কলিকাতা
সেকালের ও একালের

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক
নিশীথরঞ্জন রায়

সহযোগী সম্পাদক
অরবিন্দ ভট্টাচার্য

পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দ ২৪শে আগস্ট

শ্রাবণের বৃষ্টি, বাঙ্গালার শস্য-শ্যামল-বক্ষকে, বর্ষার মেঘের পবিত্র ধারায় সিক্ত করিয়া বিরাম লইয়াছে। ভাদ্রের আরম্ভ। তখনও বর্ষার শেষ হয় নাই। ভাদ্রের জলভরা মেঘ তখনও নীলাকাশের গাত্র-সংলগ্ন। সে মেঘে কখন বৃষ্টি হইতেছে, কখনও বা আকাশ সহসা ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, আবার কখনও বা মেঘ-ভাঙ্গা সূর্যের স্বর্ণ-কিরণে ধরা-বক্ষ প্লাবিত ও উজ্জ্বলিত।

সলিল-সম্পদময়ী ভাগীরথী কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণ যৌবনে রূপসী যেমন আরও গরীয়সী হয়, তাহার সৌন্দর্য-সম্ভার সকল দিকে পূর্ণতা লইয়া ফুটিয়া উঠে—ভাগীরথীর অবস্থা তখন ঠিক সেইরূপ। দুকূল-প্লাবী প্রচণ্ড তরঙ্গঘাতে, নদীর উভয় কূলেই ধ্বস নামিতেছে। সে প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সলিল-প্রহত শিথিল-তটভূমি গঙ্গা-অঙ্গে অঙ্গ মিশাইতেছে।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন আকাশ প্রথমটা ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বৃষ্টি হইয়া মেঘের বক্ষ শূন্য হওয়ায়, মেঘ সরিয়া পড়িল। আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত, পরিষ্কার, অস্তগামী রবির স্বর্ণ-কিরণ রঞ্জিত।

সন্ধ্যার এই প্রাক্কালে[১] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিশানওয়ালা চার পাঁচ খানি বাণিজ্য জাহাজ গঙ্গার প্রচণ্ড শক্তিশালী ঊর্মিমালার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পাইলভরে অতি ধীরে ধীরে সুতালুটির[২] দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

সেই জাহাজগুলির সঙ্গে কয়েক খানি দেশী ছিপ, বোট এবং ভাউলিয়া[৩] ছিল। সেগুলিও নদীবক্ষের নানাস্থান অধিকার করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল।

জাহাজগুলি যখন সাঁখরাইলের কাছে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সূর্য অস্তাচল-চূড়াবলম্বী

১. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্রে ১৬৯০ সালের ২৪শে আগষ্ট শিরোনামায় সুতানুটী ঘাটে অবতরণের কাল দুপুর। "This day at Sankraal, ordered Captain Brooke to come up with his vessel to Chutanutty, where we arrived at about *noon.*"

২. সুতালুটী—কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সঙ্গে সংলগ্ন তৃতীয় এই গ্রামটির বিকল্প এবং সাধারণের মধ্যে অধিক প্রচলিত নাম সুতানুটী। এই নামটির উৎপত্তি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "সুতানুটী নাম সম্বন্ধে কোনও গোলমাল নাই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সুতানুটীতে সুতার হাট বা বাজার বসিত—সুতার নুটী অর্থাৎ জড়াইয়া গোলাকার তাল বা পিণ্ড করিয়া রাখা সুতা, বহুল পরিমাণে বিক্রয় হইত বলিয়াই এ' নাম।" [সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১ম সংখ্যা বঙ্গাব্দ ১৩৪৫। সাবর্ণচৌধুরীদের কুলপঞ্জী অনুযায়ী 'ছত্র' (চাঁদোয়া) এবং 'লুট' (প্রসাদ বিতরণ) এই দুটি কথা হইতে উদ্ভূত 'ছত্রলুট' পরে ইংরেজ কোম্পানির কাগজ-পত্রে সুতানুটী নামে উল্লেখিত হয়েছে। এ. কে. রায়-এর মতে "The word is said to have been converted in later years—when the British trade in cotton bales became, a prominent feature of the city—into 'Sootalooty' and then 'Sutanuti' from soota—cotton and looty—skein—*A short History of Calcutta,* 2nd Impression, p. 27 F. N. 13.

৩. ভাউলিয়া—Hobson-Jobson-এর মতে "A kind of light accommodation boat with a cabin, in use on the Bengal rivers. We do not find the word in any of the dictionaries. Ives, in the middle of the 18th century, describes it as a boat very long, but so narrow that only one man could sit in the breadth, though it carried a multitude of rowers......Buchanan Hamilton, writing about 1820, says: The bhauliya is intended for the same purpose (conveyance of passengers), and is about the same size as the *Pansi.* It is sharp at both ends, rises at the ends less than the *Pansi,* and its tilt is placed in the middle, the rowers standing both before and behind the place of accommodation of passengers."—New edition, p. 102.

হইয়াছেন। নিশাগমন-সূচিত বিরলান্ধকারে সমস্ত মেদিনী সমাচ্ছন্না হইতেছে। আর বৃক্ষাদিপূর্ণ, জঙ্গলময় জনশূন্য নদীকূলে অন্ধকার যেন আরও জমাট হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা মোগল রাজত্বের মধ্যযুগের কথা বলিতেছি। আজকাল যে স্থান কলিকাতা সহর বলিয়া পরিচিত. সেই স্থান অধিকার করিয়া সেই সময়ে সূতালুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা বলিয়া তিনখানি গণ্ডগ্রাম ছিল। ভাগীরথীও সেই সময়ে অতি প্রচণ্ড বেগশালিনী ও বিস্তৃত-কায়া ছিলেন।

সূতালুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানি পাশাপাশি ছিল। ইহাদের চারি-দিকেই ভীষণ জঙ্গল। গ্রামগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যে একটি খাত ছিল। কার সাধ্য—সন্ধ্যার পর এই সমস্ত গ্রামের পথে একাকী বাহির হইতে পারে। চারিদিকে নরঘাতী দস্যু-তস্কর।

সূতালুটিতে, গঙ্গার উপকূলে একটি ক্ষুদ্র হাট ছিল। শেঠ ও বসুকেরা (বসাকেরা) সেই সময়ে সূতালুটির প্রধান অধিবাসী ছিলেন। সূতার ব্যবসায়ই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। সূতানুটির হাটে, বৎসরের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট সময়ে, সূতা, কাপড় প্রভৃতি বিক্রয় হইত।

এই সমস্ত পণ্য কিনিত ইউরোপীয় বণিকগণ। সেকালে বঙ্গদেশের সূতার সূক্ষ্ম-কাটুনি জগৎ প্রসিদ্ধ। ইউরোপ খণ্ডে বাঙ্গালার ঢাকাই মস্‌লিনের বড় আদর। চরকা, কাট্‌না প্রভৃতির সহায়তায় সেকালে যেরূপ অতি সূক্ষ্ম সূতা এদেশে জন্মিত, আজকাল কলেও সেরূপ হয় না।

তখন বঙ্গদেশে, ইংরাজ, পর্টুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি বণিকগণ বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। সপ্তগ্রামের পতনে, হুগলীর প্রাধান্য বাড়িয়া উঠে। এই সমস্ত ইউরোপীয় সওদাগরেরা, এদেশের উৎপন্ন অনেক দ্রব্য ইউরোপে চালান দিতেন। সূতালুটির হাট হইতে সকলকেই সূতা ও কাপড় কিনিতে হইত।

সন্ধ্যার বিরল অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, ধীর মন্থর গতিতে, জাহাজ কয়খানি সাঁখরাইল ছাড়াইয়া. বর্তমান খিদিরপুরের পার্শ্ব দিয়া, ধীরে ধীরে সূতালুটি গ্রামের কাছে পেঁছিল। নাবিকগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সেই প্রবল তরঙ্গের উপর ক্ষুদ্র 'পিনেস্‌' বা জালি-বোট নামাইয়া দিয়া, জাহাজ গুলি নঙ্গর করিল। তখন গঙ্গায় বয়া ছিল না, নঙ্গর করিবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। অপরন্তু সেই জঙ্গলময় স্থানে মোটা গুঁড়িওয়ালা গাছেরও অভাব ছিল না। ক্ষুদ্র বাণিজ্য জাহাজগুলি বৃক্ষের মূলেই রজ্জু দিয়া বাঁধা হইল।

সেই বজরার মধ্য হইতে একজন ইংরাজ একখানি পিনেসের সাহায্যে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতীর হইতে সূতালুটির বাজারের দিকে ধীর-গতিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। নদীতীরে বাণিজ্য কার্যের জন্য. কোম্পানির কর্মচারিগণের যে কয়েকখানি মাটির চালা ছিল, তাহার চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে, দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোন কোনটির বাঁশ-বাঁখারি দরমা প্রভৃতির চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল ভিত্তির মাটি বর্ষার প্রবাহধৌত হইয়া কুটীরের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে।

আর যাঁহারা তাঁহার সহিত কূলে নামিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহার পশ্চাৎবর্তী হইলেন। আশ্রয় স্থানের অবস্থা দেখিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোক সেই অন্ধকারময় শ্মশানবৎ নির্জন স্থানের উপর পড়িয়া অতি ভীষণ দৃশ্যের সূচনা করিল।

অগ্রগামী ইংরাজটির বেশভূষা অন্য সকলের অপেক্ষা অনেকটা বহুমূল্য। তিনি সেই অন্ধ-কারময় স্থানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া তারকাখচিত, মেঘ-মণ্ডিত, অন্ধকারময় আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিলেন। তার পর তাঁহার সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই সকল! আমরা এই সূতালুটিতে যে আশ্রয় স্থানটুকু করিয়া গিয়াছিলাম, তাহার পরিণাম ত তোমরা সবাই দেখিতেছ। বর্ষার রাত্রে, এই জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে বাস করা বড়ই কষ্টকর হইবে। চল, আমরা আজকে রাত্রের মত জাহাজে ফিরিয়া যাই। কাল প্রাতে আবার মাল-মসলা জোগাড় করিয়া নূতন আশ্রয়-স্থান করিতে হইবে।"

তাঁহার অধীনস্থ সকলেই তাঁহার মত সমর্থন করিল। সেই দীর্ঘাকার পুরুষ ধীর গতিতে আবার জালি-বোটে উঠিলেন।

এই দীর্ঘাকার ইংরাজ আর কেহই নহেন স্বয়ং জোব চার্নক, কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা।

পরদিন প্রভাতে পরিচিত বাঙ্গালীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জোব চার্নক ইংরাজদিগের বাসের জন্য কয়েকখানি মৃৎকুটীর নির্মাণ করাইলেন। মাত্র একখানি কোটাবাড়ি ভাড়া লইয়া মেরামত করান হইল। কোম্পানির কুঠির কর্মচারীরা সেই কুটিরগুলি যত শীঘ্র পারিলেন দখল করিলেন।

এইরূপে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে, বর্তমান প্রাসাদ-সৌন্দর্যময়ী কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বর্তমান বৎসর[১] হইতে ২২৩ বৎসর পূর্বে, আজকাল যে স্থানকে লোকে 'হাটখোলা' বলে, সেই অঞ্চলেই জোব চার্নক কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, বেনিয়াটোলা ঘাটের সমীপবর্তী রথতলা ঘাটই জোব চার্নকের কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার প্রথম স্থান। উক্ত গভীর জঙ্গলময়ী গ্রামত্রয়, কালচক্রের আবর্তনে, কিরূপে বনজঙ্গল সমন্বিত বেলাভূমি হইতে, এই সার্ধ দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া বর্তমান প্রাসাদময়ী নগরীতে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। কলিকাতার জীবনের এই অভিনব পরিবর্তনের দিনে প্রাচীন কলিকাতার, ইংরেজাধিকৃত কলিকাতার, বঙ্গদেশ মধ্যে ভারতের শেষ রাজধানী কলিকাতার ঘটনাময় জীবনের সমস্ত কাহিনীই আমরা এই পুস্তকে যথাযথ লিপিবদ্ধ করিব।

কাপ্তেন ব্রুক বলিয়া একজন ইংরাজ, সেই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পোতাধ্যক্ষ ছিলেন। জোব চার্নক যে শুভমুহূর্তে সুতালুটিতে উপস্থিত হন, সেই সময়ে কাপ্তেন ব্রুকও তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। সেই স্মরণীয় দিনের ঘটনা, পুরাতন কাগজ পত্র হইতে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। কারণ ইহা ব্যতীত কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আর কোন লিখিত বিবরণই নাই।

"১৬৯০ খ্রীস্টাব্দ, ২৪ আগস্ট, আজ আমরা সাঁকরাইলে আসিয়া পৌঁছিলাম। কাপ্তেন ব্রুককে আদেশ করা হইল, যেন তিনি তাঁহার অধীনস্থ বাণিজ্য পোতগুলি, সুতালুটি, হাটের সন্নিকটে নঙ্গর করেন। তিনি অপরাহ্নে এই স্থানে উপস্থিত হন। এ স্থানের অবস্থা অতি শোচনীয়। আমাদের আশ্রয় লইবার উপযুক্ত কোন স্থানই সেখানে ছিল না। যাহা কিছু ছিল সবই গিয়াছে। দিন রাত বৃষ্টি হইতেছিল। নদীগর্ভে বোটের উপর বাসও স্বাস্থ্যকর নহে। আমরা পূর্ববারে এই সুতালুটির মধ্যে যে দুই একখানি কুঁড়ে ঘর রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহার চিহ্নমাত্র নাই। আমরা এ স্থানত্যাগ করিবার পরই, মল্লিক বরকুদার[২] (বৃকোদর মল্লিক?) ও দেশীয় লোকেরা চালাগুলি জ্বালাইয়া দিয়াছে এবং বাঁশ বেড়া ইত্যাদি যাহা ছিল সবই লইয়া গিয়াছে।"[৩]

---

১. গ্রন্থখানি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত। এখানে সেই সময় উল্লিখিত।

২. মল্লিক বরকুদার (বৃকোদর মল্লিক)—শ্রীরাধারমণ মিত্রের মতে "কথাটা তো মল্লিক নয়, (ফার্সী) মালিক। মানে, প্রভু বা কর্তা। আর বকখুরদার মানে ছোট। ফার্সী মূলশব্দ 'খুর্দ' থেকে হয়েছে 'খুর্দা' বাংলায় 'খুচরা'—অর্থ ছোটমুদ্রা বা রেজকি। এটা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, তাঁর উপাধিমাত্র। সুবেদার বা নবাবের নিচেই যে সরকারী কর্মচারী থাকতেন তাঁকে অথবা নবাবের প্রতিনিধিকে বলা হতো 'মালিক বরকুরদার'।" —কলিকাতা দর্পণ, পৃ. ১২৫।

৩. 1690. August 24. This day at Sankraal ordered Captain Brooke to come up with his vessel to Chutta-nutty, where we arrived about afternoon, but found the place in a deplorable condition, nothing being left for our present accommodation and the rain falling day and night. We are forced to betake ourselves to Boats, which considering the season of the year, is very unhealthy, Mullick Burcoodar and the country people at our leaving this place burning and carrying away what they could.

প্রথম অধ্যায়

কলিকাতার ভূতত্ত্ব ও পুরাকালের কথা

অতি প্রাচীন কালে বঙ্গদেশের অবস্থা।—রাজমহলের তল-দেশে সমুদ্রের তীর-ভূমি—মন্বাদির সময়ে বঙ্গের অবস্থা—যুধিষ্ঠিরের সময়ে বঙ্গের অবস্থা—প্রাচীন তাম্রলিপ্ত—পরিব্রাজক হুয়েন-সাংএর কথিত কাহিনী—পৌণ্ড্র, কামরূপ, সমতট—তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি বঙ্গের পঞ্চবিভাগ—বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গের অবস্থা—রাজধানী রূপে গৌড়, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ—বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে উল্লিখিত সমতট-ভূমি—কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ—সে-কালের শৃগালদহ (শিয়ালদহ), বালুকা (বালী), খড়্গদহ (খড়দহ) প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ—দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র গর্ভে অবস্থান—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও চরের উৎপত্তি—শতাধিক বৎসর পূর্বে গড়ের মাঠের কেল্লায় ও শিয়ালদহে পুষ্করিণী খননের ফলাফল—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মত—কলিকাতা, কিলকিলা ও কালী-ক্ষেত্রের সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ভব।

জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্বে, আমরা কলিকাতার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন, কলিকাতার আবার ভূতত্ত্ব কি? কিন্তু তাঁহারা আজকাল কলিকাতাকে যে অবস্থায় দেখিতেছেন, কলিকাতার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা দেখিতেছেন, পুরাকালে সেরূপ ছিল না। আমরা এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, বহুপূর্বে অর্থাৎ যখন এদেশের কোন ইতিহাসই ছিল না সেই প্রাচীনতম কালে, বর্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগ সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। আজ কালকার রাজমহল, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের সীমার মধ্যে, কোন একস্থলে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে বহির্গত সমস্ত নদ-নদী সেই পুরাকালে ঐ স্থানে আসিয়া সাগরে পড়িত। তাহাদের স্রোত-পরিচালিত বালুমৃত্তিকায়, গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপ বা ইংরাজ ভৌগোলিকগণের Gangetic Delta-র উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া, দক্ষিণ বঙ্গে সমতল ভূভাগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

শাস্ত্রাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মনুর সময়ে কেবলমাত্র প্রয়াগ পর্যন্ত, হিন্দু আর্য-দিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আর্যগণ ক্রমশঃ পূর্বদেশাভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনু সংহিতায়[১] 'পৌণ্ড্র-দেশ'[২] পতিত ক্ষত্রিয়গণের আবাসভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পৌণ্ড্র দেশ উত্তর বাঙ্গালার প্রাচীন নাম। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, মনুর সময়ে উত্তর বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আর্যদিগের করতলগত হয় নাই। বৈবস্বত মনুর পুত্র, প্রথিতযশা ইক্ষ্বাকু নরপতি অযোধ্যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমে চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় নৃপতিগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অসভ্য অনার্য জাতিদিগকে দূরীভূত করিয়া, আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিলে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ এইসকল স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

১. মনুসংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খ্রী. পূ. ২০০ এবং খ্রীষ্টাব্দ ২০০-এর মধ্যবর্তী কাল। প্রয়াগ পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ এবং সভ্যতার বিস্তার ইহার পূর্ববর্তী কালে অর্থাৎ মহাভারতের যুগে ঘটিয়াছিল।

২. শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ / বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ।৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রা দ্রাবিড়া কাম্বোজা যবনাশকাঃ।৪৪।—মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

মহাভারতে দক্ষিণ বাঙ্গালার অন্তর্গত 'তাম্রলিপ্ত' প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুবংশধর রাজচক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সময়ে, রাজসূয় যজ্ঞকালে পূর্বদিক বিজেতা ভীমসেন ঐসমস্ত প্রদেশের অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) প্রভৃতি স্থানে সে সময়ে পাণ্ডবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। অধিকাংশ প্রাচীন পুরাণাদির দেশ-বিবরণ স্থানে, দক্ষিণ বাঙ্গালার সমুদ্রতীর পর্যন্ত অরণ্যানিপূর্ণ তাবৎ ভূভাগকে 'সমতট প্রদেশ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

চীন-দেশীয় ভ্রমণকারী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হুয়েন-সাং ভারতবর্ষের সমসাময়িক অবস্থার কথা তাঁহার লিখিত-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া সেই অন্ধতমসময় যুগের ইতিহাস-রক্ষার অনেক সহায়তা করিয়াছেন। হুয়েন-সাং যখন বাঙ্গালায় আসেন, তখন ইহা পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাঁহার মতে, তৎকালে বঙ্গের উত্তরে পৌণ্ড্র, উত্তর-পূর্বে কামরূপ, পূর্বে সমতট, দক্ষিণ পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত ও পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ বিভাগ ছিল। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, যে, তাম্রলিপ্ত (বর্তমান মেদিনীপুর) হইতে দক্ষিণেশ্বর সমগ্র সমতটভূমি সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত শিরোমণি ডাক্তার কনিংহাম বলেন, খৃঃ পূর্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই আমরা ভারতের নানা স্থানের ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারি। ইহার পূর্বের ঘটনা কুহেলিকা-জালে সমাবৃত। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লিখিত বিবরণের সহায়তায় ভারতের প্রাচীনতম স্থানের অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত কাহিনী হইতে আমরা দক্ষিণে রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতির কথা জানিতে পারি। আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে পাটলী-পুত্র বা পাটনার কথা জানিতে পারা যায়। জনকপুর, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, কপিলাবস্তু প্রভৃতি নগরীগুলি, নেপাল তিরায়ের পর্বতশ্রেণীর অধিকৃত নিম্ন সমতল ভূভাগেই স্থাপিত হইয়াছিল। খৃীস্টের ছয় হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে পাটনার দক্ষিণ প্রদেশ গুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে, আমরা গৌড় নগরীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ১৬০৪ খৃীস্টাব্দে গৌড়ের ধ্বংসের সহিত তাণ্ডায় বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৭০৪ খৃীস্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ মুরশিদাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিতবর কনিংহামের মতে. সমস্ত বঙ্গদেশের এইরূপ উন্নত ও জনপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইতে তিন চারি সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।[১]

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আজকাল যে কলিকাতা 'সৌধময়ী নগরী' বা City of Palaces বলিয়া এত গৌরবান্বিত, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। সমুদ্রের অনন্ত সলিলগর্ভে বর্তমান কলিকাতার অধিকৃত ভূখণ্ড প্রোথিত ছিল। তাঁহাদের মতে. পুরাকালে রাজমহলের নিম্নদেশ দিয়া বঙ্গোপসাগরের খরস্রোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন ধরিয়া, ক্রমাগতঃ চড়া পড়িয়া আবার গাঙ্গেয় 'ব'-দ্বীপ, সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমশঃ উত্থিত হইতে লাগিল। এই ব-দ্বীপ অতি পুরাকালে সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ-পণ্ডিত বরাহ-মিহির বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে 'সমতট' বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন পুরাণ উপপুরাণ কিম্বা অন্য প্রাচীন গ্রন্থে 'সমতটের' নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। সম্ভবত খৃীস্টের সপ্তম শতাব্দী হইতেই 'সমতট' একটি ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়। বর্তমান কলিকাতা সেই সময়ে এই সমতটের দক্ষিণে বন জঙ্গল পরিপূর্ণ অবস্থায় সুন্দরবনের গর্ভে ছিল। জনশ্রুতি এই, উক্ত প্রাচীন জঙ্গলময় স্থান আর একবার ভূগর্ভে বসিয়া যায়। তৎপরে কাল সহকারে পলি পড়িয়া আবার উন্নত ভূভাগে পরিণত হইয়াছে।

কতদিন হইতে বর্তমান কলিকাতার অধিকৃত ভূভাগখণ্ড বাসযোগ্য হইয়াছে এবং কোন্ সময় হইতে এখানে জনমানবে প্রথম বসবাস করিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা

১. *Journal of the Geological Society of London.* VOL XXI 1869.

অতি কঠিন। সুন্দরবনের ন্যায়, এই প্রাসাদশোভাময়ী কলিকাতা, বহুপূর্বে গভীর জঙ্গলময় ও ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের বসবাস ছিল। বহু শতাব্দী পূর্বে নীচশ্রেণীর অসভ্য জাতিরা ক্রমশঃ ইহার জঙ্গল কাটাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সম্ভবত শাস্ত্রোক্ত কিরাত, নিষাদ, শবর অথবা কোল জাতি। তাহাদের বসবাস হেতু, এই জঙ্গল-পূর্ণস্থান ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। তৎপরে এক শ্রেণীর অসভ্যজাতি এখানে আসিয়া বাস করে। তাহারা নদী হইতে মাছ ধরিয়া বা চাষ-বাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। ইহাই কলিকাতার বহু শতাব্দী-পূর্বের আনুমানিক ইতিহাস। উপরে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন লিখিত বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন পুরাণাদির উক্তি, অনুমান ও চলিত কিম্বদন্তী হইতেই সেই অন্ধকারময় যুগের প্রাচীন বিবরণ কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। ভবিষ্যতে কালীঘাটের কথা বলিবার সময়ে আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

পণ্ডিতবর পদ্মনাথ ঘোষাল বলেন, "অতি প্রাচীন কাল হইতেই কলিকাতা সর্ব সাধারণে পরিচিত। পুরাকালের হিন্দুগণ, এই স্থানকে—'কালীক্ষেত্র' বলিতেন। তৎকালের এই কালী-ক্ষেত্র বহুলা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেকে এই বহুলাকে বর্তমান কালের 'বেহালা' বলিয়া অনুমান করেন। এই 'কালীক্ষেত্রের' সীমার মধ্যে কোন একটি স্থলে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সতীদেহের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। এই জন্য, সেই স্থানে এক দেবীমূর্তি ও একটি ভৈরব-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর আর দেবীমূর্তি কালী। অনেকের মতে এই কালীক্ষেত্র হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে, এবং কালীক্ষেত্র ও কালীঘাট যে বিভিন্ন স্থান, এসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। গৌড়েশ্বর বল্লাল সেনের সময়ে 'কালীক্ষেত্র' স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বল্লালের এক দান পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি 'কালীক্ষেত্র' নামক এই বিস্তৃত ভূভাগটি এক ব্রাহ্মণকে দান-পত্র লিখিয়া দান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে ১৪৯৫ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত এই 'কালীক্ষেত্রের' আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

'দিগ্বিজয়প্রকাশ' বলিয়া একখানি সংস্কৃত ভূগোল ও ইতিহাস আছে। এই বহুমূল্য গ্রন্থ-খানি সেকালের একজন প্রাচীন কবি, কবিরামের রচিত। কবিরাম[১] মগধ বা আধুনিক বিহারের কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। কবিরামের গ্রন্থে 'কিল্‌কিলা' বলিয়া একটি স্থানের বিবরণ[২] আছে। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, কিল্‌কিলা একটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল ও তাহার সীমার মধ্যে অনেক বড় বড় নগর ও গ্রাম ছিল। কবিরাম সম্ভবত স্বনামপ্রসিদ্ধ, যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। আমরা নিম্নে কবিরামের 'কিল্‌কিলার' সম্বন্ধে লিখিত বিবরণটি বিশ্বকোষ মহাভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। স্থানাভাব জন্য মূলভাগ পরিত্যক্ত হইল।

'পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্বে গঙ্গানদী ইহার মধ্যে একুশ যোজন পরিমিত কিল্‌কিলা-ভূমি। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। দানগলী নদীর পশ্চিমে, গঙ্গার নিকটে শাড়েশ্বরী দেবী বিরাজ করিতে-ছেন। এখানে উপবাস করিলে কুষ্ঠাদি দারুণ রোগ দেবীর কৃপার আরোগ্য হয়। মাহেশ ও খড়্গদহ (খড়দহ) গ্রামের মধ্যে, দীর্ঘ-গঙ্গার নিকট ফুলপাল্ল নামক রাজা বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গা-নদীর তটে অনুদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্তাভূমি (?) আছে। এখানে কদলী, পৃশ্নিপর্ণী, সুপারি প্রভৃতি গাছ জন্মে। পীঠমালা মতে, এখানে ভাগীরথী তীরে সতী-দেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালিকা-দেবীর প্রসাদে কিল্‌কিল্লা বাসীরা ধনধান্যবান হইবেন। সকল প্রকার শস্যাদি জন্মে বলিয়া ইহাকে 'ঋদ্ধ' দেশ বলিয়া থাকে।

---

১. কবিরাম, পাটলীপুত্র নগরবাসী একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক। পাটলীপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আনাম দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি যে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত 'দিগ্বিজয়প্রকাশে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২. দিগ্বিজয়প্রকাশে কিলকিলা (কিলকিল্লা) বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ইহার পূর্বসীমা কালিন্দিকা (অর্থাৎ যমুনা) নদী, পশ্চিমদিকে সরস্বতী।

এখানে সকল বর্ণের লোক নিয়ত বাস করে। এখানকার দেশবাসীদের মতে, সমুদ্র মন্থনকালে, পৃষ্ঠস্থিত মন্দার-পর্বতের ও অনন্তের ভারে অভিভূত হইয়া, পর্বত-ভারবাহী কূর্ম দৈত্যগণের মোহনের জন্য এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই নিশ্বাসের কল্লোল যতদূর গিয়াছিল, ততদূর 'কিল্‌কিলা-দেশ'। সতী-দেবীর বরে, মহাবলবান কুলপাল ও দেশপাল, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র। হরিপাল ও অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে[১] নিজনামে হট্টবাপীযুক্ত একটী মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতি, গোষ্ঠী ও সাঙ্গাইদিগের রাজা হইলেন। অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ (চাকদা) ও ডুমুরদ্বীপ (ডুমুরদ) গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অহিপালের তিনপুত্র। কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও মহাবল কেশীধ্বজ। কেশীধ্বজ কিল্‌কিলার পশ্চিমে যোজনান্তরে (?) সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয়া বেঘ (?) জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র মহাবল বিরম্রী সুগন্ধি নামক গ্রামে বসবাস করেন। বিভাণ্ড পূর্বপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা, জগদ্দলে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য, ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের রাজা হইয়াছেন। রাজা কেশীধ্বজ, চান্দোল নামক স্থানে নানাস্থান হইতে কায়স্থ আনাইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্মীনদীর তীরে সেই কেশীধ্বজের বংশোদ্ভব কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছেন। শিবপুর ও বালুকা (বালি) গ্রামের মধ্যে এবং ভদ্রেশ্বরের নিকট শ্রীরামপুরাদি গ্রামে, ব্রাহ্মণ জাতির বাস। হুগলীর নিকট বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম। এখানে খলাপি নদী দামোদর হইতে আদি-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। খলসানি গ্রামে ধীবর রাজার রাজত্ব। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যে পাটুলী গ্রাম কায়স্থ অধিবাসীদের অধীন। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লী, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদহ (শিয়ালদহ) এবং সারপল্লীও কায়স্থদিগের শাসনে আছে। সর্বশুদ্ধ তিন হাজার গ্রাম কিলকিলার অন্তর্গত। '..........' বিশ্বসার-তন্ত্রের প্রথম পটলে, কিল-কিলাস্থ শিবলিঙ্গের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত তন্ত্র মতে কিল্‌-কিলাদেশে নবদ্বীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে শচীসুত (চৈতন্যদেব) এবং খড়্গদহ গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন।'[২]

'দিগ্বিজয়প্রকাশ' হইতে আমরা জানিতে পারি, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আমলে খড়্গ-দাহ (খড়দা) মাহেশ, হরিপাল, সিঙ্গুর, ত্রিবেণী, চাকদা, ডুমুরদা, সপ্তগ্রাম, জগদ্দল, শিবপুর, বালী, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, খলসানি, গোবিন্দপুর, ভাটপাড়া, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য অবস্থায় ছিল।

ইতিপূর্বে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা হইতে প্রমাণ হয়, যে সমুদ্রগর্ভ হইতেই কলিকাতার উৎপত্তি। পূর্বোক্ত কিল্‌কিলা প্রদেশের অধিকাংশ স্থান বাদাভূমি ও সমুদ্র-গর্ভজাত ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপাদি পূর্ণ ছিল। এখনও নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুখ-সাগর, চাকদহ, ডুমুরদহ, খড়দহ, আর্যদহ (আরিয়াদহ বা এঁড়েদা) প্রভৃতি নাম হইতে প্রমাণ হয়, এ স্থানগুলি সমুদ্র বেষ্টিত খাড়ী, নদীগর্ভ বা জলাভূমি হইতে উদ্ভূত। পণ্ডিতপ্রবর ফরগুসান সাহেব বলেন, 'দহ' শব্দটি দ্বীপের অপভ্রংশ।

বর্তমান কালে, কলিকাতার ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে পরীক্ষার ফল হইতেও প্রমাণ হয়, যে বর্তমানকালের কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থানগুলি বহুশতাব্দী পূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, হিমাচলের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতরঙ্গ উত্থিত

১. এখনও তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল গ্রাম বর্তমান।

২. কবিরাম সে সমস্ত গ্রামের ও ভূভাগের নামোল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদের অনেকগুলি পরিবর্তিত নাম লইয়া, এখনও বিরাজমান। তাঁহার উল্লিখিত রাজ্য ও রাজাগণের কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। বল্লালী আমলের 'কালী-ক্ষেত্র' ও কবিরামের উল্লিখিত কিল্‌কিলা যে অবশ্য বর্তমান কালীঘাট নহে—ইহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই প্রমাণ হয়।—নব্যভারত ১৩০৮।

হইত। কালে অগ্নুৎপাতের ফলে ভূমিখণ্ড ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া উত্তর বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর বাঙ্গালার যে কোন স্থানের ভূমি খনন করিলেই এখনও গন্ধক এবং জারিত লৌহ (Vetrified Iron) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেক স্থানের মৃত্তিকা দেখিতে যেন এক নম্বর সুরকীর মত লোহিতবর্ণ। এই লৌহে উৎকৃষ্ট অসি প্রস্তুত হইত। 'লৌহার্ণব' গ্রন্থে লিখিত আছে—"বঙ্গ-দেশজাত অসি তীক্ষ্ম ও ছেদ-ভেদে পটু।" কুচবিহারের নিম্নে, প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ লৌহ আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, অগ্নুৎপাতে উৎপন্ন দ্বীপ সমূহের উপর হিমালয়-জাত নদী সমূহ অবিশ্রান্ত কর্দমরাশি সহ, নুড়ী-প্রস্তর আনিয়া ঢালিতে ঢালিতে, বহু সহস্র বৎসরের চেষ্টায়, হিমালয়কে বর্তমান স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কলিকাতার মধ্যবর্তী ভূমি গভীর ভাবে খনন করিয়া ইহার প্রাচীন অবস্থার অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। এই সমস্ত খনিত স্থানে বসবাসের চিহ্নস্বরূপ, দগ্ধ মৃত্তিকা বা ধাতু-দ্রব্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। অনেক স্থলে, কেবল উদ্ভিজ্জ-সার ও নদীর বালুকা স্তরই দেখা দিয়াছিল। লালদীঘি, গোলদীঘি, মনোহর-তালাও প্রভৃতি পুষ্করিণী খনন কালে, এরূপ অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার গড়ের মাঠের মধ্যে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি পুষ্করিণী খনন করান হয়। উক্ত বৎসরের মে মাসেই 'কলিকাতা গেজেটে' ইহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, চৌরঙ্গীর কোণে দীঘির নিম্নে বালুকা জন্মায়, গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীটি শুকাইয়া যায়। সেই জন্য উহাকে একটু বেশী গভীর করিয়া খনন করান হয়। খননকালে চারি ফিট নিম্নে, সারি সারি পুরাতন বৃক্ষের মূল পাওয়া গিয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ, সে মূল গুলি সুন্দরী-বৃক্ষের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ইহার আরও কয়েকটি স্থানে পুষ্করিণী খননকালে, ঐ প্রকার চিহ্ন দেখা যায়। সরকারী-রিপোর্ট হইতে আমরা তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।—

১। শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণে যে পুষ্করিণী আছে, তাহা খননকালে প্রথম স্তরের এক-ফুট মৃত্তিকার নিম্নে, তিন ফিট পরিষ্কার নদীর বালুকা, তৎপরে কোন কোন স্থানে ছয় ফিট, আবার কোথাও বা আট ফিট সূক্ষ্ম বালুকাসহ, উদ্ভিজ্জ-সার ও ঝিনুক পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে পরীক্ষার জন্য আরও গভীর করিয়া খনন করিলে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের আটাল মৃত্তিকা পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মৃত্তিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবামাত্রই, ছাই হইয়া যায়। ভূতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতদের মতে, ইহা 'পিট-কোল' বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐ পুষ্করিণীটি আরও গভীর করিয়া খনন করায়, সারি সারি সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি সকল পাওয়া যায়।

২। এই সময়ে কলিকাতার বর্তমান কেল্লার মধ্যে, একটী কূপ খনন করান হয়। তাহাতেও শিয়ালদহের পুষ্করিণীর ন্যায়, মাটি ও বালি পাওয়া যায়। শেষ ১৫৯ ফিট খনন করিবার পর হরিদ্রাবর্ণ সূত্র-চিহ্ন-বিশিষ্ট আঁটাল মাটি পাওয়া যায়। ১৮০ ফিট নিম্নে, পিটকোলের সহিত ছাঁচিকুমড়ার বিচি ও ইক্ষু পত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬ ফিটের নিম্নে লৌহসংযুক্ত মৃত্তিকার চিহ্ন পাওয়া যায়। ৩৫০ ফিট নিম্নে, একটি কুক্কুরের কঙ্কাল ও ৩৭২ ফিটের পর একটি কচ্ছপের খোলা বাহির হইয়াছিল। ইহার পর আরও খনন করিতে করিতে ঝিনুক, গলিত উদ্ভিজ্জ-সার ও গাছের গুঁড়ি দেখা গিয়াছিল।

এইরূপ পদার্থসমূহের আবির্ভাব দেখিয়া, কূপটিকে ৪৮১ ফিট পর্যন্ত খনন করান হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে সমুদ্রতীরের ক্ষুদ্র বালুকা, পর্বত নিঃসৃত ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, অভ্রের খণ্ড বাহির হওয়ায় খননকার্য বন্ধ করা হয়।

৩। কয়েক বৎসর গত হইল, দমদমার নিকট একটি পুষ্করিণী খননকালে গভীর ভাবে খনিত একটি স্থান হইতে ঐরূপ বৃক্ষ একটি হরিণের শৃঙ্গ ও কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল।

৪। বর্তমান গার্ডেনরীচের নিকট এক পুষ্করিণী খননে একখানি নৌকা বাহির হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, গঙ্গার বদ্বীপ বা (Gangetic Delta) বহুবার বসিয়া গিয়া,

এক্ষণে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ৬৩৫ খৃীস্টাব্দে, চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং, তমলুক বা তাম্রলিপ্ত নগরীকে সমুদ্র তটে দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তমলুক হইতে সাগর ৬০ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ধরিতে গেলে, প্রতি শতাব্দীতে প্রায় পাঁচ মাইল করিয়া ভূমি ভরিয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, বরাহ মিহিরের 'সমতট' ও কবিরামের 'কিল্‌কিলা' প্রদেশ বহু বহু শতাব্দীর পর বর্তমান অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের কোন ধারাবাহিক লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য এত বেশী, বহু শতাব্দী পূর্বের কথা দূরে থাক, একশত বৎসরের পূর্বের ঘটনারও কোন লিখিত বিবরণ নাই। এরূপ অবস্থায় বঙ্গদেশের প্রাচীন ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া অতি দুঘট ব্যাপার।

মোটের উপর কথা হইতেছে এই, বর্তমান কলিকাতা নগরীর অধিকৃত স্থান ও সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ অতি পুরাকালে সমুদ্র-গর্ভমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। চর ও বালুকাস্তর দ্বারা কালধর্মে, গভীর সমুদ্রতল হইতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডের অস্তিত্ব জন্মিয়াছে। এই সমুদ্র-গর্ভোত্থিত দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যেই কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।
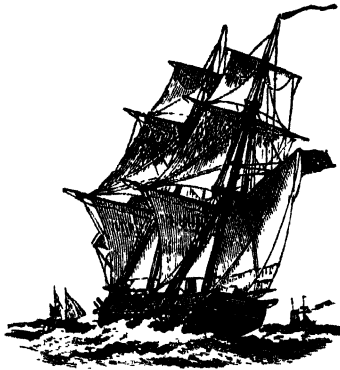
দ্বিতীয় অধ্যায়

কালীপীঠ ও পৌরাণিক কথা

সতী-দেহ-ধ্বংসে পীঠস্থানোৎপত্তি—কালীপীঠ,—নকুলেশ্বর ভৈরব, চূড়ামণি-তন্ত্রের উক্তি—তন্ত্রানুসারে প্রাচীন কালীপীঠের সীমা—বঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্মের উচ্ছেদ—শাক্তধর্মের পুনরুত্থান—পীঠমাহাত্ম্য প্রকাশ—বল্লালসেন কর্তৃক বঙ্গ বিভাগ—বাগড়ি অঞ্চলে ব্রহ্মোত্তর দান—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে কালীঘাটের অবস্থা—কালী কুণ্ড—মহানীল-তন্ত্রোক্ত গুহ্য-কালী—চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী—চিতে ডাকাত—চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি—কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ—কিল্‌কিলাপুরীর বিবরণ—রাজা গোবিন্দ দত্ত—তাঁহার সময়ের কালীঘাট—গোবিন্দপুর নামকরণ—প্রতাপাদিত্যের সময়ের কালীঘাট।

মহাদেবঃ সতী দেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।
তদ্দেহ বিষ্ণুণা ছেত্তুং খ্রিয়তেঽসৌ সুদর্শনঃ॥

পাঠক! একবার কল্পনার চক্ষে, দক্ষালয়ে রাজর্ষি দক্ষ-সূচিত মহাযজ্ঞের ব্যাপারের চিত্রে মনোনিবেশ করুন। যজ্ঞে সকলেই নিমন্ত্রিত। দেব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর মুনি ঋষি কেহই বাকি নাই—অতি দীন দরিদ্র ভিক্ষুক পর্যন্ত যজ্ঞশালায় উপস্থিত—খালি নাই সতীর সর্বস্বধন শিব! পিতৃমুখে সভামধ্যে স্বামীর অবমাননা বাক্য শুনিয়া, পতি-প্রেমানুরাগিণী আদ্যাশক্তি সতী, অভিমানে মর্মজ্বালায় দেহত্যাগ করিলেন। শিবের ও তৎসহচর প্রমথগণের উৎপাতে দক্ষের মহাযজ্ঞ পণ্ড হইল। শিব-নিন্দার শাস্তিরূপে তাঁহার ছাগমুখ হইল। বিগত-প্রাণা সতী-দেহ স্কন্ধে লইয়া শিব উন্মাদের ন্যায় মহাতাণ্ডব নৃত্যে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি 'যায় যায়' হইয়া উঠিল।

শিব-ক্রোধে প্রলয় উপস্থিত হয় দেখিয়া দেবগণ মঙ্গলময় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু শাণিত সুদর্শন দ্বারা সেই বিগত-প্রাণ সতী-দেহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভারতবর্ষের নানা-স্থানে নিক্ষেপ করিলেন। সতী-দেহের এই ছিন্নাংশ যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল সেইসকল স্থান 'পীঠ' বা 'শক্তিক্ষেত্রে' পরিণত হয়। 'পীঠমালা' নামক গ্রন্থে, প্রধান প্রধান পীঠ-স্থানের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। হিন্দুমাত্রেই এইসকল পীঠের নাম শুনিয়াছেন—এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ সুতরাং নিষ্প্রয়োজন।

'পীঠমালায়' দেখা যায়, সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি কালীঘাটে পড়িয়াছিল। এইজন্য কালীঘাট পবিত্র শক্তি-পীঠ। প্রত্যেক পীঠে শিব ও শক্তি অর্থাৎ দেবতা ও ভৈরব বিরাজিত থাকেন। কালীঘাটের কালী পীঠের দেবতা মহাশক্তি রূপিণী কালী ও পীঠ-রক্ষক ভৈরব নকুলেশ। সতীস্নেহবশতঃ শিব লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া কালীঘাটে নকুলেশ্বর নামে বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা শিবের সন্তোষের জন্য এই স্থানে একটি কালীমূর্তি স্থাপন করিলেন। চূড়ামণি তন্ত্রে আছে—

নকুলেশঃ কালী-পীঠে দক্ষ পাদাঙ্গুলীষু চ
সর্বসিদ্ধিকর দেবী কালিকা তত্র দেবতাঃ॥

ইহাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরাণিক ইতিহাস। কালীঘাটের বিস্তৃতি সেই পুরাকালে কতদূর ছিল তৎসম্বন্ধে নিগমকল্পে পীঠমালায় বিশেষ ভাবে উল্লেখ আছে। আমরা এই পীঠ-

মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্থাপিত যশোরেশ্বরী
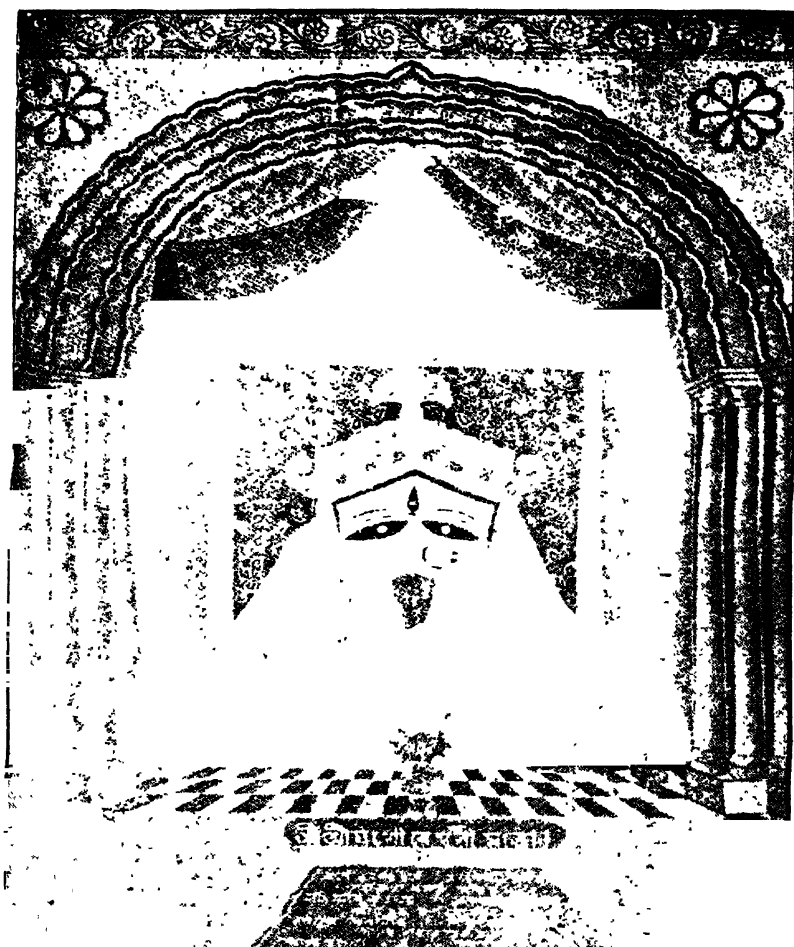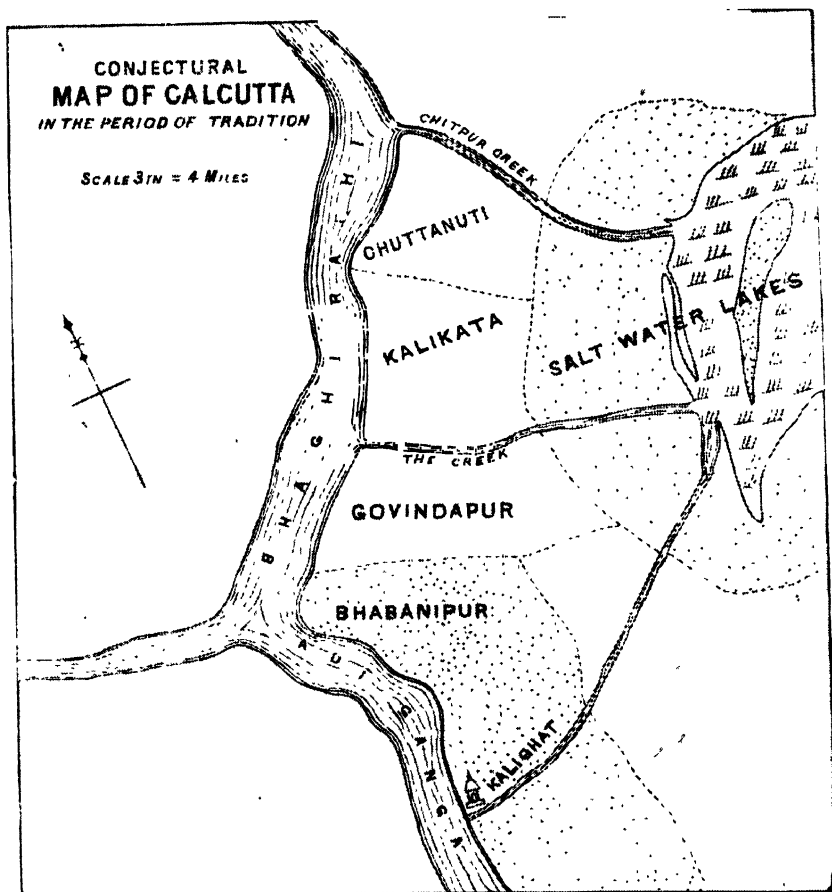
প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বের কলিকাতা, কালীঘাট ও আদি গঙ্গা

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তলিপি

রাজা সীতারাম রায়ের স্বাক্ষর

মালা হইতে দেখিতে পাই, "দক্ষিণেশ্বর হইতে বহুলা[১] পর্যন্ত দুই যোজন ব্যাপ্ত ধনুকাকার কালীক্ষেত্র।" তন্মধ্যে এক ক্রোশ ব্যাপ্ত ত্রিকোণাকার স্থানের মধ্যে, ত্রিকোণে—ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, শিব এবং মধ্যস্থলে মহাকালী নামক কালিকাদেবী বিরাজ করেন। যেখানে নকুলেশ ও গঙ্গা বিরাজিত, সেই স্থান মহাপুণ্যক্ষেত্র। তাহা দেবতার দুর্লভ।

কাশীক্ষেত্র ও কালীক্ষেত্র উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু নাই। এখানে মরণ মাত্রে কীট পর্যন্ত মুক্তিলাভ করে। মনুষ্যের ত কথাই নাই। এই স্থানে ভৈরবী, বগলা, কালী, মাতঙ্গী, কমলা, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও চণ্ডী এই সনাতনী অষ্টশক্তি অবস্থান করেন।

এরূপ জনপ্রবাদ যে কালীঘাটের দেবী মন্দিরে আজও সেই সতী-অঙ্গ-বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলি বর্তমান। কালীর সেবায়েত, হালদার মহাশয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠের বংশসম্ভূত কোন ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিবৎসর স্নানযাত্রা এবং অম্বুবাচীর শেষ দিনে উক্ত পদাঙ্গুলির বিধিপূর্বক স্নান ও অভিষেক কার্য সমাধা করিয়া থাকেন। বর্তমান কালের এই পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার দিনে, অনেকে একথা অবিশ্বাস করিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁহারা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব রক্ষিত, মিশর দেশের 'মমির' কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্যই নাই। যাঁহারা বিশ্বাসী হিন্দু, তাঁহারা শুনিয়া রাখুন—দেবী-ভাগবতের মতে, সতীর ছিন্ন-দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ ভূমিতে পতিত হইবামাত্রই পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। দেবীভাগবতের একাদশ অধ্যায়ে উক্ত আছে—

ভূমৌ নিপতিতা যেতুচ্ছায়াঙ্গাবয়বাঃ ক্ষণাৎ
জগ্মুঃ পাষাণত্বাং সর্বে লোকানাং হিতহেতবে।

তন্ত্র-বিশেষের মতে কালীক্ষেত্র[২] শ্রীপীঠ বা ওংকার পীঠ। কারণ এখানে সতী-পদাঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল। কালীক্ষেত্র এইজন্যই শ্রেষ্ঠ মহাপীঠ। তাহার এ গর্ব আজও খর্ব হয় নাই, এবং যতদিন হিন্দুধর্ম থাকিবে ততদিন হইবে না।

সতী-অঙ্গ, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রদ্বারা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া নানাস্থানে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় খণ্ডিত দেহাংশ হইতে একান্ন পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। নিগমকল্পের পীঠমালায় ইহা যথাযথ বর্ণিত আছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মহাদেব স্বয়ং প্রশ্নকর্তা এবং

১. অনেকে অনুমান করেন—এই বহুলাই আধুনিক বেহালা। বেহালা হইতে বর্তমান কালীঘাটের দূরত্ব দেড় ক্রোশের মধ্যে। কিন্তু 'কালীক্ষেত্র-দীপিকা' রচয়িতা, এই বহুলাকে কালীঘাটের দক্ষিণবর্তী রাজপুরের কিছু দক্ষিণ-পূর্ব আকনা গ্রামের, সন্নিকটস্থান বোলপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।

২. *Calcutta Review* (vol 92, No. 184, April 1891)এ 'Kalighat and Calcutta' শীর্ষক প্রবন্ধে গৌরদাস বসাকের মন্তব্য :—"The Pithamalas or strings of names of these, ***Pithas***, with those of their presiding goddesses and ***Bhairavas*** and a description of the particular relics that fell there, are given in various Sanskrit and Vernacular works." He also mentions therein the omission of the name of Kalighat in the list of ***Pithas*** in several Puranas and Upapuranas like Devi Bhagavata. The first mention of Kalipitha occurs in Tantra.

দক্ষ-যজ্ঞের বিবরণ মহাভারতের শান্তিপর্বে ২৮৪ অধ্যায়ে পাওয়া গেলেও তাহাতে সতী দেহত্যাগের কোন উল্লেখ নাই। ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণে সতীর প্রাণত্যাগ সত্যযুগে ঘটিয়াছিল—কেবল এইমাত্র আভাস আছে। —কালীঘাটের ইতিবৃত্ত।...পৃ. ৭৫.

কালীঘাটের অবস্থান এবং বিস্তার সম্পর্কে পীঠমালার বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রী এ. কে. রায়ের মন্তব্য—"The identification of this triangular island, situated between Dakshineswar on the north and Bahula on the south, with the ancient site of Calcutta, appears to admit of little doubt. With the Chitpur creek on the north, the Adiganga on the south, the Salt Water Lakes on the east and the Hooghly on the west, Calcutta in the twelfth century must have been a triangular area of about two miles, for the Salt Water Lakes were close to Sealdah, and the Adiganga, stretched as far north as Chowringhee.—*A Short History of Calcutta*, 2nd Impression, p. 11.

উত্তর-দাত্রী দেবী-ভগবতী।১

ইহা হইতেছে তান্ত্রিক হিন্দুর ও তন্ত্র-শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রে এই কালীক্ষেত্রকে যে গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আজও পর্যন্ত কলির এই পূর্ণ রাজত্বে, তাহা সমানভাবেই বর্তমান। আজও ভক্ত হিন্দু-নর-নারী জগতের এই মাতৃরূপিণী কালিকা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মাতৃমূর্তি দেখিতে পাইলে, ভক্তি ভরে 'মা! মা!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। আজও এই অধর্ম অনাচারের দিনে, অর্ধনাস্তিকতার আমলে, জড়বাদ ও পাশ্চাত্য-দর্শনের পূর্ণ আধিপত্য কালে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব-স্বরূপ বাঙ্গালী মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি পুলকিত স্বরে তাঁহাকে 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া প্রাণের শান্তিলাভ করেন। সুদূর বঙ্গের চারিদিক হইতে, কেবল বঙ্গদেশ কেন— সমগ্র ভারতের সুদূর স্থান সমূহ হইতে গৃহী-ভক্ত সপরিবারে এই কালীক্ষেত্রে আসিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করেন। বিশ্ব-মাতার মন্দিরে না আসে কে? রেল পথের বিস্তার জন্য দ্রাবিড়, কর্ণাট, ত্রৈলিঙ্গ, উৎকল, মগধ, অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, বম্বে, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি সকল স্থানের যাত্রীই এই মাতৃমন্দিরে পূজা, হোম ও বন্দনার জন্য উপনীত হন। যতি, সন্ন্যাসী, দণ্ডাশ্রমী, সাধু, সাধক, যাঁহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক ও শাক্তধর্মের অনুসারী তাঁহারাই চতুবর্গ ফললাভের জন্য প্রতি পুণ্যদিনে এইস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকেন।

পৌরাণিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে আমাদের দেখিতে হইবে, কিরূপে দূরবগম্য জঙ্গলপূর্ণ প্রদেশ হইতে এই পীঠস্থান পরিস্ফুট হইয়া ধীরে ধীরে মানবচক্ষে আত্মগৌরব প্রকটিত করিল। কিরূপে, কোন সময়ে, কাহার দ্বারা, প্রথম মন্দির নির্মিত হইল, কিরূপে জঙ্গলময় কালীক্ষেত্র বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইল। এই সমস্ত অন্ধ-তমসাবৃত কালের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার। আমরা কালীঘাটের প্রথম আবির্ভাব সময়ের সম্বন্ধে এই-স্থলে যাহা কিছু বলিব, তাহার অধিকাংশই কিম্বদন্তী-মূলক। সকল কিম্বদন্তীই যে অসার ও ভিত্তিশূন্য, তাহাও বলিতে পারি না। তবে কালগর্ভে বিলয়প্রাপ্ত, অতীত যুগের ইতিহাসগুলি এত বিশৃঙ্খল অবস্থায় রক্ষিত বা একাধারে বিলুপ্ত যে তাহাদের সহায়তায় কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

আমরা ইতিপূর্বে কলিকাতার ভূতত্ত্ব আলোচনা কালে দেখাইয়াছি, যে নিম্ন-বঙ্গ কখনও বা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, আবার কখনও নদীবাহিত বালু-রাশি পুঞ্জীভূত হওয়ায় সেই সুগভীর স্থান পূর্ণ হইয়া ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে! কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী ভূভাগ সমূহের রসাতল-প্রবেশ ও ভূগর্ভ হইতে পুনরুত্থানের জন্য যে বহু বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্যই রামায়ণের সময়ে যে স্থান কপিলাশ্রম ও তপোবন, মহাভারতীয় সময়ে তাহা অপরিজ্ঞেয় এবং পৌরাণিক যুগে তাহা নিবিড় অরণ্যময়।

মহাভারতোক্ত মহারাজ জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মগধে রাজত্ব করিতেন। পুরাণে এই সহদেব হইতে অজাতশত্রু পর্যন্ত পঁচিশ জন রাজার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অজাতশত্রুর সময়ে বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই সময়ে উত্তর বঙ্গে সিংহবাহু বলিয়া এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। সিংহবাহুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ। বিজয়-সিংহ যৌবনের উদ্দাম প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া প্রজা-পীড়ন আরম্ভ করেন। এজন্য সিংহবাহুর ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ও সভাসদগণ মন্ত্রণা করিয়া

১ দক্ষিণেশ্বরমারাভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকার ক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয় সংখ্যকঃ॥
তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারঃ ক্রোশা মাত্র ব্যবস্থিতং।
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মকং॥
মধ্যে চ কালিকাদেবী মহাকালী প্রকীর্তিতা।
নকুলেশঃ ভৈরবো যত্র গঙ্গা বিরাজিতা॥
তত্র ক্ষেত্র-মহাপুণ্যং দেবানামপি দুর্লভং।
কাশী-ক্ষেত্র কালী-ক্ষেত্র অভেদোঽপি মহেশ্বর॥
কীটোঽপি মরণে মুক্তিঃ, কিং পুনর্মানবাদয়।
ভৈরবী বগলা বিদ্যা (কালী) মাতঙ্গী কমলা তথা।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী চাষ্ট শক্তি বসেৎ সদা॥

রাজকুমার বিজয়সিংহকে দেশ হইতে নির্বাসিত করেন।

ইতিহাসের আখ্যানেই প্রকাশ রাজকুমার বিজয়সিংহ সাতশত সঙ্গী লইয়া অর্ণবযানারোহণে ভাগীরথীর বক্ষ বাহিয়া, দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন। ভাগীরথীর মোহানা অতিক্রম করিবার পর তিনি ভারত-সমুদ্রে গিয়া পড়েন। অনন্যোপায় হইয়া সমুদ্রের বিশাল তরঙ্গ-রাশি মথিত করিয়া অশেষে বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া তিনি পরিশেষে সিংহলদ্বীপে উপনীত হন। খ্রী. পূর্ব ৫৪৩ অব্দে তিনি সিংহলে পোঁছিয়াছিলেন। এই বৎসর বুদ্ধদেবও ইহলীলা সাঙ্গ করেন। রাজাদেশে রচিত সিংহলের ইতিহাসে বিজয়সিংহের বঙ্গত্যাগের ব্যাপার উল্লিখিত আছে। কিন্তু ইহাতে বঙ্গদেশের কোনও নগরের বা তীর্থস্থানের উল্লেখ নাই। ইহাতে বোধ হয় এই সময়ে কালীঘাট ও তৎসংলগ্ন স্থান সমূহ নিবিড় অরণ্যময় ছিল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর, কয়েক শতাব্দীমধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়িতে লাগিল। মঠ ও বিহার-প্লাবিত বঙ্গদেশে এবং মগধ-রাজ্যে পুনরায় হিন্দুধর্মের প্রভাব নবোদিত সূর্যকিরণের মত উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অনেক বৌদ্ধমন্দিরে শিবলিঙ্গ ও শক্তি-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইল।[১] আবার উজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখা অনেক দেবমন্দিরে ও গৃহচত্বরে জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণও বৌদ্ধধর্মের অবসন্ন অবস্থা দেখিয়া সাধারণের নিকট তান্ত্রিক-ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

মগধরাজ্যের উচ্ছেদের পর, পালবংশীয় নৃপতিরা, খ্রীস্টের দশম শতাব্দী[২] পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। এ সময়ে ভারতের সর্বস্থানেই বৌদ্ধধর্ম হীন-প্রতাপ। 'অহিংসা পরমোধর্ম' এই পবিত্র মূল-নীতি ত্যাগ করিয়া, আবার হিংসামন্ত্রময় বলির রুধির-স্রোতে, কাপালিকের শব-সাধনে ও পঞ্চমকারময় উপাসনায় দেশ অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল।

পালবংশীয় নরপতিগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুগণকে কোন রূপে উৎপীড়িত ও নিরুৎসাহিত করেন নাই। তাঁহারা অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ, রাজনীতি-জ্ঞানপূর্ণ অনেক মণীষী ব্রাহ্মণকে তাঁহারা মন্ত্রিত্ব-পদ পর্যন্ত প্রদান করেন। ইতিহাসে প্রকাশ, পালবংশীয় দেবপাল, নারায়ণপাল প্রভৃতি রাজাগণ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অনেক প্রাচীন গুপ্ত-লিপি ও অনুশাসন-পত্রে ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৌদ্ধদিগের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুধর্মের প্রভাব আবার বাড়িয়া উঠিল। তান্ত্রিক ধর্ম নানাস্থানে আধিপত্য প্রকাশ করিতে লাগিল। তন্ত্রাচারী কাপালিকগণ, গভীর অরণ্যমধ্যে শক্তি-সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। পূর্বোক্ত চূড়ামণি-তন্ত্র সেকালের একখানি প্রাচীন তন্ত্র-গ্রন্থ। এই তন্ত্র হইতে প্রমাণ হয়, সে সময়ে কালীঘাট গভীর জঙ্গলাবৃত অবস্থায়, লোক-লোচনের অগোচরে ছিল। বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক অবনতির সহিত এদেশে শাক্ত-ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং তান্ত্রিকগণও ক্রমশঃ 'সিদ্ধ-পীঠ' সমূহের কথা জানিতে পারে।

খ্রীস্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বল্লাল সেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে, বল্লালের আমলে, অনেক নরনারী পাপমোচন কামনায় কালীক্ষেত্রে গঙ্গা-স্নানে আসিত। গঙ্গাতীরেই এই 'কালীক্ষেত্র' ছিল। এই কালীক্ষেত্র ও কালীঘাট যে একই স্থান নয়, তাহাই বা কে বলিতে পারে।

গৌড়েশ্বরগণের প্রচারিত অনুশাসন-পত্র গুলি হইতে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহারা শিব ও শক্তির উপাসক ছিলেন। রাজকার্যের সুবিধার জন্য বল্লাল-সেন সমস্ত বঙ্গদেশকে (১) রাঢ়, (২) বর্গাড়ি, (৩) বরেন্দ্র, (৪) বঙ্গ, (৫) মিথিলা, এই পঞ্চভাগে

---

১. 'জলপাইগুড়ির জল্পেশ্বর মন্দির, ঢাকার ঢাকেশ্বরী, কুচবিহারের বাণেশ্বর ও তমলুকের বর্গভীম। দেবীর মন্দির দেখিলে তাহা বৌদ্ধ-কীর্তি বলিয়া বোধ হয়।' নব্যভারত, ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

২ পালবংশীয় রাজারা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন।

বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ অঞ্চলকে রাঢ়-দেশ বলিত। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্বাংশ বগড়ি নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিম, এবং মহানন্দার পূর্বাংশকে বরেন্দ্র, আর করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব-পার্শ্বস্থ প্রদেশকে বঙ্গ বলিত। বল্লালী-আমলের এই বগড়ি প্রদেশই আজকালকার প্রেসিডেন্সি-বিভাগ। বল্লাল সেন এই বগড়ি অঞ্চলের কিয়দংশ ভূমি দেবসেবার জন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ইহার পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালীঘাটের আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালীক্ষেত্রদীপিকা হইতে জানিতে পারা যায়, "পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, দিল্লীর পাঠান রাজগণের সময়ে কালীঘাটের অনতিদূরে, স্থানে স্থানে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। এ সময় কালীঘাটের চতুঃপার্শ্ব বেত্র, কচুই প্রভৃতি লতা এবং দুশ্ছেদ্য গুল্মাদিময় ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমান কালীবাটির পূর্বদিকে, ঐ বনের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পথ ছিল। এই পথ বর্তমান কালের 'রসা রোড' বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বন-মধ্যস্থ এই অপ্রশস্ত পথ দিয়া কালী-দর্শনার্থী নাগা ফকির ও সন্ন্যাসিগণ দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করিত এবং কালী-ঘাটের কার্য শেষ করিয়া পদব্রজে গঙ্গাসাগরে 'কপিলাশ্রমে' পৌঁছিত। কালীঘাটের দক্ষিণ প্রদেশে সাগর সন্নিকটে, ছত্রভোগে, অম্বুলিঙ্গশিব ও সংকেতমাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈতন্য-ভাগবতেও এই দুই দেবস্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে পশ্চিমাভি-মুখে ধাবিতা যে প্রশস্ত নদী এখন সমুদ্র গমনের প্রধান পথ হইয়াছে, তখন তাহা এত প্রশস্ত ছিল না। এই সংকীর্ণ নদী দিয়া সেই পুরাকালে লোকে তমলুক, হিজলী, উৎকল প্রভৃতি স্থানে নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। বর্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে, ভাগীরথী ক্রমশঃ ধনুকাকারে বক্র হইয়া উত্তর-বাহিনী ছিলেন। বর্তমান কালীকুণ্ড-হ্রদ তখন গঙ্গাগর্ভে অতলস্পর্শ 'দহ' বা 'দ' ছিল।[১]

পীঠ-স্থান বলিয়া পরিচিত হইবার বহুকাল পরেও কালীঘাট নির্জন শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য-গর্ভে, অজ্ঞাত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। জন-প্রবাদ এই, ভীমকায় ভৈরব ও বামাচারী কাপালিক-গণ এই নির্জন বন-প্রদেশস্থ কালীর পর্ণ-মন্দিরের নিকটে জঙ্গল মধ্যে বসিয়া, বীরাচার-সম্মত উপাসনা করিত। নরবলি দিয়া ভগবতীর নৃ-কপালময় খর্পরকে রুধিরস্রোতে পূর্ণ করিত। গভীর নিশীথে তাহাদের কঠোর কণ্ঠ-নিঃসৃত ভীষণ-মন্ত্রনাদে, সেই নির্জন বনস্থলী বিকম্পিত হইয়া উঠিত। তন্ত্রাচার-সমন্বিত, উজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখার গর্জনে সেই স্থান ভীম কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিত।

আদিশূর হইতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালের মধ্যে বঙ্গদেশের নানাস্থান জনপূর্ণ হইতে লাগিল। কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তদনুচর ক্ষত্রিয়গণের বংশধরেরা বঙ্গের নানা-স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বগড়ি অঞ্চলেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ও গ্রাম দেখা দিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা-প্রাবল্য জন্য অনেক অংশের বন-জঙ্গল কর্তিত হইয়া স্থানে স্থানে দেব-মন্দিরাদি নির্মিত হইতে লাগিল। বীরাচারী কাপালিকগণও ক্রমশঃ এইসকল জনপূর্ণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া গভীরতম বনে প্রবেশ করিল।

দক্ষিণ-বঙ্গ বা বগড়ির নানাস্থানে জঙ্গল কাটিয়া লোকালয় নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

---

১. নকুলেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ হইয়া, একটি রাস্তা আজকাল কালীদেবীর মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার পর্যন্ত গিয়া ভোগের ঘরের নিকট শেষ হইয়াছে। ভোগের ঘরের পশ্চাতে এই রাস্তার ধারে যে পঙ্কিল পুকুরটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই পুরাকালের 'কালীকুণ্ড'। এই কালীকুণ্ডের সহিত পূর্বে গঙ্গার সংযোগ ছিল অথবা ভাগীরথী-স্রোত এই কালীকুণ্ড পর্যন্ত প্রধাবিত হইত। চারি পাঁচশত বৎসরের মধ্যে কি পরিবর্তন হইয়াছে! পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখিবেন—অতীতকালের গঙ্গাগর্ভস্থ কালীকুণ্ড তীর হইতে বর্তমানের আদিগঙ্গা কতদূরে সরিয়া আসিয়াছেন। জনপ্রবাদ এই, কালীকুণ্ড তীরেই সতীর প্রস্তরবৎ পদাঙ্গুলী পাওয়া যায়। পরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা হইবে।

বঙ্গদেশে শিব ও শক্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠার ধূম পড়িয়া গেল। অবস্থাপন্ন শাক্তগণ দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে যিনি যে দেবীর উপাসক, তিনি তদনুরূপ মূর্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা প্রবর্তন করিলেন। ভাগীরথী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী-তীরে অসংখ্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বৌদ্ধমন্দিরও শিব ও শক্তি-মন্দিরে পরিণত হইয়া গেলে। চৈতন্যদেবের সময় পর্যন্ত কেবল কালী-ক্ষেত্রের নামোল্লেখ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। খ্রীস্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-দেবের উৎকল হইতে প্রত্যাগমন বর্ণনার মধ্যে বর্তমান কলিকাতার উত্তরাংশে পানিহাটী ও কালীঘাটের দক্ষিণ দিকে ছত্রভোগ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের কথা কোনরূপ বিশেষভাবে উল্লিখিত না হওয়ায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর বা তৎপূর্ববর্তী সময়ের বৈষ্ণবলেখকগণ, সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষবশে হউক, কিংবা কালী-ঘাটের কথা সাধারণের অজানিত থাকার জন্যই হউক, তাহার নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই।

মহানীল-তন্ত্রে 'কালীঘাটে গুহ্যকালী' বলিয়া এক দেবীর নামোল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকে, এই 'গুহ্য-কালীর' পূজার্চনাদি করিত। এতদ্ব্যতীত আচার-নিগম-তন্ত্র, মহালিঙ্গ-তন্ত্র, চূড়ামণিতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থেও কালীঘাটের নামোল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই তন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রচিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত চণ্ডীকাব্যে গঙ্গাতীরের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কালীঘাটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়। ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥ রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা। বালুঘাট এড়াইল বেণের নন্দন।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥ কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥

অনেকে অনুমান করেন, সে সময়ে কলিকাতা গভীর বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং এ রচনা মুকুন্দরামের নহে, তাঁহার চণ্ডী-কাব্য মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, কালীঘাট যে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। কলিকাতায় সে সময়ে আর একটি কালীমন্দির বর্তমান ছিল। ইহা বর্তমান কালের 'চিত্রেশ্বরীর' মন্দির। এই চিত্রেশ্বরী হইতেই 'চিৎপুর' নামকরণ হইয়াছে। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি এই চিত্রেশ্বরীর স্থাপনা করেন, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি এই, এই কালী-প্রতিমা 'চিতে' নামক দস্যুদলপতি দ্বারা স্থাপিত। সেকালের ডাকাতেরা কালীর পূজা না করিয়া কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যাইত না। সে ভীষণ সময়ে. জলে স্থলে ডাকাতি চলিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, সর্বাগ্রে এই মন্দির গঙ্গাতীরে জঙ্গলমধ্যে ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে গঙ্গার কূল ভরাট হইয়া পড়ায় ইহা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই চিত্রেশ্বরীর মন্দিরেই ডাকাতেরা নরবলি দিত। গঙ্গাতীরস্থ বিজন অরণ্যমধ্যে এই মন্দির স্থাপিত ছিল। এই চিত্রেশ্বরী ও কালীঘাটের কালী ব্যতীত, আর কোন বিখ্যাত কালীমন্দিরই তখন এদেশে ছিল না। কিন্তু কালীঘাট পীঠস্থান ছিল বলিয়া পুরাতন গ্রন্থাদিতে ইহারই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' গ্রন্থ যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে লিখিত। দিগ্বিজয়-প্রকাশে গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম— "হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দ-দত্ত নামক একজন রাজা, গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থ-কার্য সমাপন করিয়া ফিরিয়া

বিভক্ত করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ অঞ্চলকে রাঢ়-দেশ বলিত। গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগীরথীর পূর্বাংশ বগড়ি নামে পরিচিত ছিল। গঙ্গার উত্তর ও করতোয়ার পশ্চিম, এবং মহানন্দার পূর্বাংশকে বরেন্দ্র, আর করতোয়া ও পদ্মার পূর্ব-পার্শ্বস্থ প্রদেশকে বঙ্গ বলিত। বল্লালী-আমলের এই বগড়ি প্রদেশই আজকালকার প্রেসিডেন্সি-বিভাগ। বল্লাল সেন এই বগড়ি অঞ্চলের কিয়দংশ ভূমি দেবসেবার জন্য এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ইহার পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালীঘাটের আর কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালীক্ষেত্রদীপিকা হইতে জানিতে পারা যায়, "পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, দিল্লীর পাঠান রাজগণের সময়ে কালীঘাটের অনতিদূরে, স্থানে স্থানে মনুষ্যের বাস হইয়াছিল। এ সময় কালীঘাটের চতুঃপার্শ্ব বেত্র, কচুই প্রভৃতি লতা এবং দুশ্ছেদ্য গুল্মাদিময় ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমান কালীবাটির পূর্বদিকে, ঐ বনের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পথ ছিল। এই পথ বর্তমান কালের 'রসা রোড' বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বন-মধ্যস্থ এই অপ্রশস্ত পথ দিয়া কালী-দর্শনার্থী নাগা ফকির ও সন্ন্যাসিগণ দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করিত এবং কালীঘাটের কার্য শেষ করিয়া পদব্রজে গঙ্গাসাগরে 'কপিলাশ্রমে' পেঁাছিত। কালীঘাটের দক্ষিণ প্রদেশে সাগর সন্নিকটে, ছত্রভোগে, অম্বুলিঙ্গশিব ও সংকেতমাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। চৈতন্য-ভাগবতেও এই দুই দেবস্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা হইতে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিতা যে প্রশস্ত নদী এখন সমুদ্র গমনের প্রধান পথ হইয়াছে, তখন তাহা এত প্রশস্ত ছিল না। এই সংকীর্ণ নদী দিয়া সেই পুরাকালে লোকে তমলুক, হিজলী, উৎকল প্রভৃতি স্থানে নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। বর্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে, ভাগীরথী ক্রমশঃ ধনুকাকারে বক্র হইয়া উত্তর-বাহিনী ছিলেন। বর্তমান কালীকুণ্ড-হ্রদ তখন গঙ্গাগর্ভে অতলস্পর্শ 'দহ' বা 'দ' ছিল।[১]

পীঠ-স্থান বলিয়া পরিচিত হইবার বহুকাল পরেও কালীঘাট নির্জন শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য-গর্ভে, অজ্ঞাত অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। জন-প্রবাদ এই, ভীমকায় ভৈরব ও বামাচারী কাপালিকগণ এই নির্জন বন-প্রদেশস্থ কালীর পর্ণ-মন্দিরের নিকটে জঙ্গল মধ্যে বসিয়া, বীরাচার-সম্মত উপাসনা করিত। নরবলি দিয়া ভগবতীর নৃ-কপালময় খর্পরকে রুধিরস্রোতে পূর্ণ করিত। গভীর নিশীথে তাহাদের কঠোর কণ্ঠ-নিঃসৃত ভীষণ-মন্ত্রনাদে, সেই নির্জন বনস্থলী বিকম্পিত হইয়া উঠিত। তন্ত্রাচার-সমন্বিত, উজ্জ্বল হোমাগ্নি-শিখার গর্জনে সেই স্থান ভীম কোলাহল-মুখরিত হইয়া উঠিত।

আদিশূর হইতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালের মধ্যে বঙ্গদেশের নানাস্থান জনপূর্ণ হইতে লাগিল। কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণ ও তদনুচর ক্ষত্রিয়গণের বংশধরেরা বঙ্গের নানা-স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বগড়ি অঞ্চলেও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ও গ্রাম দেখা দিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা-প্রাবল্য জন্য অনেক অংশের বন-জঙ্গল কর্তিত হইয়া স্থানে স্থানে দেব-মন্দিরাদি নির্মিত হইতে লাগিল। বীরাচারী কাপালিকগণও ক্রমশঃ এইসকল জনপূর্ণ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া গভীরতম বনে প্রবেশ করিল।

দক্ষিণ-বঙ্গ বা বগড়ির নানাস্থানে জঙ্গল কাটিয়া লোকালয় নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

---

১. নকুলেশ্বরের মন্দির হইতে আরম্ভ হইয়া, একটি রাস্তা আজকাল কালীদেবীর মন্দিরের পশ্চাতের দ্বার পর্যন্ত গিয়া ভোগের ঘরের নিকট শেষ হইয়াছে। ভোগের ঘরের পশ্চাতে এই রাস্তার ধারে যে পঙ্কিল পুকুরটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই পুরাকালের 'কালীকুণ্ড'। এই কালীকুণ্ডের সহিত পূর্বে গঙ্গার সংযোগ ছিল অথবা ভাগীরথী-স্রোত এই কালীকুণ্ড পর্যন্ত প্রধাবিত হইত। চারি পাঁচশত বৎসরের মধ্যে কি পরিবর্তন হইয়াছে! পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখিবেন—অতীতকালের গঙ্গাগর্ভস্থ কালীকুণ্ড তীর হইতে বর্তমানের আদিগঙ্গা কতদূরে সরিয়া আসিয়াছেন। জনপ্রবাদ এই, কালীকুণ্ড তীরেই সতীর প্রস্তরবৎ পদাঙ্গুলী পাওয়া যায়। পরে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা হইবে।

বঙ্গদেশে শিব ও শক্তি-মন্দির প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িয়া গেল। অবস্থাপন্ন শাক্তগণ দশ-মহাবিদ্যার মধ্যে যিনি যে দেবীর উপাসক, তিনি তদনুরূপ মূর্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা প্রবর্তন করিলেন। ভাগীরথী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী-তীরে অসংখ্য দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বৌদ্ধমন্দিরও শিব ও শক্তি-মন্দিরে পরিণত হইয়া গেল। চৈতন্যদেবের সময় পর্যন্ত কেবল কালী-ক্ষেত্রের নামোল্লেখ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। খ্রীস্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন। চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য-দেবের উৎকল হইতে প্রত্যাগমন বর্ণনার মধ্যে বর্তমান কলিকাতার উত্তরাংশে পানিহাটী ও কালীঘাটের দক্ষিণ দিকে ছত্রভোগ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালীঘাটের কথা কোনরূপ বিশেষভাবে উল্লিখিত না হওয়ায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর বা তৎপূর্ববর্তী সময়ের বৈষ্ণবলেখকগণ, সম্প্রদায়-গত বিদ্বেষবশে হউক, কিংবা কালী-ঘাটের কথা সাধারণের অজানিত থাকার জন্যই হউক, তাহার নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই।

মহানীল-তন্ত্রে 'কালীঘাটে গুহ্যকালী' বলিয়া এক দেবীর নামোল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকে, এই 'গুহ্য-কালীর' পূজার্চনাদি করিত। এতদ্ব্যতীত আচার-নিগম-তন্ত্র, মহালিঙ্গ-তন্ত্র, চূড়ামণিতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থেও কালীঘাটের নামোল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই তন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে রচিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত চণ্ডীকাব্যে গঙ্গাতীরের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কালীঘাটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

ত্বরায় বহিছে তরী তিলেক না রয়। ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥ রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা। বালুঘাট এড়াইল বেণের নন্দন।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥ কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥

অনেকে অনুমান করেন, সে সময়ে কলিকাতা গভীর বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং এ রচনা মুকুন্দরামের নহে, তাঁহার চণ্ডী-কাব্য মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, কালীঘাট যে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। কলিকাতায় সে সময়ে আর একটি কালীমন্দির বর্তমান ছিল। ইহা বর্তমান কালের 'চিত্রেশ্বরীর' মন্দির। এই চিত্রেশ্বরী হইতেই 'চিৎপুর' নামকরণ হইয়াছে। কোন্ সময়ে কোন্ ব্যক্তি এই চিত্রেশ্বরীর স্থাপনা করেন, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি এই, এই কালী-প্রতিমা 'চিতে' নামক দস্যুদলপতি দ্বারা স্থাপিত। সেকালের ডাকাতেরা কালীর পূজা না করিয়া কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যাইত না। সে ভীষণ সময়ে, জলে স্থলে ডাকাতি চলিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, সর্বাগ্রে এই মন্দির গঙ্গাতীরে জঙ্গলমধ্যে ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে গঙ্গার কূল ভরাট হইয়া পড়ায় ইহা দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই চিত্রেশ্বরীর মন্দিরেই ডাকাতেরা নরবলি দিত। গঙ্গাতীরস্থ বিজন অরণ্যমধ্যে এই মন্দির স্থাপিত ছিল। এই চিত্রেশ্বরী ও কালীঘাটের কালী ব্যতীত, আর কোন বিখ্যাত কালীমন্দিরই তখন এদেশে ছিল না। কিন্তু কালীঘাট পীঠস্থান ছিল বলিয়া পুরাতন গ্রন্থাদিতে ইহারই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ' গ্রন্থ যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সময়ে লিখিত। দিগ্বিজয়-প্রকাশে গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম—"হে নৃপশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দ-দত্ত নামক একজন রাজা, গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থ-কার্য সমাপন করিয়া ফিরিয়া

আসেন, সেই সময়ে কালী দেবী নৌকামধ্যে তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নদান করেন, 'তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণ-পুরীতে (অর্থাৎ যেখানে ভূমি কর্ষিত হয় নাই) তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একটি মহাগ্রাম স্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।' দেবীর আদেশ অবগত হইয়া, রাজা, পারীন্দ্রগ্রাম (?) হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া, সুরধনীতটে বসবাস করিলেন। গোবিন্দ দত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে একখানি স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন। ঐ লাঙ্গল সহায়তায় দেবীর আদেশে তথাকার ভূমি খনন করিয়া প্রভূত অর্থ পাইয়াছিলেন[১] এবং ঐ অর্থ হইতে চতুঃষষ্টি বলি এবং হোম-যজ্ঞাদি দ্বারা দেবীর পূজা করেন; ধনধান্য ও বংশবলের বৃদ্ধি প্রযুক্ত, তিনি ঐ স্থানের বর্ধিষ্ঠ লোক হইয়াছিলেন। এইরূপ অ-চিন্তিত ঐশ্বর্যলাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি ও বাসের জন্য বাস্তুযোগ করাইয়াছিলেন।" কবিরামের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে প্রমাণ হইতেছে—বনজঙ্গলময় স্থান পরিস্কৃত হইয়া, গোবিন্দ-পুরাখ্য নূতন গ্রামের প্রতিষ্ঠা হয়। গোবিন্দ দত্ত নামক একজন রাজা কালীঘাটেরও একটু উন্নতি করেন। এইজন্য অনেকের অনুমান এই, গোবিন্দ দত্ত হইতেই গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার ইতিবৃত্ত লেখক ষ্টার্ণডেল সাহেব বলেন, "গোবিন্দরাম মিত্র হইতে গোবিন্দপুর নাম হইয়াছে।" আবার অন্যদিকে কলিকাতার আদিম অধিবাসী শেঠ ও বসুকেরা বলেন, তাহাদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতেই গোবিন্দপুর নামকরণ হইয়াছে। গোবিন্দপুর নামকরণ যে জন্যই হউক না কেন— কবিরামের লিখিত কাহিনী হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, গঙ্গাসাগর যাত্রী রাজা গোবিন্দ দত্ত সেই ইতিহাসবর্জিত পুরাকালে জঙ্গল কাটাইয়া কালীর স্বপ্নাদেশে কালী-ক্ষেত্রের একটু উন্নতি করিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক-ধর্মের ক্রমবিকাশের সহিত কালীক্ষেত্রের মহিমা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছিল। বল্লাল সেনের সময় হইতে তান্ত্রিক-ধর্ম ক্রমোন্নতি লাভ করিতে থাকে। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব' হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

খ্রীস্টের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তান্ত্রিক ধর্ম যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এই সময়টিকে তান্ত্রিক-যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালার অবস্থা আলোচনার সহিত আমরা দেখাইব, কি করিয়া শাক্তধর্ম বঙ্গদেশে এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

১. ইদানীং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌচ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকে তটে। (১০৫২)
গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দসহস্রগে
সিন্ধুসঙ্গমতীর্থযাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ। (১০৫৩)
গোবিন্দদত্ত ভূপালং, তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্
কালীদেবী স্বপ্নচ্ছলে নৌকায়াস্তমুবাচ হ। (১০৫৪)
অকর্ষণী পুরীং রাজন্ আগচ্ছ হি মমাজ্ঞতঃ
বাদর রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্। (১০৫৫)
কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকার হি মুদান্বিতঃ। (১০৫৭)
পারীন্দ্রগ্রামাৎ সর্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরিত্তটে। (১০৫৮)
লাঙ্গুলী দ্বিস্কন্ধযুতঃ দেব্যা পৃষ্ঠে চ বর্ত্ততে
যদাদেশেন তন্মূলে........................(১০৫৯)
প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি
কাঞ্চনকর্ষপূরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুরৈরপি। (১০৬০)
ভূরীণি দ্রবিণান্যের প্রাপ্য গোবিন্দ ভূপতিঃ
চতুঃষষ্ঠী সংখ্যকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্। (১০৬১)
গোত্রবৃদ্ধা বিত্তবৃদ্ধা তেজোবৃদ্ধা হিঁ ভূমিপ
বভূব গোবিন্দদত্তো বর্ধিষ্ঠপ্রবরো মহান্। (১০৬২)
ভাগীরথী পূর্বতটে পুরীবর্ধনহেতবে
বাস্তুযাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে॥ (১০৬৩)

—বিশ্বকোষোদ্ধৃত, কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গে মোগল-পাঠান সংঘর্ষ ও কামদেব ব্রহ্মচারীর কথা

বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিক[১] — তাঁহাদের নাম, — দ্বাদশ-ভৌমিকের আবির্ভাবের পূর্বের কথা — বঙ্গে পাঠান-রাজত্বের অবসান — মোগল কর্তৃক বঙ্গ-বিজয় — বাঙ্গালার পাঠান অধীশ্বর সুলেমান — শেষ পাঠান নরপতি দায়ুদ খাঁ — গৌড়ের রাজসভায় বাঙ্গালীর আধিপত্য — প্রতাপাদিত্যের পিতামহ রামচন্দ্র গুহ — সপ্তগ্রাম হইতে রামচন্দ্রের পলায়ন — গৌড়েশ্বর সুলেমানের মন্ত্রীত্ব লাভ — শেষ পাঠান-রাজা দায়ুদ খাঁর অধীনে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের গৌড়ের মন্ত্রীত্ব — মোগল পাঠানে যুদ্ধ — গৌড়েশ্বর দায়ুদের উড়িষ্যায় পলায়ন — মুনাইম খাঁর মৃত্যু — মজঃফর কর্তৃক সুলতান দায়ুদের হত্যা — বঙ্গে পাঠান-রাজত্বের শেষ — বিক্রমাদিত্য কর্তৃক যশোহর প্রতিষ্ঠা — রাজা টোডরমলের বঙ্গদেশে আগমন — বঙ্গে শান্তি স্থাপন। — প্রতাপাদিত্য — চাঁদ রায় কেদার রায় — মানসিংহের বঙ্গদেশে আগমন — কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় — পূর্ব পরিচয় — কালীক্ষেত্রে অবস্থান — দেবীর পদাঙ্গুলি সম্বন্ধে অদ্ভুত ঘটনা — কামদেবের ব্রহ্মচারিত্ব গ্রহণ — কাশীতে মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ — মানসিংহের শিষ্যত্ব স্বীকার। মানসিংহ কর্তৃক দ্বাদশ-ভৌমিকের উচ্ছেদ। প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের পতন — কামদেব ব্রহ্মচারীর নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান — মানসিংহ কর্তৃক গুরু-দক্ষিণা দান — কালীঘাটের প্রথম প্রতিষ্ঠা — কামদেবের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র লক্ষ্মীকান্তের মজুমদার উপাধি ও জমিদারী লাভ। বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী বংশ।

বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণ ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চার করিয়া নির্জীব বঙ্গদেশে এক মহাশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই শক্তির দমনের জন্যই মহারাজ মানসিংহকে বঙ্গদেশে আসিতে হয়। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধের পর মানসিংহ বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন। বঙ্গে দ্বাদশ-ভৌমিকের আবির্ভাবের পূর্বে, আরও কতকগুলি আবশ্যকীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহা না জানিলে, সে সময়ের অবস্থা বুঝিবার কোন উপায়ই নাই।

এই দ্বাদশ-ভৌমিকাধিকৃত বঙ্গদেশকে সেই সময়ে 'বারো-ভাটী' বাঙ্গলা বলিত। যে কয়জন প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার, রাজা উপাধি ধারণ করিয়া, মোগল রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদের তালিকা[২] দিলাম — (১) যশোহরেশ্বর — প্রতাপাদিত্য। (২) বিক্রমপুরাধিপতি — চাঁদ রায় ও কেদার রায়। (৩) চন্দ্রদ্বীপের — কন্দর্প রায় ও রামচন্দ্র রায়। (৪) ভুলুয়ার — লক্ষ্মণমাণিক্য। (৫) ভূষণার — মুকুন্দ রায় (৬) সাতৈলের — রামকৃষ্ণ (৭) চাঁদপ্রতাপের — চাঁদগাজি। (৮) ভাওয়ালের — ফজলগাজি। (৯) খিজিরপুরের — ইশা খাঁ মসনদী। (১০) তাহেরপুরের — কংসনারায়ণ। (১১) দিনাজপুরের — গণেশ রায়। (১২) পূর্ণিয়ার — রাজা (নাম অজানিত)।

১. 'বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক'—এঁরা "যে সংখ্যায় ঠিক বারজনই ছিলেন এবং সেই বারজন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, তাহা বলা যায় না। হয়ত একজনের রাজত্বের শেষ সময়ে অন্যের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। অথবা অন্য কোন প্রধান ভূঞার মৃত্যুর পর, তাঁহার কোন বংশধর নামমাত্র শাসন পরিচালনা করিতেন, কিন্তু হিসাবের বেলায় তিনিও বার ভূঞার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন।"—সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ২০।

২. সতীশচন্দ্র মিত্র বার ভূঞাদের যে তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এইরূপ—১। ইশা খাঁ মসনদ্ আলি (খিজিরপুর বা কত্রাভু); ২। প্রতাপাদিত্য (যশোহর বা চ্যাণ্ডিকাল); ৩। চাঁদ রায়, কেদার রায় (শ্রীপুর বা

হইয়া, নিয়তি বশে রামচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ভবানন্দ মহা সমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন।

বঙ্গেশ্বর সুলেমান রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরও তাঁহার পুত্রগণকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দ তাঁহার অতি প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিলেন।

সুলেমান সাহের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ বৈজিয়দ ও কনিষ্ঠ দায়ুদ। এই দুই রাজকুমারের সহিত ভবানন্দ পুত্র শ্রীহরি ও শিবানন্দ পুত্র জানকীবল্লভের বড়ই বন্ধুত্ব হইল। বাল্যকালের বন্ধুত্ব অতি মধুর ও অকৃত্রিম। সাহাজাদাগণ শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের সহিত দিবসের অধিকাংশ সময় থাকিতেন। একত্রে অধ্যয়ন, মল্লক্রীড়া, অশ্বারোহণ, অস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতিতে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির একটা দুশ্ছেদ্য বন্ধন আঁটিয়া গেল। বিশেষত সাহাজাদা দাউদ, উঁহাদের উপর এত অনুরক্ত ছিলেন, যে এক সময়ে তিনি প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিয়াছেন, "আমি যদি কখনও রাজা হই, তাহা হইলে তোমাদের দুই ভাইকে মন্ত্রী করিব।"

১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সুলেমান ইহলীলা সম্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বৈজিয়দ সিংহাসনে বসিলেন বটে, কিন্তু তিনি বহুদিন রাজত্ব করিতে পারিলেন না। তাঁহার এক ভগ্নিপতি গুপ্ত হত্যার দ্বারা তাঁহার জীবলীলা শেষ করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, কনিষ্ঠ রাজকুমার দায়ুদ গৌড়ের রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন।

দায়ুদ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিয়া তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে, ভবানন্দের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁহার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। ভবানন্দ-পুত্র শ্রীহরির নাম পরিবর্তিত হইয়া হইল বিক্রমাদিত্য। আর শিবানন্দের পুত্রের নাম বসন্ত রায় হইল।

বঙ্গেশ্বর দায়ুদ পিতার ন্যায় উন্নত চরিত্রের রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালের প্রথমাংশে, বঙ্গদেশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। প্রজাগণ ধনধান্য-পূর্ণ-ভাণ্ডার ও পরিজন-বর্গ লইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে নিরাপদে কাল কাটাইতে লাগিল। দায়ুদ হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজাকেই সমান চক্ষে দেখিয়া প্রজাবর্গের সম্মান-ভাজন হইয়া উঠিলেন।

ভবানন্দের সুব্যবস্থার গুণে রাজকোষে প্রচুর অর্থ জমিল। অনুরক্ত প্রজাবর্গ, প্রচুর ধন-পূর্ণ রাজভাণ্ডার, অগণ্য সৈন্যরাজি দেখিয়া বঙ্গেশ্বর দায়ুদ মনে মনে গর্বস্ফীত হইতে লাগিলেন।[১] তাঁহার পিতা মোগল-বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া যে কলঙ্ক অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহা ক্ষালন করিতে মনস্থ করিলেন।

মন্ত্রীবর্গকে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলায়, অনেকে তাহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু দায়ুদের অধীনে কয়েকজন পরাক্রান্ত পাঠান-সেনানী ছিল। পাঠানেরা মোগলের চিরশত্রু। লুঠতরাজ যুদ্ধ-বিগ্রহ পাইলেই তাহারা সুখে থাকে। তাহারা এই সুযোগে দায়ুদকে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। দায়ুদও মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য সেনাগণকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন।

সুচতুর ভবানন্দ দেখিলেন, তাঁহার সুখ-সৌভাগ্যের অবস্থা যে আর বেশী দিন থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। কারণ প্রবল প্রতাপ সম্রাট আকবর সাহের সহিত যুদ্ধে দায়ুদকে নিশ্চয়ই পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইতে হইবে। তখন আর তাঁহাদের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।

ভবানন্দ মনে মনে স্থির করিলেন, "গৌড় ছাড়িয়া এমন এক স্থানে বাস-স্থান নির্মাণ করিতে হইবে যেখানে শত্রুগণ হইতে আমাদের কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।" ভ্রাতৃগণ সকলেই একমত হইলে ভবানন্দ গুপ্তভাবে এই প্রকার আশ্রয়স্থান সন্ধানের জন্য কয়েকজন বিশ্বাসী লোককে নানাদিকে প্রেরণ করিলেন। স্থান নির্বাচনের জন্য ভবানন্দ যাহাদের দূরতর স্থানে

১. প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক ষ্টুয়ার্ট সাহেব বলেন—সর্বপ্রকার অস্ত্র-শোভিত দুই লক্ষ সৈন্য দায়ুদের আজ্ঞাধীন হইয়া সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার বিংশতি সহস্র কামান ছিল, নৌসেনাও প্রচুর ছিল।

প্রেরণ করিয়াছিলেন, একমাস পরে তাহাদের সকলেই ফিরিয়া আসিয়া পরিদৃষ্ট স্থানসমূহের বিবরণ তাঁহার কর্ণ-গোচর করিল। যে ব্যক্তি দক্ষিণ প্রদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহার বর্ণিত স্থানটিই ভবানন্দের বিশেষ মনোনীত হইল। সে স্থানের নাম যশোহর। পূর্বে এ স্থান চাঁদ খাঁ মুসন্দরী নামক এক মুসলমান জাইগীরদারের জমিদারি ছিল। কিন্তু তিনি ফৌত হওয়ায় আর কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় তাহা তখন রাজসরকারের অধীন। ভবানন্দ বঙ্গেশ্বর দায়ুদের নিকট প্রার্থনা করিয়া যশোহরের জমিদারিটি নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন।

এই নব-নির্বাচিত স্থানে, জঙ্গল কাটিয়া নগর বসাইতে হইবে। যশোহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ, ভীষণ জঙ্গলে পূর্ণ। চারিদিকেই হিংস্র শ্বাপদগণের বিচরণ ক্ষেত্র। নদীর মধ্যে হাঙ্গর ও কুম্ভীর যথেষ্ট। এই জঙ্গল কাটাইয়া ভবানন্দ প্রচুর অর্থব্যয়ে যশোহর-নগরীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। শতাধিক বৎসর পূর্বে রচিত স্বর্গীয় রাম-রাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিতে এই জঙ্গল কাটাইবার একটি বর্ণনা আছে। তাহা আমরা এস্থানে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।—

'সেস্থানে লোক পাঠাইয়া (ভবানন্দ) দরবস্ত জঙ্গলসমূহ কাটাইলেন। নদী-নালার নিকট স্থানে স্থানে পুলবন্দী করাইয়া, রাস্তার নমুদ করিলেন। পাঁচ ছয় ক্রোশ দীর্ঘ-প্রস্থ, এমন দিব্য স্থান তৈয়ার হইল। তাহার মধ্যস্থলে চারিদিকে ক্রোশাধিক আয়তন গড় কাটাইয়া পুরীর আরম্ভ হইল। সদর মফঃস্বলে ক্রমে, তিন চারি বেহন্দে এমারত সমস্ত তৈয়ার হইয়া, দিব্য ব্যবস্থিত পুরী প্রস্তুত হইল। চতুঃপার্শ্বে গোলা, গঞ্জ, সহর, বাজার, নগর, চাতর ও বাগ-বাগিচা। এই মতে সেই স্থান অতি শোভান্বিত। দুই তিন বৎসরে স্থান তৈয়ার হইল।''[১] ভবানন্দ গৌড়ের রাজসরকারে চাকরি করিয়া প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার জন্য যশোহরের প্রাণ -প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রহিলেন। শিবানন্দ, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় গৌড় নগরে রাজদরবারে চাকরি করিতে লাগিলেন।

মোগল-পাঠানে অবশেষে যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ বাধাইবার মূল স্বয়ং বঙ্গেশ্বর দায়ুদ। অমিত বলদর্পিত হইয়া তিনি মোগল-রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এই সংবাদ আকবর-সাহের কর্ণে পেঁাছিল। তিনি জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনাইম খাঁকে প্রচুর সৈন্য সমেত দমনার্থে প্রেরণ করিলেন।

বঙ্গেশ্বর দায়ুদের সহিত মুনাইম খাঁর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে, মুনাইম খাঁ হাজিপুর ও পাটনার যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দায়ুদের পাঠান-সেনা এবং তাঁহার সেনাপতিগণকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে যে সমস্ত পাঠান নিহত হইয়াছিল, তাহাদের ছিন্ন-মস্তক কয়েকখানি সুবৃহৎ নৌকা পরিপূর্ণ করিয়া মুনাইম খাঁ দায়ুদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ব্যাপার দেখিয়া দায়ুদ বুঝিলেন মোগলের সহিত ইচ্ছা করিয়া বিবাদ বাধাইয়া তিনি সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। মোগলসৈন্য ধীর-পদে গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে শুনিয়া, তিনি উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। কালাপাহাড় প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতিরা কুচবিহারের দিকে পলাইল। গৌড়ত্যাগ করিয়া পলাইবার পূর্বে বঙ্গেশ্বর দায়ুদ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাল্যাবধি আমরা বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। আমি তোমাদের দুই-জনকে প্রকৃত মিত্র বলিয়া ভাবি। যদি কখনও আবার গৌড়ের সিংহাসন উদ্ধার করিতে পারি, রাজ্য ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে তোমাদের স্মরণ করিব। আমার যাহা কিছু বহু-মূল্য ধন-রত্নাদি গৌড়ে আছে, তাহা তোমরা লইয়া যাও। তদ্ভিন্ন সেগুলি রক্ষার আর কোন উপায়ই দেখিতে পাইতেছি না।" ইহার পর সহস্রাধিক বৃহৎ নৌকায় বোঝাই হইয়া গৌড়েশ্বরের সমস্ত সম্পত্তি যশোহরের রাজ-ভাণ্ডারে গিয়া পেঁাছিল।

১. প্রতাপাদিত্য চরিত, পৃ. ২১।

মুনাইম খাঁও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি উড়িষ্যা পর্যন্ত ধাবিত হইয়া, দায়ুদ-সৈন্যকে আক্রমণ করেন। দায়ুদ নিরুপায় হইয়া অগত্যা সন্ধি প্রার্থনা করিলে মুনাইম খাঁ তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

বঙ্গদেশে বহুদিন অবস্থান করায় ও ক্রমাগত যুদ্ধ কার্যের কঠোর পরিশ্রমে মুনাইম খাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল। তিনি বাঙ্গলার কোমল মৃত্তিকার মধ্যে সমাধিস্থ হইলেন। দায়ুদ মুনাইম খাঁর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া পুনরায় সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। বিজয়ী দায়ুদ মোগলদিগকে আকমহল (বর্তমান রাজমহল) হইতে তাড়াইয়া দিয়া আকমহল-দুর্গ দখল করিলেন।

পুনরায় পাঠানগণ বিজয়ী হইয়াছে শুনিয়া দিল্লীশ্বর আকবর সাহ দায়ুদের উচ্ছেদের জন্য খাঁজাহান হোসেনকুলী, মজঃফর খাঁ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিগণকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। মজঃফর খাঁর সহিত শেষ যুদ্ধে বঙ্গের পাঠান রাজা দায়ুদ নিহত হন। মজঃফর খাঁ তাঁহার ছিন্নমুণ্ড আকবর সাহের নিকট দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন।

দায়ুদের মৃত্যুতে বঙ্গে স্বাধীন পাঠান-রাজত্বের চির বিলোপ হইল। গৌড়ের রাজলক্ষ্মী জন্মের মত চলিয়া গেলেন। দায়ুদের মন্ত্রী, বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় সন্ন্যাসী-বেশে পলায়ন করিলেন। মোগল-অধিকারে কিরূপ নূতন বন্দোবস্ত হয় তাহা দেখিবার জন্য তাঁহারা যশোহরে ফিরিয়া না গিয়া ছদ্মবেশে বরেন্দ্র-ভূমিতেই লুকাইয়া রহিলেন।

নববিজিত বঙ্গের শাসন-শৃঙ্খলা সমাধানের জন্য দিল্লীশ্বর আকবর সাহ মহারাজ টোডরমলকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে টোডরমল বঙ্গদেশে উপস্থিত হন।[১]

রাজা টোডরমল উন্নতচেতা, চরিত্রবান, সূক্ষ্মদর্শী, ন্যায়নিষ্ঠ শাসনকর্তা ছিলেন। রাজকার্যেই যে কেবল তিনি চাণক্য-সদৃশ বুদ্ধিমান ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার মত সমর-কুশল বীরও সে সময়ে অতি অল্পই ছিল। এইজন্যই বাদসাহ সকল বিষয়েই তাঁহাকে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। টোডরমল বাঙ্গলায় আসিয়া বুঝিলেন বঙ্গদেশের অরাজকতা দূর করা বড় সহজ কাজ নহে। বাঙ্গলায় কিয়দ্দিন অবস্থানের পর, রাজা টোডরমল স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন বিদ্রোহী পাঠানগণকে দমন করিতে হইলে অগ্রে বঙ্গের জমিদারদের হস্তগত করা প্রয়োজন। জমিদার ও প্রজা-সম্বন্ধে কোনরূপ সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত না করিলে মোগল রাজ-সরকারের যথেষ্ট অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। বঙ্গীয় জমিদারগণ, মোগল-সরকারের নিকট মৌখিক আনুগত্য স্বীকার করিলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা পাঠান বিদ্রোহিগণকে সাহায্য করিতেছিল। এ সাহায্য করার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া মহামতি টোডরমল দেখিলেন অর্থের আশাতেই জমিদারেরা বিদ্রোহিগণকে দ্বিগুণ মূল্যে শস্য ও রসদাদি বিক্রয় করে। তিনি বাঙ্গলার গণনীয় ভূস্বামীদের নিকট প্রস্তাব করিলেন—'আমি মোগল সরকারের পক্ষ হইতে দ্বিগুণ মূল্যে সমস্ত রসদ কিনিয়া লইব। কেন আপনারা সামান্য অর্থলোভে এই বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতেছেন।' টোডরমলের কথায়, জমিদারেরা পাঠান-বিদ্রোহীদের নিকট রসদ বিক্রয় বন্ধ করিলেন। টোডরমল দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ মূল্যে তাহা মোগল তরফ হইতে কিনিয়া লইতে লাগিলেন। পাঠানগণ রসদাভাবে শক্তিহীন হইয়া পড়িল।

টোডরমলের সত্যবাদিতা ও ন্যায়-নিষ্ঠায় বঙ্গীয় জমিদারগণও তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। অতি সহজে, রাজা টোডরমল অবশিষ্ট অশান্ত পাঠান-বিদ্রোহীদের হীনবল করিয়া দিলেন।

রাজা টোডরমল, শান্তির এই সুখাবসরে, বাদসাহের সাধারণ প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য

১. টোডরমলের বঙ্গদেশে আগমন—প্রথম আগমন কাল ১৫৭৫ সাল।—*History of Bengal*, Vol II, Dacca University 1948, p. 189.

বুদ্ধি ও জমিদারদের নিকট সরকারের খাজনা আদায়ের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করেন। ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ, বিহার ও উড়িষ্যাকে কতকগুলি সরকার বা পরগনা এবং চাকলায় বিভক্ত করিয়া জমিদারদিগকে সরকার পক্ষ হইতে রাজস্ব সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। হিন্দুরা যে সমস্ত জায়গীর ও ভূসম্পত্তি বাদসাহের নিকট দানরূপে পাইয়াছিলেন, বা যে সকল জমিদারি তাঁহারা ভোগ করিতেছিলেন, রাজা টোডরমল কায়েমি বন্দোবস্ত করিয়া সেগুলি তাঁহাদের প্রত্যর্পণ করেন। ইহাতে বঙ্গদেশের জমিদারেরা পূর্ণান্তঃকরণে বাদসাহের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে ও বিদ্রোহ-সংকুল বঙ্গদেশে তখনকার মত শান্তি স্থাপিত হয়।

মহারাজ টোডরমল ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যাঁহারা ভূতপূর্ব পাঠান নৃপতিদের আমলে রাজকার্য পরিচালনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা বিনা-সঙ্কোচে, বিনা ভয়ে, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন।" বিক্রমাদিত্যের অনুচর আকমহল হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে মহারাজ টোডরমলের এই অভয়-বাণীর কথা জ্ঞাপন করিল। তাঁহারা যখন বুঝিলেন, টোডরমলের সহিত সাক্ষাতে কোন ভয়ের কারণ নাই, তখন দুই ভ্রাতা মহারাজের সহিত রাজমহলে সাক্ষাৎ করিলেন।

রাজা টোডরমল গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের প্রমুখাৎ রাজস্ব ও দেশের শাসন-নীতি সম্বন্ধে সমস্ত কথা অবগত হইয়া তাঁহাদের প্রচুর বিত্তদানে যথেষ্ট সম্মানিত করেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁহার প্রতি প্রসন্না তাঁহার প্রতিভার কোন স্থানেই অনাদর হয় না। মহারাজ টোডরমল বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়কে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা পাঠান নরপতি দায়ুদের নিকট যে জমিদারি পাইয়াছিলেন তাহাও বাহাল রহিল। দিল্লী-দরবার হইতে সনন্দ আনাইয়া মহারাজ টোডরমল উভয় ভ্রাতাকে যশোহরের পশ্চিমভাগে গঙ্গানদী ও পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্র-নদের পশ্চিমভাগ এই বৃহৎ সীমা-সমন্বিত রাজ্য প্রদান করেন।১

সুবুদ্ধিমান বিক্রমাদিত্য কনিষ্ঠ বসন্ত রায়কে যশোহরে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ টোডরমলের আদেশানুসারে তিনি সরকারি জমা-ওয়াশীল-তুমার অর্থাৎ রাজস্ব বিষয়ক কাগজ পত্র প্রস্তুত কারলেন। মহারাজ টোডরমল বিক্রমাদিত্যের কার্য-প্রণালী দর্শনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্নাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

এইবার বিক্রমাদিত্যের সংসারসুখ চরম সীমায় উপস্থিত হইল। মোগল পাঠানের অনুগ্রহেই তিনি এক বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্যও সেই সময়ে নবযৌবনের সীমায় উপস্থিত। বিক্রমাদিত্য যশোহরের কায়স্থ সমাজের অধিপতি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জঙ্গল-কাটান যশোহর অট্টালিকা, বিপণী, হাট, চত্বর প্রভৃতিতে দিনে দিনে শোভাসৌন্দর্যময়ী হইতেছে। রাজ-দরবারে প্রচুর সম্মান, সমাজে একাধিপত্য, ভাণ্ডারে লক্ষ্মী অচলা, ইহাপেক্ষা সুখের চরমোৎকর্ষ আর কি হইতে পারে?২

১. রামরাম বসু ও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য-সম্পর্কিত গ্রন্থ দ্র.।

২. এই সময়ে যশোহরের ঐশ্বর্যসূচক একটি কবিতা আজও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

"যশোহরপুরী কাশী দীর্ঘিকা মণিকর্ণিকা। / তর্কপঞ্চাননো ব্যাসঃ বসন্তঃ কালভৈরবঃ।

অর্থাৎ যশোহরের অত্যুচ্চ মন্দির-সমূহ, কাশীর রমণীয় ভাব ও মণিকর্ণিকা নামক দীঘি, মণিকর্ণিকার পূত-সলিলকে অনুকরণ করে। অশেষশাস্ত্রবিৎ তর্কপঞ্চানন, এই নগরের সাক্ষাৎ ব্যাসদেব এবং দোর্দণ্ড-প্রতাপ বসন্ত রায় সাক্ষাৎ কালভৈরব স্বরূপ। বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের নাম শ্রীকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন। তিনি অতি তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনিই মহাসমারোহে প্রতাপাদিত্যকে যশোহরের সিংহাসনে বসাইয়া, অভিষেকোৎসব সমাপন করেন। পরবর্তী কালে মহারাজ প্রতাপাদিত্যও তাঁহাকে মহা-গুরুর মত মান্য করিতেন, সকল কার্যেই তাঁহার মতামত প্রার্থনা করিতেন।

গৌড়নগরীতে যখন ভয়ানক রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। ভবানন্দ তখনও ইহলোকে বর্তমান। পৌত্রের মুখ দেখিয়া ভবানন্দ হর্ষ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। পৌত্রকে পরম রূপবান দেখিয়া তিনি তাহার 'প্রতাপাদিত্য' নামকরণ করিলেন। বাল্যকালে প্রতাপ গৌড়নগরে পারস্য-ভাষা শিক্ষা করেন। যশোহরে রাজধানী নির্মিত হইলে তিনি পরিজনবর্গের সহিত যশোহরে আসেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। শর-চালনায় ও অশ্বারোহণে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন। প্রতাপের এই বীরপ্রকৃতি বিক্রমাদিত্য আদৌ পছন্দ করিতেন না। বাল্যকালে পণ্ডিতগণ প্রতাপের ঠিকুজী-কোষ্ঠী দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! এই বালক পিতৃদ্রোহী হইবে!"

প্রতাপের প্রতি কার্যেই বিক্রমাদিত্য বুঝিলেন, এই বীরত্বাভিমানই প্রতাপের সর্বনাশ করিবে। বিক্রমাদিত্য পরম ধার্মিক ও শান্তি-প্রিয় ছিলেন। যিনি বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী শ্রবণে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন, তিনি যে পুত্রের এই বীর-প্রকৃতির উপর বিরক্ত হইবেন, তাহার আর আশ্চর্য কি!

একদিনের ঘটনায় তাঁহার মনোমধ্যে সযত্নে প্রচ্ছন্ন এই বিরক্তি-ভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। আকাশে একটি পক্ষী উড়িয়া যাইতেছিল, প্রতাপ শরাঘাতে সেই পক্ষী বধ করেন। ইহা দৃঢ়-লক্ষ্যের পরিচয়। বিক্রমাদিত্য যে স্থানে বসিয়াছিলেন, নিহত পক্ষী সেই স্থানে পড়িয়া যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। পক্ষীকে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে কে বধ করিল—এই ব্যাপারের অনুসন্ধানে বিক্রমাদিত্য যখন জানিতে পারিলেন তাঁহার পুত্র প্রতাপ কর্তৃক এই শকুন শরাহত হইয়াছে, তখন তিনি প্রতাপকে ডাকিয়া যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন।

মানব মাত্রেই ভ্রমান্ধ। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কে কবে কাজ করিতে পারিয়াছে? মানুষ প্রজ্ঞাবান ও মনস্বী হইলেও কর্মফল তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া বিপরীত পথে লইয়া যায়। প্রতাপ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের কোষ্ঠীফল বিচার বিক্রমাদিত্যের মনে বড়ই আধিপত্য প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি মনোমধ্যে সর্বদাই আলোচনা করিতেন, এই পুত্র আজীবন আমার অবাধ্য হইবে। প্রতাপের কাজকর্মেও সেই ভাব সূচিত হইতে লাগিল। ইহাতে বিক্রমাদিত্যের মনে 'পিতৃ-দ্রোহিতার' এই সংস্কারটা আরও বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। কেবল বিক্রমাদিত্য নহেন, প্রতাপের কোন বিষয়ে অবাধ্যতা দেখিলে অন্যান্য পরিজনেরাও তাঁহাকে পিতৃ-দ্রোহী বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন। এইরূপ ভর্ৎসনার ফল অতি বিষময় হইল।

প্রতাপ তাঁহার বাল্যজীবন গৌড়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গৌড়ে তখন হুলস্থূল ব্যাপার! সুলেমানের প্রাধান্যলাভ, তাঁহার উড়িষ্যা জয়, উড়িষ্যা-বাসী হিন্দুরাজগণের অমিত পরাক্রম ও যুদ্ধ-কৌশল, উড়িষ্যার স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য তদ্দেশবাসী হিন্দুদের জীবনব্যাপী চেষ্টা, প্রতাপের মনে একটা নূতন আলোক-জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিল। প্রতাপ প্রায়ই শুনিতেন, তাঁহার পিতৃদেব বিক্রমাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে বঙ্গাধিপতি দায়ুদের পার্শ্বে থাকিয়া অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন, অসমসাহসিক বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্য মথিত করিতেছেন, তাহা শুনিয়া তাঁহার মনে শক্তিপরিচালন সম্বন্ধে একটা অনুকূল সংস্কার উপস্থিত হইল। আর এই সমস্ত ব্যাপারে প্রতাপের মনে, সেই সময়ে স্বাধীনতার একটা স্পৃহা জাগিয়া উঠে।

প্রতাপের দুইজন বাল্যসঙ্গী এই সময়ে তাঁহার উন্মেষিত চিত্ত-বৃত্তির পূর্ণ-বিকাশের সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহাদের মধ্যে একজন শঙ্কর চক্রবর্তী ও আর একজন সূর্যকান্ত গুহ। প্রতাপের সঙ্গীদ্বয়ও তাঁহার ন্যায় সাহসী ও বলদর্পিত ছিলেন। তাঁহারা তিনজনেই গভীর জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন প্রতাপাদিত্য। প্রতাপ গভীর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া, যেরূপ ভাবে বরাহ-ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতেন, তাহা দেখিয়া তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া থাকিত।

প্রতাপের এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন-গতি অন্যদিকে পরিবর্তিত করিবার জন্য বিক্রমাদিত্য

কনিষ্ঠের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে যশোহর-নগরী নয়ন-মনোহর শোভা ধারণ করিল। এরূপ উৎসব বহুদিন ধরিয়া কেহ দেখে নাই। বিবাহ হইয়া গেলে নববধূ গৃহে আনিয়া বিক্রমাদিত্য মনে মনে ভাবিলেন, যে ঈশ্বরী-মায়ার আবর্তে পড়িয়া সংসারে সকলেই হাবুডুবু খাইতেছে, প্রতাপ নিশ্চয়ই তন্মধ্যে পড়িয়া তাহার উগ্রস্বভাব পরিত্যাগ করিবে।

কিন্তু প্রতাপের কোন পরিবর্তনই নাই। প্রতাপ সঙ্গিগণ লইয়া মৃগয়া ব্যসনে আরও গভীর ভাবে অনুরক্ত হইলেন। প্রতাপ-চরিত্রের বিচিত্রতা বিক্রমাদিত্য কোন রূপেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। প্রতাপাদিত্য-চরিত লেখক বলেন, "তিনি যখন গৃহে থাকিতেন, সে সময়ে তিনি রাজ্যের আয়-ব্যয় ও শাসন-ব্যবস্থা অতি বিচক্ষণতার সহিত নির্বাহ করিতেন। আবার যখন কঠোর-ভাব ধারণ করিতেন, সে সময়ে তাঁহাকে যমের ন্যায় ভীষণ বলিয়া মনে হইত। আবার অন্য সময়ে, তাঁহার মধুর বাক্য ও সরস ব্যবহার দেখিলে, তাহাতে যে অনুমাত্র কঠোরতা আছে, তাহা বোধ হইত না।"

কিন্তু প্রতাপের অতি দুর্ভাগ্য যে তাঁহার পিতা তাঁহার প্রত্যেক কার্যেই পিতৃদ্রোহিতার আভাস পাইতে লাগিলেন। যাহাতে এই উদ্ধত পুত্রের জন্য তাঁহাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত না হয়, সংসারে কোন অশান্তি না আসে, এইজন্য বিক্রমাদিত্য প্রতাপকে দূরতম স্থানে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

একজন কর্মচারী আগরার রাজদরবারে যশোহর-রাজসংসারের প্রতিনিধি রূপে থাকিতেন। বাঙ্গালার সকল করদাতা ভূস্বামীকে তৎকালে বাদসাহ দরবারে এইরূপ একজন প্রতিনিধি বা উকিল রাখিতে হইত। বিক্রমাদিত্য একদিন বসন্ত রায়কে নিভৃতে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "ভাই! প্রতাপকে আমি আগরার দরবারে রাখিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে আমার সকল উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। দূরদেশে অবস্থান নিবন্ধন আত্মীয়দিগের সহিত তাহার দূরতর সম্বন্ধ ঘটিলে সে তাহাদের প্রতি আরও আকৃষ্ট হইবে। এই বিশাল জমিদারির ভার, দিনকতক বাদে প্রতাপের স্কন্ধেই পড়িবে। তুমি আমি চিরদিন থাকিব না। যাহাতে প্রতাপ বাদসাহের দরবারে থাকিয়া উজির ও আমির-ওমরাহদের সহিত মিলিত হইয়া, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করে, ইহা দ্বারা তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। সম্রাট আকবর সাহ গুণগ্রাহী। প্রতাপ যদি কোনরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া বাদসাহের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ আরও পরিস্ফুট হইবে।"

বসন্ত রায় ভ্রাতাকে তাঁহার এ ভয়ানক সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। অগত্যা বসন্ত রায় প্রতাপকে জ্যেষ্ঠের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

কিন্তু নির্ভীক হৃদয় প্রতাপ ইহাতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। খুল্লতাতের আদেশে তিনি আগরা-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ নৌকা-সকল সজ্জিত হইতে লাগিল। শুভদিনে পিতামাতা ও গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া শঙ্কর, সূর্যকান্ত প্রভৃতি অনুচরবর্গকে লইয়া প্রতাপ আগরা-যাত্রা করিলেন। প্রতাপকে বিদায় দিবার জন্য যশোহর নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা রাজধানী প্রান্ত বাহিনী যমুনা-তীরে সমবেত হইল।

এই যশোহর ত্যাগ ব্যাপারে প্রতাপের মনে একটি মহা কুসংস্কার বদ্ধমূল হইল। প্রতাপ মনে মনে ভাবিলেন, আমার এই নির্বাসনের মূলই আমার পিতৃব্য। পিতা সকল কার্যেই তাঁহার মন্ত্রণাধীন। তিনিই আমার বিরুদ্ধে নানারূপ কুমন্ত্রণা দিয়া, পিতার কর্ণ বিষদগ্ধ করিয়া তুলিয়া এই ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। প্রতাপের এই কুসংস্কার-ফলে ভবিষ্যতে তাঁহাকে পিতৃব্য-হত্যার মহা-কলঙ্কে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

বহু বাধা-বিঘ্ন, পথকষ্ট সহ্য করিয়া প্রতাপ আগরায় উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে উপ-

যুক্ত উপঢৌকনাদি সহ দরবারে উপস্থিত হইয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। বিশাল-দর্শন আম-খাস, দেওয়ান-খাস—তাহাদের মণি খচিত স্তম্ভ—অসংখ্য অশ্ব-হস্তী-উষ্ট্র-বাহিত অক্ষৌহিণী মোগলবাহিনী পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় পদাতিক শ্রেণী দেখিয়া তিনি মোগল-সম্রাটের ঐশ্বর্য ও শক্তির পরিচয় পাইলেন।

ক্রমে রাজ-সভায় অনেক গণ্য-মান্য লোকের সহিত প্রতাপের আলাপ পরিচয় হইল। প্রতাপ যখন ভাবিতেন যে, এই মানসিংহের বাহুবলেই আকবর সাহের রাজ্য সুরক্ষিত, এই টোডরমলের অমানুষিক প্রতিভাবলে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসন-বিভাগ সমুন্নত তখন হিন্দুদের শক্তির উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এই হিন্দু ভিন্ন ক্ষেত্রে শক্তি ও অবসর যথাযথ ভাবে পরিচালনা করিলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য সমূহে বিভক্ত করিয়া শাসন করিতে পারিবে। এই সব ব্যাপার দেখিয়াই তাঁহার মনে স্বাধীনতা স্পৃহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

আগরায় অবস্থান কালে অনেক পদস্থ আমির ওমরাহগণের সহিত প্রতাপের আলাপ পরিচয় হয়। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে একদিন বাদসাহের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাঁহার আলাপের সুযোগ ঘটিল। আকবর সাহ সভাসদগণকে মধ্যে মধ্যে এক একটি সমস্যা-পূরণ করিতে দিতেন। একদিন প্রতাপ রাজসভায় উপস্থিত, এমন সময়ে বাদসাহ, তাঁহার পার্শ্ববর্তী আমির ওমরাহগণকে বলিলেন, "সেত ভুজঙ্গিনী যাত চলি হৈ" এই সমস্যা পূর্ণ কর। তাঁহার পার্শ্ব-বর্তী কবি ও পণ্ডিত সভাসদগণ বাদসাহ প্রদত্ত সমস্যাটি প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবে পূরণ করিলেন, কিন্তু বাদসাহ তাহার একটিও পছন্দ করিলেন না।

প্রতাপও মনে মনে এই সমস্যার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি বাদসাহের অপরিচিত। অতি নম্রভাবে, দিল্লীশ্বরের সন্নিহিত হইয়া সসম্মানে কুর্নিশ করিয়া প্রতাপ বলিলেন—"জাঁহাপনা! এ দাস আপনার সমস্যার পূরণ করিতে পারে। অনুমতি প্রদান করিলে আমার রচিত পদটি আপনাকে শুনাইয়া দিই।"

বাদসাহ দেখিলেন, এক গৌরকান্তি, সমুন্নতকায় বাঙ্গালী যুবক তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে। তিনি তখনই সম্মতি দিলেন। প্রতাপ পদপূরণ করিয়া বাদসাহকে শুনাইলে, তিনি মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কার দেন। এই দিন হইতেই বাদ-সাহের সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ পরিচয় হয়।[১]

আগরায় অবস্থান কালে প্রতাপ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে বন্ধুদ্বয়ের সহিত দূর-দূরান্তর দেশে, এমন কি পঞ্জাব, রাজপুতানা, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিতেন। এইরূপে আকবর সাহের শাসন নীতি ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

বহুকাল আগরায় অবস্থান করিবার পর একদিন প্রতাপ এক দুঃসাহসিক কাজ করিলেন। যশোহর হইতে যে রাজস্ব সম্রাট-সরকারে আসিত তাহা তিনি এতদিন নিয়মিত রূপেই দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সেই বার সহসা রাজস্ব দাখিল বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম

১. প্রতাপাদিত্য আগরায় রাজসভায় যে সমস্যাটি পূরণ করিয়াছিলেন তাহা এই—

শোবর কামিনী নীর নিহারতি রিত ভালি হৈঁ — রায়বচোরি আপন মনমে উপমাও চারি হৈঁ
চিরমচরকে গঠপর বাপিকে ধারেছু চল্ল চলি হৈঁ — কেছঙ্গ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী জাত চলি হৈ।

—রামরাম বসু ও শাস্ত্রীর প্রতাপাদিত্য চরিত্রে উদ্ধৃত।

আকবরসাহ অতি গুণগ্রাহী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার সভায় কবি দার্শনিক, সর্ববিষয়ে জ্ঞানবিশারদ ব্যক্তি-বর্গ, সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। রাজকার্যের অবসানে, চিত্তবিনোদনের জন্য কিম্বা জ্ঞানালোচনার জন্য, বাদসাহ উপস্থিত পণ্ডিতগণের সহিত নানাবিষয়িণী আলাপ করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পর্টুগীজ, সর্ব-জাতীয় লোকই এই সভায় উপস্থিত থাকিত।

কূটনীতি। যশোহর হইতে রাজস্ব না আসার কথা ক্রমে বাদসাহের কানে উঠিল। আকবর সাহ ইতিপূর্বেই প্রতাপকে ভালরূপে চিনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের সান্নিধ্যে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতা যশোহরের খাজনা প্রেরণ বন্ধ করিলেন কেন?" প্রতাপ বিনয়ের সহিত বলিলেন, "জাঁহাপনা! আমার পিতৃদেব রাজকার্য হইতে অবসর লইয়াছেন। খুল্লতাত বসন্ত রায়ের উপর এখন রাজ্য-ভার ন্যস্ত। জানি না কি গূঢ় উদ্দেশ্য চালিত হইয়া আমার খুল্লতাত আগরায় করপ্রেরণে এইরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছেন। আমি এ ব্যাপারের রহস্য অবগত নহি। প্রকৃত সংবাদ আনাইবার জন্য যশোহরে লোক প্রেরণ করিয়াছি। আমার বোধ হয় যশোহর রাজ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে, খাজনা পত্র আদায় হইতেছে না। এ অবস্থায় আমিও নিজের কর্তব্য বুঝিতে পারিতেছি না। এখন জাঁহাপনা যেরূপ আদেশ করিবেন, এ দাস তাহাই পালন করিবে।"

আকবর সাহ কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন, "প্রতাপ! তুমি যদি সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব কোন উপায়ে যোগাড় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে যশোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব। আশা করি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান যুবক সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য-শাসনে সমর্থ হইবে।"

প্রতাপের মনের গূঢ় বাসনা সিদ্ধ হইল। তিনি বাদসাহকে কুর্নিশ করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! এ দাসকে কয়েকদিন সময় দান করিলে বোধ হয় আমি রাজস্ব-সংগ্রহ করিতে পারি।"

বাদসাহ ইহাতে সম্মতি দান করিলে, প্রতাপ অল্পদিনের মধ্যেই, রাজস্বের প্রয়োজনীয় অর্থ আগরা হইতেই সংগ্রহ করিলেন। আগরার অনেক আমির-ওমরাহ তাঁহার বন্ধুস্থানীয় হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিশ্বাস ও স্নেহ করিতেন। কাজেই এই দূরদেশে অর্থ সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে বেশী অসম্ভব হইল না।

সম্রাট প্রতাপের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে তিন লক্ষ টাকা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহার আদেশে তখনই বাদসাহী আজ্ঞাপত্র বা রাজ্য-প্রদানের 'ফারমান' প্রস্তুত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ফারমানের প্রতিলিপি বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল।

কেবল বাদসাহী ফারমান নহে, প্রতাপ বাদসাহের অনুমতি লইয়া সেনা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বাদসাহকে বুঝাইলেন, সহসা রাজোপাধি লইয়া দেশে উপস্থিত হইলে এবং রাজ্য দখল করিবার চেষ্টা করিলে, পিতৃব্য বসন্ত রায় কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে পারেন। বাদসাহের অনুমতি লইয়া তিনি দ্বাবিংশতি সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে আগরা পরিত্যাগ পূর্বক, যথা সময়ে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

শঙ্করের পরামর্শানুসারে, প্রতাপ এই পুণ্য-ক্ষেত্র বারাণসীতে খুব দান ধ্যান করেন। কয়েকটি ঘাট-প্রতিষ্ঠা, মঠধারী সন্ন্যাসীদের বৃত্তি-ব্যবস্থা দরিদ্র বিদ্যার্থীদের অর্থদান, প্রভৃতি পুণ্য কর্মানুষ্ঠানে বারাণসীবাসী সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। নগরের অধিবাসিগণকে কয়েক দিবস ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও অর্থাদি প্রদান করেন। আজও বারাণসীতে তাঁহার কীর্তি সমূহ বর্তমান। ১

বারাণসী ত্যাগ করিয়া নানাদেশে পরিভ্রমণান্তর প্রতাপ অবশেষে যশোহরের সন্নিকটস্থ

১. অনেকে অনুমান করেন, চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাট প্রতাপাদিত্যের ব্যয়েই নির্মিত হয়। এ ঘাটটি আজও বর্তমান। ধরিতে গেলে এই ঘাট কাশীর মধ্যে বাঙ্গালীদের অতি প্রাচীনকীর্তি। এই ঘাটের সান্নিধ্যে, ভদ্রকালী প্রতিমাও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা মনে পড়ে। একদিকে প্রতাপের চৌষট্টি-যোগিনীর ঘাট যেমন তাঁহার কাশীর প্রধান কীর্তি, আবার অন্য দিকে তাঁহার ঘোর শত্রু, মহারাজ মানসিংহ 'মান মন্দির' প্রতিষ্ঠা দ্বারা অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কোথায় বা প্রতাপাদিত্য, আর কোথায় বা সেই মানসিংহ—কিন্তু তাঁহাদের কীর্তি আজও অবিনশ্বর ভাবে বর্তমান।

হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ বিপুল বাহিনী পূর্ব্ব হইতেই শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে সজ্জিত করিয়া নগর অবরোধ করিলেন। পাছে পিতৃব্য বসন্ত রায় তাঁহাকে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন, ইহাই তাঁহার প্রধান আশঙ্কা। এরূপ বিগ্রহ-ব্যাপারে রাজকোষ হস্তগত থাকা বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তিনি রাজকোষ দখল করিলেন। কেহ তাঁহাকে বাধা দিল না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য পুত্রের এই অদ্ভুত ব্যাপারে বিরক্ত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভ্রাতার সহিত প্রতাপের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। পিতা ও পিতৃব্যকে সহসা সেই ভাবে তাঁহার স্কন্ধাবার মধ্যে উপস্থিত হইতে দেখিয়া প্রতাপ বড়ই লজ্জিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তখনই পিতা ও পিতৃব্যের চরণ-বন্দনা করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বিক্রমাদিত্য পুত্রকে অনুতপ্ত দেখিয়া তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমরা আর কতদিন বাঁচিব! রাজ্য ত তোমারই। তবে তোমার এরূপ ভাবে নগরাবরোধের প্রয়োজন কি? কোন্ পিতা পুত্রের উন্নতি কামনা না করেন? তুমি কি মনে ভাবিয়াছিলে যে, তোমার স্নেহময় পিতৃব্য তোমার রাজ্যলাভে বাধা দিবেন?"

প্রতাপ অনুতপ্ত চিত্তে পিতা ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। সমস্ত গোলযোগ, মনান্তর, অকৌশল এই খানেই মিটিল। প্রতাপই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যেশ্বর হইলেন। বসন্ত রায় ও বিক্রমাদিত্য কেবল ঈশ্বরোপাসনা ও বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের বিরচিত পদাবলী শ্রবণে, দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

যশোহরকে একটি সুরক্ষিত ও শক্তিমান রাজ্যে পরিণত করিবার জন্য প্রতাপ নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে তাঁহার অধিকৃত স্থানসমূহের চারিদিকে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মিত হইল। রডা নামক একজন পর্টুগীজ নৌ-সেনাপতির তত্ত্বাবধারণে এই সমস্ত দুর্গ নির্ম্মিত হয়। দুর্গ-গুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইলেও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার বিশেষ উপযুক্ত ছিল।[১] যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে—তাহা হইতে আমরা প্রতাপ-প্রতিষ্ঠিত সাতটি দুর্গের নাম পাইয়াছি। মাতলা, রায়গড় (বর্ত্তমান গার্ডেনরিচ্), টানা, বেহালা, সালকিয়া, চিৎপুর, আটপুর, (মুলাযোড়) প্রভৃতি সাতটি স্থানে এই সপ্ত দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অশ্বারোহী পদাতি, তীরন্দাজ, বেলদার (শ্রমজীবি-সেনা) ও গোলন্দাজ প্রভৃতি কোন প্রকার সৈন্যেরই অভাব হইল না। দুই এক বৎসরের মধ্যে যশোহরের যশঃপ্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতাপের এই উন্নতির সময়ে, তাঁহার মহাগুরু নিপাত হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই সময়ে পরলোক গমন করেন। মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করিয়া প্রতাপ বসন্ত রায়কে পিতার ন্যায় সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজ্য-সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত পূর্ব্ববৎ ভাবেই চলিতে লাগিল।

প্রতাপাদিত্য দেখিলেন বঙ্গদেশের সান্নিধ্যে, উৎকলবাসিগণই তখনও অমিত শক্তিতে মোগল-পাঠানের সহিত যুঝিয়া, তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। এই উৎকলীদের সাহস, শক্তি, যুদ্ধপ্রণালী প্রভৃতি দেখিবার জন্য তিনি তীর্থ-যাত্রাছলে, অগণ্য বাহিনী লইয়া উৎকলে গমন করেন।

উৎকলে সে সময়ে উৎকলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ এবং গোবিন্দদেব নামক শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি অতি বিখ্যাত ছিল। বসন্ত রায় প্রতাপকে এই দুইটি বিগ্রহ সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। এই দুই বিগ্রহ আবার উৎকলবাসীদের পরমারাধ্য দেবতা। উড়িষ্যার মধ্যভাগ হইতে

১. Maharaja Pratapaditya had through the help of Rodda the Portuguese Commander of his fleet, built several forts close to Calcutta during his transcient struggle for independence. One such fort, appears to be built at Mutla, another at Raigurh (Garden Reach), a third at Behala, a fourth at Tannah and a fifth at Salkia, a sixth somewhere near Chitpur and a seventh at Atpur near Mulajore... These mud-forts were highly prized in those days for their strategic value. The River being only navigable by small sloops and boats.—Mr. Roy's *Census Report*, p. 13.

সে গুলি নিরাপদ ভাবে আনয়ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু প্রতাপ পূজারীদের হস্ত-গত করিয়া পিতৃব্যের জন্য বিগ্রহদ্বয় সংগ্রহ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

উড়িষ্যা-বাসীরা যখন জানিতে পারিল তাহাদের দেবতাদ্বয় অপহৃত হইয়াছে, তখন তাহারা বিগ্রহের উদ্ধার কামনায় প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। যে উৎকলীদের বাহুর শক্তি-পরীক্ষার জন্য তিনি এত উৎসুক হইয়া ছিলেন কর্মসূত্রে তাহা আপনিই ঘটিয়া গেল।

উৎকল-রাজগণের সহিত প্রতাপের যুদ্ধ বাধিল। সুবর্ণরেখার তটভূমে বাঙ্গালীর প্রথম শক্তি পরীক্ষা ব্যাপারে প্রতাপই বিজয়ী হইলেন। এ যুদ্ধে কয়েকজন উৎকল-রাজা প্রতাপের হস্তে বন্দী হন। প্রতাপ তাঁহাদের সহিত যথেষ্ট সৌজন্য ও শিষ্ট ব্যবহার করিয়া পরিশেষে বন্দী রাজগণকে সসম্মানে মুক্তিদান করেন। এই যুদ্ধ সময়ে প্রতাপের সহকারী শঙ্কর চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত গুহ প্রভৃতি শূরগণ যথেষ্ট শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যেরূপ ভাবে অসংখ্য শত্রু-মণ্ডলীর মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাঁহারা যশোহরে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসে অতি দুর্লভ ঘটনা। এই উৎকলেশ্বর-হরণ ব্যাপারেই প্রতাপের যশঃগৌরব বঙ্গের চারি-দিকে ছড়াইয়া পড়িল।১

উৎকল-বিজয়ী প্রতাপাদিত্য যশোহরের সমীপবর্তী হইতে না হইতে সমগ্র বঙ্গ-প্রদেশে তাঁহার যশোরাশি পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহারাজ বসন্ত রায় বিজয়ী ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপযুক্ত সম্বর্ধনা করিবার জন্য নগর সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। নগরের সর্বস্থানই ধ্বজপতাকা ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইল। রাজপথের চারিদিকে সুবিস্তৃত গগনস্পর্শী তোরণদ্বার সমূহ রচিত হইল। বসন্ত রায় প্রত্যুদ্গমন করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে নগর মধ্যে আনয়ন করিলেন।

প্রতাপ উৎকল হইতে আনীত প্রতিমাদ্বয় খুল্লতাতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরম বৈষ্ণব বসন্ত রায় তাঁহার সাধনা ও আরাধনার যোগ্য বিগ্রহ পাইয়া মহা সমারোহে উৎকলেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপও গোবিন্দদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হন।

ইহার পরেই প্রতাপ যশোরেশ্বরীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতে সকলেরই মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রতাপাদিত্য নিশ্চয়ই ভবানীর বরপুত্র। তাহা না হইলে যশোরেশ্বরী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়া মূর্তি-প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিলেন কেন? ২

১. প্রতাপাদিত্য-চরিত লেখক, শাস্ত্রী মহাশয় বসন্ত রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা রমেশচন্দ্র রায়ের নিকট এই উৎকলেশ্বর মন্দিরের যে প্রস্তর লিপি পাইয়াছিলেন তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। মহারাজ বসন্ত রায়, বেতকাশীতে (সুন্দরবন প্রদেশ) উৎকলেশ্বরের এক অভ্রভেদী মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। তাহার চিহ্নমাত্র নাই। তবে প্রতিষ্ঠা সময়ের প্রস্তর-লিপিখানি এখনও বর্তমান আছে। প্রস্তর-লিপির মধ্যে লিখিত আছে।—

নির্মাণে বিশ্বকর্ম্মা যৎ পদ্মযোনিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ প্রতাপাদিত্য ভূপেনানীতমুৎকল দেশতঃ
উৎকলেশ্বর সজ্ঞঞ্চ শিবলিঙ্গমনুত্তমম্ ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ।

জনশ্রুতি এই—গোবিন্দদেবের এক রাধিকা ছিল। যুদ্ধকালে সুবর্ণরেখা পার হইবার সময় সেই রাধিকা ঠাকুরাণী নদী মধ্যে হারাইয়া যান। গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাজা বসন্ত রায় ঠাকুরের জন্য একটি রাধিকা নির্মাণ করান। কিন্তু ঠাকুর স্বপ্নে তাঁহাকে বলেন—"এ রাধিকা আমার মনোনীত হয় নাই।" এই জন্যে একে একে অনেকগুলি রাধিকা নির্মিত হইয়াছিল। প্রতাপ আবার এই রাধিকাগুলির জন্য এক একটি কৃষ্ণ নির্মাণ করিয়া রাজ্যের নানাস্থানে সেই যুগলমূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠা করেন।

২. কালীঘাটের কালীমূর্তি আবিষ্কারের মূলে যেমন একটি কিম্বদন্তী আছে, যশোরেশ্বরী সম্বন্ধেও সেইরূপ জনশ্রুতি বর্তমান। কমল খোজা বলিয়া প্রতাপের এক বিশ্বস্ত অনুচর ইছামতী নদীতটে এক অপূর্ব জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রতাপকে সংবাদ দেয়। আবার যশোহর প্রদেশের লোকেরা বলে, যশপাটনী নামক জনৈক ব্যক্তি নদীতীরে অদৃশ্য জ্যোতিদর্শন করিয়া প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দেন। প্রতাপাদিত্য সংবাদ পাইবামাত্রই, নদীতীরে আসিয়া দেখেন, এক শিলাখণ্ড হইতে অপূর্ব জ্যোতি বাহির হইতেছে। প্রতাপ পরদিন বনজঙ্গলাদি কাটাইয়া এই প্রস্তরময়ী প্রতিমার উদ্ধার করেন। মানসিংহ যশোহর জয় করিবার পর এই যশোরেশ্বরীকে তাঁহার অম্বরপ্রাসাদে লইয়া যান। আজও অম্বররাজপ্রাসাদে যশোরেশ্বরীর মূর্তি বর্তমান আছে।

প্রচুর সেনাবলে বলীয়ান প্রতাপাদিত্য এই সময়ে ধূমঘাটে একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ বৎসর কালের পর এই দুর্গের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। দুর্গটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে পঞ্চক্রোশ। মৃণ্ময়-প্রাকারে পরিবেষ্টিত হইয়াও এই দুর্গ অতি সুদৃঢ় ছিল। তাহার চারিদিকে অনলবর্ষী কামান-শ্রেণী। এরূপ জনশ্রুতি যে, এই ধূমঘাটের মধ্যে আরও চারিটি গুপ্ত দুর্গ নির্মিত হয়। প্রত্যেক দুর্গ সমরূপে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত। এইসকল দুর্গের মধ্যে বহু-সংখ্যক গৃহ, পুষ্করিণী, উদ্যান, সুপ্রশস্ত রাজপথ ও পণ্য-বীথিকাসমূহ নির্মিত হইল। পঞ্চম দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ। ধূমঘাট নির্মাণ কার্য শেষ হইলে প্রতাপাদিত্য শুভদিনে মহোৎসবের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন।১

প্রতাপ যখন সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপস্থিত, সেই সময়ে তাঁহার গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ তর্ক-পঞ্চানন মহাশয় বসন্ত রায়ের নিকট তাঁহার রাজ্যাভিষেক প্রস্তাব করিলেন। এই তর্কপঞ্চানন জ্ঞানে-গুণে সর্বজন-পূজ্য। তাঁহার নিষ্ঠাবৃত্তি দেখিয়া প্রতাপ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করেন। সন্ধিবিগ্রহাদি ব্যাপারে গুরুর মত না লইয়া প্রতাপ কোন কাজই করিতেন না। তর্কপঞ্চানন মহাশয় কাশ্যপ-গোত্র সম্ভূত-মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার এ অভিষেক-প্রস্তাব সকলকেই অনুমোদন করিতে হইল। অবশেষে মহাসমারোহে প্রতাপাদিত্যের অভিষেক-কার্য সুসম্পন্ন হইল।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য মৃত্যুকালে তাঁহার সমগ্র রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পুত্র ও ভ্রাতাকে দিয়া যান। রাজা বসন্ত রায় এই বিভাগানুসারে ছয় আনা ও প্রতাপ দশ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। এতদিন তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া মিশিয়া রাজ্য-পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ ভাবে বেশীদিন আর চলিল না। দুইজনের প্রকৃতি দুই প্রকার। বসন্ত রায় বৃদ্ধ, ধর্মভীরু ও শান্তিপ্রিয়। প্রতাপ স্বাধীনতা-প্রয়াসী, উদ্ধত-প্রকৃতি এবং অস্থিরচিত্ত। সার্বভৌমিক আধিপত্য লাভের জন্য তিনি বড়ই উৎসুক। প্রথমতঃ প্রতাপ বসন্ত রায়কে স্বমতে আনিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। কাজেই উভয়ের মধ্যে রাজ্য-বিভাগ অপরি-হার্য হইয়া পড়িল।

বর্তমান বাখরগঞ্জ ও বরিশালের মধ্যে চক-শ্রীপুর বা চলিত কথায় 'চাক্‌সিরি' বলিয়া একটি পরগনা ছিল। সমুদ্র-তীরবর্তী স্থান বলিয়া এখানে দুর্গ-নির্মাণের বিশেষ সুবিধা। মগ ও পর্টুগীজ ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য বহুদিন হইতে এই পরগনাটি প্রতাপের স্পৃহনীয় সম্পত্তি ছিল। প্রতাপ অন্য স্থান বিনিময়ে এই চাকসিরি পরগনা লইবার জন্য খুল্লতাতের নিকট প্রস্তাব করেন। কিন্তু বসন্ত রায় ইহাতে সম্মত না হওয়ায় প্রতাপ অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন। এই ঘটনায় বসন্ত রায় সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব ধারণা অতি প্রবলভাবে মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে। তিনি পিতৃব্যের উপর মহাবিরক্ত হন।

চাকসিরি লাভে বিফল মনোরথ হইয়া প্রতাপ পূর্ববঙ্গে স্বীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আর একটি নূতন কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার কন্যা বিন্দুমতীর সহিত চন্দ্রদ্বীপ-রাজ মহাবীর কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু এ বিবাহেও সুখকর হইল না। কেন, তাহা বলিতেছি।

পিতার ন্যায় রামচন্দ্রও একজন বীরপুরুষ ছিলেন। রামচন্দ্র বহুসংখ্যক যুদ্ধে ফিরিঙ্গি পর্টুগীজ ও মগদিগকে পরাজিত করেন। একবার রামচন্দ্র ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দিভাবে রাজধানীতে আনেন। এরূপ বীর জামাতা পাইয়াও প্রতাপ সুখী হন নাই। কেহ কেহ বলেন, জামাতা রামচন্দ্রকে নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য নিজরাজ্য-ভুক্ত

১. রাজ্যাভিষেকের পর প্রতাপ নিজনামে মুদ্রা-প্রচলন করেন। সেই মুদ্রার দুই অংশে নিম্নলিখিত কথা গুলি ছিল—(সম্মুখ ভাগে) শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন জয়তিঃ / শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য।
(পশ্চাৎ ভাগে) বজৎছিকাবছিমো জররে / বাঙ্গাল মহারাজ প্রতাপাদিত্য—জন্মজন্দাল ॥

করিবার জন্য প্রতাপ বহুচেষ্টায় তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। রামচন্দ্র তাঁহার শ্যালক কুমার উদয়াদিত্যের সহায়তায় কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, বসন্ত রায় ও তাঁহার পুত্রগণ রামচন্দ্রের মনে এরূপ একটা দৃঢ়বন্ধ করিয়া দেন যে, রাজ্য-লোলুপ প্রতাপ তাঁহাকে হত্যা করিয়া চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্য অপহরণ মানসে তাঁহাকে জামাতাপদে বরণ করিয়াছেন। উপযুক্ত অবসর পাইলেই তিনি তাহাকে নিহত করিয়া সংকল্প সিদ্ধি করিবেন।

যে-কোন কারণেই হউক, প্রতাপ তাঁহার জামাতা রামচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করিলে রামচন্দ্র রামনারায়ণ নামক এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহায়তায় সে যাত্রা যশোহর হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। রামনারায়ণ প্রভুকে স্কন্ধে লইয়া গভীর নিশীথে নদীতীরে উপস্থিত হয়। ঘাটে রাম-চন্দ্রের নৌকাসমূহ বাঁধা ছিল। রামচন্দ্র ষাটটি দাঁড়-বিশিষ্ট দ্রুতগামী এক নৌকায় আরোহণ করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। যশোহরের ঘাট ছাড়িবার পূর্বে, তোপধ্বনি করিয়া প্রতাপকে জানাইলেন — "আমি চলিলাম।"

গভীর রাত্রে সহসা বজ্রনাদী তোপধ্বনি শুনিয়া প্রতাপাদিত্য বিস্মিতচিত্তে কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন যে তাঁহার অবরুদ্ধ জামাতা রামচন্দ্র কারাগার হইতে পলাইয়া-ছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অতি দ্রুতগামী নৌকায় জনকয়েক দূতকে রামচন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র প্রতাপের সকল সতর্কতা এবং চেষ্টাকে অতিক্রম করিয়া নিরাপদে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ বসন্ত রায়কেই এই গৃহ-বিবাদের মূল কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহার মনে একটা ধারণা জন্মিল যে, বসন্ত রায় তাঁহার ঐশ্বর্য ও পরাক্রম দৃষ্টে জ্ঞাতিত্ব-নিবন্ধন তাঁহার উচ্ছেদ-কামনা কারতেছেন। আবার এ দিকে বসন্ত রায়ের মনের ভাবও এইরূপ বিদ্বেষমূলক। বস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত অনলকণা নির্বাপিত না করিলে যেমন তাহা শক্তিসঞ্চয় করিয়া সহসা জ্বলিয়া উঠে, প্রতাপ ও বসন্ত রায়ের মনোমধ্যে পোষিত বিরুদ্ধভাব সেইরূপ একদিন মহা-অনর্থ উৎপাদন করিল।

বসন্ত রায়ের বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। বসন্ত রায় প্রতাপকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রতাপও খুল্লতাতের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধু সহ তিনি বসন্ত রায়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায় জ্যেষ্ঠকে আসিতে দেখিয়া পিতাকে সংবাদ দিতে গেলেন। বসন্ত রায় সেই সময়ে সন্ধ্যাবন্দনার আয়োজন করিতেছিলেন। নিয়তি-চালিত ঘটনাবশে বসন্ত রায় একজন পরিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গঙ্গাজল লইয়া আইস।"

প্রতাপের কর্ণে 'গঙ্গাজল' শব্দ অতি ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হইল। 'গঙ্গাজল' বসন্ত রায়ের প্রিয় অস্ত্র। 'পিতৃব্য অসি আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছেন, হয়ত আমাকে হত্যা করিবার জন্যই এই নিমন্ত্রণ' — এই ভাবিয়া হৃদয়ের উত্তেজনা বশে উন্মুক্ত অসি হস্তে প্রতাপ সহসা বসন্ত রায়ের সম্মুখীন হইলেন।

এদিকে বসন্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দ রায় প্রতাপকে অসি উন্মোচন করিতে দেখিয়া পিতার অনিষ্টাশঙ্কায় প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সে অস্ত্র প্রতাপের গায়ে লাগিল না। প্রতাপ ইহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া গোবিন্দ রায়কে ভীমবেগে আক্রমণ করতঃ নিহত করেন।

সহসা সেই শান্তিময় রাজপুরীতে শোণিত-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষের লোকজনই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মহা হল্লা উপস্থিত করিল। প্রতাপ দ্রুতপদে পুনরায় বসন্ত রায়ের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বসন্ত রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র গঙ্গাজল অস্ত্র লইয়া আইস।" ভৃত্যবর্গ তাঁহার আদেশ পালনের পূর্বেই অসংযত-ক্রোধ প্রতাপ সাংঘাতিক প্রহারে পিতৃব্যের মুণ্ড স্কন্ধ-চ্যুত করিলেন। পিতৃব্যহত্যার এই মহা-পাপেই ভবিষ্যতে তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছিল।

জগদানন্দ, পরমানন্দ, শ্রীরাম, রূপরাম, রামকান্ত, মধুসূদন, মাণিক্য প্রভৃতি বসন্ত রায়ের

পুত্রগণ, এই ভীষণ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতাপকে সদলবলে আক্রমণ করিল। কিন্তু রণ-কৌশলী প্রতাপ পিতৃব্য পুত্রগণকে একে একে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। শান্তিময় রাজ-পুরীর প্রকোষ্ঠ ও দরদালান সমূহ পিতৃকুলের শোণিতে পরিসিক্ত হইল।

বসন্ত রায়ের অনুচরগণকে নিরস্ত্র করিয়া যাহাতে অন্তঃপুরের মধ্যে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, প্রতাপ তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। বসন্ত রায় মহিষী, তাঁহার একমাত্র শিশু-পুত্রকে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য কচুবনের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন।[১] ইহাতেই সেই শিশুর প্রাণ-রক্ষা হয়।

বসন্ত রায়ের জামাতার নাম রূপরাম বসু। বসন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য, তিনি অন্যান্য হিতৈষী কর্মচারীদের সহিত মন্ত্রণামতে, রাজা বসন্ত রায়ের পরমবন্ধু হিজলী-কাঁদির নবাব ইশা খাঁ মশন্দরীর নিকট গমন করেন। সেখানেও মন্ত্রণায় কিছু স্থির হইল না দেখিয়া, ইশা খাঁর সেনাপতি বলবন্ত বলিলেন, "আমার উপর বিশ্বাস করুন, আমি যে উপায়ে পারি, প্রতাপের কবল হইতে রাজপুত্র রাঘব রায়কে উদ্ধার করিয়া আনিব।"

কচুবন হইতে রাঘবকে কুড়াইয়া লইয়া প্রতাপ সেই শিশুকে স্বীয় মহিষীর হস্তে লালন-পালনার্থে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সিংহের গহ্বর হইতে শিকার বাহির করিয়া আনা বড় সহজ কাজ নহে। কিন্তু বলবন্ত অসীম সাহসী। মশন্দরী সাহেবও ভাবিলেন, চেষ্টার অসাধ্য কার্য নাই — আর সে চেষ্টার ভার যখন বলবন্তের ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিত হইতেছে, তখন তাহা সিদ্ধ হওয়াও অসম্ভব নহে।

বলবন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া একখানি দ্রুতগামী নৌকাযোগে যশোহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষণ জঙ্গলময়, শ্বাপদ-সংকুল সুন্দরবনের মধ্য-দিয়া নৌকা বাহিয়া ধূমঘাটে উপস্থিত হইয়া বলবন্ত প্রতাপকে নিজ আগমন সংবাদ জানাইলেন।

প্রতাপ যথোচিত সম্মানের সহিত বলবন্তকে গ্রহণ করিয়া ইশা খাঁর কুশলাদি সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন। বলবন্তও যথাযথ উত্তরাদি প্রদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে গোপনে কিছু বলিতে চাই. এজন্য এক নির্জন স্থানে চলুন।" প্রতাপ কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া বলবন্তকে এক নির্জন কক্ষে লইয়া গেলেন। রাজ্যসম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথনে প্রতাপকে অন্যমনস্ক করিয়া বলবন্ত সহসা ক্ষিপ্তব্যাঘ্রবৎ প্রতাপের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে ভূপতিত করিল! ভীষণস্বরে বলবন্ত বলিল, "মহারাজ! আপনি এখন সম্পূর্ণ-রূপে আমার আয়ত্তাধীন। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হন তাহা হইলে আমি আপনাকে অব্যাহতি দিব। নচেৎ এই শাণিতাগ্রভাগ তরবারি আপনার উত্তপ্ত রুধির পান করিবে। আমি জানি আপনি সত্যবাদী। এজন্য প্রতিজ্ঞা করুন, বিনা আপত্তিতে রাজকুমার রাঘবকে আমার সঙ্গে যাইতে দিবেন। যতক্ষণ না আমি আপনার রাজ্যের বাহিরে যাই ততক্ষণ আমায় কোনরূপ বাধা দিবেন না।"

প্রতাপ যখন দেখিলেন বলবন্তের হস্তে তাঁহার নিস্তার নাই, তখন অগত্যা তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রতাপের কথা নড়িবার নয়। বলবন্ত এই অদ্ভুত কৌশলে বিনাযুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে শিশু রাজকুমার রাঘবকে লইয়া ইশা খাঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ইশা খাঁ বলবন্ত প্রমুখাৎ সমস্ত কথা অবগত হইয়া তাঁহার বীরত্বের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "বলবন্ত! মনে করিও না প্রতাপাদিত্য তোমাকর্তৃক এইভাবে লাঞ্ছিত হইয়া কোনরূপ প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে না। শীঘ্রই সে আমাদের রাজ্য-আক্রমণ করিতে পারে, অতএব

১. এইজন্য এই শিশুরাজপুত্র রাঘব ইতিহাসে কচু রায় বলিয়া পরিচিত। বেহালা গ্রামে বসন্ত রায়ের অনেক কীর্তি আজও বর্তমান। অনেকে বলেন, বেহালার রায়দীঘি ও সরশুনার কয়েকটি প্রকাণ্ড দীঘি বসন্ত রায়ের খনিত। কচু রায় বা রাঘব বহুদিন বেহালা প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।"

ইশা খাঁর অনুমানই সত্য হইল। নির্জিত প্রতাপ মহাক্রুদ্ধ হইয়া স্থলপথে ও জলপথে বিপুল-বাহিনী লইয়া ইশা খাঁর আশ্রয়দুর্গ হিজলী আক্রমণ করিলেন। তিনি ও তাঁহার নৌ-সেনাধ্যক্ষ রডা হিজলীর উপর ক্রমাগত গোলাবর্ষণ করিয়া হিজলীবাসীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। শঙ্কর প্রভৃতি সেনানায়কগণ চারিদিক হইতে স্থলপথে ও জলপথে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষ-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে ইশা খাঁ মশন্দরী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। বলবন্তও অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া শত্রু হস্তে প্রাণ-বিসর্জন করেন।

হিজলী জয়ের পর প্রতাপ রূপরাম ও রাঘবকে ধরিবার জন্য সেনাপ্রেরণ করিলেন। রূপরাম ইতিপূর্বেই ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়া রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাদের ধরিতে না পারিয়া প্রতাপ বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। যুদ্ধান্তে হিজলীর হিন্দু রাজ-কর্মচারিগণের হস্তে রাজ্যের শাসনভার দিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য-সম্ভার সহ তিনি যশোহরে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রতাপ এই অসম্ভব বিজয়লাভে অধিকতর দর্পিত হইয়া মহোল্লাসে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নগরবাসিগণও তোরণাদি নির্মাণ দ্বারা উৎসবাদি করিয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিলেন। প্রতাপ এই সমরবিজয় উপলক্ষ করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন ও সেনাগণকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার প্রদান করিলেন।

নিম্নবঙ্গে প্রতাপ যেরূপ বর্ধিত-প্রতাপ হইয়া স্বাধীনতা-লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন,[১] তেমনি আর দুইজন শক্তিমান পুরুষ পূর্ববঙ্গের মধ্যে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য স্বাধীন রাজ্যের সূচনা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহারা বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় ও কেদার রায়। চাঁদ রায় কেদার রায় অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ কেদার রায় সর্ববিষয়ে দক্ষ, সমর-কুশল এবং প্রতাপের অপেক্ষা প্রতিভাবান ছিলেন। যে সকল কলঙ্ক প্রতাপের জীবনকে কলঙ্কিত করিয়াছিল কেদার রায়ের সে সব কিছুই ছিল না। পরে আমরা চাঁদ রায় কেদার রায় প্রসঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

প্রতাপ যখন শুনিলেন যে, বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ কেদার রায়, পূর্ববঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি রায়-রাজাদের দমনের নিমিত্ত এক অভিযান ব্যবস্থা করিলেন। প্রতাপের ইচ্ছা নয় যে, সমগ্র বঙ্গে আর কেহ তাঁহার সমকক্ষ হয়। তাঁহার মনের ইচ্ছা এই—অগ্রণীরূপে তিনি সকলের পুরোবর্তী হইয়া বঙ্গদেশকে মোগলের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করেন। কাজেই প্রতাপ এবং তাঁহার সেনাপতিবর্গ বিপুলবাহিনী লইয়া বিক্রমপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শঙ্কর প্রভৃতি সেনাপতিগণের পরামর্শে তিনি চারিধার হইতে বিক্রমপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কেদার রায় এরূপ অতর্কিত আক্রমণের

১. প্রতাপাদিত্য ও স্বাধীনতাযুদ্ধ—এ প্রসঙ্গে আচার্য যদুনাথ সরকারের অভিমত "A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the *Bara Bhuiyas* of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort...The height of absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessore as the counter-part of Maharana Pratap Singh of Mewar. It is, therefore, necessary to debunk the Bengali 'hero' by turning the day light of history on hire ... Pratapaditya never defeated any Mughal army in pitched battle, his son and general Udayaditya took to flight at the first sight of a losing naval battle (at Salka) and Pratapaditya himself tamely submitted to the Mughal general without holding out till he was assured of safety to life and honour."—*History of Bengal*, Vol. II, Dacca University, 1948, p. 225-226.

জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া যখন তিনি বুঝিলেন প্রতাপের সহিত বর্তমান অবস্থায় প্রতিযোগিতা করা অসম্ভব, তখন অগত্যা তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রতাপও কেদার রায়ের সহিত সন্ধি করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

বর্ধিত-প্রতাপ প্রতাপ উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মত্ত যুদ্ধাশ্বের মত অতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া শক্তিপরীক্ষার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এ অবসরেরও অভাব হইল না।

তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি ও অমাত্যগণের সহিত একদিনের মন্ত্রণাতেই স্থির হইল যে, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ প্রিয়সুহৃদ শঙ্কর দেশে দেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া দেশবাসিগণকে তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝাইয়া দিবেন, তাহাদিগের প্রাণে স্বাধীনতা-প্রয়াস উদ্দীপ্ত করিবেন। তাহাদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া এমন এক বিরাট-শক্তির সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে পারে। এই কার্য-সাধনের জন্য সাহসে ভর করিয়া শঙ্কর নানাদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সুদূর মিথিলায় উপস্থিত হয়েন। সমস্ত দেশকে শক্তি-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া শঙ্কর সকলের চক্ষে পূজ্য ও বরেণ্য হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালী শঙ্কর চক্রবর্তীকে বীর্যবান মৈথিলিগণ গুরুর ন্যায় মান্য করিতে লাগিলেন।[১]

প্রতাপও এদিকে তাঁহার সেনাপতিগণকে বিভিন্ন কার্যের ভার-প্রদান করিয়া রাজ্যের নানা-স্থান যথাসম্ভব সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। সূর্যকান্ত, ভবানীদাস, মদন, প্রতাপসিংহ, রডা-ফিরিঙ্গি প্রভৃতি সেনাপতিগণ দুর্গ নির্মাণ, তদুপযোগী অস্ত্রাদি সংগ্রহ, সৈন্যগণকে নব-প্রণালীতে যুদ্ধশিক্ষা দান, রসদ-সংগ্রহ প্রভৃতি গুরুতর কার্যে নিযুক্ত রহিলেন। চারিদিকেই উত্তেজনা, উৎসাহ, যুদ্ধোদ্যম। সকলেই মনে মনে ভাবিল, শীঘ্রই বঙ্গদেশে একটা মহা-বিপ্লব উপস্থিত হইবে।

প্রতাপ যখন ধূমধাটে বসিয়া এই সমস্ত বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত সেই সময়ে প্রতাপ-সেনাপতি শঙ্কর ঘটনাবশে রাজমহলে উপস্থিত হন। শের খাঁ নামক একজন মোগল-কর্মচারী এই সময়ে রাজমহলের শাসন কর্তা ছিলেন। তিনি শঙ্করের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহার উপর জাতক্রোধ হন। আকবর সাহের শাসন প্রণালী সুশাসন-মূলক হইলেও তাঁহার প্রাদেশিক কর্মচারীরা আগরা হইতে অনতিদূরে, এই বাঙ্গলায় থাকিয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। শের খাঁ একজন উদ্ধত প্রকৃতির শাসনকর্তা ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এই সময় এক ব্রাহ্মণ অপরাধীকে বন্দী করিবার আদেশ করেন। ইতিপূর্বে এই ব্রাহ্মণ শঙ্করের শক্তি ও সাহসের কথা শুনিয়াছিলেন। অপরন্তু শঙ্কর এই সময়ে রাজমহলে অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া রাজদণ্ড-ভীত, অত্যাচার-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। শঙ্করও সেই ব্রাহ্মণকে নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখেন।

শের খাঁ শঙ্কর চক্রবর্তীকে দমন করিবার জন্য শনির ন্যায় সূত্রানুসন্ধান করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে অতি সহজে সেই সূত্র মিলিল। শের খাঁ শঙ্করকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এ ব্যক্তি রাজদ্বারে অপরাধী। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এখনই অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করুন।" মহাপ্রাণ, আশ্রিত-বৎসল শঙ্কর বলিয়া পাঠাইলেন, "সাহেব! এ ব্যক্তি আমার শরণাগত। ইহার কৃত ক্ষতি আমি পূরণ করিয়া দিতে প্রস্তুত, কিন্তু আশ্রিতকে কখন ত্যাগ করিতে পারিব না।"

১. শঙ্কর মিথিলায় অবস্থান কালে গণ্ডকী-তটে ভগবতীর এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। কিম্বদন্তী এই, দ্বারভাঙ্গা প্রদেশের হায়াঘাটে শঙ্কর স্থাপিত এই প্রতিমূর্তি এখনও বর্তমান।—শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য চরিত।

এই কথায় শের খাঁ রাজকর্মচারিগণকে কর্তব্য-কার্যে বাধা দেওয়ার অভিযোগে শঙ্করকে কারারুদ্ধ করেন। বিদেশে মোগল শাসনকর্তা কর্তৃক শঙ্করের কারাবরোধ বার্তা প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি অতিশয় ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়া বন্ধুর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তর্ক-বিতর্কের পর এই স্থির হইল যে, কারাগারের হিন্দু প্রহরিগণকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া শঙ্করকে মুক্ত করিতে হইবে। এ উপায় ব্যর্থ হইল না। শঙ্কর কারামুক্ত হইয়া যশোহরের দিকে ধাবমান হইলেন।

পরদিন শের খাঁ কারাগার হইতে শঙ্করের পলায়ন-বার্তা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহরীদের দণ্ডিত করিলেন এবং পলায়িত ব্যক্তির অনুসরণের জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। এমন কি তাঁহার গুপ্ত-প্রণিধিগণ ছদ্মবেশে যশোহর পর্যন্ত গিয়াছিল। তাহারা শঙ্করকে পাইল না বটে, কিন্তু যশোহরে প্রতাপের যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখিল সবই শের খাঁকে জানাইল।

একজন বাঙ্গালী-জমিদার সেনা-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে, দুর্গ-প্রতিষ্ঠা করিতেছে, মোগল শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এ সংবাদে শের খাঁ অধৈর্য হইয়া শঙ্করকে ধৃত ও প্রতাপকে নির্জিত করিবার জন্য সৈন্যসমেত যশোহরের দিকে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপাদিত্য তাঁহার গুপ্ত-প্রণিধিগণের মুখে সংবাদ পাইলেন যে, মোগল-শাসনকর্তা শের খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে যশোহরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনিও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। শের খাঁকে বাধা দিবার উদ্যোগ আয়োজন সবই সম্পূর্ণ হইল। তিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া সর্বপ্রথমে শের খাঁর সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধের পরিণামে শের খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। মোগলের সহিত যুদ্ধে প্রতাপ এই প্রথম জয়লাভ করিলেন।

এই অসম্ভাবিত জয়-লাভে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য তাঁহার মিত্ররাজ বর্গকে এই বিজয় সংবাদ প্রদান করিলেন। এই সংবাদে বঙ্গের দ্বাদশভৌমিকগণের অনেকেই মহা-সাহসী হইয়া মোগলদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। প্রতাপাদিত্যচরিতে লিখিত আছে, এই সময়ে সকলেই স্বীয় শক্তি অনুসারে, মোগল-সম্রাটের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিল না। কেহ বা দিল্লীগামী মোগল-রাজকোষ লুণ্ঠন, কেহ বা মোগল-সৈন্য-নিবাসে অগ্নি প্রদান, কেহ বা অল্পসংখ্যক মোগলসেনাকে দল বাঁধিয়া আক্রমণ, কেহ বা মোগলদের যাতায়াতের পথে রাস্তা-ঘাট-পোল সমূহ ভাঙ্গিয়া যথেষ্ট পরিমাণে অনিষ্ট-সাধন করিতে লাগিলেন। সময় বুঝিয়া বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গ এক প্রাণে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

প্রতাপের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী পরিশেষে সম্রাট-দরবারে আকবর সাহের কানে পেঁছিল। বসন্ত রায়ের জামাতা রূপরাম বসু রাজপুত্র রাঘবকে (কচু রায়) লইয়া দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজধানীতে পেঁছিয়া রূপরাম নানা কৌশলাবলম্বনে বাদসাহের সহিত পরিচিত হইলেন। অবসর বুঝিয়া তিনি প্রতাপ কর্তৃক তাঁহার শ্বশুরের হত্যাকাণ্ড, কচু রায়ের উদ্ধার, ঈশা খাঁর সহিত প্রতাপের যুদ্ধ, প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপার সম্রাটের কর্ণগোচর করেন। আকবর সাহ প্রতাপের এই স্পর্ধার কথা শুনিয়া ইব্রাহিম খাঁ নামক একজন মোগলসেনাপতিকে সৈন্য-সমেত বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত যাত্রা করিয়া অসংখ্যবাহিনী সমভিব্যাহারে ইব্রাহিম খাঁ মোগলের রাজধানী রাজমহলে উপনীত হন। পথক্লেশ দূর হইলে রাজমহল ত্যাগ করিয়া তিনি সপ্তগ্রামাভিমুখে আসেন। সপ্তগ্রামে পেঁছিয়া প্রণিধিগণ মুখে তিনি সংবাদ পাইলেন, সুন্দরবন ও তৎসমীপস্থ স্থানসমূহ নদী-সংকুল, সুতরাং এ ক্ষেত্রে নৌকাপথে সেনা লইয়া যাওয়াই ঠিক। মোগল সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ প্রচুর রসদ সমেত অসংখ্য সেনাপূর্ণ নৌকা লইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ প্রতিমুহূর্তেই দিল্লী হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানের আশা করিতেছিলেন। ইব্রাহিম সপ্তগ্রাম ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া তিনি সৈন্যদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। ইব্রাহিমের আসিবার পথেই প্রতাপের মাতলা-দুর্গ। প্রতাপ এই দুর্গকে সবল সৈন্যপূর্ণ করিয়া অতি সুদৃঢ় ভাবে সুরক্ষিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রায়গড় দুর্গও সুরক্ষিত হইল।[১]

পথিমধ্যে ইব্রাহিম খাঁ সর্বপ্রথমে রায়গড়-দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু এ অবরোধের ফল বড়ই শোচনীয় হইল। প্রতাপের যুদ্ধনীতি-জ্ঞান ইব্রাহিম খাঁর রায়গড় আক্রমণ বিফল করিয়া দিল। বল-দর্পিত মোগল-সৈন্য যেরূপ ভাবে রায়গড়ের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল, প্রতাপের সৈন্যেরাও সেইরূপে মোগলদিগের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া সেনাক্ষয় করিতে লাগিল।

প্রতাপ ইতিপূর্বে রায়গড় অবরোধের সংবাদ পাইয়া সূর্যকান্ত প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ সেনাপতিকে মোগল-সেনার পার্শ্বদেশ আক্রমণের জন্য নিযুক্ত করেন। সূর্যকান্ত বহুক্ষণ যুদ্ধের পর মোগলশিবিরে আগুন লাগাইয়া দেন। বায়ুবশে এই অগ্নি-শিখার জ্যোতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইলে সূর্যকান্ত মোগলদিগকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারিয়া ঘোরতর রূপে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে মোগলসৈন্য বিভীষিকা-গ্রস্ত হইল। বৃথা লোকক্ষয় অপ্রয়োজন ভাবিয়া সূর্যকান্ত সৈন্যসমেত প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এ দিকে ইব্রাহিম খাঁও রায়গড়ে বৃথা সৈন্যক্ষয় অবিবেচনার কার্য ভাবিয়া তথায় অল্প সংখ্যক সেনা রাখিয়া মাতলা-দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মাতলা দুর্গের নিকটবর্তী হইবামাত্র, প্রতাপের সৈন্যগণ মোগলসৈন্যের উপর ভীষণ গোলা-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। স্থলপথে যে সকল মোগল-সৈন্য আসিয়াছিল সূর্যকান্ত ও শঙ্কর পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ভীমাক্রমণে তাহাদের বিপর্যস্ত করিতে লাগিলেন। পর্টুগীজ রডা জলপথে মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। আহত ও নিহতদের শোণিতস্রোতে নদীর জল আরক্ত বর্ণ ধারণ করিল। স্বয়ং প্রতাপ ও শঙ্কর ব্যূহের নানাস্থানে উপস্থিত হইয়া হিন্দু সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণামে প্রতাপের হস্তে ইব্রাহিম খাঁ পরাজিত হইলেন। যে স্থানে এই ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল আজও তাহা 'সংগ্রামপুর' নামে সাধারণে পরিচিত। প্রতাপ মোগলসৈন্যকে মাতলার যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া রায়গড়ের সাহায্যার্থে প্রচুর সেনা প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধের পরিণামে নানাবিধ বিজয়লব্ধ পদার্থ লইয়া প্রতাপাদিত্য সেনাপতি-সহ যশোহরে ফিরিয়া আসিলেন এবং এই সমর-বিজয় সংবাদ চারিদিকে বিঘোষিত করিবার জন্য মহা-সমারোহে যশোরেশ্বরীর পূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, দরিদ্রকে দান প্রভৃতি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হইল।

ক্রমাগত উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়লাভে সাহসী হইয়া মহারাজা প্রতাপাদিত্য পরিশেষে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণের সংকল্প করিলেন। এ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে তিনি স্বরাজ্য শাসন-সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা করেন। দূরদেশে যুদ্ধকার্যে ব্যস্ত থাকিবার সময় যাহাতে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার কোন বিপর্যয় না ঘটে, তজ্জন্য তিনি তাঁহার নিকট আত্মীয় ভবানীদাস ও লক্ষ্মীকান্ত নামক এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে রাজস্ব ও শাসনবিভাগের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। প্রতাপ উপযুক্ত পাত্রেই এই দায়িত্ব-ভারার্পণ করিয়াছিলেন। এই দুইজন কর্মচারী তাঁহার অবর্তমানে, অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য সম্পাদন করিয়া প্রজা সাধারণের প্রীতিভাজন হয়েন।

এই লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে। প্রতাপাদিত্যের

১. এই রায়গড় দুর্গ কলিকাতার দক্ষিণে কোনও স্থানে ছিল। প্রতাপাদিত্যচরিত-লেখক শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, এই রায়গড় বেহালা-বড়িষার সন্নিকটে। পূর্বে বলিয়াছি বেহালা ও তৎসমীপবর্তী স্থানগুলি রাজা বসন্তরায়ের জমিদারি-ভুক্ত হইয়াছিল। প্রতাপের রাজ্যমধ্যে রায়গড় নামধেয় অনেকগুলি দুর্গের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

পরাভবের পর মহারাজ মানসিংহ তিনজন 'মজুমদারের' মধ্যে বঙ্গরাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। 'তিন মজুমদারের মধ্যে বাঙ্গালাভাগ' বলিয়া একটি প্রবাদ আজও এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 'মজুমদার' বাদসাহী আমলের উপাধি। বঙ্গের করসংগ্রাহকগণ সরকার হইতে এই উপাধি পাইতেন। এই তিন মজুমদারের নাম লক্ষ্মীকান্ত, ভবানন্দ, জয়ানন্দ। লক্ষ্মীকান্ত বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীগণের আদিপুরুষ। জয়ানন্দ বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের আদিপুরুষ। আর ভবানন্দ কর্তৃক কৃষ্ণনগর রাজ-বংশের সূচনা হয়। আমরা কালীঘাট প্রসঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিব; কারণ বর্তমান কালীঘাটের সহিত এই লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণের সম্বন্ধ দুশ্ছেদ্য।

প্রতাপ লক্ষ্মীকান্ত প্রভৃতির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শুভদিনে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য যাত্রা করিলেন। নদী-বহুল সুন্দরবন বিভাগে, নৌকা-যানে সেনাচলাচল করা সর্বাপেক্ষা সুবিধাকর ভাবিয়া সুবৃহৎ পোতাদি সৈন্য ও রসদ পরিপূর্ণ করত, তিনি সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-ভীতিময় স্থান সমূহের মধ্য দিয়া, নৌকা চালাইতে লাগিলেন। অগ্রপশ্চাতে কয়েকখানি পোত ব্যূহরূপে থাকিয়া মধ্যবর্তী সৈন্য-পূর্ণ নৌকাগুলির রক্ষক রূপে চলিল। প্রতাপ সুন্দরবন পার হইয়া গঙ্গায় পড়িলেন। সপ্তগ্রাম সেই সময়ে বাণিজ্যপূর্ণ উন্নত বন্দর মোগল-রাজকর্ম-চারীদের প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র। প্রতাপ সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া এক দল সেনাসহ সহসা নগর আক্রমণ করিলেন।

এই সংবাদ দেশের সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইল। সুযোগ পাইয়া উড়িষ্যার হিন্দু নৃপতিগণ ও নির্জিত পাঠানগণ নানাদিক হইতে মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। দেশময় একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

মোগলদিগের গঙ্গাতীরবর্তী আশ্রয়-কেন্দ্রসমূহ আক্রমণ করিতে করিতে প্রতাপ রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহী পাঠানেরাও এই সময়ে তাঁহার সহিত যোগ দিল। মোগলের রাজ-মহল দুর্গ হিন্দু-সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। রসদ না পাওয়ায় ও ভবিষ্যতের শোচনীয় পরিণাম বুঝিয়া মোগল-সেনাপতি ও সেনাগণ প্রতাপের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজমহলে স্ব-নির্বাচিত একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া প্রতাপ পাটনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইতি পূর্বে বিহার-প্রদেশের জমিদারগণও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। প্রতাপকে বিজয়ীরূপে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার পতাকার অধীনতা স্বীকার করিলেন। শঙ্করের সহিত বিহার প্রদেশের অনেক ক্ষমতাপন্ন ভূস্বামীর বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্রতাপ ইহাঁদিগের সহিত মিলিত হইয়া পাটনা নগরী আক্রমণ করেন।

পাটনা উন্নত শহর। বিহারের মোগল রাজধানী। মোগলের প্রধান সেনানিবেশ। প্রতাপ ইহা পূর্ব হইতেই বুঝিয়া বীর-বিক্রমে, অসম সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কয়েকদিনের ভীষণ যুদ্ধে এবং হিন্দুপক্ষের ক্রমাগত গোলাবর্ষণে, দুর্গ-প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িলে হিন্দুগণ দুর্গ দখল করিলেন। যুদ্ধান্তে প্রতাপ পাটনা ও বিহার প্রদেশীয় জমিদারদের হস্তে পাটনার শাসনভারার্পণ করিয়া বিজয়ী বীররূপে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন।

ভারতসম্রাট আকবর সাহ যখন শুনিলেন বিদ্রোহী ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য পাটনা ও রাজমহল দখল করিয়া, মোগল-সেনাকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি মহাক্রোধান্ধ হইয়া আজিম খাঁ নামক এক সুদক্ষ মোগল-সেনাপতিকে প্রতাপের দমনের জন্য প্রেরণ করেন।

আজিম খাঁ শক্তিশালী মোগলসেনা লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া ক্রমাগত কুচ করিয়া কলিকাতার নিকট শিবির স্থাপন করিলেন। এ সংবাদ প্রতাপের কর্ণগোচর হইল। পথিমধ্যে আজিম খাঁ প্রতাপের সৈন্য হইতে কোন রূপ বাধা প্রাপ্ত হন নাই। প্রতাপ আজিম খাঁকে কৌশলে বন্দী বা বধ করিবার জন্যই এই উপায়াবলম্বন করিয়াছিলেন। আজিম খাঁ তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন, প্রতিপক্ষীয়গণ শক্তির অভাবেই তাঁহাকে বাধা দিতেছে না। প্রতাপ একদিন গভীর রাত্রে বিশ্বস্তচিত্ত আজিম খাঁর শিবির আক্রমণ করিলেন। প্রতাপসৈন্য বীর-বিক্রমে

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া মোগলদের সঙ্গে লড়িয়া শত্রুদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত করিল। প্রতাপ-আদিত্যের জীবনচরিত লেখকের মতে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রায় বিংশতি সহস্র মোগলসৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। এ ভীষণ যুদ্ধের পর প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী ও নানাপ্রকার বহুমূল্য দ্রব্যে প্রতাপের রাজ-কোষ পূর্ণ হয়। এই অসম্ভব বিজয়াবার্তা তড়িৎগতিতে সমস্ত বঙ্গে প্রধাবিত হইল। সকলেই একমুখে প্রতাপের অসীম শৌর্য-বীর্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে প্রতাপ যুদ্ধ-নিহত মুসলমানগণের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। সেকালের ঘটক-কারিকায় এই মহাযুদ্ধের একটি বিবরণ আছে। পাঠকের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।[১]

এই ভীষণ পরাজয়-সংবাদ যখন দিল্লীশ্বর আকবর সাহের নিকট পৌছিল তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সভাসদ বিশেষ গণনীয় দ্বাবিংশতি জন আমিরকে তিনি অসংখ্য সৈন্য সমেত প্রতাপের দমনের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন।

এই নব-নিযুক্ত দ্বাবিংশতি আমির সেনাপতিগণ তাঁহাদের গন্তব্য পথের মধ্যে কোন রূপ বাধা প্রাপ্ত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যশোহর-প্রান্ত-বাহিনী যমুনা-তীরে সৈন্যসমেত উপস্থিত হইলেন। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহারা প্রতাপ-সৈন্য হইতে কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হন নাই। কাজেই সকলেই বিশ্বস্ত চিত্তে একেবারে রাজধানীর নিকটবর্তী হইলেন। এখন প্রতাপকে ধরিতে পারিলেই তাঁহাদের কার্যসিদ্ধি হয়, এই ভাবিয়া তাঁহারা অসি ও শৃঙ্খল সহ প্রতাপের নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। এই অসি ও শৃঙ্খল প্রেরণের অর্থ এই, 'হয় বশ্যতা স্বীকার কর—না হয় যুদ্ধার্থে অগ্রসর হও।' প্রতাপ মোগল দূতের নিকট হইতে অসিগ্রহণ করিয়া জানাইলেন যে তিনি বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

দূরদর্শী প্রতাপ, এই অতর্কিত বিপদে চিন্তিত হইয়া এক গুপ্ত মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন। মহাবীর শঙ্কর বলিলেন, "বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। এ সময়ে শত্রুনাশে আমাদের বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। সুন্দরবন বিভাগের চতুর্দিকস্থ জলাভূমি বর্ষায় কিরূপ ভীষণ ভাব ধারণ করে তাহা সকলেই জানেন। শত্রুপক্ষের নৌকাগুলি নষ্ট করিয়া দিলেই আমাদের অর্ধেক কাজ হইয়া যাইবে। তারপর শমন-রাজ প্রেরিত বর্ষার ভীষণ রোগ সমূহ একবার মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিলে শত্রুক্ষয় কার্য আরও অগ্রসর হইবে। আমার মতে খণ্ড-যুদ্ধে মোগলসেনাকে চারি-দিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিলেই আমরা জয়ী হইব।"

শঙ্করের এই মত সকলেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করায় প্রতাপ তাঁহার নৌ-সেনাপতি মহাবীর্যবান পর্টুগীজ রডাকে শত্রুর নৌকাগুলি বিপর্যস্ত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। রঘু ও সুখা নামক দুইজন বীর স্থলপথে সৈন্য লইয়া গিয়া মোগলদের রসদ-সংগ্রহ কার্যে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। সূর্যকান্ত শত্রু পক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও খণ্ড-যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন। মোগলদের রসদবাহী নৌকাসমূহ হিন্দুদের হাতে পড়িতে লাগিল। দেশব্যাপী সমরা-নল প্রজ্বলিত হইল। কোন পক্ষেরই জয়পরাজয় নির্ধারিত হইল না।

ইহার পর ভীষণ বর্ষা আসিল। কয়েক দিন ধরিয়া অনবরত প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত দেশ জলে পরিপূর্ণ হইল। উন্নত স্থান সমূহ দ্বীপাকার ধারণ করিল। বিষাক্তসর্প, কীট, মশক, জলোকাগণ বাদা-ভূমিস্থিত মোগল শিবিরে সৈন্যগণ মধ্যে মহা উৎপাত উপস্থিত করিল। সুযোগ বুঝিয়া যমরাজের প্রধান সেনানীরূপে জ্বরও মোগল-শিবিরে প্রবেশ করিল। ইহার

১. আজিমাগমন বার্তাং শ্রুত্বাপি স নৃপোত্তমঃ।
অধাবৎ সিংহনাদেন স্বসৈন্য পরিবেষ্টিতঃ॥
নির্জগাম তদাতূর্ণমাজিমো হি স্থিতো যথা।
নিঃস্বনং ঘোর যামিন্যামাক্রম্য তৎবলং বলাৎ॥

প্রগৃহ্য বিবিধানস্ত্রান্ স ববর্ষ মুহুর্মুহুঃ।
অদ্ভুতং সমরং ঘোরং কৃত্বাসৌ শমনোপমঃ॥
বিংশসহস্র সৈন্যানী ঘাতয়িত্বা ক্ষণং তদা।
আজিমং পাতয়ামাস তীব্রঘাতেন ভূতলে॥

—প্রাচীন ঘটককারিকা।

উপর মোগল-শিবিরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এই ভীষণ সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রতাপ চারিদিক হইতে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিলেন। কয়েক দিনের দিবারাত্র-ব্যাপী যুদ্ধে, জনকয়েক প্রসিদ্ধ মোগল-সেনাপতি নিহত হইলেন। প্রতাপেরে পক্ষেও বহু লোক ক্ষয় হইল।[১] কিন্তু প্রতাপই পরিশেষে এই ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। এই যুদ্ধের পর সমস্ত বঙ্গদেশ মোগল-শাসন পাশ হইতে মুক্ত হইয়া হিন্দুরাজ্যে পরিণত হইল।

এই শোচনীয় পরাজয় সংবাদ যথাসময়ে দিল্লীতে পেঁাছিল। আকবর সাহ তখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। আগরার রাজপ্রাসাদ মধ্যে তখন মহা হুলস্থুল। আগরার সিংহাসন লইয়া তখন মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবার পূর্ব-সূচনা দেখা দিয়াছে। মহারাজ মানসিংহ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া ভাগিনেয় সাহাজাদা খসরুকে সিংহাসনে স্থাপিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। সুলতান সেলিমের (ভবিষ্যৎ জাহাঙ্গীর) ভাগ্য-সূত্রও এই বিপ্লব-স্রোতে প্রবলভাবে আন্দোলিত। রাজ্যের প্রধান প্রধান মন্ত্রী, সেনাপতি ও আমির-ওমরাহ-বর্গ উভয়পক্ষেই বিভাজিত। এই ভীষণ সময়ে আকবর সাহের নিকট বঙ্গদেশে হিন্দু কর্তৃক মোগলের পরাজয় সংবাদ পেঁাছিল।

নিয়তিবশে মহাশক্তিমান সম্রাট আকবর সাহ ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। সেকেন্দ্রার সমাধি-গর্ভে তাঁহার বীর-দেহ সমাহিত হইল। 'দিল্লীশ্বরো বা—জগদীশ্বরো বা' এই শৌর্যবীর্য গৌরব-জ্ঞাপক বিশেষণ সেই দিন হইতে লোপ পাইল। মোগল-সাম্রাজ্যের চূড়া খসিয়া পড়িল।

মৃত্যুকালে আকবর সাহ, জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহাজাদা সেলিমকে সিংহাসনের অধিকারী-রূপে নির্দেশ করিয়া যান। সেলিম 'জাহাঙ্গীর' উপাধি ধারণ করিয়া ভারতের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মানসিংহ ও আজিম খাঁ বিফল মনোরথ হইয়া নব বাদসাহের কোপমুখ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

জাহাঙ্গীর ধীরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, মানসিংহকে তাঁহার বড়ই প্রয়োজন। বঙ্গদেশের ভীষণ বিদ্রোহ-ব্যাপার তাঁহার হৃদয়কে বড়ই আলোড়িত করিতেছিল। মানসিংহ বিংশতি সহস্র বলীয়ান, সুযোদ্ধা রাজপুত-সেনার অধিনায়ক। কাজেই জাহাঙ্গীর ধীরতা অবলম্বনে মানসিংহকে বলিয়া পাঠান, "মহারাজ! আমি আপনার এবং আমার পুত্র যুবরাজ খসরুর সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিলাম। আগরা-দরবারস্থ যে সমস্ত আত্মীয়-বন্ধু এবং আমীর-ওমরাহ ইতি পূর্বে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও মার্জনা করিলাম। আপনারা পুনরায় সম্রাট সরকারে স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত হইলেন।"

এই অভয়বাণী পাইয়া মহারাজ মানসিংহ আগরায় ফিরিয়া আসেন। কিয়ৎদিন পরে জাহাঙ্গীর মানসিংহকে বঙ্গের বিদ্রোহ-দমনের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। জাহাঙ্গীরের মনের গূঢ় উদ্দেশ্য অন্যরূপ। তিনি মানসিংহের উপর বহুদিন হইতেই বিরক্ত। তিনি মনে ভাবিলেন, মানসিংহের মত এক প্রতাপশালী ব্যক্তিকে সিংহাসনের এত নিকটে রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। অথচ তাঁহাকে গোপনে হত্যা করা অতি অসম্ভব কার্য। বঙ্গদেশে যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইলে মানসিংহ রাজধানী হইতে দূরেও থাকিবেন অথচ যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তিনি শত্রুহস্তে নিহত হন তাহা হইলে তাঁহার এক প্রবল শত্রু অতি সহজেই ধরাধাম হইতে অপসৃত হইবে।

কাবুল-বিজয়ী, বীরত্বাভিমানী মহারাজ মানসিংহ অগণ্য বাহিনী সমেত বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া তিনি বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার পূজাদি করিলেন। সেই সময়ে কাশীতে তাঁহার মানমন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেছিল তাহার সম্বন্ধেও নানাবিধ সুব্যবস্থা করিলেন।

১. বসীরহাটের অপর পারে, ইছামতী তটে এই লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়।

একদিন মানসিংহ দেখিলেন এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর, গৈরিকধারী গম্ভীর-মূর্তি সন্ন্যাসী মণিকর্ণিকার ঘাটে বসিয়া একান্ত চিত্তে ভগবানের স্তব পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নয়ন-প্রান্ত দিয়া ভক্তি-অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্তব-মন্ত্র উদাত্ত-অনুদাত্তাদি স্বরে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই নির্জন স্থান বিকম্পিত করিতেছে।

সন্ন্যাসী গভীর রাত্রে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। মহারাজ মানসিংহ নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাৎবর্তী হইলেন। সন্ন্যাসী এক নির্জনমঠে প্রবেশ করিলেন। মানসিংহও তাঁহার অনুসরণ করিয়া মঠাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি সন্ন্যাসীর চরণ বন্দনা করিয়া কৌশলে পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলেন, এই তেজঃপুঞ্জময় সন্ন্যাসীর নাম কামদেব ব্রহ্মচারী।

মানসিংহ যে কয়দিন বারাণসীতে ছিলেন সেই কয়দিন কামদেব ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন. ব্রহ্মচারীর শাস্ত্রজ্ঞান, নিষ্ঠাবৃত্তি দেখিয়া মহারাজ মানসিংহ মনে মনে তাঁহার প্রতি অতীব অনুরক্ত হইলেন। এই একান্ত অনুরাগ হইতে দৃঢ় ভক্তি আসিল। মানসিংহ পরিচয়ে জানিলেন, এই নিষ্ঠাবান সন্ন্যাসী সাবর্ণ-গোত্রসম্ভূত একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ। মহারাজ মানসিংহ কামদেব ব্রহ্মচারীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।[১]

ভারত-বিজয়ী মানসিংহ তাঁহার গুরুর নিকট হইতে কৌশলে কথার ছলে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য অবগত হন। ইহাতে ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল।

মানসিংহ বঙ্গদেশে যাইতেছেন শুনিয়া বহুদিন পরে কামদেবের মনে লুপ্তপ্রায় পুত্র-স্নেহ জাগিয়া উঠিল। তিনি মানসিংহকে বলিলেন, "বৎস! তোমার ন্যায় শক্তিমান পুরুষ এ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি আমার শিশুপুত্রকে নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া ব্রহ্মচর্যাবলম্বন করিয়াছি। আমার প্রাণ এখন সেই শিশুপুত্রের জন্য অতি কাতর। আমার পুত্রকে যে উপায়ে পার, সন্ধান করিয়া বাহির করিবে। জানিও, ইহাই তোমার গুরু-দক্ষিণা।"

এই কামদেব ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে আমরা দুই একটি অতি প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। তাহা নিতান্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কামদেবের বংশধরগণ এখনও বর্তমান। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে কামদেবের স্বহস্ত লিখিত এক আত্মপরিচয় পাইয়াছি। তাহা আমরা পরে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত করিব।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্বনামধন্য বঙ্গাধিপতি আদিশূর মহারাজ কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে যে পঞ্চজন বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে সাবর্ণ-গোত্রসম্ভূত বেদগর্ভ একজন। ইনি রাজার নিকট বটগ্রাম প্রাপ্ত হন। এই বটগ্রাম যে কোথায়, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। কান্যকুব্জাগত পাঁচজন ব্রাহ্মণের ৫৬টি পুত্র জন্মে। আদিশূরের উত্তরাধিকারী মহারাজ ক্ষিতিসুর এই ৫৬ জন ব্রাহ্মণকে ৫৬টি গ্রাম প্রদান করেন। এই গ্রামদান ব্যাপার হইতে 'গাঁই' শব্দের উৎপত্তি হইল। 'গাঁই' অর্থাৎ গ্রামাধিকারী। বেদগর্ভের দ্বাদশপুত্রের মধ্যে হল নামধারী এক পুত্র 'গঙ্গ' গ্রাম প্রাপ্ত হন। এইজন্য হলের সন্ততিবর্গ গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়া আখ্যাত হইতেছেন।

এই হলের অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ভব দেখিতে পাওয়া যায়। কামদেবের পূর্বপুরুষেরা বল্লালের সময় কৌলীন্যমর্যাদা লাভ করেন নাই। এই কৌলীন্যমর্যাদার

---

১. অনেকে বলেন, মানসিংহ আগে বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন। এই কামদেব ব্রহ্মচারীই তাঁহাকে শাক্তমতে দীক্ষিত করেন। এ কথা কতদূর সঙ্গত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহারাজ মানসিংহ, যে সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া যশোহর জয় করেন, প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন, সে সময়ে তিনি ঘোর শাক্ত। কারণ এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মানসিংহ যুদ্ধজয়ী হইবার পর যশোহর নগরে প্রবেশ করিয়া মহাসমারোহে 'যশোরেশ্বরী'র পূজা করিয়াছিলেন। পরে তিনি এই 'যশোরেশ্বরী'কে বঙ্গদেশ হইতে নিজের অম্বর-রাজধানীতে লইয়া যান। অম্বর শহরে আজও এ মূর্তি বর্তমান। যশোরেশ্বরীর পূজার জন্য মানসিংহ কয়েকজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে লইয়া যান। তাঁহারাই অম্বরপ্রাসাদস্থিত যশোরেশ্বরীর পূজক পদে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের বংশধরেরা আজও তথায় অবস্থান করিতেছেন। তবে তাঁহাদিগকে সহসা বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

সমীকরণ কালে, কামদেবের পিতৃপুরুষেরা শ্রোত্রীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কামদেব শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দিবারাত্র জপ-তপ ও শাস্ত্রচর্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার প্রাণ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্বদাই চেষ্টা করিত। কিন্তু গুণবতী পত্নীর স্নেহ ও প্রেমে আবদ্ধ থাকায় তাঁহার সে বাসনা সিদ্ধির কোন সুযোগই ঘটে নাই।

সহসা এ সম্বন্ধে একটি দৈব-প্রেরিত সুযোগ উপস্থিত হইল। ভগবানের ভক্ত বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার সংসার-বন্ধন শৃঙ্খল একটি ঘটনায় ছিন্ন হইল। দারুণ প্রসব বেদনার পর এক পুত্র প্রসব করিয়া কামদেব পত্নী পদ্মাবতী দেহত্যাগ করিলেন।

সম্মুখে পত্নীর মৃতদেহ আর তাহার ক্রোড়-পার্শ্বে সদ্যোপ্রসূত শিশু। কামদেব একদৃষ্টিতে পত্নীর মৃতদেহের দিকে চাহিয়া আছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, "হা ভগবান! হা প্রভু! করিলে কি? এই সদ্যোজাত মাতৃহীন বালকের উপায় কি হইবে? কোথায় আমি মায়ার বন্ধন কাটাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তাহা না হইয়া এই মাতৃহীন বালক আমার সংসার-বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া দিল।"

কামদেব এই সমস্ত কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে সেই পর্ণকুটিরের চালের মধ্য হইতে একটি জেঠীর (টিকটিকি) ডিম্ব তাঁহার সম্মুখে পড়িল। পড়িবামাত্রই ডিম্বটি ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার মধ্য হইতে একটি টিকটিকির ছানা বাহির হইল। ঘটনাক্রমে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা সেই স্থানে আসিবা মাত্রই সেই সদ্যোজাত জেঠী তাহাকে গ্রাস করিল।

কামদেব সবিস্ময় চিত্তে দেখিলেন করুণাময় ভগবান সেই সদ্যোজাত জেঠীর আহারের ও জীবনরক্ষার বন্দোবস্ত করিতেও অমনোযোগী নহেন। যিনি এই ক্ষুদ্র টিকটিকির আহারের বন্দোবস্ত করিলেন, তিনি যে তাঁহার সদ্যোপ্রসূত শিশুর রক্ষা-ব্যবস্থা করিবেন না, তাহা কখনই হইতে পারে না।

কামদেবের জ্ঞান-নেত্র খুলিল। তিনি কৃতজ্ঞতা-বিমুগ্ধ-কণ্ঠে, অশ্রু-পূর্ণ-নেত্রে বলিলেন, "হে মধুসূদন! আজ তুমি আমায় যে শিক্ষা দিয়াছ, তাহাতেই আমার জ্ঞান-নেত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। এই বালক তোমারই আশ্রয়ে রহিল। তুমিই ইহাকে দেখিও।" তিনি একখণ্ড কাগজে দুইটি ছত্র লিখিয়া বালকের বক্ষের উপর রাখিলেন. তাহাতে লিখিত ছিল—

কাকঃ কৃষ্ণীকৃতো যেন হংসশ্চ ধবলীকৃতঃ।
ময়ূরশ্চিত্রিতো যেন তেন রক্ষা ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ—"যিনি কাককে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন, হংসকে শ্বেতবর্ণ করিয়াছেন, ময়ূরকে বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তিনিই এই সদ্যোজাত বালককে রক্ষা করিবেন।"

কামদেব ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া মৃত পত্নীর দেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করিলেন, তৎপরে উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন।[১]

১. বঙ্গদেশে গোঘাটা গোপালপুর গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করি। শৈশবাবধি আমি আমার আচার্যের নিকট শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, উপনয়নান্তে মন্ত্র-গ্রহণ পূর্বক ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ স্ত্রী পদ্মাবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ পূর্বক ইষ্ট-সাধনার্থ, পীঠমালা-গ্রন্থে লিখিত, 'বঙ্গদেশে চ কালিকা,' অর্থাৎ আদিগঙ্গা তীরে যে স্থানে সতী-অঙ্গ পতিত হয় তাহা নিরাকরণার্থ ও বিশ্বকর্মা নির্মিত পাষাণময়ী মূর্তি ও তাঁহার রক্ষক যে অনাদিলিঙ্গ ভৈরব প্রকাশ আছে, তাহা জানিবার জন্য মাগুরা পরগনার অন্তর্গত আদিগঙ্গাতীরে স্থান নির্ণয় পূর্বক অরণ্যমধ্যে একটি পর্ণ-কুটীর নির্মাণপূর্বক তথায় স্ত্রী পুরুষে ঈশ্বর আরাধনায় মগ্ন ছিলাম। প্রতি পর্ব নিশিতে যথানিয়মে দেবীর অর্চনা করিতাম। একদা আমি পরম-তত্ত্ব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় পত্নী পদ্মাবতী কহিলেন "একি আশ্চর্য! এতদিন এখানে বাস করিতেছি, এরূপ আশ্চর্য অলৌকিক দৃশ্য কখন ত নয়নগোচর হয় নাই।" এই কথা বলিয়া আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, "প্রভো! রাত্রি কি শেষ হইয়াছে? পূর্বদিকে অরুণোদয়ের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কি পদার্থ দেখিতেছি? আপনি ঐ দেখুন।" এই কথা আমার কর্ণগোচর হইবামাত্র আমি কুটীর-দ্বার হইতে পূর্বদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু ঐ ব্যাপার আমার নয়নগোচর হইল না। "কৈ—কি দেখিলে" বলিয়া প্রশ্ন করায়,

তাই মানসিংহ তাঁর অতিশয় ভক্ত।
তাঁর শিক্ষা-দীক্ষায় ত্রিতাপে অনাসক্ত॥
গুরুর আশীষে শিষ্য মানবেতে সিংহ।
ভারতজয়ী হইল সে রাজা মানসিংহ॥
কি কাজে গুরুর তোষ ইঙ্গিতেতে শুনি।
তব ভ্রাতৃ-অন্বেষণ কর যাদুমণি॥
মানসিংহ গুরুপুত্র করে অন্বেষণ।
কালীঘাটে দেখা হল নাম লক্ষ্মীনারায়ণ॥
শিষ্ট শান্ত সুবুদ্ধি আর তেজীয়ান অতি।
বালক হলেও বিজ্ঞ আছিল সুনীতি॥
রাজা জিজ্ঞাসিল ভাই মাতৃচরণ কই।
চরণামৃত দাও গুরু ঋণ-মুক্ত হই॥
লক্ষ্মীনারায়ণ কহে মাতৃ আজ্ঞা শুন।
মর্যাদা হীন জীবনে নাহি কাজ কোন॥
নৃপ বলে প্রতিজ্ঞা ত জান মোর স্থির।
গুরুর আদেশ রক্ষায় আছে এ শরীর॥
আজি হতে তব ইচ্ছা যত লও ভূমি।
কুলীনে ধরুক ছাতা অন্নদাতা তুমি॥
পিত্রাদেশ আছে এই কুল কর চূর্ণ।
তাঁহার মানস তাহে হবে পরিপূর্ণ॥
ভবানন্দ সহচর কানুনগুয়ার।
ইচ্ছামত তব রাজ্য হবে যে বিস্তার॥
উত্তররাঢ়ী কায়স্থ দ্বিজ ভক্ত এক।
লক্ষ্মীর সন্ধানে ক্লেশ পায় সে কতেক॥

ক্ষুদ্র ভূমীশ বটে দেব দ্বিজেতে সুমতি।
মানসিংহের আজ্ঞায় রাজস্বে নিষ্কৃতি॥[১]
গঙ্গাবাসে স্থান নাহি চাহি যে নিষ্কর।
পিতৃযজ্ঞে ভূস্বামীর পূজা শ্রেষ্ঠতর॥
তথাস্তু বলিয়া তারে মহাশয় কয়।
তদবধি নারায়ণ সন্ততি মহাশয়॥
লক্ষ্মীর অতুল বিত্ত রায়চৌধুরী খ্যাতি।
কন্যাদানে কুল নাশে কুলের দুর্গতি॥
কুম্ভমাটি মত কুলীন উঠিয়া মাথায়।
পদতলে দলিত মানহীন এ ধরায়॥
লক্ষ্মীর আরাধ্য কালী যাহে স্থিরা মতি।
অদূরে বড়িশা তথা করিলা বসতি॥
যতকাল কালীঘাটে কালিকার স্থিতি।
লক্ষ্মীনাথে কুল ভঙ্গে সাবর্ণের মতি॥
কালীঘাট কালী হল চৌধুরী সম্পত্তি।
হালদার পূজক এই ত তার বৃত্তি॥
ক্রমে জাতি কুটুম্বে দেয় যতেক বৃত্ত।
কুলীন কুল নাশে সবে হল প্রবৃত্ত॥৫২
মানসিংহ যদা যায় পুনঃ কাশীবাসে।
কহে গুরু আজ্ঞা সিদ্ধ গুরু অভিলাষে॥
জানুক না জানুক অস্ত্রের কেহ বিদ্যা।
সৈন্যের রক্ষণে পটু চৌধুরী অনবদ্যা॥ ৫৪

—সারাবলীর অন্তর্গত মেলমালা।

মহারাজ মানসিংহ বারাণসী হইতে বাহির হইয়া বর্ধমানের পথ ধরিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যও এদিকে মানসিংহের বঙ্গপ্রবেশ বার্তা অবগত হইয়া যাহাতে তিনি গঙ্গাপার হইতে না পারেন তাহার বন্দোবস্তে ব্যস্ত রহিলেন। তাঁহার নৌ-সেনাপতি রডা সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া মোগলসৈন্যের পথরোধ করিবার আয়োজন করিলেন। মানসিংহ বঙ্গে আগমন সময়ে রূপরাম ও কচু রায়ের সন্ধান পান। প্রতাপের গৃহের গুহ্য কথা জানিতে পারিবেন বলিয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে লন।

মানসিংহ যখন যেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন সেই স্থানের প্রজারা ঘরদ্বার ছাড়িয়া মোগল-সেনাদের ভয়ে নানা স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে অনেক নগর ও গ্রাম জন-শূন্য হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ও প্রজাগণের পলায়ন হেতু অনেক সময়ে মানসিংহকে রসদের জন্য বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

মানসিংহ প্রণিধি-মুখে প্রতাপের সৈন্য-সমাবেশ ব্যবস্থা বুঝিয়া দ্রুতপদে বর্ধমানে উপস্থিত হন। নদীবক্ষে একখানিও নৌকা নাই নৌকা বাহিবার মাঝি নাই। এ সম্বন্ধে কোন কিছু সন্ধান জানিবারও উপায় নাই, কারণ নগরবাসীরা সকলেই ভয়ে পলাইয়াছে। সেই জন-শূন্য-স্থানে এসব সন্ধান দেয় কে? মানসিংহ এই সমস্যার অবস্থায় পড়িয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন।[২]

১. রাজা শূদ্রমণি।
২. ততো মানসিংহো মহাপ্রাসাদোঽয়ং দেবস্তেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃতো নির্জগাম নির্গতশ্চ যত্র যত্রোবাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকা পলায়নম্ চক্রিরে রাজানশ্চ প্রয়োজন সাক্ষাদ্বভুবুঃ—ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতম্।

কিন্তু প্রতাপের ধ্বংস ও মানসিংহের বিজয়লাভ বিধাতার বাঞ্ছনীয়। কাজেই এই সময়ে ভবানন্দ আসিয়া মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হয়েন। মানসিংহ ভবানন্দের সহায়তায় নৌকা জোগাড় করিয়া নদী উত্তীর্ণ হইলেন।

কিন্তু ইহার পর আবার এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। সাতদিন ধরিয়া এমন ভয়ানক বৃষ্টি হইল যে, মানসিংহের সমভিব্যাহারী সেনাগণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইবার মত হইল। আহার্যাভাবে তাহাদের জীবন বিপন্ন। ভবানন্দ এ বিপদ সময়ে প্রচুর রসদ জোগাইয়া বিপন্ন মানসিংহ-সৈন্যের প্রাণরক্ষা করেন। ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের সংসারে প্রতিপালিত, কিন্তু তাঁহার এই অন্যায় কার্যের জন্য আজও তাঁহাকে কলঙ্ককালিমা বহন করিতে হইতেছে।

সুচতুর মানসিংহ অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া বুঝিলেন, জলপথে সেনা লইয়া যাওয়া নিরাপদ নহে। তাঁহার পূর্ববর্তী মোগল সেনাপতিগণ এই উপায় অবলম্বনে বাঙ্গলা হইতে পরাজয়ের কলঙ্ক কিনিয়া গিয়াছেন। বিশেষত ফিরিঙ্গি-সেনাপতি রডার চালিত প্রতাপের নৌ-বাহিনী অতি প্রবল শক্তিময়। তাহারা মুহূর্তমধ্যে জলপথে মহাবিপদ ঘটাইতে পারে। এই ভাবিয়া মানসিংহ স্থলপথে যাওয়াই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। তিনি সরাসর নূতন রাস্তা নির্মাণ করাইয়া গ্রাম, নগর, জঙ্গল, প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলেন। [১]

সপ্তদিন ব্যাপী যে ঝড় বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে প্রতাপেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাঁহার অনেক সজ্জিত রণতরী বিপর্যস্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। এরূপ মহা বিপত্তি ঘটিলেও প্রতাপ নিরুৎসাহ হইলেন না। চারিদিকের বন্দোবস্ত যাহাতে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। যশোহর-নগরীও এই সময়ে পরিখা, খাত প্রভৃতি দ্বারা সুরক্ষিত হইল।

মানসিংহ উপযুক্ত স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া অসি ও শৃঙ্খলসহ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। দূত রাজসভায় উপস্থিত হইলে প্রতাপ ও তাঁহার সভাসদ কেশব ভট্টাচার্য মানসিংহকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া তৎপ্রেরিত অসি গ্রহণ করেন। দূত প্রতাপ পরিত্যক্ত সেই শৃঙ্খল হস্তে মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথাই তাঁহাকে জানাইল।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের নিকট বশ্যতার আশাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ দম্ভপূর্ণ উত্তর পাইয়া তিনি সেনাগণকে সজ্জিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই সময়ে কচু রায় আসিয়া মানসিংহকে বলিলেন, "মহারাজ! প্রতাপ অতি ক্রূরকর্মা ও কূটকৌশলী। আপনি একটু বিবেচনার সহিত কার্য করিবেন। কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া প্রতাপ অতিশয় দর্পিত হইয়াছে। সাধারণের মনের উপর তাহার অসীম ক্ষমতা। সাধারণে প্রতাপকে সমরে বিজয়দাত্রী কালীর বরপুত্র বলিয়া বিবেচনা করে। প্রতাপ মোগলসৈন্যের বিনাশার্থ এই সন্নিকটবর্তী প্রান্তরসমূহ মধ্যে বারুদ পুতিয়া রাখিয়াছে।"

মানসিংহ কচু রায়ের পরামর্শে বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যূহ-রচনা করিলেন। দক্ষিণে অশ্বারোহী ও পদাতিক, বাম দিকে গোলন্দাজগণ, সম্মুখে গজারোহী চমূ স্থাপন করিয়া মহারাজ মানসিংহ বীর-বিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপও তাঁহার প্রিয়-সহচরগণ, অর্থাৎ সূর্যকান্ত, রঘুনন্দন প্রভৃতিকে লইয়া দুর্ভেদ্য ব্যূহ-রচনা করিলেন। এবারের সমরের বিশেষত্ব এই, নবীন বয়স্ক রাজকুমার উদয়াদিত্য সেনানায়ক হইয়া প্রতাপ-সৈন্যের এক প্রয়োজনীয় দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রতাপকে জীবন্ত ধরিতে পারিলে বা নিহত করিতে পারিলে বাঙ্গলার যুদ্ধানল সহজেই

---

১. শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, এখনও মানসিংহকৃত এই সৈন্যাগমন পথের ভগ্নাবশেষ সুন্দরবন প্রদেশে দেখা যায়। ইহা 'গৌড়ের জাঙ্গাল' বলিয়া বিখ্যাত।

নির্বাপিত হইবে, ইহা ভাবিয়া মানসিংহ বাছাবাছা রাজপুত, পাঠান ও মোগল-সৈন্য দ্বারা দুর্ভেদ্য ব্যূহ-রচনা করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতাপ সৈন্যসহ মানসিংহকে আক্রমণ করেন। পূর্বদিনের যুদ্ধ অপেক্ষা সে দিনের যুদ্ধ অতি ভয়াবহ। এ ভীষণ যুদ্ধে অনেক হিন্দু ও মোগল-সেনা নিহত হইল।

মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যে এই ভীষণ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের স্থান আমাদের নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিগ্রহে দিন দিন সৈন্যক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মানসিংহ অতিশয় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। কচু রায়, রাঘব ও ভবানন্দ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া মানসিংহ বলিলেন, "আমি কাবুল প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়াছি—কিন্তু কোথাও এরূপ শোচনীয় ভাবে পরাজিত হই নাই। আমার পরাক্রমে সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্য বিকম্পিত হইয়াছে, কিন্তু আজ আমাকে প্রতাপের পরাক্রম দেখিয়া কম্পিত হইতেছে। আমি এখন বুঝিতেছি, সম্রাট আমাকে মৃত্যুর কবলগত হইবার জন্যই বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। অপরন্তু এ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আগরায় ফিরিলেও আমি ক্রোধানল হইতে মুক্তি পাইব না।" এই কথা শুনিয়া কচু রায়, ভবানন্দ প্রভৃতি বলিলেন, "মহারাজ! বিজয়-লক্ষ্মী আপনার অঙ্কগত-প্রায়। এরূপ সময়ে আপনি যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ইহার সুফল ভোগ না করেন তাহা হইলে বুঝিলাম, বীরধর্ম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি গতরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যশোহরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী প্রতাপের উপর বিমুখ হইয়াছেন। ভগবান রামচন্দ্র লঙ্কাসমরে ভগবতীর উদ্বোধন করিয়া যেরূপে বানর-চমূ মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ মহামায়ার পূজা করিয়া সৈন্যদের হৃদয়ে শক্তি-সঞ্চার করুন। ইহাতে নিশ্চয়ই আপনার অভীষ্ট লাভ হইবে।" উপস্থিত অন্যান্য সকলে কচু রায়ের এই কথার সমর্থন করিল। মহারাজ মানসিংহ মহাসমারোহে ভগবতীর পূজা করিলেন। সৈন্য-মধ্যে এরূপ একটা জনরব প্রচার করিয়া দিলেন, "ভগবতী মানসিংহের ভক্তিতে প্রসন্না হইয়া প্রতাপের পক্ষ ত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং এখন প্রতাপকে কেহই রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।"[১] বলা বাহুল্য, এই উৎসাহবাণী মানসিংহের সেনামধ্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিল।

তৎপর দিন আবার উভয়পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রতাপ প্রাণপণে যুঝিতে লাগিলেন। মানসিংহও ভীমবেগে প্রতাপকে আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষের রণ-মদোন্মত্ত বীরগণ জীবনাশা ত্যাগ করিয়া মহা-সমরে প্রবৃত্ত হইল। প্রতাপের এই বার কপাল ভাঙ্গিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ সূর্যকান্ত সমরে পতিত হইলেন।

সূর্যকান্তের পতনে যশোহরের সেনাদল উৎসাহ-হীন ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া ঊনবিংশ বর্ষীয় নবীন রাজকুমার উদয়াদিত্য স্বয়ং সূর্যকান্তের স্থলাধিকার করিয়া সেনা-চালনা করিতে লাগিলেন। মানসিংহ যশোহর-রাজকুমারকে রণাঙ্গণে অসীম সাহসের সহিত প্রবেশ করিতে দেখিয়া কতকগুলি প্রবল পরাক্রান্ত হাবসি ও রাজপুত-সেনা উদয়াদিত্যের দিকে পরিচালিত করিলেন। উদয়াদিত্য কিয়ৎক্ষণ ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে সমরক্ষেত্রে নিহত হন।

রাজকুমার উদয়াদিত্য ও সূর্যকান্তের পতনে প্রতাপ-সৈন্য বজ্রাহতের মত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাব ধারণ করিল। পর্টুগীজ সেনাপতি রডা এই উৎসাহ-হীন হিন্দু সৈন্যগণকে প্রোৎসাহিত করিয়া আবার মোগলদিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি শেষ রক্ষা করিতে না পারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন।

মানসিংহ এইবার জয়াশায় উৎসাহিত হইয়া যশোহর-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রতাপের শত্রুগণ তাঁহাকে দুর্গের দুর্বল স্থান গুলি দেখাইয়া দিলে মানসিংহ সেই সকল দিক হইতে

১. শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য।

আক্রমণ করিয়া অতি সহজেই যশোহর-দুর্গ দখল করিলেন। প্রতাপ উপায়ান্তর না দেখিয়া ধূমঘাট-দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

যশোহর দুর্গ জয় করিবার পর মহারাজ মানসিংহ এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য প্রতাপের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু প্রতাপ ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব উপেক্ষা করায় পুনরায় উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন অবশিষ্ট আছেন কেবল প্রতাপ ও শঙ্কর। প্রতাপ শঙ্করকে লইয়া আবার নবোৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধের শেষ বর্ণনা আমরা শাস্ত্রী-মহাশয়ের লিখিত কাহিনী হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—"প্রতাপ শঙ্কর-সহ মিলিত হইয়া মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় অরাতিকুল সংহার করিতে করিতে মানসিংহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মানসিংহ কতকগুলি সৈন্য প্রতাপের সৈন্যের মধ্যভাগ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ঘোরতর বিক্রমে বঙ্গীয় সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিল। প্রতাপ স্বীয় সৈন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানসিংহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইলেন। রজনীর বৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ ও অন্ধকার বর্ধিত হইতে লাগিল। মানসিংহের সৈন্যগণ প্রতাপ পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন এইরূপ শব্দ করিয়া বঙ্গীয় সৈন্যগণকে আক্রমণ করিল। 'প্রতাপের মৃত্যু' এই শব্দ, বঙ্গীয় সৈন্যগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় তাহারা দশদিক অন্ধকার দেখিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মানসিংহ-সৈন্য-পরিবেষ্টিত প্রতাপ কোনরূপেই শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। সমস্ত দিনের ভীষণ পরিশ্রম ও আহত স্থান হইতে প্রচুর শোণিতস্রাব হওয়াতে পূর্ব হইতেই প্রতাপের শরীর অবসন্ন প্রায়। এক্ষণে আবার শত্রু-প্রহারে জর্জরিত হইয়া যুদ্ধস্থলে তিনি অচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হন। এই অবকাশে মানসিংহ প্রতাপের পরিশ্রান্ত সৈন্যগণকে বীর-বিক্রমে আক্রমণ করেন। বঙ্গীয় সেনাগণ প্রতাপাদিত্যের মূর্ছিত দেহ রক্ষা করিবার জন্য অচলের ন্যায় অটল হইয়া তাহাদের গতিরোধ করিতে লাগিল। ইহার পর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শরীর রক্ষায় নিযুক্ত একমাত্র অবশিষ্ট বীর শঙ্করও চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সমরক্ষেত্রে মূর্ছিত হইয়া পড়েন। এই সময়ে মানসিংহ স্বয়ং আগমন করিয়া প্রতাপ ও শঙ্করকে বন্দী করিয়া নিজের শিবিরে লইয়া যান।"

মানসিংহ বিজয়োল্লাসে উৎসাহিত হইয়া, সৈন্যগণকে ধূমঘাট এবং যশোহর-নগর লুণ্ঠন করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, মানসিংহ যশোহর-বিজয়ে অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি পাইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য-মহিষী মহারাজের পরাজয় বার্তা শ্রবণে শত্রুহস্তে পতিতা হইবার ভয়ে যমুনাগর্ভে আত্ম-বিসর্জন করেন। মহারাণী যে স্থলে জল নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন আজও পথিকগণ সে স্থানটি অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিয়া থাকে।

যশোহর বিজয়ান্তে মানসিংহ বন্দী প্রতাপাদিত্য ও কচু রায় প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী যাত্রা করেন। প্রতাপকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় বাদসাহের নিকট পেঁৗছিতে হয় নাই। পথিমধ্যে কাশীধামে প্রতাপাদিত্য ইহলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে যশোহরের উজ্জ্বল গৌরব জন্মের মত মলিন হইয়া পড়ে।

প্রতাপের অন্যান্য পরিজনবর্গ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। মানসিংহ প্রতাপের আজীবন সহচর, বিশ্বস্ত বন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তীকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন যে, তিনি আর কখনও বাদসাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না। শঙ্করও এই প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া স্বেচ্ছায় সর্বস্বান্ত হইয়া গঙ্গাবাস উপলক্ষে বারাসত গ্রামে সপুত্র বসতি করেন।

কচু রায় বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে জমিদারি এবং যশোহরজিৎ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতী পুনরায় স্বামীর সঙ্গে মিলিত হন। বিন্দুমতীর গর্ভে রামচন্দ্রের কীর্তিনারায়ণ নামে এক মহাবল পুত্র জন্মে। প্রতাপ-দৌহিত্র কীর্তিনারায়ণ

নৌযুদ্ধে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করেন। তিনি মেঘনা নদীর উপকূলে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া পর্টুগীজ দস্যুদিগকে উক্ত প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ঢাকা-নগরীর মোগল শাসনকর্তা কীর্তিনারায়ণের বীর্যমত্তায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন।

প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের পরিশিষ্ট ভাগে লিখিত আছে, "বসন্ত রায়ের মৃত্যুর সময় রমানাথ নামক তাঁহার এক পুত্র পূর্বদেশে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। কচু রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পর তিনি যশোহরে আগমন করিলে, পৈতৃক বিষয়, রাজা উপাধি, এমন কি গুরু-পুরোহিত অবধি প্রাপ্ত হন নাই। রমানাথ যশোহর ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ ফতুল্লাপুর গ্রামে নন্দকিশোর চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করেন। ইঁহার সন্ততিগণ পরে পুঁড়াগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামভদ্র বসু মহাশয়ের যত্নে পুঁড়াগ্রামে বাস করেন। রমানাথের সন্ততিগণ এখনও পুঁড়া, ঘোড়গাছি প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কচু রায় নিঃসন্তান ছিলেন। উদয়াদিত্য ব্যতীত প্রতাপের মুকুটমণি বলিয়া এক পুত্র জন্মে। রাজকুমার মুকুটমণির সম্বন্ধে কোন বিবরণ জানিবার উপায় নাই।"

প্রতাপের জন্ম বা মৃত্যুর কোন সময় নিরূপিত হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে প্রতাপ ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে বা ১০১৫ হিজরীতে সংসারলীলা সম্বরণ করেন। সম্ভবত ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। ১

প্রচলিত কিম্বদন্তী ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক বঙ্গ-ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা প্রতাপের জীবনের সমস্ত ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়াছি। প্রতাপ বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার সম্বন্ধে সমকালীন মুসলমান লিখিত ইতিহাসে, এমন কি আইন-ই-আকবরীতেও কোন কথা নাই। ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত ও শাস্ত্রী মহাশয়ের ও নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে যাহা আছে, তদপেক্ষা আরও কিছু বেশী জানিবার চেষ্টা করিয়া আমরা তৎকালীন দুর্লভ ইতিহাস ও অন্যান্য লিখিত কাহিনী হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পাঠক বর্গকে জানাইয়া প্রতাপাদিত্য-প্রস্তাব শেষ করিব। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি হইতে প্রতাপাদিত্য, ইশা খাঁ ও বসন্ত রায় সম্বন্ধে পাঠক অনেক কথা জানিতে পারিবেন। এগুলি পরিত্যাগ করিলে প্রতাপ-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। হয়ত এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি সাধারণ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু ইতিহাস-ভক্ত পাঠক ইহাতে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবেন।

বঙ্গে দ্বাদশ ভৌমিকের আবির্ভাব সময়ে কয়েক জন পর্টুগীজ মিশনারী সেই সুদূর ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে আসেন। তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে চণ্ডী খাঁ (যশোহর) শ্রীপুর ও বাকলা প্রভৃতি স্থানের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

দুঃখের বিষয়, সমসাময়িক কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখকই প্রতাপ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। আকবর-নামায় 'প্রতাপবেজেরা' বলিয়া একটি নাম পাওয়া যায়। এই প্রতাপ মোগল সুবাদার খাঁ-জাহানের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তায় খাঁ-জাহান ভাটীর জমিদার ইশা খাঁকে পরাজিত করেন। এই 'ভাটী' সম্ভবত চট্টগ্রাম প্রদেশ। ইশা খাঁ অবশ্য খিজিরপুরের ইশা খাঁ মসনদী, কিন্তু 'প্রতাপ বেজেরাই' কি প্রতাপাদিত্য? ইহার বিশেষ প্রমাণ কই? চাঁচরা (যশোহর) রাজবংশের ইতিহাসেও প্রতাপের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইতিবৃত্তের এক স্থানে লিখিত আছে, "তাঁহাদের পূর্ব পুরুষ ভবেশ্বর, চারিটি পরগনা (অর্থাৎ আমিদপুর, মুড়াগাছা, মল্লিকপুর ও সৈয়দপুর) বাদসাহের নিকট প্রাপ্ত হন। এইগুলি প্রতাপাদিত্যের সম্পত্তি।

১. প্রতাপাদিত্য-চরিত্রের লেখকের মতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুকাল ১৬০৬ খ্রী.। গ্রন্থকারের মতে "সম্ভবতঃ ১৫৬৮ খ্রী. অব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁহার জন্ম হয়।" যশোহর-খুলনার ইতিহাস গ্রন্থের লেখক সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে "১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার অব্যবহিত পরে" প্রতাপের জন্ম (পৃ. ৬০)। মৃত্যু ১৬১০—১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে (পৃ. ৩৯৯)।

আইন-ই-আকবরী হইতে জানা যায়, জেসার (যশোহর) সাধারণত রসুলপুর বলিয়া পরিচিত হইত। এই রসুলপুর সরকার খালিফাতাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই মহলের রাজস্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতিবৎসরে ১৭২৩০৫০ দাম (৪৩০৯৬৮ টাকা) এই সরকার হইতে মোগলবাদসাহ রাজকররূপে প্রাপ্ত হইতেন।

১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা দেখিতে পাই, মহারাজ মানসিংহ বিদ্রোহী পাঠান জায়গীরদারদিগকে অনুগত করিবার জন্য এই খালিফাতাবাদ পরগনা জায়গীর রূপে তাঁহাদের দান করেন। এই জায়গীর-গৃহীতাগণের নাম—খাজা সুলেমান, খাজা বাকির এবং ওসমান। মানসিংহ মনে ভাবিয়াছিলেন, পাঠান জায়গীরদারেরা এই নূতন জায়গীর পাইয়া উড়িষ্যা ত্যাগ করিবে, বিদ্রোহাচরণ হইতে ক্ষান্ত থাকিবে, এবং ইহাদের সহায়তাবলেই বিদ্রোহী ভুঁইয়াগণও দমন হইবে। কিন্তু মানসিংহ পরে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। এই দুর্ধর্ষ পাঠানগণ, পরিশেষে ইশা খাঁ প্রভৃতি বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণের সহিত মিশিয়া তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতে[১] আবুল ফজল, ইশা খাঁর নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে 'মার্জবান্-ই-ভাটী' (নিম্নভূমি প্রদেশাধিপতি) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবুল ফজল প্রদত্ত এই সংজ্ঞা হইতে প্রমাণ হইতেছে ইশা খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সমুদ্র-তটস্থ নিম্নভূমিময় (ভাটী) প্রদেশসমূহের অধিপতি ছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, কয়েকজন পর্টুগীজ মিশনারী সেই সুদূরবর্তী অতীত কালে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাল্‌ফ্ ফিচের নাম ইতিহাস পাঠকের নিকট পরিচিত। কিন্তু এই ফিচ্ ব্যতীত আরও কয়েকজনের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা পূর্ববঙ্গের তৎকালীন অবস্থা জানিতে পারি। এই সমস্ত পর্টুগীজ-লেখকগণ সমসাময়িক ঘটনার যে চিত্রাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে সেই অতীত যুগের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

পর্টুগীজ জ্যারিক এই দ্বাদশ-ভৌমিকদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপের রাজত্বকালে দুইজন জেসুইট মিশনারী বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। জ্যারিক একস্থানে লিখিতেছেন, "এই সমস্ত ভুঁইয়াগণ কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না। মোগল বাদসাহকে তাঁহারা রাজকর দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রচুর সেনা সামন্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত রাজার ন্যায় দেশ-শাসন করিতেন, কিন্তু 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন নাই। 'ভুঁইয়া' বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইহাদের মধ্যে তিনজন হিন্দু। অপরেরা মুসলমান।[২]

ইহার পর ডি এভিটি নামক একজন পর্টুগীজ বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকদের শক্তি-সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডি এভিটির লিখিত বৃত্তান্ত ১৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে, প্যারি-নগরীতে প্রথম মুদ্রিত হয়। ডি এভিটি জ্যারিকের কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, তবে তিনি ইশা খাঁ মসনদীকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ডি এভিটি বলেন, "শ্রীপুর ও চণ্ডী খাঁর রাজাগণ প্রতাপশালী বটেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে, "মাসন্দলিন" (ইশা খাঁ মসনদী) সর্বাপেক্ষা

১. Ain-i-Akbari, Blochmann 1.341:2.—*Westland's Report*, p. 45.

২. They obeyed no one, paid no tribute and though they displayed a royal splendour, did not call themselves Kings but Boiones. Three of these chiefs, observed the religion of the country, viz—Chandicani as Siripuranuset Bakalamis (চণ্ডীখান—শ্রীপুর ও বাকলা) and remaining nine were Mehomedans. এই চণ্ডীখানই যশোহর। কিন্তু জ্যারিক বোধ হয়, দ্বাদশ-ভৌমিকের তিনজনকে হিন্দু ও অপর সকলকে মুসলমান বলিয়া একটা ভ্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—মিশনারীরা যশোহর, বাকলা ও বিক্রমপুরের সহিত যতটা মেশামেশি করিয়াছিলেন, অপর সকলের সহিত সেরূপ ভাবে মিশিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা এই তিন প্রদেশাধিপের সম্বন্ধে কোন রূপ ভ্রম করেন নাই। যাহাই হউক না কেন জ্যারিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই আমরা যশোহর, বিক্রম-পুর ও বাকলা (চন্দ্রদ্বীপ) সম্বন্ধে অতি পরিস্ফুট বিবরণ পাইতেছি।

প্রতাপাদিত্য কার্ভালোকে[১] কেন হত্যা করিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণ হয়।[২] কার্ভালো বিক্রমপুরাধিপতি রাজা কেদার রায়ের নৌ-সেনাপতি। এই কার্ভালো প্রতাপের নৌ-সেনাপতি রডার অপেক্ষাও ক্ষমতাবান। কার্ভালোর নাম শুনিলে লোকে ভয়ে কাঁপিত। সন্দ্বীপ কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত ছিল। মোগলেরা তাহা দখল করিলে কেদার রায় কার্ভালোকে ইহা পুনরুদ্ধারের জন্য নিযুক্ত করেন। কার্ভালো অসীম বীরত্ব প্রকাশের পর মোগলদের হাত হইতে সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া লয়েন।

এই সময়ে মেংরাজজী আরাকানের অধিপতি। তিনি সেলিম-শা উপাধি গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম পর্যন্ত দেশসমূহ তাঁহার অধিকারে ছিল। পর্টুগীজদিগের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত। তাহাদের দমনের জন্য তিনি বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কার্ভালো সন্দ্বীপ অধিকার করিয়াছে শুনিয়া তিনি দেড়শত সজ্জিত রণতরী ও কামান সন্দ্বীপ দখলের জন্য পাঠান। কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট সেই সংবাদ পাঠাইলে কেদার রায় তাহার সাহায্যের জন্য একশত খানি কামান ও বন্দুক-সজ্জিত 'কোষ' শ্রীপুর হইতে প্রেরণ করেন। একদিকে বাঙ্গালী, পর্টুগীজ ও অপরদিকে মগ। কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট সাহায্য পাইয়া বিপুল বিক্রমে সেলিম শার রণতরী সমূহ আক্রমণ করেন। মগরাজ এইযুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তাঁহার সমস্ত রণতরীগুলি কার্ভালোর হস্তগত হয়। কার্ভালোর এই অসীম বীরত্বের ফলে সন্দ্বীপ কেদার রায়ের দখলেই রহিল।

এই সন্দ্বীপ লইয়া আরাকান রাজের সহিত কেদার রায়ের ক্রমাগত বিবাদ চলিতে লাগিল। এই সময়ে মানসিংহ মন্দা রায়কে কেদার রায়ের রাজ্যাক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া রাজা কেদার রায় আবার প্রচুর সেনা-সমেত কার্ভালোকে মোগল-সৈন্যগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগলসেনা কার্ভালোর বীর বিক্রমে সন্ত্রস্ত ও ভীত হইয়া, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে।

এই যুদ্ধের পর কার্ভালো প্রতাপের রাজধানী চণ্ডীখানে উপস্থিত হন। প্রতাপের আহ্বানেই কার্ভালো তাঁহার রাজধানীতে যান। তাঁহার নৌ-সেনাপতি রডার অপেক্ষা আর কেহ যে সমধিক প্রতাপশালী হয়, ইহা প্রতাপের ইচ্ছা নহে। বিশেষত এই কার্ভালোর সহায়তায় কেদার রায় যে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া পরিচিত হইবেন, ইহাও তাঁহার সহ্য হইল না। মগরাজ সেলিম শাও এই কার্ভালোর সর্বনাশের জন্য মহাব্যস্ত। প্রতাপের সহিত মগরাজের এ সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্তা পূর্বেই স্থির হইয়াছিল। কার্ভালোকে নিজের রাজধানীতে পাইয়া প্রতাপ তাহাকে ঘাতকদ্বারা গুপ্তভাবে নিহত করান। কার্ভালো যখন যশোহরে আসেন তখন তাঁহার সঙ্গে উক্ত পর্টুগীজ পুরোহিতদ্বয়ও আসিয়াছিলেন। কার্ভালোকে হত্যা করিয়া প্রতাপ নিজের ও মগরাজের চিত্ত তুষ্টি করিলেন।

এখন দেখা যাউক যশোহরের নাম 'চণ্ডীখান' হইল কিরূপে? আর এই চণ্ডীখানের অবস্থান স্থান কোথায়? আমরা যতদূর বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, চণ্ডীখানই প্রতাপের ধূমঘাট। আজকালকার কালীগঞ্জের নিকট সেকালের এই ধূমঘাট দুর্গ ও রাজধানী ছিল। পর্টুগীজ লেখকেরা বলেন, এই চণ্ডীখান নাম 'চাঁদখান' এই শব্দের বিকারমাত্র। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য হইতে জানিতে পারা যায়, প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য যে সময়ে গৌড়ের-

১. কার্ভালো—Domingo Carvalho

২. After Fernandez had been killed at Chittagong in 1602 the Jesuit priests went to Sondip and they soon left it and went with Carvalho the Portuguese Commander to Chandecan. The King of Chandecan promised to befriend them, but in fact, he was determined to kill Carvalho and thereby make friends with the king of Arakan, who was then very powerful and had already taken possession of the kingdom of Bakla. The king therefore sent for Carvalho to 'Josor' and there had him murdered.
—Du Jarric.

সম্রাট দায়ুদের নিকট হইতে যশোহর সাম্রাজ্যের সনন্দ প্রাপ্ত হন, তখন ইহা চাঁদখানের বা 'চাঁদখাঁর' জমিদারি-ভুক্ত ছিল। চাঁদখাঁর সন্তানাদি ছিল না এবং তিনিও তখন মৃত। কাজেই প্রার্থনামাত্রেই গৌড়েশ্বর দায়ুদ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী বিক্রমাদিত্যকে এই জমিদারির সনন্দ দেন। বেভারিজ সাহেব বলেন, যশোহর প্রদেশ পূর্বে খাঞ্জা আলি (খাঁজাহান) নামক এক জন সুবেদারের দখলে ছিল। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে খাঞ্জা আলির মৃত্যু হয়। ইহার ১২০ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য যশোহরে নগর স্থাপন করেন। খাঞ্জা আলির যিনি উত্তরাধিকারী ছিলেন খুব সম্ভবত তাঁহার নাম চাঁদখান, আর তাঁহার অধীনস্থ জমিদারি তাঁহার নামানুসারেই সাধারণে পরিচিত ছিল। বিক্রমাদিত্য জমিদারি দখল লইবার পরও হয়ত উহা 'চাঁদখানের জমিদারি' এই সংজ্ঞায় তখনও অভিহিত হইত। এই চাঁদখাঁ হইতে সম্ভবত 'চণ্ডীখান' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। বিদেশীয় পর্টুগীজ লেখকগণ এই চাঁদখানকেই Chandecan বা Ciandecan বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১]

আমরা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক লেখকগণের ইতিবৃত্ত হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তিনশত বৎসরের পূর্বে, সেই ঘটনাসঙ্কুল সময়ের কোন ইতিহাসই নাই। যদি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও রামরাম বসুর ও শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতাপাদিত্য না থাকিত, তাহা হইলে প্রতাপের স্মৃতি এতদিন বঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যপরিবর্তন কিরূপে হয়, কিজন্য গৌড়-সম্রাট দায়ুদ, তাঁহার উপর এত অনুরক্ত হন, সে সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী মুসলমান ইতিহাস-লেখকরা বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দায়ুদের শ্রীধর (শ্রীহরি) বলিয়া একজন উচ্চপদস্থ বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিলেন। দায়ুদের প্রধান সচিব আমির-উল-উমরা লোদী খাঁ। আর ইউসফ্ গৌড়েশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইউসফ্ লোদী খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দায়ুদ ইউসফ্‌কে গোপনে হত্যা করেন। লোদী খাঁ এই বিপত্তিতে গৌড় ত্যাগ করিয়া জৌনপুরের মোগল-শাসনকর্তা, মুনাইম খাঁর আশ্রয় লয়েন। কিন্তু সেখানে সুবিধা না হওয়ায় ও তাঁহার বন্ধুগণ শ্রীহরি, জালাল খাঁ ও কালাপাহাড় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া লোদী খাঁ সাহাবাদের রোটাসগড়ে আশ্রয় লয়েন।

দায়ুদ খাঁ নানাবিধ কৌশলাবলম্বনে লোদী খাঁকে গৌড়ে আনয়ন করিয়া বন্দী করেন। বন্দীর রক্ষার ভার তাঁহার প্রধান অমাত্য শ্রীহরির উপর দেন। শ্রীহরি ও কতলু খাঁর পরামর্শে দায়ুদ পরাক্রান্ত লোদী খাঁকে হত্যা করিয়া নিষ্কন্টক হন। ইহার পর শ্রীহরি[২] বিক্রমজিৎ (বিক্রমাদিত্য) উপাধি ও যশোহরের জমিদারি প্রাপ্ত হন।

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একজন ইংরাজ লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্মানুবাদ আমরা নিম্নে দিতেছি। তিনি বলেন, "প্রতাপাদিত্য প্রথম প্রথম ক্রমশ উন্নতির স্তরে উঠিতেছিলেন। তাঁহার সময়ে যশোহর বহু হর্ম্যমালায় বিভূষিত হয়। নানাস্থানে জঙ্গল কাটাইয়া তিনি পথঘাট নির্মাণ করিয়া দেন। দীর্ঘিকা-খনন, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা—দেবমন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণ ইত্যাদি প্রজাহিতকর অনেক কার্য তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। দিন দিন তাঁহার রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্তী রাজাদের রাজ্য তিনি বাহুবলে করায়ত্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি তাঁহার পার্শ্ববর্তী সমস্ত ভূভাগের একচ্ছত্র অধীশ্বরত্ব লাভ করিলেন। এমন কি, দিল্লীর বাদসাহকেও অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিলেন। এইরূপ

১. Were the Sunderbans inhabited in ancient times ?—*J.A.S.B.* Vol. XLV.

২. Akbarnama, Elliot's *History of India* VI 41.—অনুবাদে শ্রীহরির নাম Sayid Hari (সৈয়দ হরি) লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিকে 'শ্রীধর বাঙ্গালী' বলিয়া মুসলমান গ্রন্থকারগণ একটু গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতিরিক্ত সাফল্যে প্রতাপ অতিশয় গর্বিত ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার প্রজাদের সামান্য অপরাধের জন্য ভীষণ দণ্ড দিতে লাগিলেন। অতি তুচ্ছ অপরাধের জন্য অপরাধীর শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিতে লাগিলেন। এই কারণেই তাঁহার রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন।"

প্রতাপ যখন যশোহরে যশোহরেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন দেবী তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ দিয়া বলেন, "যতদিন না তুমি আমাকে চলিয়া যাইতে বলিবে ততদিন আমি তোমায় ত্যাগ করিব না।" প্রতাপ যখন প্রজা-নিগ্রহে ব্যস্ত, সেই সময়ে যশোহরেশ্বরী তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন। তিনি তাঁহার নিকট চিরবিদায় লইবার জন্য তাঁহার কন্যামূর্তি ধারণ করিয়া প্রকাশ্য দরবার মধ্যে উপস্থিত হন।[১]

প্রতাপ একদিন রাজসভায় বিচারাসনে উপবিষ্ট। এক মেথরাণী তাঁহার সম্মুখে রাজ-বাড়ীর উঠান ঝাঁট দিয়াছিল, এজন্য প্রতাপ তাহার এ ধৃষ্টতার জন্য বড় রুষ্ট হইয়া তাহার স্তনদ্বয় কর্তন করিয়া দিবার আদেশ দেন। প্রতাপ যখন এই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেছেন সেই সময়ে যশোহরেশ্বরী তাহার কন্যার মূর্তি ধরিয়া রাজ-সভামধ্যে উপস্থিত হন। প্রকাশ্য রাজসভায় কন্যাকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া প্রতাপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি তখনই কন্যাকে বলেন, "যা—যা—এখান হইতে এখনই চলিয়া যা। আর তোর মুখ দেখিব না। এ পুরীর মধ্যেও তোর স্থান নাই।" এই সময়ে দেবী নিজমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রতাপকে বলেন, "তুমি যখন আমায় তাড়াইয়া দিয়াছ তখন আর আমি এখানে থাকিব না। আমি চলিলাম।"

মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া, জীবিতাবস্থায় দিল্লীতে বাদসাহের নিকট লইয়া যাইবার সংকল্প করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, তিনি প্রতাপকে সিংহের মত এক পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। দিল্লীতে আরও অধিক লাঞ্ছনা ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রতাপাদিত্য গরলগর্ভ অঙ্গুরীয় লেহনে পথিমধ্যে কাশীতে আত্মহত্যা করেন।

যশোহরে মোগল-পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানসিংহ এইরূপে প্রতাপাদিত্যের ধ্বংস-সাধন করিলেন। ভবানন্দ বহু চেষ্টায় যে রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিনাশ প্রতাপের পতনের সঙ্গেই সূচিত হইল।

প্রতাপের সমসাময়িক আর যে দুই জন ভৌমিক সেই সময়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিলেন এইবার তাঁহাদের কথা বলিব।

বাঙ্গালার দ্বাদশ-ভৌমিকগণের মধ্যে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য ও বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদ রায় ও কেদার রায় নামক দুই ভ্রাতাই বিশেষ গণনীয়। প্রতাপ স্বল্প দিবসব্যাপী যুদ্ধের পর মানসিংহ কর্তৃক পরাজিত ও অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্য পক্ষে কেদার রায় মানসিংহকে শ্রীপুর জয়ে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্যের জীবনী-কথা এক্ষণে তিন চারি খানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়া তাঁহার নাম সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে আছে—

যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।

১. For a time, says tradition, Pratapaditya, prospered exceedingly. He adorned his kingdom with noble buildings, made roads, built temples, dug tanks and wells and in fact, did everything that a sovereign could do for the welfare of his subjects. The limit of his kingdom quickly extended, for he made war on his neighbours and came off victorious in every battle, till all the surrounding country acknowledged his rule. Ultimately he declared himself independent of the Emperor of Delhi and so great was his power that he managed to defeat one after another the generals sent against him. He was a favourite to goddess Jessoreswari, for her favour was at last withdrawn for Pratapaditya swollen with pride, became very tyrannical with his subjects, beheading them for the least offence.—*Bengal Gazeteer*, p. 26.

নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বর পুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বাহান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

প্রতাপাদিত্যের বংশবৃক্ষ

বিরাট গুহ—১
রামচন্দ্র—১২
ভবানন্দ — শিবানন্দ — গুণানন্দ
ভবানন্দ → বিক্রমাদিত্য (শ্রীহরি) → মহারাজ প্রতাপাদিত্য
গুণানন্দ → জানকীবল্লভ (বসন্ত রায়) → রাঘবাদি পুত্র
মহারাজ প্রতাপাদিত্য → উদয়াদিত্য, মুকুটমণি, বিন্দুমতি—রামচন্দ্র
মুকুটমণি → রামেশ্বর → গৌরচরণ (ভুলুয়াতে বাস করিতেন)
বিন্দুমতি—রামচন্দ্র → কীর্তিনারায়ণ (দৌহিত্র)

শঙ্কর চক্রবর্তীর বংশবৃক্ষ

দক্ষ ১
গোপাল ১৭
শঙ্কর চক্রবর্তী — শিব — নারায়ণ — গোবিন্দ — কন্দর্প — দুর্গাদাস
শঙ্কর চক্রবর্তী → রাম ভট্টাচার্য → কাশীশ্বর ন্যায়ালঙ্কার → নীলকণ্ঠ (দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন)
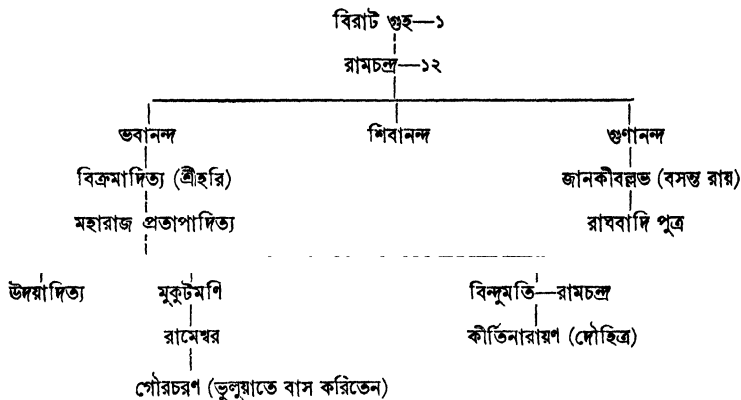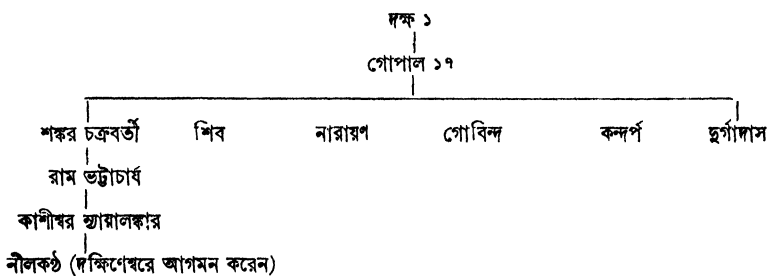
কিন্তু বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের কাহিনী এখনও সম্পূর্ণভাবে সাধারণের নিকট প্রচলিত হয় নাই। তাঁহার জীবনের ঘটনা অবলম্বনে এ পর্যন্ত কোন কাব্যাদি রচিত হয় নাই। মাত্র একখানি ঐতিহাসিক নাটকে তাঁহাদের কীর্তি-কথা বিবৃত হইয়াছে। এইজন্য বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা চাঁদ রায় ও কেদার রায় সম্বন্ধে দুই চারি কথা সংক্ষেপে বলিব।

পূর্ব বাঙ্গালায় বিক্রমপুর প্রদেশের অধিপতি এই চাঁদ রায় ও কেদার রায়। শ্রীপুর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। প্রসিদ্ধ পর্টুগীজ ভ্রমণকারী ফার্ণাণ্ডেজ সাহেব, ষোড়শ শতাব্দীতে, প্রতাপের যশোহর ও চাঁদ রায়ের শ্রীপুরের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে প্রমাণ হয় শ্রীপুর রাজধানী অতি ঐশ্বর্যময়ী অবস্থায় ছিল। ফার্ণাণ্ডেজ আরাকান, শ্রীপুর (চণ্ডীপুর), চণ্ডীখাঁ (যশোহর) এই তিনটি রাজ্যকে প্রধান বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, "মোগলদের প্রবল

পরাক্রম সত্ত্বেও ঐ দুই প্রদেশাধিপতিগণ যথেষ্ট প্রভুত্ব উপভোগ করিতেন। বিশেষত চণ্ডীখান ও শ্রীপুরাধিপতিরা মোগল-অধীনতা সত্ত্বেও স্ব স্ব রাজ্যে সর্বময়কর্তা ছিলেন।[১]

শ্রীপুর গগনস্পর্শী অতুল্য হর্ম্যমালায় সুশোভিত ছিল। রায়-রাজগণ বহু যত্নে ও চেষ্টায় শ্রীপুরে সমাজগঠন ও নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায় সেই সময়ে বিক্রমপুর-সমাজের অধিপতি ছিলেন। আর এই সামাজিক আধিপত্য জন্যই তাঁহাদের অন্নভোজী আশ্রিত কর্মচারী, শ্রীমন্তের কূটনীতি-কৌশলে তাঁহাদের অধঃপতনও ঘটিয়া ছিল। যথাস্থানে আমরা এ বিষয় বর্ণন করিব।

বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকগণ ব্যক্তিগত প্রাধান্য রক্ষার জন্য চেষ্টা না করিয়া যদি একযোগে কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মহারাজ মানসিংহ কর্তৃক বঙ্গদেশ পরাজয় সুদূর পরাহত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং সেই জন্যই তাঁহাদের অধঃপতন হয়। দ্বাদশ-ভৌমিকদের অগ্রণী মহারাজ প্রতাপাদিত্য ভবানন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্য হারাইয়া মোগল সেনাপতির হস্তে বন্দী হন। আবার অন্য পক্ষে কেদার রায় তাঁহার অধীনস্থ শ্রীমন্ত চৌধুরী নামক জনৈক কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় মানসিংহের নিয়োজিত গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হন। এই শ্রীমন্তই রাজা কেদার রায়ের ও বিক্রমপুর রাজ্যের অধঃপতনের কারণ।[২]

১. *Early Travels in India*, Fernandez. p. 3 and 11.

২. কেহ কেহ চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে, পিতা-পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আবার আজকাল এ সম্বন্ধে মত পরিবর্তন হইয়াছে। বর্তমানে দুই-একজন স্থানীয় ঐতিহাসিক চাঁদ রায় ও কেদার রায়কে 'সহোদর-ভ্রাতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজবাড়ীর যে স্মৃতি স্তম্ভটি, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ফলডার কর্তৃক নবসংস্কৃত হয়, তাহাতে 'দুই ভ্রাতা' এই কথাই উল্লেখ আছে। আমরা আধুনিক মতই অবলম্বন করিলাম। নিম্নে এতৎ-সম্বন্ধীয় একখানি পত্রও প্রকাশ করিলাম। চাঁদ রায় ও কেদার রায়, এই দুজনের মধ্যে সম্বন্ধ লইয়া, বর্তমান বঙ্গ-সাহিত্যে অল্প বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুই ভাই ছিলেন, বিদ্যমান কালে এই মতই পরিগ্রাহ্য। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু দীনেশ বাবু এ সম্বন্ধে প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ও রামানন্দ বাবু যাহা আমাকে পাঠান, তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে দিতেছি। ইহা হইতে নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ হয় তাঁহারা দুই ভ্রাতাই ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়!

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'জ্যোতি-নির্ব্বাণ' নামক যে উপন্যাসটির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কেদার রায়কে, চাঁদ রায়ের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সম্বন্ধে আমাদের একটু সন্দেহ আছে। আশা করি, হরিসাধন বাবু আমাদের সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া বাধিত করিবেন।

পদ্মার উত্তর পারে রাজবাড়ী নামক যে গ্রামটি বর্তমান আছে, সেই গ্রামে একটি অতি প্রাচীন ও অতি উচ্চ মঠ বর্তমান থাকিয়া এখনও চাঁদ রায়ের অতুল কীর্তির পরিচয় দিতেছে। ঐ মঠের গাত্রে একটি শ্বেত-প্রস্তরফলকে ইংরাজিতে যে কয়টি কথা খোদিত আছে, তাহা পাঠ করিলে হরিসাধন বাবুর লিখিত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে বড়ই খটকা লাগিয়া যায়। আমরা নিম্নে ঐ প্রস্তর-ফলকের লেখার অবিকল নকল দিতেছি—

"This Structure being an ancient and sacred Hindu Monument and a valuable Landmark for the District, erected by Chand Roy and Kedar Roy, over the Funeral Pyre of their Mother, in the Sixteenth Century, was repaired in 1896 at the cost of Raja Srinath Ray of Bhagyakul by Sasi Bhuson Mitter, District Engineer, under the orders of C. J. S. Faulder Esqr, I.C.S. Collecter of Dacca."

পরিশেষে 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয়ের নিকট, আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, পদ্মা যেরূপ দ্রুত-গতিতে উক্ত মঠের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় চাঁদ রায়ের যে কীর্তি এতকাল বর্তমান থাকিয়া তাঁহার নাম ঘোষিত করিতেছিল, তাহা বা দুই এক মাসের মধ্যেই পদ্মা-গর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় 'সচিত্র প্রবাসীতে' যদি ইহার একটি ছবি তুলিয়া রাখেন, তবে একটি স্থায়ী চিহ্ন থাকিয়া যায়। এই বিষয়ে তাঁহাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। ইতি—বিনীত নিবেদক,

শ্রীদীনেশচরণ বসু।

একটি সামান্য সামাজিক বিষয় লইয়া কেদার রায়ের সহিত তাঁহার অমাত্য শ্রীমন্তের মনোবাদ উপস্থিত হয়। শ্রীমন্ত শ্রোত্রীয়-শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সমাজ-বন্ধনের মুখে রাজা কেদার রায় শ্রীমন্তকে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রদান না করিয়া কোটিশ্বরের দেবল-ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠীপতিত্ব প্রদান করেন। শ্রীমন্ত এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিকূলতা করিয়াও সিদ্ধকাম হইতে পারিল না। শ্রীমন্তের বিচারে দেবল-ব্রাহ্মণগণ হীন-ভাবাপন্ন। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদে কোন ফল হইল না দেখিয়া শ্রীমন্ত রায়-রাজগণের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইল। কি প্রকারে তাঁহাদিগকে রাজশ্রী-হীন করিবে, কি প্রকারে তাঁহাদের ধ্বংস সাধন করিবে, দারুণ মনস্তাপে অধীর হইয়া শ্রীমন্ত সেই চেষ্টাই করিতে লাগিল এবং এজন্য তাহাকে অধিকদিন সুযোগ অপেক্ষা করিতে হইল না। বিধাতা শীঘ্রই এক উপযুক্ত অবসর ঘটাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালার দ্বাদশ-ভৌমিকগণের মধ্যে চট্টগ্রামাধিপতি নবাব ইশা খাঁ মসনদী একজন গণনীয় ব্যক্তি ছিলেন। ইশা খাঁর পিতা কালিদাস হিন্দু ছিলেন পরে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ইশা খাঁর রাজধানী চট্টগ্রামের অন্তর্বর্তী খিজিরপুর।[১] দ্বাদশ-ভৌমিকদের বিদ্রোহ সময়ে ইশা খাঁর নাম যে জাহির হয় নাই তাহার প্রধান কারণ এই, তিনি ইতিপূর্বেই আকবর সাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ঘটনাটি এই, ইতিপূর্বে মানসিংহ যখন ইশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ইশা খাঁ বীর-বিক্রমে মানসিংহের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায় ইশা খাঁ মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহবান করেন। এই যুদ্ধে মানসিংহের তরবারি ভঙ্গ হয়। ইশা খাঁ ইচ্ছা করিলেই অস্ত্রহীন মানসিংহকে হত্যা করিতে পারিতেন। কিন্তু—তিনি প্রাণের উদারতাবশে তাহা না করিয়া মানসিংহকে একখানি নূতন তরবারি প্রদান করেন এবং পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহবান করেন। মানসিংহও ইশা খাঁর হৃদয়ের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া তাঁহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। মানসিংহ ইশা খাঁকে আগরায় লইয়া গিয়া আকবর সাহের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। বাদসাহ ইশা খাঁর গুণাবলীর ও মহত্ত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে শিরোপা, খেলাৎ ও চট্টগ্রাম প্রদেশের একাধিপত্য প্রদান করেন।

এই ইশা খাঁর সহিত বিক্রমপুরের রাজা চাঁদ রায়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ইশা খাঁ মধ্যে মধ্যে শ্রীপুরে আসিয়া চাঁদ রায়ের আতিথ্য-স্বীকার করিতেন। চাঁদ রায়ও বন্ধুর পদোপযুক্ত সমাদর করিয়া তাঁহার মর্যাদা রক্ষা করিতেন।

কিম্বদন্তী এই যে, নবাব ইশা খাঁ কোন এক সময়ে তাঁহার বন্ধু চাঁদ রায়ের আতিথ্য-স্বীকার করেন। এই সময়ে একদিন তিনি ঘটনাক্রমে চাঁদ রায়ের পরম রূপবতী বিধবাকন্যা সোণামণিকে দেখিতে পান। সেই দেবদুর্লভ অনিন্দ্যরূপরাশি মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার মহত্ত্বময় হৃদয় অধিকার করিল। দুর্দমনীয় রিপুর তাড়নায় তিনি প্রাণের স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্ব হারাইলেন। সোণামণির লোকলোচন-দুর্লভ অতুলনীয় রূপরাশি, আর তাহাকে পাইবার আকাঙ্খা, ইশা খাঁর হৃদয়ের স্বাভাবিক উদারতার বিলোপ করিয়া ঘোর নীচতা আনিয়া দিল। প্রাণের মধ্যে সোণামণির রূপের ছবি আঁকিয়া লইয়া ইশা খাঁ নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু সহস্র কার্যের মধ্যেও তিনি সেই অতুলনীয় রূপসী সোণাকে ভুলিতে পারিলেন না। সেই লোক-ললামভূতা, সুন্দরীর রূপ-জ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া তিনি সোণামণির হস্ত প্রার্থনা করিয়া চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন।

১. খিজিরপুর—According to *Baharistan* it stood near the confluence of the river Dulai and the Lakhiya, commanding the only water-route to Dacca from this site. The centre of Musakhan's political authority was the strategic region south-east of modern Dacca where the Ganges (Padma), the Lakhya and the Brahmaputra (Meghna) formerly met.—***History of Bengal, Dacca University,*** **1948 p. 238.**

ইশা খাঁর এই নীচজনোচিত প্রার্থনায় চাঁদ রায় ও কেদার রায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দূতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন। ইহার পর কেদার রায় এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ইশা খাঁর কলাগাছিয়ার দুর্গ অবরোধ করেন। ইশা খাঁ আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার ত্রিবেণী দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কেদার রায় ত্রিবেণী-দুর্গ অবরোধ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। এই সব ব্যাপারে ইশা খাঁর চৈতন্যোদয় হইল। হিন্দুর নিকট কন্যা-প্রার্থনা করিয়া তিনি যে কি ভয়ানক কাজ করিয়াছেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন। তিনি যখন এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তায় ব্যস্ত সেই সময়ে অযাচিত ভাবে বিধাতা-প্রেরিত এক মহাসুযোগ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

এই সময়ে শ্রীমন্ত চৌধুরী চাঁদ রায়ের সহিত খিজিরপুরে অবস্থান করিতেছিল। দুষ্টবুদ্ধি শ্রীমন্তের মনের ভাব চিরদিনই একরূপ। 'বর্তমান যুদ্ধে রাজা কেদার রায় ইশা খাঁর নিকট পরাজিত হউন, রায়-রাজ্য বিক্রমপুর উৎসন্ন যাউক' সে মনে মনে এইরূপ ভাব পোষণ করিলেও মুখে বন্ধুত্বের ভাণ করিয়া চলিত। কুটিলমতি শ্রীমন্ত মনোভাব গোপনে এত চতুর ও সুকৌশলী ছিল যে, চাঁদ রায় তাহাকে একজন অন্তরঙ্গ হিতৈষী মিত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কেদার রায় যখন খিজিরপুর লুণ্ঠনে ব্যস্ত, সেই সময়ে অতি গোপনে এই প্রভুদ্রোহী শ্রীমন্ত ইশা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে। খাঁ-সাহেব তাহার মনোভাব অবগত হইয়া এই বিশ্বাস-ঘাতককে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, খোদা ইচ্ছা করিয়াই এই শ্রীমন্তকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

উভয়ের মধ্যে একটা গুপ্ত বন্দোবস্ত হইল। সেই বন্দোবস্তের জন্য অথবা পূর্বকার অপ-মানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই হউক, শ্রীমন্ত ইশা খাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিল, যে কোন উপায়েই সে চাঁদ রায় কন্যা পরমা সুন্দরী সোণামণিকে ইশা খাঁর অঙ্কশায়িনী করিবে। বলা বাহুল্য, প্রচুর পুরস্কার ও জমিদারি-লাভের লোভেই শ্রীমন্ত এই কুৎসিত কার্যে প্রবৃত্ত হইল।

চাঁদ রায় ও কেদার রায় উভয় ভ্রাতাই যখন ইশা খাঁর সহিত যুদ্ধব্যাপারে ব্যস্ত, শ্রীমন্ত সেই সময়ে শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিয়া প্রচার করিল, "রাজ ভ্রাতাদ্বয়, ইশা খাঁ কর্তৃক বন্দী হইয়াছেন। ইশা খাঁ অচিরাৎ শ্রীপুর আক্রমণ করিয়া সোণামণিকে লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে।" এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্রই রাজপুরীতে হাহাকার শব্দ উঠিল। কিরূপে শ্রীপুরে রাজধানী ও বিধবা রাজকন্যা সোণামণিকে রক্ষা করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে পরামর্শ চলিল। শ্রীমন্ত অবসর বুঝিয়া রাজ-পরিবারবর্গকে পলায়নের উপদেশ দিল। কিন্তু প্রধান-মন্ত্রী বৈদ্যবংশীয় রঘুনন্দন চৌধুরী শ্রীমন্তের এ পরামর্শ সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। তিনি প্রবল উৎসাহের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাণী রাজ্যরক্ষার জন্য যতটা ব্যস্ত না হউন, কন্যাকে রক্ষার জন্য বড়ই উতলা হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্তের পরামর্শই তাঁহার পক্ষে সমীচীন বলিয়া বোধ হইল।

চন্দ্রদ্বীপে সোণামণির শ্বশুরালয়। গুপ্ত পরামর্শে স্থির হইল, সোণামণিকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠানই উচিত। শ্রীমন্ত রাণীর অনুরোধে সোণাকে চন্দ্রদ্বীপে পৌঁছাইয়া দিবার ভারগ্রহণ করিল। রাজকন্যা সোণামণি শ্রীমন্তের রক্ষাধীনে চন্দ্রদ্বীপ যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন।

পাপিষ্ঠ শ্রীমন্ত ইতিপূর্বেই প্রচুর অর্থদানে মাঝিদের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝিরা সেই উপদেশ অনুসারে এবং প্রচুর অর্থের প্রলোভনে নৌকাখানি চন্দ্রদ্বীপের দিকে না চালাইয়া সুবর্ণগ্রামের দিকে চালাইল। শ্রীমন্তের পরামর্শ-ক্রমে সেই সময়ে এই সুবর্ণ-গ্রামেই ইশা খাঁ মসনদী অবস্থান করিতেছিলেন।

শ্রীমন্ত বিনা প্রতিযোগিতায় বিনা সন্দেহে, সুবর্ণগ্রামে নবাব ইশা খাঁর নিকট সোণা-মণিকে পৌঁছাইয়া দিল। এ ব্যাপার এত গুপ্তভাবে ও কৌশলের সহিত সমাধা হইল যে, চাঁদ রায় ও কেদার রায় ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিলেন না। যথাসময়ে এই ঘটনা সর্বপ্রথমে

চাঁদ রায়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি দারুণ মর্ম-যাতনায় ও ঘৃণায় যুদ্ধভার কেদার রায়ের উপর সমর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া কন্যা-শোকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন।

চাঁদ রায় রাজধানীতে পেঁৗছিয়া অমাত্য বন্ধু-বান্ধব কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। কেবল মাত্র অনশন-ব্রতাবলম্বন পূর্বক, কোটীশ্বরের মন্দিরে শয়ন করিয়া রহিলেন। প্রবাদ আছে, এই-অবস্থায় দুই দিবস অতীত হইবার পর তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে তোমাদের বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। ভবিষ্যৎ বিপদ এতদপেক্ষা আরও বেশী। তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হও।"

দেবীর এই প্রত্যাদেশ পাইয়া চাঁদ রায় মনে মনে ভাবিলেন, সোণামণিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও তিনি তাহাকে গৃহে স্থান দিতে পারিবেন না। সমাজে সোণার কোন স্থানই নাই। বিশেষতঃ মোগল-বাদসাহের সহিত যেরূপ বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে তাহাতে কখন কি হয় বলা যায় না। অতএব এই যুদ্ধ হইতে এখন বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। এই উদ্দেশ্য চালিত হইয়া তিনি রাজা কেদার রায়কে এই লোকক্ষয়কর যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে অনুমতি প্রদান করেন।

কেদার রায় এদিকে বীর-বিক্রমে ইশা খাঁর ত্রিবেণীদুর্গ পর্যন্ত অবরোধ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু চাঁদ রায়ের আদেশ প্রাপ্তিমাত্রই তিনি নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত শ্রীপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইশা খাঁ পরম রূপবান পুরুষ ছিলেন। বার ভুইয়াঁ প্রবন্ধ-লেখক আনন্দবাবু বলেন, "ইশা খাঁ সম্বন্ধে সোণামণির মনোগত ভাব কিরূপ ছিল, তাহা পরিগ্রহ করিবার কোন উপায়ই নাই। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী চরিত্র পর্যালোচনা করিলে ও ইশা খাঁর প্রতি তাঁহার অনুরাগের বিষয় ভাবিলে, মনে এই উপলব্ধি হয় যে, সোণামণি, ইশা খাঁকে প্রাপ্ত হইয়া অনুমাত্র অসুখী হন নাই। বরং তাঁহার জীবনের কতকগুলি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ইশা খাঁর আশ্রয়ই তাঁহার পক্ষে বিশেষ কার্যকারী হইয়াছিল।" হিন্দুরমণীর এইরূপ প্রবৃত্তি. জানি না, তৎকালীন বিক্রমপুর সমাজে কিরূপ ভাবে গৃহীত হইয়াছিল![1]

সোণামণি ইশা খাঁর করতলগত হইয়া সোণাবিবি ও বিবি আলি নেয়ামত নামে পরিচিতা হইলেন। ইশা খাঁ প্রথমে হুসেন সাহের দৌহিত্রী করিম ফতেয়া-খাতুনের পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু ইশা খাঁ তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে সোণাবিবিকেই সমধিক সম্মান করিতেন।

এদিকে চাঁদ রায় সোণামণির ব্যাপারে হৃদয়ের বল হারাইলেন। তাঁহার বংশগৌরবে ঘোরতর কালিমা নিক্ষিপ্ত হইল। গর্বিত সম্মান, পূর্ববঙ্গের সামাজিক-নেতৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অবনত হইল। চাঁদ রায় ভগ্নহৃদয়ে শয্যা আশ্রয় করিলেন। এই শয্যাই তাঁহার অন্তিমশয্যা! কোটীশ্বরের পদমূলে আশ্রয় পাইয়া তিনি সকল জ্বালাযন্ত্রণা হইতে এড়াইলেন। আর সেই বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খিজিরপুরে ইশা খাঁর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল।

কেদার রায় বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। এই সময়ে আকবর সাহের দেহ, সেকান্দ্রার অন্ধতমসাবৃত সমাধি-ক্ষেত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। সুলতান সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। এই সময়েই বঙ্গের ভূঁইয়াগণ প্রতাপাদিত্যকে অগ্রণী করিয়া, মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। মহারাজা মানসিংহ কি উপায়ে প্রতাপের ধ্বংস-সাধন করেন, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। প্রতাপের ধ্বংসের পর তখনও দুই জন ভূঁইয়া মোগল-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম ভূষণাধিপতি মুকুন্দ রায়, দ্বিতীয় বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়। মুকুন্দ রায়ের ভূষণা আক্রমণ করিয়া মানসিংহ অতি সহজেই

১. 'নব্যভারত' পত্রিকায় আনন্দবাবুর প্রবন্ধ।

তাঁহাকে বিধ্বস্ত ও করতলগত করেন। ইহার পর মানসিংহের দৃষ্টি শ্রীপুরের উপর পড়িল।

মানসিংহ সসৈন্যে শ্রীপুরের সন্নিহিত হইয়া রাজা কেদার রায়ের নিকট এক দূত-প্রেরণ করিলেন। এই দূতের হস্তে তরবারি ও শৃঙ্খল প্রদান করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, "যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তবে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য করা হইবে না। অন্যথা তরবারি গ্রহণ করিয়া যদি শত্রুভাব প্রকাশ করেন তাহা হইলে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করা হইবে।" এই সঙ্গে একখানি পত্রও প্রেরিত হয়। দূত মানসিংহ প্রেরিত তরবারি এবং ঐ লিপিখানি কেদার রায়ের হস্তে দিল।

কেদার রায় প্রথমে মানসিংহ প্রদত্ত লিপি পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী, কাক-কুলী চাকালী। হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি।
সকল পুরুষ মেতৎ, ভাগ যাও পালায়ী॥ বিষম সমর সিংহোমানসিংহঃ প্রয়াতি॥

কেদার রায় এই পত্র পাঠান্তে অসিগ্রহণ করিয়া দূতকে বলিলেন, "তোমার প্রভু মহারাজা মানসিংহকে বলিও, আমি তাঁহার প্রেরিত তরবারিই গ্রহণ করিলাম। তাঁহার যতদূর ক্ষমতা থাকে তাহা প্রয়োগ করিতে তিনি যেন কুন্ঠিত না হন। হয় তাঁহার অস্ত্রাঘাতে আমার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন হইবে নতুবা তৎপ্রদত্ত এই অসির আঘাতে তাঁহারই মস্তক দেহবিচ্যুত হইয়া এই যুদ্ধের অবসান হইবে।" কেদার রায় উক্ত পত্রাংশের উত্তরে, যে শ্লোকটি মানসিংহের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাও আমরা আনন্দবাবুর প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম। কেদার রায়ের উত্তর এই—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ-কুম্ভং। করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে।
বিভর্তি বেগং পবনাতিরেকং॥ তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

মানসিংহ কেদার রায়ের এই দম্ভ-সূচক লিপি পাইয়া সৈন্যগণকে শ্রীপুর রাজধানী আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। মোগল সৈন্য পঙ্গপালের মত শ্রীপুরের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল।

কেদার রায়ের গুরু গোঁসাই ভট্টাচার্য সহসা এই মহাবিপদ উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার শিষ্যকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কেদার রায় সে কথায় কোন কর্ণপাত না করিয়া গোঁসাই ঠাকুরকে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি এমন কোন দৈবানুষ্ঠান করুন, যাহাতে আমি যুদ্ধে জয়ী হই।" কেদার রায় ছিন্নমস্তা দেবীর উপাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব শিষ্যের মঙ্গলার্থে সমর-বিজয়-দায়িনী কালিকার মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তৎপূজায় প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রবাদ আছে, গোঁসাই ভট্টাচার্য বীরাচারী তান্ত্রিক ছিলেন। ইঁহারা বৈদিকাচারী বা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মত কোন পূজা-অর্চনাদি প্রায়ই অনাহারে অনুষ্ঠান করিতেন না। তন্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান দ্বারা ইষ্ট-দেবীকে অন্নব্যঞ্জনাদি উৎসর্গ করিয়া ঐ প্রসাদ গ্রহণান্তর গভীর নিশীথে পুনরায় দেবীর পূজার্চনাদি করিতেন। গোঁসাই ঠাকুর দিবসে আহার করিয়া রাত্রে দেবীর পূজা করিতে যাওয়ায় কেদার রায় উহাতে মনে মনে রুষ্ট হন। কিন্তু তিনি এ কার্যের প্রতিবাদ করিয়া গুরুদেবকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারেন না। এক দিন গুরু গোঁসাই ঠাকুর, মধ্য রাত্রে পূজা শেষ করিয়া নির্মাল্য লইবার জন্য কেদার রায়কে বার বার ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু পুনঃ পুনঃ আহবানে কেদার রায় উপস্থিত না হওয়ায় গুরুদেব মনে মনে ভাবিলেন, কেদার রায় তাঁহার অনুষ্ঠিত শক্তি-পূজার প্রণালী দেখিয়া নিশ্চয়ই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং এই জন্যই দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে আসিতেছেন না।

গোঁসাই-ঠাকুর কেদার রায়ের এই প্রকার ধৃষ্টতায় বড়ই অপমানিত বোধ করিলেন। তিনি সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ! মৎকৃত দেবার্চনার প্রতি তোমাদের রাজার বড়ই সন্দেহ ও ঘৃণা জন্মিয়াছে। আমি তাঁহার কল্যাণ-কামনায় নানাবিধ হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়াছি, এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বারবার পরামর্শ দিয়াছি, বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে বলিয়াছি, কিন্তু তিনি যখন তাহা শোনেন নাই তখনই জানিয়াছি তাঁহার

কল্যাণ অসম্ভব। আমি এই দৈব-কার্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিলেন। অতএব তাঁহার অশুভ অনিবার্য। তোমরা স্বচক্ষে আমার প্রভাব অবলোকন কর।"

এই কথা বলিয়া গুরুদেব গোঁসাই ঠাকুর শাণিত খড়্গ লইয়া সেই মৃন্ময়ী প্রতিমার বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই প্রহৃত স্থান হইতে অবিরল ধারায় শোণিত-প্রবাহ বাহির হইতে লাগিল। উপস্থিত সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। ইহার পর গোঁসাই ঠাকুর রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সহসা অদৃশ্য হইলেন। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা কেদার রায়ের কর্ণে পোঁছিলে তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া ত্বরিতপদে দেবমন্দিরে আসিলেন। গুরুর অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।[১]

মানসিংহ প্রচণ্ড সেনাবলসহ বিক্রমপুর আক্রমণ করিলেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও মহাবল কেদার রায় সাহসহীন হইলেন না। তিনি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখনও বা তিনি প্রচণ্ড বিক্রমে মানসিংহের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেন, আবার কখনও বা মোগল-সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া কৃতান্তের ন্যায় মথিত করিতে থাকেন। এই ভাবে নয়দিন ধরিয়া ভয়ানক যুদ্ধ চলিল।

দশম দিবসে গভীর নিশীথে ইষ্টদেবীর উপাসনার্থে রাজা কেদার রায় দশ-মহাবিদ্যার মন্দিরে প্রবেশ করেন। তিনি যখন ইষ্টপূজায় একান্তচিত্তে নিমগ্ন ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বাহ্য-জ্ঞানবিহীন, সেই সময়ে বিশ্বাসহন্তা শ্রীমন্তের সহায়তায় মানসিংহ-নিয়োজিত গুপ্তঘাতক সেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদার রায়কে অতর্কিত আক্রমণে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে। মানসিংহের এই কাপুরুষতা ও শ্রীমন্তের এই বিশ্বাসঘাতকতা অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহাদের নামে

১. এই সময়ে বঙ্গে যে শক্তি-পূজার অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য যশোরেশ্বরীর পূজা করিতেন। চাঁদ রায় ও কেদার রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তি এখনও বিক্রমপুরে বর্তমান। কিন্তু কেদার রায় প্রতিষ্ঠিত, ছিন্নমস্তা মূর্তির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী দেবী এখনও বিদ্যমান।

ছয় বৎসর পূর্বে 'বসুমতী' পত্রিকায়, আমি কেদার রায় সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধ বাহির হইবার পর পূর্ববঙ্গ হইতে একজন লেখক কেদার রায় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি বসুমতীতে প্রকাশিত করেন। তাহা এস্থলে সবিস্তারে উদ্ধৃত হইল।

"শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, আপনার বসুমতী পত্রিকাতে গত ৫ই শ্রাবণ তারিখে বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকের অন্যতম, কেদার রায়ের জীবনবৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন। বঙ্গের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই সুতরাং কেদার রায়ের জীবনবৃত্তান্তও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আছে। কেদার রায়ের সম্বন্ধীয় একটি বিশেষ সত্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে—সাধারণের অবগতি ও অনুসন্ধানের জন্য আমরা লিখিতেছি—অনুগ্রহ পূর্বক আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন;—নদীয়া জেলার অন্তর্গত পোস্ট কালীগঞ্জের অধীন লাখুরিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু ষষ্ঠীদাস রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতে, যে ৺ভুবনেশ্বরী মূর্তি আছেন তাঁহার পাদপদ্মে "শ্রীকেদার রায়" নামাঙ্কিত আছে। ঐ দেবী কেদার রায়ের উপাস্য-দেবী বলিয়া চির প্রসিদ্ধ আছে। ষষ্ঠীবাবুর পূর্ব পুরুষের বাস পূর্ববঙ্গে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি কণ্ঠহার দ্বারা যে সময়ে সদ্বৈদ্য-কুলপঞ্জিকা নামে তাঁহাদের জাতীয় কুল-পঞ্জিকা লিখিত হইয়াছিল, তাহার পূর্বে ষষ্ঠীবাবুর পূর্ব পুরুষ পূর্ববঙ্গ হইতে আসিয়া লাখুরিয়া গ্রামে বাস করেন। এই কেদার রায়ের প্রতি দেবীর আদেশ ছিল, 'যবন দর্শন হইলে তোমার পুরী পরিত্যাগ করিব'। কেদার রায় রাজকরের জন্য বাদশাহের লোক কর্তৃক বন্দী হইলে, দেবী তাঁহার আলয় পরিত্যাগ করেন ও ষষ্ঠীবাবুর পূর্ব পুরুষ শ্রীরায়ের ভবনে আসেন। তদবধি ঐ বংশেই পূজিতা হইতেছেন। কেদার রায়ের আলয় হইতে, শ্রীরায় ও গোপী রায়ের বাটিতে দেবীর আগমন নিরূপণ করা তত কঠিন নহে, কারণ কেদার রায় ও শ্রীরায় এতদুভয়ের মধ্যে বংশগত সামাজিক বা বন্ধুত্বসূত্রে কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। কেদার রায়ের অভীষ্ট দেবী সংক্রান্ত অনেক কিম্বদন্তী আছে। জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহা নিশ্চয় করা যায় না। হরিসাধন বাবু যে ইষ্টদেবীর পূজাকালে, কেদার রায়ের ঘাতক হস্তে মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত যবন দর্শন মাত্র দেবীর পুরী পরি-ত্যাগ বৃত্তান্তের অনেকটা সাদৃশ্য অনুমান করা যায়। ৺ভুবনেশ্বরী দেবীর পদাঙ্কিত, কেদার রায়ের নাম দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ষষ্ঠীবাবুর বাটিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়।"

গভীর কলঙ্ক-কালিমা বিলেপিত করিয়া রাখিবে।

কেদার রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি বিবরণ আজকাল প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত মতে প্রকাশ যে, কেদার রায় মানসিংহের নিয়োজিত গুপ্তঘাতকগণ দ্বারা ছিন্নমস্তা দেবীর মন্দিরে নিহত হন। কিন্তু ঐতিহাসিক চিত্রে কেদার রায়ের মৃত্যু-সম্বন্ধে যে বিবরণটি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অন্যরূপ। আমরা কেদার রায় প্রসঙ্গের শেষাংশটি পাঠকের গোচরার্থে এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম।—

"পাঠান রাজলক্ষ্মী গৌড় হইতে চির নির্বাসিত হইলেও বাঙ্গলার শস্য-শ্যামল প্রান্তর হইতে দুর্দমনীয় শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। দায়ুদের পর কতলু খাঁ, ইশা খাঁ ও ওসমান খাঁ সেই শক্তিকে জাগরিত করিয়াছিলেন। ওসমানের বিজয়ভেরী প্রথমে উড়িষ্যায় নিনাদিত হইয়া পরে পূর্ববঙ্গে মহান্দোলন উপস্থিত করে। সেই ব্যোমবিজয়ী বিজয়ভেরীর গভীর নিনাদ শ্রবণ করিয়া পূর্ববঙ্গে অবস্থিত মোগল সেনাপতি বাজবাহাদুর তাহার নীরবতা সাধনের জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ওসমানের ভেরী-নিনাদ কিছুতেই নিবৃত্ত না হওয়ায় মানসিংহ স্বয়ং বাজবাহাদুরের সাহায্যের জন্য পূর্ববঙ্গে গমন করেন। মিলিত মোগলসৈন্যের হুঙ্কারে কিছুকালের জন্য ওসমানের বিজয়ভেরী নীরব ভাবে অবস্থান করে। ইহার পর বাজবাহাদুর ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিবার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। ওসমান, ইশা খাঁ ও কেদার রায়ের প্রতিযোগিতায় মোগল সেনাপতিগণ পূর্ববঙ্গে শান্তিস্থাপন করিতে পারেন নাই। বাজবাহাদুরকে সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগী দেখিয়া ওসমান পুনর্বার মোগলের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করেন। মানসিংহ আবার তাঁহার দমনের জন্য অগ্রসর হন। ওসমান পরাস্ত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিলে মানসিংহ বিক্রমপুর ও শ্রীপুর অধিকারের জন্য মনোনিবেশ করেন। কেদার রায়ও তাঁহাকে বাধা প্রদানের জন্য উদ্যোগী হন। কেদার রায় অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়া মানসিংহকে চমকিত করিলেন। কিন্তু পরিণামে তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। কথিত আছে যে, মানসিংহ কেদার রায়কে তাঁহার রাজ্য পুনঃ প্রদান করেন। এই সময়ে কেদার রায়ের কুলদেবতা শিলামাতাকেও মানসিংহ অম্বরে লইয়া যান। প্রবাদ এই শিলা-মাতা আজও জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে বিরাজ করিতেছেন।[১]

কেদার রায় পরাস্ত হইয়া মানসিংহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি পুনরায় আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আরাকান রাজ সেলিম-শাও তাঁহার গোলন্দাজ সেনা ও রণতরী লইয়া বাঙ্গলা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি কেদার রায়ের পরাক্রম বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কেদার রায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে তিনি যে কৃতকার্য হইতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। এজন্য তিনি কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান অধিকারের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেদার রায় তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে উভয়ে একযোগে অনেক স্থান মোগলের শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়েন। ইতি পূর্বে ইশা খাঁর মৃত্যু হওয়ায়, সোণারগাঁ মগরাজ ও কেদার রায়ের হস্তে পতিত হয়। কথিত আছে, সোণারগাঁ আক্রমণ কালে চাঁদ রায়ের কন্যা সোণাবিবি কেদার রায় ও মগদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায় লজ্জায় ও ক্ষোভে সোণারগাঁ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। মোগলসৈন্যেরা তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, পূর্ববঙ্গের অনেক স্থান মগরাজ ও কেদার রায়ের অধীনে আসে।

পুনরায় পূর্ববঙ্গে অশান্তির আগুন প্রজ্বলিত হইলে মানসিংহ তাহা নির্বাণের জন্য বিরাট

১. প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী জাগ্রত দেবতা। তাঁহার প্রত্যাদেশ না লইয়া প্রতাপ কোন কার্যই করিতেন না। রাজা কেদার রায়ের ছিন্নমস্তাও (মল্লামাতা?) সেইরূপ ছিলেন। জনপ্রবাদ এই, মোগলঘাতক কর্তৃক কেদার রায়ের ভূলুণ্ঠিত মস্তক "ছিন্নমস্তে-নমস্তে" বলিয়া নিজের ইষ্টদেবীর নামোচ্চারণ করিয়াছিল।—নব্য-ভারত পত্রিকায় প্রকাশিত আনন্দবাবুর দ্বাদশ-ভৌমিক।

আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাকে সেলিম শা ও কেদার রায় উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে হয়। কিন্তু সুচতুর মানসিংহ একবারে উভয়কে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া প্রথমে সেলিম শার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার সঙ্কল্প করেন। আরাকানীরা জল ও স্থলযুদ্ধ, উভয় ব্যাপারেই পারদর্শী ছিল। কাজেই মানসিংহকে প্রথমে তাহারই আয়োজন করিতে হয়। তৎপূর্বে আরাকানরাজ ও কেদার রায়ের মধ্যে সন্ধি ভঙ্গ হওয়ায় মানসিংহের পক্ষে মহা সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথমেই আরাকানরাজ সেলিম শার সৈন্যগণকে আক্রমণ করেন। মানসিংহ সেলিম শাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে বিতাড়িত করেন।

মগরাজকে দমন করিয়া মানসিংহ পুনর্বার কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসুক হন। মগদিগের সহিত এই যুদ্ধে তাঁহার অনেক সেনা নষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে মানসিংহ নবসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। কেদার রায় এই সময়ে পাঁচশত রণতরী সংগ্রহ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাও ছিল। মানসিংহ প্রথমতঃ মোগল সেনাপতি কিলমককে কেদার রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করেন। কিলমক সসৈন্যে শ্রীনগর নামক স্থানে উপস্থিত হইলে কেদার রায়ের সেনাগণ তাঁহাকে চারিদিক হইতে অবরোধ করিয়া বেষ্টন করিয়া ফেলে। মানসিংহ কিলমকের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া তাহার সাহায্যের জন্য একদল মোগলসেনা পাঠাইয়া দেন। পুনরায় কেদার রায়ের সেনাদলের সহিত মোগলসৈন্যের ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বাঙ্গালীর অত্যদ্ভুত বীরত্বে মোগল ও রাজপুতগণ চমকিত হইয়া গেল। এই যুদ্ধে কেদার রায় নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহা-পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া মোগলের বিশ্ব-ধ্বংসকর গোলা উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষের ভয়াবহ অগ্নিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে কেদার রায় আহত হইয়া পড়িলেন। মোগলেরা জয়লাভ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল ও সেই অবস্থায় মানসিংহের নিকট লইয়া গেল। মানসিংহের নিকট সেই শোচনীয়, আহত অবস্থায় আনীত হইবার অল্পক্ষণ পরে কেদার রায় এ নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অক্ষয়ধামে চলিয়া যান।[১]

কেদার রায় বিক্রমপুর সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে তিনি ভূমি-দান করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থদের তিনটি সমাজ পরস্পরের গৌরব-বর্ধনের

১. Kedar Roy, the Lord of Sripur was suddenly assaulted with two Koshas sent by by Raja Mansing, who having subjected that tract, to his master, sent forth his navy against Kedar Roy.* Munda Roy the Admiral of Raja Mansing was slain after a bloody fight.

* ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, রাজা মানসিংহ, জলপথে ও স্থলপথে সেনা চালনা করিয়া কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কেদার রায়ের নৌসেনাবলও বড় কম ছিল না। মুহূর্ত মধ্যে, তিনি একশত 'কোষ' বা বৃহৎ নৌকা সজ্জিত করিতে পারিতেন। প্রতাপাদিত্যের রডার ন্যায় ফ্রান্সিস কার্ভালো তাঁহার পর্টুগীজ নৌসেনাপতি ছিলেন। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে এই কার্ভালোকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া কলঙ্ক অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

কেদার রায়ের অসীম ক্ষমতা ও যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত ভ্রমণকারী Ralph Fitch সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহাও এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম—

Raja Mansingha, after defeating the Magh Raja, turned his attention towards Kaid Rai (Kedar Roy) of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war and had laid siege to Kilmack, the Imperial Commander in Srinagar. Kilmack held out till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy and after a furious cannonade, took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds, soon after he was brought before the Raja.—Inayatulla's ***Takmillui Akbarnama.*** Elliot's ***History of India,*** Vol, VI.

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশে কেদার রায়ের মৃত্যুবৃত্তান্ত যেভাবে বর্ণিত আছে, তাহার সহিত তুলনায় আনন্দ বাবুর লিখিত বৃত্তান্ত ঠিক বিপরীত। এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। সুবুদ্ধিমান পাঠক স্ব স্ব অভিমত সংগঠন করিয়া লইবেন।

চেষ্টা করিত। শ্রীপুরের রাজবংশ বিক্রমপুরের, বাকলার রাজবংশ চন্দ্রদ্বীপের ও যশোহরের রাজবংশ যশোহরসমাজের গোষ্ঠীপতি থাকিয়া স্ব স্ব সমাজের গৌরবরক্ষার জন্য সতত যত্ন করিতেন। এই তিন সমাজে অবস্থিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি অনেক ভূসম্পত্তি ও বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া পুরুষ-পরম্পরাক্রমে আপনাদের জীবিকা-নির্বাহ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই সমস্ত ব্রহ্মোত্তর দান ব্যতীত চাঁদ রায় ও কেদার রায় অনেক মন্দির প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘিকা-খনন করিয়া আপনাদের ধর্ম প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়া[১] গিয়াছেন। কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত ভুবনেশ্বরী মূর্তি, নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার লাখুরিয়া গ্রামের চৌধুরী মহাশয়দের বাটিতে অদ্যাপি বিরাজিত। দেবীর পাদোপরি কেদার রায়ের নাম খোদিত। কেদারবাটি নামক স্থানে কেদার রায়ের খনিত দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণী, আজও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। সর্বাপেক্ষা 'রাজাবাড়ি মঠ' তাঁহাদের বিরাট কীর্তির পরিচায়ক।

কেদার রায়ের পতনে[৩] বিক্রমপুর রাজ্যের মুকুটমণি খসিয়া পড়িল। মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায়ের মত দুইজন পরাক্রান্ত ভৌমিককে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশে 'ভুঁইয়া-বিদ্রোহের' যবনিকা পতন করেন।

রাজা কেদার রায়ের এই আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার অধীনস্থ সেনা ও সেনাপতিগণ বড়ই ভীত হইয়া পড়েন। যুদ্ধ স্থগিত রাখাই সকলের মত হইল। কিন্তু মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী ও সেনাপতি কমলশরণ রায় কোনমতে ভীত না হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সেনানায়কগণের মধ্যে, কালিদাস ঢালি, রাজা সরদার, পর্টুগীজ ফ্রান্সিস্ ও শেখ কালু তাঁহাদের সহায়তা করিতে লাগিল। কিন্তু পরিণামে শেখ কালু ও ফ্রান্সিস্ বিপক্ষ পক্ষের সহিত যোগদান করে। মহারাজ মানসিংহ রাজমন্ত্রী রঘুনন্দনকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি আপনারা যুদ্ধে ক্ষান্ত হন, তাহা হইলে আমি বিক্রমপুরের উপর কোন অত্যাচারই করিব না। বরঞ্চ রাণীকে রাজ্য ভার দিয়া বাঙ্গলা হইতে চলিয়া যাইতে পারি।"

১. নব্যভারতের প্রবন্ধ-লেখক আনন্দবাবু বলেন,—বহুকাল হইতে বিক্রমপুরে দুইটি কালীক্ষেত্র পীঠস্থানবৎ পূজিত হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে একটি চাঁচুরতলায় 'ঠারিণ-বাড়ি' (ঠাকরুণ বাড়ি?) 'অপরটি মাত্রৈসারে 'দিগ-ম্বরী' বাড়ি, বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ, চাঁচুরতলাতে ব্রহ্মাণ্ড গিরি এবং মাত্রৈসারে গোঁসাই ভট্টাচার্য শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই দুই স্থানে আজও কি স্বদেশী কি বিদেশী, হিন্দুরা পূজা বন্দনাদি করিয়া থাকে। কেদার রায় মাতৃ-নির্দেশ ক্রমে এই পীঠস্থানবৎ চাঁচুরতলার নিকটে অপর একটি বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা আজও 'রাজাবাড়ি' বলিয়া বিখ্যাত। এই স্থানে বাস করিয়া দেবীর অর্চনা করা যাইবে, এই মানসেই ঐ বাড়ি নির্মিত হয়। আবার এই সময়ে, এ প্রদেশে কলিকাতার সান্নিধ্যে কালিকাদেবীও জনসাধারণে পরিচিত হন। কালীঘাট সম্বন্ধে আলোচনাকালে পাঠক বঙ্গে শক্তি-পূজা সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন। প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী লক্ষ্মীকান্ত মানসিংহের অনুগ্রহে যে সময়ে বঙ্গদেশে প্রচুর জমিদারি লাভ করেন সেই সময়ে তিনি কালীক্ষেত্রের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেন। এই সমস্ত ঘটনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গে তান্ত্রিক-ধর্মের যথেষ্ট প্রাবল্য হইয়াছিল।

২. জয়পুরের চারণ-কবিদের কবিতায়, কেদার রায়ের কথা উল্লেখ আছে। অবস্থা দেখিয়া বোধ হয়, মান-সিংহের বঙ্গবিজয় কীর্তিকাহিনী, রাজপুতানায় বিঘোষিত করিবার জন্য চারণগণ তাঁহার গুণগরিমা-প্রকাশক এই সমস্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাহা হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি।—

"তখ্‌তপর বৈঠকর্ সেলিমনে আপনা নাম জাঁহাগীর রখ্‌খা। উস্‌মে মানসিংজীকো বঙ্গালাকে পূর্বপ্রান্ত মৈ, হিন্দুয়োকো স্বতন্ত্র রাজমে উনকো দবানে কে লিয়ে ভেজা। মানসিংজী পরতাপআদিত্য কো জীত্ কর, রাজা কেদার কে রাজপর চড়াই কৈ। বহ জাতিকা কায়স্থ থা। ঔর সল্লামাতা নাম্নী দেবী উস্‌কো ইষ্ট থা।" বঙ্গদেশের কোনও গাথায়, কেদার রায়ের বীরত্ব সম্বন্ধে কোন কথা লিপিবদ্ধ না হইলেও, সুদূর রাজপুতানার চারণগণের কবিতার মধ্যে তাঁহার কীর্তি কাহিনী সুরক্ষিত হইয়াছে, ইহাই বঙ্গবাসীর গৌরবের কথা।

৩. কেদার রায়ের মৃত্যুর পরিচয় সঠিক জানা যায় না। "বিক্রমপুরের নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে কেদার রায় আহত ও বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মানসিংহের নিকট লইয়া যাইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল (১৬০৩)— বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত— *History of Bengal*, দ্বিতীয় খণ্ডের মতে কেদার রায়ের মৃত্যুকাল ১৬০৫ খ্রী., p. 214-215.

রঘুনন্দন যখন দেখিলেন তাঁহাদের দল হইতে বিশ্বাসঘাতকগণ মোগল পক্ষে যোগদান করিতেছে, সেনাগণও রাজা বিহনে নিরুৎসাহ হইয়াছে এবং রাণীও আর অনর্থক লোকক্ষয়ে ইচ্ছুক নহেন, তখন তিনি কমলশরণ প্রভৃতি সেনানায়কগণকে সঙ্গে লইয়া মানসিংহের শিবিরে উপস্থিত হইয়া আত্মসমর্পণ করেন। মহারাজা মানসিংহও রাজা কেদার রায়ের পত্নীর হস্তে বিক্রমপুরের শাসনভার অর্পণ করেন। এইখানেই বিক্রমপুরের শেষ অধঃপতন হইল।

কেদার রায়ের রাণী লোকান্তরিত হইবার পর মোগল রাজপ্রতিনিধির আদেশমত চাঁদ রায়ের রাজ্য তিন চারি ভাগে বিভাজিত হইল। রঘুনন্দন বিক্রমপুর, কমলশরণ ইদিলপুর ও শেখ কালু কার্তিকপুরের জমিদারি প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ-বংশীয় কালিদাস ঢালি, রামরাজ সরদার, দেওভোগ ও মূলপাড়া নামক দুইটি পৃথক তালুক প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে সমগ্র বিক্রমপুর রাজ্য নানা অংশে বিভাজিত হইয়া পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কার

লক্ষ্মীকান্ত কর্তৃক, মানসিংহের প্রদত্ত জমিদারি-লাভের পরের কথা — লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণের নিমতায় ও বড়িশায় আগমন — কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কার — কবি বিপ্রদাস বর্ণিত কালীঘাট — কামদেব ব্রহ্মচারীর কালীঘাটে অবস্থান — জনৈক ব্রহ্মচারী কর্তৃক কালীকুণ্ড হ্রদতীরে পদাঙ্গুলি প্রাপ্তি — মুখের প্রস্তরখণ্ড প্রাপ্তি — নকুলেশ্বর ভৈরবের সন্ধান প্রাপ্তি — কালীমূর্তি প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কিম্বদন্তী — বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী সন্তোষ রায় কর্তৃক জঙ্গলমধ্যে কালী প্রতিমা দর্শন — তাঁহার পিতা কেশব রায়ের উপর দেবীর স্বপ্নাদেশ — বর্তমান পোস্তার নিকট কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ — সন্ন্যাসী ও কাপালিকগণ কর্তৃক সেই মূর্তি কালীঘাটের জঙ্গলে আনয়ন — শাঁখাবিক্রেতা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কিম্বদন্তী — নবাব আলিবর্দি খাঁ ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক কালীমূর্তি দর্শন — জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী কর্তৃক কালীমূর্তির আবিষ্কার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ — ভুবনেশ্বর (চক্রবর্তী) ব্রহ্মচারী — বসন্ত রায় কর্তৃক কালীর সেবায় ভুবনেশ্বরের নিয়োগ। বসন্ত রায় কর্তৃক প্রথম কালীমন্দির নির্মাণ। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর উত্তরাধিকারিগণ — কালীমাতার সেবায়েত বর্তমান হালদার মহাশয়গণের পূর্ববৃত্তান্ত — তাঁহাদের বংশপরিচয় — কালীঘাট হইতে হালদারগণের গোবিন্দপুরে বাস — সন্তোষ রায় কর্তৃক বিবিধ দেবোত্তর সম্পত্তি দানের তায়দাদ — কালীব দেবোত্তর সম্পত্তি — কালীকুণ্ড হ্রদ — কালীর বর্তমান মন্দির — কালী মূর্তির অলঙকারাদি — নিত্যপূজা ও আয়ব্যয় — শ্যামরায় বিগ্রহ — স্বয়ম্ভূলিঙ্গ নকুলেশ্বর — কালীঘাট সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা।

লক্ষ্মীকান্ত হইতেই বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদার-বংশ আরম্ভ হয়। মানসিংহের নিকট প্রচুর অর্থ, জমিদারি ও রাজসম্মান লাভ করায় বঙ্গদেশের মধ্যে বিশেষতঃ বঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে লক্ষ্মীকান্ত একজন সর্বজন-জানিত লোক হইয়া উঠেন। মানসিংহ বাদসাহ জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচটি পরগনার ও হেতেগড় পরগনার কিয়দংশের জায়গীর এবং সনন্দ আনাইয়া দেন। বাদসাহী সনন্দ পাইলেও লক্ষ্মীকান্ত এই সমস্ত পরগনা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীনে আনিতে সমর্থ হন নাই। পূর্বে বলিয়াছি, হুগলী জেলার গোহট্ট-গোপালপুরে লক্ষ্মীকান্তের পৈতৃক বাসস্থান ছিল। শুনিতে পাই, উক্ত গ্রামে লক্ষ্মীকান্তের পরিখা-বেষ্টিত আবাসভূমির ধ্বংসাবশেষ আজও দৃষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মীকান্ত পুত্র গৌরহরি মজুমদারকে, জমিদারির উত্তরাধিকার দান করিয়া আশি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। গৌরহরি ও তাঁহার পুত্র শ্রীমন্তও, সম্রাট-প্রদত্ত পরগনাসমূহ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিতে সমর্থ হন নাই। গৌরহরি — প্রাপ্ত জায়গীরের রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য, গোপালপুর হইতে বর্তমান দমদমার নিকটবর্তী. নিমতা বিরাটি গ্রামে বাসস্থান নির্মাণ করেন।

ইহার মধ্যবর্তী সময়ে, লক্ষ্মীকান্তের বংশধর-গণের আর কোন প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৭২২ খৃস্টাব্দে, নবাব মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গালার নূতন রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন।[১]

১. ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার দেওয়ান, এবং ১৭০৭ সালে সহকারী সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে, সুবে-বাঙ্গালার অন্তর্গত তাঁহার অধিকৃত স্থান সমূহ তেরটি চাকলা ও বহু পরগনায় বিভক্ত হয়। প্রত্যেক চাকলায়, রাজস্ব আদায়ের জন্য এক একজন রাজ-কর্মচারী, নবাব সরকার হইতে নিযুক্ত হন। চাকলার কর্মচারীরা, প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। মোগল-সুবাদার—চাকলার কর্মচারীগণের নিকট হইতে বাদসাহী-রাজস্ব বুঝিয়া লইতেন। এই সময়ে, শ্রীমন্তের পুত্র ও লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র, কেশব মজুমদার বাঙ্গালার দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী নিযুক্ত হয়েন। তিনি নবাব সরকার হইতে রায়চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইহার কিছু পূর্বে অর্থাৎ ১৭০০ খৃীস্টাব্দে, বাদসাহ আলমগীরের (ঔরঙ্গজেব) পৌত্র, সুলতান আজিম ওসানের বাঙ্গালা শাসন সময়ে, ইংরাজেরা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামত্রয়, সুবাদারের নিকট হইতে ষোল হাজার টাকায় ক্রয় করেন। এই গ্রামত্রয়ের জন্য ইংরাজ কোম্পানিকে নবাব সরকারে নিয়মিত বাৎসরিক খাজনা দিতে হইত।

কেশব রায়ের জমিদারির মধ্যে তিনটি গ্রাম ইংরাজদের হস্তগত হওয়ায় দক্ষিণ অঞ্চলের জমিদারি তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে রায়মহাশয় নানা অসুবিধা ভোগ করিতে থাকেন। এদিকে ১৭১৬ অব্দে হ্যামিল্টন নামক একজন ইংরাজ চিকিৎসক, দিল্লীর সম্রাট ফেরোকসিয়ারের পীড়া আরোগ্য করিয়া, কলিকাতার নিকটবর্তী ৩৭টি মৌজা ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।[১] ইংরাজেরা এই জমিলাভের সনন্দ প্রাপ্ত হইলে, নবাব মুরশিদকুলি খাঁ অতিশয় ক্ষুণ্ণ হন এবং কলিকাতার সমীপস্থ পরগনার জমিদারগণ অর্থাৎ যাঁহারা রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী ছিলেন—তাঁহাদের গোপনে নিষেধ করিয়া দেন—"তোমরা কেহই ভবিষ্যতে ইংরাজ-কোম্পানিতে জমি বিক্রয় করিওনা।" এই সময়ে কেশব রায় দেখিলেন, নিজের জমিদারির কেন্দ্রস্থলে না থাকিলে জমিদারি শাসনও অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য তিনি নিমতা বিরাটি ত্যাগ করিয়া কালীঘাটের প্রায় তিনক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে বড়িশাগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে ১৭১৬ খৃীস্টাব্দের পর হইতে সাবর্ণ-রায়-চৌধুরী জমিদারদের বড়িশায় বাস আরম্ভ হইয়াছে।

বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরীদের কথা এত বিশদভাবে বলিবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, কালীঘাটের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা, কালীমূর্তির প্রথমাবিষ্কার ইত্যাদি ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। দ্বিতীয়তঃ, ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভবিষ্যতে যে সমস্ত পরগনার স্বত্ব লাভ করেন, তাহার সহিত সাবর্ণদের বিশেষ সম্পর্ক। কি সূত্রে কেশবরাম চৌধুরী নিমতা ত্যাগ করিয়া বড়িশায় আসেন, তাহা উল্লিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে আমরা প্রাচীন কালীঘাটের সম্বন্ধে অন্যান্য কথার অবতারণা করিব।

খৃীস্টের অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালীঘাট নিশ্চয়ই একটি সর্বজনজানিত স্থান হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ-ব্যাপী সময়ের মধ্যে অতি ধীরে ধীরে এই উন্নতি সংসাধিত হয়। উলা নিবাসী বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক

১. এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী K. Blechynden এর বিবরণ—Attached to the English Embassy was Surgeon William Hamilton of the Honourable East India Company's service, whose name deserves to stand high in the records of Calcutta as second only to that of Charnock the founder. When inspite of the efforts of the court physicians, the emperor's illness continued to increase, Hamilton proffered his services, and so successful was his treatment that the royal patient was shortly restored to health......During this long interval Hamilton had been in attendance on the emperor, and it was likely owing to his influence that the English claims received favourable considerations in spite of opposing intersts. In addition, the emperor granted permission to the East India Company to purchase the Zamindary rights of 24 villages (the number given here is wrong it was 38) besides the three already held.—*Calcutta Past and Present,* 2nd Impression, p. 12-13.

কবি 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'[১] নামক কাব্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি কালীঘাটের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় কালীঘাটের সে সময়ে অতি সমৃদ্ধিশালী অবস্থা। গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

চলিল দক্ষিণ দেশে, বালি ছাড়া অবশেষে,
উপনীত যথা কালীঘাট।
দেখেন অপূর্ব্ব স্থান, পূজা হোম বলিদান,
দ্বিজগণে করে চণ্ডী পাঠ॥

আবার ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত কবিকঙ্কণের[২] বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই—

বালুঘাটা এড়াইল বেণের নন্দন। তীরের প্রমাণ যেন চলে তরীবর।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা, দিল দরশন॥ তাহার মেলানি বাহে মাইননগর॥

উল্লিখিত দুইটি কবিতা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, কালীঘাট উক্ত সময়ের মধ্যে তীর্থস্থান রূপে সাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিল।

কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কার কে করিল, ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলা অতি কঠিন। তবে এ সম্বন্ধে বহুবিধ অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তাহার সকলগুলিই আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠককে জানাইতেছি।[৩]

ইহার প্রথম গল্পটি এই, বর্তমান কালীমন্দিরের অনতিদূরে অরণ্য মধ্যে এক পর্ণকুটীরে কোন ব্রাহ্মণ বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক তপস্যা করিতেন। একদিন সায়ংকালে তিনি ভাগীরথী তীরে সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে, অদূরে তীব্র জ্যোতির্ময় এক আলোকচ্ছটা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। আর কখনও সেরূপ উজ্জ্বল আলোক তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। এই অপূর্ব দীপ্তিময়ী আলোকচ্ছটার সহসা আবির্ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণের কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। তিনি আলোক-রেখা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ভাগীরথীর ঘূর্ণায়মান অতলস্পর্শ এক দহের (বর্তমান কালীকুণ্ড হ্রদের) নিকটস্থ একটি স্থান হইতে ঐ দিব্যালোক বিচ্ছুরিত হইতেছে। ব্রহ্মচারী ইহার কারণানুসন্ধান করিতে না পারিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ের ক্রমাগত চিন্তায় তাঁহার কৌতূহলের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। পরদিন দিবাভাগে ব্রাহ্মণ পুনরায় ঐ স্থান লক্ষ্য করিয়া গিয়া দেখিলেন যে, কালীদহের তীরে একটি প্রস্তর-খোদিত মূর্তি রহিয়াছে এবং তৎসন্নিকটে সূর্যরশ্মির ন্যায় চাকচিক্যময় মনুষ্যাঙ্গুলির সদৃশ্য এক প্রস্তরবৎ অঙ্গুলি পড়িয়া রহিয়াছে। এই অঙ্গুলিকেই ব্রহ্মচারী পূর্ব-রাত্রের আলোক দর্শনের কারণ বলিয়া অনুমান করিলেন এবং এরূপ জনসমাগম-শূন্য অরণ্য মধ্যে প্রস্তর-খোদিত মুণ্ড ও প্রস্তরময় পদাঙ্গুলি দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না। কিন্তু এই ব্যাপারের কোন কারণ নির্ধারণ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ অতিশয় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই গভীর বনমধ্যে ত জনমানব বাস করে না। সুতরাং এ মুখ ও অঙ্গুলি নিশ্চয়ই কোন দৈব-ব্যাপার, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ সেই প্রস্তর-মূর্তির ও পদাঙ্গুলির যথারীতি পূজার্চনা করেন। গভীর রাত্রে ভগবতী সেই ব্রাহ্মণকে প্রত্যাদেশ করিলেন, "কুণ্ড-তীরে প্রস্তরবৎ যে অঙ্গুলি দেখিয়াছ, উহা সতীদেহ-বিচ্ছিন্ন অঙ্গুলি। সুদর্শনচক্রে ছিন্ন হইয়া তাহা এই কালীদহে আসিয়া পড়িয়াছে।"

১. গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী নামক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই বইটির প্রকাশক গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য (১৮১৬)। ডঃ সুকুমার সেনের মতে এই গ্রন্থটির রচনাকাল "অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ বিশ বছর।"—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ৩য় সং ১৯৫৭, পৃ. ৪৫৭।

২. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৪ হইতে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কোন সাল। তাঁহার কাব্য কাহিনীর যে অংশে কালীঘাটের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকের অনুমান।

৩. কালীক্ষেত্র-দীপিকা, পৃ. ৫৪।

তৎপরে ব্রহ্মচারী অনুসন্ধান করিতে করিতে, অদূরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নকুলেশ্বর ভৈরব রহিয়াছেন, দেখিতে পাইলেন। তদবধি ঐ ব্রহ্মচারী উক্ত প্রস্তরময় সতী-অঙ্গ যত্নপূর্বক ঐস্থানে রাখিয়া প্রত্যহ সেই নির্জন বনপ্রদেশে আসিয়া উক্ত কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজো করিতেন। ইহার পর ক্রমশঃ এই ব্যাপার জনসমাজে পরিজ্ঞাত হয়। আজও এই জনরবটি কালীঘাট অঞ্চলের বৃদ্ধলোক-পরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায়। জন-প্রবাদ এই, পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারীর নাম আত্মারাম ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয় জনপ্রবাদ এই, দিবা অবসান প্রায়। কলিকাতার দক্ষিণে বড়িশার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, সাবর্ণ-গোত্রজ সন্তোষ রায় চৌধুরী মহাশয় একদা অরণ্য-পরিবৃত কালীঘাটের তীরবর্তী ভাগীরথী-বক্ষোপরি নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সেই শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য মধ্যে শঙ্খঘন্টা প্রভৃতির ধ্বনি শুনিয়া তিনি অতীব বিস্মিত হইলেন। কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তিনি ঐ স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া সেই শঙ্খঘন্টার শব্দ লক্ষ্য করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করেন। গভীর বন-স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই বিরাট জঙ্গল-সমাবৃত নিস্তব্ধ বনপ্রদেশে এক ব্রহ্মচারী পাষাণময়ী কালীমূর্তির সায়ংকালোচিত আরতি করিতেছেন। সন্তোষ রায় শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করিয়া ভীতি-বিহ্বল-চিত্তে, ভক্তিপূর্ণ প্রাণে, সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। আরত্রিক কার্য শেষ হইয়া গেলে তিনি সেই বিজনবাসী ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐস্থানে সতী-অঙ্গ নিপতিত হইয়াছিল, সেই অঙ্গ ব্রহ্মচারীই সর্বপ্রথমে দেখিতে পান। তৎপরে দেবাদেশে তিনি সেই দিন হইতেই ঐ স্থানে দেবীমূর্তির ও ভৈরবের পূজো করিয়া আসিতেছেন। এই ঘটনার পর হইতে সন্তোষ রায় মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানে কালীমূর্তিদর্শন করিতে আসিতেন। ইহার পরে জন-সমাজে এই কালীমূর্তির কথা প্রচারিত হয়।

তার পর তৃতীয় জনরব এই যে, বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদারগণের পূর্বপুরুষ কেশব রায় চৌধুরী আপন জমিদারি-ভুক্ত গঙ্গাতীরে গভীর অরণ্য মধ্যে জপ-তপাদি করিতেন। তিনি ঘোর শাক্ত ছিলেন। একান্ত মনে কিয়দ্দিবস শক্তিসাধনার ফলে তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। দেবী তাহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন, "যদি আমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চাস্—তাহা হইলে কালীকুণ্ড-তীরে আমাকে অনুসন্ধান কর। সেখানে তুই আমার প্রস্তর খোদিত মুখমণ্ডল দেখিতে পাইবি। উহা যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া আমার পূজার্চনাদি দ্বারা তুই অভীষ্টমত সিদ্ধিলাভ করিতে পারিস্।"

এই প্রত্যাদেশ পাইয়া কালীকুণ্ড তীরে অনুসন্ধানের ফলে তিনি ব্রহ্মার স্থাপিত বর্তমান কালীদেবীর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন এবং ঐ কালীকুণ্ডের পশ্চিম তীরে, যেখানে বর্তমান কালীমন্দির আছে, তথায় প্রতিষ্ঠা করেন। অপরন্তু কালীর সেবার জন্য উক্ত স্থানের জমি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া মনোহর ঘোষাল নামক এক ব্যক্তিকে কালীদেবীর পরিচারক নিযুক্ত করেন। কালীঘাটের বন কাটাইয়া তিনিই প্রথমে কালীর ক্ষুদ্রমন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। কেশব রায়ের চতুর্থ পুত্র সন্তোষ রায় পিতৃ-আজ্ঞা-ক্রমে কালীর ক্ষুদ্র ইমারতের স্থানে প্রথমতঃ একটি ছোট খাট মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। পরে এই ছোট মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সাবর্ণ-চৌধুরী বংশীয় রাজীবলোচন রায় চৌধুরী মহাশয় আলিপুরের তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ ইলিয়াট সাহেবের অনুমতি ক্রমে বর্তমান বড় মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দেন। সন্তোষ রায়ই এই বড় মন্দিরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি ইহার পরিসমাপ্তি দেখিতে পান নাই।[১]

আর একটি জনপ্রবাদ এই, বর্তমান কলিকাতার পান-পোস্তার দক্ষিণে যে স্থানকে পুরাতন পোস্তা বলে, পূর্বে সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র কালীমন্দির ছিল। কোনও সময়ে সেই ক্ষুদ্র পুরাতন

১. কালীক্ষেত্র-দীপিকা, পৃ. ৫৮।

মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ায় সেই পুরাতন তীর্থস্থান লুপ্ত হয়। এই মন্দিরের নিকট গঙ্গাতীরে একটি সুবিস্তীর্ণ পোস্তা গাঁথা ছিল। কালীতীর্থ-দর্শনার্থীদের ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীদের সুবিধার জন্য সেই পোস্তায় একটি করিয়া হাট বসিত। মন্দির পড়িয়া গেলেও পোস্তা বর্তমান থাকায় হাট বসিবার পক্ষে কোনরূপ অসুবিধা হইত না। ক্রমে কালীঘাট নাম লুপ্ত হইয়া উহা 'পোস্তার-হাট' বলিয়া সাধারণের পরিচিত হয়। বহুকাল পূর্বে এক দল কাপালিক গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রা করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহারা উপরোক্ত মন্দিরের ভগ্নস্তূপ মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া ইষ্টক-রাশির মধ্য হইতে চারিটি ছিদ্র-সংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি একখানি প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হন। জনরবে প্রকাশ, ইনিই কালীঘাটের কালী। এই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাঁহারা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের তন্ত্র-সম্মত পূজায় সময়ে সময়ে নরবলির প্রয়োজন হয়, এজন্য লোকালয়ের নিকট উক্ত কালীমূর্তির পূজা নিতান্ত সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া তাঁহারা কালীঘাটের বন-জঙ্গলাদি-পূর্ণ নিভৃত স্থানে সেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড আনিয়া লুকাইয়া রাখেন। সে সময়ে কালীঘাটের নিকটবর্তী স্থানগুলি গভীর বন-জঙ্গলে সমাবৃত ছিল। এই নিভৃত জঙ্গল-মধ্যে তৃণ-কাষ্ঠাদি দ্বারা এক ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া তাঁহারা কালীর পূজা করিতেন। বাহিরের অতি অল্প লোকেই তখন এই কালীমূর্তির সন্ধান জানিত।

অপর কিম্বদন্তী এই, ভবানী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শাঁখা বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতেন। একদিন তিনি শাঁখা বিক্রয় করিবার জন্য গঙ্গাতীর দিয়া যাইতেছিলেন। এক সধবা ব্রাহ্মণী সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া শাঁখা পরিতে চাহিলেন। শাঁখা-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পূর্বোক্ত কালীকুণ্ড তীরে শাঁখা পরাইয়া দেন। শাঁখা পরানো শেষ হইলে ব্রাহ্মণ শাঁখার মূল্য চাহিলেন। ব্রাহ্মণী 'স্নান করিয়া আসিয়া মূল্য দিব' এই কথা বলিয়া কালীকুণ্ড-হ্রদে নিমজ্জিতা হইলেন। স্ত্রীলোকটি হয়ত দৈব-দুর্ঘটনা বশে জলমগ্ন হইল ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি জলে নামিতে যাইতেছেন, এমন সময় সেই জলনিমজ্জিতা ব্রাহ্মণী সলিলমধ্য হইতে সেই শাঁখাপরাহাত দুইখানি তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

তখনই আকাশবাণীতে সেই ব্রাহ্মণের প্রতি দেবীর প্রত্যাদেশ হইল, "বৎস! আমি কালিকা। তুমি এই কালীকুণ্ড তীরে আমার পূজা প্রচলিত কর। তোমার গৃহে অমুক স্থানে, আমি একটি কৌটার মধ্যে আছি। গৃহে গিয়া আমাকে দর্শন করিও।"

ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে, বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে, কম্পিত-কলেবরে গৃহে গিয়া দৈববাণী নির্দিষ্ট-স্থানে, সেই কৌটাটি পাইলেন। সেই কৌটাটি খুলিবামাত্রই শতসূর্যের ন্যায় জ্যোতি বাহির হওয়ায় ব্রাহ্মণ ভয়-চকিত ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই আকস্মিক ভয়-সঞ্জাত মোহ অপসৃত হইলে ব্রাহ্মণ দেখিলেন, যাহা হইতে এই অপূর্ব জ্যোতি নির্গত হইতেছে, তাহা পাষাণ-ময়ী পদাঙ্গুলি মাত্র। উহা মস্তকে ধারণ করিয়া কুণ্ডতীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। এই প্রস্তরময় মুখমণ্ডল সেই স্থানে স্থাপিত করিয়া তিনি কালীর পূজা প্রবর্তন করেন। ইহা হইতেই কালীঘাটের কালীমূর্তির প্রকাশ।

আর একটি কিম্বদন্তী এই যে, এক ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা বন্দনাদি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় বনমধ্যে একটি অপূর্ব আলোকচ্ছটা দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করেন। এইরূপ ভাবে অনুসরণ করিতে করিতে তিনি বর্তমান কালীকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হন। কালীকুণ্ড-তীরে কালীর মুখ এবং প্রস্তরের মত একটি পদাঙ্গুলি দেখিতে পান। তাহার পরই তিনি দেবীর প্রত্যাদেশ পাইলেন, "যে অঙ্গুলি তুমি এই কুণ্ডতীরে পাইয়াছ, তাহা বিষ্ণু কর্তৃক সুদর্শন-ছেদিত সতী-অঙ্গ। আর ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-ফলক দেখিতে পাইতেছ, তাহা ব্রহ্মার নির্মিত কালীমূর্তি।" ব্রাহ্মণ দেবীর এই প্রত্যাদেশ পাইয়া যত্ন করিয়া ঐ উভয় খণ্ডই একত্রিত করিলেন এবং তাহার নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। ইহার পর গভীর জঙ্গল-মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া তিনি নকুলেশ্বর শিবলিঙ্গও প্রাপ্ত হন।

কালীমূর্তির আবিষ্কার সম্বন্ধে আমরা আরও দুই একটি কিম্বদন্তী এস্থানে উল্লেখ করিব। এগুলিও পাঠকের শুনিয়া রাখা উচিত। নবদ্বীপাধিপতি স্বনাম ধন্য বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এক সময়ে নবাব-সরকারে বারলক্ষ টাকা খাজনার দায়ে ঋণী হওয়ায় মুরশিদাবাদের নবাব কর্তৃক কারারুদ্ধ হন।১

নবাব আলিবর্দি খাঁ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণগরিমার কথা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। অবকাশ সময়ে তাঁহার নিকট হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহার ও মহাভারতাদির উপাখ্যান কথা শ্রবণ করিতেন।

একদিন নবাব আলিবর্দি খাঁ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া নৌকাবিহারে যাত্রা করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাবকে নিজের জমিদারির অবস্থা দেখাইবার জন্য কৌশলে কলিকাতা পর্যন্ত লইয়া আসেন। নৌকা হইতে নামাইয়া জঙ্গলমধ্যবর্তী ভূভাগ-সমূহ নবাবকে দেখাইয়া দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলেন, "জাঁহাপনা! ঐ শুনুন, ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির ভীষণ গর্জন। আমার এই জঙ্গলময় জমিদারি হস্তী-ব্যাঘ্র-বরাহাদি প্রজাপূর্ণ। ইহাতে মানুষের বসবাস নাই, কেবল বন্য-শ্বাপদগণ বাস করে। এ জমিদারির খাজনা আমি কাহার নিকট হইতে আদায় করিব? এই জন্যই নবাব সরকারে আমার রাজস্ব এত বাকী পড়িয়াছে।" বলা বাহুল্য নবাব স্বচক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, সরকারের প্রাপ্য-খাজনা মহকুব করিয়া দেন।২

ইহার পর মহারাজা নবাবকে গঙ্গাতীরস্থ এক জঙ্গলে লইয়া যান। গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়াই তাঁহারা উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিলেন সেই জঙ্গল মধ্যে এক নির্জন মৃৎ-কুটীরে জনৈক সন্ন্যাসী এক কালীমূর্তির পূজা করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র দেবীমূর্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিলেন। ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথনে তিনি জানিতে পারিলেন, এই স্থানেই সুদর্শন-ছিন্ন সতীদেহের একাংশ পতিত হইয়া তাহা পবিত্র পীঠ-স্থানে পরিণত হইয়াছে, আর এই কালী হইতেই এই স্থানের নাম 'কালীঘাট' হইয়াছে। কি প্রকারে দেবীর নিত্য-পূজার ব্যয় নির্বাহ হয়—এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করায়, ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যদিও এ স্থান জঙ্গলাবৃত তত্রাপি দেবীর উপাসনার জন্য কোন জিনিসের অভাব হয় না।" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথনে বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ অতি নির্লোভ! জগদম্বার উপর তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং মায়ের সেবার জন্য কাহারও সাহায্যপ্রার্থী নহেন। মহারাজার ন্যায় নবাবও ব্রাহ্মণের এই প্রকার একনিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও দেবদেবীর প্রতি একান্ত বিশ্বাস দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। রাজার অনুরোধে নবাব আলিবর্দি খাঁ কালীর সেবার জন্য উক্ত প্রদেশ প্রদান করিলেন। জগদম্বার সেবাকার্যের উপলক্ষ স্বরূপ হওয়ায় তিনিও মহারাজের উপর কৃপা করেন। কারণ মুরশিদাবাদে ফিরিয়া গিয়া নবাব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বাকি-খাজনার সমস্ত টাকাই ছাড়িয়া দেন।

আর একটি কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে, দশনামী শৈব-সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত জঙ্গল-গিরি নামক এক সন্ন্যাসী শিষ্যসহ গঙ্গাসাগরে যাইতে ছিলেন। তিনি আদি-গঙ্গা-তীরে কালীর

১. কলিকাতা রিভিউএর লেখক, গৌরদাসবাবু বলেন, এই বাকি খাজনার পরিমাণ ৫২ লক্ষ। কালীময় ঘটক মহাশয়ের মতে, রাজার পিতার আমলের দশলক্ষ ও তাঁহার নিকট হইতে দশলক্ষ এই কুড়িলক্ষ টাকার দায়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কারারুদ্ধ হন।

২. Maharaja Krishna Chunder, was the constant companion of Alivardi Khan (Mahabat Jung) and that during his trips on the river, he used to read and explain the Mahabharata to him. It is also said that he succeeded in obtaining from the Nawab, a remission of arrears of revenue due from him to the amount of fifty two lakhs or so, by cleverly taking on one of these river trips, the Nawab's party, on shore, on the Northern side of Calcutta, where there were settlements, and leading the Nawab on towards the south, where, in the distant thickets and woods, the roar of the tiger was heard and wild elephants were seen, pointing to him the nature of his Zamindary and the obvious reasons of his having been a defaulter.—*Kalighat and Calcutta* by G.D. Basyck, *Calcutta Review*.

প্রস্তর-খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া উক্তস্থানে কুটীর বাঁধিয়া পূজা-প্রবর্তন করেন। কিয়ৎকাল এই স্থানে অবস্থানের পর তিনি এক প্রিয় শিষ্যের হস্তে সেই কালীমূর্তির সেবার ভার দিয়া গঙ্গাসাগরে চলিয়া যান। কিম্বদন্তী ব্যতীত কোন দেবদেবী মূর্তিরই আবিষ্কার দেখা যায় না। চৌরঙ্গী-সন্ন্যাসী কর্তৃক কালীমূর্তি আবিষ্কারের মূলে কাজেই একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী বিজড়িত। সেই আখ্যানটি এই, চৌরঙ্গী একদিন দেখিলেন, বনমধ্যে একটি গাভী এক স্থানে দাঁড়াইয়া মৃত্তিকার উপর অজস্র দুগ্ধধারা বিসর্জন করিতেছে। সন্ন্যাসী এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া কৌতূহলাবিষ্ট চিত্তে সেই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করেন, এবং খনিতস্থান-মধ্য হইতে কালীর প্রস্তরময় মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন। সেই মুখই এখন কালীমূর্তি রূপে মন্দিরমধ্যে বিরাজ করিতেছেন।

এই সমস্ত কিম্বদন্তীর মধ্যে অনেক গোলযোগ আছে, অনেক অপ্রামাণিক কথা আছে। সেগুলির যথাসম্ভব আলোচনা না করিলে প্রকৃত-ব্যাপার যে কি তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আধুনিক উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত নব্য যুবকগণ এ সমস্ত কিম্বদন্তী উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারেন, ইহাতে বিশ্বাস না করিতেও পারেন। তাহাতে আমাদের কোন আপত্তিই নাই। কিন্তু যে সমস্ত মহাপ্রাণ হিন্দু এই সমস্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জন্য আমরা এ বিষয়ে আরও একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। এ সম্বন্ধে কালীক্ষেত্র-দীপিকাকারও একটা বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এস্থলে আমরা তাঁহার অভিব্যক্তিগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কালীক্ষেত্র-দীপিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই, কালীঘাটে কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কারের বিষয়ে যে কয়েকটি কিম্বদন্তীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা পরস্পরবিরোধী। কেশব রায়ের পুত্র সন্তোষ রায়,[1] খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তদনুসারে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও কেশব রায়ের বর্তমান থাকা ধরিলে, তাঁহাদের দ্বারা [illegible] প্রকাশ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ কেশব রায়ের সময়ের একশত বৎসর পূর্বে রচিত মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে পীঠস্থান কালীঘাট ও তাহার অদূরবর্তী স্থানসমূহের উল্লেখ আছে। দেবীর প্রত্যাদেশ অনুসারে কেশব রায় কর্তৃক কালীঘাটের কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কার হইলে তাহার বহু পূর্বে রচিত মুকুন্দ-রাম কবির গ্রন্থে কালীঘাটের উল্লেখ থাকিত না। আর কেশব রায়ের পুত্র সন্তোষ রায় কর্তৃক কালীঘাটের প্রথম আবিষ্কার হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণীতে কালীঘাটে বলিদান ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক চণ্ডীপাঠের কথার কোন উল্লেখ থাকা সম্ভবপর নহে। একটি জন-শ্রুতিতে প্রকাশ যে, সন্তোষ রায় শঙ্খঘণ্টার শব্দ পাইয়া গভীর বনমধ্যে উপস্থিত হন এবং তথায় একজন ব্রহ্মচারীকে কালীর আরতি করিতে দেখিতে পান। এই ঘটনা দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, কালীর সেবার জন্য নিশ্চয়ই তখন কোন সেবায়েত নিযুক্ত হইয়াছিল।

আর একটি বিবরণে প্রকাশ যে, কেশব রায় মনোহর ঘোষাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কালীর সেবায়েত নিযুক্ত করেন। সাবর্ণ-চৌধুরীগণের প্রদত্ত দেবোত্তর-সম্পত্তির একটি তায়দাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠক এই তায়দাদ হইতে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

কালীক্ষেত্র-দীপিকার লেখক মহাশয় বলেন, "উল্লিখিত একটি বিবরণের মধ্যে কেশব রায় কর্তৃক মনোহর ঘোষাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে সেবায়েত নিযুক্ত করা ও দেবোত্তর-জমি চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু সন্তোষ রায় এই মনোহর ঘোষালকে কালীর সেবার্থে যে ভূমি দান করেন, তাহাতে দেখা যায় ১১৫৭ সালে মনোহর ঘোষাল সন্তোষ রায়ের নিকট দেবোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হন। সুতরাং কেশব রায়ের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মনোহর ঘোষালের বর্তমান থাকা সন্দেহজনক। আর যদিও বা বর্তমান থাকেন, তাহা

১. সন্তোষ রায় নবাব আলিবর্দির সমসাময়িক ছিলেন ইহার স্বপক্ষে কিম্বদন্তী ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ নাই।

হইলে তখন তাঁহার বাল্যাবস্থা। ঐরূপ বয়সে কালীর সেবায়েত নিযুক্ত হওয়া কতদূর সম্ভব, তাহাও বলা যায় না। বিশেষতঃ কেশব রায় কর্তৃক দেবোত্তর দানের কোন তায়দাদ দেখা যায় না। সন্তোষ রায় কর্তৃক জমিদানের তায়দাদে মনোহর ঘোষাল ব্যতীত অপরাপর অনেককে দেব-সেবার্থে ভূমিদান করা প্রমাণ হইতেছে। তন্মধ্যে কালীঘাটের জনৈক সেবায়েত গোকুল হালদারের নামও দেখা যায় এবং তিনিও ১১৫৭ সালে ভূমিদান গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বর নামক যে ব্রহ্মচারী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালীর সেবায়েত ছিলেন—এই গোকুল হালদার উক্ত ভুবনেশ্বর হইতে অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে বর্তমান ছিলেন। কেশব রায় কর্তৃক, মনোহর ঘোষাল সেবায়েত নিযুক্ত হইলে এক সময়ে উক্ত গোকুল হালদার ও তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতিগণ এবং উক্ত মনোহর ঘোষালের কালীর সেবায়েত রূপে বর্তমান থাকা প্রমাণ হইতেছে। সুতরাং কালীর বর্তমান সেবায়েত হালদারগণ কিরূপে মনোহর ঘোষালের দৌহিত্র-বংশোদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে গোলমাল দাঁড়ায়। উক্ত তায়দাদে যে সমস্ত গ্রামের নামোল্লেখ আছে তাহার একটিও কালীঘাট গ্রামে নহে। এই সকল ঘটনা হইতে কেশব রায় এবং সন্তোষ রায় সম্বন্ধীয় বিবরণসমূহের মধ্যে একটা সন্দেহের ছায়া আসিয়া পড়ে।[১] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান সম্বন্ধেও কোনরূপ বিশ্বাস্য প্রমাণ নাই।[২]

যাহা হউক, উল্লিখিত বিশৃঙ্খল বিবরণসমূহ হইতে প্রমাণ হয় বঙ্গে দ্বাদশ-ভৌমিকের আবির্ভাব সময়ে তান্ত্রিক-ধর্ম অতি প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে বঙ্গে শক্তি-পূজার অধিকতর প্রচলন হয়। লুপ্ত তীর্থস্থানসমূহ বামাচারী কাপালিকগণের তামসিক শব-সাধনার কবল হইতে মুক্ত হইয়া সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের আয়ত্বাধীনে আসে। এই সময় হইতেই কালীঘাট তীর্থস্থান বলিয়া সাধারণের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যদিও কালীঘাট বল্লালী-আমল হইতে তীর্থস্থান রূপে পরিগণিত ছিল, তাহা হইলেও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার যেরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এরূপ আর কোন সময়ে হয় নাই। ঘটক-কারিকা হইতে প্রমাণিত হয়, বঙ্গে আদিশূর কর্তৃক আনীত যাজ্ঞিক পঞ্চমহর্ষির সময়েও কালীঘাট তীর্থাবাস বা মহাতীর্থ রূপে সেই পুরাকালেও সাধারণের নিকট পরিজ্ঞাত ছিল।

স্ত্রী-পুত্র সমেত পঞ্চমহর্ষির রাঢ়ে আবাস-গ্রহণের সময় কোন স্থান কাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, হরিমিশ্রের কুলগ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত তালিকায় তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয় সে সময়েও কালীঘাট ও নকুলেশ-ভৈরবের অস্তিত্ব ছিল। কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের ছাত্রদের শিক্ষা-বিধানার্থ তীর্থবাস জন্য

১. বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের আদিপুরুষদের সম্পর্কে সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কালীক্ষেত্র দীপিকায়' যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা আলোচনা প্রসঙ্গে এ. কে. রায়ের অভিমত—"It is not understood where Babu Surya Kumar Chatterjee heard the story about the discovery of the goddess by Lakshmikanta's descendants in the third and fourth generations as recorded by him in the *Kalikshettradipika*. So far as we have been able to ascertain, in every branch of the family, Kamadeva Brahmachari is traditionally known to have worshipped her in Calcutta, where her ground is said to have come subsequently to be known as the 'Fakir's ground'. This ground was north of Kali's temple and had five sacred trees, from two of which Nimtala and Battala are said to have been named." *Vide* Wilson's *Early Annnals*, Part I, Vol II X/IX-ii, *vide A Short History of Calcutta*, 2nd Impression p. 26 Fa 11.

২. কৃষ্ণনগর রাজবংশপ্রদীপ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক কালীদেবীকে কোন প্রকার ভূসম্পত্তি দান সম্বন্ধে কোন দলিল-পত্রাদি পাওয়া যায় না। নবাব আলিবর্দি খাঁ, কৃষ্ণচন্দ্রের দেয় রাজস্ব মার্জনা করিতে পারেন, কিন্তু কালিকা-দেবীর জন্য, তিনি যে কোনরূপ সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন—ইহা অপ্রামাণ্য। তবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মধ্যে মধ্যে কালীঘাটে আসিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কলিকাতায় কালীদর্শনে আসিয়া, পলাশী-যুদ্ধের পূর্বে কলিকাতার কুঠির অধ্যক্ষ গবর্ণর ড্রেক সাহেবের সহিত দেখা করিয়া যান।

অবিকল প্রতিলিপি

কৈফিয়ৎ বাজে জমির রেওয়া মোতালকে জেলা ২৪ পরগনা

সাবেক নম্বর	কি প্রকার বাজে জমি	ভুমিদাতার নাম	ভুমিগৃহীতার নাম	ভোগ্যবানের নাম	কি সুরতে জমি-পায়	সনন্দের সন তারিখ	গ্রামের নাম	জমির পরিমাণ	পরগনা	সনন্দের নকল	দাখিলের সন তারিখ
তায়দাদ ৯৭৩৫ ১২০৪ সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ	দেবোত্তর	সন্তোষ রায়	৺কালী ঠাকুরাণী সাং ৺কালীঘাট	৺কালীঠাকুরাণীর সেবায়েত মনোহর ঘোষাল	সেবার্থে	সন ১১৫৭	চক দুলালপুর	২৭/০	মাগুরা	নাই	১২০৯ সাল ২৮ আগস্ট
৯৭৩৮	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সন ১১৫৭ ১২ জ্যৈষ্ঠ	চক সীতারাম	ঐ	ঐ	ঐ	১২০৯ সাল
তায়দাদ ১২০৪ সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ	ঐ	ঐ	৺দক্ষিণরায় ঠাকুর সাং গগন গোহাল	মনোহর ঘোষাল	ঐ	সন ১১৬০ ৮ই জ্যৈষ্ঠ	বড় গগণ গোহাল	৩/০	ঐ	ঐ	ঐ
২২০৮ তায়দাদ ১২০৪ সাল ৭ জ্যৈষ্ঠ	ঐ	সন্তোষ রায়	৺পঞ্চানন ঠাকুর	ঐ	ঐ	১১৫৭ ১৮ই শ্রাবণ	ঐ	৩/০	ঐ	ঐ	ঐ
৮২০২ তায়দাদ	দেবোত্তর	সন্তোষ রায় চৌধুরী জমিদার	শ্রীশ্রী৺কালী ঠাকুরাণীর সেবায়েত গোকুলচন্দ্র হালদার সাং কালীঘাট	পার্বতী চরণ হালদার সাং কালীঘাট	৺কালীঠাকুরাণীর সেবার্থে	ঐ	গড়পা	৯।০	খাসপুর	১১৬৫ সাল নাগাইদ ১১৯০ সালে যখন কোম্পানি বাহাদুর সরকারে জব্দ হইয়াছে তাহাতে, বাহাল আছে।	
ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কলিকাপুর	৩/০	ঐ		

গঙ্গাতীরে যে সমস্ত গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।[১]

যাজ্ঞিক পঞ্চ-মহর্ষির নামাদি

মহর্ষির নাম	গোত্র	জীবিকার্থ বাসস্থান	অধুনাতন নাম	তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী
১. ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	পঞ্চকোটি	পঞ্চকোট বা মানভূমি	কালীঘাট।
২. শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	কঙ্কগ্রাম	বাণকুণ্ডা (বাঁকুড়া)	অগ্রদ্বীপ।
৩. দক্ষ	কাশ্যপ	কামকোটি	বীরভূম কামকোটি	ভর্তীপুর।
৪. বেদগর্ভ	সাবর্ণি	বটগ্রাম	বর্ধমান (বড়গ্রাল)	গুপ্তপল্লী।
৫. ছান্দড়	বাৎস্য	হরিকোটি গোপ ব্রহ্মপুরী	(হরিকুঠি গোপ) মেদিনীপুর	ত্রিবেণী।

কামদেব ব্রহ্মচারী, ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, মহারাজা প্রতাপাদিত্য সম সাময়িক ব্যক্তি। প্রতাপের সময়ে কালীঘাট তাঁহার তীর্থাবাসস্থান ছিল। তবে সেই সময়ে কালীমূর্তি গভীর জঙ্গল মধ্যে থাকায় চারিদিকে তাহার এত নাম ডাক হয় নাই। পাদ-টীকায় উদ্ধৃত দিগ্বিজয়-প্রকাশের শ্লোকাংশ হইতে প্রমাণ হয়, কালীঘাট সে সময়ে যশোর-রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল।[২] তবে প্রতাপ যুদ্ধবিগ্রহাদিতে ক্রমাগত ব্যস্ত থাকায় কালীক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় পরম বৈষ্ণব হইয়াও কালীর সেবার ও নিত্যপূজার জন্য তাঁহার গুরুদেব ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে কালীঘাটে প্রেরণ করেন। ভুবনেশ্বরের পূর্বে কামদেব ব্রহ্মচারীর কালীঘাটে অবস্থানের কথাও আমরা কামদেবের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই পাইয়াছি। কামদেব কালীঘাটের যে স্থানে বাস করিতেন তাহা 'ফকিরডাঙ্গা' বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। কামদেবের পর তাঁহার বংশধরগণ কালীর মন্দির-নির্মাণ ও সেবাদির সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা করেন। কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণই ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র বংশোদ্ভূত।

এক্ষণে আমরা কালীর সেবায়েত ও অধিকারী হালদারবংশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বর্তমান হালদার মহাশয়গণের পূর্বপুরুষগণ অতি নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারাই ভবানীপুর, কালীঘাট, গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থান ব্রাহ্মণ-পূর্ণ হইয়া উঠে। এই হালদার-বংশ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কালীঘাট হইতে গোবিন্দপুর ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী একটি তালিকা হইতে প্রমাণিত হইবে।

কালীর সেবায়েতগণের মধ্যে ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী কুল-ব্রহ্মচারীর নাম প্রথমই পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর সর্বদা যোগসাধনায় রত থাকিতেন। তৎকালের লোক-লোচনাদৃশ্য কালীঘাটেই তাঁহার নির্জন সাধনার পবিত্র বেদী সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রসন্ন-সলিলা, পূত-প্রবাহময়ী আদি গঙ্গাতীরে জঙ্গল-সমাকীর্ণ নির্জন স্থানে বাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও ধ্যানে তাঁহার জীবন কাটিয়া যাইত। কথিত আছে, তিনি অন্তর্যোগে নিমগ্ন থাকিয়া ধ্যানে কালীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল নাগা, দণ্ডী, ভৈরব, অবধূত শ্রেণীভুক্ত সন্ন্যাসীরা কালীপীঠ দর্শনার্থী হইয়া সেই স্থানে আগমন করিতেন তাঁহারা তাঁহাকে 'গুরু-ব্রহ্মচারী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভুবনেশ্বরের এই অলৌকিক সাধনা ও নিষ্ঠাবৃত্তি এবং যোগ-শক্তি দেখিয়া যশোহরের রাজা বসন্ত রায় তাঁহার শিষ্য হন।

---

১. পরম প্রাজ্ঞ, সম্বন্ধনির্ণয়কার পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয়ের, ক্রোড়পত্রের ১১ পৃষ্ঠায় এড়ু মিশ্রের বচনোদ্ধৃত করিয়া এবং তৎপর পৃষ্ঠায় যাজ্ঞিক পঞ্চ-মহর্ষি অর্থাৎ ভট্টনারায়ণ শ্রীহর্ষাদির, বল্লাল-প্রদত্ত জীবিকার্থ বাসস্থান তীর্থাবাস ও চতুষ্পাঠী প্রভৃতি সম্বন্ধে যে তালিকা দিয়াছেন,তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার মতে, নাকুলীশিকং এই শব্দে নকুলেশ্বর-ভৈরব সম্বন্ধীয় পীঠস্থান ও 'কৌশিকি' শব্দে কালী বুঝাইতেছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, কালীঘাটের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন, তবে কখনও বা লোকচক্ষে প্রকাশিত কখনও বা রাষ্ট্র-বিপ্লবাদি নানাকারণে লুপ্ত।

২. প্রতাপাদিত্য-ভূপস্ত যশোরভূমিপস্তচ গঙ্গাবাসো স্থলোরাজন ইদানিং বর্ত্ততে নৃপ।

—দিগ্বিজয়-প্রকাশ (৬৯৬ শ্লোক)।

সন্তানাদির মধ্যে ভুবনেশ্বরের এক কন্যা ছিল। খনিয়ান নিবাসী ভবানী দাস চক্রবর্তীর সহিত ভুবনেশ্বর সেই কন্যার বিবাহ দেন। ভবানীদাস সুরাই মেলের, কাশ্যপ-গোত্রীয়, চণ্ডীবর চক্রবর্তীর (তপস্বী) সন্তান। ভবানী দাসের পিতার নাম পৃথ্বীধর। পৃথ্বীধর তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া দীর্ঘকাল গৃহে প্রত্যাগমন না করায় ভবানীদাস পিতৃ-অন্বেষণে বাহির হইয়া নানাস্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে পরিশেষে কালীঘাটে উপস্থিত হন।১

ভবানীদাস কালীঘাটে পৌঁছিয়া ভুবনেশ্বরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বর ভবানীদাসের পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ভবানীদাস ইতিপূর্বেই বিবাহিত, কিন্তু তিনি ভুবনেশ্বরের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার কন্যাকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন।

এই ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সময় নিরূপণ করিবার জন্য একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। ভবানীদাসের পিতা পৃথ্বীধর চণ্ডীবর চক্রবর্তীর (তপস্বী) পুত্র। এই চণ্ডীবর দেবীবর ঘটকের মেল-বন্ধন সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং সুরাই-মেলে পরিগণিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে, দেবীবরের অব্যবহিত পরেই ভুবনেশ্বর বর্তমান ছিলেন। এক্ষণে দেবীবরের সময় নির্ণীত হইলেই ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

যখন স্মার্ত্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য বঙ্গের বর্তমান আচার-ব্যবহার বিধি প্রবর্তক স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহ করেন, নিমাই গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ও ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার আরম্ভ করেন এবং মহাপণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে বিচারে পরাস্ত করিয়া ন্যায়-শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যে সমগ্র ভারতে ও নবদ্বীপে তাঁহার প্রাধান্য সংস্থাপন করেন এবং 'চিন্তামণি-দীধিতি' নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সময়ে ভট্টনারায়ণ হইতে অধঃস্তন ষোড়শ পুরুষে, বন্দ্যবংশে—সর্বানন্দ ঘটকের ঔরসে দেবীবর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ের প্রাচীন ঘটক-কারিকায় দেবীবর সম্বন্ধে যে উক্তিটি আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

এইকালে রাঢ়ে বঙ্গে, লেগে গেল ধূম
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধূম।
কিছু পরে সংকেতের বংশে এক ছেলে,
নামে খ্যাত দেবীবর, লোকে যারে বলে।২
সেই ছোঁড়া মনে করে, কূলে করে ভাগ
তদবধি কূলে আছে ছত্রিশের দাগ।
দোষ দেখে কূল করে, একি চমৎকার
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কূলে হয় সার।

—প্রাচীন ঘটক-কারিকা।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের কিছু পরে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মেল-বন্ধন করেন। ১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃস্টাব্দে, ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সায়ংকালে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। ১৫০৯ খৃস্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। এবং ১৫৩৩ খৃস্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমে অন্তর্ধান হয়েন।৩

১. কালীক্ষেত্র-দীপিকা।

২. দুর্বলীর পুত্র সংকেত, সংকেতের পুত্র অনন্ত, অনন্তের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মীকান্তের পুত্র সর্বানন্দ, ও সর্বানন্দের পুত্র দেবীবর।

৩. চৈতন্যদেবের জন্মকাল ১৪০৭ শকাব্দের ২৩শে ফাল্গুন, ইংরেজী সনের গণনানুসারে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে আছে—

চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুনে।
পৌর্ণমাসী সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণে॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন প্রয়োজন॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্ন হইলা অন্তর্ধান॥

—আদিলীলা।

মেল-বন্ধনের তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই, বহুরূপ হইতে অধঃস্তন নবম পুরুষে এই চণ্ডীবর তপস্বী ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে বর্তমান ছিলেন। চণ্ডীবরের পুত্র পৃথ্বীধরের অন্ততঃ ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান থাকা সম্ভব। এই পৃথ্বীধর ও কালীর প্রথম সেবায়েত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী সমকালীন ব্যক্তি। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী বর্তমান ছিলেন। কালীঘাট এই সময়ে পার্শ্ববর্তী জনসমাজে অবশ্য বিশেষ রূপেই পরিচিত ছিল। কালীদেবীর নাম তখন বর্ধমান, হুগলী, যশোহর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তাহা না হইলে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের মধ্যে কালীঘাট ও তৎসমীপবর্তী ভূভাগসমূহের অতটা বিবরণ পাওয়া যাইত না।

পূর্বে বলিয়াছি, যশোহরের রাজা বসন্ত রায় ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। ভুবনেশ্বরের সময়ে কালীঘাট অতি সামান্য অবস্থায় ছিল। রাজা বসন্ত রায় কালীর পর্ণকুটীর ভাঙ্গিয়া একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। তাহার পর বর্তমান মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান মন্দির বড়িশার জমিদার, সন্তোষ রায়ের আমলে আরম্ভ হয়। পূর্বে বলিয়াছি বসন্ত রায়ের সময়ে কালীঘাট প্রদেশ, যশোহরের জমিদারি-ভুক্ত ছিল। কিন্তু রাজা বসন্ত রায় কালীর সেবার জন্য কোনরূপ ভূমিদান ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন প্রমাণই নাই।

কালীক্ষেত্র-দীপিকাকারের মতে, "এ সময়ে কালীঘাটের অবস্থা অতি সামান্য ছিল। কালীর ক্ষুদ্র মন্দির ব্যতীত, এখানে আর কোন ইষ্টক-নির্মিত গৃহাদি ছিল না। চতুষ্পার্শে বন আর মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি পর্ণকুটীর। ব্রহ্মচারিগণের শিষ্যাদি হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং ভূমির উৎপন্ন ফল মূল ও শস্যাদি ব্যতীত কালীর আর কোন কিছুই আয় ছিল না। এই ষোড়শ শতাব্দীতে কালীঘাট যদি অধিকতর উন্নত অবস্থায় উপনীত হইত, অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা হিন্দুধর্ম-দ্বেষী কালাপাহাড়ের কুদৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কালীদেবীর এই ক্ষুদ্রমন্দির মধ্যে অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। সেগুলি আজও মায়ের মন্দির মধ্যে বর্তমান। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, ভুবনেশ্বর শক্তি-মন্ত্রোপাসক হইলেও তান্ত্রিক কাপালিকের ন্যায় বিষ্ণু-দ্বেষী ছিলেন না।

ভুবনেশ্বরের এই একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন পুত্র-সন্তানাদি ছিল না। এই সময়ে কালীঘাটের আয় দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছিল, এজন্য তাঁহার জামাতা ভবানীদাস কালীঘাটে বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। কালীঘাটে ভবানীর রাঘবেন্দ্র নামে এক পুত্র হয় ও পূর্ব-পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভে যাদবেন্দ্র ও রাজেন্দ্র নামে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। ভুবনেশ্বরের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ভবানীদাস শ্বশুরের স্থানে কালীর সেবায়েত ও অধিকারী হয়েন। যথাস্থানে আমরা ভুবনেশ্বরের ও ভবানী দাসের বংশবৃক্ষ প্রদান করিলাম।[১]

সাবর্ণ-বংশীয় কামদেব ব্রহ্মচারী হইতেই — [illegible] সহিত, সাবর্ণ-বংশের প্রথম সম্বন্ধ। কামদেবের একমাত্র নিরুদ্দিষ্ট পুত্র — লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার, এই সাবর্ণ পরিবারের আদি পুরুষ। লক্ষ্মীকান্ত, মানসিংহের নিকট জমিদারি প্রাপ্তির পরও, কালীর সেবার জন্য — কোন সম্পত্তি স্থায়ী-ভাবে দান করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ আর কিছুই নহে — সেই সময় বঙ্গদেশের চারিদিকেই রাষ্ট্র-বিপ্লব। বাদসাহ-প্রদত্ত, জমিদারির শাসন-শৃঙ্খলা সাধন করিতে, প্রায় দুই পুরুষ সময় লাগিয়াছিল। এই জমিদারির শৃঙ্খলা সাধনের জন্যই, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে, লক্ষ্মীকান্তের বংশধরগণ নিমতায় আগমন করেন—তৎপরে তাঁহাদের বড়িশায় বাস হয়। এই জন্যই, আমরা তাঁহার বংশধর কেশব রায় ও সন্তোষ রায়ের (শিবদেব)

১. অনেকে অনুমান করেন, ভবানীদাসের বংশধরগণ বংশ-বিস্তারের সহিত, কালীঘাট, ভবানীপুর, চরকডাঙ্গা, গোবিন্দপুর, প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। ধরিতে গেলে, ভবানীদাস ও তাঁহার বংশধরেরা, কালীঘাটের ও ভবানীপুরের জঙ্গল-কাটানো অধিবাসী। অনেকের অনুমান এই ভবানীদাস হইতে ভবানীপুর নামকরণ হইয়াছে।

আমলে, কালীঘাটের সহিত তাঁহাদের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। সন্তোষ রায় নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলের লোক। পরে ইহাঁর বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

কালীঘাটের উন্নতি সম্বন্ধে, প্রধান উপলক্ষ্য এই সাবর্ণ-জমিদার। ইঁহাদের সহায়তা না থাকিলে, কালীঘাটের বর্তমান উন্নতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। বর্তমান কালের এ সুবৃহৎ মন্দিরও নির্মাণ হইত না। সাবর্ণ-জমিদারগণ কলিকাতার দক্ষিণ-অঞ্চলের সমাজপতি ছিলেন। তাঁহারা কৌলীন্য-মর্যাদা না পাওয়াতেও, পরিণামে চারি-মেলের কুলীন-সন্তানগণের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, সামাজিক প্রাধান্য লাভ করেন। কেবল কলিকাতার দক্ষিণ-অঞ্চলে নহে তৎকালীন কলিকাতা সমাজেও ইহাঁদের যথেষ্ট আধিপত্য ছিল। সন্তোষ রায় প্রসঙ্গে পাঠক পরে সে সব ঘটনা জানিতে পারিবেন।

কালীর সেবায়েতের নাম	সার্বর্ণ-চৌধুরী জমিদার	প্রাদুর্ভাবের সময়	মন্তব্য
ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী (কালীঘাট)		১৬ শতাব্দীর মধ্যভাগ আকবর বাদসাহের সময়	রাজা বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক
(১) ভবানীদাস চক্রবর্তী (জামাতা)	কামদেব গঙ্গোপাধ্যায় (ব্রহ্মচারী)	১৬ শতাব্দীর শেষভাগ	
(২) রাঘবেন্দ্র (পুত্র)	লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার (পুত্র) (গোপালপুর)	১৭ শতাব্দীর প্রথমভাগ (মানসিংহের সমকালীন)	
(৩) রামগোপাল (পুত্র)	গৌরহরি (পুত্র) (নিমতা বিরাটি)	ঐ মধ্যভাগ	
(৪) রামবল্লভ (পুত্র)	শ্রীমন্ত (পুত্র)	ঐ শেষভাগ	
(৫) বিশ্বনাথ (৩য় পুত্র)	কেশবরাম রায়চৌধুরী (জমিদার বড়িশা)	১৮ শতাব্দীর প্রথম। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমল	
(৬) গোকুল হালদার (পুত্র)	সন্তোষ রায়চৌধুরী (৪র্থ পুত্র)	ঐ মধ্য ও শেষ ভাগ নবাব আলিবর্দি খাঁর আমল (১৭৫১)	
(৭) পার্বতী হালদার (ভ্রাতুষ্পুত্র)	রাজীবলোচন রায়চৌধুরী (ভ্রাতুষ্পুত্র)	১৯ শতাব্দীর প্রথম ভাগ	

পর পৃষ্টায় আমরা একটি তালিকা প্রদান করিতেছি। ইহা হইতে পাঠক ষোড়শ শতাব্দীতে, কামদেব ব্রহ্মচারীর সময় হইতে উনবিংশ শতাব্দীর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বড়িশার সাবর্ণী-জমিদার ও কালীর সেবায়েত হালদার বংশের ও তাঁহাদের সমকালীন ব্যক্তিগণের প্রাদুর্ভাব, তুলনায় সমালোচন করিতে পারিবেন। যথোপযুক্ত স্থানে হালদার মহাশয়দের ও সাবর্ণ-চৌধুরীদিগের বংশবৃক্ষও সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।[১] (৯৭ পৃঃ দেখুন।)

১. উপরোক্ত তালিকায় ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর আমল—অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের সময় হইতে নবাব আলিবর্দির আমলের প্রথম অংশ পর্য্যন্ত কালীদেবীর সেবায়েত ও অধিকারীগণের নাম প্রদত্ত হইল। সমগ্র বংশবৃক্ষের তালিকা, পূর্ণভাবে প্রদান করা আমাদের এ গ্রন্থে অসম্ভব। এই বংশবৃক্ষের জন্য, আমরা কালীক্ষেত্র-দীপিকার গ্রন্থকার সূর্যবাবুর নিকট ঋণী। তিনি এই সমস্ত প্রাচীন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া না রাখিলে এতদিনে ইহা হয়ত বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত হইত। উল্লিখিত বংশাবলী হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ও তাঁহার দৌহিত্রবংশ হইতেই কালীদেবীর নিয়মিত সেবা আরম্ভ হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা জ্ঞাতিবিবাদে কালীঘাট হইতে ভবানীপুর ও সেকালের গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। হালদারদের যত্নেই ইহাঁদের আত্মীয়-কুটুম্বগণ ভবানীপুর, কালীঘাট ও গোবিন্দপুরে বসবাস করিয়া এই সকল স্থানে ব্রাহ্মণ অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। এই জন্য কলিকাতার সামাজিক ইতিহাসে, এই হালদার মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

কালীর সেবায়েত হালদার-মহাশয়গণের বংশবৃক্ষ
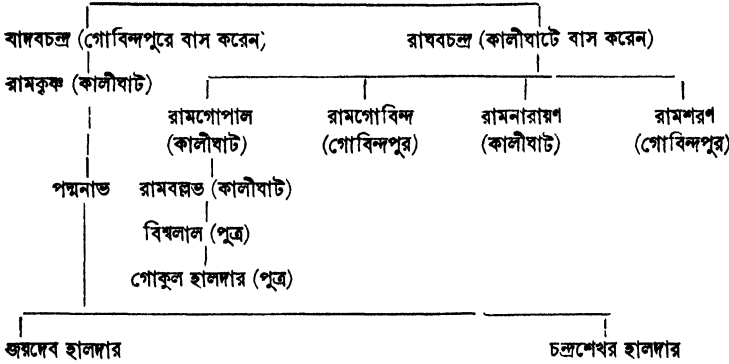
কেশব রায় কি উদ্দেশ্যে বড়িশাগ্রামে আগমন করেন, আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। যথাস্থানে আমরা সাবর্ণী-চৌধুরীদেরও একটি বংশবৃক্ষ প্রদান করিলাম। ইহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, কেশব রায়ের পাঁচ পুত্র জন্মে। তাঁহার চতুর্থ পুত্র শিবদেবই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও দানশীল ছিলেন। তখন এ অঞ্চলে তাঁহার ন্যায় বলীয়ান ব্যক্তি খুব কম ছিল। তিনি ভীমের ন্যায় আহার করিতে পারিতেন। আর এই প্রচুর আহারের ফলেই তিনি নবাব আলিবর্দি খাঁর নিকট আবজাখালি মহল 'খোরাকি-মহল' রূপে পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[১]

এই সন্তোষ রায়ের দান-শক্তির জন্য তাঁহার নাম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। যে কেহ প্রার্থী হউক না কেন তাঁহার কোন প্রার্থনা লইয়া গেলে নিরাশ হইত না। কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়. গৃহনির্মাণ, চতুষ্পাঠী-স্থাপন, ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রার্থী প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদের সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন বলিয়া 'সন্তোষ' নামে পরিচিত

১. জনপ্রবাদ এই, বঙ্গে বর্গীর-হাঙ্গামার সময়ে নবাব আলিবর্দি খাঁ, সন্তোষ রায়ের নিকট অনেক টাকা বাকি রাজস্বের জন্য দাবি করেন। সন্তোষ রায় টাকা দিতে না পারায়, নবাব কতৃ'ক বন্দী হন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, সন্তোষ রায় প্রচুর আহার করিতে পারিতেন। মুরশিদাবাদের নবাব কারাগারে অর্ধভুক্ত অবস্থায় থাকিয়া এবং নিজের অভ্যাসমত আহারাদি না পাইয়া তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। একদিন তিনি নবাবের এক ছাগরক্ষকের হস্ত হইতে একটি ছাগল কাড়িয়া লন। নিজের পাচকের দ্বারা সেটি পাক করাইয়া সমগ্র ছাগ-মাংস একাই আহার করেন। কথাটা নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সন্তোষ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করেন। সন্তোষ রায়ের কথায় বিশ্বাস না হওয়ায় নবাব তাঁহাকে পরদিন আর একটি ছাগ প্রদান করেন। একটি সমগ্র ছাগমাংস রায় মহাশয়কে বিনাকষ্টে ভক্ষণ করিতে দেখিয়া নবাব বলিলেন, "আমি তোমার এই অদ্ভুত আহার দৃষ্টে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে লোক নিজে এরূপ অতিভোজন করে সে কখনও আমার রাজস্ব দিতে পারিবেনা। অতএব আমি তোমার নিকট প্রাপ্য-খাজনা মকুব করিয়া এবার তোমায় মুক্তি দিলাম। আর ভবিষ্যতে যাহাতে এই আহারের দায়ে খাজনা বাকি না ফেল তজ্জন্য তোমায় একটি মহল নিষ্কবে দান করিতেছি।" সন্তোষ রায় নবাবের নিকট হইতে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট-বর্তী 'আবজাখালি মহল' তাঁহার খোরাকি বাবত ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন।

হন। নবাবি আমলের সেহা এবং নানাবিধ প্রাচীন দানপত্র ও দলিলে, তিনি 'সন্তোষ রায়' এই নামেই পরিচিত। তাঁহার প্রকৃত নাম 'শিবদেব' বলিলে লোকে তাঁহাকে চিনিতে পারিত না। কেশব রায়ের পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে এই সন্তোষ রায়ই বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এদেশে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। ইহা সেকালের বাঙ্গলার একটি স্মরণীয় ঘটনা। লুণ্ঠন-পরায়ণ, মহারাষ্ট্রীয় দস্যুবর্গের উৎপাতে, শান্তিময় বঙ্গদেশ বড়ই ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বর্গীর জ্বালায়, লুণ্ঠনের ভয়ে, লোকে গ্রাম নগর ত্যাগ করিয়া নানাস্থানে পলাইতে লাগিল। গ্রাম জনশূন্য, ক্ষেত্র শস্যশূন্য সমৃদ্ধসম্পন্ন প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠিত। বড় বড় জমিদারগণও এই সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ—চৌথ দানে স্বীকৃত হওয়ায় বর্গীরা শান্তভাব ধারণ করে।

বর্গীরা ত শান্ত হইল। কিন্তু এ 'চৌথ' আদায় হইবার উপায় কই? চৌথ দূরে থাক, চাষবাস না হওয়ার জন্য, বাঙ্গালার তৎকালীন জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে কিছুই আদায় করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গলার নবাব ছাড়িবেন কেন? তিনি জমিদারদিগকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। জমিদারেরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নদীয়ার রাজা, স্বনামপ্রসিদ্ধ বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলিবর্দি খাঁ কর্তৃক বাকি খাজনার দায়ে কারাবদ্ধ হয়েন। এই দাবির পরিমাণ বার লক্ষ টাকা। বড়িশার সাবর্ণ-জমিদার সন্তোষ রায়ও এই সময়ে সরকারি খাজনার দায়ে, মুরশিদাবাদে কারাবদ্ধ হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলিবর্দিকে তাঁহার কলিকাতার জমিদারি মধ্যে সিংহ-ব্যাঘ্রের গর্জন শোনাইয়া, বাকি খাজনার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন তাহাও পূর্বে বলা হইয়াছে।

সন্তোষ রায় মুরশিদাবাদ হইতে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিয়া, অতি সমারোহে কালীঘাটে মায়ের পূজা করেন। এতদুপলক্ষে অসংখ্য ব্রাহ্মণ-ভোজন করান এবং কালীঘাটের সেবায়েতগণের মধ্যে অনেককে ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর দান করেন। দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির তায়দাদে দেখা যায় যে, ১১৫৭ সালে অর্থাৎ ইং ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মনোহর ঘোষাল ও কালীঘাটের তদানীন্তন সেবায়েত জনৈক গোকুল হালদার ও অপরাপর অনেককে সন্তোষ রায়—তাঁহার জমিদারির নানাস্থানে বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। সন্তোষ রায় ঘোর শাক্ত ছিলেন। তিনি বড়িশার মধ্যে নানাস্থানে শিবমন্দির ও কালীঘাটের বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। শিব মন্দিরগুলি আজও অর্ধভগ্নাবস্থায়, বড়িশায় বর্তমান। কথিত আছে, মুরশিদাবাদ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর জীবদ্দশাকালের মধ্যে সন্তোষ রায় লক্ষবিঘা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া 'সন্তোষ' নামের সার্থকতা দেখাইয়া গিয়াছেন।[১]

কালীমূর্তি প্রকাশের পর কোন সময়ে কোন ধর্মাত্মা ব্যক্তি দ্বারা কালীর প্রথম মন্দির

১. আমরা একটি প্রাচীন কিংবদন্তী শুনিয়াছি যে, এক সময়ে কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সন্তোষ রায়ের কালীঘাটে সাক্ষাৎ হয়। মহারাজ তাঁহার রাজোচিত সমৃদ্ধি দেখাইবার জন্য অনেক আশা-শোটা, নকীব, বরকন্দাজ, হাতী, ঘোড়া, পালকী ইত্যাদি সঙ্গে আনেন। সন্তোষ রায় সামান্য বেশে সামান্য ভাবে তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় ও অল্প-সংখ্যক ভৃত্য ও শরীর রক্ষক লইয়া কালীঘাটে গিয়াছিলেন। তাঁহার অলক্ষ্যে মহারাজার পক্ষ হইতে একজন লোক বলেন, 'শুনিয়াছি—সন্তোষ রায় লক্ষবিঘা ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছেন, মস্ত জমিদার, কিন্তু তাঁহার হাতী ঘোড়া, আশা-শোটা, বরকন্দাজ একটিও নাই।' কথাটা সন্তোষ রায়ের কানে যায়। তিনি তখনই চারি-মেলের শতাধিক গণ্যমান্য সুপণ্ডিত কুলীনসন্তানগণকে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া বলেন, 'মহারাজ! ইহারাই আমার আশা-শোটা ও বরকন্দাজ। ইহারাই আমার হাতী ঘোড়া এবং উট-পালকী। চারি মেলের এই নবধাকুললক্ষণ-বিশিষ্ট, মহাকুলীনগণকে আমি ব্রহ্মোত্তর দিয়া বাস করাইয়াছি। বলা বাহুল্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই ব্যাপারে বড়ই অপ্রতিভ হন। বস্তুতঃ সে সময়ে, সন্তোষ রায়ের মত দাতা কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে খুব কম ছিল। তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর লইয়া এখনও অনেকে জীবন যাপন করিতে-ছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, শিবমন্দির, কালীঘাটের কালীমন্দির এখনও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

নির্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সময়ে কালীর একটি মাত্র ক্ষুদ্র মন্দির ছিল। এই মন্দির যশোহরের রাজা বসন্ত রায় কর্তৃক নির্মিত, এইরূপ প্রবাদ আছে। বসন্ত রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐ ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বে কালীমূর্তি এক পর্ণ-কুটীর-মধ্যে রক্ষিত হইত।

একটি প্রবাদ আছে যে, কেশব রায় কালীর জন্য এক ক্ষুদ্র ইমারত প্রস্তুত করাইয়া দেন এবং তাঁহার পুত্র সন্তোষ রায় ঐ ইমারতের স্থানে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু ইহাও প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বাঙ্গালাদেশের মন্দির প্রভৃতি ইমারত বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে। এখনও তিন চারি শত বৎসরের পুরাতন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। সন্তোষ রায় যে ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করেন তাহা যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সময়ে ভাঙ্গিয়া গেল, একথা প্রামাণিক নহে। তবে একটি ঘটনা যাহা আমরা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা যদি নিতান্ত কল্পিত না হয়, তাহা হইলে বোঝা যায়, কোন সামাজিক কারণে সন্তোষ রায় সমাজ-পতি রূপে অনেক টাকা প্রাপ্ত হন। সেই টাকাটা তিনি সমাজে বিতরণ না করিয়া বর্তমানের সুবৃহৎ কালীমন্দির নির্মাণার্থে দান করেন। এই ব্যাপারে সন্তোষ রায় নগদ পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। সম্ভবত সন্তোষ রায় কালীর সাবেক মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র ভাবিয়া তাহা বড় করিয়া নির্মাণের জন্য এই টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক না কেন, কালীঘাটের বর্তমান মন্দির সন্তোষ রায়ের আমলেই তাঁহার প্রদত্ত অর্থে নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তিনি এই সুবৃহৎ মন্দিরের নির্মাণকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত দেখিতে পান নাই। সন্তোষ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রামলাল রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায়ের বর্তমান বড় মন্দির ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়।[১] আজকাল আমরা যে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবী কালিকার পূজা দিয়া থাকি তাহা এক শতাব্দীর উপর নির্মিত। আজও অচল অটল ভাবে থাকিয়া এই মাতৃমন্দির সন্তোষ রায়ের স্বর্ণময় কীর্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। 'কালীক্ষেত্র-দীপিকা'কার বলেন, "সন্তোষ রায় কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের সমাজ-পতি ছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতার তদানীন্তন প্রধান ধনী বাবু কালীপ্রসাদ দত্ত কোন সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে দক্ষিণ সমাজের ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করেন। সন্তোষ রায় বড়িশা, সরশুনা, বেহালা, কালীঘাট প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণগণকে উক্ত কালীপ্রসাদ দত্তের বাটিতে সভাস্থ হইতে অনুমতি দান করেন। এই জন্য ব্রাহ্মণদিগের সম্মান ও বিদায় জন্য কালীপ্রসাদ দত্ত ২৫ হাজার টাকা সমাজপতি সন্তোষ রায়ের নিকট পাঠাইয়া দেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, সাবর্ণ মহাশয়েরা ঘোর শাক্ত। বিশেষত এই সময়ে কালীঘাটের অনতিদূরে কলিকাতার উন্নতির সহিত, কালীঘাটে যাত্রীসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু দেবীর তদুপযুক্ত মন্দিরাদি ছিল না। বহুকালের পুরাতন যে ছোট মন্দির ছিল, তাহা ক্রমশ জীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। এই জন্য কালী-প্রসাদ দত্ত প্রদত্ত টাকা সামাজিক ব্রাহ্মণগণকে বিভাগ করিয়া না দিয়া সন্তোষ রায় সমাজস্থ

১. বেহালার সাবর্ণ চৌধুরী পরিবারের সন্তোষ রায় কলিকাতা ও তাহার দক্ষিণ উপনগরের হিন্দু সমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ মহাজন কালীপ্রসাদ দত্ত কলি-কাতার দক্ষিণ উপনগর সমূহের ব্রাহ্মণগণকে কোন সামাজিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করেন। সন্তোষ রায় বড়িশা, সরশুনা, কালীঘাট প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য কালীপ্রসাদ দত্তের বাড়িতে তখন যাইতে অনুমতি প্রদান করেন। কালীপ্রসাদ দত্ত ব্রাহ্মণদের সম্মান রক্ষার্থে ২৫,০০০ টাকা বিদায় স্বরূপ সন্তোষ রায়ের নিকট প্রেরণ করেন। সাবর্ণ চৌধুরীরা শাক্ত। সে সময়ে কালীঘাটের যাত্রী সংখ্যা সর্বাধিক প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যে মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন, তাহাও ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদের সহিত লইয়া কালীপ্রসাদ দত্ত প্রদত্ত টাকায় কালীর মন্দির নির্মাণ করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই নূতন মন্দির প্রস্তুত হইবার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রামনাম রায় ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার কার্য শেষ করেন।—কালীঘাটের ইতিবৃত্ত, বিহারীলাল আঢ্য, অর্চনা, আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

ব্রাহ্মণগণের অভিমত লইয়া সেই টাকায় কালীর পুরাতন ছোট মন্দির ভাঙ্গিয়া বড় মন্দির নির্ম্মাণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

কিন্তু কি ব্যাপারে কালীপ্রসাদ দত্তের নিকট সন্তোষ রায় এই পঁচিশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন তাহার একটি সুন্দর গল্প প্রাণকৃষ্ণ বাবু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।[১] আমরা সেটি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সকল গল্পই একেবারে ভিত্তিহীন হয় না। তাহার মূলে কিছু না কিছু সত্য থাকে। এই গল্পটি হইতে তৎকালীন সমাজের লোকের অবস্থা, মতিগতির ও রেষারেষির ব্যাপার জানিতে পারা যায়।[২] যে সামাজিক দলাদলির ব্যাপার লইয়া সেই সময়ে কলিকাতায় একটা মহা হুলস্থূল ঘটিয়াছিল তাহা এই।—

শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ মহারাজ পলাশী-যুদ্ধের পরে প্রচুর ধনশালী ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়াতে সে কালের বনিয়াদি ধনবানদের অনেকেরই চক্ষুশূল হন। চূড়ামণি দত্ত নামক এক ধনী-কায়স্থ, রাজার প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামে গ্রে-স্ট্রীট হইতে চিৎপুর-রোড পর্য্যন্ত একটি বিস্তীর্ণ রাস্তা আজও বর্ত্তমান। পূর্ব্বে উহা রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মসজিদবাড়ী স্ট্রীট হইতে নীলমণি সরকারের লেন, যেখানে কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীটে পড়িয়াছে, ঠিক তাহার সম্মুখে চূড়ামণি দত্তের দক্ষিণ-মুখী দরজা ছিল। ফটক নহে বৃহৎ চৌকাটওয়ালা দরজা। গৃহমধ্যে সুপ্রশস্ত চাঁদনী-ওয়ালা উঠান এবং তাহার চারিদিকে দ্বিতল গৃহ। গৃহের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট। পশ্চিম সীমা বালাখানা স্ট্রীট। উত্তর সীমার অধিকাংশ রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জমি।

এই চূড়ামণি দত্তের সামাজিক ব্যাপার লইয়া রাজার বিবাদ বিসম্বাদ চলিত। উভয়ে উভয়কে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি চিত্তরঞ্জক গল্পের উল্লেখ করা বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গল্পটি এই, একদিন এক ব্রাহ্মণ, একটি ছোট পাথরবাটি লইয়া রাজা নবকৃষ্ণের বাটিতে গিয়া তৎপুত্র গোপীমোহন বাবুকে বলেন, "আমার ছেলের কান পাকিয়াছে, একটু পচা আতর যদি দেন তাহা হইলে তাহার কানে দিই।" রাজকুমার সরলচিত্ত ব্রাহ্মণকে আতরের জন্য বাটি আনিতে দেখিয়া আমোদ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! চূড়ামণি-বাবুর নিকটেই এইরূপ আতর আছে, কিন্তু যে রকম উঁচু মেজাজের লোক, আপনি অত ছোট বাটি হাতে করিয়া গেলে, হয়ত তিনি বিরক্ত হইতে পারেন। যদি তাঁর কাছে যান, ত একটা কলসী লইয়া যাইবেন।" সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাই করিলেন। চূড়ামণি বাবু তখন তৈল মাখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, পুত্র কালীপ্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আগে গন্ধী (আতরওয়ালা) ডাকাইয়া, এই ব্রাহ্মণকে এক কলস আতর দাও, পরে আমি স্নান করিব।" ব্রাহ্মণের সম্মুখেই আড়াই হাজার টাকার আতর কিনিয়া, তাঁহার কলসী ভরিয়া দিয়া বলা হইল "দেখ ঠাকুর! গুপী ছেলেমানুষ। তুমি নবকে গিয়া এই আতর দেখাইয়া, আবার আমার নিকট লইয়া আইস।" চূড়ামণিবাবু বয়োজ্যেষ্ঠ। এই জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণকে নব বলিয়া ডাকিতেন।

ব্রাহ্মণ রাজবাটিতে গিয়া সেই আতর-ভরা কলসী দেখাইয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে, চূড়ামণি দত্ত এই আতর-ঘটিত সমস্ত রহস্য ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন "নব আমাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্যই, কলসী দিয়া পাঠাইয়াছিল। তা সে আমাকে কোনরূপে ঠকাইতে পারিল না। তা ঠাকুর! এত টাকার আতর লইয়া তুমি কি করিবে? তোমায় নগদ আড়াই

১. প্রাণকৃষ্ণবাবু—প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাচীন কলিকাতা সম্পর্কিত ইহার রচিত প্রবন্ধসমূহ সম্প্রতি 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

২. কালীপ্রসন্নী হাঙ্গামা—এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ, ১ম সংস্করণ, গ্রন্থ পৃ. ৫২—৫৪ দ্রষ্টব্য।

হাজার টাকা যাহা এই আতরের মূল্য, তাহাই দিতেছি।" ব্রাহ্মণ টাকা লইয়া অতি আনন্দিত চিত্তে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু জেদে পড়িয়া কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য, চূড়ামণি বাবুর পাঁচহাজার টাকা খরচ হইয়া গেল।

আর একটি গল্প এই —একবার কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে, চূড়ামণি দত্তের কন্যা রাজবাটিতে নিমন্ত্রণ রাখিতে যান। তাঁহার অঙ্গুরীতে একখানি বৃহৎ অথচ বহুমূল্য নীলকান্তমণি ছিল। দত্ত-কন্যা, নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবামাত্র, উপরিস্থিত লোহিতবর্ণের সামিয়ানা, ময়ূরপংখীর রং ধারণ করিল এবং চারিদিক হইতেই এক অপূর্ব জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। রাজা ইহার কারণানুসন্ধান করায়, বাটির মহিলাগণ দত্ত-কন্যাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া উক্ত নীলাযুক্ত অঙ্গুরী দেখান। রাজা নবকৃষ্ণ অঙ্গুরীনিবদ্ধ প্রস্তরের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। কন্যা গৃহে আসিয়া, পিতাকে সমস্ত ঘটনা বলিলে, তিনি অন্য উপহারের সহিত, উক্ত অঙ্গুরীয়টিও রাজবাটিতে প্রেরণ করেন।

১৭৯৭ খৃস্টাব্দের ২২শে নভেম্বর, শয়ন-গৃহের খটেবাপরি, নিদ্রিতাবস্থায় সকলের অলক্ষিতে, মহারাজ নবকৃষ্ণ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সে কালে গঙ্গাতীরস্থ হইয়া মৃত্যু না হইলে লোকে তাহাকে অপঘাত মৃত্যু বলিয়াই বিবেচনা করিত। সজ্ঞানে, গঙ্গায় ত্রিরাতবাস করিয়া নাভিদেশ পর্যন্ত গঙ্গাজলে ডুবাইয়া, 'গঙ্গানারায়ণ-ব্রহ্ম' জপ করিতে করিতে, হরিনামোচ্চারণ করিয়া যে মৃত্যু, তাহাই সেকালের হিন্দুরা বাসনা করিতেন। সুতরাং রাজার মৃত্যুতে, সাধারণ লোকে একটু কাণাঘুসা করিতে থাকে। চূড়ামণি দত্তের পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবামাত্রই, তিনি বহুসংখ্যক ঢুলি আনাইয়া, নিজে একখানি রৌপ্যের চতুর্দোলে বসিয়া, গঙ্গাযাত্রায় চলিলেন। অগ্রপশ্চাৎ অসংখ্য লোহিত-বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগরকীর্তন। চতুর্দোলটি নানা রকমে সাজান। নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসীমালার ঝালর, চারিদিকে তুলসীগাছ, আর তার মধ্যে চূড়ামণি দত্ত আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী ও গলায় এবং হাতে জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা 'চুড়া যায় যম জিনতে' এই বোল বাজাইতে লাগিল। কীর্তনীয়ারা গাহিতে লাগিল—

"আয়রে আয়—নগরবাসী! দেখবি যদি আয়।
জগৎ জিনিয়া চূড়া—যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়া—যম জিনিতে যায়।
জপ-তপ কর, কিন্তু মরিতে জানিলে হয়।"

রাজবাটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া, এই গান গাহিবার পর, চূড়ামণি দত্ত সদলবলে গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজবাটির লোকে, চূড়ামণি বাবুর এই কঠোর-বিদ্রূপে বড়ই মর্মাহত হইলেন। কয়েক দিন গঙ্গাবাস করিয়া, চূড়ামণি দত্ত পরিশেষে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন।

এদিকে আবার নূতন বিভ্রাট উপস্থিত! মহাসমারোহে চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের জোগাড় হইতেছে, এমন সময়ে চারিদিকে জনরব উঠিল যে কালীপ্রসাদ বাবু, এক মোগল-বাইওয়ালীর গৃহে প্রায়ই রাত্রিযাপন করেন, সুতরাং তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে, কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হইবেন না। কায়স্থ-শ্রেণীর জন্য, কর্মকর্তা কালীপ্রসাদ দত্ত, ততটা উদ্বিগ্ন হন নাই, কারণ সে সময়ে কলিকাতার কায়স্থদিগের অনেকগুলি দল ছিল। তিনি আশ্বাস পাইলেন, রাজাদের দল ব্যতীত, অন্য সকল দল উপস্থিত হইবে কিন্তু ব্রাহ্মণদলের জন্য তাঁহার বড়ই চিন্তা হইল। কলিকাতা ও তৎসন্নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণ, রাজবাটির বৃত্তিভোগী ও অনুগত। ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত না থাকিলে এবং দানগ্রহণ না করিলে, কিরূপে তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতে পারে? এই বিপদে পড়িয়া, কালীপ্রসাদ বাবু সে কালের রামদুলাল সরকার মহাশয়ের (ছাতুবাবু-লাটুবাবুদের আদিপুরুষ) সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। সরকার মহাশয়, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া, বড়িশায় আসিলেন এবং বৃদ্ধ সন্তোষ রায়ের নিকটে, কালীপ্রসাদের উপর সমাজের সমস্ত অত্যাচারের কথা জানাইলেন। পরি-

শেষে এই মহাদায়োদ্ধারের জন্য, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করায়, সন্তোষ রায় তাঁহাদের নির্ভাবনায় থাকিতে বলেন।

সন্তোষ রায় সেই কুলে-শীলে ধনে-মানে একজন নামজাদা লোক। যিনি নবাব আলিবর্দির নিকট হইতে "খোরাকী-মহল" আদায় করিতে পারেন, তিনি বড় সহজবুদ্ধির লোক নহেন। ধরিতে গেলে, দক্ষিণ-বঙ্গের মধ্যে তিনিই তখন সমাজপতি। অসংখ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা কেশব রায়ের ও তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়া, আজও জীবনযাপন করিতেছেন। সন্তোষ রায় কালীপ্রসাদ বাবুকে অভয় দিয়া, এই সমস্ত দলস্থ ব্রাহ্মণকে লইয়া, শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হন। কালীপ্রসাদ বাবু, এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে উক্ত ব্রাহ্মণদের বিদায়ের জন্য পঁচিশ হাজার টাকা দান করিলে, সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদের বলেন, "দেখুন! আমরা যদি এই টাকা লই, তাহা হইলে লোকে বলিবে, যে আমরা টাকার লোভে পড়িয়া, এক পতিত ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এ অপবাদভার বহন করা অপেক্ষা, এই টাকা ধর্মার্থে ব্যয় করিলে, কেহ একটি কথাও বলিতে পারিবে না।" সন্তোষ রায়ের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য, সকলেই এক মতে গ্রহণ করায় ঐ টাকা কালীর মন্দির নির্মাণের জন্য প্রদত্ত হইল।

মায়ের বর্তমান মন্দিরটি, আটকাঠা ভূমির উপর নির্মিত। ইহা উচ্চে ৬০ হাত। ইহার ভিতরের পরিসর ৫০ হাত। এই মন্দির নির্মাণ হইতে, সাত আট বৎসর লাগিয়াছিল। সেকালে, শতাধিক বৎসর পূর্বের ত্রিশ হাজার টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছে। সন্তোষ রায়ও এ মন্দির নির্মাণে নিজ তহবিল হইতে এসম্বন্ধে বহু অর্থব্যয় করেন।

এক্ষণে এই কালীমন্দির সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিয়া, আমরা কালীঘাটবৃত্তান্ত শেষ করিব।

কালীর মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে ৫৯৫।৪।৶ বিঘা ভূমি, কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পঞ্চান্নগ্রামের খাসপুর-মহলের অন্তর্গত ৬ সংখ্যক প্রাচ্য ডিভিজনের E. F. M. P. Q. প্রভৃতি সব-ডিভিজনে এই সমস্ত দেবোত্তর ভূমি আজও দেখা যায়। এই দেবোত্তর দান সম্বন্ধে, অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন— এ সমস্ত সন্তোষ রায় কর্তৃক প্রদত্ত। অন্য মতে, পুরাকালের হিন্দু ক্ষত্রিয়রাজগণ ঐ ভূমি দেবোত্তর রূপে দান করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি বিরুদ্ধ মতের সমর্থক কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। আমরা এ সম্বন্ধে 'কালীক্ষেত্র-দীপিকা'-কারের মীমাংসা, এস্থলে সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি।

সাবর্ণ-চৌধুরীদের প্রদত্ত ভূমির তায়দাদে (৭৪ পৃঃ দেখুন) কালীঘাট গ্রামের দেবোত্তর ভূমির কোন উল্লেখ দেখা যায় না। উক্ত তায়দাদের লিখিত ভূমি, কালীঘাটের বাহিরে, অন্যান্য গ্রামের ও ভিন্ন ভিন্ন পরগনার অন্তর্গত। এই তায়দাদ দেখা যায়—যে কালীর সেবায়েত ব্যতীত, অন্যান্য বহুতর লোককে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও লাখেরাজ দান করা হইয়াছে। এ সকল দানও ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে। একটিও কালীঘাটের মধ্যে নহে। কালীমাতার সমস্ত সম্পত্তি—সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়দের প্রদত্ত হইলে, কোন না কোন তায়দাদে তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ থাকিত। ঐ তায়দাদ দৃষ্টে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে সাবর্ণ-চৌধুরী সন্তোষ রায় মহাশয়, আপন জমিদারির অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামের ভূমি, কালীর সেবার জন্য দান করিয়াছেন। সন্তোষ রায়ের উক্ত ভূমি দানের সময়, কালীঘাট গ্রাম দেবোত্তররূপে বর্তমান না থাকিলে, দেবোত্তর দানের চিঠায়, অগ্রে কালীঘাটের জমির দান লিখিত হইত। কালীর পুরীর নিকটের জমি অধিকারে থাকিতে কালীর সেবায়েতগণ, দূরে দেবোত্তর জমি কেন দানরূপে পাইলেন ইহার কারণ বুঝা যায় না। এতদ্ব্যতীত সন্তোষ রায়ের পিতা কেশব রায় কর্তৃক এরূপ কোন দেবোত্তর দানের কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

কেশবরাম রায় চৌধুরী, ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের পর, নিমতা-বিরাটি হইতে বড়িশায় আসিয়া বাস করেন। এই সময়ে, কলিকাতার সন্নিহিত গ্রামসমূহ অতি জঙ্গলময় অবস্থায় ছিল। তবে মধ্যে মধ্যে লোকজনের বাস ছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দের পর, ইংরাজেরা গোবিন্দপুর হইতে অধিবাসী-

দের বাস উঠাইয়া দিলে, তাঁহাদের অনেকে ভবানীপুর, কালীঘাট প্রভৃতি অদূরবর্তী গ্রামসমূহে গিয়া বাস করেন। তখন এ সকল স্থানে যথেষ্ট ব্যাঘ্রাদির ভয় ছিল।[১]

গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া আসিয়া, কালীঘাটে ও উহার উত্তর প্রান্তে চড়কডাঙ্গায় বাসস্থান নির্মাণ করিবার পর, কালীর সেবায়েত ভবানীদাসের পৌত্রগণ, বল্লালীমতে কুলক্রিয়া আরম্ভ করেন। তাঁহারা ভাগিনেয় বা দৌহিত্র-দিগকে, কালীঘাটে বাসজন্য, দেবোত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, এই সময়কে ভবানীপুর ও কালীঘাট গ্রামের সংস্থাপনের সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। কালীর সেবায়েতগণের যত্নেই কালীঘাটে কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রথম বাস হয়।

পরে ইংরাজেরা কলিকাতায় রাজধানী স্থাপন করিলে, ইহা ক্রমশ জনাকীর্ণ হইতে থাকে। ইহা হইতে দেখা যায়, বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরীদের প্রাধান্যের পূর্বেই, কালীঘাট গ্রাম. কালীর সেবায়েতগণের হইয়াছিল। তবে কি সূত্রে, তাহা উহাঁদের হস্তগত হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

ক্ষত্রিয়রাজগণ যে পূর্বকালে কালীর সেবার জন্য ভূমিদান করেন তাহারও কোন অনুশাসনপত্র নাই। বল্লালী আমলে এই কালীঘাট, তীর্থবাস রূপে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের একজনকে দেওয়া হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু সে সময় কালীঘাটের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন বিবরণ জানিবার উপায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ হয়, প্রতাপাদিত্যের সময়েও কালীঘাট ভীষণ বনজঙ্গল-সমাচ্ছন্ন, তন্ত্রাচারী, ভীমকায় কাপালিকদের নিবাসভূমি। অশোক, শিলাদিত্য, দেবপাল, ভীমপাল, মহীপাল প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ-রাজগণের দান সম্বন্ধে, অনেক তাম্রলিপি ও অনুশাসনপত্র দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহাদের কোনটিতেও কালীঘাটের ভূমিদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেনবংশীয় রাজাগণ, কিম্বা মুসলমানাধিকারের পর, যে সমস্ত হিন্দুরাজা, বঙ্গদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাদেরও কোনরূপ দানপত্র নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, রাজা বসন্ত রায়—যে সময়ে তাঁহার গুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে, কালীঘাটে প্রতিস্থাপিত করেন, এ দান হয়ত সেই সময়ের অনুষ্ঠিত। কিন্তু এ-সম্বন্ধেও কোন দানপত্রাদি দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৫৮২ খৃস্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময়, 'জমা-ওয়াশীল-তুমার' নামে বাঙ্গালার রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত হয়, তাহাতে প্রজাদিগের সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত নির্ধারিত হয়। সম্রাট-কর্মচারীরা, প্রজাদিগের নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া, বাদসাহ সরকারে পাঠাইয়া দিতেন। ১৭২২ খৃস্টাব্দে, নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সময়ে, রাজস্বের তৃতীয়বার বন্দোবস্ত হয়। সেই সময়ে কেশব রায় এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। এ সময়েও কালীঘাটের রাজস্ব আদায় করিতে কাহাকেও দেখা যায় না। কোম্পানির জমিদারি প্রাপ্তির পরও দেখা যায়, কালীঘাট সাবর্ণদিগের বা কোম্পানির জমিদারিভুক্ত ছিল না। অথচ এ সময়ে কালীর সেবায়েতগণ, কালীঘাটের ভূমি গুলি, তাঁহাদের ইচ্ছামত কুলীন ব্রাহ্মণদের দান করিয়াছিলেন। সাবর্ণ জমিদারগণ তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, যে সাবর্ণ-জমিদারগণের বড়িশাবাসের অর্থাৎ ১৭১৬ খৃস্টাব্দের পূর্বে, কালীঘাটের ভূমি কালীর সেবায়েতগণের দখলে ছিল।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে, পলাশী যুদ্ধের পর, ইংরাজ কোম্পানি বর্ধিত-প্রতাপ হইয়া উঠেন। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে, কোম্পানি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। রাজস্ব-সম্বন্ধীয়

১. ইহার অন্যূন পঞ্চাশ ষাট-বৎসরের পরেও, কলিকাতা ভবানীপুরের পার্শ্বস্থ-স্থানের জঙ্গল, সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় নাই। এরূপ শোনা গিয়াছে—ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব, বর্তমান হরিণবাড়ি জেলের নিকটস্থ বনে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বন্যবরাহ ইত্যাদি শিকার করিতেন। ইহার পর প্রাচীন কলিকাতার স্থান সমূহের বর্ণনা-কালে আমরা দেখাইব—কিরূপে কোন সময়ে নানা স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া এই কলিকাতা মহানগরীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

সমস্ত ব্যবস্থা এই সময়ে কোম্পানির হাতে আসে। ১

হুজুরীমল ২ বলিয়া একজন পঞ্জাবী, ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে, বক্সারযুদ্ধের সময় কোম্পানির যথেষ্ট উপকার করেন। হুজুরীমল—উমিচাঁদের নিকট-আত্মীয়। আজও "হুজুরীমল্‌স ট্যাঙ্ক লেন" বলিয়া, একটি গলি এই কলিকাতা সহরে তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। তদানীন্তন ইংরাজ গবর্ণর ভেরেলেস্ট সাহেব, হুজুরীমলের এই সহায়তার জন্য, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে, তিনি অন্য কোন পুরস্কার না লইয়া, কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘা জমি প্রার্থনা করেন। ভেরেলেস্ট সাহেব, কালীঘাটের দেবোত্তর সম্পত্তিভুক্ত—বার বিঘা জমি কালীর সেবায়েতগণের নিকট হইতে লইয়া তৎপরিবর্তে মুদি-সাহানগরে ১২ বিঘা জমি, হালদার মহাশয়দের 'এওয়াজি' রূপে নিষ্কর করিয়া দেন। কালীঘাটের বাজার ও পুলিস এখন যে স্থানে অবস্থিত তাহাই হুজুরীমলের ঐ বারবিঘা জমিভুক্ত। এখন এই স্থান, আলিপুরের কলেক্টর সাহেবের অধীন।

ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের আমলে—১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে, জমিদারদের সহিত একটি রাজস্ব সম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত হইয়াছিল। টেলর ও রিচার্ড নামক দুইজন কলেক্টর সমস্ত জমি জরিপ করিয়া, তাহার এক নক্সা প্রস্তুত করেন। নক্সা প্রস্তুত হইলে—জমিদারদের সহিত পাঁচ-বৎসরের জন্য জমি-সম্বন্ধে বন্দোবস্ত হয়। কালীঘাট এই ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের নক্সার মধ্যেও পড়ে নাই। ইহাতে বোধ হয়, "দেবোত্তর" বলিয়া কালীঘাট এই নক্সাভুক্ত করা হয় নাই।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস, রাজস্ব সম্বন্ধে আর এক নূতন বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত প্রথমত দশবৎসরের জন্য হয়। বাঙ্গলার দক্ষিণ বিভাগের রাজস্ব-বন্দোবস্ত, সন্তোষ রায়ের সহিত হয়। পরে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ইহা "চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তে" দাঁড়ায়। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের এ বন্দোবস্তেও, কালীঘাট সম্বন্ধীয় রাজস্বের কোন উল্লেখ মাত্র নাই। সুতরাং এই সময়েও উহা সন্তোষ রায়ের জমিদারি কিম্বা ইংরেজ-কলেক্টর, কাহারও অধীনে আসে নাই। পূর্বাবধি যেরূপ ছিল—সেই রূপই রহিয়া গেল। কালীঘাটের ভূমির খাজনা, জমিদারও পাইতেন না—ইংরাজ কলেক্টরও লইতেন না। তজ্জন্য কালীঘাটের দেবোত্তরভূমি, এতগুলি রাজস্ব বন্দোবস্তের পরও, কোনরূপ রাজকরের অধীন হইল না। পরে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে, মেজর আর স্মিথ সাহেব, আর একবার ২৪ পরগনা জরিপ করেন। আলিপুরের ডেপুটি কলেক্টর, বাবু গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের সময়ে, কালীঘাটকে, "ইংরাজদের ডিহি-পঞ্চান্নগ্রামের অন্তর্গত এবং এজন্য করভুক্ত হওয়া উচিত"—এই দাবীতে ক্রোক করা হয়। সমস্ত বিষয়ে তদন্ত করিয়া, কলেক্টর সাহেব এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট কাগজপত্র দাখিল করেন। ইহার অব্যবহিত পরে প্রসিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার বিলম্ব ঘটে। বিদ্রোহশান্তির পর, ১৮৬১ সালে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কালীঘাটকে কর হইতে মুক্ত করিয়া দেন।

ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য আমরা এই মোকদ্দমা-ব্যাপার ঘটিত এতখানি প্রাচীন ইংরাজী দলিলের ও আরজির নকল—পরের পৃষ্ঠায় অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।—

১. এই দেওয়ানি প্রাপ্তির মঙ্গল কামনায় তৎকালীন ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষেরা তাহাদের অধস্তন কলিকাতার হিন্দু সিপাহীদিগকে কালীঘাটে কালীপূজা দিবার জন্য শতাধিক টাকা দিয়াছিলেন, এরূপ একটি জনশ্রুতি আছে।

২. হজুরীমল (হজুরীমল্ল) ছিলেন পাঞ্জাবী শিখ, উমিচাঁদের শ্যালক এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মুৎসুদ্দি। হজুরীমল কোম্পানির নিকট দানরূপে যে জমি পান, তাহা তিনি ব্যবহার করেন নাই। বোধ হয়, দানের জমিতে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠায় পুণ্য-সঞ্চয় হইবে না—এইরূপ ভাবিয়াই তিনি নিজ ব্যয়ে স্বতন্ত্রভাবে গঙ্গারঘাট ও চাঁদনি প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দেন।

From

GOVINDA PROSAD PUNDIT
DEPUTY COLLECTOR OF 24 PURGUNAHS.

To

THE COLLECTOR OF 24 PURGUNAHS

Dated Alipore, 15th January 1855.

Sir,

I have the honour to submit for sanction, the accompanying cases of boundary disputes and Debsheba claims, which have been decided by me, in connexion with the settlement of Mehal Punchannagram.

2nd. In these cases, the Holdings, noted on the margin, are declared by their occupants to consist of Rent-free Debotter lands of Iswary Kally Thakurani of Kalighat, the profits of which, have from time immemorial, been exclusively appropriated to the Sheba of that Idol.

It is moreover declared, that the entire Mouzah Kalighat, in which, the lands are situated, does not belong to Punchannagram but to Purgunah Khaspore.

3rd. With respect to the merits of these claims I beg to submit my opinion as follows :—

I have personally inspected all the Holdings and found them situated in Mouzah Kalighat as you will likewise perceive, from the accompanying maps. No assessment, appears to me, to have been ever fixed on these lands.

I have examined the Chittas and Jamanbundee papers of 1200 B. S. of Punchannagram and of 1190 B. S. of Purgunah Khaspore, neither of them comprise the lands of Mouzha Kalighat.

Whatever may have been the reason, for this exclusion of the lands, from those measurements, there is no doubt, however, that the profit of the same, are appropriated to the Sheba of the abovenamed Idol. The Mouzah itself, is called after her name. According to the tradition and the Shastras of the Hindus, Kalighat is revered as a place of sanctity, from time immemorial. Hindu pilgrims, daily resort to the place, from every part of India and the worship of the Kali, is performed with solemnity from the profits of the lands, dedicated to her and the offerings paid at her shrine, by the pilgrims. The management of this worship and of the funds dedicated to this purpose, being in the hands of the Haldars of Kalighat, most of the lands have been found in their occupation—there being no suspicion as to the fact, of the appropriation of the profits of the lands to the service of the Idol (as it is well known to the public), evidence of witnesses to establish this seems unnecessary. From the manner in which the Sheba of the Idol is daily performed I am of opinion, that the lands ought to be exempted from assessment with reference to the provisions of Regulation XIX of 1810 Sec. XVI.

4th. With reference to the Khaspore claim, I have made every enquiry to ascertain whether Mouzha Kalighat belongs to Punchannagram or to Purgunah Khaspore. I can trace out nothing on record, by which I can declare, that the Mouzha belongs to Punchannagram. The

chittas of 1200 B. S. do not mention that Mouzha, nor shew the lands to have been measured as appertaining to Punchannagram, although Estate Huzoorimal which is situated in Mouzha Kalighat has been resumed and found out appertaining to Punchannagram. Yet I should think this circumstance alone, cannot form a sufficient ground, for considering the Mouzha or the lands under reference to belong to Punchannagram for Estate Huzoorimal has been resumed as Lawaris property to which the right of Government no doubt extends, wherever it may be situated.

5th. On the other side, the lands are not also mentioned in the chittahs of 1190 B. S. of Purgunah Khaspore. This would tend to the claim of the occupants, but then they say—as Mouzah Kalighat entirely consisted of rent-free lands, which have from time immemorial, been dedicated to the Sheba of Kali, they were, excluded from the measurement of 1190 B. S. as unfit for assessment. This does not seem improbable, for had the Mouzah been left unmeasured in 1190 B. S. from the consideration that it belonged to Punchannagram, it would come under measurement in 1200 B. S. From the Collectorate and Civil Court Fysalas and Roobkaris which have been produced by the occupants, from the Sunnunds &c shewn by the collectorate record-keeper, agreeably to all the local enquiries held by me in person and from the deposition of several witnesses, which have been taken down, it would appear, that the lands of Mouzha Kalighat belong to Purgunah Khaspure.

6th. Under these circumstances, therefore, I have excluded the lands from assessment subject to confirmation of higher authorities. My vernacular proceedings dated 7th instant, herewith accompany and will furnish any further information on the subject that may be required,

I have &c.

(Sd.) GOVINDA P. PUNDIT,

Deputy Collector.

শ্রীহরি
শরণং।

কমিশনারের রেজেষ্টারির নং ৩৬ সন ১৮৬০। — ৮১ নং শেহা সন ১৮৬১।৬২

রোধকারী নদীয়া প্রদেশের, রেভিনিউ কমিশনার কাছারি, হাল মোকাম আলীপুর, বৈঠক শ্রীযুক্ত এফ, লসিংটন সাহেব কমিশনার সন ১৮৬১ সাল তারিখ ৩১ মে।

জেলা চব্বিশ পরগনা সংক্রান্ত

গবর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ... ... বাদী।

কালীঠাকুরাণীর সেবাইত আনন্দচন্দ্র হালদার প্রভৃতি......প্রতিবাদীগণ। ফকিরচন্দ্র হালদার ও ভগবতীচরণ হালদার ও কালীচন্দ্র হালদার ও রামচন্দ্র হালদার ও কিনুরাম হালদার ও প্রাণকৃষ্ণ হালদার ও নেপালচন্দ্র হালদার ও বীরেশ্বর হালদার ও বিশ্বেশ্বর হালদার ও যজ্ঞেশ্বর হালদার ও শ্যামাচরণ হালদার ও শিবচন্দ্র হালদার ও হরিমোহন হালদার ও ঈশ্বর চন্দ্র হালদার ও ঈশান চন্দ্র হালদার ও মহিমানাথ হালদার ও দীননাথ হালদার ও রামগোপাল হালদার ও শ্রীমত্যা জগদম্বা দেব্যা ও সুখময় হালদারের মাতা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেব্যা ও রাজচন্দ্র হালদার

ও শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেব্যা ও নিবারণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রামকুমারী দেব্যা ও দেব-নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কমলাকান্ত হালদার সায়েলান্।

গবর্ণমেন্টের খাস মহল ৫৫ গ্রামের অন্তঃপাতী ডেপুটী কলেক্টর শ্রীল শ্রীযুক্ত মেঃ হেসাম সাহেবের প্রেরিত লিপির লিখিত ৫৯৫।৪।৴৫ বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর ভূমির সিন্ধাসিন্ধের তদন্তের বিষয়।

অত্র পূর্বে, উক্ত জেলার শ্রীযুক্ত কলেক্টর সাহেব সন ১৮৬০ সালের ১২ মার্চ দিবসীয় রোবকারী এবং ইংরাজী রায়ের লিখিত বিবরণ মতে বিবাদী ৫৯৫।৪।৴৫ বিঘা ভূমির মধ্যে ০৴ কাঠা ভূমির খারিজ বাদে ৫৯৯।৪৫ বিঘা ভূমি কালীঘাটের অসিদ্ধ নিষ্কর বিবেচনায়, বাজেয়াপ্ত অভিপ্রায় করিয়া নথির কাগজাৎ সন ১৮১৯ সালের ২ আইনের ১০ ধারার বিধান মতে এস্তাহার জারী হওয়াতে, সায়েলান্ উক্ত ভূমি সিদ্ধ দেবোত্তর প্রমাণার্থ সন ১২০৪ সালের তায়দাদের নকল ইত্যাদি দলিলাত সম্বলিত, উক্ত ভূমি কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত পাইবার প্রার্থনা করাতে, তাহা নথির কাগজাতের সহিত অবলোকন ও প্রণিধানানন্তর সন ১৮৬০ সালের ২৯ আগস্ট দিবসীয় ১৬৩ নম্বরি রিপোর্টে, বিরোধীয় ভূমি গবর্ণমেন্টের খাস-মহল ৫৫ গ্রামের মধ্যগত না থাকায়, ঐ ভূমির উপসত্ব ধর্ম বা দানের কর্মে ব্যয় হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ লিপি পূর্বক বোর্ডের সন ১৮৪০ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর দিবসীয় ৫৪২ নম্বরি সাধারণ লিপির ৪ দফার মর্মানুসারে কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দিবার অভিপ্রায়ে, বোর্ডে পাঠান হইয়াছিল। প্রতাপান্বিত বোর্ডের সাহেবান্, নথীর কাগজাৎ তলব ও অবলোকন করিয়া, সন ১৮৬০ সালের ১৪ ডিসেম্বর দিবসীয় ৬৬৫ নম্বরি রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ লিপী পূর্বক এ পক্ষের মঞ্জুর করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছিলেন। তথাকার চলিত সনের ১৬ জানুয়ারী দিবসীয় ৬৪A নম্বরি চিঠির দ্বারা ঐ অভিপ্রায় মঞ্জুর হওয়াতে, এ পক্ষের তলব মতে বোর্ডের ১৯ ফেব্রুয়ারী দিবসীয় ৮৫ নম্বরি চিঠির দ্বারা কাগজাৎ পুনরাগত হওয়াতে, সন ১৮১৯ সালের ২ আইনের ২১ ধারার মর্মমত, উক্ত ভূমি মুক্ত দিবার হেতুবাদ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। যদিচ শ্রীযুক্ত কলেক্টর সাহেব, স্বীয় সন ১৮৬০ সালের ২৪ মার্চ দিবসীয় রোবকারী এবং ইংরাজী রায়ে লিখিতেছেন যে বিবাদী ভূমির চারিদিকেই ৫৫ গ্রামের জমি থাকা বিধায়ে ঐ ভূমি ৫৫ গ্রামের শামিল বিবেচনা করিয়া সন ১৭৯৩ সালের ১৯ আইনের ২৫ ধারার বিধান মতে তায়দাদ দাখিল না থাকা হেতু ঐ জমি লাখেরাজ হইতে না পারা বোধে, হুজুরিমল্ল বাবুর নামীয় সন ১১৭৬ সালের ১৮ চৈত্র দিবসীয় এয়াজী জমির সনন্দের নকল অমূলক জ্ঞানে বাজেয়াপ্তের অভিপ্রায় করিয়াছেন। কিন্তু সায়েলান্ এ পক্ষের সমীপে সন ১২০৪ সালের তায়দাদের যে নকল দাখিল করিয়াছে, তাহাই উক্ত ২৫ ধারায় বিধানোক্ত লাখেরাজের রেজেষ্টরি প্রযুক্ত। সেই রেজেষ্টরিতে উক্ত ভূমি "কালী ঠাকুরাণীর দেবোত্তর সংজ্ঞায় লিখিত থাকার প্রমাণ হইয়াছে এবং সেই রেজেষ্টরির কৈফিয়াতে ইংরাজী ১৭৮০ সাল বাঙ্গালা সন ১১৮৭ সালের মূল সনন্দ, গৃহদাহে নষ্ট হওয়ার বিবরণ এবং সত্যযুগে সতী অঙ্গ পতন সময়ে, ক্ষত্রিয় নৃপতিতে উক্ত ভূমি দান করার কথা লিখিত আছে। সেই নৃপতিরা কত শত বৎসর পূর্বে, এতদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছে। তৎকর্তৃক ঐ ভূমি দান হওয়ার বিষয় উপন্যাসের স্বরূপ জনশ্রুতি অনুসারে সচরাচর গোচর আছে। আর সরকারের রাজ্যাধিকারের অর্থাৎ দেওয়ানী আমলের পূর্বাবধি, কালীঘাটের ভূমি যে নিষ্কর দেবোত্তর ছিল, তাহা গবর্ণমেণ্টের অর্পিত, হুজুরীমল্ল সীকের নামীয় সন ১১৭৬ সালের ১৮ চৈত্র দিবসীয় সনন্দের দ্বারায় প্রতীয়মান হইতেছে, যেহেতুক গবর্ণমেণ্ট ঐ হুজুরীমল্লের কৃত-কর্মের উপকার স্বীকার পূর্বক তাহাকে ভূমি দান করিয়া, যে সনন্দ অর্পণ করিয়াছেন, ঐ সনন্দে খাসপুর পরগণায়, কালীঘাটের দেবোত্তর ভূমির মধ্য হইতে ১১৴০ বিঘা জমি লইয়া তৎপরিবর্তে ঐ কালীঠাকুরাণীর সেবাইতদিগকে সরকারের খাসমহল ৫৫ গ্রামের অন্তঃপাতী. মুদিসাহানগর মোজায়, তৎতুল্য পরিমাণ এয়াজ দিবার কথা লিখিত আছে। অতএব এক্ষণে যে

ভূমির সম্বন্ধে নিষ্কর সিদ্ধাসিদ্ধির তদন্ত উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উক্ত সনন্দভুক্ত ভূমির অবশিষ্ট অংশ থাকার স্বরূপতায় বিষয়ে, অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আর প্রতিবাদী হালদারেরা বিরোধীয় ভূমি গবর্ণমেণ্টের খাসমহল ৫৫ গ্রামের সীমার বহির্গত থাকার প্রমাণ পক্ষে যে আপত্য করিয়াছে, তাহা যথার্থই স্বীকার করিতে হইবেক। কারণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যাধিকারের ৩০ বৎসর পূর্বে, ঐ ৫৫ গ্রাম দিল্লাধিপতি বাদসাহার স্থানে দান পাইয়াছিলেন। তাহাতে খাষপুর পরগণায় কোন গ্রাম যদিও ঐ ৫৫ গ্রামের শামিল হইয়া থাকে কিন্তু ৫৫ গ্রামের সন ১১৮৮ ও সন ১২০০ সালের জরিপী-চিঠায় তাহার শামিল *কালীঘাট নামক গ্রাম জরিপ হওয়া দেখা যায় না। অতএব কালীঘাটের দেবোত্তর ভূমির প্রতি, কর অবধারিত দাওয়া করিতে হইলে, গবর্ণমেন্ট ৫৫ গ্রামের জমিদারী সত্বে কি রাজত্ব সত্বে তাহা করিবেন, এই তর্কের মীমাংসাও সুকঠিন। অতএব ঐ ভূমি বহুকাল হইতে দেবোত্তর সংজ্ঞায় দান হওয়া তাহার উপসত্ব অবিচ্ছেদে সেবা ও পূজা আদি ধর্ম বা দানের কার্যে ব্যয় হইয়া আসা এবং কালীঘাট যে হিন্দুদিগের প্রকাশ্য দেবস্থলি পীঠস্থান, তাহা ভারতবর্ষীয় আপামর সাধারণে ব্যক্ত থাকায়, এপক্ষ কর্তৃক উক্ত ভূমি কর গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দিবার যে অভিপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত বোর্ড রেবেনিউর সাহেবান্‌ তাহাই গ্রাহ্য পূর্বক দৃঢ়রূপে অনুরোধ করাতে, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর উক্তভূমি কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দিবার আজ্ঞা করিয়াছেন অতএব—

হুকুম হইল যে বিরোধিয় ৫৯৫/৪।৫ বিঘা ভূমি কর-গ্রহণের শ্রেণী হইতে মুক্ত দেওয়া যায়, আর মিছিলের কাগজাৎও বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের চিঠির নকল এই রোবকারীর প্রতিলিপীর দ্বারায়, শ্রীযুক্ত কলেক্টর সাহেবের নিকট পাঠান যায়, আর সায়লানের দাখিলি-দলিল ফেরত দেওয়া যায় ইতি।

অদ্য আগত হইয়া হুকুম হইল যে, রেজেষ্টরিতে দরজ করা যায়, অত্র রোবকারীর লিখিত ভূমি ৫৫ গ্রাম হইতে খারিজ দেওয়া যায় এবং নকসার চিহ্নিত করা যায়, আর কাগজাৎ ইনফেসানিতে রাখা যায়।[১]

কালীঘাটের সীমার মধ্যে, মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া, কোন দেবীপূজা করিবার প্রথা নাই। যদি কেহ তাহা করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে, কালীর নিকটেই সে সমস্ত করিতে হয়। কালীঘাটের সীমার মধ্যে অপর দেবী-প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করার কোন বিধি নাই।

কালীমন্দিরের পশ্চিমদিকে, শ্যামরায় বিগ্রহ অবস্থান করিতেছেন। শ্যামরায়ের মন্দিরের পার্শ্বেই আছে তাঁহার দোলমঞ্চ। আর এক শ্যামরায় ঠাকুর, মন্দিরের বাহিরে, অর্থাৎ কালী মন্দিরের প্রবেশদ্বারের নিকট অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দরজার উপর লেখা আছে "আদি শ্যামরায়"।

এই দুইটি শ্যামরায়ের মূর্তি কোথা হইতে আসিল, এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। কালীর সেবায়েত হালদারগণের পূর্বপুরুষ ভবানীদাস বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। শ্যামরায় বিগ্রহকে তিনি কালীঘাটে স্থাপন করেন। কালীর মন্দির সে সময়ে অতি ক্ষুদ্র ছিল। স্থানাভাবে শ্যামরায়কে তিনি কালীর মন্দির মধ্যেই স্থাপন করেন।

১৭২৩ খৃস্টাব্দে, মুরশিদাবাদের জনৈক ধনী কানুনগো কালীঘাটে আসিয়া শ্যামরায়কে কালীর মন্দিরে অধিস্থাপিত দেখিয়া নিজব্যয়ে শ্যামরায়ের জন্য একটি ছোট ঘর প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহার এক শত কুড়ি বৎসর পরে চব্বিশ পরগনা বাওয়ালীর জমিদারদিগের পূর্বপুরুষ উদয়নারায়ণ মণ্ডল মহাশয় শ্যামরায়ের সেই ছোট ঘরটি ভাঙ্গিয়া তৎস্থানে বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। বাওয়ালীর মণ্ডল-জমিদারগণ বৈষ্ণব ধর্মানুসারী। টালিগঞ্জে ও

১. বর্ণাশুদ্ধি সমেত উপরে মূল দলিলের অবিকল লিপি প্রদত্ত হইল।

তাঁহাদের আদি বাসস্থান বাওয়ালীতে তাঁহাদের রাসবাড়ী ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, নবরত্ন প্রভৃতি আজও তাঁহাদের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। এখনও প্রতিবৎসর রাসের সময় টালিগঞ্জের মণ্ডলদের দেবালয়ে মহাসমারোহে রাসোৎসব হইয়া থাকে। শ্যামরায়ের মন্দিরসংলগ্ন যে দোলমঞ্চটি আছে তাহা সাহানগর নিবাসী মদন কলে নামক এক ধনী-ব্যক্তির কীর্তি। দোলযাত্রা শ্যামরায়ের একটি প্রধান উৎসব। প্রতিবৎসর রামনবমীর সময়ে উহা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্বে এই রামনবমীর দোলোৎসব শ্যামরায়ের মন্দির মধ্যে হইত। ধর্মপ্রাণ কলে মহাশয় একটি দোল-মঞ্চের অভাব উপলব্ধি করিয়া ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে তাহা প্রস্তুত করাইয়া দেন।

কালীর পুরীর বাহিরে শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দিরের পশ্চিমে আর একটি শ্যামরায় বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন এবং বাহিরের এই বিগ্রহ-মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর 'পুরাতন শ্যামরায়' বলিয়া লেখা আছে। ইহা হালদার মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নহে। এইরূপ জনরব যে এই শ্যামরায় শেঠ ও বসুকদিগের।[১] ইহা বহুকালের পুরাতন বিগ্রহ। এই বিগ্রহ পূর্বে গোবিন্দপুরে ছিল। সেকলের গোবিন্দপুরের মধ্যে শেঠ ও বসুকগণ অতি প্রাচীন অধিবাসী। এই বিগ্রহের অপর নাম গোবিন্দরায়। ইংরাজেরা গোবিন্দপুর গ্রাম ক্রয় করিলে, অধিবাসীগণকে তথা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে সম্ভবত এই বিগ্রহটি কালীঘাটে আনা হইয়াছে। এই বিগ্রহেরও রাসাদি-উৎসব হইয়া থাকে। একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ এখন ইহাঁর সেবায়েত।[২] যাত্রীপ্রদত্ত অর্থাদি সেবায়েতরাই লইয়া থাকেন। হালদার মহাশয়দের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।

শিব ও শক্তির পূজা যে এদেশে বহু কালাবধি প্রচলিত আছে তাহা আর স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণ সহকারে বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে শিব ও শক্তিমাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। খ্রীস্টের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের যত্নে শৈবমত বিশেষরূপে প্রচারিত হয়। অনেকানেক প্রাচীন রাজ-বংশীয়দের প্রচলিত মুদ্রায় শিবের বৃষ ও ত্রিশূলে প্রভৃতির প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে ও এতদ্দেশে শিবলিঙ্গ-সম্বন্বিত বহুতর প্রাচীন মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পৌরাণিক-ধর্ম প্রচারিত হইবার প্রথমেই শৈবধর্ম ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হয়। শৈবদিগের মধ্যে অধিকাংশই উদাসীন সম্প্রদায়ী। ইহাদিগকে সচরাচর সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে।

শিবের উপাসনার মধ্যে লিঙ্গপূজাই সর্বাধিক প্রবল। ভারতের নানা স্থানে শৈবদিগের মঠ আছে। নির্গুণ উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশে ঐ সকল মঠ স্থাপিত হয়। কন্যাকুমারিকার নিকট শৃঙ্গগড় মঠ, বদরিকা আশ্রম, কেদারনাথ, বদরিনাথ, চট্টগ্রামের নিকট চন্দ্রনাথ, মধ্যভারতের ওঁকার-মান্ধাতা ও উজ্জয়িনীর মহাকাল প্রভৃতি তীর্থগুলি প্রসিদ্ধ শিবপীঠ। কালীঘাটেও ত্রিকালেশ্বর নামে সন্ন্যাসীদিগের একটি মঠ আছে। তথায় সময়ে সময়ে বহুতর উদাসীন সমাগত হয়। কালীর পুরীর সম্মুখের ঘাটের উপর সম্প্রতি দাক্ষিণাত্যের শৈবসম্প্রদায়ী শেঠীদিগের একটি মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। নির্গুণ উপাসনা মঠের উদ্দেশ্য হইলেও অধিকাংশ মঠে সাকার লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরাণে দেখা যায়, সতীদেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যে যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মহারুদ্র

১. বসুক—বসাক

২. আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই দুই শ্যামরায়েরই মন্দির দেখিতে যাই। বাহিরের পুরাতন শ্যামরায়ের মন্দিরটি অতি জীর্ণ ও সংস্কারভাবে অতি শোচনীয় অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। আমি এই বিগ্রহের জনৈক প্রাচীন সেবায়েতের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাহার নিকট হইতে এই শ্যামরায়ের সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে চাই। ব্রাহ্মণ—কোন রূপেই আমাকে কোন কথা বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল তিনি এ সম্বন্ধে কোন প্রাচীন বিবরণ জানেন না। বাহিরের এই শ্যামরায় বিগ্রহটি, অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, যে মূর্তিটি কাষ্ঠ-খোদিত। কিন্তু এদিকে আবার আর একটি জনরব প্রচারিত আছে—যে শেঠ ও বসুকদিগের আদি গোবিন্দজী এখনও বড়বাজারে আছেন।

সতীদেহ বশত, সেই সেই স্থানে, লিঙ্গরূপে অবস্থিতি করিলেন।১ শিবের প্রতিমূর্তি পূজা অতীব বিরল। ভারতবর্ষের সর্বত্রই লিঙ্গপূজা প্রচলিত। সাধারণ মতে শিব সংহারকর্তা। কিন্তু শৈবেরা শিবকে সংহারকর্তা ও সৃজনকর্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। শিবের লিঙ্গ মূর্তি সেই সৃজনশক্তির পরিচায়ক। শিব-গীতাতে শিবের নিরাকার ও সাকার উভয়রূপই বর্ণিত আছে।

লিঙ্গপুরাণে দুই প্রকার শিবের বিষয় লিখিত আছে। অলিঙ্গ ও লিঙ্গ। অলিঙ্গ-শিব নির্গুণ-স্বরূপ আর লিঙ্গ-শিব জগতের সৃষ্টির কারণ।

জগদ্যোনি মহাভূতং স্থূলং সূক্ষ্মং মজং বিভুং।
বিগ্রহং জগতাং লিঙ্গং অলিঙ্গাদভবৎ স্বয়ং॥ —লিঙ্গপুরাণ তৃতীয় অধ্যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম, অজন্মা, সর্বব্যাপী বিশ্বরূপ ও জগতের কারণ মহাভূতস্বরূপ লিঙ্গ শিব, অলিঙ্গ শিব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

লিঙ্গ শিব দ্বিবিধ অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। স্বয়ম্ভূলিঙ্গ ও বাণলিঙ্গকে অকৃত্রিম লিঙ্গ কহে। আর মনুষ্য কর্তৃক দ্রব্য বিশেষে, যথা—স্বর্ণ, রজত, তাম্র, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যে গঠিত লিঙ্গকে কৃত্রিম লিঙ্গ কহে। নর্মদা নদীতীরে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাষাণ-খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার নাম বাণলিঙ্গ। বাণরাজার দ্বারা প্রথমে পূজিত হয় বলিয়া উহার বাণলিঙ্গ নাম হইয়াছে। যে সকল লিঙ্গ কোন মনুষ্যের দ্বারা নির্মিত হয় নাই এবং যাহার মূল দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে স্বয়ম্ভূ বা অনাদিলিঙ্গ কহে।২ কালীঘাটের নকুলেশ্বর ভৈরব স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। কালীর মন্দিরের অদূরে ঈশানকোণে ইনি অবস্থিত। সুদর্শন-ছিন্ন সতীঅঙ্গ পতনে ইহাঁর উদ্ভব ধরিতে হইবে। কালীমূর্তি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়।

কালীঘাট জনসমাজে প্রকাশিত হইবার অনেক পরে বহুকাল পর্যন্ত নকুলেশ্বরের কোন মন্দিরাদি ছিল না। বিগ্রহের উপর সামান্য পর্ণকুটীরের আচ্ছাদন মাত্র ছিল। কালীর বড় মন্দির, ভোগঘর, শ্যামরায়ের অধিষ্ঠান মন্দির প্রভৃতি নির্মিত হইবার অনেক পরে নকুলেশ্বরের প্রস্তর নির্মিত মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তাহাও বহুদূর প্রদেশবাসী জনৈক ব্যবসায়ীর যত্নে হইয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশীয় বিখ্যাত ধনী তারা সিংহ নামে জনৈক শিখ শৈব ১৮৫৪ খৃীস্টাব্দে স্বদেশ হইতে প্রস্তর আনিয়া, নকুলেশ্বরের মঠ ও মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

নকুলেশ্বরের মঠ-মন্দির এ প্রদেশীয় সাধারণ মন্দিরের মত নহে। ইহার সমস্তই প্রস্তর নির্মিত আর সুদৃশ্য প্রস্তরস্তম্ভের উপর ছাদ রক্ষিত হইয়াছে।

তারা সিংহের এই মন্দির নির্মাণের বিষয়ে একটি আশ্চর্য গল্প শ্রুত হওয়া যায়। তারা সিংহ একবার ব্যবসায়ে আশাতীত লাভ পান। সেই লাভের অর্থ নিজে ব্যয় না করিয়া বারাণসীতে সন্ন্যাসীদের জন্য একটি মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। সঙ্কল্পিত মঠ নির্মাণের উপযোগী প্রস্তরাদি নৌকায় বোঝাই দিয়া তিনি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন। নাবিকগণ সেই বোঝাই নৌকা বারাণসীর ঘাটে কোন ক্রমে লাগাইতে পারিল না। নৌকা স্রোত-মুখে ভাসিয়া আসিয়া কালীঘাটে থামিল। তারা সিংহ তীরে উঠিয়া নকুলেশ্বরের দুরবস্থা দেখিয়া ঐ সকল প্রস্তরের দ্বারা তাঁহার এই মঠ মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন।

শিবরাত্রি ও লীলাষষ্ঠী (অর্থাৎ বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির পূর্বদিন) এই দুইটি পর্বে নকুলেশ্বরের স্থানে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্বে নকুলেশ্বরের চড়কপর্ব বড় সমারোহে সম্পাদিত হইত। কালীঘাটের উত্তর পূর্ব সীমা বর্তমান চড়কডাঙ্গায় চড়কপর্ব হইত এবং তদুপ-

১. কালিকা উপপুরাণ—২৮ অ। ৪৭ শ্লোক।
২. নানাছিদ্র সুসংযুক্তং নানাবর্ণ-সমন্বিতং। / অদৃষ্ট মূলং যল্লিঙ্গং কর্কশং ভূবি দৃশ্যতে॥ বটকর্মদীপিকা। যে সকল লিঙ্গ নানা ছিদ্রযুক্ত ও নানা বর্ণ বিশিষ্ট ও যাহার অঙ্গ কর্কশ এবং যাহার মূল দৃষ্ট হয় না, তাহার নাম স্বয়ম্ভু বা অনাদিলিঙ্গ। বারাণসীর বিশ্বেশ্বর, উজ্জয়িনীর মহাকাল, নর্মদাতীরস্থ সূর্যবংশীয় মান্ধাতারাজ স্থাপিত ওঁকার-মান্ধাতা ও ৺তারকনাথ দেব এই অনাদিলিঙ্গ শ্রেণীভুক্ত।

লক্ষে তথায় প্রতিবৎসর এ সময়ে একটি মেলা হইত। নকুলেশ্বরের চড়কপর্ব ঐ স্থানে সমাধা হইত বলিয়া ঐ স্থান অদ্যাবধি 'চড়কডাঙ্গা' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নকুলেশ্বরের মঠ মন্দির ব্যতীত কালীঘাটের স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন অনেক শিব-মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ মন্দিরগুলি সেবাইত হালদারগণ ও নানাস্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ সকল মন্দির মধ্যে, কালীর পুরীর মধ্যস্থ দুইটি শিব মন্দির ও পুরীর সম্মুখীন গঙ্গার ঘাটের উপর হুজুরীমল নির্মিত মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

ইতিপূর্বে কালিকাদেবীর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত মুখমণ্ডল প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রবাদমতে ইহা মনুষ্যকৃত নহে, ব্রহ্মার স্থাপিত। এই মুখমণ্ডল জনসমাজে প্রচারিত হইবার পূর্বে পবিত্র কালীকুণ্ডের পশ্চিম পারে স্মরণাতীত কাল হইতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঐ মুখমণ্ডল বরাভয়-কর-সংযুক্ত ও অসি-শোভিত হইয়া মন্দিরমধ্যে প্রতিমারূপে বিরাজ করিতেছে। মায়ের নেত্রদ্বয় স্বর্ণালঙ্কৃত — শিরোদেশে সোনার-মুকুট। মুকুটের উপর স্বর্ণময় মতির ঝালর দেওয়া ছত্র বিরাজিত। হস্তে তীক্ষ্মধার অসি ও করে স্বর্ণময় নৃ-মুণ্ড। উক্ত মুখমণ্ডল প্রাপ্তির পর হইতে এ সমস্ত অঙ্গ-সজ্জা কালে কালে সঞ্চিত হইয়া কালীদেবীর বর্তমান মূর্তিতে দাঁড়াইয়াছে। বহু ধর্মপরায়ণ শাক্তের একান্ত ভক্তির জন্য বা কোন মানসিক বাসনাসিদ্ধির ফলে এগুলি ভক্তি উপহার রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন এগুলির একটু পরিচয় দিব।

মন্দিরের মধ্যস্থলে উপর্যুপরি প্রস্তর সাজাইয়া তদুপরি ব্রহ্মার নির্মিত মুখমণ্ডল সং-স্থাপিত করা হইয়াছে। লোহময় হুকে অসিমুণ্ডাদি ধৃত হস্ত চতুষ্টয় সংযোজিত হইয়াছে। জনশ্রুতি এই, ঐ স্তূপীকৃত প্রস্তরগুলির মধ্যে, কালীদহে নিপতিত, বিষ্ণুর সুদর্শনচ্ছেদিত প্রস্তরবৎ সতীঅঙ্গ সযত্নে রক্ষিত আছে। স্নানযাত্রা, অম্বুবাচী প্রভৃতি পুণ্যদিনে মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ঐ প্রস্তরময় পদাঙ্গুলির স্নান ও পূজার্চ্চনাদি হয়। হালদার মহাশয়গণের মধ্যে, জ্যেষ্ঠের বংশোদ্ভূত যে কেহ থাকেন — তিনিই এই স্নান কার্যে ব্রতী হন।

প্রথমে খিদিরপুর নিবাসী দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় কালীর চারিটি রৌপ্য-ময় হস্ত নির্মাণ করিয়া দেন। ইনি ভূকৈলাসস্থ ঘোষাল রাজবংশের পূর্ব-পুরুষ। নবাবী আমলের অবসান হইলে ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হন।

তৎপরে কলিকাতা নিবাসী বাবু কালীচরণ মল্লিক মহাশয় বর্তমান চারিটি স্বর্ণনির্মিত হস্ত প্রদান করিয়াছেন। চারি হস্তের চারিগাছি স্বর্ণময় কঙ্কণ চড়কডাঙ্গা নিবাসী °রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদান করেন। কলিকাতা বেলিয়াঘাটার রামনারায়ণ সরকার নামক জনৈক ধনী চাউলব্যবসায়ী কালীর স্বর্ণময় মুকুটটি দিয়াছেন। দেবীর হস্তস্থিত অসুরের মুণ্ড কাহার প্রদত্ত তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। কালীর স্বর্ণময় জিহ্বাটি পাইকপাড়ার রাজবংশাবতংস স্বর্গীয় রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর দিয়াছেন। কালীর মস্তকোপরি সুশোভিত স্বর্ণছত্রটি নেপালরাজ্যের প্রধান সেনাপতি স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় স্যর জঙ্গ বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত। অসংখ্য ভক্তকর্তৃক ভক্তি উপহাররূপে প্রদত্ত মায়ের অলঙ্কারগুলি এইরূপে ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিয়াছে। ১৮৭৮ সালে কালীর মন্দিরে একবার চুরি হয়। তজ্জন্য কতক অলঙ্কার চুরি গিয়াছিল। 'কালী-ক্ষেত্র-দীপিকা'র মতে "এই সমস্ত অলঙ্কারাদি বহুতর ধনাঢ্য লোকের প্রদত্ত। অপর কেহ কোন উৎকৃষ্ট অলঙ্কারাদি প্রদান করিলে পূর্বেরটি খুলিয়া নূতনটি কালীদেবীকে পরাইয়া দেওয়া হয় এবং পূর্বের অলঙ্কার যে সেবায়েতের যজমানের প্রদত্ত তাঁহারই প্রাপ্য হয়।"

কালীর নিত্য পূজা পুরাকালে কিরূপ ভাবে হইত, তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। যখন এই কালীমূর্তি কাপালিক ও তান্ত্রিক-সন্ন্যাসিগণের হস্তে পতিত হয়, তখন তাহারা সম্ভবত তামসিক নিয়মেই কালীদেবীর পূজাদি করিত। এই ভীষণ সময়ে তাহারা পশুবলি ও নরবলি দিয়া জগন্মাতার আরাধনা করিত — এরূপ জনশ্রুতি আছে। বর্তমান সেবায়েত হালদার-গণের পূর্বপুরুষ ভবানীদাসের সময় পর্যন্ত সেবায়েতগণ স্বহস্তে দেবীর পূজাদি করিতেন।

ভবানীদাস বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। তিনি সাত্ত্বিকভাবে নিরামিষ নৈবেদ্যাদি সহকারে জপ ও হোমাদি দ্বারা কালীর নিত্যপূজা সমাধা করিতেন। প্রাত্যহিক ভোগের জন্য তিনি ছাগবলি দিতেন না। কেবলমাত্র দুর্গোৎসবের নবমীর দিন একটি মাত্র পশুবলি দিতেন। কালীর বর্তমান অধিকারীদের মধ্যে এখনও ভবানীদাস প্রবর্তিত এই পুরাতন নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে সমাগত যাত্রিগণের প্রদত্ত ছাগবলি হইতে মায়ের নিত্য-ভোগ হইয়া থাকে। এইজন্য প্রতিদিন যে ছাগটি প্রথম বলি হয় তাহাই দেবীর ভোগের জন্য সংগৃহীত হয়। হালদারগণ আজও পশুবলি প্রদান করেন না। তবে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতামহকুলের প্রথা, কেহবা পৈতৃক প্রথানুসারে চলিয়া থাকেন।

ভবানীদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রগণের সময় হইতে স্বতন্ত্র পুরোহিত দ্বারা দেবীর পূজাদি নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এই নিত্য পূজার ব্যয় অধিকারিগণ পালাক্রমে বহন করেন। বংশবিস্তারের সহিত উত্তরাধিকারিগণের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় এই পালার বা পূজার দিনাংশ সৃষ্টি হইয়াছে। যে দিন যাঁহার সেবার পালা পড়ে তিনি সেই দিনের পূজাদির ব্যয় নির্বাহ করেন। ভবানীদাসের পৌত্রগণের সময়ে নিত্য-পূজাদির ব্যয় যেরূপ নির্ধারিত ছিল, এখনও সেইভাবে চলিয়া আসিতেছে। আমিষ ভোগের জন্য পালাদারের কোন ব্যয় নাই কারণ তাহা যাত্রিগণপ্রদত্ত প্রথম বলি হইতে নির্বাহিত হয়।

যে কালীকুণ্ড হ্রদতীরে সতীর প্রস্তরময় ছিন্ন পদাঙ্গুলি পাওয়া যায়, যে হ্রদতীরের গভীর বনমধ্যে কামদেব-পত্নী পদ্মাবতী এক অপূর্ব জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন "ঐ দেখ, ঐ দেখ", প্রচলিত প্রবাদ মতে, সতী-পদাঙ্গুলি এই কালীকুণ্ড হ্রদতীরেই পাষাণবৎ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে আমরা এই 'কালীকুণ্ড' সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

কালীর মন্দিরের ঠিক পূর্বাংশে এই কালীকুণ্ড হ্রদ। বর্তমানে ইহা সামান্য পঙ্কিল পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার বর্তমান আয়তন কমবেশী দশ কাঠা মাত্র। পূর্বে ইহার আয়তন সমধিক বিস্তৃত ছিল। এই হ্রদতীরেই কালীর পাষাণমূর্তি প্রথমে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই কালীকুণ্ডের কথা অবগত আছেন, তাঁহারা গঙ্গাস্নান করিবার পূর্বে এই হ্রদে অবগাহন করিয়া থাকেন।[১] কিন্তু অতি অল্প লোকেই ইহার সন্ধান জানেন। অতীতকালে ইহা অতলস্পর্শ দহ বা 'দ' ছিল। ক্রমে চর পড়িয়া গঙ্গার পূর্ব তীরস্থ তট উন্নত হওয়াতে উহা হ্রদরূপে পরিণত হইয়াছে। কালীক্ষেত্র-দীপিকার মতে, এই 'দহ' গঙ্গার তলদেশ অপেক্ষা সমধিক গভীর ও তথায় স্রোতের আধিক্য থাকা বশত উহা পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। সুতরাং ঐ দহের পশ্চিমে গঙ্গার তলদেশ ক্রমশ সমুন্নত হইয়া উঠিলে গঙ্গার স্রোত ঐ স্থান হইতে সরিয়া গিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং কালস্রোতে পলি পড়িয়া উহা একটি হ্রদরূপে পরিবর্তিত হইল। উড়িষ্যার চিলকা হ্রদ যেমন সমুদ্রসম্ভব, কালীকুণ্ড হ্রদও সেইরূপ নদীসম্ভব। তবে চিলকা হ্রদ বহুযোজন ব্যাপী, আর কালীকুণ্ড হ্রদ অতি ক্ষুদ্র। গঙ্গার তীর হইতে এমন কি চারি পাঁচ শত হস্ত দূরে, কালীঘাট বা তৎসন্নিহিত স্থানে কূপ-খনন সময়ে, সমুদ্রতটের সিকতাময় ভূমির সদৃশ স্তর স্তর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানে

১. এই কালীকুণ্ড হ্রদ, বর্তমানে যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, আর কিছুদিন পরে ইহার স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে। ভবিষ্যতে আরও পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় হইলে ইহাতে মিউনিসিপ্যালিটির কোপদৃষ্টি পড়িতে পারে। কালীকুণ্ড হ্রদটির স্মৃতি রক্ষা করা হালদার মহাশয়গণের পক্ষে অতীব কর্তব্য। বারাণসীতে 'জ্ঞানবাপী' মহাপবিত্র স্থানরূপে আজও সুরক্ষিত। বাপীটি সুন্দররূপে বাঁধান ও তাহার চারিপাশে নাটমন্দির ও চত্বর। হালদার মহাশয়েরা একটু চেষ্টা করিলেই এই হ্রদটির পুনঃ সংস্কার করিয়া ইহার চারিদিকে ঘাট বাঁধাইয়া দিতে পারেন। যাত্রীর প্রদত্ত অর্থেই এই ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারে।

সম্প্রতিকালে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সভাপতি স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহাশয়ের পৌরহিত্যে কালীপ্রভৃত হ্রদের সংবাদ ও পঙ্ক উদ্ধার করা হইয়াছে।

প্রায় গলিত-উদ্ভিদ-ময় মৃত্তিকা দেখা যায় না। ইহাতে সুচারুরূপে প্রতীয়মান হয় যে কালী-ঘাটের গঙ্গার ঈষদূরবর্তী স্থান সকল পূর্বে গঙ্গার গর্ভে নিমগ্ন ছিল এবং কালক্রমে স্তর পড়িয়া ক্রমশ সমুন্নত হইয়া উচ্চভূমির আকারে পরিণত হইয়াছে ও তৎপরে ইহা মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে।

কালীর পুরী হইতে প্রায় দুই শতাধিক হস্ত পশ্চিমে এখন আদি-গঙ্গা প্রবাহিতা রহিয়াছেন। কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণ কালীঘাটের প্রথম অধিবাসী। কিন্তু কালীর পুরীর পশ্চিমে উঁহাদের বাস দেখিতে পাওয়া যায় না। কালীক্ষেত্রের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে হালদারগণের নির্মিত প্রাচীন ইমারতগুলি দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে হালদারগণের প্রথম বাসের সময় গঙ্গা কালীপুরীর আরও নিকটবর্তী স্থান দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। কালীকুণ্ড হ্রদের পশ্চিমে, গঙ্গার তীর পর্যন্ত সমুদায় স্থানের মধ্যে কোথাও একটিও প্রাচীন বৃক্ষ দেখা যায় না। ঐস্থানে আবহমান কাল উচ্চভূমি থাকিলে উক্ত স্থানে অন্তত একটিও প্রাচীন অশ্বত্থ, বট বা অন্য কোন বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত। কালীঘাট এখন সমুদ্রতল হইতে ১১।১২ হস্ত উচ্চ হইয়াছে, কিন্তু তবুও আদিগঙ্গায় জোয়ার আসিলে গঙ্গাতীরবর্তী অধিকাংশ স্থলে জলময় হইয়া যায়।

এই কালীকুণ্ড হ্রদের পঙ্কোদ্ধারের জন্য দুই তিন বার চেষ্টা করা হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কালীর সেবায়েতগণ আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া ইহার সামান্য সংস্কার করেন। পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ইহার পঙ্কোদ্ধার করা হয়। কিন্তু খনকেরা ইহার সমুদায় জল বহু চেষ্টা দ্বারাও একবারে সেচন করিয়া উঠিতে পারে নাই। সুগভীর ও গঙ্গার নিকটবর্তী হওয়ায় জলসেচন করিলেও ইহা ক্ষণমধ্যে আবার জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ইহাই 'কালীকুণ্ডের' ইতিহাস। এই কুণ্ড হিন্দুর চক্ষে কাশীর জ্ঞানবাপীর ন্যায় অতীব পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র। এই হ্রদতীরেই কালী-দেবীর প্রস্তরময় মুখমণ্ডল এবং পদাঙ্গুলি পাওয়া যায়। কালীকুণ্ডের পবিত্র নাম কালীঘাটের স্থাপনা এবং প্রাচীন স্মৃতির সহিত সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত।

দেবীর নিত্যপূজার জন্য, যেমন একজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন তেমনি তাঁহার নিত্য বেশকারগণও আছেন। ইহাঁরা কালীর 'মিশ্র' বলিয়া বেশভূষা ও সাজসজ্জাদি পরাইবার জন্য আখ্যাত হন। কোন সময়ে, কাহার আমল হইতে ভবানী-দেবীর এই বেশকার-মিশ্রগণ নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা ঠিক করা সুকঠিন। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে পূজার জন্য স্বতন্ত্র পুরোহিত নিযুক্ত হইবার সময় বা তাহার কিছু পরবর্তী সময়ে এই বেশকার-মিশ্রগণ নিযুক্ত হইয়াছেন। পুরোহিত ও বেশকার-মিশ্রগণ কালীর অধিকারী হালদারগণের মত পুরুষ-পরম্পরায় ঐ পদের উত্তরাধিকারী হইয়া আসিতেছেন। আরতির পর মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা ও পুনরায় প্রাতে দ্বারোদ্ঘাটন করার ভার এই মিশ্রগণের উপর সংন্যস্ত। তবে অধিকারিগণ তাঁহাদের কার্যের উপর তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

যে যে বিষয়ে কালীর নিত্য আয়-ব্যয় সংকুলান হয় তাহার একটি মোটামুটি তালিকা আমরা সংগ্রহ করিয়া দিতেছি (পরের পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রথমে প্রত্যহ হালদার মহাশয়গণ কর্তৃক মায়ের নিত্যপূজা হয়। পালাদারের অনুষ্ঠিত নিত্যপূজোদি ব্যতীত যাত্রীপ্রদত্ত পূজা সমস্ত দিনই হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অনেক ধনাঢ্য হিন্দু প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কালীর পূজা দিয়া থাকেন। অনেক ধনী ব্যক্তির বেতনভোগী পুরোহিতগণও তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মায়ের নিত্যপূজা করেন এবং এ সকল পূজার অধিকাংশই মায়ের মন্দির-সম্মুখস্থ 'নাটমন্দিরে' হইয়া থাকে। তবে যে সমস্ত ধনবান ব্যক্তি, কালীঘাটে নিত্য বা বিশেষ পূজা দেন তাঁহাদের অভিলাষ অনুসারে পূজা ও বলি সর্ব প্রথমে হইবার কোন বাধাই নাই। বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদারগণের অভ্যুদয় সময়ে তাঁহারা

বড়িশা হইতে নিত্য কালীদেবীর পূজাদি পাঠাইতেন। তাঁহাদের পূজা সর্বাগ্রে সম্পাদিত হইত। পাইক-পাড়ার স্বর্গগত রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর কালীঘাটে মায়ের নিত্যপূজা দিতেন। তাঁহার আমলে তিনি কালীর সামিষ ভোগের নিত্য-ব্যয় নির্বাহ করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত বলির পশু, সর্বাগ্রে নিবেদিত হইত। বর্তমানে আর কোন ধনবান ব্যক্তির ঐরূপ ভাবে মায়ের নিত্য-পূজাদির ব্যবস্থা আছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি।[১]

কালীর প্রাত্যহিক পূজা অধিকারিগণ দ্বারা পালাক্রমে নির্বাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্নান-যাত্রা, দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা অধিকারিগণের সাধারণ পূজা। সেই সকল পর্বদিনে যাঁহাদের পালা পড়ে তিনি নিত্য-পূজার নিয়মানুসারে সেই দিনে প্রাত্যহিক পূজার ব্যয় নির্বাহ করেন। সাময়িক উৎসবের ব্যয় সমস্ত অধিকারিগণ চাঁদা করিয়া দেন এবং তদ্দ্বারা একত্রে উৎসব-কার্য নির্বাহ হয়। সমস্ত অধিকারির নামে সংকল্প হইয়া পূজা সমাপ্ত হইয়া থাকে।

শারদীয় পূজার তিনদিন বিশেষত মহাষ্টমীর দিন, ভোগের ব্যাপার অতি বিরাট। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, সমস্ত নাটমন্দির পর্বতপ্রমাণ নানাবিধ সামিষ ও নিরামিষ অন্নে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। একদফা এই ভাবে উৎসর্গীকৃত হইলে আবার সেই স্থান গঙ্গোদক-মার্জিত হইয়া নূতন ভোগের স্থান করিয়া দিত। অন্নপূর্ণার বিরাট অন্নক্ষেত্রের সে স্মৃতি আজও আমাদের মনে জাগরিত আছে। এখনকার ভোগের ব্যাপারও বড় কম নহে।

অনেক ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়নাদি, কালীঘাটে মানসিক ক্রমে, দেবীর সম্মুখেই হইয়া থাকে। ঐরূপ স্থলে নব ব্রহ্মচারীকে তিন দিন দণ্ডীরূপে পৃথক গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই দণ্ড ভাসান হইয়া যায়।

করুণাময়ী মায়ের দ্বারে, অনেক নিরাশ্রয় অভুক্ত অতিথি, সন্ন্যাসী ও দরিদ্রগণ সমবেত হয়। পূজাদি শেষ হইলে মধ্যাহ্নের পর ইহারা মায়ের প্রসাদ পায়। ভোগের পরই মন্দিরদ্বার নিত্য আবদ্ধ হয়। সন্ধ্যার সময় তাহা খোলা হইয়া থাকে।

হিন্দুর পবিত্রতীর্থ কালীঘাটের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকবর্গের গোচরার্থে লিপিবদ্ধ করিলাম। খ্রীস্টের ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই যে বঙ্গের প্রধান শক্তিপীঠ কালীঘাট সাধারণে বিশেষভাবে পরিচিত হয়, তাহা পূর্বোল্লিখিত ঘটনাবলী হইতেই প্রমাণিত হইবে। এই কালীঘাটের প্রতিষ্ঠার সহিত বড়িশা সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদারগণের বিশেষ সম্বন্ধ। আমরা পরপৃষ্ঠায় তাঁহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বংশবৃক্ষ প্রদান করিয়া কালীঘাট-প্রস্তাব শেষ করিলাম।

কালীর নিত্য আয়-ব্যায় তালিকা

আয়	ব্যয়
১। দর্শনার্থী—যাত্রীগণ প্রদত্ত অর্থ (কালী, নকুলেশ, শ্যামরায় ও মনসার প্রণামী)।	১। নিত্যপূজার নৈবেদ্যাদি।
২। যাত্রীগণ প্রদত্ত পূজার দ্রব্যাদি।	২। পুরোহিতের দক্ষিণা।
৩। পশুবলির দক্ষিণা।	৩। বেশকার-মিশ্রগণের দৈনিক বেতন।
৪। উৎসর্গীকৃত ছাগমুণ্ড।	৪। বাদ্যকার, ঘড়িয়াল (যে ঘণ্টা বাজায়), পশু-বলির কর্মকার প্রভৃতির দৈনিক বেতন।
৫। অতিরিক্ত পূজা—প্রণামী ও ভক্তগণ প্রদত্ত বিবিধ উপহার।	৫। মন্দির রক্ষার আটজন প্রহরীর দৈনিক বেতন।
৬। কালীর নামের দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব প্রভৃতি।	৬। পাচক ও পুরী—সম্মার্জকের দৈনিক বেতন।
	৭। কালীমাতা ও শ্যামরায়বিগ্রহের ভোগের দ্রব্যাদি ও বৈকালিক।

১. পশুবলির দক্ষিণা সকলের পক্ষে সমান নহে। সাধারণকে প্রতি ছাগবলির জন্য, চারি আনা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু পুলিসের লোকের নিকট দুই আনা ও সেনাবিভাগের হিন্দু সিপাহীর নিকট এক আনা লওয়া হয়। মহিষ বলির দক্ষিণা— এক টাকা। শারদীয়া মহাষ্টমী, কালীপূজা ও অন্যান্য শাক্ত পর্বতিথিতে বলির বৃদ্ধি অনেক আদায় হইয়া থাকে।—কালীক্ষেত্র-দীপিকা।

বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশবৃক্ষ
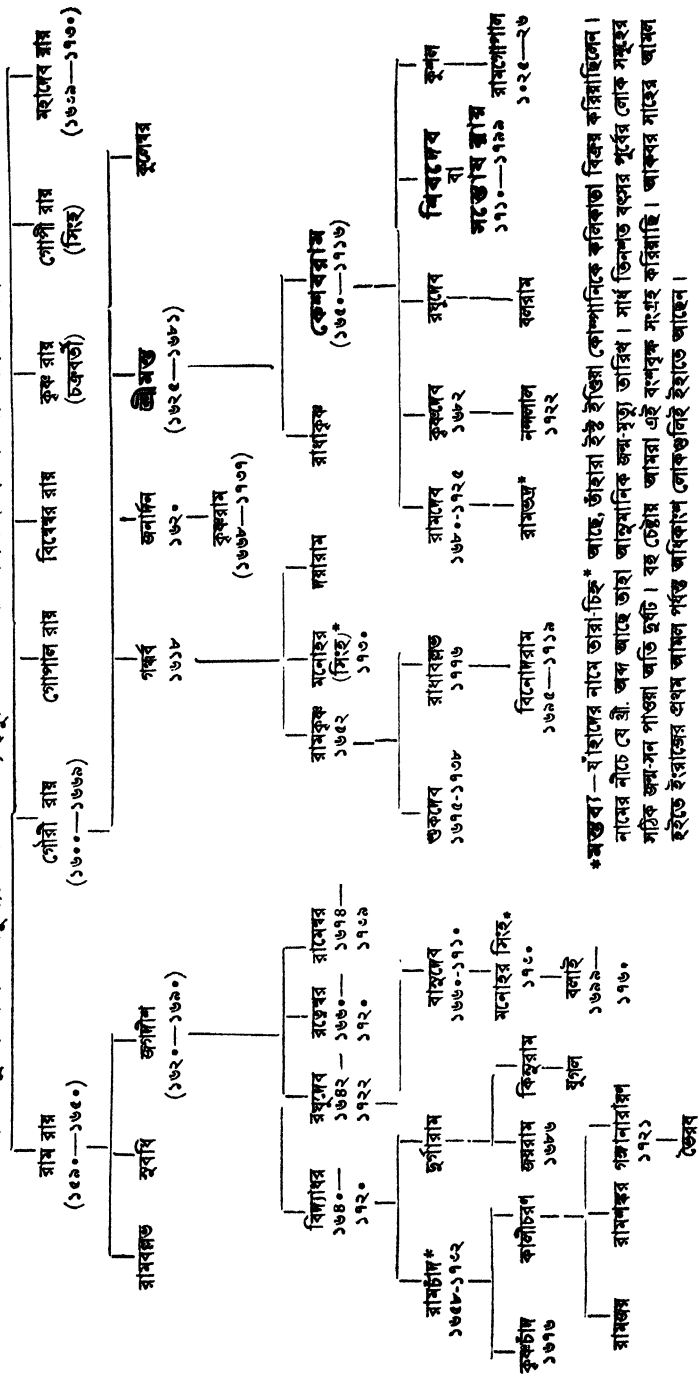
মন্তব্য—যাঁহাদের নামে তারা-চিহ্ন আছে, তাঁহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কলিকাতা বিক্রয় করিয়াছিলেন। নামের নীচে যে খ্রী. অব্দ আছে তাহা আনুমানিক জন্ম-মৃত্যু তারিখ। সার্ধ তিনশত বৎসর পূর্বের লোক সমূহের সঠিক জন্ম-সন পাওয়া অতি দুর্ঘট। বহু চেষ্টায় আমরা এই বংশবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়াছি। আকবর সাহের আমল হইতে ইংরাজের প্রথম আমল পর্যন্ত অধিকাংশ লোকগুলিই ইহাতে আছেন।

ভিন্ন ভিন্ন মহানুভব ব্যক্তিদিগের দ্বারা নির্মিত, কালীপীঠ সম্বন্ধীয় বর্তমান দেবোত্তর ইমারত তালিকা

বর্তমান কীর্তি	নির্মাণের সময় (খ্রী. অব্দ)	কাহা দ্বারা নির্মিত
কালীর সম্মুখীন গঙ্গার ঘাট	১৭৭০।৭১	পঞ্জাব প্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ সৈনিক হুজুরীমল।
কালীর বর্তমান মন্দির	১৮০৯	বড়িশার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী, সন্তোষ রায় চৌধুরী ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ।
দুটি ভোগঘর	১৮১২	গোরক্ষপুর নিবাসী টীকা রায়।
পুরীর তোরণদ্বার ও নহবত খানা	১৮১২	ঐ
নাট্যমন্দির	১৮৩৫	আন্দুলের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা কাশীনাথ রায়।
শ্যামরায় বিগ্রহের অধিষ্ঠান মন্দির	১৮৪৩	বাওয়ালী নিবাসী বৈষ্ণব-প্রধান জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল।
তৃতীয় ভোগঘর	১৮৩৪	শ্রীপুর নিবাসী জমিদার রায় তারকচন্দ্র চৌধুরী।
	১৮৪৪	তেলিনীপাড়া নিবাসী জমিদার কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নকুলেশ্বরের মঠ মন্দির	১৮৫৪	পঞ্জাব প্রদেশীয় ব্যবসায়ী তারাসিংহ।
পুরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গমনাগমনের পথ	১৮৫৮	গড়িয়া নিবাসী গোবিন্দ সাধু খাঁ ও জোড়াসাঁকো নিবাসী রামচন্দ্র পাল এবং পরে ছাপরা নিবাসী গোবর্ধনদাস আগরওয়ালা।
শ্যামরায়ের দোলমঞ্চ	১৮৫৮	সাহানগর নিবাসী মদন কোলে।
অবশিষ্ট ভোগঘর	১৮৭৮	ছাপরা নিবাসী গোবর্ধন দাস আগরওয়ালা।
গঙ্গার ঘাট হইতে কালীর মন্দির পর্যন্ত গমনাগমনের পথ	১৮৭৮	জোড়াসাঁকো নিবাসী রামচন্দ্র পাল ও গোবর্ধনদাস আগরওয়ালা।
শ্মশানের ঘাট, বিশ্রাম ঘর ও যাতায়াতের পথ	১৮৭৯	কালীর সেবাইত ৺গঙ্গানারায়ণ হালদারের বনিতা, বিশ্বময়ী দেবী (৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের জননী)।
শ্মশানের বড় বিশ্রাম ঘর ও শিব মন্দির	১৮৮০	হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বেঞ্চক্লার্ক বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু।
কালীর মন্দিরের বায়ু কোণে মনসাতলা প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ	১৮৮০	বেহালা নস্করপুর নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র দাস মণ্ডল।

পঞ্চম অধ্যায়

ইউরোপীয় জাতির ভারতে আগমন : ইংরাজের অভ্যুদয়

ভারতে ইউরোপীয় জাতির প্রথমাগমন—খৃঃ পূঃ ৫৫০ অব্দে ইউরোপের সহিত ভারতের সংস্রব—পারস্যরাজ দরায়ুস কর্তৃক সিলাক্সকে ভারতে প্রেরণ—সিলাক্সের লিখিত বৃত্তান্ত—আলেকজান্দার কর্তৃক ভারতাক্রমণ—ইউরোপখণ্ডে ভারতের কথা প্রচার—মেগাস্থিনিস কর্তৃক লিখিত প্রাচীন ভারতের বৃত্তান্ত, পাটলিপুত্রের ঐশ্বর্যময় অবস্থা—পর্টুগীজগণের প্রথম ভারতে আগমন—পর্টুগীজদের প্রভাব বিস্তার—পর্টুগীজগণের অধঃপতন—ইংরাজ কোম্পানির প্রথম আবির্ভাব—ড্রেক, ক্যাবেণ্ডিস্ প্রভৃতি ইংরাজ নাবিকগণের ভারতে প্রথমাগমন-শুভমুহূর্তে লণ্ডন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা—ভারতে ইংরাজের প্রথম বাণিজ্যারম্ভ—রাজ্ঞী এলিজাবেথের সনন্দ—জেমস ল্যাঙ্কেস্টারের প্রথম ভারতযাত্রা। আকবরের সভায় জন মেইডেনহল নামক জনৈক ইংরাজের আগমন—কাপ্তেন হকিন্স—জাহাঙ্গীরের সভায় হকিন্সের অবস্থান—হকিন্সের উপর সম্রাটের প্রীতি—প্রীতির ফলে সম্রাট কর্তৃক হকিন্সের বিবাহ-চেষ্টা। বিবাহের পরিবর্তে বাণিজ্যস্বত্ব প্রার্থনা—পর্টুগীজদের প্রতিযোগিতা—সুরাটে ইংরাজজাতির প্রথম বাণিজ্যাগার—সুরাট কুঠির প্রথম অধ্যক্ষ বেস্ট সাহেব—পর্টুগীজদের প্রতিযোগিতা—সুরাটের ইংরাজকুঠির বিপন্ন অবস্থা—স্যর টমাস রোর জাহাঙ্গীরের দরবারে আগমন—সম্রাট দরবারে রোর দীর্ঘকাল অবস্থান—বঙ্গদেশে বাণিজ্যস্বত্বলাভ—সুরাটের বাণিজ্যকুঠির ক্রমোন্নতি—শিবাজির অভ্যুদয়—মোগলের সহিত প্রতিযোগিতা—শিবাজি কর্তৃক সুরাট লুণ্ঠন—ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট অক্সেনডেনের সহিত শিবাজির যুদ্ধ—শিবাজির পরাজয়—ঔরঙ্গজেবের নিকট ইংরাজ প্রেসিডেণ্টের খেলাত প্রাপ্তি। মান্দ্রাজের বাণিজ্য-কুঠির উন্নতি—মান্দ্রাজ কুঠিতে প্রথম গবর্ণর নিয়োগ—সেকালের ইংরাজ গবর্ণরের বাবুয়ানা—ইংরাজের বোম্বাই লাভ ইত্যাদি।

অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠামধ্যে আমরা দেখিতে পাই, যে যে সিলাক্স (Scylax) নামক একজন গ্রীক, খৃঃ পূর্ব ৫৫০ অব্দে সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসেন।[১] পারস্যাধিপতি দরায়ুস রাজা সিন্ধুনদীর তীরভূমিস্থিত জনপদগুলির সন্ধান লইবার জন্য সিলাক্সকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। সিলাক্স ভারতের একাংশ দেখিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে তাঁহার সমকালবর্তী গ্রীসীয়গণ ভারত সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা জানিতে পারেন। সিলাক্সের কথিত বৃত্তান্ত নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ ছিল।

সিলাক্সের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরবর্তী যুগের গ্রীসীয়দের মনে ভারতভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। ইহার পর আমরা হেরোডটাসের গ্রন্থে ভারতের আংশিক বিবরণ দেখিতে পাই।[২] খৃঃ পূর্ব ৩২৭ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ সেকেন্দার সাহ (আলেকজান্দার) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন প্রথিতনামা গ্রীসীয় ইতিবৃত্তলেখক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারত-

১. Scylax : হেরোদোতাস্-এর মতে সিন্ধুনদের উৎপত্তি ও গতিপথ পর্যবেক্ষণ করার জন্য Scylax (of Caryanda in Caria)-এর নেতৃত্বে পারস্য সম্রাট দরায়ুস খ্রী. পূ. ৫১৭ অব্দে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

২. হেরোদোতাস-এর বই-এ ভারত সম্পর্কে বহু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে কিন্তু লেখক নিজে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই।

বর্ষের লোকবিশ্রুত ঐশ্বর্য, গগনস্পর্শী উত্তুঙ্গশৃঙ্গময় পর্বতমালা, মৃদুসমীরান্দোলিত শস্যক্ষেত্র, শ্যামল প্রান্তর, তিমিরময় খনিমধ্যে সুবর্ণ ও হীরকস্তূপ ও নাগরিকদের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

আলেকজান্দারের সমকালবর্তী মেগাস্থিনিসের[১] গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যপ্রবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা তৎকালীন ইউরোপে প্রচারিত হয়। মেগাস্থিনিস ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রথমত সেলুকসের দূতরূপে তিনি বহুকাল পাটলিপুত্রে অবস্থান করেন। এই মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি—'ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ছয়লক্ষ পদাতিক, ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা ছিল। নয় হাজার হস্তী সর্বদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিত। চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ এই সমস্ত অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধকুশল, রণনীতিদক্ষ ও অত্যন্ত বলীয়ান ছিল। তাঁহার আমলে পুলিস বন্দোবস্ত এতদূর সুন্দর ছিল যে সেরূপ সুবন্দোবস্ত ইউরোপীয় প্রদেশ সমূহেও দেখা যাইত না।'

আমরা কলিকাতার ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি। ইহার সহিত ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত। পর্টুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এই ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহাদের সকলেরই প্রধান লীলাক্ষেত্র এই বঙ্গদেশ। হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, সুতানুটি ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ঘটনাবলীর সহিত তাঁহাদের কর্মময় জীবনের অতীত ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত। অন্যান্য ইউরোপীয়দের বর্জন করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজদের প্রতিই অবশেষে প্রসন্না হন। ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি জাতির স্মৃতি বঙ্গদেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গিয়াছে। ফরাসীর ক্ষুদ্র অধিকার চন্দননগর এখনও এই বঙ্গে, উক্তজাতির পূর্ব অস্তিত্বের স্মৃতি আজও অতি ক্ষীণভাবে রক্ষা করিতেছে।[২] দিনেমার ওলন্দাজের কথা আমরা ত একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছি। চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও কাশিমবাজারের বক্ষস্থিত কয়েকটি সমাধিক্ষেত্রে আজও সেকালের দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকদিগের অস্থিরাশি বাঙ্গালার কোমল মৃত্তিকায় প্রোথিত রহিয়াছে। ইংরাজজাতি ভারতে বাণিজ্য করিতে না আসিলে আজ আমরা ব্রিটিশশাসনের সুখ, শান্তি, গৌরব ও সৌভাগ্য ভোগ করিতে পারিতাম না। আজ আমরা ভারতেশ্বরী মাতৃপ্রতিম মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র সম্রাট জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীকে এই কলিকাতা রাজধানীতে ভারত সম্রাট-সম্রাজ্ঞী-রূপে দেখিতে পাইতাম না। এই উচ্চশিক্ষা, অনাবিল সুখশান্তি, উচ্চরাজপদ, আর জগৎব্যাপী নাম লইয়া বঙ্গবাসী আজ সমগ্র ভারতের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইতে পারিত না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কত কষ্ট সহ্য করিয়া, কত বাধা-বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাণিজ্যের ফলে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

ইংরাজেরা এদেশে আসিবার পূর্বে পর্টুগীজগণ প্রথমে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করেন। ভারতের পশ্চিমোপকূলে তাঁহাদের উপনিবেশ স্থাপিত হয় ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২২এ মে, ভাস্কো ডি গামা নামক একজন পর্টুগীজ নাবিক[৩] উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া প্রচণ্ড ঝড়ঝটিকা ও সমুদ্রযাত্রার অসংখ্য বাধাবিঘ্ন সহ্য করিয়া কালিকটে উপস্থিত হন। তখন কালিকটে জামোরিন[৪]

১. মেগাস্থিনিস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে খ্রী. পূ. ৩০৪ হইতে খ্রী. পূ. ২৯৯ পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন।—*Comprehensive History of India*, Vol II, ed. K.A.N. Sashtri, Calcutta 1957, p. 8.

২. ভারত এবং ফরাসী সরকারের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তিনামা অনুসারে ফরাসী চন্দননগরের কর্তৃত্ব ও অধিকার ১৯৫১ সালে ভারত সরকারের অধীনে হস্তান্তরিত হয়।

৩. 'Vasco da Gama' arrived at a small village, 8 miles north of Calicut on May 17, 1498.—*Cambridge History of India*, Vol V, p. 3-4.

৪. Zamorin—ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, কালিকটের হিন্দু রাজাদের উপাধি। 'কালিকট যে যে সমুদ্রযাত্রার জন্যই সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, রাজ বংশের উপাধি অদ্যাপি তাহার পরিচয় প্রদান

বলিয়া একজন ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া পর্টুগীজেরা তাঁহাদের একটু আশ্রয়স্থান করিয়া লইলেন। তৎপরে সাহস ও উদ্যম সহায়ে এই পর্টুগীজগণ মালাবার উপকূল হইতে পারস্যোপসাগরের তীর পর্যন্ত প্রধান প্রধান বন্দরগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করেন। একশত বৎসরের মধ্যে আরব উপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতঃ প্রাচী জাপানের সন্ধান পর্যন্ত পাইয়াছিলেন।

পর্টুগীজ বণিকগণ ভারতের পশ্চিমকূলস্থ বন্দরগুলির সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিতে লাগিল। ভারতের ঐশ্বর্যপ্রবাদ ভারতীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদির সহায়তায় ইউরোপের নানাস্থানে প্রচারিত হইতে লাগিল। সমগ্র ইউরোপীয় জগৎ স্তম্ভিতনেত্রে ভারত প্রত্যাগত এই পর্টুগীজ বণিকগণের ঐশ্বর্য ও উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইল। ভারতের সহিত বাণিজ্যে সহজে যে এত ধনশালী হওয়া যায় ইহা দেখিয়া ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি জাতিরা পর্টুগীজদের মত ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল।

পিড্রো এল্‌ভারেজ ক্যাব্রাল[১] নামক একজন পর্টুগীজ ব্যবসায়ী ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে কালিকটে প্রথম ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যনিবাস স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে পর্টুগীজেরা ভারতীয় বন্দরাদি হইতে মাল সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে চালান দিতেন। পর্টুগালের লিসবন নগরী সেই সময়ে ভারতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রধান ইউরোপীয় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। দেখিতে দেখিতে লিসবন নগরী সেই পুরাকালে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যসমূহের প্রধান আড়ত হইয়া পড়িল। সমগ্র ইউরোপীয় জাতিই লিসবনের বাজারে ভারতীয় মাল কিনিতে আরম্ভ করিল।

ক্যাব্রালের তিন বৎসর পরে আলফান্‌সো আলবুকার্ক[২] নামক একজন পর্টুগীজ সেনানীর অধিনায়কতায় পর্টুগীজেরা তাহাদের ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যনিবাসের রক্ষা জন্য একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করেন। ইহাই ভারতবর্ষে ইউরোপীয় জাতির প্রথম দুর্গ। ১৫০৬ হইতে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের পশ্চিমোপকূলে বঙ্গোপসাগরে ও সমুদ্রতটবর্তী প্রধান প্রধান বন্দর সমূহে পর্টুগীজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ আধিপত্য বিস্তৃত হয়। কিন্তু ১৬৬৮ হইতে পর্টুগীজ ক্ষমতা ক্রমশঃ হীনশক্তি হইতে থাকে।

পর্টুগীজদিগের অবনতিতে দিনেমারেরা ভারতোপকূলে বাণিজ্যের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৫৮০ খ্রীঃ স্পেন ও পর্টুগাল একজন রাজার শাসনাধীনে আসে। দিনেমারেরাও এই সময়ে এক স্বাধীন জাতিতে পরিণত হয়। এতাবৎকাল দিনেমারেরা লিসবন বন্দর হইতেই ভারতের আমদানি দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিত। কিন্তু পর্টুগীজেরা মদগর্বে অন্ধ হইয়া দিনেমারদিগকে বড়ই নিগৃহীত করিতে লাগিল। এক সময়ে দিনেমারদের কয়েকখানি জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবার জন্য লিসবন বন্দরে উপস্থিত হইলে পর্টুগীজেরা তাহা আটক করিয়া দিনেমার ব্যবসায়ী ও পোতাধ্যক্ষদিগকে কারানিক্ষিপ্ত করিল।

এই সমস্ত কারানিক্ষিপ্ত দিনেমার কয়েদিদিগের মধ্যে একজন কোন পর্টুগীজ কয়েদির নিকট হইতে ভারতের বাণিজ্যদ্রব্যাদি ও ঐশ্বর্যপ্রবাদ, এবং ভারতে আসিবার সহজ পথ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক ব্যাপার কথায় কথায় জানিয়া লয়। তাহার পর সেই অপরাধী মুক্তিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। তাহার মুখে ভারতের ঐশ্বর্যপ্রবাদ অবগত হইয়া ডেনমার্কের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী অনতিবিলম্বে দুই-চারিখানি দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ বাণিজ্য জাহাজ সংগ্রহ করিয়া

করিয়া থাকে। রাজার উপাধি 'সামরী'—তাহাতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য থাকাই সূচিত হয়। ফিরিঙ্গি বণিক 'সামরীর' উচ্চারণের বিকৃতি সাধিত করিয়া কালিকট-রাজকে 'জামোরিন' নামে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন।'—ফিরিঙ্গি বণিক, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৮।

১. Cabral—Pedro Alvarez Cabral. ইনি ৬টি জাহাজ লইয়া ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর কালিকট বন্দরে উপনীত হন।

২. পূর্ব সংস্করণে আবুকার্ক আছে, প্রকৃত নাম Alfonso de Albuquerque. ভারতবাসী সংশোধিত।

ভারতের দিকে প্রেরণ করেন।

পর্টুগীজগণ তখন বুঝিল দিনেমারেরা একবার ভারতে প্রবেশ করিতে পারিলে তাহাদেরই সর্বনাশ হইবে। ভারতের সহিত বাণিজ্যে তাহাদের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিলে তাহাদেরই ব্যবসা মাটি হইবে। কাজেই তাহারা উত্তমাশা অন্তরীপের পথ আটক করিল। দিনেমারেরা পর্টুগীজদিগের প্রতিযোগিতায় বিফলমনোরথ হইয়া আবার চারিখানি বাণিজ্য জাহাজ অন্য পথে ভারতের দিকে প্রেরণ করে।

দিনেমারগণ ১৫৯৮ খৃীস্টাব্দে ভারতের উপকূলে বাণিজ্য আরম্ভ করে।[১] এই সময়ে মোগল সম্রাটগণের শাসন কঠোরতায় পর্টুগীজগণ হীনশক্তি হইয়া পড়িতেছিল। এজন্য তাহারা ভারতের পশ্চিমোপকূল ত্যাগ করিয়া পূর্বোপকূলে আশ্রয় লইবার যোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্রাট সাহজাহানের আমলে প্রসিদ্ধ ফরাসী ভ্রমণকারী বার্নিয়ার[২] বহু-দিন দিল্লী ও আগরায় সম্রাটদরবারে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বার্নিয়ারের লিখিত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়, "১৬৬৩ খৃীস্টাব্দে দিনেমারদের আগরা সহরে একটি ফ্যাক্টরি ছিল, সেখানে চার পাঁচজনের বেশী লোক ছিল না। বঙ্গদেশ, পাটনা, সুরাট প্রভৃতি স্থানেও তাহাদের ছোট ছোট বাণিজ্যকুঠি ছিল।" বার্নিয়ারের এই বিবরণ হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, দিনেমারেরা পর্টুগীজদিগের পরে ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি[৩]

পর্টুগীজ ও দিনেমারদিগের পর ইংরাজ ও ফরাসীগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য যে বণিকসমিতি সংগঠিত করেন তাহাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানি কিরূপে বাণিজ্যের সহিত রাজ্য অর্জন করেন তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। তাহার পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা কিরূপে হইল তাহা পাঠকের জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

আজও লোকে "কোম্পানির মুল্লুক, কোম্পানির পথঘাট" প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইতেই এই সমস্ত আখ্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইংরাজ যখন পর্টুগীজ ও দিনেমারদিগের মত এদেশে কেবল বাণিজ্য উদ্দেশে আগমন করেন, তখন তাঁহারা জানিতেন না যে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া এই সমগ্র ভারতরাজ্য তাঁহাদের হস্তেই সমর্পণ করিবেন। সামান্য একটু আশ্রয়স্থান একটি ক্ষুদ্র বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের জন্য মোগল বাদসাহের কর্মচারীদের নিকট তাঁহাদিগকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কতবার তাঁহারা অধিকারচ্যুত হইয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। মোগল বাদসাহের অধীনস্থ প্রাদেশিক কর্ম-চারীরা এই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণকে কতই না নিগৃহীত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ইংরাজজাতি উদ্যম, অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা বলে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শেষে এই ভারতবর্ষের সার্বভৌমিক সম্রাটপদ লাভ করিয়াছেন। কি করিয়া এই কোম্পানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল, এখন তাহারই আলোচনা করা যাউক।

ক্যাবট, ভাস্কো ডি গামা, আলবুকার্ক প্রভৃতি পর্টুগীজগণ এদেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায় লিপ্ত হইয়া কিরূপ সাফল্য লাভ করেন তাহা ইউরোপের সর্বত্রই উপকথার মত প্রচারিত হইতে

১. ভারতে দিনেমারদের প্রথম উপনিবেশ Tranquebar (১৬২০)। ডেনমার্ক-এর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠাকাল ১৬১৫ খ্রী.।

২. বার্ণিয়ার-এর ভারতে অবস্থানকাল ১৬৫৮-১৬৬৭খ্রী.। Francois Bernier—***Travels in the Mogul Empire***, Oxford 1914.

৩. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুরা নাম The Company of Merchants of London Trading into the East Indies। এই যৌথ কোম্পানি ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ-এর নিকট হইতে প্রথম সনদ লাভ করেন ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর।

লাগিল। ইংরাজজাতি এই সমস্ত অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া ভারতের সহিত বাণিজ্যসংস্রবে আসিতে বড়ই উৎসুক হইলেন। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরী ও ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের আমলেই ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। ইংলণ্ডের বড় বড় আমিরগণ তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তি বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন তুলিয়া ফেলিলেন। এই নবগঠিত ইংরাজ কোম্পানি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিলেন। সকল কথা বলিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। তবে পাঠক জানিয়া রাখুন, ১৫৬৭ খৃীস্টাব্দে স্যর ফ্রান্সিস ড্রেক[১] নামক একজন দুর্দমনীয় উৎসাহী ইংরাজ প্লাইমাউথ বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া জাভাদ্বীপে উপস্থিত হয়েন। ড্রেকের এই সাফল্য দেখিয়া ইংরাজজাতি অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন বটে, কিন্তু এই পথ নিতান্ত সুগম বলিয়া বোধ না হওয়ায় পরিশেষে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

এই ঘটনার কুড়িবৎসর পরে, ১৫৮৬ খৃীস্টাব্দের জুলাই মাসে, টমাস ক্যাভেণ্ডিস[২] নামক আর একজন সুদক্ষ নৌসেনাপতি তিনখানি জাহাজ লইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের পথ অবলম্বন করেন। তিনি আমেরিকার উপকূল বাহিয়া আটলাণ্টিক সাগরের মধ্য দিয়া লানজ্জোন ও জাভা দ্বীপে উপস্থিত হন। প্রত্যাবর্তন সময়ে তিনি Cape of Good Hope বা উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া আবার প্লাইমাউথে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে আসিবার এই দুইটি পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় তৎকালীন ইংরাজজাতি মহোল্লসিত হইলেন। ভারতের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিনে শুভ-মুহূর্তে এলডারম্যান গডার্ড নামক এক ইংরাজের বাটিতে, "লণ্ডন-ইস্ট-ইণ্ডিয়া" কোম্পানির প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।[৩] এই সমিতিতে যে কয়জন ইংরাজ উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা উচ্চদরের ধনী ব্যবসায়ী। কাজেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাণিজ্যজাহাজ ও তদানুসঙ্গিক আয়োজনাদির জন্য প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইল।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রদত্ত সনন্দবলে বলীয়ান হইয়া এই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থে প্রথম যাত্রা করেন। এই সনন্দের অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি প্রধান ও গণনীয় শর্ত ছিল যে কোম্পানি ইচ্ছা করিলে, প্রাচ্যদেশে ভূমিক্রয় বা অন্য কোন কায়েমি বন্দোবস্ত জমি দখল করিয়া বাণিজ্যব্যবসায় কুঠি স্থাপন করিতে পারিবেন। পনর বৎসরের জন্য অবাধ বাণিজ্যাধিকার এই কোম্পানিকে দেওয়া হয়। পাঁচখানি জাহাজ বাণিজ্যার্থে সজ্জিত হয় এবং কাপ্তেন জেমস ল্যাঙ্কেস্টার[৪] নামক একজন ইংরাজ নাবিক জাহাজগুলির প্রধান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

১. Drake—Sir Francis Drake. ইনি পর্টুগীজদের বিরুদ্ধে প্রথম সাফল্য অর্জন করেন ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে।

২. Thomas Cavendish—"An English circumnavigator in the reign of Elizabeth, born about 1555, died 1592. Having collected three vessels for the purpose of making a predatory voyage to the Spanish colonies, he sailed from Plymouth in 1586, took and destroyed many vessels, ravaged the coasts of Chile, Peru, and New Spain, and returned by the Cape of Good Hope, having circumnavigated the globe in two years and fortynine days, the shortest period in which it had then been effected. In 1591, he set sail on a similar expedition, during which he died."—*The British Encyclopaedia*, Vol II. London, 1933, p. 425.

৩. আমরা তিনশত বৎসরের পূর্বের কথা বলিতেছি। বহুদিন পর্যন্ত লণ্ডন সহরের এই প্রসিদ্ধ বাটিটি 'Founder's Hall' বলিয়া পরিচিত ছিল। এই বাটির ভাগ্যেই ইংরাজ ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়।

৪. James Lancaster—"In 1591 James Lancaster, in the *Edward Bonaventura* reached Cape Comorin and the Malay Peninsula. On February 13, 1691, in command of five vessels, Lancaster set up on the company's first voyage, visited Achin, captured a Portuguese barrack, left a factory at Bantun and returned to England in September 1603."—P.E. Roberts, *History of British India*, p. 22, 25.

মধ্যা, শুভক্ষণে মাহেন্দ্রযোগে টরবে বন্দর হইতে এই জাহাজগুলি ভারতাভিমুখে যাত্রা করে।[১] এক বৎসর সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিয়া জাহাজগুলি সুমাত্রা দ্বীপের আচিন নামক স্থানে উপস্থিত হয়। আচিনের অধিবাসীরা ল্যাঙ্কেস্টারের দলের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিল না। বরঞ্চ তাহাদের সহিত বাণিজ্যসন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। ল্যাঙ্কেস্টারের জাহাজে যে সমস্ত লৌহনির্মিত যন্ত্রাদি ও বিলাতি বাণিজ্যদ্রব্যাদি ছিল, তাহারা তাহা কিনিয়া লইল। কাপ্তেন ল্যাঙ্কেস্টারও মালয়দ্বীপজাত নানাবিধ ফল, মরিচ, কর্পূর, মুসব্বর, গুলগুলু, দারুচিনি. সোনামুখি প্রভৃতি দ্রব্য খরিদ করিয়া জাভাদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রায় তাঁহারা ভারতের কোন বন্দরে প্রথম উপস্থিত হন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি। তবে মালয় ও জাভাদ্বীপের সহিত বাণিজ্যে এই নব প্রতিষ্ঠিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছিলেন তাহার আর কোন সন্দেহই নাই।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে জন মেইডনহল (John Maidanhall)[২] নামক একজন ইংরাজ সওদাগর আকবরের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মেইডনহল কতদিন মোগলদরবারে ছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি যে সম্রাট আকবরের অনুকম্পায় বাণিজ্য সম্বন্ধে একখানি অনুমতিপত্র ও ফারমান পাইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেইডনহল ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হয় নাই। আগরায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধরিতে গেলে জাহাঙ্গীর বাদসাহের আমলেই ইংরাজের বাণিজ্যলক্ষ্মী ও সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যস্বত্ব লাভের জন্য কাপ্তেন হকিন্স[৩] নামক একজন ইংরাজ ভারতে প্রেরিত হয়েন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে হকিন্স প্রবাসযাত্রার পথে বহু কষ্ট ভোগ করিয়া মোগলদরবারে উপস্থিত হন।

হকিন্স তুরস্কের ভাষা জানিতেন। কাজেই বাদসাহের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। জাহাঙ্গীরও তাঁহার উপর যথেষ্ট সন্তুষ্ট হন। বাদসাহের এ সন্তোষের পরিণাম শেষে এতটা বেশী হইয়া পড়ে যে তিনি এক সুন্দরী আর্মানী যুবতীকে নির্বাচিত করিয়া তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য হকিন্সকে মহা পীড়াপীড়ি করিয়া বসেন। কিন্তু হকিন্স ত এদেশে প্রজাপতির নির্বন্ধে আবদ্ধ হইতে আসেন নাই। কাজেই নিজের স্বার্থ বশে এই স্ত্রীরত্নের জন্য তিনি ব্যাকুল না হইয়া স্বদেশীয় স্বজাতীয় বণিকগণের স্বার্থরক্ষার জন্য বাদসাহের নিকট এক জোর আরজি করিয়া বসিলেন।

তাঁহার বাসনা সিদ্ধ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে হইল না। বাদসাহ ইংরাজ বণিকগণকে দীর্ঘকালের জন্য ভারতবর্ষে বাণিজ্য স্বত্বদানে অনেকটা সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু পর্টুগীজদের প্রতিযোগিতায় হকিন্সকে সে যাত্রা বিফল মনোরথ হইতে হইল। আকবরসাহের আমল হইতে মোগল-সম্রাট-দরবারে পর্টুগীজ পাদরীসম্প্রদায়ভুক্ত জেসুইটগণের প্রবল আধিপত্য ছিল। এই জেসুইটগণ যখন সম্রাটের পার্শ্বচরগণকে বুঝাইলেন যে ইংরাজ এই বাণিজ্যস্বত্ব লাভ করিলে পর্টুগীজদিগের তাহাতে সমূহ অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, তখন তাঁহারা ইংরাজদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়া বাদসাহের কান ভারি করিলেন। হকিন্স এত কষ্ট করিয়া এদেশে আসিয়া প্রায় আড়াই বৎসরকাল আগরায় কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফল বিশেষ আশাপ্রদ হইল না। পর্টু-

১. ইংরাজ বণিকগণের যে চারিখানি জাহাজ সর্বপ্রথমে ভারতসমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত হয় তাহাদের নামগুলি অতি বিচিত্র। ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠক ইহার রসগ্রহণ করুন। জাহাজগুলির নাম—The Scourge, The Susan, The Hector, The Ascension. শেষোক্ত জাহাজখানি পিনেস।

২. John Maidenhall, ইঁহাকে সরকারি নথিপত্রে John Midnall এবং John Mildenhall নামেও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইনি স্থলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে।

৩. হকিন্স আর্মানী যুবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পর্তুগীজদিগের প্রতিযোগিতাতেই তাঁহার আশাসিদ্ধির যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিল। কেবল মাত্র সুরাট বন্দরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের সামান্য স্বত্ব লাভ করিয়া হকিন্স বিলাতে ফিরিয়া যান। যাহা হউক, এত প্রতিযোগিতার মধ্যেও ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে সুরাটে ইংরাজের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল।

বেস্ট নামক একজন ইংরাজ নৌসেনাপতি সুরাটের প্রথম প্রতিষ্ঠিত কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। বেস্ট অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও জবরদস্ত লোক ছিলেন। পর্তুগীজেরা তাঁহাকে নানাবিধ বিপত্তিতে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাঁহার কুঠিস্থাপনের ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পথে অনেক বাধা উপস্থিত করিয়াছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। জবরদস্ত বেস্ট স্থানীয় মোগল শাসনকর্তাকে হস্তগত করিয়া বাদসাহী ফারমানের জোরে সুরাটে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিলেন। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ কুঠিস্থাপনের প্রায় দুই বৎসর পরে বেস্ট ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান।

বেস্টের পরে কাপ্তেন ডাউনটন নামক আর একজন ইংরাজ সুরাটের কুঠির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে, ডাউনটন সুরাটে উপস্থিত হন। তিনি কোম্পানির বাণিজ্যকুঠির অবস্থা যাহা দেখিলেন তাহাতে বড়ই আতঙ্কিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, কুঠিতে মোটে তিনজন মাত্র ফ্যাক্টর আছেন—বাকী ফ্যাক্টরেরা পলাইয়া গিয়াছেন। আত্মবিবাদ এবং চক্রান্তেই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ডাউনটন একটু কড়ামেজাজে কাজ আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার যথেষ্ট শত্রুবৃদ্ধি হইল। পর্তুগীজদিগের শত্রুতা ছাড়া স্থানীয় মোগল সুবাদারগণও তাঁহার উপর বিরক্ত হইলেন। ইহার উপর সুরাটের জলহাওয়াও তাঁহার সহিল না। কঠিন রোগে পীড়িত হইয়া তিনি সুরাটেই সমাধিস্থ হইলেন। কেরিজ্‌ বলিয়া একজন ফ্যাক্টর তাঁহার স্থানাধিকার করিলেন।

বিলাতের কর্তারা তাঁহাদের সুরাটের বাণিজ্যকুঠির অন্ধকারময় অদৃষ্টের কথা অবগত হইয়া ইংলণ্ডাধিপ জেমসের নিকট আরজি করিয়া স্যর টমাস রোকে দূতরূপে জাহাঙ্গীরের সভায় প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। রো সাহেব ১৬১৫ অব্দে ৬ই মার্চ বিলাত ছাড়িয়া সাত মাস পরে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে সুরাটে উপস্থিত হন। সুরাট হইতে তিনি বুরহানপুর যাত্রা করেন। সম্রাটপুত্র তখন বুরহানপুরের শাসনকর্তা। রো সাহেব নানা উপায়ে সাহাজাদা খুরমকে (পরে সাজাহান) সন্তুষ্ট করিয়া আজমীর অভিমুখে যাত্রা করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বায়ুপরিবর্তনের জন্য তখন আজমীরে অবস্থান করিতেছিলেন। স্যর টমাস রো ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩এ ডিসেম্বর আজমীরে উপস্থিত হন। এত কষ্ট করিয়া আজমীরে আসিয়াও তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে প্রায় মাসাবধি-কাল সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে হয়।

সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্যর টমাস রো তাঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরের পত্র ও তৎপ্রেরিত বিচিত্র উপঢৌকনাদি প্রদান করিলেন। জাহাঙ্গীর বাদসাহ ইংলণ্ডের রাজদূতকে সম্মানের চক্ষে, প্রীতির চক্ষে দেখিলেন। রো সাহেবও নিজের স্বভাবগুণে সম্রাটের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইলেন।

রো সাহেব দুইটি প্রার্থনা লইয়া সম্রাটদরবারে উপস্থিত হন। (১) ইংরাজ বণিকগণ যাহাতে মোগলরাজত্বের মধ্যে নির্ভয়ে নির্বিবাদে বাণিজ্য করিতে পান তাহার আদেশ। (২) যে সকল মোগল রাজকর্মচারীরা সুরাটে ও অন্যান্য স্থানে ইংরাজ ফ্যাক্টরের বা কর্মচারীদের নিকট জবরদস্তিতে অর্থশোষণ করিয়াছিলেন, ঋণ বলিয়া অর্থগ্রহণ করিয়াও তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই, তাহার পুনরুদ্ধার। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া মোগলরাজসভায় অবস্থান করিবার পর স্যর টমাস রো সাহেব বাদসাহের নিকট হইতে সমগ্র মোগলরাজ্যে বিশেষত বঙ্গদেশে বিনা বাধায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। মোগলরাজকর্মচারিগণ এতাবৎ কাল জবরদস্তিতে কোম্পানির নিকট যে অর্থগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়া স্যর টমাস রো সাহেব স্বদেশে প্রস্থান করেন।

ইহার পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া ইংরাজ কোম্পানি সুরাটে আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিয়াছিলেন। এই কয় বৎসরের বিশেষ কোন লিখিত বিবরণ নাই। যাহা আছে তাহাও বিশৃঙ্খল। ১৬৭৪ খৃীস্টাব্দে সাহজান বাদসাহের আমলে ডাক্তার ফ্রায়ার[১] সুরাট ফ্যাক্টরির বা বাণিজ্যাগারের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। ফ্রায়ার সাহেব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশের ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার মতে, "সুরাটে ইংরাজ বাণিজ্যের অবস্থা তখন বেশ সমুন্নত। ইংরাজ ফ্যাক্টরির অধ্যক্ষের বার্ষিক বেতন তখন পাঁচশত পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ইহার অর্ধেক বেতন তিনি হাত খরচ বাবত হিন্দুস্থানে পাইয়া থাকেন। বাকী অর্ধেক তাঁহার নামে কোম্পানির খাতায় বিলাতেই জমা থাকে। তহবিল তছরূপ বা অন্য কোন রূপ কুব্যবহারের জামিন স্বরূপ তাঁহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের এক সিকিউরিটি বা জামিন নামা দিতে হইয়াছে। ফ্যাক্টরির প্রধান হিসাবরক্ষকের বার্ষিক বেতন ৭২ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে পঞ্চাশ পাউণ্ড তিনি এখানে লইয়া থাকেন। বাকি টাকা বিলাতে জমা হয়। বিলাত হইতে নিযুক্ত কর্মচারী মাত্রেই এই রূপ অর্ধ বেতন। বাকী সকলেই পূরা বেতন পাইয়া থাকেন।"

প্রথম অবস্থায় সুরাটের ফ্যাক্টরি 'এজেন্ট' উপাধিধারী এক কর্মচারীর অধীনে ছিল। রিভিঙ্গটন সাহেব সুরাট ফ্যাক্টরির শেষ এজেন্ট। ইহাঁর পরই 'প্রেসিডেন্ট' পদের সৃষ্টি হয়। সুরাট ফ্যাক্টরির তৃতীয় প্রেসিডেন্ট স্যর জর্জ অক্সেনডেনের[২] আমলে মহারাষ্ট্রপতি শিবাজি সুরাট বন্দর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। ইহার পরে অনারেবল জেরাল্ড অঙ্গিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। ইনি যুদ্ধ করিয়া শিবাজিকে সুরাট হইতে হঠাইয়া দেন।[৩]

কয়েক বৎসরের মধ্যে করমণ্ডল উপকূলেও ইংরাজ বাণিজ্য যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। দিনে দিনে ব্যবসার উন্নতিতে সম্পত্তি বৃদ্ধিও যথেষ্ট হইয়াছিল। সম্পত্তি হইলেই সকলেই তাহা

১. John Fryer M.D. (died in 1733). On December 9, 1672 he embarked at Gravesend for a tour in India and Persia undertaken in the interest of the E.I. Company and did not reach England again until 20 August 1682. In 1698 he published *'A New Accouut of East India and Persia in 8 letters. Being Nine year's travels begun in 1672 and finished 1681...Illustrated with maps, figures and useful tables,—Dictionary of National Biography,* Vol VII, p. 742-743.

২. Sir George Oxenden (1620—1669) was appointed in March 1662 "Governor of the Fort and Island of Bombay and President and Chief Director of all their affairs at Surat and all other factories in the north parts of India, from Zeilen to the Red Sea." —*Dictionary of National Biography,* Vol XV, p. 9-10.

৩. স্যর জন অক্সেনডেন সত্যসত্যই একজন বাহাদুর পুরুষ। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন ভারতের একচ্ছত্র-সম্রাট। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজি ভিন্ন দাক্ষিণাত্যে তাঁহার আর কোন প্রবল শত্রুই ছিল না। শিবাজি মোগল-দিগকে উত্যক্ত করিবার জন্য যখন মোগলরাজত্বের দক্ষিণ সীমান্ত আক্রমণ করেন, সেই ভয়ানক সময়ে স্থানীয় মোগল শাসনকর্তা দুর্গের কটক বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে আত্মরক্ষায় মনোযোগী হন। প্রজার ধনসম্পত্তি ও জীবনরক্ষা অপেক্ষা তিনি নিজের জীবনকেই বহুমূল্য ভাবিয়াছিলেন। সুরাটের উপকূলে ইতিপূর্বে একখানা দিনেমার বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়া যায়। সেকালে সমস্ত ইউরোপীয় জাহাজ জলদস্যু বা সামুদ্রিক বোম্বেটেদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাহাজে কামান রাখিত। মোগল সুবাদার সাহেবের ক্ষুদ্র দুর্গে কেবল সেই সমুদ্র-মগ্ন জাহাজ হইতে সংগৃহীত কয়েকটি কামান দুর্গপ্রাকারে সাজান ছিল। তিনি দুই একবার তোপধ্বনি করিয়া আত্মরক্ষা মহাধর্ম চিন্তা করিয়া দুর্গের দ্বার বন্ধ করিলেন। শিবাজির অধীনস্থ সেনারা নগর লুণ্ঠন আরম্ভ করিয়া ইংরাজ ফ্যাক্টরি আক্রমণের চেষ্টা করে। অক্সেনডেন মহা সাহসের সহিত মারহাট্টা সেনার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শিবাজিকে অক্সেনডেনের সহিত যুদ্ধে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। মারহাট্টারা বেগতিক দেখিয়া কেবল লুটপাট করিয়া সে যাত্রা সুরাট ত্যাগ করে। তাঁহার এই অসীম সাহসের জন্য মহাসন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব অক্সেনডেনকে একখানি তরবারি ও খেলাত এবং তাহাদের বিলাতি আমদানি বাণিজ্য দ্রব্যের উপর পারমিটের শুল্ক লাঘব করিয়া দেন। বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারেরাও অক্সেনডেনকে 'Preserver is not less than conqueror' অর্থাৎ 'রক্ষাকর্তা বিজেতার অপেক্ষা কম নহেন' এই গৌরবান্বিত বিশেষণ সমেত এক পত্র লেখেন ও সকৌশিল অক্সেনডেনকে পুরস্কৃত করেন।—Forrest's ***State Papers, Bombay Series Letter from the Surat Council.***

সুরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা স্থির করিলেন সমুদ্র-তীরবর্তী কোন বাণিজ্যোপযোগী স্থান কিনিয়া লইয়া বা জমা করিয়া আত্মরক্ষার জন্য একটি ছোটখাট কেল্লা নির্মাণ না করিলে আর কোনমতেই শ্রেয়ঃবোধ হইতেছে না। সেই সময়ে শিবাজির অমিত প্রতাপে সমস্ত দাক্ষিণাত্যের চারিদিকেই অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। গোলকন্দা প্রদেশেও যথেষ্ট গোলমাল। বাদসাহী সৈন্যেরা বা তাহাদের প্রতিপক্ষেরা ক্রমাগতই যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত। চারিদিকেই লুটপাট অশান্তি ও অরাজকতা।

এই সময়ে বাণিজ্যকার্য অবাধে চালাইবার জন্য ইংরাজ ফ্যাক্টরির প্রেসিডেণ্ট সাহেব প্রথমত স্থানীয় মোগল সুবাদারগণকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পশ্চিমোপকূলে বাণিজ্য বিস্তার সম্বন্ধে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া তাঁহারা ভারতের পূর্বোপকূলে একটু সুবিধামত স্থানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যের অবস্থানুসারে মানুষের বুদ্ধিও পরিচালিত হয়। সৌভাগ্য সূচনার সুবুদ্ধিই আসিয়া জুটে। ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট অনেক চেষ্টায় ভারতের পূর্ব উপকূলে একখণ্ড জমির সন্ধান পাইলেন। এই ভূমিখণ্ড চন্দ্রগিরির রাজার অধীন। ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে প্রচুর অর্থ দিয়া এই জমি ইংরাজ কোম্পানির অধ্যক্ষগণ জমা লইলেন। ছয় মাইল লম্বা এবং এক মাইল প্রশস্ত এই স্থানের জন্য ইংরাজেরা বাৎসরিক ছয়শত পাউণ্ড বা নয় হাজার টাকা রাজস্ব দিতে বাধ্য হন।

উপকূলতীরস্থ সমুদ্রমুখী জমির একাংশে দুর্গ নির্মিত হইল। চন্দ্রগিরির রাজার নাম শ্রীরঙ্গ। জমি ইজারা দেওয়ার সময় অন্যান্য স্বত্বের মধ্যে এই স্বত্ব রহিল যে এই নবনির্মিত বন্দরটির নাম তাঁহার নামানুসারে 'শ্রীরঙ্গরাজ পত্তনম্' নাম হইবে। রাজা একখণ্ড স্বর্ণপত্রে খোদিত করিয়া ইংরাজদিগকে জমির পাট্টা প্রদান করিলেন। ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজেরা তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীস্বরূপ এই সোনার দানপত্রখানি সযত্নে রাখিয়াছিলেন। উক্ত বৎসরে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধকালে দানপত্রখানি লুণ্ঠিত হয় কিম্বা হারাইয়া যায়। ইহার পর এইস্থান চিঙ্গলপুরের নায়ক রাজার অধীনে আসে। নায়ক রাজা ইংরাজদিগকে এই স্থানের 'চিনাপত্তন' নামকরণ করিতে আদেশ করেন। এই চিনাপত্তনই বর্তমান মান্দ্রাজ নগরী। এখনও পর্যন্ত মান্দ্রাজের দেশীয় অধিবাসীরা ইহাকে 'চিনাপত্তনই' বলিয়া থাকে।

১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দ ইংরাজদের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরেই ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রথম দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে মান্দ্রাজে এজেন্টের পরিবর্তে একজন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন।

১৬৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মান্দ্রাজের আর কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজের মান্দ্রাজ ফ্যাক্টরি একটি বিশেষ গণনীয় বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে। সুরাটের মত মান্দ্রাজের ফ্যাক্টরিও ঐশ্বর্যপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়। মান্দ্রাজের বাণিজ্য কার্যালয়ে এই সময়ে একজন গবর্ণর ও তাঁহার তিনজন সহকারী নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত রাইটার প্রভৃতি আরও অনেক কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত কর্মচারীরা সকলেই কোম্পানির খরচায় বাসস্থান ও আহার্যাদি পাইতেন।

মান্দ্রাজের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠির প্রথম গবর্ণর স্যর উইলিয়ম ল্যাংহরন।[১] ইনি ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দ হইতে সাত বৎসর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পরে স্ট্রেনশাম মাস্টারস্[২] নামক এক ব্যক্তি মান্দ্রাজের গবর্ণর পদে বৃত হন। তাহার পর ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমরা মিঃ উইলিয়াম গিফোর্ডকে গবর্ণররূপে দেখিতে পাই।

১. Sir William Langhorne, Governor of Madras (1672-1678).

২. Streynshan Master, Governor of Madras (1678-81) and author of *Diaries*, may very well be called *The Second Founder of Madras.—History and Culture of the Indian People*, Vol VII, p. 516.

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে প্রমাণ হইতেছে ইংরাজ কোম্পানির অভ্যুদয়ের দিন ক্রমাগত ধীরগতিতে উন্নতির শিখরে উঠিতেছিল। সুরাট ও মান্দ্রাজে পর্টুগীজ আধিপত্য ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল। পূর্বে দুই একটি সামান্য বাণিজ্যস্বত্ব লাভের জন্য মোগল দরবারে ইংরাজকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে করমণ্ডল উপকূলে এখন তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য তখন মান্দ্রাজে এবং বোম্বাই নগরীতে দুর্গনির্মাণ করিয়াছেন।১ মারহাট্টা ও মোগলদিগের আক্রমণ হইতে কোম্পানির সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাঁহারা প্রয়োজনমত সেনাদল রক্ষার বন্দোবস্তও করিয়াছেন। ধরিতে গেলে এই ফ্যাক্টরিগুলি ইংরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য। এই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে তাঁহারা একচ্ছত্র-সম্রাট আর ইংরাজ প্রেসিডেন্ট বা তাঁহাদের অধ্যক্ষ সেই ক্ষুদ্র রাজ্যমধ্যে একটি ছোটখাট নবাব।

ভারতের পশ্চিমোপকূলে সুরাট ও বোম্বাই, পূর্বোপকূলে মান্দ্রাজ, এই কয়টি বিশিষ্ট স্থান পাইয়া কোম্পানি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি করিতে লাগিলেন। এই ক্ষুদ্র নগরী বোম্বাই ও মান্দ্রাজ যে ইংরাজের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যের দুইটি প্রেসিডেন্সি রূপে পরিণত হইবে, তাহাই বা কে জানিত? সুরাটের ইংরাজ কুঠির প্রেসিডেন্ট দেশীয় লোকের চক্ষে একটি ছোটখাট নবাবের মত হইয়া উঠিলেন। তিনি কিরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, রেভারেণ্ড অ্যাণ্ডারসন২ নামক একজন সমসাময়িক পাদরী তাহার একটি কৌতুকময় ইতিবৃত্ত বলিয়া গিয়াছেন। এই পাদরী সাহেব বলেন, "সেকালের সুরাটের প্রেসিডেন্ট একটি ক্ষুদ্র রাজার মত জীবনযাপন করিতেন। তিনি যখন রাজপথে বাহির হইতেন তখন একজন পতাকাবাহক তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিত। তাঁহার অগ্রপশ্চাতে ইংরাজ শরীররক্ষী। চল্লিশজন দেশীয় পদাতিক তাঁহার পুরোভাগে থাকিত। যখন তিনি আহারে বসিতেন, চাকরেরা নানাবিধ খাবার লইয়া তাঁহার খানার টেবিলে সাজাইয়া দিত। প্রত্যেকবার এক একরকম খাদ্য আনিবার সময় বাহির হইতে বাদ্য বাজিয়া উঠিত। তাহাতে

১. মাদ্রাজ প্রসঙ্গে বোম্বাইর কথাটাও একটু বলিয়া রাখা ভাল। কি করিয়া বোম্বাই ইংরাজের দখলে আসিল তাহার একটু ইতিহাস আছে। তখন বোম্বাই সমুদ্রতীরস্থ একটি ক্ষুদ্র বন্দর মাত্র। কিন্তু ইহা প্রকৃতির সমুদ্র ও শৈলবেষ্টিত স্বাভাবিক দুর্গ। সমুদ্রপথই ইংরাজের সহজগম্য। আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইলে এই সমুদ্রই তাহাদের প্রধান সহায় হইবে। এইজন্য সুরাটের কুঠির অধ্যক্ষেরা বহুপূর্ব হইতেই বোম্বাইর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড অ্যাণ্ডারসন নামক একজন ইংরাজ পাদরীর সেই সময়ে লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি, "ইংরাজ ও দিনেমারগণ একযোগে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ লইয়া বোম্বাই আক্রমণের চেষ্টা করেন (১৬২৭)।"

একদিক হইতে বোম্বাই আক্রমণ ও অন্যদিক হইতে লোহিতসমুদ্রের পথরোধ করিয়া পর্টুগীজদিগের শক্তি-লোপ করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। কিন্তু দিনেমারদিগের যুদ্ধজাহাজের অধ্যক্ষ Van Speult-এর আকস্মিক মৃত্যুতে এই ব্যাপার অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহার ছাব্বিশ বৎসর পরে আমরা দেখিতে পাই ইংরাজেরা তখনও বোম্বাই দখলের চেষ্টা করিতেছেন। সেই সময় ইংলণ্ডে Commonwealth বা সাধারণতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের প্রভাব। স্বনামখ্যাত ক্রমওয়েল তখন ইংলণ্ডের হর্তাকর্তা বিধাতা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণ ক্রমওয়েলকে বোম্বাইয়ের ব্যাপারে অনুরোধ করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। ১৬৬১ খ্রী. অব্দে পর্টুগাল রাজকন্যা ইনফ্যাটা ক্যাথারিনার সহিত ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের শুভোদ্বাহ হয়। ক্যাথারিনার বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ পর্টুগালাধিপ ইংলণ্ডেশ্বরকে বোম্বাই অর্পণ করেন। এই দানস্বত্বে বলীয়ান হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের আদেশে আর্ল অব মার্লবরা ইংলণ্ড হইতে বোম্বাই দখল করিতে আসেন। (১৬৬১ সেপ্টেম্বর) আর্ল মার্লবরা বিলাত হইতে অত কষ্ট করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পর্টুগীজগণ কোন মতেই তাহাদের সাধের বোম্বাই ছাড়িতে চাহিল না। মার্লবরা তাহাদের শক্তিবলে পরাজিত করিতে না পারিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর পাঁচ বৎসরের চেষ্টায় ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যর জার্ভেস লুকাস নামক এক সাহসী সেনানীর চেষ্টায় পর্টুগীজেরা বোম্বাই পরিত্যাগ করে। ইংলণ্ডাধিপ যখন বুঝিলেন সুদূর ভারতে তাঁহার এই যৌতুকের সামান্য সম্পত্তিটুকু রক্ষার জন্য আয়ের অপেক্ষা চতুর্গুণ ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন এরূপ সম্পত্তি রাখার কোন লাভ নাই দেখিয়া তিনি এক রাজকীয় সনন্দ দ্বারা ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বোম্বাই অর্পণ করেন। কোম্পানির সহিত শর্ত রহিল, তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজসরকারে বার্ষিক দশপাউণ্ড করিয়া খাজনা দিবেন।

২. Rev. P. Anderson—*The English in Western India, Bombay, 1854* গ্রন্থের রচয়িতা।

তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ বুঝিতেন নূতন ধরনের খাদ্য আসিতেছে। একদল বেতন ভোগী বাদ্যকর এই খানার সময় বাজনা বাজাইত। যখন তিনি এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতেন, সেই সময়ে রূপার আশাসোটা লইয়া চাকরেরা তাঁহার আগপাছ যাইত। ফ্যাক্টরি হইতে রাজপথে বাহির হইবার সময় তিনি হয় পালকি না হয় অশ্বপৃঠে যাত্রা করিতেন। কিম্বা দুইটি শ্বেতবর্ণ বৃহৎকায় বলীবর্দচালিত এক্কা তাঁহার ভারবহন করিতে নিযুক্ত হইত। রূপার কাজকরা চর্মসজ্জায় সজ্জিত দুই চারিটা অশ্ব এই দলের শোভাবৃদ্ধির জন্য বাহির হইত। তাঁহার মাথার উপর এক রেশমের ছত্র ধরা হইত।"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারদের কর্ণে এই নবাবীর কথা পৌঁছিলে তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা ব্যবসা করিতে ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের অধীনস্থ ভৃত্যেরা প্রভুর কষ্টার্জিত অর্থের অপব্যয় করিয়া যে এতটা নবাবী করিবে তাহা তাঁহাদের সহ্য হইল না। বিলাতের ডাইরেক্টারেরা সুরাটের প্রেসিডেণ্টকে যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মর্ম এই, "আমাদের এই কষ্টার্জিত অর্থ তোমরা যে বাবুয়ানী ও নবাবীতে অপব্যয় করিবে তাহা আমাদের সহ্য হইবে না। যাহাতে ভবিষ্যতে এ সব আর না শুনিতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে। সামান্য ব্যবসায়ী কোম্পানির কর্মচারী হইয়া নবাবের মত এইরূপ জাঁকজমক যাহাতে আর না করিতে পার তজ্জন্য আমরা তোমার বেতন বাৎসরিক তিনশত পাউণ্ড করিয়া দিলাম। এখন হইতে তোমাদের প্রেসিডেণ্ট নামও ঘুচিয়া গেল। তোমরা ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্রে ইংরাজ কোম্পানির 'এজেন্ট' বলিয়া আখ্যা লাভ করিলে।" বলা বাহুল্য, বিলাতের ডাইরেক্টারদের এই কঠোর আদেশে প্রেসিডেণ্ট সাহেব বিশেষ সায়েস্তা হইয়াছিলেন।

কি করিয়া এই ব্যবসায়ী ইংরাজ কোম্পানি বোম্বাই ও সুরাট প্রদেশে শক্তিসঞ্চয় করেন, তাহা বুঝিতে হইলে বোম্বাই ও সুরাটের কথা আরও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ কোম্পানি সামান্য ব্যবসায়ী হইতে কিরূপ শক্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিরূপে ধীরে ধীরে ভগবানের বিধানে তাঁহাদের নৌশক্তি ও সেনাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিরূপে সেই সেনাশক্তির সহায়তায় তাঁহাদের শত্রুদের অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা বুঝাইতে হইলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজের অভ্যুদয়ের কথা একটু বিস্তারিত ভাবে বলিতেই হইবে।

অক্সেনডেনের পর জেরাল্ড অঙ্গিয়ার বোম্বাই কুঠির অধ্যক্ষ হন। ধরিতে গেলে অঙ্গিয়ার হইতেই বোম্বাইয়ের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হয়। অঙ্গিয়ার বোম্বাই কুঠির অধ্যক্ষতা লাভ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন ইংরাজের অবস্থা তথায় আদৌ নিরাপদ নহে। মালাবার উপকূলে জলদস্যুরা প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সমুদ্রে দিনেমারগণ বলসঞ্চয় করিতেছে বোম্বাইয়ের আশপাশে, জলদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে বোম্বাইকে রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গিয়ার সমুদ্রকূলে প্রকাণ্ড দুর্গপ্রাচীর নির্মাণ করেন। ইহার পরে 'মার্টেলো টাওয়ার' বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। দুর্গনির্মাণ কার্যে তাঁহাকে অনেক বাধা-বিঘ্ন পাইতে হইয়াছিল। বিলাতের ডাইরেক্টারগণ, প্রথমে ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অঙ্গিয়ার নিজের উদ্ভাবনী শক্তিবলে বোম্বাই নগরীতে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানির খাসদখলে যে সমস্ত হিন্দু-মুসলমান প্রজা বাস করিত, তাহাদের মধ্যে বাছা লোক লইয়া তিনি এক ক্ষুদ্র সেনাদল (militia) গঠন করেন। ব্রাহ্মণ ও বেনিয়ারা বাৎসরিক কিছু 'তনখা' বা বৃত্তি-দানে বন্দুক ঘাড়ে করার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইল। বোম্বাইয়ের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসিবর্গকে এইভাবে সৈনিকরূপে গ্রহণ করিয়া অঙ্গিয়ার ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ছয়শত প্রজাসৈন্য, চারিশত ইউরোপীয় সেনা ও চল্লিশজন সেনানায়ক সমেত একটি ক্ষুদ্র সেনাদল সৃষ্টি করেন। রাজপুতগণকে লইয়া আর একটি সেনাদল গঠনের বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে কিন্তু উপযুক্ত সুযোগাভাবে তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজি আবার সুরাট আক্রমণ করেন। এই ব্যাপারে অঙ্গিয়ারের নব-

যে সম্পূর্ণ নবোদ্ভাবিত, তাহাও নয়। ইংলণ্ডেও পুরাকালে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। অপরাধী-কে জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইত, কিন্তু সে কোম্পানির নিকট হইতে দৈনিক খোরাকি পাইত না রাজপথগামী পথিকদের নিকট ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার দিন চলিয়া যাইত। ইহার ফলে, ভিক্ষাজনিত লজ্জা ও মানসম্ভ্রমের জন্য অনেক অপরাধী আপনিই গোষরাইয়া যাইত।[১]

অঙ্গিয়ারের প্রধান কীর্তি, সমুদ্র উপকূলস্থ মালাবারী জলদস্যুদের উপদ্রব নিবারণ। এই জলদস্যুগণ বোম্বাই হইতে আরম্ভ করিয়া কেপ-কমোরিন পর্যন্ত স্থান সমূহে মহা বিভীষিকা উৎপাদন করিয়াছিল। সমুদ্রপথগামী বাণিজ্যজাহাজ ও নৌকা লুঠ করাই ইহাদের প্রধান ব্যবসা ছিল। তাহার উপর, ইহারা সময় ও অবসর বুঝিয়া সমুদ্র পার্শ্ববর্তী প্রধান প্রধান নগর ও গ্রাম-সমূহে প্রবেশ করিয়া নিরীহ প্রজার যথাসর্বস্ব লুঠ করিত, গ্রাম নগর জ্বালাইয়া দিত, সুন্দরী স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে বলপূর্বক তাহাদের জাহাজে লইয়া গিয়া দূরবর্তী উপকূলে দাসদাসী রূপে বিক্রয় করিত। নরহত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, পাশব অত্যাচারের ভীষণ দৃশ্যে এই সময়ে ভারতের পশ্চিমোপকূলে মহা হাহাকার উঠিল। ইংরাজের বোম্বাই ও সুরাট লইয়াই সম্পর্ক। মোগলসাম্রাজ্যের প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল, কিন্তু মোগল বাদসাহ ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ব্যস্ত এবং স্থানীয় মোগল শাসনকর্তারাও শক্তিহীন, কাজেই তাঁহাদের কেহই প্রজাদের রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন না। কিন্তু এই মহাপ্রাণ ইংরাজ অঙ্গিয়ারের চেষ্টায় জল-দস্যুদের উপদ্রব কমিয়া গেল। ইংরাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রণতরীগুলি কামান লইয়া ক্রমাগত ভারতের পশ্চিমোপকূলে পাহারা দিতে লাগিল। ইহাতে জলদস্যুদের উপদ্রব অনেকটা প্রশান্ত হয়। ইহার পর ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ এই দস্যুকুলকে সমূলে নির্মূল করেন।

এখন ইংরাজের শত্রু রহিল কেবল মারহাট্টাগণ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি অঙ্গিয়ার মনে মনে স্থির করিলেন যে উপায়েই হউক মহারাষ্ট্রীয়গণকে হাত করিতেই হইবে। তাহা না করিলে ভারতের পশ্চিমোপকূলে ইংরাজের বাণিজ্য আদৌ নিরাপদ নহে। আবার অন্যপক্ষে মহাবীর শিবাজিও ভাবিলেন, এই রণকৌশলসম্পন্ন সাহসী ইংরাজগণের সহিত শত্রুতা রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে। ঔরঙ্গজেব বিপুল বাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্যে আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রভূমে প্রবেশের অন্য পথগুলি শিবাজি নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। শিবাজি ভাবিলেন, মোগলসম্রাট ইংরাজদিগকে হস্তগত করিয়া অনায়াসে বোম্বাইয়ের মধ্য দিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে পারেন।

ইংরাজদের বীরত্বের পরিচয়ও তিনি দুইবার পাইয়াছেন। অক্সেনডেন ও অঙ্গিয়ার ১৬৬২ ও ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে মারহাট্টা আক্রমণকে কিরূপে ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তাহাও যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে। শিবাজিরও তিনখানি যুদ্ধজাহাজ ও পঁচাশিখানি সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। কিন্তু ইংরাজ যুদ্ধজাহাজের তুলনায়, তাঁহার নৌশক্তি অতি হীন। তিনি পশ্চিমোপকূলের বন্দরগুলি দখলে রাখিয়া মোগল বাদসাহকে জব্দ করিতে ইচ্ছুক। এসব করিতে হইলে ইংরাজ-দিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতেই হইবে।

কিন্তু মানের কান্নার দায়ে শিবাজি এক মহা সমস্যায় পড়িলেন। উপযাচক হইয়া তিনি ইংরাজদিগকে সন্ধির জন্য অনুরোধ করিতে পারেন না। যিনি অক্ষৌহিণী বাহিনীর নায়ক, মহাশক্তিমান মোগল-সম্রাট যাঁহার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত ও অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি কোন্ মুখে ইংরাজকে বলিবেন, 'ওগো! তোমরা আমার সহিত সন্ধি কর—আমি তোমাদিগকে চাই।' এদিকে অঙ্গিয়ারও শিবাজির ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণরূপে সশঙ্কিত চিত্তে সর্বদাই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিতেন।

১. *India Office Manuscripts* (Sir W. Hunter) Bruce's *Annals* Vol II, p. 368.

শিবাজি আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য ইংরাজের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হুবলী আক্রমণ করিলেন। হুবলী ধারওয়ার বিভাগের কার্পাস বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। এই কার্পাস তখন ইংরাজের প্রধান বাণিজ্য। শিবাজি সহসা ভীমবেগে আক্রমণ করিয়া ধারওয়ার পর্যন্ত লুণ্ঠন করিলেন। অতর্কিত-রূপে হুবলী লুণ্ঠিত হওয়ায় অঙ্গিয়ার কোনরূপ বাধা প্রদান করিতে না পারিয়া শিবাজিকে অর্থপ্রদানে এই বিগ্রহ ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিলেন।

মহাশক্তিমান শিবাজির নৌবিভাগে তিনখানি বড় জাহাজ ও ৮৫ খানি সুবৃহৎ দাঁড়ওয়ালা নৌকা ছিল। তুলনার সমালোচনায় শিবাজি বুঝিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তুলনায় তাঁহার নৌশক্তি তত প্রবল নহে। বোম্বাই বন্দর তাঁহার চক্ষে যেন কন্টকবৎ প্রতীয়মান হইল। এই বোম্বাই ইংরাজের দখলে। তাঁহার প্রধান শত্রু মোগল বাদসাহ ইংরাজদিগকে হস্তগত করিতে পারিলে অনায়াসে বোম্বাই বন্দর সাহায্যে মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ স্থলে ইংরাজপক্ষের সহায়তা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। দুইটি প্রবল শত্রুর সৃষ্টি না করিয়া একটি রাখাই কর্তব্য।

হুবলী লুণ্ঠনের পর ইংরাজদের সহিত শিবাজির একটা মৌখিক সন্ধি হইল। ইহার পর ১৭৬৪ খৃীস্টাব্দে শিবাজি মহাসমারোহে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন।[১]

এই অভিষেক সময়ে প্রকাশ্যভাবে মোগলসম্রাটের ক্ষমতা অস্বীকার করিয়া শিবাজি আপনাকে মহারাষ্ট্রভূমের স্বাধীন ভূপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। এই অভিষেক উপলক্ষে একটি বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। বোম্বাইয়ের ডেপুটি গবর্ণরও এই উৎসব উপলক্ষে শিবাজি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। অভিষেকোৎসব শেষ হইয়া গেলে শিবাজি ইংরাজদের সহিত এই শর্তে সন্ধি করেন যে তাঁহারা ভারতের পশ্চিমোপকূলের সকল স্থানেই ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র তাঁহাদিগের শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে আমদানিশুল্ক দিতে হইবে। ইংরাজেরা মহারাষ্ট্র রাজ্য মধ্যে প্রচলিত, বাজার দরে সমস্ত জিনিসপত্র কিনিতে পাইবেন। তাঁহাদিগকে কোনরূপ কাস্টম বা শুল্ক দিতে হইবে না।[২]

নিম্নে আমরা শিবাজির অভিষেক উৎসব ও ইংরাজের সহিত সন্ধিব্যাপারের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি। ইংরাজদূত ফ্রায়ার সাহেব যখন মহারাষ্ট্রপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সে সময়ে তাঁহার যশঃসূর্যের তীব্র কিরণরাশি উজ্জ্বলভাবে কঙ্কণের পার্বত্য প্রদেশ ও রায়গড়ের মেঘমণ্ডিত গিরিশিখরে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইতেছিল। ঔরঙ্গজেবকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাভূত করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া শিবাজি সেই সময়ে রাজোপাধি ধারণ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

রাজ্যের চারিদিকে আনন্দকোলাহল। দৃঢ়কায় মহারাষ্ট্রীয়গণ নানাবিধ অভিষেকোপযোগী দ্রব্যাদি লইয়া রায়গড়ে উঠিতেছে। যোদ্ধারা নূতনসাজে ভূষিত হইয়া দুর্গাধিপের জয়ঘোষণার নিমিত্ত পর্বতের চারিদিকে শিবির স্থাপন করিয়াছে। শিবাজির অধীনস্থ পেশোয়া, ভোঁসলা ও অন্যান্য সামন্তবর্গের পরিবারেরা উৎসব দেখিবার জন্য রায়গড়ের উপত্যকা ধীরে ধীরে অতিক্রম করিতেছেন। দুর্গপ্রাকার হইতে শিবাজির বিজয়নিশানের পৎপৎ শব্দ মহারাষ্ট্র সৈনিকের 'হর হর মহাদেও' শব্দের সহিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এহেন মঙ্গলময় উৎসব সময়ে ইংরাজদূত ডাক্তার ফ্রায়ার রায়গড়ের নিম্নস্থ 'পঞ্চারা' নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইলেন।[৩]

তিনি পঞ্চারা হইতেই শুনিলেন যে নূতন মহারাজ শিবাজি কোন অদূরবর্তী তীর্থপর্যটনে গিয়াছেন; এবং দুই এক দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া রাজোপাধি গ্রহণ করিবেন। নারায়ণ

১. *India under the Restoration* p. 223.

২. Treaty Signed on 4th April 1674. Summarised by Sir W. Hunter from Fryer, Grant Duff and Rev. Anderson.

৩. পঞ্চারা—পঞ্চারা

পণ্ডিত নামক শিবাজির অন্যতম বিশ্বস্ত অমাত্যের সহিত তাঁহার পূর্ব্বে হইতেই পরিচয় ছিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে নারায়ণজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও এক বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাঁহার সহায়তালাভের পথ আরও সুগম করিয়া লইলেন।

অত্যন্ত গ্রীষ্মাধিক্য হেতু পঞ্চারাতে অবস্থান করা ইংরাজদূতের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি পাহাড়ের উপর উঠিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শিবাজি প্রতাপগড় হইতে বায়রীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াও নারায়ণজীর সহায়তায় পাহাড়ে উঠিবার অনুমতি লাভ করিয়া ইংরাজদূত রাজদর্শনে চলিলেন।

'বায়রী' বা 'রায়গড়' পার্ব্বত্য দুর্গ। নিম্নে পাষাণবক্ষ দৃঢ়কায় পাহাড়। এ পর্ব্বতপ্রাচীর দুর্ভেদ্য, অজেয়। উপরে নীচে, আশে পাশে, উত্তরে দক্ষিণে, পূর্ব্বে পশ্চিমে, নানাবিধ দীর্ঘ-বিস্তৃত, স্বল্পায়ত, শ্যামল তরুরাজিপূর্ণ বনপ্রদেশ। প্রকৃতির সহায়তায় এই পার্ব্বত্য দুর্গ চারি-দিক হইতেই অজেয়। অন্তঃশত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন ইহার পরহস্তগত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

কয়েকটি পার্ব্বত্যপথ বহুকষ্টে অতিবাহিত করিলেই রায়গড়ের ক্ষুদ্র সহর। অন্যান্য বাণিজ্য-দ্রব্যাদি অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রেই রায়গড়ের বিশেষ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ। রমণীর কলকণ্ঠ সেখানে সর্ব্বদা শোনা যাইত না। কেবল অশ্বের হ্রেষারব, সৈনিকের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা ও কঠোর বাহ্বাস্ফোট, গম্ভীর কণ্ঠস্বর 'হর হর মহাদেও' শব্দে সেইস্থান প্রতিধ্বনিত ও শব্দাকুলিত। মেঘের কোলে অবস্থিত রায়গড়ে তখন তিন শতের অধিক আবাসবাটি ছিল না।

ডাক্তার ফ্রায়ার পাহাড়ে উঠিয়া চারি দিন রায়গড়ে বিশ্রাম করিলেন। তাঁহার পরম সুহৃদ্ নারায়ণজী পণ্ডিত তাঁহাকে দরবারে অভিষেক দেখিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন প্রভাতের প্রথম বিকাশকালে তিনি বহুমূল্য উপহার দ্রব্যের সহিত দলবল লইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিলেন।

রায়গড়ের পার্ব্বত্য বারদোয়ারী জনতা পরিপূর্ণ। শিবাজি রত্নময় সিংহাসনে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যুন্নত আসনে বসিয়া তাঁহার বংশধর শম্ভুজী ও মন্ত্রিবর পেশওয়া মোরো পণ্ডিত। সেনাধ্যক্ষ ও সেনানায়কেরা অস্ত্রশস্ত্রের উজ্জ্বলতার মধ্যে নির্ব্বাকভাবে সসম্ভ্রমে দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। সভার উপরে, আশে পাশে, হর্ম্যভিত্তিতে, স্তম্ভগাত্রে নানাবিধ সুবাসিত ফুলমালা, বহুবিধ কঠোর ক্ষুরধার শাণিত কৃপাণের মধ্যে শোভিত হইয়া বিভীষিকাময় কঠোর-কোমল দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। সহসা রণভেরী বাজিয়া উঠিয়া সভারম্ভ ঘোষণা করিয়া দিল।

সর্ব্বপ্রথমে বেদগান ও ঈশ্বরের স্তুতিপাঠ করিয়া ব্রাহ্মণেরা শস্য ও দূর্ব্বার দ্বারা নবীন মহারাজের জয়োচ্চারণকরতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন। স্তুতিপাঠকেরা গুরুগম্ভীরকণ্ঠে তাঁহার বীরত্ব কাহিনী গান করিল। প্রথম মাঙ্গলিক ব্যাপার শেষ হইলে নারায়ণজী ইংরাজদূতকে মহা-রাষ্ট্রপতির সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

প্রথামত 'সেলাম' করিয়া ডাক্তার ফ্রায়ার নবীন মহারাজের সম্মুখে বহুবিধ বহুমূল্য উপহারদ্রব্যাদি স্থাপিত করিলেন। শিবাজি সহাস্য আস্যে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ইংরাজদূতকে সিংহাসনের নিকটস্থ হইতে বলিলেন। দুই-চারিটি বিষয়ে দ্বিভাষীর সাহায্যে সামান্যরূপ কথোপকথনের পর দূতবর সে দিনের মত বিদায়প্রাপ্ত হইলেন।

শিবাজি অভিষেকের পূর্ব্বদিনেই সন্ধির শর্ত্তাদির এক খসড়া করিতে স্বীয় পেশওয়া মোরোজী পণ্ডিতকে অনুমতি দিয়াছিলেন। অভিষেকের পরদিন তাঁহার 'তুলা' হইবার দিন।

অষ্টবিধ শস্য, ঘৃত, কোষেয় বস্ত্র, চন্দনকাষ্ঠ, গন্ধদ্রব্য ও স্বর্ণমুদ্রায় মহারাষ্ট্রের প্রভাত-সূর্য্যস্বরূপ বীরকেশরী শিবাজি দ্বাদশবার তৌলিত হইলেন এবং তুলাসংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যাদি কঙ্কণ, মহারাষ্ট্র ও পুনার ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিতরিত হইল। ডাক্তার সাহেব বলেন এই শুভদিনে বিতরিত স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ দুই লক্ষ ষাট হাজার।

ইহার কয়েকদিন পরে নারায়ণ পণ্ডিতের সহায়তায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া শিবাজির শীলমোহর সংযুক্ত হইল। তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্ত ছিল—

১। ইংরাজ বণিকগণ মহারাষ্ট্রপতির রাজ্যসীমার অভ্যন্তরে সকল স্থানে অবাধ বাণিজ্য করিতে স্বত্ত্ববান হইলেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ভূভাগ মহারাজের নূতন অধিকারভুক্ত হইবে, তাহাতেও বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার বিবেচনাধীন হইয়া রহিল।

২। ইংরাজের স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা কঙ্কণে এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের মুদ্রা, পুনা ও বোম্বাইয়ে চলিবে। এ সম্বন্ধে প্রকাশ থাকে যে, ইংরাজের মুদ্রাগুলি অবশ্য বাদসাহী মুদ্রার ন্যায় নিখাদ ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই।

৩। ইংরাজের বাণিজ্যপোত যাহাতে তাঁহার অধিকৃত বন্দরসমূহে নিরাপদে থাকে তাহার আদেশপত্র প্রচারিত হইবে। অন্যান্য বিদেশীয় জাতির সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম আছে, সেই নিয়মানুসারে ঝটিকাতাড়িত বা সমুদ্রমগ্ন ভগ্ন জাহাজ মালামাল সহিত কঙ্কণের চির প্রচলিত প্রথানুসারে সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

এতদ্ব্যতীত, ইহাতে আরও কয়েকটি সামান্য শর্ত রহিল। তৎপরে শিবাজি তাহাতে নিজের মোহর সংযুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাঁহার পেশওয়া ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন।[১]

শিবাজি ইংরাজদের সহিত এইরূপ শর্তে সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে হস্তগত করিলেন। শিবাজির মনে এরূপ একটা ধারণা ছিল যে তিনি একদিন ঔরঙ্গজেবের শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিবেন। মোগল তাঁহার প্রবল শত্রু। এরূপ সময়ে বৃথা শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে ভাবিয়া শিবাজি ঔরঙ্গজেবের উপর এইরূপ একটি নূতন চাল চালিলেন।

অঙ্গিয়ারের সময়ে ভারতের পশ্চিমোপকূলে বোম্বাই একটি প্রধান বন্দর হইয়া উঠে। পর্টুগীজদিগের আমলে বোম্বাইয়ের অধিবাসী সংখ্যা দশহাজার ছিল। অঙ্গিয়ারের আমলে বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা ৬০ হাজারে দাঁড়ায়। পূর্বে বোম্বাই বন্দরের রাজস্ব ছিল ২৮২৩ পাউণ্ড। অঙ্গিয়ারের সময়ে তাহা ৯২৫৪ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। বোম্বাইয়ের এই অসম্ভব উন্নতি মোগলসম্রাট ও মহারাষ্ট্রপতি শিবাজি উভয়েরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল।

শিবাজির সহিত ইংরাজের এ আত্মীয়তা দাক্ষিণাত্য উপকূলের মোগল শাসনকর্তাদের বড় ভাল লাগিল না। শিবাজি যে ইংরাজদিগকে অবাধে বাণিজ্যস্বত্বাদি দানে হস্তগত করিয়াছেন, তাহার প্রতিকারের কোন উপায়ই নাই। মোগল শাসনকর্তারা নানা দিক হইতেই ব্যতিব্যস্ত। পশ্চিমোপকূলে ইংরাজের ও শিবাজির নৌবাহিনী একত্র সম্মিলিত। মালাবার উপকূলে সিদ্দি-জাতীয় আরব জলদস্যুদের প্রভাব দিনে দিনে পরিবর্ধিত। এই সিদ্দিগণ এতদূর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে প্রয়োজন হইলে তাহারা দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মুসলমান প্রদেশাধিপতিদের সেনা প্রদানে সাহায্য করিত। এমন কি মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবও কোন কোন সময়ে এই ভীষণ জলদস্যুদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে এই সিদ্দি দস্যুগণ বোম্বাই উপকূলে নামিয়া মহারাষ্ট্র রাজ্য লুণ্ঠনের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। কিন্তু অঙ্গিয়ার ঘৃণার সহিত তাহাদের প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। ইহাতে সিদ্দিরা ক্রুদ্ধ হইয়া নানা উপায়ে অঙ্গিয়ারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। কিন্তু তিনি অসীম সাহসের সহিত তাহাদের প্রত্যেক কার্যেই প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন। শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব কেহই ইংরাজ বণিকদের এই কার্যপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। অঙ্গিয়ারের চেষ্টায় বোম্বাই সেই সময়ে দেশীয় অধিবাসীদের চক্ষে বিপন্নের আশ্রয় স্থান বলিয়া বোধ হইল। হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী, বিশেষত হিন্দু বেনিয়া ও আর্মানী ব্যবসায়ীরা

১. মৎপ্রণীত প্রবন্ধ 'শিবাজির দরবারে ইংরাজদূত'।—সাহিত্য, ১৩০০।

বোম্বাইয়ের নিরাপদ অবস্থা অনুভব করিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিল। অঙ্গিয়ারের চেষ্টাতেই ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই তৎকালে ভারতের পশ্চিমোপকূলে এক সুরক্ষিত বন্দররূপে পরিণত হয়। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন তারিখে সুরাটে অঙ্গিয়ার দেহত্যাগ করেন। জোব চার্নকের নাম যদি কলিকাতা প্রতিষ্ঠার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত থাকিতে পারে, তাহা হইলে বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির সহিত অঙ্গিয়ারের নাম কখনই বিচ্ছিন্ন হইবে না। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা দেখানই আমাদের বর্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। এ সম্বন্ধে সবিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে গেলে একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। মোটের উপর কথা হইতেছে এই যে, এই মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে প্রথমে ইংরাজের সামান্য বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। তৎপরে ইংরাজেরা তথায় দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অঙ্গিয়ার, স্যর জন চাইলড প্রভৃতি কোম্পানির সাহসী ইংরাজ কর্মচারিগণের চেষ্টায় বোম্বাইয়ে ইংরাজ কোম্পানির নৌসেনাবল প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবাজির ও ঔরঙ্গজেবের মহাসমরের ফলে যখন দাক্ষিণাত্যে মহাবিপ্লবের ও অরাজকতার সূচনা হয়, সেই সময়ে ইংরাজ কোম্পানির মনীষী কর্মচারিগণ তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর পরামর্শে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইংরাজের বঙ্গে আগমন

বঙ্গে পর্টুগীজ প্রভাব—ইংরাজদের সহিত পর্টুগীজগণের বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রতি-যোগিতা—তিন শত বৎসর পূর্বে সপ্তগ্রামের অবস্থা—সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিস্তার—সিজার ফ্রেডরিক প্রভৃতির লিখিত সপ্তগ্রামের বিবরণ—পর্টুগীজ বণিকদের ভারতে আগমন—ভাস্কো-ডি-গামার ভারতে আগমন—ভারতে পর্টুগীজদের বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত—আলবুকার্ক—আকবরের রাজসভায় পর্টুগীজদের প্রতিপত্তি—পর্টুগীজদের প্রথম বঙ্গে আগমন—হুগলীর সান্নিধ্যে ব্যাণ্ডেলে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন—হুগলীতে পর্টুগীজ বাণিজ্য—হুগলীর অভ্যুদয় ও সপ্তগ্রামের অধঃপতন—হুগলীতে পর্টুগীজগণ কর্তৃক দুর্গ নির্মাণ—চট্টগ্রাম উপকূলে পর্টুগীজ প্রভাব—পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে পর্টুগীজ বোম্বেটে-দিগের প্রভাব—আকবর কর্তৃক পর্টুগীজ প্রভাব দমন চেষ্টা—ইসলাম খাঁর সাফল্য—জাহাঙ্গীরের আমলে কাশেম খাঁ কর্তৃক পর্টুগীজ দমন—ইব্রাহিম খাঁর আমলে বঙ্গে পর্টুগীজদের অবস্থা—সাহজাদা খুরমের (পরে সাহজাহান) পিতৃদ্রোহিতা—বিদ্রোহীরূপে তাঁহার বঙ্গদেশে পলায়ন—বর্ধমানে অবস্থান—পর্টুগীজ গবর্ণর রডারিকের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা—সম্রাট সৈন্যের হস্তে সাহজাহানের পরাজয়—জাহাঙ্গীরের মৃত্যু—সাহজাহানের সিংহাসনাধিরোহণ পর্টুগীজদের উচ্ছেদ সাধন জন্য কাশেম খাঁর বাঙ্গালায় আগমন—আল্লাইয়ার খাঁ ও খাজা সের প্রভৃতি মোগল সেনাপতিগণ কর্তৃক হুগলী অবরোধ—সার্ধ তিন মাস ব্যাপী যুদ্ধের পর পর্টুগীজদের অধঃপতন—সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে বন্দর স্থাপন—পর্টুগীজগণের অধঃপতনের সহিত ইংরাজের অভ্যুদয়।

এই ভারতে বাণিজ্য ব্যাপারে ইংরাজের প্রধান ও প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পর্টুগীজ। পরে ফরাসীরা কার্যক্ষেত্রে দেখা দিয়াছিল বটে—কিন্তু সর্বপ্রথমে মহাশক্তিমান পর্টুগীজগণ ইংরাজের বাণিজ্য ব্যবসা ও প্রতিপত্তি ধ্বংসের জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিল। বোম্বাই উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত সকল স্থানেই তাহারা ইংরাজদিগের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজের প্রতি প্রসন্ন, এইজন্য পর্টুগীজগণেই ধ্বংস হইল। পর্টুগীজ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই, ইংরাজের উন্নতির সূচনা। তাহা না হইলে আজ আমরা ইংরাজ রাজত্বের সুখসমৃদ্ধি ভোগে অধিকারী হইতে পারিতাম না।

এই পর্টুগীজ জাতি বঙ্গদেশে কিরূপভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া কিরূপে একটি ক্ষুদ্রশক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, বঙ্গের সমুদ্রোপকূলে জলদস্যুরূপে লুণ্ঠনাদি করিয়া কিরূপে বঙ্গদেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল—এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তবে পাঠক এইটুকু মনে রাখিবেন, প্রথমে পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশের বন্দরে বাণিজ্য করিবার জন্যই আসে। তৎপরে যখন তাহারা দেখিল বাণিজ্যের অপেক্ষা লুণ্ঠনে বেশী অর্থাগম হয়, তখন তাহারা চট্টগ্রাম উপকূলে জাঁকিয়া বসিল। চট্টগ্রাম প্রদেশের আশেপাশে, প্রচণ্ড নৌ-সেনাবল লইয়া ক্ষুদ্ররাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। যে মালাবার উপকূলের গোয়া প্রদেশে তাহারা প্রথম বাণিজ্য করিতে আসে, তাহার কথা ভুলিল। এই সময়ে বঙ্গে পর্টুগীজগণের প্রভাব প্রতিপত্তি এত বেশী যে কার্ভালো, রডা, গঞ্জালিস প্রভৃতি পর্টুগীজ জলদস্যুনায়কগণ প্রতাপাদিত্য, রাজা কেদার রায় প্রভৃতির অধীনে সেনাপতিত্ব পদ গ্রহণ করিয়া মোগলদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিত। আকবরের আমলে পর্টুগীজদের অত্যাচার এত ভীষণভাব ধারণ করিয়াছিল যে তাহাদের নাম

শুনিলে লোকে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত।

ষোড়শ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। চট্টগ্রাম প্রদেশের উপকূলে বাণিজ্য জাহাজাদির যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ছিল বলিয়া পর্টুগীজেরা চট্টগ্রামকে 'পোর্টগ্রাণ্ডী' বা বৃহৎ স্বর্গ এবং সপ্তগ্রামের বন্দরকে 'পোর্টপিকোনো' বা ক্ষুদ্র স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করিত। সপ্তগ্রাম-পার্শ্ববাহিনী যে সরস্বতী কালধর্মে এখন ক্ষীণকায়া ও বিরল সলিলা হইয়া পড়িয়াছেন, তিনশত বৎসর পূর্বে তাহার এ অবস্থা ছিল না। সেই সময়ে সুবৃহৎ বাণিজ্য-পোতসমূহ অগণিত বাণিজ্য দ্রব্যসম্ভার লইয়া মৃদু বায়ুভরে হেলিতে দুলিতে, সপ্তগ্রামে উপনীত হইত। সপ্তগ্রামের হাট বাজার চত্বর গঞ্জ, কমলার ক্রীড়াকাননভূমিরূপে বিরাজিত ছিল। আকবর-সাহের সময়ে এই সপ্তগ্রাম একটি প্রধান সরকাররূপে পরিগণিত হইত। বস্তুত, সে সময়ে এরূপ বাণিজ্যদ্রব্যপূর্ণ বন্দর, জনপূর্ণ সহর বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না। মোগলরাজশক্তির বিরুদ্ধে যাহারা চক্রান্ত করিত, তাহারা এই জনপূর্ণ 'সাতগাঁয়ে' বিদ্রোহের মন্ত্রণাগার স্থাপন করিত। এই জন্যই আকবরসাহ এই স্থানকে 'বুলঘক্‌খানা' বা বিদ্রোহীদিগের আবাসস্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁর সে সময়ের ঐশ্বর্য অবর্ণণীয়। সিজার ফ্রেডরিক ১৫৭০ খৃীস্টাব্দে সপ্তগ্রাম দর্শন করিয়া যান। সে সময়ে বাণিজ্য ব্যাপারে সপ্তগ্রামের অবস্থা অতি সমুন্নত! কবি-কঙ্কণের চণ্ডীতে বর্ণিত সপ্তগ্রামের বিবরণের সহিত ফ্রেডরিকের লিখিত এই বিবরণ[১] একই ভাবে সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্যজ্ঞাপক। এতদ্ভিন্ন ডি, লেইএট, এডমিরাল ওয়ারউইক প্রভৃতি প্রাচীন লেখক-গণ সকলেই সপ্তগ্রামের বাণিজ্য ঐশ্বর্যের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তগ্রামের গঞ্জে রেশম, কার্পাস, গালা, চিনি, কার্পাসবস্ত্র ও চাউল প্রভৃতির আড়ত ছিল। এই সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য ইউ-রোপের নানাবন্দর, নানাদেশে বিক্রয় করিবার জন্য সর্বজাতীয় ইউরোপীয় বণিকেরা এই সাতগাঁর বন্দরে উপস্থিত হইয়া বিশালাকায়া সরস্বতী বক্ষ নানাবর্ণের পোতশ্রেণীতে সুশোভিত করিত।

ইতিহাসের কাহিনীতে প্রকাশ, যে ভাস্কো ডি গামা নামক এক পর্টুগীজ নাবিক কেপ অব গুড্‌হোপ বা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া সর্বপ্রথমে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৪৯৮ খৃীস্টাব্দের ২৬ আগস্ট[২] তারিখে তিনি কালিকটে উপস্থিত হন। ১৪৯৯ খৃীস্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় হইতে পর্টুগীজ ব্যবসায়িগণ ভারতক্ষেত্রে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ভারতোপকূলে গোয়া, সিংহল, মলাক্কাদ্বীপ, ও অরমজ্ বন্দরে পর্টুগীজ-গণ স্থানাধিকার করিয়া বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। আলবুকার্ক নামক একজন সাহসী সেনানীর বাহুবলেই এই সমস্ত ক্ষুদ্র অধিকার স্থাপিত হয়। ইংরাজগণ লর্ড ক্লাইভকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আলবুকার্কের এই বীরত্বের জন্য পর্টুগীজেরা তাঁহাকে সেই ভাবেই দেখিত। ১৫১৫ খৃীস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর আলবুকার্ক[৩] গোয়াতে প্রাণত্যাগ করেন। আলবুকার্কের পর আরও কয়েকজন পর্টুগীজ বাণিজ্যাধ্যক্ষ ভারতে পর্টুগীজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপ্রণে চেষ্টা করেন।

মহাগৌরবান্বিত সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধে সমদর্শী সম্রাট আকবর যখন 'দীন-ইলাহি' নামক নূতন ধর্মের প্রচার চেষ্টা করেন, সেই সময়ে তিনি খৃীস্টধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য অবগত হইবার জন্য তিনজন পর্টুগীজ পাদরীকে তাঁহার রাজসভায় আনয়ন করেন। মহা পণ্ডিত আবুল-

১. সিজার ফ্রেডরিক "As I passed upto Satagan, I saw the village standing with a great number of people, with an infinite number of Ships and Bazras, and at my return downe with my Captaine of the last Ship, for whom I favoured, I was all amazed to see such a place so soone razed and burnt, and nothing left but the signe of burnt Houses.

—Quoted in *History of Bengal*, Vol II. Dacca, p. 365.

২. ভাস্কো ডি গামা কালিকটে অবতরণ করেন ২০শে মে, ১৪৯৮ খ্রী.।

ফজল ইহাদের একজনকে পাদরী রুডাফ্ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম একোয়াভিভা। আকবরের সময়ে পর্টুগীজগণ সর্ব প্রথমে বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করে। হুগলীর উপকণ্ঠে বাণ্ডেলই তাহাদের প্রথম আশ্রয়ভূমি। এই বাণ্ডেল সম্ভবত 'বন্দর' শব্দের অপভ্রংশ। অবশ্য তৎকালীন মোগল সুবাদারের সম্মতি পাইয়াই পর্টুগীজেরা হুগলীতে তাহাদের প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিয়াছিল। এই নবস্থাপিত বাণিজ্যকুঠির কার্য পরিদর্শন জন্য সেই সময়ে একজন এজেণ্টও নিযুক্ত হন। বাণ্ডেলের গির্জা আজও পর্টুগীজদিগের বঙ্গে প্রথম উপনিবেশের অতি প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ রূপে দণ্ডায়মান।

পর্টুগীজেরা যে সময়ে সপ্তগ্রামের সমীপবর্তী হুগলীতে প্রথম বন্দর স্থাপন করেন, সেই সময়ে সপ্তগ্রামের অধঃপতন না হইলেও তাহার অবস্থা অনেকটা মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। পর্টুগীজেরা এই সময়ে সপ্তগ্রাম বন্দরকে মজাইয়া তাহাদের প্রতিষ্ঠিত হুগলীর বাণিজ্য জাঁকাইয়া তুলিবার মতলব করিল। হুগলীর প্রাধান্য দিন দিন বর্ধিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের প্রাধান্য কমিয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমশ ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত পর্টুগীজেরা অতিশয় দর্পিত ও সাহসী হইয়া হুগলীতে এক দুর্গ নির্মাণ করিল। মোগল শাসনকর্তাগণ ইহাতে পর্টুগীজদিগের উপর মহা অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সে সময়ে বাদসাহ সরকারে এতদ্বিরুদ্ধে এতেলা করিলেও কোন ফল হইবে না, কারণ পর্টুগীজগণ আকবর সাহের অনুগ্রহভাজন। এই জন্যই তাঁহারা সে সময়ে চুপ করিয়া যান।[১]

পর্টুগীজেরা অল্প রাজস্বে গঙ্গার তীরবর্তী ভূভাগের অধিকারী হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করতঃ দক্ষিণবঙ্গের বাণিজ্য একরূপ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। যে সমস্ত জাহাজ বা নৌকা হুগলী বন্দরের নিকট দিয়া যাইত, পর্টুগীজেরা তাহাদের নিকট শুল্ক আদায় করিত। এজন্য সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। বাণিজ্য সম্বন্ধে এইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া পরিশেষে দুর্দান্ত পর্টুগীজগণ দেশের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা বালক-বালিকাগণকে প্রলোভনে কিম্বা বল প্রয়োগে বশীভূত করিয়া দাস বৃত্তির জন্য ইউরোপে প্রেরণ করিত। এই কুৎসিত ব্যবসায় অবলম্বন করায় বঙ্গবাসিগণ পর্টুগীজদিগকে ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। এতজ্জন্য তাহাদের বাণিজ্যেরও ক্ষতি হইতে লাগিল। অপরন্তু তাহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জলপথে ও স্থলপথে লোকের সর্বস্ব অপহরণপূর্বক দেশমধ্যে ভীষণ অত্যাচারস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। কি পূর্ববঙ্গ, কি দক্ষিণবঙ্গ, কি পশ্চিমবঙ্গ, সর্বস্থানেই ক্রমে ক্রমে তাহাদের দাসব্যবসায় ও দস্যুবৃত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গেও মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা নদীর উপকূল ভাগে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে। পূর্ববঙ্গেই দস্যুবৃত্তিব্যবসায় অধিক চলিত, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে দাসব্যবসাই প্রবল ছিল। এই জন্য বাঙ্গলার সকল স্থানেই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল।

যতদিন আকবর সাহ জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্টুগীজেরা নিঃশঙ্ক চিত্তে এইভাবে বঙ্গদেশের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। হুগলীতে যে সব পর্টুগীজ থাকিত, তাহারা দাসব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যও করিত। তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যে দেশের বাণিজ্যক্ষেত্র প্রসারিত ও সরকারের আয় বৃদ্ধি হইতেছিল। দাসব্যবসায় দেশের লোকের পক্ষে সর্বনাশকর হইলেও, সেকালে অতি প্রবলভাবে হিন্দুস্থান মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেক সময়ে এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনাবলী বাদসাহ সরকারে পৌঁছিত না বলিয়াই হউক, বা বঙ্গে পাঠান বিপ্লব ও দ্বাদশ-ভৌমিকদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকার জন্য হউক, অথবা পর্টুগীজদিগের বাণিজ্যদ্বারা সরকারের রাজকোষ পূর্ণ হইতেছে ভাবিয়াই হউক, আকবর সাহের দৃষ্টি এই পর্টুগীজদিগের উপর নিপতিত হয় নাই।

আকবরের দেহান্তে জাহাঙ্গীর সাহ মসনদ অধিকার করিলেন। পূর্বে বলিয়াছি, মহারাজ মানসিংহ তাঁহার আমলেই দ্বিতীয়বার সেনাপতিরূপে বঙ্গে প্রেরিত হয়েন। দ্বাদশ-ভৌমিকদের

১. *Hoogly Past and Present*—ঐতিহাসিক চিত্র।

বিদ্রোহ দমনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতাপাদিত্য ও চাঁদ রায় কেদার রায়ের ধ্বংস সাধন করিয়া, মানসিংহ সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভ করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে সমর ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার সময় অনেক স্থলে তাঁহাকে পর্টুগীজদিগের হস্তে বাধা পাইতে হইয়াছিল। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালিস এই সময়ে সন্দ্বীপ উপকূলে মহা প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিল। ফ্রান্সিস্ কার্ভালো এই সময়ে প্রকাশ্যভাবে কেদার রায়ের অধীনস্থ হইয়া মোগল সৈন্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। এই সকল কারণে মানসিংহ পর্টুগীজদিগের উপর ভয়ানক বিরক্ত হন।

আরাকান উপকূলের পর্টুগীজগণ যে সময়ে এই সমস্ত বিগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত, সেই সময়ে হুগলীর পর্টুগীজগণ ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগী হইয়াছিল। তাহাদের স্বজাতীয়েরা বঙ্গের অপর প্রান্তে কোথায় কি করিতেছে, তাহার সকল সংবাদই তাহারা পাইত, কিন্তু তাহাদের কোন কার্যেই প্রকাশ্য সহানুভূতি দেখাইত না।

পর্টুগীজদিগের এই ভীষণ অত্যাচারে একটা দেশব্যাপী মহা আতঙ্ক উত্থিত হইল। সে আতঙ্ককাহিনী দিল্লীশ্বরের সিংহাসনতলে গিয়া পৌঁছিল। বাদসাহের আদেশে পর্টুগীজদিগের অত্যাচার প্রশমিত করিবার জন্য বঙ্গের রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় পরিবর্তিত হইল।

ইসলাম খাঁ[১] এই সময়ে বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। ইসলাম খাঁ ঢাকায় আসিয়া পর্টুগীজদের দমনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহার এ সম্বন্ধে পরিশ্রমও বৃথা হইল না। বঙ্গের পূর্বোপকূলে পর্টুগীজগণ তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে শান্তভাব ধারণ করিল। তিনি পর্টুগীজদিগকে একবারে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলেও তাহাদের দমনে রাখিলেন।

১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। কাসেম খাঁ[২] তাঁহার স্থলে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কাশেম খাঁও পর্টুগীজদিগকে তাঁহার শাসনাধীনে সংযত রাখিয়াছিলেন। কাশেম খাঁর পর ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্তা বা সুবাদার নিযুক্ত হন।

ইব্রাহিম খাঁ[৩] অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। কেবল তাই নয়, তাঁহার আমলে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সর্ববিষয়িণী উৎপাত ও বিঘ্ন বাধা দূর করিয়া তিনি বঙ্গীয় প্রজাকে শান্তিময় শাসনাধীনে পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে বঙ্গদেশ আবার অরাজকতার পরিবর্তে সুখশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইব্রাহিম খাঁ আর কিছুদিন এইভাবে কাজ করিতে পারিলে, বঙ্গদেশ হইতে পর্টুগীজ প্রভাব হয়ত একবারে বিলুপ্ত হইত। কিন্তু বঙ্গের ভবিতব্য অন্যরূপ। সহসা এমন এক ঘটনাচক্রের সৃষ্টি হইল, যাহাতে ইব্রাহিম খাঁ সম্পূর্ণরূপে তাহার অধীন হইয়া পড়িলেন। সেই ঘটনার সহিত বঙ্গে পর্টুগীজপ্রভাব ধ্বংসের বিশেষ সম্বন্ধ।

জাহাঙ্গীর অতি শান্তিপ্রিয় বাদসাহ ছিলেন। স্যর টমাস রো অবশ্য তাঁহাকে এইভাবেই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রো একস্থলে বলিয়াছেন, "জাহাঙ্গীরের গুণ অনেক, কিন্তু তিনি কখনও কাহার ক্ষমতার অপব্যবহারে বাধা দিবার ইচ্ছা করিতেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার প্রধানা বেগম নূরজাহানের শক্তির একান্ত অধীন। প্রকারান্তরে সর্ববিষয়েই তিনি নূরজাহানের হস্তের ক্ষমতাবিহীন ক্রীড়াপুত্তলি।"

প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও তাই। জাহাঙ্গীরের পুত্রগণের মধ্যে সাহাজাদা খুরম শক্তিশালী ও বিশেষ বুদ্ধিমান ছিলেন। খুরম রাজপুত্রোচিত গুণাবলী বিভূষিত হইলেও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহাকে আদতে দেখিতে পারিতেন না। জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র সাহাজাদা সাহরিয়ারকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। কারণ সম্পর্কে সাহরিয়ার আবার তাঁহার জামাতা। পূর্বস্বামী, সের আফগানের ঔরসজাত এক কন্যার সহিত নূরজাহান সাহরিয়ারের বিবাহ দেন। নূরজাহানের ইচ্ছা

১. ইসলাম খাঁ চিসতি বাংলার সুবাদার ছিলেন ১৬০৮ হইতে ১৬১৩ খ্রী.।
২. কাশিম খাঁর সুবাদারি কাল ১৬১৩-১৬১৭ খ্রী.।
৩. ইব্রাহিম খাঁ ১৬১৭-১৬২৪ খ্রী. পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।

সাহরিয়ারই দিল্লী সিংহাসনের অধিকারী হন। এইজন্য সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান সর্ববিষয়ে তাঁহার জামাতার পক্ষ সমর্থন করিতেন।

এই অন্যায় পক্ষপাতিত্বের ফল বড়ই বিষময় হইল। সাহাজাদা খুরম (পরে সাহজাহান) পিতৃদ্রোহী হইলেন। ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে[১] বিদ্রোহী হইয়া খুরম সসৈন্যে দিল্লী নগরী অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দিল্লীর যুদ্ধে তিনি সম্রাটসৈন্যের হস্তে পরাজিত হন। সম্রাটসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি সুদূর বঙ্গদেশে পলায়ন করিয়া বর্ধমানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সম্রাটকুমার খুরম নানা কারণে বাধ্য হইয়া বর্ধমানে শিবির স্থাপন করিলেন। সম্রাট পুত্র বিদ্রোহী হইয়া হুগলীর অতি সন্নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া হুগলীর তৎকালীন পর্তুগীজ গবর্ণর, মাইকেল রডারিকো[২] (Michael Rodriques) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বিদ্রোহী সম্রাটপুত্র কোন বিশেষ উদ্দেশ্য চালিত হইয়া মহাসমাদরে তাঁহাকে শিবিরে গ্রহণ করেন। অন্যান্য কথাবার্তার পর, সাহজাহান রডারিকোকে বলিলেন, "আপনি যদি আমার এই বিপত্তির সময়ে আমাকে কয়েকটি কামান ও আপনার ইউরোপীয় সেনা দিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব এবং আমার শুভদিন সমুপস্থিত হইলে এ কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিব।"

রডারিকো এইবার এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। বিদ্রোহী সম্রাটপুত্রকে সাহায্য করিলে, নিশ্চয়ই তিনি জাহাঙ্গীরের বিষনয়নে পড়িবেন। একদিন না একদিন, সম্রাটপুত্রের এই বিদ্রোহ প্রশমিত হইবে। কিন্তু এইরূপ অসঙ্গত সাহায্যের জন্য সমগ্র পর্তুগীজ জাতিকে বঙ্গদেশ হইতে, এমনকি ভারত হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি বিদ্রোহী সম্রাটপুত্রের প্রস্তাবের স্পষ্টরূপে কোন উত্তর না দিয়া স্বস্থানে চলিয়া আসেন।

সাহাজাদা খুরম পর্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় বিফল মনোরথ হওয়ায় তাহাদের উপর অতিশয় জাতক্রোধ হইলেন। কিন্তু ক্রোধ দেখাইবার সময় তখন নহে। কাজেই তিনি শান্তভাব ধারণ করিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনাগণকে একত্রিত করিলেন। সাহসে বুক বাঁধিয়া জাহ্নবী তীরস্থ প্রান্তরে মোগলসুবাদারকে আক্রমণ করিলেন। মোগলসুবাদার প্রাণপণে যুঝিয়া রণ ক্ষেত্রে দেহত্যাগ করেন। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে।[৩]

বিদ্রোহী রাজকুমার খুরম কাজেই বঙ্গের শাসনকর্তা হইলেন। সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার দণ্ডমুণ্ডের ব্যবস্থাধীন হইল। দুই বৎসর কাল তিনি এইভাবে বঙ্গদেশে অবস্থান করেন। এদিকে সম্রাট পুত্রের বিজয়বার্তা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া দিল্লী হইতে এই বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গদেশে এক প্রচণ্ডবাহিনী প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য কুমার খুরম, এই যুদ্ধে পিতৃসৈন্যের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। পরিশেষে পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায় এই পিতৃদ্রোহিতার শান্তি হয়।

১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে[৪] জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের শ্বাসরোগ ছিল। লাহোরে অবস্থান কালে এই রোগ সহসা প্রবলভাব ধারণ করে, এবং তাহাতেই তাঁহার দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়াই সাহাজাদা খুরম 'সাহজাহান' উপাধি ধারণ করিয়া, আগরার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

সাহজাহানের রাজত্বকালের এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও তিনি পর্তুগীজকৃত পূর্বদিনের অপমানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি কাশেম খাঁ নামক এক অনুগৃহীত সেনানীকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

১. সাহাজাদা খুরম বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন ১৬২২ সালের শেষভাগে।
২. Michael Rodriques-এর প্রকৃত নাম Miguel Rodriques.
৩. *Hoogly Past and Present*—S. C. Day, Bengal Gazetteer—Hoogly.
৪. জাহাঙ্গীরের মৃত্যুকাল ৭ই নভেম্বর, ১৬২৭ খ্রী.।

সম্রাটের আদেশ ছিল, "আমি তোমায় বঙ্গদেশের সর্বময় কর্তৃত্ব ও শাসনভার দিয়া পাঠাইতেছি। তুমি আমার অনুগৃহীত ও নির্বাচিত ব্যক্তি। তুমি সাবধানে পর্টুগীজদিগের কার্যপ্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখিবে। তাহারা কোথায় কি করিতেছে, তৎপ্রতি যেন তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে। আমি আমার বঙ্গীয় প্রজাগণকে পর্টুগীজদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে চাহি। যখন দেখিবে তাহারা কোনরূপ বিধি বিগর্হিত অন্যায় কার্য করিতেছে, তখনই সরকারে এত্তেলা করিবে। এত্তেলা পাইলে যেরূপ হুকুম দেওয়া প্রয়োজন আমি তখনই তাহা দিব।"

কাশেম খাঁ বাঙ্গলায় আসিয়া ক্রুদ্ধ শনির ন্যায় পর্টুগীজদের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। পরিশেষে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল। কাশেম খাঁ সম্রাট সরকারে যে এত্তেলা পাঠাইলেন তাহার সার মর্ম এই—(১) পর্টুগীজেরা বলপূর্বক ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্রাটের প্রজাগণকে খৃীস্টানধর্মে দীক্ষিত করিয়াছে। (২) সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত দুই এক স্থলে দুর্গনির্মাণও করিয়াছে। (৩) তাহাদের বাণিজ্যালয়ের বা ফ্যাক্টরির নিকট দিয়া যে সমস্ত বাণিজ্যনৌকা যাতায়াত করে, তাহাদের নিকট হইতে বলপ্রয়োগে শুল্ক আদায় করিতেছে। (৪) বাদসাহের প্রধান বাণিজ্যবন্দর সপ্তগ্রামের সম্পূর্ণ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

সম্রাট সরকারে এই এত্তেলা পেঁৗছিবামাত্রই ঘৃতসিক্ত বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ হইলে যে ব্যাপার ঘটে, তাহাই হইল। সম্রাট তখনই আদেশ দিলেন, "পর্টুগীজদিগকে বাঙ্গালা হইতে একেবারে বিতাড়িত করিয়া দাও। তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ কর।"

বাদসাহ যত সহজে এই আদেশ প্রদান করিলেন, পর্টুগীজদিগকে সমূলে বিতাড়িত করা তত সহজ বলিয়া বোধ হইল না। কারণ পর্টুগীজদিগের হুগলীদুর্গ কামানদ্বারা সুন্দররূপে সুরক্ষিত।[১] তাহারা শিক্ষিত সেনাসহায়ে এই সুরক্ষিত স্থানের মধ্যে থাকিয়া মোগলসৈন্যকে যে যথেষ্ট বাধা দিতে পারিবে, তাহাও খুব সম্ভব। এইজন্য সুচতুর কাশেম খাঁ ধীরে ধীরে পর্টুগীজধ্বংসরূপ মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

কাশেম খাঁ তাঁহার পুত্র এনায়েৎউল্লা এবং আল্লা ইয়ার খাঁ নামক একজন সেনানীকে হুগলী আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। এনায়েৎ খাঁ একজন সুদক্ষ সেনানী, পিতার উপযুক্ত পুত্র। অন্যদিক হইতে খাজা সেরও হুগলীর পথ ধরিলেন। এতদ্ব্যতীত মাসুম খাঁ (ইশা খাঁর বংশধর), বাহাদুর কুম্বু প্রভৃতি সেনাপতিগণও এই যুদ্ধে যোগদান করেন। এই সময়ে ডি মিগনেল ডি নোরোনহা পর্টুগীজ অধিকারসমূহের সর্বময় কর্তা ছিলেন। এ যুদ্ধ ব্যাপার বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। এজন্য আমরা ঐতিহাসিক চিত্র হইতে অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ঘটনাবলী এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পাছে পর্টুগীজগণ এই আক্রমণের সন্ধান পায়, এই আশঙ্কায় 'বাদসাহী সৈন্যগণ হিজলী অধিকারের জন্য যাইতেছে', এই কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল। আল্লা ইয়ার খাঁ হিজলী যাত্রার অছিলায় বর্ধমান নগরে অবস্থিতি করিয়া খাজা সের প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খাজা সের শ্রীপুর হইতে[২] রণতরী সমেত পর্টুগীজদিগের নদীমুখে পলায়ন

---

১. William Bruton, Quarter Master of the Hopewell, East Indiaman, who wrote an account of his party, describes Hoogly (in 1632) as 'an island made by the Ganges, having several thousand Portuguese Christians in it'. A writer in *Stewart's Descriptive Catalogue* represents Hoogly as 'protected in one side by the river and on the other by a deep ditch which was filled by water.'

২. সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক ইলিয়ট ও ষ্টুয়ার্ট সাহেব, এই শ্রীপুরকে শ্রীরামপুর বলিয়া বোধ হয় যেন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কাশিম খাঁ ঢাকা হইতেই যুদ্ধযাত্রার আদেশ প্রদান করেন। খুব সম্ভবত ঢাকার নিকটবর্তী পদ্মার উপরই বাদসাহী রণতরী থাকিত। শ্রীপুর পদ্মার তীরবর্তী ও সমুদ্রের নিকটবর্তী। শ্রীপুর হইতে নদীপথে হুগলী পর্যন্ত আসার পথও নির্দিষ্ট ছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নিখিলবাবু বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুর নহে—শ্রীপুর'। এ বিষয়ে নিখিলবাবুর সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই।

পথ রুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রণতরীর বহর মোহানাতে উপস্থিত হইলে আল্লা ইয়ার খাঁ হুগলীতে উপস্থিত হইয়া পর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। খাজা সের মোহানাতে উপস্থিত হইলে আল্লা ইয়ার খাঁ বর্ধমান হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রাম ও হুগলীর মধ্যস্থ হলদীপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন। খাজা সেরও মোহানা হইতে হুগলীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে বাহাদুর কুম্বু মুকসুদাবাদ হইতে পাঁচশত অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া আল্লা ইয়ার খাঁর সহিত যোগদান করেন।

সেনাপতি খাজা সের এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেখানে অতি সহজেই হুগলীর পার্শ্ববর্তী জঙ্গল মধ্যে একটি সংকীর্ণ স্থান সেতুদ্বারা বন্ধ করিলে পর্টুগীজদিগের পলায়নপথ বন্ধ করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থা করায় পর্টুগীজেরা আর কোনরূপে জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিতে পারিল না।

যদিও পর্টুগীজগণের গতিরোধ করিয়া বাদসাহী সৈন্য হুগলী অধিকারের জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তাহারা পর্টুগীজদিগকে দমন করিতে সক্ষম হয় নাই। হুগলী বন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়া পর্টুগীজেরা তথায় এমন দুর্ভেদ্য দুর্গ[১] করিয়া রাখিয়াছিল যে সহসা সে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করা সহজ কাজ নহে। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ নদী, ঝিল ও পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। বুরুজে বুরুজে বজ্রনাদী কামান। বাদসাহী সৈন্য জলে স্থলে তিনমাস কাল হুগলী-দুর্গ অবরোধ করিয়া প্রায় সাড়ে তিনমাস[২] পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়।[৩] এই সময়ের মধ্যে বাদসাহের সেনাপতিগণ দুর্গের বহির্ভাগস্থ নদীর উভয় তীরবর্তী নানা স্থানে সৈন্য পাঠাইয়া খ্রীস্টানদিগকে বন্দী করিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন। সেইসঙ্গে পর্টুগীজদিগের নিযুক্ত বহুসংখ্যক বাঙ্গালী নাবিককে ধৃত করিয়া আপনাদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন।

বাদসাহী সেনাকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পর্টুগীজেরা সময়ে সময়ে আত্মরক্ষার জন্য সামান্য যুদ্ধ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা সন্ধির প্রস্তাবও করিয়াছিল। এই সন্ধি ব্যাপারে তাহারা আত্মরক্ষার জন্য লক্ষ মুদ্রা দিতে চায়। কিন্তু গোয়া ও অন্যান্য পর্টুগীজ অধিকার হইতে সাহায্য পাইবার আশায় তাহারা সহসা আত্মসমর্পণ করিল না।

পর্টুগীজদিগের অধীনে সাত হাজার বন্দুকধারী সেনা ছিল। তাহারা এই কয়মাস কাল অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণে বাদসাহী সেনাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপে প্রায় সাড়ে তিন মাস অতীত হয়।

দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর অক্টোবর মাসে[৪] বাদসাহপক্ষ দুর্গ জয়ের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। সুড়ঙ্গে বারুদ পূর্ণ করিয়া তাঁহারা হুগলীদুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পর্টুগীজদিগের গির্জার নিকটে যে পরিখাটি ছিল, তাহা অতি সংকীর্ণ। কোন কৌশলে সেই অপ্রশস্ত খাতের জল বাহির করিয়া দিয়া তাহা বারুদে পরিপূর্ণ করা হইল। বলা বাহুল্য, পর্টুগীজেরা এই বারুদপূর্ণ সুড়ঙ্গটির সন্ধান পাইয়া তাহা অকর্মণ্য করিয়া দিল। মধ্যস্থলে যে সুড়ঙ্গটি নির্মিত হইয়াছিল, তাহার উপরিস্থ এক বৃহৎ অট্টালিকায় বহু

১. পাদরী Cabral-এর মতে 'The city had no walls nor artillery of any kind. What musketry they had—there was much of it and of good quality—was distributed and (sub) Captains appointed.—*Cabral* ii, p. 399—Quoted in ***History of Bengal*** Vol II Dacca, p. 325.

২. ১৪ই জুন হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৬৩২ খ্রী. হুগলীর অবরোধ কাল।

৩. আবদুল হামিদ লাহোরীর 'বাদসানামায়' উল্লিখিত আছে—বাদসাহী সৈন্য সার্ধ তিনমাস হুগলী অবরোধ করিয়াছিল, কিন্তু 'তারিখ-ই-খাফি-খান' বা খাফি খাঁর ইতিবৃত্তে অবরোধের সময় তিনমাসকাল বলা হইয়াছে। তারিখ গ্রন্থখানি বাদসানামার পরে রচিত। যাহা হউক এই দুইখানি গ্রন্থের উক্তি হইতেই প্রমাণ হয়, বাদসাহী সৈন্যকে তিন বা সাড়ে তিনমাসকাল ধরিয়া পর্টুগীজ ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল।
—Elliot's ***History of India*** Vol VII. Day's ***Hoogly Past & Present,*** p. 17.

৪. পর্টুগীজ বাহিনী ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

পর্টুগীজ বাস করিত। বাদসাহী সৈন্যগণ সেই অট্টালিকার সম্মুখে সমবেত হইয়া পর্টুগীজগণকে তথায় উপস্থিত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। পর্টুগীজেরা মোগল সৈন্যের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া সেই স্থলে আসিবামাত্রই বাদসাহী সৈন্য সুড়ঙ্গে অগ্নিপ্রদান করিল। বলা বাহুল্য, মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অট্টালিকা ভূমিসাৎ ও বিলুপ্ত হইল।

বাদসাহী সৈন্যগণও নিশ্চেষ্ট রহিল না। তাহারা পর্টুগীজদের এই অসম্ভব বিপত্তি দেখিয়া তাহাদিগকে পূর্ণবেগে আক্রমণ করিল। কতকগুলি পর্টুগীজ পলায়নকালে জাহ্নবীগর্ভে জীবন্ত সমাহিত হইল। অনেকে জাহাজে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মোগল সেনা-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারাও নিহত হইল।[১]

ইতি মধ্যে বহুসংখ্যক পর্টুগীজ একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়াও বাদসাহী সেনার হস্তে পতিত হইলে ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার ভয়ে তাহারা জাহাজের বারুদখানায় আগুন লাগাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, জাহাজখানি মুহূর্ত মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া দশধা বিক্ষিপ্ত হইল। আরও কতকগুলি অপেক্ষা-কৃত ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া পর্টুগীজেরা নানাদিক দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে ছিল। ষাটখানি বড় ডিঙ্গি, সাতান্নখানি ঘেরাব বা মাঝারি নৌকা ও তিনশতখানি জেলিয়া ডিঙ্গির মধ্যে মাত্র একখানি ঘেরাব ও দুইখানি জেলিয়া ডিঙ্গি পলাইয়া যায়। নৌসেতুর মধ্যস্থ দুই একখানি নৌকা পর্টুগীজদের বারুদের আগুনে দগ্ধ হইয়াছিল। জলেস্থলে যে সমস্ত পর্টুগীজ পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই বন্দী হইল।

বাদসাহী দলের প্রায় এক সহস্র সৈন্য জীবন বিসর্জন করে। মোগলদিগের হস্তে ৪৪০০ পর্টুগীজ পুরুষ ও রমণী বন্দী হয়। পর্টুগীজগণ কর্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত দশহাজার লোক মুক্তি লাভ করে। পর্টুগীজ বন্দীদিগের মধ্যে চারিশত সুন্দর পুরুষ ও নারী আগরায় প্রেরিত হয়। সুন্দরী রমণীগণ বাদসাহের ও আমির-ওমরাহগণের হারেমে আশ্রয় লাভ করে। বালকেরা মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। জেসুইট ও অন্যান্য পাদরীগণকে মুসলমান করিবার জন্য ভয়প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কারাগার হইতে গোয়ায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করে। দুর্গে ও নৌকায় পর্টুগীজদিগের যে সমস্ত ধন সম্পত্তি ছিল মোগলেরা তাহা লুঠ করিয়া লয়। এই সময়ে গির্জার মধ্যস্থ অনেকগুলি বহুমূল্য সুন্দর চিত্রও বিনষ্ট হইয়াছিল।

যাহা হউক পর্টুগীজদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তগ্রামেরও পতন সূচিত হইল। বাণিজ্য-লক্ষ্মী জন্মের মত 'সোনার সাঁতগার' নিকট বিদায় লইলেন। মোগলসম্রাটের আদেশে সপ্তগ্রাম বন্দর হিসাবে পরিত্যক্ত হইল। সপ্তগ্রামের পতনের সহিত ত্রিবেণী ও সরস্বতীর সর্বনাশ হইল।

বাদসাহের আদেশে সমস্ত সরকারী কাছারি সপ্তগ্রাম হইতে হুগলীতে স্থানান্তরিত হইল। সরকার হইতে একজন ফৌজদার ইহার শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত হইলেন।[২] এই ফৌজদারের

১. Hoogly was taken on the 10th. September, 1632. The loss on the side of the Portuguese was immense. Out of 64 large vessels 57 grabs 200 sloops which were anchored opposite the town, only one grab and two sloops made their escape. The Captain of the largest vessel on which were embarked 2000 men, women and children with all their goods and valuables, rather than yield to the Mussulmans set fire to the magazine and blew them up. And many other vessels followed his desperate example. 10,000 Portuguese are said to have been perished during the siege and 4400 were taken prisoners. All the natives, whom the Portuguese had in their power, were liberated. A thousand Mussulmans died as martyrs to the religion. এই বিপত্তি সময়ে De Miguel de Noronha ভারতে পর্টুগীজ উপনিবেশসমূহের বড়কর্তা ছিলেন। ১৬২৯-১৬৬৫ খ্রী. অব্দ পর্যন্ত তিনি কর্তৃত্ব করিয়াছিলেন।

—Rehatsek's *Portuguese in India*. C. R. 1881. Day's *Hoogly*, p. 17.

২. আজকাল অস্মদ্দেশের নাটক-নভেলে ফৌজদারের উল্লেখ মৃদুভাবে হইয়া থাকে। কিন্তু ফৌজদারগণ যে-সে লোক ছিলেন না। তাঁহাদের বেতন মাসিক দুই সহস্রের উপর ছিল। কিন্তু নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে তাহা বৎসরে বত্রিশ হাজারে দাঁড়ায়। ফৌজদারেরা প্রধান পুলিশ কর্মচারী ছিলেন, খালি তাই নয়, তাঁহারা

হস্তে বাদসাহ সরকার হইতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইল। ফৌজদার সেই সময়ে পুলিস বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ফৌজদারী মোকদ্দমা সমূহের বিচার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তবে তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিতেন না। সেকালে 'নাজিম' বলিয়া আর একজন উচ্চ পদবীর ম্যাজিস্ট্রেট বা ফৌজদারী বিচারক ছিলেন। তাঁহার হস্তেই অপরাধীদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার ভার সমর্পিত ছিল। ফৌজদারের অধীনে একজন সহর কোতোয়াল থাকিতেন। বাদসাহী আমলে ফৌজদারদের বেতন অনেক ছিল। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে তাহা বার্ষিক বত্রিশ হাজারে দাঁড়ায়। যাহা হউক, হুগলীর অভ্যুদয়ের সহিত সপ্তগ্রাম ও পর্টুগীজদেরও অধঃপতন ও ইংরাজদের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল।

ইংরাজের উড়িষ্যায় প্রবেশ

কি কারণে এবং কোন্ সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মান্দ্রাজ উপকূল হইতে বাণিজ্যার্থে উড়িষ্যাদেশে প্রবেশ করেন, এইবার সেই কথাই বলিব। ইংরাজের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য মসলিপট্টনের ছিট ও কাপড়। মসলিপট্টনের ছিট আজও বাজারে প্রাধান্য লাভ করিয়া আছে। ইংরাজ কুঠির অধ্যক্ষেরা দেখিলেন নানা কারণে মসলিপট্টনের কাপড়ের বাজার মন্দা হইয়া পড়িতেছে। রপ্তানির কাজ ভালরূপে চলিতেছে না এবং ব্যবসায়ে কোম্পানির ক্ষতি হইতেছে। মসলিপট্টনের কুঠির অধ্যক্ষেরা এজন্য সংকল্প করিলেন গঙ্গানদীর উপকূলবর্তী স্থানসমূহে বাণিজ্যের চেষ্টা করিতে হইবে। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এ সম্বন্ধে সমস্ত পরামর্শ ও বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। একদল ইংরাজ একখানি সুবৃহৎ দেশীয় নৌকায় আরোহণ করিয়া কটকের দিকে যাত্রা করিলেন। এই নৌকার মধ্যে আরোহী রহিলেন মাত্র আটজন ইংরাজ কুঠিয়াল। তাহা ছাড়া, দেশী মাঝি মাল্লাও তাহাতে আবশ্যক মত ছিল।

সমুদ্রতরঙ্গরাজি বিভিন্ন করিয়া অদৃষ্টের ও সমুদ্রের স্রোতে ভাসিয়া এই নৌকাখানি যথা সময়ে হরিশপুরে আসিয়া পৌঁছিল।[১] হরিশপুর উড়িষ্যার পাটুয়া নদীর উপর। পাটুয়া নদীবক্ষে প্রবেশ কালে কোম্পানির কর্মচারীরা এ দেশীয় নৌকায় মালপত্র বোঝাই করিয়া নদীপথে যাত্রা করিলেন। এই ভাবে চারি ক্রোশ রাস্তা যাইবার পর, এই ইংরাজ বণিকদল কোঁসিদা নামক স্থানে পৌঁছিলেন। কোঁসিদা হইতে কটক পর্যন্ত সরকারী রাস্তা ছিল। কটক হইতে এই ইংরাজ-দল মালকাণ্ডি বা মুকুন্দদেবের রাজধানীতে পৌঁছিলেন। মুকুন্দদেবের রাজধানীর নাম বারবাটি।

যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে সেই সময়ে এই সকল স্থান অতিশয় দুর্গম ছিল। সকলে সে দিকের পথ ঘাট জানিত না, জানিলেও বলিয়া দিত না। তাহার উপর এই আটজন ইংরাজ সেই দেশের ভাষা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। দেশীয় লোকদেরও তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। এত অসুবিধা ও বিপদের মধ্যে পড়িয়া কেবল মাত্র উদ্যমবশে তাঁহারা মুকুন্দ-দেবের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। এই দলের মধ্যে উইলিয়াম ব্রুটন বলিয়া একজন ফ্যাক্টর ছিলেন। কিরূপ কষ্টের মধ্যে পড়িয়া এই অষ্টজন ইংরাজ, সর্বপ্রথমে উড়িষ্যা ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তাহার একটি 'রোজনামচা' ব্রুটন নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন।[২] আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে দিতেছি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার পর্যন্ত করিতেন। তবে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিতেন না। ফৌজদারের উপরি-তন কর্মচারী ছিলেন 'নাজিম'। নিম্নতম কর্মচারী কোতোয়াল। নাজিমেরা চরম দণ্ডাজ্ঞা অর্থাৎ প্রাণদণ্ডাদেশ দানে সক্ষম ছিলেন।

The Fouzdar was the Chief Police Officer and Judge of all crimes not capital. The Kotwal the Head Constable of the Town was subordinate to him. The Nazim as Supreme Magistrate presided at the trial of Capital offenders.—Field's *Regulations* p.135.

১. বর্তমানকালে এই স্থান 'হরিশপুর গড়' বলিয়া পরিচিত।

২. *News from the East Indies or a Voyage to Bengalla*—William Bruton; Wilson's *Early Annals.*

"২২শে (১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দ) মার্চ। আমরা তখন করমন্ডল উপকূলে। মসলিপট্টনে আমাদের ফ্যাক্টরি ছিল। আমাদের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ জন নরিস। আমাদের মধ্যে পরামর্শ মতে স্থির হইল, বাঙ্গলাপ্রদেশে ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে হইবে। বঙ্গদেশের শাসনকর্তাদের দিবার জন্য আমরা নানারূপ উপঢৌকন সংগ্রহ করিয়া মসলিপট্টন হইতে এ দেশীয় এক সমুদ্র-গামী বৃহৎ নৌকায় উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করিলাম। আমরা বহুকষ্টে সমুদ্র পথের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হরিশপুরে উপস্থিত হইলাম। আমরা যে সময়ে হরিশপুরে নঙ্গর করিলাম, সেই সময়ে দেখিলাম, একখানি পর্টুগীজ জাহাজও আমাদের অতি নিকটেই নঙ্গর করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য যে সৎ নহে, ইহা বুঝিয়াই আমরা আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত রহিলাম। ২৪শে তারিখে আমাদের দলস্থ মিঃ কার্টরাইট ও মিঃ কলি হরিশপুরের শাসনকর্তার সহিত দেখা করিতে গেলেন। পথি-মধ্যে কয়েকজন দেশীয় গুন্ডা ও বদমায়েস লইয়া পূর্বোক্ত পর্টুগীজ জাহাজের নাবিকগণ আমাদের আক্রমণ করিল। তাহারা হয়ত আমাদের হত্যা করিত অথবা সর্বস্ব কাড়িয়া লইত। কিন্তু রাজা লক্ষ্মীপের লোকেরা সেই স্থানে দুই শত লোক লইয়া আসিয়া, মিঃ কার্টরাইটের জীবন রক্ষা করেন।[১]

এই দাঙ্গার ফলে মিঃ টমাস কলি দক্ষিণ হস্তে ভয়ানক আঘাত পান। আমাদের একজন লোক পায়ে ও মস্তকে অত্যন্ত আঘাত পায়। বিপক্ষীয়ের একজন 'নাখোদা' (নৌকাচালক) অতি ভীষণ-রূপে আহত হয়। এই বিবাদে আরও সর্বনাশ ঘটিতে পারিত। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় তাহা হয় নাই।

২৭শে এপ্রিল। আমরা তিনজন অর্থাৎ কার্টরাইট, আমি ও ডসন হরিশপুরের রাজার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। মিঃ কলি আহত, এজন্য তিনি হরিশপুরেই রহিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের অন্যান্য সঙ্গিগণও রহিল। আমরা মালকান্ডির (মুকুন্দদেব) সহিত সাক্ষাতার্থে যাত্রা করিলাম। পশ্চাদ্‌গামী সঙ্গীদের বলিয়া গেলাম, পথে যাহা কিছু ঘটিবে, তাহাদের সংবাদ পাঠান হইবে। ইতোমধ্যে মিঃ কলিও আরোগ্যলাভ করিবেন। আমাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইলে তাঁহারা গন্তব্য পথাভিমুখী হইবেন, ইহাই স্থির রহিল।

আমরা নানাবিধ সুগন্ধি মসলা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি বাণিজ্য দ্রব্যে, আমাদের নৌকা বোঝাই করিলাম। আমরা যে সকল সুগন্ধি মসলা সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাহা এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না। নদীপথ শেষ হইবার পর আমরা মালপত্রগুলি গরুর গাড়িতে বোঝাই করিলাম। সন্ধ্যার সময় আমরা গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইলাম।

২৮শে এপ্রিল। প্রভাত হইয়াছে। প্রভাতকালেই সেই নগরের শাসনকর্তা আমাদের শিবিরে আসিলেন। আমাদের প্রধানের পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনের বিনিময় হইল। তিনি আমাদের কথাবার্তায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, আপনাদের উপকার করিব।" তিনি বাস্তবিকই অতি ভদ্র। যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। তিনি আমাদের আরোহণের জন্য কয়েকটি অশ্ব পাঠাইয়া দিলেন। আমাদের হুকুম তামিল করিবার জন্য কয়েকজন কুলি পাঠাইয়া দিলেন। কারণ এই সহরে আমাদের দ্রব্যাদি লোকজনের দ্বারাই বহন করাইতে হইবে। গাড়ির আর তেমন সুবিধা হইবে না। আমরা গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিলাম। শাসনকর্তা আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহার লোকজনেরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আমরা সে দেশের পথঘাট কিছুই জানি না। কাজেই পথঘাট দেখাইয়া দিবার জন্য এবং রাজার প্রদত্ত অশ্বগুলি ফিরাইয়া আনিবার জন্য শাসনকর্তার লোকেরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বেলা এগারটা-বারটার সময় আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। এপ্রিল মাস, ভয়ানক গরম।

১. ব্রুটন ইহাকে Harsapoore এবং এই রাজাকে Lucklip the rogger বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চারিদিকে যেন আগুনের হলকা ছুটিতেছে। আমরা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একস্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তিন-চারিঘণ্টা বিশ্রামের পর অপরাহ্ন আসিল। এখান হইতে আমরা 'হরহরাপুরের' (হরিহরপুর) দিকে যাত্রা করিলাম। দুই-ঘণ্টার মধ্যে আমরা হরিহরপুরে পেঁৗছিলাম। হরিহরপুরে পেঁৗছিবার পর একজন লোক আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমাদের রাজা আপনাদের আগমন সংবাদ ইতোপূর্বেই পাইয়া-ছেন। তিনি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।"

একজন শাসনকর্তা আমাদের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছেন, এ সংবাদে আমরা বড়ই কৃতার্থমন্য বোধ করিলাম। তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতার্থে গমন করিলাম। একটি প্যাগোডা বা দেবমন্দিরের নিকট তাঁহার তাঁবু পড়িয়াছিল।[১]

সেই রাজকর্মচারী আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। রাত্রিতে বিরাট ভোজ হইল। আমাদের অবস্থান জন্য সরাই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা আহারান্তে সরাইয়ে ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের সঙ্গের মালপত্র সবই সেই থানাতেই হেপাজতে রহিল। মির্জা মমিন তাঁহার সঙ্গীদের সহিত সে রাত্রিতে তাঁহার নিজের শিবিরেই রহিলেন।

৩০শে এপ্রিল। আমরা অদ্য প্রভাতে কটকের (Coteke) পথ ধরিলাম। কটক খুব বড় সহর। কটক হইতে মুকুন্দদেবের (Malkundy) রাজধানী এক মাইলের উপর। মিঃ কার্টরাইট, আমাদের সঙ্গে আসিলেন না। কারণ তিনি মির্জা মমিনের সঙ্গে আসিবেন। সমস্তদিন পথ চলিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় গন্তব্যস্থানে পেঁৗছিলাম। সমস্ত দিবাভাগে কটক পর্যন্ত আমরা আট মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছি। রাত্রি একটার সময় মিঃ কার্টরাইট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে আমরা সদল বলে মির্জা মমিনের বাটিতে উপস্থিত হইলাম। মির্জা মমিন মহাসমাদরে আমাদের ভোজ দিলেন। তিনি নবাবকে সংবাদ পাঠাইলেন, "আটজন ইংরাজ সওদাগর আমার বাটিতে অতিথি হইয়াছেন।" যথাসময়ে আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া নবাব এক সিধা পাঠাইয়া দিলেন। এমন সুন্দর ও উপাদেয় ভোজ্য আমাদের অদৃষ্টে বহুদিন মিলে নাই। সেইদিন মির্জা-সাহেবের বাটিতেই বিশ্রাম করিলাম। বেলা তিন-চারি ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল, "রাজা আমাদের সহিত সাক্ষাতার্থে প্রস্তুত।"

ইংরাজ সদাগরেরা 'Court of Malcundy' বলিয়া একটা কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা কটকের মোগলসুবাদার আগা মহম্মদ জামানের সভায় উপস্থিত হন। এই 'মালকাণ্ডি' নাম কোথা হইতে আসিল, তাহার একটু আলোচনা করিব। উড়িষ্যার শেষ হিন্দু রাজা মুকুন্দদেব।[২] মুকুন্দদেব ১৫৪০ খৃীস্টাব্দে উড়িষ্যায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন হুমায়ুন বাদসাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। ইহার ছয়[৩] বৎসর পরে আকবর সাহ দিল্লীর সম্রাট হন। ১৫৬৭ খৃীস্টাব্দে সুলেমান সাহ কিরাণী, বাঙ্গলার মোগল-সুবাদার বা রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। সুলেমান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড়কে উড়িষ্যাজয়ে প্রেরণ করেন। যাজপুরের যুদ্ধে[৪] মুকুন্দদেব নিহত হন। উড়িষ্যার এই শেষ স্বাধীন হিন্দুনৃপতি কটকে

১. হরিহরপুরে এখনও এক শিবমন্দির ধ্বংসাবস্থায় বর্তমান। স্থানীয় লোকে, ইহাকে 'সোমনাথমন্দির' বলে। যে রাজকর্মচারী এই ইংরাজ বণিকদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম Mirza Momeine (মির্জা মমিন); ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাহেবেরা তাঁহাকে Mersy Momeine (মর্সি মমিন) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু দেবমন্দিরে তাঁহার অবস্থান সম্ভবত অসম্ভব। তবে অনুমানত এই বোধ হয়, মন্দির সমীপে কোন উন্মুক্ত স্থানে তাঁহার শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেইখানেই তিনি ইংরাজ বণিকগণকে প্রত্যুদ্গমন করেন।—Wilson's *Early Annals.*

২. পুরিচরণ মুকুন্দদেব অথবা তেলিঙ্গ মুকুন্দরাম নামে পরিচিত।

৩. 'ছয়' এর পরিবর্তে 'ষোল' পড়িতে হইবে। আকবরের সিংহাসনারোহণ কাল ১৫৫৬ খ্রী.।

৪. যাজপুরের যুদ্ধের কাল ১৫৬৮ খ্রী.।

এক প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ ১ নির্মাণ করিয়াছিলেন।২

ইংরাজ কুঠিয়াল বা ফ্যাক্টরেরা যখন কটকে উপস্থিত হন, তখন উড়িষ্যা প্রদেশ আকবর সাহের করকবলিত। মুকুন্দদেবের দুর্গে যে প্রকাণ্ড রাজভবন ছিল, সেই স্থানে উড়িষ্যায় মোগলসুবাদার আগা মহম্মদ অবস্থান করিতেছিলেন।

ব্রুটন ও তাঁহার সঙ্গীরা নবাবের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন। সে দেশে আর কখনও কেহ ইংরাজ দেখে নাই। কাজেই 'সাদালোক' দেখিয়া তাহারা একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণ পরে নবাবের ভৃত্যেরা আসিয়া কার্পেট পাতিয়া দিল। সেই কার্পেটের উপর মছলন্দের বিছানা ও স্বর্ণখচিত তাকিয়া পড়িল। ইহাই নবাবের বসিবার আসন। চারিটি স্বর্ণদণ্ডে পরিধৃত, মখমলের চন্দ্রাতপ সেই স্থানে খাটান হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একটা রব উঠিল, নবাবসাহেব দরবারে আসিতেছেন। সকলে সম্মানের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নবাব দুইজন লোকের স্কন্ধে বাহুর ভর দিয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একজন সুন্দর কান্তি যুবক উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পাহারা দিতে লাগিলেন। ইনিই নবাবের ভ্রাতা। নবাবের পশ্চাতে পঞ্চাশজন সভাসদ।

নবাব সেই মখমলমণ্ডিত বিছানার উপর বসিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গ তাঁহার আশে পাশে বসিল। ইংরাজ বণিকগণ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আনীত উপহারদ্রব্যাদি তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। নবাব তাহা স্পর্শ মাত্র করিয়া ইংরাজদের আপ্যায়িত করিলেন। ইংরাজ বণিকেরা নবাবের নিকট বাণিজ্যস্বত্ব লাভের প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নবাব তাহার কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্বেই 'নামাজের আজান-ধ্বনি' হইল। কাজেই সেদিন আর কোন কাজের কথা হইল না। তখন অপরাহ্ণ সময়। নবাব ও তাঁহার সঙ্গিগণ সেই সভাতে বসিয়াই নামাজ করিলেন। নামাজ শেষ হইলে ভৃত্যেরা সেই দরবারদালানের মোমবাতিপূর্ণ ঝাড়গুলি জ্বালিয়া দিল। রাত্রি আটটা-নয়টার সময় ইংরাজ বণিকগণ কটকে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রুটন এই নবাবের কোন নামোল্লেখ করেন নাই। এই নবাবই কার্টরাইটকে উড়িষ্যাদেশে অবাধ বাণিজ্যের স্বত্ব দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭০৪ সালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্র হইতে উইলসন সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন এই নবাবের নাম আগা মহম্মদ জামান্। পারস্যের তারহান (টিহারাণে?) ইঁহার জন্মস্থান। জাহাঙ্গীরের আমলে ইনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। আগা মহম্মদ বহুদিন এই বঙ্গদেশে ছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য তিনি শ্রীহট্টের ফৌজদার ও তালুকদার নিযুক্ত হন। সাহজাহানের আমলে তিনি মাসিক দুই হাজার মুদ্রা বেতন পাইতেন ও একহাজারি মনসবদার ছিলেন। বাদসানামার মতে, ১৬৩০-৩১ খৃীস্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। পর বৎসর তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হয় এবং তিনি মনসবদারীতেও উন্নীত হন। ১৬৩৪ খৃীস্টাব্দে তিনি আগরায় উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তিনি সম্রাটকে বঙ্গদেশ হইতে আনীত দুইটি হস্তী ও আটটি উৎকৃষ্ট অশ্ব উপঢৌকন প্রদান করেন। ঐ বৎসরে তিনি ইসলাম খাঁর

১. An Ancient fort, called Barabati Killa, of undoubted origin, is still one of the most conspicuous monuments in the city (of Cuttack).—*Imperial Gazetteer of India* Vol XI, p. 98.

২. আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে মুকুন্দদেবের এই বিরাট প্রাসাদদুর্গের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—"The City of Cuttack has a Stone Fort situated at the bifurcation of the two rivers, the Mohanadi held in high veneration by the Hindus and the Katjuri. It is the Residence of the Governor and contains some fine buildings, for 5 or 6 Kos round the Fort. During the rains the country is under water. Raja Mukund Deo built a Palace here with nine Courts (literally of nine Ashianahs or nest)—*Ain-i-Akbari*, Blockman' Trs.

এই দুর্গ 'বারবাটীর কেল্লা' বলিয়া পরিচিত ছিল। অন্যমতে, রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্তৃক এই দুর্গ নির্মিত হয় (খ্রী. চতুর্দশ শতাব্দী)। এখন এ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়। মুকুন্দদেবের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখন জঙ্গলে সমাবৃত। ইহার প্রস্তরখণ্ড লইয়া বঙ্গের পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট, লাইটহাউস্ (বাতিঘর) ও হাসপাতাল নির্মাণে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে অতীতের স্মৃতিস্বরূপ এই দুর্গপরিখা ও ভগ্ন তোরণদ্বার এখনও বর্তমান।

সহিত পুনরায় বঙ্গদেশে আসেন। ইহার তিন বৎসর পরে ইসলাম খাঁ তাঁহাকে কুচবিহার জয় করিতে পাঠান। কুচবিহার ও আসামের যুদ্ধে জয়লাভ করায় আগা মহম্মদের আরও পদোন্নতি হয়। ১০৫১ হিজিরাব্দে সাহজাহান তাঁহার পুত্র সাহাজাদা সুজাকে উড়িষ্যাপ্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করেন। সুজাকে তিনি বলিয়া দেন, "মহম্মদ জামান তাহারানীকে উড়িষ্যার শাসনকর্তা করিয়া দিও। তিনি একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা।" ইহার পরে তাহারানী উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বাল্‌খ্‌ প্রদেশে গমন করেন। তৎসময়ের ইংরাজদিগের প্রাচীন কাগজ-পত্র হইতে প্রমাণ হয়, মহম্মদ জামান দুইবার উড়িষ্যাপ্রদেশের শাসনকর্তা হইয়া আসিয়াছিলেন।

ইংরাজ বণিকগণ তাঁহাদের লিখিত কাহিনীতে এই মহম্মদ জামানকেই 'নবাব' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমদিনে কার্যসিদ্ধি হইল না দেখিয়া ইংরাজগণ পরদিন পুনরায় নবাবদরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, হরিশপুরে যে দুর্দান্ত পর্টুগীজ নাখোদার সহিত তাঁহাদের বিবাদ হইয়াছিল, সে সশরীরে সেই নবাব-দরবারে উপস্থিত। ইতিপূর্বেই সে নবাবের এক সভাসদকে হস্তগত করিয়া নালিশ রুজু করিয়া দিয়াছে, "ইংরাজগণ তাহার জাহাজের দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লোকদিগকে আহত করিয়াছে।"

কিন্তু তখন ইংরাজের সৌভাগ্যোদয় আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই এ নালিশ টিকিল না। নবাব পর্টুগীজদের ছলনায় ভুলিলেন না বটে, কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন জাহাজ দুখানি পিপ্‌লি বন্দরের, আর সে বন্দর মোগলের অধীনে, তখন তিনি সেই জাহাজ দুখানি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিলেন। ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন, নবাব পর্টুগীজ জাহাজ দুখানি ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহাদেরই দিবেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায় কার্টরাইট অতিশয় ভগ্নমনোরথ হইয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন. "আপনার নিকট আমরা সুবিচার পাইলাম না। কিন্তু অন্যত্র সুবিচার পাইবার চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া তিনি ক্রোধবশে নবাবকে অভিবাদন না করিয়া সহসা সেই সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন।[১]

কার্টরাইট ক্রোধভরে সভাগৃহ ত্যাগ করিলে উপস্থিত সকলেই এই ইংরাজের সাহসদৃষ্টে একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কার সাধ্য যে দেশের মালিক ও দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা নবাবের সহিত এরূপ উদ্ধতভাবে ব্যবহার করিতে পারে? এই ঘটনার পরদিনে. ধীরভাবে বিবেচনার পর নবাব তাঁহার প্রধান দেওয়ানজীকে ইংরাজ সওদাগরদের ডাকিয়া আনিতে পাঠান। কার্টরাইট প্রমুখ ইংরাজগণ পুনরাহূত হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সে দিনের দরবার খুব জাঁকাল। নবাব কার্টরাইটকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি যে গতকল্য ওরূপ ক্রোধভরে আমার দরবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহার কারণ কি?" কার্টরাইট বলিলেন, "জাঁহাপনার কল্যকার বিচারে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। আপনি আমাদের প্রভু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর অন্যায় আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদিগের ন্যায্য স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, এজন্য আমি মনের দুঃখে ক্রোধে ক্ষোভে ঐরূপ করিয়াছিলাম।"

নবাব দ্বিভাষিগণের সাহায্যে জানিতে পারিলেন যে ইংরাজেরাই প্রকৃত ব্যবসায়ী বণিক। মালাবার উপকূল, পারস্য, বান্টাম্‌, জাপারো. জান্‌বী ও ম্যাকসারে তাঁহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত। তাঁহারা পর্টুগীজদিগের মত ব্যবসায়ের ভাণ করিয়া দস্যুতা করিতে এদেশে আসেন নাই। প্রকৃত বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া ধনোপার্জনের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্যাগার স্থাপন করিয়াছেন ও বাদসাহের অন্যান্য প্রজার ন্যায় নির্বিবাদে ব্যবসাবাণিজ্য করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য, কার্টরাইটের এইরূপ অসমসাহসিক ব্যবহারেই ইংরাজগণ সে যাত্রা তরিয়া

---

১. Our merchant seeing that he could not make prize of the vessels or goods nor have any satisfaction for the wrongs which he and our men had received, he rose up in great anger and departed saying that if he could not have right justice here, he would have it in another place, and so went his way nor taking leave of the Nabab nor of any other.—Wilson's ***Early Annals of the English in Bengal.***

পেলেন। নবাব নিম্নলিখিত শর্তে ইংরাজদিগকে উড়িষ্যায় বাণিজ্যাধিকার দিলেন। উড়িষ্যা যদি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিভাগানুসারে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে ধরিতে গেলে, উড়িষ্যা প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজের বঙ্গে প্রথম আগমনকাল সূচিত হইয়াছে। নবাব সদয় হইয়া নিম্নলিখিত শর্তে তাঁহাদের বাণিজ্য চালাইবার আদেশ দিলেন।

(১) নবাবের বা তাঁহার প্রভু বাদসাহের অথবা সাধারণ প্রজাবর্গের কোন জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি ঝটিকাতাড়িত হইয়াই হউক বা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াই হউক, যদি কোনরূপ বিপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হয়, আর তাহাদের তদ্রূপ বিপন্ন অবস্থা এই ইংরাজ কর্মচারীরা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃপরত সেই বিপন্ন পোতগুলিকে সাহায্য প্রদানে বাধ্য রহিলেন।

(২) যদি কোন বাদসাহী জাহাজ, বোট বা নৌকা নঙ্গরাভাবে, খাদ্যাভাবে, পানীয়-জলাভাবে বা অন্য কোনরূপ বিপাকে পড়িয়া বিপন্ন হয়, আর যদি তাহা ইংরাজ কোম্পানির কোন সমুদ্র বা নদীগামী জাহাজ জানিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা সেই বিপন্ন ও অভাবগ্রস্ত বাদসাহী জাহাজ বা নৌকাকে সাহায্য করিতে বাধ্য রহিলেন।

(৩) বাদসাহের অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহের কোনও বন্দরে ইংরাজ কোম্পানি অন্য কাহারও জাহাজ আটক করিতে বা তাহা দখল করিয়া লইতে পারিবেন না। তবে, সমুদ্রপথে তাঁহাদের এরূপ স্বাধীনতা দেওয়া গেল।

এই কয়েকটি শর্ত স্থির হইয়া গেলে, নবাবের মীরমুন্সী সন্ধিপত্রের সার মর্ম বাদসাহপক্ষ হইতে সর্বসমক্ষে পাঠ করিলেন। এই আদেশপত্রের মর্মানুযায়ী ইংরাজ বণিকগণ উড়িষ্যা দেশের সর্বস্থানেই বাণিজ্যদ্রব্য আমদানি রপ্তানি করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। অপরন্তু উড়িষ্যা মধ্যে যে কোন সুবিধাকর স্থানে কুঠি খুলিবার অনুমতিও তাঁহারা পাইলেন। তবে এই কড়ার রহিল, যাহাতে সম্রাটের প্রজাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় ইংরাজেরা সেইভাবে কুঠি বা বাণিজ্যাগার স্থাপন করিবেন। নবাবের অধীনস্থ কোন শাসনকর্তাই ইংরাজদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবেন না। করিলে, তাঁহাদের কৈফিয়ৎ ও রাজদণ্ডের অধীন হইতে হইবে। যদি কোন বিষয় লইয়া ইংরাজের ও সম্রাটের প্রজাগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে শাসনকর্তারা তাহা সরাসরি নবাবের গোচরে আনিবেন। তিনি তাঁহার নিজ দরবারে এরূপ মামলাসমূহের বিচার করিবেন। এতদর্থে ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে এই আদেশ বা ছাড়পত্র স্বাক্ষরিত হইল।

৪ঠা মে। নবাব আমাদের প্রধান বণিককে (মিঃ কার্টরাইট) এক জবর খানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। মির্জা মমিনের কাছেই (Mersey Momiene)[১] অবশ্য এ খানার সওগাদ আসিল। সে দিনের দরবারে যে আমির আমাদের শত্রু পর্টুগীজদের সপক্ষে দুই চারি কথা কহিয়াছিলেন, পর্টুগীজদের কার্যপ্রণালীর সমর্থন করিয়াছিলেন, তিনিও আমাদের উপর অতি প্রসন্ন হইয়া এক বস্তা চিনি, একবোতল উৎকৃষ্ট মদিরা ও নানাবিধ দেশীয় মিষ্টান্ন প্রভৃতি স্বয়ং সঙ্গে লইয়া আসিলেন। মিঃ কার্টরাইটকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সেদিনকার দরবারে আমি যে প্রতিকূলতা করিয়াছিলাম, সে কথা আপনারা ভুলিয়া যান। ইংরাজ কোম্পানির উপকার করিতে এখন আমি সর্বতোভাবে প্রস্তুত।" এই আমিরটি বালেশ্বরের (Bollasoriye) শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার নাম মীরকাশেম (Mercossem)। আমরা বালেশ্বরের দিকে যাত্রা করিব শুনিয়া তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন।

৫ই মে। (১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দ) নবাবের আহ্বানক্রমে আমরা পুনরায় তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের সেই দিন পরোয়ানা বা বাণিজ্যসম্বন্ধে আদেশপত্র প্রদান করিলেন। এই আদেশপত্রের বলে আমরা তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশসমূহে অবাধ বাণিজ্যের অধিকারী হইলাম।

৬ই মে। (১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দ) আজ নবাব ইংরাজদিগকে তাঁহার সভায় আহ্বান করিয়া

১. ব্রুটন এ দেশের ভাষানভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তিনি তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তে নামগুলি যেরূপ বানান করিয়া গিয়াছেন আমরা বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজীতে অবিকল তাহাই দিলাম।

একটি উপাদেয় ভোজ দিলেন। নবাবের মাথার উপরে যে মখমলের চন্দ্রাতপখানি ছিল—তাহা চারিবর্ণের। এই দরবারে আমাদের প্রধান বণিক ও দলপতি মিঃ কার্টরাইট এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ সম্মানের খেলাৎরূপে প্রাপ্ত হন। পরদিন আমরা আবার রাজসভায় যাই। যাহাতে নবাবসাহেবের অধীনস্থ স্থানসমূহে, আমরা অবাধে ভ্রমণ করিতে পারি তাহার জন্য আর একখানি ছাড়ও আমরা এই দিনে পাইলাম। দেখিলাম নবাব একটি যুদ্ধের আয়োজনে বড়ই ব্যস্ত। তাহা হইলেও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হইল না।

৮ই মে। আমরা নবাবের নিকট বিদায় লইয়া গন্তব্যপথে যাত্রা করিলাম।

উপরে আমরা ব্রুটেনের রোজনামচা হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা বিবৃত করিলাম, তাহা হইতে পাঠক জানিতে পারিবেন, ইংরাজ বণিকগণ কতকষ্টে সর্বপ্রথমে বঙ্গপ্রদেশভুক্ত উড়িষ্যার মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপারের ছাড় ও স্বত্ব লাভ করেন। এই উড়িষ্যার বাণিজ্যস্বত্ব লাভই ইংরাজের বঙ্গের বাণিজ্যের প্রথম সোপান। এজন্য আমরা আবার ব্রুটনের কাহিনী অনুসরণ করিতেছি।

মিঃ ব্রুটন বলিতেছেন, "মালকান্দির রাজসভায় যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা আমি সরলভাবে বলিয়া গেলাম। এক্ষণে নবাব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। নবাব এই পাষাণ প্রাচীরময় দুর্গমধ্যে দরবারাদি করিলেও এবং এই দুর্গমধ্যে অসংখ্য প্রাসাদকক্ষ বর্তমান থাকিলেও তিনি এতন্মধ্যে না থাকিয়া রাত্রিতে স্বতন্ত্র তাঁবুতে অবস্থান করিতেন। এই তাঁবুর মধ্যে তাঁহার বিশ্বাসী অনুচরবর্গ, সেনা ও সেনাপতিগণ ভিন্ন আর কেহই থাকিতে পারিত না। উড়িষ্যার স্বাধীন হিন্দু নৃপতি মুকুন্দদেবের পরিত্যক্ত প্রাসাদে নবাব যে রাত্রিযাপন করিতেন না, তাহার কারণ এই, তাঁহার মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে অপরের ব্যবহৃত রাজপুরী কখনও মোগল শাসনকর্তার আরামকক্ষে পরিণত হইতে পারে না। নবাবের নৈশশিবিরে তিন শত রমণী বাস করিতেন। তাঁহাদের সকলেই সদ্বংশজাত।[১]

৯ই মে। নবাবের রাজসভা হইতে বিদায় লইয়া আমরা সমস্ত জিনিস পত্র বাঁধিয়া কটকাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ১০ই তারিখের অপরাহ্নে আমরা হরহরাপুরে (হরিহরপুর) উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমাদের কোন আশ্রয়স্থান ছিল না, কাজেই আমরা আমাদের দলের মধ্যে যে দ্বিভাষী ছিল, তাঁহার বাটিতেই সে রাত্রে রহিলাম। আমাদের আগমনবার্তা নগরের শাসনকর্তাকে জানাইয়া ফারমান ও ছাড়পত্রখানি তাঁহাকে দেখাইলাম। শাসনকর্তা সেই ফারমানখানিকে মোগলসম্রাটের হুকুমনামা ভাবিয়া, দুই তিনবার সম্মানের সহিত মস্তকে স্পর্শ করিলেন। তৎপরে প্রসন্নভাবে আমাদিগকে বলিলেন, "যখন বাদসাহী ফারমান আপনাদের সঙ্গে তখন আমি আপনাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিব।" আমরা সেই শাসনকর্তাকে কিছু নজর উপহার দিলাম।

১২ই মে। মিঃ কলি ও অন্যান্য যে সব সহযাত্রীকে আমরা পশ্চাতে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের সকলেই এই স্থানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। আমরা জিনিসপত্র রাখিবার জন্য একটি বাড়ি ভাড়া লইলাম। ইহাই আমাদের অস্থায়ী আশ্রয়স্থান হইল।

হরিহরপুর সহরটি ছোট হইলেও বেশ জাঁকালো। অনেক লোকজন এখানে বাস করে। নগরটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ছয়-সাত মাইল। এখানে অনেক ব্যবসায়ী আছেন। বাজারে নানাবিধ

১. Although the Palace of the Nabob be so large in extent and so magnificent in structure, yet he himself will not lodge in it but every night he lodgeth in tents with his most trusty servants and guards about him. For it is an abomination to the Moghals (which are whitemen) to rest or sleep under the roof of a house that another man hath built for his own house. And therefore he was building a palace which he proposed should be a fabric of rest and future remembrance of his renown ; he likewise keepeth three hundred women who are all of them the daughters of the best and ablest subjects that he hath.—Bruton's *Narrative* (Wilson). পাঠক! ইহা হইতেই অনুমান করিয়া লউন, সেকালের একজন প্রাদেশিক মোগল শাসনকর্তা কিরূপভাবে দ্বিতীয় বাদসাহের ন্যায় ঐশ্বর্যময় জীবনযাপন করিতেন।

মালপত্রও যথেষ্ট। এই নগর তন্তুবায়প্রধান স্থান। সহরে তিনহাজার তাঁতি বাস করে। কাপড়-চোপড় এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

১৪ই মে। অদ্য আমাদের দলের কয়েকজন সহর পরিভ্রমণে গিয়া বাদসাহের প্রতিনিধি প্রদত্ত ফারমানের বলে বসবাসের জন্য এক ভূমিখণ্ড নির্ধারিত করিয়া আসিলেন।

১৫ই মে। অদ্য আমরা জনমজুর সংগ্রহ করিয়া আমাদের দখলীভূত জমিটুকু মাপ করিলাম এবং ইহার উপর নূতন কুঠির ভিত্তিস্থাপন করিলাম। যাহাতে গৃহনির্মাণকার্য শীঘ্র হইয়া যায়, তাহারও বন্দোবস্ত করা হইল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে এত বৃষ্টি হইল ও আমাদের মিস্ত্রিরা যতখানি গাঁথিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এমনভাবে ধুইয়া গেল যেন ইতিপূর্বে তথায় কোন কিছুই করা হয় নাই।

১৬ই জুন। আমাদের অগ্রণী মিঃ কার্টরাইট তাঁহার দুইজন সঙ্গীকে লইয়া বালেশ্বর (ব্রুটন লিখিয়াছেন Ballazary) যাত্রা করিলেন।[১] তাঁহার মনের ইচ্ছা, বালেশ্বর হইতে তিনি খাস বঙ্গদেশে প্রবেশ করিবেন।

ঠিক এই সময়ে বিলাত হইতে 'সোয়ান' বলিয়া একখানি জাহাজ মসলীপত্তনে উপস্থিত হয়। সোয়ান অনেক মালপত্র আনিয়াছিল। মসলীপত্তনের কর্তারা যখন সংবাদ পাইলেন, উড়িষ্যার মধ্যে আমরা বাণিজ্যাধিকার লাভ করিয়াছি, তখন তাঁহারা বড়ই আনন্দিত হইলেন। মসলীপত্তনের ফ্যাক্টর তখনই এক মন্ত্রণাসভার অধিষ্ঠান করিয়া স্থির করিলেন, যে সোয়ান বিলাত হইতে আসিবার পথে যে সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহা বঙ্গদেশে বিক্রয়ের চেষ্টা করা হইবে। তখন পারস্য, আরব, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দর ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাণিজ্যদ্রব্যের আদান প্রদান জন্য চাউল, চিনি, মাখন, গমল্যাক্ (ল্যাক্) রেশম, রেশমীবস্ত্র, স্যাশ্ (পাগড়ীর কাপড়), আলিজা (পাঁচগজ লম্বা রেশমী কাপড়), ছিট, সাদাকাপড় প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্যরূপে নানা দেশে ক্রীত ও বিক্রীত হইত।

মসলীপত্তন হইতে যাত্রা করিয়া সোয়ান জাহাজ হরিশপুরে পেঁৗছিল। ইংরাজগণ জাহাজের উপস্থিতি জ্ঞাপনের জন্য সমুদ্রবক্ষ হইতে তিনবার তোপধ্বনি করিলেন। কিন্তু পূর্বকথিত ফ্যাক্টরগণ হরিহরপুরে ছিলেন। এজন্য সোয়ানের কর্মচারীরা তাঁহাদের তোপধ্বনির কোন উত্তরই পাইলেন না। কোন সংবাদ না পাইয়া সোয়ানের কাপ্তেন পরদিন প্রভাতে হরিশপুর হইতে নঙ্গর তুলিয়া বালেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন ও সেস্থানে তাঁহারা মিঃ কার্টরাইটের সন্ধান পান।[২]

কিন্তু সোয়ান জাহাজের মালপত্র দুর্ভাগ্যক্রমে কোন স্থানেই বিক্রীত হইল না। সোয়ান প্রচুর পরিমাণে বনাত, সীসা ইত্যাদি জিনিসের বোঝাই লইয়া আসিয়াছিল। বালেশ্বরে ও তাহার নিকটবর্তী বন্দরসমূহে তাহার খরিদ্দার জুটিল না। এক বৎসরকাল সেই মাল অবিক্রীত অবস্থায় বালেশ্বরে পড়িয়া রহিল। সেকালের ইংরাজ নাবিকগণ প্রবৃত্তি সংযমের মর্যাদা জানিতেন না। তাঁহাদের অনেকে নানাবিধ ফলমূল ও বালেশ্বরজাত 'আরক' নামধেয় মদিরা পানে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। জ্বর, কলেরা রোগেও অনেকে মরিল। টমাস কীল জ্বরে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। উড়িষ্যার মৃত্তিকায় তাঁহার সমাধি হইল।

উড়িষ্যায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া দৈবপ্রতিকূলতাবশে ইংরাজদের নানা বিপত্তি ঘটিল। স্থানীয় শাসনকর্তাদের দ্বারা তাহারা আদৌ উৎপীড়িত না হইলেও তাহাদের অনেকেই রোগে ভুগিয়া উড়িষ্যার বালুকাময় মৃত্তিকাগর্ভে সমাধিরচনা করিয়া লইল। এক বৎসরের মধ্যে পাঁচ ছয়জন ফ্যাক্টর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 'সোয়ান' জাহাজের পর 'টমাস' বলিয়া আর এক-খানি জাহাজ বাণিজ্যদ্রব্যাদি লইয়া পুনরায় উড়িষ্যার বন্দরে উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে জল-হাওয়ার দোষে টমাস পোতবক্ষ মধ্যে চারিজন নাবিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং জাহাজের অনেক

১. ব্রুটন যে ভাবে নামগুলির বানান করিয়াছেন আমরা সেইরূপই রাখিলাম।
২. Bruton's *Voyages*. Hedges' *Diary* Vol III p. 179. (C. R. Wilson).

মাঝি-মাল্লা ভয়ানকরূপে পীড়িত হইয়া পড়ে।[১]

বিধাতার একান্ত ইচ্ছা যে কর্মবীর ইংরাজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করিবেন। এই বঙ্গদেশ হইতেই তাঁহাদের সৌভাগ্যসূচনা হইবে, এই শস্যশ্যামলা, ফলজলপূর্ণা বঙ্গে তাঁহারা রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিবেন, একদিন সমগ্র ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইবেন, কাজেই তাঁহাদের উড়িষ্যার বাণিজ্য সম্বন্ধে নানাবিধ দৈববিপত্তি উপস্থিত হইল। এই সময়ে আবার মগ জল-দস্যুরা উড়িষ্যার উপকূলে ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহারা ইংরাজদের কয়েকখানি বোট আটক করিয়া বাণিজ্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে। ইহার উপর পর্টুগীজ ও দিনেমারেরাও ইংরাজদের প্রতিকূলতা আরম্ভ করিল। এই সমস্ত অসুবিধার সহিত ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কার্ট-রাইট বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। হরিহরপুর ও বালেশ্বরে তাহাদের যে কুঠি স্থাপিত হয়, তাহাই কেবল বর্তমান রহিল। কার্টরাইট পুরী ও হিজলীতে দুইটি নূতন বাণিজ্য কুঠি খুলিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। ঘটনাবশে হরিহরপুর যে নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, তাহাতে ক্রমশ চর পড়িতে লাগিল।

কয়েক বৎসর ধরিয়া ইংরাজেরা উড়িষ্যার কুঠি লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মান্দ্রাজে উড়িষ্যার কুঠির বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে ক্রমাগত অভিযোগ পত্র যাইতে লাগিল। ইহার ফলে, মান্দ্রাজ হইতে একজন অধ্যক্ষ প্রেরিত হইলেন। তিনি বহু অনুসন্ধানের ও চিন্তার পর বালেশ্বর সহরেই একটি নূতন বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন। এই কুঠির কর্মচারী সংখ্যাও বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তিনি যতদিন বালেশ্বরে ছিলেন, কর্মচারীরা ততদিন কোন বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিল না বা অবাধ্যতা দেখাইল না। কিন্তু পূর্বোক্ত কর্মচারী মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিবার পরই বালেশ্বরের ইংরাজকর্মচারিগণ কুঠির কার্যের অসুবিধা সম্বন্ধে নানা অভাব অভিযোগ করিতে লাগিলেন। কুঠিগুলির 'বামন গেলো ঘর' গোছ অবস্থা দাঁড়াইল। আর এই সমস্ত বিশৃঙ্খলতা ও অভিযোগের কথাও সঙ্গে সঙ্গে মান্দ্রাজের ও বিলাতের কর্তাদের নিকট পেঁছিল।

১. Hedges' *Diary*, Vol III, p. 181.

সপ্তম অধ্যায়

ইংরাজদিগের বালেশ্বর ত্যাগ ও খাস বাঙ্গলায় প্রবেশ
হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন : ১৬৫০-১৬৫৭

ইংরাজের উড়িষ্যায় বাণিজ্যের অসুবিধা—বালেশ্বর ত্যাগ—খাস বঙ্গদেশে প্রবেশ, বাণিজ্যস্বত্বলাভ—দৈবপ্রেরিত সুযোগ—সাহজাহান বাদসাহের কন্যা সাহাজাদী জাহানআরার দৈববিপত্তি—ডাক্তার বৌটনের বাদসাহ-কন্যার চিকিৎসা জন্য আগরায় গমন—সম্রাট পুত্র সাহসুজার সহিত বৌটনের পরিচয়—হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য ব্রিজম্যান ও স্টিফেন্সের চেষ্টা। বৌটনের চেষ্টায় বঙ্গে অবাধ বাণিজ্যের স্বত্বলাভ—হুগলীতে প্রথম ইংরাজ কুঠিস্থাপন—হুগলীর কুঠিতে নানাবিধ বিশৃঙখলা—প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ কোম্পানি—বেনামী বাণিজ্য—বিলাতের কর্তাদের চেষ্টায় বিশৃঙখলার প্রতিকার—সাহজাহানের মৃত্যু—বিরাট রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্বসূচনা—সম্রাট পুত্রগণের সিংহাসনলাভের জন্য আত্মবিগ্রহ—ঔরঙ্গজেবের জয়লাভ—'আলমগীর' উপাধি ধারণ ও সিংহাসনে অধিরোহণ—সাহজাহানের মৃত্যু—মীরজুমলার বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ—এই রাষ্ট্রপরিবর্তনে ইংরাজবণিকদের বিপত্তি—হুগলীর ফৌজদারের অত্যাচার—মীরজুমলার সহিত ইংরাজের বাৎসরিক তিন সহস্রমুদ্রা রাজস্বদানের বন্দোবস্ত—কুচবিহার ও আসামে বিদ্রোহ—মীরজুমলার মৃত্যু—নবাব সায়েস্তা খাঁর বঙ্গে আগমন—ইংরাজ বণিকের প্রতি নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রীতি—সুবিধাকর বাণিজ্য স্বত্ব দান—বাঙ্গালার ইংরাজ ফ্যাক্টরিতে পুনরায় গোলযোগ—বিলাত হইতে স্ট্রেনশাম মাস্টারের গবর্ণর পদ লাভ—স্ট্রেনশামের বঙ্গে যাত্রা—তাঁহার সময়ে বঙ্গের ইংরাজ বাণিজ্যের অবস্থা—হিজলী দুর্গ—বেতোড় থানা দুর্গ (মেটিয়া বুরুজ)—প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রাম বরাহনগর ও চন্দননগরে দিনেমার ও ফরাসী বণিকদের কুঠি—বরাহনগর নাম হইবার কারণ—চুঁচুড়ার দিনেমার ফ্যাক্টরি—হুগলী ঘোলঘাট—সে-কালের কাশিমবাজার—কাশিমবাজারের বাণিজ্য—কাশিমবাজারের কুঠির অভ্যন্তরীণ বিশৃঙখলা—রঘু পোদ্দার ও অনন্তরামের ব্যাপারে মাস্টার কর্তৃক তদন্ত—কাশিমবাজার বাণিজ্যকুঠির মধ্যে বিশৃঙখলা—মালদহে প্রথম কুঠি স্থাপন—স্ট্রেনশাম মাস্টারের মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন—তিন বৎসর পরে পুনরায় বঙ্গে আগমন—কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ভিনসেন্ট সাহেব—তাঁহার আমলে ইংরাজ বাণিজ্যের উন্নতি—ভাগীরথী বক্ষে ইংরাজের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ 'ফ্যাকনের' প্রবেশ—জাহাজের কাপ্তেন স্টাফোর্ড সম্বন্ধে একটি রহস্যজনক ঘটনা—কার্যসূত্রে ইংরাজের সহিত বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম পরিচয়—রতন সরকারের সম্বন্ধে রহস্যকর ঘটনা—সেকালের বাঙ্গালীর ইংরাজীজ্ঞানের নমুনা।

বালেশ্বরে ইংরাজ কুঠির কর্মচারীদের অবস্থা যখন এইরূপ বিশৃঙ্খল এবং তাঁহারা বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া খাস বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তখন আরও কয়েকটি ঘটনা, ইংরাজ-দিগকে বালেশ্বর ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। এই সময়ে মান্দ্রাজ ও মসলীপত্তনের বাণিজ্য ক্রমে হতশ্রী হইয়া পড়িতেছিল। অপরন্তু ঐ সকল প্রদেশে দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ক্রমাগত আত্মদ্রোহ-জনিত যুদ্ধবিগ্রহে এবং করাল দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবে করমণ্ডল উপকূলের ইংরাজ-বাণিজ্য অতি শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইল।

এই সকল কারণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষেরা, করমণ্ডল উপকূল ও বালেশ্বরের বাণিজ্যের উপর নির্ভর না করিয়া খাস বঙ্গদেশে বাণিজ্য বিস্তারে মনোযোগী হইলেন। বিধাতা

তাঁহাদের প্রতি সদয় হইয়া এ সম্বন্ধে একটা সুবিধাও ঘটাইলেন।

কোম্পানির 'হোপওয়েল' জাহাজের ডাক্তার ছিলেন—গেব্রিয়েল বোটন।[১] এই বোটন সাহেব সেকালের ইংরাজদের মধ্যে আত্মত্যাগের আদর্শ। তাঁহার অমানুষিক স্বার্থত্যাগের জন্যই তিনি স্বজাতির যথেষ্ট উপকার করিতে সমর্থ হন। বোটন ইচ্ছা করিলে এই ঘটনা উপলক্ষে নিজের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি স্বজাতির স্বার্থ ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা করেন নাই। এজন্য তিনি ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন।

ব্যাপারটি কি, তাহা বলিতেছি। সাহজাদী জাহানআরা দিল্লীশ্বর সাহজাহানের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা। পিতার কক্ষ হইতে একদিন গভীর রাত্রে, নিজ কক্ষে প্রত্যাগমনকালে কক্ষগাত্রস্থ দীপালোকে তাঁহার ওড়নায় একাংশে আগুন ধরিয়া যায়। যেস্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে সেস্থানে চীৎকার করিবারও কোন উপায় ছিল না। পাছে রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত চীৎকার পুরুষের কর্ণগোচর হয়, আর সে চীৎকার ধ্বনি রঙ্গমহলের বাহিরে যায়, এই ভয়ে নারীসম্ভ্রম রক্ষার জন্য সেই বিপদময় জ্বলন্ত অবস্থাতেই সাহজাদী জাহানআরা নিজকক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। এই দুর্ঘটনায় তাঁহার জীবনের কোন আশাই ছিল না।[২] তখন বোটন সাহেব সুরাটে ছিলেন। সম্রাট-কন্যার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে জোর তলব হয়। সুরাটের মোগল শাসনকর্তা আসালত খাঁ ডাক্তার বোটনকে আগরায় পাঠাইয়া দেন। ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে, বোটন আগরা রাজধানীতে উপস্থিত হন। স্বভাবগুণে ও চিকিৎসা-পটুতায় বোটন সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়েন।

আগরায় অবস্থানকালে সম্রাটপুত্র সাহসুজার সহিত তাঁহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়। ইহার পর সাহসুজা, বাঙ্গলার শাসনকর্তা হইয়া আসেন।[৩] সে সময়ের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারা যায়, বোটন সাহেব রাজমহলে সাহজাদা সুজার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন।

এদিকে বিলাতের কর্তাদেরও মতি-গতি ফিরিল। তাঁহারা যখন বুঝিলেন, দিনেমারেরা গাঙ্গ্য-প্রদেশে বাণিজ্য দ্বারা যথেষ্ট ফল পাইতেছে, তখন তাঁহাদের মনে বঙ্গদেশে ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যাগার খুলিবার বাসনা অতি প্রবল হইয়া উঠিল। এই ভাবিয়া তাঁহারা বিবিধ বাণিজ্য-দ্রব্যপূর্ণ 'লিয়নেস্' (Lyoness) নামক একখানি জাহাজ ভারতে প্রেরণ করিলেন।

২২শে আগস্ট তারিখে (১৬৫০) 'লিয়নেস্' মান্দ্রাজে আসিয়া নোঙ্গর করে। মান্দ্রাজ ফ্যাক্টরির কর্তারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, নবাগত জাহাজখানিকে সরাসর বঙ্গদেশের মধ্যে হুগলীতে না পাঠাইয়া প্রথমে বালেশ্বরে নঙ্গর করান হউক। জাহাজ বালেশ্বরেই থাকিবে. কেবল কয়েকজন ফ্যাক্টর হুগলী পর্যন্ত গিয়া তত্রাকার সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া যথাবিহিত কর্তব্য করিবেন। দিনেমার জলদস্যুদের হস্তেও পথিমধ্যে বিপদ ঘটা খুব সম্ভব, এইজন্য জাহাজখানিকে অতি সাবধানতার সহিত পরিচালিত করিতে হইবে। সকলেই এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ করিলেন। ব্রুক হাভেন নামক একজন দক্ষ ইংরাজের অধীনতায় কয়েকজন ফ্যাক্টর 'লিয়নেস' জাহাজকে লইয়া বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সোরা, চিনি ও রেশম, এই তিনটি তখনকার কালে বঙ্গদেশের প্রধান লাভকর বাণিজ্য-দ্রব্য।

১. Surgeon Boughton সম্পর্কিত কাহিনী সম্পর্কে ঐতিহাসিক মহলে সাম্প্রতিকতম মন্তব্য—Lastest research proves beyond doubt that Boughton got the concession of free trade *for himself* and not for the English Company in general—see, 'The Myth of the English East India Company Trading privileges in Bengal, 1651-1668, by Dr. S. Chaudhuri, ***Bengal Past and Present, Sir J. N. Sarkar Centenary*** Vol. 1970.

২. সম্রাটকন্যার এই দুর্ঘটনার তারিখ লইয়া অনেক গোলমাল আছে। মুসলমান ইতিহাস লেখকদের মতে, এই ঘটনা ১৬৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দের। বোটন ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে সুরাট হইতে প্রেরিত হন। উক্ত ইতিহাস-লেখকেরা আরও বলেন, যে লাহোর হইতে একজন দক্ষ হাকিম আসিয়া সম্রাটকন্যার দগ্ধক্ষতের চিকিৎসা করেন। বোটন বিলম্বে পৌঁছিয়াছিলেন। এ মত বিভিন্নতা সত্ত্বেও, বোটন যে দিল্লীর সম্রাট-দরবারে একটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।

৩. সাহজাদা সুজার বাংলার সুবাদার ছিলেন প্রথমে ১৬৩৯ খ্রী. হইতে ১৬৪৭ খ্রী., দ্বিতীয়বার ১৬৪৮-১৬৫৮।

কাপ্তেন ব্রুক হাডেন বালেশ্বরে পেঁৗছিয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের এই কয়টি দ্রব্যের ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রচলন সম্বন্ধে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন এবং তাহাদিগকে সময়োপযোগী নানাবিধ উপদেশ দিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।

এই উপদেশানুবর্তী হইয়া ব্রিজম্যান ও স্টিফেন্স নামক দুইজন ফ্যাক্টর ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য যাত্রা করেন। গেব্রিয়েল বোটন সাহেবও উন্মুক্তনেত্রে ইংরাজ বণিকদিগের কার্য-কলাপ লক্ষ্য করিতে ছিলেন। কারণ, তিনি ইতিপূর্বেই তিন হাজার মুদ্রা নজরানা দিয়া সম্রাট-পুত্র সাহসুজার নিকট হইতে বঙ্গদেশের সর্বত্রই বিনাশুল্কে ইংরাজ-দের বাণিজ্যের অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[১] এই অনুমতি পত্রের বলে ইংরাজগণ বাঙ্গলার সর্বত্রই অবাধ-বাণিজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। হুগলী ও বালেশ্বরে তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে সোরা ক্রয় করিতে পারিবেন, এরূপ আদেশও ইহাতে থাকে।

ইহার পর সেকালের কাগজপত্র হইতে যাহা কিছু জানা যায়, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে। ইংরাজ স্থাপিত হুগলীর প্রথম বাণিজ্যাগার নানা কারণে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সকল দিকেই ঘোর বিশৃঙখলা ও গোলযোগ। বেগতিক দেখিয়া, মান্দ্রাজের কর্তারা বাঙ্গালা হইতে দপ্তর তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার লিপিবশে এই সময়ে ইংলণ্ডে ঘোরতর রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইল। ইংলণ্ড তখন সাধারণতন্ত্র-বিধায়ক ক্রমওয়েলের শাসনাধীন। প্রজাতন্ত্র শাসনের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব। কোম্পানির বিলাতের কর্তারা সুযোগ বুঝিয়া ক্রমওয়েলের নিকট তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় চার্টারটি নূতন করিয়া লইলেন।[২]

১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে এই সমস্ত বিশৃঙখলার প্রতিকারের উপায় হইল। ইংলণ্ডীয় রাজ-স্বত্বাধীনে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, ইতিপূর্বে সর্বপ্রথমে গঠিত হইয়াছিল তাহারা ব্যতীত আরও অনেকে নূতন কোম্পানি গড়িয়া ভাগ্য-পরীক্ষার্থে ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্রমওয়েলের আমলে বিলাতের অধ্যক্ষেরা তাঁহার নিকট নূতন 'চার্টার' প্রাপ্ত হন। ক্রমওয়েলও ইহাঁদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। যাহাতে ইংরাজ কোম্পানি দিনেমার ও পর্টু-গীজদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয়গণের চক্ষে হেয় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহার প্রতিকার জন্যও তিনি সুব্যবস্থা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিলাতে আটঘাট বাঁধিয়া কোম্পানির কর্তারা তাঁহাদের ভারতীয় ফ্যাক্টরিগুলির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। নানাস্থানের ফ্যাক্টরেরা বেনামী বাণিজ্য, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দ্বারা কোম্পানির যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিল। বিলাতের কর্তারা এতৎ প্রতিকারার্থে এক বিধান করিয়া পাঠাইলেন, 'কোম্পানির কোন কর্মচারীই বেনামে বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিতে পারিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীদের অর্থলোলুপতা দূর করিবার জন্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল, এই বর্ধিত হারে বেতন গ্রহণের পূর্বে, তাঁহাদিগকে এক সিকিউরিটি বণ্ড বা জামিননামায় স্বাক্ষর করিতে হইবে। তাঁহারা কোম্পানির ভারতীয় কুঠিতে যে দিন যে কাজ করিবেন, তাহার রোজনামচা বা ডায়ারি করিয়া তাহার নকল বিলাতের কর্তাদের গোচরার্থে পাঠাইবেন। কোম্পানির ভারতীয় বাণিজ্যকুঠি

১. 'The most important of these was *nishan* or sealed permit granted in 1651 by Prince Shuja, the Governor of Bengal, by which the English were permitted to have freedom of trade in Bengal without any custom duties and without any restrictions in return for an annual payment of Rs.3,000 only—S. Bhattacharya, ***East India Company and Economy of Bengal***, p. 12.

২. হুগলীর বাণিজ্য-কুঠির অবস্থা বস্তুতই এই সময়ে অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। মান্দ্রাজ কাউন্সিল বিলাতে যে পত্র লেখেন, তাহার একাংশ এই—'বাঙ্গলার ফ্যাক্টরেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। বাদসাহী ছাড় ও নিশান তাহাদের হস্তগত থাকায়, তাহারা নিজেরাই বেনামে ব্যবসা চালাইতেছে। ইহাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নির যথেষ্ট অর্থ ক্ষতি হইতেছে। গেব্রিয়েল বৌটন মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিধবা পত্নী একজন ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছেন। এই নবদম্পতি এক্ষণে একযোগে, কোম্পানির অধ্যক্ষগণের নিকট, বৌটনের প্রাপ্য আদায়ের জন্য এক দাবি উপস্থিত করিয়াছেন।'

সমূহের ফ্যাক্টরগণ সুরাটকুঠির অধীনস্থ হইবেন। বান্টাম, মান্দ্রাজ, পারস্য ও বঙ্গদেশে চারিটি বাণিজ্য-এজেন্সি স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত বালেশ্বর, কাশিমবাজার এবং পাটনা প্রভৃতি স্থানে "সব-এজেন্সি" স্থাপিত হইবে। শেষোক্ত কয়টি স্থানের কুঠি হুগলীর কর্তাদের অধীন থাকিবে।১

এই নূতন বিধানের বলে, ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারির ডেসপ্যাচ বা আদেশ-পত্র মতে, জর্জ গটন সাহেব হুগলীর প্রধান 'এজেন্ট' নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার একশত পাউণ্ড বা আধুনিক হিসাবে পনর শত টাকা বাৎসরিক বেতন ধার্য হয়। তাঁহার অধীনে চারিজন 'ফ্যাক্টর' রহিলেন। হপ্‌কিন্‌স বালেশ্বরের প্রধান এজেন্ট হইলেন। এই সময়ে কেনও কাশিমবাজারের প্রথম ফ্যাক্টর বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। চেম্বারলেন পাটনার নবস্থাপিত কুঠির কর্তৃত্ব লাভ করেন। আর কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা, জোব চার্নক, কাশিমবাজার কুঠির চতুর্থ সহকারীরূপে নিযুক্ত হন।

বিলাতের কর্তারা, বাঙ্গলায় ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠির এইরূপ একটা সুব্যবস্থা করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু এই সময়ে ভবিতব্যবশে ভারতেও এক মহা রাষ্ট্র-পরিবর্তন হইল। বঙ্গদেশেও সে পরিবর্তনের প্রবলস্রোত পৌঁছিল। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর, সম্রাট সাহজাহান মূত্রকৃচ্ছ রোগে পীড়িত হন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া ভীষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। ঔরঙ্গজেবই সর্বশেষে এই বিবাদে বিজয়লাভ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জুলাই২ ঔরঙ্গজেব 'আলমগীর' উপাধি ধারণ করিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইহার কয়েক মাস পরে আরাকানে সম্রাটের অন্যতম পুত্র ইংরাজ বণিক-দের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক, সাহসুজার শোচনীয় পরিণাম ঘটে এবং নূতন বাদসাহের আদেশে সেনাপতি মীরজুমলা বঙ্গদেশের শাসন-ভারপ্রাপ্ত হন।৩

স্থানীয় মোগল শাসনকর্তারা, এই বিপ্লবের সুযোগে ইংরাজবণিকদিগকে নানারূপ অসঙ্গত দাবি দাওয়ায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। হুগলীর ফৌজদার বলিয়া পাঠাইলেন, "সম্রাট সাহজাহানের রাজ্যচ্যুতির সহিত আপনাদের পূর্ব-গৃহীত সনন্দ ও নিশান সমূহের চলিত স্বত্ব লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগকে নূতনভাবে সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইংরাজ কোম্পানিকে বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্কাদি বাবত, বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব দিতে হইবে।" এই সঙ্গে বালেশ্বরের মোগল-শাসনকর্তাও সমুদ্রোপকূলস্থ ইংরাজ জাহাজের উপর নঙ্গরি মাশুলের হার চড়াইয়া দিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে ভাগীরথী বক্ষে তখন বোম্বেটিয়া দস্যুদের বড়ই উৎপাত। তাহারা প্রচুর বাণিজ্য-দ্রব্য-পূর্ণ কোন নৌকা দেখিলেই সুবিধামত লুঠ করিয়া লইত। এই সমস্ত বিপত্তির উপর আর এক নূতন বিপত্তি ঘটিল। পাটনা হইতে সোরা বোঝাই লইয়া ইংরাজ কোম্পানির যে সব নৌকা আসিতেছিল, স্বয়ং মীরজুমলা সাহেব সে গুলিকে রাজমহলে আটক করিলেন। চারিদিক হইতেই ইংরাজেরা এই সময়ে ব্যতি-

১. এরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনও হইয়াছিল। কোম্পানির সেই সময়ের বিবরণে প্রকাশ—"ব্রিজম্যান ও তাঁহার বন্ধুগণ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সততা সম্বন্ধে কোম্পানির কর্তাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়। (In fact Bridgeman and his friends were acting irregularly and dishonestly). হিসাব নিকাশ করিতে বলায়, ব্রিজম্যান ও ব্লেক ভয়ে চাকরি ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ওয়ালিডি গ্রেভ্ নামক আর একজন ফ্যাক্টর হুগলী কুঠি ছাড়িয়া মান্দ্রাজে আসিতেছিলেন। তাঁহার নিকট কোম্পানির দরকারি কাগজ পত্র ও সেরেস্তা ছিল। তিনি পথিমধ্যে এই প্রয়োজনীয় কাগজগুলি হারাইয়া ফেলেন। ইহার মধ্যে সম্রাটপুত্র সাহসুজার ফারমান ছিল, সেখানিও খোয়া গিয়াছে।"

Hedges' *Diary*, Vol III. Danver's *Bengal its Chief Agents and Governors*. Bruce's *Annals* Vol I.

২. ঔরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণ উৎসব দুইবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, প্রথমে আগরা অধিকারের অব্যবহিত পরে ১৬৫৮ সালের ২১শে জুলাই, পরে খাজুয়ার যুদ্ধের পর ১৬৫৯ সালের জুন মাসে।

৩. মীর জুমলা বাংলার শাসনকর্তার পদে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে নিযুক্ত হন।

ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বাণিজ্যসূত্রে দেনা-পাওনার অনাদায়ী টাকার জন্য এই সময়ে ঘটনাবশে ইংরাজেরা একখানি মালপূর্ণ দেশীয় নৌকা আটক করিলেন। কথাটা বঙ্গেশ্বর মীরজুমলার কানে পেঁাছিল। মীরজুমলা হুগলীর কুঠির অধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন, "পত্রপাঠ আপনারা যে মহাজনী নৌকা আটক করিয়াছেন, তাহা খালাস করিয়া দিবেন। অন্যথায় আমি হুগলী আক্রমণ করিয়া আপনাদের উচ্ছেদ করিব ও বঙ্গদেশের সকল স্থান হইতেই ইংরাজ-বণিককে জন্মের মত বিতাড়িত করিব।" তখন ট্রিভিসা বলিয়া একজন ইংরাজ হুগলীর কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষদের আদেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা করিলে মান্দ্রাজের কর্তারা বলিয়া পাঠাইলেন, "মীরজুমলার সহিত বিবাদে কোন প্রয়োজন নাই, যে নৌকা তোমরা আটক করিয়াছ তাহা ছাড়িয়া দাও এবং সুবাদারের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা কর।" ট্রিভিসা সে যাত্রা এই ব্যবস্থায় মীরজুমলার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন এবং ইংরাজ কোম্পানিকে মোগল শাসন-কর্তার অভিপ্রায়মত বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা শুল্করূপে দিতে হইল।[১]

এত কষ্ট, এত পীড়ন, এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ইংরাজেরা হুগলী ও বঙ্গদেশের অন্যান্য বাণিজ্যাগারগুলি রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের পরম সৌভাগ্য যে, বঙ্গের হর্তাকর্তা-বিধাতা মীরজুমলা সাহেব আর একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া এসব ছোটখাট ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারিলেন না। কারণ, এই সময়ে কুচবিহার ও আসাম-সীমান্তে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। মীরজুমলা সেই বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজধানী রাজমহল ত্যাগ করিলেন। এই যুদ্ধান্তে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তিনি ঢাকায় ফিরিয়া আসেন এবং ঢাকাতেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

মীরজুমলার মৃত্যুর পর নবাব সায়েস্তা খাঁ বঙ্গদেশের গবর্ণর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

ইংরাজবণিকগণ সায়েস্তা খাঁর আমলে অনেকটা সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিলেন। তাঁহারা পূর্বপ্রথামত বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রাই বাণিজ্য-শুল্করূপে মোগল-সরকারে প্রদান করিতে বাধ্য রহিলেন। ইহার পর ১৬৭২ খৃীস্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরাজদের পূর্ব প্রাপ্ত বাণিজ্য স্বত্বাদির সমর্থন করিয়া আর এক নূতন আদেশ পত্র প্রচার করেন। তাহার সারমর্ম এই—

"এতদ্বারা বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তাদের আদেশ করা যাইতেছে যে ইংরাজেরা বালেশ্বর, পাটনা, কাশিমবাজার, হুগলী প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে তাঁহাদের মাল-পত্রাদি স্বচ্ছন্দে আমদানি রপ্তানি করিতে পারিবেন। যাহাতে এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয়, স্থানীয় মোগল-শাসনকর্তারা সে দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। যাহাতে তন্তুবায়গণ, সওদাগরগণ বা ব্যবসায়িগণ, ইংরাজ কোম্পানিকে ঠকাইতে না পারে, তদ্বিষয়েও সর্ব বিভাগের শাসনকর্তাদের দৃষ্টি থাকা উচিত। দিনেমারেরা যাহাতে বঙ্গের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য করিতে না পারে, তাহার সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্বে এক আদেশ প্রচার করিয়াছি। অপরন্তু ইংরাজগণ যাহাতে এ দেশে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারেন, স্থানীয় শাসনকর্তাগণ তাহার সুব্যবস্থা করিবেন। ভবিষ্যতে যেন এ বিষয়ে ইংরাজদিগের নিকট হইতে আমাকে কোন প্রকার অভিযোগ না শুনিতে হয়।"

এইরূপ সুবন্দোবস্তাদি হইলেও বাঙ্গলার নানাস্থানের ফ্যাক্টরিগুলির কাজকর্ম উত্তমরূপে চলিতে ছিল না। কোম্পানির বিলাতের কর্তাদের আদেশ ছিল, যে মান্দ্রাজের (ফোর্ট সেন্ট জর্জ) ফ্যাক্টরির প্রধান-কর্তা বা গবর্ণরকে, অধীনস্থ ফ্যাক্টরিগুলি প্রধান বলিয়া মান্য করিবেন। কোম্পানির বঙ্গীয় বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ, মান্দ্রাজের কর্তাদের হুকুমানুসারে পরিচালিত হইবে। কিন্তু হুগলী, বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানের ফ্যাক্টরেরা, এ সব কথা প্রায়ই কানে তুলিতেন না। তাঁহারা কেবল আত্মবিবাদ, বৃথা তর্কে প্রমত্ত হইয়া কোম্পানির লাভালাভের অনিষ্ট করিতে-ছিলেন। ইহা দেখিয়া বিলাতের কর্তারা মনে মনে ভাবিলেন, বিলাত হইতে একজন শক্ত লোক না পাঠাইলে ভারতীয় বাণিজ্যাগার সমূহের উন্নতি ও সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা অতি সুদূর-পরাহত।

১. Bruce's *Annals* Vol I, Stewart's *Bengal*. p. 189.

এইজন্য তাঁহারা বিলাত হইতে স্ট্রেনশ্যাম মাস্টার বলিয়া এক সুদক্ষ ইংরাজকে মান্দ্রাজের কুঠি সমূহের সর্বময় কর্তা করিয়া পাঠান।[১] ছয় বৎসর পূর্বে ইনি ইংরাজের সুরাট ফ্যাক্টরির গবর্ণররূপে যথেষ্ট যশ সঞ্চয় করিয়া বিলাতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

মাস্টারকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরগণ বিশদরূপে বুঝইয়া দিলেন—"বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার কুঠির কর্মচারিগণ অতিশয় যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আমাদের বেতনভোগী কর্মচারী হইয়াও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক রেশমের গুপ্ত-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ায় আমাদের যথেষ্ট অর্থ ক্ষতি হইতেছে। আপনি বঙ্গদেশে ও উপকূলবর্তী স্থানসমূহে এই গুপ্ত-বাণিজ্যের মূলোচ্ছেদ করিবেন। বিলাত হইতে আমরা যে সমস্ত মাল বিক্রয় জন্য ভারতে রপ্তানি করি, কিম্বা বঙ্গদেশ হইতে যে সকল মাল আমদানি হয় তাহার ক্রয়বিক্রয় সৌকর্যার্থে সুবিধাকর বন্দোবস্ত করিবেন। প্রত্যেক ফ্যাক্টরির মালপত্র ও হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তজ্‌বিজ্‌ করিবেন। ফ্যাক্টরদিগের মধ্যে কে কিরূপ চরিত্রের লোক, তাহারও এক কাগজ প্রস্তুত করিবেন। যাহাতে তাহারা বৃথা বিবাদবিসম্বাদ ও হিংসাদ্বেষ ত্যাগ করিয়া কোম্পানির কার্যে মনোযোগী হয়, তাহারও সদুপায় করিবেন। কাশিমবাজার কুঠিতে রঘু পোদ্দারের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহারও একটা তদন্ত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।"

এইরূপভাবে উপদেশ পাইয়া মাস্টার সাহেব ১৬৭৬ খৃস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি বিলাত ত্যাগ করেন। বিলাত ছাড়িবার সাত মাস পরে তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। জুলাই মাসে 'ইগল' নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া তিনি বালেশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার বঙ্গে আগমনের একখানি ডায়ারি বা রোজনামচা রাখিয়া গিয়াছেন। এখানি আজও বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত। এই রোজনামচা হইতে বঙ্গদেশের সম্বন্ধে প্রায় আড়াই শত বৎসরের পূর্বের কথা জানিতে পারা যায়। আমরা এই রোজনামচা হইতে পুরাতন স্থানসমূহ সম্বন্ধে কতক গুলি কথা পাঠকবর্গের গোচর করিতেছি।

এই সময়ে বঙ্গদেশের উপকূলে বালেশ্বর, মধ্যভাগে হুগলী ও কাশিমবাজার, উত্তরপূর্ব প্রান্তে পাটনা, সিংহিয়া,[২] পূর্ব প্রান্তে ঢাকা ইংরাজের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজমহলেও একটি ক্ষুদ্র এজেন্সি স্থাপিত হইয়াছিল।

বালেশ্বরের তীরভূমিতে ইগলকে ত্যাগ করিয়া মাস্টার একখানি এদেশীয় ক্ষুদ্র জাহাজে উঠিলেন। ইগল জাহাজ বালেশ্বর বন্দরেই নঙ্গর করিয়া রহিল। মাস্টারের ক্ষুদ্র তরণী সাগরসঙ্গমের পথে বঙ্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইল। এই মোহানার মুখে সেই সময়ে অনেক গুপ্তচড়া ছিল। তাহাতে অনেক নৌকার বিপত্তি ঘটিত। চড়াগুলি সাবধানে পার হইয়া মাস্টারের তরণী ভাগীরথীবক্ষে প্রবেশ করিল। মাস্টার লিখিয়াছেন, "জাহাজ নঙ্গর করিবার পর জেলেরা নানারকমের মাছ বিক্রয় করিতে আসিল। চারি পয়সার এত মাছ দিল যে তাহাতে প্রায় দশ জনের খোরাক হয়। এই স্থানে নদীর মোহানা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্বভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। মোহানার পশ্চিমে হিজলী দুর্গ। এই দুর্গ মোগল-সম্রাটের নির্মিত। হিজলীর নিকট বাদসাহী লবণের কারখানা ছিল। সুন্দরবন হইতে সংগৃহীত মধুচক্রসমূহ হইতে মোমও যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এগুলি মোগল-সম্রাটের একচেটিয়া ব্যবসা। নদীর এই স্থানের নাম 'রোগস্‌-রিভার' (Rogue's River), ইহা আরাকানি বোম্বেটিয়াদের প্রধান আড্ডা।

১. ইনি ১৬৭৭ খ্রী. হইতে ১৬৮১ খ্রী. মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। এঁর লেখা *Diaries* স্যর রিচার্ড টেম্পল দুইখণ্ডে ১৯১১ সালে প্রকাশিত করেন। কোম্পানির নির্দেশে ইনি ১৬৭৬ সালে বাংলার ইংরেজ কুঠিগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য আসিয়াছিলেন।

২. সিংহিয়ার অপর নাম লালগঞ্জ। গণ্ডকের পশ্চিম তীরে ইহার অবস্থান। কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্রে ইহা সিঙ্গি বলিয়া উল্লিখিত। এই সিংহিয়ার নিকটেই সোরার খনি ছিল। সোরা কোম্পানির একটি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। বেশীর ভাগ সোরা এইস্থান হইতেই সংগৃহীত হইত।

সায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক আরাকানি জলদস্যুদের ধ্বংসসাধনের পূর্ব্বে নদীর এই অংশ বিনা বিপদে অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ ছিল।

পরদিন মাস্টারের ক্ষুদ্র তরণী বেতোড়ে উপস্থিত হয়। এই বেতোড় হইতেই সরস্বতী নদীতে অতি পুরাকালে শত শত পর্টুগীজ জাহাজ বাণিজ্যার্থে সপ্তগ্রামের বন্দরে যাইত। তখন ইহার দুই দিকেই মোগলের থানা ছিল। এপারে বর্ত্তমান মেটিয়াবুরুজ ও ওপারে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের অধুনাতন আবাসবাটীর স্থান অধিকার করিয়া মোগলের থানা বা তাহার অপভ্রংশ 'থানা' নামক মৃৎদুর্গদ্বয় বর্ত্তমান ছিল। এই দুর্গ দুইটি বর্ত্তমান থাকায় পর্টুগীজ ও জলদস্যুরা ভাগীরথীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহার পরেই ভাগীরথীর দক্ষিণকূলে জঙ্গলাবৃত গোবিন্দপুর গ্রাম। শেঠ ও বসাকেরা এখানে বাস করায় গোবিন্দপুরের জঙ্গল অনেকটা পরিস্কৃত হইয়া আসিতেছিল। গোবিন্দপুরের দক্ষিণে আদিগঙ্গা এবং আদিগঙ্গার উপকূলে কালীতীর্থ। গোবিন্দপুরের নিকটেই কলিকাতা। কিন্তু তখন তাহা গভীর জঙ্গল সমাকীর্ণ।

মাস্টার তাঁহার গন্তব্য-পথের অনেক স্থলেই 'হলান্ডার্স' বা ডাচদিগের সৌভাগ্য চিহ্নের পরিচয় পান। বরাহনগরে উপস্থিত হইয়া তিনি ডাচদিগের শূকরের কারখানা দেখিতে পান। এইস্থানে বড় বড় শূকর বধ করা হইত এবং লবণ-জারিত করিয়া তাহা ইউরোপে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইত।[১] চন্দননগরেও তিনি ডাচদিগের একটি সুন্দর উদ্যানবাটী দেখিতে পান। ইহার পরেই ফরাসীদিগের ধ্বংসপ্রায় ফ্যাক্টরি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হয়।

চুঁচুড়াতে সে সময়ে ডাচদিগের প্রবল আধিপত্য। ডাচফ্যাক্টরি গুলি যেন সমুদ্রোপকূলস্থ ক্ষুদ্র নগরীর ন্যায় সদা হাস্যময়ী। সন্ধ্যার সময় তিনি হুগলী ঘোলঘাটে অবতীর্ণ হন। ইহার পর তিনি হুগলী হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হয়েন। এই উদ্যানবাটীতে বিশ্রামান্তে তিনি কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হন।

পাঁচদিন পরে কাশিমবাজারে উপস্থিত হইয়া, মাস্টার সাহেব ইংরাজ কুঠির মধ্যে প্রবেশ করেন। কাশিমবাজার তখন বাণিজ্যৈশ্বর্য্যে হুগলীর সমকক্ষ। মাস্টার সেই সময়ের কাশিমবাজারের যে বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহা এই— "কাশিমবাজার একটি ক্ষুদ্র সহর। দুই মাইল ইহার বিস্তৃতি। রাস্তাঘাট অতি কম চওড়া। বিশেষতঃ যেখানে বাজার আছে, সে স্থানের পথ এত অপ্রশস্ত, যে একখানি ক্ষুদ্র পালকিও সুবিধার সহিত যাতায়াত করিতে পারে না। অধিকাংশ গৃহই মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। দেয়াল মেঝে সবই মাটির। সকল বাড়ির পিছনে বা পার্শ্বে দুই চারিটি ক্ষুদ্র খাত আছে। এই জন্য এ স্থানটি বড়ই অস্বাস্থ্যকর। মৃত্তিকা অতি কোমল ও উর্ব্বর। কাষ্ঠ বড়ই দুর্ম্মূল্য। কাশিমবাজারের চারিদিকের ভূমিখণ্ডে তুঁতগাছের চাষ। এই তুঁতগাছের কচি পাতাই গুটিপোকার খাদ্য। এখানে যে রেশম উৎপন্ন হয় তাহা হরিদ্রাবর্ণের। কিন্তু কাশিমবাজারের রেশম ব্যবসায়ীরা কলার বাসনার ছাই দ্বারা, এই রেশমকে কাচিয়া পরিষ্কার করে। তাহা প্যালেস্টাইনের শ্রেষ্ঠ রেশম অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।"[২]

মাস্টার সাহেব সম্ভবতঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর কাশিমবাজারে উপস্থিত হন। কাশিমবাজার ফ্যাক্টরিতে পৌঁছিয়াই তিনি মুকসুদাবাদে মোগল শাসনকর্ত্তার নিকট তাঁহার পৌঁছান-সংবাদ প্রেরণ করেন এবং কাশিমবাজারে তিনি ছয় সপ্তাহের উপর কাল অবস্থান করিয়া কোম্পানির

১. অনেকে বলেন—বরাহনগরের চারিদিকে শূকরের বা বরাহের উৎপাত ছিল বলিয়া, ইহা 'বরাহনগর' আখ্যা-লাভ করিয়াছে। শূকরঘটিত এ কিম্বদন্তী যে একেবারেই অমূলক নহে, তাহা মাষ্টারের লিখিত কাহিনী হইতেই প্রকাশ। আমাদের বোধ হয়, বরাহনগরে ডাচদিগের এই বরাহ-মাংস জারণের কারখানা ছিল বলিয়াই, সম্ভবত ইহা বরাহনগর বা তদপভ্রংশে বরানগর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। স্ট্রেনশাম মাষ্টার ১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগর দর্শন করেন।

২. Tavernier's *Voyages*. Vol II.

ফ্যাক্টরির সম্বন্ধে নানাবিধ সুবন্দোবস্ত করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কোম্পানির কুঠির ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে একটা আন্তরিক সদ্ভাব ও বন্ধুত্বের ভাব খুব কম ছিল। এজন্য তাঁহার নিকট অনেক মামলা উপস্থিত হইল। ছোট খাট গোলমালগুলির মীমাংসা করিয়া তিনি রঘু পোদ্দারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। এ ব্যাপারটি বিলাতের কর্তাদের কানে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। রঘু পোদ্দার বহুদিন ধরিয়া কোম্পানির অধীনে খাজাঞ্জির কাজ করিয়া আসিয়াছে। কাশিমবাজার কুঠির তদানীন্তন অধ্যক্ষ ভিন্‌সেন্ট সাহেব রঘুকে কারাবন্ধ করেন। রঘু পোদ্দার কোম্পানির নিকট কিছু টাকা ধারিত, তজ্জন্যই এই অবরোধ। ভিন্‌সেন্ট সাহেব কার্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গেলে অনন্তরাম বলিয়া জনৈক ব্যক্তির উপর কারাবন্ধ রঘুর রক্ষার ভার ন্যস্ত হয়। এই অনন্তরাম কোম্পানির অধীনে দালালি করিত। অনন্তরামের সহিত রঘুর পূর্ব শত্রুতা ছিল। সে ভিন্‌সেন্ট সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগে, রঘুকে অত্যন্ত প্রহার করে এবং তাহাতেই রঘুর প্রাণবিয়োগ হয়। ইহাতে স্থানীয় অধিবাসীরা অতিশয় বিচলিত হইয়া উঠে। রঘু মোগল বাদসাহের প্রজা, কাজেই ব্যাপারটা মোগল-শাসনকর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এই ব্যাপার লইয়া সেই সময়ে একটা মহা হুলস্থুল বাধিয়া যায়। তেরটি হাজার টাকা গণিয়া দিবার পর ব্যাপারটি চাপা পড়ে। স্ট্রেনশাম মাস্টার প্রায় দুইপক্ষকাল ধরিয়া এ হত্যাব্যাপার সম্বন্ধে তদারক করেন।

এই অনুসন্ধান ব্যাপারের সময় কাশিমবাজারের কুঠির ইংরাজ কর্মচারিগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে মাস্টারের নিকট নানাবিধ অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। প্রকৃত তথ্যানুসন্ধান ব্যাপার ক্রমশ জটিল হইয়া দাঁড়াইল। মাস্টার সাহেব বাঙ্গলার ফ্যাক্টরিতে নূতন আগন্তুক মাত্র, কাজেই এই সমস্ত অভিযোগ ব্যাপারের কোন সূক্ষ্ম মীমাংসা হইল না। তবে মাস্টার কার্যক্ষেত্রে 'মাস্টারের' মত কাজ করিলেন। তিনি এই সব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্মচারীদের তিরস্কার করিয়া তাহাদের মধ্যে কর্তব্য বিভাগ করিয়া দিলেন। তাহাদের কৃত প্রত্যেক কার্যের রিপোর্ট যাহাতে মান্দ্রাজের সদর ফ্যাক্টরিতে যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই মালদহে নূতন ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যাগার স্থাপিত হইল। মালদহের এই নবস্থাপিত ফ্যাক্টরিটি লইয়া বাঙ্গলায় তখন ইংরাজের ছয়টি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইল। স্ট্রেনশাম মাস্টার বঙ্গের ইংরাজ কুঠিগুলির সম্বন্ধে নানাবিধ সুব্যবস্থা করিয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন করেন।

১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে, তিনি পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিন বৎসর পূর্বে তিনি বাঙ্গলার কুঠিগুলির যেরূপ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছিলেন, এবারে আসিয়া দেখিলেন তাহাদের যেন অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও কর্মচারিগণ তাহাদের স্বভাবদোষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভিন্‌সেণ্ট সাহেব তখনও কাশিমবাজারে বর্তমান। ভিন্‌সেণ্টকে তিনি স্থানচ্যুত করিলেন না বটে, কিন্তু যাহাতে কুঠিগুলির কার্যসমূহ উত্তমরূপে চলে তাহার সুবন্দোবস্ত করিলেন। কুঠির কর্মচারীদের পরিচালিত ও সংযত করিবার জন্য আরও কঠোর নিয়মাবলী প্রচলিত হইল। তখন কাশিমবাজারে ইংরাজের বাণিজ্যাগার স্থায়ীভাবে নির্মিত হয় নাই। মাস্টারই কাশিমবাজার কুঠির মৃৎকুটীরগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই স্থানে ইটের কোঠা করিয়া দেন।

ভিন্‌সেণ্ট লোক ভাল ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার আমলে বাঙ্গলায় ইংরাজবাণিজ্য বড়ই তেজে চলিতেছিল। ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে ৬৫ হাজার পাউন্ড মূল্যের বাণিজ্য দ্রব্য ইংরাজ-ফ্যাক্টরদের হস্তে সংন্যস্ত হয়। প্রয়োজন ঘটিলে তাঁহারা আরও কুড়িহাজার টাকার মালপত্র চাহিতে পারিবেন, এ বন্দোবস্তও হইল। এই অর্থদ্বারা রেশম, বাফ্‌তা, বৎসরে ছয়শত টন সোরা, উৎকৃষ্ট সাদা চিনি, সুতা, হরিদ্রা, মধুচ্ছ (মোম) প্রভৃতি কেনা হইত। ইহার দুইবৎসর পরে বিলাতের বাজারে ঢাকা ও মালদহের রপ্তানি মালের কাটতি অতি প্রবল হয়। তাহাতে কোম্পানিও আশাতিরিক্ত লাভবান হন। এই লাভ দৃষ্টে প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহারা রপ্তানি বাণিজ্যের

মূলধন একলক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত বাড়াইয়া দেন। ইহার ফলে বাঙলায় ইংরাজের বাণিজ্য খুব উন্নত হইয়া পড়িল। মান্দ্রাজ হইতে যে সমস্ত চালানি-মাল বিলাতে পৌঁছিত, তাহার চৌদ্দ আনা অংশ বঙ্গদেশের ফ্যাক্টরি হইতে প্রেরিত হইত। ১৬৮০ খৃীস্টাব্দের পুরাতন কাগজ পত্র হইতে জানা যায় যে, ফ্যাক্টরদের হস্তে এই সময়ে দেড় লক্ষ টাকা মূলধন রূপে ন্যস্ত হয়।

এতদিন ইংরাজের বাণিজ্য-জাহাজ সমূহ বালেশ্বর পর্যন্ত আসিত। ভাগীরথী বক্ষ বাহিয়া হুগলী প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিতে পারিত না অথবা নানা কারণে সাহসও করিত না। সন ১৬৭৯ খৃীস্টাব্দে, ইংরাজের প্রথম বাণিজ্য জাহাজ 'ফ্যাকন' সর্বপ্রথমে হুগলীতে উপস্থিত হয়। ইহা ইংরাজ কোম্পানির বণিক-জীবনের এক নূতন ঘটনা। কাপ্তেন স্ট্যাফোর্ড এই জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহাই ভাগীরথী-বক্ষ প্রবেশকারী ইংরাজের প্রথম বাণিজ্য-জাহাজ।

এই জাহাজ বর্তমান গার্ডেনরিচ বা মেটিয়াবুরুজে আসিয়া নঙ্গর করে। এই ফ্যাকন জাহাজের নঙ্গর-করা ব্যাপারের সহিত একটি রহস্যজনক গল্প জড়িত আছে। সে সময়ে গার্ডেন-রিচ বা মেটিয়াবুরুজে[১] বাণিজ্য-পোতাদির নঙ্গর করিবার বিশেষ সুবিধাকর স্থান ছিল। জাহাজের অধ্যক্ষ স্ট্যাফোর্ড সাহেব এ দেশের ভাষা জানিতেন না। তবে তিনি শুনিয়াছিলেন যে গোবিন্দপুরের শেঠ-বসাকেরা কিছু কিছু ইংরাজি বুঝিতে পারেন। কাজেই স্ট্যাফোর্ড গোবিন্দপুরে শেঠ-বসাকদের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিয়া অনুরোধ করেন, "আমাদের একজন দুবাসের বা দ্বিভাষীর প্রয়োজন, তাহাকে ত্বরায় পাঠাইয়া দিবেন।"

শেঠ-বসাকেরা 'দুবাস' কথাটার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া সাহেবেরা একজন ধোপা চাহিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে রতন সরকার নামক একজন ধোপাকে তাঁহারা সাহেবদের জাহাজে পাঠাইয়া দেন। রতন একটু আধটু ইংরাজি বুঝিত। সে কতকগুলি উপঢৌকন লইয়া ভদ্রলোকের মত পোষাক পরিয়া জাহাজের কাপ্তেনের সহিত দেখা করিল। রতন ধোপার সহিত ইংরাজিতে কথা-বার্তায়, কাপ্তেন সাহেব বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। রজক রতনই ইংরাজের প্রথম দ্বিভাষীর পদ লাভ করিলেন।[২]

এক্ষণে আমরা এই হুগলী ফ্যাক্টরির অবস্থা ও কোম্পানির তৎসাময়িক কর্মচারীদের সম্বন্ধে আরও দুই চারি কথা বলিব। আমরা এই সন্দর্ভে আড়াইশত বৎসর পূর্বের ইংরাজদের কথা বলিতেছি, পাঠক যেন একথাটি মনে রাখেন। এখনকার সহিত তুলনায়, সেই সুদূরবর্তী সময়ে, আকাশ পাতাল প্রভেদ ছিল। তখন মোগল এ দেশের অধিপতি। কোম্পানি বাহাদুর সামান্য ব্যবসাদার ও প্রজামাত্র। তাঁহারা এদেশের নানাস্থানে বাণিজ্যাগার স্থাপন করিয়া, এদেশীয় উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করেন ও ইউরোপের নানা বন্দরে চালান দেন। কিম্বা ইউরোপ হইতে মালামাল রপ্তানি করিয়া এদেশের বাজারে বেচিয়া লাভ করেন। এই বিরাট ব্যবসায়ের মালিক, বিলাতের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানির অংশীদারদের মধ্যে, বাছাই করিয়া একটি কোর্ট

১. মেটিয়া বা মাটিয়া (মৃত্তিকা) বুরুজ (কেল্লা) ইহাই মেটিয়াবুরুজ শব্দের সহজ ব্যুৎপত্তি। পূর্বেই বলিয়াছি, এই মেটিয়াবুরুজে ও তাহার অপর পারে—জলদস্যুদের আগমন পথ রোধ করিবার জন্য নবাব সায়েস্তা খাঁ দুইটি মাটির কেল্লা প্রস্তুত করেন। ইহা হইতেই মেটিয়াবুরুজ নামকরণ হইয়াছে ও সেই নাম এখনও চলিয়া আসিতেছে।

২. অনেকে অনুমান করেন, বর্তমান মাথাঘষা গলির সন্নিকটবর্তী যে রাস্তাটি Rutton Sarker Garden Street বলিয়া পরিচিত, তাহা এই রতনের নামে হইয়াছে এবং আজও রতনের নাম লোকের স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়াছে।

অনেকের মতে রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট নামে পরিচিত রাস্তাটি 'ধোবী' রতন সরকার-এর স্মৃতি বহন করে না; উহার নামকরণ হইয়াছিল কলিকাতার প্রথম কলেক্টর Ralph Sheldon এর সহকারী নন্দকুমার সেনের আশ্রিত রতন সরকার নামে জনৈক ব্যক্তির নাম অনুসারে। ইনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। —Cotton, *Calcutta Old and New*, 2nd Ed. p. 292-93.

অব ডিরেক্টার সভা বিলাতে সংগঠিত হইয়াছিল। তাঁহারাই ইতিহাসে 'কোর্ট' নামে পরিচিত। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সুরাট, বালেশ্বর ও বঙ্গদেশে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠি সমূহের সমস্ত কার্য তাঁহাদেরই আদেশে পরিচালিত হইত। এ বিরাট বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁহাদেরই মূলধন খাটিত। লাভ লোকসান তাঁহাদের—সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহাদের। পর্টুগীজ, দিনেমার, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা এবং বাধা বিপত্তির সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে উল্লিখিত স্থান সমূহে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বাণিজ্য কুঠির কার্য পরিচালনার জন্য তাঁহারা এজেন্ট, ফ্যাক্টর, রাইটার, পরসার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কর্মচারীর সৃষ্টি করেন। কোম্পানিই বিলাত হইতে নিযুক্ত করিয়া এই সমস্ত কর্মচারীকে এদেশে পাঠাইয়া দিতেন। এতদিন ইংরাজ কোম্পানি ভারতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলে বাণিজ্য কার্যেই বেশী মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু বালেশ্বরে কুঠি স্থাপনের পর হইতে তাঁহারা শস্যশ্যামলা, ফল-জলপূর্ণা, ঐশ্বর্যময়ী বঙ্গদেশের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে ইংরাজ বাণিজ্য সম্বন্ধে নানা কথা

হুগলী ফ্যাক্টরির অসম্ভব উন্নতি—আড়াই শত বৎসর পূর্বে হুগলী ও ব্যাণ্ডেলের অবস্থা—হুগলীর-কুঠির কর্মচারিগণ—তাঁহাদের শাসনে রাখিবার জন্য বিবিধ কঠোর ব্যবস্থা—সেকালের ইংরাজদের দৈনিক জীবন—আহার ও অবস্থান প্রণালী—ইংরাজদের এ দেশীয় স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ—আড়াইশত বৎসর পূর্বে ইংরাজদের আমোদপ্রমোদ ও শিকার। কোম্পানির কুঠির ইংরাজ কর্মচারীদের বিশৃঙ্খল জীবন—তাহার প্রতিকারার্থে, নৈতিক-জীবন গঠনের চেষ্টা—বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের কার্যসূত্রে প্রথম সম্বন্ধ—ইংরাজের বাঙ্গালীর-প্রীতি—ইংরাজের বাণিজ্যে বাঙ্গালীর সহায়তা—ইংরাজ কর্মচারীদের ধর্মানুরাগী করিবার জন্য মাস্টারের চেষ্টা—তৎসম্বন্ধে বিবিধ কঠোর ব্যবস্থা প্রচলন—তাহাদের নৈতিক-জীবন সংগঠন জন্য কঠোর বিধান—সেকালের অপরাধ—জরিমানা ও শাস্তি—ফ্যাক্টরদের শাসনে রাখিবার জন্য দ্বাদশটি আদেশ—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলের ইংরাজ সমাজ—কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের পাটনায় নিয়োগ—কাশিমবাজার ত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ—চার্নকের অবাধ্যতা—বাঙ্গালার কুঠিসমূহের স্বাধীনতা—বঙ্গীয় কুঠির প্রথম গবর্ণর হেজেস্—ইণ্টারলোপারদের প্রাধান্য—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজন্য বাণিজ্য ক্ষতি—হেজেস্ কর্তৃক ইন্টারলোপারদের ধ্বংস-সাধন— ভিন্‌সেণ্ট ও পিটের কথা—মোগল শাসনকর্তাদের অত্যাচার বৃদ্ধি—হুগলীর বাণিজ্যের সঙ্কটাবস্থা—হেজেসের মহাবিপত্তি—ঔরঙ্গজেবের দরবারে নূতন ফারমানের চেষ্টা—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফারমান—নূতন ফার-মানে নূতন বিপত্তি—ইংরাজের উপর সম্রাট কর্তৃক জিজিয়া কর স্থাপন—পরমেশ্বর দাসের ও বালচন্দ্রের ইংরাজনিগ্রহ—ইংরাজ-বাণিজ্যের প্রতিকূলতা—পরমেশ্বর দাসের ইংরাজদের প্রতি অত্যাচার—এ অত্যাচার প্রতিকার প্রার্থনায় গবর্ণর হেজেসের ঢাকায় গমন—বালচন্দ্র কর্তৃক গবর্ণরের নৌকা আক্রমণ—কালকাপুরে জোব চার্নকের সহিত বিবাদ-প্রতিকার পরামর্শ—ঢাকায় নবাবের সহিত হেজেসের সাক্ষাৎ—নবাবের সহানুভূতি—এ মূল্যহীন সহানুভূতির ফলে মোগল কর্মচারীদের উৎপাত বৃদ্ধি—বালচন্দ্র ও পরমেশ্বর দাস কর্তৃক নূতন অত্যাচার।

সম্রাট সাহজাহান ও সাহসুজা প্রভৃতির ফারমানের[১] বলে বলীয়ান হইয়া ইংরাজেরা কি অবস্থায় হুগলীতে প্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেন এবং তৎপরে কাশিমবাজার, ঢাকা, পাটনা, রাজমহল, সিংহিয়া, মালদহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের বাণিজ্যকুঠি সমূহ স্থাপিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক বিবরণ আমরা পূর্বে দিয়াছি। এই যে আসমুদ্র হিমাচল-ব্যাপী ভারতবর্ষ ইংরাজের গৌরবময় সাম্রাজ্যরূপে সিংহ-চিহ্নিত ব্রিটিশ রাজপতাকা-মণ্ডিত হইয়া ধরণীপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রথম বীজ এই হুগলীতেই রোপিত হইয়া-ছিল। যেমন অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড শাখা-পল্লবময় বিরাট বটবৃক্ষের উদ্ভব হয়, সেইরূপ হুগলীর বাণিজ্যকুঠিরূপ ক্ষুদ্রবীজ হইতে, এই বিশাল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত-সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যে ভারতে ইক্ষ্বাকু, দিলীপ, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত,

---

১. একমাত্র বাদসাহই ফারমান জারি করিতে পারিতেন; সাহজাদা সাহসুজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অধিকার সংক্রান্ত যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা নিশান, ফারমান নহে।
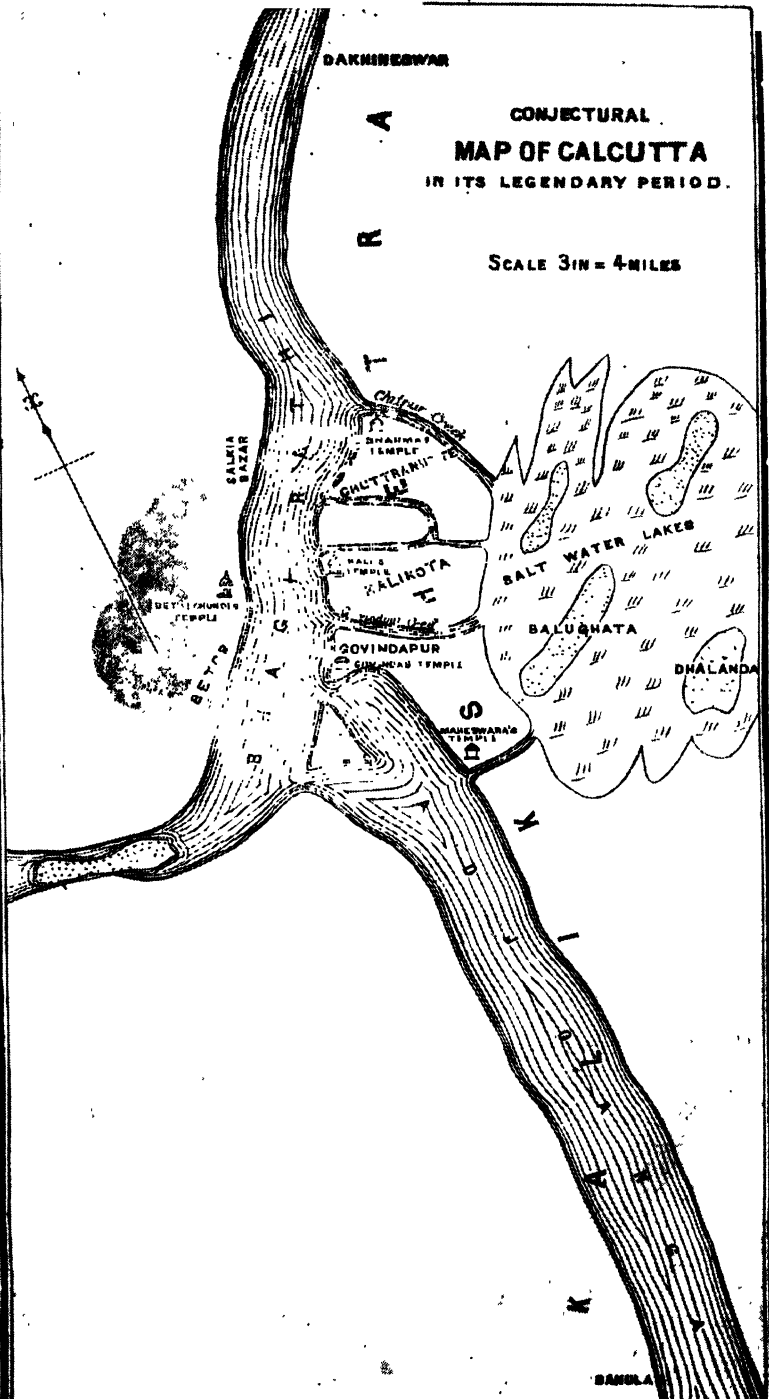
কবিকঙ্কণের বর্ণিত কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ
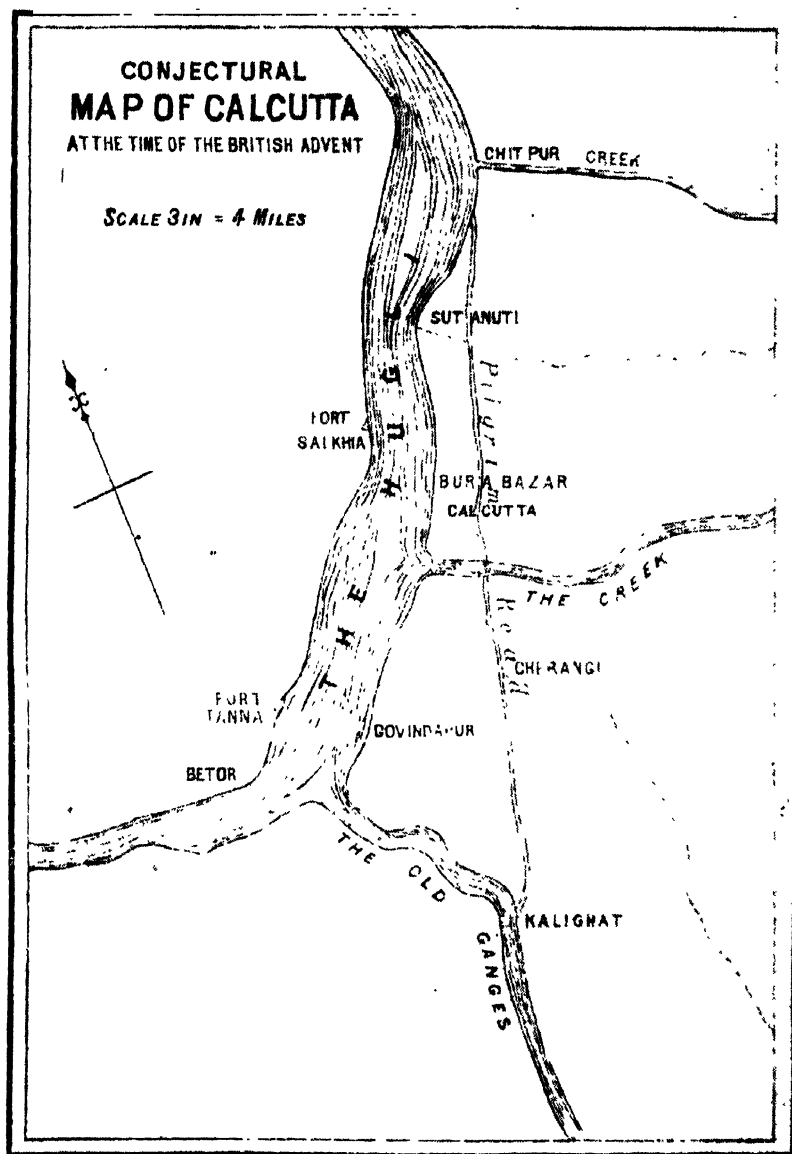
জোব চার্নকের আমলের ও তৎপরবর্তীকালের কলিকাতা

পৃথ্বীরাজ ইত্যাদি হিন্দুনরপতিগণ এবং আকবর, জাহাঙ্গীর, সাহজাহান, ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি মোগলসম্রাটগণ একচ্ছত্র আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতে আজ আমরা সমগ্র ভারতের রাজচক্রবর্তী সম্রাটরূপে, আমাদের সর্ব-জনপ্রিয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা ও রক্ষাকর্তারূপে দেখিতে পাইতেছি। এ প্রসঙ্গে আমরা আড়াই শত বৎসরের পূর্বের কথা আলোচনা করিতেছি। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, কর্মবীর ইংরাজ জাতির মায়াময় করস্পর্শে ভীষণ জঙ্গলাবৃত সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জঙ্গলের মধ্য হইতে বর্তমান প্রাসাদময়ী, বিদ্যুতালোকোজ্জ্বলিত, প্রশস্ত রাজবর্ত্মপূর্ণ, বিশাল জনসংঘ সম্বলিত, শকট ঘর্ঘর নিনাদিত বর্তমান মহানগরী কলিকাতার উদ্ভব হইয়াছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে, ইংরাজগণ কিরূপ অবস্থায় এদেশে অবস্থান করিতেছিলেন, এখন আমরা সেই কথাই বলিব। বঙ্গের এই বাণিজ্য-ব্যবসা রক্ষা করিতে তাঁহাদের যে কত কষ্ট, কত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার এবং নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল—তাহাই বলিব। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে, বঙ্গে ইংরাজবাণিজ্য চরম উন্নতির মুখে আসিয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁর[১] অনুকম্পায়, ইংরাজেরা তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বাধাবিপত্তি হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গদেশের ফ্যাক্টরিগুলিতে দেড়লক্ষ পাউণ্ড খাটিতেছিল। সর্ব প্রথমে মোটে পাঁচশত টাকা লইয়া হুগলী ফ্যাক্টরির প্রথম বাণিজ্য আরম্ভ হয়, শেষে তাহা দেড়লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল। ধরিতে গেলে, বঙ্গদেশে হুগলীর বাণিজ্য-কুঠিই ইংরাজের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য সূচনা করিয়া দেয়।

কিন্তু বাণিজ্যের অসম্ভব উন্নতি সংসাধিত হইলেও হুগলী সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। সমুদ্রবক্ষেই ইংরাজের প্রভাব ও কার্যকুশলতা। জাহাজ লইয়াই ইংরাজের শক্তি। এ শক্তি হুগলীতে বিকাশ করিবার কোন উপায় ছিল না। গঙ্গাসঙ্গম স্থানও হুগলী হইতে অনেক দূরে। আজকাল ভাগীরথীর যে অবস্থা হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। সেই সুদূর অতীতে, রণোন্মাদিনী মূর্তিতে দুইকূল ভাঙ্গিয়া ভাগীরথী মহাবেগে সাগর সঙ্গমের দিকে ছুটিতেন। নদীর নানাস্থানে প্রচণ্ড দহ ও ঘূর্ণায়মান আবর্ত ছিল। সমুদ্রমুখ হইতে হুগলী বহুদূরে। সেই সময় বৃহৎকায় জাহাজাদির অবাধ যাতায়াত নানা কারণে সুবিধাকর ছিল না। তাহার পর হুগলী সহরের মধ্যেই কোম্পানির ফ্যাক্টরি অবস্থিত ছিল। অনতিদূরে মোগল-সুবাদারের আবাসবাটী। সেই আবাসবাটীর সন্নিকটেই মোগলের সেনানিবাস। কোনরূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই, মোগল সুবাদার বা ফৌজদারগণ তখনই সেনাসংগ্রহ করিয়া অতি সহজেই ইংরাজপক্ষকে বিপদগ্রস্ত করিতে পারিতেন।

সেই আড়াইশত বৎসরের পূর্বে হুগলী সহরের অবস্থাও তত ভাল ছিল না। চারিদিকে ক্ষুদ্র গলি, নদীর দুই কূলে দুই মাইলব্যাপী অপ্রশস্ত পথ। উত্তরে ব্যাণ্ডেল গ্রাম। ইহা পর্টুগীজদের আশ্রয়স্থান। দক্ষিণে চুঁচুড়া। এখানে দিনেমারদিগের উপনিবেশ। গঙ্গার ধার হইতে আরম্ভ করিয়া সহরের মধ্যে তিনশত গজ বিস্তৃত এক খাত। সময়ে সময়ে নদীর জল বৃদ্ধির সহিত ইহা একটি প্রকৃত ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হইত।[২] চারিদিকে ছোট ছোট ইষ্টক এবং মৃত্তিকা নির্মিত বাসগৃহ। তাহার মধ্যে মোগল-ফৌজদারের বাসভবন। ইংরাজেরা তাঁহাদের বুদ্ধির দোষেই হউক বা ভবিতব্য চালিত হইয়াই হউক, ফৌজদারের বাটীর সান্নিধ্যেই তাঁহাদের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য পরে তাঁহাদের মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছিল।

সুরাট ও মান্দ্রাজ ফ্যাক্টরির তুলনায়, হুগলী ফ্যাক্টরি যেন সমুদ্র নিকটে গোষ্পদ তুল্য। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারা সহরের মধ্যেই বাটীভাড়া করিয়া থাকিতেন। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর কুঠি পরিদর্শন করিতে আসিয়া স্ট্রেনশাম মাস্টার

১. সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।
২. ইহাই 'ঘোলঘাট' নামে পরিচিত।

সাহেব ইহার ঘরবাড়িগুলির অনেকটা উন্নতি করিয়া যান। এই সময়ে কতকগুলি কার্যালয় ও মালগুদাম নির্মাণ করা হয়। কয়েক স্থানে কর্মচারীদের জন্য নূতন আবাস গৃহও নির্মিত হয়। কিন্তু তাহাতেও সকলের স্থান সংকুলান হইল না।

এই সময়ে হুগলীর কুঠিতে চারিজন প্রধান কর্মচারী থাকিতেন। ইহাঁদের সর্বপ্রধানের পদবী—এজেণ্ট। এজেণ্টের নিম্নে হিসাব-রক্ষক, গুদাম-রক্ষক ও ধনাধ্যক্ষ। একজন সেক্রেটারীও তাঁহাদের সহায়তার্থে নিযুক্ত হন। সেক্রেটারীকে প্রত্যেক মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত থাকিয়া কেরাণীর কাজ করিতে হইত। মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে যে কোন কাজ হইত, তাহার মন্তব্যের নকল তিনি মান্দ্রাজে পাঠাইতেন ও মান্দ্রাজ হইতে তাহা বিলাতের কর্তাদের নিকট পেঁাছিত। এজেণ্ট বা সর্বোচ্চ কর্মচারীর বেতন বাৎসরিক দেড় হাজার টাকা ছিল। কিন্তু ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইহা দুইশত পাউণ্ড বা আড়াই হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া কুঠির মধ্যে মারচ্যাণ্ট ফ্যাক্টর, রাইটার, এপ্রেণ্টিস প্রভৃতি নানা শ্রেণীর কর্মচারী ছিল। রাইটারেরা বৎসরে দেড়শত টাকা পাইতেন। সেকালের আট-টাকার গোমস্তার বা নায়েবেরও দোল-দুর্গোৎসবের কথা শুনা গিয়াছে। মাহিনার টাকার উপর ইহারা বড় একটা নির্ভর করিতেন না। নানারূপ বেনামী বাণিজ্যে, কোম্পানির ছাড় ও নিশানের অন্যায় ব্যবহারে ইঁহাদের প্রচুর অর্থাগম হইত। কোম্পানি বাহাদুরের বেতনভোগী ভৃত্য হইয়াও ইঁহারা প্রভুর সর্বনাশ করিতেন। কোম্পানির প্রত্যেক কর্মচারীই বিনাব্যয়ে থাকিবার স্থান ও খাইবার খরচা পাইতেন। বিনাব্যয়ে আলো ও চাকর পাইতেন। খানা-গৃহে একটি প্রকাণ্ড টেবিল ছিল। আহারের ঘণ্টা হইবামাত্র সকলে ঐ টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব পদ মর্যাদানুসারে আসনগ্রহণ করিতেন। তখন ইংরাজগণ দুইবারমাত্র খানা খাইতেন। ইহাই ডিনার ও সপার। যাঁহারা পরিবার লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতেন কোম্পানি তাঁহাদের খোরাকির জন্য ভাতা বা Dietmoney দিতেন। তাহারাও বিনা খরচায় চাকর এবং রাত্রে জ্বালাইবার জন্য মোমবাতি পাইত।

ইংরাজেরা তখন এদেশের ভাষা জানিতেন না, অথচ দেশীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই তাঁহাদের সর্বদাই ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত থাকিতে হইত। এজন্য দেশীয় দালাল ভিন্ন তাঁহাদের কাজ চলিত না। এই দেশীয় দালালেরা মাত্র গোটাকতক শব্দ জানিত। তাহারই সাহায্যে তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিত এবং কাজকর্মও চালাইয়া লইত। দালালেরা গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ক্রয়াহঁ মালপত্র সন্ধান করিত, তাহার দর-দস্তুর করিত এবং চালানিদ্রব্যে শতকরা তিন টাকা হিসাবে কমিশন পাইত।

কোম্পানির কর্মচারীদের সংযত রাখিবার জন্য নানাবিধ কঠোর বিধান প্রচলিত হইয়াছিল। ফ্যাক্টরির মধ্যস্থ কোন কর্মচারীই কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাহিরে রাত্রিযাপন করিতে পারিত না।১ আজকালকার অনেক কলেজের বোর্ডিংয়ের বা গোরা-বারিকের বন্দোবস্ত যেরূপ কঠোর, সেকালের ইংরাজ কুঠির বন্দোবস্তও তদ্রূপ ছিল। প্রাতঃকালে নয়টা হইতে বারটা পর্যন্ত অফিস বসিত, আবার অপরাহ্ণে বেলা চারিটা অবধি অফিসের কাজ চলিত। সাধারণ সময়ে বড় বেশী কাজ থাকিত না। তবে যে সময়ে মান্দ্রাজ হইতে জাহাজগুলি মাল লইতে বা পেঁাছাইয়া দিতে আসিত, সেই সময়ে কাজের ঝঞ্ঝাট বড়ই বাড়িয়া যাইত। মধ্যাহ্নকালে সমস্ত কর্মচারীই কুঠির হলের মধ্যে মধ্যাহ্ন ব্যাপার শেষ করিতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, একটি প্রকাণ্ড টেবিলের চারিপার্শ্বে সকলেই পদমর্যাদানুসারে উপবিষ্ট হইতেন। সকল কুঠিতেই ভারতীয়, পর্টুগীজ, ইংরাজ এবং ফরাসীপাচকগণ বেতনভোগীরূপে নিযুক্ত থাকিত। সে সময়ে বঙ্গদেশে প্রচুর মৎস্য, মাংস ও ফলমূলাদি পাওয়া যাইত, এজন্য আহারের কোন কষ্টই ছিল না। একটি সুবৃহৎ রৌপ্যপাত্রে কর্মচারীরা আহারান্তে হস্ত-প্রক্ষালন করিতেন।

---

১. Hedges' *Diary* Vol II, *First Bengal Chaplain* p. 3 and 5 (Indian Church Quarterly Review) Ovington's *Voyages to Surat &c.*

সেরাজি ও মিশ্র-আরক[১] (Arack Punch) সে সময়ের বিখ্যাত মদ্য ছিল। সে সময়ে উচ্চ শ্রেণীর বিলাতি মদিরা খুব কমই এদেশে আসিত। বিলাতি মদ্য ও বিয়ার সে সময়ে বড়ই বহুমূল্য জিনিষ ছিল। পর্বদিনে ও রবিবারে শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস দ্বারা নানাবিধ মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হইত। এই সময়ে বিশেষ উৎসব দিনে ইংরাজ ফ্যাক্টরগণ মদ্যপানকালে ইংলণ্ডের সম্রাট ও তাঁহাদের প্রভু কোম্পানি বাহাদুরের স্বাস্থ্যপান বা হেলথ-ড্রিঙ্ক করিতেন। এ সময়ে চা-পান প্রথাও প্রচলিত ছিল। রাত্রের ভোজন ব্যাপারও উল্লিখিতরূপে সমবেতভাবে শেষ হইত। ঠিক রাত্রি নয়টার সময়, ফ্যাক্টরির সদর দরজা বন্ধ হইয়া যাইত। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে অনেক ইংরাজ অবিবাহিত অবস্থাতেই এ দেশে আসিতেন। বিবাহিতের সংখ্যা বড় কম ছিল। কারণ বিলাত হইতে সে সময়ে ভারতে আসিতে ছয় সাত মাস লাগিত। এদেশে পরিবার লইয়া থাকিতে হইলে একটা ব্যয়বাহুল্যও ছিল। এজন্য অনেকে বিবাহিত ব্যক্তি বিলাতেই তাঁহার পরিণীত-পত্নীকে রাখিয়া আসিতেন। আবার অনেক অবিবাহিত যুবক এদেশেই যোগাড়যন্ত্র করিয়া বিবাহ করিতেন।[২] সেই সময়ে অনেক ইংরাজই এদেশের নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা নির্বাহ কিরতেন। যখন তাঁহারা ফ্যাক্টরি হইতে দূরতর স্থানে যাইতেন, তখন মুসলমানদিগের মত মাটিতে কার্পেট বা সতরঞ্চ বিছাইয়া খানা খাইতেন।[৩] অনেকে এদেশের ঢিলা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিতে ভালবাসিতেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেন। সমাজ-সংগঠন করিয়া একস্থানে বাস করিতে গেলে সেই সমাজের উপযুক্ত আমোদ প্রমোদও চাই। কেবল অক্লান্ত কর্মময় জীবন লইয়া থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। এখন যেমন বল, থিয়েটার, পিকনিক, ইভনিং-পার্টি ইত্যাদি নানারূপ আমোদ ব্যবস্থা হইয়াছে তখন সেরূপ ছিল না। আড়াই শত বৎসর পূর্বে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে বঙ্গদেশীয় ইংরাজগণের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন অতি সামান্যভাবেই হইত। পর্বদিনে কিম্বা ছুটির দিনে তাঁহারা নিকটস্থ জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেন। কখনও বা কোন এদেশীয় পদস্থ আমির ওমরাহের সঙ্গে জুটিয়া শিকারের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। ফ্যাক্টরি হইতে বেশী দূরে যাইবার অধিকার তাঁহাদের ছিল না। হুগলীর ইংরাজ-ফ্যাক্টরির দুই মাইল উত্তরে কোম্পানির একখানি সখের-বাগান ছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা সাধারণতঃ এই বাগানেই আমোদ-প্রমোদ করিতে যাইতেন। বাগানের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরতর স্থানে যাইবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। বাগানে গিয়া পুষ্করিণীতে অবগাহন স্নান, বায়ুসেবন, খোস গল্প আর মদিরা ও মোরব্বা-ভোজন ইহাই আড়াই শত বৎসর পূর্বে এদেশীয় ইংরাজের আমোদ-আহ্লাদের চূড়ান্ত ব্যবস্থা ছিল। সামাজিকতা হিসাবে প্রতিবাসী ডাচদিগের সহিত ইংরাজদের কখন কখন নিমন্ত্রণের আদানপ্রদান চলিত। কখনও বা ডাচেরা তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিতেন, আবার কখনও ইংরাজেরা ডাচদিগকে প্রীতিভোজ দানে প্রফুল্লিত করিতেন। ফ্যাক্টরির 'চীফ' বা বড়কর্তা এবং তাঁহার সহকারী কেবলমাত্র 'পালকি' ব্যবহার করিতে পারিতেন। পাদরীসাহেবদের কেবলমাত্র ছাতা ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল। পথ চলিবার সময় বেতনভোগী ছত্রধারীরা বড় বড় ছাতা দিয়া তাহাদের মাথা রক্ষা করিত। ইহাদিগকে 'ছাতা-বরদার' বলিত। কিন্তু এই ছত্র-ছায়া সুখ-সম্ভোগ

১. Arrack, an Arabic word meaning strong drink, 'distilled spirit'....In India it is applied to a variety of common spirits ; in South India to those distilled from the fermented sap of sundry palms ; in East and North India to the spirit distilled from cane-molasses and also to that from rice.—*Hobson-Jobson*, New Ed. p. 36.

২. Unfortunately there was few of them (English Ladies) the hardships and dangers of the long voyage being very great and a large number of the Company's Servants had to find their wives in this country.—Wilson's *Early Annals*. p. 63.

৩. In those days of greatest isolation the tendency to gravitate towards the local ways of living and acting was very strong. They took their meals when away from the Factory lying on carpets ; they wore the Indian dress, they married Indian wives. —Ovington's *Voyages* p. 491. Wilson.

করিবার ক্ষমতা, নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ছিল না। পাঠক! হুগলীর ফ্যাক্টর ইংরাজদের সেই সুদূর অতীত কালের বিলাসিতার সহিত একবার বর্তমান যুগের বেরুচ, ফিটান, ভিক্টোরিয়া ডগকার্ট ও মোটরাদি বিলাসময় যানবাহনের সুখটা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন। এই আড়াই শত বৎসরের মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে।[১]

মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, সেকালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের অনেকেই অতি হীন প্রবৃত্তির লোক ছিলেন। সুদূর ভবিষ্যতে, যে ভারতে এলফিনস্টোন, মনরো, ম্যালকম, টড, হেনরি ও জন লরেন্স, মারটিন, হিবার প্রভৃতি মহাপ্রাণ দেবতুল্য ইংরাজগণ আবির্ভূত হইয়া, ভারতক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দেবচরিত্রের ও মহাপ্রাণতার সহিত তুলনায় সেকালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম-চারীদের অনেকেই অতি হীনমতি ছিলেন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে দেশকাল পাত্র ও ঘটনা-চক্রবশে তাঁহাদিগকে এইরূপ হইতে হইয়াছিল। সে সময়ে যে সমস্ত ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরূপে এ দেশে আসিতেন, তাঁহাদের অনেকেই অনভিজ্ঞ ও তরুণ বয়স্ক যুবক। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই আবার অবিবাহিত অবস্থায়, নির্বাসিত ব্যক্তির ন্যায় সুদূর ভারতে উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের অনেকেরই আয় কম, খরচ বেশী। কোম্পানির কর্তারা বিলাতে থাকিতেন, আর বিলাত হইতে বহুদূরে ছয় মাসের পথে, সুদূর বঙ্গদেশে বসিয়া তাঁহাদের কর্মচারীরা রক্ষক হইয়াও ভক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। প্রভু সম্প্রদায়ের উৎক্রোশ দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া অনেক বেনামী বাণিজ্য, ছাড় ও নিশান বিক্রয় প্রভৃতি নানাবিধ বিধি-বিগর্হিত উপায়ে প্রচুর অনিষ্ট করিয়া ধনাগমের চেষ্টা করিতেন। স্বার্থসংঘর্ষ জন্য তাহাদের মধ্যে প্রায় আত্মবিবাদ উপস্থিত হইত। এই সকল বিবাদের মীমাংসার জন্যই স্ট্রেনশাম মাস্টার দুই দুইবার বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সেকালে সামাজিক ধর্ম ও নীতিশিক্ষা দিবার কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। নৈতিক নিয়মে বন্ধ করিবার পথই ছিল না, কাজেই বিবেক-ভয়-শূন্যচিত্তে তাঁহারা অনেক অপকর্ম করিয়া বসিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য কুঠির ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কাহারও উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। সকলেই সুযোগ পাইলে পরস্পরের নিন্দাবাদ ও অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন। এইজন্য নবাব সায়েস্তা খাঁ এক সময়ে ইংরাজ বণিকদের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সমকালের ইংরাজ বণিকদিগকে নীচপ্রকৃতি, বিবাদ বিসম্বাদপরায়ণ, হীন ব্যবসায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[২] মোটের উপর কথা হইতেছে এই, ইংরাজের মধ্যে একতার অভাব লক্ষ্য করিয়াই মোগল শাসনকর্তাগণ তাহাদের নানা উপায়ে উত্যক্ত করিতেন।

সেকালের ইংরাজ-বণিকদিগের কার্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি সম্বন্ধে, যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের স্বদেশীয়দের দ্বারাই হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ যে সম্পূর্ণরূপে মহত্ব-বর্জিত ছিলেন এরূপ নহে। তাঁহাদের প্রধান গুণ এই যে, দেশীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁহারা কোনরূপ অত্যাচার করিতেন না। সে-কালের হিন্দুরা এই ব্যবসায়ী ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারিগণকে বিপন্নের আশ্রয়, ন্যায়ের মর্যাদারক্ষক বলিয়া বিবেচনা করিত। ইংরাজের সহিত ব্যবসায় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া লেন-দেনের হিসাবে কখনও কোন হিন্দু ব্যবসায়ীর একটি পয়সাও নষ্ট হয় নাই। বিলাতের কর্তারাও পর্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন—"কোন দেশীয় লোকই অভিযোগ করিতে পারেন না, যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্থাপনাবধি, তাহাদের প্রাপ্য একটি সামান্য পয়সার গোলমাল হইয়াছে।"[৩] সে

---

১. Hedges' *Diary*, Vol 1. p. 66. Ovington's *Voyages* p. 400. Mandelslo's *Voyages* (Quoted by Wilson.)

২. A Company of base, quarrelling people and foul dealers.—Wilson, p. 66.

৩. "Never", says the Court in 1693 "never any Native of India lost a Penny Debt by this Company from the time of the first institution thereof in Queen Elizabeth's days till this time.—Wilson's *Early Annals*. p. 67.

সময়ে বাদসাহের কর্মচারিগণ দেশীয় প্রজাদের উপর বড়ই অত্যাচার করিতেন। প্রজার কোন একটি সামান্য প্রার্থনা পূরণ বা অভিযোগের তদন্ত করিতে হইলেই মোগল [illegible] উৎকোচ দিতে হইত। ঢাকার শাসনকর্তা আবার অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণতার সীমায় আনিয়াছিলেন। মনুষ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় চাউল, লবণ ইত্যাদি, এমন কি—তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাগণের ঘোড়ার ঘাস, জ্বালানি কাঠ পর্যন্ত ফৌজদার ও সুবাদার সাহেবেরা একচেটিয়া করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইজন্য সময়ে সময়ে, সেই স্বচ্ছলতার দিনে জিনিসপত্রের দরও চড়িয়া যাইত। জোর করিয়া ব্যবসায়ীদের চড়া দরে জিনিসপত্র কিনিতে বাধ্য করা হইত। মুসলমান মহাজনদিগের নিকট উচ্চ সুদে হিন্দুরা টাকা কর্জ করিতে বাধ্য হইতেন। ঋণ পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে মায় সুদ টাকা আদায় করা হইত। কিন্তু এ দেশীয় জনসাধারণ যখন দেখিল, ইংরাজগণ দেনাপাওনার ব্যাপারে বড়ই উদার, তাহারা ন্যায্য মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করে, লোকের পাওনা বাকি রাখে না, তাহাদের নিজের ছাড় ও নিশান দিয়া মোগল কর্মচারীদের অত্যাচার হইতে প্রজাদের রক্ষা করে, প্রয়োজন হইলে তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিগণের জন্য মোগলের নিকট দরবার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা স্বভাবতই ইংরাজদের মহৎগুণাবলীর দিকে আকৃষ্ট হইল। পূর্বে আমরা দেখাইয়াছি, বঙ্গদেশের ফ্যাক্টরি সমূহে দেড়লক্ষ পাউণ্ড মূলধন ন্যস্ত হইয়াছিল। ইংরাজের বঙ্গীয় বাণিজ্যের এই অসম্ভব শ্রীবৃদ্ধি যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সহানুভূতিতেই হইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ইংরাজ কোম্পানির মান্দ্রাজের কুঠির অধ্যক্ষ বা প্রেসিডেণ্টই সেকালের ভারতীয় ইংরাজদের ভাগ্য-নিয়ন্তা বা ফ্যাক্টরির সর্বপ্রধান কর্মচারী ছিলেন। যাহাতে কর্মচারিগণ সচ্চরিত্র ও সুনীতিপরায়ণ হন, তৎসম্বন্ধে চেষ্টার কোন ত্রুটিই তাঁহারা করেন নাই। এই জন্যই স্ট্রেনশাম মাস্টারের মত দৃঢ় চরিত্রের লোক, দুই দুই বার বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। তখন পাদরী ছিল না, গির্জা ছিল না, উপাসনার নির্ধারিত স্থান ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এ সম্বন্ধীয় সকল বন্দোবস্তই হইয়াছিল। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে জন ইভান্স[১] নামক একজন পাদরী কোম্পানির দ্বারা নিয়োজিত হইয়া বঙ্গদেশে আসেন। ইনিই বঙ্গের প্রথম পাদরী। বাঙ্গলার সহিত তুলনায়, সুরাটের ইংরাজদের নৈতিক অবস্থা অনেকটা উন্নত ছিল। এইজন্য ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের গভর্ণর বঙ্গদেশে আসিয়া পাদরীদিগের সহিত পরামর্শমতে কতকগুলি নীতিগর্ভ নিয়ম প্রচলন করেন। এই নিয়মগুলি দেখিলেই পাঠক বুঝিবেন, কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের বঙ্গদেশস্থ সহযোগিগণের নৈতিক উন্নতি সাধনার্থে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বের এ নৈতিক নিয়মগুলি অতি কৌতূহলজনক। পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এস্থলে সেগুলি আনুপূর্বিক উদ্ধৃত করিলাম। এই কটি বিধিপত্রে লিখিত ছিল—

১। যাহাতে ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হয়, যাহাতে সকল কর্মে তাঁহার মঙ্গলাশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এই উদ্দেশ্যে কোম্পানির কর্মচারিগণ ভজনাগারে নিত্য প্রার্থনা করিবেন।

২। মিথ্যা বলা, শপথ করা, অভিশাপ প্রদান, মাতলামি প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র দিন অপবিত্র করিবে না।

৩। রাত্রে কেহই ফ্যাক্টরি অথবা তাহাদের সহরের আবাসবাটী ছাড়িয়া বাহিরে অন্য কোন স্থানে রাত্রি যাপন করিতে পারিবে না।

৪। সকলেই পাদরীসাহেবের উপদেশে মনোযোগ প্রদান করিবেন। যিনি তাহা না করিবেন বা ভজনালয়ে প্রার্থনার সময় নিত্য উপস্থিত না হইবেন, তাঁহাকে অপরাধীরূপে বিচারাধীনে আনা হইবে।

১. Of Jesus College, Oxford, Bishop successively of Bangar and of Meath arrived in Bengal in 1628.—H.E.A. Cotton, *Calcutta Old and New*, 2nd Ed. p. 382.

৫। যদি কেহ রাত্রি নয়টার পর বাটী হইতে বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দশ টাকা জরিমানা দিতে হইবে।

৬। যদি কেহ অযথা শপথ করেন, তাহা হইলে প্রত্যেক শপথের জন্য তাঁহার নিকট বার পেনি জরিমানারূপে আদায় করা হইবে।

৭। মাতলামির প্রত্যেক অপরাধের জন্য অপরাধীকে পাঁচ শিলিং করিয়া জরিমানা দিতে হইবে।

৮। লর্ডস দিনে প্রার্থনাক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকিলে এক শিলিং জরিমানা দিতে হইবে।

৯। যদি চাহিবামাত্র জরিমানার টাকা আদায় না হয়, তাহা হইলে অপরাধী ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় দ্বারা তাহা আদায় করা হইবে।

১০। প্রোটেস্টান্ট খৃীস্টান মাত্রেই প্রভাত ও সন্ধ্যার ভজনা সময়ে নিয়মিতরূপে গির্জা-গৃহে উপস্থিত থাকিবেন। অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণ না দেখাইতে পারিলে অপরাধীকে প্রত্যেক অপরাধের জন্য ১২ পেনি জরিমানা দিতে হইবে।

১১। এই সমস্ত আদেশ বৎসরে দুইবার ফ্যাক্টরির কর্মচারিগণকে পড়িয়া শুনান হইবে।

১২। একজন ফ্যাক্টর বা রাইটার এই সমস্ত জরিমানা আদায়ের সেরেস্তা থাকিবেন। অপরাধী ফ্যাক্টর ও কর্মচারিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত জরিমানার টাকা হুগলীর অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইবে। হুগলীর অধ্যক্ষ তাহা মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার হাত দিয়া সেই অর্থ দরিদ্রের মধ্যে বিতরিত হইবে।

"উল্লিখিত বিধানগুলি যথাযথ ভাবে পালিত হইলে, ফ্যাক্টরির কর্মচারিগণের যথেষ্ট নৈতিক-উন্নতি সাধিত হইতে পারে। এই উন্নতির ফলে, ভারতে ইংরাজের জাতীয় গৌরব, তাঁহাদের অন্নদাতা কোম্পানির নামও গৌরবান্বিত হইবে। কিন্তু এই কঠোর বিধান প্রচলনের ফলেও যদি কোন কুচরিত্র ব্যক্তির স্বভাব-দোষ বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাঙ্গলাদেশ হইতে মান্দ্রাজে চালান করিয়া সেই স্থানে তাহার অপরাধের কঠোরতর শাস্তি বিধান করা যাইবে।"[১]

সেকালে অর্থাৎ আড়াই শত বৎসর পূর্বে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে, ইংরাজগণের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের কয়েকটি বিশদ চিত্র আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিলাম। আশা করি, এগুলি তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে।

উইলিয়াম হেজেস— বাঙ্গালার প্রথম গবর্ণর (১৬৮২—১৬৮৩)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন। মূলধন খাটাইয়া সকল ব্যবসাদারে যেমন লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসা করে, তাঁহারাও সেইরূপ করিতেন। কিসে সরঞ্জামি খরচা কম হয়, কিসে উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুবিধার দরে ক্রীত হয়, কিসে সেগুলি যথা সময়ে জাহাজ-বন্দী হইয়া বিলাতে পেঁছায়, সেগুলি বিলাতের বাজারে বিক্রয় করিলে কিসে দুপয়সা বেশী লাভ হয়, ইহাই সেকালের কোম্পানির প্রধান লক্ষ্য ছিল। স্ট্রেনশাম মাস্টার অত খরচ পত্র করিয়া দুই দুইবার বাঙ্গলায় আসিলেন, কিন্তু তাহাতে ফ্যাক্টরদের মামুলি অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হইল না দেখিয়া কর্তারা স্ট্রেনশামের ও তাঁহার কার্য প্রণালীর উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন।

কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক সাহেব, প্রথমে পাটনার কুঠিতে ছিলেন এবং তৎপরে [illegible] আসেন। এই সময়ে স্ট্রেনশাম মাস্টারও দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে আসেন। তিনি

---

১. If any by these penalties will not be reclaimed from their vices or any shall be found guilty of adultery, fornication, uncleanliness or any such crimes, or shall disturb the peace of the Factory by quarrelling or fighting and will not be reclaimed, then they shall be sent to Fort St. George, there to receive condign punishment.—Wilson's *Early Annals*. p. 69, and *Hugly Diary* 1679.

চার্নককে আদেশ করিয়া পাঠান—"বিলাতের কর্তারা আপনাকে কাউন্সিলের দ্বিতীয় সদস্য করিয়াছেন। অতএব যে সমস্ত সোরা পাটনার গুদামে মজুত আছে, তাহা নৌকায় চালান দিয়া সরাসর এখানে চলিয়া আসিবেন।" কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, চার্নক কাশিমবাজার ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহাতে স্ট্রেনশাম মাস্টার বিরক্ত হইয়া চার্নককে লিখিলেন, "আপনার এই অবাধ্যতায় আমি বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাতে কোম্পানিরও কার্যক্ষতি হইয়াছে। আমি আপনাকে কাশিমবাজার হইতে হুগলীতে বদলি করিলাম।"

নানা কারণে চার্নক তখন হুগলীতে আসিলেন না। এদিকে স্ট্রেনশাম মাস্টার যে পাঁচ বৎসরের জন্য কোম্পানির এজেন্ট ও ফোর্ট সেন্ট জর্জের গবর্ণর হইয়াছিলেন, তাহাও শেষ হইয়া গেল। কোম্পানি কতকগুলি কারণে স্ট্রেনশামকে কর্মচ্যুত করিলেন। উইলিয়ম গিফোর্ড তাঁহার স্থানে ফোর্ট সেন্ট জর্জের বা মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে বঙ্গের ও উড়িষ্যার উপকূলবর্তী বাণিজ্য-ব্যাপার সম্বন্ধেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। বাঙ্গলার কুঠি সমূহকে মান্দ্রাজের অধীনতা হইতে বিমুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। কোম্পানির বাঙ্গলার কুঠিগুলির উপর সর্বময় কর্তৃত্ব করিবার জন্য মান্দ্রাজের প্রথানুসারে একজন এজেন্ট বা গবর্ণর সর্বপ্রথম নিযুক্ত হইলেন। উইলিয়াম হেজেস [১] এই নবনির্বাচিত গবর্ণর।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, চার্টার-প্রাপ্ত ও ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমোদিত কোম্পানি। কিন্তু স্বাধীন দেশ, কর্মভূমির প্রশস্ত ক্ষেত্র ইংলণ্ডে উদ্যমশীল লোকেরও অভাব ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া বেশ দুপয়সা উপায় করিতেছেন দেখিয়া অনেক ভাগ্য-পরীক্ষার্থী ইংলণ্ডেশ্বরের রাজসনন্দ না লইয়া এদেশে গুপ্তভাবে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহারা এদেশে আসিয়া নানা উপায়ে অর্থ ও উৎকোচদানে কোম্পানির কর্মচারীদের নিকট হইতে ছাড় ও নিশান সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্য দ্বারা বেশ লাভবান হইতেছিল। ক্রমে ইহাদের প্রভাব এত বাড়িয়া উঠে যে বিলাতের কর্তারা তাহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠেন এবং ইহাদের উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহারাই ইতিহাসে 'ইন্টারলোপার্স' বলিয়া পরিচিত।

এই ইন্টারলোপারদের অগ্রণী ছিলেন পিট। পিটের মত অমন ডানপিটে লোক বোধ হয়, বাঙ্গলায় তখন ছিল না। পিট তাহার সহযোগীদের সহিত ব্যবসা চালাইত। সে সময়ে ভাড়াটিয়া জাহাজের অভাব ছিল না। অর্থ দিলেই পর্টুগীজ, দিনেমার ও ডাচেদের জাহাজ ভাড়া পাওয়া যাইত। পরিশেষে এই পিট এত বর্ধিতপ্রতাপ হইয়া পড়ে, যে সে তুর্কি সওদাগরদিগের সহায়তায় এক নূতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করিতে উদ্যোগী হয়।

হেজেসের উপর কড়া হুকুম ছিল—"বাঙ্গালার কুঠির শাসন ও সুবন্দোবস্ত করিয়া, 'ইন্টারলোপারদের' সমূলে ধ্বংসসাধন করিবে।" হেজেস ১৬৮২ খৃস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি বাঙ্গলায় আসিবার জন্য 'ডিফেন্স' জাহাজে আরোহণ করেন। এদিকে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে ইন্টারলোপারদিগের সর্দার পিটও 'ক্রাউন' নামক এক জাহাজ আরোহণে বঙ্গদেশের দিকে যাত্রা করেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষদের আদেশ ছিল—'বাঙ্গালায় পৌঁছিয়াই হুগলী কুঠির অধ্যক্ষ ভিনসেন্টকে বন্দী করিবে।' এইজন্য হেজেসের সহিত কয়েকজন গোরাসৈনিক দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, হেজেস তাঁহার বিলাতের প্রভুদের আদেশপালন করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ এই, পিট যে জাহাজে আসিতেছিলেন তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়। কাজেই হেজেসের পরে যাত্রা করিয়াও পিট তাহার এগার দিন আগে বালেশ্বরে পৌঁছিল ও তথায় প্রচার করিয়া দিল, বিলাতের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেউলিয়া হইতে বসিয়াছেন। এজন্য এক নূতন কোম্পানি গঠিত হইয়াছে।

১. উইলিয়াম হেজেস হুগলীতে আগমন করেন ১৬৮২ সালের আগস্ট মাসে; নিয়োগপত্র অনুসারে ইনি ছিলেন "Agent and Governor of all affairs and factories in the Bay of Bengal." ১৬৮৪ সালে ইনি পদচ্যুত হন।

আমিই তাহার এজেন্ট।[১]

হেজেস হুগলীতে আসিতেছেন শুনিয়া হুগলীর কুঠির অধ্যক্ষ ভিনসেণ্ট বুঝিলেন, তাহারও দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি হেজেসকে চুঁচুড়ায় ডাচদিগের বাগানে মহা সমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আত্মরক্ষার জন্য তিনি ৩৫ জন বন্দুকধারী পর্টুগীজ, পঞ্চাশজন রাজপুত ও আরও কয়েকজন দেশী সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন। হেজেস তাঁহাকে কোম্পানির আদেশপত্র দেখাইলেন। ভিনসেন্ট বলিলেন—"ইহার উত্তর আমি বিলাতে গিয়া দিব।"

এদিকে পিটও এক কাণ্ড করিয়া বসিল। সে অগ্রবর্তী হইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গেও লাল-কুর্তী-ওয়ালা পর্টুগীজ ও দেশীয় সেনা। সঙ্গে তিনখানি বাণিজ্য-জাহাজ। মহাসমারোহে তীরে নামিয়া, পিট চুঁচুড়ায় বাস করিতে লাগিল। এইস্থানে কোম্পানির কর্ম্ম-চারী ভিনসেন্টও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। ডাচ ও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের সাহায্যে পিট চুঁচুড়ায় এক বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করিল এবং হুগলীর শাসনকর্তাকে হাত করিয়া লইয়া বেশ জোরের সহিত ব্যবসা চালাইতে লাগিল। নিজেকে নূতন ইংলিস-কোম্পানির এজেন্ট বলিয়া পরিচয় দিয়া স্থানীয় শাসনকর্তার নিকট বাণিজ্যস্বত্ব ও বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণের ক্ষমতাও পাইল।

হেজেস এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বুঝিলেন, পিটকে ধ্বংস করা বা কয়েদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কাজেই তিনি ঢাকার শাসনকর্তাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিয়া পত্র-ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তখন হুগলীতে বালচন্দ্র বলিয়া বাদসাহের একজন পারমিটকর্ম্মচারী ছিলেন। মোগল শাসনকর্তা এই বালচন্দ্র এবং হুগলীর শাসনকর্তার উপর ঢাকা হইতে হুকুম পাঠাইলেন—"পিট ও তাহার সহযোগী ডরেলকে কয়েদ করিবে।" কিন্তু পিট হুগলীর মোগল শাসনকর্তাকে বুঝাইলেন, "সম্রাটের যাহা প্রাপ্য, তাহা আমি যখন দিতে প্রস্তুত, তখন আমার সঙ্গে এ সব হাঙ্গামা কেন?" ফৌজদার দেখিল, এ ব্যাপারে সরকারের লাভ হইতেছে। পিটই হউক, আর যেই হউক, সরকারের আয় বৃদ্ধি হইলেই তাহার খোসনাম। এই ভাবিয়া স্থানীয় ফৌজদার পিটের অনুকূলে মোগল শাসনকর্তার নিকট রিপোর্ট করিলেন। হেজেস এত চেষ্টা করিয়াও পিটকে উচ্ছেদ করিতে পারিলেন না। পূর্ণ এক বৎসরকাল এই ভাবেই চলিল। ক্রমাগত নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত এই সম্বন্ধে লেখাপড়া করায়, নবাব হুগলীর শাসনকর্তার উপর পুনরায় হুকুম দিলেন—"এই নূতন কোম্পানিকে উচ্ছেদ করিয়া দাও।" নূতন দল পূর্ব্ব কথিত বালচন্দ্রকে হাত করিয়াছিলেন। হুগলীর ফৌজদারও তাঁহাদের পক্ষে। অন্যপক্ষে বালচন্দ্র নবাব সায়েস্তা খাঁকে জানাইলেন—"সাবেক কোম্পানি অপেক্ষা ইহারা বড় ভাল লোক। সাবেক কোম্পানির উদ্দেশ্য সমস্ত বাণিজ্য একচেটিয়া করা। ইহাদের সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। তাহার উপর ইহারা শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক দিতে প্রস্তুত।" বলা বাহুল্য, নবাব সায়েস্তা খাঁ এই সংবাদ পাইয়াই তাঁহার পূর্ব্বাদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ইন্টারলোপারদের আর ধ্বংসসাধন হইল না।

'ইন্টারলোপার' দিগকে উচ্ছেদ করিবার জন্য হেজেস যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। এই ইন্টারলোপারদের ব্যাপার ছাড়া আরও কয়েকটি সাংঘাতিক ব্যাপারে তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। এই সময়ে মোগল শাসনকর্তাগণ, ইংরাজ-দের উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে হুগলীর বাণিজ্যকুঠির ও বাণিজ্যের অতি
উপরে বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে হুগলীর বাণিজ্যকুঠির ও বাণিজ্যের অতি
সঙ্কটময় অবস্থা উপস্থিত হয়। ঘটনাটা কি সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

সম্রাট-কুমার সাহসুজার নিকট হইতে কোম্পানি যে ফারমান বা বাণিজ্যস্বত্ব লাভ করেন, তাহাতে বঙ্গের বাণিজ্যসম্বন্ধে তাঁহাদের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। ইহার উপর নবাব সায়েস্তা

---

১. এই পিট বড় যে-সে লোক নহেন। বিলাতের ভবিষ্যৎ যুগের রাজমন্ত্রী স্বনামখ্যাত উইলিয়ম পিট ইঁহারই বংশধর।—Hedges' *Diary*, Vol I. p, 52 and 130.

খাঁর হুকুমনামাও বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের উন্নতির উত্তরসাধক হইয়াছিল। ১৬৭৭[১] খ্রীস্টাব্দে নবাব সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গলা ত্যাগ করেন। ফেদাই খাঁ তাঁহার স্থানে গবর্ণর নিযুক্ত হন। ফেদাই খাঁ, নবাব সায়েস্তা খাঁর বিধান অমান্য করিয়া, [illegible] কাজ করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের পরম সৌভাগ্য, পর বৎসর ঢাকায় ফেদাই খাঁর মৃত্যু হয় ও তাঁহার স্থানে সাহজাদা মহম্মদ আজাম নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভিনসেন্ট হুগলীর কুঠির অধ্যক্ষ। ভিনসেন্ট পুনরায় চেষ্টা করিয়া রাজকুমারের নিকট হইতে নূতনভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা লাভ করেন। (১৬৭৮)[২] । মোগল শাসনকর্তাদের নিকট এইরূপ সনন্দ আনাইতে হইলে, প্রতিবার প্রত্যেক নূতন শাসনকর্তার নিকট হইতে প্রচুর অর্থদানে নূতন সনন্দলাভ করিতে কোম্পানি আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। ইহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। এই জন্য তাহাদের আদেশে বাঙ্গলার অধ্যক্ষেরা খোদ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র আনিতে আদিষ্ট হইলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ যখন বাঙ্গলা হইতে অবসর লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া যান তখন একজন ইংরাজ-প্রতিনিধি তাঁহার অনুবর্তী হইল।

১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাহারা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে নূতন ফারমান লাভ করিলেন। এই সংবাদ হুগলীতে পৌঁছিবামাত্র ভারি ধূম পড়িয়া গেল। সম্রাটের ফারমানে লিখিত ছিল—

> ঈশ্বরের নাম জয়যুক্ত হউক। সুরাটের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মচারী যাহারা সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের প্রতি এই আদেশ হইল যে ইংরাজ কোম্পানি এ পর্যন্ত শতকরা দুই টাকা হিসাবে তাঁহাদের বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক দিয়া আসিতেছেন। এখন হইতে আদেশ হইল, তাহার উপর শতকরা দেড় টাকা হারে 'জিজিয়া' শুল্ক আদায় করা হইবে।
>
> এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে, এসকল স্থানে শওয়ালের প্রথম দিবস হইতে আমাদের রাজত্বের এই ত্রয়োবিংশতি বৎসরে ঐ সকল লোক শুল্ক হিসাবে শতকরা সাড়ে তিন টাকা ভবিষ্যতে কর দিতে বাধ্য রহিল। অন্য সকল স্থানে এই জন্য তাহাদিগকে যেন উত্যক্ত না করা হয়। রাহাদারি পেশকাস, ফরমায়েস প্রভৃতি আদায় করা আমার আদেশে রহিত হইল। কেহই এ সম্বন্ধে কোন কিছু বাজে আদায় করিতে পারিবে না। তারিখ ২৩এ সফর। রাজত্বের ২৩ বৎসরে লিখিত।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের উক্ত আদেশপত্র হইতে হিতে বিপরীত হইল।[৩] আদেশপত্রের অর্থ এদেশে অন্যরূপ দাঁড়াইল। সম্রাটের এ আদেশপত্র হইতে ইংরাজেরা বুঝিলেন, কেবল সুরাটেই জিজিয়া কর আদায় হইবে ও তজ্জন্য বর্ধিতহারে শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গদেশের মোগল শাসনকর্তারা ইহার অর্থ করিলেন—সুরাট ও অন্য সকল স্থানে বর্ধিতহারে শুল্ক দিতে হইবে। সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে পুনরায়[৪] বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিও সনন্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ইংরাজদের উপর 'জিজিয়া' প্রচলন করিলেন।

ইহার উপর এই সময়ে বালচন্দ্র রায়ের অত্যাচারে[৫] ইংরাজের হুগলীর বাণিজ্য অতি

---

১. সায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদারি হইতে অপসারিত হন ১৬৭৮ সালে। তাহার উত্তরাধিকারী ফেদাই খাঁ মাত্র কয়েকমাস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার পর পদচ্যুত হন (১৬৭৮)। এই বছরেই নতুন সুবাদার নিযুক্ত হন সাহাজাদা মহম্মদ আজম (জুলাই ১৬৭৮-অক্টোবর ১৬৭৯)।

২. Stewart's *Bengal* p. 190-91.

৩. The English traders interpreted this *farman* to mean that these goods at *Surat only* were to be subjected to a 3½ percent duty, while 'at other places' they were to be free not only from such duties, but also the yearly tributes, like the one paid by them in Bengal. The Mughal officials however contended that a 3½ percent duty was to be uniformly levied throughout India, See B. Gupta *Sirajudalla and the E. I. Co. Background to the Foundation of British power in India*, p. 4-5.

৪. সায়েস্তা খাঁর পুনর্নিয়োগ কাল, ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রী.।

৫. বালচন্দ্র রায় সম্রাটের তরফে হুগলীর পরমিট-শুল্কের অধ্যক্ষ ছিলেন। আজ কাল যাহাকে Superintendent Of Customs বলে, ইহা সেই পদ। বালচন্দ্র ইংরাজ কোম্পানির উপর আন্তোপান্তই নারাজ ছিলেন। পরমেশ্বর দাস তাঁহারই সহকারী কর্মচারী।

সংকট অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে পরমেশ্বর দাসও উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। সে নানাপ্রকারে ইংরাজদের উত্ত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল। হেজেস এই বিপদের প্রতিকারের জন্য স্বয়ং ঢাকায় গিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। হেজেস মনে মনে স্থির করিলেন, কাশিমবাজার ঘুরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। জোব চার্নক কাশিমবাজারে আছেন। তিনি একজন প্রধান ও অভিজ্ঞ কর্মচারী। তাঁহার সহিত একটা পরামর্শ করা প্রয়োজন।

পরমেশ্বর দাস যখন শুনিলেন যে ইংরাজ গবর্ণর হেজেস তাঁহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার জন্য ঢাকায় যাইতেছেন, তখন তিনি বড়ই চটিয়া গেলেন। এই ব্যাপার লইয়া উভয়পক্ষে অনেক বাদ-প্রতিবাদ ও লেখালেখি পর্যন্ত হইয়া গেল। কিন্তু পরমেশ্বর দাসের এমন কোন ক্ষমতা নাই, যে তিনি হেজেসকে আটকাইয়া রাখিতে পারেন। কাজেই হেজেসের ঢাকায় যাওয়া বন্ধ হইল না।

দুইখানি বজরা ও কয়েকখানি এদেশীয় নৌকা সজ্জিত হইল। ২৩ জন ইংরাজ শরীররক্ষী, পনেরজন রাজপুত ও কয়েকজন পদাতিক লইয়া গবর্ণর হেজেস ১০ই অক্টোবর ঢাকার দিকে শুভযাত্রা করিলেন। এই বছর সমেত কাশিমবাজার ত্যাগ করিয়া হেজেস সর্বপ্রথমে হুগলীতে ইংরাজ-কোম্পানির বাগানে উপস্থিত হন।

হেজেস যাহাতে নিরাপদে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ না করিতে পারেন, পরমেশ্বর দাস এজন্য বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এতদর্থে সে গুপ্তভাবে কতকগুলি লাঠিয়াল ও বন্দুকধারী সেনা সংগ্রহ করিয়া নিশাকালে ইংরাজ পক্ষকে নদীর উপরেই আক্রমণ করে। ইংরাজদের দুইখানি বোট তাহার হস্তগত হয়। ইংরাজপক্ষীয়গণ এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন, হয়ত ইহা ডাকাতি। কিন্তু ঘটনার অবস্থা তদন্তে বোধ হইল, ইহা যে সে ডাকাতের কাজ নহে। নিশ্চয়ই পরমেশ্বর দাস এ ব্যাপারের মধ্যে আছে। হেজেস যদি সাহসের সহিত বন্দুক চালাইতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত প্রকৃত ডাকাতদের পথ দেখিতে হইত। কিন্তু হেজেসের মনে একটা দৃঢ়সংস্কার জন্মিল, ইহা প্রকৃত ডাকাতি নহে, পরমেশ্বর দাসের রাহাজানি মাত্র। পরমেশ্বর দাস মোগল-বাদসাহের কর্মচারী। তাহার দলের লোকজনকে নিহত করিলে পরে মহা বিপদে পড়িতে হইবে, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া হেজেস এই হাঙ্গামার পর ভাগীরথীবক্ষ ত্যাগ করিয়া সুন্দরবনের পথ ধরিয়া ঢাকা গমনে সংকল্প করিলেন।

২০এ অক্টোবর হেজেস জলঙ্গী ও গঙ্গার সঙ্গম স্থানের অনতিদূরে উপস্থিত হন। কালকাপুরে পৌঁছিলে, জোব চার্নক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। চার্নকের সহিত উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার অনেক কথাবার্তা ও পরামর্শ হয়।

ইহার পাঁচদিন পরে, অর্থাৎ ২৫এ অক্টোবর, হেজেস ঢাকায় উপস্থিত হন। তখন নবাব সায়েস্তা খাঁ ঢাকার লালবাগে থাকিতেন। এই স্থানেই তাঁহার দরবারাদি হইত। লালবাগ ইষ্টক নির্মিত দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল।১

হেজেস ঢাকায় উপনীত হইয়া, দেড়মাস কাল নবাবের দর্শনাশায় অপেক্ষা করিলেন। দেড়-মাসের পর তিনি সায়েস্তা খাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন। হেজেস সায়েস্তা খাঁর নিকট যে সমস্ত আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন, নবাব তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি দান করিলেন।২

এত কষ্ট করিয়া ঢাকায় আসিয়া হেজেস নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট তাঁহার প্রার্থিত দাবিগুলি পাইলেন বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার কোন বিশেষ ফল দেখিতে পাইলেন না।

১. সায়েস্তা খাঁর এ দুর্গের চিহ্ন এখন কিছুই নাই। নদীও অনেকদূরে সরিয়া আসিয়াছে। এখন কেবল একটি পুরাতন ভগ্ন মসজিদ ও সায়েস্তা খাঁর কন্যা পিয়ারে বিবির শ্বেত মর্মরময় সমাধিস্তম্ভ ভিন্ন পুরাতনের চিহ্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

২. আশা-সাফল্যে উৎফুল্ল হইয়া হেজেস তাঁহার রোজনামচার একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন—"I bless God for this great success I have had, beyond all men's expectations in my voyage to Dacca."

ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। অত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিয়া এবং বিপদ মাথায় লইয়া ঢাকায় গিয়া সম্রাটের প্রতিনিধি নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন ফলই হইল না দেখিয়া তিনি বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন, সায়েস্তা খাঁর অনুকূল আদেশসত্ত্বেও সম্রাটের কর্মচারীরা, কোম্পানির কর্মচারীদের সহিত পূর্ববৎ বিবাদ-বিসম্বাদ করিতেছে। এত ব্যাপারের পরও সেই উপদ্রব, সেই অত্যাচার, সেই অশান্তি। বালচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে কোন উৎপাত না করিলেও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী পরমেশ্বর দাসকে ভিতরে ভিতরে টিপিয়া দিলেন। পরমেশ্বর দাস প্রভুর প্রীতিসম্পাদন জন্য কোম্পানির বাণিজ্য-দ্রব্যবাহী নৌকাগুলি আটক করিতে লাগিল। নৌকা হইতে ইংরাজ কোম্পানির মালামাল জোর করিয়া উঠাইয়া লইতে লাগিল। তখন হেজেস স্পষ্ট বুঝিলেন, পূর্ববৎ উৎকোচ প্রদান ভিন্ন মোগল-কর্মচারীদের অত্যাচার প্রতিকারের আর কোন উপায়ই নাই। যথা পূর্বং তথা পরং। বাহিরের শত্রুর ত এই অবস্থা ইহার উপর হেজেস কয়েকদিন হুগলীতে থাকিয়া বুঝিলেন, কুঠির ইংরাজ কর্মচারীরা অতি অসংযত ও অবাধ্য। প্রধান কুঠির অধীনস্থ অন্যান্য বাণিজ্য কুঠির অবস্থাও এইরূপ বিশৃঙ্খল। হেজেস মনে মনে মতলব স্থির করিলেন, ঘরের শত্রু দমন না হইলে বহিঃশত্রুর তিনি কিছুই করিতে পারিবেন না। ইহার পর গবর্ণর হেজেস কি করিলেন, পরের পরিচ্ছেদে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।

নবম অধ্যায়

কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের প্রথম গবর্ণর হেজেস সাহেব

গবর্ণর হেজেস কর্তৃক কুঠির অভ্যন্তরীণ গোলযোগ মীমাংসা-চেষ্টা—কোম্পানির কর্মচারিগণের মধ্যে আত্মবিবাদ—তাঁহাদের আনীত অভাব অভিযোগের তদন্ত—ইন্টারলোপার বা গুপ্ত-বণিকদিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি—এতজ্জন্য কোম্পানির ব্যবসায়ের ক্ষতি—ইন্টারলোপার বা গুপ্ত ব্যবসায়ীদের দমন চেষ্টা—এ চেষ্টার ফলে হেজেসের সহিত জোব চার্নকের মনান্তর—অনন্তরামের ব্যাপার—নানাবিধ অভিযোগের নিষ্ফল তদন্ত—হেজেসের পদচ্যুতি—তৎপদে গিফোর্ডের নিয়োগ—গিফোর্ডের আগমনে নূতন বিশৃঙ্খলা—তাঁহার মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন—বেয়ার্ডের এজেণ্ট বা গবর্ণর পদে নিয়োগ—শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য বেয়ার্ডের ব্যর্থচেষ্টা—ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া বেয়ার্ডের হুগলীতে মৃত্যু—ইংরাজজাতির শক্তি-নীতি প্রতিষ্ঠার মূল—হেজেস—তৎকর্তৃক সাগরদ্বীপে দুর্গ প্রতিষ্ঠার কল্পনা—বাহুবলই আত্মরক্ষার উপায়—ভবিষ্যতের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হেজেসের কল্পনার ফল—আত্মরক্ষার জন্য দুর্গনির্মাণে বিলাতের কর্তাদের আশঙ্কা ও আপত্তি—মোগলের সহিত বিবাদে অনিচ্ছা—পরে এ সঙ্কল্প পরিবর্তন—চট্টগ্রামে ইংরাজের প্রথম দুর্গ নির্মাণ সংকল্প—ইংলণ্ডেশ্বর জেমসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা—মোগল রাজ্য আক্রমণ জন্য বিলাতে নৌ-বাহিনী সংগ্রহ—সম্রাট জেমসের সহানুভূতি—সুরাটকে কেন্দ্র করিয়া মোগলের সহিত শত্রুতার সংকল্প—বঙ্গদেশেও এই প্রকার প্রতিযোগিতার প্রস্তাব—কোম্পানি কর্তৃক চট্টগ্রাম আক্রমণ সংকল্প।

বিলাতের কর্তাদের নিয়োগ মতে, এই উইলিয়াম হেজেসই ধরিতে গেলে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্ণর বা এজেণ্ট। ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া হেজেস প্রথমত তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের সায়েস্তা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কোম্পানির বাণিজ্যাধিকার গবর্ণর হইলেও তাঁহার অধীনে একটি মন্ত্রণাসভা ছিল। কোম্পানির প্রধান কর্মচারীবর্গ লইয়াই এই সভা গঠিত হইত। তখন এই সভায় জোব চার্নক, জন বেয়ার্ড, জন রিচার্ড, ফ্রান্সিস এলিস, জোসেফ ডড ও উইলিয়াম জনসন বলিয়া সাত জন সদস্য ছিলেন।

হেজেস যদি একটু মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া বিবেচনার সহিত কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইত না। ঢাকায় অবস্থানকালে তিনি জোব চার্নকের চরিত্রের বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিয়া আসেন। এই জোব চার্নকই মন্ত্রীসভার অভিজ্ঞ সদস্য এবং বহুদিন ধরিয়া তিনি কোম্পানির কর্মচারীরূপে নানাস্থানের বাণিজ্য-কেন্দ্রে কাজ করিয়াছেন। হেজেস এই অবস্থাভিজ্ঞ জোব চার্নককে সন্দেহ করিয়া এক মহাভ্রমে পড়িলেন।

এই মন্ত্রী সভা বা কাউন্সিলের মধ্যে উইলিয়াম জনসন বলিয়া এক অপরিণত বয়স্ক যুবক ছিলেন। হেজেস এই যুবককে বড়ই স্নেহ করিতেন। এই যুবক জনসনের উপর তাঁহার খুব বিশ্বাস। কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীদের তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। কাজেই তাঁহার প্রিয়পাত্র জনসনকে তাহাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত করেন। জনসন এই নূতন চাকরি পাইয়া অন্যান্য সদস্যগণের ছিদ্রান্বেষণে নিযুক্ত রহিলেন। অনেকের অনেক গুহ্যকথা হেজেসের কানে তুলিয়া তাঁহার কান-ভারি করিতে লাগিলেন।

একদিন জনসন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য জন বেয়ার্ডের একখানি গুপ্ত-চিঠির সন্ধান হেজেসকে বলিয়া দেন। এই চিঠিখানি হেজেসের বিরুদ্ধে অভিযোগে পূর্ণ। বেয়ার্ড এই চিঠি-

খানি হেজেসকে না জানাইয়া গোপনে বিলাতের কর্তাদের নিকট পাঠাইতেছিলেন। গোয়েন্দা জনসন এই চিঠিখানি সংগ্রহ করিয়া হেজেসকে পড়িতে দেন। হেজেস সে চিঠিখানি পড়িয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন এবং সেই পত্রখানি বিলাতে না পাঠাইয়া নিজের কাছে রাখিলেন। এই পত্রে বেয়ার্ড তাঁহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহার যথার্থতা প্রমাণ করাইবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

মন্ত্রীসভার সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে বেয়ার্ডকে অভিযুক্ত করিবার জন্য হেজেস হুগলীতে আসিলেন। কিন্তু কার্যকালে তাঁহার সাহসে কুলাইল না। তিনি বেয়ার্ডের কিছু করিতে না পারিয়া কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিস এলিসের উপর পড়িলেন। একজন গোয়েন্দা সংবাদ দিল, এলিস সাহেব চারি হাজার টাকা ঘুষ লইয়া কোম্পানির গুদামের কতক মাল সরাইয়া দিয়াছেন। এলিসের বিরুদ্ধে প্রমাণও অনেক পাওয়া গেল। এলিস স্বমুখে নয়শত টাকা ঘুষের কথা স্বীকার পর্যন্ত করিলেন। অনেক এদেশী মহাজন এলিসের শত্রু ছিল তাহারাও সুযোগ বুঝিয়া এলিসের অপরাধ প্রমাণের সহায়তা করিল। ইহার ফল এই হইল যে এলিসের চাকরিটি গেল। বিলাতের কর্তারা হেজেসের হস্তে বাহাল ও বরতরফের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। হেজেস এলিসকে কর্মচ্যুত করিলেন এবং জোসেফ উড নামক একব্যক্তি তাঁহার স্থানে কোম্পানির মালখানার কর্তা নিযুক্ত হইলেন।[১]

পাঠক! মনে রাখিবেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখন ব্যবসায়ী বণিকসম্প্রদায় ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। এদেশের উৎপন্ন দ্রব্য খরিদ করা, আর জাহাজে করিয়া বিলাতে চালান দেওয়া এবং বিক্রয়ান্তে তাহার লাভ-ভাগী হওয়াই তাঁহাদের প্রধান কার্য। যে যে স্থানে তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠি ছিল, সেই সেই স্থানের কার্য নির্বাহ করিবার জন্য যে সকল ইংরাজ কর্মচারী থাকিতেন, তাঁহাদের পরিচালিত করিবার জন্য একজন কর্তা থাকিত। এই কর্তাই 'এজেন্ট বা গবর্ণর' ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত হইতেন। কাউন্সিল বা মন্ত্রণা-সভা, বর্তমান কালের রাজ্য পরিচালনের সভা নহে, বিদ্যমানকালের লাট-কাউন্সিলও নহে। কোম্পানির এই সব কাউন্সিলে, কেবল কোম্পানির বাণিজ্যস্বার্থ, ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির কথা, কর্মচারীদের দোষগুণের বিচার, ডিক্রি, ডিস্‌মিস্‌ এই সবই আলোচিত হইয়া এক নির্দিষ্ট প্রণালীমতে লিপিবদ্ধ হইত। হেজেস এই ভাবেই হুগলীর কুঠির শাসনকর্তা বা গবর্ণর ছিলেন। পাঠক মনে রাখিবেন, তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রী-সভা, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় মন্ত্রী-সভা বই আর কিছুই নহে।

এই সময়ে 'ইন্টারলোপার'দিগের উৎপাত বড়ই বেশী হইয়া পড়ে। 'ইন্টারলোপার'দের উৎপাতে কোম্পানি বাহাদুরের ব্যবসা মাটি হইতে ছিল। 'ইন্টারলোপার[২] কথাটি কি, পাঠককে একটু বুঝাইয়া বলিব।

কোম্পানির যে সমস্ত কর্মচারী তখন এদেশে ছিলেন, তাঁহারা ধরিতে গেলে একরূপ ইংলণ্ড হইতে নির্বাসিত রূপেই থাকিতেন। তখন স্টীমার ছিল না, আল্‌পস্‌-পর্বত-বক্ষভেদী ওভার-ল্যাণ্ড রেল ছিল না, সুয়েজের সোজাপথ ছিল না, দ্রুতগামী মেল-স্টীমারও ছিল না। বিলাত হইতে এক খানা জাহাজ যাওয়া আসা করিতে একটি বৎসর কাটিয়া যাইত। পাঠকের যেন মনে থাকে, এই সমস্ত জাহাজ আজকালকার বৈদ্যুতিক আলোকশোভিত প্যাসেঞ্জার-স্টীমার নহে—পাইল-ওয়ালা জাহাজ মাত্র।

কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা অনেকদিন এদেশে বাস করিয়া মালামাল খরিদ ও চালানি কাজে অভিজ্ঞ হইতেন, আড়ঙ্গের কাজ বুঝিতেন, তাঁহারা স্পষ্টচক্ষে দেখিলেন—

১. Hedges' *Diary,* Vol II. p. 18-19 and p. 43-44.

২. 'One in former days who traded without the license, or outside the service, of a Company (such as the EIC) which had a charter of monopoly...Perhaps it is an English corruption from ***outlookers*** 'to evade, escape, run away from',—***Hobson-Jobson,*** New Ed. p. 438.

গোপনভাবে বেনামিতে ব্যবসা চালাইলে বেশ দু'পয়সা উপরি রোজগার হয়। কিন্তু এ গুপ্ত-ব্যবসা চালাইতে হইলে কিম্বা তদুদ্দেশ্যে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মালামাল চালান দিতে গেলে কোম্পানির দস্তক ছাড়[১] ও নিশান ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই। কোম্পানির ছাড় ও দস্তক না থাকিলে, মোগলের কুতঘাটার কর্মচারীরা নৌকা আটক করিত। এবং তাহা যে কোম্পানির নৌকা, তাহার প্রমাণ না পাইলে ক্রোক পর্যন্ত করিত। এইজন্য কোম্পানির কর্মচারীরাই অসদুপায়ে অর্থলোভের জন্য প্রভুদের অধিকৃত বাদসাহী সহি-মোহর যুক্ত 'ছাড়' ও "নিশান' ব্যবহার করিয়া বাণিজ্য চালাইতেন। তাঁহাদের এই গুপ্ত ব্যবসায়ে কোম্পানির যথেষ্ট লোকসান হইত। কোম্পানির কর্তারা বিলাত হইতে এই সমস্ত 'ইন্টারলোপার' দমনের জন্য বহুবার আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু রক্তবীজের ন্যায় ইহাদের দল পরিপুষ্ট হওয়ায় এ দেশীয় কর্তারা ইহাদের আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। আর এক শ্রেণীর 'ইন্টারলোপার' ছিল—তাহারা ইংরাজ বটে, কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেতনভোগী কর্মচারী নহে। ইহাদের দল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশক্তি ছিল, কিন্তু কোম্পানির কর্মচারী নহে বলিয়া শাসন করিবার ক্ষমতাও কোম্পানির কর্তাদের ছিল না।

কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা বেনামি বাণিজ্য করিতেন বা অন্য কোন উপায়ে কোম্পানির ব্যবসায় হানি করিতেন, হেজেস তাহাদের দমনের জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন সেই চেষ্টা কার্যে পরিণত করিলেন। দ্বিতীয়বার কাশিমবাজারে আসিয়া তিনি সর্ব প্রথমেই নেলর নামক একজন কর্মচারীকে পাকড়াও করিলেন।

হেজেসের সম্বন্ধে আমরা একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি, তাহার কারণ এই, কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী জোব চার্নকের সহিত এই হেজেসের বিশেষ সম্বন্ধ। চার্নকের প্রধান শত্রু ছিলেন এই হেজেস! হেজেসই চার্নকের চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। হেজেস তাঁহার কার্যকালের একখানি ডায়ারি[২] বা রোজনামচা রাখিয়া গিয়াছেন। কোম্পানির পুরাতন আমলের ইতিহাসের কথা ইহাতে অনেক আছে। এই হেজেস-ডায়ারি ইতিহাসের হিসাবে অতি মূল্যবান সম্পত্তি।

কাশিমবাজারের কুঠির কর্তা ছিলেন জোব চার্নক। নেলর, জোব চার্নকের অধীনস্থ কর্মচারী। ইনি কোম্পানির গুদামে রেশমের 'রং-দার' বা Dyer ছিলেন। তখন কাশিমবাজার রেশম-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। অপরিষ্কৃত রেশম, ও বাফ্‌তা এখানে প্রচুরভাবে উৎপন্ন হইত। কাশিমবাজারের কোম্পানির কর্মচারীদের অনেকে এই রেশমের গুপ্ত-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। হেজেসের নিয়োজিত পূর্ব কথিত জনসন তাঁহাকে সংবাদ দিল—বেনামে রেশম ও বাফ্‌তা কিনিবার প্রধান সহায় এই নেলর। আর জোব চার্নক তাঁহার প্রধান মুরুব্বি। হেজেস কাউন্সিলের প্রকাশ্য অধিবেশনে নেলরের অপরাধের বিচার করিলেন। নেলরের নিজের হাতে লেখা, চিঠিপত্র হইতেও প্রমাণ হইল যে, অভিযোগ-কথা আদৌ মিথ্যা নহে। হেজেস আদেশ দিলেন—"নেলর নজরবন্দী হইয়া থাকিবে এবং তাহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও কাগজ-পত্রাদি ক্রোক হইবে।"

ইহার পর হেজেস জোব চার্নকের উপর পড়িলেন। চার্নক বহুদিন এদেশে আছেন। চার্নককে ধরিতে হইলে তাহার গুপ্তজীব হার্ডিংকে প্রথমে ধরা আবশ্যক। এই হার্ডিং ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির রাইটার হইয়া আসেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ইঁহার চাকরি যায়। জোব চার্নক

১. "A pass or permit. The *dustucks* granted by the Company's covenanted servants in the early half of the 18th century seems to have been a constant instrument of abuse, or bone of contention, with the native authorities of Bengal"—*Hobson-Jobson*, New Ed. p. 334.

২. *The Diary of William Hedges*, edited by Henry Yule, Hakluyt Society Publications, 3 Vols, London, 1887-89.

ইঁহাকে বেতনভোগী নিজস্ব কর্মচারী রূপে নিয়োগ করেন। ফ্যাক্টরির অন্যান্য কর্মচারীরা হার্ডিং-এর শত্রু ছিল। তাহারাই চেষ্টা করিয়া হার্ডিং-এর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করাইল ও সাক্ষ্য-সাবুদ জোগাড় করিতেও ত্রুটি করিল না।

চার্নকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই, তিনি অনন্তরাম নামক এক বদমায়েসকে কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।[১] চার্নক যতদিন কাশিমবাজারে আসিয়াছেন ততদিন অনন্তরাম, তাঁহার অধীনে কর্মচারীরূপে নিয়োজিত রহিয়াছে। অনন্তরামকে তলব করিয়া এই কথার প্রমাণ লওয়া হইল বটে, কিন্তু হেজেস চার্নকের বিরুদ্ধে কোন কিছু কঠোর আদেশ প্রদান করিতে পারিলেন না। জোব চার্নক তখন এদেশে একজন মতাশালী লোক ছিলেন। তাঁহার উপর জুলুম করিলে একটা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে, ইহা ভাবিয়া হেজেস চার্নকের কিছু করিতে না পারিয়া ওয়াটসন নামক আর একজন কর্মচারীর উপর পড়িলেন।

ওয়াটসনের এই অস্বাভাবিক স্পর্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া হেজেস তাহাকে সাসপেন্ড সর্বদাই লোকের সহিত বিবাদ করে, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। হেজেস কোম্পানির কর্মচারীদের সংযত ও শিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কাজেই তিনি ওয়াটসনকে তলব করিয়া পাঠান।

ওয়াটসন এই কথা শুনিয়া রুষ্টভাবে প্রত্যুত্তর দিয়া পাঠাইল, "এজেন্ট হেজেস সাহেবকে বলিও, তিনিও কোম্পানির কর্মচারী, আর আমিও বিলাত হইতে কোম্পানি কর্তৃক এই কর্মে বাহাল হইয়াছি। তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই যে আমাকে কার্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে পারেন।"

ওয়াটসনের এই অস্বাভাবিক স্পর্ধা সহ্য করিতে না পারিয়া হেজেস তাহাকে সাসপেন্ড করিলেন। ইতিপূর্বে এলিসও কর্মচ্যুত হইয়াছিলেন। হেজেসের সর্বাপেক্ষা প্রবল শত্রু হইলেন জোব চার্নক। তিনি প্রকাশ্যভাবে সকলের সাক্ষাতে বলিতে লাগিলেন, "হেজেসের দিন ফুরাইয়াছে। কোম্পানি তাঁহাকে শীঘ্র জবাব দিবেন।" মোট কথা এই, একদিকে জোব চার্নক ও তাঁহার বন্ধুগণ এবং অন্যদিকে একা হেজেস। হেজেস নিজের বুদ্ধির দোষে শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন মাত্র। এজেন্ট বা প্রধান হইয়াও তিনি তাঁহার অধীনস্থদিগের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব হারাইলেন।

জোব চার্নক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই পরিণামে সত্য হইল। ১৬৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুলাই 'টমাস' নামক একখানি জাহাজ মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া পেঁাছে। এই জাহাজের অধ্যক্ষ হো সাহেব হেজেসকে জানাইলেন, 'কোম্পানি আপনাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। বেয়ার্ড সাহেব বাঙ্গালার এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। গিফোর্ড করমণ্ডল উপকূল ও বঙ্গদেশের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।" হেজেস এ হুকুম প্রাপ্তে পদত্যাগ করিলেন এবং কোম্পানির বঙ্গীয় বাণিজ্য কুঠিগুলি পুনরায় পূর্ববৎ মান্দ্রাজের কর্তাদের অধীন হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা হারাইল।

জুলাই এর মধ্যভাগে হেজেস বিলাতের কর্তাদের নিকট পদচ্যুতি পত্র প্রাপ্ত হন এবং নূতন প্রেসিডেন্ট গিফোর্ড সাহেবও হুগলীতে উপস্থিত হয়েন। গিফোর্ড হুগলীতে পেঁাছিবার অর্ধ-ঘন্টা পরেই, কাউন্সিলের সদস্যগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার সেক্রেটারী সর্বসমক্ষে কোম্পানির শীলমোহর যুক্ত কমিশন বা তাঁহার নিয়োগপত্র পাঠ করিলেন।

হেজেস কার্যক্ষম ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বড়ই দুর্বলচিত্ত বলিয়া, তাঁহার অভীপ্সিত কার্যগুলি সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। অন্যপক্ষে গিফোর্ডের অন্য কোন বিশেষ গুণ থাক আর নাই থাক, অপরের কৃতকার্যগুলি নষ্ট করিতে তিনি খুব মজবুত ছিলেন। কাজেই গিফোর্ড বাঙ্গলার ফ্যাক্টরিতে আসিয়া নানা বিশৃঙ্খল ও গোলযোগ বাধা-

---

১. এই অনন্তরামের কথা পূর্বে বলিয়াছি। অনন্তরাম একজন মহাজনকে বিনাদোষে ফাটকবন্দী করিয়া তাহাকে নির্দয় প্রহার করে। মনের দুঃখে সেই মহাজন উজ্জনে প্রাণত্যাগ করেন। মিঃ ভিনসেন্টের আমলে এই ঘটনা হয়। বিলাতের কর্তারা এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার তদন্তের আদেশ পর্যন্ত দেন।

হইয়া দিলেন। বঙ্গদেশের [illegible] একটা [illegible] মধ্যে ফেলিয়া তিনি মান্দ্রাজে চলিয়া যান।

অগত্যা বেয়ার্ড বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যাগারসমূহের কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কিন্তু তিনি বড়ই দুর্বলচিত্ত, এজন্য কাজকর্মের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা আনিতে পারিলেন না। দেশীয় শাসনকর্তাদের সহিত নানাবিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত করিলেন। শেষে সকল দিক সামলাইতে গিয়া অতিরিক্ত চিন্তা ও পরিশ্রমের ফলে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে মৃত্যু তাঁহার সকল যন্ত্রণা শেষ করিল। হুগলীতে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইল।

হেজেসের রোজনামচায় সেই সময়ের ইতিবৃত্ত অতি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইজন্যই আমরা হেজেস সম্বন্ধে এতকথা বলিলাম। অপরন্তু প্রকারান্তরে তিনি এদেশে ইংরাজ জাতির শক্তিপ্রতিষ্ঠার বীজ অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছেন। কেন তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে যাঁহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যাগার সমূহ পরিচালনার জন্য এজেণ্ট বা কর্তা হইয়া আসিতেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির প্রতিনিধি-সওদাগর বা মালামাল আমদানি-রপ্তানির বড়কর্তা। হেজেসও তাই ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে আসিয়া বুঝিলেন, ইংরাজ কোম্পানি বা অন্য কোন ইউরোপীয় কোম্পানি, যাহারা বাণিজ্যার্থে এদেশে আসিয়াছে, তাহারা ধরিতে গেলে মোগল-বাদসাহের প্রজা। ভারতের নানা উপকূলে, বন্দরে বা মধ্যবর্তী ভূভাগে, বাণিজ্য করিবার স্বত্ব এই মোগল রাজকর্মচারীদের নিকটই লইতে হইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মোগল রাজকর্মচারীরা উৎকোচপরায়ণ বলিয়াই হউক বা পদমর্যাদাজনিত আত্ম-ম্ভরিতাবশেই হউক, অনেক সময়ে বাদসাহী ছাড়ের স্বত্বগুলি আমলে আনিতেন না বা অপরকে আনিতে দিতেন না। এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া ইংরাজ কোম্পানিকে মোগলের প্রতিনিধি শাসন-কর্তাদের নিকট অনেক দরবার করিতে হইয়াছে, অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে, অনেক উৎকোচ প্রদান করিতে হইয়াছে। এই সমস্ত বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায়, যদি মোগলের অতটা মুখাপেক্ষী না হইয়া বাহুবল দ্বারা আত্মশক্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে বোধ হয় সুফল ফলিতে পারে—মোগল শাসনকর্তারাও ভয় পাইতে পারেন—এই কল্পনা হেজেসের মনেই প্রথম উদিত হয়। ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সাগরদ্বীপে একটি কেল্লা করিবার মতলব করেন। কিন্তু বিলাতের কর্তারা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া হেজেসের কথায় ততটা মনোযোগ প্রদান করেন নাই। হেজেসের এই কল্পনাই ভবিষ্যতে কলিকাতায় পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ।

মোটের উপর কথা হইতেছে এই—বিলাতের কর্তাদের প্রধান লক্ষ্য এদেশে বাণিজ্য ও তদ্দ্বারা অর্থলাভ। মোগল তখন দেশের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কুম্ভীরের সহিত বিবাদ করিয়া জলে বাস যেরূপ অসম্ভব সেইরূপ মোগলের সহিত শত্রুতা করিয়া এদেশে বাণিজ্য করাও অসম্ভব। কিন্তু হেজেসের এ আত্মরক্ষার প্রস্তাব একবারে উপেক্ষিত হয় নাই। কথাটা বিলাতের কর্তাদের অনেকটা মনে লাগিয়াছিল। কিন্তু মোগলশক্তির সহিত কোন সংঘর্ষ উপস্থিত হইলেই ইংরাজের প্রতিপক্ষ ব্যবসায়ী দিনেমারেরা মোগলের সাহায্য করিবে। কেবলমাত্র বোম্বাই হইতে মোগলের সহিত শত্রুতা করা চলিতে পারে। বাঙ্গলায় এরূপ একটা কোন কিছু করিতে হইলে চট্টগ্রামের মত সমুদ্রতীরবর্তী স্থানই আশ্রয়কেন্দ্র করা উচিত। কিন্তু তাহার পথেও বহু বাধা বিঘ্ন।

যাহা হউক পরিশেষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া পড়ায় বিলাতের কর্তারা মোগলের সহিত শত্রুতা করিতে মনস্থ করিলেন। বাণিজ্য-প্রতিভার সহিত বাহুর শক্তিকে মিলিত করিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল।

ব্যাপারটা এই সময়ে খুব অগ্রসর হইল। বিলাতের কর্তারা এজন্য সম্রাট দ্বিতীয় জেমসের

সহায়তা ও অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডেশ্বর জেমস ইহাতে আপত্তি করিলেন না। তাঁহার আদেশে মোগলরাজ্য আক্রমণ জন্য নৌ-বাহিনী সংগৃহীত হইল। সুরাটের কর্তাদের উপর তখনিই আদেশ হইল, "তোমরা সুরাট ছাড়িয়া বোম্বেতে একত্রিত হও। মোগলের অন্তর্গামী ও বহির্গামী জাহাজসমূহ আক্রমণ ও লুণ্ঠন কর।" এইরূপ শত্রুতা করিবার জন্য অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজও বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। হুকুম হইল যে, জাহাজগুলি প্রথমে উড়িষ্যার উপকূলে বালেশ্বরে পৌঁছিবে। তথা হইতে হুগলী কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের কর্মচারীদের সেই জাহাজে তুলিয়া লইয়া সরাসর চট্টগ্রাম যাত্রা করিবে। হুকুমটা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইল যে, যে সকল দুর্গ, নগর বা কেল্লা এ যুদ্ধফলে ইংরাজেরা বাহুবলে দখল করিবেন, জোব চার্নক তাহার গবর্ণর বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হইবেন।[১]

১. Hedges' *Diary*, Vol II. p. 51-58.
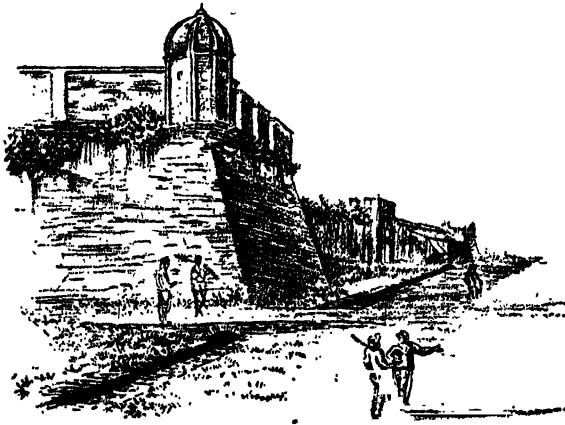
দশম অধ্যায়

কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাকারী জোব চার্নক

কোম্পানি বাহাদুরের দুর্গ-নির্মাণ সংকল্প, কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা—বাহুবলই শ্রেষ্ঠবল—হুগলীতে দুর্গ-নির্মাণের অসুবিধা—চট্টগ্রামে দুর্গ-নির্মাণ সঙ্কল্প—জোব চার্নকের উপর এ মহা সমস্যার মীমাংসাভার—কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের পূর্ব কথা—কাশিমবাজারে তাঁহার প্রথম নিয়োগ—পাটনায় কুঠির অধ্যক্ষতালাভ—চার্নকের হিন্দুপত্নী সম্বন্ধীয় প্রবাদ—চার্নকের হিন্দুপত্নী গর্ভজাত সন্তানসন্ততি—মৃতপত্নীর সমাধির উপর মোরগবলির কিম্বদন্তী—এ দেশবাসীর প্রতি চার্নকের সহানুভূতি—বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা—নবাব সায়েস্তা খাঁর আমল—ইংরাজ কোম্পানির উপর তাঁহার অত্যাচার—মোগল কর্মচারীদের নিকট জোব চার্নকের বিরুদ্ধে অভিযোগ—চার্নকের হুগলীতে পলায়ন—হুগলীর কুঠির এজেন্ট পদে নিয়োগ—ইংরাজদের সেনাবৃদ্ধির সংবাদে মোগল শাসনকর্তাদের আতঙ্ক—হুগলীতে হুলস্থুল ব্যাপার—মোগল-সেনা কর্তৃক হুগলী অবরোধ—ইংরাজদের সহিত মোগল-সৈন্যের সংঘর্ষ—ইংরাজদের রক্ষার জন্য চার্নকের বিবিধ বন্দোবস্ত—চার্নকের আদেশে রিচার্ডসন কর্তৃক মোগলের তোপখানা আক্রমণ—ইংরাজ হস্তে হুগলীর মোগল-ফৌজদারের পরাজয় ও পলায়ন—চার্নকের আদেশে হুগলীর উপর গোলাবর্ষণ—মোগলের সহিত সন্ধির চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া চার্নকের হুগলী হইতে পলায়ন—সুতালুটিতে আশ্রয় গ্রহণ—সেই সময়ে সুতালুটির অবস্থা—নবাব সায়েস্তা খাঁ কর্তৃক হুগলীর রক্ষার বন্দোবস্ত—নবাবের নিকট চার্নকের সন্ধি প্রার্থনা—সন্ধির শর্তগুলির মীমাংসার জন্য ভরমলের সুতালুটিতে আগমন—সন্ধি পত্র সম্বন্ধে নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রতারণা—ইংরাজ বণিকদিগের বিরুদ্ধে তৎকর্তৃক যুদ্ধায়োজন—চার্নকের সুতালুটি হইতে পলায়ন—মেটিয়াবুরুজের থানাদুর্গ অধিকার—হিজলীতে আগমন—নিকলসন কর্তৃক হিজলী অধিকার—হিজলীর শাসন-কর্তা মালেক কাশেমের পলায়ন—চার্নক কর্তৃক হিজলী রক্ষার বন্দোবস্ত—চার্নক কর্তৃক বালেশ্বর লুণ্ঠন—বালেশ্বরে মোগলের পরাজয়—নবাব সায়েস্তা খাঁ কর্তৃক হিজলীতে সেনা প্রেরণ—হিজলীর যুদ্ধ—মোগলে ও ইংরাজে সন্ধি—হিজলী যুদ্ধে চার্নকের অসমসাহসিকতা—সন্ধির পর সদলবলে চার্নকের সুতালুটি পুনঃ প্রত্যাগমনের চেষ্টা—মোগলপক্ষের প্রতারণা—চার্নকের হিজলী ত্যাগ করিয়া উলুবেড়িয়ায় আশ্রয় গ্রহণ—উলুবেড়িয়া হইতে পুনরায় সুতালুটিতে প্রত্যাবর্তন—বিলাত হইতে যুদ্ধ-জাহাজসমূহের সুতা-লুটিতে আগমন—কাপ্তেন হিথের কাণ্ড—কাপ্তেন হিথ কর্তৃক চট্টগ্রাম আক্রমণ সঙ্কল্প—এ সঙ্কল্পের পরিণাম—চার্নক ও হিথের মান্দ্রাজে প্রত্যাগমন—স্যার জন চাইল্ডের চেষ্টায় সম্রাটের সহিত ইংরাজ পক্ষের নূতন বন্দোবস্ত—বঙ্গেশ্বর নবাব ইব্রাহিম খাঁর ইংরাজের উপর সহানুভূতি—ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজ হইতে পুনরায় কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিতে নবাবের অনুমতি—চার্নকের তৃতীয়বার সুতালুটিতে আগমন—চার্নক কর্তৃক বর্তমান কলিকাতা নগরীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা।

ইংরাজের হুগলী লুণ্ঠন ও সুতালুটিতে আগমন

এইবার আমরা ইংরাজ বাণিজ্যের একটি আবশ্যকীয় স্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ এই দেশে যে সমস্ত অঘটন ঘটাইয়াছিলেন, তাহাই

এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতে ব্রিটিশ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করে। সেইজন্যই আজ আমরা ইংরাজের সৌভাগ্যের অংশভাগী হইয়া সুখে ও নিরাপদে ইংরাজ রাজত্বে বাস করিতেছি।

কোম্পানি বাহাদুরের বিলাতের কর্তারা অনেক বিবেচনার পর সারকথা বুঝিলেন—মোগলেরা যেরূপভাবে ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায়ের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিতেছেন, তাহার প্রতিকার বাহুবলের সাহায্যেই করিতে হইবে। মুখ বুজিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহাদের কৃপাভিখারী হইয়া চলিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে প্রতিদিনই অসংখ্য অন্তরায় উপস্থিত হইবে। বাণিজ্য করিতে ইংরাজ বণিক এদেশে আসিয়াছে বটে, এ পর্যন্ত মোগল শাসনকর্তাদের খামখেয়ালির জন্য তাহারা পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়োজন বুঝিলে বাণিজ্যের সহিত বাহুর শক্তি সম্মিলিত করিবার ক্ষমতা যে তাহাদের নাই, এরূপ নহে। এরূপ প্রয়োজন স্থলে এবার হইতে কৃপাভিক্ষা না করিয়া, বাহুর শক্তির প্রভাবে দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা করা কর্তব্য।

কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা বাঙ্গলায় একটি সুরক্ষিত দুর্গনির্মাণের জন্য বড়ই সমুৎসুক হইলেন। কিন্তু সে দুর্গ কোথায় প্রতিষ্ঠা করা যায়, ইহাই তখন এক মহাসমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। বাণিজ্যের হিসাবে ধরিতে গেলে হুগলীই প্রশস্ত ক্ষেত্র। কিন্তু হুগলীতে দুর্গনির্মাণে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। মোগলশক্তির প্রভাব হইতে বহুদূরে থাকিয়া এ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করিতে হইবে। চট্টগ্রাম হস্তগত না করিতে পারিলে পূর্ণরূপে আশাসিদ্ধির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। কিন্তু চট্টগ্রাম হস্তগত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। চট্টগ্রাম তখন পর্তুগীজদের দানবশক্তি বিমুক্ত হইলেও মোগলশাসন তথায় দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এই মহাসমস্যায় মীমাংসার ভার জোব চার্নকের উপর পড়িল। এই জোব চার্নকই কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা, এই জোব চার্নকই ধরিতে গেলে ভারতে ইংরাজ-রাজলক্ষ্মীর প্রধান প্রবর্তক। কিন্তু এ হেন প্রতিভাবান লোককে ইতিহাস উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই—ইঁহার অমানুষিক প্রতিভার প্রতি সুবিচার হয় নাই। এমন কি ইংরাজগণও জোব চার্নকের প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই।[১]

জোব চার্নকের আভিজাত্য সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণই সে কালের ইতিহাসে নাই। সেকালের পুরাতন কাগজপত্রে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ১৬৫৫ কি ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের একশত বৎসর পূর্বে তিনি ভারতবর্ষে আসেন।[২] কাশিমবাজারে জুনিয়ার মেম্বররূপে আমরা তাঁহার নাম প্রথম দেখিতে পাই। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের কোম্পানির সেরেস্তায় দেখা যায়—"জোব চার্নক—চতুর্থ সদস্য—বেতন কুড়ি পাউণ্ড।"[৩] কাশিমবাজার হইতে তিনি পাটনায় প্রেরিত হয়েন।[৪]

---

১. এতাবৎকাল পর্যন্ত, সেণ্ট জন গির্জা মধ্যস্থ সমাধিস্তম্ভ ব্যতীত চার্নকের স্মৃতি-রক্ষার আর কোন চিহ্নই স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু আমাদের ভূতপূর্ব বড়লাট, ভারতীয় ইতিহাস-ভক্ত লর্ড কার্জন পোষ্টাফিসের নিকটবর্তী স্থানটিকে Charnock Place আখ্যা দিয়া, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি-রক্ষা করিয়াছেন।

২. চার্নক ১৬৫৬ সালে ভারতে আসেন। সম্ভবত ইনি প্রথমে Maurice Thomson-এর নেতৃত্বে গঠিত বণিক-সঙ্ঘের অধীনে কর্মচারী ছিলেন (১৬৫৫ খ্রী.), পরের বছর তিনি কোম্পানির অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন, যদিও কোম্পানির কাগজপত্রে ১৬৫৭ সালের পূর্বে তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।—*See* P.T. Nair, *Job Charnock, The Founder of Calcutta* p. 5.

৩. His (Charnock's) name first appears on the normal roll entered in the Court books under date 12-13th January 1657 (1658) as Junior Member of the Council at Kasimbazar.

৪. বিলাতের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ১৬৭৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষের কাছে এক চিঠিতে কাউন্সিল-এর সদস্যরূপে জোব চার্নককে পাটনার কুঠিতে যোগদানের প্রস্তাব পাঠান। ১৬৭৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চার্নককে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেও চার্নক ১৬৮১ সালের জানুয়ারির আগে কাশিমবাজারের কুঠির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নাই। ততদিন তিনি পাটনাতেই ছিলেন।—*Ibid* p. 8-10.

চার্নক প্রথমে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে এদেশে কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন। কিন্তু ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি তিনি বিলাতের কর্তাদের নিকট যে প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে প্রমাণিত হয়, মেয়াদি সময়ের অতিরেকেও তিনি কোম্পানির চাকরি করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তাঁহার কড়ার এই যে, তিনি পাটনা ফ্যাক্টরির অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত হইতে চান এবং সেই সঙ্গে তাঁহার বেতন বৃদ্ধিও প্রয়োজন। বলা বাহুল্য তাঁহার এ প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পাটনায় থাকেন।[১]

পাটনায় অবস্থান কালে, এদেশের লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে। এ-দেশের লোকের রীতি, প্রবৃত্তি, শক্তি, প্রতিভা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করেন। এই অভিজ্ঞতা বলেই তিনি ভবিষ্যতে তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন,[২] সহমরণের চিতা হইতে চার্নক যে ব্রাহ্মণকন্যাকে উদ্ধার করিয়া পত্নী-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও যাহার গর্ভে তাঁহার কয়েকটি কন্যা হয়, তাহারই শক্তিতে তিনি খ্রীস্টান ধর্মে শিথিলতা প্রদর্শন করেন। এইজন্যই তিনি আধা-হিন্দু আধা-খ্রীস্টান গোছের হইয়াছিলেন। এই জনপ্রবাদের একটি কারণ আছে। পত্নীর মৃত্যুর পর প্রতিবৎসর তাহার মৃত্যু-তিথিতে চার্নক তাহার গোরের উপর একটি মোরগবলি দিতেন। গোর ও তদুপরি মোরগ-বলির কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে হিন্দুপ্রথা নহে—তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। চার্নক বহুদিন বিহার প্রদেশে ছিলেন। বিহার প্রদেশের লোকেরা 'পাঁচপীরের' উদ্দেশে এরূপ মোরগবলি দেয়। হয়ত চার্নক সেই প্রথারই অনুকরণ করিয়াছিলেন। আর তাঁহার শত্রু-পক্ষীয়েরা এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে অখ্রীস্টান ইত্যাদি বলিয়া গিয়াছেন। চার্নকের ধর্মমত সম্বন্ধে এই অভিমত কখনও সঙ্গত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। চার্নক তাঁহার কন্যাদের খ্রীস্টানী নাম প্রদান করেন। তাঁহার এক জামাতা আয়ার (পরে স্যর চার্লস আয়ার) কোম্পানি বাহাদুরের কুঠির গবর্ণর-পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় জামাতা

১. বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে চার্নক সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কাগজ পত্র আছে বটে, কিন্তু তাঁহার বাল্য-জীবনের কোন কথাই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। প্রবাদ এই, এক হিন্দুরমণীকে জোব চার্নক সতীদাহের অগ্নি-কুণ্ড হইতে উদ্ধার করেন। তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই রমণীর প্রভাবে চার্নকের মনে অনেকটা হিন্দুভাব জাগিয়া উঠে। বর্তমান কালের হেস্টিংস স্ট্রীটে, সেণ্ট জন গির্জার মধ্যে, চার্নকের নশ্বর দেহ সমাহিত হয়। তখন এস্থানে গির্জা নির্মিত হয় নাই। ইহা পতিত সমাধি-ভূমি মাত্র ছিল। এই গির্জা সম্ভবত ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে নির্মিত হয়। জমিটা মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সম্পত্তি। এই গির্জার পার্শ্বেই গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বাটি ছিল। সেই বাটি এক্ষণে Burn কোম্পানির কার্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের সমাধিস্থানের উপর একটি মন্দির (Mausoleum) নির্মিত হইয়াছিল। তিনশত বৎসরের পুরাতন এই মন্দিরটি আজও ঝড়ঝটিকা সহ্য করিয়া অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই সমাধি মন্দির চার্নকের জামাতা চার্লস আয়ার কর্তৃক ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়, চার্নকের সহিত এই হিন্দুরমণীর (ব্রাহ্মণ-কন্যার) পরিণয় সম্ভবত ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বা পরে হইয়াছিল। ইহা হইতে বোধ হয়—এই হিন্দু স্ত্রী লইয়া চার্নক কুড়ি বৎসরকাল জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। জনরব এই, উক্ত সমাধিস্তম্ভ-নিম্নে, চার্নক ও তাঁহার হিন্দু পত্নী উভয়েরই সমাধি আছে। এই হিন্দু রমণীর গর্ভে চার্নকের মেরী বলিয়া এক কন্যা জন্মে। আয়ার এই মেরী-কেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মেরীর মৃত্যু হয়। মেরী ব্যতীত চার্নকের ক্যাথারিন ও এলিজাবেথ নামক আরও দুইটি কন্যা ছিল। জোনাথান হোয়াইটের সহিত ক্যাথারিনের বিবাহ হয়। ১৭০১ খ্রী. ক্যাথারিনের মৃত্যু ঘটে। ক্যাথারিন ও মেরী উভয়েই পিতার সহিত একক্ষেত্রে সমাধিস্থ হন। চার্নকের তৃতীয় কন্যা এলিজাবেথ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের তিন বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। উইলিয়ামস বোরিজ নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাই কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের বংশবৃত্তান্ত।—Wilson's *Early Annals—Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, March 1892—*Indian Church Quarterly Review*, 1892.

২. চার্নক ও হিন্দুরমণী সম্পর্কিত বিষয়টির উল্লেখ উইলিয়াম হেজেসের ডায়ারিতে (১লা ডিসেম্বর ১৬৮২) দেখিতে পাওয়া যায়।

জোনাথান হোয়াইট বাঙ্গালার ফ্যাক্টরি-কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। যাহাই হউক না কেন, চার্নকের ধর্মমত লইয়া তর্ক বিতর্ক করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, তিনি কি করিয়া তিনশত বৎসর পূর্বে বর্তমান রাজধানী কলিকাতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আলোচনা করিব।

চার্নক বহুদিন এদেশে বাস করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আচার ব্যবহার, স্বভাব চরিত্র তিনি উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ ও তাহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। মোগল সম্রাট তখন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা। সম্রাট দিল্লী ও আগরায় থাকেন, তাঁহার অধীনস্থ রাজপ্রতিনিধি সুবাদার ফৌজদার প্রভৃতির কর্মচারিগণই সুদূর রাষ্ট্র-বিভাগ সমূহের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। এই শাসক-সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, শাসন-কৌশল বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

বিলাতের কর্তারাও তাঁহার উপর অগাধ বিশ্বাস করিতেন।[১] চার্নকের আশা ছিল, যে বঙ্গের বাণিজ্য কুঠিগুলি ভবিষ্যতে আবার মান্দ্রাজের অধীনতা বিমুক্ত হইবে, তিনিই বঙ্গের সর্বময় কর্তা হইবেন। কিন্তু তাঁহার এ আশা অনেক বিলম্বে পূর্ণ হইয়াছিল।

চার্নক প্রথমে কাশিমবাজার কুঠির কর্তা হন। হুগলীর কুঠিই তখন প্রধান কুঠি। কিন্তু বিলাতের প্রভুদের মিষ্টবাক্যে মোহিত হইয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া, তিনি কাশিমবাজারেই থাকেন। হুগলী হইতে নদীপথে কাশিমবাজার দুই দিনের পথ। কাশিমবাজার সান্নিধ্যেই বর্তমান মুরশিদাবাদ। তখন মুরশিদাবাদেই মোগল শাসনকর্তা থাকিতেন।

নবাব সায়েস্তা খাঁর নাম ভারত ইতিহাসে, বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সায়েস্তা খাঁ, পঁচিশ বৎসর[২] কাল বঙ্গদেশে মোগল-সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপে, দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের উপর তাঁহার কোনরূপ মায়া-মমতা ছিল না। তিনি সুযোগ পাইলেই তাহাদের নানা অছিলায় পীড়ন করিতেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ —দিল্লীর সম্রাট-বংশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা দিয়া বাঙ্গলায় পাঠাইয়া দেন ও নিজে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তির সহিত যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হন। কাজেই এই অমিত প্রতাপশালী নবাব যাহা করিতেন, তাহাতে কথা কহিবার আর কেহই ছিল না।[৩]

সায়েস্তা খাঁর সহিত নানাকারণে ইংরাজ-পক্ষের মনোমালিন্য ঘটিল। পূর্বে আমরা সম্রাট ঔরঙ্গজেব প্রদত্ত যে ফারমানের কথা বলিয়াছি, সায়েস্তা খাঁ তাহা আমলেই আনিতে চাহিলেন না। ইংরাজেরা এপর্যন্ত নানাদিকে নানাবিষয়ে স্থানীয় শাসনকর্তাদের নিকট

১. কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনেক বিলাতি-চিঠিপত্রে, তাঁহারা চার্নককে 'Our old and good servant Mr. Job Charnock' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

২. সায়েস্তা খাঁ প্রথমে বাঙ্গলার সুবাদার পদে ১৬৬৩-১৬৭৮ মোট ১৫ বৎসরকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে দ্বিতীয়বার তিনি ১৬৭৯-১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দ মোট ৯ বৎসর সুবা বাঙ্গলার শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন। বাঙ্গলার সুবাদার রূপে তিনি ২৪ বৎসর ক্ষমতায় আসীন ছিলেন।

৩. নবাব সায়েস্তা খাঁ দুইবার বঙ্গদেশে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে শাসন কর্তৃত্ব পদ লাভ করেন। ইতমাদ-উদ্দৌলা গিয়াস বেগ সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা। আসফ খাঁ নূরজাহানের সহোদর। সায়েস্তা খাঁ আসফ খাঁর পুত্র ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র। আসফ খাঁ জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান উভয় বাদসাহের আমলেই রাজ্যের প্রধান উজীর ছিলেন। সায়েস্তা খাঁ তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সাহজাহানের 'আমির-উল-উমরা' বা প্রধান সচিব পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ভগ্নী মমতাজমহল সাহজাহানের প্রধানা রাজ্ঞী ছিলেন। ইহাঁর সমাধির উপরই জগৎ-বিশ্রুত তাজমহল নির্মিত হয়। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করেন। অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত সাহজাহানের অন্যতম পুত্র সাহজাদা মুরাদবক্সের পরিণয় হয়। দিল্লীর রাজসংসারের সহিত এরূপ বাঁধাবাঁধি সম্পর্ক থাকার জন্যই সায়েস্তা খাঁ অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য, বেরার, গুজরাট প্রভৃতি দেশে ভিন্ন ভিন্ন সম্রাটের আমলে রাজ প্রতিনিধির কার্য করিয়া শেষে তিনি বঙ্গদেশে আসেন। ইংরাজদিগের মতে তিনি সুশাসক ও প্রজাপালক শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার আমলে বঙ্গদেশে টাকায় আটমণ চাল বিক্রীত হইত। এখন এটা প্রবাদবাক্যে দাঁড়াইয়াছে। ১৬৯৪ খ্রী. অব্দে ৮৬ বৎসর বয়সে নবাব সায়েস্তা খাঁর মৃত্যু হয়।

লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া আসিতেছেন। মোগল রাজকর্মচারীরা নবাবের মনোভাব বুঝিয়া ইংরাজদের নিকট জোর জবরদস্তি করিয়া নানা ব্যয়ের অছিলায়, টাকা আদায় করিতে লাগিল। মান্দ্রাজ কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষীয়েরা নবাব সায়েস্তা খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"যদি আপনি ইংরাজ-বণিকদিগের প্রতি সুবিচার না করেন, অত্যাচারের প্রতিবিধান না করেন, তাহা হইলে কোম্পানি-বাহাদুর বাঙলার বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিবেন। বাঙলায় ইংরাজ-বাণিজ্য লোপ হইলে সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব-নাশ হইবে।" কিন্তু এবম্বিধ ভয় প্রদর্শনেও কোন ফল হইল না।

নবাবের এইরূপ হৃদয়হীন ব্যবহার ইংরাজেরা বহুদিন ধরিয়া নির্বাকভাবে সহ্য করিলেন। শেষে বিলাত হইতে ইংলণ্ডেশ্বর জেমসের আদেশে ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণের অনুরোধে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ ভারতবর্ষের দিকে প্রেরিত হইল। মোগল-রাজশক্তির সহিত প্রকাশ্যভাবে প্রতিযোগিতা করাই এ নৌ-সেনাবল প্রেরণের উদ্দেশ্য।

অবশেষে ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে দুইখানি জাহাজ ৩০৮ জন নৌসেনা লইয়া সুদূর ইংলণ্ড হইতে হুগলী নদীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কাজটা বড়ই ভ্রমাত্মক হইয়াছিল। কারণ বঙ্গদেশে নবাব সায়েস্তা খাঁর অধীনেই চল্লিশ হাজার মোগল সেনা ছিল। এমন কি, হুগলী সহরেই মোগল-সুবাদারের অধীনে সাড়ে তিন হাজার সেনা রাজ্যরক্ষার জন্য নিয়োজিত। ইহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যে অগণ্য বাহিনী সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিল।[১]

চার্নক যখন কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ, সেই সময়ে এদেশীয় মহাজনেরা তাঁহার নামে, বাকি পাওনা আদায়ের জন্য মোগলকর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ উপস্থিত করে। তাহারা জানিত, মোগল শাসনকর্তারা ইংরাজের উপর বিরূপ। নালিশ করিলেই তাহা সরকারে গ্রাহ্য হইবে ও প্রাপ্য আদায় হইয়া আসিবে। চার্নক এই ব্যাপারে মহাবিপদে পড়িলেন। আত্মরক্ষার কোন চেষ্টাই সফল হইল না। মোগল রাজকর্মচারী সমস্ত মোকদ্দমাই চার্নকের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিলেন।

এদিকে ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে,[২] হুগলীর চিফ-এজেন্টের মৃত্যু হওয়ায় চার্নক তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু তখন এই দেনার টাকার জন্য কাশিমবাজারে তিনি মোগলের নিকট একরূপ নজরবন্দীরূপেই ছিলেন। পাছে চার্নক মহাজনদের ঋণ পরিশোধ না করিয়া পলাইয়া যান, এইজন্য হুগলীর মোগল সেনাপতি অতিরিক্ত সতর্কতা বশে কাশিমবাজার সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। বহুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে চার্নক হুগলীতে পলায়ন করেন।

কিন্তু হুগলীতে আসিয়াও চার্নক কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। সেখানেও চারিদিক হইতে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ঢাকা মোগলের প্রধান রাজ-প্রতিনিধির রাজধানী। ইংরাজেরা অত্যাচারের প্রতিকার কামনায় ঢাকায় যে সব আবেদন ও অভিযোগ পত্র পাঠাইতে লাগিলেন তাহার মোলায়েম জবাব পাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু নবাবের আদেশে অসংখ্য মোগলসৈন্য হুগলীতে আসিয়া জমিল। বিলাত হইতে মোগলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধ-জাহাজ আসিতেছে এ কথা অবশ্য নবাব শুনিতে পান নাই। তবে গোয়েন্দামুখে তিনি এ সংবাদটুকু পাইয়াছিলেন যে, হুগলীতে ইংরাজ বণিকগণ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে।

১. দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত একলক্ষ ষাট হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা ছিল। সমস্ত ভারতব্যাপী মোগলসেনার পরিমাণ তিনলক্ষ অশ্বারোহী ও চারিলক্ষ পদাতিক। ইহা ছাড়া গোলন্দাজ, হস্তী ও উষ্ট্রারোহী সেনা ছিল।

২. Charnock was offered the second position in Hooghly eventually to succeed Malthias Vincent as the Chief. He became the Agent of the Company in Bengal on the 16th or 17th April 1686.—P.T. Nair, *Job Charnock, The Founder of Calcutta* p. 10.

মোগলসৈন্য হুগলী সহর ঘিরিয়া ফেলিল। দুই তিনশত অশ্বারোহী ও তিন চারি হাজার পদাতিক মোগলসেনা ইংরাজদের ভয় প্রদর্শনার্থে প্রকারান্তরে হুগলী অবরোধ করিল। স্থানীয় শাসনকর্তা আদেশ প্রচার করিলেন—"ইংরাজেরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য কোন মালই হুগলীর বাজারে কিনিতে পারিবে না। এমন কি তাঁহার আদেশে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদিও ইংরাজদের বিক্রয় করা বন্ধ হইল। এই ঘটনায় কেবল যে হুগলীর বাণিজ্য ব্যাপারই অচল হইল এরূপ নহে, হুগলীবাসী ইংরাজদের পেটও অচল হইল। এই সময়ে আবদুল গণি নামক এক সেনাপতি হুগলীর ফৌজদার ছিলেন।

১৬৮৬ খৃস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজের সহিত মোগলের রণাভিনয় আরম্ভ হইল। ঘটনাটি এই— তিনজন ইংরাজসেনা হুগলীর বাজারে তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদি কিনিতে যায়। জন কয়েক মোগলসেনা তাহাদের আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে সেই তিনজন ইংরাজসেনার মধ্যে দুইজন আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়া থাকে। বক্রী একজন ফিরিয়া আসিয়া চার্নককে সংবাদ দেয়।

এই সংবাদ পাইয়া চার্নক কয়েকজন ইংরাজ গোরাকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের বলিয়া দিলেন—"জীবিতই হউক বা মৃত হউক, আমাদের আহত সেনাদের এখানে লইয়া আসিবে। কিন্তু আক্রান্ত না হইলে মোগলদের সহিত ইচ্ছা করিয়া বিবাদ করিও না।"

কিন্তু চার্নকের এ উপদেশ-বাণী বৃথা হইল। এই নবাগত সেনাদের সহিত মোগল-সেনাদের পুনরায় বিবাদ বাধিল। বিবাদে সেবার ইংরাজ পক্ষই জয়ী হইল। তাহারা সেই দুইজন আহত ইংরাজ-গোরাকে লইয়া ফ্যাক্টরিতে উপস্থিত হইল।[১]

চার্নক মনে মনে বুঝিলেন, ইংরাজপক্ষের অবস্থা অতি বিপজ্জনক। ইংলণ্ড হইতে আনীত নূতন সেনা-সমষ্টির সংখ্যা ধরিলেও তাঁহার আয়ত্তাধীনে কেবলমাত্র চারিশত সেনা আছে। এত অল্প সেনা লইয়া মোগলের সহিত যুঝিয়া উঠা অসম্ভব।

যাহা হউক উপায়ান্তর না দেখিয়া, চার্নক হুগলীর বন্দরে তাঁহাদের যে কয়খানি ছোট জাহাজ ছিল তাহা সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই ছোট জাহাজগুলি কি করিয়া মোগলের কামানের অনলরাশি হইতে আত্মরক্ষা করিবে, ইহা ভাবিয়াই তিনি চিন্তিত হইলেন। হুগলী হইতে শতক্রোশ দূরে সমুদ্রমুখে ইংরাজের বড় জাহাজগুলি আছে বটে, কিন্তু ত্বরিত তাহাদের সাহায্য পাওয়া অসম্ভব।

চন্দননগরে একদল ইংরাজসেনা ছিল। তাহাদের যথাসত্বর হুগলীতে আসিবার আদেশ প্রদান করা হইল। ঘোলঘাটে ইংরাজের ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যাগার ছিল। ঘোলঘাটের অনতিদূরেই মোগলদিগের ব্যাটারি ছিল। ব্যাটারির পরই মোগল শাসনকর্তার বাটি (ম্যাপ দেখুন)। কাপ্তেন রিচার্ডসন নামক এক ব্যক্তিকে চার্নক এই মোগল-তোপখানা আক্রমণ করিতে পাঠান। মোগলেরা ইতিপূর্বেই অগ্নিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কাজেই রিচার্ডসন বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না, অপরন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইংরাজের সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে চন্দননগরের সেনাদল আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের অধিনায়করূপে কাপ্তেন আরবথনট-এর অসীম সাহসিকতায় ইংরাজ-সেনারা মোগলের তোপখানা দখল করিয়া কামানগুলিকে স্থানচ্যুত করেন। চারিদিকে অনলবৃষ্টি করিতে করিতে আরবথনট মোগল শাসনকর্তার আবাসস্থানের দিকে অগ্রসর হন। শাসনকর্তা বিপদ বুঝিয়া হুগলীকে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া

১. কয়েকজন সেনাসমেত কাপ্তেন লেস্‌লী বলিয়া একজন সেনানী এই কার্যে অগ্রসর হন। লেস্‌লীকে দেখিয়াই কয়েকজন মোগল অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা অগ্রসর হইয়া আহত ব্যক্তিদের উদ্ধারার্থে বাধা প্রদান করে। ইহাতে মোগল পক্ষের সাতজন লোক জখম হয়। কিন্তু লেস্‌লীর দল উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া সেই দুইজন আহত সেনাকে লইয়া পলায়ন করে। ইহাতে মোগলেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজদের অধিকৃত চালাঘর সমূহে অগ্নি বর্ষণ করে। এই অগ্নিরাশি পরিশেষে ইংরাজ-ফ্যাক্টরির চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

ছদ্মবেশে নদীপথে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন।

ইংরাজপক্ষ হুগলীকে ধ্বংস করিবার মনস্থ করিলেন। নদী-বক্ষস্থিত ছোট জাহাজগুলিকে সহরের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু ভাঁটার সময় বলিয়া আদিষ্ট জাহাজগুলি সুবিধামত স্থানে অগ্রসর হইতে পারিল না। সন্ধ্যার পূর্বে তাহারা সহরের নিকটবর্তী হইয়া একখানি মোগল-জাহাজ দখল করিল। সমস্ত রাত্রি ও তৎপর দিন পর্যন্ত হুগলী সহরের উপর অগ্নিবর্ষণ চলিল।

এই বিবাদে আরবথনট, তথাপক্ষে ইংরাজেরাই, জয়লাভ করিলেন। এই অসমসাহসিকতার জন্য আরবথনট পরে বিলাতের কর্তৃপক্ষদের নিকট এক সোনার ঘড়ির চেইন ও মেডাল প্রাপ্ত হন।

চার্নক মনে মনে ভাবিলেন, "৫৪ বৎসর পূর্বে এই অক্টোবর মাসেই এই স্থানেই মোগল-সেনাগণ পর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ করে। এই স্থানেই মোগলপক্ষ বহুসংখ্যক পর্টুগীজকে নিহত ও জলমগ্ন করিয়া বিনষ্ট করিয়াছিল। তাহাদের পুরুষ-বন্দী-দিগকে ক্রীতদাসরূপে আগরায় পাঠাইয়াছিল, সুন্দরী পর্টুগীজ রমণীগণ মোগল-হারেমের সৌন্দর্যবৃদ্ধি জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।" এই সমস্ত অতীত কথা ভাবিয়া চার্নক বড়ই চিন্তিত হইলেন। যাহাতে ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হয়, তাহার জন্য হুগলীতে মোগল শাসনকর্তার সহিত তিনি পত্র লেখালিখি করিতে লাগিলেন।[১] ইহাতে দুইমাসকাল কাটিল। উভয় পক্ষ হইতেই যুদ্ধ স্থগিত করা হইল। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র জাহাজগুলিকে কোম্পানির বাণিজ্যাগারের মালপত্রে পূর্ণ করিলেন। কোম্পানির কর্মচারী ও সেনাগণ সেই জাহাজে উঠিল। পরে একদিন সুবিধা বুঝিয়া চার্নক গভীর নিশীথে সেই জাহাজগুলি লইয়া হুগলী ত্যাগ করিলেন।

সাতাইশ মাইল নদীপথ অতিক্রম করিবার পর চার্নক সুতানুটিতে উপস্থিত হন। তিনি বুঝিলেন, মোগলেরা যদি তাঁহাদের স্থলপথেও আক্রমণ করেন, তাহা হইলে এই জঙ্গলময় স্থানে আশ্রয় লইলেই তাঁহারা অনেকটা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন।

তখন কলিকাতা ও সুতানুটি গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। সুতানুটিতে তখন এমন একটি সুবিধাকর স্থানে নদীর বাঁক ছিল—সেখানে জাহাজাদি বিনা অসুবিধায় নঙ্গর করা যায়। এই স্থান হইতে গঙ্গার মোহানাও তত অধিক দূরবর্তী নহে। নদীর জল এত গভীর যে, বড় বড় জাহাজ অনায়াসে এই স্থানে আসিতে পারে। কাজেই এই বনজঙ্গলময় সুতানুটিই চার্নকের বড়ই পছন্দ হইল।

পূর্বে পর্টুগীজগণ হুগলী প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যার্থে যে সব মালপত্র বড় জাহাজে করিয়া চালান দিত, সে গুলি হুগলী বন্দর অবধি যাইতে পারিত না বলিয়াই নদীর পশ্চিম পারে বেতোড়ে নামান হইত। গোয়া হইতে প্রতিবৎসর যখন পর্টুগীজদের মালপত্র এই স্থানে আসিয়া পৌঁছিত, তখন তাহা খরিদ-বিক্রয়ের জন্য দরমা হোগলা প্রভৃতি দিয়া বেতোড়ে কতকগুলি অস্থায়ী হট্ট-গৃহ নির্মিত হইত। ইহাই তখন 'বেতোড়ের হাট' বলিয়া পরিচিত ছিল।

---

১. হুগলীর শাসনকর্তা ইংরাজদের এই জয়লাভে বড়ই ভীত হইয়া ছিলেন। তিনি কিয়ৎকালের জন্য যুদ্ধ বন্ধ রাখিতে চার্নককে অনুরোধ করেন। চার্নকের সহিত মেটামিটির ব্যাপারে কিছু সময়ক্ষেপ করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। তাঁহার মনের কথা এই, ঢাকা হইতে সেনাবল আসিতে সময়ের প্রয়োজন। এই সময়টা বাজে লেখালিখিতে কাটাইলে তাঁহারই সুবিধা। মোগলপক্ষ ইহাতে যেমন সুবিধা বুঝিলেন, চার্নকও সেই দীর্ঘ অব-সরের মধ্যে কোম্পানির মালপত্র জাহাজে বোঝাই করিতে লাগিলেন। কেবল তাহাই নহে, হিজলীর শাসনকর্তা মোগলদের উপর বড়ই বিরক্ত ছিলেন। চার্নক হিজলীতে আশ্রয় লইবার জন্য তাঁহার সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এদিকে নবাব সায়েস্তা খাঁ হুগলীর সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজের পাটনার কুঠি লুণ্ঠন ও তথাকার কর্মচারীদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ঢাকায় ইংরাজ কুঠিরও সেই অবস্থা হইত। কিন্তু ভারমল্ বলিয়া ইংরাজের একজন হিতৈষী মোগল রাজকর্মচারীর জন্য ঢাকার ইংরাজেরা নবাবের কোপমুখ হইতে বাঁচিয়া যান।

প্রতিবৎসর মাল-পত্র বিক্রয়ের পর জাহাজগুলি যেমন সেইস্থান হইতে চলিয়া যাইত তখনিই সেই পর্ণময় হট্টমন্দির গুলি বৈশ্বানরকে উপহার দেওয়া হইত। ঘরগুলি পুড়িয়া গেলে আবার সেই স্থান কোলাহলশূন্যে হইয়া গভীর নির্জনতায় সমাচ্ছন্ন হইত। আবার বৎসরান্তে পর্টুগীজ বাণিজ্য জাহাজ আসিলে নূতনভাবে হাট তৈয়ারি হইত।

এই সময়ে গঙ্গার পূর্ব উপকূলেও একটি নূতন হাট পত্তন হইতে আরম্ভ হয়। শেঠ ও বসুকগণ (বসাক) এই হাটপত্তন করেন। দেশী চরকায় ও কাটনায় কাটা মিহি ও মোটা সুতা এই হাটে বিক্রয় হইত। সুতার লুটি বিক্রয় হইত বলিয়া—ইহা 'সুতালুটির হাট' আখ্যা লাভ করে।

কিন্তু এই সুতালুটির অবস্থা তখন অতি ভয়ানক। ইহার চারিদিকে ভীষণ বন-জঙ্গল। নদীর তীরভূমি হইতে এই স্থানটি একটু সমুন্নত ছিল বলিয়া এখানে জাহাজ প্রভৃতি নঙ্গর করার সুবিধা ছিল বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাৎভাগে বন ও বাদাভূমি থাকায় ইহা মানবের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। এই সকল বাদাভূমি জ্বরের জন্মস্থান। বাদার জলে অসংখ্য কুম্ভীর। ভাগীরথীর একটি শাখা এই জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহাই সেকালের আদিগঙ্গা। জোয়ারের জল এই আদিগঙ্গার ভিতর দিয়া আসিয়া পার্শ্বস্থ বাদাভূমি জলপূর্ণ করিত। ইহার অদূরেই কালীঘাট। তীর্থযাত্রীরা এই গভীর বনমধ্যস্থ পথ ধরিয়া কালীঘাটে যাইত।[১]

জোব চার্নক এই ভীষণ অবস্থাময় সুতালুটিতে নঙ্গর করিয়া বুঝিতে পারিলেন এই স্থানই আত্মরক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই স্থানে আড্ডা স্থাপন করিলে নদীপথ তাঁহাদের আয়ত্তে থাকিবে। গভীর জঙ্গলের বাদার ও অসংখ্য খাল-বিলের জন্য পশ্চাৎ দিক দিয়া মোগল-সৈন্য আক্রমণ করিতে পারিবে না। প্রকৃতির এই অস্বাস্থ্যকর ক্রোড়ে রোগবশে দুই দশজন মরিতে পারে বটে, কিন্তু মোগলের কামানের মুখে দলে দলে বিনাশ এস্থলে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

চার্নক এই সুতালুটিতে আসিয়া তিনটি মহা সমস্যার মধ্যে পড়িলেন। হুগলী তখন নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রেরিত সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত, সুতরাং হুগলীতে প্রত্যাগমন পথ সম্পূর্ণ-রূপে রুদ্ধ। বিলাতের কর্তারা জাহাজ প্রেরণকালে আদেশ করিয়াছিলেন—"চার্নক হুগলী হইতে কোম্পানির মালপত্র উঠাইয়া লইয়া বালেশ্বরে আড্ডা করিবেন। যে সকল বাদসাহী জাহাজ গঙ্গার মোহানায় আসিয়া পড়িবে, সে গুলি আটক করিবেন। তৎপরে চট্টগ্রামে পেঁৗছিয়া তাহা বলপূর্বক মোগলের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া দখল করিবেন। অথবা হিজলীর শাসনকর্তার সহিত মিলিত হইয়া সম্রাট-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবেন।" এতগুলি সমস্যার মধ্যে পড়িয়া চার্নক যেন দিশাহারা হইয়া গেলেন। স্থিরভাবে দীর্ঘকাল বিবেচনার পর তিনি বুঝিলেন, এই বন-জঙ্গলাবৃত সুতালুটিই তাঁহার উপযুক্ত আশ্রয়কেন্দ্র।

চার্নক তখনও নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত একটা মিটমাটের আশা ত্যাগ করেন নাই। ইতিপূর্বে নবাবকে তিনি যে সকল পত্রাদি লিখিয়া ছিলেন এখন তাহার ফল ফলিল। ঢাকায় ভরমল বলিয়া একজন মোগল কর্মচারী ছিল। ভরমল এক পক্ষে যেমন ইংরাজ-হিতৈষী, আবার অন্য পক্ষে সেইরূপ নবাবেরও বিশ্বাসভাজন। কাজেই তিনি নবাব-পক্ষ হইতে ইংরাজ ও মোগলের বিবাদের মীমাংসাকার রূপে সুতালুটিতে উপস্থিত হইলেন।

চার্নক নবাবের নিকট যে সকল দাবি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই প্রধান—

১. কেহ কেহ বলেন, সুতালুটি হইতে এই আদিগঙ্গা বর্তমান গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া খিদিরপুর পর্যন্ত প্রবাহিত ছিলেন। পরে 'টলিস্-নালা' নামক নূতন খাল ওয়াটগঞ্জের নিম্ন হইতে কাটিয়া কলিকাতার মধ্যবাহিনী আদিগঙ্গার গতি পরিবর্তন করা হয়। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র। খিদিরপুরের পুলের পশ্চিমদিকের যে অংশটি বড় গঙ্গার বা ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহাই কাটা-খাল। আজও হিন্দুরা এই গঙ্গায় স্নান করেন না। তাঁহারা খিদিরপুরের পুলের নিকটস্থ অর্ফানগঞ্জ বাজারের পার্শ্ববাহিনী গঙ্গাকেই আদিগঙ্গা বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গঙ্গা জিরাট, আলিপুর, ভবানীপুর হইয়া কালীঘাটে পৌঁছিয়াছে।

(১) নবাব তাঁহার অধিকৃত ভূভাগের মধ্যে একটি সুবিধাকর স্থানে ইংরাজদিগকে দুর্গ-নির্মাণ করিতে সম্মতি দিবেন। (২) ইংরাজদের বাণিজ্য-শুল্ক দিতে হইবে না ও তাঁহারা নিজেদের টাঁকশালে টাকা তৈয়ারি করিবেন। (৩) মালদহের ফ্যাক্টরি লুঠে করিয়া নবাব ইংরাজদের যে টাকাকড়ি লইয়াছেন, তাহা প্রত্যার্পণ করিবেন ও ফ্যাক্টরি-গৃহ পুনঃ নির্মাণ করিয়া দিবেন। (৪) ইংরাজেরা বাণিজ্যসূত্রে নবাবের প্রজাদের নিকট যে সমস্ত টাকা পান, তাহা তাঁহারা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

ভরমল এই সমস্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য নবাব সায়েস্তা খাঁ কর্তৃক সুতালুটিতে প্রেরিত হইলেন।

বলা বাহুল্য, ভরমল ইংরাজদিগের প্রার্থনামত কয়েকটি শর্তে—নবাবপক্ষ হইতে ইংরাজ-দের সহিত সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। প্রথামত এই সন্ধিপত্র নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট স্বাক্ষরার্থে ঢাকায় প্রেরিত হইল। চার্নক বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন ইহা যেন সম্রাটেরও স্বাক্ষর সংযুক্ত হইয়া আসে। ১১ই জানুয়ারি এই সন্ধিপত্র নবাবের নিকট ঢাকায় প্রেরিত হয়। ২৮শে তারিখে নবাবের নিকট হইতে সংবাদ আসে যে. তিনি সেই সন্ধিপত্র মঞ্জুর করিয়া বাদসাহের সহি মোহরের জন্য যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু চার্নক আগাগোড়াই একটা মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন। এদেশে এতদিন বাস করিয়াও তিনি নবাব সায়েস্তা খাঁর মত জবরদস্ত, কূটবুদ্ধি রাজকর্মচারীকে চিনিতে পারেন নাই। শীঘ্রই তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। প্রকৃতপক্ষে নবাব হুগলীর ব্যাপারে তিলমাত্র ভীত হন নাই। তিনি কেবল উপযুক্ত অবসর লাভের জন্য এইরূপ চতুরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি ভরমল-প্রণোদিত উল্লিখিত সন্ধিপত্র চার্নকের নিকট অস্বাক্ষরিত অবস্থায় ফিরাইয়া দিলেন। বঙ্গের সর্বস্থানের শাসনকর্তাদের সেনা সমবেত করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহাদের উপর হুকুম হইল, এই সমবেত-সেনা সহায়তায় তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ-দিগকে জন্মের মত উচ্ছেদ করিবেন। ভরমল ইতিপূর্বেই স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন।[১]

চার্নক এই সংবাদ অবগত হইয়া মহা বিপদে পড়িলেন। যুদ্ধ বিনা আর কোন উপায়ই নাই। তিনি অগত্যা সুতালুটি ত্যাগ করিয়া, মালপত্র ও জাহাজাদি সমেত মেটিয়াবুরুজে উপস্থিত হইলেন। এইখানে বাদসাহী নিমকমহল ছিল[২] ও 'থানা' বলিয়া একটি দুর্গও ছিল। চার্নক বাদসাহী নিমকমহলের ঘরগুলি পোড়াইয়া দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে থানা দুর্গটিও দখল করিয়া লইলেন। মোগলের সহিত ইংরাজের প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা আরম্ভ হইল।

চার্নক যে সময়ে 'থানা' দুর্গের ধ্বংসসাধনে নিযুক্ত, সেই সময়ে তাঁহারই আদেশে কাপ্তেন নিকলসন অর্ধেক সৈন্য ও জাহাজ লইয়া হিজলী অধিকারের জন্য প্রেরিত হইলেন। পাঠক এই সমস্ত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিতেছেন, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাকারী জোব চার্নক কিরূপ দুঃ-সাহসিক লোক ছিলেন।

ইংরাজ কর্তৃক সুতালুটি ত্যাগ হিজলী অধিকার এবং উলুবেড়িয়া ও সুতালুটিতে পুনঃ প্রত্যাগমন।
(১৬৮৭—১৬৮৮)

কলিকাতার পার্শ্ববাহিনী ভাগীরথী এখন যে অবস্থায় উপনীত তিনশত বৎসর পূর্বে ঠিক সেরূপ ছিল না। যে হিজলীতে চার্নক আশ্রয় লইয়াছিলেন সে হিজলীও এখনকার মত

১. চার্নক ঘটিত ব্যাপারে যেখানে আমরা 'নবাব' শব্দ ব্যবহার করিব পাঠক সেটিকে নবাব সায়েস্তা খাঁ বলিয়াই যেন বুঝেন।

২. আজও মেটিয়াবুরুজের অদূরবর্তী একটি স্থান নিমকমহল বলিয়া পরিচিত। এখনও নিমকমহলের রাস্তাটি 'নিমকমহল ঘাট রোড' বলিয়া সাধারণে পরিচিত আছে।

সঙ্গম ছিল না। চারিদিকে অসংখ্য নদী, বালিয়াড়ির স্তূপ, উত্তাল তরঙ্গময়ী জাহ্নবী জলরাশির তাণ্ডবনৃত্য, ইত্যাদি কারণে হিজলীর সে সময়ের অবস্থা অতি ভয়ানক ছিল। সহজে কেহ তথায় যাইতে চাহিত না। আর অন্য স্থান হইতে কোন লোক হিজলীতে পৌঁছিলে তাহার জীবন লইয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব হইত। কারণ একটা প্রবাদবাক্য আছে—

"একবার খেলে হিজ্‌লী-পানি যমে-মানুষে টানাটানি।"

ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দুই শতাব্দী পূর্বে হিজলী জ্বর ম্যালেরিয়া ও উদরাময়ের আবাসকেন্দ্র ছিল।

চার্নক হুগলী হইতে পলাইয়া সুতালুটিতে আসিলেন বটে, কিন্তু তথায় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। মোগলেরা কখন যে পঙ্গপালের মত তাঁহার দলবলকে সহসা আক্রমণ করিবে, বিধ্বস্ত করিবে, সর্বস্বলুণ্ঠন করিবে, এই ভাবনাতেই তিনি অস্থির হইয়া যমের অগম্য-স্থান এই হিজলীতে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। হিজলী মোগলের অধিকারভুক্ত স্থান হইলেও হুগলী বা ঢাকা হইতে সেনা পাঠাইয়া মোগলেরা তাঁহাকে ততটা ব্যতিব্যস্ত করিতে পারিবেন না, ইহাই তাঁহার প্রধান আশা। অপরন্তু হিজলী সমুদ্রের নিকটে। সমুদ্রপথে ইংরাজ চিরদিন নির্ভয় চিত্ত। প্রয়োজনমতে সমুদ্রপথ হইতে ইংরাজ-জাহাজের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। সঙ্গে যে কয়েকখানি জাহাজ আছে, বেশী গোলযোগ সম্ভাবনা দেখিলে সেই জাহাজে উঠিয়া সমুদ্রপথে পলায়নেরও কোন অন্তরায় উপস্থিত হইবে না। এই সব ভাবিয়া চার্নক হিজলী যাওয়াই স্থির করিলেন।

কোন ইউরোপীয় বণিকেরাই এ পর্যন্ত মোগল-বাদসাহের সৈন্যের সহিত প্রকাশ্য সংঘর্ষ উপস্থিত করিতে সাহসী হন নাই। দিনেমার, ওলন্দাজ যাহা করিতে সাহসী হন নাই ইংরাজপক্ষ হইতে জোব চার্নক তাহাই করিলেন। তিনি হুগলীতে যে হুলস্থূল ব্যাপার ঘটাইয়া আসিয়াছেন, মোগলপক্ষ তাহাতে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। বিশেষত অন্য কোন শাসনকর্তা হইলে না হয়, ততটা ভয়ের সম্ভবনা ছিল না, কিন্তু অমিতপ্রতাপ, কূটবুদ্ধি সায়েস্তা খাঁ বর্তমান থাকিতে ইংরাজগণ কোন ক্রমেই নিরাপদ নহেন।[১]

১. হুগলীর হাঙ্গামা ব্যাপারে এদেশীয়দের চক্ষে চার্নক প্রকৃতই একজন সাহসী বীর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন আখ্যান প্রচলিত আছে। সে আখ্যানটি চার্নকের হুগলী পরিত্যাগ ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। এ দেশীয়েরা চার্নককে ও তাঁহার কৃতকার্যগুলিকে কিরূপভাবে দেখিয়াছিল তাহা এই অতিরঞ্জিত গল্প হইতেই প্রমাণিত হয়। গল্পটি এই—চার্নক যে সময়ে হুগলীর কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন সে সময়ে একদিন বানের তোড়ে কোম্পানির বাণিজ্যাগার ও ইংরাজদের আবাসভবন ভাঙ্গিয়া যায় ও সমস্ত গৃহাদি নষ্ট হয়। ইহার পর চার্নক ইংরাজদের বাসের জন্য একটি দুইতালা বাড়ি গাঁথিতে আরম্ভ করেন। তখন অনেক পদস্থ মোগল-কর্মচারী ও আমির-ওমরাহ হুগলীতে বাস করিতেন। তাঁহারা হুগলীর মোগল-শাসনকর্তার নিকট এই বলিয়া নালিশ করেন—"ইংরাজ কোম্পানি যেরূপভাবে ঘর প্রস্তুত করিতেছে, সেগুলি সেইভাবে উচ্চ হইলে তাহাদের অন্দর-মহলের সমস্ত ব্যাপারই ইংরাজেরা ছাদে উঠিলেই দেখিতে পাইবে। তাহাতে জেনানার মর্যাদাহানি হইতে পারে"। মোগল-সুবাদার এই অভিযোগ শুনিয়া এদেশীয় মিস্ত্রি ও রাজমজুরদিগকে ইংরাজের কাজ করিতে নিষেধ করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া চার্নক হুগলী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। হুগলীতে তখন অগণিত মোগলসেনা ছিল, কিন্তু চার্নকের লোকবল তাহার তুলনায় অতি কম। মোগলের সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া চার্নক হুগলী ত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু গমন সময়ে সূর্যরশ্মি ও আফ্‌তাব্‌ (আতসী) কাচের সাহায্যে গঙ্গা-তটবর্তী সমস্ত গৃহগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া যান। হুগলী হইতে চন্দননগর পর্যন্ত এই অগ্নিরাশি ব্যাপৃত হইয়া পড়ে। মোগল-শাসনকর্তারা চার্নকের পলায়ন পথ রোধ করিবার উদ্দেশ্যে গঙ্গার এপার হইতে ওপার পর্যন্ত দুইগাছি সুবৃহৎ লোহার শিকল লাগাইয়া দেন। কিন্তু চার্নক তরবারি দিয়া সেই লোহার শিকল কাটিয়া ফেলেন ও দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে বাদশা দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। চার্নককে বাদশার নিকট উপস্থিত করা হইল। চার্নক জোড়হস্তে বাদসাহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে একজন রাজকর্মচারী আসিয়া বাদসাহকে চুপে চুপে বলিল, মোগল-সেনার রসদ ফুরাইয়াছে। সকলকে অনাহারে মরিতে হইবে।" চার্নক এই কথা শুনিতে পাইয়া তাঁহার একজন কর্মচারীকে গোপনে বলিয়া দেন, আমাদের আহার্য যাহা কিছু আছে মোগল-শিবিরে পৌঁছাইয়া দাও। তখনই তাঁহার এ

মসনদ আলি খাঁ নামক একব্যক্তি হিজলীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও মসনদ আলির মসজীদ তাহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। মসনদ আলি যোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে হিজলীর সর্বময় কর্তা ছিলেন। দীর্ঘকাল রাজত্বের পর মসনদ আলি শুনিতে পাইলেন, মোগল-সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে অসংখ্য সেনা প্রেরণ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া পুত্রকে মোগলের সহিত সন্ধি করিবার উপদেশ দিয়া তিনি জীবন্ত অবস্থায় সমাধিমধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবলীলার অবসান করেন। তাঁহার পুত্র আজীবন মোগল বাদসাহের অধীনে সামন্তরাজরূপে হিজলী শাসন করেন। তৎপরে ইহা মোগলের দখলে আসে।

সে সময়ে হিজলীতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। লবণও যথেষ্ট উৎপন্ন হইত। লবণের ব্যবসায় মোগলের একচেটিয়া ছিল, এ প্রদেশের ক্ষারময় মৃত্তিকা ও লোণাজল হইতে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত এবং এই লবণকর মোগলের বাঙ্গলার এক লাভকর রাজস্ব। এতদ্ব্যতীত ইহা চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া মোগল এ স্থানটিকে তাঁহাদের 'ঘাটি' বা দুর্গরূপে পরিণত করিয়াছিলেন।[১]

নিকলসন চার্নকের আদেশমত সর্বাগ্রে হিজলী অভিমুখে যাত্রা করেন। মালেক-কাশেম বলিয়া একজন মোগল সেনাপতি তখন হিজলীর রক্ষা কর্তা। নিকলসনকে সহসা কতকগুলি জাহাজ সমেত উপস্থিত হইতে দেখিয়া কাশেম সাহেব হিজলী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। মোগলের কামান, রসদ ও হিজলী সহর নিকলসনের দখলে আসিল।

ফেব্রুয়ারি মাসে চার্নক হিজলীতে উপস্থিত হন। হিজলী তখনকার হিসাবে একটি ছোট-খাট জনপূর্ণ সহর। অপর্যাপ্ত শস্য, প্রচুর গৃহপালিত পশু পক্ষী—এখানে না আছে কি? চার্নক তাঁহার সমস্ত সৈন্যবল সহরে একত্রিত করিয়া বেশ জাঁকাইয়া বসিলেন। ধরিতে গেলে তিনিই তখন সমগ্র হিজলী সহরের মালিক।

হিজলী অধিকার করিয়া চার্নক বুঝিলেন, এই সহর অতি সহজেই তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে বটে, কিন্তু রক্ষার সুবন্দোবস্ত না করিলে ইহা অতি সহজেই হস্ত বহির্ভূত হইতে পারে।

একদিকে কাউখালি নদী, অন্যদিকে রসুলপুর নদী, তাহার উপর ভাগীরথীর মোহানা ত আছেই। ধরিতে গেলে হিজলী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। বিপদ উপস্থিত হইলে বা প্রয়োজন ঘটিলে যাহাতে এই সমস্ত নদীমুখ হইতে বাহির হইতে পারা যায়, তজ্জন্য নদীর চারিদিকে দিবারাত্রব্যাপী পাহারা রহিল।

হিজলী রক্ষার সুবন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গেই চার্নক চেষ্টা করিয়া বালেশ্বর দখল করিলেন। বালেশ্বরও তখন ইংরাজ-ফ্যাক্টরি ছিল। মোগলের দুর্গ ও তোপখানা ছিল। অতি সহজেই এই দুর্গ ও তোপখানা ইংরাজের দখলে আসিল। দুইদিন ধরিয়া বালেশ্বর লুঠ হইল। এই সময়ে দুইখানি মোগল-জাহাজে সাহাজাদা ও নবাব সায়েস্তা খাঁর জন্য চারিটি হস্তী আসিতেছিল। ইংরাজেরা মোগলের এই জাহাজখানি লুঠ করিয়া হাতীগুলি দখল করিলেন। এই সব কাণ্ড করিয়া ইংরাজেরা, যখন বুঝিলেন বালেশ্বরের অধিবাসীদের ইংরাজের শৌর্যবীর্য ও প্রভাব

আদেশ প্রতিপালিত হইল। বাদসা ঔরঙ্গজেব চার্নকের এই হৃদয়ের মহত্ত্বে মোহিত হইয়া বলিলেন—"তুমি যাহা চাহিবে তাহাই তোমাকে দিব"। চার্নক বলিলেন—"জাঁহাপনা! আগে আমায় অনুমতি দিন যে আমি আপনার শত্রুদের পরাজিত করি।" বাদসাহ অনুমতি দিলে চার্নক বাদসাহের শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া আবার তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। বাদসাহ চার্নকের উপর মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"এখন তোমার প্রার্থনা কি?" চার্নক বলিলেন—"কলিকাতা নামক গণ্ডগ্রামখানি ইংরাজদের দান করুন।" বাদসাহ চার্নকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বাদসাহ দিল্লী চলিয়া গেলেন। চার্নকও সুতালুটিতে আসিয়া ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গ প্রতিষ্ঠা করি-লেন।" আমরা পরলোকগত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসন সাহেবের পুস্তক হইতে এই কিম্বদন্তীটি উদ্ধার করিয়া পাঠককে উপহার দিলাম।—Wilson's *Early Annals* p. 102. (রিয়াজ-সালাতিন)।

১. Hunter's *Statistical Account of Bengal*, Vol III. p. 193.
Hedges' Diary, Vol I. p. 68, 172 and 175.

সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করান হইয়াছে, তখন তাঁহারা বালেশ্বর ত্যাগের বন্দোবস্ত করিলেন।

একে একে চার্নক অনেকগুলি অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিলেন। হুগলী লুণ্ঠন, বালেশ্বর ধ্বংসকরণ, থানা দুর্গ অধিকার, হিজলী অধিকার ইত্যাদি ব্যাপার বড় সহজ কাজ নহে। চার্নক বুঝিলেন, এইবার সাংঘাতিক সময় আসিতেছে। মোগল যে সহজে এ সব ব্যাপার ভুলিয়া যাইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

কিন্তু যে মোগলের ভয়ে চার্নক এত ব্যতিব্যস্ত তাহারা এত ঘটনার পরও সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের আরঙ্গাবাদে যুদ্ধকার্যে ব্যস্ত। মার্চমাসে তাঁহার নিকট এ সব সংবাদ পৌঁছিল। তিনি ইহাতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। কোথায় হিজলীর ন্যায় একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম, কোথায় সুদূর বঙ্গদেশে ক্ষুদ্র নগর হুগলী, এ সব সংবাদ তিনি কিছুই রাখিতেন না। কিন্তু যখন সরকারে এত্তেলা পৌঁছিয়াছে আর হুগলীর শাসনকর্তা যখন ইংরাজদের বিরুদ্ধে এত্তেলা করিয়াছে, তখন এই ব্যাপার তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তিনি মীরমুন্সীকে ডাকাইয়া বঙ্গদেশের মানচিত্র আনাইলেন। নক্সাখানি একবার দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু তখন তিনি দাক্ষিণাত্যের মহাযুদ্ধে ব্যস্ত, কাজেই এ ক্ষুদ্র ব্যাপার তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিল না তথাচ ইংরাজদের বিরুদ্ধে সুবাদারের আরজির উপর একটা হুকুম হইয়া গেল।[১]

আর এ দিকে নবাব সায়েস্তা খাঁ হুগলীর ব্যাপারটিকে ততটা হানিজনক বলিয়া বিবেচনা করিলেন না বটে, কিন্তু ইংরাজদিগকে হিজলী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, মোগল বাহিনী হিজলীতে উপস্থিত হইয়াই ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে সমুদ্রের দিকে তাড়াইয়া দিবে।

মার্চ ও এপ্রিল মাসে হিজলীতে ইংরাজের আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। এই গ্রীষ্মকালে হিজলীবন্দরে ওলাওঠা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপে বড়ই বৃদ্ধি হয়। ইংরাজপক্ষের মধ্যে এই সমস্ত রোগ দেখা দিল। জাহাজে যে সমস্ত গোরা ছিল বা হিজলী সহরে যে সমস্ত ইংরাজ ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই পীড়িত হইয়া পড়িল। পীড়ার প্রাবল্যে মড়ক দেখা দিল। প্রায় ১৮০ জন সেনা শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়া কাজ কর্মের বাহির হইয়া পড়িল। খাদ্য দ্রব্যও অতি দুর্লভ হইল। সুলভের মধ্যে গোমাংস ও লোনা গাঙ্গেয় ধৃত দুষ্পাচ্য মৎস্য। এই ভীষণ গ্রীষ্মে তাহাও অখাদ্যরূপে পরিণত হইল। ইংরাজেরা তাঁহাদের কাজকর্মের জন্য যে সমস্ত কুলি-মজুর বা মিস্ত্রি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা হিজলী সহর ছাড়িয়া নদী পার হইয়া অপর পারে পলাইতে লাগিল। আর এই ভীষণ বিপত্তির সময়ে সায়েস্তা খাঁর প্রেরিত মোগল-সেনারাও হিজলীর সন্নিহিত হইয়া পড়িল।

পূর্বে বলিয়াছি, হিজলীর সেনাপতি মালেক-কাশেম হিজলী দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যান। তিনি পুনরায় সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া হিজলীর অপর পারে রসুলপুরে গোলন্দাজ-সেনা স্থাপন করিলেন। চার্নক বুঝিলেন, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে এবারে রক্ষার আর কোন উপায় নাই। যে উপায়েই হউক মোগলের তোপখানা দখল করিতেই হইবে।

দুঃসাহসিক চার্নক অনর্থক সময়ক্ষেপ না করিয়া মালেক-কাশেমের মোগল সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমত তিনি শত্রুর পনের হাজার মণ চাউল লুঠ করিয়া গৃহজাত করিলেন। দ্বিতীয়বার আক্রমণে মোগলের তোপখানার একাংশ বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন। বড় বড় কামান-গুলি শক্তিহীন হইল, ইংরাজপক্ষ মোগলের কয়েকটি ছোট কামান দখল করিলেন। প্রচুর গুলি ও বারুদ তাঁহাদের হস্তগত হইল। এইরূপ প্রতিযোগিতার অবসরে ইংরাজপক্ষ কিছু সময় লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সে সুযোগ দীর্ঘকাল উপভোগ করিতে পারিলেন না। মোগলপক্ষ পুনরায়

১. Hedges' *Diary*, Vol II. p. 65 and 96.

সেনাবল সংগ্রহ করিয়া, নূতন তোপখানা তৈয়ারি করিল। ইংরাজের যে সমস্ত জাহাজ হিজলীর কাছে নঙ্গর করিয়াছিল, সেগুলিকে সমুদ্রে তাড়াইয়া দিয়া হিজলী দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। চার্নকের অধীনস্থ ইংরাজ-সৈন্যের বেশীর ভাগ এই হিজলীদুর্গ মধ্যেই ছিল।

নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রেরিত মোগল-সেনাধ্যক্ষ আবদুল সামেদও ঘটনাক্রমে এই সময়ে অসংখ্য বাহিনী লইয়া হিজলী পেঁাছিলেন। বার হাজার ফৌজ তাঁহার সঙ্গে। নবাব তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিলাম। যে উপায়ে পার, ইংরাজদের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করিতে চেষ্টা কর।" আবদুল সামেদ ইংরাজদের উচ্ছেদ করিবার জন্য এই নদী-উপনদীবহুল স্থানের চারিদিকে ব্যাটারি বা তোপখানা স্থাপন করিলেন। ইংরাজদের জাহাজ-গুলির উপর চারিদিক হইতে গোলাবর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল।

ইংরাজেরা এইবার মহাবিপদে পড়িলেন। দুর্গ মধ্যস্থ সেনাদল সম্পূর্ণ রূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। দলের অর্ধেক সেনা, পীড়িত ও রোগান্তে অতি দুর্বল। ২৮এ মের সন্ধ্যা-কালে, সাতশত মোগল অশ্বারোহী ও দুইশত গোলন্দাজ হিজলী সহর হইতে মহোৎসাহে রসুলপুরের মোহানা পার হইল। হিজলী নগর হইতে এই স্থান দেড় ক্রোশ। ইংরাজেরা হিজলী দুর্গমধ্যে। এ নূতন বিপত্তি-সংবাদ তাহাদের নিকট পেঁাছিতে না পেঁাছিতে আবদুল সামেদের সেনাগণ নগর লুঠপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে আগুন ধরাইয়া দিল। এই সময়ে মোগলদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিক উত্তেজনা অবর্ণনীয়। উন্মত্ত মোগল সেনাগণ একজন পীড়িত ইংরাজ সেনাপতিকে শায়িতাবস্থাতেই শতখণ্ডে তরবারি দ্বারা বিভক্ত করিল। তাহার পত্নী ও পুত্রকে বন্দী করিল। যে আস্তাবলে ইংরাজদের অশ্ব ছিল তাহা মোগলপক্ষের হস্তগত হইল। চার্নক যে চারিটি হস্তী ইতিপূর্বে মোগল জাহাজ লুণ্ঠন দ্বারা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা আবার মোগলের হাতে পড়িল। সন্ধ্যা অবধি এইভাবে যুদ্ধ চলিল বটে, কিন্তু মোগল-সেনা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না।

চার্নকের অবস্থা এখন বড়ই শোচনীয়। প্রায় দুইশত লোক জ্বরে ও ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। তাঁহার অধীনস্থ একশত সেনা রোগে জর্জরিত ও শীর্ণকায়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র উপায়, বহির্দেশ হইতে কোনরূপ সাহায্যলাভ। যদি কোন ইংরাজ-জাহাজ সহসা সমুদ্র হইতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলেই রক্ষা। কিন্তু এরূপ সাহায্য ভগবানের কৃপা ভিন্ন হইতে পারে না। চার্নক একটা বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন যে, নদীর মোহানার যে অংশ সমুদ্রের দিকে গিয়াছে সেই স্থানে একটি বাড়ী দখল করিয়া তথায় দুইটি তোপ রাখিয়াছিলেন। মোগল সৈন্য এই তোপের জন্যই এদিকে আসিতে পারে নাই। এই পথটি সুরক্ষিত দেখিয়া চার্নক কোম্পানির মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি জাহাজে তুলিয়া দিতে সক্ষম হইলেন।

কিন্তু ভগবান ইংরাজের সহায়। এই সময়ে কাপ্তেন ডেনহ্যামের অধীনে একখানি নূতন জাহাজ বিলাত হইতে সমুদ্র-মুখে উপস্থিত হইল। এই জাহাজে সত্তর জন লোক ছিল। চার্নক তাহা-দের দুর্গ মধ্যে আনিলেন।

সমরস্রোত সহসা অন্যদিকে ফিরিল। এই সাহায্য উপস্থিত হওয়ায় চার্নক সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পরদিন ডেনহ্যাম এই সৈন্য সমেত দুর্গ হইতে বাহির হইলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর শত্রুকে গোলাবর্ষণে একটু উত্যক্ত করিয়া তিনি পুনর্বার দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন।

মোগলপক্ষকে প্রতারিত করিবার জন্য চার্নক এই সময়ে একটি নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। পূর্বদিনে সে সমস্ত সেনা, জাহাজ হইতে দুর্গমধ্যে আসিয়াছিল, তাহাদের আগমন ব্যাপার মোগলেরা যে লক্ষ্য করে নাই, তাহা নহে। চার্নক গুপ্তভাবে সেই সেনাগুলিকে দুই চারি জন করিয়া পুনরায় ডেনহ্যামের জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা তৎপর দিন দলবদ্ধ ভাবে ঢক্কানিনাদ করিয়া নিশান হাতে লইয়া জয়োল্লাস করিতে করিতে হিজলীর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। মাত্র সত্তর জন সেনা লইয়া চার্নক এই খেলা খেলাইতে লাগিলেন। মোগল পক্ষ

ইহাতে ভাবিল, জাহাজ হইতে আরও নূতন ইংরাজ সেনা নামিতেছে। ইহাতে তাহারা একটু দমিয়া গেল। ইংরাজ পক্ষ এই উপযুক্ত অবসরে সন্ধির প্রস্তাব করিল। মোগলেরা ইংরাজের প্রচুর সেনা আসিয়াছে ভাবিয়া, এ সন্ধি প্রস্তাবে কোনরূপ আপত্তি করিল না। ইংরাজেরা যাহাতে নির্বিঘ্নে সূতানুটিতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন ও নবাব সায়েস্তা খাঁর নিকট তাঁহাদের পূর্ব প্রার্থিত দ্বাদশটি স্বত্ব যাহাতে মঞ্জুর হয়, ইংরাজপক্ষ সেই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ট্রেঞ্চ-ফিলড ও তাঁহার দুইজন সহযোগী এই সন্ধিপত্রের জন্য আবদুল সামেদের শিবিরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ইংরাজেরা তাঁহাদের গোলা, বারুদ, কামান ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহা কিছু ছিল তাহা জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া পুনরায় সূতানুটির দিকে যাত্রা করিলেন। হিজলী পুনরায় মোগলের অধিকারে আসিল।[১]

আবদুল সামেদ এই ব্যাপারে ইংরাজদের সহিত একটু চাল চালিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ প্রতিনিধিদের বলিলেন, "প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের খসড়া করিয়া নবাব সায়েস্তা খাঁর মঞ্জুরির জন্য ঢাকায় পাঠাইলাম। ইংরাজেরা ইতিমধ্যে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত যাইতে পারেন।" ইংরাজ-দিগকে মোগলের থানা দুর্গ পর্যন্ত নিরাপদে যাইবার জন্য ছাড় দিতেও তিনি স্বীকৃত হন।

কিন্তু কোথায় বা সেই ছাড়, কোথায় বা সায়েস্তা খাঁর অনুমোদন পত্র। তিন মাসের মধ্যে কোন জবাবই আসিল না দেখিয়া অগত্যা জোব চার্নক সূতানুটি পর্যন্ত অগ্রসর না হইয়া উলুবেড়িয়াতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

জুন মাসে চার্নক হিজলী ত্যাগ করেন। জুলাই আগস্ট পর্যন্ত, তাঁহাকে নবাবের আদেশ অপেক্ষায়, উলুবেড়িয়ায় থাকিতে হয়। ১৬ই আগস্ট তারিখে নবাবের নিকট হইতে শেষ আদেশ আসে। এ অনুমতিপত্রে নবাব ইংরাজদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বলেন, "তোমরা উলু-বেড়িয়াতেই থাক, হুগলী ও উলুবেড়িয়ার বাণিজ্য ব্যবসায় চালাও, টাকশালা নির্মাণ ও ক্ষতিপূরণ বাবৎ তোমরা যাহা চাহিয়াছ, তৎসম্বন্ধে এখন কিছুই নির্ধারিত বলিতে পারি না। সম্রাটের নিকট এ সম্বন্ধে আরজি গিয়াছে। তাহার জবাব আসিলে যাহা হয় হইবে।"[২] এই হুকুম-পত্র পাইয়াই চার্নক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা নবাব সাহেবের নিকট ফেরত পাঠাইলেন। সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় এক নূতন আদেশপত্র আসিল।

এই আদেশপত্রানুযায়ী কাজ করা চার্নক যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করিলেন না। উলু-বেড়িয়ায় থাকিলে ইংরাজের বঙ্গের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি, আর হুগলীতে প্রত্যা-বর্তন করিলে আবার সিংহের গহ্বরে পুনঃ প্রবেশ করিতে হইবে। চার্নক মহা সমস্যায় পড়িয়া, গয়ংগচ্ছভাবে পুনরায় সূতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঠক! এই প্রাসাদময়ী ইংরাজ রাজধানী কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী জোব চার্নকের ভাগ্য বিড়ম্বনা একবার ভাবিয়া দেখুন। বিলাতের কর্তাদের নিকট যখন হিজলীর ঘটনা পোঁছিল তখন তাঁহারা চার্নককে পুরস্কারের পরিবর্তে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা

১. "On the 11th June, 1687 the English evacuated Hijli, carrying away all their artillery and munitions"—*History of Bengal*, Vol II. Dacca p. 385.

২. নবাব সায়েস্তা খাঁর এই ২১শে জুলাইয়ের(১৬৮৭) পরোয়ানা, হেজেস্ ডায়ারিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা সে সময়ের ইংরাজীর নমুনা সমেত পত্রখানির একাংশ উদ্ধৃত করিলাম।—

Consider yourselfe what manner of Evill has been enacted by you, and those rash fights made with the King's forces and with myself, and fired 300 Cannon Shott and plunderea and took prizes the shippes of Moors and afflicted God's people. If the matter should fully in every particular be made known to the King (Aurangzeb) the Offense in noewise would be forgiven—but an aged and merciful Viceroy will not exact punishment.—Hedges' *Diary*, Vol II. p. 70-71. Sir William Hunter's *British India*, Vol I. পাঠক এই তিরস্কারপূর্ণ ভাষা দেখিয়া বুঝিবেন, সেকালে মোগল সুবাদারেরা এইভাবেই ইংরাজশক্তিকে উপে-ক্ষার চক্ষে দেখিতেন। আজ আর ভাগ্য পরিবর্তনে সেই মোগলশক্তি শতধা বিচূর্ণিত ও ইংরাজ এই বিশাল ভারতের রাজরাজ্যেশ্বর।

লিখিলেন—"তুমি যাহা কিছু করিয়াছ, তাহাতে তোমার অসহিষ্ণুতা ও নির্বুদ্ধিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। হুগলীতে মোগল-পক্ষের সহিত বিবাদ বাধাইয়া হিজলীতে না আসিয়া যদি সরাসর আমাদের প্রেরিত সেনাসমেত চট্টগ্রামে যাইতে, আমাদের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে, তাহা হইলে আমাদের এত ক্ষতি হইত না। চট্টগ্রাম দখল হইলেই মোগল-শাসনকর্তারা ভয় পাইয়া আমাদের প্রার্থিত স্বত্বগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে দান করিতেন। অতএব এজন্য যাহা কিছু ঘটিয়াছে. তাহা তোমার দোষে হইল। যে বিধাতা ইংরাজদের প্রত্যেক বিপদ হইতেই রক্ষা করিতেছেন, তিনিই এযাত্রা আমাদের রক্ষা করিয়াছেন।"[১]

সুতালুটির জঙ্গলময় অস্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া চার্নক কোন সুবিধাই বুঝিতে পারিলেন না। সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল তিনি কোম্পানির অধীনে চাকরি করিয়াছেন। তখনকার চাকরি এখনকার মত সুখের ছিল না। তখন বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল থাকিলেই ইংরাজদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইত। এরূপ অবস্থা সত্ত্বেও সুতালুটিতে আসিয়া কয়েকখানি চালাঘর তুলিয়া তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য একটু আশ্রয় স্থান করিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত পুনরায় লেখালেখি আরম্ভ হইল।

চার্নক সুতালুটিতে আসিয়া অসংখ্য অসুবিধার মধ্যেও, যেন একটু সুবিধা বোধ করিলেন। তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সদুদ্দেশ্যে — প্রভুদিগের স্বার্থ রক্ষার্থেই করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যফল এরূপ, যে তিনি একদিকে নবাব সায়েস্তা খাঁর ও অন্যদিকে তাঁহার নিয়োগকর্তা প্রভুদিগের অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারদেরও বিরাগভাজন হইলেন। কিন্তু আমরা অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালী। অদৃষ্ট কর্ম-চালিত। কর্মের ফল কর্মদোষে সু ও কু হইয়া থাকে। ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন নারিকেলে জল-সঞ্চারের ন্যায় অতি অদৃশ্য-ভাবেই হইতেছিল। কাজেই ভবিষ্যৎ ইংরাজদিগের পরম সৌভাগ্যের এই উপলক্ষ স্বরূপ জোব চার্নক উপরোক্ত ভাবেই কাজ করিয়া গিয়াছিলেন। তাহা না করিলে ভারতে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত হইত।

যদি সম্রাট ঔরঙ্গজেব সেই সময়ে দিল্লী হইতে সুদূর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধব্যপদেশে ব্যাপৃত না থাকিতেন, যদি নবাব সায়েস্তা খাঁ অশীতিপর বার্ধক্যে অভিভূত হইয়া ধর্মচর্চায় জীবনক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত ইংরাজ পক্ষের মহা বিপত্তি উপস্থিত হইত। ইংরাজের সৌভাগ্য যে এই সব যুদ্ধবিগ্রহের কথা সম্রাটের গোচরে আসিলেও তিনি এ ব্যাপারটিকে আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। সায়েস্তা খাঁর বয়স এই সময়ে পঁচাশি বৎসর। তিনি রাজকার্যে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ। মোল্লা, মৌলানা, মৌলভীগণ লইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার আশায় কোরান শরীফ পাঠে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত।[২] কাজেই ইংরাজদিগের এই যুদ্ধ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি

১. বিলাতের কর্তারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার দুই চারি পংক্তি এই—"It was not your wit or contrivance but God Almighty's good Providence which hath always graciously superintended the affairs of this Company. . . . If you had immediately according to the King our Sovereign's orders and our own, proceeded directly for Chittagong while our forces were strong and vigorous, the Mogull would have consented to our holding and keeping that place in amity with him.—*Letter of the Court of Directors dated 27th August 1687.*

২. As a matter of fact it was due to accidental causes that the English were not swept off the face of Bengal. The Emperor (Aurangzeb) engrossed by his wars in Southern India, scarcely deigned to notice the petty triumph on the Hugly except by calling for of a map of that scarcely known region. The Viceroy of Bengal (Sayesta Khan) then in his 85 lunar year had taken himself to the round of devotions amid which a pious Mussulman prepares for his death and thought he had sufficiently punished the traders by driving them out of their miserable refuge at Hijli.—*Letter from the Patna Factor to Sir John Child,* dated 25. 6. 1697.—নবাব সায়েস্তা খাঁ ১৬৮৯ খ্রী. অব্দে বঙ্গের শাসন-কর্তৃত্ব ত্যাগ করেন ও ১৬৯৪ চান্দ্র বৎসরে ৯৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।
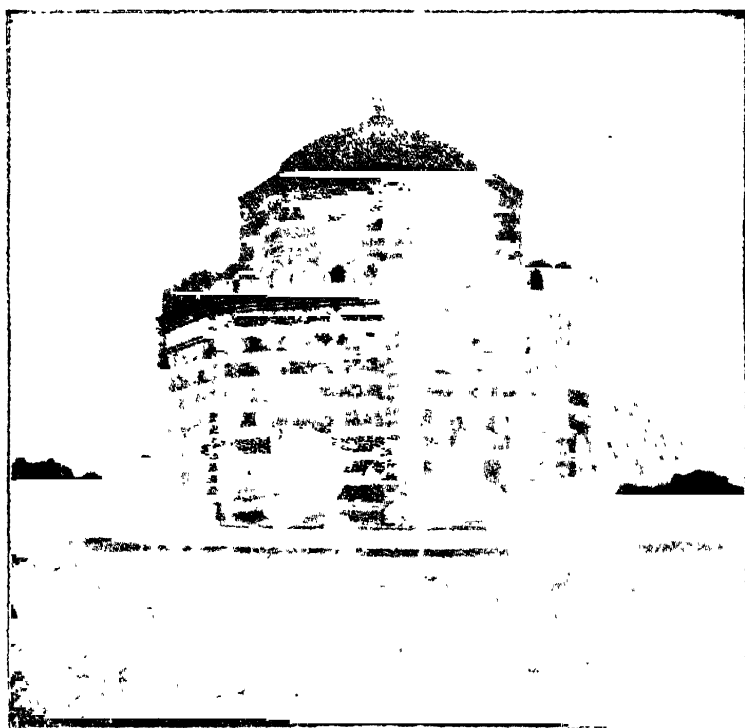
জোব চার্নকের সমাধিস্তম্ভ

whether you are willing to be cutt or not, but as for us should they offer any such thing, we should cut their Throats. Not else but we are

Your affectionate friends

Job Charnock

[illegible]

Sam: Griffith

জোব চার্নকের হস্তাক্ষর

কলিকাতার প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ : গঙ্গাতীরের দৃশ্য,
এই দুর্গই সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন

১৭৩৬ খ্রীর ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নক্শা
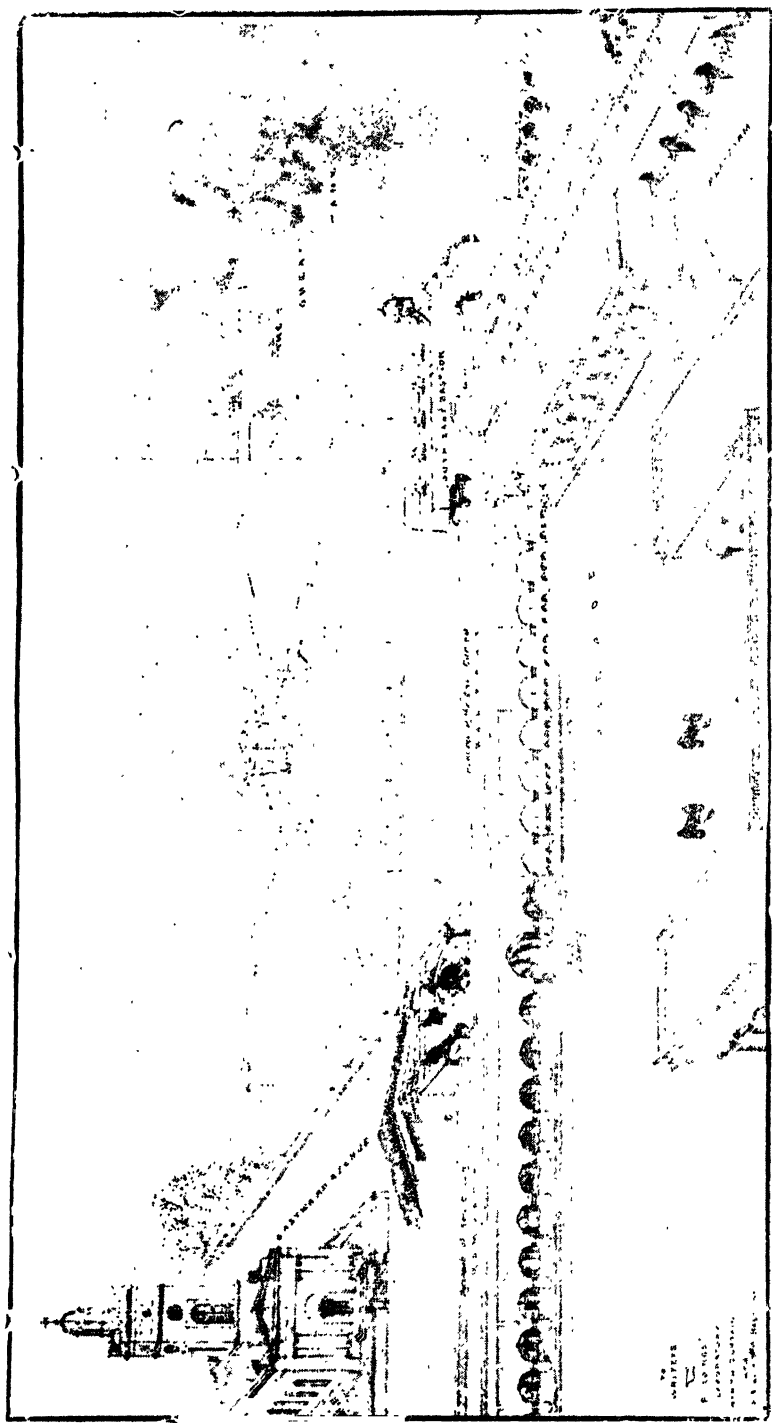
যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন। এরূপ না হইলে ইংরাজেরা সেই বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইতেন।

চার্নক এইসব ব্যাপারে এক বৎসর সময় পাইলেন। উলুবেড়িয়া হুগলী, হিজলী, সকল স্থানেই তিনি ইংরাজের বাণিজ্যাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া নির্বিবাদে জীবন যাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তিনটি স্থানই তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল। হুগলীতে মোগলের দুর্দান্ত প্রতাপ, উলুবেড়িয়ায় অন্তর্বাণিজ্যের কোন সুবিধাই নাই আর হিজলীতে ম্যালেরিয়া, কাজেই এই তিনটি স্থানই তিনি বর্জনীয়রূপে নির্ধারিত করিলেন। সুতালুটির উপরই তাঁহার বেশী টান। কারণ এস্থানে কুঠিস্থাপন করিতে পারিলেই মোগলশক্তির নিকট হইতে দূরে থাকা যাইবে, অথচ সমুদ্রপথ হইতে বিপদকালে সাহায্যলাভের পথও রুদ্ধ হইবে না। কিন্তু সুতালুটিও বিপদশূন্য নহে। ইহার চারিদিকে গভীর বন-জঙ্গল, বাদা ও বিল। স্থানটিও কাজে কাজেই অতি অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ইহা অনেকটা নিরাপদ। এই ভাবিয়া চার্নক ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে সুতালুটিতে চালাঘরের ব্যারাক তৈয়ারি করিয়া তাঁহার ম্যালেরিয়া পীড়িত সেনাদের আশ্রয়স্থান করিয়া দিলেন।[১] কোম্পানির বাণিজ্য কার্যেরও যাহাতে সুবিধা হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কাপ্তেন হিথ বিলাত হইতে এক জাহাজ লইয়া সুতালুটিতে পেঁাছিলেন। হিথের আগমনে ঘটনাস্রোত পরিবর্তিত হইয়া গেল। হিথ চার্নককে বিলাতের কর্তাদের একখানি পত্র দিলেন। হা অদৃষ্ট! ইহাতেও সেই তিরস্কার। চার্নকের বিলাতের প্রভুরা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছেন—"আপনার অধীনে যে সমস্ত ইংরাজ-সৈন্য এখনও রুগ্ন ও জীর্ণাবস্থায় জীবিত, তাহাদের কাপ্তেন হিথের জাহাজে উঠাইয়া দিয়া আপনি সুতালুটি ত্যাগ করিয়া সরাসর চট্টগ্রামে চলিয়া যাইবেন। চট্টগ্রাম দখল করাই আমাদের অভিপ্রায়।"

বিলাতের কর্তারা কাপ্তেন হিথকে চট্টগ্রামে যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। হিথ বড়ই একরোখা লোক। যে ভগবদ্দত্ত প্রতিভার সহায়তায় চার্নক ও ভবিষ্যতে লর্ড ক্লাইভ এই কলিকাতাতেই ইংরাজের ভাবী সৌভাগ্যের বীজ রোপিত হইবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, হিথের সে প্রতিভা ছিল না। চার্নক সুতালুটিতে ইংরাজের বাণিজ্যাগার রক্ষাই বিশেষ সুবিধাকর বলিয়া হিথকে অনেক বুঝাইলেন, তাঁহাদের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক তর্কাতর্কি চলিল। কিন্তু হিথ কিছুতেই নিজের জেদ ছাড়িলেন না। তিনি অন্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত কয়েকজন ইংরাজকে সুতালুটিতে রাখিয়া, অবশিষ্ট লোক সমেত চট্টগ্রাম উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। চার্নক তাহাতে কোন বাধাই দিতে পারিলেন না।

হিথের সঙ্গে কয়েকখানি ছোট বড় জাহাজ ছিল। সেই জাহাজে কোম্পানির লোকজন এবং মালপত্র উঠিল। হিথ বালেশ্বরে পেঁাছিয়া পুনরায় সহর লুণ্ঠন করিলেন। সেখানে কয়েকজন ইংরাজ মোগলের হস্তে বন্দী হইল। তাহাদের সেখানে বিপদের মুখে ফেলিয়া হিথ তাঁহার ক্ষুদ্র বহর লইয়া চট্টগ্রামের দিকে চলিলেন। চার্নক তাঁহার হস্তে তখন ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র!

হিথের অধীনে মাত্র তিনশত সেনা ছিল। তাহাদের মধ্যে আবার অর্ধেক পর্তুগীজ-ফিরিঙ্গি। চট্টগ্রাম কোথায়, তাহার অবস্থা কিরূপ, হিথ তাহার কিছুই জানিতেন না। চট্টগ্রামে পেঁাছিয়া দেখিলেন, সেস্থান দ্বাদশ সহস্র মোগল-সেনা দ্বারা সুরক্ষিত। অবস্থা দেখিয়া হিথ স্থানীয় শাসন-কর্তার সহিত পত্র ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না। আরাকানের রাজার সহিতও তাঁহাদের গুপ্ত-পরামর্শ চলিল, তাহাতেও সুফল ফলিল না। তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে স্কার্ভি রোগ দেখা দিল। বিপত্তি দেখিয়া হিথ তাঁহার সমগ্র বহরকে মান্দ্রাজ অভিমুখে

---

১. পাঠক! সেকালের বন-জঙ্গলময় সুতালুটির সহিত বর্তমান বড়বাজার প্রভৃতির তুলনা করুন। সেকালের এই পর্ণকুটীরময় ইংরাজ সেনা নিবাসের সহিত বর্তমান কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের বৈদ্যুতিক আলোকময় ত্রিতল চতুস্তল বারিকগুলির তুলনা করিয়া দেখুন।

অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন।[১]

চার্নক মান্দ্রাজে আসিয়া দারুণ মর্মবেদনায়, অনুশোচনায় পনের মাস কাটাইলেন। সম্রাটের ও বঙ্গের সুবাদারের নিকট হইতে কোন সংবাদই আসিল না। কাপ্তেন হিথ চট্টগ্রাম দখলের খেয়ালে ও জেদে পড়িয়া প্রকারান্তরে বঙ্গে ইংরাজের বাণিজ্য উচ্ছেদ করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সময়ে বিধাতার কৃপায় ইংরাজদের পুনরায় সৌভাগ্যোদয় হইল। সে ঘটনাটি কি, তাহা পাঠকের শোনা উচিত।

এই সময়ে স্যর জন চাইল্ড[২] সুরাটের কুঠির অধ্যক্ষ। চাইল্ড একজন তেজস্বী কর্মচারী ছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখনও দাক্ষিণাত্যে। বঙ্গে ইংরাজের বাণিজ্য সমূলে উচ্ছেদ হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া চাইল্ড বড়ই মর্মপীড়িত হইলেন। ইংরাজেরা এই সুরাটে বাণিজ্য দ্বারা সম্রাটের রাজকোষের আয়বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। সে আয় বড় সহজ নয়। শিবাজির সহিত যুদ্ধেও ইংরাজেরা সম্রাটের তরফে বন্দরাদি রক্ষা করিয়া ঔরঙ্গজেবের উপকার সাধন করিয়াছেন। এই বিষয় লইয়া চাইল্ডের সহিত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অনেক লেখাপড়া চলিল। কিন্তু সম্রাটের উদাসীন ভাব দেখিয়া স্যর জন চাইল্ড শেষ বলিয়া পাঠাইলেন—"যদি সম্রাট আমাদের প্রার্থনায় মনোযোগ না দেন, তাহা হইলে আমরা সুরাট হইতে বাণিজ্য উঠাইয়া লইব ও মক্কা যাত্রীদিগের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি লুঠ করিব।"

ঔরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান সম্রাট। ইংরাজদিগকে তিনি তাঁহার নিজের রাজ্য মধ্যে দমনে রাখিতে পারেন, কিন্তু সমুদ্রপথে তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই। বঙ্গদেশে জোব চার্নক কর্তৃক হিজলী অধিকার, সুতালুটিতে আগমন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই তখন তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগকে এদেশের সর্বস্থান হইতে তাড়াইয়া দিবারও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন ইংরাজদের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করিলে তাঁহার রাজকোষের সমূহ ক্ষতি হইবে, তখন অগত্যা চাইল্ডের প্রস্তাবিত বিষয়টি সম্বন্ধে একটু বেশী মনোযোগ দিলেন। স্থিরভাবে সকল দিক বিবেচনার পর সম্রাট ইংরাজদের কৃতাপরাধ মার্জনা করিলেন। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৭এ ফেব্রুয়ারি, তিনি ইংরাজদিগকে আবার একটি নূতন ফারমান প্রদান করিলেন।[৩]

এই ফারমানে লিখিত ছিল—"ইংরাজেরা ইতিপূর্বে যে সমস্ত গর্হিত কার্য আমার সাম্রাজ্য মধ্যে করিয়াছেন, তাহা মার্জনার জন্য বিনীত ভাবে আবেদন করায় আমি তাহাদের মার্জনা করিলাম। এ ব্যাপারে মোগল সম্রাটের দখলীভূত লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির মূল্য স্বরূপ ইংরাজেরা দেড় লক্ষ টাকা দন্ড স্বরূপ দিবেন। এই কড়ারে আমি তাহাদের নূতন শর্তে বাণিজ্য কার্যে অনুমতি দিলাম। আর আমার আদেশ এই চাইল্ড সাহেব আর এদেশে থাকিতে পারিবেন না। থাকিলে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।"[৪]

উল্লিখিত সাধারণ আদেশের একখন্ড বাঙ্গলার শাসনকর্তা নবাব ইব্রাহিম খাঁর[৫] নিকট প্রেরিত হইল। সায়েস্তা খাঁর পর বাহাদুর খাঁ বাঙ্গলার নবাব হইয়াছিলেন। বাহাদুর খাঁর

১. Captain W. Heath's *Short Account to the President and Council at Fort St. George*.

২. ইনি ১৬৮২-১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের গবর্ণর ছিলেন।

৩. "The Company was obliged to pay a fine of £ 150,000 and to make good the Indian losses. By a subsequent *farman* the English traders were permitted to return to Bengal and to trade free of custom duties, on payment of a yearly tribute of Rs.3,000." —B. Gupta, *Sirajuddaula and the E. I. Co., Background to the Foundation of British Power in India*, p. 5.

৪. সম্রাটের এ আদেশ সুরাটে পৌছিবার পূর্বেই চাইল্ড সাহেব বোম্বাইয়ে দেহত্যাগ করেন।—Stewart's *History of Bengal*, Appendix, vii, Bruce's *Annals* Vol II. p. 639-640.

৫. সুবা বাঙ্গলার ইব্রাহিম খাঁর শাসনকাল ১৬৮৯-১৬৯৭।

পর ইব্রাহিম খাঁ পুনরায় বঙ্গদেশে আসেন। এই ইব্রাহিম খাঁ অতি শান্তিপ্রিয়, সরল-হৃদয় শাসন-কর্তা ছিলেন। তিনি সম্রাটের আদেশপত্র পাইয়া চার্নককে মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গে আগমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

চার্নক ইব্রাহিম খাঁকে ভালরূপেই জানিতেন। খাঁ সাহেব কাশ্মীর, লাহোর, বিহার প্রভৃতি দেশ শাসন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একান্ত শান্তিপ্রিয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির একান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু তাহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ সেরূপ নহে। ইব্রাহিম খাঁর আহ্বান-পত্রের উত্তরে চার্নক এইভাবে উত্তর দিলেন—"আপনার মহৎ চরিত্রের উপর আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। কিন্তু সম্রাটের যে আদেশ-পত্র বাহির হইয়াছে, তাহা ভারতের সর্বস্থানের বাণিজ্য-কুঠির সম্বন্ধে। বাঙ্গলার বাণিজ্য কুঠি সম্বন্ধে আমাদের সাবেক বাৎসরিক তিন সহস্র মুদ্রা, শুল্ক প্রদানের ও পূর্বের অন্যান্য স্বত্বগুলি যদি আপনি বজায় রাখেন, এবং আপনার অধীনস্থ কর্ম-চারীদিগের অত্যাচার ও জবরদস্তি হইতে আমাদের রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমরা বাঙ্গলায় যাইতে পারি।"

ইব্রাহিম খাঁ চার্নককে অভয় দিলেন। তাঁহার শাসনকালের প্রথম বৎসরটি স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি ইংরাজ বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিলেন। পূর্বকথিত কাপ্তেন হিথের হঠকারিতার জন্যই এই সকল ইংরাজ মোগলের বন্দী হন। তিনি চার্নককে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনার প্রার্থনা আমি বাদসাহের মঞ্জুরির জন্য পাঠাইলাম। সে মঞ্জুরি না পেঁছানর পূর্বেও আমি আপনাকে অভয় দিতেছি যে বিনা আশঙ্কায় আপনারা বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতে পারেন।"[১]

আগস্টমাসে (১৬৯০ খৃষ্টাব্দে) ভরা বর্ষায় চার্নক বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত কর্মচারী ও ত্রিশজন শরীররক্ষী সেই জাহাজে উঠিল। ২৪এ আগস্ট রবিবার মধ্যাহ্নের পরবর্তী সময়ে তাহারা ভাগীরথী-বক্ষে তরণী সমেত প্রবেশ করিল। এইবার লইয়া চার্নক তৃতীয়বার সুতালুটিতে আসিলেন।

বর্ষাবাদলের তখন বড়ই প্রাবল্য। শ্রাবণের প্রবলধারা, ভাগীরথীর উত্তাল-তরঙ্গময় রণ-রঙ্গিণী মূর্তি। বহুবাধা বিঘ্ন সহ্য করিয়া জোব চার্নক—সুতালুটিতে নঙ্গর করিলেন।

ভাগীরথী প্রবেশ পথে ইংরাজগণ কোন বাধাই প্রাপ্ত হন নাই। ইব্রাহিম খাঁর আদেশে সমস্ত ঘাটির মোগল-কর্তারা তাঁহার সহিত শিষ্ট ব্যবহারই করিয়াছিল। মেটিয়াবুরুজের সন্নিকটবর্তী 'থানা' দুর্গের মোগল-সেনাপতি তাঁহাকে তোপধ্বনি করিয়া সম্মান দেখাইলেন।

ভবিতব্যবশে, বিধাতার ইচ্ছায় ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য, বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সুখ-সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য, চার্নক জঙ্গলময় সুতালুটিতে নঙ্গর করিলেন। এই শুভমুহূর্তে, বর্তমান প্রাসাদ-ময়ী রাজধানী কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। এই সার্ধ দুইশত বৎসরে নানা ঘটনার অধীন হইয়া যেন যাদুবলে সেই জঙ্গলময় কলিকাতা প্রাসাদময়ী রাজধানীতে পরিণত হইয়াছে। ধন্য ইংরাজ! ধন্য তোমার কষ্ট সহিষ্ণুতা। ধন্য তোমার বাণিজ্য প্রতিভা। আর ধন্য তুমি জোব চার্নক — এই ঐশ্বর্যময়ী কলিকাতার জন্মদাতা।

জোব চার্নক বহুদিন এদেশে ছিলেন। পাটনা, হুগলী, হিজলী, উলুবেড়িয়া, বালেশ্বর, সকল স্থানের অভিজ্ঞতাই তাঁহার ছিল। কিন্তু এ সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া কেন তিনি এই জঙ্গলময় বাদাভূমি ও বনজঙ্গলে বেষ্টিত সুতালুটিতে ইংরাজের বাণিজ্য কুঠিস্থাপন করিলেন.

১. বাদসাহ বাঙ্গলার নবাব ইব্রাহিম খাঁকে ইংরাজদের সম্বন্ধে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া ছিলেন, তাহার একাংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিতেছি—You must understand that it has been the good fortune of the English to repent them of their irregular past proceedings and by not being in their former greatness, have by their attorneys petitioned for their lives and a pardon of their faults, which out of my extraordinary favour towards them have accordingly granted. Therefore upon receipt hereof my order, you must not create them any further trouble but let them trade in your government as formerly and this order I expect you to see strictly observed.—Stewart's *History of Bengal*, Appendix p. iv.

তাহা তাঁহার সমকালীন ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন নাই। চার্নক যদি এই সুতালুটিতে ইংরাজের ভাগ্য প্রতিষ্ঠা না করিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে হয়ত পলাশীর রণাভিনয়ে লর্ড ক্লাইভ যশো-সঞ্চয় করিতে পারিতেন না বা ভবিষ্যদ্বংশীয় ইংরাজ জাতি এই ভারতের একাধীশ্বরত্বও লাভ করিতেন না।

চার্নক যে সমস্ত গূঢ় কারণ পরিচালিত হইয়া সুতালুটিতে ইংরাজ-বণিকদের কুঠি স্থাপনের মনস্থ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই প্রধান—(১) হুগলীতে থাকিলে অনেক বিপদ। হুগলীতে মোগল-ফৌজদারের বাস। ইংরাজ কুঠির সান্নিধ্যেই তিনি থাকেন। একবার যেমন কোম্পানির গোরা ও মোগলের সেনার মধ্যে বিবাদ বাধায় তাঁহাকে হিজলী পলাইতে হইয়াছিল, পুনরায় সেরূপ কোন ব্যাপার ঘটা অসম্ভব নহে। (২) সুতালুটি বন-জঙ্গলময়। ইহার উপকণ্ঠে বাদাভূমি ও খাল বিল। পার্শ্বে নৈসর্গিক পরিখারূপে প্রচণ্ড বেগময়ী ভাগীরথী বিরাজমানা। এই স্থানে কুঠিস্থাপন করিলে মোগলই হউক, আর মারহাট্টাই হউক, ভাগীরথী পার না হইয়া কেহই ইংরাজ কুঠির উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না। বিশেষত তখনকার সেই ভীম-তরঙ্গ-সংকুল গঙ্গানদী সসৈন্যে উত্তীর্ণ হওয়াও অসম্ভব। (৩) সেই সময়ে শেঠ ও বসুকেরা সুতালুটিতে হাটস্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরাজের রপ্তানির উপযুক্ত মালও এখানে সহজ প্রাপ্য। তাঁহার সৈনিকদিগের জীবনযাত্রার উপযোগী শস্যাদিও এখানে যথেষ্ট। (৪) বিশেষত এই সুতালুটির চারিধার এক ব্রাহ্মণ জমিদারের জমিদারি। তাঁহাদের নিকট ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইলেই সুবিধামত দরে জমা বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সে সময়ে সুতা-লুটিতে একটি কোঠাবাড়িও ছিল। এই কোঠাবাড়িতে প্রয়োজন মত ফ্যাক্টরগণকে রাখিয়া কাজকর্ম চলিতে পারে। (৫) সুতালুটি হইতে সমুদ্র সঙ্গম ও হুগলীর ফ্যাক্টরি বেশীদূরে অবস্থিত নহে। এখানে থাকিয়া হুগলীর সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে, বা বিপত্তি বুঝিলে জাহাজে চড়িয়া সাগর সঙ্গমে সমুদ্র মধ্যে উপস্থিত হওয়ার খুব সুবিধা। স্থলে ইংরাজ মোগলকে ভয় করিতেন বটে, কিন্তু জল পথে তাঁহারা অদ্বিতীয়। (৬) সুতালুটির পার্শ্ববাহিনী গঙ্গা তখন বর্তমান অবস্থায় ছিল না। সুতালুটির বাধা ঘাটের নীচে গঙ্গা অতি গভীর। এস্থানে সমুদ্রের দিক হইতে বড় বড় জাহাজ আসিয়া নঙ্গর করিতে এবং মাল নামাইতে উঠাইতে সক্ষম হইবে। মোগল-শাসনকর্তারা সহসা কোন গোলযোগ উপস্থিত করিলে সাবধান হইবার ও আত্ম-রক্ষার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে। (৭) কেবলমাত্র মাটির প্রাচীরের বেষ্টনী-বেষ্টিত ইংরাজ বাণিজ্য-কুঠি নিরাপদ নহে। ইংরাজ ফ্যাক্টরি ও কোম্পানি বাহাদুরের মালামাল নিরাপদে রাখিতে হইলে একটা ছোট খাট দুর্গ নিতান্ত প্রয়োজন। এতগুলি কথা মনে মনে ভাবিয়া জোব চার্নক সাহেব সুতালুটিতে আশ্রয় লইয়া বর্তমান কলিকাতা রাজধানীর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।

একাদশ অধ্যায়

ইংরাজ আগমনের পূর্বে ও পরে প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা

সুতালুটি প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলময় অবস্থা—চারিদিকে বাদাভূমি—বাঘ ও ডাকাতের ভয়—সালিখা ও বেতোড় প্রভৃতি গ্রামের কথা—বেতাইচণ্ডী—মনসার ভাসান গ্রন্থে তৎকালীন স্থানসমূহের নামোল্লেখ—ডি ব্যারোজ ও সিজার ফ্রেডরিক প্রভৃতি ইউরোপীয়ানগণ কর্তৃক লিখিত প্রাচীন জনস্থান-সমূহের বিবরণ—চাটগাঁ ও সাতগাঁর বন্দর—সপ্তগ্রামের উন্নত অবস্থা—ত্রিবেণী সঙ্গমের মেলা—বেতোড় ও গার্ডেনরিচ—বেতোড়ের হাট—বেতোড়ের হাটে পর্টুগীজ বাণিজ্য—সালিখা ও চিৎপুরের ক্রমোন্নতি—কুচিনান ও কলিকাতা—সপ্তগ্রামের অধঃপতন—সপ্তগ্রামবাসী শেঠ ও বসুকদের গোবিন্দ-পুরে আগমন—মুকুন্দরাম শেঠ ও তাঁহার প্রপৌত্র গোপীমোহন শেঠের কথা—শেঠ ও বসুকদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—শেঠদিগের গৃহদেবতা গোবিন্দজী—ধনন্তগ্রাম বা গোবিন্দপুর—কালীঘাটের হালদার বংশ ও কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠীর আদি পুরুষদের গোবিন্দপুরে বাস—পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ—সুতালুটির প্রাচীনত্ব নির্ণয়—বসাকগণ কর্তৃক সুতার ব্যবসায়—ঢাকাই মসলিন—ঢাকাই মসলিন বস্ত্রসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভারনিয়ারের বিবরণ—শেঠ ও বসাকদের বাণিজ্য জন্য সুতালুটির উন্নতি—শেঠ বসাকদের গৃহ-দেবতা গোবিন্দজি—কোম্পানি কর্তৃক গোবিন্দপুর খাসদখলের পর শেঠদিগের বড়বাজারে গমন—বড়বাজারে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীউর মন্দির—বৈষ্ণবচরণ শেঠ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—'আগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদের উৎপত্তি—বৈষ্ণবচরণের ধর্মজ্ঞান—প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা—হ্যামিল্টনের উক্তি—শেঠ ও বসাকের বাণিজ্য—বেতোড় হাটের অধঃপতন—সুতালুটি হাটের উন্নতি—পিপ্‌লে বা পীরপল্লী—কাটিগঙ্গা—কলিকাতায় পর্টুগীজ কুঠি—আলুগুদাম—আর্মানীদের কলিকাতায় আগমন—আর্মানীদের কলি-কাতায় বসবাস করাইবার জন্য জোব চার্নকের চেষ্টা। কলিকাতায় ডাচ বণিকদের কুঠি—বাঁকশাল ঘাট—বাঁকশাল শব্দের ব্যুৎপত্তি—কালীঘাটের হালদারদের গোবিন্দপুরে বসবাস—নূতন ও পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্মিলনে কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতি—সাঁইত্রিশ খৃীস্টাব্দের ঝড় ও ভূমিকম্প—তাহাতে প্রাচীন কলিকাতার ধ্বংস সাধন—সেই ভয়ানক ঝড়ের সমসাময়িক বৃত্তান্ত।

আমরা এ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক বুঝিয়াছেন, কেবলমাত্র পলাশীক্ষেত্রে বিজয়লাভ দ্বারা ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাঁহাদিগকে ইহার পূর্বে শতাধিক বৎসর ধরিয়া স্বার্থ-সংরক্ষণ জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। মুসলমান শাসনকর্তাদের হস্তে বহুবিধ অত্যা-চার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কারণ মোগল তখন দেশের রাজা ও ইংরাজ-বণিক তাঁহাদের প্রজা মাত্র। তাহার উপর পর্টুগীজ, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা যে কম ছিল তাহা নহে। এই প্রতিযোগিতা সহিয়া অদম্য সাহস ও স্থিরবুদ্ধি বলে পরিণামে ইংরাজই জয়ী হইয়াছিলেন। এ জয়লাভ করিতে তাহাদের যে কত কষ্ট আপদ বিপদ সহিতে হইয়াছিল তাহা পূর্বের অধ্যায়সমূহে বিবৃত হইয়াছে।

অতীত ইতিহাস হইতে প্রমাণ হয়, মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেই ইংরাজদের কিছু বেশী কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারা সমান ভাবেই মুসলমান হস্তে উৎ-

পীড়িত হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের প্রতিনিধিরূপে নবাব সায়েস্তা খাঁই ইংরাজ-বণিকগণকে নানাবিধ কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এখন এই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাটের শাসনাধীন ও তাঁহারই রাষ্ট্র সম্পত্তি। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য বণিকরূপী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণের প্রতিভাবলে অর্জিত। পলাশী যুদ্ধের পরে দেশের লোকে ইংরাজের শক্তি সামর্থ ও প্রভাবের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল বটে। কিন্তু তাহারা ইহার আগে জানিতে পারে নাই যে ইংরাজ জাতি শক্তি ও সাহসে, বুদ্ধি ও প্রতিভায় অতুলনীয়। পলাশী আমলের পূর্বে অনেক কর্মবীর স্বদেশভক্ত ইংরাজ ভারতে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বর্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠক! আজকালকার এই গ্যাসালোক উজ্জ্বলিত বড়বাজার, হাটখোলা প্রভৃতির চিত্র চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলুন। কল্পনার সহায়তায় দেখুন, এই সকল স্থানাধিকৃত সেকালের সুতালুটি. কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের চারিদিক ভীষণ জঙ্গল সমাচ্ছন্ন। একদিকে শিয়ালদহ, অপরদিকে হাওড়া ও দক্ষিণে চৌরঙ্গী, কালীঘাট ও ভবানীপুর, এই বিস্তৃত ভূভাগ কেবলমাত্র খাত ও পঙ্কিল বাদা ও ভূমিপূর্ণ। আর এই সমস্ত বাদায় কুম্ভীর, জঙ্গলে বাঘ এবং ডাঙ্গায় নরহন্তা, লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দল।

সরকারী কাগজ পত্রের সহায়তা ব্যতীত সেকালের লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও বহুযত্নে সংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকাদি ও তদুল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে সেই দুইশত বৎসর পূর্বের অন্ধতমসাবৃত যুগের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

কালীঘাটের উৎপত্তি ও এতৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা ইতিপূর্বে কালীঘাট প্রসঙ্গে বলিয়াছি। ধরিতে গেলে প্রাচীন কলিকাতা, সুতালুটি, গোবিন্দপুর, চিৎপুর প্রভৃতি লইয়াই বর্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সালিখাও একটি অতি প্রাচীন স্থান। দুইশত বৎসরের পুরাতন পুঁথি প্রভৃতিতে ইহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, বেতোড় (বর্তমান ব্যাঁটারা) গ্রামও সেকালের একটি বিখ্যাত স্থান। বেতোড়ের 'বেতাইচণ্ডী' বহুকালের দেবতা। প্রাচীন কলিকাতার সহিত সেকালের এই সমস্ত গ্রামগুলির স্মৃতি পূর্ণরূপে বিজড়িত আছে।

কালীঘাট ও কলিকাতা এই নামকরণ লইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক লেখা-লেখি হইয়া গিয়াছে। স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক গৌরদাসবাবু 'কলিকাতা রিভিউ'এর পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত এস্থলে পুনরাবৃত্তি করার বিশেষ প্রয়োজন কিছুই নাই। মোটের উপর কথা হইতেছে, এই কালীঘাট বহুদিন হইতেই লোকসমাজে পরিচিত ছিল।[১]

১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে, বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহের আমলে[২] বিপ্রদাসের 'মনসার ভাসান' রচিত হয়। এই মনসার ভাসান হইতে আমরা কলিকাতা, বেতোড় ও কালীঘাট সম্বন্ধে কতক কথা জানিতে পারি। বিপ্রদাসের গ্রন্থের প্রধান নায়ক চাঁদ-সওদাগর ভাগলপুর হইতে যাত্রা করিয়া বাণিজ্যার্থে সমুদ্রগামী হইয়াছিলেন। কবি এই প্রসঙ্গে তাঁহার গন্তব্যপথের প্রধান প্রধান স্থান-গুলির পরিচয় বা নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজঘাট, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া. আমবুয়া, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কুমারহাটি, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকনাড়া, মুলাযোড়, পাটুলিয়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, ইচ্ছাপুর, বাঁকিবাজার, নিমাইঘাট, চানক, রামসাল, আকনা, মাহেশ,

১. Babu Gour Das Bysack's Kalighat and Calcutta, *Calcutta Review*, April 1891. p. 306.

২. আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.

খড়দহ, রিষড়া, সুখচর, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, এড়িয়াদহ, ঘুসুড়ি, চিৎপুর, কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট, চোরাঘাট (চোরঘাট), জয়ঢালী, ধনস্থান, বারুইপুর হুলিয়া, ছত্রভোগ, হাতিয়াগড় প্রভৃতি স্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল স্থানগুলি সেই সময়ে সাধারণে পরিচিত না থাকিলে, কবি বিপ্রদাস তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইহার নামোল্লেখ করিতেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাস এই গ্রন্থ[১] রচনা করেন। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এবং সেই সময়ের লিখিত অন্যান্য কাহিনীও উল্লিখিত জনস্থান সমূহের মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে। সেই সকল কাহিনী, পর্টুগীজ ও ইংরাজ-লেখকদিগের পুরাতন কাগজপত্র হইতেও আমরা জানিতে পারি, ইহাদের মধ্যে অনেক গ্রামের নাম ও যশ সেকালে বিশেষ ভাবে প্রচারিত ছিল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এই সময়ের একখানি ম্যাপ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।[২]

কবির কিম্বদন্তী ছাড়িয়া এখন আমরা একবার ইতিহাসের দিক হইতে এই সকল স্থানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিব। সমসাময়িক ইউরোপীয়গণ পূর্বোক্ত জনস্থানসমূহের যেসকল বৃত্তান্ত লিপিবন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

ইউরোপীয় জাতিদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সুতানুটি অঞ্চলের' নাম জাহির হইয়াছে। প্রাচীন কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ সাধারণের পরিচিত হইয়াছে। প্রথমত পর্টুগীজ, পরে ইংরাজ—এই দুই জাতির কার্যক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া এই সমস্ত স্থানের পরিচয় পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবন্ধ হইয়াছে। ডি ব্যারোজ[৩] ও সিজার ফ্রেডরিক[৪] প্রভৃতি তৎকালীন লেখকগণ কতকগুলি প্রাচীন স্থান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বঙ্গীয় কবিগণের বর্ণিত কাহিনী অনেক মিলিয়া যায়।[৫]

পর্টুগীজেরা যখন বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করে, সেই সময়ে পূর্বে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে সপ্তগ্রাম এই দুইটিই প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ইহাই সেকেলে চাটগাঁ ও সাতগাঁর বন্দর বলিয়া বিখ্যাত। তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দর সপ্তগ্রামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। সকল আয়তনের জাহাজই চট্টগ্রামে নঙ্গর করিতে পারিত। কিন্তু পর্টুগীজ বোম্বেটিয়াদের উৎপাতে এ স্থানের বাণিজ্য-প্রাধান্য কমিয়া আসে। চট্টগ্রামের নিম্নে বাঙ্গলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের নিকটেই ত্রিবেণী সঙ্গমে তখন অনেক লোকে শুভ-পর্বদিনে ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত। সপ্তগ্রামের হাট-বাজার চত্বর ও গঞ্জ প্রভৃতিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইতে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আসিত। তখন বেতোড় পর্টুগীজদের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। পর্টুগীজ জাহাজগুলি এই স্থানের অদূরে, বর্তমান গার্ডেনরিচে নঙ্গর করিত। বড় বড় জাহাজ নদীর শাখাসমূহ প্রবেশ করিতে পারিত না। বোট, বজরা ও ভড় প্রভৃতি এই বেতোড়ের হাট হইতে মালপত্র লইয়া সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইয়া বরানগর, দক্ষিনেশ্বর, আগরপাড়া, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাইত। বেতোড়ে কোন নির্দিষ্ট হাট ছিল না। পর্টুগীজেরা প্রতিবৎসর যখন এইস্থানে আসিত সেই সময়ে হাটের জন্য তাহারাই এদেশের জনমজুর দিয়া কতকগুলি হাটচালা প্রস্তুত করাইয়া লইত। সাময়িক ক্রয়বিক্রয়ের কার্য শেষ হইয়া

১. বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসামঙ্গল' সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

২. বিপ্রদাসের এই বর্ণনা হইতে প্রমাণ হইতেছে কলিকাতা, চিৎপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামের নামোল্লেখ থাকিলেও ইহার মধ্যে সুতালুটি ও গোবিন্দপুরের নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, এই গ্রামগুলি সে সময়ে জঙ্গলাবৃত স্থান ছিল।

৩. Jao de Barros, এঁর নকসার রচনাকাল ১৫৫০ খ্রী.

৪. Caesar Fredrick ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন।

৫. *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal* 1892. p. 189.—Article on Bipradas by Mohamohopadhya Haraprasad Sastri.

গেলে বড় বড় জাহাজে তাহাদের ক্রীত মালপত্রগুলি তুলিয়া লইয়া সমুদ্র-পথে দিয়া তৎকালের পর্টুগীজদের প্রধান বাণিজ্যস্থান গোয়ায় পৌঁছিত। পর্টুগীজেরা এই সময়ে তাহাদের হাট-বাজারের চালাগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। সেই জনসংকুল হাট পরিণামে কেবল দগ্ধ বাঁশ হোগলা ও খড়ের ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া তাহাদের আগমন-চিহ্ন প্রকাশ করিত। আলাউদ্দিনের বাতির মত বৎসরের মধ্যে দুই একবার সহসা এই স্থান ক্ষুদ্র নগরের আকার ধারণ করিত, আবার পর্টুগীজদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা জনশূন্য ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইত।১

যাহা হউক বেতোড়ের এই বাণিজ্য জন্য চিৎপুর সালকিয়া প্রভৃতি জঙ্গলময় স্থানসমূহ ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইতেছিল। কুচিনান ও কলিকাতায় গঙ্গার তীরে নৌকাদি বাঁধিবার জন্য কয়েকটি ঘাট ছিল, একথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

নিয়তির শক্তি অতিক্রম করিতে কেহই পারে না। কালের স্রোত রুদ্ধ করিতে কেহই সক্ষম নহে। লক্ষ্মীশ্রীপূর্ণ, জনসংকুল সপ্তগ্রাম, সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় এই নিয়তি শক্তিবশে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দেও সপ্তগ্রাম, খুব জাঁকাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তাহার পরেই ইহার পতন আরম্ভ হয়। সপ্তগ্রামের পতন দেখিয়া, তথাকার শেঠ ও বসুকেরা বেতোড়ের বাণিজ্যে লাভবান হইতে প্রয়াসী হন। কলত্রীশ গোত্রীয় যাদবেন্দ্র বসাক মহাশয় খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার সন্নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে বাস করিতে আসেন। এই সময়ে শেঠবংশীয় মুকুন্দরাম শেঠও২ গোবিন্দপুর৩ গ্রামবাসী হন। ইহাঁর প্রপৌত্র গোপীমোহন ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের তিন বৎসর পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'দাদনীবণিক' ছিলেন।

যে শেঠ ও বসুকদিগের সহিত জঙ্গলময় বাদা ভূমিপূর্ণ কলিকাতার বিশেষ সংস্রব, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা বহুকষ্টে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বসাক বা বসুকদিগের৪ আদিবাসস্থান সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের একটি পুষ্করিণী তাঁহাদের নামানুসারে 'বসকা-দীঘি' বলিয়া বিখ্যাত। সপ্তগ্রামে বাসকালে বসাকদিগের 'বসক'৫ উপাধি ছিল। কলিকাতায় আসিবার পর তাহা 'বসাকে' পরিবর্তিত হয়।

এই বসাকদিগের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠী বা শেঠ বলিয়া এক সম্প্রদায় আছেন। শেঠেরাও এই সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস আরম্ভ করেন।

সেকালের কলিকাতা দুইখানি গ্রামে বিভক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

১. Caesar Fredrick in Hakluyt Ed. of 1598. Vol 1, p. 230.

২. মুকুন্দরাম শেঠের (বা শ্রেষ্ঠীর) বিস্তৃত বিবরণ নগেন্দ্রনাথ শেঠ প্রণীত কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস পৃ. ২০-২২ দ্রষ্টব্য।

৩. একটি জনপ্রবাদ এই যে শেঠদিগের প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর গ্রামের নামকরণ হয়। এই গোবিন্দপুরের জঙ্গল কাটাইয়া তদধিকৃত স্থানাংশ বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বা গড়ের মাঠে কেল্লা নির্মিত হইয়াছে।

৪. 'বসুক' গ্রন্থ-প্রণেতা মদনমোহন হালদার মহাশয় বলেন—বসুক শব্দই বসাকদের প্রকৃত উপাধি এবং বসুকেরা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। একখানি সারগর্ভ গ্রন্থ লিখিয়া তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বসুক হইতে বসক শব্দে দাঁড়াইয়াছে। বসক শব্দের অর্থ ধনসম্পত্তি—ভাবার্থে কর ও রাজস্ব! উহা বৈশ্যের বর্ণগত উপাধি। আমরা এই গ্রন্থে চিরপ্রচলিত বসাক শব্দই ব্যবহার করিব। তাহা না হইলে পাঠকেরা গোলে পড়িতে পারেন।

৫. কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস গ্রন্থপ্রণেতা নগেন্দ্রনাথ শেঠের মতে "আকবরের রাজত্বকালে উচ্চপদ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বুসাখ উপাধি লাভ করিতেন ··· বুসাখ পারসী শব্দ—বু অর্থে—সৌরভ, সাখ অর্থে—শাখা; অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সৌরভময় শাখা। প্রাচীন বুসাখ উপাধি মধ্যযুগে বসাখ এবং বর্তমানে বসাক নামে বিদিত। পৃ. ১১৬।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে—

"ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়। চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা। বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥[১]
বেতাই-চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে। ধনন্তগ্রাম থানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাইনে এড়াইয়া যায় হিজিলির পথ। রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
কালীঘাট এড়াইল বেনিয়ার বালা। কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সওদাগর। তাহার মেলান বেয়ে যায় মাই নগর॥

শ্রীমন্ত সওদাগর কলিকাতা উত্তীর্ণ হইয়া ধনন্তগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কবির বর্ণনানুসারে, এই ধনন্তগ্রাম সেকালের গোবিন্দপুর বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমন্ত পরপারস্থ বেতাই-চণ্ডিকার পূজা করিয়া আদ্যগঙ্গায় প্রবেশ কালে ধনন্তগ্রামখানি বামদিকে দেখিয়াছিলেন। 'ধনন্ত' শব্দ 'ধনস্থের' অপভ্রংশ। ধনস্থ শব্দের সঙ্গত অর্থ—যে গ্রামে ধন আছে বা ধনিগণ বাস করেন। বসাকেরা চণ্ডীকাব্য রচনার পূর্বে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। তাঁহারা যে এই গ্রামের আদিম অধিবাসী তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পরই কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণের পূর্বপুরুষগণ ও কলিকাতা ঠাকুরগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ বহু পরে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন ১৭০৬ খৃীস্টাব্দে জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা স্থাপনের ষোল বৎসর পরে গোবিন্দপুরে আসেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে প্রকাশ যে, গোবিন্দপুর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দক্ষিণে[২] এবং গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমা হইতে ঐ দুর্গ তিন মাইল উত্তরে। ১৬৯৬ খৃীস্টাব্দে এই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ সূচনা হয়।

হ্যামিল্টন বর্ণিত কোম্পানির কুঠি ও দুর্গ সূতালুটির অন্তর্গত ছিল। খৃীস্টীয় ১৮২০ অব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। খৃীস্টীয় ১৭০০ অব্দের ২৭-এ মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত পত্রাদি এদেশ হইতে কোম্পানি বাহাদুরের কর্মচারীরা বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন তাহা সূতালুটি হইতে প্রেরিত বলিয়া ব্যক্ত আছে। ইহার পরের সমস্ত চিঠিপত্র যথাক্রমে কলিকাতা ও ফোর্ট উইলিয়াম হইতে প্রেরিত।[৩]

এই প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের কিছু দক্ষিণে একটি নদী বা খাল ছিল। ঐ খাল বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া চাঁদপাল ঘাটে গঙ্গার সহিত মিলিত

১. বেতড়া বা বেতোড় আধুনিক ব্যাঁটরা। উহা হাওড়া ষ্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে। বেতড়ার খালকে বেতাকীর খাল বলে। উহার মোহানা আদিগঙ্গার মোহানার ঠিক সম্মুখে। পূর্বে পর্টুগীজ বণিকেরা ঐ খাল দিয়া সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন। বেতাই-চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে সেইস্থানে অতীতকালে এক মহামেলার অনুষ্ঠান হইত। ফ্রেডরিক সিজার নামক পূর্বোক্ত সমসাময়িক ভ্রমণকারী ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় আসেন। তিনি বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে মুকুন্দরামের সময়ে ঐ খাল একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বেতাকীর খাল বন্ধ হইলে ইংরাজ ও পর্টুগীজ বণিকেরা হুগলী যাতায়াতকালে ভাগীরথী দিয়া যাইতেন। তখন সপ্তগ্রাম হইতে আসিবার সময় গরিফা, গোন্দলপাড়া, ইছাপুর, মাহেশ, খড়দা, কোন্নগর, চিৎপুর, শালিখা প্রভৃতি গ্রামগুলি অতিক্রম করিয়া কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সম্মুখ দিয়া আদিগঙ্গায় প্রবেশ করিতে হইত। ফ্রেডরিক লিখিয়াছেন—"Buttor a good tides rowing before you come to Satgaw from thence upwards the ships do not go because the river is very shallow. The small ships go to Satgow and there they lade.

২. Yule's *Glossary*. (See Chutanutty).

৩. হ্যামিল্টন কলিকাতার পুরাতন কেল্লা (অর্থাৎ বর্তমান জেনারেল পোষ্টাফিস, কাষ্টমহাউস ও ই, আই, রেলওয়ে এজেন্ট আফিসের অধিকৃত স্থানে যে কেল্লা ছিল যাহার অবস্থান চিহ্ন লর্ড কার্জন বাহাদুর—পিত্তলের লাইন দিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন, যাহা নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন) তাহার কথাই বলিয়াছেন। পুরাতন দুর্গের অস্তিত্বমাত্র এখন নাই। পাঠক যেন এই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামকে গড়ের মাঠের বর্তমান কেল্লা বলিয়া না ভাবেন।

হইয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে অপজনের[১] ম্যাপেও ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।[২] এই খাল গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এবং সুতানুটি গ্রামের অন্তর্বর্তী সীমা ছিল। যখন গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমার খাল 'গোবিন্দপুরের খাত' বলিয়া উল্লিখিত হইত তখন উত্তরের এই খালটির সম্ভবতঃ এরূপ কোন একটা নাম থাকিতে পারে। কিন্তু সে নাম যে কি ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না।

সুতানুটি সম্ভবতঃ শেঠ ও বসাকদের আগমনের পর হইতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কলিকাতা গ্রামের একটা নাম ঘোষণা হইয়াছিল। চণ্ডীকাব্য হইতে পাঠক দেখিলেন অগ্রে ধনন্তগ্রাম পরে কলিকাতা, এই ভাবেই নির্দেশ আছে। কলিকাতার অধস্তনকালের আখ্যা সুতানুটি চণ্ডীকাব্যে নাই।

চণ্ডীকাব্য রচনার পর হইতে সুতানুটির ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে। গ্লাডউইনের 'আইন-ই-আকবরীতে' "জমা-ওয়াশীল-তুমার'র মধ্যস্থ তালিকায় এই কলিকাতাই উল্লিখিত আছে। ১৫৮২ অব্দে রাজা টোডরমল সমস্ত বঙ্গদেশ জরিপ করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করেন। আইন-ই-আকবরী ১৫৯৬ অব্দে শেষ হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, সুতানুটি নাম কলিকাতার পরে হইয়াছে।[৩]

বসুকদিগের সুতানুটি-হাট পত্তনের ন্যূনাধিক শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৬৬০ অব্দে ভ্যানডেন ব্রুক (Vanden Broock)[৪] নামক জনৈক ওলন্দাজ, তৎসাময়িক একখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে (Soelanotti) বলিয়া একটি গ্রামের নামোল্লেখ আছে।[৫] সেই সময়ে কলিকাতার মধ্যে সুতার ও সেই সঙ্গে সুতার-নুটির বাণিজ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

সেকালে বাঙ্গলার সূক্ষ্ম-সূত্র-শিল্প, এক অপূর্ব জিনিস ছিল। 'ঢাকাই-মসলিন্' বঙ্গের অতীত গৌরবের সামগ্রী। ইউরোপের অনেক সম্রাজ্ঞী, ভারতের মোগল বাদসাহদিগের পাটরাণীগণ, বেগমগণ, এই ঢাকাই-মসলিন্ নির্মিত পোষাক পরিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন। ঢাকার দশ বার ক্রোশ উত্তর পূর্বে ডুমরাও নামক একটি স্থান, অতীতকালে এইরূপ সূক্ষ্ম-সূত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও সেখানে অনেক তন্তুবায়ের বাস আছে। এখনও একটি প্রবাদ আছে যে এই স্থানের সুপ্রসিদ্ধ কর্তনীরা একরতি ওজনের তুলায় একশত পঁচাত্তর হাত সূতা কাটিয়া দেন।

---

১. অপজন—Aaron Upjohn জাহাজের বাদ্যকর হিসাবে ভারতে পদার্পণ করেন ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ইনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল তিনি Calcutta Chronicle-এর সম্পাদক ছিলেন।

২. এই খালের বা Creek (ক্রীকের) কোন চিহ্ন না থাকিলেও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পার্শ্ববর্তী—'ক্রীক-রো' ইহার নাম রক্ষা করিতেছে। 'ডিঙ্গাভাঙ্গা' নামের সহিত এই খালের কোন সম্বন্ধ আছে কি না পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। হলওয়েল সাহেব গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমার খালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—On my joining the Fleet at Fulia I did hear he was sent into Gobindapur Creek to burn and destroy the great boats there, that they might not be employed by the enemy in the attack or pursuit of the ships.—Holwell's *Indian Tracts* 1764, p. 238.

৩. Gladwin's *Ain-i-Akbari*. Vol II p. 206.

৪. প্রকৃত নাম Van den Broucke (ভ্যান ডেন্ ব্রোক)।

৫. অনেকে অনুমান করেন, বসাকেরাই তন্তুবায়ের কাজ করিতেন, বস্ত্র ও সূতা প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু 'বসুক' নামক জাতিতত্ত্ব-বিচার গ্রন্থপ্রণেতা মদনমোহন বাবু বলেন, "বসুকেরা তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রবয়ন করাইয়া লইতেন। এই নিম্নশ্রেণীস্থ বয়ন-জীবিগণ বসুকদের নিকট কার্পাস গ্রহণ করিত এবং চরকায় সূতা কাটিবার জন্য তুলার পাঁজ প্রস্তুত করিত। এই সমস্ত তুলা বসুক বা বসাকদের নিকট গৃহীত হইত এবং চরকায় সুতা কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। পরে আবার সূত্র বা বস্ত্রাকারে তাহাদিগকেই প্রদত্ত হইত। এই আদান-প্রদান ক্রিয়ার অবান্তর সম্বন্ধ বশত ঐ সকল তুলার পাঁজ 'বসুক বা বোসকে' নামে আখ্যাত। যে সকল স্ত্রীলোক কাটনা কাটিতেন তাহাদিগকে 'কর্তনী' বলিত। 'কাটনা' শব্দ কর্তনীর অপভ্রংশ। এখনও পর্যন্ত কাটনা শব্দ বঙ্গদেশ হইতে লোপ পায় নাই এবং অনেক বৃদ্ধ মফঃস্বলে কাটনা-কাটার প্রথা বৃদ্ধা বিধবাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে একটি প্রবাদই আছে 'কাটনা কাটনা ধন'।"

পাঠক! বঙ্গের এই প্রাচীন গৌরবের অস্তমিত অবস্থায় হয়ত একথা বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য আমরা প্রসিদ্ধ ফরাসীবণিক টাভারনিয়ারের[১] উক্তি নিম্নস্থ পাদ-টীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। টাভারনিয়ার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন[২] তাহার সারমর্ম এই—বাপতাগুলি পৌণে দুই হাত চওড়া ছিল। একটি থানে কুড়ি হাত কাপড় থাকিত। এই কাপড়গুলি ৫ হইতে ১২ মামুদীতে সাধারণতঃ বিক্রয় হইত। যদি কেহ ফরমাইস করিতেন, তাহা হইলে তদ্বারা তাহারা আরও চওড়া ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। তাহার দাম ৫০০ মামুদি পর্যন্ত হইত। আমাদের সময়ে আমি দেখিয়াছি, এক হাজার মামুদীতে দুই খণ্ড কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। ইংরাজ সওদাগরগণ এই বহুমূল্য কাপড়ের এক প্রস্থ কেনেন, ও দিনেমার সওদাগরগণ অপরটি লয়েন। এ কাপড়গুলি লম্বে ২৮ হাত। মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে ফিরিয়া যাইবার সময় অস্ট্রীচ ডিম্বাকার এক ক্ষুদ্র রত্নখচিত নারিকেল খোলের মধ্যে এক খণ্ড মসলিন্ লইয়া যান। পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় সাহ সুফীকে এই অপূর্ব জিনিস উপহার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই রত্নখচিত নারিকেলের খোলের মুখ খুলিবামাত্রই তন্মধ্য হইতে ৬০ হাত লম্বা এক মস্‌লিনের পাগড়ি বাহির হইল। এই মস্‌লিন এত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত যে আদৌ তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায় না। যত লম্বা মসলিন্ হউক না কেন তাহার ভার অতি কম। ভরি ও রতি ইহার মাপ-পরিমাণ। আমরা গল্প শুনিয়াছি যে ঢাকাই মসলিনের একখণ্ড যদি রাত্রিকালে কোন তৃণক্ষেত্রে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি শিশিরে ভিজিয়া তাহার এরূপ অবস্থা হয় যে পরদিন প্রভাতে সূর্য উঠিলেও তাহার অস্তিত্ব বোধ হয় না। বোধ হয়, যেন ঘাসের উপর একখানি মাকড়সার সুদীর্ঘ জাল বিছান আছে।

বঙ্গের সেকালের সূক্ষ্ম-কার্পাসসূত্র বাঙ্গালীর ভাগ্যলক্ষ্মী ছিল। অনেক টাকার সূক্ষ্ম-সূত্র কার্পাসবস্ত্র ও মসলিন্ এ দেশ হইতে ইউরোপের হাটে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। কাট্‌না-কাটা এদেশে তখনকার একটা সাধারণ প্রথা। মোগলদিগের আমলে এই কাট্‌না-কাটা প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কবিকঙ্কণের নিম্নলিখিত শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ—

প্রভুর দোসর নাই, উপায় কে করে। 'দাদনি' দেয় এবে মহাজন সবে।
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওধারে॥ টুটিল সূতার কড়ি উপায় কি হবে॥
দুপণ কড়ির সূতা একপণ বলে
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে।

তখন স্ত্রীলোকেরা দাদনি লইয়া কাটনা কাটিতেন। শেঠ-বসাকেরা পরবর্তী কালে দাদন দিয়া কাজ করাইতেন, পরে ইংরাজ-বণিকেরাও 'দাদ্‌নি' প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভাগীরথীর একদিকে সুতালুটির সূতার ব্যবসা ও অপরদিকে বেতোড়ের হাট। এই দুইটি হাটের বাণিজ্যের জন্যই ভবিষ্যৎ কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। ধরিতে গেলে শেঠ-বসাকদিগের আগমনে বন-জঙ্গলপূর্ণ গোবিন্দপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বল্লভাচার্যই রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির উপাসনা ভারতে প্রচার করেন, এরূপ

---

১. ফরাসী পর্যটক, Tr. and Ed. V. Ball (London) 1889.

২. 'The broad Baftas are 1¾ cubit wide and the piece is 20 cubits long. They are commonly sold at from 5 to 12 *Mahamudis*, but the merchant on the spot is able to have them made much wider and finer and up to the value of 500 *Mahamudis* the piece. In my time, I have seen 2 pieces of them sold for each of which 1000 *Mahamudis* were paid. The English bought one and the Dutch the other and they were each 28 cubits. Mahamed Ali Beg while returning to Persia from his embassy to India presented *Chasufi* (II) with a cocoanut of the size of an ostrich's egg, enriched with precious stones and when it was opened a turban was drawn from it 60 cubits in length and of a *Muslin* so fine, that you would scarcely know what it was that you had in your hand. The Queen Dowager with many of the Ladies of the Court was surprised at seeing a thread so delicate which almost escaped the view—*Travels of Tavernier*, Vol II p. 7-8, 1679.

একটা জনপ্রবাদ আছে। বলিতে পারি না, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির বহুল প্রচার ইহার পূর্বে হইয়াছিল কি না। বসাকেরা গোবিন্দপুরে আসিবার পর রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত ইহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কাল। শেঠ-বসাকদিগের গোবিন্দজী ঠাকুর শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই যুগল মূর্তি।[১] ক্রমশ গোষ্ঠি-বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতির সহিত এই শেঠ ও বসাক বংশীয়দের অনেকের গৃহে শ্যামরায়, মদনমোহন ইত্যাদি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়।

ধরিতে গেলে এই শেঠ ও বসাকগণ কলিকাতার 'জঙ্গল-কাটা' বাসিন্দা। তাঁহারা যদি ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম হইতে সুতালুটিতে আসিয়া বাস না করিতেন, তাহা হইলে এই কলিকাতাকে আজ আমরা প্রাসাদময়ী নগরী রূপে দেখিতে পাইতাম না।

প্রাচীন কলিকাতায় যে হাট পত্তন হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা, কুচিনান
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥

১. এই মূর্তি স্থাপনায় প্রধান উদ্যোগী মুকুন্দরাম বসাক। মুকুন্দরামের উপাধি 'শেঠ' ও তিনি মোদ্গল্য-গোত্রীয়। ১৭৫৭ খ্রী. অব্দে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের আমলে কোম্পানি বাহাদুর গোবিন্দপুর হইতে লোকের বস-বাস উঠাইয়া দিলে তদ্বংশজাত বৈষ্ণবচরণ তথা হইতে গোবিন্দজীকে উঠাইয়া আনিয়া বড়বাজারে নিজ বসত-বাটির উত্তরে স্থাপিত করেন। তদবধি গোবিন্দজী এখনও তথায় বর্তমান আছেন। টাঁকশালের দক্ষিণ পূর্বে বড়-বাজারে যাইবার পূর্বধারে তাঁহার মন্দির আজও অবস্থিত। (বসুক-১২৫৬) মুকুন্দরামের বংশধর বৈষ্ণবচরণ শেঠ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার মত ধর্মভীরু লোক সেকালে বড় কম ছিল। তেলিঙ্গানা প্রদেশের রামরাজার পূজার জন্য গঙ্গাজল তিনি কলিকাতা হইতে শীলমোহর করিয়া পাঠাইতেন। বৈষ্ণবচরণের ধর্মভীরুতার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছি। পাঠক বোধ হয় শুনিয়াছেন এদেশে একটি প্রবাদ বাক্য আছে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'। এই গৌরী সেন ব্যবসায় সূত্রে বৈষ্ণবচরণের অংশীদার ছিলেন। বৈষ্ণব শেঠ এক সময়ে কতকগুলি দস্তা খরিদ করেন। কিন্তু পরীক্ষায় জানা যায় এই দস্তার মধ্যে রূপার অংশ কিছু বেশী। বৈষ্ণবচরণ ভাবিলেন গৌরী সেনের নামে দস্তা কেনায় তাহা 'রাঙ্গের বদলে রূপায়' দাঁড়াই-য়াছে। ধর্মভীরু কর্তব্যপরায়ণ বৈষ্ণবচরণ ইহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই গৌরী সেনকে প্রদান করেন। এই ব্যাপারে গৌরী সেন মহা ধনী হইয়া উঠেন। গৌরী সেন তাঁহার অর্জিত বিপুল সম্পত্তি দান-খয়রাতে ব্যয় করি-তেন। কন্যাদায়, মাতৃদায়, পিতৃদায়, দেনার দায়ে কয়েদী অধমর্ণ, কিম্বা যাহারা ন্যায়পথে থাকিয়া সৎকার্যের জন্য ফৌজদারিতে জড়িত ও জরিমানার আসামী তাহাদের জন্যই অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। ইহা হইতেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এই প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি। এক্ষণে এই বৈষ্ণবচরণ শেঠ সম্বন্ধে দুই একটি কিম্বদন্তী বলিব। বৈষ্ণবচরণ এক সময়ে বর্ধমানের কোন মহাজনের নিকট দশহাজার টাকার চিনি কিনিবার সংকল্প করেন। এই লোকটির নাম গোবর্ধন রক্ষিত, জাত্যংশে তাম্বুলী। সমস্ত মাল যখন বড়বাজার কদমতলা ঘাটে পৌঁছিল সেই সময়ে বৈষ্ণবচরণের কর্মচারীরা মাল নামাইতে যান। তাঁহারা গোবর্ধনের নিকট কিছু উপরি পাওনার লাভে হতাশ হইয়া মনিব বৈষ্ণবচরণকে মিথ্যা করিয়া জানান যে মাল তত সুবিধার নয়, ইহা কিনিলে লোকসান হইবে। বৈষ্ণবচরণ রক্ষিত মহাশয়কে অন্যলোক দ্বারা সেই কথা জানাইয়া বলেন, "আপনার মাল শুনি-তেছি তত ভাল নয়, এজন্য দাম কমাইতে হইবে।" সেকালের লোক ধর্মকে বড় ভয় করিতেন। কাজেই রক্ষিত মহাশয় যখন এই মিথ্যাপবাদ শুনিলেন, তখন তিনি ব্যবসায়ে বদনামের ভয়ে তাঁহার চাকরদের আদেশ করি-লেন, "চিনির নৌকা গঙ্গায় ডুবাইয়া দে। বদনাম কিনিয়া চিনি বেচিতে চাহি না।" তাঁহার চাকরেরা এই হুকুম পাইয়া যখন তাহা কতকটা কার্যে পরিণত করিয়াছে তখন এ সমস্ত কথা ধার্মিকপ্রবর বৈষ্ণবচরণের কাণে পৌঁছিল। তিনি তখনই আসিয়া মহাজন রক্ষিত মহাশয়কে বলিলেন, "আমার কর্মচারীদের মুখে মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া আমি আপনাকে সন্দেহ করিয়াছি। গঙ্গায় যে মাল ফেলিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব না। এখন যে মাল মজুত আছে তাহার দাম পূর্ব স্বত্ব মতেই দিব।" কিন্তু ধর্মজ্ঞানে গোবর্ধনও বৈষ্ণব-চরণের অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন ছিলেন না। তিনি কোনমতেই পুরা দামে মাল বেচিতে চাহিলেন না। যে মাল নষ্ট হইয়াছিল তাহা বাদে তিনি বৈষ্ণবচরণের নিকট মালের দাম চুকাইয়া লইলেন। হায় বাঙ্গলা! হায় বঙ্গবাসী! তোমরা দেড়শত বৎসর পূর্বে যেরূপ মহত্ত্বে ভূষিত ছিলে আর কি সে দিন ফিরিয়া আসিবে!

প্রাচীন কলিকাতায় বসুকেরাই প্রথমে একটি হাট-স্থাপনা করেন। চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা হইতে দেখা যায়, কলিকাতার তখনকার হাটসমূহ হইতে হয়ত ভবিষ্যতে 'সুতালুটি হাটখোলা' বা 'সুতালুটি হাটতলা' দাঁড়াইয়াছে। তখনকার হাটসমূহ পাকা পোক্তা ধরনের ছিল না। হয়ত উন্মুক্ত স্থানেই অনেক হাট বসিত। এই জন্য হয়ত 'খোলা হাট' এই আখ্যা হইতে ক্রমশ তাহা 'হাটখোলায়' দাঁড়াইয়াছে।

বেতাকীর খালের দুর্দশার সহিত বেতোড়ের হাট ক্রমশ শ্রীহীন হইতে থাকে। পর্টুগীজ বণিকেরাও তথায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেন। বেতোড়র হাটের ধ্বংস হইলে কলিকাতার হাটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। জোব চার্নক যে সময়ে সুতালুটিতে তৃতীয়বার পদার্পণ করিয়া কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন সে সময়ে সুতালুটির হাট বেশ জোরে চলিতেছিল। কারণ জোব চার্নক নিজেই লিখিয়াছেন, "চারিদল শেঠ ও বসাকেরা সপ্তগ্রামের অধঃপতনের সূচনা দেখিয়া গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। তাঁহারা প্রথমে বেতোড়ের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। বেতোড়ের অধঃপতনের পর সুতালুটির হাট প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১]

জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার প্রায় সাতাশ বৎসর পরে এই প্রাচীন কলিকাতার যে সামান্য উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সমসাময়িক হ্যামিল্টনের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

বসুক নামক গ্রন্থ রচয়িতা বলেন, "সম্ভবত খৃস্টের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বসাকেরা কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসবাস করেন। বসাকেরা পর্টুগীজ ও ইংরাজ উভয় জাতীয় বণিকদের সহিত ব্যবসায়সূত্রে লিপ্ত ছিলেন। বেতোড়ের হাটের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এপারে সুতালুটির হাট জাঁকিয়া উঠে। বসুকেরা ধরিতে গেলে কলিকাতার 'জঙ্গল কাটানো' অধিবাসী। ১৭১৭ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বংশবৃদ্ধির সহিত তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন।" এ সম্বন্ধে সমসাময়িক হ্যামিল্টন সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এই —"১৭১৭ খৃস্টাব্দে কলিকাতার অবস্থা অন্যরূপ ছিল। বর্তমান নগরী সেই সময়ে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। দশ বারখানি ঘর লইয়া, এক একটি ক্ষুদ্রগ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা অনেকেই কৃষকশ্রেণীভুক্ত। চাম্পাল ঘাটের (চাঁদপাল) দক্ষিণে এক বনভূমি। ক্রমে এই বন পরিস্কৃত হয়। খিদিরপুর ও এই বনভূমির মধ্যে দুইখানি গ্রাম ছিল। এই সময়ে শেঠ ও বসাকেরা এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী। তাহাদের যত্নেই এসব গ্রামে লোকের বসবাস হয় ও ইহা একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হয়। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম (গড়ের মাঠের পার্শ্ববর্তী স্থান) ও এসপ্লানেড (ধর্মতলার নিকটবর্তী স্থান) অধিকৃত ভূভাগেই উল্লিখিত বনভূমি ও দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ১৭১৮ খৃস্টাব্দে চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্যে দুই একখানা গ্রামের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রামের চারিদিকে নালা নর্দমা ও খাল। ধরিতে গেলে এই সময়ে চিৎপুর হইতেই কলিকাতার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু চিৎপুর ও কলিকাতার মধ্যবর্তী ভূভাগ বন-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। ১৭৪২ খৃস্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য কলিকাতার একদিক ব্যাপিয়া খাল খনন করা হয়। ইহা 'মারহাট্টা ডিচ' বা বর্গীর-খাত' বলিয়া বিখ্যাত। সিরাজ-উদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সহরের মধ্যে ইংরাজদের ৭০ খানি বাড়ি ছিল। এখন যাহা এসপ্লানেড, চৌরঙ্গী ও ফোর্ট উইলিয়াম, ১৭৫৬ খৃস্টাব্দেও তাহা জঙ্গলময় ছিল। এই জঙ্গলসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রগ্রাম ও মধ্যে মধ্যে গোচারণ ভূমি।"[২]

১. The foreign market attracted native traders and merchants to the spot and in particular from families of Bysacks and one of Setts, leaving the then rapidly declining city of Satgong, came and founded the Settlement of Govindpur and established Suttnutai market on the north side of Calcutta—Wilson *Early Annals*, Vol I, p. 128.

২. A forest to the south of (Champal Ghat) which was afterwards removed by degrees between Kidderpur and the forest were 2 villages whose inhabitants were invited to settle in Calcutta by the ancient family of Sets, who were at that time merchants.

বসুক গ্রন্থকার বলেন, "প্রাচীন কলিকাতায় তাঁহাদের (শেঠ বসাকদের) একটি হাট সংস্থাপিত হয়। চণ্ডীকাব্যে যে কলিকাতা-হাটের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা তাঁহাদেরই সেই বিচার্যমান হাট এবং অধস্তনকালে ইহা 'সুতালুটি হাটখোলা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হইলে, বেতোড়ের হাটের অবনতি ঘটে ও বণিকেরা ক্রমে ঐ হাটে যাতায়াত কমাইয়া ফেলেন। বেতোড়ের হাট জনশূন্য হইলে কলিকাতার হাট জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। পর্টুগীজ বাণিজ্যের জন্যই বেতোড়ের হাটের উন্নতি। শেঠ বসাকেরা পর্টুগীজ ওলন্দাজ ডাচ্ প্রভৃতি সর্বজাতীয় বণিকদের সহিত ব্যবসা করিতেন কিন্তু ইংরাজদের সহিত তাঁহাদের কিছু বেশী বনিবনাও হইত। পর্টুগীজদিগকে লোকে 'ফিরিঙ্গি'১ আখ্যা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একদল সমুদ্রপথে বোম্বেটিয়াগিরি করিত, অপর দল হুগলী সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিত। পর্টুগীজ বোম্বেটিয়ারা, গ্রাম নগর লুঠ করিত, ছেলেমেয়ে চুরি করিত, অর্থের জন্য লোকের জীবন নাশ করিত—মোগল সম্রাটের প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিত—সুন্দরী রমণী লুঠ করিয়া লইয়া দেশে বিদেশে বিক্রয় করিত। বাঙ্গলার মোগল শাসনকর্তারা, বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। শেষ সম্রাট সাহজাহানের চেষ্টায় পর্টুগীজগণ সম্যকরূপে বিধ্বস্ত হয়। সম্রাট হুগলী হইতে তাহাদের বাসোচ্ছেদ করেন, এবং পর্টুগীজদের এই অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে।২

সমুদ্রতীরে "পিপলে" বলিয়া একটি বন্দরে পর্টুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পিপলে বন্দরে, কেবল পর্টুগীজ নহে, ইংরাজ ও দিনেমার বণিকগণও৩ বাণিজ্য করিতেন। ইহা ইংরাজীতে 'পিপলি' ও বাঙ্গলায় পীরপল্লী বলিয়া আখ্যাত হইত। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় পিপলি সমুদ্রতীরস্থ একটি প্রধান বন্দর ছিল। চণ্ডীকাব্যে লিখিত আছে—

দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীর থানা। কাণহাটা ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
কেরয়ালের ঝমঝমি নদী যুড়ে ফেনা॥ অঙ্গরপুরের ঘাট বামেতে থুইয়া॥
ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রি দিন বয়ে যায় হারামদের৪ ডরে॥

সিংহল যাত্রাকালে ধনপতি সওদাগর মেদিনীপুর অতিক্রম করিয়া 'ফিরিঙ্গির দেশখানা'

---

of great note and very instrumental in bringing Calcutta into the form of a town. Fort William and Esplanade are the sites where this forest and the two villages above named stood. In 1717 there was a struggling village consisting of small houses surrounded by puddles of water where now stands the elegant houses of Chowringhee ... Calcutta may at this period was extending to Chitpur Bridge but the intervening space consisted of ground covered with jungle. ... What are now called the Esplanade the site of Fort William and Chowringhee were so late as 1756 a complete tract of jungle interspersed with small pieces of grazing land.—Hamilton, *E. I. Gazetteer*, 1818, London, Vol II. p. 316.

১. Applied by natives in India (especially in the South), specifically to the Indian-born Portuguese, or when used more generally for 'European' implies something of hostility or dispargement—*Hobson-Jobson*, p. 352.

২. The characters, however, of foreign traders must have seriously hampered the whole commerce of the place, for the Portuguese were at the best dangerous people to deal with and there was not so difference between the merchants of Hoogly and the pirates of Chittagong. The "Portuguese in Bengal", says Van Lins Chuten, writing in 1595 "live like wild men and untamed horses. Every man doth there what he wills; and every man is lord and master. They pay no regard to justice and in this way certain Portuguese dwell among them, some here, some there, and are for the most wickedness by them committed—*Hakluyt Society's Edition* of 1885. Vol I, p. 95. Wilson. —সম্রাট সাহজাহান এই পর্টুগীজদের উচ্ছেদকালে আদেশ দিয়াছিলেন "ইহাদের আশ্রয়স্থান ধ্বংস করিবে ও সমস্ত পর্টুগীজদিগকে ক্রীতদাসরূপে বন্দী করিয়া আগরায় পাঠাইবে।—Bernier Vol I, p. 236.

৩. পর্টুগীজ, ইংরাজ ও দিনেমার ছাড়া এখানে ওলন্দাজরাও বাণিজ্য করিত।

৪. এই 'হারামদের ডরে' বোধ হয় পর্টুগীজ জলদস্যুদের লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

দর্শন করিয়াছিলেন। তখন ভাগীরথী অবলম্বনে পিপলিতে যাতায়াত চলিত। কাপ্তেন আলেকজান্দার হ্যামিল্টনও[১] বলেন—"পিপলে সহর গঙ্গানদীর এক শাখার ধারে অবস্থিত ছিল। উহা বালেশ্বর হইতে ১৫ মাইল অন্তর।[২] বালেশ্বরে যে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইত, পিপলে সহরেও তাহা পাওয়া যাইত। এজন্য দিনেমার পর্টুগীজ ও ইংরাজ-বণিকগণ এখানে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া এ বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের মত ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমারেরাও শেঠ ও বসাকদিগের সহিত বাণিজ্য-কার্যে লিপ্ত ছিলেন।[৩] ওলন্দাজ বা ডাচদিগের আগমনে পর্টুগীজদের বাণিজ্য অনেকটা কম জোর হইয়া পড়ে। ওলন্দাজেরা খিদিরপুর হইতে শাঁকরালের খাল পর্যন্ত ভাগীরথীর অংশকে গম্ভীর করিয়া দেন। ঐ জন্য ঐ অংশকে 'কাটি-গঙ্গা' বলে।

জোব চার্নক কর্তৃক সুতালুটিতে কুঠি স্থাপিত হইবার পর পর্টুগীজ ও আর্মানীরা আসিয়া সুতালুটিতে ব্যবসা আরম্ভ করেন। যে স্থান এখন 'আলুগুদাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই স্থানেই পর্টুগীজদের বাণিজ্যাগার ছিল। আলুগুদাম, (Algodam) 'অলগোডাম' নামক শব্দের অপভ্রংশমাত্র। পর্টুগীজ ভাষায় 'অলগোডাম' শব্দের অর্থ তুলা। সুতালুটিতে তখন কার্পাস-বাণিজ্যের বড়ই প্রাদুর্ভাব, এইজন্য বোধ হয় পর্টুগীজেরা তাহাদের কলিকাতার বাণিজ্য-কুঠির অধিকৃত স্থানকে 'অলগোডাম' বলিত, ক্রমে তাহা 'আলুগুদামে দাঁড়াইয়াছে।

আর্মানীগণের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা এস্থলে প্রয়োজন। কারণ আর্মানীগণ বহুদিন হইতেই এদেশে বাণিজ্য করিত। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিদের বঙ্গদেশে প্রবেশের বহুপূর্বে তাহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। আর্মানীয়ানেরা ইউরোপীয় জাতিদিগের ন্যায় জলপথে ভারতে আসে নাই। বহুকাল পূর্বে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থ স্থানসমূহ হইতে তাহারা খোরাসানে বাণিজ্য করিতে আসিত। তৎপরে কান্দাহার ও কাবুলের পথ ধরিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে দিল্লী, বেনারস, পাটনা ও বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। আড়াই শত বৎসর পূর্বে তাহারা কাশিমবাজারের সান্নিধ্যে সৈদাবাদে একটি বাণিজ্যাগার স্থাপন করে। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা চুঁচুড়ায় আসে।[৪] জোব চার্নকের আমলের বহুপূর্ব হইতেই কলিকাতায় ও

১. কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন ১৬৮৮-১৭১৭ সালের মধ্যে অনেকবার ভারত এবং প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেন। ইনি 'আঠার শতকের সিন্দবাদ' নামে পরিচিত ছিলেন। এর রচিত গ্রন্থের নাম *New Account of the East Indies.*

২. Piply lies on the banks of river supposed to be a branch of the Ganges, about 5 leagues from that of Ballasore. Formerly it was a place of trade and was honoured with English and Dutch Factories. The country produces the same commodities that Ballasore does. At present it is reduced to beggary by the factory's removal to Hoogly and Calcutta, the merchants being all gone. পিপলি বন্দর হইতে পর্টুগীজদের উচ্ছেদ হইবার পরও তাহারা পুনরায় সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়, এবং সম্রাট তাহাদিগকে ব্যাণ্ডেল ও তৎসন্নিহিত স্থানে বসবাস জন্য জমি প্রদান করেন। ব্যাণ্ডেল গির্জায় একটি প্রস্তরফলকে ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ খোদিত আছে। হুগলীর প্রাচীন নাম 'গোলিন' বা 'উগোলিন' ও তাহা হইতে হুগলী শব্দের উৎপত্তি। গোলিন পর্টুগীজ শব্দ ইহার অর্থ গোলাবাড়ি।

৩. আমরা ইতিপূর্বে দুই একস্থলে বসাকের পরিবর্তে 'বসুক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বসুক-গ্রন্থ প্রণেতার মতে 'বসুক'ই ঠিক শব্দ। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেকর্ডে বসুক শব্দ Bysack বলিয়া লিখিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহা হইতেই 'বসাকে' দাঁড়াইয়াছে। বসাক শব্দটি সাধারণ প্রচলিত শব্দ বলিয়া আমরা ইহাই অতঃপর ব্যবহার করিব।

৪. আর্মানীগণ সেই সময়ে দেশের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের রাজত্ব সময়ে তাঁহারা আগরায় এক গির্জা নির্মাণ করেন। আগরায় এই গির্জার একটি প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় বাদসাহী আমলে ইহাদের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। কলিকাতার আর্মানী-গির্জায় যে প্রস্তরফলকের কথা উপরে বলিয়াছি তাহা আর্মানী ভাষায় লিখিত। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই—Rezabeebeh the wife of the late charitable Sookeas departed this world to life eternal on the 21st Day of Nakha in the year 15 of the new era of Julpha which corresponds with the 11th of July 1630 A.D.

এই সময়ে স্যার ফ্রান্সিস রাসেল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠির মন্ত্রণাসভার সদস্য ছিলেন। রাসেলের বর্ণিত কাহিনীই, আমরা এ স্থানে অনূদিত করিয়া দিলাম।[১] তিনি লিখিতেছেন—"এমন ভয়ানক ঝড় ও সেই মহাঝটিকার রাত্রের ভয়ানক দৃশ্য, আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না। মুষলধারে বৃষ্টি, মুহুর্মুহু বজ্রনাদ, ঝড়ের বিষম ঝাপটা ও সন্‌সন্‌ শব্দ দেখিয়া. আমি উপরতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। আমার বিশ্বাস, যে বাড়িতে আমি বাস করিতাম, তাহা অন্যান্য সকল বাড়ি অপেক্ষা মজবুত। কিন্তু ঝড়-ঝাপটা, ও বাতাসের দমকা ইত্যাদি দেখিয়া আমার প্রতিমুহূর্তে ভয় হইতে লাগিল, যে বুঝি বাড়ি চাপা পড়িয়া আমাদের জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হইতে হইবে। মিসেস ওয়াসটেল নামধেয় এক ইংরাজরমণী, আমাদের বাড়িতে পুত্রকন্যাদিসহ আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রাণের ভয়ে যে ঘরে ছিলেন— তাহার দরজা জানালা ও গৃহভিত্তি মহাশব্দে পড়িয়া গেল। এইভাবে ভয়, উদ্বেগ, অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা লইয়া সমস্ত রাত্রিটা আমরা বসিয়া কাটাইলাম।"

"পরদিন প্রভাতে কি ভয়ানক দৃশ্যই দেখিলাম! পূর্বদিন সন্ধ্যায় ছোট বড় ঊনত্রিশ খানি জাহাজ, গঙ্গার উপর ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এই জাহাজের মধ্যে ডিউক অব ডর্সেট নামক (Duke of Dorsett) একখানি মাত্র জাহাজ নদীবক্ষে আছে। তাহারও অবস্থা অতি শোচনীয়। পাইল ও মাস্তুল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এইখানি ছাড়া, অন্য জাহাজগুলির কয়েকখানি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে, দুই চারিখানি তীরভূমিতে আড় হইয়া পড়িয়া আছে—অপরগুলি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক দৃশ্য! ইংরাজের ও দেশীয়দের আবাস বাটির মধ্যে, দশ-বারখানি একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। সেণ্ট এ্যান গির্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া গির্জাটা মাটিতে সমভূমি হইয়াছে। তখনকার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—যেন কোন প্রবল শত্রু আসিয়া তাহা সমভূমি করিয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের দ্বারা এত ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, যে লেখনীমুখে তাহার স্বরূপ বর্ণনা অসম্ভব। রাস্তার দুই ধারে যে সমস্ত বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, তাহা রাস্তা জুড়িয়া পড়িয়া আছে।"

রাসেল লিখিত কাহিনী হইতেই প্রকাশ—এই ঝড় ৩০শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয়। বঙ্গোপসাগর হইতেই ঝড়টা উঠিতে আরম্ভ করে। যেমন ঝড়ের বেগ, তেমনই মুষলধারে বৃষ্টি। পাঁচ ঘন্টার মধ্যে নদীর জল ১৫ ইঞ্চি বাড়িয়া উঠে। ঝড়টা সমুদ্র হইতে উঠিয়া ৬০ লিগ পর্যন্ত দূরবর্তী স্থানে প্রধাবিত হয়। ইহার সঙ্গে আবার ভূমিকম্পও ছিল। প্রায় বিশহাজার জাহাজ, বোট, জেলেডিঙ্গী, নৌকা, ভড়, বজরা ইত্যাদি নষ্ট হইয়াছিল এবং ভাঙ্গিয়া বা ডুবিয়া গিয়াছিল। গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি অনেক গৃহপালিত পশু এই বন্যার মধ্যে ডুবিয়া যায়। এমন কি কলিকাতার জঙ্গলমধ্যবাসী কয়েকটি বাঘ ও গণ্ডারকে পর দিন নদী স্রোতে মৃতাবস্থায় ভাসিতে দেখা যায়। পক্ষিকুলের দুর্দশার ইয়ত্তা ছিল না। বহুসংখ্যক পক্ষীর মৃতদেহ, নদীজলে ও পথিমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ৫০০ টন মাল বহিতে পারে, এমন অনেক জাহাজ দুইশত হাত দূরবর্তী গ্রামের মধ্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডেকার, ডিভনশায়ার, নিউকাসেল প্রভৃতি তিনখানি বড় বড় জাহাজ, নদীর তটভূমিতে ঝটিকা বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেলহ্যাম নামক জাহাজ খানির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। ফরাসীদের একখানা জাহাজ পূর্বদিন রাত্রে বন্দরে আসিয়া লাগে।—তাহাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ঝড় থামিবার পর, নদীগর্ভে নিমজ্জিত অনেক মালপত্র পুনরুদ্ধার করা হয়। একখানি জাহাজের অধিকাংশই জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাহার মালগুলি উদ্ধারের জন্য একজন

১. রাসেলের চিঠির তারিখ ১৭৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।—H.E.A. Cotton's ***Calcutta Old and New***, 2nd Ed. p. 27.

লোককে নীচের ডেকে নামাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সে ডেক হইতে বাহির হইয়া উপরে আসিল না। কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, আর একজন লোক সেই ডেকের মধ্যে নামিয়া গেল। তাহারও সেই অবস্থা। তখন মশাল লইয়া, জনকয়েক লোক তাহাদের সন্ধানে নীচে নামিয়া গেল। তাহারা সেই মশালের আলোকে যে দৃশ্য দেখিল, তাহা অতি ভয়ানক। তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল—যে একটা প্রকাণ্ডকায় কুম্ভীর, সেই ডেকের জলে ভাসিয়া আছে। পূর্বগামী লোক তিন জনের যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কুম্ভীরটা জাহাজের গায়ে একটা গর্তের মধ্য দিয়া ডেকের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া কুম্ভীরটাকে বধ করা হইলে দেখা গেল—তাহার উদরের মধ্যে সেই তিনজন লোক রহিয়াছে।[১]

পাঠক! সাঁইত্রিশ খৃীস্টাব্দের (১৭৩৭) এই ভীষণ ঝটিকার ইতিবৃত্ত হইতেই বুঝিতে পারিবেন—এ ঝড় কিরূপ ভয়ানক! ইহাতে সেকালের নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিবৃত্ত হইতেই এই ঝড়ের কাহিনী আমরা লিপিবন্ধ করিয়াছি। হইতে পারে, ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কথাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা যে সেই সময়ে একটা মহা হুলুস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল ও কলিকাতার অনেক নবনির্মিত বাড়ি ঘর ও চালা প্রভৃতি ভূমিসাৎ করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা স্থাপনের ৪৭ বৎসর পরে এই ঝড় হয়। এই অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া, যে সমস্ত বাড়ি ঘর নির্মিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই এই ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যায়।

জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পূর্বের ইতিহাস কিছুই নাই বলিলে হয়। প্রাচীন পুরাণ কাব্যাদিতে কলিকাতা, কালীঘাট প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত সামান্য বর্ণনা আছে, তাহা হইতেই যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। জোব চার্নকের পর হইতেই কলিকাতার নদীতীরবর্তী স্থানসমূহ অর্থাৎ সুতালুটি, হাটখোলা ও তন্নিকটবর্তী গোবিন্দপুর প্রভৃতির গভীর জঙ্গল ক্রমশ পরিষ্কৃত হয় ও তথায় লোকের বসবাস হইতে থাকে। অদ্ভুত প্রতিভাবলে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি পরিচালিত হইয়া, জোব চার্নক ভবিষ্যৎবংশীয় ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে এই সুতালুটিতেই প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান আসমুদ্রব্যাপী বৃটিশাধিকৃত ভারতবর্ষ তাঁহার এই দূরদর্শিতার ফল।

১. It is computed that 20000 ships, barks, sloops, boats, canoes etc. have been washed away. A prodigious quantity of cattle of all sorts, a great many tigers and rhinoceroses were drowned and innumerable quantity of birds were sent down into the river by the storm. Two English ships of 500 tons were thrown into a village, about 20 fathoms from the bed to the river Ganges, broke to pieces and all the people drowned pellmell. ... After the wind and water abated, they opened the hatches and took on several bales of merchandise &c. but the man who was in the hole to sling the bales, suddenly ceased working nor by calling him could they get any reply on which they sent down another, but heard nothing of him which very much added to their fear so that for sometime no one would venture down. At length one more hardy than the rest went down and became silent and inactive as the two former to the astonishment of all. They then agreed to look down into the hole by light which had a great quantity of water in it and to their great surprise they saw a huge alligator staring, as expecting more prey. It had come in through a hole in the shipside and it was with difficulty they killed it, when they found the three men in the alligator's belly. **অন্য একমতে**—"of nine English ships then in the Ganges eight were lost and most of the crews drowned. Barks of sixty tons were blown two leagues up into land over the tops of high trees. ... 300000 souls are said to have perished. The water rose 40 feet higher than usual in the Ganges—" ***Gentlemen's Magazine* 1738, *Historical and Ecclesiastical Sketches of Bengal*, 1828, p. 182-183,** H.E.A. Cotton's ***Calcutta Old and New*, 2nd Ed. p. 27-29.**

দ্বাদশ অধ্যায়

জোব চার্নক সম্বন্ধে নানাকথা

কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক—তাঁহার সমাধিক্ষেত্র ও স্মৃতিচিহ্ন—পাটনা, বালেশ্বর ও কাশিমবাজারে চাকুরি—পাটনায় অবস্থান কালে সহমরণোদ্যতা এক ব্রাহ্মণকন্যাকে উদ্ধার—তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ—তাঁহার সন্তান-সন্ততি, পত্নীর সমাধির উপর মোরগবলির জনপ্রবাদ—বাহুবল সহায়তায় আত্মরক্ষার ও মোগল সম্রাটের নিকট দাবী-দাওয়া আদায়ের সংকল্প—নবাবের সহিত ইংরাজের ও তৎপক্ষে চার্নকের বিবাদ সূচনা—এতজ্জন্য বিলাত হইতে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ—বহরের অধ্যক্ষ নিকলসনের প্রতি কোম্পানির আদেশ—চট্টগ্রাম ও ঢাকা আক্রমণ সংকল্প—নিকলসনের সসৈন্যে হুগলীতে আগমন—নবাবের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষের প্রারম্ভ—হুগলী রক্ষার জন্য নবাবের সেনা-প্রেরণ—হুগলীর ফৌজদারের সহিত চার্নকের বিবাদ—চার্নকের জয়লাভ—ফৌজদার আব্দুল গণির হুগলী ত্যাগ করিয়া পলায়ন—মোগলপক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব—চার্নকের নূতন চাল হুগলী ত্যাগ—হিজলীর কাণ্ড—নবাব ইব্রাহিম খাঁর আমল—চার্নক কর্তৃক কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও সুতালুটিতে বাণিজ্যাগার স্থাপন—সেকালের সুতালুটি ও তদধিকৃত স্থানে বর্তমান কলিকাতা—কোম্পানির কুঠির জন্য মাটির ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা—লালদীঘি—মজুমদারদের কাছারি বাটি—শ্যামরায় বিগ্রহ—লালদীঘি নামোৎপত্তির কারণ—চার্নক কর্তৃক কোম্পানির সেরেস্তা রাখিবার জন্য উক্ত কাছারি বাটি গ্রহণ—চিত্রেশ্বরী কালী—চিৎপুর রোড নাম হইবার কারণ—জঙ্গল মধ্যবর্তী কালীক্ষেত্রের পথই চিৎপুর রোড—সাবর্ণগণের জন্যই কলিকাতার প্রতিপত্তি—শ্যামরায়ের দোল পর্বে হাটবাজার ও মেলাদির অনুষ্ঠান—রাধাবাজার লালবাজার ইত্যাদি নামের কারণ—হাটখোলা বড়বাজার ইত্যাদি নাম সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী—তৎকর্তৃক কালীমাতার মুখ-প্রস্তর আবিষ্কার সম্বন্ধে জনপ্রবাদ—চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত চারিটি শিব লিঙ্গমূর্তি—জঙ্গলেশ্বর, চৌরঙ্গীশ্বর, নকুলেশ্বর ও নঙ্গরেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যকথা—গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের বাস—মহারাজ নবকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ রুক্মিণীকান্ত দেব, শ্রীহরি ঘোষ ও গোবিন্দরাম মিত্রের পূর্বপুরুষগণের গোবিন্দপুরে বাস—হালদার বংশের কালীঘাট, ভবানীপুরে ও গোবিন্দপুরে আবাসস্থান পরিবর্তন—হাটখোলা দত্তদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দ শরণ দত্ত ও ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুরের গোবিন্দপুরে বাস—চার্নকের সহিত মজুমদারদের আমমোক্তার এণ্টনি সাহেবের বিবাদ—এই এণ্টনির পৌত্রই কবিওয়ালা আণ্টুনি সাহেব।

যে সকল প্রতিভাবান, শক্তিমান ইংরাজ ভারতে বৃটিশাধিকার স্থাপনের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জোব চার্নকই অগ্রগণ্য। জোব চার্নকের অনেক ত্রুটি, অনেক দোষ থাকিতে পারে, আর ত্রুটি ও দোষহীন মানুষও জগতে খুব কম। কিন্তু দোষভাগের সহিত তুলনায়, জোব চার্নকের গুণাংশই অধিক ছিল। আজ যে আমরা গগনস্পর্শী সৌধমালা সমন্বিত এই কলিকাতা মহানগরী দেখিতে পাইতেছি, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বহুবিধ অসুবিধা, কষ্ট, ত্যাগস্বীকার মর্মবেদনা সহ্য করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ জোব চার্নক তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতাতেই ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনশত বৎসর পূর্বে গভীর জঙ্গল সমাবৃত, হিংস্র শ্বাপদ সমাকীর্ণ, বাদাভূমিপূর্ণ, কলিকাতার পার্শ্ব-

বর্তী সুতানুটি গ্রামে যদি তিনি ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে আজ হয়ত আমরা ইংরাজ সম্রাটের রাজভক্ত প্রজারূপে, ইংরাজ রাজত্বের এই সুখ-সম্পদের অধিকারী হইতাম না।

ইংরাজ জাতি বহুকাল পরে জোব চার্নকের অমানুষিক প্রতিভা ও গুণরাশির মূল্য উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন বাহাদুরের চেষ্টাতেই জোব চার্নকের নাম রক্ষা সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা হয়। তিনিই চেষ্টা করিয়া বর্তমান জেনারেল পোস্ট-আপিসের সম্মুখবর্তী পথটিকে 'চার্নক-প্লেস' নামে অভিহিত করিয়া চার্নকের নাম তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরীর সহিত সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন।

জোব চার্নকের সমাধিস্তম্ভ আজও কলিকাতায় বর্তমান। এই সমাধির মধ্যে তাঁহার ও তাঁহার হিন্দু-পত্নীর দেহ সমাহিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত। এই সমাধির একখানি চিত্র আমরা যথাস্থানে প্রদান করিলাম। এই সমাধি সৌধ তাঁহার জামাতা স্যর চার্লস আয়ার কর্তৃক স্থাপিত হয়। বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের সেণ্ট জন গির্জার মধ্যে প্রবেশ করিলে এই সমাধিস্তম্ভ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড কার্জনের চেষ্টাতেই এই সমাধি নূতন ভাবে সংস্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছে।

জোব চার্নকের মৃত্যুর ঠিক দুইশত বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার এই স্মৃতিস্তম্ভ বঙ্গের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট দ্বারা মেরামত করান হয়। চার্নকের গোরের মধ্যে Vault বা খিলান আছে কিনা এবং তাহার মধ্যে চার্নক ও তাঁহার হিন্দুপত্নী দুই জনের সমাধিস্থান থাকা সম্ভব কিনা, ইহা দেখিবার একটা কৌতূহল কর্তৃপক্ষীয়দের মনে উদিত হয়। এই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য গোরটি খনন করা পর্যন্ত হয়। এই সময়ে রেভাঃ এইচ, বি, হাইড সাহেব এই সেন্ট জন গির্জার পাদরী ছিলেন। এই খনন ব্যাপার সম্বন্ধে হাইড সাহেব লিখিয়াছেন, "পরদিন আমি চার্নকের সমাধি-মন্দির দেখিতে গেলাম। (২২এ নভেম্বর ১৮৯২) দেখিলাম ছয় ফিট পর্যন্ত গোরটি খনন করা হইয়াছে। খননকারীরা এই পর্যন্ত খনন করিবার পর কার্য বন্ধ করে। কারণ এই স্থানেই তাহারা অস্থি-খণ্ড ও নরকঙ্কালচূর্ণ দেখিতে পায়। আজকাল সাধারণ সমাধিগর্ভগুলি যেরূপ ভাবে গভীর ইহা সেরূপ ছিল না। এই ছয় ফিট খননের পর, একটি সমতল স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানের পশ্চিম অংশটি আরও কিয়দ্দূর খননের পর তাহারা একখানি অস্থি দেখিতে পায়। এই অস্থিখানি যে অবস্থায় যেখানে ছিল তদ্রূপই রাখা হয় এবং ইহার পরই খনন কার্য বন্ধ করা হয়। এই অস্থিখানির গঠন প্রণালী দেখিয়াই বুঝা গেল, ইহা সমাহিত ব্যক্তির বামবাহুর সম্মুখের অস্থি। গোরে শোয়াইবার সময়, প্রথামত হাত দুইখানি মৃতদেহের বুকের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। এ অস্থির অবস্থান সমাবেশ দেখিয়া অনুমিত হইল ইহা সমাহিত বামহস্তের অস্থি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পর খনকেরা আর একটি ক্ষুদ্র জিনিস দেখিতে পায়। সেটিকে প্রথমে আমি শবাধারে ব্যবহৃত একটি পেরেক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু পরীক্ষায় বুঝিলাম তাহা বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলীর বৃহৎ অস্থি-খণ্ড। সেই অস্থি-খণ্ড আমি যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, আর একটু খনন করিলেই হয়ত সমস্ত নরকঙ্কালের অর্ধবিনষ্ট অস্থিগুলি পরিদৃশ্যমান হইত। খুব সম্ভবত এই দুই শত বৎসর পরেও আমরা তাহা যথাযথভাবে দেখিতে পাইতাম।"

"সমাধিগর্ভে নিহিত কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী জোব চার্নকের নশ্বর দেহের এখনও পরিদৃশ্যমান অংশগুলি দেখিয়া বোধ হইল দুইশত বৎসর পূর্বে তিনি এই স্থানেই সমাহিত হইয়াছিলেন। ... এই পর্যন্ত দেখিবার পরই আমি সমাধি-খনন কার্য বন্ধ করিয়া দিলাম।[১]

১. A note read at a meeting of the Asiatic Society by Rev. H.B. Hyde. K. Blechynden's *Calcutta Past and Present*, 2nd Ed. p. 8-9.

চার্নক ও তাঁহার হিন্দু-পত্নী উভয়েই এক সমাধির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন কি না তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। উক্ত গোরটি আরও গভীরভাবে খনিত হইলে, বোধ হয় তাহার তথ্য নির্ণয় হইতে পারিত। কিন্তু তাহা নানা কারণে অসম্ভব।"

যেস্থানে চার্নক, হ্যামিল্টন[১] প্রভৃতি মৃত মহাত্মাদের সমাধিচিহ্ন আজও বর্তমান তাহা বহুপূর্বে একটি গোরস্থান ছিল। বোধ হয়, এই গোরস্থানটি চার্নকের আগমনের সময় হইতে বা তৎপূর্বেও সমাধিক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। হুগলী ও বালেশ্বরে গমনাগমনের পথে যে সমস্ত ইংরাজেরা জাহাজে মরিতেন তাঁহাদিগকে এই বনভূমিপূর্ণ নির্জনস্থানে সমাহিত করা হইত।

এই সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী ভূভাগে ইহার বহুকাল পরে বর্তমান সেন্ট জন গির্জা নির্মিত হয়। ইহা জনসাধারণে 'পাথুরিয়া-গির্জা' নামে অভিহিত। বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের যে বাটিটিতে এখন বার্ন কোম্পানির কার্যালয় হইয়াছে সেই বাটিটিই ভবিষ্যতে গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের কলিকাতার আবাসস্থান ছিল। পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানিতে পারা যায়—"হেস্টিংস ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা পদব্রজে গির্জাঘরে যাইতেন।" এই সেন্ট জন-চার্চই, সেই গির্জাঘর। পাঠক! এই সেন্ট জন-চার্চের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলেই আজও পুরাতন গোরস্থান ও চার্নকের সমাধি-মন্দির দেখিতে পাইবেন। আমাদের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন-বাহাদুর যে বাটিতে গবর্ণর জেনারেল হেস্টিংস সাহেব বাস করিতেন, তাহার গায়ে একখানি স্মৃতিফলক লাগাইয়া দিয়াছেন। পাঠক! ইচ্ছা করিলে অনায়াসে চার্নকের সমাধি-মন্দির দেখিয়া আসিতে পারেন।

জোব চার্নকের বাল্যজীবনের কোন ইতিহাসই নাই। ইংলণ্ডের কোন্ প্রদেশে বা কোন্ গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন তাহার কোন সন্ধানই নাই। কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তা হইতে এইটুকু কেবল জানা যায় ১৬৫৫ বা ১৬৫৬ খৃীস্টাব্দে অর্থাৎ আড়াইশত বৎসর পূর্বে তিনি এদেশে আগমন করেন। মাসিক তিনশত টাকা বা কুড়ি পাউণ্ড বেতনে, তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে পাঁচ বৎসরের কড়ারে চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথমে তিনি পাটনার কুঠিতে নিযুক্ত হন, তৎপরে কাশিমবাজারে আসেন। পাটনার কুঠিতে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি বালেশ্বর ও রাজমহলের কুঠিতে কাজ করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃীস্টাব্দের পূর্বে কাশিমবাজার কুঠির প্রতিষ্ঠা বন্দোবস্ত পাকা হয় নাই। এইজন্য চার্নক বালেশ্বর ও রাজমহল হইয়া পরে পাটনায় পৌঁছান।

১৬৬০ খৃীস্টাব্দে লিখিত চার্নকের এক পত্র হইতে প্রকাশ যে তিনি পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ পদে নিয়োজিত হইবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত। এই সময়ে তিনি বিলাতের ডিরেক্টারদের একখানি পত্র লেখেন। সে পত্রের মর্মার্থ এই, "যদি আপনারা আমাকে স্থায়ী ভাবে পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত না করেন তাহা হইলে আমি পদত্যাগ করিব।" বলা বাহুল্য, তাঁহার প্রভু ডিরেক্টারেরা তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণরূপে সম্মতিদান করেন।

চার্নকের চাকুরি জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর পাটনাতেই কাটে। পাটনা তখন মুসলমান-প্রধান স্থান, মোগলের শাসন-কেন্দ্র। পাটনায় থাকিয়া চার্নক এ দেশীয় শাসনকর্তাদের কার্য-প্রণালী বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ দ্বারা এদেশের শাসননীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পাটনার আশপাশ হইতে সোরা কিনিয়া তিনি মান্দ্রাজে পাঠাইয়া দিতেন। মান্দ্রাজ হইতে এই সোরা বিলাতে চালান হইত। আগে মসলিপত্তন হইতেই সোরা প্রেরিত হইত। কিন্তু পাটনাই

১. Attached to the English embassy was Surgeon William Hamilton of the Honourable East India Company's service, whose name deserves to stand high in the records of Calcutta as second only to that of Charnock, the founder—K. Blechynden, *Calcutta Past and Present,* 2nd Ed. p. 12-15. ইনি সমাধিস্থ হন সেন্ট জন চার্চ ইয়ার্ডে।

সোরা, মসলিপত্তনের সোরা অপেক্ষা সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় কোম্পানির ডিরেক্টারেরা চার্নকের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হন। সোরা তখন কোম্পানির একটি লাভকর বাণিজ্যদ্রব্য। এজন্য চার্নকের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা তাঁহার বেতন মাসিক ছয়শত টাকা করিয়া দেন (১৬৭১)। ইহার পর ১৬৭৫ সালে ডিরেক্টারেরা চার্নকের নির্দিষ্ট বেতনের উপর তিনশত টাকা পুরস্কার ব্যবস্থাও করেন। বিলাতের কর্তৃপক্ষদের এই অসীম অনুগ্রহ হইতে চার্নকের কার্যশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

১৬৭৬ খৃস্টাব্দে কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে চার্নক বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়গণ কর্তৃক দিল্লী যাইতে আদিষ্ট হন। কিন্তু তিনি এদেশের শাসনকর্তাদের সহিত হাতে-কলমে কাজ করিয়া বুঝিয়াছিলেন দিল্লীশ্বরের প্রাদেশিক শাসনকর্তারাই সর্বপ্রধান। কোথায় দিল্লী, আগরা, আর কোথায় বঙ্গদেশ। দিল্লীর সম্রাট ইংরাজদিগের বাণিজ্যসৌকর্যার্থে যে সমস্ত ফারমান ছাড় ও আদেশপত্র দিতেন, উৎকোচ গ্রহণে সিদ্ধহস্ত রাজকর্মচারিগণ সে সব স্বত্ব আমলেই আনিত না। তাহাদের চিরদিনই এক কথা, "টাকা চাই, সেলামী চাই, নজরানা চাই। বাদসার ভরসা বড় করিও না, এই দূরদেশে আমরাই বাদসাহ।" চার্নক এদেশীয় শাসনকর্তাদের হাল জানিতেন বলিয়াই দিল্লী যাইতে স্বীকৃত হন নাই। সাহজাহানের আমলে তাঁহার হুকুমপত্র রদ করিতে কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তারাই সাহস করিতেন না। আর ঔরঙ্গজেব ত অতবড় জবরদস্ত বাদসাহ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আমলে বাদসাহী হুকুমসমূহ অতি সহজেই উল্লঙ্ঘিত হইত। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। বঙ্গদেশে কোথায় কি হইতেছে, তাহার কোন সংবাদই তিনি রাখিতেন না। ইহার প্রমাণস্বরূপ, হুগলীর ব্যাপারকে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হুগলী, হিজলী প্রভৃতি স্থানে চার্নক যে সব বিপ্লব ও বিগ্রহ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহার সংবাদ যখন ঔরঙ্গজেবের নিকট পেঁৗছিল, তিনি হুগলীসহর কোথায়, ইহাই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে বঙ্গদেশের নক্সা তলব করিয়া তিনি হুগলীর অবস্থান-স্থান নির্ণয় করিলেন। চার্নক হাতে-কলমে ঠেকিয়া শিখিয়া বাদশাহ ও তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে যে কি পার্থক্য তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন। সম্রাট দরবারের উপর তাঁর তেমন একটা আস্থা ছিল না।[১] অপর কারণ এই, নবাব সায়েস্তা খাঁ চার্নক আমলের অধিকাংশ সময়ই বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধিরূপে কার্য করিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁ অতি জবরদস্ত শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার উপর তিনি সম্রাটের একান্ত বিশ্বাসভাজন ও অতি নিকট-আত্মীয়। কাজেই তিনি যাহা কিছু সম্রাট দরবারে এতেলা করিতেন তাহার সত্যতার সম্বন্ধে সম্রাটের মনে কখনও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই।

পাটনা হইতে জোব চার্নক, কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত হন। কাউন্সিলের দ্বিতীয় পদপ্রাপ্তিও এই সময়ে ঘটে। কিন্তু বলা যায় না, কি অব্যক্ত কারণে চার্নক পাটনা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। এই ব্যাপার লইয়া তাঁহার উর্পরিতম কর্মচারী স্ট্রেনশাম মাস্টারের সহিত মনোভঙ্গ পর্যন্ত হইয়াছিল। স্ট্রেনশাম এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া চার্নককে কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ পদ হইতে অপসারিত করেন এবং হুগলীর কুঠির দ্বিতীয় সহকারী পদে নিয়োগ-আদেশ দেন। কিন্তু স্ট্রেনশাম মাস্টারের এই ব্যবহারে বিলাতের কর্তারা পর্যন্ত তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। স্ট্রেনশাম মাস্টার শেষে নিজেই পদচ্যুত হন ও বিলাতের কর্তারা চার্নককে

১. জোব চার্নক ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই যে পত্র লেখেন তাহার একাংশ এই—The King's *Hookum* is of small value as an ordinary governor. * In our opinion sum of money demanded is very large, considering all circumstances. Had it been another king as Shajahan whose *Pharmand* and *Husbul Hookums* were of such great force and finding that none dare to offer to make the least exception against any of them, it might have seemed somewhat reasonable, but this with King (Aurangzeb) it is the contrary . . .—Hedges' *Diary*, Vol II.

কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।

পাটনায় অবস্থানকালে চার্নকের জীবনে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।[১] কথাটা উপন্যাসের মত অনেকদিন হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। কথাটা এই যে, চার্নক এক হিন্দু-রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘটনাটা আমরা সংক্ষেপে বলিব। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে চার্নক পাটনায় ছিলেন। একদিন তিনি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে এক সতীদাহের দৃশ্য দেখিতে পান। সতীদাহ প্রথা বহুদিন হইতে ভারতের সর্বস্থানেই প্রচলিত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর পত্নী স্বামীবিয়োগ-শোক অসহ্য জ্ঞানে তাঁহার সহিত জ্বলন্ত চিতায় স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন। আমাদের বঙ্গদেশেও পুরাকালে এ প্রথার বড়ই বাহুল্য ছিল।[২] যাহারা স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করিতে অস্বীকৃত হইত তাহাদিগকে জোর করিয়া জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করা হইত।

চার্নক নদীতীরে ভ্রমণকালে দেখিলেন জ্বলন্ত অনলে আত্মসমর্পণে উদ্যতা সেই হিন্দু-রমণী পরমা সুন্দরী, পূর্ণ যুবতী। চার্নক তাঁহার প্রহরিগণের সাহায্যে এই সহগমনোন্মুখ সতীকে উদ্ধার করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসেন ও তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এই রমণীর গর্ভে চার্নকের কয়েকটি কন্যা সন্তান হয়। হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত হইলেও তাহাদের খ্রীস্টানী ধরনে নামকরণ হয়। চার্নকের এই তিন কন্যার নাম মেরী, ক্যাথারিন ও এলিজাবেথ। তৎকালের তিনজন পদস্থ ইংরাজের সহিত এই তিন কন্যার বিবাহ হয়। চার্নকের জামাতা ও কন্যাগণের নাম আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি।

চার্নক এই হিন্দু-পত্নীর সহিত বহুদিন সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। চার্নক অতিশয় পত্নীবৎসল ছিলেন এবং চার্নকের শত্রুপক্ষীয়েরা বলেন, স্ত্রীকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক তাঁহার শক্তির অধীনে তিনিই অর্ধপৌত্তলিক হইয়া পড়েন। এই স্ত্রীর মৃত্যু হইলে চার্নক তাঁহার দেহ সুতালুটিতেই সমাধিস্থ করেন। প্রতি বৎসরে তাঁহার মৃত্যুদিনে, পত্নীর সমাধির উপর, চার্নক একটি করিয়া মোরগবলি দিতেন। এ মোরগবলি অবশ্য হিন্দু প্রথা নহে। বেহার অঞ্চলে পাঁচপীরের দরগায়, এরূপ মোরগবলির প্রথা প্রচলিত আছে।[৩] একথাও আমরা ইতিপূর্বে বলিয়া আসিয়াছি।

ইহাই হইতেছে চার্নকের হিন্দু-পত্নীর আখ্যান। কিন্তু এ ঘটনা সম্বন্ধে অনেকে অবিশ্বাস করেন, কেহ কেহ আবার সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন। চার্নকের সমকালীন কয়েকজন লেখক এই হিন্দু-পত্নী সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গবর্ণর হেজেসই প্রধান। গবর্ণর হেজেস তাঁহার ডায়ারির একস্থানে লিখিয়াছেন, "অদ্য প্রাতে একজন এ দেশীয় লোক আমার কাছে অভিযোগ করিতে আসে যে, চার্নক উনিশ বৎসর কাল ধরিয়া এক হিন্দু-স্ত্রীলোককে নিজের সঙ্গে রাখিয়াছেন এবং এই স্ত্রীলোকের স্বামী অদ্যাপিও জীবিত আছে। হুগলী ও কাশিমবাজার শাসনকর্তা বুলচাঁদ এই লোককে আমার কাছে পাঠাইয়া দেন। .... এই হিন্দু ও অন্যান্য দেশীয় লোকের নিকট তিনিও অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছেন, যে চার্নক যখন পাটনায় থাকিতেন, তখন একজন হিন্দু স্ত্রীলোক স্বামীর অর্থ ও অলঙ্কারাদিসহ তাহার আবাস ত্যাগ করিয়া চার্নকের আশ্রয় গ্রহণ করে।"[৪]

১. চার্নকের হিন্দু স্ত্রী সম্পর্কে কাহিনী বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য P.T. Nair-এর *Job Charnock* গ্রন্থের ১০, ১১ এবং ১২ অধ্যায় এবং রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ পৃ. ১২৮।

২. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিক কর্তৃক এই সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়।

৩. সেণ্ট জন চার্চ ইয়ার্ডের পার্শ্বে যে গোরস্থান আছে সেইস্থানেই চার্নকের মৃতপত্নীর দেহ সমাধিস্থ হয়। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে অবস্থিত এই গির্জা এখন 'পাথুরিয়া-গির্জা' নামে খ্যাত। আজও দুইশত বৎসরের ঝড় ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া চার্নকের এই সমাধিস্তম্ভ অটলভাবে সেই স্থানে বর্তমান। ইহাই কলিকাতার প্রাচীনতম ইষ্টকনির্মিত শিল্প।

৪. Hedges' *Diary*,—ঐতিহাসিক চিত্র, যোগেন্দ্র সমাদ্দারের প্রবন্ধ পৃ. ৪৩০।

চার্নকের হিন্দু-পত্নীগ্রহণ সম্বন্ধে গবর্ণর হেজেস ও তাঁহার পরবর্তী আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন নামক একজন সমসাময়িক ইতিবৃত্তলেখক যাহা কিছু বলিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। হেজেসের কথা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। হ্যামিল্টন এ সম্বন্ধে বলেন, "মোগলদের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে চার্নক এক সতীদাহ দেখিতে গমন করেন। তিনি সেই মরণোন্মুখ যুবতীর সৌন্দর্য দেখিয়া এতদূর মোহিত হন, যে তাঁহার সিপাহীদের সহায়তায়, বলপূর্বক সেই রমণীকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়া নিজাবাসে আনিয়া বহুদিন ধরিয়া পতি-পত্নীরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিয়াছিলেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁহার কয়েকটি সন্তান সন্ততিও হইয়াছিল।"

চার্নকের হিন্দু-পত্নী গ্রহণ ব্যাপার কেহ কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, আবার কেহ বা ইহা ভিত্তিহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হেজেস ও হ্যামিল্টন উভয়ের বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ রেনি, রেভারেণ্ড কেরি, কটন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ একথায় আস্থাস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব ও ফার্মিঞ্জার সাহেব একথা বিশ্বাস করেন নাই।[১] হেজেস ও হ্যামিল্টন উভয়েই চার্নকের শত্রু ছিলেন বলিয়া তাঁহারা এ উক্তির উপর আস্থা স্থাপনে অনিচ্ছুক। হেজেসের সহিত চার্নকের মনান্তর কাহিনী আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে ইংরাজ বণিকগণ নানাদিক হইতে মোগল রাজকর্মচারিগণ দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আসিতেছিলেন। হেজেস নানা উপায়ে এ অত্যাচারের প্রতিকার চেষ্টা করিয়াও যখন সফলমনোরথ হইলেন না তখন তাঁহার মনে একটা ধারণা জন্মিল, মোগল রাজ-কর্মচারীদিগকে ক্রমাগত ভয় করিয়া চলিলে ইংরাজের বণিকবৃত্তির ও ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ অনিষ্ট ঘটিবে। ক্রমাগত উৎকোচ প্রদানে ও তোষামোদে তাঁহাদের বাধ্য রাখাও অসম্ভব। কারণ এ পর্যন্ত এইভাবে চেষ্টা করিয়াও ইংরাজপক্ষ সিদ্ধমনোরথ হন নাই। বাহুর শক্তিতে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন ইংরাজের আর গত্যন্তর নাই। এই বাহুর শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সেনাবল সৃষ্টি ও দুর্গ-নির্মাণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই সকল বিবেচনা করিয়াই হেজেস তাঁহার পদত্যাগের পূর্বে বিলাতের কর্তাদের লিখিয়াছেন, "মোগলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণাই সমীচীন, এবং স্থানে স্থানে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ-নির্মাণও একান্ত আবশ্যক।" বলা বাহুল্য, এ ব্যাপার সম্বন্ধে জোব চার্নক হেজেসের সহিত একমত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতের কর্তারা ইহা কার্যে পরিণত করিতে প্রথমে একটু ভয় পাইয়াছিলেন। অপরন্তু হিথ ও নিকলসনের পরবর্তী অভিযান প্রমাণ করিতেছে যে ভবিষ্যতে তাঁহারা এ সম্বন্ধে চার্নক ও হেজেসেরই মতাবলম্বী হইয়া কার্য করেন।

এই সময়ে মোগল শাসনকর্তারা ইংরাজদের সহিত নানা বিষয়ে প্রতিকূলতা আরম্ভ করেন। তাঁহারা মনে মনে বুঝিতেন, যে কোন অছিলায় ইংরাজদের পীড়ন করিতে পারিলেই দুই পয়সা আদায় হইবে। তাঁহারা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে ইংরাজ-বণিক প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের কৃপাভিখারি, তাঁহাদের অনুকম্পা-প্রার্থী, তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইবেন। ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁ, নানা বিষয়ে ইংরাজ-বণিকগণকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। তাহার একটি প্রমাণ, চার্নকের সহিত দেশীয় বণিকদের দেনা পাওনা লইয়া বিবাদ ও নবাব সায়েস্তা খাঁর মীমাংসা। এই ব্যাপারে নবাব চার্নক ও তাঁহার সহকারীদের ৪৩ হাজার টাকা জরিমানা করিলেন। চার্নক ইচ্ছা করিয়া এ জরিমানার টাকা না দেওয়ার ফল এই হইল যে তিনি নবাবের আদেশে কাশিমবাজারে নজরবন্দীরূপে রহিলেন। পাছে তিনি কাশিমবাজার হইতে

১. ***Historical and Topographical sketch of Calcutta***—H. Rainey, Carey's *Good old days of John Company*, Cotton's *Calcutta Old and New*, Wilson's ***Early Annals of the English in Bengal.***

গুপ্তভাবে পলায়ন করেন তজ্জন্য মোগলের ফৌজ পাহারা দিতে লাগিল।

সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। অত্যাচারের একটা গণ্ডী আছে। মোগল শাসকসম্প্রদায় সে গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন। এদিকে বিলাতের কর্তারাও তাঁহাদের সংকল্প পরিবর্তন করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও নবাব সায়েস্তা খাঁকে কিছু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের অন্তত একথাটাও বুঝিতে দেওয়া উচিত যে প্রয়োজন হইলে ইংরাজেরা আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ পর্যন্ত করিতে পারেন। বিলাতের কর্তারা তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের এই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য তৎকালীন ইংলণ্ডাধিপতি দ্বিতীয় জেমসের অনুমতি গ্রহণ করেন। ইহার ফলে নিকলসনের অধীনে কামান সজ্জিত ছয়শত সেনা-পূর্ণ নয়খানি যুদ্ধজাহাজ ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল।

বিলাতের কর্তারা নিকলসনকে আদেশ দিলেন—"মান্দ্রাজে পেঁাছিয়া তথা হইতে আরও চারিশত সেনা লইয়া বালেশ্বরে যাইবে। তৎপরে চট্টগ্রাম বন্দর দখল করিবে। আরাকানের রাজা মোগলের শত্রু। তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া চট্টগ্রাম দখল করিবে। চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর ইংরাজগণ নবাবের আবাসস্থান মোগলের রাজধানী ঢাকা অধিকার করিবেন। ঢাকা অধিকার করিলেই মোগল বাধ্য হইয়া সন্ধি করিবে।"

বিলাতের কর্তারা ভাবী সন্ধিপত্রের একটি খসড়া পর্যন্ত করিয়া দেন। তাহাতে পূর্ববর্তী সম্রাটগণের প্রদত্ত ফারমানগুলি যাহাতে বলবৎ হয়, তাঁহারা বিনা বাধায় বঙ্গদেশের সর্বত্র বাণিজ্য করিতে পারেন, তাঁহাদের নিজের টাঁকশালে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে পারেন, এ সব প্রস্তাবও ছিল।

এদিকে জোব চার্নক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজার হইতে পলায়ন করিয়া হুগলীতে আসিলেন। হুগলীতে আসিবার পরই তিনি সংবাদ পাইলেন, নিকলসন ছয়শত সেনা সমেত ভারতে আসিতেছেন। চার্নক এতদিন মুখ বুজিয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রভু ডিরেক্টারেরা তাঁহার পূর্ব প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়া মোগলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সেনা-প্রেরণ করিতেছেন, এ সংবাদে তাঁহার প্রাণে অনেকটা সাহস আসিল। ঐ বৎসরে চারিশত নূতন ইংরাজ সৈন্য হুগলীতে পেঁাছিল।

নবাব সায়েস্তা খাঁও শুনিলেন ইংরাজেরা চারিশত সেনা আনিয়া হুগলীতে জড় করিয়াছে। যাহাতে তাঁহারা কিছু করিতে না পারেন এইজন্য তিনি তিন সহস্র পদাতিক ও তিনশত অশ্বারোহী মোগল-সেনা হুগলীতে পাঠান। তখন আবদুল গনি হুগলীর ফৌজদার। লোকটা বড়ই অব্যবস্থিতচিত্ত। আবদুল গনি প্রকারান্তরে গায়ে পড়িয়া ইংরাজদের সহিত ঝগড়া বাধাইলেন। সে বিবাদের কারণ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। হুগলীর বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্য-কিনিতে গিয়াই মোগল সৈন্যের সহিত ইংরাজ সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। জোব চার্নক নিকলসন ও লেসলীকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে ইংরাজপক্ষই জয়ী হন। ফৌজদার হুগলী ছাড়িয়া পলায়ন করেন। ইংরাজপক্ষে একজন লোক হত হয়, মোগলপক্ষে ষাট জন লোক মরে।

ফৌজদার ভয় পাইয়া চার্নকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। চার্নক তখন কোম্পানির জাহাজসমূহে সোরা বোঝাই করিতেছিলেন। তিনি বুঝিলেন হুগলীতে মালামাল রাখা নিরাপদ নহে। সোরাগুলি অনেক টাকার মাল। এগুলি মান্দ্রাজে জাহাজ ভরিয়া পাঠাইতে পারিলে সকল দিকে মঙ্গল। এজন্য তাঁহার সময়ের বড়ই প্রয়োজন। কাজেই তিনি সন্ধির প্রস্তাবে কোন-রূপ অমত করিলেন না। চার্নক হুগলীতে দুইমাস থাকিয়া সোরা বোঝাই শেষ করিয়া হুগলী ত্যাগ করিলেন।

হুগলী ত্যাগের পর হিজলী অবরোধ ব্যাপার চার্নকের জীবনে একটি উজ্জ্বলতম ঘটনা। হিজলীর ব্যাপারে তিনি যেরূপ অত্যধিক সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধিকৌশল দেখাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। যে মোগল সুবাদার ইচ্ছা করিলে অসংখ্য

সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাঁহার ধ্বংসসাধন করিতে পারিতেন তিনিও তাঁহার কূটবুদ্ধি ও কৌশলে পরাজিত হইলেন। ইংরাজের সমরশক্তি বঙ্গদেশে প্রথম জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ করিল। মোগল রাজশক্তির নিকট বাহুবলের শক্তি দেখাইয়া চার্নক সম্রাট ঔরঙ্গজেব ও নবাব সায়েস্তা খাঁকে স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—ইংরাজশক্তি একেবারে উপেক্ষণীয় নহে; প্রয়োজন হইলে তাহারা আত্ম-স্বার্থ রক্ষার জন্য অস্ত্র পর্যন্ত ধরিতে পারে।

সায়েস্তা খাঁর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গদেশের হর্তাকর্তা-বিধাতা হইয়া আসেন। ইতি-পূর্বে তিনি কাশ্মীর, লাহোর, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। চার্নক সুতালুটিতে আশ্রয় লইবার এক বৎসর পরে তিনি তাঁহাকে পূর্ব প্রতিশ্রুত সম্রাট-স্বাক্ষরিত ফারমান আনাইয়া দেন। এই ফারমানের বলে চার্নক সুতালুটিতে ইংরাজের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত করিয়া অসংখ্য সৌধমালাবেষ্টিত ইন্দ্রপুরী তুল্য বর্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পাঠক! একবার কল্পনার সাহায্যে সেই ১৬৯০ সালের আগস্ট মাসের সুদূরবর্তী স্মৃতিকে একটু পরিস্ফুট করিয়া তুলুন। গভীর বর্ষার প্রখর তেজে জাহ্নবী উন্মাদিনীর মত সাগরসঙ্গমে ধাবমানা, আশে পাশে গ্রাম নগর কিছুই নাই। চারিদিকে হিংস্র শ্বাপদপূর্ণ ভীষণ জঙ্গল ও নক্রকুম্ভীর সর্পাদিপূর্ণ বাদা ও বিলভূমি। রাত্রে হিংস্রপশুর ভীম-ভৈরব গর্জন। আর পার্শ্ব-বাহিনী ভাগীরথীর তরঙ্গরাজির তাণ্ডব নৃত্য। সেই বর্ষাধারাপ্লাবিত অপরাহ্নে চার্নক ধীরে ধীরে জাহাজ হইতে নামিলেন। তীরে আসিলেন। দেখিলেন, তাঁহাদের পূর্ব নির্মিত হাটচালা-গুলির চিহ্নমাত্র নাই। বিষন্নমনে এক নিম্ববৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তান্বিত চিত্তে নিরাশাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের অবস্থা চিন্তায় বিভোর হইয়া তিনি পাইপের ধূমপানে আত্মহারা।

আরও ভাবুন—এই সার্ধ দুইশত বৎসর পরে সেই জঙ্গলময় সুতালুটির বর্তমান গৌরব-ময় অবস্থা। পুরাকালের সে সুতালুটি নাম নাই, সে ভীষণ জঙ্গল নাই, সে শ্মশান-ভীতি-দায়ক হৃদয়স্তম্ভনকারী বনভূমির দৃশ্য নাই। এখন সেই স্থানের চারি পাশে কঙ্কর ও প্রস্তর-মণ্ডিত প্রশস্ত রাজপথ। রাজপথের দুই ধারে উজ্জ্বল গ্যাসের আলো। গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোকে উজ্জ্বলিত প্রাসাদতুল্য বিশাল সৌধরাজি। সর্বত্রই কর্ম-জগতের মহামন্ত্র প্রণোদিত, উৎসাহ, উদ্যম ও ব্যস্তভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি। প্রত্যেক সমুচ্চ অট্টালিকাশীর্ষে ইংরাজ জাতির বিজয়-নিশান। যেন মায়াবলে এই দুইশত তেইশ বৎসরের মধ্যে[১] সেই প্রাচীন সুতালুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতার স্মৃতি লোপ করিয়া এক বৈজয়ন্তী শোভাসম্পদপূর্ণ আদর্শ রাজধানী নির্মিত হইয়াছে। এ জনসংঘময়ী সৌধ-শোভাসম্পন্ন কলিকাতা রাজধানী যদি ইংরাজজাতির গৌরব ইংরাজ সম্রাটের গৌরব এবং কীর্তির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে জোব চার্নক সে গৌরবের অংশ পাইতে সম্যক অধিকারী।[২]

চার্নকের স্মৃতি অবলম্বন করিয়া বর্তমান কলিকাতায় বিশেষ কোন কিছুই নাই। আছে কেবল গির্জার কোমল মৃত্তিকা বক্ষে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ, আর সেকালের লালদীঘি। কিন্তু এই কলিকাতার অস্তিত্ব যতদিন থাকিবে ততদিন চার্নকের স্মৃতি লোপ হইবে না।

---

১. এই গ্রন্থ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখা শুরু হয়, প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে। লেখক এখানে গ্রন্থ-রচনাকালের সময় অনুযায়ী ২২৩ বৎসর উল্লেখ করিয়াছেন।

২. চার্নক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক পরলোকগত উইলসন সাহেব আমাদের সমাদ্দার মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলেন আমরা ঐতিহাসিক চিত্র হইতে সেইটুকু প্রয়োজনীয় বোধে এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম। "For my part, I am prepared to forget the minor blemishes and remember only his resolute determination, his clear-sighted wisdom, his honest self-devotion and so leave him to sleep in the heart of the city, which he founded looking for a blessed resurrection and the coming of him by whom, he ought to be judged. সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব বলেন, —"He was a man who had a great and hard task to do and who did it—did it with a courage which no danger could daunt nor any difficulties turn aside. It was his lot to found unthanked a capital.—Sir William Hunter's ***History of British India,*** Vol II.

এখন যেখানে সেন্ট জন চার্চ বর্তমান আছে, তাহা সেই অতীতকালে একটি নদীতীরবর্তী গোরস্থান ছিল। আজকাল যাহা স্ট্র্যান্ড-রোড বলিয়া পরিচিত পূর্বে তাহা ভাগীরথী-গর্ভে ছিল। যে সকল জাহাজ ভাগীরথীপথে সেকালের কলিকাতা সুতানুটি প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত, তাহাতে কোন লোকজন মরিলে এই নির্জন স্থানে গোর দেওয়া হইত। সুতানুটিতে আসিবার পর খুব সম্ভবত ইংরাজেরা এই স্থানটি সীমা বেষ্টিত করিয়া লয়েন। এই সেন্ট জন গির্জা, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে নির্মিত।[১]

চার্নক যখন সুতানুটিতে দ্বিতীয়বার আসেন সেই সময়ে তিনি অস্থায়ীভাবে কয়েকখানি মাটির দেওয়াল দেওয়া আশ্রয়স্থান করিয়া যান। কিন্তু সে সব মাটির ঘর রক্ষকশূন্য অবস্থায় বহুদিন পড়িয়া থাকায় তাহার কিছুই ছিল না। চার্নক উলুবেড়িয়া হইতে নবাব ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে যখন পুনরায় সুতানুটিতে আসেন তখন সেই গৃহগুলির শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলেন। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরও চার্নককে ঘর-দ্বারের জন্য বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কারণ সুতানুটির কৌন্সিলের প্রথম অধিবেশনে যে মন্তব্য তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই তখনকার অবস্থা বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হয়। এই সভায় জোব চার্নক, মিঃ ফ্রান্সিস ইলিস, মিঃ জেরিমিয়া পিচি প্রভৃতি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মন্তব্যের একাংশ এই, "আগে যে সমস্ত ঘরবাড়ি ছিল সেগুলি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় পুনরায় কতকগুলি গৃহ নির্মাণ করা প্রয়োজন। একটি মালগুদাম, একটি রান্নার ও খাইবার ঘর, কোম্পানির কর্মচারীদের থাকিবার স্থান, প্রহরীদের বাসস্থান ও এলিস সাহেবের আবাসস্থান নির্মাণ করা অতি শীঘ্রই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এজেন্ট ও মিঃ পিচির পূর্বকার আবাসস্থানের কতকটা এখনও আছে, এটা মেরামত করিয়া লইলেই চলিবে। চারিদিকে মাটির দেয়াল ও চালাঘর করিয়া চালাইতে হইবে। যতদিন আমরা স্থায়ী ভাবে ফ্যাক্টরি-গৃহ স্থাপনের স্থান না পাই, ততদিন এই ভাবেই চালাইতে হইবে।"[২]

এই কয়েকখানি চালাঘরের কল্পনাতেই অগণিত গগনস্পর্শী সৌধরাজি মণ্ডিত, বিদ্যুৎ-আলোকিত, অমরাপুরীর ন্যায় বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত বর্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। চার্নকের নির্মিত এই কয়খানি চালাঘরই ভারতে ইংরাজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী। বর্তমান মহানগরী কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকারী।

পূর্বে কালীঘাট প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কথা বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি। এই লক্ষ্মীকান্তই বেহালা-বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী জমিদারদের আদি পুরুষ। কালীঘাটের কালিকা-দেবী এই লক্ষ্মীকান্তের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত। লক্ষ্মীকান্ত যশোরেশ্বর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের অধীনে কাজ করিতেন। লক্ষ্মীকান্ত কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের (ব্রহ্মচারীর) সন্তান। আর এই কামদেব ব্রহ্মচারী মহারাজ মানসিংহের গুরু। যে তিনজন ব্যক্তি বঙ্গবিজয়ে প্রধান সহায় ছিলেন মহারাজ মানসিংহ তাঁহাদের প্রত্যেককেই প্রচুর পুরস্কার ও বাদসাহ সরকারে চাকরি দেন। জয়ানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত ও ভবানন্দ এই তিনজনই মহারাজ মানসিংহের বিশেষ অনু-

১. যে জমিতে সেন্ট জন গির্জা নির্মিত হয় ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর আমলে শুধু সেই জমিখণ্ডই সংগৃহীত হইয়াছিল। গির্জার নির্মাণ সম্পন্ন হয় ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর কার্যকাল উত্তীর্ণ হইবার দুই বৎসর পর ১৭৮৭ খ্রী.।

২. The Right Worshipful Agent Charnock, Mr. Francis Ellis and Mr. Jeremiah Peachie duly resolved—"in consideration that all the former buildings here are destroyed to build as cheap as possible a warehouse, a dining-room, a cook-room, a room to sort cloth in, an apartment for Company's servants and a guard house, also a house for Mr. Ellis. The Agent's and Mr. Peachie's houses which were part standing to be repaired as also the secretary's office—these to be done with mud walls and thatched houses till we can get a ground whereon to build a factory.—*Calcutta Past and Present* by Kathleen Blechynden, 2nd Ed. p. 6.

গ্রহ লাভ করেন। মানসিংহ ইহাদের তিনজনকেই 'মজুমদার' পদবী প্রদান করিয়া বঙ্গের কর-সংগ্রাহক জমিদার করিয়া দেন। ভবানন্দ অতি ভীষণ বিপদে খাদ্যদানে মানসিংহের সেনাগণের প্রাণরক্ষা করেন। এই ভবানন্দ মজুমদারই কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদিপুরুষ। জয়ানন্দ মানসিংহের আদেশে তাঁহার গুরুপুত্র লক্ষ্মীকান্তকে খুঁজিয়া বাহির করেন বলিয়া মজুমদার উপাধি পান। আর লক্ষ্মীকান্ত গুরুপুত্র বলিয়া জমিদারি লাভ করিয়া মজুমদার হয়েন। এই লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামের জমিদার ছিলেন। মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর, হাভেলিসহর, হাতিয়াগড় প্রভৃতি পরগনা তাঁহার দখলে ছিল। কালিকাদেবীর সেবায়েত বলিয়া তিনি কলিকাতা পরগনা খাসে রাখিয়াছিলেন।[১]

এই লক্ষ্মীকান্তের জমিদারি কাছারি কলিকাতার মধ্যে ছিল। বর্তমান লালদীঘি ও তাহার পার্শ্ববর্তী ভূভাগই লক্ষ্মীকান্তের জমিদারির কাছারি বাটির সীমানা ও পুকুর। এই পুকুরের অনতিদূরে শ্যামরায়-বিগ্রহের মন্দির ছিল। এই বাগানের অতি সান্নিধ্যে লক্ষ্মীকান্তের ইষ্টক নির্মিত[২] কাছারি বাড়ি। এই কাছারি বাড়িটিই কেবলমাত্র ইটের গাঁথুনি, আর বাকি সব চালাঘর। জোব চার্নক চেষ্টা করিয়া এই পাকা কাছারি বাড়িটি জমিদারদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া তন্মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ও বহুমূল্য দ্রব্যজাত রক্ষা করেন। কারণ তখনও তাঁহার প্রস্তাবিত গৃহগুলি নির্মিত হয় নাই।

সেকালে মহাসমারোহে মজুমদার জমিদারদের, শ্যামরায়ের দোলোৎসব হইত। শ্যামরায় লক্ষ্মীকান্তের বংশধরদিগের গৃহদেবতা। এখন এই শ্যামরায় কালীঘাটে আছেন। শ্যামরায়ের দোলের সময় এত আবির কুঙ্কুমের ছড়াছড়ি হইত যে পূর্বোক্ত দীঘির জল লাল হইয়া উঠিত। এই জন্য ইহার 'লালদীঘি' নামকরণ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, ইংরাজেরা লালরঙের পাকা ইটের দ্বারা পুরাতন 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গের পোস্তা ও দেয়াল তৈয়ারি করিয়াছিলেন। সেই লাল ইটের প্রাচীরের রং, দীঘির জলে প্রতিফলিত হইয়া একটা গাঢ় লোহিত বর্ণের প্রতিবিম্ব-সৃষ্টি করিত বলিয়া লালদীঘি নাম হইয়াছে।[৩]

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর আর দক্ষিণে বেহালা—এই ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী ত্রিকোণাকৃতি বৃহৎ মণ্ডলই সাবর্ণদের জমিদারি ছিল। সাবর্ণদিগের পুরাতন কাগজপত্র ও পারিবারিক আখ্যানাদি হইতে জানা যায়, যে চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী কালীও তাঁহাদের সম্পত্তি। হইতে পারে, বহুপূর্বে চিতে-ডাকাত জঙ্গলের মধ্যে এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কিন্তু পরে ইহা সাবর্ণদেরই হস্তগত হয়। জমিদারের লাঠির জোরে ডাকাতেরা হয়ত ইহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছিল। সেই পুরাকালে চিত্রেশ্বরীর মন্দির হইতে একটি রাস্তা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাত্রী-পথরূপে বরাবর কালীঘাট পর্যন্ত গিয়াছিল। এই পথটিকে সেকালের ইংরাজেরা Pilgrim's Track বলিতেন। ইহাই বর্তমান কালের ট্রামঘণ্টা-নিনাদিত চিৎপুর রোড। এই রাস্তাটি অতি ক্ষুদ্র ও ভীষণ জঙ্গলের দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সেকালের এই ক্ষুদ্র যাত্রী-পথটি আজকালকার চিৎপুর রোড বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট হইয়া একটি খালের নিকট গিয়া শেষ হয়। ইহাই গোবিন্দপুর-ক্রীক বা খাল বলিয়া পরিচিত। আবার এই পথ খালের অপর পার হইতে আরম্ভ হইয়া সরাসর চৌরঙ্গীর

১. The bulk of Parganas, Magura, Khaspur, Calcutta, Paikan, Anwarpur, Habelishahar and Hatiagar which were given to Lakhmikanta, remained in his family at the Permanent Settlement.—*Proceedings* dated 24th July, 1788.

২. রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ, পৃ. ১২য় উল্লিখিত C. R. Wilson-এর মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৩. আবার অন্যমতে শেঠদিগের গোবিন্দজী ঠাকুর এই স্থানে ছিলেন। তাঁহারই দোলোৎসবে মহাসমারোহে হইত। তাঁহাদের দোলোৎসবের আবির ছড়াছড়ির জন্য পুকুরের জল লাল হইয়া যাইত। ইহা হইতে লালদীঘি নামের উৎপত্তি, শেঠেরা অবশ্য এই কথাই বলিয়া থাকেন। অপর একটি জনশ্রুতি মতে লালমোহন শেঠ এই পুষ্করিণী খনন করেন এবং তাঁর নাম অনুসারে এটি লালদীঘি নামে পরিচিত হয়।—নগেন্দ্রনাথ শেঠ, কলিকাতাস্থ তন্তু বণিক জাতির ইতিহাস পৃ. ২২।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়া, ভবানীপুরে ভেদ করিয়া কালীঘাটে গিয়াছিল।[১]

সাবর্ণগণের পারিবারিক কাহিনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে এই শ্যামরায় ঠাকুর সেই পুরাকালের জঙ্গল-বেষ্টিত প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে খুব নামজাদা বিগ্রহ ছিলেন। সাবর্ণ মহাশয়েরা তখন খুব দানধ্যান করিতেন। এক চন্দ্রাতপের (অপরার্থে ছত্র বা ছায়া-প্রদানকারী আবরণ) নিম্নে তাঁহাদের ঠাকুরের ভোগ বিতরিত হইত। এই প্রসাদ লইবার জন্য দূরবর্তী স্থান-সমূহ হইতে অনেক লোক আসিত। 'ছত্র' বা 'চন্দ্রাতপের' নিম্নে এই 'লুট' বা 'প্রসাদ' বিতরণ করা হইত বলিয়া, এইস্থান 'ছত্রলুট' আখ্যা ধারণ করে।[২] এই 'ছত্রলুট' ক্রমশ অপভ্রংশ হইয়া হইয়া ইহা সুতালুটিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহাই সুতালুটি নাম হইবার সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ। আবার অন্য কিম্বদন্তী হইতে আমরা জানিতে পারি যে অধস্তনকালে শেঠ-বসাকদের হাট এই স্থানেই স্থাপিত হয় এবং তথায় 'সুতার-লুটি' বিক্রয় হইত বলিয়া ইহা 'সুতালুটি' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা শেঠ-বসাকদের উক্তি। ইংরাজদের সেরেস্তায় 'ছত্রলুট' নাম কোথাও নাই, 'সুতালুটি' আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেরেস্তায় একখানি পুরাতন Letter Book বা বিলাতি-চিঠির বহি ছিল। এখান হইতে যেসব চিঠিপত্র বিলাতে যাইত তাহার নকল ইহাতে থাকিত। এখানি এখন বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে অতি জীর্ণাবস্থায় রক্ষিত। ইহাতে ১৭০০ খৃীস্টাব্দের চিঠিপত্রের নকল আছে। সেই সমস্ত চিঠিপত্র 'সুতালুটি' হইতে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে। জোব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পর এবং এই ১৭০০ খৃীস্টাব্দের পূর্বে আর একখানি পুরাতন চিঠির বহি ব্যবহৃত হইত। সে বহিখানি ঘটনাচক্রে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জোব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্বে ও পরে 'সুতালুটি ডায়ারি' (১৬৮৮) ও 'সুতালুটি কন্সলটেসনস' বা মন্ত্রণাসভার বহি (১৬৯০) এখনও বিলাতে সুরক্ষিত। উল্লিখিত কারণ সমূহের মধ্যে যে-কোন কারণেই হউক না কেন সেই সময়ে কলিকাতা প্রভৃতি গ্রাম সুতালুটি বলিয়াই সাধারণ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিল।[৩]

যাহাই হউক না কেন সাবর্ণ মহাশয়েরা সেই পুরাকালে কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আংশিক উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শ্যামরায়জীউর উৎসব উপলক্ষে সাময়িক অনেক হাট-বাজার ও মেলার অনুষ্ঠান হইত। তাঁহাদের শ্যামরায় বিগ্রহের দোলযাত্রা উপলক্ষে তৎকালের উপযোগী, একটা জাঁকালো মেলা লালদীঘিতে বসিত। এই শ্যামরায়ের দোলের উৎসবক্ষেত্রে ছিল বলিয়াই বোধ হয় পার্শ্ববর্তী স্থানগুলির লালদীঘি, রাধাবাজার, লালবাজার ইত্যাদি নামকরণ হইয়াছিল। হাটতলা ও তদপভ্রংশ হাটখোলা, বড়বাজার (বুড়া-বাজার—বুড়ো শিবের বাজার) ইত্যাদি আখ্যাও এই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রাচীনকালের যখন কোন ধারাবাহিক ইতিকথা নাই, তখন চলিত কিম্বদন্তীসমূহের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে।[৪]

১. A. K. Ray's *A Short History of Calcutta*, 2nd Ed. p. 220.

২. 'ছত্র', 'দানছত্র', 'হরিহরছত্র', 'জলছত্র' প্রভৃতি তুলনা করিয়া দেখুন। এবং হরিরলুটের অপভ্রংশ মেয়েলী কথা 'হরিরলুট' কথাটিও তুলনার সমালোচনা ভাবুন। ছত্র আবার অনেক স্থলে 'সত্র' এই ভাবেও উচ্চারিত হয়। এই সমস্ত নামের গোলমাল সেকালের ইংরাজেরাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এদেশের ভাষা বুঝিতেন না—কানে যে শব্দটা আসিত তাহাই ইংরাজী অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিতেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—সেকালের কাগজ পত্রে তাঁহারা সাহজাহানকে, 'Chazahu', মির্জা মমিনকে, Mersy Momien' সায়েস্তা খাঁকে, 'Cha-esta-cawn', আবার কোন সময়ে 'Shosta Khan' করিয়া গিয়াছেন। এরূপ স্থলে পাঠকই বিচার করিয়া লইবেন, 'ছত্রলুট' হইতে সুতালুটি কিম্বা সুতার-লুটি হইতে সুতালুটি হওয়ার কোনটি বিশেষ সম্ভবপর।

৩. Burnell and Yule's *Glossary of Anglo-Indian Terms—Bengal and Agra Gazetteer* Vol II, p. 11 and 329. Wilson's *The Early Annals of the English in Bengal.*

৪. They (the Savarnas) mention, that it was from the annual holi festival of this very Sham Roy and his spouse Radha, during which a vast quantity of red-powder (Kunkum) used to be sold and scattered in and around their Cutcherry Tank, the temporary bazars erected for the occassion that Laldighi, Lalbazar and Radhabazar derive

জোব চার্নক মজুমদারদের এই পাকা কাছারি বাড়িটি কোম্পানির সেরেস্তা রাখিবার জন্য ভাড়া করিয়া লয়েন। এই কাছারি বাড়িই কলিকাতার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আফিস-গৃহ। কলিকাতার পুরাতন 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গ নির্মিত হইলে ১৭৬০ খৃস্টাব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।[১]

সেকলের চৌরঙ্গীর কথা এস্থলে একটু বলা প্রয়োজন। অনেকের মতে, জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী হইতেই এই চৌরঙ্গী নাম হইয়াছে। জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর প্রবাদ কেহ বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, কেহ বা তাহাতে অনাস্থা প্রকাশ করেন। অনেকে বলেন জঙ্গলগিরি বর্তমান [illegible] মুখের প্রস্তরখানি কুড়াইয়া পান। পোস্তা হইতে [illegible] অংশভুক্ত যে প্রস্তর-খণ্ড কাপালিকগণ কর্তৃক গভীর জঙ্গল মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল, একটি প্রবাদ মতে চৌরঙ্গী সন্ন্যাসীর আবিষ্কৃত মুখ প্রস্তর খানি তাহা বই আর কিছুই নহে। হঠ-প্রদীপ গ্রন্থে চৌরঙ্গী-গিরির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উইলসন সাহেবও তাঁহার 'হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "আদিনাথ গোরক্ষের পর চৌরঙ্গী ষষ্ঠ বংশীয় শিষ্য ও ভক্ত কবীরের সমকালবর্তী। এই কবীর সুলতান ইব্রাহিম লোদির দ্বারা সম্যকরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ১৫২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সুলতান লোদির রাজত্বকাল।' ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খৃস্টাব্দে সম্ভবত শেঠ-বসাকেরা গোবিন্দপুরে আগমন করেন। বাবু গৌরদাস বসাকের মতে দশনামী শৈবসন্ন্যাসী চৌরঙ্গী-গিরি সশিষ্য গঙ্গাসাগর যাইতেছিলেন। গঙ্গাতীরে কালীর প্রস্তরখোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া উক্তস্থানে কুটীর বাঁধিয়া পূজা প্রবর্তন করেন। কিয়ৎকাল পরে জঙ্গলগিরি নামক তাঁহার এক শিষ্যের হস্তে কালীপূজার ভার দিয়া তিনি গঙ্গাসাগরে চলিয়া যান। প্রস্তরফলক প্রাপ্তি সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এই যে, চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী একদিন দেখিতে পাইলেন যে গভীর বনমধ্যে একটি নির্জন স্থানে এক পয়স্বিনী গাভী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার বাঁট হইতে অজস্র দুগ্ধধারা নিম্নস্থ একটি স্থানের উপর পড়িতেছে। ইহাতে সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া সন্ন্যাসী সেই স্থান খনন করিতে করিতে কালীর প্রস্তরময় মুখ প্রাপ্ত হন।

চৌরঙ্গী ও তাঁহার শিষ্যগণ ঘোর শাক্ত ছিলেন। আগমবাগীশের পরই সমগ্র বঙ্গে শিব ও শক্তিপূজার এবং তন্ত্রাচারানুমোদিত ক্রিয়াদির বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়। আমরা একজন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি যে, সেই সময়ে চৌরঙ্গীর জঙ্গল[২] ও তাহার পার্শ্ববর্তী সীমার মধ্যে

their names...The old Zaminders of Calcutta further claim, that it was the Hat and Bazar round their idols and their pucca Zamindary Cutcherry west of the tank, that gave Calcutta its original importance and gave rise to the names of Hattola, latterly corrupted into Hatkhola and Burrabazar (Bura being familiar name of Siva) and it was the doles near Kali's temple that attracted a large population and contributed to the reclamation and cultivation of marsh and jungle and that their culverts, landing-ghat and roads with a shady avenue of trees on both sides formed the only adornment of Rural Calcutta in its early days.—A.K. Ray *A Short History of Calcutta—Town and Suburbs*, Reprint of Census of India, 1901, Vol VII Part I, 1982 p. 22-23.

১. The year 1706 had already witnessed the destruction of the Cutcherry which had sheltered the Company's records since the days of Charnock and the erection of a more imposing factory building.— Cotton's *Calcutta Old and New*, 2nd Ed. p. 352.

২. কলিকাতার বর্তমান লালদীঘির দক্ষিণ হইতে সুদূরে দক্ষিণপ্রান্তব্যাপী এক জঙ্গল বহুকাল হইতে বর্তমান ছিল। চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী কর্তৃক কালীমূর্তি আবিষ্কার অথবা জঙ্গলেশ্বর প্রভৃতি শিবপ্রতিষ্ঠার পরই ইহা 'চৌরঙ্গীজঙ্গল' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। হলওয়েলের সময়ে চৌরঙ্গী-জঙ্গল মধ্যে একটি রাস্তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পলাশীযুদ্ধের পাঁচ বৎসর আগে লিখিত হলওয়েলের বৃত্তান্ত হইতে প্রকাশ—'The road leading to Colly-got (Kalighat) and Dee Calcutta' এই জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। ১৭৫৮খ্রীঃ অব্দে মীরজাফরের পুত্র মীরন, কোম্পানিকে যে কলিকাতার নূতন সনন্দ দেন, তাহাতে চৌরঙ্গীর জঙ্গল কতকাংশ কলিকাতার মধ্যে, আর কতকাংশ পাইকান পরগনার মধ্যে বলিয়া উল্লিখিত ছিল। এই চৌরঙ্গী-জঙ্গলে বড় ডাকাতের ভয় ছিল—পালকিওয়ালারা রাত্রে এই জঙ্গল পথের মধ্য দিয়া সওয়ারী লইত না, বা সওয়ারী লইলে ডবল ভাড়া চাহিত। রাত্রিকালে দলবদ্ধ না হইয়া কেহই এ পথে আসিত না।

চারিটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ন্যাসীরাই ইহার পূজা করিতেন। এই কয়টি শিব-লিঙ্গের মধ্যে দুইটির অস্তিত্ব এখনও আছে। (১) নকুলেশ্বর—তিনি এখন সর্বজন প্রসিদ্ধ হইয়া কালীঘাটে বিরাজ করিতেছেন। আগে ইনি পর্ণকুটিরের মধ্যে রক্ষিত ছিলেন তৎপরে তারাচাঁদ শিখ ইহাঁর বর্তমান মন্দির করিয়া দেন। (২) জঙ্গলেশ্বর মহাদেব—হরিণবাড়ির নিকটস্থ জঙ্গলে এই শিব ছিলেন। আমরা শুনিয়াছি, এই জঙ্গলেশ্বর, ভবানীপুর, কাঁশারী পাড়ার কোন স্থানে আছেন। সম্ভবত এই লিঙ্গমূর্তি চোরঙ্গীগিরির শিষ্য জঙ্গলগিরির প্রতিষ্ঠিত। (৩) 'চোরঙ্গীশ্বর' মহাদেব। একটি চলিত প্রবাদ এই, বর্তমান এসিয়াটিক সোসাইটি-গৃহ যে স্থানে নির্মিত হইয়াছিল, সেই স্থানেই 'চোরঙ্গীশ্বর' শিবলিঙ্গ বর্তমান ছিলেন। সোসাইটির বাটি নির্মাণের পর, দরোয়ানরা একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পরে উক্ত সোসাইটির একজন সভাপতির আদেশে তাহা স্থানান্তরিত হয়। (৪) নঙ্গরেশ্বর—ইহার অপভ্রংশ নাম 'লাঙ্গলেশ্বর'। এই নঙ্গরেশ্বর মহাদেব এখনও বর্তমান। বড়বাজার লোহাপটির নিকট বাসনপটির মোড়ে, পান-পোস্তার কাছে ইঁহার মন্দির এখনও রহিয়াছে। কয়েকজন উড়িয়া-পাণ্ডা এখন ইঁহার পূজক। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শঙ্খ ঘণ্টা নাদে এখনও ইঁহার আরতি হয়। তখনকার কালের ভাগীরথী বর্তমান স্ট্রাণ্ড রোড পর্যন্ত প্রসারিত ছিলেন। নদীর ধারেই নঙ্গরেশ্বরের মন্দির। অবশ্য সে সময়ে সম্ভবত বর্তমান মন্দির নির্মিত হয় নাই। সুতালুটি হাটের নিকটেই চালা ঘরের মধ্যে এই মন্দির ছিল। যে সকল হাটুরিয়া ও ব্যবসায়ীরা সুতালুটির ঘাটে নৌকা লাগাইত বা সেই স্থানে নঙ্গর করিত তাহারা এই নঙ্গরেশ্বরের পূজা দিত।

মোটের উপর এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদারদের দ্বারা সেই জঙ্গলময় কলিকাতার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। কালীঘাটের হালদার-বংশের আদি পুরুষগণ অর্থাৎ রামগোবিন্দ, রামশরণ ও যাদবেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ দ্বারা গোবিন্দপুর গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ কায়স্থের বসবাস হয়। চিত্রপুর (চিৎপুর), ছত্রলুট (সুতালুটি), গোবিন্দপুর. চোরাঙ্গী (চোরঙ্গী), ভবানীপুর ও কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বসবাসের পরিচয়ও এই পুরাকালে পাওয়া যায়। সাবর্ণেরা ও শেঠ-বসাকেরা অনেক বন-জঙ্গল কাটাইয়া ফেলেন। শেঠ বসাকেরা তাঁহাদের ব্যবসার খাতিরে আর সাবর্ণেরা তাঁহাদের কলি-কাতা জমিদারির জন্যই ইহার উন্নতিকল্পে বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত পর্টুগীজ, দিনেমার, আর্মানী ব্যবসায়ীদের দ্বারাও সেই প্রাচীন কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত দেব মহাশয় নাবালক সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদার কেশব রায়ের সম্পত্তির ম্যানেজার ছিলেন। ইনিও এই সময়ে কলিকাতায় বাস করেন। ইহা ছাড়া কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে মনোহর ঘোষ বলিয়া একজন কায়স্থ বাস করিতেন। ইনি চিৎপুরবাসী দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের পূর্বপুরুষ।[১] হলওয়েলের আমলে

১. Amongst the Hindu residents of the time in Calcutta and its neighbouring villages we find mention in the traditions of Calcutta, of Manohar Ghosh, an ancestor of Dewan Srihari Ghosh at Sibpur, of a predecessor of Gobindram Mitter who acted as the 'Black Zaminder' under Holwell at Chuttanutti of Govinda Saran Dutt and Punchanan Tagore ancestors of the Dutts and the Tagores of Hatkhola and Pathuriaghata respectively settled at Chuttanutty and Govindpur. শেঠেরা যেমন বলিয়া থাকেন, তাহাদের গৃহ-দেবতা 'গোবিন্দজীউ' হইতে গোবিন্দপুর নামোৎপত্তি আবার দত্তবংশীয়েরাও সেইরূপ বলেন, যে গোবিন্দ শরণের নাম হইতে গোবিন্দপুর হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্তদিগের কথা প্রামাণিক নহে। শেঠেরা দত্তদের বহুকাল পূর্বে গোবিন্দপুরে বাস করেন।...The family of Rukmini Kanto Dey (great-grand-father of Maharaja Nabakissen whose services in the Savarna family greatly benefitted Keshab Roy, one of the minor proprietors of Calcutta, was one out of several, that made Govindpur their abode.—Wilson's *Early Annals*. A. K. Ray's Report. *Memoirs of Nabakissen* —N. N. Ghosh, p. 4.

'ব্ল্যাক-জমিদার' গোবিন্দরাম মিত্রের পূর্বপুরুষেরাও গোবিন্দপুরের আদিম অধিবাসী। হাটখোলার দত্ত বংশীয় জমিদারগণের আদিপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্ত সুতালুটিতে বাস করিতেন। কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিপুরুষ পঞ্চানন ঠাকুর মহাশয়ও কলিকাতার আদিম অধিবাসী। জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পরে ও সুতালুটি প্রভৃতি গ্রামের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এবং পরবর্তী কালে কলিকাতার পুরাতন দুর্গ-নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন কলিকাতায়, গোবিন্দপুরে ও সুতালুটি অঞ্চলে দুই দশ ঘর করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস আরম্ভ হয়। বসাক-বংশ ও শেঠগণও এই সময়ে প্রাচীন কলিকাতায় বহু বিস্তৃত হইয়া পড়েন। কারণ আমরা পরবর্তী কালে দেখিতে পাই, বসাকদের মধ্যে শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক, গোরাচাঁদ বসাক, বৈষ্ণবচরণ শেঠও সেকালের শেঠ-বসাকদের মধ্যে প্রধান ও যশস্বী হইয়া প্রাচীন কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত খিদিরপুর ভূকৈলাস রাজ-বংশের আদিপুরুষ, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালও এ স্থলের একজন প্রাচীন বাসিন্দা। বর্তমান ভূকৈলাস রাজ-বংশ তাঁহার জ্ঞাতি জয়নারায়ণের বংশধর। গোকুল ঘোষালের বংশ নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কলিকাতায় শোভারাম বসাকের সুতার হাটই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও কলিকাতায় কয়েকটি রাজপথ[১] পুরাকালের বসাক মহাশয়ের নাম সাধারণের স্মৃতিপথে জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আমরা সাধ্য মত নানাবিধ প্রবাদ, কিম্বদন্তী, জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক তথ্যের সহায়তায় জোব চার্নকের আসিবার পূর্বে ও পরে প্রাচীন কলিকাতায় সামাজিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করিলাম। আশা করি, এগুলি পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিবে। এক্ষণে জোব চার্নক সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিব।

জোব চার্নক সুতালুটিতে কুঠি স্থাপনের পরও উপযুক্ত আশ্রয়স্থানের অভাবে বড়ই কষ্ট পান, পূর্বে একথা বলিয়াছি। সুতালুটি মন্ত্রণা-সভার প্রথম অধিবেশনের যে মন্তব্য ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে কোম্পানির তৎকালীন আবাসস্থানের কষ্টের কথা জানিতে পারা যায়। মান্দ্রাজ কাউন্সিলের কর্তা এই সময়ে কলিকাতার কুঠির শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতের কর্তৃপক্ষদের যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এই—সুতালুটির ইংরাজ কোম্পানির কর্মচারীরা অতি শোচনীয় অবস্থায় কাল-যাপন করিতেছেন। ইংরাজের আবাসস্থান ও গুদাম প্রভৃতি সুরক্ষিত নহে। বাটিগুলির অধিকাংশই মাটির ঘর। কুঠির অধিকাংশ কর্মচারী তাঁবু খাটাইয়া বাস করে, অথবা নদীতে বোটের উপর থাকে। আর কোম্পানির অত মালপত্র, সম্পত্তি ও জাহাজ প্রভৃতি রক্ষা করিবার জন্য একশত গোরা সৈন্য মাত্রই সম্বল।[২]

চার্নক মৃত্যুর পূর্বে লালদীঘির ধারে দুইটি মাত্র বাড়ির বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তখন সুতালুটিতে অনেক পর্টুগীজ থাকিত। ইহাদের একটি 'Mass-House' বা প্রার্থনা-গৃহ ছিল। দ্বিতীয় পাকাবাড়ি লালদীঘির সান্নিধ্যে মজুমদারের পূর্বকথিত কাছারি বাড়ি চার্নক মজুমদার-বংশীয় বিদ্যাধর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট তাঁহার কাছারি জমা করিয়া লয়েন। রায়চৌধুরী মহাশয়ের জায়গীরের মধ্যেই সুতালুটি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়। এই বিদ্যাধর রায়চৌধুরীর একজন ফিরিঙ্গি আমমোক্তার বা নায়েব ছিল, তাহার নাম এন্টনি সাহেব। একদিন ঘটনাবশে এই এন্টনির সহিত জোব চার্নকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ সংঘর্ষের কারণ আমরা বলিতেছি।

পূর্বোক্ত লালদীঘি তখন এত বড় ছিল না। ইহা একটি মাঝারি ধরনের পুষ্করিণী। এই পুষ্করিণীটি মজুমদারদের কাছারি বাড়ির সীমার মধ্যেই ছিল। শ্যামরায় কালীঘাটে

১. বর্তমান শোভারাম বসাক ষ্ট্রীট, বৃন্দাবন বসাকস্ লেন ইত্যাদি পথগুলির কথা পাঠক স্মৃতিপথে আনুন।
২. Letter dated Fort St. George 25th May 1691.

স্থানান্তরিত হইলেও দোলের সময় এখানে আসিতেন। শ্যামরায়ের দোলক্ষেত্র এই কাছারি বাড়ির সীমার মধ্যে বহুদিনের প্রচলিত প্রথামত দোলটা পূর্ব্ববৎই চলিয়া আসিতেছিল। বিবাদের কারণ এই, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কতকগুলি ফ্যাক্টর দোলবাটির মধ্যে উৎসব দেখিবার জন্য প্রবেশের চেষ্টা করে। চৌধুরীদের আমমোক্তার এণ্টনি সাহেব তাহাদের প্রবেশ করিতে দেন নাই। চার্নকের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তিনি স্বপক্ষীয়দিগের সাহায্যার্থে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তাঁহার হাতে ঘোড়ার চাবুক ছিল, সেই চাবুক দিয়া এণ্টনিকে প্রহার করেন।[১]

চার্নক হস্তে প্রহৃত এণ্টনি সাহেব এ অপমান ভুলিতে না পারিয়া তাঁহার প্রভু মজুমদারের অধিকৃত জমিদারির মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার নিকট এক গ্রামে গিয়া বাস করেন।[২]

এই এণ্টনি সাহেবের পৌত্রই, কবিওয়ালা আণ্টুনি (এণ্টান) সাহেব। সেকালের কবির সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের যদি কোন সম্বন্ধ থাকে, যদি আমরা দাশু রায়, রাম বসু, ভোলা ময়রা, ঠাকুর সিংহ প্রভৃতির নাম বিস্মৃত না হই, তাহা হইলে এণ্টনির নামও বিস্মৃত হইব না। এণ্টনি খ্রীস্টান হইয়াও হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। তাহার কারণ, তিনি এক ব্রাহ্মণ-রমণীর প্রেমে পতিত হন। তিনি হিন্দুর পাল-পার্ব্বণ, দোল, দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন, অবশেষে কবির দল বাঁধিয়া আসরে নামিয়াছিলেন। কবির দলের ব্যাপার বড় সহজ ব্যাপার নহে। উপস্থিত বুদ্ধিতে অর্থপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া ছড়া কাটান ও প্রতিপক্ষদলকে কঠোর জবাবে নিরস্ত করা বড় সহজ কাজ নহে। এণ্টনির কবিত্ব ও বাঙ্গলা ভাষায় দখলও বড় কম ছিল না। দুই একটি উদাহরণ দিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

এক জায়গায় কবির আসর বসিয়াছে। তখনকার কালে কবির বড় ধূম। আসর লোকে পরিপূর্ণ। এই সময়ে এণ্টনি সাহেব মাথার টুপি ও গায়ের কুর্তি ছাড়িয়া আসরে অবতীর্ণ। প্রতিপক্ষ কবিওয়ালা ঠাকুরসিংহ, এণ্টনি সাহেবকে আক্রমণ করিয়া বলিলেন—

"বলহে এণ্টনি আমি একটি কথা জানতে চাই,
এসে এদেশে, এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই।"

এণ্টনি ইহার যে জবাব দিলেন, তাহাতে ঠাকুর সিংহকে হটিতে হইল। বর্তমানকালে এ জবাব সুরুচি সঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু তখনকার কালে এরূপ জবাবে শ্রোতারা বড় আনন্দ উপভোগ করিতেন। এণ্টনি, ঠাকুর সিংহকে 'শ্যালক' সম্বোধন করিয়া তাহার আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন। তিনি বলিলেন—

"এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর দেশে আনন্দে আছি,
হয়ে ঠাকুরে সিংহের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।"

একবার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসু আসরে দাঁড়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়া পূর্বপক্ষ করিলেন—

"সাহেব ! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী সাহেব, শুনতে পেলে দেবে চুণকালি।"

সাহেব উত্তর দিলেন—

১. Portuguese Antony, agent of the proprietor of Calcutta has been horse-whipped out of the enclosure by Charnock for attempting to prevent some English factors from entering it during the *Holi* festival of the Hindu god Sham Roy (Gobinda) which was still being celebrated here as of old, inspite of the removal of the idol to Kalighat. —A.K. Ray's *A Short History of Calcutta*, 1982 Ed. p. 47.

২. চার্নকের সমকালবর্তী, মজুমদারদের কর্মচারী, চার্নক-প্রহৃত এণ্টনির বাগানবাটির ভিটা এখনও বর্তমান। এণ্টনির হাটের নাম এখনও অনেকের মনে আছে। কলিকাতার এণ্টনি-বাগান লেন এই এণ্টনির নামেই হইয়াছে। ইহার পৌত্র কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেব ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটিতে থাকিতেন। তাঁহার বাগানবাটির ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়। কবিওয়ালা এণ্টনির ভ্রাতা কেলি সাহেব একজন ক্ষমতাপন্ন ও অর্থশালী লোক ছিলেন।—*Ibid*, দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

"খ্রীস্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।
আমার যীশু যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে—
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই।"

এণ্টনি সাহেব ধর্ম-সম্বন্ধে উদারপন্থাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার মতে কৃষ্ণ, খ্রীস্ট, খোদা, হরি সবই এক। এই-জন্যই তিনি প্রাণের আবেগে গাহিয়াছিলেন—

"আমি ভজন সাধন জানিনে মা জেতে অধম ফিরিঙ্গি,
আমায় দয়া করে কৃপা কর ওমা শিবে মাতঙ্গী।"

যাহা হউক, বহু চেষ্টায় ও অনুসন্ধানে আমরা নানাস্থান হইতে জোব চার্নক সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। সেকালের পুরাতন দপ্তরের অনেক ভাল ভাল রেকর্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই পুরাতন রেকর্ডগুলি যত্নে রাখিবার জন্যই জোব চার্নক মজুমদারের কাছারি বাড়িটি লইতে বাধ্য লন। ১৭১৩ সালের মহা ঝড়ে অনেক কাগজপত্র নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণকালেও বহু দরকারি কাগজপত্র অগ্নিদগ্ধ হয়।

জোব চার্নক কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি গভীর জঙ্গল ও শ্বাপদ, কুম্ভীর, সর্প-সংকুল বনভূমিতে বর্তমান কলিকাতা মহানগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি শতাব্দী পূর্বে লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ এই প্রাসাদময়ী কলিকাতা নগরী তাঁহার ও তাঁহার জাতির ও সেই জাতির অধিপতি রাজ-রাজেশ্বর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর উজ্জ্বল কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

জোব চার্নকের সহস্র দোষ থাকিতে পারে। মানুষ মাত্রেই দোষহীন নহে। কিন্তু সেই দোষের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই চার্নক একান্তচিত্তে প্রভুভক্ত। কোম্পানির তিনি যে নিমক খাইয়াছিলেন তাহার পরিবর্তে তিনি ভবিষ্যৎবংশীয় ইংরাজদের অতুল বিত্তসম্পত্তি দান করিবার উপলক্ষ হইয়াছেন। তখনকার কালে মুষ্টিমেয় ইংরাজ যে এক মহাশক্তি বলে অসীম পরাক্রান্ত মোগল বাদসাহের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন, তাহার মূলে এই জোব চার্নক। চার্নকের সাহস কিরূপ অদম্য ও স্বজাতিপ্রীতি কিরূপ প্রবল ছিল তাহা চার্নকের জীবনের ঘটনাবলী হইতেই প্রমাণিত হইবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

চার্নকের মৃত্যুর পর কোম্পানির বাণিজ্যাগারের অবস্থা—স্যর জন গোল্ডসবরার সুতানুটিতে আগমন—দুর্গনির্মাণের প্রথম কল্পনা ও সূচনা—স্যর চার্লস আয়ারের আমল—চেতোয়া ও বর্দার তালুকদার শোভাসিংহের বিদ্রোহ—রহিম সার উড়িষ্যা হইতে আগমন ও শোভাসিংহের দলে যোগদান—শোভাসিংহ কর্তৃক বর্ধমান আক্রমণ—বর্ধমানাধিপ রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের পরাভব—শোভাসিংহ কর্তৃক বর্ধমান রাজপুরী অধিকার—কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরামের ছদ্মবেশে কৃষ্ণনগরে পলায়ন—কৃষ্ণনগর হইতে ইব্রাহিম খাঁর নিকট জাহাঙ্গীরনগরে(ঢাকায়) গমন—প্রজারক্ষার সম্বন্ধে নবাব ইব্রাহিম খাঁর ঔদাসীন্য—যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর প্রতি পরিশেষে বিদ্রোহ দমনের আদেশ প্রদান—নূরউল্লার যশোহর হইতে হুগলীতে আগমন ও হুগলীদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ—পরাভূত হইয়া ছদ্মবেশে পলায়ন—নবাবের নিকট ইউরোপীয় বণিকগণের দুর্গনির্মাণের আবেদন—নবাবের সম্মতি ও কলিকাতায় ইংরাজদের দুর্গনির্মাণ কার্যের সূচনা—পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা—ওলন্দাজদের হস্তে বিদ্রোহীদের পরাভব, শোভাসিংহের হুগলীতে, সপ্তগ্রামে ও তৎপরে বর্ধমানে পলায়ন—রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সুন্দরী কন্যার উপর শোভাসিংহের অত্যাচার চেষ্টা—রাজকন্যার হস্তে শোভাসিংহের শোচনীয় মৃত্যু ও রাজকুমারীর আত্মহত্যা—শোভাসিংহের মৃত্যুর পর হিম্মতসিংহের নায়কত্ব গ্রহণ—রহিম সার মুখসুদাবাদে প্রবেশ—জায়গীরদার নেয়ামত খাঁর বীরত্ব—জবরদস্ত খাঁর সেনাপতি পদে নিয়োগ—তাঁহার হস্তে বিদ্রোহীদের পরাজয়—নবাব ইব্রাহিম সার পদত্যাগ—বঙ্গদেশের শাসন কার্যে সাহজাদা আজিমওশ্বানের নিয়োগ—জবরদস্ত খাঁর পদত্যাগ—আজিমওশ্বানের সমরনীতি—বিদ্রোহী রহিম সার নিকট দূত প্রেরণ—আনওয়ার খাঁর হত্যাকাণ্ড—মোগল পাঠানের সংঘর্ষ—যুদ্ধক্ষেত্রে আজিমওশ্বানের বিপন্ন অবস্থা—হামিদ খাঁ কর্তৃক তাঁহার জীবন রক্ষা—সুতালুটির দুর্গনির্মাণ সম্বন্ধে নানা অসুবিধা—এ অসুবিধার প্রতিকারার্থে আজিমের দরবারে ওয়ালশের গমন—নূতন ফারমান বলে ইংরাজ বণিকের সুতালুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয়—এতৎসম্বন্ধীয় বায়নানামার প্রতিলিপি—প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য কথা।

নবাবী আমলে, ইংরাজেরা কলিকাতায় যে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা সে দুর্গ আক্রমণ করেন, সে দুর্গের অস্তিত্বমাত্র এখন নাই, তবে এখনও তাহার অধিকৃত স্থানটি বর্তমান আছে। অধুনাতনকালে গবর্ণমেণ্ট সেখানে কয়েকটি সরকারি অফিস স্থাপন করিয়াছেন। দুর্গটি কোথায়, কি ভাবে, কোন দিকে ছিল, তাহার স্মৃতিও ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জনের অনুগ্রহে আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। লর্ড কার্জন বাহাদুর এদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারকল্পে অনেক চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অতীত ইতিহাসের এই লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্নের উদ্ধার-সংকল্পের জন্য ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট চিরদিনই কৃতজ্ঞ থাকিবেন। প্রাচীন লুপ্তচিহ্ন পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামের স্মৃতি, তিনি অতি পরিস্ফুটভাবেই রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

আজকাল লালদীঘির সান্নিধ্যে বর্তমান কাষ্টম হাউস, জেনারেল পোস্টাফিস বা বড় ডাকঘর, ইনকম-ট্যাক্স অফিস ও ফেয়ার্লি-প্লেসের ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেল-কোম্পানির প্রাসাদতুল্য

কার্যালয়, এই কয়েকটি স্থানের অধিকৃত ভূভাগে নবাবী আমলের 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গ অবস্থিত ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর, বর্তমান গড়েরমাঠের নূতন কেল্লা নির্মিত হয়। নূতন কেল্লার বিবরণ আমরা যথাস্থানে দিব। এখন নবাবী আমলের পুরাতন কেল্লার কথাই বলিতেছি।

কলিকাতাবাসীদের মধ্যে অনেকে হয়ত জানেন না এই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অবস্থান স্থান কোথায়? এই পুরাতন কেল্লাই নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন। নবাব কর্তৃক বিজিত হইবার পরে রাজা মাণিকচাঁদ এই কেল্লারই ভারপ্রাপ্ত হন, এই কেল্লার মধ্যেই হলওয়েল সাহেব মহাসাহসে আত্মরক্ষা করেন। এই কেল্লা হইতেই ড্রেক সাহেব পলায়ন করেন। অন্ধকূপ-হত্যা ইহার মধ্যেই সংগঠিত হয়। যেস্থানে অন্ধকূপ-হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল, লর্ড কার্জন সেই স্থানটি কৃষ্ণবর্ণ মর্মর-প্রস্তরে বাঁধাইয়া দিয়াছেন ও এই বাঁধান স্থানের উপরে যে প্রস্তরফলক গ্রথিত আছে, তাহাতেই এই ভীষণ কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যেখানে 'অন্ধকূপ-হত্যার' নরদেহসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার স্মৃতিস্তম্ভও লর্ড কার্জন কর্তৃক নূতনভাবে নির্মিত হইয়াছে।

কলিকাতার পুরাতন কেল্লা অবশ্য একদিনে নির্মিত হয় নাই, অথবা ইহা দুই এক বৎসরের অর্থব্যয় ও পরিশ্রমের ফলও নহে। সেকালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যাগার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা, অনেক সময়ে মোগল রাজকর্মচারীদের হস্তে অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইতেন। অনেক সময়ে সামান্য বিবাদ বিসম্বাদের ফলে তাঁহাদের মালপত্র লুণ্ঠিত হইত। এ সব কাহিনী আমরা ইতিপূর্বে সবিস্তারে বলিয়াছি। এই সমস্ত উৎপাতের প্রতিকার জন্য, বহুদিন হইতেই ইংরাজেরা ভাগীরথী তীরে একটি প্রাচীর বেষ্টিত আশ্রয়স্থান নির্মাণের সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। এই সংকল্পের জনক—পূর্বোল্লিখিত গবর্ণর হেজেস। হেজেস ১৬৮২ হইতে ১৬৮৪ পর্যন্ত কোম্পানির ফ্যাক্টরি সমূহের গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার মনেই দুর্গনির্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার কল্পনা প্রথম উদিত হয়। জোব চার্নকও হেজেসের এই সংকল্পের পরিপোষণ করেন।

হেজেস বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবার যে প্রস্তাব করিয়া যান, জোব চার্নক তাহা সর্বপ্রথমে কার্যে পরিণত করেন। তিনি যখন সুতালুটিতে আশ্রয় লইলেন, সেই সময়ে তিনি নদীতীরে একটি উন্নত স্থান দেখিয়া তথায় কোম্পানির ফ্যাক্টরির স্থান নির্দেশ করেন। এই ফ্যাক্টরি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ভবিষ্যতে এই স্থানেই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম নির্মিত হইয়াছিল।[১]

হেজেস চলিয়া যাইবার দুই বৎসর পরে নবাবের লোকের সহিত জোব চার্নকের বিবাদ বাধিল। এ বিবাদের প্রারম্ভ ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই বিবাদের ফলে অন্য যাহা ঘটুক না কেন, বর্তমান কলিকাতা মহানগরী ও পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছিল।

জোব চার্নক ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে ২৪এ আগস্ট তারিখে, সুতালুটিতে শেষ আশ্রয় লয়েন। ইহার পর তিনি প্রায় তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে, তিনি কলিকাতায় ইংরাজদের আশ্রয়স্থান নির্মাণের জন্য স্থায়ীভাবে কোন কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই।

১৬৯৩ খ্রীঃ অব্দে, স্যর জন গোল্ডসবরা কোম্পানির কুঠিসমূহের সর্বময় কর্তারূপে নিযুক্ত হইয়া সুতালুটিতে উপস্থিত হন।[২] গোল্ডসবরা দেখিলেন, সুতালুটিতে ইংরাজের

১. আবার অন্যমতে, স্যর জন গোল্ডস্‌বরা কর্তৃক ভবিষ্যতে, দুর্গনির্মাণ জন্য এই স্থান নির্বাচিত হয়।

২. Sir John, Goldsborough কোম্পানির 'Commessary Generall and Admirall of the East India Fleet' এবং 'Chief Governor of the Right Honorable English East India Company's Affaires' রূপে কলিকাতায় আসেন ১৬৯৩ সালের আগস্ট মাসে। ইনিই নবাবের অনুমতি সাপেক্ষে ডিহি কলিকাতার সর্বোচ্চ ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট এলাকায় মাটির দেয়াল দিয়া একটি স্বতন্ত্র সুরক্ষিত স্থান নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এই স্থানটিতেই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ।

আশ্রয়স্থানের কোন সুবন্দোবস্তই নাই। নবাবপক্ষ হইতে সুতালুটিতে স্থায়ী আশ্রয়স্থান নির্মাণের কোন সনন্দও তখনও পোঁছায় নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি সুতালুটির কুঠির চারিদিকে মৃত্তিকা-প্রাচীর তুলিয়া দেন ও ইংরাজদের ফ্যাক্টরি বা বাণিজ্যাগার ইহারই মধ্যে রক্ষিত হয়।[১] কোম্পানির দরকারী সেরেস্তা ও কাগজপত্র রাখিবার জন্য একটি পাকা কোঠাও এই সময়ে ক্রয় করা হয়।

এই ভাবে আরও তিন বৎসর কাটিল। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে স্যর চার্লস আয়ার (ইনি চার্নকের জামাতা) কলিকাতা কুঠির এজেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। আয়ারের আমলে—সম্রাট পৌত্র আজিম-ওশ্বানের নিকট হইতে, সম্রাটের সনন্দ বা নিশান কলিকাতায় উপস্থিত হয়।[১] ইংরাজের অদৃষ্ট অতি সুপ্রসন্ন, যে এই সময়ে বঙ্গদেশে শোভাসিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহের প্রথম সূচনাতেই, ইংরাজেরা কলিকাতার দুর্গনির্মাণের উপযুক্ত সুযোগ লাভ করেন।

তখন কলিকাতা-ফ্যাক্টরির কার্য ততটা লাভজনক হয় নাই। ফ্যাক্টরি রক্ষার জন্য যে সৈন্য-বলের প্রয়োজন, তাহাদের খরচ কোথা হইতে আসে, ইহা একটা ভাবনার বিষয় হইল। এইজন্য ইংরাজেরা নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রাম খাজনা করিয়া লইবার সঙ্কল্প করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গনির্মাণ ব্যাপার, অতি ধীরে ধীরে ও সামান্যরূপে চলিতে লাগিল। পাছে বড় করিয়া এবং পাকাপোক্তভাবে ইমারত ও প্রাচীরাদি নির্মাণ করিলে, স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তাদের মনোযোগ আকর্ষিত হয় বা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহারা তাহাতে বাধাপ্রদান করেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আশঙ্কা দাঁড়াইল। বিলাতের কর্তাদের আদেশ ছিল, "আত্ম-রক্ষার জন্য কলিকাতার দুর্গটি যাহাতে সর্ব বিষয়ে উপযুক্ত হয় সেইভাবেই তাহা নির্মাণ করিবে। দুর্গটি পঞ্চভুজাকারে হইলেই ভাল হয়।" কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিল দেখিলেন, পঞ্চ-ভুজাকারে না হইয়া আয়তাকারে দুর্গনির্মাণই সর্বাপেক্ষা সুবিধাকর। বিশেষত এই সময়ে এমন একজন সুদক্ষ লোক মিলিল না, যাঁহার হস্তে এই দুর্গনির্মাণের ভার দেওয়া যাইতে পারে।

বিধাতা ইংরাজদের উপর প্রসন্ন হইলেন। এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যদ্দ্বারা ইংরাজদের দুর্গনির্মাণ কার্যে কোন বাধা ঘটিল না। সে ঘটনাটি শোভাসিংহের বিদ্রোহ। এ সাংঘাতিক বিদ্রোহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।[২]

তখন নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্তা। ইব্রাহিম খাঁ অতি শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে এবং জোব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে, চেতোয়া ও বর্দার জমিদার শোভাসিংহ মোগলসরকারের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। চেতোয়া ও বর্দা বর্ধমান প্রদেশভুক্ত। এই সময়ে রাজা কৃষ্ণরাম রায় বর্ধমানের অধিপতি।[৩] তাঁহার ন্যায় ঐশ্বর্যশালী

১. *Nishan*, literally a sign in the form of a sealed document of flag or other emblem from the local authority of a district or province—Hunter's *British India* Vol II (H).

২. এই শোভাসিংহ কোন কোন লেখক কর্তৃক 'সুভাসিংহ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহা হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না।

৩. কৃষ্ণরাম রায়, বাবু রায় হইতে তিনপুরুষ অধস্তন। এই বাবু রায়ই বর্ধমান রাজবংশের প্রথম স্থাপয়িতা। কেহ কেহ ইঁহাকে 'আবু রায়' বলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগতরাম। ইনিই শোভাসিংহের ভয়ে ঢাকায় পলায়ন করেন। ১৭০২ খ্রী. জগতরাম শত্রুহস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র কীর্তিচন্দ্রের আমলেই ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' রচিত হয়। কৃষ্ণরাম ও জগতরাম রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের জমিদারি ছয় সাতটি পরগনার বেশী ছিল না।—See *Fifth Report of the Select Committee* p. 402

চেতোয়ার জমিদার শোভাসিংহ একজন ক্ষুদ্র তালুকদার ছিলেন। চেতোয়া বর্তমানে মেদিনীপুর বিভাগে অবস্থিত। আবুলফজল, আইন-ই-আকবরীতে বলিয়াছেন—"Chitwa is a Mahal lying intermediate between Bengal and Orissa." অর্থাৎ চেতোয়া মহল বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যে অবস্থিত। ষ্টুয়ার্ট—চেতোয়াকে 'জেতোয়া' (Jetwa) বলিয়া বানান করিয়া গিয়াছেন। মার্শম্যান সাহেব আবার তাহাকে 'চিতুয়ান' (Chituyan) বলিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। যাহাই হউক, এই চেতোয়ার মালিক শোভাসিংহ। চেতোয়ার সন্নিকটেই 'বর্দা'। শোভাসিংহের প্রপিতামহ রঘুনাথ সিংহই সর্ব প্রথমে বঙ্গদেশে আসেন। রঘুনাথের পুত্র কানাইসিংহ

জমিদার, সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে আর কেহই ছিলেন না। নানাকারণে শোভাসিংহের সহিত রাজা কৃষ্ণরামের দারুণ মনোমালিন্য ঘটে। কিন্তু রাজার ক্ষমতার বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইতে সাহসী না হইয়া, শোভাসিংহ উড়িষ্যার আফগান দলপতি 'নাককাটা' রহিম খাঁকে তাঁহার সাহায্যার্থে আহ্বান করেন।[১] ওসমানের পতনের পর হইতে পাঠানদিগের দর্প একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। এই সময়ে রহিম খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন পাঠান সর্দার, তখনও বঙ্গদেশের মধ্যে আফগান জাতিকে সজীব করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা এই সমস্ত সর্দারদের অধীন হইয়া সময়ে সময়ে বঙ্গের শান্তিময় প্রদেশসমূহে দলবদ্ধভাবে প্রবেশ করিয়া ডাকাতের মত মোগল বাদসাহের প্রজাবর্গের ধনসম্পত্তি লুটপাট করিত। রহিম খাঁ এই দলপতিদের অন্যতম।

শোভাসিংহের আহ্বানে, লুণ্ঠনপ্রয়াসী রহিম খাঁ তাঁহার সহিত সানন্দে যোগদান করিল। ইহাতে শোভাসিংহের দলপুষ্টি হওয়ায়, সে রহিম খাঁর সহিত একযোগে বর্ধমান আক্রমণ করে। রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত তাহাদের একটি সামান্য যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্ধমান-রাজ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েন। বিদ্রোহীরা বর্ধমান দখল করিয়া, রাজা কৃষ্ণরামের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া, তাঁহার পরিজনবর্গকেও বন্দী করিল। প্রবাদ এই, রাজা কৃষ্ণরামের পুত্র কুমার জগতরাম কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা রামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরে তথা হইতে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা অভিমুখে, নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট পলায়ন করেন।[২]

জগতরামের অতি দুর্ভাগ্য যে শান্তিপ্রিয় মোগল-রাজপ্রতিনিধি, নবাব ইব্রাহিম খাঁ প্রথম প্রথম এ ব্যাপারটা আদৌ সাংঘাতিক বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। নবাব সাহেব, তাঁহার চির-প্রিয় গোলেস্তাদি পুস্তকপাঠেই বেশী মনোযোগী। তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিগণ অসদুপায়ে অর্থলাভের চিন্তাতেই বিভোর। কাজেই এ বিদ্রোহ ব্যাপারটা নবাবের মনোযোগ আকর্ষণ করিল না। এদিকে বিদ্রোহীদলও নবাবের এ উদাসীনতায়, ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। বিদ্রোহের কথা নবাবের কানে তুলিলেই—তিনি বলিতেন, "এই অন্তর্বিপ্লব ব্যাপারটা অতি

চেতোয়া খরিদ করেন। কিন্তু বর্দার জমিদার ফতেসিংহের নিকট ঋণের দায়ে চেতোয়া বিক্রয় হইয়া যায়। শোভাসিংহের পিতা দুর্জয় (দুর্লভ?) সিংহ, ফতেসিংহের পুত্র কীর্তি সিংহের নিকট হইতে চেতোয়া উদ্ধার করেন। শোভাসিংহের আমলে বর্দা তালুকখানি তাঁহার হস্তগত হয়। শোভাসিংহ ক্রমে বর্ধিত প্রতাপ হইয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কৃষ্ণরাম রায় ইতিপূর্বে তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিশোধ কামনায় শোভাসিংহ জঙ্গল মধ্যবর্তী এক গুপ্তপথ দিয়া সহসা দামোদর তীরে উপস্থিত হন। কৃষ্ণরাম এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, কাজেই তিনি পরাভূত হন।—*Vide* Blochmann's Notes. Hunter's *Statistical Account of Bengal* Vol I. *Hooghly Past and Present*, p. 26.

১. কোন যুদ্ধে রহিম খাঁর নাসিকার কিয়দংশ কাটিয়া যাওয়ায় তিনি 'নাককাটা রহিম খাঁ' নামে পরিচিত ছিলেন।

২. ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণরাম রায় স্বীয় পুত্র জগতরামকে স্ত্রীলোকের বেশ পরাইয়া, স্ত্রীলোকদিগের আরোহণোপযোগী যানে কৃষ্ণনগরাধিপের নিকট পাঠাইয়া দেন। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশই তাহার প্রমাণ—

"তদানীমেব কৃষ্ণরাম রায়েন পরবলমায়াতীতি বিজ্ঞাতং স্বপরিবারস্য পলায়নাবসর কালোনাস্তি যুদ্ধসামগ্রীচ পূর্ব্বং ন কৃতা, ন উপায়া, স্বপরিবারস্য নাশো উপস্থিত ইতি চিন্তয়ন্ স্বপুত্রং জগদ্রামনামাণং স্ত্রীবেশধারিণাং কৃত্বা স্ত্রীণামারোহণযোগ্য যানেন পরবলৈরনুপলক্ষিতং রামকৃষ্ণ রায়স্য সন্নিধৌ কৃষ্ণনগরে প্রেরয়ামাস।" কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা রামকৃষ্ণ রায়, জগতরামকে তাঁহাদের মাটিয়ারির বাটিতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে জগতরাম ঢাকায় বা জাহাঙ্গীরনগরে গমন করেন। নিখিল নাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পাদটীকা পৃ. ২৯১।

রিয়াজ-উস্-সালাতিনে উক্ত আছে—'রাজা কৃষ্ণরামের জগত রায় নামক পুত্র একাকী পলায়ন করিয়া (বাঙ্গলার) রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরে গমন করিলেন।—রামপ্রাণ গুপ্তের রিয়াজের বঙ্গানুবাদ পৃ. ২১২।

উইলসন সাহেব বলেন—His (Krishna Ram) son Jagat Rai alone escaped to Dacca where he laid his complaints before the Nawab (Ibrahim Khan).—Wilson's ***Early Annals of the English in Bengal*** p. 147.

ঘৃণার বিষয়। এটা গ্রাহ্য না করিলেই বিদ্রোহীরা আপনা আপনিই থামিয়া যাইবে। অকারণ খোদার সৃষ্ট জীবের রক্তপাত করিয়া, তাহাদিগকে হত্যা করার ফয়দা কি?[১]

নবাবের এইরূপ মতিগতি দেখিয়া, ইউরোপীয়ান বণিকগণ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের উপায় বিধানে মনস্থ করিলেন। ইউরোপীয় বণিকগণ, আত্মরক্ষার্থে দেশীয়-সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ, ডাচ[২] ও ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ স্ব স্ব আশ্রয় স্থান সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন। এদিকে বিদ্রোহিগণও হুগলীর সন্নিহিত হইল।

দেশময় একটা মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ-নায়ক রহিম সা ও শোভাসিংহের অত্যাচারে, নিরীহ শান্তিপ্রিয় প্রজাকুল, বাড়ি-ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। চারিদিকে অত্যাচার, লুণ্ঠন, নরহত্যা, আর্তের চীৎকার ও শোণিতপাতের ভীষণদৃশ্য প্রকটিত হইল। এতদিনের পর, নবাব ইব্রাহিম খাঁর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি বিদ্রোহী সামন্তদের দমনের জন্য যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁর প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন—"ব্যাপারটা বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। যে উপায়ে পার, বিদ্রোহীদের দমন কর।"[৩]

বহুদিন পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে লিপ্ত না থাকায় ও শান্তির ক্রোড়ে বিলাস-সুখমগ্ন হইয়া কেবলমাত্র ধনবৃদ্ধির চিন্তায় ও চেষ্টায় জীবনযাপন করাতে, নূরউল্লা খাঁ লড়াইয়ের ব্যাপার একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। নবাবের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, অগত্যা তিনি তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া যশোহর হইতে যাত্রা করিলেন।

নূরউল্লা হুগলীতে পেঁৗছিয়া দেখিলেন বিদ্রোহিগণ মহাবেগে হুগলী অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। নূরউল্লা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত হইবার আশঙ্কায় হুগলী-দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ বণিকগণের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু বিদ্রোহি-সেনারা তাহাতে দমিল না। তাহারা হুগলী-দুর্গ বেষ্টন করিল। এই আক্রমণের পরিণাম চিন্তায় ভীত হইয়া, ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ গোপনে যথাসর্বস্ব সেই দুর্গমধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া, ছদ্মবেশে কেল্লার গুপ্তদ্বার দিয়া নদীপথে পলায়ন করিলেন।[৪] বিদ্রোহী সৈন্য মোগলের হুগলী-দুর্গ

১. But His Highness was engaged with his books and His Highness's Commanders, intent upon making money, considered the matter of little importance, while they hesitated and delayed, the rebel force increased in numbers, marched upon Hugly and took it. Still His Highness remained inactive. He could only repeat that civil war was a dreadful evil and that the rebels, if let alone, would soon disperse. What is the use then of fighting? Why should he want only to destroy the lives of God's creatures? Why could he not be left to read Gulistan in peace?—Wilson's ***Early Annals of the English in Bengal, The Rebellion of Cubhasing*** p. 147.

২. 'ডাচ্' কথাটির পরিবর্তে 'ফরাসী' পড়িতে হইবে।

৩. রিয়াজে উল্লিখিত আছে, এই নূরউল্লা যশোহর, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর, চাকলার ফৌজদার ছিলেন। তাঁহার অধীনে তিন হাজার সৈন্য ছিল। ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেবের যশোহর বিবরণীতে প্রকাশ—'১৭৯৮ খ্রী. অব্দে নূরউল্লার প্রপৌত্র হিদায়ৎউল্লা ও রহমতউল্লা নামক দুইজন অশীতিবর্ষ বয়স্ক দেশীয় বৃদ্ধ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট পেন্সনের দাবী করিয়াছিলেন। কথিত আবেদন পত্রে, নূরউল্লা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের 'দুধভাই' বলিয়া উল্লিখিত। সম্ভবত নূরউল্লার মাতা, ঔরঙ্গজেবের শিশুকালের ধাত্রী ছিলেন। এই সম্বন্ধের জোরেই নূরউল্লার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে কেবল ফৌজদারির কর্তা ছিলেন তাহা নহে—বাণিজ্য-ব্যবসায় ছাড়াও প্রচুর ধনোপার্জন করিয়াছিলেন। কপোতাক্ষ নদীর তীরে তিনি মির্জানগরে অবস্থিতি করিতেন। এখনও তথায় তাঁহার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। এখনও লোকে, তাহাকে 'নবাব-বাটি' বলিয়া থাকে। তাঁহার নাম হইতে নূরনগর পরগনার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত নূরনগরে অদ্যাপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য, রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। নূরউল্লার সময়ে মির্জানগর, যশোহর ফৌজদারির প্রধান স্থান ছিল, এখন ইহা একটি সামান্য গ্রাম মাত্র।—রিয়াজ-উস্-সালাতিন, পৃ. ২৯২, রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ।

৪. রিয়াজে উল্লিখিত আছে—'নূরউল্লা ধনরত্ন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাণরক্ষা করিতে পারাই সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এবং তজ্জন্য একমাত্র ল্যাঙ্গট্ পরিধান করিয়া রাত্রিযোগে কতিপয় সহচরের সহিত বহুকষ্টে নদীপার হইয়া কেবল নাক-কান লইয়া পলায়ন করেন।'

দখল করিয়া লুণ্ঠন করিল। ইহাতে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। নগরবাসিগণ ও ব্যবসায়িগণ তাহাদের যথাসর্বস্ব নাশের ভয়ে চুঁচুড়ায় আসিয়া ওলন্দাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। ওলন্দাজ বণিকদিগের অধ্যক্ষগণ এই সময়ে কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য, দুইখানি জাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দুর্গের নিম্নে উপস্থিত হইলেন।

হুগলী অতি সহজে বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল দেখিয়া ইংরাজ, দিনেমার ও ওলন্দাজ বণিকগণ চিন্তিত হইয়া, এদেশীয় সেপাহী সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব সেনাদল বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল, তাহা লোপ হইল। ইউরোপীয় বণিকগণ নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট আবেদন করিলেন—"মোগল সরকারের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া বিদ্রোহিগণ তাঁহাদেরও শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। সুযোগ পাইলেই তাহারা তাঁহাদের বাণিজ্যাগার লুণ্ঠন করিবে। এরূপ অবস্থায়, নবাব যদি তাহাদের দুর্গনির্মাণের অনুমতি না দেন, আত্মরক্ষার উপায় করিতে না দেন, তাহা হইলে তাহাদের অতিশয় বিপন্ন হইতে হইবে।"

বলা বাহুল্য, নবাব ইব্রাহিম খাঁ তাঁহাদের এ আবেদন অগ্রাহ্য না করিয়া দুর্গনির্মাণের সম্মতি দিলেন। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ আপনাদের কুঠির চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া চারিকোণে বুরুজ ও মিনারাদি তুলিলেন। চুঁচুড়া, চন্দননগর, সুতালুটিতে এইরূপে দুর্গনির্মাণের সূত্রপাত হইল।১

বিলাতের কর্তারা এতদিন যে সঙ্কল্পের পরিপোষকতা করিতেছিলেন, কলিকাতার ইংরাজকুঠির অধ্যক্ষগণ বহুদিন পোষিত যে বাসনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া জোব চার্নক সমাধিগর্ভে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা এই উপযুক্ত অবসরে কার্যে পরিণত হইল। ভারতে ইংরাজের রাজশক্তির প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সমস্ত ইউরোপীয়গণই সেই ভীষণ সময়ে, এদেশীয় বিপন্ন লোকদিগের প্রধান সহায় ও বিপদে রক্ষাকর্তা বলিয়া বিবেচিত হইল। ইংরাজদের কুঠি সুরক্ষিত হইতেছে দেখিয়া, একজন এদেশীয় রাজা তাঁহাদের কুঠিতে ৪৮ হাজার টাকা গচ্ছিত রাখেন। ১৬৯৭ খৃস্টাব্দে সুতালুটি দুর্গনির্মাণের কার্য অনেকটা অগ্রসর হয়।

এখন বিদ্রোহ কাহিনীই বিবৃত করিব। নবাব ইব্রাহিম খাঁ, 'কিছুই না' বলিয়া যতই নিশ্চিন্ত হউক না কেন—ইহার ফলে দেশব্যাপী হাহাকার উঠিল। বিদ্রোহিগণ হুগলী দখল করিয়া সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিল। হুগলী সহর ও সহরতলির আমির ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগন এবং পার্শ্ববর্তী স্থানের বণিকগণ, ধন ও দ্রব্যাদিসহ নিরাপদ স্থান চুঁচুড়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ওলন্দাজগণ এই বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা অস্ত্রশস্ত্রাদিপূর্ণ দুইখানি জাহাজ সৈন্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া, হুগলী দুর্গের নিম্নে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহিগণ ওলন্দাজদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া, দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া যেমন জাহাজ দুইখানির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিতেছে, অমনি ওলন্দাজগণের কামান ও বন্দুকের গোলাগুলি আসিয়া, তাহাদের উপর নিপতিত হইল।২

শোভাসিংহ এই ব্যাপারে ভয় পাইয়া হুগলী দুর্গ ত্যাগ করিয়া সপ্তগ্রামে উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে রহিম খাঁকে নদীয়া ও মুখসুদাবাদ (মুরশিদাবাদ) লুণ্ঠনের জন্য পাঠাইয়া দেয় এবং নিজে পুনরায় বর্ধমানে উপস্থিত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, শোভাসিংহ বর্ধমানাধিপ রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের পরিবারভুক্ত বালক-

১. দুর্গগুলির নাম যথাক্রমে Fort Gustavus (চুঁচুড়া), Fort Orleans (চন্দননগর) এবং Fort William (সুতালুটি)।

২. রিয়াজ-উস্-সালাতিন, নিখিল নাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, Stewart's *History of Bengal*, Wilson's *Early Annals of the English in Bengal*.

বালিকা ও রাণীকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল।১ বর্ধমান রাজকুমারী পরমা সুন্দরী ছিলেন। পিশাচ শোভাসিংহ তাঁহার কমনীয় রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হয়। বহুবিধ চেষ্টার পর, রাজকুমারীকে করায়ত্ত করিতে অক্ষম হওয়ায়, পাপিষ্ঠ একদিন গভীর নিশীথে গুপ্তভাবে রাজকুমারীর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে। রাজকুমারী এই অতর্কিত বিপদ দৃষ্টে ভয়ব্যাকুলা হইয়া উঠেন। তবে তিনি আত্মরক্ষার জন্য, পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় ভাবিয়া, একখানি তীক্ষ্ণধার-ছুরিকা, তিনি তাঁহার বক্ষবস্ত্র মধ্যে লুক্কায়িত রাখিতেন। শোভাসিংহ কামমোহিত চিত্তে, যেমন তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাইবে, অমনি রাজকুমারী তাঁহার বসনমধ্যে লুক্কায়িত ছুরিকাখানি বাহির করিয়া, দুর্বৃত্তের নাভিমূলে বসাইয়া দিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করেন। দুরাচার বিদ্রোহী এই আঘাতে ভূপতিত হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাহার মৃত্যু ঘটে। রাজকুমারীও নিজের পরিণাম চিন্তায় অধীরা হইয়া, সেই ছুরিকা বক্ষ মধ্যে প্রোথিত করিয়া আত্মহত্যা করেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ যে রাজ-বিদ্রোহীর কিছুই করিতে পারেন নাই, নূরউল্লা খাঁ যাহার ভয়ে হুগলী হইতে পলায়ন করেন, সেই দুরাত্মার নিপাত সাধন এক বঙ্গীয়া রমণীর হস্তেই হইল।

শোভাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হিম্মতসিংহ, বিদ্রোহীদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। রহিম খাঁ এই সময়ে রহিম সা উপাধি ধারণ করিয়া দেশলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। কতগুলি মুর্খ বদমায়েস ও নীচাশয় লোকের সহায়তা লাভে সেনাবল বৃদ্ধি করিয়া, বর্ধমান হইতে রাজমহল পর্যন্ত ভূভাগ করায়ত্ত করিল। ইহার ফলে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গব্যাপী একটা দারুণ হাহাকার উঠিল। প্রজাগণ বিদ্রোহীদের অত্যাচারে ও লুণ্ঠনের জ্বালায় জর্জরিত হইয়া নানাদিকে পলাইতে লাগিল।

রহিম সার যথেষ্ট আয় এবং পরাক্রমও বেশী। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায়, যে তাহার বার্ষিক আয় ষাট লক্ষ টাকা এবং পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা বার হাজার ও অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল। রিয়াজের বৃত্তান্তানুসারে, রহিম সা বর্ধমান হইতে রাজমহল পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট সাহেবের মতে, রহিম সা মেদিনীপুর হইতে বর্ধমান পর্যন্ত স্থানগুলি অধিকার করেন, উল্লিখিত আছে।২

দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক যিনি, প্রজার রক্ষা করিবার ভার যাঁহার হস্তে ন্যস্ত, যিনি এই বিশাল বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি সেই নবাব ইব্রাহিম খাঁ তখনও নিশ্চেষ্ট। জেলার পর জেলা, নগরের পর নগর, পরগনার পর পরগনা, যে বিদ্রোহীদের হস্তগত হইতেছে—আর্তের আর্তনাদে দেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার রক্ষাধীনে ন্যস্ত প্রজাকুলের সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইতেছে, চারিদিকে দারুণ হাহাকার—তবু তিনি সুখ নিদ্রায় নিমগ্ন। তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ ও অমাত্যবর্গ এই সময়ে তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে

১. এ সম্বন্ধে একটু মতান্তরও আছে। "Krishnaram being thus taken quite unaware and finding no means of escape secretly sent away his son Jagat Ram to the Court of Ram Krishna, the Raja of Nadia, while he (Krishnaram) in right Rajput fashion slew the females of his family in order to avoid their falling into the hands of the enemy. After this horrible deed has been done by Krishnaram, Shobha Sing with his army entered the city, and in the battle which ensued defeated and killed him."—ইহার মর্মার্থ এই, রাজা কৃষ্ণরাম শোভাসিংহের অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হইয়া, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে শত্রুহস্তে না পড়ে, তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বহস্তে হত্যা করেন। যে রাজকুমারী পরে শোভাসিংহের হস্তে পতিত হন, তিনিই কোনরূপে লুকাইয়া এ হত্যাকাণ্ড হইতে আত্মরক্ষা করেন।—Day's ***Hooghly Past and Present***, p. 36.

২. The country in possession of rebels were estimated at sixty lacs of Rupees per annum and that their force consisted of 12000 cavalry and 32000 infantry.—Governor Sir Charles Eyer's Letter dated Dec, 1696, ***East India Records***. Vol XIX, p. 26.

বিশেষ কোন ফল হইল না। রহিম সা হুগলী হইতে মুখসুদাবাদে উপস্থিত হইল। মুখসুদাবাদ প্রদেশের কয়েকজন জমিদার এই বিদ্রোহিগণের পক্ষাবলম্বন করিলেন। এতন্মধ্যে ফতেসিংহের জমিদারগণই প্রধান। ফতেসিংহের তদানীন্তন জমিদার, সবিতা রায়ের বংশোদ্ভব ঘনশ্যামের পুত্র জগৎ, কালু প্রভৃতি অতি দুর্দান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা রহিম সার সহিত যোগদান করিয়া, অনেক স্থানে লুটপাট ও উপদ্রব আরম্ভ করে। রহিম সা মুখসুদাবাদের দিকে অগ্রসর হইয়া, তথাকার জায়গীরদার নেয়ামত খাঁকে তাহার সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন।[১]

নেয়ামত খাঁ মোগল রাজকর্মচারী। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "সম্রাটের প্রজা আমি। তুমি রাজবিদ্রোহী। আমি তোমার কোন সহায়তা করিব না।" রহিম সা নেয়ামত খাঁর শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিল। নেয়ামত খাঁ মৃত্যু অবধারিত জানিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র তাহওয়ার (তাহওয়ার অর্থে—বীরপুরুষ) অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক, বিপুল বিক্রমে বিদ্রোহী সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে বীরপ্রবর তাহওয়ার মৃত্যুমুখে পতিত হন। নেয়ামত খাঁ এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়া, মহাক্রোধে উত্তেজিত ভাবে শত্রুব্যূহ মধ্যে বিনা যুদ্ধসজ্জায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শাণিত অসির ভীষণ আঘাতে অনেক পাঠান ইহলোক ত্যাগ করিল। অবশেষে নেয়ামত খাঁ রহিম সাকে আক্রমণ করেন। তিনি রহিমের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারির আঘাত করিলেন বটে, কিন্তু তাহার লৌহময় শিরস্ত্রাণের উপর পড়িয়া তাঁহার তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল। নেয়ামত খাঁ নৈরাশ্যজনিত ভীষণ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া বলপ্রয়োগে রহিমের কটিদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিয়া তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বাহুবলে উত্তোলনপূর্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে অশ্ব হইতে ক্ষিপ্রতার সহিত লম্ফ দিয়া, তাঁহার প্রশস্ত বক্ষোপরি উপবেশন পূর্বক কটিদেশ হইতে 'যমধর'[২] নামক অস্ত্র খুলিয়া লইয়া তাহার গলদেশে ভীষণ আঘাত করিলেন। এবারও 'যমধর' বর্মের সঙ্গে জড়াইয়া যাওয়াতে রহিম সার কণ্ঠ ছিন্ন হইল না। এই অবসরে রহিম সার সেনারা তথায় উপস্থিত হইয়া, নেয়ামত খাঁকে তরবারি ও বর্শার আঘাতে আহত করিল। তিনি অকর্মণ্য হওয়ায়, শত্রুসৈন্য তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর তাহারা তাহাদের দলপতিকে ভূতল হইতে উত্তোলন করিয়া, তাহাকে পুনর্জীবন দান করিল এবং আহত নেয়ামত খাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় শিবিরে লইয়া গেল। তখনও বীরপ্রবর নেয়ামতের প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। তিনি পিপাসিত হইয়া জলের জন্য চক্ষু উন্মীলন করিলেন। জনৈক শত্রুসৈন্য তাঁহার নিকট জলপূর্ণ পাত্র আনয়ন করিল। কিন্তু তিনি শত্রুহস্তে জলপান করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, পিপাসিত অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই যুদ্ধে বীরপ্রবর নেয়ামত খাঁর পক্ষে অনেক সৈন্য নিহত হয়। রহিম সার সেনাগণ তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে। তৎপরে বিদ্রোহীসৈন্য মহাদম্ভভরে মুখসুদাবাদে উপনীত হয়। মুখসুদাবাদে উপস্থিত হইয়া তাহারা পাঁচ হাজার বাদসাহী-সেনাকে পরাজিত করে। নগর লুণ্ঠন ও পাশবিক অত্যাচার দ্বারা একটা মহা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া, বিজয়ী বিদ্রোহীদল

---

১. "ঘনশ্যামসুতা জ্ঞেয়শ্চত্বারো গুরুসাহসাঃ। সভাসিংহ গণো ভূত্বা জগদাদিজগৎপতিম।
জগৎ কালুশ্চ বেণীশ্চ কৃষ্ণরামশ্চ বিশ্রুতঃ॥ বিশ্বেশ্বরং বিরুদ্ধৈব প্রায়ো রাজাচ্যুতোঽভবৎ॥"

—পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকা।

ঘনশ্যামের চারিপুত্র—জগৎ, কালু, বেণী ও কৃষ্ণরাম অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিল। জগৎ প্রভৃতি শোভাসিংহের বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়া জগৎপতি সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করায় প্রায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল। তাঁহাদের জমিদারি বাজেয়াপ্ত হইলে অনেক দরবারের পর তদ্বংশীয়েরা উক্ত জমিদারি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।—নিখিল নাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস পৃ. ২৯৮।

২. মৎস্যাকৃতি একপ্রকার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রবিশেষ।—Stewart's *History of Bengal.* রিয়াজ-উস্-সালাতিন ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হয়। কাশিমবাজারের দেশীয় ব্যবসায়িগণ ভীত হইয়া বিদ্রোহী সেনানায়কের নিকটে কৃপা ভিক্ষা করায়, তাহারা কাশিমবাজার লুণ্ঠন সঙ্কল্প ত্যাগ করে। বিদ্রোহীদের নিকট এইরূপ হীনতা স্বীকার করার জন্য, কাশিমবাজারের প্রধান সওদাগর গোলাচাঁদকে পরে অনেক টাকা বাদসাহ সরকারে জরিমানা দিতে হয়।

এই সময় একদল বিদ্রোহী সৈন্য, সুতালুটির দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা মধ্যপথে কয়েকখানি গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল। পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের জমিদারগণ একযোগে মিলিত হইয়া, বিদ্রোহীদের মধ্যে ৯০ জনকে নিহত করেন। আর একদল বিদ্রোহী, মোগলের পূর্বকথিত 'থানা' দুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। হুগলীর ফৌজদারের অনুরোধক্রমে এই সময়ে সুতালুটির ইংরাজ-কাউন্সিল, থানা-দুর্গের রক্ষার্থে দুইখানি জাহাজ প্রেরণ করায়, বিদ্রোহিগণ ভয় পাইয়া সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

এই সময়ে ইউরোপীয় বণিকগণ মহোৎসাহে ও বিশেষ তৎপরতার সহিত তাঁহাদের দুর্গনির্মাণ কার্যে অগ্রসর করিয়া দেন। চুঁচুড়া, চন্দননগর ও সুতালুটি, তিন স্থানেই সমানভাবে রাত্রিদিন ব্যাপিয়া কাজ চলিতে লাগিল। ইংরাজেরা তাঁহাদের কলিকাতার দুর্গের একদিকের প্রাচীর পরিখা ও বুরুজ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া ফেলিলেন।[১]

বিদ্রোহিগণ ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে, রাজমহল হইতে মালদহ পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগ করায়ত্ত করিয়া বসিল। মালদহে ইংরাজ ও ডাচদিগের কুঠি ছিল। এই দুইটি কুঠি লুণ্ঠন করিয়া তাহারা যথেষ্ট লাভবান হয়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই বিদ্রোহ ঘটনার কথা সরকারি 'সওয়ানে নেগার' পত্রে প্রথমে জানিতে পারেন।[২] তিনি বাঙ্গলার শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁর এই নিশ্চেষ্ট ব্যবহারে তাঁহার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার পৌত্র আজিমওশ্বানকে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁর উপর আদেশ হইল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সাহজাদা আজিমওশ্বান বঙ্গের রাজধানীতে উপস্থিত হন, ততক্ষণ পর্যত তিনি স্বকার্যেই থাকিবেন। তাঁহার পুত্র জবরদস্ত খাঁ মোগল বাহিনীর অধিনায়করূপে বিদ্রোহিগণকে দমন করিবেন। এতদ্ভিন্ন এই বিদ্রোহ দমন কার্যে সহায়তা করিবার জন্য অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বিহার প্রদেশের শাসনকর্তাদের উপর আদেশ প্রচারিত হইল।

জবরদস্ত খাঁ বহুদিন হইতেই তাঁহার পিতার এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে সম্রাটের আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, তিনি অসংখ্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সেনা লইয়া, রহিম সার দমনের জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার এই প্রকাণ্ড বহরের সঙ্গে জলপথে কতকগুলি রণতরীও চলিল।

এই সময়ে রহিম সার হস্তে প্রচুর অর্থ আসিয়া পড়ায়, সে বলদর্পিত হইয়া সেনাদল বৃদ্ধি করিতে থাকে। এক রাজা বা রাজপুত্রের যেরূপ ঐশ্বর্যময় অবস্থায় থাকা উচিত—সে সেইরূপ চালই আরম্ভ করে। রহিম সা যখন শুনিল সম্রাট-সেনা তাহার বিরুদ্ধে ঢাকা হইতে অগ্রসর হইতেছে, তখন সে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভগবানগোলায় ছাউনী স্থাপন করিল।

জবরদস্ত খাঁ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি অতি ধীরভাবে অগ্রসর হইতে

১. In the meantime the Europeans worked day and night in fortifying their factories at Chinsura, Chandernagore and Chuttanutty, at the latter place, the English constructed regular bastions, capable of bearing cannon, but to avoid giving offence, the embrasures were filled up on the outside, with a wall of single brick.—Stewart's *History of Bengal*, 1813 Ed. p. 334.

২. সেকালের বাদসাহদিগের একশ্রেণীর কর্মচারী ছিল, তাহাদের 'সওয়ানে নেগারে' বলিত। ইহারা সরকারী সংবাদপত্র লেখক। প্রত্যেক প্রধান শাসনকেন্দ্রেই এইরূপ 'সওয়ানে নেগার' থাকিতেন। তাঁহারা দেশের কোথায় কি হইতেছে তাহার সংবাদ সরাসর বাদসাহ সরকারে প্রেরণ করিতেন।

লাগিলেন। একদল গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সেনাকে, তিনি বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্রস্থল রাজমহল ও মালদহে পাঠাইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। রাজমহলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাঠানসর্দার ঘিরেট খাঁ নিহত হন। মোগলপক্ষ রহিম সা কর্তৃক লুণ্ঠিত অনেক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করেন। এই সম্পত্তির মধ্যে, দিনেমার ও ইংরাজদের কুঠির জিনিসপত্রও ছিল। ইংরাজগণ জবরদস্ত খাঁর নিকট সেগুলি ফিরাইয়া চাহিলেন। কিন্তু জবরদস্ত খাঁ বলিলেন, "নবাবের হুকুম ব্যতীত আমি এগুলি আপনাদের প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না।" কাজে কাজেই ইউরোপীয় বণিকগণ নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

এইবার জবরদস্ত খাঁ শত্রু শিবিরের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র যুদ্ধ জাহাজগুলি শত্রুসৈন্যকে বাধা দিবার জন্য নদীবক্ষেই রহিল। তিনি কেবলমাত্র গোলন্দাজ ও পদাতিক সেনা লইয়া, রহিম সার দলকে আক্রমণ করিলেন। প্রথম দিনটা গোলাবর্ষণেই কাটিয়া গেল। অনেক পর্টুগীজ গোলন্দাজ, এই সময়ে মোগল সম্রাটের তোপখানায় চাকরি করিত। তাহারা ক্রমাগত গোলাবর্ষণ দ্বারা, শত্রুপক্ষের কয়েকটি কামান দখল করিল। পরদিন প্রভাতে, উভয় পক্ষীয় সেনাই প্রকাশ্য স্থলে যুদ্ধার্থে সমবেত হয়। মোগলপক্ষই প্রথম আক্রমণ করেন। কয়েক ঘন্টাব্যাপী যুদ্ধের পর, বিদ্রোহিগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। মোগলেরা পুনরায় রহিম সার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়।

জবরদস্ত খাঁ সেই রাত্রি যুদ্ধক্ষেত্রেই অতিবাহিত করিলেন। উভয় পক্ষের আহত বন্দীদিগকে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করেন। যাহারা যুদ্ধে দেহ বিসর্জন করিয়াছিল, তাহাদের সমাধিকার্যও এই রাত্রে শেষ হইয়া যায়।

পরদিন প্রভাতে, জবরদস্ত খাঁ তাঁহার যুদ্ধ শিবির হইতে বঙ্গ বিহারের জমিদার ও জায়গীরদারদের নিকট এক পরোয়ানা পাঠাইয়া দেন। তাহাতে এই আদেশ ছিল—"সম্রাট-সৈন্য বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছে। সমস্ত জায়গীরদার ও জমিদারের আদেশ করা যাইতেছে—যেন তাঁহারা বিদ্রোহী পাঠানদিগকে কোনরূপ রসদাদি-দানে সাহায্য না করেন।"

এই আদেশপত্রের শুভফল দেখা দিল। বাদসাহী-সেনার বিজয় সংবাদ পাইয়া, সন্নিকটস্থ বড় বড় জায়গীরদারগণ জবরদস্ত খাঁর দলে, সেনাসমেত যোগদান করিলেন।

জবরদস্ত খাঁ এইবার মুখসুদাবাদের পথ ধরিলেন। বিদ্রোহীরা তখন এই স্থানেই সমবেত হইয়াছে। জবরদস্ত খাঁ নগরের পূর্বদিকের প্রশস্ত ময়দানে সেনা সমাবেশ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, পরদিন প্রভাতে রহিম সাকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা সহিল না। রহিম সা সেই রাত্রিতেই গঙ্গা পার হইয়া, বর্ধমানের দিকে পলায়ন করিল। সম্রাট-সৈন্য বর্ধমান পর্যন্ত বিদ্রোহীদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাহাদের বর্ধমান হইতে তাড়াইয়া দিল এবং পুনরায় সেই ছত্রভঙ্গ পাঠান-সেনার অনুসরণ করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঘটনাস্রোত সহসা অন্যদিকে পরিবর্তিত হইল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার পৌত্র সাহাজাদা আলীগহর আজিমওশ্বানকে মুক্তা-খচিত তরবারিসহ, বিশেষ খেলাত, উন্নত মনসব, ও মাহিখেতাব দিয়া বাঙ্গলা ও বিহারের সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম খাঁ এই নিয়োগ সুবাদারিপদ হইতে বরতরফ হইলেন। আজিমওশ্বান স্বীয় পুত্র করিমউদ্দিন ও ফেরোকসিয়ারকে সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গদেশাভিমুখে গমন করেন। বাদসাহ-পৌত্র এলাহাবাদ ও আউধের (অযোধ্যা) পথ অবলম্বন করিয়া, অবিলম্বে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন।[১] তাঁহার সহিত দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা ছিল।

এলাহাবাদে পৌঁছিয়াই, সাহাজাদা অযোধ্যা ও বেনারস বিভাগের শাসনকর্তাদের আদেশ করিয়া পাঠান—"আমি বঙ্গদেশে বিদ্রোহদমনে যাইতেছি, আপনারা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র আমার

১. রিয়াজ-উস্-সালাতিন পৃ. ২১৯, রামপ্রাণ গুপ্তের অনুবাদ।

সহিত সসৈন্যে যোগদান করিবেন।" বেনারস ও বিহার প্রদেশের জমিদার ও জায়গীরদারদের উপরও এইরূপ আদেশ জারি হইল।

পাটনায় পেঁাছিবার পর, সাহাজাদা আজিমওশ্বান, জবরদস্ত খাঁর বিজয়কাহিনী অবগত হইলেন। দূরাকাঙ্খ রাজকুমার দেখিলেন—তিনি নিজে যে জয়মাল্য সুশোভিত হইয়া গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন, পিতামহ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নিকট যশোভাজন হইতে পারিতেন, তাহা জবরদস্ত খাঁর ভোগ্য হইতেছে। সাহাজাদা আত্মস্বার্থ ও সম্ভ্রমরক্ষার্থে জবরদস্ত খাঁকে নিষেধ করিয়া পাঠান—"আমি বর্ধমানে না পেঁাছান পর্যন্ত, আপনি যুদ্ধাদি ব্যাপারে ক্ষান্ত থাকিবেন।"

জবরদস্ত খাঁ একজন বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি সম্রাট-পৌত্রের এ আদেশের অর্থ বুঝিয়া, বিদ্রোহদমন ব্যাপারে নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিলেন। সাহাজাদা মুঙ্গের হইতে রাজমহল ও রাজমহল হইতে বর্ধমানের দিকে যাত্রা করিলেন। সম্রাট-পৌত্র বর্ধমানের সন্নিকটস্থ হইলে. জবরদস্ত খাঁ সসৈন্যে বহুদূর প্রত্যুদগমন করিয়া, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য অগ্রসর হন। রাজশিবিরে উপস্থিত হইয়া পদোচিত মর্যাদার সহিত সম্মানিত না হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, সুলতান আজিমওশ্বান তাঁহার এ প্রার্থনা পূরণে কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। তাঁহার মনের উদ্দেশ্যই এই, যে কোন উপায়ে জবরদস্ত খাঁকে বাঙ্গলা হইতে বিদূরিত করিতে পারিলেই, এই বিদ্রোহ দমনের সমস্ত যশোলাভ তাঁহারই হইবে। পিতার সহিত জবরদস্ত খাঁ দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নিকট চলিয়া গেলেন। ইহাতে আজিমওশ্বানেরই ক্ষতি হইল। কারণ জবরদস্ত খাঁর অধীনে যে আট হাজার সেনা ছিল, বাঙ্গলা ত্যাগ করিবার সময় তিনি তাহাদের সঙ্গে লইয়া গেলেন।

জবরদস্ত খাঁর ভয়ে রহিম সা আত্মগোপন করিয়া এখানে সেখানে পলাইয়া বেড়াইতেছিল। জবরদস্ত খাঁ বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া, সে আবার তাহার আশ্রয়স্থান হইতে বাহির হইয়া হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি প্রদেশে পুনরায় উৎপাত আরম্ভ করিল ও সেই সকল স্থান তাহার লুণ্ঠন-অত্যাচার দ্বারা জনশূন্য হওয়ায়, সর্প, পশু, পেচকের নির্জন আবাস স্থানরূপে পরিণত হইল।[১]

জবরদস্ত খাঁকে বিদায় করিয়া, সুলতান আজিমওশ্বান স্বাধীনভাবে কার্য আরম্ভ করেন। জমিদার ও সেনাপতিদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য ও তাহাদের আশ্বস্ত করিবার জন্য তিনি সম্রাটের আদেশপত্র ও রাজপতাকা জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং আকবরনগর হইতে যাত্রা করিয়া, সৈন্যবৃন্দের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশের সেনাপতি ও রাজপুরুষগণ নানাস্থান হইতে উপযুক্ত অর্থ ও উপঢৌকন সহকারে সাহাজাদার নিকট উপনীত হইয়া, তাঁহার সহগামী হইলেন। মন্দভাগ্য রহিম সা সাহাজাদার আগমন সংবাদ বিশ্বাস না করিয়া শত্রুর গতিরোধ জন্য সতর্ক হইল না, কিন্তু তৎপরে রাজসৈন্যকে সহসা সমাগত দেখিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে আফগানসেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। শত্রুসৈন্য তাঁহার গতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, সাহাজাদা ভীত না হইয়া রসদ ও মালপত্র সঙ্গে না লইয়া, তিনি বর্ধমান প্রান্তে উপনীত হইয়া শিবির সংস্থাপন করিলেন।

সাহাজাদা রহিম সাকে বলিয়া পাঠান—"যদি তুমি সহজে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমায় মার্জনা করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে তুমি সম্রাটের অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভ করিবে। কিন্তু যদি ইহার অন্যথা কর. তাহা হইলে তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" ইংরাজ গবর্ণর আয়ার সাহেব লিখিয়াছেন যে, "সাহাজাদা তাঁহার এই পত্র ও আদেশের সহিত কয়েদীদের

---

১. রিয়াজ-উস্-সালাতিন পৃ. ২২০, Stewart's *History of Bengal*, Original Ed. 1813.

বেড়ি ও একখানা তরবারি পাঠাইয়া দেন।"১

রহিম সা অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে সাহাজাদার সহিত চাতুরী খেলিল। বেড়ি ফিরাইয়া দিয়া, সে তরবারি গ্রহণ করিল এবং বলিয়া পাঠাইল—"আমি বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। অপরন্তু আপনার পক্ষেও আফগানদিগকে হাতে রাখা বুদ্ধির কার্য। আপনার পিতামহ ঔরঙ্গজেব বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য লইয়া একটা মহা হুলুস্থুল উপস্থিত হইবে। এ সময়ে আফগান-সৈন্য যদি আপনার হাতে থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলার ন্যায় একটি বিস্তৃত বিভাগ আপনার আয়ত্বাধীনে থাকিবে. আর আফগানেরাও আপনাকে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিবে। তবে আপনার নিকট সরাসরভাবে গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আমার সাহস হয় না। আপনি যদি আপনার প্রধানমন্ত্রী খাজা আনওয়ারকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সকল ব্যাপারের সুচারু মীমাংসা হইয়া যায়।"

আজিমওশ্বান পাঠান সর্দার রহিম সার কথায় বিশ্বাস করিয়া খাজা আনওয়ারকে কতিপয় সঙ্গীর সহিত তাহার শিবিরে পাঠাইয়া দেন।

আনওয়ার খাঁ সাহাজাদার আদেশ পালনার্থ, অসতর্কাবস্থায় কতিপয় আত্মীয় অন্তরঙ্গসহ. অশ্বারোহণে আফগান শিবিরের নিকটবর্তী হইয়া দূতদ্বারা আপন আগমনবার্তা রহিম সাকে প্রেরণ করেন এবং তাহার সাক্ষাৎলাভ জন্য, শিবিরের বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতে থাকেন। রহিম সা মোগল-সেনাপতিকে প্রবঞ্চিত করিবার জন্য, আফগান-সৈন্যদিগকে সুসজ্জিত ভাবে শিবির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল। রহিম সা নানারূপ ছলনা ও কৌশল অবলম্বন করিয়া, খাজা আনওয়ারকে শিবিরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করায় আনওয়ার আপত্তি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "ধূম হইতেও অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে।" তিনি রহিম সাকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি স্বচ্ছন্দে বাহিরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আপনার কোন আশঙ্কাই নাই।"

রহিম সা আনওয়ারের এ অনুরোধ রক্ষা না করিয়া, সুসজ্জিত সৈন্য সমভিব্যবহারে ব্যূহ হইতে বহির্গত হইয়া, অপ্রীতিকর বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে নবাব আনওয়ার খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাক্য-বর্ষণের পর, অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ হইল। মোগল-সেনাপতি এ নীচ জনোচিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ও তাহার আন্তরিক দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় আগমনোদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত রহিম সা, অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিল এবং তিনিও বাধ্য হইয়া বীরপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ক্ষুদ্র বিবাদের পরিণামে, আনওয়ার খাঁ কতিপয় সহচরসহ জীবন বিসর্জন করেন। ইহার পর রহিম সা রাজ শিবির আক্রমণ করে। এই কার্যে অগ্রসর হইবার পূর্বে, রহিম সা অতি সুকৌশলে ব্যূহ-রচনা করিয়াছিল। সম্রাট শিবিরের একদিক আক্রান্ত হইবার পর, রহিম সা মহা-বিক্রমে কতিপয় বর্শাধারী লৌহবর্মাচ্ছাদিত আফগান-যোদ্ধাসহ, রাজসৈন্যের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া, চীৎকারপূর্বক আজিমওশ্বানকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিল।

মোগল-অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ, সহসা এইভাবে আক্রান্ত হইয়া, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা আফগানদিগকে প্রচণ্ড অস্ত্রবর্ষণের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া, সাহাজাদাকে শত্রুর সম্মুখে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। রহিম সা মহাবিক্রমে, সুরচিত মোগল-ব্যূহ

১. It was reported that the Prince (Azim Ooshan) sent the rebel chief a pair of shackles and a sword desiring him to take his choice. that the rebel took the sword but sent a polite message to the Prince pointing out to him the great age of the Emperor, the contentions that must ensue upon his death and the favourable opportunity that was now presented to His Highness of securing for himself the rich province of Bengal by taking into his favour and service the Afgans whose friendship, he would ind out less servicable than their enmity would prove formidable—Sir Charles Eyer's Letter dated 6th January 1608, Stewart's ***History of Bengal***, p. 352.

ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিল ও তৎপরে আজিমওশ্বান যে হস্তীর উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল।

আজিমের জীবন মহা বিপন্ন অবস্থায় উপনীত দেখিয়া, তাঁহার একজন বিশ্বস্ত অনুচর কোরেশ-বংশীয় হামিদ খাঁ, প্রচণ্ডবেগে অশ্বচালনা করিয়া রহিম সার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "দুরাত্মা! আমিই আজিমওশ্বান। আমার সহিত যুদ্ধ কর।" এই কথা বলিয়া, হামিদ ক্ষিপ্রগতিতে ধনুকে তীরযোজনা করিয়া, রহিম সার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিল। তীর ব্যর্থ হইল না। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই আজিমের হস্তনিক্ষিপ্ত আর একটি তীর রহিম সার গ্রীবা বিদ্ধ করায়, রহিম সা ভূতলে পতিত হইল। হামিদ খাঁ ক্ষিপ্রগতিতে অবতরণপূর্বক তাহার বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া, শিরশ্ছেদন করিলেন। তৎপরে রহিম সার ছিন্নমুণ্ড তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে ঘূর্ণায়মান করিতে লাগিলেন। আফগান-সৈন্য এই ভীষণ ব্যাপার দেখিয়া, ভয়াকুলচিত্তে রণস্থল পরিত্যাগ করিল। আজিমওশ্বান যুদ্ধজয়ী হইলেন। রণবাদ্য মোগলের বিজয়বার্তা ঘোষণা করিল।

মোগলের অশ্বারোহী-সেনা পলাতক আফগান-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, তাহাদের শিবির পর্যন্ত অনুসরণ করিল। যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাদেরই বধ করিল। আফগানগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অসংখ্য বন্দী ও বিপুল ধনভাণ্ডার মোগলের হস্তগত হইল। বিজয়লক্ষ্মীর বরপুত্র সাহাজাদা জয়মাল্য সুশোভিত হইয়া, বর্ধমান নগরে উপনীত হইলেন এবং সমগ্র বাঙ্গলা বিহারের প্রজা, তাঁহাকে এই ভীষণ অত্যাচারময় বিদ্রোহ দমনের জন্য, দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিল। মহাপুরুষ হজরৎ-সাহ ইব্রাহিম ছাক্কার সমাধিমন্দির দর্শনান্তে, সাহাজাদা বর্ধমান দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই বিদ্রোহ-ব্যাপারের শেষাংশ বিবৃত করিবার জন্য, আমরা আবার রিয়াজের কাহিনী অনুসরণ করিতেছি। সাহাজাদা আজিমওশ্বান বর্ধমান হইতে পত্র প্রেরণ করিয়া, স্বীয় বিজয়বার্তা সম্রাটকে বিজ্ঞাপিত করিলেন। রহিম সার পক্ষাবলম্বন করিয়া যাহারা সম্রাট-শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহাদের শাসনের জন্য এইবার মনোযোগী হইলেন। মোগল-সৈন্যগণ যে স্থানে আফগানদের সন্ধান পাইল, সেই স্থানেই তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ বা বন্দী করিল। অত্যল্পকাল মধ্যেই হুগলী, বর্ধমান ও যশোহর জেলা আফগান-শূন্য হইল। আফগানদের অত্যাচারে যে সকল স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহ ও অত্যাচার শান্তির সঙ্গে সঙ্গে, তাহা আবার জনপূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙ্গলার যে সকল গৃহস্থ, শোভাসিংহ ও রহিম সার অত্যাচারে হুগলী, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলাইয়াছিল, তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়া গৃহকক্ষে দীপ জ্বালিল।

নিহত রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগতরাম রায়, পৈতৃক জমিদারি উত্তরাধিকার সূত্রে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। নূতন বন্দোবস্ত অন্তে, খালসা ও জায়গীর-মহল সমূহের কর আদায় হইতে লাগিল। তয়ুল, আয়মা, আলৃতমগা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জায়গীরদারগণ[১] আপন আপন মহলের ভার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার পৌত্রের জীবনরক্ষাকারী হামিদ খাঁকে, সমসের খাঁ উপাধি ও উচ্চমনসব দিয়া, শ্রীহট্ট ও বান্দাশালের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিলেন। যে সকল খাস কর্মচারী যুদ্ধকালে কার্যপটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারাও আপন আপন পদমর্যাদা ও পারদর্শিতানুসারে যথাযোগ্যরূপে সম্মানিত হইয়া মনসব প্রাপ্ত হইলেন।

---

১. রাজকার্য জন্ম বেতনের পরিবর্তে সেকালে নিষ্কর-ভূমি দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই ভূমির নাম তয়ুল। এতভিন্ন কার্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ অনেকে নিষ্কর-ভূমি পাইতেন। ইহাকেও তয়ুল বলিত। বিদ্বান, ধার্মিক, দরিদ্র, সদ্বংশজ দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগকে নিষ্কর ভূমিদানের নিয়ম ছিল। এই ভূমির নাম আয়মা ও আলৃতমগা। আলৃতমগা-ভূমি সম্বন্ধে উত্তরাধিকার ও দান বিক্রয়ের নিয়ম ছিল।—রিয়াজ-উস্-সালাতিন পৃ. ২২৪।

সাহজাদা আজিমওশ্বান বর্ধমানের দুর্গমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, এবং তথায় অট্টালিকার ভিত্তিপত্তন করিলেন। তাঁহার বর্ধমান বাসের স্মৃতিরক্ষার জন্য, তিনি বর্ধমানে একটি জুমা-মসজিদ ও হুগলীতে সাহগঞ্জ বলিয়া একটি গঞ্জ বা বাজার প্রতিষ্ঠা করিলেন। লোকে এই বাজারকে সাহগঞ্জ না বলিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে 'আজিমগঞ্জ' বলিয়া উল্লেখ করিত।

রাজস্ব সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন বন্দোবস্ত করেন। সে সব কথা বিশদ আলোচনার স্থান আমাদের নাই। সাহজাদা রাজকার্যেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। অবসর সময়ে, সম্ভ্রান্ত আমির-ওমরাহগণের সহিত মিলিত হইয়া, হদিস মসনবি ও মৌলানারুমের কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করিতেন। বিদ্বান, সদ্বংশজ ও কীর্তিমান ব্যক্তিগণের উপর তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। ধার্মিক ও সংসারবিরাগী সাধুগণকে তিনি অতি সম্মান করিতেন ও তাহাদের উপদেশ লইবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইতেন।

বর্ধমানে অবস্থানকালে, তিনি বায়েজিদ নামক জনৈক সুফী সাধু-ফকিরের যশের কথা শুনিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাতার্থে ব্যগ্র হন এবং তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আনিবার জন্য তাঁহার পুত্রদ্বয় সাহজাদা করিমউদ্দিন ও ফেরোকসিয়ারকে তাঁহার আস্তানায় প্রেরণ করেন। রাজকুমারদ্বয় সুফীর বাসভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদিগকে "সেলাম-আলেকম্" বলিয়া অভিবাদন করেন। সাহজাদা করিমউদ্দিন স্বভাবতই একটু গর্বিত। রাজোচিত পদমর্যাদার লাঘব হইবে বলিয়া, সুফীকে প্রত্যভিবাদন করেন নাই। কিন্তু রাজকুমার ফেরোকসিয়ার, নগ্নপদে তাঁহার নিকট সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করেন। তৎপরে পিতৃ-অভিলাষ ব্যক্ত করেন। ফকির ফেরোকসিয়ারের বিনয় নম্র ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহার হস্তধারণ করিয়া বলেন, "আসুন! আসন গ্রহণ করুন, আপনি হিন্দুস্থানের সম্রাট!" তৎপরে তিনি ঈশ্বর সমীপে তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা বিধাতার নিকট মঞ্জুর হইয়াছিল কারণ এই ফেরোকসিয়ারই ভবিষ্যতে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতঃপর ফকির রাজপ্রাসাদে গমন করিলে, আজিমওশ্বান যথোচিত নম্রতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় মনোভিলাষ পূরণ জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন।[১] ফকির প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "রাজকুমার! আপনার কাম্যবস্তু ইতিপূর্বেই ফেরোকসিয়ারকে দেওয়া হইয়াছে। করধৃত তীর একবার নিক্ষেপ করিলে তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না।" ইহার পর ফকির সাহজাদা আজিমওশ্বানকে আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন।

আজিমওশ্বানের বর্ধমানে অবস্থানকালে, চুঁচুড়ার দিনেমার বণিকগণের কর্তৃপক্ষ, তাঁহার নিকট একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এই দূত সাহজাদার নিকট আবেদন করিলেন—"ইংরাজেরা তাঁহাদের দ্রব্যাদির শুল্ক, বাৎসরিক তিন হাজার করিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু দিনেমারদিগকে শতকরা সাড়ে তিন টাকা হারে শুল্ক দিতে হয়। অতএব দিনেমারদিগের প্রার্থনা, যেন ইংরাজদের মত তাহাদের শুল্কের হার নির্দিষ্ট হয়।"

আজিমওশ্বান কর্মক্ষম হইলেও সকল কাজেই তিনি দীর্ঘসূত্রী ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য উৎকোচ, নজরানা প্রভৃতি হইতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করা। তিনি বঙ্গদেশ হইতে যত অর্থ লইয়া গিয়াছিলেন, এরূপ আর কোন শাসনকর্তাই পারেন নাই। কাজেই দিনেমারেরা তাঁহাদের আবেদনের আর কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না।

এদিকে ইংরাজ বণিকগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। যাহাতে দিনেমারেরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ চক্রান্ত না করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা মিঃ ওয়ালশকে বর্ধমানে পাঠাইয়া দেন। ওয়ালশ একজন উপযুক্ত কর্মচারী। ওয়ালশকে বর্ধমান প্রেরণের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটি এই, তিনি বর্ধমানে রাজ-প্রতিনিধির দরবারে সদলবলে উপস্থিত থাকিয়া, দিনেমারদের গুপ্ত-

১. Stewart's *History of Bengal*, p. 349. রিয়াজ-উস্-সালাতিন পৃ. ১২৬।

চক্রান্তে বাধা দিতে পারিবেন। দ্বিতীয়, কলিকাতা, সুতালুটি, গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করা তখন নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধেও বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। তৃতীয়, সাহজাদার নিকট নূতন নিশান বা অনুমতিপত্র প্রার্থনা করা—যাহার বলে বাঙ্গালার সর্বত্র, তাঁহারা বিনাশুল্কে অবাধে বাণিজ্য করিতে পারিবেন। চতুর্থ, শোভাসিংহের বিদ্রোহ-ব্যাপারে, মালদহের ইংরাজ-কুঠির যে মালামাল লুণ্ঠিত হইয়াছিল, যাহা তাহারা জবরদস্ত খাঁর নিকট চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করেন নাই, সেগুলিরও উপায় হইবে।

শোভাসিংহের বিদ্রোহই ইংরাজদের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর নিয়ামক। এ বিদ্রোহ উপস্থিত না হইলে, তাঁহারা 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। নবাব ইউরোপীয় বণিকদিগকে আত্মরক্ষার সম্মতি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অর্থ এরূপ নহে যে তাঁহারা পাকা-পোক্তভাবে কলিকাতায় দুর্গনির্মাণ করিবেন। এ সম্বন্ধে বাদসাহ ইতিপূর্বেই এক প্রতিকূল আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।১ তবে নবাব যাহা বলিয়াছিলেন তাহার অর্থ এই—কোম্পানি তাঁহাদের বাণিজ্যাগার রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিবেন। অথচ বাণিজ্যাগারটিকে সুদৃঢ় প্রাচীরাদিতে বেষ্টিত না করিলে, আত্মরক্ষার আর কোনরূপ উপায়ই নাই। কাজেই তাঁহারা দুর্গের ভিত্তিপত্তন করিয়া তাহার দেওয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিলেন।

দুর্গনির্মাণ কার্য অতি দ্রুতভাবে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটি ব্যাপারের জন্য কোম্পানি বড়ই ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ধরিতে গেলে যে স্থানের উপর তাঁহারা কুঠি ও দুর্গনির্মাণ করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা জায়গীরদারের সম্পত্তি। জায়গীরদার মোগল-সরকারে রাজস্ব দেন ও জমির দখলী-স্বত্ব তাঁহার। জমির উপর ইংরাজদের কোন কায়েমী-স্বত্বই নাই। তাঁহাদের স্থানত্যাগ করিতে বলিলেই, তখনই উঠিয়া যাইতে হইবে। হুগলীর ঘটনাটি তাঁহারা যে ভুলিয়াছিলেন তাহা নহে। এইজন্যই ইংরাজেরা সুতালুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর গ্রাম কয়খানি জায়গীরদারদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে মনস্থ করিলেন। তখন বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদারগণ এই গ্রাম তিনখানির মালিক। কিন্তু বঙ্গের শাসনকর্তার অনুমতি না পাইলে, তাঁহারা গ্রাম বিক্রয় করিতে সাহসী হইলেন না। এজন্য ইংরাজগণ বাধ্য হইয়া সুলতান আজিমওশ্বানের দরবারে ওয়ালশ সাহেবকে প্রেরণ করেন।

ওয়ালশ সাহেব ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, বর্ধমানে উপস্থিত হন। কিন্তু এই কার্যগুলি নিষ্পত্তির জন্য, তাঁহাকে সাতমাস কাল বর্ধমানে থাকিতে হয়। সুলতান আজিমওশ্বান তখন বিদ্রোহ-ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত সুতরাং এ বিষয়ে কোনরূপ মনোযোগ দেন নাই।

ষোলটি হাজার মুদ্রা ব্যয় করিয়া, কোম্পানি বাহাদুর এই গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার অনুমতিপত্র পাইয়া, সুতালুটিতে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু জমিদার সাবর্ণ মহাশয়েরা, এই আদেশপত্রে দেওয়ানের সহি না দেখিয়া বিক্রয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায়, এই সহি-ব্যাপার মীমাংসার জন্য, আরও কিছু সময় কাটিল। মোটের উপর, এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপার শেষ হইতে প্রায় বৎসরাধিককাল লাগিল। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানি, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদারের নিকট হইতে পুনরায় স্বাধীনভাবে বঙ্গের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্যের স্বত্বলাভ করিলেন।

কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুর গ্রাম তিনখানি কিনিবার অনুমতি পাইয়া, ইংরাজ কোম্পানি সাবর্ণ-জমিদার রামচাঁদ রায়, মনোহর রায় প্রভৃতির সহিত জমি ক্রয় সম্বন্ধে লেখাপড়া শেষ করিয়া ফেলিলেন।২

১. Wilson's *Early Annals*, p. 147. Stewart's *History of Bengal*, p. 342.

২. এই সময়ে বিলাতে আর একটি নূতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয়। এ কোম্পানির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন। নূতন কোম্পানির কর্তারাও বঙ্গে বাণিজ্য-স্বত্ব লাভের জন্য নানা চেষ্টা
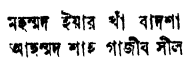
মহম্মদ ইয়ার খাঁ বাদশা
আহম্মদ শাহ গাজীব সীল

সৈয়দ আহম্মদ খাঁ বাহাদুব
দৌলত জং বাদশা শাহ
গাজীর সীল

কলিকাতা বিক্রয়ের দলিল
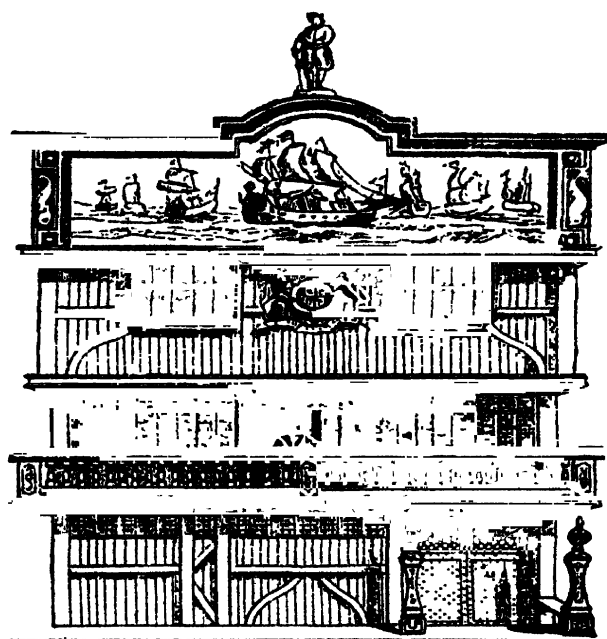
THE FIRST EAST INDIA HOUSE.

লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দপ্তর

যে বায়নামা বলে ইংরাজগণ কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের জমিদারি ক্রয় করেন, তাহার অবিকল ইংরাজী প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এ দলিলখানি অতি বহুমূল্য ও প্রাচীন ও এ পর্যন্ত কোন বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।[১]

Deed of Purchase or "Bainama" of the Three Towns Kalikata, Sutanutty and Govindpur

Copy of the deed of purchase[২] of the villages *Dihi Kalikata* &c. bearing the seal of the *qazi* and the signature of the *zamindars.* The details are as follows—

"We submissive to *Islam* declaring our names[৩] and descent ; *viz.* Manohar Dat[৪] son of Bas Deo, the son of Raghu, and Ramchand the son of Bidhyadhar, son of Jagdis;[৫] and Ram Bhadar, the son of Ram Deo, the son of Kesu[৬]; and Pran the son of Kalesar, the son of Gauri, and Manohar Singh, the son of Gandarb, the son of . . . ,[৭]; being in a state of legal capacity and in enjoyment of all the rights given by the law; avow and declare upon this wise; that we conjointly have sold and made a true and legal conveyance of the villages *Dihi Kalkatah* and *Sutaluti* within the jurisdiction of *parganah Amirabad* and village *Gobindpur* under the jurisdiction of *parganas Paeqan* and *Kalkatah* to the English Company with rents and uncultivated lands and ponds

করেন। এই লইয়া নূতন ও পুরাতন উভয় ইংরাজ কোম্পানির মধ্যে ভয়ানক বিবাদ বাধে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট বলেন—"It was during this period that the great contest between two English companies took place in Bengal. The Prince (Azim Oshan) did not understand the subject, but took bribes from both parties. From the Old Company he got Rupees 16000 and from the New Rupees 14000.

এই গ্রামত্রয় ক্রয় ব্যাপারে হুগলীর ভূতপূর্ব ফৌজদার জৈনউদ্দিন খাঁ ইংরাজ কোম্পানিকে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তিনি রাজকুমার ফেরোকসিয়ারকে রাজী করিয়া ১৬ হাজার টাকার নজরানা প্রদানে এই অনুমতিপত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। খোজা সরহদ বলিয়া একজন আর্মানীও এই ব্যাপারে ইংরাজদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই গ্রামত্রয়ই ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মী ও প্রথম জমিদারি। এই জমিদারির ভাগ্যবলেই বর্তমান বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য অর্জিত হইয়াছে।—A.K. Ray's *A Short History of Calcutta,* 2nd Ed. Ch. IV p. 29ff.

১. স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উইলসন সাহেব বহু চেষ্টায় এই পুরাতন দলিলের একটি প্রতিলিপি বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে সংগ্রহ করেন। কলিকাতার সেন্সস্ অফিসার শ্রী এ, কে, রায় মহাশয়কে তিনি সেই দলিলখানি ব্যবহার করিতে দেন। *History of Old Fort-William* গ্রন্থেও ইহার একটি প্রতিলিপি আছে। রায় মহাশয়ও ইহার একখানি লিপি দিয়াছেন। আমরা উভয়ের সহায়তা গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত পাঠটি উদ্ধৃত করিলাম।

২. The *Bainamah* is document No. 39 in additional M.S. No. 24039 in the British Museum, the translation of which by Mr. W. Irvine, C.S. retired, has been kindly given to us by Mr. C.R. Wilson. A.K. Ray's *A Short History of Calcutta,* 2nd Ed. p.67 F.N. No. 1.

৩. The names which follow, are the names of descendants of Lakshmikanta Mozumder.

৪. Manohar Dat is probably a mistake for Monohur Deo. In the pedigree, Mahadeva is the son of Basudeva who is the son of Raghudeva who was the son of Jagadis who was the son of Ram Rai, who was son of Lakshmikanta.

৫. Jagadis the grandson of Lakshmikanta as above.

৬. Kulesvara the son of Kesav Rama, son of Srimanta son of Gauri Rai son of Lakshmikanta.

৭. The blank probably stands for 'ditto' Gandharba being the son of Gauri Rai the son of Lakshmikanta as above.

and groves and rights over fishing and woodlands and dues from resident artisans, together with the lands appertaining thereto, bounded by the accustomed notorious and usual boundaries, the same being owned and possessed by us (up to this time the thing sold being in fact and in law free from adverse rights or litigation forming a prohibition to a valid sale and transfer) in exchange for the sum of one thousand and three hundred rupees, current coin of this time, including all rights and appurtenances thereof, internal or external; and the said purchase money has been transferred to our possession from the possession of the said purchaser and we have made over the aforesaid purchased thing to him and have excluded from this agreement all false claims, and we have become absolute guarantors that if by chance any person entitled to the aforesaid boundaries should come forward, the defence thereof is incumbent upon us; and henceforth neither we nor our representatives absolutely and entirely, in no manner whatsoever, shall lay claim to the aforesaid boundaries, nor shall the charge of any litigation fall upon the English Company. For these reasons we have caused to be written and have delivered these few sentences that when need arises they may be evidence. Written on the 15th of the month Jamadi I in Hijri year 1110, equivalent to the 44th year of the reign full of glory and prosperity."[১]

The date is the 10th November 1698 O.S.

কোম্পানি, জায়গীরদার সাবর্ণ মহাশয়দিগকে, এই তিনখানি গ্রামের জন্য জায়গীরদারের প্রাপ্য যে খাজনা দিয়াছিলেন তাহা কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তায় এখনও বর্তমান। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা মাত্র একটি বৎসরের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম। স্থানাভাবে অন্যগুলি পরিত্যক্ত হইল।

বৎসর	খাজনা গ্রহীতার নাম	কন্সলটেসান বহির তারিখ	মোট টাকা
১৭১৮ খ্রী. অব্দ	সুখদেব	১০—৪—১৭১৮	৩২৫
	রত্নেশ্বর	২৪—৪—১৭১৮	৩৩
	মহাদেব	১২—৫— „	৭০
	সুখদেব	১১—৮—১৭১৮	৩২০ ‖০
	বিনোদরাম	১৮—৮—১৭১৮	৩৭ ।৵
	মহাদেব	৯—১০— „	৭১
	সুখদেব	৮—১২— „	৩২৫
	বিনোদরাম	৬—১—১৭১৯	৩০
	„	„	৭০
			১২৮১ ৸৵০

পলাশীযুদ্ধের তিনবৎসর পূর্ব পর্যন্ত সময়ের হিসাব, এ কে রায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। স্থানাভাববশত, আমরা কেবল একটি বৎসরের বিবরণ, পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রদান করিলাম।

এক্ষণে আমরা পূর্ব কাহিনীর অনুসরণ করিতেছি। চার্নকের মৃত্যুর পর স্যার জন গোল্ডসবরা, কোম্পানির বাণিজ্যাগারসমূহের সর্বময় কর্তা হইয়া কলিকাতায় আসেন। ধরিতে গেলে, তিনি দুর্গের প্রথম ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান। গোল্ডসবরা যে স্থানটিকে দুর্গনির্মাণের

১. The date is equivalent to November 9, 1698.

উপযুক্ত বলিয়া নির্ধারিত করেন, তাহা 'ডিহি কলিকাতার' (Dhee Coliecotta) মধ্যে অবস্থিত ও ভাগীরথীতীরে ইহাই সর্বোচ্চ স্থান। চার্নক যে কয়খানি বাটি কোম্পানির কুঠির জন্য বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, তাহা এই স্থানের মধ্যেই অবস্থিত। ইহার দক্ষিণেই পূর্বোক্ত গোরস্থান।[1] নিকটেই বড়বাজার। এই বড়বাজার তখন বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ সেটেলমেণ্টের বা উপনিবেশের যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা বড়বাজার হইতেই পাওয়া যাইত।

তাহার পর শোভাসিংহের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ-ব্যাপারে দুর্গনির্মাণ কার্য সম্বন্ধে আরও সুবিধা হইল। নবাব ইংরাজ ফরাসী ও দিনেমার বণিকগণকে তাঁহাদের বাণিজ্যাগার রক্ষার আদেশ দিলেন। এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই, ভবিষ্যদ্দর্শী তীক্ষ্ণবুদ্ধি ইংরাজ-বণিকসম্প্রদায় মহোৎসবের সহিত দুর্গনির্মাণ কার্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠি 'গড়বন্দী' হইয়া অনেকটা নিরাপদ হইল।

দুর্গের প্রথম বুরুজ ও দেয়াল নির্মাণের কার্য, অতি দ্রুতভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়দের বড়ই ভয়, যে পাছে নবাব জানিতে পারিয়া দুর্গের নির্মাণ কার্য বন্ধ করিয়া দেন। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে দুর্গনির্মাণ কার্য এতদূর অগ্রসর হইল, যে কলিকাতার কর্তৃপক্ষীয়েরা মান্দ্রাজ হইতে দশটি কামান আনিয়া, বুরুজের উপর স্থাপন করিলেন। উক্ত বৎসর মে মাসে, তাঁহারা মাটির গুদাম-ঘরগুলিকে পাকা-কোঠায় পরিণত করিলেন। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দের রিপোর্ট হইতে প্রকাশ—"আমাদের কলিকাতার দুর্গ এরূপভাবে সুদৃঢ় হইয়াছে, যাহার সহায়তায় আমরা নবাবের বা ফৌজদারের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি।" দুর্গের চারিদিকের প্রাচীরগুলি পাকা ইটে ও উৎকৃষ্ট মসলায় তৈয়ারী হইয়াছিল।

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের পুরাতন কাগজপত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, এই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের[2] উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্বের বুরুজ ছাড়া আর দুটি বুরুজ ছিল। কিন্তু ঐ বৎসরে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া মহা বিবাদ উপস্থিত হয় ও দেশব্যাপী একটা মহা বিশৃঙ্খলা জাগিয়া উঠে। এই সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ইংরাজেরা নদীতীরের দিকের অসমাপ্ত বুরুজ দুইটির নির্মাণ কার্য শেষ করেন।

পাঠক, বর্তমান সময়ে একবার লালদীঘির নিকট কোন স্থানে দাঁড়াইয়া এই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম-এর আনুমানিক চিত্র,[3] মনোমধ্যে অঙ্কিত করুন। আমরা এই দুর্গের একখানি চিত্র এই পুস্তকের যথাস্থানে সংযোজিত করিলাম। ইহাই প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম। কিন্তু এই পুরাতন চিত্র হইতে একেবারে বিলুপ্ত সেই প্রাচীন দুর্গের প্রকৃত অবস্থান স্থান নির্ণয় করা অতি দুরূহ। বর্তমানে এইরূপ অসুবিধার আর কোন কারণ নাই। কারণ আমাদের ভূতপূর্ব প্রত্নতত্ত্বপ্রিয়, বড়লাট কার্জন বাহাদুর, পিত্তল-নির্মিত রেখা দ্বারা এই দুর্গাধিকৃত স্থানটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান ফেয়ার্লি-প্লেস হইতে এই চিহ্নের আরম্ভ ও কয়লাঘাট রাস্তায় ইহার শেষ।

আজকালকার বড় ডাকঘর ও তৎপার্শ্ববর্তী গবর্ণমেণ্ট আফিসসমূহের অধিকৃত স্থান,

---

১. সেণ্ট জন গির্জা সংলগ্ন পূর্বোক্ত গোরস্থান। চার্নকের ন্যায় গোল্ডসবরাও এখানে সমাহিত হন।

২. ইংলণ্ডের তদানীন্তন সম্রাট তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুসারে ১৭০০ খ্রী. অব্দ হইতেই পুরাতন দুর্গের এই নামকরণ হইয়াছিল। এখনও নূতন দুর্গ এ নামেই পরিচিত।

৩. পলাশী যুদ্ধের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ভারতে আসেন ইংরেজ চিত্রশিল্পী টমাস ড্যানিয়েল। ১৭৮৬-৮৮ সালে তিনি Twelve Views of Calcutta নামে যে খোদাই চিত্রাবলী প্রকাশিত করেন তার প্রথম চিত্রটির বিষয়বস্তু, 'The Old Fort Looking Towards, Clive Street', 1786. ইহাতে পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অঙ্কিত হইয়াছে।

কাস্টম হাউস ও ইস্ট-ইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানির সুবৃহৎ আফিসবাটির অধিকৃত ভূভাগোপরি, প্রাচীন 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গ নির্মিত হইয়া ছিল। দুর্গের দক্ষিণদিকে যে সমস্ত মালগুদাম বা Warehouse নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলি বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীটের সান্নিধ্যে ছিল। বর্তমান ফেয়ার্লি প্লেসই, এই দুর্গের উত্তরদিক। পশ্চিমদিকে ভাগীরথী, পূর্বদিকে বর্তমান ক্লাইভ স্ট্রীট ও ডালহাউসী স্কোয়ার ও লালদীঘি অবস্থিত। এই লালদীঘিই সেকালের কাগজ-পত্রে পার্ক (Park) বলিয়া উল্লিখিত।

দুর্গের বাহিরে, পূর্বদিকের দুর্গপ্রাচীরের অতি সান্নিধ্যেই, সেন্ট এ্যান্ নামক এক গির্জা ছিল। ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে এই গির্জা নির্মিত হয়। আজকাল যেস্থানে, ভূতপূর্ব লেফ্‌-টেনান্ট গবর্ণরদের কাউন্সিল-চেম্বার বা মন্ত্রণাসভাগৃহ বর্তমান, সেইস্থান অধিকার করিয়াই, এই 'সেন্ট এ্যান্ গির্জা' অবস্থিত ছিল। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই গির্জায় ইংরাজ উপ-নিবেশের কর্মচারিগণ ও কলিকাতার খ্রীস্টান অধিবাসিগণ ভজনাদি করিতেন।

১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে দুর্গের সম্মুখস্থ লালদীঘির পুকুরটির পঙ্কোদ্ধার করান হয়। এই লালদীঘির অবস্থা তখন এরূপ উন্নত ছিল না। পুকুরটি যত্নের অভাবে পঙ্ক-শৈবালাচ্ছাদিত হইয়া উঠিয়াছিল। তখন কলিকাতার মধ্যে উৎকৃষ্ট পানীয়জলের বড়ই অভাব ছিল। এইজন্যই লালদীঘির সংস্কার করান হয়। ইহার চারিদিকে কঙ্করমণ্ডিত ক্ষুদ্র পথ ও নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপন করান হয়। অন্যান্য গাছের মধ্যে কয়েকটি কমলালেবুর গাছও এই বাগানে ছিল। লাল-দীঘির জল অতি পরিষ্কার ছিল বলিয়া, ইংরাজ অধিবাসিগণ ইহার জল পান করিতেন। এতদ্ব্যতীত এই বাগানের একাংশে সব্জীবাগানও ছিল। নানাপ্রকার তরিতরকারি এই বাগানে উৎপন্ন হইত। কোম্পানির গবর্ণর ও তাঁহার কর্মচারিগণ, এই বাগানের তরিতরকারি ব্যবহার করিতেন। নানাবিধ ফলের গাছও এই লালদীঘিতে রোপিত হয়। এই লালদীঘির জল, পুকুরের মাছ, বাগানের ফল ও শাকসব্জীই, তখন কলিকাতা সেটেলমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের প্রধান উপ-ভোগ্য ছিল। তখন ইহার নাম ছিল—'Green before the Fort'। কোম্পানির ফ্যাক্টরেরা চন্দ্রা-লোকিত রাত্রে, এইস্থানে প্রকৃতির নৈশশোভা সন্দর্শনে ও বিমল বায়ুসেবনে তৃপ্ত হইতেন। কখন বা তাঁহারা পক্ষী ইত্যাদি শিকার করিয়া, আনন্দ উপভোগ করিতেন। সেকালের কাগজপত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই, বাগানটি পরিষ্কৃতভাবে রাখিবার জন্য, কোম্পানি মাসিক দশ টাকা করিয়া খরচ করিতেন। পুরাতন জমা খরচের খাতায় দেখিতে পাওয়া যায় "বাগানের শোভা-বর্ধন জন্য ৩৪৲ টাকা খরচ মঞ্জুর করা হইল। পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও শৈবালাদি পরিষ্কারের জন্য ২০৲ টাকা মঞ্জুর হইল।"[১]

কলিকাতার পুরাতন দুর্গের অবস্থাও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি দুর্গের উত্তর দিকের পরিসর ৩৪০ ফিট, দক্ষিণদিক ৪৮৫, পূর্ব-পশ্চিমদিক ৭১০ ফিট ছিল। চারিকোণে চারিটি বুরুজ করা হয়। প্রত্যেক বুরুজের উপর দশটি করিয়া কামান সাজান ছিল। পূর্বদিকের প্রধান দ্বারপার্শ্বে পাঁচটি কামান ছিল।

দুর্গপ্রাচীর চারি ফিট পুরু এবং ১৮ ফিট ঊর্ধ্ব ছিল। নদীর দিকটি আরও পাকা করিয়া নির্মাণ করা হয়। পাঠক মনে রাখিবেন, আজকাল যে স্থান 'স্ট্রাণ্ড রোড' বলিয়া পরিচিত ও যাহার উপর দিয়া এখন ট্রামগাড়ি চলিতেছে, তাহা তখন নদীগর্ভে ছিল। বর্তমান ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল-অফিসের উঠানের মধ্যে প্রবেশ করিলেই, এই দুর্গ পার্শ্ববাহিনী নদীর অবস্থান স্থান, অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নদীতীরের যে স্থান দিয়া সিরাজের সেনারা প্রবেশ করে—সেস্থানটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড কার্জন বাহাদুর নদীতীরবর্তী এই ঘাটের স্থানটি

১. *Calcutta Review,* Vol XVI II. *Consultation Book* Vol I. Captain Hamilton's *Accounts.*

নির্দেশ করিয়া, তথায় একটি প্রস্তর-ফলক মারিয়া দিয়াছেন। দুর্গের মধ্যে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ আকারের গৃহনির্মিত হয়। এ ঘরগুলি ততটা উচ্চ ছিল না। এগুলি সেকালে Long Row বলিয়া পরিচিত ছিল। কোম্পানির যুবক কর্মচারীরা, এই সকল গৃহে বাস করিতেন। দুর্গের উত্তরদিকে অস্ত্রাগার ও বারুদখানা। এই অস্ত্রাগারের নিকট মালগুদাম, চিকিৎসালয় ও কারখানা ছিল। দুর্গের দক্ষিণদিকে দুইটি ফটক ছিল। এই ফটক হইতে একটি রাস্তা, বরাবর নদীতীরের দিকে গিয়াছিল। অপর রাস্তাটি পূর্বদিকে লালদীঘি (বর্তমান ডালহাউসি স্কোয়ার নর্থ) লালবাজার ও বৌবাজারের দিকে অগ্রসর হইয়া শিয়ালদহের বৈঠকখানা বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দুর্গের দক্ষিণদিকে যে সমস্ত গৃহাদি নির্মিত হয়, তাহাতে কোম্পানির মালামাল থাকিত। বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীটের পার্শ্বে, এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট ওয়্যার-হাউস বা মালগুদাম ছিল।

দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ প্রাঙ্গণ মধ্যে, গবর্ণরের আবাসগৃহ ছিল। দুর্গের মধ্যে এই গৃহটিই সর্বাপেক্ষা শোভনীয় ছিল। হ্যামিল্টন মুক্তকণ্ঠে ইহার স্থাপত্য-সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এখন এই দুর্গের প্রাচীন চিহ্নের বিশেষ কিছু নিদর্শন নাই। তবে ইহার ঘরবাড়িগুলি কিরূপ ধরনের ছিল পাঠক যদি তাহার নমুনা দেখিতে চান, তাহা হইলে কয়লাঘাট স্ট্রীট হইতে, জেনারেল পোস্টাফিস বা বড় ডাকঘরের মধ্যে প্রবেশ করুন। সম্মুখেই কতকগুলি ছোট খিলান-ওয়ালা গৃহ আপনার নেত্র পথে পতিত হইবে। এখন ইহার উপরে পোস্টাফিসের বাবুদের তামাক খাইবার ঘর হইয়াছে। নীচে পোস্টাফিসের ডাকগাড়ি ও ঘোড়া ইত্যাদি থাকে। এই অংশটুকুই সেই পুরাতন দুর্গের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আজও বর্তমান। পুরাতন দুর্গের সকল অংশই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল, কেবল পুরাতনের স্মৃতিরক্ষার জন্য এইটুকুই বজায় রাখা হইয়াছে।

আমাদের ভূতপূর্ব প্রত্নতত্ত্বানুরাগী বড়লাট লর্ড কার্জন বাহাদুরের চেষ্টায়, এই পুরাতন দুর্গের চারিদিকের সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। দুর্গের কোন স্থানে কি ছিল তাহা তিনি স্পষ্ট-ভাবে, প্রস্তরফলক দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছেন। বর্তমান চার্নক-প্লেসের নিকট, পোস্টাফিস ও কলেক্টরি অফিসের দ্বারের মধ্যে 'ব্ল্যাকহোল' বা অন্ধকূপ-হত্যাগৃহের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। আজকালকার রাইটার্স বিল্ডিংসএর সম্মুখে, যেস্থানে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে[1] সেই স্থানটি সেই সময়ে দুর্গপার্শ্ববর্তী একটি গভীর নালা ছিল। অন্ধকূপ-হত্যায় যে সমস্ত ইংরাজ শোচনীয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পরদিন প্রভাতে নবাবের আদেশে তাহাদের মৃতদেহ এই খাতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই স্থানটি স্মরণীয় করিবার জন্য, হলওয়েল সাহেব সেই পুরাকালে এইস্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দেন। ইংরাজরাজত্বের মধ্যযুগে সেটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। আমরা এই স্মৃতিচিহ্নের একখানি চিত্র প্রদান করিলাম।[2]

শোভাসিংহের বিদ্রোহের সময় হইতে আরম্ভ হইয়া, এই 'প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ' ধীরে ধীরে কিরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল তাহার বিবরণ আমরা যথাসাধ্য প্রদান করিলাম। এই দুর্গনির্মাণের পর হইতেই প্রাচীন সুতালুটি ও কলিকাতার উন্নতি আরম্ভ হইল।

শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটায় ইংরাজদের প্রভূত উপকার সাধিত হইল। এ বিদ্রোহ উপস্থিত

১. অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ বর্তমান বিবাদী বাগ-এর উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যাকাহিনীর সত্যতা ঐতিহাসিক মহলে সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই। এ কাহিনীতে অতিরঞ্জন স্থানলাভ করিয়াছে। কার্জন এটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব পরিচালিত আন্দোলনের ফলে এই স্তম্ভটি সেন্ট জন গির্জা প্রাঙ্গণে অপসারিত হইয়াছে।

২. যাঁহারা এই প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের (অর্থাৎ যে দুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন) অবস্থান স্থান সম্বন্ধে বিশদরূপে জানিতে চাহেন তাঁহারা Victoria Memorial Hall Collection এর মধ্যে সংগৃহীত দুর্গের একটি অবিকল নমুনা বর্তমান মিউজিয়াম গৃহে দেখিয়া আসিতে পারেন। এই নমুনাটি পর-লোকগত ঐতিহাসিক ডাক্তার উইলসনের চেষ্টায় ও লর্ড কার্জনের সহায়তায় প্রস্তুত হইয়াছিল।

না হইলে কলিকাতার দুর্গনির্মাণ ব্যাপারটা এত শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিত না। বিদ্রোহীরা, ইংরাজদের ভয়েই গঙ্গা পার হইয়া কলিকাতার দিকে আসিতে পারে নাই। এই বিদ্রোহের সময়, ইংরাজেরা দুইখানি জাহাজ কামান দ্বারা সজ্জিত করিয়া, ভাগীরথীবক্ষে চৌকি দেন। মোগলের থানাদুর্গের ফৌজদার, ইংরাজদের এই বন্দোবস্তের জন্যই, বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান। হুগলীতে ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসিগণ, আর কলিকাতার ইংরাজগণ, এই সময়ে যুদ্ধ জাহাজ ও নৌ-সেনা দানে সাহায্য না করিলে এবং ভাগীরথীবক্ষ শত্রুমুক্ত না রাখিলে, ইহার মধ্যবর্তী ভূভাগের নগর ও গ্রামগুলি ছারেখারে যাইত। এই নিরাপত্তার জন্য, কলিকাতার পার্শ্ব-বর্তী গ্রামের অনেক ব্যবসায়ী, কলিকাতায় আসিলেন। ইউরোপীয়ানদের শক্তির উপর তাঁহাদের একটা বিশ্বাস জন্মিল। যখন তাঁহারা বুঝিলেন, এই ইউরোপীয়ানগণ চেষ্টা করিলে, দেশের লোকের মান মর্যাদা ও ধনসম্পত্তিরক্ষা করিতে সক্ষম, তাহাদের অনলবর্ষী কামানের ভয়ে, বিদ্রোহীরাও এপারে আসিতে অক্ষম—তখন তাঁহারা ইংরাজ-শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাসস্থাপন করিলেন। ইহার ফলে, কলিকাতার ও সুতালুটির জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইল। বাণিজ্যাদি ব্যাপারে, ইংরাজেরা দেশীয়দের সহিত অতি সদ্ব্যবহার করিতেন। শেঠ-বসাকেরা ইংরাজদের সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া কলিকাতাতেই রহিলেন। সুতালুটির সে জঙ্গলময় অবস্থা ক্রমশ বিদূরিত হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র অট্টালিকা, হাট-বাজার ও বস্তি হইতে লাগিল। তখন লোকে ভাবিত. বিপদ-আপদ উপস্থিত হইলে ইংরাজের সুতালুটির কেল্লার মধ্যে অতি সহজেই আশ্রয় পাওয়া যাইবে।

সুতালুটির অবস্থার উন্নতি ঘটিলেও নানাকারণে ইংরাজ-কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইল। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গের সুবাদার আজিমওশ্বান। বাঙ্গলাসুবার দেওয়ান—নবাব মুরশিদকুলি খাঁ। মুরশিদকুলির আমলেই, ইংরাজ-বণিকেরা কলিকাতা, সুতালুটি এবং গোবিন্দপুর ইত্যাদি গ্রামত্রয় ক্রয় করেন। এই আমলেই তাঁহারা কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানের জমিদারি লাভ করেন। কি করিয়া এই জমিদারি অর্জিত হইল, তাহা পরের অধ্যায়ে বলিতেছি।

Yo: most humb^le: Servant.

Chas: Sowdon

John Goldsborough

চতুর্দশ অধ্যায়

নবাবী আমলের প্রাচীন কলিকাতা

বিলাতে নূতন কোম্পানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা—পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিপত্তি—বাণিজ্যস্বত্ব লাভের জন্য নূতন কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে স্যর উইলিয়াম নরিসের সম্রাটদরবারে আগমন—নরিসের আশাভঙ্গ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন—নূতন কোম্পানির প্রধান কর্মচারী লিটলটনের হুগলীতে আগমন—পুরাতন কোম্পানির অধ্যক্ষ জন বেয়ার্ডের সহিত লিটলটনের সংঘর্ষ—জলদস্যুদ্বারা মোগলে যাত্রীজাহাজ লুণ্ঠন—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ—ইউরোপীয় বণিকদের উচ্ছেদ করিবার আদেশ প্রদান—বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদার সুলতান আজিমওশ্বান বঙ্গের নবনিযুক্ত দেওয়ান নবাব মুরশিদকুলি খাঁ—মুরশিদকুলির পূর্ব-পরিচয়—হায়দ্রাবাদের দেওয়ান—সম্রাট কর্তৃক বঙ্গে নিয়োগ—মুরশিদকুলির রাজস্ব বন্দোবস্ত—আজিমওশ্বানের সহিত মনোমালিন্য—আজিমওশ্বান কর্তৃক নবাব মুরশিদকুলিকে হত্যা করিবার চেষ্টা—এ মনোমালিন্যের পরিণামে সম্রাটের আদেশে আজিমের ঢাকা হইতে পাটনায় গমন—মুরশিদকুলি খাঁ কর্তৃক মুরশিদাবাদ প্রতিষ্ঠা—যুক্ত-কোম্পানি ও রোটেশন গবর্ণমেণ্ট—নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সহিত ইংরাজ-কোম্পানির মনোমালিন্য—হুগলীর ফৌজদারের অত্যাচার—কোম্পানি কর্তৃক রামচন্দ্রকে হুগলীতে প্রেরণ—উকীল রাজারামের নবাব দরবারে গমন—হুগলীর ফৌজদারকে বাধ্য করিবার জন্য ইংরাজদের উপহার দ্রব্য প্রেরণ—উপহার দ্রব্যের তালিকা—নবাব মুরশিদকুলি খাঁর অসম্ভব দাবি—কাশিমবাজার কুঠি খুলিবার বন্দোবস্ত—ইংরাজের ভাগ্য পরিবর্তন—সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু—এ মৃত্যু সংবাদে মহা গোলযোগের সূচনা—ঔরঙ্গজেবের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ—মৃত্যুর পূর্বে সম্রাটের শেষ পত্র—সম্রাট-পুত্রগণের আত্মবিগ্রহ ও সাহআলমের জয়লাভ—বঙ্গদেশ হইতে পিতার সাহায্যার্থে সুলতান আজিমওশ্বানের গমন—সাহজাদা কামবক্স ও আজমের শোচনীয় পরিণাম—এই গোলযোগে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পরিসমাপ্তি—ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুতে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে ইংরাজদের সুবিধা।

ইংরাজ কোম্পানির অনেক শত্রু ছিল। ঘরের শত্রু ছিল তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ। পাঠক ইতিপূর্বে 'ইণ্টারলোপার'দের কথা শুনিয়াছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা সম্বন্ধে, ইহারা স্বতঃপরত অনিষ্ট চেষ্টা করিত। এই সময়ে বিলাতে আবার একটি নূতন ব্যবসায়ী-কোম্পানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহারা ইংলণ্ডের তৎকালিক অধিপতি তৃতীয় উইলিয়াম ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট প্রার্থনা দ্বারা ভারতে বাণিজ্য-সম্বন্ধে নূতন সনন্দ লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে স্যর উইলিয়াম নরিসকে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে দূতরূপে প্রেরণ করেন।

এইবার পুরাতন কোম্পানি মহাপ্রমাদ গণিলেন। নূতন কোম্পানির নাম হইয়াছিল,'ইংলিশ কোম্পানি ট্রেডিং টু দি ইস্ট-ইণ্ডিস,' (English Company Trading to the East Indies)। পুরাতন কোম্পানি অগত্যা 'লণ্ডন-কোম্পানি' এই আখ্যা ধারণ করিলেন।[১]

১৬৯৯ খৃস্টাব্দে নূতন কোম্পানির প্রতিনিধি নরিস সাহেব[২] ভারতে উপস্থিত হন। মসলিপট্টনে প্রায় এক বৎসরকাল সময় ক্ষেপণ করিয়া তিনি ১৭০০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরে সুরাটে

১. ইংরাজ বণিকদের এই নূতন সঙ্ঘ ১৬৯৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর রাজকীয় সনন্দ লাভ করে।
২. Sir Willam Norris—ইনি ছিলেন লিভারপুল হইতে নির্বাচিত পার্লামেণ্টের সদস্য।

উপস্থিত হন। কিন্তু সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধকার্যে ব্যস্ত। নরিস স্থানীয় উজীর ও মোগল-কর্মচারীদের উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া, মহাসমারোহে সম্রাটের সহিত সাক্ষাতার্থে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইলেন। নরিস খুব জাঁকজমক করিয়াই সম্রাট সকাশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৬০ জন ইংরাজ ও তিনশত এদেশীয় শরীর-রক্ষী ছিল। সম্রাটকে উপহার দিবার জন্য তিনি নানাপ্রকারের বনাত, বিলাতী-আলু, কাচের জিনিস প্রচুর পরিমাণে আনিয়াছিলেন। একজন রাজদূতের যতটা পদোচিত সম্ভ্রম ও জাঁকজমকের সহিত সম্রাট দরবারে যাওয়া সম্ভব, নরিস তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই।

ঔরঙ্গজেব নরিসকে সাদর ভাবে গ্রহণ করিলেন। নরিসের অভিপ্রায় মত নূতন কোম্পানির জন্য সনন্দ ও ছাড়পত্রাদিও প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই সময়ে উজীর ও অন্যান্য উৎকোচ-লোলুপ রাজ-কর্মচারিগণ, নানাবিধ ওজর আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। পুরাতন কোম্পানির প্রতিনিধিরাও নরিসের সংকল্প বিফল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। উৎকোচ দিতে দিতে নরিসের ভাণ্ডার শূন্য হইয়া আসিল। তিনি ভগ্নহৃদয়ে সুরাটে ফিরিলেন। মোগলের প্রধান উজীর দিনকয়েকের জন্য তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিল। উজীরের কবল হইতে উৎকোচ দানে উদ্ধার পাইয়া নরিস শূন্যহস্তে নিরাশচিত্তে ইংলণ্ডে যাইবার জন্য জাহাজে উঠিলেন। সে যাত্রা আর তাঁহাকে দেশে পেঁাছিতে হয় নাই। আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি সেণ্ট হেলেনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।[১]

নরিসের সঙ্গে সঙ্গে স্যর এডওয়ার্ড লিটলটন[২] নামক একজন ইংরাজ নূতন কোম্পানির বঙ্গীয় বাণিজ্যের অধিনায়ক বা বড়কর্তারূপে প্রেরিত হন। লিটলটন পূর্বে পুরাতন ইংরাজ কোম্পানির ফ্যাক্টররূপে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি ১৬৮২ সালে পুরাতন কোম্পানির অধ্যক্ষগণের আদেশে পদচ্যুত হন। এই লিটলটন নবপদবী লাভে নূতন কোম্পানির কর্মচারীরূপে এই সময়ে বালেশ্বর বন্দরে উপস্থিত হইলেন। বালেশ্বর হইতে তিনি পুরাতন কোম্পানির এজেণ্ট বেয়ার্ড সাহেবকে ভয় ও মৈত্রী সম্বলিত একখানি পত্র, সুতালুটিতে প্রেরণ করেন। বেয়ার্ড এ পত্র পাইয়াও তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনিও তদনুরূপ উত্তর দিয়া পাঠাইলেন।

লিটলটন হুগলীতে আসিলেন। দুই বৎসরকাল ধরিয়া তিনি সকল বিষয়েই পুরাতন কোম্পানির প্রতিযোগিতা করিতে লাগিলেন এবং প্রতি কাজেই নিরাশ হইলেন। হুগলীতে তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার অধীনস্থগণেই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা-সভার দুইজন সদস্য বাঙ্গলার জ্বরে ভুগিয়া দেহত্যাগ করিলেন। নূতন কোম্পানির সম্পত্তি রক্ষার জন্য তিনি যে সমস্ত প্রহরী-সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাদের অনেকে দল ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কতক বা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অসংখ্য মুদ্রা উৎকোচদানে তিনি মোগল রাজ-কর্মচারীদের নিকট বাণিজ্যের ছাড় পাইলেন বটে, কিন্তু এ ছাড় অতি অল্পদিনের জন্য। এই ছাড়ের মেয়াদী সময় অতীত হইয়া গেলে আবার প্রচুর মুদ্রা নজরানা দিয়া, তাঁহাকে নূতন ছাড় লইতে হইল। লিটলটন হুগলীতে থাকিয়া এত প্রতিযোগিতা করিয়াও পুরাতন কোম্পানির কোন অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। পরিশেষে দুই বৎসর পরে, উপায়ান্তর বিহীন হইয়া নূতন কোম্পানি পুরাতনের সহিত মিশিয়া গেল। উভয়পক্ষের এই বিবাদের ফলে ইংরাজ-বাণিজ্য অনেকটা হীনশক্তি হইয়া পড়িল।

লিটলটন যে সময়ে নূতন কোম্পানির অধ্যক্ষরূপে হুগলীতে আসেন, সেই সময়ে জন বেয়ার্ড, সুতালুটি বা কলিকাতার কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। বেয়ার্ড ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে এদেশে

১. Bruce's *Annals* Vol III, 4th Ed., Wilson p. 154, Hedges' *Diary* Vol II, p. 205.
২. Sir Edward Littleton ছিলেন সাবেক কোম্পানীর পদচ্যুত কর্মচারী।

প্রথম আসেন। জোব চার্নকের আমলে মোগলের সহিত ইংরাজের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সে সময়ে বেয়ার্ডকেও অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর তিনি কাউন্সিলের দ্বিতীয় সদস্য পদে নিযুক্ত হন। ১৬৯৯ খৃস্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে চলিয়া যান। বেয়ার্ড তৎপরে কলিকাতা এজেন্সির প্রধান বা 'চিফ্' পদে উন্নীত হন।

বেয়ার্ড কলিকাতা ফ্যাক্টরির চিফ বা প্রধানপদে নিযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু ক্রমশ বুঝিতে পারিলেন এ উচ্চপদ সুখের নহে। প্রথমত লিটলটনের সহিত তাঁহার একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। দৃঢ়তার সহিত কার্য করিয়া তিনি লিটলটনের ব্যাপারটা একরূপ মীমাংসা করিলেন বটে, কিন্তু এই সময়ে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত ইংরাজদের নূতন সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার উপক্রম হওয়ায়, বেয়ার্ড বড়ই ভীত হইলেন। এ সংঘর্ষের কারণ এই, সেই সময়ে সুরাট হইতে মক্কাগামী যাত্রী জাহাজগুলি প্রায়ই লুণ্ঠিত হইত। ঔরঙ্গজেবের মনে একটা দৃঢ় সন্দেহ যে ইংরাজ-জাহাজ কর্তৃক এই কার্য হইতেছে। নূতন ও পুরাতন উভয় কোম্পানি-কেই ঔরঙ্গজেব এই ব্যাপারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলেন। নূতন কোম্পানি পুরাতনের স্কন্ধে দোষ চাপাইলেন। পুরাতন বলিলেন, "আমরা জাঁহাপনার রাজ্যে এতদিন বাস করিতেছি, এ কাজ আমাদের দ্বারা হয় নাই।"

ঔরঙ্গজেব ইংরাজদের উপর মহা বিরক্ত হইয়া ১৭০১ খৃস্টাব্দের শেষভাগে, এই হুকুমনামা প্রচার করেন—"ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ আমাদের সহিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন, যে আমার প্রজাগণকে তাঁহারা সমুদ্রপথে, জলদস্যুদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা মুসলমান জাহাজসমূহ লুঠ করিতেছেন, সেগুলি আটক করিতেছেন। এইজন্য সর্বস্থানের দেওয়ান ও নাজিমগণের উপর এই আদেশ প্রদান করা গেল—এই সকল ইউরোপীয় জাতি অতঃপর আমার রাজ্য মধ্যে কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারিবে না। তাহাদের দ্রব্যজাতসমূহ বাজেয়াপ্ত হইবে। এই সমস্ত দ্রব্যজাত আটক করিয়া, প্রত্যেক শাসন-কর্তা আটকী-দ্রব্যের একটি ফর্দ আমার কাছে পাঠাইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও হুকুম করা যাইতেছে—ইউরোপীয় বণিক-কর্মচারিগণকে দেখিলেই অবরুদ্ধ করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখিবে।"[১]

এই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্রই একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। দায়ুদ খাঁ তখন মান্দ্রাজ বিভাগের শাসনকর্তা। তিনি ১৭০২ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি হইতে মে মাস পর্যন্ত মান্দ্রাজ অবরোধ করিয়া রহিলেন। উক্ত বৎসর, বঙ্গদেশের পাটনা, রাজমহল ও কাশিমবাজারের কুঠিগুলি আটক করা হইল। সমস্ত ইউরোপীয়ান ফ্যাক্টরিগুলির অবস্থা অতি বিপন্ন হইয়া পড়িল। নূতন কোম্পানি অর্থাৎ লিটলটনের দলের মহা বিপত্তি উপস্থিত হইল। বেয়ার্ড বহুদিন এদেশে আছেন, তিনি সকল দিকে আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিতেছিলেন। লিটলটন এ দেশের কিছুই জানিতেন না, কাজেই তিনিই অধিকতর বিপদগ্রস্ত হইলেন। এই ব্যাপারে নূতন ইংরাজ-কোম্পানির ৬২ হাজার টাকা ক্ষতি হওয়ায় তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

এই সময়ে বঙ্গদেশের মধ্যে দুই জন ব্যক্তি প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব লইয়া বিরাজ করিতেছিলেন। একদিকে বঙ্গের সুবাদার সুলতান আজিমওশ্বান, অন্যদিকে নবাব মুরশিদকুলি খাঁ।

১. At the end of the year 1701 a proclamation was issued ordering the arrest of all Europeans in India. 'In as much as the English and other Europeans', it ran, 'notwithstanding that they have entered into a contract to defend our subjects from piracies, have seized and plundered Mussulman ships, therefore we have written to all Governors and Dewans that all manner of trade be interdicted with these nations throughout our dominions and that you seize on their effects where-ever they can be found, take them carefully on your possessions, sending an inventory thereof to us. And it is likewise further ordered that you confine their persons, but not to close imprisonment. —Wheeler's *Madras in the Olden Time* p. 213. Wilson, p. 160.

ধরিতে গেলে মুরশিদকুলি খাঁ হইতেই বাঙ্গলার নবাবী-আমলের প্রারম্ভ। তাঁহার ন্যায় দোর্দণ্ড-প্রতাপ নবাব বাঙ্গলায় আর কেহ হন নাই। তিনি প্রতি পদে ইংরাজ-বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ-বাণিজ্য উচ্ছেদের জন্য প্রথমে তিনি নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়া পরে বিফল মনোরথ হয়েন। এত বড় জবরদস্ত নবাব মুরশিদকুলি খাঁর একটু বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

নবাব জাফর মুরশিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যবাসী এক গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যকালে ইঁহার পিতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ইস্পাহানবাসী হাজি সফী নামক একজন বণিক ইঁহাকে ক্রীতদাসরূপে ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। সেখানে এই ক্রীতদাস মহম্মদ হাজী নামে পরিচিত ছিল। বালকটিকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান দেখিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে নীচ কার্যে নিযুক্ত না করিয়া, পুত্রের মত লালনপালন করেন। তৎকালোচিত শিক্ষালাভও তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছিল।

বণিকের মৃত্যু হইলে মহম্মদ হাজী ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। বহু চেষ্টার পর বেরার প্রদেশের তৎকালীন দেওয়ান হাজী আবদুল্লা খোরাসানীর অধীনে, তিনি একটি সামান্য কার্যে নিযুক্ত হন। দেওয়ান তাঁহার কার্য-কুশলতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বড়ই প্রসন্ন হইয়া বাদসাহের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। ঔরঙ্গজেবও তাঁহার কার্য-কুশলতায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে কারতলব খাঁ উপাধি এবং মনসব প্রদান করেন।

সেই সময় হইতেই মুরশিদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। এই সময়ে হায়দ্রাবাদের দেওয়ানী পদ খালি হওয়ায়, সম্রাট কারতলব খাঁ বা ভবিষ্যৎ মুরশিদকুলিকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্যেও বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করায়, ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বাঙ্গলার দেওয়ান রূপে নিযুক্ত করেন। বঙ্গদেশের দেওয়ানী লাভ করিবার পর, তিনি মুরশিদকুলি খাঁ[১] উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং এই নামেই তিনি ইতিহাসে সুপরিচিত। আমরা এইজন্য মুরশিদকুলি খাঁ নামই ব্যবহার করিব।

আকবর বাদসাহের আমলে মহারাজ টোডরমল্ল বঙ্গের রাজস্ব সম্বন্ধে একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এই সময় হইতে প্রত্যেক সুবায় বা শাসন-বিভাগে একজন সুবাদার বা নাজিম এবং একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। নাজিমের হস্তে সেনাবিভাগ ও দেশের শাসনভার অর্পিত ছিল আর দেওয়ান রাজস্ব-বিভাগে কর্তৃত্ব করিতেন।

কূটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেব বাঙ্গলার রাজস্ব হ্রাস হইতেছে দেখিয়া ও বঙ্গের রাজস্ব-বিভাগকে, সম্পূর্ণরূপে সুবাদারের কর্তৃত্ব বিমুক্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে নাজিম ও দেওয়ানের কর্তব্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। সৈন্য-পরিচালনা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা ও বিচার-বিভাগ, নাজিমের হাতেই রহিল। দেওয়ান স্বতন্ত্রভাবে রাজস্ব-আদায়, রাজস্ব-বন্দোবস্ত, সরকারের আয় ব্যয় পরিদর্শন প্রভৃতি কার্যের ভার পাইলেন।

বঙ্গের দেওয়ানী পদ লাভ করিয়া, নবাব মুরশিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্য হইতে ঢাকায় উপস্থিত হন। তখন সুলতান আজিমওশ্বান বঙ্গের সুবাদার। মুরশিদকুলি খাঁ অবশ্য বঙ্গের সুবাদারের অধীনস্থ কর্মচারী। কিন্তু সুবাদার প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানের উপর কোনরূপ আদেশ চালাইতে পারিতেন না। বাদসাহের প্রচারিত 'দস্তর-উল্-আমল' বা অনুশাসন পত্রানুসারে উভয়কেই কার্য নির্বাহ করিতে হইত।

বঙ্গদেশে শস্যের অভাব কোন কালেই ছিল না। স্বর্ণপ্রসূ-বঙ্গের প্রত্যেক বিঘাই প্রচুর শস্যোৎপাদনে সক্ষম। শস্য হইতেই প্রজার আয়। প্রজার আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশই রাজার রাজস্ব।

১. যিনি পরে মুরশিদকুলি খাঁ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন তিনি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে যখন বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন তখন কারতলব খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন। দুই বৎসর পর তিনি মুরশিদকুলি খাঁ উপাধি লাভ করেন (১৭০২)।

বেবন্দোবস্তের গুণে, অপব্যয়ের প্রভাবে, বাঙ্গলার রাজস্ব ক্রমশ কমিয়া আসিতেছিল। মোগল-বাদসাহের স্থানীয় কর্মচারীরা, নিজেদের উদর পূরণেই বেশী মনোযোগী ছিলেন। তাহার উপর বিদ্রোহ, বিপ্লব প্রভৃতি কারণে মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশের রাজস্ব-বিভাগে মহা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইত।

নব নিযুক্ত দেওয়ান মুরশিদকুলি খাঁ, বাঙ্গলায় আসিয়া রাজস্ব বিভাগের সংস্কার কার্যে মনোযোগী হইলেন। সরকারী কাগজ-পত্র অনুসন্ধানে, তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে এক কোটি টাকা রাজস্বরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। এইজন্য তিনি শীঘ্রই রাজস্ব-বিভাগের আমূল সংস্কার করিলেন। উপযুক্ত কর্মচারিগণের হস্তে রাজস্ব-বিভাগের কার্যসমূহ ন্যস্ত হইল। বাঙ্গলার মধ্যে যে সমস্ত জায়গীরদারগণ এতদিন জায়গীরের স্বত্ব উপভোগ করিতেছিলেন, প্রজার রক্তশোষণ করিয়া স্থূলকায় হইতেছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই জায়গীর উড়িষ্যায় স্থানান্তরিত হইল। কেবল নিজামতের, দেওয়ানের এবং বাদসাহী প্রধান সেনাপতি প্রভৃতির জায়গীর বঙ্গদেশেই রহিল। ইহার ফল এই হইল, প্রজাগণ জায়গীরদারদের অযথা অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং জমির উন্নতি হওয়ায় তাহার উর্বরতা-শক্তিবৃদ্ধির সহিত রাজস্ব-বৃদ্ধি পাইল।

মুরশিদকুলি খাঁ সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়া বঙ্গীয় রাজস্বের বিশদ বিবরণ বাদসাহের দরবারে পেশ করিলেন। তিনি বাদসাহের স্বনির্বাচিত কর্মচারী। ঔরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধকার্যে ব্যস্ত, টাকার তাঁহার বড়ই প্রয়োজন। কাজেই বাঙ্গলার এই নূতন দেওয়ানের কার্য-কুশলতায় তিনি প্রীত হইলেন।

এই ব্যাপার লইয়া বাঙ্গলার সুবাদার আজিমওশ্বানের সহিত নবাব মুরশিদকুলির মনোমালিন্য ঘটে। তিনি বাদসাহের ভয়ে তাঁহার প্রিয় দেওয়ানকে কিছু বলিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু মনে মনে সর্বদাই তাঁহার অনিষ্ট-কামনা পোষণ করিতেন। এইজন্য এক সময়ে তিনি নবাবকে বিনাশ করিবার জন্য এক ভীষণ চক্রান্তের সৃষ্টি করিলেন।

সেই সময় একদল নগদী-সেনা আবদুল ওয়াহেদ নামক একজন রেসালাদারের অধীন ছিল। নগদীরা রাজকোষ হইতে নগদ বেতন পাইত। তাহাদের জন্য কোনরূপ জায়গীর বন্দোবস্ত ছিল না। এই সময়ে তাহাদের প্রাপ্য বেতন কিছু বাকী পড়ে। সুলতান আজিমওশ্বান এই সংবাদ অবগত হইয়া, তাহাদের সর্দার ওয়াহেদকে হস্তগত করিলেন। তিনি ওয়াহেদকে গোপনে উপদেশ দিলেন, "যে সময়ে নবাব রাজ-সভায় আসিবেন, সেই সময়ে বেতন প্রার্থনার অছিলায়, তোমরা পথিমধ্যে গোলযোগ বাধাইয়া, কোন সুযোগে তাঁহাকে হত্যা করিবে। মুরশিদকুলি খাঁ সম্রাট-পৌত্র আজিমওশ্বানকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন। তিনি জানিতেন না যে তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ এক ঘৃণিত চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ যেখানেই যাইতেন তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্যে একটি বর্ম পরিধান করিতেন। যুবরাজের উপর তাঁহার একান্ত বিশ্বাস ছিল না। আজিমওশ্বান যে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট নহেন তাহাও তিনি জানিতেন। একদিন মুরশিদকুলি খাঁ দরবারে আসিবার জন্য সদলবলে অশ্বারোহণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে ওয়াহেদ তাহার সঙ্গীদের লইয়া বেতনের দাবি করিয়া নবাবের সহিত বিবাদ উপস্থিত করে। মুরশিদকুলি খাঁ ইহাতে কোনরূপ ভয় না পাইয়া সরাসর দরবারে উপস্থিত হন। আজিমওশ্বান যে এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছেন ইহাই তাঁহার ধারণা। নবাব দরবারে উপস্থিত হইয়া পূর্ব প্রথামত আজিমওশ্বানকে কোনরূপ সম্বর্ধনা না করিয়া, তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়া রুষ্টভাবে বলিলেন, "সাহজাদা! যদি আপনি আমায় গুপ্তভাবে হত্যা করিতে স্থিরসংকল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিয়া রাখুন, আমিও প্রতিহিংসা লইতে বিরত থাকিব না। আর এ কথাও স্থির জানিবেন আমায় হত্যা করিলে

বাদসাহও তাহার প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আবদুল ওয়াহেদকে এরূপ-ভাবে উত্তেজিত করিবার মূলই আপনি।"

আজিমওশ্বান দেওয়ানের ক্রোধ দেখিয়া বড়ই ভীত হইলেন। পিতামহ ঔরঙ্গজেবকে তিনি চিনিতেন। যে দেওয়ান বাঙ্গলায় সম্রাটের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, তাঁহার বঙ্গ-সাম্রাজ্যের রাজকোষের আয়বৃদ্ধির জন্য যাহাকে তিনি নিজে নির্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছেন—তাহার প্রতি এরূপ অমানুষিক অত্যাচারের কথা বাদসাহের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার পরিণাম শুভফলজনক নহে। এইজন্য তিনি বিবিধ উপায়ে নবাবের ক্রোধ-শান্তির চেষ্টা করিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলেন, "ওয়াহেদের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। এবং তিনি নবাবের একান্ত বন্ধু ও হিতচিকির্ষু।" ওয়াহেদ তাঁহাকে পথিমধ্যে এরূপভাবে অপমান করার জন্য শাস্তিভোগ করিবে ইত্যাদি স্তোক-বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিয়া বিদায় করিলেন।

কিন্তু মুরশিদকুলি খাঁ ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি নিজধামে প্রত্যাগমন করিয়া 'সওয়ানে-নেগার' নামক কাগজে এই ব্যাপারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন। তৎপরে সওয়ার দ্বারা তাহা দাক্ষিণাত্যে বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিলেন। ওয়াহেদ তাহার এ ধৃষ্টতার জন্য ভবিষ্যতে পদচ্যুত ও দেশ হইতে বিতাড়িত হইল।

এই ব্যাপারে মুরশিদকুলি খাঁ রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করা ততটা নিরাপদ বলিয়া ভাবিলেন না। তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের সহিত পরামর্শমতে স্থির করিলেন মুখ-সুদাবাদেই রাজধানী স্থানান্তরিত করা কর্তব্য।১

সুবাদার আজিমওশ্বানের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই, মুরশিদকুলি খাঁ তাঁহার কর্মচারীবর্গসহ খালসা দস্তর বা রাজস্ব-বিভাগ মুখসুদাবাদে উঠাইয়া আনিলেন।২ কুড়ুলিয়া নামক পতিত মৌজায় মহলসরা (প্রাসাদ) দেওয়ানখানা ও অন্যান্য গৃহাদিনির্মাণ করিয়া নগরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাহার পৌত্রের সহিত তাঁহার প্রিয় দেওয়ানের মনো-মালিন্যের কথা শুনিয়া, অতিশয় রুষ্ট হইয়া আজিমওশ্বানকে বাঙ্গলা হইতে বিহারে অবস্থান করিতে আদেশ দেন। আজিমওশ্বান তাঁহার পুত্র সাহজাদা ফেরোকসিয়ারকে ঢাকায় প্রতিনিধি বা নায়েব-সুবাদার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, পরিবারবর্গ ও অর্ধেক সৈন্যসহ মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সাহসুজার মর্মর নির্মিত প্রাসাদ তখন ভগ্নপ্রায় দেখিয়া রাজকুমার আজিমওশ্বান পরি-

১. অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতে মুখসুদাবাদ যে একটি ক্ষুদ্র নগর ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন সময় হইতে মুখসুসাবাদ বা মুখসুদাবাদের প্রতিষ্ঠা বা নামকরণ হয়, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। মুরশিদাবাদ প্রদেশে একটি সাধারণ প্রবাদ এই যে, বাদসাহ হোসেন সাহের সময়ে মুখসুদন দাস নামে কোন নানক-পন্থী সন্ন্যাসী তাঁহার পীড়া শান্তি করিয়া এইস্থান লাখরাজরূপে প্রাপ্ত হন এবং সেই সন্ন্যাসীর নামানুসারে উক্তস্থানের নাম 'মুখসুদাবাদ' হয়। রিয়াজ-উস-সালাতিনের মতে মুখসুদ খাঁ নামক কোন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী হইতে ইহার মুখসুদাবাদ নাম হয়। আবার টিফেনথেলার ১৭৭০ খ্রী. অব্দে লিখিয়াছেন মুরশিদাবাদ নগর আকবর-বাদসাহের সময়ে নির্মিত।

আইন-ই-আকবরীতে মুরশিদাবাদের নাম নাই। আকবর-নামায় বঙ্গের এক সময়ের শাসন-কর্তা সারদ খাঁর ভ্রাতা মুখসুদ খাঁর নাম পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গ-বিহারের নানাস্থানে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। যাহাই হউক না কেন মুরশিদকুলি খাঁর সময়েই ইহার নাম মুরশিদাবাদে দাঁড়ায়।—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস পৃ. ৩৮, নিখিল নাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস পৃ. ৩৩৭ পাদ-টীকা।

২. ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে দেওয়ানীর সদর দপ্তর এবং রাজধানীর স্থানান্তর ঘটে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্যর যদুনাথ সরকারের মতে "The name of the city (Mokshudabad) was, many years later changed with the Emperor's permission to Murshidabad".—*History of Bengal*, Vol II, Dacca University p. 404. আবদুল করিমের মতে—"Coins issued from Murshidabad mint and dated 1116/AH (AD 1704) are however available . . . There is therefore no reason to doubt the evidence of Salim Allah and Salim (acc to whom Murshed Quli was allowed to rename Makshudabad, Murshidabad after his own title in 1704.—Abdul Karim *Murshed Quli Khan and his Times*, p. 23 F.N.

শেষে পাটনা নগরীতেই দুর্গনির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নামানুসারে পাটনা সেই সময়ে আজিমাবাদ বলিয়া কথিত হইত।

মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থাপনের এক বৎসর পরে, রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত কার্য সুশৃঙ্খলার মধ্যে আগমন করিয়া নিকাশী কাগজপত্র সমেত নবাব মুরশিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। বাঙ্গলার রাজস্ব নানা উপায়ে প্রচুররূপে বর্দ্ধিত হয়েছিল। মুরশিদকুলি বাদসাহকে রাজস্বের সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিলে, তিনি তাঁহার কার্য-দক্ষতায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। একা বঙ্গদেশ হইতে যে এ পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণায় আসিল না। দাক্ষিণাত্যের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে তখন রাজকোষে বড়ই অর্থাভাব, কাজেই তিনি দেওয়ানের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'মুরশিদকুলি খাঁ' উপাধি উৎকৃষ্ট খেলাত, বাদসাহী ঝাণ্ডানকাড়া ও মনসবী সেনানায়কত্ব প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন।১

সম্রাটের নিকট হইতে সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া মুরশিদকুলি খাঁ, মুখসুদাবাদকে 'মুরশিদাবাদ' নাম দিলেন। মুরশিদাবাদে একটি সরকারী টাঁকশাল স্থাপিত হইল। ভূপতি রায় কিশোর রায় নামক দুইজন হিন্দুকে তিনি এলাহাবাদ হইতে সঙ্গে লইয়া আসেন। ভূপতি রায়কে নিজের সহকারী ও কিশোরকে তিনি মুন্সীর পদে নিযুক্ত করেন। বহু পরিমাণে বিশ্বাসী হিন্দু আমিলগণ তাঁহার আমলে রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইলেন। দেওয়ান কুলি খাঁও, নিজে হাতে-কলমে সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুলতান আজিমওশ্বান ও ফেরোকসিয়ার, কুলি খাঁর প্রতাপ ও আধিপত্যে আচ্ছন্ন হইয়া অতিশয় হীনশক্তি হইয়া পড়িলেন।

১৭০৪ হইতে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ইংরাজ বাণিজ্য বহুবিধ অসুবিধা ও বাধাবিঘ্নের মধ্যে পড়িয়া বড়ই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। কোম্পানি কি করিয়া এ সমস্ত বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, পরবর্তী ঘটনাগুলি পাঠে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

এই সময়ে কোম্পানির বাণিজ্য 'রোটেশন' বা পর্যায়ক্রমিক শাসন ব্যবস্থার অধীন। নূতন ও পুরাতন কোম্পানির মিশ্রণের সহিত, ইহার কার্য-নির্বাহক সভাও নূতন ভাবে সংগঠিত হয়। দুই দলই এক হইয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে উদ্যত হন।

উভয় কোম্পানির আত্ম-বিবাদের ব্যাপার—তাহাদের উভয়ের পক্ষে অশুভ ফলপ্রদ হইলেও, স্থানীয় মোগল কর্মচারিগণ তাহাতে প্রচুর শস্যলাভ করিলেন। তাঁহারা নানা উপায়ে নানা, অছিলায়, নানা ভাবে, নানা দাবিতে, কোম্পানির নিকট হইতে টাকা আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টাকা না পাইলেই বিবাদ, অত্যাচার, ও উৎপীড়ন। এই সমস্ত অত্যাচারের জ্বালায় ইংরাজেরা বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন।২

এই কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী হইতেই প্রমাণ হয় যে মোগল-শাসনকর্তাগণ ইংরাজদিগকে নানা ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইংরাজ-বণিকের নৌকা সোরা বোঝাই হইয়া আসিতেছে সহসা একজন নবাবী পরমিট কর্মচারী বা ক্ষুদ্র জমিদার তাহা আটক করিতে আদেশ দিলেন, আবার কোথাও বা কোন স্থানীয় ফৌজদার তাঁহাদের মালপত্র ও লোকজন আটক করিয়া

১. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস পৃ. ৩৮।

২. মাদ্রাজের গবর্ণর পিট এই সময়ে বিলাতের কর্তাদের যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশ এই— "You will see that they (Mogul) have a great mind to quarrel with us again and it is certain, that Moors will never let your trade run on quietly as formerly till they are well-beaten". অর্থাৎ মোগলপক্ষ পুনরায় আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমুৎসুক। এই মুসলমান শাসনকর্তাগণের ইচ্ছা নহে যে আমরা নির্বিবাদে ও বিনা বাধায় এদেশে বাণিজ্য করিব। পূর্বকার মত শক্তি প্রয়োগে ইহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। কলিকাতার প্রেসিডেন্ট বেয়ার্ড বলিয়াছিলেন "Force and a strong fortification were better than an ambassader."—Bruce's *Annals of the E. I. Company.* Vol II, p. 697. Hedges' *Diary* Vol III, p. 82

ফেলিলেন। এসব বিবাদে ইংরাজগণ অনেক স্থলে এই সব স্থানীয় শাসনকর্তাদের উৎকোচ দানেই মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন।

বাঙ্গলার মোগল শাসনকর্তারা স্ব স্ব প্রধান ছিলেন। যিনি যখন সুবিধা পাইতেন তিনিই ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের পীড়ন করিয়া কিছু উপরি আদায়ের চেষ্টা করিতেন। বিশেষত এই সময়ে একদিকে অর্থলোলুপ সুলতান আজিমওশ্বান ও অন্যদিকে অসীম ক্ষমতাশালী নবাব মুরশিদকুলি খাঁ। রাজস্ব-সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত ও তাহা বৃদ্ধি করাই নবাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ ইংরাজ-বণিকদের নিকট হইতে তাঁহাদের পুরাতন সনন্দগুলি তলব করেন। কিন্তু ইংরাজেরা সাহসুজার প্রদত্ত ফারমানখানি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহারা একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দেওয়ানের কর্মচারীবর্গকে উৎকোচ দানে বশীভূত করা ভিন্ন, তাঁহাদের আর কোন উপায়ই রহিল না। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে, এই যুক্ত ইংরেজ কোম্পানি (United Company)[১] নবাব মুরশিদকুলি খাঁর নিকট প্রার্থনা করিলেন—"যাহাতে আমাদের পূর্ব-কার সনন্দ ও তদন্তর্ভুক্ত বাণিজ্য স্বত্বাদি বলবৎ থাকে, তাহার আদেশ প্রদান করুন।" কিন্তু মুরশিদকুলি খাঁ যখন দেখিলেন দুইটি বিভিন্ন কোম্পানি একযোগে এই দরখাস্ত করিতেছে, তখন তিনি ইহাদের পৃথক কোম্পানি বলিয়াই ধরিয়া লইলেন। তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না যে—এই দুইটি কোম্পানি একই। কাজেই পূর্ব বন্দোবস্ত অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানিকেই স্বতন্ত্রভাবে তিন সহস্র মুদ্রা দিতে হইল। কোম্পানিরা নবাবের বুঝিবার দোষে তিন সহস্র মুদ্রা বেশী দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে[২] এই যুক্ত-কোম্পানি প্রকাশ্যভাবে কার্য চালাইবার জন্য এক মোহরে দস্তক-জারি আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে মোগলের স্থানীয় কর্মচারীদের উৎপাত আরও বৃদ্ধি হইল। তাহারা যখন দেখিল দেওয়ান স্বয়ং যুক্ত ইংরেজ কোম্পানিকে একই কোম্পানি বলিয়া স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক তখন তাহারা নানা উপায়ে ইংরাজদের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। হুগলীর ফৌজদার, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এইবার তিনিও অত্যাচারের সূচনা করিলেন।

ইংরাজগণ নিরুপায় হইয়া ২৭এ মার্চ তারিখে তাঁহাদের মোক্তার, রাম চন্দ্রকে হুগলীর ফৌজদারের নিকট পাঠান। ১৪ই জুন তারিখে রাজারাম নামক একজন প্রবীণ ও অবস্থাভিজ্ঞ উকিলকে দেওয়ানের নিকট পাঠান হয়। এই সময়ে নবাব মুরশিদকুলি খাঁ উড়িষ্যা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। রাজারামকে কোম্পানির কর্তারা বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন, "দেওয়ানকে বলিও দুইটি বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানি এখন মিলিত হইয়া, এক কোম্পানিতে দাঁড়াইয়াছে। আমাদের কার্যালয় একই স্থানে অবস্থিত। শীঘ্রই আমাদের একজন অধ্যক্ষও নিয়োজিত হইবেন। এরূপ স্থলে আমাদের পূর্ব কড়ার মত তিন হাজার টাকাই দিব। দেওয়ান আমাদের অবাধ-বাণিজ্য ক্ষমতা দিবার জন্য যে আরও পনর হাজার টাকা চাহিয়াছেন, তাহা আমরা দিতে প্রস্তুত নহি।[৩]

১. দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বণিক সঙ্ঘের একীকরণের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছিল ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে। এই প্রচেষ্টার পূর্ণ সাফল্য লাভ ঘটে ১৭০৮ সালে। নূতন সঙ্ঘের নাম United Company of Merchants of England Trading to the East Indies.

২. ১৭০৪ খ্রী. অব্দের জানুয়ারি মাসে, এই দুইটি ইংরাজ কোম্পানি এক হইয়া যায়। নূতন কোম্পানির কর্তা স্যর চার্লস্ আয়ার আয়ার আয়ার হুগলী হইতে সমস্ত মালপত্র লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই যুক্ত-কোম্পানির দলের বাছা বাছা লোক লইয়া একটি মন্ত্রণা-সভা গঠিত হইল। ইহাদের আমলই 'Rotation Government' বলিয়া বিখ্যাত।—*Summaries of Consultations* p. 48-57.

৩. "Tell Murshid Kuli" they said "that the Companies have amalgamated and we expect that a new head will soon be appointed. We are now one Company with one factory, and we shall therefore, according to the arrangement, make but a single payment of Rs 3000. As for Rs 15000 which he demands for the release of our trade, we refuse to pay it at all. Our trade should never have been hindered".—*Summaries of Consultations*, Wilson p. 170.

সেকালের মোগল কর্মচারীরা কোন একটা ব্যাপারের মীমাংসা করিতে বড়ই দীর্ঘ সময় লইতেন। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, কাজটা সহজে মিটাইয়া দিলে পাওনা তত বেশী হয় না। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারের মীমাংসার জন্য নবাব অযথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে হুগলীর শাসনকর্তা কলিকাতার কুঠির অধ্যক্ষদিগকে বলিয়া পাঠান, "একজন ইংরাজ কর্মচারীকে আপনারা আমার কাছে পাঠাইয়া দিন। আমার সহিত যে কাজের সম্পর্ক তাহা আমি মিটাইয়া দিতেছি। অবশ্য আমার নিজের জন্য ও কর্মচারীদের জন্য উপঢৌকনাদি যেন ঐ সঙ্গে পাঠান হয়।" ১

কলিকাতা কাউন্সিল অবশ্য এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। হুগলীর শাসনকর্তা আবার বেশী মুদ্রার দাবী করিলেন। এই সময় হুগলীর ফৌজদার নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিলেন। মুরশিদকুলি খাঁ সেই সময়ে উড়িষ্যা পরিদর্শন করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। ইংরাজপক্ষ হুগলীর ফৌজদারকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি আমাদের জন্য দেওয়ান মুরশিদকুলি খাঁকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিবেন। নিম্নশ্রেণীর মোগল কর্মচারীরা আমাদের বড়ই উত্যক্ত করিতেছে।"

মুরশিদকুলি খাঁ ইতিপূর্বে ডাচ-বণিকদের নিকট ৩০ হাজার টাকা আদায় করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাদের উকিল রাজারামকে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন দেওয়ানকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিও, "যে দুইটি কোম্পানি এখন এক হইয়া গিয়াছে। শীঘ্রই একজন এই দুই কোম্পানির কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। যদিও ইতিপূর্বে এই দুই কোম্পানি পৃথকভাবে সরকারে ছয় হাজার টাকা দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের একীকরণের সহিত ছয় হাজার টাকা দিতে তাহারা বাধ্য নহে। সাবেক দস্তুর মত তিন হাজার টাকাই দিবে। ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য সম্বন্ধে নবাব যে আরও ১৫০০০ টাকা চাহিয়াছেন তাহা দিতেও তাঁহারা বাধ্য নহেন। কারণ পূর্বের সনন্দ অনুসারে, ইংরাজের বাণিজ্য কখনই বন্ধ হইতে পারে না। তবে যে কিছু উৎপাত ঘটিতেছে, তাহা নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দোষে। এই জন্যই ইংরাজের বাণিজ্যের আয় কমিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহাদের আয়ের বর্তমান অবনতির অবস্থায় তাঁহারা বেশী দিতে সক্ষম নহেন।" রাজারাম চারিশত টাকা পাথেয় ও দেওয়ানের খাস কর্মচারীদের জন্য কতকগুলি উপঢৌকন সমেত যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন।২

১. হুগলীর ফৌজদার সাহেবকে কিরূপ উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

বেগুনী রঙের বনাত (১৬ গজ)	...	...	...	মূল্য—১১৪৲
সবুজ ঐ ঐ (২৪ গজ)	...	...	...	„ ৮০৲
লাল রঙের বনাত (২৩৷৷০ গজ)	...	...	...	„ ১২০৲
চলতি রকমের বনাত	...	...	...	„ ৮০৲
তরবারির ফলক	...	...	...	„ ৫৲
পিস্তল এক জোড়া	...	...	...	„ ২২৲
শিকারী বন্দুক (পাখী মারিবার জন্য)	...	...	...	„ ২২৲
বড় আয়না (৩০ ইঞ্চি)	...	...	...	„ ৩৮৲
ফ্লিণ্ট ওয়্যার (Flintware)	...	...	...	„ ৬০৲
			মোট—	৫৪১৲

এতদ্ব্যতীত ফৌজদারের আখবরনবিশ ও কোয়াশিদ্‌দার-এর জন্য ঐ ভাবে ৫২৪ টাকার জিনিস পাঠান হয়। বক্স বন্দরের দারোগা ও খোজা মহম্মদ বখ্‌শীও ২৮৪ ও ৩০০ শত টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লাভ করেন। উকিল রামচন্দ্র হুগলীতে এই সমস্ত উপঢৌকন সহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। একা হুগলীর ফৌজদার ও তাহার কর্মচারীরা এইরূপে তিন হাজার টাকার উপঢৌকন লাভ করেন।—*Summaries of Consultations No.117*,(1704).

২. এই উপঢৌকনগুলি কি তাহাও পাঠকের জানিয়া রাখা উচিত—

(১) বনাত—১০ গজ (উৎকৃষ্ট শ্রেণীর)। (২) অরোরা—১০ গজ (অল্প শ্রেণীর বনাত)।

১৬

নবাব দেখিলেন ইংরাজদের অপেক্ষা দিনেমারেরা সরকারে বেশী টাকা দিয়াছে, কাজেই তিনি তিন হাজার টাকার কথা উড়াইয়া দিয়া ইংরাজদের নিকট একেবারে নগদ বিশ হাজার টাকার দাবী করিলেন। ইংরাজেরা অগত্যা বিশ হাজারে উঠিলেন, কিন্তু তাহাতেও নবাব স্বীকৃত নহেন। শেষ এই দাবী পঁচিশ হাজারে দাঁড়াইল। ইংরাজেরা সেই সময়ে কাশিমবাজারের কুঠিটি জাঁকাইয়া তুলিবার সংকল্প করেন। তাঁহাদের দুইজন কর্মচারীও কুঠি খুলিবার উপযুক্ত দ্রব্যাদি লইয়া, কাশিমবাজারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। ইংরাজেরা অগত্যা বাধ্য হইয়া, নবাবের এই অস্বাভাবিক দাবী পঁচিশ হাজার টাকা দিতেই স্বীকৃত হইলেন।

কাজকর্ম অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে ইংরাজদের ভাগ্যগুণে ও বিধির বিধানে ঘটনাস্রোত সহসা অন্যদিকে পরিবর্তিত হইল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুসংবাদ বাঙ্গলায় পেঁৗছিবামাত্রই, ইংরাজেরা যে দুইজন কর্মচারীকে (বড্‌জেন ও ফিক্‌) কাশিমবাজারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। নবাবকে দিবার জন্য যে টাকা ধার্য হইয়াছিল তাহাও দেওয়া হইল না। বিধাতার কৃপায়, ইংরাজ বণিকগণ সে যাত্রা অনর্থক ক্ষতির হাত হইতে বাঁচিয়া গেলেন।[১]

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সংবাদ সুতালুটিতে পেঁৗছিবামাত্র একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কলিকাতা-কাউন্সিল, তখনই এক বিশেষ অধিবেশন করিয়া মন্তব্য স্থির করিলেন—"নানাস্থান হইতে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা হইতে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এরূপ স্থলে সর্বস্থানেই একটা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে। অতএব স্থির হইল, আপাতত টাকা কড়ি দেওয়া বন্ধ রাখা হউক, মিঃ ডারেল ও স্পেনসার যথা-সম্ভব শীঘ্র, কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানির দলিলপত্রাদি সমেত ফিরিয়া আসুন। কাশিমবাজারে মিঃ বড্‌জেন ও ফিকের উপরও এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইতেছে।"[২]

এক্ষণে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু-ব্যাপারে, ভারতের সর্বত্রই একটা হুলুস্থুল উপস্থিত হইল। আহম্মদনগরে সম্রাটের জীবলীলার অবসান হয়। আহম্মদনগর হইতেই তিনি শেষ যুদ্ধযাত্রা করেন। রণক্ষেত্রের ভীষণ পরিশ্রম, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, বার্ধক্য প্রভৃতিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিল। এ অবস্থাতেও তিনি দরবারে বসিতেন, সাধারণকে দেখা দিতেন, রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তবুও তিনি বুঝিলেন, যে কালব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহার হস্ত হইতে তাঁহার পরি-ত্রাণের আশা নাই। তিনি এত চেষ্টা করিয়াও দাক্ষিণাত্য হইতে মহারাষ্ট্র-শক্তির উচ্ছেদ করিতে পারিলেন না ইহাই তাঁহার মহাদুঃখ।

দিল্লীর সম্রাটের মৃত্যু যে কি, তাহা ঔরঙ্গজেব জানিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনা-ধিকার লইয়া, যে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে শোণিতযজ্ঞের সূচনা হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনি তাঁহার পিতা সাহজাহানকে শেষ অবস্থায় কিরূপভাবে নির্যাতন করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। এইজন্য মৃত্যুর সময়টা তিনি শান্তির সহিত অতিবাহিত করিবার বাসনা করিয়া পুত্রগণকে নিজের সান্নিধ্য হইতে দূরে পাঠাইলেন।

(৩) সাধারণ বনাত—১০ গজ। (৬) আয়না (চারি প্রকারের)।
(৪) একজোড়া পিস্তল। (৭) ছুরি ও কাঁচি।
(৫) একটি জাপানদেশ নির্মিত ঢাল।

—Vide *Summaries of Consultations* (Fort William July 1704).

১. *Consultations No. 107 and No. 199.*

২. The whole town and factory were thrown into confusion by the news, that the Moguil is dead. As these tidings were received from several sources people were found to credit the story and great was the consternation at the Fort. A hasty council was summoned and determined to stop as much as possible all paying out of money and as a revolution is expected, order all the men that are near enough such as Messrs Darrell &c to come back with what money and charters they have, belonging to the Company. —*Consultations No. 197.*

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহ-আলম তখন কাবুলে। কনিষ্ঠ কামবক্সকে সম্রাট একটু বেশী ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে বিজাপুরে পাঠাইলেন। আজম মালব দেশে প্রেরিত হইলেন।[১] সুদূর দাক্ষিণাত্যে আত্মীয়গণ পরিবর্জিত হইয়া তখন তিনি একা। চারিদিক হইতে দারুণ নিরাশা আসিয়া প্রলয়ান্ধকারের ন্যায় তাঁহার চিত্তকে গ্রাস করিল। তখন অতীতের বিষময় চিন্তা তাঁহার মৃত্যুচ্ছায়া কলঙ্কিত মনে, অসংখ্য আত্মগ্লানি উপস্থিত করিল। কি করিয়া তিনি বৃদ্ধ পিতার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন, কিরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত তিনি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিরূপ কঠোরভাবে নৃশংস পিশাচের মত তিনি দারা ও মোরাদকে হত্যা করিয়াছিলেন, সেই সব অতীত কথাই তাঁহার মনে পড়িল। সেই কষ্টার্জিত সিংহাসন, সেই সুবিশাল রাজ্য, সেই দ্যুতিময় ময়ূর-সিংহাসন ও অগণ্য মণিমাণিক্যময় রাজভাণ্ডার, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কোহিনুর. সবই ত পড়িয়া রহিল—তাহার একটিও ত তিনি সঙ্গে লইতে পারিলেন না। কোথায় অসংখ্য আলোকরাশি উজ্জ্বলিত আগরার রত্নময় প্রাসাদ, আর সেই সুখবিলাসপূর্ণ আগরা হইতে কতদূরে তিনি আত্মীয় বান্ধবহীন হইয়া এই দাক্ষিণাত্যে। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই যে তাঁহাকে সুদূরদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইতে হইয়াছে!

মৃত্যুর পূর্বে দারুণ নির্বেদ আসিয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেবের চিত্তাধিকার করিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, এত চেষ্টা করিয়া এতদিন ধরিয়া যাহা করিয়াছি সবই ভুল! জীবনে যে কঠোর পাপ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত! এই সব চিন্তায়, দারুণ মনোবেদনায় অধীর হইয়া সম্রাট দিন রাত ভীষণ যাতনা ভোগ করিতেন। তাঁহার জীবনের সন্ধ্যায় যে পত্রগুলি তিনি তাঁহার পুত্রদের লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার মনের অবস্থার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়।

একখানি পত্রে সম্রাট লিখিতেছেন, "যখন সংসারের প্রথম আলোক দর্শন করিয়াছিলাম তখন অনেকেই আমার পার্শ্বে ছিল। কিন্তু এখন আমি একাই চলিলাম। আমি কে, কেন পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্য, রাজকার্য, যুদ্ধ লইয়াই জীবন কাটাইয়াছি। স্বার্থের চিন্তাতে বিভোর হইয়া, জীবনের পথে অন্ধের মত চলিয়া আসিয়াছি। আত্মচিন্তায় সর্বস্ব অর্পণ করিয়া খোদাকে ভুলিয়াছি। এ জীবনে আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। যে দেশ আমার শাসনাধীনে ছিল, যে প্রজা আমার আশ্রয়াধীনে ছিল তাহাদেরই বা কি করিয়াছি? ঈশ্বর ত আমার প্রাণের মধ্যেই বিরাজিত ছিলেন কিন্তু আমার অন্ধ চক্ষু তাহা ত দেখে নাই। দেখিবার চেষ্টাও করে নাই। এ জগতে কিছুই সঙ্গে করিয়া আনি নাই, কিন্তু যাইবার সময় পাপের বিরাট বোঝা লইয়া চলিলাম। যদিও আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণায় একান্ত বিশ্বাস করি, তাহা হইলেও যে সমস্ত পাপ করিয়াছি তাহা ভাবিতে ভয় হয়। আমার কোন আশাই নাই। যাহাই ঘটুক না কেন, আমি জীবনতরী মহাসমুদ্রে ভাসাইলাম। বিদায়—বিদায়—বিদায়।"[২]

৪ঠা মার্চ ১৭০৭ খৃস্টাব্দের প্রভাতে, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনান্তে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রাণবায়ু দেহমুক্ত হইল। ঔরঙ্গজেব প্রায়ই বলিতেন, "খোদা কি এমন করিবেন না যে শুক্রবারে আমার মৃত্যু ঘটে?" তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল।[৩] যাহাতে বিনা জাঁকজমকে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি ব্যাপার সম্পন্ন হয়, এ আদেশ তিনি মৃত্যুর পূর্বেই দিয়া রাখিয়াছিলেন। অত বড় আলমগীর বাদসা, যাঁহার নাম শুনিলে লোকে কাঁপিয়া উঠিত, এইরূপে পুত্রগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

১. Kafi Khan in ***Elliot's History***, Cal 1877, Vol VII, p. 884.
২. Scott's ***Deccan*** 1794, Vol II, p. IV.
৩. Iradat Khan quoted in Scott's ***Deccan*** Vol IV, p. 10. Stanley Lane Poole's ***Aurangzeb*** p. 224.

রাজকুমার আজম এই সময়ে রাজধানী হইতে বিশক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যদি তিনি একটু বুঝিয়া চলিতেন হয়ত সিংহাসন তাঁহারই হইত। কিন্তু তিনি হঠকারিতা ও আত্মম্ভরিতা দোষে সমস্ত ক্ষমতাপন্ন আমির-ওমরাহগণকে শত্রু করিয়া তুলিলেন। বিপৎকালে কেহই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল না।

ধীর বুদ্ধি সাহ-আলম এই সময়ে অতি ধীরতার সহিত কাজ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান ভরসা তাঁহার দুই পুত্র—মুইজুদ্দিন ও আজিমওশ্বান। সে সময়ে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মুনাইম খাঁও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইবার দুইদিন পরে ১০ই মার্চ তারিখে, তিনি পেশোয়ারে উপস্থিত হন। এপ্রিল মাসে লাহোরে পৌঁছান। লাহোরে আসিয়া কয়েকদিন নির্জন অবসরের সুযোগে সাহ-আলম নিজের সেনাদল ও ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী ঠিক করিয়া লইলেন। তৎপরে দিল্লী ও আগরার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজিমওশ্বানও বিশ হাজার অশ্বারোহী লইয়া পথিমধ্যে পিতার সহিত মিলিত হইলেন।

শেষে সাহ-আলমেরই জয় হইল। জ্ঞানে, দক্ষতায়, মতলবে, তিনি আজমের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তবুও তিনি আজমকে প্রথমে এক পত্র লিখিয়া পাঠান, "এস ভাই! হিন্দুস্থানটা আমরা কয়জনে ভাগ করিয়া লই। বৃথা শোণিতপাতে প্রয়োজন কি?" আজম সাদীর কবিতার একটি চরণ-উদ্ধার করিয়া জ্যেষ্ঠের এই সঙ্গত প্রস্তাবের উত্তর দিলেন, "একখানি কম্বলে দশজন ফকির শুইতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যে দুইজন রাজা থাকিতে পারে না।"[১]

যাহা হউক এই ভ্রাতৃ-সমরে সাহ-আলমই বিজয়শ্রী লাভ করিলেন। সিংহাসন তাঁহারই হইল।

---

১. ভবিষ্যতে কামবক্সকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সাহ-আলম ১৭০৮ খ্রী. অব্দে দাক্ষিণাত্যের আরঙ্গবাদে আসেন। এই সময়ে কামবক্স হায়দারাবাদে ছাউনী করিয়াছিলেন। সাহ-আলম কামবক্সকে বলিয়া পাঠান—"ভাই! পিতা তোমাকে বিজাপুর রাজ্যের অধিকার দিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাকে তাহার উপর হায়দরাবাদ দিতেছি। আমি তোমার নিজের সন্তানের মত স্নেহ করি। অযথা মুসলমানের রক্তপাতের প্রয়োজন কি?" কিন্তু এ ন্যায্য প্রস্তাবেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। কামবক্স কিছুতেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। পরাজিত হইয়া আহত অবস্থায় তিনি সাহ-আলমের শিবির মধ্যে আনীত হন। এই সময়ে সাহ-আলম তাঁহাকে দেখিতে যান। সাহ-আলম কনিষ্ঠের সেই রক্তাপ্লুত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"ভাই! তোমাকে যে এ অবস্থায় দেখিতে হইবে, এ ইচ্ছা আমার ছিল না।" কামবক্স বলিলেন—"তৈমুর-বংশে জন্মিয়া যে প্রাণভয়ে ভীত কয়েদীর মত শৃঙ্খলিত হইয়া, তোমার কাছে আসি নাই ইহাই আমার সৌভাগ্য।" সাহ-আলম এ উত্তরে কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ভ্রাতার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সেই সময়ে দুইজন ইউরোপীয় ডাক্তার সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন। সাহ-আলম আহত ভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য তাঁহাদেরও নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু কামবক্স ঘৃণায়, মনের দুঃখে ভ্রাতার নিকট কোন সাহায্য লয়েন নাই।—*Iradat Khan* p. 55, *Khafi Khan*, p. 406.

পঞ্চদশ অধ্যায়

নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমল

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাষ্ট্র-বিপ্লব—সুলতান আজিমওশ্বানের পিতার সাহায্যের জন্য সেনা সংগ্রহ—ইউরোপীয় বণিকদিগকে অর্থের জন্য পীড়ন—ইংরাজ বণিকদের আতঙ্ক—এই বিপ্লব-সুযোগে ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণ কার্য সমাপন—পাটনার এজেন্টদের উপর সুবাদারের অত্যাচার—কলিকাতা কাউন্সিল কর্তৃক এ অত্যাচার প্রতিকার চেষ্টা—সাহ আলমের সিংহাসন প্রাপ্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহের শান্তি—আজিমওশ্বানের সুবাদারি পদে নিয়োগ ও দিল্লীতে অবস্থান—সাহজাদা ফেরোকসিয়ারের সুবাদারি লাভ—মুরশিদকুলি খাঁর পুনরায় দেওয়ানী প্রাপ্তি—হুগলীর নূতন ফৌজদার—ইংরাজ বণিকদের সহিত ফৌজদারের সংঘর্ষ—কলিকাতা আক্রমণের ভয় প্রদর্শন—ইংরাজদের কলিকাতা রক্ষার চেষ্টা—মীর মহম্মদের মধ্যস্থতায় বিবাদের নিষ্পত্তি—নূতন বাদসাহ দরবারে সনন্দপ্রাপ্তির চেষ্টা—ইংরাজদের উকিল শিবচরণের নিষ্ফল প্রয়াস—দেওয়ান মুরশিদকুলি খাঁ ও সুবাদার ফেরোকসিয়ারের অসম্ভব দাবিদাওয়া—উকিল শিবচরণের কার্যে ইংরাজ কাউন্সিলের অবিশ্বাস—তাহাকে নজরবন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য ফজল মহম্মদকে রাজমহলে প্রেরণ—নবাব ও সুবাদারের ইংরাজ বণিকদের নিকট দেড়লক্ষ টাকা উৎকোচ দাবি—হুগলীর ফৌজদারের চাতুরী—কামবক্সের দাক্ষিণাত্যে পরাজয় সংবাদে মুরশিদকুলি ও সাহজাদার দিল্লী গমন—কলিকাতার ইংরাজ বণিকগণ কর্তৃক মোগলচৌকির লোকদিগকে ধৃত করণ—শেরবলন্দ খাঁর দেওয়ানী লাভ—ইংরাজ বণিকদের প্রতি শেরবলন্দ খাঁর মৌখিক সহানুভূতি ও তাঁহাকে ৪৫ হাজার টাকা উৎকোচ দানে বাণিজ্যস্বত্ব লাভ—সাহ আলমের রাজমুকুট ধারণ—মুরশিদকুলির বঙ্গে প্রত্যাবর্তন—হুগলীর নূতন ফৌজদার জেয়াউদ্দিন খাঁ—জনার্দন শেঠের ইংরাজদের উকিলরূপে হুগলীতে ফৌজদারের নিকট গমন—ইংরাজদের সহিত জেয়াউদ্দিনের সদ্ব্যবহার—কলিকাতা কাউন্সিলের নূতন কর্তা ওয়েল্টডন—নবাব মুরশিদকুলির নূতন দাবি—দাবির জ্বালায় অস্থির হইয়া ইংরাজদের বাদসাহ দরবারে দূত প্রেরণ—সাহ আলমের মৃত্যু—পুনরায় নূতন রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা—আজিমওশ্বানের মৃত্যু—নূতন বাদসাহ জাহান্দার সাহ—সাহজাদা ফেরোকসিয়ারের দিল্লী সিংহাসন দখলের উদ্যোগ—মুরশিদকুলির নিকট অর্থসাহায্য ও সেনা প্রার্থনা—মুরশিদকুলির এ সাহায্য কার্যে অস্বীকার—পাটনা ও ঢাকা হইতে সেনা সংগ্রহ—ফেরোকসিয়ার কর্তৃক বিহার দখল—রাঢ়ের সুবাদার আবদুল্লা খাঁ ও হোসেন আলীর সাহায্য লাভ করিয়া ফেরোকসিয়ার কর্তৃক বাঙলার খালসা রাজস্ব লুণ্ঠন—ফেরোকসিয়ার কর্তৃক রসিদ খাঁকে মুরশিদকুলির দমনের জন্য প্রেরণ—নবাব মুরশিদকুলির সৈন্যের সহিত সাহজাদার সৈন্যের সংঘর্ষ—সকরীগলি ও তিলিয়া-গড়ীর যুদ্ধ—ফেরোকসিয়ারের পরাজয়—জাহান্দার সাহের সহিত ফেরোকসিয়ারের সংঘর্ষ—নূতন সম্রাট জাহান্দার সার শোচনীয় মৃত্যু—ফেরোকসিয়ারের সম্রাট উপাধি ধারণ—মুরশিদকুলির পুনরায় নবাব-নাজিমী পদ প্রাপ্তি—ফেরোকসিয়ারের নিকট উপহার প্রেরণ—মুরশিদকুলির সহিত পুনরায় ইংরাজের সংঘর্ষ—ইংরাজদের সম্রাট ফেরোকসিয়ারের দরবারে দূত প্রেরণ—সর্মান ও ডাক্তার হ্যামিল্টনের উপহার ও নজরানাসহ সম্রাট দরবারে গমন—সম্রাটের পীড়া—হ্যামিল্টন কর্তৃক সম্রাটের পীড়া শান্তি—ইংরাজ পক্ষের প্রচুর সম্মান ও পুরস্কার লাভ—ফেরোকসিয়ারের নূতন সনন্দ—কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয়ের অনুমতি—এতৎ সম্বন্ধে মুরশিদকুলির প্রতিযোগিতা—এই গ্রামগুলির বর্তমান ও অতীত পরিচয় তালিকা—নবাব মুরশিদকুলি খাঁর মৃত্যু—তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা—নবাবী আমলে দেশের অবস্থা।

এ অধ্যায়ে আমরা পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম সম্বন্ধে নানা কথা, মুরশিদকুলি খাঁর ইংরাজদের সহিত ব্যবহার—'রোটেশান' বা পর্য্যায়ক্রমিক গবর্ণমেণ্টের আমলে ইংরাজ-বাণিজ্যের অবস্থা ও দেশীয় শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলিব। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পৌত্র বাঙ্গলার সুবাদার সুলতান আজিম-ওশ্বান পিতার সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সরকারী রাজকোষ তিনি ইতিমধ্যেই হস্তগত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ যুদ্ধোদ্যমে আরও টাকা চাই। এ টাকা আসেই বা কোথা হইতে? শেষ তিনি ইউরোপীয় বণিকদের উপর পড়িলেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে তাহাদের নিকট একলক্ষ মুদ্রা চাহিয়া বসিলেন।

ইংরাজেরা এ সংবাদ শুনিয়া ভয় পাইলেন। বঙ্গের সুবাদারের এ দাবির কতকাংশ দিতে বাধ্য হইলেও তাঁহাদের ক্ষমতায় কুলাইবে না। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রথম উত্তেজনার কাল উত্তীর্ণ হইলে ইংরাজেরাও বুঝিলেন, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুতে তাঁহাদের একরূপ সুবিধাই হইয়াছে। পদস্থ-রাজ-কর্ম্মচারীরা এখন সকলেই যুদ্ধের হাঙ্গামায় ব্যস্ত। এই অবসরে অসম্পূর্ণ দুর্গের বাকি কাজগুলি শেষ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই এই উপযুক্ত অবসরে, তাঁহারা নদীতীরের দুইটি বুরুজ নির্ম্মাণ-কার্য শেষ করিয়া ফেলিলেন। পাটনা হইতে এই সময়ে সংবাদ আসিল, সুবাদার যুদ্ধ-কার্য্যের প্রয়োজনীয় টাকা আদায় করিবার জন্য জবরদস্তি আরম্ভ করিয়াছেন। ইংরাজদের কয়েক-জন কর্ম্মচারীকে তিনি ফাটকে দিয়াছেন। এই সংবাদে বিচলিত হইয়া কলিকাতা-কাউন্সিল রাজ-দরবারে একখানি পত্র পাঠাইলেন—তাহার স্থূলমর্ম্ম এই, "আপনারা যদি আমাদের উপর অন্যায় জবরদস্তি করেন, তাহার ফল শুভ হইবে না। পাটনায় যদি ইংরাজ কোম্পানির কোন ক্ষতি হয়, তাহা হইলে আমরা হুগলী বা অন্যস্থানে তাহার প্রতিশোধ লইব।"[১]

ইংরাজগণ এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিলে, ব্যাপারটা তখন একটু চাপা পড়িল। আজিমওশ্বান পিতার সাহায্যকল্পে সবিশেষ ব্যস্ত। কামবক্স তখনও প্রতিযোগিতা করিতে অগ্রসর। সুলতান পিতার সাহায্যার্থে, বঙ্গদেশ হইতে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে, ত্রিশহাজার অশ্বারোহী-সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সেনা-সাহায্য বাহাদুর সাহের বিজয়লাভের যথেষ্ট সহায়তা করিল।

বাদসাহ পুত্রের এইরূপ কার্য্যকুশলতা দেখিয়া তাঁহাকে পুনরায় বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারি দান করিলেন। কিন্তু উপস্থিত মত আজিমওশ্বান পিতার নিকটেই রহিয়া গেলেন। মুরশিদ-কুলি খাঁ পূর্ব্ববৎ বাঙ্গলার দেওয়ান হইলেন। আজিমওশ্বানের অনুপস্থিতি কালে, শেরবলন্দ খাঁর[২] তত্ত্বাবধানাধীনে রাজকুমার ফেরোকসিয়ার বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারের কাজ করিতে লাগি-লেন। কিন্তু তিনি নাম মাত্র সুবাদার। মুরশিদকুলি খাঁই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলার নায়েব-নাজিম ও দেওয়ান হইয়া রাজ্য-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারই চেষ্টাতে সৈয়দ একরাম খাঁ বঙ্গদেশের নায়েব-নাজিম হন এবং তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন উড়িষ্যার নায়েব-দেওয়ানী পদলাভ করেন।

মুরশিদকুলি খাঁ, এই সময়ে ইংরাজদিগের সহিত বাণিজ্য-বন্দোবস্ত করিবার জন্য, তাহা-দের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন। ইংরাজেরা এই আহ্বানের মর্ম্ম বুঝিয়া, একটু সন্দিগ্ধ ভাবে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। কামবক্স তখনও স্বাধীন। তখনও সমরক্ষেত্রে তাঁহার

১. The Sultan and his son demanded a lac of rupees as a contribution towards raising forces. Mr. Llyod and Cowthorp refused the money, so the Prince had the English Vakil seized and also the other native servants who belonged to the Company. . . A letter was sent to the Company's Vakil at Patna, telling him, that if the Company's people there are plundered, we will take satisfaction at Hugly or anywhere, we find it convenient to do so.—*Consultation No 203,* Wilson.

২. শের বলন্দ খাঁ—ইনি প্রথমে ছিলেন বর্দ্ধমান ও রাজমহলের ফৌজদার, পরে ১৭০৯ সালের এপ্রিলে ইনি 'Chief Manager of the Provinces of Bengal, Bihar and Orissa' পদে নিযুক্ত হন।

সম্পূর্ণ পরাজয় হয় নাই। নূতন সম্রাট ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়াছেন। সিংহাসন যে কাহার হয় তাহার স্থিরতা নাই। এ সময়ে মুরশিদকুলির সহিত টাকা দিয়া বন্দোবস্ত করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে কি না, ইহা ভাবিয়া ইংরাজেরা ইতস্তত করিতে লাগিলেন। অথচ অন্যপক্ষে তাঁহাদের বাণিজ্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, সোরার নৌকাগুলি পূর্ববৎ আটক হইয়া রহিয়াছে। পাটনার কুঠির কার্যেও বড়ই বিশৃঙ্খলা। এজন্য তাঁহারা পাটনায় কুঠি তুলিয়া দিবার মতলব স্থির করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৭০৮ খৃস্টাব্দে হুগলীতে একজন নবনিযুক্ত ফৌজদার আসিলেন। ইনি প্রথম প্রথম ইংরাজদের সহিত বেশ সদ্ব্যবহারই করিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন, যে কামধেনুরূপ ইংরাজ বণিকদের পীড়ন করিলেই কিছু দুগ্ধ পাওয়া যাইবে, তখন তিনি নিজমূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদের ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা ইংরাজ বণিকদের সহিত মালপত্রের লেনদেন করিও না।" ইহার উপর তিনি ইংরাজ কোম্পানির স্থানীয় প্রতিনিধিগণের উপর অযথা পীড়ন আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার ইংরাজদের ভয় দেখাইলেন, "আমি শীঘ্রই কলিকাতা আক্রমণ করিব।" ১

ইংরাজগণ ইহাতে ভয় পাইয়া সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। কলিকাতাবাসী। যত খৃষ্টান ছিল, তাহাদের নবনির্মিত দুর্গমধ্যে আনিয়া কুচকাওয়াজ শিখাইতে লাগিলেন। পর্টুগীজগণও এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানির সেনাদলে গৃহীত হইল। তখন কলিকাতায় ভাগীরথীবক্ষে দুইখানি মাত্র জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিল। তাহাদের মাঝি মাল্লাগণকেও সাবধান করিয়া দেওয়া হইল। ইংরাজেরা এরূপভাবে আয়োজন করিতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহারা অনায়াসে ফৌজদারদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে পারেন।

যাহা হউক এইরূপ অবস্থার দুইদিন পরেই, কলিকাতায় ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ যুবরাজ ফেরোকসিয়ারের কোয়াসিদদার মীর মহম্মদের নিকট হইতে এক অনুকূল পত্র পাইলেন। সে পত্রে লেখা ছিল—"আমি আপনাদের জন্য হুগলীর ফৌজদারের নিকট অনেক অনুযোগ করিয়াছি। তাঁহাকে বলিয়াছি, ইংরাজদের সহিত এরূপভাবে ব্যবহার করা উচিত হয় নাই। আপনি ইংরাজদের বাণিজ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। কিন্তু ফৌজদার আমাকে বলিলেন, নবাব মুরশিদকুলির আদেশেই এ কাজ হইয়াছে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। আর ইংরাজদের মালপত্র ও লোকজন যাহা আটক করা রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। আপনারা দুই চারিদিন অপেক্ষা করুন, আমি এ ব্যাপারের সম্বন্ধে শীঘ্রই একটা মিটমাট করিয়া দিব।" ইংরাজেরা এই পত্রের উত্তরে বলিয়া পাঠান, "আপনাদের যে সমস্ত কর্মচারীদের দোষে, আমাদের গোমস্তা ও কর্মচারিগণ আটক হইয়াছেন, আপনি তাঁহাদের কর্মচ্যুত করিলে, আমরা বড়ই সুখী হইব।"২

কেবলমাত্র সাহজাদার উপর নির্ভর করিয়া বা তাঁহার নিকট উকিল প্রেরণ করিয়া, কলিকাতার ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ফোর্ট সেণ্ট জর্জ বা মান্দ্রাজের বড়কর্তাও নূতন বাদসাহ সাহ আলমের নিকট হইতে অন্যদিক দিয়া সনন্দ লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। এইজন্য কলিকাতা কাউন্সিল, তাঁহাদের উকিলকে পুনঃ পুনঃ লিখিতে লাগিলেন—"সাহজাদাকে বলিও, শীঘ্রই আমরা নূতন বাদসাহের সনন্দ পাইব, পাইলেই তাহা দেওয়ান ও সাহজাদার নিকট পাঠাইব।"

---

১. In July the 'hot-headed phousder' began to resort to violence. He prohibited the local merchants from dealing with the English, abused the English representatives, imprisoned the English servants. An attack on Fort Willam seemed imminent. . . . On the 10th July "we summoned all the Europeans and Christian inhabitants and the Master of ships acquainting them that we expect some trouble from Hugly."—*Wilson,* Vol I p. 129.

২. *Summaries of Consultations, Nos. 247-249.*

ইংরাজদের যে সকল পুরাতন ফারমানের প্রতিলিপি, উকিল শিবচরণ রাজমহল লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ কোন ফললাভ হইল না। দেওয়ান ও ইংরাজপক্ষের মধ্যে দরদস্তুর আরম্ভ হইল।। কলিকাতা কাউন্সিল বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনার স্বাক্ষরিত বাণিজ্য ছাড়ের জন্য আমরা পনর হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত।" নবাব ও সাহজাদা ইহাতে সম্মত হইলেন না। উকিল পুনরায় লিখিয়া পাঠাইলেন, "আরও পনর হাজার টাকা চাই এবং তিনখানি আয়না চাই। একখানি আয়না সাহজাদা ফেরোকসিয়ারের জন্য ও অপর দুইখানি দেওয়ান মুরশিদকুলি খাঁর জন্য।" ইহাতেও ফল হইল না। উকিল আবার লিখিয়া পাঠাইলেন, "সাহজাদা ও দেওয়ান. ৩৫ হাজার টাকার কমে কোনরূপেই রাজি হইতেছেন না। ডাচ বণিকগণ ইতিপূর্বেই এই টাকা দিয়াছেন। সুতরাং ইংরাজেরাও ইহা দিতে বাধ্য।" ইংরাজেরা তাঁহাদের উকিলকে আবার লিখিয়া পাঠাইলেন, "২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আমরা দিতে পারি, ইহাতে যদি সুবাদার ও নবাব স্বীকৃত হন ত ভালই, নচেৎ তুমি সরাসর কলিকাতায় আসিবে।"[১] কিন্তু শিবচরণ কোম্পানির আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, নবাবকে ছত্রিশ হাজার টাকার এক হুণ্ডী দিয়া সেই সংবাদ কলিকাতায় পাঠাইলেন। কলিকাতার কর্তারা এই সংবাদ পাইয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প হইল শিবচরণ প্রদত্ত এ হুণ্ডী অমান্য করা হইবে। কিন্তু ততটা অগ্রসর হইতে তাঁহাদের সাহস হইল না। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের উকিলের উপর বড়ই চটিয়া গেলেন ও ফজল মহম্মদ নামক এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে রাজমহলে প্রেরণ করিলেন। ফজল মহম্মদের উপর আদেশ রহিল যে তিনি যেন শিবচরণকে আটক করেন ও প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করেন।

ফজল মহম্মদ ফিরিয়া আসিয়া যে সংবাদ দিলেন তাহাতে কলিকাতার কর্তাদের চক্ষুস্থির হইল। ফজল মহম্মদ জানাইলেন যে যদিও ৩৬ হাজার টাকা পাইয়া দেওয়ান ও সাহজাদা সনন্দ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তথাপি তাঁহারা কার্যত কিছুই করিতেছেন না। তাঁহাদের অভিলাষ এই যে তাঁহাদের দুইজনকে নজরানারূপে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং সম্রাটের রাজকোষে এক লক্ষ টাকা উপহার দিতে হইবে।[২]

ইংরাজেরা এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া হুগলীর ফৌজদারের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। ফৌজদার সাহেব তখন অনেকটা ঠাণ্ডা মূর্তিধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন "আপনাদের ভাবিবার কোন কারণ নাই। আপনারা আমাকে ৩ হাজার টাকা নজরানা দিবেন। আমি দেওয়ান ও সুবাদারকে অনুরোধ করিয়া যাহাতে ৩৫ হাজার টাকা দিলে, এ ব্যাপারটা মিটিয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিব।" কিন্তু ফৌজদার সাহেব মুখে যতটা আস্ফালন করিলেন, কার্যত তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। ১৭০৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরাজেরা সংবাদ পাইলেন—কাউথর্প সাহেব, যিনি রাজমহলে ইংরাজদের প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি এবং কোম্পানির মালের নৌকাগুলি আটক হইয়াছে। ঘটনাটা অবশ্য যুবরাজের আদেশেই হইয়াছে। আর চৌদ্দ হাজার টাকা না পাইলে যুবরাজ এগুলি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। এই

১. They received notice from their Vakil at Rajmahal that the Prince and Dewan have now increased their demands to Rs. 35000 for their *Sanad*. The Dutch had already given the sum, so the Prince and Dewan force the English to do the same. The Council decide they can not give such a sum. They write to their Vakil telling him to offer Rs. 25000. If the Dewan refuses to accept it, the Vakil is to come away—***Suttanuty Consultations No. 254.***

২. The Akhundi returned from Dewan's camp and told the Council that after having promised their *Sanad* the Prince and Dewan now refuse to give it, for less than fifty thousand rupees as a present for the Dewan and Prince and a hundred thousand rupees to be paid into the Emperor's treasury at Surat. The Akhundi had tried every means he could to lessen their demands but had not succeeded. The Dewan and the Prince, he said, were determined to have a large sum from the English—***Consultation No. 203.***

সময়ে কলিকাতায় সংবাদ আসে যে নূতন সম্রাট সাহ আলম কামবক্সকে পরাভূত করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া দেওয়ান মুর্শিদকুলি ও যুবরাজ ফেরোকসিয়ার দিল্লী যাত্রা করিলেন। এই সময়ে জোসিয়া চিটি নামক কোম্পানির একজন কর্মচারী কলিকাতা কাউন্সিলকে জানান যে, "খিদিরপুরের চৌকির, মোগল জমাদারেরা অনর্থক নৌকা আটক করিয়া তাঁহাদের ক্রমাগত কষ্ট দিতেছে।" প্রকৃতই এই চৌকিদারগুলো প্রায়ই কোম্পানির নৌকা আটক করিয়া কিছু উপরি আদায়ের চেষ্টা করিত। ইংরাজ-কর্তৃপক্ষীয়েরা কলিকাতার কুঠি হইতে ৬০ জন বরকন্দাজ ২০ জন বন্দুকধারী সেনা মোগল চৌকিদারদের ধরিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করেন। ইংরাজের লোক যথাস্থানে পৌঁছিলে উভয়পক্ষে বেশ একটা হাতাহাতি হইয়া গেল। ইহাতে ইংরাজপক্ষে ও মোগলপক্ষে কয়েকজন লোক জখম হয়। ইংরাজেরা কয়েকজন মোগল চৌকিদারকে কলিকাতার কুঠিতে ধরিয়া আনেন এবং তাহাদের থামে বাঁধিয়া চাবুকের দ্বারা আঘাত করিতে আদেশ প্রদান করেন।[১]

মুর্শিদকুলি খাঁ ও সুবাদার দিল্লীতে চলিয়া গেলে শেরবলন্দ খাঁ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় সুবাদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া নবনিযুক্ত সুবাদারকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এজন্য তাঁহারা জন আয়ার ও প্যাটেল সাহেবকে[২] তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে শেরবলন্দ খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। শেরবলন্দ খাঁও প্রথম প্রথম ইংরাজদের উপর সদয় ভাবই প্রকাশ করিলেন। তিনি আদেশ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনাদের বাণিজ্য যেমন চলিতেছে তেমনই চলুক, পরে সনন্দ আনাইলেই চলিবে।" কিন্তু সেকালের মোগল কর্মচারীদের মতিগতি বোঝা ভার। ভবিষ্যতে এই শেরবলন্দ খাঁই আবার খেয়ালের বশে ইংরাজদের মালের নৌকা আটক করেন। কোম্পানি আবার ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন করিলেন। এই পূজার প্রথম অংশ অর্থাৎ দুইটি হাজার টাকা তখনই তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য পাঠান হইল। কিন্তু শেরবলন্দ খাঁ ৪৫ হাজার টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। তিনি ইংরাজপক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এই টাকাটা আমায় দিলে আমি আপনাদের সনন্দ আনাইবার সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিব। আমি বঙ্গের দেওয়ানীপদে পাকা হইয়া যাই ত কথাই নাই। অন্যথায় আমার পর যিনি আসিবেন তাঁহাকেও এরূপভাবে অনুরোধ করিয়া যাইব, যাহাতে আপনাদের সনন্দ প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা না ঘটে। কিন্তু এই টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করিলে আপনাদের বাঙ্গলার বাণিজ্য আমি একেবারে বন্ধ করিয়া দিব।"

মোগলরাজ্যের নিয়মানুসারে প্রত্যেক নূতন সম্রাটের সময়েই নূতনভাবে সনন্দ আনাইতে হয়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সহিত পুরাতন সনন্দের স্বত্ব লোপ পাইয়াছিল। সাহ আলম তখন দিল্লীর তক্তে বসিয়াছেন, কাজেই তাঁহার নিকট হইতে নূতন সনন্দ না আসা পর্যন্ত ইংরাজেরা নিরাপদ নহেন। অগত্যা তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাঁহাদের এজেন্ট প্যাটেল সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন, "উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন।"[৩]

প্যাটেল সাহেব দেখিলেন পাটনায় কোম্পানির মালের নৌকা এই ভাবে আবদ্ধ থাকিলে মালামাল নষ্ট হইয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে ব্যবসায়েরও সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে। ইহার উপর মুর্শিদাবাদের মাশুলের জন্যও অনেক টাকা দাবি হইতেছে। প্যাটেল সাহেব অগত্যা শেরবলন্দ খাঁর হস্তে ৪৫ হাজার টাকা তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারে সরকারী খাজনাখানার অধ্যক্ষ ওয়ালীবেগ প্যাটেল সাহেবকে বিশেষরূপে সাহায্য করেন। ইংরাজেরা শেরবলন্দ খাঁর নিকট হইতে বঙ্গ-বিহার ও উড়িষ্যার অবাধ বাণিজ্যের সনন্দ লাভ করিলেন এবং ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, রাজমহল

---

১. We have considered it and believe it will be for the Company's interest to have them severely punished to deter the other troublesome Chaukis from committing the like. Agreed—that each of them be tied to the post and have 21 strokes with a split ratten and be kept for a further punishment.—*Consultation* **No. 309.**

২. প্যাটেল সাহেব—Edward Pattle.

৩. *Summaries of Consultations No. 325.*

প্রভৃতি স্থানের জন্যও তাঁহারা বিশেষ আদেশপ্রাপ্ত হইলেন।[১]

অগ্রেই বলিয়াছি মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্ট পিট সাহেব নূতন সম্রাটের দরবারে ভারতে ইংরাজের অবাধ-বাণিজ্য স্বত্ব সম্বন্ধে পূর্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। পিট কলিকাতার কাউন্সিলকে বলিয়া পাঠান, "আপনারাও এই সময়ে আমাদের সাথে যোগদান করুন।" কিন্তু সেই সময়ে কলিকাতার কর্তারা মুরশিদাবাদ ও রাজমহলে তাঁহাদের পথ পরিষ্কারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া পিটের সহায়তা করিতে পারেন নাই। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শেরবলন্দ খাঁ শাসনকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যুবরাজ ফেরোকসিয়ার, আজিমওশ্বানের স্থলে বাঙ্গলার সুবাদার ও নবাব মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ানরূপে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু মুরশিদকুলি খাঁর আগমনের পূর্বে যিনি অস্থায়ীভাবে দেওয়ানের কার্য করিতেছিলেন, তিনি কোম্পানির মালপত্র আটক করিয়া বলিয়া বসিলেন, "হাজার টাকা দাও, তাহা না হইলে আমি মালপত্র ছাড়িব না।" ইংরাজেরা মহা গোলযোগে পড়িলেন। শেরবলন্দ খাঁর উদর পূর্ণ করিবার জন্য অতগুলি টাকা মিছিমিছি জলে গেল। তাহার উপর আবার এই বিপত্তি। ইংরাজেরা ইহাতে সম্পূর্ণরূপে আপত্তি করেন। কিন্তু তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এই দেওয়ান নগদী-সেনাদের হস্তে নিহত হইলেন। নগদীরা প্রাপ্য বেতনের জন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিল। ইহার ফলে ইংরাজেরা ১৭১০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত নির্বিবাদে বঙ্গের বাণিজ্যকার্য চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আজিমওশ্বান প্রথম হইতেই মুরশিদকুলির উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাহার উদাহরণও পাঠক পূর্বে দেখিতে পাইয়াছেন। তখন তিনি বাদসাহ-পুত্র। তাঁহার পিতা সাহ আলম বাহাদুর সাহ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি ভাবিলেন মুরশিদকুলির মত একজন সুদক্ষ কর্মচারীকে ত্যাগ করিলে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি, অথচ তাঁহার অবাধ ক্ষমতা সংযত করাও আবশ্যক।

মুরশিদকুলি খাঁ মার্চ মাসে পাটনায় উপস্থিত হন। এদিকে বাদসাহ জেয়াউদ্দিন খাঁ নামক এক সুদক্ষ ব্যক্তিকে এপ্রিল মাসে হুগলীর ফৌজদার ও করমণ্ডল উপকূলের ও বঙ্গোপসাগরের নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন।[২] মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিট সাহেবের সহিত জেয়াউদ্দিনের খুব সদ্ভাব ছিল। পিটের সহিত তাঁহার যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা হইতেই প্রমাণ হয় তিনি ইংরাজদের পরম হিতাচিকীর্ষু বন্ধু ছিলেন।[৩] জেয়াউদ্দিন খাঁ মে মাসে হুগলীতে উপস্থিত হন। এই সময়ে জনার্দন শেঠ[৪] কোম্পানির প্রধান দালাল ছিলেন। ইংরাজপক্ষ নূতন ফৌজদারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, জনার্দনকে হুগলীতে পাঠাইলেন। জনার্দন ফিরিয়া আসিয়া কাউন্সিলকে জানাইলেন, "ফৌজদার সাহেব অতি অমায়িক ও ভদ্রলোক। আমার সহিত তিনি অতি ভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহার পূর্বে নবাবী প্রথামত

১. ইংরাজের এই শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্র খাজনা-খানার দারোগা ওয়ালীবেগ সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় আগমন করেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে মহাসমারোহে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সহস্রমুদ্রা মূল্যের দ্রব্যাদি উপহার দেন।

"Waly-Beg the Superintendent of the King's Treasury who had been most useful to Mr. Pattle in helping to get the order, was graciously pleased to visit Calcutta at the end of September, where he was received very civilly and had a present of one thousand rupees value made to him.—***Summary of Consultations No. 338.***

২. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'ইহার পূর্ণ নাম জেয়াউদ্দিন খাঁ। উচ্চারণে ইহা 'জেয়াদীনে' দাঁড়ায়। ইংরাজ দপ্তরের কাগজে ইনি জুডী খাঁ (Zoody Khan) নামেই পরিচিত। ইনি সম্ভ্রান্তবংশীয় ও নানাস্থানে রাজকার্যে নিযুক্ত হন। বাদসাহ দরবারে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি ছিল।

৩. Wheeler's ***Madras in the Olden Time,*** 1861 p. 289.

৪. জনার্দন শেঠ—১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর ইনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুৎসুদ্দির পদে নিযুক্ত হন। "ইংরেজ বণিকদের সংসর্গে থাকিয়া ইনি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েন।"—নগেন্দ্রনাথ শেঠ সংকলিত কলিকাতার তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস, পৃ. ৩৪-৩৫।

আপনাদের পক্ষ হইতে দুইজন লোক তাঁহার দরবারে হাজির হওয়া প্রয়োজন।" জনার্দনের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া কলিকাতা-কাউন্সিল মিঃ চিটি ও মিঃ ব্লাণ্ট নামক দুইজন সাহেবকে নূতন ফৌজদারের নিকট পাঠাইয়া দেন।

এদিকে 'রোটেশন গভর্ণমেণ্ট' বা পর্য্যায়ক্রমিক শাসনপ্রথার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। ১৮ই জুলাই তারিখে মিঃ এণ্টনি ওয়েল্টডনের নিকট হইতে কলিকাতা কাউন্সিল এক পত্র পান। এই পত্র বালেশ্বর হইতে লিখিত। ওয়েল্টডন লিখিয়াছেন, "আমি কোম্পানি কর্তৃক বঙ্গীয় বাণিজ্যাগারের প্রধানরূপে নিযুক্ত হইয়া বালেশ্বরে পৌঁছিয়াছি।" এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা পূর্বোক্ত ব্লাণ্ট সাহেবকে নবনিযুক্ত গবর্ণরকে প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য বালেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। ২০শে জুলাই সন্ধ্যাকালে ওয়েল্টডন কলিকাতায় পৌঁছান। তিনি দুর্গ সমীপে উপস্থিত হইলে কাউন্সিলের সভ্য জন রাসেল ও আডাম্স নামক দুইজন গণনীয় ব্যক্তি তাঁহাকে জাহাজ হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া দুর্গে আনয়ন করেন। এই সময়ে সেই নবগঠিত কলিকাতা সহরের পথে দেশীয় ও ইংরাজ অধিবাসীদের ভিড় এত বেশী হইয়াছিল, যে গবর্ণরকে অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া কলিকাতা দুর্গমধ্যে আসিতে হয়।[১]

সেপ্টেম্বর মাসে হুগলীর নবনিযুক্ত ও ইংরাজ-বন্ধু ফৌজদার জেয়াউদ্দিন খাঁ কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সম্বর্ধনার জন্যও যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রচুর উপহার ও রাজোচিত সম্মানলাভে তিনি ইংরাজদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হন। অক্টোবর মাসের শেষে জেয়াউদ্দিন হুগলী হইতে কলিকাতার ইংরাজ প্রেসিডেণ্টকে জানান "সম্রাট-পৌত্র ফেরোকসিয়ার আপনাদের কাউন্সিলের প্রধানকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ এবং একটি সুন্দর তুরঙ্গম ও একখানি সৌহার্দ্যসূচক পত্র পাঠাইয়াছেন।" ১৭১০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার কাউন্সিলের সদস্যগণকে লইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইলে জেয়াউদ্দিন তাঁহাকে উল্লিখিত উপহার দ্রব্যগুলি প্রদান করেন। সম্রাটের প্রিয়তম পৌত্রের নিকট হইতে এরূপ সম্মানসূচক উপহার পাইয়া কলিকাতা কাউন্সিল বড়ই প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে আমরা নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সহিত ইংরাজ কোম্পানির কার্যপ্রণালীর আলোচনা করিব। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে নবাব মুরশিদকুলি খাঁ সুবাদার বাঙ্গলার নায়েব-নাজিম ও দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে উপস্থিত হন।[২] এই সময়ে ইংরাজের কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন উইলিয়ম হেজেস সাহেব। পাঠক যেন পূর্ববর্তী গবর্ণর হেজেসের সহিত ইহাকে এক বলিয়া না ভাবেন। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলে, কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ হেজেস সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য গমন করেন। নবাব মিষ্ট কথায় ও সদ্ব্যবহারে ভুলিবার লোক ছিলেন না। ইংরাজ পক্ষের নিকট হইতে তিনি পুনরায় টাকা চাহিয়া বসিলেন। এই সময়ে খাঁ জাহান বাহাদুর উড়িষ্যা ও বিহারের নায়েব ও সুবাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ইংরাজদের আটকী সোরার নৌকা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের অবাধ বাণিজ্যের জন্য আদেশ প্রদান করিলেও, মুরশিদকুলি খাঁ তাহা আমলেই আনিলেন না। ইংরাজদের মালপত্র বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও আটক হইতে লাগিল। আজিমওশ্বান প্রথমে ইংরাজদিগকে সনন্দ দানে

১. নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ের প্রাচীন কলিকাতা কতদূর জনপূর্ণ হইয়াছিল। He (Weltden) was met at his landing by most of the Europeans in the town and the natives in such crowds, that it was difficult to pass to the Fort, where he was conducted by the Worshipful John Russell and Abraham Adams Esqr, and the Council. —*Summaries of Consultations No. 383.*

২. ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। তিন বছর পর তিনি নিযুক্ত হন বাংলার 'Deputy Subadar' পদে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাংলার পুরা সুবাদারের পদ লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার উপাধি ছিল—মুতামান-উল্-মুলক আলাউদ্দোলা জাফর খাঁ বাহাদুর, নাসিরি নাসির জঙ্গ।—Sir J. N. Sarkar (Ed)—*History of Bengal,* Vol II, p. 399.

প্রতিশ্রুত থাকিলেও, শেষে তিনি ইংরাজদিগকে সনন্দের পরিবর্তে 'নিসান' দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু নবাব ইংরাজের প্রধান শত্রু। ইংরাজপক্ষ বহু চিন্তায় ও নানাবিধ পরামর্শের পর বুঝিলেন, তাঁহাদের ভাগ্য-রন্ধ্রস্থিত শনি দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, তাঁহাদের আর নিস্তার নাই। শেষ মীমাংসা হইল যে ত্রিশ হাজার টাকা পাইলে নবাব নিজে ছাড় লিখিয়া দিবেন ও সনন্দ আনাইয়া দিলে তাঁহাকে আরও সাড়ে বাইশ হাজার টাকা উপহার দিতে হইবে। কেবলমাত্র নবাবের করুণার উপর নির্ভর না করিয়া ইংরাজপক্ষ স্বাধীনভাবে দিল্লীতে বাদসাহ-দরবারে দূত পাঠাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। তাহার যোগাড়যন্ত্রও চলিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল সম্রাট বাহাদুর সাহ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে আবার চারিদিকে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।১

প্রায় পঞ্চবর্ষ কাল রাজত্ব করিয়া সম্রাট বাহাদুর সাহ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মোগল রাজসংসারের চিরন্তন প্রথানুসারে সিংহাসন লইয়া পুনরায় বাদসাহ-পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। আজিমওশ্বান মৃত বাদসাহের কিছু বেশী প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাহাদুর সাহ আজিম-ওশ্বানকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন ও তাহার পরামর্শানুসারেই অনেক রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। লাহোরে বাদসাহের মৃত্যু হয়। সুলতান আজিমওশ্বান রাজকোষ ও গোলন্দাজ সৈন্য আয়ত্বাধীন করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ সাহজাদা মুইজুদ্দিন অভিমান বশে পিতার মৃত্যু সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত করিতে আসেন নাই। প্রধান প্রধান আমির-ওমরাহগণ আজিমওশ্বানের পক্ষভুক্ত ছিলেন। সৈন্যবলও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। আজিমওশ্বান যদি এই সময়ে ধীরভাবে কাজ করিতেন, তাহা হইলে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাকেই জয়মাল্য প্রদান করিতেন। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে বাদসাহের প্রধান উজীর আসাদউদ্দৌলার পুত্র বাদসাহী সৈন্যের একজন প্রধান সেনাপতি জুল-ফিকার খাঁ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি সুবিধামত বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আজিমওশ্বান নিহত হন এবং এইরূপে সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া মুইজুদ্দিন 'জাহান্দার সাহ' নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।২

জাহান্দার সাহ সম্রাট হইয়া চলিত প্রথানুসারে দিল্লী-দরবার হইতে নবাব মুরশিদকুলি খাঁকে দেওয়ানী সনন্দাদি পাঠাইয়া দেন। মুরশিদকুলি খাঁও এই নূতন সম্রাটের উপযুক্ত সওগাদাদি পাঠাইয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তি জ্ঞাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে নবাব মুরশিদকুলি খাঁই এই সময়ে বাঙ্গলার সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। এদিকে আজিমওশ্বানের পুত্র সুলতান ফেরোকসিয়ারও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পাটনায় সম্রাট বলিয়া আত্মঘোষণা প্রচার করিয়া, মুরশিদ-কুলি খাঁকে তাঁহার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেন এবং বঙ্গদেশের রাজস্ব চাহিয়া পাঠান। মুরশিদকুলি খাঁ বলিয়া পাঠান, "আমি দিল্লীশ্বরের আজ্ঞাধীন। তৈমুর-বংশীয় যে কেহ দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মস্তকে মুকুট ধারণ করিবেন—দিল্লীর সিংহাসনে বসিবেন—আমি

---

১. *Summary of Consultations No. 383.*

২. মোগলের সিংহাসন চিরদিনই অভিশপ্ত। শোণিতধারা দ্বারা ধৌত না হইলে নূতন সম্রাট ইহাতে আরোহণ করিতে পারেন না। সাহজাহান নিষ্ঠুরভাবে খসরুকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর পাপে তাঁহাকে জীবনের শেষ ভাগে সামান্য কয়েদীর মত থাকিতে হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে অতি নৃশংস-ভাবে হত্যা করেন। দারার রুধিরাক্ত ছিন্নমুণ্ড স্বহস্তে ধৌত করিয়া তবে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইহা দারার মস্তকই বটে। গোয়ালিয়র দুর্গে হতভাগ্য মুরাদের জীবলীলার অবসান হয়। সুজার মৃত্যুর উপলক্ষ্যও তিনি। সাহ-আলম তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়কে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা না করিলেও তাহাদের শোচনীয় মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। জাহান্দার সাহ এ প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করিবেন কেন? তিনিও সাহজাদা আজিমওশ্বানকে নিহত করেন। প্রধান মন্ত্রী আসাদ খাঁ ও আমির উল উমরা জুলফিকার খাঁর সাহায্যে সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে ইহসংসার হইতে অপসৃত করেন। বাহাদুর সাহের পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা ৩০ জনের অধিক ছিল। জাহান্দার সাহ ইহাদের সকল-কেই হত্যা করেন। অন্য যাহারা জীবিত রহিল তাহাদেরও তিনি কারারুদ্ধ করেন। কেবল ফেরোকসিয়ার বঙ্গ-দেশে ছিলেন বলিয়া বাঁচিয়া যান। কিন্তু জাহান্দার সাহ ফেরোকসিয়ারকে বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্য বাঙ্গলার নবাবকে আদেশ করেন। ফেরোকসিয়ার ইহা পূর্বে জানিতে পারিয়াই আত্মরক্ষার জন্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া জাহান্দার সাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিব, তদ্ব্যতীত আর কাহারও আজ্ঞাধীন হওয়া কৃতঘ্নতার লক্ষণ। সুতরাং বাঙ্গলার রাজস্ব আমি আপনাকে প্রদান করিতে পারি না।"[১] ফেরোকসিয়ার বাঙ্গলার রাজস্ব ও সৈন্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, মনে মনে বলিলেন "খোদাই আমার সহায়।" নিতান্ত বাধ্য কয়েকজন আত্মীয় অন্তরঙ্গদের সহায়তাকে তিনি তাঁহার প্রধান অবলম্বন ভাবিয়া, কার্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ঢাকা হইতে রাজসৈন্য ও কামান আনয়ন করিয়া সাজিহানাবাদ বা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাটনায় উপস্থিত হইয়া তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করেন। বিহারের ও বারাণসীর জমিদারদের নিকটও অনেক টাকা আদায় হইল। ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকদের নিকটও তিনি প্রচুর মুদ্রার দাবি করেন। পাটনার শাসনকর্তা, নবাব সৈয়দ হোসেন আলিকে তিনি বাঙ্গলার দেওয়ানের সমস্ত সম্পত্তি এবং তদভাবে তাঁহার মস্তক আনিতে আদেশ করেন।

তিনি বিহারের বণিকদিগের নিকট হইতে করস্বরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়া বিহার প্রদেশ স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন। অনন্তর ফেরোকসিয়ার রাজকীয় আসবাব প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তথায় সিংহাসনে উপবেশন ও মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিলেন। তৎপরে সুলতান পাটনা পরিত্যাগ করিয়া মহোল্লাস সহকারে বারাণসীতে উপনীত হইলেন। বারাণসীর প্রধান ধনিগণ ও শেঠদিগের নিকট "রাজ্য প্রাপ্তি হইলে তোমাদের ঋণ শোধ করিব", এই কড়ারে এক কোটি টাকা ঋণরূপে সংগ্রহ করেন। অর্থের অভাব বিদূরিত হওয়ায় তিনি সেনা-সংগ্রহে মনোযোগী হন। রাঢ় নিবাসী সৈয়দ বংশোদ্ভব আবদুল্লা খাঁ ও হোসেন আলী, সুবা অযোধ্যা ও সুবা এলাহাবাদের সেনাপতি-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সে সময়ে বীরপুরুষ ও মহাযোদ্ধা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। জাহান্দার সাহ ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করায় তাঁহারা নূতন সম্রাটের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। কাজেই সুলতান ফেরোকসিয়ার তাঁহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইবামাত্রই তাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহার সহায়তার জন্য জীবন সমর্পণে প্রতিশ্রুত হইলেন।[২]

এই সময়ে সুলতান এলাহাবাদে উপস্থিত হন। এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন যে তথাকার শান্তিরক্ষক সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ তিন শত অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে তথাকার রাজকীয় উদ্যানে বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত রাজস্ব রক্ষা করিতেছেন। এ সংবাদে ফেরোকসিয়ার বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনি বলপূর্বক সেই রাজস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিজ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব বিদূরিত হইল। পিতৃমিত্র হোসেন আলীকে তিনি মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন এবং নিজের নামে শিক্কা ও খোত্‌বা প্রচলিত করিলেন।

ফেরোকসিয়ার মুরশিদকুলির ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার অনুচর মির্জা আফসিরি বা আফরাসিয়ার খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, রসিদ খাঁকে বাঙ্গলার নাজিমের

১. One of his (Jahander Shah's) first cares was to despatch an order to Jafar Khan (Murshid Kuli), Viceroy of Bengal for sending the Prince Ferock Siyur prisoner to court. The order embarrassed the Khan, who sent him a trusty person who advised him to provide for his safety by flying the country in time or perhaps the Prince himself having got some advice of the orders recieved by the Khan, thought it unsafe for him to remain longer in the country.—*Seir-Mutakerin* Vol I. মুরশিদকুলি গোপনে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়ার জন্যই হউক বা অন্য কোন সূত্রে তিনি জাহান্দার সার উদ্দেশ্য জানিতে পারার জন্যই হউক, ফেরোকসিয়ার সময় থাকিতে আত্মরক্ষার উপায় বিধান করেন।

২. কিন্তু সিয়ের 'মুতাক্ষরীনের' মতে এই সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল সেই সময়ে স্ব স্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখনও তাঁহারা কর্মচ্যুত হন নাই। এই ভ্রাতৃদ্বয় ইতিপূর্বে ফেরোকসিয়ারের পিতা সুলতান আজিমওশ্বানের নিকট যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করেন ও উপকৃত হন। সেই উপকারের কৃতজ্ঞতা ঋণ পরিশোধের জন্যই ফেরোকসিয়ারের মনোভিলাষ জ্ঞাত হইয়াই তাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। ইঁহারা দুই জনেই রণকুশল ও সাহসী-বীর। তাঁহাদের দুই জনের অধীনেই যথেষ্ট সেনা ছিল। কাজেই ইঁহাদের সাহায্য লাভ করিয়া ফেরোকসিয়ার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেন।

পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান।[১]

রসিদ খাঁ বিপুল বাহিনীসহ বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া তেলিয়াগড়ী ও সকরীগলির গিরিপথে প্রবেশ করিলেন। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণে কিছু মাত্র ভীত না হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রসিদ খাঁ মুরশিদাবাদ হইতে তিন ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। মুরশিদকুলি খাঁ মীর বাঙ্গালী ও সৈয়দ আনোয়ার খাঁ নামক দুই জন যোদ্ধাকে তাঁহার সেনাপতি পদে বরণ করেন। এই দুই যোদ্ধার সহিত দুইসহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা প্রেরিত হইল।

রিয়াজের লেখকের মতে—মুরশিদকুলি খাঁ তখনও অবিচলিত। ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার কোন ভাবনাই নাই। তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে কোরাণের এক একটি অংশ লিখিয়া রাখিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়া তিনি কোরাণ লিখিতে মনোনিবেশ করিলেন। এই যুদ্ধে আনওয়ার খাঁ শত্রুহস্তে নিহত হন। মীর বাঙ্গালী অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রসিদ খাঁর সৈন্য তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিল। নবাবের নিকট যখন এ সংবাদ পেঁছিল তখনও তিনি অবিচলিত। একমনে কোরাণ লিখিতে নিবিষ্ট। মীর বাঙ্গালী যুদ্ধে অক্ষম হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। নবাব এই সংবাদ অবগত হইয়া মুরশিদাবাদের ফৌজদারি সেনানায়ক এবং নিজের বিশ্বস্ত অনুচর মোহম্মদ খাঁকে, মীর বাঙ্গালীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মীর বাঙ্গালী প্রভুকে আসিতে দেখিয়া পুনরায় সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগদান করেন এবং রাজধানীর বহির্ভাগে খরিসাবাদের ময়দানে রসিদ খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মুসলমান লেখকগণ বলেন, "নবাব হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া যুদ্ধকালে 'সয়ফি' মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই মন্ত্র বলেই তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন।" রসিদ খাঁ মীর বাঙ্গালীর হস্তনিক্ষিপ্ত তীরে ধরাশায়ী হন, পরিশেষে মহাযুদ্ধের পর নবাব মুরশিদকুলি খাঁ জয়লাভ করেন। নবাবের সৈন্যগণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। এরূপ প্রবাদ আছে যে, লোকের মনে ভয়সঞ্চার করিবার জন্য নবাব মুরশিদকুলি খাঁ, নিহত সৈন্যের মস্তক দ্বারা প্রকাশ্য রাজপথে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। এই স্তম্ভের প্রত্যেক কোণে রসিদ খাঁ ও তাহার অনুচরবর্গের ছিন্নমস্তক রক্ষিত হইয়াছিল।"

নবাবের জয়লাভ ও রসিদ খাঁর মৃত্যু সংবাদে সাহজাদা ফেরোকসিয়ার অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়েন। এই সময়ে সংবাদ আসে যে খাঁজাহান সকরীগলির প্রবেশপথ অবরোধ করিয়া, দখলে আনিয়াছেন। কিন্তু এই সময়ে সম্রাট-পুত্র এয়াজুদ্দিন সসৈন্যে আগরায় উপস্থিত হইয়াছেন

১. এই মির্জা আফরাসিয়ার খাঁ বঙ্গদেশে কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন ও রাজসংসারে প্রতি-পালিত হন। তিনি পরাক্রমে রুস্তম ও ইস্ফেন্দিয়ারের সমকক্ষ ছিলেন এবং মত্ত হস্তীকেও ভূতলশায়ী করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে, সুলতান ফেরোকসিয়ার যখন আকবর নগর হইতে আজিমাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন তখন 'মালেক-ময়দান' নামক একটি বৃহৎ কামান সকরীগলির নিকটবর্তী এক কর্দমাক্ত নিম্ন ভূমিতে বাঁধিয়া গিয়াছিল। এই তোপ পূর্ণ করিতে এক মণ গোলা লাগিত এবং ৫০টি গরু ও ২টি হস্তীতে উহা টানিয়া লইয়া যাইত। এই তোপ এক সময়ে কর্দমে বসিয়া যায়। হস্তী ও গরুগুলি প্রাণপণ চেষ্টায় উহা মাটিতে তুলিতে পারিল না। ফেরোকসিয়ার স্বয়ং তোপের নিকট উপস্থিত হইয়া ফিরিঙ্গি গোলন্দাজদের দ্বারা বহু কৌশল অবলম্বন করাইয়াও কৃতকার্য হইলেন না। তখন মির্জা আফরাসিয়ার সসম্মানে ফেরোকসিয়ারকে বলিলেন, "যদি আপ-নার অনুমতি হয় তাহা হইলে এ দাসও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।" সুলতান অনুমতি করিলে মির্জা আফরাসিয়ার পরিধেয় বস্ত্র যথোপযুক্তরূপে বিন্যস্ত করিয়া কামানের চাকার নিম্নে দুইহস্ত দ্বারা ধরিয়া উহা স্বীয় বক্ষঃস্থল পর্যন্ত উত্তোলিত করেন। তৎপরে তিনি সাহজাদাকে বলিলেন, "এখন যেখানে অনুমতি করিবেন সেই খানেই তোপ রাখিয়া দিই।" তিনি সুলতানের ইঙ্গিত ক্রমে পার্শ্বস্থ উচ্চ ভূমিতে তোপ রাখিয়া দিলেন। এজন্য তিনি এতদূর বল প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে তাঁহার চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ফেরোক-সিয়ার তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন। সমবেত সৈন্যগণ তাঁহার এই অদ্ভুত বীরত্বের জন্য জয়নাদ করিয়া উঠিল। এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তিনহাজারী সেনার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া 'মির্জা আফরাসিয়ার খাঁ' উপাধিতে বিভূষিত হইলেন।—রিয়াজ-উস্-সালাতিন, অনুবাদ পৃ. ২৫৫।

—এই সংবাদ পাইয়া, ফেরোকসিয়ার তাঁহার গতিরোধার্থে আগরার পথ ধরিলেন। গমনকালে তিনি ওলন্দাজদের নিকট হইতে দুইলক্ষ ও ইংরাজদের নিকট বাইশ হাজার টাকা জবরদস্তিতে আদায় করিলেন।

কাজোয়া নামক স্থানে বাদসাহী সৈন্যের সহিত ফেরোকসিয়ারের একটি যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাদসাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র এয়াজুদ্দিন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হন। ফেরোকসিয়ার দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাহান্দার সাহের এতক্ষণে চেতনা সঞ্চার হইল। বিপদ হইতে প্রতিকারের আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া এক দিবস ব্যাপী একটা বিশৃঙ্খল যুদ্ধাভিনয়ের পর এই অপদার্থ সম্রাট লালকুয়র নামক এক বারবণিতাকে সঙ্গে লইয়া, শ্মশ্রু মুড়াইয়া হিন্দু সাজিয়া নিশাযোগে দিল্লী হইতে পলায়ন করিলেন। পরে দিল্লীর সহর কোতোয়াল আসাদউল্লার বাটিতে ধরা পড়িয়া নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হন এবং ফেরোকসিয়ার আরও দুই একটি সামান্য যুদ্ধের পর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।[১]

দিল্লীর তক্ত অধিকার করিয়া ফেরোকসিয়ার বাদসাহ হইলেন। বর্দ্ধমানবাসী সাহ সুফী ফকিরের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইল। বাঙ্গলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের মুকুট মণি। ফেরোকসিয়ারের এই সাফল্যের প্রধান ভরসা, এই বাঙ্গালার রাজস্ব। বহুদিন বঙ্গদেশে বাস করিয়া, রত্নপ্রসূ বাঙ্গলার কুবের ভাণ্ডারের দৃশ্য যে তাঁহার চক্ষে পতিত হয় নাই, এমন নহে। এক সময়ে স্বার্থরক্ষার জন্য, মুরশিদকুলি খাঁর সহিত তাঁহাকে বিবাদ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মুরশিদকুলি খাঁ কিরূপ সুচতুর ও কার্যদক্ষ কর্মচারী, বাঙ্গালার রাজস্ব-বিভাগের তিনি কি অসম্ভব উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি বহুদিন ধরিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই সিংহাসনে অধিরোহণের পর তিনি মুরশিদকুলি খাঁকেই বাঙ্গলার দেওয়ান পদে বহাল করিলেন। মুরশিদকুলি খাঁও বাদসাহী সনন্দ পাইয়া প্রথামত (পেস্কস) উপহার প্রেরণ করিলেন। বাদসাহও সরকার হইতে তাঁহাকে পদোপযুক্ত শিরোপা ও পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেন।

বাদসাহী-ফারমান ও নিশানের বলে ইংরাজেরা এপর্যন্ত তিন সহস্র টাকা বাণিজ্য শুল্করূপে সরকারে দিয়া আসিতেছিলেন। ইহাতে অন্যান্য ইউরোপীয়-বণিকদের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। দেশীয় বণিকেরাও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। মুরশিদকুলি খাঁ ইংরাজদের উপর ততটা সদয় ছিলেন না। কাজেই তিনি বাণিজ্য-সম্বন্ধে সাম্যনীতি অবলম্বন সঙ্কল্প করিলেন। অন্যান্য বণিকগণের নিকট যেরূপ বর্দ্ধিত হারে বাণিজ্যকর আদায় করা স্থির হইল, নবাব ইংরাজ-বণিকদেরও তদনুযায়ী শুল্ক দিতে বাধ্য করিলেন। পুরাতন বাদসাহী নিশান ও ছাড়-সমূহের স্বত্বমত ইংরাজগণ এপর্যন্ত সরকারি প্রাপ্য একটি নির্দিষ্ট হারে দিয়া আসিতেছিলেন। তাহা রদ করিয়া দিয়া তিনি অন্যান্য ইউরোপীয়-বণিকদের মত ইংরাজপক্ষের উপর অতিরিক্ত দাবী করিলেন।

ইংরাজ-বণিকগণ দেখিলেন, দুইটি উপায়ের সহায়তায়, তাঁহারা এই উপস্থিত বিপদের প্রতি-

১. The pusillanimous Emperor (Jahander Shah) at length taken having the field contending armies met in the vicinity of Agra and after a confused battle, which lasted nearly the whole day the Imperial army was completely routed, and the Emperor accompanied by his mistress Lall Coar fled upon his elephant to Agra. Where having changed his dress and shaved his head and beard in the manner of Hindus, he in the middle of the night, continued his flight to Delhi and upon his arrival in that city instead of going to the fort he slept at the house of the Vizer Asaduddowlah. ফেরোকসিয়ার দিল্লী প্রবেশ করিয়াই আসাদউল্লার গৃহে সম্রাটের অবস্থান ব্যাপার জানিতে পারেন। তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে আসাদউল্লা ও তাঁহার পুত্র জুলফিকার খাঁ ফেরোকসিয়ারের নিকট উপস্থিত হন। নূতন সম্রাট তাঁহাদের উভয়কেই পদোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। আসাদউল্লাকে বিনা শাস্তিতে মুক্তি দেওয়া হয়। জুলফিকার খাঁই জাহান্দার সার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে এক নির্জন তাঁবুতে লইয়া গিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করা হয়। তদুত্তরে তাঁহার দোষ প্রমাণিত হওয়ায়, সম্রাট তাঁহাকে ফাঁসি দিয়া হত্যা করেন। ইতিপূর্বে জাহান্দার সাকে কারাগার মধ্যে হত্যা করা হইয়াছিল। পরে এই দুই মৃত দেহ হস্তীতে তুলিয়া ফেরোকসিয়ার সদল বলে দিল্লী প্রবেশ করেন। —Stewart's *History of Bengal* p. 391, Scott's *History of the Deccan* Vol I, p. 1.

কার করিতে পারেন। [illegible] যেভাবে দাবি দাওয়া করিতেছেন, তাহা দিতে পারিলে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু সেইভাবে শুল্ক দিয়া, এ বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিতে গেলে, তাঁহারা অন্যান্য বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। দ্বিতীয় উপায়, নূতন বাদসাহ ফেরোকসিয়ারের দরবারে দিল্লীতে দূত প্রেরণ। পরিশেষে ইংরাজ কর্তৃপক্ষগণ পরামর্শ করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন "দিল্লীতে সম্রাট দরবারে দূত প্রেরণ করাই উচিত।"

হেজেস সাহেব তখন কলিকাতার বাণিজ্যাগারের সর্বপ্রধান কর্মচারী। তাঁহার উপর দূত নির্বাচনের ভার পড়িল। জন সর্মান[১] ও এডওয়ার্ড স্টিফেনসন নামক দুইজন প্রবীণ ফ্যাক্টর, দূতরূপে নির্বাচিত হইলেন।[২] কলিকাতা দুর্গের ডাক্তার হ্যামিলটন এই দৌত্যাভিযানের চিকিৎসক-রূপে নির্বাচিত হয়েন।

এই সময়ে খোজা সরহদ[৩] বলিয়া একজন ধনী আর্মানী-সওদাগর কলিকাতার মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনিও এই দৌত্যাভিযানের সঙ্গে দ্বিভাষীরূপে চলিলেন। খোজাসাহেবের বিশেষ স্বার্থ এই তিনি বিনা ব্যয়ে, বিনা শুল্কে, কোম্পানির এই অভিযানের সহিত কতক মালপত্র দিল্লীতে ব্যবসার জন্য লইয়া গিয়া উচ্চমূল্যে বেচিতে পারিবেন।

সম্রাটের ও তাঁহার কর্মচারীদের জন্য সার্ধ তিনলক্ষ টাকার উপঢৌকন নির্বাচিত হইল। এই উপঢৌকন দ্রব্যের মধ্যে কাচের বাসন, বহুমূল্য ঘড়ি, কিঙ্খাপ, উৎকৃষ্ট রেশমী ও পশমী বস্ত্র ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্য ছিল। খোজা সরহদ ইতিমধ্যে দিল্লীতে একখানি পত্র পাঠাইয়া বাজার সরগরম করিয়া তুলিলেন। সে পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সম্রাটের জন্য ইংরাজ-বণিকগণ দশ-লক্ষ টাকার উপহার দ্রব্য লইয়া যাইতেছেন।" কথাটা সম্রাটের কানে পেঁৗছিল। তিনি ইংরাজদের উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। ইংরাজেরা যে সকল স্থান অতিক্রম করিবেন, তথাকার প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদের উপর সম্রাট আদেশ প্রদান করিলেন—"তোমরা যথাসাধ্য এই ইংরাজদলকে দিল্লী পেঁৗছিবার সহায়তা ও সুব্যবস্থা করিবে। পথিমধ্যে তাহাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় এরূপ বন্দোবস্ত করিবে।" ইংরাজগণ নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে পাটনা পর্যন্ত অতিক্রম করিলেন। পাটনা হইতে হাঁটা পথ ধরিলেন। তিনমাস এইভাবে যাত্রা করিয়া তাঁহারা ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে দিল্লী পেঁৗছিলেন।[৪] দিল্লীতে পেঁৗছিবামাত্র নূতন সম্রাট তাঁহাদের মহা-সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

এই অভিযান সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দৌত্যাভিযানের একটি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে দিল্লীতে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সবিস্তারে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া ডেস-প্যাচের মত কলিকাতায় পাঠান হইত। আমরা সেই প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে পাঠকবর্গের অবগতির

---

১. 'সর্মানের বাগান' (Surman's Garden) সেকালের কলিকাতায় একটি গণনীয় শোভনোদ্যান ছিল। আজকাল খিদিরপুরের কুলীবাজারের যে স্থানে মিলিটারী বারাকসমূহ স্থাপিত জনপ্রবাদ এই, তাহার সান্নিধ্যেই সর্মানের বাগানবাটি ছিল।

২. বাদসাহের দরবারে যে দৌত্য প্রেরিত হয় তার সদস্য ছিলেন John Surman (Chief), Khwaja Sarhad (Second), Edward Stephenson, Hugh Barker (Secretary) এবং Dr. William Hamilton (Surgeon).

৩. The only suitable person for the business was the Armenian merchant Khwaja Israel Sarhad . . . He had been for many years well acquainted with the English and their affairs. He had been to England at one time . . . and must have known something of the English language, though he was not able to read or write it.—C.R. Wilson, *Early Annals of the English in Bengal*, Vol II, Part II p. XV.

৪. Surman এবং তাঁর সঙ্গীরা ৩রা জুলাই, ১৭১৫ সালে দিল্লীর নিকটবর্তী ফরিদাবাদে পৌঁছান। পরদিন দিল্লীতে হাজির হইবার পর তাহারা বাদসাহের নিকট হইতে শিরোপা পাইয়াছিলেন।—Diary of Messrs Surman and Stephenson during their Embassy to the Great Moghul, reproduced in the C. R. Wilson's *The Early Annals of the English in Bengal*, Vol II, Part II p. 51-52, Stewart's *History of Bengal*. Ed. 1813, p. 396.

জন্য তাহার প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমরা প্রথমবারে প্রয়োজনীয় উপহারগুলি লইয়া সম্রাট সাক্ষাতে গেলাম। এই উপহারের মধ্যে ১০০১ মোহর, টেবিলে রাখিবার উপযুক্ত মণিমুক্তাখচিত একটি বহুমূল্য ঘড়ি, সমগ্র ভূখণ্ডের একখানি মানচিত্র ও আরও অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি ছিল। এরূপ ধরণের জিনিসপত্র আমরা লইলাম যাহা দেখিলেই বাদসাহ আমাদের উপর সন্তুষ্ট হইবেন। আমরা এই সমস্ত নির্বাচিত উপহার দ্রব্যের এক একটি হাতে করিয়া সম্রাট দরবারে উপস্থিত হইলাম। উপহারদ্রব্য দৃষ্টে মহা সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট সর্মান সাহেবকে একপ্রস্থ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মণিখচিত একটি কলগা উপহার দিলেন। খোজা সরহদের অদৃষ্টেও এইরূপ উপহার লাভ ঘটিল। সম্রাট আমাদের যথেষ্ট সমাদর করিলেন। দরবারান্তে আমরা ডেরায় ফিরিয়া আসিলাম। সে দিন উজীর সলাবৎ খাঁর বাটিতেই আমাদের সকলের ভোজের নিমন্ত্রণ হইল।"

সম্রাট ইংরাজ অভিযানভুক্ত প্রতিনিধিগণকে সমাদরে গ্রহণ করিলেও কাজের কথা কিছুই হইল না। এই সময়ে যোধপুরের রাজা অজিতসিংহের রূপসী কন্যার সহিত বাদসাহের বিবাহের আয়োজন হইতেছিল। বিবাহের অছিলায় বাদসাহ ক্রমাগত কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। ইংরাজপক্ষও নিত্য নূতন উপহারদানে বাদসাহের চিত্তরঞ্জন করিতেন। ইংরাজদের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুইদল আমির-ওমরাহ দাঁড়াইলেন। বিপক্ষদের মুখবন্ধ করিবার জন্য ও স্বপক্ষদের বশে আনিবার জন্য ইংরাজদলকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইল। ইংরাজেরা পরিশেষে আশা সিদ্ধির উপায় সুদূরপরাহত দেখিয়া নিরাশাপূর্ণচিত্তে কলিকাতায় ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময়ে বাদসাহ পীড়িত হইলেন। এই পীড়াই ইংরাজদের আশা চরিতার্থের প্রধান উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।

সার্জন হ্যামিল্টনের নিকট ইংরাজগণ আজীবন ঋণী। জোব চার্নক যদি কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী বলিয়া গৌরব লাভের যোগ্য হন, তাহা হইলে এই মহাপ্রাণ ডাক্তার হ্যামিল্টনও তাঁহার পূর্ববর্তী ডাক্তার বোটনের ন্যায়, আত্মস্বার্থ ত্যাগী স্বদেশভক্ত-মহাপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া ইংরাজ-জাতির কৃতজ্ঞতা লাভের দাবী করিতে পারেন।

হ্যামিল্টন যদি সে যাত্রা এই ইংরাজ অভিযানের সঙ্গে না থাকিতেন, তাহা হইলে এত কষ্ট স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াও ইংরাজ-বণিকদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইত কি না, তৎপক্ষে বিশেষ সন্দেহ আছে।

বাদসাহের খাস হাকিমগণ বহু চেষ্টা করিয়া তাঁহার রোগ আরাম করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিবাহ-ব্যাপার সম্বন্ধে একটি মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পাত্রীপক্ষ দিল্লীতে উপস্থিত, বিবাহের সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত, এমন সময়ে এই বিভ্রাট! হ্যামিল্টন সম্রাটকে বলিয়া পাঠাইলেন, "সকলেই ত আপনার চিকিৎসা করিলেন, এখন একবার আমায় চেষ্টা করিতে দিন।" সম্রাট ইহাতে কোনরূপ আপত্তি না করায় হ্যামিল্টন তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় সম্রাট শীঘ্রই রোগমুক্ত হইয়া আরোগ্যস্নান করিলেন। সহরময় এই সুদক্ষ ইংরাজ-চিকিৎসকের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা শতমুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

রোগান্তে সম্রাট ফেরোকসিয়ার প্রকাশ্য দরবারে ইংরাজ চিকিৎসক হ্যামিল্টনকে সম্মানিত করিলেন। তিনি তাঁহাকে এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তাখচিত একটি কলগা, দুইটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয়, একটি হস্তী, একটি অশ্ব ও নগদ পাঁচহাজার টাকা উপহার দিলেন। যে অস্ত্র সহায়ে তিনি সম্রাটের স্ফোটকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়াছিলেন, সম্রাট সেই অস্ত্রগুলি সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিতে আদেশ দেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার কামিজে পরিবার জন্য একসেট স্বর্ণনির্মিত, মণিখচিত বোতাম পর্যন্ত উপহার দেন। ডাক্তার সাহেবের চুল আঁচড়াইবার ব্যবস্থা করিতেও তিনি ভুলেন নাই। কারণ এই সঙ্গে হ্যামিল্টন সোনা দিয়া বাঁধান মণিখচিত একটি বুরুশ পর্যন্ত পাইয়াছিলেন।

জুলাই মাসে ইংরাজ-দূতগণ দিল্লীতে উপস্থিত হন। সম্রাট যখন রোগমুক্ত হইলেন তখন নবেম্বরের শেষভাগ। বর্ষা, শরত, হেমন্ত কাটিয়া গিয়া এই ছয় মাস পরে শীতঋতুর আবির্ভাব হইল। এই ছয়মাস কাল ইংরাজেরা কিছুই করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের উপহার-দ্রব্যের মধ্যে যেগুলি অবশিষ্ট ছিল, সেইগুলি এইবার দেওয়া হইল। ডিসেম্বর মাসে মহা সমারোহে সম্রাটের উদ্বাহকার্য শেষ হইয়া গেল। তাহার পর আরও কয় মাস কাটিল। ১৭১৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ইংরাজেরা তাঁহাদের প্রার্থিত বাদসাহী-ফারমান প্রাপ্ত হইলেন।[১] কেবল ফারমান নহে, এই সঙ্গে ইংরাজেরা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮ খানি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব কিনিবার অনুমতিও পাইলেন।

সম্রাট রোগমুক্ত হওয়া পর্যন্ত হ্যামিল্টনকে একদিনের জন্য ভুলেন নাই। তিনি তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাকে প্রায়ই দরবারে উপস্থিত হইতে হইত। হ্যামিল্টনের উপর বাদসাহ এতদূর সন্তুষ্ট হন, যে তিনি তাঁহাকে দিল্লীতে রাজ-পরিবারের চিকিৎসকরূপে নিয়োগ করিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ডাক্তারসাহেব কিন্তু দিল্লীতে থাকিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। আবার হ্যামিল্টনকে ছাড়িয়া না দিলেও, দৌত্যাভিযানের কর্তারা কলিকাতায় ফিরিতে পারেন না। হ্যামিল্টন পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া সম্রাটকে বলিলেন, "আমি বহুদিন দেশত্যাগী। আপনার অনুমতি পাইলে আমার স্ত্রী পুত্রগণকে একবার দেখিয়া আসি। এখানে যে সমস্ত ঔষধ পাওয়া যায় না, বিলাতে গেলে সে সমস্ত অদ্ভুত ফলপ্রদ ঔষধগুলিও আপনার জন্য আনিতে পারিব। আর দেশ হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়াই আমি সাহানসাহের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিব।"

সম্রাট ইহাতে আর কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলেন না। হ্যামিল্টন দলবল সহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। দিল্লী হইতে ফিরিবার পরই তিনি সাংঘাতিক রোগে পীড়িত হইয়া এই কলিকাতাতেই ইহলীলা শেষ করেন।[২] যে সমাধি-ক্ষেত্রে চার্নকের সমাধি হইয়াছিল, সেই সেণ্ট জন গির্জার নির্জন গোরস্থানেই এই স্বার্থত্যাগী মহাপ্রাণ ইংরাজের দেহ সমাহিত হয়।[৩] আজও

১. ফারমানটি উজীরের শীলমোহর অঙ্কিত হইবার পর (২৭ মার্চ ১৭১৭) John Surman-এর হাতে অর্পিত হইয়াছিল ১৭১৭ সালের ১০ই এপ্রিল।—Wilson's *Early Annals of the English in Bengal,* Vol. II, Appendix p. 276-78.

২. John Surman এবং তাঁর সঙ্গীরা—১৭১৭ সালের ২২শে নবেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৭১৭ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর হ্যামিল্টন কলিকাতায় পরলোক গমন করেন।

৩. হ্যামিল্টনের স্মৃতিও ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতিগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর ষাট বৎসর পরে গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব কর্তৃক তাঁহার স্মৃতিফলক নূতনভাবে নির্মিত হয়। এই সময়ে সেণ্ট জন গির্জার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। হ্যামিল্টন ইংরাজ জাতির জন্য যে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রকৃতই গৌরবজনক ও অসাধারণ ভাবিয়া হেষ্টিংস সাহেব সরকারি ব্যয়ে তাঁহার স্মৃতিফলকটি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়া দেন। এই স্মৃতিফলকটির একাংশ ইংরাজী ও অপরাংশ ফার্সীতে লিখিত। ইংরাজী অংশটুকু এই —"Under this stone lyes interred the body of William Hamilton who departed this life, the 4th December 1717. His memory ought to be dear to his nation for the credit he gained the English, in curing Farrukseer the present King of Indoston, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great Monarch and without doubt will perpetuate his memory as well as Great Britain as all other nations in Europe. (Copy of the Inscription in St. John's Churchyard, Calcutta). সম্রাট-দরবারে ফিরিয়া না যাওয়ায় ও হ্যামিল্টনের মৃত্যুসংবাদে অবিশ্বাস করিয়া সম্রাট ফেরোকসিয়ার তাঁহার দুইজন কর্মচারীকে হ্যামিল্টন সত্যসত্যই গতাসু হইয়াছেন কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কর্মচারীদের নিকট হইতে এই সংবাদের যথার্থতা অবগত হইয়া বড়ই দুঃখিত হন। হুইলার সাহেব অনুমান করেন, হ্যামিল্টনের গোরের উপর যে ফার্সী অংশটুকু আছে, তাহা সম্রাটের প্রেরিত কর্মচারীদেরই রচনা। উক্ত ফার্সী অংশের ইংরাজী অনুবাদ এই—William Hamilton Physician in the service of the English Company, who had accompanied the English Ambassador to the enlightened presence, and having made his name famous in the four quarters of

এ সমাধিস্থান বর্তমান। পাঠক ইচ্ছা করিলে দেখিয়া আসিতে পারেন।১

হ্যামিল্টনের চেষ্টায় ইংরাজপক্ষ নূতন কতকগুলি স্বত্ব লাভ করিলেন। ইংরাজদের প্রার্থিত বিষয়-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত স্বত্বগুলিই প্রধান। (১) কলিকাতার প্রেসিডেণ্ট সাহেব যে সব মালের জন্য 'দস্তক' বা ছাড়-পত্র সহি করিয়া দিবেন, তাহা বঙ্গীয় শাসন-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষীয়গণ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। এই দস্তকের সহায়তায় কোম্পানীর মালামাল সর্বত্রই বিনা বাধায় যাইতে পারিবে। (২) মুরশিদাবাদের সরকারি টাঁকশালে প্রয়োজন মত ইংরাজেরা সপ্তাহে তিন দিনের জন্য তাঁহাদের প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলি প্রস্তুত করাইয়া লইতে পারিবেন। (৩) ইউরোপীয়ই হউক আর এ দেশীয় লোকই হউক না কেন, যে কেহ ইংরাজ-কোম্পানির নিকট দেনাদার হইবে, স্থানীয় কর্তাদের নিকট আবেদন করিবামাত্র তাঁহারা তাঁহাদের কলিকাতা-কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষীয়দের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। (৪) ইতিপূর্বে ইংরাজেরা কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুরের গ্রামের জমিদারিস্বত্ব যেরূপ ভাবে লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী আরও ৩৮ খানি গ্রামের খরিদা স্বত্ব পাইবেন।

সম্রাট ইংরাজদিগের প্রার্থিত স্বত্বগুলির মর্ম বিচারার্থে প্রধান উজীরের উপর ভার দিলেন। উজীর ও অন্যান্য প্রধান সভাসদ্‌গণ সেগুলি নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। সামান্য প্রার্থনাগুলি পূরণ করিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যেগুলিতে ইংরাজদের বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলি লইয়াই তাঁহারা গণ্ডগোল উপস্থিত করিলেন। কতকগুলি ব্যাপারের মীমাংসার ভার সাক্ষাৎসম্বন্ধে নবাব মুরশিদকুলি খাঁর উপর অর্পণ করা হইল। ইংরাজগণের তখন মুদ্রা-বিভ্রাট ঘটিয়া ছিল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে যে টাকা তাঁহারা প্রস্তুত করাইতেন তাহার মূল্য কম। সিক্কা বা প্রচলিত টাকার সহিত তুলনায় ইহার মূল্য অনেক কম দাঁড়াইত। ইহাতে বাট্টার জন্য লেনদেন ও কারবারাদি কার্যে ইংরাজদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছিল। এই মুদ্রা বিভ্রাট সর্বাগ্রে বিদূরিত করাই তাঁহারা প্রথম কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু মুরশিদাবাদের সরকারি টাঁকশাল ভিন্ন এ মুদ্রা প্রস্তুতের আর কোন উপায়ই নাই। অথচ এই বাদসাহী টাঁকশাল বাঙ্গলার দেওয়ান ও নায়েব-নাজিম মুরশিদকুলি খাঁর অধীনে। ১৭১৬ সালে কাশিমবাজারের অধ্যক্ষ জানাইলেন নবাবকে পনর হাজার ও দেওয়ান একরাম খাঁ এবং রঘুনন্দন প্রভৃতি কর্মচারিবর্গকে পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার টাকা দিলে, বাণিজ্য কার্য ও মুরশিদাবাদের মুদ্রা প্রস্তুতাদি ব্যাপারেও সুবিধা হইবে। ইংরাজপক্ষ অগত্যা বাধ্য হইয়া এই টাকাটা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইংরাজেরা অঙ্গীকার করিয়াও যথা সময়ে প্রতিশ্রুত মুদ্রা না দেওয়ায়, সায়ের বিভাগের ইজারাদার রঘুনন্দন২ ইংরাজদের মালের নৌকা আবদ্ধ রাখিলেন ও কাশিমবাজারে লোক পাঠাইয়া ইংরাজদের উৎপীড়িত করেন। এই রঘুনন্দনকে কেহ কেহ নাটোর রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। বাদসাহ-দরবারে যাহাতে ইংরাজেরা তাঁহাদের প্রার্থিত বিষয়গুলি না পান, মুরশিদকুলি খাঁ সেজন্য বাঙ্গলা হইতে অনেক চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু ইংরাজপক্ষ বাদসাহের এক খোজাকে ঘুষ দিয়া পরিশেষে কৌশলক্রমে তাঁহাদের কার্যোদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসেন।৩

the earth, by the cure of the Emperor, the Asylum of the World, Mohumud Farruk Siyar the victorious and with a thousand difficulties having obtained permission from the Court, which is the refuge of the universe to return to his country. By the Divine decree on the 4th December 1717, died in Calcutta and is buried here.

১. সমাধিস্থান সম্প্রতি St. John's Churchyard-এর অপরাংশে ১৯৮২ সালে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

২. রঘুনন্দন ছিলেন মুরশিদকুলির রাজস্ব বিভাগের অন্যতম দায়িত্বশীল পদের অধিকারী। ইনি ছিলেন সরকারি টাঁকশালের দারোগা। তাঁর প্রভাবে ভ্রাতা রামজীবন রাজসাহীর ভূষণা এবং মুরশিদাবাদের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদারি লাভ করেন।—A. Karim, ***Murshid Quli Khan and His Times***, p. 70, 218.

৩. ইংরাজ-বণিকগণ বাদসাহ ফেরোকসিয়ারের নিকট যে ৩৮ খানি গ্রাম-ক্রয়ের ফারমান পান, তাহার প্রয়োজনীয় অংশটুকু নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।—That the rentings of Calcutta, Chuttanutty and

ইংরাজেরা বাদসাহী ফারমান লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু নবাবের প্রতিযোগিতার জন্য তাঁহারা বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই।

ইতিপূর্বে কেবল আমরা ফারমানের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। যে অংশে ইংরাজেরা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার স্বত্ব পান তাহাই দেখান হইয়াছে। কিন্তু ফারমানে ইহা ছাড়া আরও অনেক স্বত্বদানের কথা ছিল। এই ফারমানের প্রতিলিপি দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট প্রভৃতি স্থানেও প্রেরিত হয়, কারণ মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাণিজ্য-সম্বন্ধেও ইহাতে অনেক কথা ছিল। দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও গুজরাটের নবাব, বাদসাহী হুকুম পাইবামাত্র তদনুযায়ী কার্য করেন। কিন্তু বাঙ্গলায় সেরূপভাবে কাজ আরম্ভ হইল না। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ অসমসাহসিক লোক ছিলেন, তিনি দিল্লী সরকারের দুর্বলতাও বুঝিতেন। ইংরাজদের উপর আবার তাঁহার সুনজর ছিল না। কাজেই এই গ্রামগুলি ক্রয়ের স্বত্ব পাইয়াও ইংরাজেরা কার্যতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ প্রকাশ্যভাবে বাদসাহের হুকুম অমান্য করিতে সাহসী না হইলেও, গোপনে জমিদারদের টিপিয়া দিলেন যেন তাঁহারা ইংরাজদিগকে গ্রামগুলি বিক্রয় না করেন।

এই গ্রামগুলি পাইলে ইংরাজদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে, কলিকাতার দক্ষিণে ও উত্তরে ভাগীরথীর উভয় কূলবর্তী স্থানসমূহ তাঁহাদের দখলে আসিলে সমুদ্রপথ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত সমস্ত স্থানটি তাঁহাদের ক্ষমতার অধীনে আসিবে, অনেক মোগল-প্রজা ইংরাজের প্রজা হইবে। এই সব নানা কথা ভাবিয়া নবাব মুরশিদকুলি বাদসাহী ফারমানের নানারূপ কূটার্থ করিয়া এই সমস্ত গ্রাম বিক্রয় না করিতে জমিদারদের গোপনে নিষেধ করিয়া দেন।[১]

সম্রাট ফেরোকসিয়ার প্রদত্ত ফারমানে উল্লিখিত, কলিকাতার পার্শ্ববর্তী সেকালের ৩৮ খানি গ্রামের তালিকা।

ইংরাজেরা তাঁহাদের পুরাতন সেরেস্তার এই সমস্ত গ্রামের নাম অতি বিকৃতভাবে বানান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাদের স্থায়িত্ব নির্দেশে কোন কষ্ট হয় না।

১ হাবড়ার দিকে

	আধুনিক নাম	ইংরাজদের সেরেস্তার লিখিত নাম	পরগনা	রাজস্বে পরিমাণ
১	সালকিয়া	Salica	বোরো ও পাইকান	২৭৭
২	হাবড়া(Howrah)	Harirah	ঐ	৩৮২
৩	কাসুন্দিয়া	Cassundeah	ঐ	১৩০
৪	রামকৃষ্ণপুর	Ramkissnopoor	ঐ	১৭০
৫	ব্যাঁটরা	Batter	ঐ	৫৮১

Govindpur on the Pergana of Amirabad &c. in Bengal, were formerly granted them and bought by consent from the Zaminders of them and are now in Company's possessions for which they yearly pay the sum of Rs 1195-6 as. The 38 Towns more amounting to Rs 8121-8 as. adjoining to the aforesaid towns, which they hope the renting of, may be granted and added to those they are already in possession of that, they will pay annually the same amount of them. COMMANDED that the copy under the seal of chief Cauzi be regarded and that old towns formeıly bought by them remain in their hand as heretofore, and that they have the renting of the adjacent towns petitioned for, for which they are to buy from the respective owners of them and Duan and Subah give permission.—Extract from Emperor Farruk Shere's Phermand—*East India Records No. 593* A.D. 1717. A. H. 1129.

১. বেহালা বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীগণ বাদসাহ জাহাঙ্গীরের আমল হইতে এই সমস্ত জমিদারি লাভ করিয়াছিলেন। জমি সরকারের, তাঁহারা কেবল জমিদার মাত্র। জনরব এই সুতালুটি কলিকাতা গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম বিক্রয়ের জন্য, সাবর্ণ জমিদার বিদ্যাধর রায়, নবাব কর্তৃক নানা অছিলায় কারানিক্ষিপ্ত হন। পরিশেষে বাদসাহ পুত্রের সনন্দ আসিয়া পৌছিলে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

২ কলিকাতার দিকে

	আধুনিক নাম	ইংরাজদের সেরেস্তায় লিখিত নাম	পরগনা	রাজস্বের পরিমাণ[১]
৬	দক্ষিণ পাইকপাড়া	Dackney Pack-parrah	আমিরাবাদ	১৪৫
৭	বেলগেছিয়া	Belgashia	কলিকাতা ও পাইকান	৩০৫
৮	দক্ষিণদ্বারী *	Dackney Dandi	কলিকাতা পাইকান আমিরাবাদ	৪২৫
৯	হোগলকুড়িয়া	Hogulchundey	পাইকান	১০৭
১০	উল্টাডিঙ্গি	Ultadang	কলিকাতা ও পাইকান	৩১৫
১১	সিমলে	Similiah	মানপুর	৮২
১২	মাকন্দা	Macond	ঐ	১১৮
১৩	কামারপাড়া	Comorparrah	কলিকাতা	৬৩
১৪	কাঁকুড়গাছি	Cancergasoiah	পাইকান ও নদীয়া	২০৮
১৫	বাঘমারি	Bagmarrey	কলিকাতা	৪৯
১৬	আর্কুলী	Arcooly	মানপুর	২২
১৭	মির্জাপুর	Mirsapur	পাইকান ও কলিকাতা	১৭৩
১৮	শিয়ালদহ	Sealda	কলিকাতা	১১৮
১৯	কুলিয়া *	Cooliah	কলিকাতা ও পাইকান	৫৭২
২০	ট্যাংরা	Tangarah	ঐ	২২৮
২১	শুঁড়া	Sundah	ঐ	৬৪৮
২২	বাহির শুঁড়া	Bad Sundah	কলিকাতা	৪০
২৩	শেখপাড়া	Shekpara	ঐ	৪১
২৪	ধলন্দা	Doland	কলিকাতা ও পাইকান	৩০৬
২৫	বির্জি	Bergey	কলিকাতা, পাইকান নদীয়া, আমিরাবাদ	২৮৩
২৬	তিলজলা	Tiljola	কলিকাতা ও পাইকান	২০৭
২৭	তোপসিয়া	Topsiah	কলিকাতা ও পাইকান	২৯০
২৮	সাপগাছি *	Sapgassey	কলিকাতা	২১১
২৯	চোবাঘা	Chobogah	ঐ	৩৭
৩০	চৌরঙ্গী	Cherangi	কলিকাতা ও পাইকান	৮৮
৩১	কলিঙ্গা	Colimba	ঐ	৩৮৩
৩২	গোবরা	Gobrah	পাইকান	১০০
৩৩	বাহির দক্ষিণদ্বারী *	Badokney Dandi	ঐ	১২৫
৩৪	শ্রীরামপুর (ইটিলি)	Sicampur	কলিকাতা, পাইকান আমিরাবাদ	১২৭
৩৫	জলা কলিঙ্গা	Jola Colimba	কলিকাতা	১১৪
৩৬	গেঁদলপাড়া	Gendalpara	কলিকাতা ও পাইকান	১০১
৩৭	ইটিলি	Hintaley	ঐ	২২৯
৩৮	চিৎপুর	Chittpoor	আমিরাবাদ	২৫২

১. মুদ্রাঙ্কনের সৌকর্যার্থে আমরা কেবল মাত্র জমার মোট টাকাগুলি দিয়াছি। ঐ সমস্ত স্থান হইতে সেই অতীত পুরাকালে এইরূপ হারেই রাজস্ব আদায় হইত। ইংরাজেরা সম্রাট ফেরোকসিয়ারের সনন্দ বলে, গ্রামাধিকারীদের নিকট এই গ্রামগুলি কিনিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হন। পাঠক এই বহু কষ্টে সংগৃহীত তালিকা হইতেই দেখিতে পাইবেন—এই সমস্ত গ্রামগুলি লইয়াই বর্তমান মহানগরী কলিকাতার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। * চিহ্নিত স্থানগুলি আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। শ্রীরামপুর, ডিহি শ্রীরামপুর—ইটিলির সন্নিকট। কুলিয়া বোধ হয় আধুনিক কুলিবাজার। তপসের নাম এখনও লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদ্বারী সম্ভবত দক্ষিণেশ্বর কি? সাপগাছি, চোবাঘা ইত্যাদি নাম হইতে প্রাচীন কলিকাতার জঙ্গলময় অবস্থার অভিব্যক্তি! মাকন্দা মানপুর পরগনায়। বোধ হয় ইহা বর্তমান সিমলের কাছাকাছি কোন স্থান।—*Consultations No. 851 & 1174, Fort William,* also *A.K. Ray's Report.*

'সাহস ও সহিষ্ণুতা' এই দুইটি শব্দ শক্তিমান ইংরাজ জাতির মূলমন্ত্র। অসংখ্য কষ্ট, অত্যাচার ও উৎপাত সহ্য করিয়া সেকালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তাঁহাদের বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন। দেশীয় মোগল-শাসনকর্তাদের মধ্যে ভাল মন্দ দুই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ইংরাজগণ ধনী ব্যবসায়ী এবং তাঁহাদের পীড়ন করিলেই কিছু টাকা পাওয়া যাইবে, এইজন্য মোগল-রাজকর্মচারীরা নানা উপায়ে তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ-শোষণের চেষ্টা করিতেন। তাহার অধিকাংশ ঘটনাই পাঠকগণ পূর্ব অধ্যায়সমূহে জানিতে পারিয়াছেন।

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গপ্রতিষ্ঠা হওয়ায় এদেশবাসীর যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। বনজঙ্গল কাটাইয়া কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলিরও ক্রমশ উন্নতি হইতেছিল। ইংরাজের কামান বন্দুকের ভয়ে শোভাসিংহের বিদ্রোহের সময়, অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজা, কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আর ইংরাজের এই কামানের ভয়ে বিদ্রোহীরা কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে 'বর্গীর-হাঙ্গামার' ভয়ানক অত্যাচারের সময় অনেক লোক ইংরাজের আশ্রয়ে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে দেশের লোকে বুঝিল এই ইংরাজ-জাতি শক্তিমান, আর্তের আশ্রয়-দাতা, বিপন্নের উদ্ধার কর্তা। কাজেই দিনেমার, ফরাসী ইত্যাদি অন্যান্য সমধর্মী বণিকগণ থাকিতেও তাহারা ইংরাজদের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। অনেক বাঙ্গালী ইংরাজের কুঠিতে দালালি ও অনেকে ইংরাজের উকিলরূপে নবাব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হইত।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ নানাপ্রকারে ইংরাজদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সহিষ্ণু কর্মবীর ইংরাজ জাতি তাহা আদৌ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নাই। তাঁহারা মুখ বুজিয়া সবই সহ্য করিতেছিলেন। আনুগত্যময় ব্যবহারে নবাব মুরশিদকুলিকে নানা উপায়ে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া, তাঁহারা কলিকাতার বাণিজ্যের, দুর্গের ও নগরের উন্নতি-সাধন করিতেছিলেন। এই ভাবে তাঁহারা মুরশিদকুলির মৃত্যু কাল পর্যন্ত সুখে দুঃখে অতিবাহিত করেন। মুরশিদকুলির পরবর্তী নবাবদ্বয়ের আমলে ইংরাজদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। এইরূপে নানাবিধ সুখ দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া, নবাব আলিবর্দি খাঁর রাজত্বকাল পর্যন্ত, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের বাণিজ্য-জীবন অতিবাহিত করেন। এজন্য ইহার পর আমরা নবাব আলিবর্দি ও সিরাজের আমলের কথাই বলিব।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ অতিশয় জবরদস্ত নবাব ছিলেন। বর্তমান মুরশিদাবাদ নগরী আজও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। ধরিতে গেলে, তিনিই মুরশিদাবাদ নবাব-বংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। মুরশিদকুলির মৃত্যুর পর নানাবিধ বিপ্লবের মধ্য দিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের হস্ত হইতে রাজশক্তি ও শাসনশক্তি আলিবর্দি খাঁর হাতে আসিয়া পড়ে। সে সব বাঙ্গলার ইতিহাসের কথা। আমরা কলিকাতার ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছি. সুতরাং বাঙ্গলার অতীত ইতিহাসের কথা আলোচনা করিয়া পুস্তকের অযথা কলেবর-বৃদ্ধি করিতে চাহি না। বর্তমানে নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া, আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

'রিয়াজে' উল্লিখিত আছে, নবাব জাফর খাঁর (মুরশিদকুলি) শাসনকালে বঙ্গদেশে চোর ডাকাতের ভয় একেবারে নিবারিত হইয়াছিল। কি সহর কি মফঃস্বল, সর্বস্থানের অধিবাসীরা নিরাপদভাবে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। বর্ধমান রাজপথের পার্শ্বে কাটোয়া মুরশিদগঞ্জে পথিকগণকে নিরাপদ করিবার জন্য, তিনি প্রধান একটি থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় খাস-ভৃত্য মোহম্মদ জানকে এই সদর থানার তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করেন। নদীয়া ও হুগলীর পথ-পার্শ্বস্থ ফেনাচোর নামক স্থানের কলা-বাগানে দিবা-ভাগেই ডাকাতি হইত। এজন্য মোহম্মদ জান ইহার নিকটেই এক থানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কাটোয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দস্যু ও চোরদিগকে ধরিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া পথি-পার্শ্বে গাছের ডালে লট্‌কাইয়া রাখিতেন। এরূপ ভীষণ দণ্ড বিধান দেখিয়া চোর ও ডাকাতের দল

ভয় পাইয়া অপকার্য হইতে বিরত থাকিত। মোহম্মদ জানের নাম শুনিলে দস্যু-তস্করেরা ভয়ে কাঁপিত। সর্বদাই তাঁহার পাল্কির অগ্রভাগে ঘাতকগণ 'কুড়ালী' হস্তে গমন করিত। এইজন্য লোকে তাঁহাকে 'কুলড়া' বা কুড়ুলিয়া এই আখ্যা প্রদান করে।

নবাব স্বধর্ম প্রচারে ও মুসলমান ধর্মানুষ্ঠিত আচার ব্যবহারাদি সম্পাদনে গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর পর এরূপ স্বধর্মানুরাগী নবাব আর বাঙ্গলা দেশে কেহ আসে নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মানরক্ষা, সুবিচার ও প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণে তিনি যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন বা অঙ্গীকার করিতেন কিছুতেই তাহার অন্যথা হইত না। তাঁহার ন্যায়পরতা এতই প্রখর ছিল যে দাক্ষিণাত্যে সুবাদারি করিবার সময় তিনি বিচারাসনে বসিয়া, তাঁহার একমাত্র পুত্রের প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অন্য এক বিবাহিত ব্যক্তির পত্নীর ধর্মনাশ করিয়াছিল। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলি পুত্র বলিয়া তাহাকে মার্জনা করেন নাই। বিচার-ব্যাপারে বিচার করিয়া এবং আদেশ দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তাঁহার আজ্ঞা যথাযথ প্রতিপালিত হইত কি না, তাহাও তিনি দেখিতেন। জমিদারেরা যাহাতে প্রজাবর্গের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে তজ্জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তথা নবাব-দরবারে সকল জমিদারেরই এক জন প্রতিনিধি বা উকিল থাকিতেন। পাছে তাহাদের প্রভুদের নামে কোন প্রজা নবাবের নিকট কোনরূপ অভিযোগ আনয়ন করে, এই ভয়ে উকিলেরা নববের 'চেহেলসতুন' দরবারের বহির্দেশে বেড়াইতেন, নবাবের নিকট কোন অভিযোগকারী আসিয়াছে কি না খুঁজিয়া দেখিতেন। যদি কেহ থাকিত তাহা হইলে নানা উপায়ে তাহাকে হস্তগত বরিয়া অভিযোগ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করাইতেন। কারণ তাঁহারা জানিতেন নবাবের নিকট অপরাধ প্রমাণ হইলে তাঁহাদের প্রভু জমিদারদের ভয়ানক শাস্তি হইবে।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পড়িতেন, তিনমাসকাল রোজা রাখিতেন এবং প্রতিদিন সম্পূর্ণ কোরাণ পাঠ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'আয়মবাজ অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমার উপবাস করিতেন, জুম্মা-রোজা রাখিতেন। বৃহস্পতিবার সমস্ত রাত্রি জাগিয়া উপাসনা করিতেন।

দিবা একপ্রহর অতীত হইলে তিনি কোরাণ নকল করিতে আরম্ভ করিতেন। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এই নকলের কার্য চলিত। তাঁহার প্রেরিত বিচিত্র উপহার সমূহ সুদূর তুরস্ক সুলতানের নিকটেও পোঁছিত। ভারতের ও বিদেশের যে যে স্থানে মুসলমান তীর্থ আছে, সে সকল স্থানেও তাঁহার উপহার পোঁছিত। এখনও সাদুল্লাপুরে সিরাজউদ্দিন সাহেবের পবিত্র সমাধি-গৃহে, নবাব মুর্শিদকুলির জাফর খাঁর প্রেরিত একখানি ছিন্ন কোরাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ কোরাণ নবাব মুর্শিদকুলির স্বহস্ত লিখিত। 'রিয়াজের' বর্ণনানুসারে জানা যায়, "তাঁহার সভায় সার্ধ সহস্র উৎকৃষ্ট ও নিয়মিত কোরাণ-পাঠক নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যহ সমগ্র কোরাণ পাঠ ও তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত কোরাণ সংশোধন করিতেন। এই সমস্ত কোরাণ-পাঠকেরা নবাবের রন্ধনশালা হইতে নিত্য আহার্য প্রাপ্ত হইতেন। নবাব শাস্ত্রবেত্তা মৌলবী, মৌলানা ও সদ্বংশ জাত ব্যক্তিগণের সাহচর্য শ্রেয়স্কর বোধ করিতেন।

নবাব রবিঅল্ আউল মাসের ১লা হইতে হজরত পয়গম্বরের (মহম্মদ) তিরোভাব দিন অর্থাৎ ১২ই তারিখ পর্যন্ত ধার্মিক, শাস্ত্রবেত্তা ও দরিদ্রদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন। তাহাদের আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেন। এই সময়ে ...হ মাহিনগর হইতে লালবাগ পর্যন্ত নদীর তট অতি সুন্দর দীপমালায় সুশোভিত হইত। ...ার ন্যায় সমুজ্জল আলোক-মালায় মসজিদের খিলান, বেদী, বৃক্ষলতা, কোরাণের শ্লোক ...দি প্রদর্শিত হইত। নাজির আহম্মদ নামক একজন কর্মচারী এই কার্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ...েন। কথিত আছে এজন্য তিনি আনুমানিক প্রায় এক লক্ষ মজুর নিযুক্ত করিতেন। সন্ধ্যা

সমাগত হইলে একটি তোপধ্বনি হইবামাত্র, সমস্ত প্রদীপ একবারে জ্বলিয়া উঠিত। আর সমস্ত আলোক একবারে জ্বলিয়া উঠায়, অপূর্ব নেত্র-মনোহর সৌন্দর্যের বিকাশ করিত। মুরশিদকুলির সময়ে বেরা-নামক আলোক-দান পর্বও এইরূপ মহোৎসবে নির্বাহিত হইত। এই সময়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত কাগজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী, দীপমালায় সুশোভিত করিয়া নদীবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হইত।[১]

অতিথি সৎকারে মুরশিদকুলি খাঁ কখনই কৃপণতা প্রকাশ করিতেন না। অতিথি, অনাহূত, রবাহূত লোক, ও সাধু ফকিরগণ তাঁহার নিকট প্রত্যহই আহার্যাদি পাইত। এরূপ শুনা গিয়াছে যে তাঁহার দানের সীমা কেবল মনুষ্য-জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। বনের পশু পক্ষীদের জন্য স্থানে স্থানে প্রচুর খাদ্য রক্ষা করা হইত। এমন কি তাঁহার নিয়োজিত ভৃত্যগণ মাঠের মধ্যে গিয়া যে সকল বৃষ হলাকর্ষণে নিযুক্ত, তাহাদেরও নিয়মিত খাদ্য দিয়া আসিত।

তাঁহার আহার পারিপাট্য ও বিলাসব্যসন কিছুই ছিল না। মৃগয়া দ্বারা প্রাণিবধে তাঁহার কোন সখই ছিল না। তিনি কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কেবলমাত্র বরফ-জলই তাঁহার তৃষ্ণা শান্তি করিত। অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাদ্যাদি ব্যবহার তাঁহার নিয়ম-বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রিয় কর্মচারী নাজির আহম্মদের সহকারী খিজির খাঁ শীত কালের চারি মাস আকবর-নগরের (রাজমহল) পার্শ্ববর্তী পর্বতে সংবৎসরের উপযোগী বরফ আবদ্ধ রাখিবার জন্য ব্যাপৃত থাকিতেন। এইরূপে বার মাসের বরফ সঞ্চিত হইয়া থাকিত।

বঙ্গদেশের সর্বোৎকৃষ্ট ফল আম্র তাঁহার উপভোগের অতি প্রিয় জিনিস ছিল। মালদহের আমই সেকালে খুব বিখ্যাত ছিল। নবাব এই সমস্ত গ্রামের আম্র-রক্ষার জন্য দারোগা নিযুক্ত করিয়া, মালদহ কোতোয়ালি ও হোসেনপুরের খাস আম্রবৃক্ষগুলি রক্ষা করিতেন। ফলের সময়, তাঁহার নিযুক্ত কর্মচারীরা আম্র পাড়াইয়া প্রহরী-যোগে রাজধানীতে প্রেরণ করিত। এই সমস্ত লোকজনের ব্যয়ভার জমিদারদের দিতে হইত। জমিদারগণ খাস আম্র-বৃক্ষসমূহ কর্তন করিতে পারিতেন না। পরবর্তীকালে নবাব মীরজাফরের সময় পর্যন্ত এইরূপে আম্র চৌকি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

গীতবাদ্যাদিতে নবাবের কোন অনুরক্তি ছিল না। নৃত্যকলাকৌশলময়ী নর্তকীগণ কখনও তাঁহার তৃপ্তিসাধন করে নাই। খোজাদিগকে তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। যে সকল স্ত্রীলোকের নবাব-পরিবারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহারাও অন্তঃপুরে থাকিতে পাইত না। আজীবন তিনি একমাত্র বিবাহিত পত্নীতে অনুরক্ত ছিলেন। কখনও পরকীয়ার সহবাস করেন নাই। কোন দাসী অন্তঃপুর হইতে একবার বাহিরে আসিলে আর ভিতরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইত না। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ অঙ্ক-শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। এই জন্য রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত হিসাব-পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল। তিনি সরকারি সমস্ত কাগজ-পত্র লালকালীতে সহি করিতেন।

১. খাজা-খিজির নামক এক পবিত্রাত্মা মহাত্মার স্মরণার্থে এই আলোকদান পর্বের অনুষ্ঠান হয়। খাজা-খিজির খ্রীষ্টানদের ইলিয়স। ঢাকার নবাব একরাম খাঁর আমলেই বাঙ্গলার মুসলমানগণের এই পর্বানুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। মুরশিদাবাদে এই পর্ব পূর্বে, বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে, এই পর্ব উপলক্ষে মুরশিদাবাদে বিশেষ সমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দিক হইতে কদলীবৃক্ষ ও বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রকাণ্ড এক আলোকযান প্রস্তুত হয়। তাহার উপর নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে মণ্ডিত, তরণীগৃহ ও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্মিত হইয়া থাকে। ইহা আলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। সেকালে তিনশত হস্ত বিস্তৃত আলোকযান প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরও 'বেরা' থাকিত। এই সময়ে নদীবক্ষে এক অপূর্ব নয়নমোহন দৃশ্য আবির্ভূত হইত। বর্তমান সময়ে বেরার আয়তন ও সৌন্দর্য লাঘব হইয়াছে। এই অঞ্চলের মুসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের প্রদোষে নৈবেদ্যসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা ভাগীরথী বক্ষে ভাসাইয়া দেয়।—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস পৃ. ৫৬ ফুটনোট।

মাসের শেষ দিবসে সমস্ত সেরেস্তার কাগজ-পত্র নিজে পরীক্ষা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতেন। এইরূপ স্বাধীনভাবে ও হাতে-কলমে কাজ করিয়া তিনি রাজস্ব-বিভাগের আমূল পরিবর্তন করেন।

বিচার-সম্বন্ধে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়েরই প্রতি সমদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। অর্থী-প্রত্যর্থী তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদের নিকট কোন রূপ সুবিচার না পাইয়া যদি কোন উপায়ে তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার আশা পূর্ণ হইত। সাধারণের বিচার কার্যে নবাব কাজী মোহম্মদ সরেফ্ বলিয়া একজন শাস্ত্রবিৎ কাজীর পরামর্শ লইতেন। এই কাজী-সাহেব সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রিয়পাত্র। সম্রাটই ইঁহাকে বঙ্গদেশে বিচারকার্যের সহায়তার জন্য পাঠাইয়া দেন। নবাব এই কাজী সাহেবের ব্যাখ্যামত কোরাণের ব্যবস্থানুযায়ী বিচারকার্য নির্বাহ করিতেন। কাজী মোহম্মদ সরেফের দুই একটি বিচার-প্রণালীর কথা আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব।

মুরশিদকুলি খাঁর আমলে চুণাখালিতে বৃন্দাবন বলিয়া একজন হিন্দু তালুকদার ছিলেন। একদিন একজন ফকির তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে যায়। বৃন্দাবন তাহাকে ভিক্ষা না দিয়া বাটি হইতে তাড়াইয়া দেন। ফকির বৃন্দাবনকে জব্দ করিবার জন্য পথ হইতে কতকগুলি ইষ্টক সংগ্রহ করিয়া সাজাইয়া রাখে। এই ইষ্টকগুলি সজ্জিত করিয়া সে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীর প্রস্তুত করে এবং তাহা মসজিদ নামে অভিহিত করিয়া নিত্য উচ্চৈঃস্বরে আজান দিতে আরম্ভ করে। বৃন্দাবন যখন এই মসজিদের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতেন তখন ফকিরের আজানের চীৎকারটা কিছু বৃদ্ধি পাইত। বৃন্দাবন ফকিরের এই দুষ্ট ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া সেই প্রাচীরের কতকগুলি ইষ্টক ফেলিয়া দেন এবং ফকিরকে গালি দিয়া বহিষ্কৃত করেন। ফকির নবাবের নিকট বিচার প্রার্থী হইলে কাজী মোহম্মদ সরেফ্ মুসলমান-শাস্ত্রের বিধানানুসারে তালুকদারের প্রাণদণ্ডের বিধান দেন। মুরশিদকুলি খাঁ বৃন্দাবনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে অসম্মত হইয়া ইসলাম শাস্ত্রে তাঁহাকে মুক্তি দিবার কোনরূপ ব্যবস্থা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কাজীকে প্রশ্ন করেন। তাহাতে কাজীসাহেব বলেন, "শাস্ত্রে এরূপ অপরাধীকে মার্জনা করিবার কোন বিধানই নাই। তবে অপ-রাধীর সহকারীকে বধ করিতে যে সময়টুকু আবশ্যক, তাহার জন্য প্রধান অপরাধীকে বাঁচিবার সময় দেওয়া যাইতে পারে। তৎপরে তাহাকে নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে।" সাহজাদা আজিমওশ্বান এই হিন্দু-তালুকদারের জীবন-রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেও তাহাতে কোনরূপ ফল হয় নাই। কাজিসাহেব স্বহস্তে তীর-নিক্ষেপ করিয়া বৃন্দাবনের জীবননাশ করেন। আজিম-ওশ্বান এই ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া সম্রাটকে জানান, "আপনার প্রেরিত কাজী মোহম্মদ সরেফ্ উন্মাদ হইয়াছেন। কারণ তিনি অনর্থক হিন্দু-তালুকদার বৃন্দাবনকে বধ করিয়াছেন।" কিন্তু গোঁড়া মুসলমান সম্রাট ঔরঙ্গজেব সেই পত্রপৃষ্ঠে স্বহস্তে লিখিয়া দেন, 'কাজী সরফ্ খোদাকা তরফ্' অর্থাৎ কাজীসাহেব ঈশ্বরানুমোদিত কার্যই করিয়াছেন।" এই বিচার-ব্যাপার হইতে বুঝা যায়, মুরশিদকুলি খাঁ বৃন্দাবনের জীবন-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হন।

তাঁহার আর একটি বিচার-প্রণালীর কথা বলিব। হুগলীর ফৌজদার আসাদউল্লা খাঁ নবাবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সময়ে হুগলী বন্দরের কোতোয়াল ইমামউদ্দিন এক সম্ভ্রান্ত মোগল-কন্যাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায়। আসাদউল্লার নিকট কন্যার পিতা ইমাম-উদ্দিনের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিলে তিনি তাঁহাকে বলেন, "ভবিষ্যতে ইমামউদ্দিন আর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিবে না।" কিন্তু সেই অপহৃতা কন্যার পিতা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নবাব মুরশিদকুলি খাঁর নিকট এক আরজী উপস্থিত করেন। আবেদনকারীর অভিযোগ সত্য, এ কথা প্রমাণ হইলে নবাব আদেশ প্রচার করেন, কোরাণের নির্দেশানুসারে প্রস্তর-নিক্ষেপে এই ব্যভিচারীকে হত্যা করা হইবে। হুগলীর ফৌজদার সাহেব এ বিষয়ে নবাবকে অনুরোধ করিলেও তিনি তাহা রক্ষা করেন নাই।

তাঁহার আমলে বঙ্গদেশে কখনও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় নাই। দেশের শস্য-রক্ষা সম্বন্ধে,

তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার রাজস্ব বন্দোবস্তের গুণে জমিরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। অনেক পতিত-জমির আবাদ হওয়ায় প্রচুর শস্য উৎপাদিত হইত। জমিদারগণ প্রজার উপর অত্যাচার করিতে পারিতেন না। শস্যাদির মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কর্মচারিগণ মহাজনগণের নিকট হইতে কিম্বা বাজার বা গঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে শস্যাদির মূল্য-তালিকা সংগ্রহ করিয়া নবাব-দরবারে পেশ করিতেন। কখনও বা শস্যাদির একটা নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত। কোন ব্যবসায়ী যদি শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি করিত, বা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় তাহা বিক্রয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দিত, আর নবাব সে কথা জানিতে পারিতেন তাহা হইলে সেই ব্যবসায়ীকে গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগর পরিভ্রমণ করান হইত। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে টাকায় পাঁচ ছয় মণ চাউল পাওয়া যাইত।

বাকি-খাজনার জন্য জমিদারগণকে অনেক সময় কারাবদ্ধ করা হইত বা নজরবন্দী করিয়া মুরশিদাবাদে রাখা হইত। প্রথম নবাবী আমলের এই ব্যবস্থা নবাব আলিবর্দি খাঁর আমল পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। বড়িশার জমিদার সন্তোষ রায়, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও খাজনার দায়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অবরোধকালে যে জমিদারের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হইত তাহার কোন মূলভিত্তি নাই। এ বিষয়ে সমসাময়িক মুসলমান ইতিবৃত্ত-লেখকেরাই মুরশিদ-কুলির চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বলেন—"নবাবী আমলে জমিদারেরা কেবল সোজা বাঁশ দেওয়া চৌপালা ব্যবহার করিতে পাইতেন। হিন্দু-জমিদার ও কর্মচারীবর্গ নবাবের সমক্ষে আসনে উপবেশন করিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র জমিদারদের নবাব-দরবারে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। নবাবের সমক্ষে পরস্পরকে কেহ অভিবাদন করিতে পারিতেন না। তাহার পর বহুদিন হইতে একটা কথা প্রচলিত আছে—অক্ষম হিন্দু জমিদারদের নিকট জবরদস্তিতে খাজনা আদায়ের জন্য নবাব 'বৈকুণ্ঠের' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এ বৈকুণ্ঠ যে কি ব্যাপার তাহা একটু পরে বলিতেছি।

জমিদারদের উপর অত্যাচার ব্যাপার সম্বন্ধে সমসাময়িক ইংরাজ ইতিহাস লেখকদের ইতি-বৃত্ত হইতে খুব কম বিবরণই পাওয়া যায়। দেশীয় ইতিবৃত্ত লেখকেরাই এ ব্যাপারটি অধিক পরিমাণে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রাজস্ব প্রদানে অপারগ হইলেই এই সমস্ত উৎপীড়ন আরম্ভ হইত। যে সমস্ত জমিদার বা আমিল রাজস্বপ্রদানে ত্রুটি করিতেন, তাঁহারাই কারাগারে আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণাভোগ করিতেন। পীড়ন দ্বারা টাকা আদায় করাই অবরোধের প্রধান উদ্দেশ্য, কাজেই পীড়নের মাত্রা কিছু বেশী পরিমাণেই হইত। কিন্তু যখন আমরা ভাবি বাঙ্গলার অতীত-যুগের জমিদারগণ দরিদ্র প্রজাগণকে পীড়নের জন্য 'চুনের-ঘর', 'ঠাণ্ডাগারদ' ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে পারেন আর সামান্য বিশ পঁচিশ টাকা পাওনা আদায়ের জন্য এখনও কঠোরভাবে প্রজা-পীড়ন হয়, তখন মুরশিদকুলি খাঁর মত জবরদস্ত নবাব যিনি তিন চার মুলুকের মালিক, তাঁহার আমলে যে এরূপ একটা কঠোর প্রথা বা অত্যাচার হয় নাই তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অনেকে এই সব জমিদার-পীড়নের কলঙ্ক নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁর উপর অর্পণ করিয়া থাকেন। নাজির আহম্মদ প্রথমে একজন সামান্য কর্মচারী ছিল। পরিশেষে নবাবের অনুগ্রহ বলে সে দুই হাজার অশ্বারোহী ও চারি হাজার পদাতিক সেনার অধিনায়ক হয়। কাজেই দর্পে ও পদগৌরবে সে জগৎকে 'তৃণবৎমন্যতে' গোছ করিয়া তুলিল। যে সকল জমিদার খাজনা বাকী ফেলিতেন বা নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদান করিতে অপারগ হইতেন, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার ভার নাজিরের উপর পড়িত। নাজির তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কখনও বা ঢেকাটায় পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত কখনও বা কোড়া-প্রহারে জর্জরিত করিয়া তুলিত। তদ্ভিন্ন গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখা ও শীতকালে খোলাগারে ঠাণ্ডাজল ঢালিয়া দেওয়া

ইত্যাদি কষ্টদায়ক ব্যবস্থাও ছিল। তাহার পর ঐ সমস্ত জমিদার কারাগারে প্রেরিত হইতেন। নবাবের কারাগারে আহার্যাদির ব্যবস্থা অতি শোচনীয়। কেবল জীবন রক্ষার জন্য তাঁহারা যৎ-সামান্য খাদ্যাদি পাইতেন। আবার তাহার সঙ্গে হিন্দুর অভক্ষ্য দ্রব্যও মিশ্রিত থাকিত।

এইবার রেজা খাঁর ব্যবহারের কথা বলি। তিনি একটি খাদ খনন করাইয়া তাহা নানাবিধ দুর্গন্ধময় আবর্জনা দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদিগের মর্মে আঘাত করিবার জন্য সেই খনিত খাদটিকে 'বৈকুণ্ঠ' আখ্যা প্রদান করেন। যে সমস্ত জমিদার কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়াও রাজস্ব প্রদান করিতে পারিতেন না, এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ রেজা খাঁর আদেশে তাঁহারা কারাগারে আবদ্ধ হইয়া এই বৈকুণ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইতেন! কখনও বা তাঁহাদের ঢিলা-ইজারের মধ্যে মার্জার প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। বঙ্গীয় জমিদারদের উপর যে এই সমস্ত অত্যাচার করা হইত, ইহার বর্ণনা মুসলমান ইতিহাস লেখকদিগের লিখিত বৃত্তান্ত হইতেই কিছু বেশী পাওয়া যায়। নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁর অত্যাচারের কথা তারিখ-বাঙ্গলা রিয়াজ-উস-সালাতিনে উল্লিখিত আছে! পরবর্তী কালে গ্রাণ্ট ও স্টুয়ার্ট ইহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আবার মুরশিদ কুলি খাঁ যেরূপ ধার্মিক চরিত্রের নবাব ছিলেন তাঁহার আমলে যে এরূপ ধর্ম-নীতি ও সদাচার-বিগর্হিত অত্যাচারের অনুষ্ঠান হইত, তাহা বিশ্বাস করিতেও পারা যায় না। অথচ তাঁহার আমলের বৈকুণ্ঠ ঘটিত কথাটা যে একেবারে মিথ্যা তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়। একটা কোন কিছু ভিত্তি না থাকিলে যে এ সম্বন্ধে একটা ষোল-আনা আজগুবী জনরব উঠিল আর মুসলমান ঐতিহাসিকেরা হিন্দুদের ছোট করিবার জন্যই হউক বা মুরশিদকুলির দোর্দণ্ড-প্রতাপ দেখাইবার জন্যই হউক, এরূপ একটা অসম্ভব প্রবাদের সৃষ্টি করিলেন তাহাও ঠিক কথা নয়। মুরশিদকুলি খাঁ এই সব ব্যাপারে বেশী অত্যাচারী না হইলেও তাঁহাব কর্মচারীদ্বয় নাজির আহম্মদ ও রেজা খাঁ যে জমিদার-পীড়নের জন্য এরূপ একটা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাও অসম্ভব নহে। ঐতিহাসিক নিখিলবাবু বলেন—"রেজা খাঁ কর্তৃক জমিদারদের ভয় প্রদর্শনের জন্যও বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু জমিদারগণ বাস্তবিকই যে বৈকুণ্ঠ-বাস করিতে বাধ্য হইতেন এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। রেজা খাঁ ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের পর বাঙ্গলার নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত অব্দে এক্রাম খাঁকে কার্য করিতে দেখা যায়। তাহার অল্পকাল পরেই রেজা খাঁর মৃত্যু হইলে আসাদউল্লা সরফরাজ খাঁ নায়েব-দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই বৈকুণ্ঠের অস্তিত্ব যে বহুদিন ছিল না ইহাও ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে। মুসলমান ঐতিহাসিক-গণের জমিদার-পীড়নের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও জমিদারি বন্দোবস্তে মুরশিদকুলি খাঁ যে কঠোরতা প্রকাশ করিতেন ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধে মুরশিদাবাদ প্রদেশে এখনও একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মুরশিদাবাদ নগরে তাহার স্থান নির্দেশের চেষ্টা করিয়া থাকেন।" উক্ত গ্রন্থকারের মতে এই স্থান-নির্দেশের সত্যতা অনুমানসাপেক্ষ।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে দুইজন প্রবল-প্রতাপ জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য মুরশিদকুলি যে কঠোর ব্যবস্থা প্রচলন করেন তাহার ফলেই এই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ভূষণার জমিদার রাজা সীতারাম রায় ও রাজসাহীর জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ নবাবের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন।

যে সময়ে বঙ্গদেশে দ্বাদশ-ভৌমিকের আধিপত্য প্রবল, সেই সময়ে ভূষণা মুকুন্দরাম রায়ের দখলে। মুকুন্দরামের রাজ্যাবসানের পর ভূষণায় একজন ফৌজদার নিযুক্ত হন। এই ভূষণা ফৌজ-দারির মধ্য দিয়া মধুমতী নদী প্রবাহিতা। মধুমতী তীরে হরিহর-নগর নামক এক ক্ষুদ্রপল্লীতে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ বিশ্বাস-বংশে সীতারামের জন্ম হয়। সীতারামের পিতার নাম উদয়নারায়ণ রায়। বিশ্বাস উপাধি জাতিগত হইলেও উদয়নারায়ণ নবাব সরকার হইতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই রায়গণের অধীনে কতকগুলি ক্ষুদ্র মৌজা ও তালুক ছিল। ইহাই সীতারামের পৈতৃক

সম্পত্তি। চেষ্টা করিয়া সীতারাম পার্শ্ববর্তী ভূভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। ক্রমশঃ সীতারামের মনে নিজের জমিদারি বৃদ্ধি করা ও সেই সঙ্গে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সংকল্প সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

এ সংকল্প সিদ্ধির কতকগুলি অনুকূল কারণও উপস্থিত হইল। এই সময়ে বঙ্গদেশে শোভা-সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত। তখন দুর্বলচিত্ত নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সুবাদার। নুরউল্লা খাঁ যশোহরের ফৌজদার। এই নুরউল্লা ও ইব্রাহিম খাঁর শাসন-শিথিলতার অবসরে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বীর-প্রবর সীতারাম প্রভূত বলসঞ্চয় করেন। কেহই তাঁহার ক্ষমতায় বাধা-প্রদান করিতে সাহসী হন নাই বা মনোযোগ প্রদান করেন নাই। প্রকৃতি দেবী সীতারামের সহায় হইলেন। চাক্‌লা ভূষণা নদী-বহুল স্থান। চারিদিকে পদ্মার ক্ষুদ্র বৃহৎ শাখা-প্রশাখা এই স্থানকে অতি দুর্গম করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার দক্ষিণে সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। কাজেই সীতারাম স্বাধীনতা লাভের জন্য দীর্ঘকাল অবসর পাইয়াছিলেন। সেকালে দেশের লোক তলোয়ার, ঢাল, তীর ও লাঠি ব্যবহার করিতে সুদক্ষ ছিল। সীতারাম এইরূপে লোক সংগ্রহ করিয়া একটি সেনাদল গঠন করিলেন। বাদসাহ ও নবাবের সম্মতিক্রমে তিনি নিকটস্থ অনেক ভূভাগ নিজের জমিদারিভুক্ত করিয়া লয়েন। এই সমস্ত জমিদারি তাঁহার করায়ত্ত হইলে এবং অর্থবল ও লোকবল বৃদ্ধি হইলে, সীতারাম নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

হরিহর-নগরের পরপারে মধুমতী তীরে সীতারামের রাজধানী স্থাপিত হয়। এখানে তাঁহার কিছু পৈতৃক-সম্পত্তিও ছিল। জনপ্রবাদ এই, তাঁহার গৃহ-দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ হইতেই সীতা রামের সৌভাগ্যোদয় হয়। নিখিলনাথ রায়ের মুরশিদাবাদের ইতিহাসে সীতারামের লক্ষ্মীনারায়ণ প্রাপ্তির একটি জন-প্রবাদের উল্লেখ আছে। সীতারাম একদিন অশ্বারোহণে গমন করিতে করিতে একস্থানে তাঁহার অশ্বের খুর প্রোথিত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারেন। অশ্ব স্থিরগতি হইল দেখিয়া সীতারাম ইহার কারণানুসন্ধানের জন্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হন। কি কারণে সেইস্থানে অশ্বখুর প্রোথিত হইল তাহার তথ্যানুসন্ধান জন্য সেই স্থান খনন করাইতে করাইতে, প্রথমে একটি ত্রিশূল পরে মন্দিরের চূড়া ও পরিশেষে মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রাপ্তিতে সীতারামের উন্নতির পথ প্রসারিত হয়।

সীতারাম যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন তথায় একজন মুসলমান সাধুর আবাসস্থান ছিল। ফকির সে স্থানত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায় সীতারাম তাহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। এই ফকিরের নামানুসারেই তিনি স্বীয় রাজধানীর নাম 'মহম্মদপুর' রাখেন।

সীতারামের দুর্গ মৃত্তিকা-নির্মিত। ইহার চারিদিকের বেষ্টন এক ক্রোশ। এই দুর্গের চারিদিকে গভীর পরিখা ছিল। এই পরিখা হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা সহায়তায় দুর্গ-প্রাচীর নির্মিত হয়। দুর্গ-প্রাচীরের উপর সজ্জিত কামানশ্রেণী। দুর্গ মধ্যে ও পার্শ্বে রামসাগর, সুখ-সাগর প্রভৃতি প্রকাণ্ড জলাশয়। দুর্গের প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই রামসাগর। এই রামসাগর উত্তর দক্ষিণে পনর শত ও পূর্ব পশ্চিমে ছয় শত হাত বিস্তৃত। এখনও এই রামসাগর ও দুর্গ-পরিখার জঙ্গলময় পরিণাম অতীতের স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

এই রামসাগর খনন সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। পূর্বে এইস্থানে এক দরিদ্র বৃদ্ধা বাস করিত। তাহার পুত্রের নামও সীতারাম ছিল। একদিন বৃদ্ধা তাহার পুত্রকে আহ্বান করায় রাজা সীতারাম রায় তথায় উপস্থিত হন। বৃদ্ধা সহসা রাজাকে সম্মুখীন দেখিয়া ভয়ে অভিভূতা হয়। কিন্তু রাজার উপযুক্ত উপহার দিবার মত বৃদ্ধার ত কিছুই ছিল না। সীতারাম বৃদ্ধার এই অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহার নিকট হইতে প্রাঙ্গন-স্থিত একটি লাউগাছ প্রার্থনা করেন। রাজা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার উপহার ত লইলাম। এখন তোমার কি প্রার্থনা তাহা ব্যক্ত কর।" বৃদ্ধা একটি কূপ-খননের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে রাজা সেই লাউগাছের মূলে

কূপখননের আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু লাউগাছের মূলে দেশ খনন কালে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়। সীতারাম সেই অর্থ নিজে না লইয়া রামসাগর দীঘি খনন করান।

দুর্গ-নির্মাণ ও রাজপ্রাসাদের কার্য শেষ হইলে তিনি নানাস্থান হইতে শিল্পী ও শ্রমজীবী আনাইয়া প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত করাইলেন। দুর্গ মধ্যেও আর একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনিত হইল। ইহা সীতারামের গুপ্ত কোষাগার স্বরূপ ছিল। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ধন-রত্নাদি ইহাতে অনায়াসে নিক্ষেপ করা যাইবে, এই জন্য এই পুষ্করিণী খনন করা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির ব্যতীত সীতারাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও দশভুজা প্রভৃতি দেবমন্দির নির্মাণ করেন।

সীতারামের সেনাবলও এই সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ঢালী, সড়কি, তীরন্দাজ, পাইক তাঁহার দলে বিস্তর জুটিল। সীতারাম তাহাদিগকে সেকালের সমর-বিদ্যায় দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। সীতারামের বিশ্বস্ত সেনাপতিদের মধ্যে মেনাহাতিই সর্বপ্রধান। তন্নিম্নে বক্তার খাঁ, মুচরা সিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই সময়ে মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান ও নাজিম। বিচার ও শাসন-বিভাগ দুইই তাঁহার হস্তে। রাজস্ব আদায়ের জন্য এই সময়ে তিনি জমিদারদের উপরে উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সীতারাম ইতিপূর্বেই বিবাদের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বাহুবল বৃদ্ধির সহিত তিনি সরকারের খাজনা বন্ধ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

এই সময়ে আবুতোরাপ নামক এক ব্যক্তি ভূষণার ফৌজদার ছিলেন। আবুতোরাপ বাদসাহ-বংশের অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি। সীতারামের অবাধ্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া আবুতোরাপ তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চারিদিক নদী ও অরণ্য-প্রধান স্থান বলিয়া আবুতোরাপ সহজে তাঁহাকে আয়ত্তাধীন করিতে পারেন নাই। অগত্যা তিনি নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সে সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বে আবুতোরাপ পীর খাঁ নামক একজন জমা-দারকে দুইশত অশ্বারোহীর সহিত সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

আবুতোরাপ পীর খাঁকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়া নিজে শিকারে গমন করেন। সীতারাম লুক্কায়িতভাবে পীর খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য যেস্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, আবুতোরাপ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা সেইস্থানে উপস্থিত হন। সীতারামের সেনা-গণ পীর খাঁ বোধে আবুতোরাপকে হত্যা করে। ফৌজদারকে হত্যা করিবার ইচ্ছা সীতারামের ছিল না, এজন্য তিনি দুঃখিত চিত্তে ফৌজদারের মৃতদেহ ভূষণায় লইয়া গিয়া সমাধিস্থ করেন। এইবার তিনি বুঝিলেন নবাবের সহিত তাঁহার প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ হইবে। আবুতোরাপ বাদসাহের অতি নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি। মুরশিদকুলি খাঁ নিশ্চয়ই এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়িবেন না।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁ এই সংবাদে বিচলিত হইয়া সীতারামের দমনের জন্য তাঁহার নিকট আত্মীয় বক্স আলি খাঁকে ভূষণার ফৌজদার রূপে প্রেরণ করেন। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জন্য দীঘাপতিয়া রাজবংশের আদিপুরুষ দয়ারামও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহ নামক আর একজন সেনাপতি বক্স আলির অধীনে, সুবাদারি সেনার পরিচালক রূপে ভূষণায় আসেন।

বক্স আলি সংগ্রামসিংহ নামক এক সেনাপতিকে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সংগ্রামসিংহের সহিত দয়ারাম রায়ও ছিলেন। এই দয়ারামের পরামর্শেই সংগ্রামসিংহ সীতারামকে জখম করিতে পারিয়াছিলেন।

সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি প্রতিদিন প্রচ্ছন্নভাবে নগর প্রদক্ষিণ করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের সংবাদ লইত। মহম্মদপুরে একদিন ভয়ানক কুয়াসা হয়। মেনাহাতি পূর্ব প্রথামত যেমন নগর-প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছে অমনি দয়ারামের পরামর্শে, সুবাদারি ফৌজ তাহাকে আক্রমণ করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ করে। মেনাহাতির ছিন্ন-মুণ্ড নবাব মুরশিদকুলির নিকট প্রেরিত হয়।

নবাব এই বীর-প্রবরের ছিন্নমুণ্ড দেখিয়া না কি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার ন্যায় বীরকে আমি জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইলে বড়ই সুখী হইতাম।"

মেনাহাতির নিধন সংবাদে সীতারাম অতিশয় ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িলেন এবং নিরুপায় হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। সুবাদারি সৈন্যগণ দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফেলে ও ফৌজদার সাহেব শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। মুরশিদাবাদে গমন কালে সীতারাম কিছুদিন নাটোরে বন্দীভাবে ছিলেন এ কথাও শুনা যায়।

সীতারামের মৃত্যু সম্বন্ধে দুই প্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা বলেন—মুরশিদকুলি খাঁ সীতারামকে শূলে চড়াইয়া দেন। কিন্তু অন্য জনপ্রবাদ অনুসারে, তিনি পথিমধ্যে কিম্বা কারাগারে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।[১]

সীতারামের পরিবারবর্গ যে নবাবের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় তাঁহাদের আত্মীয় রামনাথের নিকট পলায়ন করেন, এতৎসম্বন্ধে অনেক কথা সেকালের কলিকাতা-কাউন্সিলের মন্তব্য হইতে জানা যায়।[২] নবাবের আদেশে হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির কলিকাতায় ইংরাজ-কোম্পানির পাটোয়ার রামনাথের আশ্রয়ে লুক্কায়িত, সীতারামের পরিবারবর্গের সন্ধানের জন্য পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা নিম্নে এই মন্তব্যটির প্রয়োজনীয়াংশ উদ্ধৃত করিলাম।[৩] এই মন্তব্য হইতে প্রমাণিত হয় নবাব মুরশিদকুলি খাঁ কোন বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারেন যে সীতারামের পরিবারবর্গ ত্রিশলক্ষ টাকা লইয়া কলিকাতায় লুকাইয়া আছেন। ইংরাজ কোম্পানির তৎকালীন পুরাতন সেরেস্তা হইতে প্রমাণিত হয় যে নবাবের আজ্ঞায় সীতারামের ইতিপূর্বেই প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। নবাব হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের মারফৎ যখন এইরূপ আদেশ পত্র পাঠাইলেন তখন ইংরাজেরা একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। যদি সীতারামের পরিবারবর্গ সত্যসত্যই কলিকাতায় আসিয়া থাকে তাহা হইলে নবাব ইংরাজদিগকে উৎপীড়িত করিবার জন্য নূতন ছল খুঁজিয়া পাইবেন। কাজেই কলিকাতার কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের

১. সীতারামের মৃত্যুব্যাপার লইয়া অনেক মত বিভিন্নতা আছে। তারিখ-ই-বাঙ্গালার মতে—বক্স আলি সীতারামকে সপরিবারে কারারুদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মুরশিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। নবাবের আদেশে তাঁহার মুখ চর্মাবৃত করিয়া মুরশিদাবাদের পূর্বপার্শ্বে ঢাকা ও মহম্মদপুর যাইবার রাস্তায় তাঁহাকে শূলে আরোপিত করা হইল। অন্যান্য জমিদারদের ভয়প্রদর্শন জন্য ঐ মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লটকান হইল এবং অপরাধীর রক্ত যাহাতে মাটিতে না পড়ে এজন্য একটি পাত্র নীচে স্থাপিত হইল। সীতারামের পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারুদ্ধ করা হইল। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন—Bux Ally Khan seized Sitaram, his woman, children and accomplices and sent them in irons to Murshidabad, where Sitaram and the robbers impaled alive and woman and children sold as slaves—Stewart's *Bengal*. p. 383. ষ্টুয়ার্ট সীতারামের সঙ্গীগণকে 'দস্যু' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্টের সংগৃহীত বিবরণের অধিকাংশই মুসলমান লেখকদিগের বৃত্তান্ত হইতে সংগৃহীত। এই সমস্ত মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ সীতারামের মত বীরকেও দস্যু বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

রিয়াজ-উস্-সালাতিন এবং তারিখ-ই-বাঙ্গালার মতে Murshid Quli Khan ordered that Sitaram's head should be enclosed in a raw cow-hide and after he had been impaled alive his body should be hung on a tree on the high road from Murshidabad to Dacca so that this might set an example to other Zamindars.—A. Karim, ***Murshid Quli Khan and his Times***, p. 50,

২. *Consultations*, 11th Feb. 3rd, 4th, 5th and 7th March, 1714.

৩. Letters and messengers from Mir Nassir Governor of Hugly, acquaint us, that Duan Jaffurcaun has received information and believes that the family of Seettaram late Jemeendaree of Boosnalie concealed in our Town (Calcutta) and pretends to suppose that they have Thirty Laeck of Rupees with them which he will demand of us for the King's use. If we conceal and protect them, Mir Nassir therefore persuades us as a friend to make diligent search and deliver them up with all that belongs to them if they are found, for Seettaram being executed by the Duan's order for Murder and Rebellion, all his effects belong to the King. . . *Consultation No.* 837 (Subject Seettaram —a fugitive land-holder concealed in Calcutta 1713-14.

অধীনস্থ পাটোয়ার, শিকদার, কোতোয়ালগণকে আহ্বান করিয়া মীর নাসিরের প্রেরিত কর্মচারী-দের সম্মুখেই এই বিষয়ে জেরা করিতে লাগিলেন। এই জেরার মুখে প্রকাশ পায় একদিন উষাকালে কয়েকজন বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। তাহাদের সীতারাম পরিবারভুক্ত মনে করিয়া ধরিয়া আনা হয়। কিন্তু আবার তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা এখন যে কোথায় তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ইংরাজেরা মীর নাসিরের কর্মচারীকে বলিয়া দিলেন, সীতারামের পরিবারবর্গের সন্ধান পাইলেই তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইবে। এজন্য একশত টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করা হইল। এই পুরস্কার ঘোষণার পরই তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়।[১]

সীতারাম রাজবিদ্রোহী। বিশেষত তিনি আবুতোরাপকে হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত অগাধ অর্থ লইয়া তাঁহার পরিবারবর্গ কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছেন। নবাব সীতারামের পরিবার-বর্গকে ধরিবার জন্য যতটা না হোক, তাঁহাদের আনীত অর্থের জন্য তাহাদের আয়ত্ত করিতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই জন্যই হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের উপর জোর পরোয়ানা ও কলিকাতার গৃহে গৃহে এই খানাতল্লাসী। ইংরাজেরা জানিতেন জাফর খাঁ (মুরশিদকুলি) কেবল শনির মত ইউরোপীয় বণিকদের পীড়নের ছল খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কাজেই কলিকাতার প্রেসি-ডেণ্ট সাহেব এই ব্যাপার লইয়া একটা মহা হুলস্থুল উপস্থিত করেন। রামনাথের বাটিতেই তাঁহাদের পাওয়া গেল। ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট মীর নাসিরকে সংবাদ দিলেন, "সীতারামের পরিবার-বর্গকে পাওয়া গিয়াছে। আপনি আপনার কর্মচারীদের পাঠাইয়া তাহাদের লইয়া যাইবেন।" এই সংবাদ পাইয়া মীর নাসির সাহেবরাম নামক একজন কর্মচারীকে কয়েকজন বরকন্দাজসহ কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সীতারামের পরিবারবর্গ যে কলিকাতা হইতে হুগলীতে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতেই পাওয়া যায়।[২]

আবার কোন কোন মতে নবাব সীতারামের পরিবারবর্গকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভূষণায় প্রত্যাগমন করিয়া হরিহরনগরেই বাস করেন ও ভবিষ্যতে অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন।

সীতারামের বংশ নাই। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার বংশধরেরা এখনও হরিহরনগরে বাস করি-তেছেন। সীতারাম বংশীয়েরা কিছুদিন নলডাঙ্গার রাজাদের নিকট হইতে বৃত্তিভোগ করিয়াছিলেন।

সীতারামের ধ্বংসসাধনের জন্য নাটোরের রঘুনন্দনই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রিয়াজে

---

১. The encouragement of hundred rupees reward promised, prevailed with two needy persons to discover that Seettaram's family were concealed by Ramnaut our Puttwaree at Govindpur (the very person who said the Duan's servants carry'd them away) the men in his House and the Women at another place, the President therefore sent two trusty servants and ten Peons along with the informers, who found and brought away two sons and a daughter, all small children of Seettaram's also six women of his family and four man servants they also brought away. Ramnaut our Patwaree who by concealing and harbouring them endangered vast prejudice to our affairs in Bengal for the Duan Jaffarcaun seeks all occassions possible to imbroyle all the European Traders and had lately found means to squeeze the French and Dutch tho' we have hitherto baffled his endeavours against us—*Consultation No. 838 Fort-William, 1713-14.*

২. Meir Nassir Governour of Hugly sent Sabroy one of his head officers and a guard to carry away Seettaram's family and what effects should be found here belonging to them and after the necessary precaution such as getting receipts for them and attestations sealed by the Cazee that nothing remained here belonging to them were despatch't them sending a guard of ten soldiers commanded by an officer to see them safe conveyed and deliver'd up to Meir Nassir. ৫ই মার্চ তারিখে—সীতারামের পরিবারবর্গকে প্রহরী রক্ষিত করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করা হয়। ৭ই তারিখে প্রহরীরা হুগলী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। ইংরাজের উকিল, হুগলী হইতে কলিকাতার প্রেসিডেণ্টকে লিখিয়া পাঠান যে—মীর সাহেব ইংরাজদের এই ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। The Vacquell writes that Meir Nassir exprest the utmost satisfaction with his having received them—*Consultation No 840, dated Fort-William 1713-14.*

আছে—"নাটোরের রাজবংশের প্রতিভাশালী নবীন কর্মচারী দয়ারাম নাটোরের জমিদারি ফৌজ লইয়া পশ্চিম দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলেন।" তিনি মেনাহাতিকে বিনাশ করিয়া সীতারামের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন করেন। ভবিষ্যতে রঘুনন্দন ইহার জন্য নবাব সরকার হইতে যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করেন। রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবন 'ভূষণা'র জমিদারি লাভ করেন। ভূষণার বাদসাহী সনন্দে "বির্মজ্জিম তপশীল বেশী জমা ও পেস্কস প্রদান স্বীকারে ভূষণার 'খারিজা' জমিদারি রামজীবনকে প্রদত্ত হইল" এই পংক্তিটি আছে।১

সেকালের জমিদারি সনন্দ কিরূপ ছিল অর্থাৎ তাহাতে কিরূপ ভাবে জমিদারের আদেশ প্রদত্ত হইত, তাহার একখানির নিদর্শন আমরা পাঠকবর্গের গোচরার্থে প্রকাশ করিলাম। সীতারামের অধঃপতনের পর রামজীবনের উপর ভূষণা জমিদারির স্বত্ব অর্পিত হয়। আমরা প্রথিতনামা ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্নবাবুর বাঙ্গলার ইতিহাস হইতে এই সনন্দখানি উদ্ধৃত করিলাম। ভবিষ্যতে যথাস্থানে এই রামজীবন সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলা যাইবে।

জমিদারি সনন্দ (ভূষণা ও রামজীবন)

মোহর ফেরোকসিয়ার ১১২৫ হিঃ প্রদত্ত হিঃ ১১২৯।

উপস্থিত সম্পূর্ণ ফলদায়ক শুভকালে সর্বজন মাননীয় এই ফারমানে প্রচারিত হইল, যে সুবা বাঙ্গলার অন্তর্গত ভূষণা জমিদারি বিমজ্জিম তপশীল বেশী জমা ও পেস্কস প্রদান স্বীকারে, রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দিগণের কর্তব্য, যে তাঁহারা এই রামজীবনকে উক্ত ভূষণার জমিদার জানিয়া তাঁহার উপর এতৎসম্বন্ধীয় কার্যভার ন্যস্ত আছে এইরূপ বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট প্রতিবর্ষে নূতন সনন্দ তলব করা না হয়। উক্ত রামজীবনের উচিত যে এই এলাকার প্রজা, অধিবাসী ও পথিকগণের হিত চেষ্টা করিয়া দরিদ্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া, তাহাদিগকে বজায় রাখিয়া, সচ্চরিত্রতার সহিত নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন। প্রজাবর্গ যাহাতে উত্তমরূপে চাষাদি দ্বারা স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে এবং যাহাতে রাজকর বর্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন ও আদায় ক্ষেত্রে জুলুম না করেন। ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত হইলে, নির্ধারিত রাজকর অপেক্ষা বেশী জমা পেস্কসরূপে

পূর্বোক্ত টীকাগুলির ইংরাজী অংশ সেকালের ইংরাজী বানানের নমুনা স্বরূপ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন নবাবী আমলের ইংরাজী বানানের সহিত এখন কত পার্থক্য হইয়াছে।

১. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস, নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ষ্টুয়ার্টের বেঙ্গল আর উইলসন হইতে সীতারাম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় অথচ সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠকদের উপহার দিলাম। সীতারামের নাম বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছিল, মহম্মদপুরের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গীয় ঐতিহাসিকদের চেষ্টায় এই মহাবীরের সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সীতারামের লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। শুনিয়াছি সীতারামের সময়ের অন্যান্য প্রস্তর ফলকাদির অনুসন্ধান সম্বন্ধেও বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ এখনও চেষ্টা করিতেছেন। সীতারামের দশভূজা মন্দিরের প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে—

মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী-শাকে দশভুজালয়ং। / অকারি শ্রীসীতারাম রায়েন . . . মন্দিরম্।

এই নির্দেশ হইতে ১৬২১ শক বা ১৬৯৯-১৭০০ খৃঃ অব্দ হয়। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে—

লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরসভূশকে / নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরম্।

১৬২৫ শক হইতে ১৬২৬ শক এবং দুর্গবহিঃস্থ কানাইনগরের কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরের শিলালিপি হইতে দৃষ্ট হয়—

বানদ্বন্দাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী। অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং।
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাবোত্তবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ। শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ।

মহী—১, ভুজ—২, রস—৬, ক্ষৌণী=পৃথিবী—১ 'অঙ্কস্য বামাগতি' বলিয়া ইহাতে ১৬২১ শক, এইরূপে তর্ক=দর্শন=৬, অক্ষি=২, রস—৬, ভূ—১, হইতে ১৬২৬ শক এবং বাণ—৫, দ্বন্দ—২, অঙ্গ—৬, চন্দ্র—১ হইতে ১৬২৫ শক দৃষ্ট হয়।—Westland's ***Jessore and Bengal Monuments.*** কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস পৃঃ ৭৭।

কিস্তি কিস্তি প্রদান করা কর্তব্য বিবেচনা করেন।

(এই সনন্দের পৃষ্ঠে ইয়াদদস্তে অন্যান্য কথার সহিত লিখিত আছে, যে সুবা বাঙ্গলার নাজিম নবাব জাফর খাঁ নসিরির [মুরশিদকুলি খাঁ] রোবকারী অনুসারে দৃষ্ট হয়, নিম্নের তপশীলে লিখিত ভূষণার খারিজা জমিদারি জমা বৃদ্ধি ও নজরানা স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে; তাঁহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জুর করা গেল। ২৩শে জেলহজ্জ—৫ জুলুস)

সীতারামের পরিণাম সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহাই সংকলিত করিয়া দেখাইলাম। উদয়নারায়ণের বিদ্রোহের সহিত কলিকাতার কোন সম্বন্ধ নাই। এজন্য তাহা বিবৃত না করিয়া, নবাব মুরশিদকুলি খাঁর স্মৃতিচিহ্ন ও রাজস্ব-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিয়া বর্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

কাটরার মসজিদ মুরশিদকুলি খাঁর প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। এখনও এ মসজিদ ভগ্নাবস্থায় মুরশিদাবাদে বর্তমান। মসজিদ সংলগ্ন প্রস্তর-ফলক হইতে প্রমাণ হয়, ১১০৭ হিজরী বা ১৭২৩ খৃস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এইরূপ জনপ্রবাদ যে ইহা মুসলমানের পবিত্র তীর্থ মক্কাধামের মসজিদের অনুকরণে নির্মিত। এই মসজিদের পূর্বপার্শ্বে, প্রবেশদ্বারের সিঁড়ির নীচে মুরশিদকুলি খাঁর দেহ সমাহিত। এই মসজিদ সমচতুরস্র আকারে নির্মিত। এক সময়ে প্রকাণ্ড সিংহদ্বার ও তদুপরিস্থিত দ্বিতল গৃহ, নহবৎখানা, ও প্রহরীগণের বাসস্থান প্রভৃতি শোভিত হইয়া, ইহা এক দর্শনীয় পদার্থরূপে মুরশিদাবাদের শোভাবর্ধন করিয়াছিল। এখন ইহা কালহস্তে ধীরে ধীরে বিচূর্ণিত হইয়া, ধ্বংস পথে অগ্রসর হইতেছে। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর এই কাটরা-মসজিদের অনুকরণে নবাব সরফরাজ খাঁও একটি মসজিদ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই।

মুরশিদকুলি খাঁর 'চেহেল-সতুন' দরবার একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহাসৌধ। চল্লিশটি স্তম্ভশোভিত ছিল বলিয়াই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। মুরশিদাবাদ চকবাজারের পশ্চিমে যেখানে মণিবেগমের বিখ্যাত মসজিদটি আছে সেই স্থানেই দরবার-গৃহ ছিল। এই দরবারে প্রবেশ করিতে বাঙ্গলার অনেক ভূস্বামীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে সময়ে বঙ্গের দেওয়ানী গ্রহণ করেন সেই সময়ে ইহার অবস্থা বোধ হয় অনেকটা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ এই দরবারেই বার্ষিক শুভ-পুণ্যাহের অনুষ্ঠান হইত। কিন্তু ঐ সময়ে চেহেল-সতুন দরবার পুণ্যাহের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় মতিঝিলেই পুণ্যাহ-অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই চেহেল-সতুন দরবার-গৃহেই বাঙ্গলার ইতিহাস বিশ্রুত মসনদ বা প্রস্তর-সিংহাসন স্থাপিত হয়। নবাব মুরশিদকুলি ঢাকা হইতে ইহা মুরশিদাবাদে আনেন। এই ইতিহাসবিশ্রুত মসনদ সম্রাট সাহজাহানের পুত্র সাহসুজার আমলে নির্মিত হয়। ঢাকা, রাজমহল, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি তিনটি রাজধানীতে থাকিয়া এবং তাহাদের ধ্বংস সাধন দেখিয়া এখনও এই সিংহাসন মুরশিদাবাদে বর্তমান রহিয়াছে। ইহা কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত। এই কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত আর একটি মসনদ আগরা-দুর্গে মোগল সম্রাটদের ব্যবহারের জন্য নির্মিত হয়। এখন আগরা ও বাঙ্গলার বাদসাহী ও নবাবী প্রস্তর-মসনদের একইরূপ শোচনীয় অবস্থা।১

মুরশিদকুলির দ্বিতীয় স্মৃতিচিহ্ন সুবিখ্যাত 'জাহান-কোষা' তোপ। জাহান-কোষা শব্দের

১. এই প্রস্তরখণ্ডে লৌহের ভাগ বিদ্যমান থাকায়, কয়েকটি লাল দাগ পড়িয়াছে এবং ইহা শীতল হইলে বাষ্প জমিয়া এত অধিক পরিমাণে ঘর্ম নিঃসৃত হয়, যে পার্শ্বদেশে গড়াইয়া পড়ে। সাধারণ জনপ্রবাদ যে, বঙ্গীয় নবাবগণের দুঃখে প্রস্তর সিংহাসনের বুক ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইয়াছে। এবং সেই শোকে এখনও ইহা সময়ে সময়ে নীরবে দরদরিত ধারায় বাষ্পবারি বিসর্জন করিয়া থাকে। লর্ড কার্জনের চেষ্টায় এই 'মসনদ' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে।—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস পৃ. ৫১৯। বর্তমানে ইহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রদর্শবস্তুর অন্যতম।

অর্থ 'জগজ্জয়ী'। এখনও এই সুবৃহৎ তোপ দুইটি অশ্বত্থ-তরুর কাণ্ডদেশে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া এক অদ্ভুত দৃশ্যে পরিণত হইয়াছে। এই কামানটি দৈর্ঘে বার হাত ও প্রস্থে সাড়ে তিন হাত। এই তোপে সাতখানি পিত্তল-ফলক মারা ছিল। এই সমস্ত পিত্তল-ফলকে সম্রাট সাহজাহান ও তাঁহার সময়ের বঙ্গের সুবাদার ইসলাম খাঁ এবং এই তোপেরও যশোকীর্তন লিখিত আছে। একখানি ফলক হইতে প্রমাণিত হয়, "জাহান-কোষা তোপ জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) দারোগা সের মহম্মদের ও পরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে প্রধান কর্মকার জনার্দন দ্বারা ১০৪৭ হিজরা (১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে) নির্মিত হইল। ইহার ওজন ২১২ মণ ও অগ্নি সংযোগ করিতে ২৮ সের বারুদের প্রয়োজন হয়।" ইহা ভিন্ন 'বাদসা-ওয়ালী' বলিয়া আর একটি সুবৃহৎ তোপও মুরশিদাবাদ কেল্লায় দেখা যায়। ইহার মুখের ব্যাস প্রায় দুই হাত।

এই দুইটি তোপ ও মুরশিদাবাদের শেলেখানায় রক্ষিত সেকালের পুরানো অস্ত্রশস্ত্রাদি হইতে প্রমাণিত হয় বাঙ্গালী কারিগরেরা বাঙ্গলা দেশেই এইরূপ প্রকাণ্ড তোপ ও অস্ত্রাদি নির্মাণ করিত।

পূর্বে আমরা নবাবের আমলের একখানি সনন্দ উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা হইতে প্রমাণ হয় জমিদারগণ এই সমস্ত বাদসাহী সনন্দদ্বারা নানারূপ স্বত্বে আবদ্ধ থাকিতেন। এইরূপ বাদসাহী সনন্দদান-প্রথা জাহাঙ্গীর বাদসাহের আমল হইতেই প্রচলিত হয়। কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ রাজা মানসিংহের নিকট এইরূপ সনন্দ লাভ করেন। এই সমস্ত জমিদারি-সনন্দ হইতে জানা যায়, জমিদারেরা প্রজা পালন করিতে বাধ্য ও অযথা প্রজাপীড়ন করিতে পারিতেন না। ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, সরকারের প্রাপ্য রাজকর যথাসময়ে দাখিল করিতে হইবে। এই সমস্ত সনন্দে যাহাতে প্রজাদের উপর অপরে কোনরূপ অত্যাচার না করে, প্রত্যেক জমিদারের দখলী জমিদারির মধ্যে পথঘাটের উন্নতি হয়, এরূপ ব্যবস্থাও থাকিত। জমিদারেরা এই সনন্দ-প্রাপ্তির সময়ে সরকারের নিকট এই সমস্ত স্বত্ব পালন করিবার জন্য মুচলেকা লিখিয়া দিতেন। রাজার হস্তে জমিদারির স্বত্ব উৎখাত করিবার ক্ষমতা থাকিলেও অনেক স্থলে উত্তরাধিকার সূত্রের ব্যতিক্রম করা হইত না। জমিদার যদি বিদ্রোহী হইতেন বা রাজস্বদানে অপারগ হইতেন তাহা হইলেই তাঁহার জমিদারি কাড়িয়া লইয়া অপরকে দেওয়া হইত। সেকালে জমিদারেরা জমিদারি-দান ও বিক্রয়ের স্বত্বের অধিকারী ছিলেন। তবে এরূপ বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার সময় সুবাদারের সম্মতি লইতে হইত।

নবাবী আমলে প্রজার জমির উপর কিরূপ স্বত্ব ছিল এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। নবাবী আমলে খোদকস্ত ও পাইকস্ত বলিয়া দুইটি প্রধান শ্রেণীর রাইয়ৎ ছিল। খোদকস্তগণ স্থায়ী রাইয়ৎ। ইহারা পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ভিটায় বাস করিত ও জমা লওয়া জমিতে পুরুষানুক্রমে চাষ করিত। পাইকস্তেরা ভিন্ন গ্রামবাসী রাইয়ৎ। ইহাদের জমির উপর কায়েমী স্বত্ব ছিল না। তবে তাহারা জমিজমা করিয়া লইয়া চাষ-আবাদ করিত। ইহাদের অধীন থাকিয়া যাহারা চাষ ও আবাদ করিত তাহারা কোরফা প্রজা বলিয়া উল্লিখিত হইত।

প্রজারা যাহাতে তাহাদের জমাজমির চাষ আবাদ কার্যে মনোযোগী হয় তৎসম্বন্ধে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের খুব কড়া হুকুম ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রদত্ত ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের এক পরোয়ানা হইতে দেখা যায় বাদসাহ রাজস্ব আদায়কারী তহশীলদারদিগকে আদেশ করিতেছেন—"তাহারা বৎসরের প্রারম্ভে কৃষকগণের অবস্থা যথাসাধ্য জ্ঞাত হইবে। প্রজারা রীতিমত চাষ আবাদ করিতেছে কি অবহেলা করিতেছে তৎপ্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। পরিশ্রমী কৃষকদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। কিন্তু যাহারা উপায় সত্ত্বেও আবাদে অবহেলা করিতেছে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবে, ভয় দেখাইবে, বল প্রয়োগ করিবে ও বেত মারিবে।" ডাক্তার হাণ্টার বলেন, জমিদার ও আমিলগণ এবং ইজারাদারগণ স্থায়ী প্রজাকে বাধ্য করিয়া জমি আবাদ করাইতে সক্ষম ছিলেন। প্রজাগণকে বলপূর্বক ধরিয়া আনা, বন্দীভাবে রাখা, বিদ্রোহভাবযুক্ত গ্রামসমূহে ফৌজ নিযুক্ত করা ও

পলাতক প্রজাদের বাকি খাজনা, অবশিষ্ট স্থায়ী প্রজাগণের নিকট আদায় করা প্রভৃতি প্রথা সেকালে প্রচলিত ছিল।

প্রজাগণ জমা ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও জমিদারের নিকট জমি লাভ করিত। হিন্দু জমিদারেরা ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দিতেন, দেবতা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবোত্তর করিয়া দিতেন। মুসলমানগণকেও তাঁহারা জমি দান করিতেন। আবার মুসলমানেরাও হিন্দুদের জমি দান করিতেন। এই সমস্ত কারণে বঙ্গদেশে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি জমির সংখ্যা বেশী হইয়া উঠে।

মোগলরাজত্বে সোনার বঙ্গদেশ 'জিন্নেৎ-উল্-বেলাৎ' বা স্বর্গভূমি বলিয়া উল্লিখিত হইত। প্রসিদ্ধ ফরাসি-পর্যটক বার্ণিয়ার সাহেব সাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের আমলে এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"মিশর দেশই চিরকাল অতি উর্বর ও শস্যশালিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু আমি দুইবার বাঙ্গলায় গিয়া যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বঙ্গদেশই উর্বরতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ দেশ। এখানে তণ্ডুল এত উৎপন্ন হয় যে নিকটবর্তী প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়াও অনেক দূরবর্তী স্থান সমূহের অধিবাসিগণ বাঙ্গলার অন্নে প্রতিপালিত হয়। সমস্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে এমন কি আরব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশেও বাঙ্গলার শস্য প্রেরিত হয়। নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও মিষ্টান্নের জন্য বাঙ্গলা দেশ চিরপ্রসিদ্ধ। এখানকার লোকে অন্নভোজী বলিয়া গমের চাষ খুব কম হয়। চাউল, ঘৃত ও নানা প্রকার তরকারী এখানে অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। টাকায় কুড়িটার উপর উৎকৃষ্ট পক্ষী পাওয়া যায়। ছাগ ও মেষ এদেশে প্রচুর। শূকর এতই প্রচুর, যে পর্টুগীজেরা এই মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করে। এখানে নানা শ্রেণীর মৎস্য অপর্যাপ্ত পাওয়া যায়। এক কথায় লোকের জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যে বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ। এই জন্যই পর্টুগীজেরা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছে।"

বার্ণিয়ারের এই বর্ণনার পর, আমরা ঔরঙ্গজেবের আমলেও বঙ্গের উন্নত অবস্থার কথা জানিতে পারি। সায়েস্তা খাঁর 'ধানের-গোলা' প্রবাদ কথা নহে। তাঁহার আমলে টাকায় আট মণ চাউল বিকাইত। সায়েস্তা খাঁ ঢাকায় এই গোলা নির্মাণ করিয়া তাহার তোরণের শিরোদেশে লিখিয়া দেন—"যে শাসনকর্তার শাসনকালে এইরূপ সুলভ মূল্যে চাউল পাওয়া না যাইবে—তিনি যেন আমার গোলার দরজা না খুলেন।"১ নবাব সায়েস্তা খাঁর বহু পরে, নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলেও, টাকায় পাঁচ ছয় মণ চাউল বিকাইত। চাউল সস্তা থাকিলেই অন্যান্য দ্রব্য সুলভ হইবে। এই জন্যই রিয়াজের গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন—"নবাবের আমলে মাসে এক টাকা আয় হইলে একজন লোক দুবেলা উদরপূর্ণ করিয়া পোলাও-কালিয়া খাইতে পারিত। দরিদ্র ফকিরগণ এই সস্তা গণ্ডার দিনে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইত।"

নবাব মুরশিদকুলি যাহাতে দেশের শস্য-রক্ষা হয়, প্রজাগণ কষ্ট না পায়, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হয়—তজ্জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার আমলে কোন আড়তদার ও ব্যবসায়ী শস্যাদি একচেটিয়া করিতে পারিত না। তাঁহার নিযুক্ত গোয়েন্দাগণ নানাস্থানের হাটে-বাজারে ঘুরিয়া শস্যের দর সংগ্রহ করিত। যখন তিনি ব্যবসায়ীদের পক্ষে কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার দেখিতেন, তখনই তাহাদের যথেষ্ট শাস্তি দিতেন। যদি সহরে বা নগরে শস্যের আমদানী কম হইয়া পড়িত, তাহা হইলে তিনি সুদূর মফঃস্বলে যে সকল স্থানে অন্যায়রূপে শস্য আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই সকল স্থানে সিপাহী ও [illegible] পাঠাইয়া, জবরদস্তিতে সেই সমস্ত ব্যবসায়ীকে বাজার দর অনুসারে শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য করিতেন। এই সময়ে মুরশিদাবাদে টাকায় চারি মণ চাউল বিক্রয় হইত।

---

১. মুরশিদকুলি খাঁর দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁর আমলে ঢাকার যশোবন্ত রায় রাজকার্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে ধান চাল খুব সস্তা হইয়াছিল। এ সময়েও প্রতি টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হইত। এই জন্য তিনি নবাব সায়েস্তা খাঁর ধানের গোলার দ্বার খুলিয়াছিলেন।

সুতরাং অন্যান্য জিনিসের দামও এই হিসাবে অনেক কম ছিল। চাউল যাহাতে অন্যায়রূপে রপ্তানী না হয়, সে দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।[১]

নবাবগণের শাসনকালে রাজতন্ত্র ও রাজস্ব-বিভাগ কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইত, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের একটা কৌতূহল হইতে পারে। এ সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাসে—"নবাবী আমলের কার্যবিভাগ" প্রসঙ্গে, একটি অনুসন্ধিৎসাময় বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই ইতিহাসের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারেন। আমরা নিম্নে কেবল ইহার একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করিতেছি।

মন্ত্রিবর্গ

১। দেওয়ান-ই-আলা (প্রধান মন্ত্রী) (Prime Minister).
২। দেওয়ান-খালসা-শরিফা (Finance Minister).
৩। দেওয়ান-ই-তন্ (তন্‌খা-দেওয়ান) (Pay Master General).
৪। দেওয়ান-ই-বেয়ুতাৎ (Minister of Domestic Affairs or Home Secretary)
৫। দেওয়ান-খান্ খানান্ (Lord High Steward).

বিচার বিভাগ

১। কাজি-উল্-কোজাৎ (প্রধান কাজী) (Chief Justice).
২। মুফ্‌তী (মহম্মদীয় আইনের ব্যাখ্যাকারক) হিন্দুশাস্ত্র ঘটিত ব্যাপারের জন্য প্রধান প্রধান বিচারালয়ে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন।
৩। দারোগা-ই-আদালৎ (Registrar).
৪। মোহতসীব (মদ্যপায়ী প্রভৃতি কুপথগামীর বিচারক এবং ওজন প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক)। (Town Magistrate).

সামরিক বিভাগ

১। মীর বকসী কুল বা সেপাসালার আজম্ (Commander in Chief).
২। বক্‌সী, দুয়েম্, সুয়েম্, চাহারাম প্রভৃতি।
৩। বক্‌সী আহাদিয়ান (Commander Royal Guards).
৪। বক্‌সী সার্গেদ পেসী (চোপদার প্রভৃতির অধিনায়ক)।
৫। বক্‌সী সুবাজাত (প্রাদেশিক নায়েবসুবার অধীন সেনাপতি)।
৬। জমাদার—পদাতিক সেনানায়ক।
৭। হাজারী—পঞ্চশত হইতে সহস্র পর্যন্ত সেনানায়ক।

সেরেস্তার কর্মচারী

১। মুস্তোফী (দেওয়ানী সেরেস্তাদার)।
২। মুস্‌রেফ (সেরেস্তার ইনসপেক্টার)।
৩। খাস-নবীস (নিজামৎ প্রাইভেট সেক্রেটারী)।
৪। হুজুর-নবীস (সনন্দ ফারমান প্রভৃতির অধ্যক্ষ)।

১. He always provided against the famine ; and severely prohibited all monopolies of grain. He constantly made private enquiries concerning the market price of grain, and when he discovered any imposition the offenders suffered the most exemplary punishment. If the importation of grain to the city and towns fell short of what had been usual, he sent officers into the country who broke open the hoards of individuals and compelled them to carry their grains to the public market. Rice was then commonly sold at Murshidabad at four maunds for a rupee and the prices of other provisions were in proportion.—Vide *Stewart's Bengal* 1813, p. 407.

৫। দারোগা কাছারি (দেওয়ানখানার অধ্যক্ষ)।
৬। দারোগা কারখানাজাৎ ও দারোগা সহরৎ-ই-আম্ (Building Inspector and Inspector of Public Works).
৭। আমিন্ কাছারি ও আমিন সুবাজাৎ।
৮। করোরিয়ান খালসা (রাজস্ববিভাগের প্রধান আদায়কারিগণ)।
৯। পরগনা-কানুনগো, পেস্কার প্রভৃতি।
১০। মুন্সী ও মোহরের (নানাপ্রকারের)।

খাজনা খানা

১। খাজাঞ্চী খাজনা-জমা ও খাজনা খরচ (দুইজন)।
২। ফোতাদার (পোদ্দার) মুদ্রা-পরীক্ষক ও তদধীন কর্মচারিগণ।
৩। তহবিলদার (মণিমাণিক্যাদি বহুমূল্য দ্রব্যের)।

দৌত্য ও সংবাদ-বিভাগ

১। এল্চিয়ান (Ambassadors) ও উকিল।
২। ওয়াকে নবীস (দরবারের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত লেখক)।
৩। সওয়ানে নেগার্ (সংবাদপত্র লেখক—সরকারি)।

ফৌজদারি ও শান্তিরক্ষা বিভাগ

১। ফৌজদার (Magistrate).
২। থানাদার (কোন কোন নগরে স্থাপিত সহকারী ফৌজদার)।
৩। কোতোয়াল (বৃহৎ নগরের পুলিসাধ্যক্ষ)।
৪। দারোগা-ই-দাগ (অপরাধীর সন্ধান ইত্যাদি কার্য জন্য) এতদ্ভিন্ন কোতোয়াল প্রভৃতির নিম্নে নিম্নশ্রেণীর অনেক পুলিস কর্মচারী ছিল।

অন্যান্য বিভাগ

১। মীর তোজক্ (দরবার, জৌলুস প্রভৃতির তত্ত্বাবধায়ক)।
২। মীর এমারৎ (এমারৎ বিভাগের অধ্যক্ষ)।
৩। দারোগা সায়ের (শুল্ক-বিভাগের অধ্যক্ষ)।

সম্রাটের হইয়া প্রদেশ শাসন করিতেন সুবাদার ও দেওয়ান। সুবাদার প্রায় রাজবংশীয়গণই হইতেন। দেওয়ান রাজস্ব-বিভাগের সর্বময় কর্তা। সুবাদারকে কিন্তু দেওয়ানের নিকট হইতেই বেতন গ্রহণ করিতে হইত। দেওয়ানী বিভাগের কর্মচারিবর্গ, সম্পূর্ণরূপে এই বাদসাহী-দেওয়ানের অধীন ছিলেন। মুরশিদকুলি খাঁর আমলে, দেওয়ান ও সুবাদার-পদের সমীকরণ হয়। মুরশিদকুলি খাঁ সুবাদার হওয়ায়, দেওয়ানের পদ লোপ পায়, কিন্তু মুরশিদকুলি 'খালসা-দেওয়ান' বা রাজস্ব-সচিব বলিয়া একটি নূতন পদ সৃষ্টি করেন। খালসা দেওয়ান, সমগ্র রাজ্যের আয়-ব্যয় নির্বাহ ও রাজস্ব-বন্দোবস্ত করিতেন। এতদ্ভিন্ন দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারকের কার্যও তাঁহাকে করিতে হইত। জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তিনি স্বয়ং বা তাঁহার প্রতিনিধি তাহার বিচার করিতেন।

রাজকীয় গুরুতর কার্য ব্যতীত, নায়েব-নাজিম অন্যান্য কার্য স্বাধীন ভাবেই করিতেন। উড়িষ্যা, ঢাকা ও পাটনা এই তিন স্থানেই নায়েব-নাজিম নিযুক্ত হইত। ঢাকায় নায়েব-নাজিমের ততটা প্রয়োজন ছিল না। যিনি তাঁহার সহকারীরূপে ঢাকায় থাকিতেন, তিনিই সরকারে রাজস্ব পাঠাইয়া দিতেন। নায়েব নাজিমগণ জায়গীর পাইতেন। মুরশিদকুলি খাঁ এই নায়েব--নাজিমের অধীনেই ফৌজদারি-বিভাগ স্থাপিত করিয়া দেন।

ফৌজদারগণ দেশের ম্যাজিস্ট্রেট। নবাবী আমলে সমগ্র বঙ্গদেশ দশটি ফৌজদারিতে বিভক্ত

ছিল। (১) চট্টগ্রাম (ইস্‌লামাবাদ) (২) শ্রীহট্ট (৩) রঙ্গপুর (৪) রাঙ্গামাটি (৫) পুর্ণিয়া (জেলালগড়) (৬) রাজমহল (আকবর নগর) (৭) রাজসাহী (৮) বর্দ্ধমান (৯) মেদিনীপুর (১০) হুগলী (বঙ্গ বন্দর) এই সকল ফৌজদারিতে একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত হইতেন। খাস মুরশিদাবাদ সহরে একজন অতিরিক্ত ফৌজদার নিযুক্ত ছিলেন। এই ভাবে বিহার প্রদেশেও আটটি ফৌজদারি ছিল। ফৌজদারেরা তাঁহাদের অধীনস্থ প্রদেশসমূহের শান্তিরক্ষা করিতেন। বিদ্রোহী-জমিদার বা প্রজাশাসন, বিভাগের সীমানা-রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলার ভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। এই সমস্ত বিভাগীয় ফৌজদারগণ মোগল-রাজত্বের উজ্জ্বল দিনে বাদসাহ সরকার হইতেই নিযুক্ত হইতেন। সম্রাটগণের শক্তি ক্ষীণ হইবার পর, মুরশিদাবাদের নবাবই ফৌজদার নিয়োগ করিতেন। বাদসাহ-দরবারে বিভাগীয় ফৌজদারগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল। অনেক ফৌজ-দার কার্যকুশলতা দেখাইয়া সুবাদারিপদ লাভ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এক-হাজারী হইতে, চারি-হাজারী পর্যন্ত মনসবদার হইতেন। পদমর্যাদা অনুসারে তাঁহাদের অধীনে পাঁচশত হইতে এক সহস্র পর্যন্ত সৈন্য থাকিত। ইহাই 'ফৌজদারি-ফৌজ' নামে বিখ্যাত। ফৌজ-দারগণ রাজসম্মানের সহিত সাধারণে বাহির হইতেন। পথিমধ্যে গমনকালে--ছত্র, আড়ানী প্রভৃতি সম্মানসূচক রাজ-চিহ্ন তাঁহারা উপভোগ করিতে পাইতেন। রণবাদ্যও তাঁহাদের শোভা-যাত্রার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত।

যাহাতে দেশের মধ্যে কোনরূপ অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত না হয়, ফৌজদার তাহার উপায় বিধান করিতেন। তাঁহার এলাকার মধ্যে যাহাতে কোন জমিদার কোনরূপ দুর্গনির্মাণ করিতে না পারেন,অথবা সেনা-সংগ্রহ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে না পারেন, ফৌজদার সর্বদাই সেদিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অবাধ্য ও বিদ্রোহী জমিদারকে বাদসাহী-ফৌজ সহায়ে ধৃত করিয়া সুবাদারের নিকট পাঠাইতেন। যখন কোন কারণে তাঁহার অতিরিক্ত সেনার প্রয়োজন হইত, সেই সময়ে ফৌজদারির মধ্যে নিয়োজিত সেনানী ও মনসবদারগণ তাঁহাদের অধীনস্থ সেনা লইয়া ফৌজদারের সহিত মিলিত হইতেন। আবার সুবাদারের প্রয়োজন সময়েও ফৌজদার তাঁহাকে সেনা-সাহায্য করিতেন। চোর ডাকাত দমন করা, ফৌজদারের একটা বিশিষ্ট কর্তব্য ছিল। অনেক সময়ে দলবদ্ধ ডাকাতদের পশ্চাতে সসৈন্যে ধাবমান হইয়া তিনি তাহাদের ধৃত করিয়া সমূলে উৎপাটন করিতেন। ধরিতে গেলে, ফৌজদারগণই প্রকৃতপক্ষে দেশের শান্তিরক্ষক ছিলেন। যে ফৌজদার কর্তব্যপরায়ণ হইতেন ও কঠোর নীতি অবলম্বনে দেশ-শাসন করিতেন—তাঁহার আমলে প্রজাগণ অতি নিঃশঙ্কভাবে জীবন যাপন করিত।[১]

পুলিস-বিভাগও এই ফৌজদারের হাতে ছিল। তাঁহার অধীনে নানাস্থানে শান্তিরক্ষার জন্য 'থানা' স্থাপিত হইত। থানাদার ও পুলিস-প্রহরিগণ দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা করিত। প্রধান প্রধান নগরসমূহে—কোতোয়াল বলিয়া একজন পদস্থ কর্মচারী থাকিতেন। কোতোয়ালের অধীনে অসংখ্য চৌকিদার থাকিত। এই কোতোয়াল ও চৌকিদারগণ গ্রামের মণ্ডল ও অন্য চৌকিদারগণের সহায়তায় দেশের শান্তিরক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে দূরবর্তী প্রদেশসমূহে ফৌজদারের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভারও ন্যস্ত ছিল।

'সদরস্-সদুর' বিচার-বিভাগের আর একটি উচ্চপদ। প্রত্যেক সুবায় ইঁহারা বাদসাহ কর্তৃক নিয়োজিত হইতেন। সদরস্-সদুর কাজিগণের উপর আধিপত্য করিতেন। কাজিগণের কার্যে দৃষ্টি রাখা, মুসলমানদিগের ধর্মসম্বন্ধীয় অপরাধসমূহের বিচার করা, পীরোত্তরসমূহের অধিকারিগণ অধর্মচারী হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া অন্য ধার্মিক ব্যক্তিকে দান করা, মূর্খ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকে কাজীর পদ পাইয়া যাহাতে তাহার অপব্যবহার না করিতে পারে তাহার

১. *Seir Mutakharin*, p. 567-563.

ব্যবস্থা করা, ইহাঁর কর্তব্যভুক্ত ছিল। মোটের উপর ইনি কাজিদিগের উপর সর্বময়কর্তা ছিলেন।

'মোহতসীব' বলিয়া আর এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নবাব সরকার হইতে নিযুক্ত হইতেন। ধরিতে গেলে, তাঁহার কার্যগুলি অনেকটা আজকালকার দিনের মিউনিসিপ্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাজের মত ছিল। ইনি বাজারের ব্যবসায়ীদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। যাহাতে তাহারা দ্রব্যাদির মূল্য অন্যায়রূপে বৃদ্ধি করিতে না পারে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সর্বপ্রকার বিবাদের মীমাংসা এবং মদ্যপায়ী ও দুষ্ট লম্পটগণ যাহাতে প্রকাশ্য স্থানে কোনরূপ অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, ইহার প্রতিকারেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

"সওয়ানে-নেগার," নামক আর এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। ইহাঁরা সরকারি সংবাদ-লেখক। সে সময়ে ইহাঁদের লিখিত সংবাদই, সংবাদপত্রের কাজ করিত। ইহাঁরা সরকারের বেতনভোগী কর্মচারী। সর্ব বিষয়ে সুবাদার ও দেওয়ানের অধীন। দেশের কোথায় কি হইতেছে, সমস্ত সংবাদই প্রতিনিধি-মুখে সংগৃহীত হইত। ইহাঁরা সেই সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নবাব ও বাদসাহের নিকট প্রেরণ করিতেন। ঔরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তখন এই সওয়ানে-নেগারের সহায়তায়, তিনি সুদূর বঙ্গদেশের ঘটনাসমূহ জানিতে পারিতেন। ইহাঁদের সংগৃহীত সংবাদসমূহ জরুর ডাকে সওয়ারের মারফৎ প্রেরিত হইত। কোথায় কোন জমিদার বিদ্রোহী হইল, কোথায় কোন ডাকাতের দল প্রজার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, এ সকল সংবাদ তাঁহারা নবাবকে লিখিয়া পাঠাইতেন। নবাব তাহা বাদসাহের নিকট পাঠাইতেন। 'ওয়াকে-নবীস,' বলিয়া আর এক শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা কেবল দরবারের ও স্থানীয় ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিতেন। প্রধান প্রধান সহরের ও নগরের সওয়ানে-নেগারগণের সহিত ইহাঁদের সংবাদ আদান-প্রদান চলিত।

'কানুনগো' পদ পুরাকালের নবাবী আমল হইতেই এই ইংরাজ রাজত্বের স্বর্ণময় যুগে আজও বর্তমান। তবে সেকালের কানুনগোর শক্তি-সামর্থ্য ও পদগৌরবের তুলনায় আধুনিক কানুনগো কিছুই নহেন। আকবর বাদসাহের আমলে রাজা টোডরমল যখন বঙ্গের রাজস্ব-ব্যবস্থা করেন, তখন কানুনগো পদের প্রথম সৃষ্টি হয়। টোডরমল সমগ্র বঙ্গে দশজন কানুনগো নিযুক্ত করেন। কানুনগোগণ জমির উৎপাদিকা শক্তি, পরিমাণ, রাজস্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বাঙ্গলার রাজস্ব-বন্দোবস্ত হয়। একজন প্রধান কানুনগোর উপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পিত হয়। ইনিই সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্ব-সংগ্রহ বিভাগের একমাত্র মালিক। সুবাদার ও নবাবগণ এই বিষয়ে কানুনগোর মুখাপেক্ষী ছিলেন। প্রধান কানুনগো দেশাধিকারী বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। সমগ্র বঙ্গের রাজস্বের জমাবন্দী তাঁহার দ্বারাই নির্ধারিত হইত। প্রধান কানুনগো সদর রাজস্বের উপর শতকরা আট আনা রুসুম পাইতেন। ঔরঙ্গজেবের কূটনীতি কৌশলে কানুনগোর এই অসীম ক্ষমতা অনেকটা হ্রাস হয়। কারণ তাঁহার আমলে দ্বিতীয় কানুনগো পদের সৃষ্টি হয়। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে দর্পনারায়ণ প্রধান কানুনগো ছিলেন। জয়নারায়ণ দ্বিতীয় কানুনগোর পদে নিযুক্ত হন। কানুনগোর শক্তি ও ক্ষমতা কিরূপ ছিল তাহার একটি উদাহরণ দিই। মুরশিদাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর বর্ষশেষে সরকারি হিসাবপত্র প্রস্তুত হইল। এই হিসাব সম্রাট সকাশে দাখিল করিতে হইবে। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গলার রাজস্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা এই সমস্ত কাগজপত্র দৃষ্টে জানিতে পারিলে বাদসাহ তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু প্রথামত কাগজপত্র দরবারে পেশ করিবার পূর্বে তাহাতে নবাবের নিজের সহি ও প্রধান কানুনগো ও তাঁহার সহকারীর সহি থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, এই রাজস্ব-কাগজপত্র সরকারে অগ্রাহ্য হইবে। তখন দর্পনারায়ণ প্রধান কানুনগো। ঠিক সময়ে দর্পনারায়ণ বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন।[১] তিনি জানিতেন তাঁহার সহি না হইলে এই কাগজ-

১. Murshid Cooly Khan having fixed his residence at Mukksoodabad assembled there all the public officers of his department, and at the end of the year having made

পত্র বাদসাহ-সরকারে গ্রাহ্য হইবে না, এজন্য তিনি তাঁহার ন্যায্য রুসুম বাদে, অতিরিক্ত তিনলক্ষ টাকা নবাবের নিকট দাবি করিয়া বসিলেন। তখন মুরশিদকুলির অবস্থা এমন ছিল না যে তিনি তাঁহার অধীনস্থ কানুনগোর এ আবদারটি রক্ষা করিতে পারেন। বাদসাহ-দরবার হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একলক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। কাজেই নবাব উপায়ান্তর না দেখিয়া, দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণের সহি লইয়াই দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। পাঠক এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন, সেকালের প্রধান কানুনগো কিরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কিন্তু মুরশিদকুলি খাঁ দর্পনারায়ণের কৃত এ অপমান ভুলিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে তিনি তহবিল তছরূপ প্রভৃতি দাবিতে দর্পনারায়ণকে কারারুদ্ধ করেন। কথিত আছে, কারাগারে আহারাভাবে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে, হিন্দুগণ রাজ্যের প্রধান পদসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। ভূপতি রায়, কিশোর রায়, দর্পনারায়ণ প্রভৃতি তাঁহার আমলে উচ্চ রাজপদে রাজস্ব-বিভাগে নিয়োজিত ছিলেন। নাটোরের আদিপুরুষ রঘুনন্দনই তাঁহার আমলে প্রথম খালসা-দেওয়ান ও রায়-রায়ান হন। এতদ্ভিন্ন দীঘাপতিয়া রাজবংশের সুপরিচিত দয়ারাম ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের রঘুরাম তাঁহার আমলে রাষ্ট্র-বিভাগের কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

মুরশিদকুলি খাঁর আমলে সাবেক নবাবী আমলের বিচার-প্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। অর্থী-প্রত্যর্থীদের বিবাদ মীমাংসার জন্য এবং রাজ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য, তিনি মুরশিদাবাদে চারিটি বিচার বিভাগ ও এতদাধীন বিচারালয়সমূহ স্থাপন করেন। নিজামত আদালত, মহকুমা দেওয়ানী-আদালত, মহকুমে কাজী (কাজীর আদালত) ও আদালত ফৌজদারি এই চারিটি বিচার কেন্দ্রেই সাধারণের দেওয়ানী ও ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচার হইত।

নবাবী আমলের যে সমস্ত কথা পাঠকের চিত্তরঞ্জক হইতে পারে, আমরা তাহা নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। এইবার আমরা পুনরায় প্রাচীন কলিকাতার কথা আরম্ভ করিব।

up his accounts in which was clearly exhibited the great increase he had made to the revenue of the provinces, prepared to set out for the Court in order personally to lay them before the Emperor. On presenting the papers however to the two Canoungoes whose counter-signature was requisite for their being audited in the imperial exchequer one of them named Dherp Narain refused his signature unless bribed by a present of three lacs of rupees—Stewart's *History of Bengal*, Ed. 1812.

ষোড়শ অধ্যায়

কোম্পানি বাহাদুরের বঙ্গে প্রথম জমিদারি

কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ—ইংরাজদের দেশীয় প্রজার প্রতি সদ্ব্যবহার—কোম্পানি বাহাদুরের প্রথম জমিদারি, সুতালুটি প্রভৃতি গ্রামত্রয়—জমিদারির উন্নতির সহিত কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি—কলেক্টর পদের প্রথম সৃষ্টি—প্রথম কলেক্টর রালফ শেলডন—কলেক্টরের কর্তব্য—মুরশিদকুলি খাঁর আমলে বড়বাজার, কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও জমিসমূহের পরিচয়—কলিকাতায় ধানজমি, তুলার চাষ, তামাকের চাষ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য—১৭০৬ সালের প্রথম জরিপ—প্রজাই-পাট্টার প্রথম সৃষ্টি—একখানি পলাশী আমলের পাট্টার বাঙ্গলা প্রতিলিপি—কোম্পানি বাহাদুরের জমিদারি সেরেস্তা—ব্ল্যাক কলেক্টর বা জমিদার—বাঙ্গালী কলেক্টর নন্দরাম—ব্ল্যাক জমিদার বা কলেক্টর গোবিন্দরাম মিত্র—পলাশী আমলের কলেক্টর হলওয়েল সাহেব—ইংরাজদের প্রথম আদালত মেয়র-কোর্ট—সকালে বিচার কার্য-নির্বাহ ব্যবস্থা—নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে প্রাচীন কলিকাতা—মিউনিসিপ্যাল ও স্বাস্থ্য-রক্ষার বন্দোবস্ত—যত্র তত্র জঙ্গল কাটাইয়া বাড়িঘর নির্মাণ—জরিমানার টাকা হইতে রাস্তা-ঘাট ও নালা-নর্দমার উন্নতি—প্রাচীন কলিকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ—১৭০৬ হইতে ১৭৫৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার বাড়ি ঘর রাস্তা-গলি ও পুষ্করিণী প্রভৃতির সংখ্যা।

মুরশিদকুলি খাঁর প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও, তাঁহার আমলেই কলিকাতার যথেষ্ট উন্নতি হয়। কলিকাতার এ উন্নতির প্রধান কারণ ফোর্ট উইলিয়াম। তখন লোকে ব্যবসা ও কৃষিকার্যকেই জীবনের উন্নতির প্রধান কারণস্বরূপ বিবেচনা করিত। চাকুরির জন্য লোকে কম লোলুপ হইত। দেশের লোকে যখন বুঝিল, ইংরাজেরা অতি শক্তিমান জাতি, তাঁহারা নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও পিছপাও নহেন, বিপদের সময় বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত, আর তাঁহাদের সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলে যথেষ্ট লাভ, তখন অনেকে কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে আশ্রয় লইল। কেবল বাঙ্গালী নহে, আর্মানী, দিনেমার, ডাচ, পর্টুগীজ প্রভৃতি অনেকেই ইংরাজদের কলিকাতায় আশ্রয় লইয়া বসবাস ও ব্যবসা করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে লাগিল। ইংরাজদের প্রধান গুণ তাঁহারা পাওনাদারদের কখনও ফাঁকি দিতেন না, তাহাদের সহিত সর্বতোভাবে সদ্ব্যবহার করিতেন। নবাব যদি কোন বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করিতেন ইংরাজেরা প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।[১]

এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায়েও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ইংরাজ কোম্পানি কলিকাতা, সুতালুটি, গোবিন্দপুর প্রভৃতি তিনখানি গ্রামের জমিদারি-স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া, তাহা প্রজা-বিলি করিলেন। এই প্রজা-বিলির হার প্রতি বিঘা তিন টাকা। পরে আমরা কোম্পানির জমিদারি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিব। তাহা হইতেই পাঠক নবাবী আমলে কলিকাতার অবস্থা অনেকটা জানিতে পারিবেন।

১. লেখকের এই সিদ্ধান্ত তথ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য Ram Gopal-এর *How the British Occupied Bengal*, Ch. I ও IV এবং Brijen Gupta, *Sirajuddaulah and the East India Company, 1756-57*, Ch. III দ্রষ্টব্য।

ওয়েলডন১ যে সময়ে কলিকাতায় আসেন সেই সময়ে কলিকাতার জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার কলিকাতায় পৌঁছিবার সময়ে এত জনতা হয় যে তাঁহাকে সে জনতা ঠেলিয়া অনেক কষ্টে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় কলিকাতা ধীরে ধীরে অধিবাসিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

কোম্পানি সাহজাদা আজিমওশ্বানের সনন্দের বলে যখন ১৬৯৮ খৃীস্টাব্দে কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের জমিদারি লাভ করেন, সেই সময়ে সাধারণের চক্ষে তাঁহাদের অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইল। ইংরাজেরা প্রকৃতপক্ষে এই তিনখানি গ্রামের জমিদার হইলেন। এই জমিদারির বলে তাঁহারা তাঁহাদের অধীনস্থ গ্রামত্রয়ের খাজনা আদায়, প্রজা-বিলি, কৃত-আদায়, জমির কর-নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যে সক্ষম হইলেন। এই গ্রামত্রয়ের জমিগুলি তাঁহারা জমিদারের ন্যায় পাট্টা-কবুলতি দ্বারা বিলি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কলিকাতায় একজন কলেক্টর নিযুক্ত হন। কলেক্টর তাঁহার অধীনস্থ স্থানসমূহে প্রজাদের জমি-বিলি করিতেন, তাহার খাজনা আদায় করিতেন, তৎপরে শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন কাটিয়া লইয়া বাকি টাকা বাদসাহী খাজনার জন্য কোম্পানি তহবিলে প্রেরণ করিতেন। রাজ-সরকারে কোম্পানিকে প্রতি বৎসরে বারশত টাকা খাজনা দিতে হইত। এই গ্রামত্রয়ের অভ্যন্তরীণ শাসন, জমি-বিলি ও উন্নতি সাধন, সর্ববিধ ভারই তাঁহাদের হস্তে ছিল।

এই সময়ে একজন অতিরিক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহার উপর কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হইল। র‍্যালফ শেলডন নামে একব্যক্তি এই পদে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই কলিকাতার প্রথম কলেক্টর বা জমিদার।২ কলেক্টর তাঁহার অধীনস্থ গ্রামত্রয়ের খাজনা আদায় করিয়া তাহা বাদসাহী খাজনাখানায় পাঠাইয়া দিতেন। ধরিতে গেলে কোম্পানি এই সময়ে কর-সংগ্রাহক ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না।

কোন্ মহলে কত টাকা খাজনা আদায় হইত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকা হইতে জানিতে পারা যাইবে।৩

ডিহি কলিকাতা	৪৬৮॥/১৫
সুতালুটি	৫০১৸৶/১০
গোবিন্দপুর (পাইকান পরগনার অংশে)	১২৩৸৶/৫
কলিকাতা	১০০।/১৫
মোট	১১৯৪৸৵/৫

কলিকাতার প্রথম কলেক্টর র‍্যালফ শেলডন ১৭০০ খৃীস্টাব্দে নিযুক্ত হন। তদবধি আজ পর্যন্ত এই দুইশত তের বৎসরকাল ধরিয়া ধারাবাহিক নিয়মে কলিকাতায় একজন কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। ১৭০৪ হইতে ১৭১০ অব্দ পর্যন্ত এই ছয় বৎসরে আটজন কলেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৭১০ খৃীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট ওয়েলডন কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সময়ে জন ক্যালভার্ট কলিকাতার কলেক্টর নিযুক্ত হন।৪

১. ওয়েলডন—প্রকৃত নাম ওয়েল্টডন (Anthony Weltden). He "assumed charge as President in the Bay and Governor and Commander-in-Chief of Fort William in Bengal for the United East India Company"—see S. Bhattacharya, ***The East India Company and the Economy of Bengal***, Calcutta 1969, Appendix II, p. 219.

২. Bruce's ***Annals***, Vol III, p. 172.

৩. Hamilton's ***East Indies*** 1727. As per Izzat Khan Dewan's Perwana dated 2 Shaban.—British Museum. Additional Mss. quoted by A. K. Ray.

৪. Ralph Sheldon—"First Collector of Calcutta, having been appointed to receive the revenues with the rank of Fifth of the Council when Bengal was constituted a separate Presidency in 1699.—H.E.A. Cotton, ***Calcutta Old and New***, 2nd Ed. p. 451.

ভাগীরথী-তীর হইতে ধাপা (Salt Lake) একদিকে ও অন্যদিকে গোবিন্দপুর হইতে সুতালুটি পর্যন্ত যে স্থানগুলি কোম্পানির দখলে ছিল তাঁহারা ইহার প্রজা-বিলি করিতেন। এই জমির পরিমাণ ৫০৭৭ বিঘা। আজ[১] যে জাতি সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর তাঁহাদের এই জঙ্গল ও বাদাপূর্ণ পাঁচহাজার বিঘা ভূমি লইয়া জমিদারি পত্তন করিতে হইয়াছিল।

কলেক্টরের প্রথম কাজ, তিনি এই সমগ্র জমি-পরিমাণের মধ্যে যাহা প্রজা-বিলি হইয়াছিল, তাহার খাজনা আদায় করিতেন। জমির খাজনাই কোম্পানির প্রধান আয় ছিল। স্থান বিশেষে ভূমির অবস্থানানুসারে তাঁহারা খাজনা নির্ধারিত করিয়া দিতেন। কিন্তু তিন টাকার উর্ধ্বে, তাঁহারা জমির জমা-বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না। জমির খাজনা ব্যতীত বাজারের আয়, টোল ও কুতঘাটার আয়, জরিমানা প্রভৃতি দ্বারাও তাঁহাদের জমিদারির আয় হইত। এই জমিদারির আয়-ব্যয়ের কয়েকটি তালিকা অতি পুরাতন রেকর্ড হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের গোচরার্থে যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

কলেক্টর সাহেব আদায়ী খাজনা ও অন্যান্য আয়ের হিসাব প্রতিমাসে কাউন্সিলে দাখিল করিতেন। আজ পর্যন্ত কোম্পানির পুরাতন বহিতে এ হিসাবগুলি সযত্নে রক্ষিত। এই হিসাবগুলি হইতে জানিতে পারা যায়, কিরূপে ধীরে ধীরে কোম্পানির জমিদারির আয় বৃদ্ধি হইতেছিল। ১৭০৪ খৃস্টাব্দে জমা ও খরচের জের কাটিয়া মুনাফার ভাগে ৪৮০ টাকা মাত্র ছিল। ১৭০৮ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ চারি বৎসর পরে ইহা হাজার টাকার উপর দাঁড়ায়। ১৭০৯ খৃস্টাব্দে ইহা তেরশত টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। হলওয়েলের আমলে এবং পরবর্তীকালে ইহা তিন সহস্র মুদ্রায় পরিণত হয়।[২]

কোম্পানির জমিদারির এই আয়-বৃদ্ধি হইতে প্রমাণ হয়, প্রতি বৎসরেই কলিকাতা ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। লোকবসতির পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত ইহার আয়ও বৃদ্ধি হইতেছিল। এই হিসাব হইতে জানিতে পারা যায়, ১৭০৩ হইতে ১৭০৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসরে কলিকাতার অধিবাসীসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। ইহার পরবর্তী ৪০ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার লোকসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সুতালুটি অঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বড়বাজারের দিকে লোকসংখ্যা কিছু বেশী ছিল। দেশীয় অধিবাসীরা এই সময়ে জাহ্নবীতীরবর্তী এই সুতালুটিতে জমি জমা করিয়া লয়েন। সুতালুটির প্রান্তবর্তী ঘাটসমূহে দেশীয় নৌকাগুলি তাহাদের মালপত্র নামাইত। আজকাল বড়বাজারে যে স্থানে নঙ্গরেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত, ইহার নিকটেই দেশীয় ব্যবসায়ীদের মালপত্র নামাইবার একটি ঘাট ছিল। মহাজনেরা এই ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সর্বপ্রথমে নঙ্গরেশ্বর শিবের পূজা করিতেন। ইংরাজদের প্রথম আমলে এই বড়বাজার 'গ্রেট্-বাজার' (Great-Bazar) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে ও রোটেসন গবর্ণমেণ্টের সময়ে বড়বাজারের দিকে দেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

দুইজন সমসাময়িক লেখক সেই প্রাচীন কলিকাতার জনসংখ্যা ও অধিবাসী সম্বন্ধে নানা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের প্রথম হ্যামিল্টন,[৩] দ্বিতীয় স্বনামখ্যাত হলওয়েল।[৪] এই হ্যামিল্টন একজন গন্ডে ব্যবসায়ী। কাজেই কোম্পানির কর্মচারীদের উপর তিনি বড় একটা

১. গ্রন্থরচনার কাল অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রী. অনুযায়ী এই বক্তব্য।
২. Holwel's *Tracts*, 1774, 3rd Ed. p. 241.
৩. হ্যামিল্টন—Walter Hamilton, author of *Description of Hindustan.*
৪. হলওয়েল—John Zephania Holwell, (১৭১১-১৭৯৮), কলিকাতায় অবস্থানকাল ১৭৩৬-১৭৫৭ এবং ১৭৬০-১৭৬১।

সন্তুষ্ট ছিলেন না। রোটেসন-গবর্ণমেণ্টের[১] আমলে কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি কলিকাতায় ছিলেন। পরবর্তীকালে হলওয়েল কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুর এই গ্রামত্রয়ের এবং পার্শ্ববর্তী ৩৮ খানি গ্রামের জমিদার ছিলেন। কোম্পানির আমলে তাঁহাদের অধিকৃত বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ও সহরের সুবন্দোবস্তের জন্য 'জমিদার' বলিয়া একজন কর্মচারী নিয়োজিত হইতেন। এই সাহেব-জমিদারের একজন আবার এদেশীয় সহকারী ছিল। তিনি 'ব্ল্যাক-জমিদার' বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। কুমারটুলির মিত্র-বংশের গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় কলিকাতার 'ব্ল্যাক-জমিদার' ছিলেন। এই গোবিন্দরামের লাঠির ভয়ে চোর-ডাকাতেরা থরহরি কাঁপিত। 'গোবিন্দ-রামের ছড়ি বা লাঠি', প্রাচীন কলিকাতার একটি নামজাদা জিনিস। পরে আমরা এই গোবিন্দরাম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিব।

হলওয়েল পলাশীযুদ্ধের পূর্ব সময় পর্যন্ত, কলিকাতার লোকসংখ্যা ও আয়-ব্যয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন। হ্যামিল্টনও সমসাময়িক। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এই সময়ে কলিকাতার জনসংখ্যা "দশ হইতে বার হাজার পর্যন্ত ছিল।" তিনি কোন্ বৎসরের কথা বলিতেছেন, তাহার নির্দেশ না থাকিলেও সম্ভবতঃ ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় যে জরিপ হয়, তিনি তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয় ঐ কথা বলিয়াছেন। হলওয়েল সাহেব কলিকাতার একজন খুব নামজাদা কলেক্টর। তিনি কলিকাতার বাহ্যিক উন্নতি সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন ও কলিকাতার ভিতরের অবস্থারও অনেক খবর রাখিতেন। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় একটি সার্ভে বা জরিপ করান। ইহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার জনসংখ্যা চারিলক্ষ নয় হাজার ছিল। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, হ্যামিল্টনের সময় হইতে ৪৬ কি ৪৭ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার জনসংখ্যা এইরূপ অসম্ভবভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৭০৬ খ্রীস্টাব্দের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি খাস কলিকাতা গ্রামে তখন ২৪৮ বিঘা জমির উপর লোকের বসবাস ছিল। আরও ৩৬৪ বিঘার জঙ্গলাদি কাটাইয়া তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী করিবার চেষ্টা করা হইতেছিল। কলিকাতার উত্তরে বড়বাজারের মোট জমির পরি-মাণ এই সময়ে ৪৮৮ বিঘা ছিল। কিন্তু সরকারি কাগজপত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে ৪০০ বিঘা জমি ইতিপূর্বেই লোকের বাস্তুভিটা ও বাগানে পরিণত হইয়াছে।

হলওয়েলের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, "জন্‌নগর ছাড়া (এই জন্‌নগর মারহাট্টা খাতের বাহিরে ছিল) কোম্পানির দখলে এই সময়ে ৫২৪৩ বিঘা জমি ছিল। প্রতি বিঘায় ২০ জন করিয়া গড়-পড়তায় অধিবাসী ধরিয়া লইলেই ইহা হইতেই একলক্ষের উপর লোক দাঁড়ায়। যাহাই হউক না কেন, রোটেসন গবর্ণমেণ্টের সময় হইতে হলওয়েলের সময় পর্যন্ত কলিকাতার লোক-সংখ্যা যে যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তখনকার শাসনকার্যের ও রাজস্ব-বন্দোবস্তের সুবিধার জন্য কোম্পানি কলিকাতাকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বড়বাজার এই চারি ভাগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলেও বড়বাজারের লোকসংখ্যা বেশী ছিল। খাস সহর কলিকাতার জমির পরিমাণ ১৭১৭ বিঘা দশ কাঠা। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে খাস কলিকাতার মধ্যে ২৪৮ বিঘা ভূমিতে লোকের বসবাস ছিল। বাকি জমিতে আবাদ হইত অথবা তাহা জঙ্গলপূর্ণ ও পতিত অবস্থায় ছিল। কলিকাতার

১. আঠার শতকের গোড়ার দিকে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজ বণিকসঙ্ঘের মধ্যে মতবিরোধ তীব্র হইবার ফলে সামগ্রিকভাবে ইংরাজদের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। এই কারণে যখন দুইটি সঙ্ঘের একত্রীকরণের নীতি গৃহীত হয় তখন উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে ৪ জন সদস্য লইয়া গঠিত কলিকাতার কাউন্সিলের প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সভাপতির দায়িত্ব নির্বাহ করিবেন। এই ব্যবস্থাই Rotation Government নামে পরিচিত।

উত্তরাংশে সুতালুটির ভূমির পরিমাণ ১৬৯২ বিঘা। ইহার মধ্যে ১৩৪ বিঘায় লোকের বসবাস ছিল। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে সাড়ে আট শত বিঘা ভূমিতেই লোকের বাসস্থানাদি নির্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ১৫২৫ বিঘা জমিতে ধান চাষ হইত ও ৪৮৬ বিঘা জমিতে বাগান-বাগিচা ছিল। ২৫০ বিঘা জমি কলাগাছের বাগানে পূর্ণ ছিল। ১৮৭ বিঘাতে তামাক উৎপন্ন হইত। ৩০৭ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তররূপে ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৬৭ বিঘা খামার বা পতিত জমি ছিল। বাকি জমি রাস্তা-ঘাট নালা-নর্দমা ও পুষ্করিণীতে পরিপূর্ণ ছিল। কোন্ বিভাগের অধীনে কত জমি ছিল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	বিঘা	কাঠা
বাজার	৪৮৮	১০
গোবিন্দপুর (Govenpore)	১১৭৮	৭
টাউন কলিকাতা	১৭১৭	১০
সুতালুটি (Sootaloota)	১৬৯২	১২
মোট	৫০৭৬	১৯

পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এই তিনখানি গ্রামের জমির পরিমাণ ও তাহার বিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার একটি বিবরণ ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দের জরিপ অনুসারে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই লিখিত তালিকাগুলি আজও ব্রিটিশ-মিউজিয়ামে সুরক্ষিত ও কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তার মধ্যে বর্তমান। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, দুইশত বৎসর আগে এই বর্তমান প্রাসাদসৌধময়ী কলিকাতার অবস্থা কিরূপ ছিল।[১]

ফোর্ট-উইলিয়াম—জুন ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দ

Account of Ground in Buzzar and Three Towns as it was measured.

গোবিন্দপুর (Govenpore)

জায়	কোম্পানির সেরেস্তার বানান-গুলির অবিকল প্রতিলিপি	জমির পরিমাণ	
		বিঘা	কাঠা
বাড়ি ঘর	Houses	৫৭	৯
ধান্য ক্ষেত্র	Paddie	৫১০	১১
সবজী ক্ষেত্র	Green Trade	৩৫	১৪
পানের বোরজ	Betel	০	২
তামাকের চাষ	Tobacco	১৩৯	১৬
বাগান	Gardens	৫৯	২
কলা বাগান	Plantains	১২	৩
বাঁশ বাগান	Bamboo	৪	১০
তৃণপূর্ণ স্থান	Grass	১৮	০
কূপাদি	Wells	১০	৩
পুষ্করিণী	Tancks	০	৯
নালা-নর্দমা	Ditches	১	৬
খামার	Commer	১৭	০
ব্রহ্মোত্তর	Bommons (Brahmins)	৫৭	১৬
জঙ্গল	Jungle	৮৩	১৪
পতিত জমি	Waste Ground	১৬৯	১২

১. সহর কলিকাতায় ধানের মাঠ ছিল, ধান চাষ হইত, কলার বাগান ছিল, তামাকের চাষ হইত, ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর ছিল—এ সব কথা হয়ত পাঠক সহজেই বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু আমরা নাচার।

জায়	কোম্পানির সেরেস্তার বানান-গুলির অবিকল প্রতিলিপি	জমির পরিমাণ	
		বিঘা	কাঠা

টাউন কলিকাতা (Town Calcutta)

জায়	কোম্পানির সেরেস্তার বানান-গুলির অবিকল প্রতিলিপি	বিঘা	কাঠা
বাড়ি ঘর	Houses	২৪৮	৬
ধান জমি	Paddie	৪৮৪	১৭
কলা বাগান	Plantains	১৬৯	১৮
সবজী বাগান	Green Trade	৭৭	১৮
তামাকের চাষ	Tobacco	৩৮	৭
তুলার চাষ	Cotton	১৯	১৫
বাগান-জমি	Gardens	৭০	১
তৃণাচ্ছাদিত মাঠ	Grass	১৫	৯
বাঁশ-ঝাড়	Bamboos	১	১৬
ফুল বাগান	Flowers	৬	২
খানা-ডোবা	Ditches	০	৯
আউস	Assah (Auc)	১১	৯
খামার জমি	Commer	৭২	১০
ব্রহ্মোত্তর	Bommons (Brahmins)	১০৯	১৫
জঙ্গল	Jungull	৩৬৩	১৫
পতিত জমি	Waste Ground	২৭	৩

সুতালুটি (Soota Loota)

জায়	কোম্পানির সেরেস্তার বানান-গুলির অবিকল প্রতিলিপি	বিঘা	কাঠা
বাড়ি ঘর	House	১০৪	৪
আউস	Assah (A'uc)	২	৬
ধান জমি	Paddie	৫১৫	৬
সাক-সবজী	Green Trade	৩২	১৯
কলা বাগান	Plantains	৬০	৭
বাগান	Gardens	১৪৭	৭
তামাকু চাষের জমি	Tobacco	৮	৬
ইক্ষু জমি	Sugercanes	০	১১
বাঁশ-ঝাড়	Bamboos	১	১
তৃণাচ্ছাদিত মাঠ	Grass	১১	১৬
নালা	Null (Nala)	০	১৮
তুলার চাষ	Cotton	১৪	৭
ফুল	Flowers	৪	১৭
মাদুরের কাঠির চাষ	Reeds for mats	০	৪
খানা	Ditches	১০	১৯
খামার	Commar	৭৬	১৪
পথ ঘাট	Tracks and ways	৭২	৬
জঙ্গল	Jungull	৪৮৭	১
[illegible]	Brahmans	১১১	[illegible]

জাত	কোম্পানির সেরেস্তার বানান-গুলির অবিকল প্রতিলিপি	জমির পরিমাণ বিঘা	কাঠা
	বড়বাজার (Buzzar)		
বাড়ি ঘর	Houses	৪০৯	১১
কূপ ইত্যাদি	Wells	১৫	৩
কলা বাগান	Plantains	৭	৪
শূন্য জমি বা শূন্য পড়া	Sunaporra	৯	৩
খাত	Ditches	৩	১২
বাগান	Gardens	১৯	৩
ফুল বাগান	Flowers	০	৬
কার্পাস ক্ষেত	Cotton	০	৩
সবজী বাগান	Green Trade	০	১০
তামাকের চাষ	Tobacco	০	১১
সরসে জমি	Sursha (Sarshya)	০	১৭
ব্রহ্মোত্তর	Bormottor	২৬	৮
কূপাদি	Wells	০	১৩
শূন্য ভূমি	Waste	১	০
খাত	Ditches	১	৭
বাগান জমি	Gardens	০	১৭

১৭০৬ সালে কলিকাতার এক জরিপ হয়। সেই সময়ে যে সমস্ত কাগজপত্র তৈয়ারি হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমরা কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও বড়বাজারের জমির তালিকা দিলাম। এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয়, বড়বাজারের ৪৮৮ বিঘা জমির মধ্যে ৪০০ বিঘা জমিতে ঘরবাড়ি নির্মিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এই তিনখানি গ্রামের কোথাও বা ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা ইক্ষুর চাষ, কোথাও বা তামাকের চাষ, কোথাও বা তুলার চাষ, কোথাও বা সবজী-বাগান, কোথাও বা ফুলের বাগান প্রভৃতি ছিল। বাকি সমস্ত জমি পতিত, খামার অথবা জঙ্গলাবৃত ছিল। এই ১৯১৩ খৃীস্টাব্দের বৈদ্যুতিক আলোকময়ী, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা পরিপূর্ণ, বৈজয়ন্তীতুল্য কলিকাতায় বসিয়া ১৭০৬ খৃীস্টাব্দে ইহার অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, কি ছিল আর কি হইয়াছে!

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই গ্রামগুলির মালিকানি-স্বত্ব প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র জমিদার ছিলেন।[১] প্রজাবিলি দ্বারা খাজনা আদায় করা নগরের উন্নতি সাধন করা, সুশাসন বন্দোবস্ত করা, বাণিজ্যদ্রব্যাদির শুল্ক আদায় করাও তাঁহাদের কর্তব্যভুক্ত ছিল। তাঁহারা পতিত জমিসমূহ পাট্টা, কবুলতি দ্বারা বিলি করিতেন। কিন্তু বিঘা প্রতি তিন টাকার উর্ধ্বে খাজনা বাড়াইবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। বন-জঙ্গলাদি কাটাইয়া জমিকে বাসযোগ্য করিয়া তাঁহারা প্রজাবিলি করিতেন। নাতান[২] প্রজা খাজনা দিতে না পারিলে ঢোল-সহরতে তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া খাজনার টাকা আদায় করিতেন। এজন্য তাঁহাদিগকে পাইক বরকন্দাজ প্রভৃতি

১. The English appear to have understood that they acquried by this purchase the proprietory or zamindary rights to the villages. But in this they were mistaken. The transfer sanctioned by the *Sanad* and effected under the deed, was deemed and intended to be a transfer of the rights of the tenant's rents, i.e. of the rights of dependent talukdars, the jagir itself being, as all jagirs of the *Khalsa* were, non-saleable, and, in order to emphasize this intention, it was immediately declared to be in the absolute gift of the Prince, the Emperor's heir and representative and a few years later, in that of Nawab Mir Jafar Khan. The Company was, therefore, ordered to pay, not as *revenue* to the Imperial Exchequer but as *rent* of the jagir.—A.K. Ray, *Census of India 1901*, Vol VII, *Calcutta Town and Suberb*, 1902 part I, p. 22.

২. নাতান (ফার্সী)—নাতোয়ান—অসমর্থ, দরিদ্র।

রাখিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের এই ক্ষুদ্র জমিদারির দস্তুর মত একটি সেরেস্তা ছিল। এই সেরেস্তার প্রধান কর্তা কলেক্টর। কলেক্টর সাহেবের অধীনে কতকগুলি কেরানী ও গোমস্তা (Rent-gatherer) ছিল। জমিদারির রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত ইহাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই সমস্ত কলেক্টরির কর্মচারীদের বেতন অতি কম ছিল। ভবিষ্যতে আমরা কলেক্টরির জমা খরচ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কত কম বেতনে তখন এই সব কর্মচারীরা কর্মে নিযুক্ত হইত। কম বেতন পাইত বলিয়া, ইহারা অসদুপায়ে বেনামিতে জমি জমা লইত। ১৭০৬ সালের জরিপের পর এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় কোম্পানি বাহাদুর তাহাদের বেতন চারি টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন।

কলেক্টর সাহেব কেবল পাট্টা-কবুলতির দ্বারা জমি-বিলি করিতেন। এই পাট্টা-কবুলতিতে জমির পরিমাণ, খাজনার হার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিত। ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই এই পাট্টা লিখিত হইত। আমরা নিম্নে বহুকালের পুরাতন একখানি পাট্টার প্রতিলিপি দিতেছি। সিরাজের আক্রমণের পর কলিকাতা ইংরাজের পুনরাধিকৃত হইলে জমিদার বা কলেক্টরের কাছারিও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সময়ে নিম্নোদ্ধৃত পাট্টাখানি কোন প্রজাকে দেওয়া হয়। পাট্টার প্রতিলিপি এই—

আসামী	জমি	জমা	নম্বর
ইং ১৭৫৮ সাল তারিখ—২রা জানুয়ারি সন ১১৬৫ সাল ২১এ পৌষ বাজার কলিকাতা লক্ষীকান্ত সেটজী মহল পাঁচু বশাক	।১॥•	৸৵/১২	১

প্রত্যেক পাট্টার একখানি ইংরাজী প্রতিলিপি থাকিত। কারণ ইংরাজ কলেক্টর বাঙ্গলা জানিতেন না। উল্লিখিত পাট্টার প্রতিলিপি (ইংরাজী) এই—

A pottah being granted unto Lokicanto Seat for 6 cottahs and 8 chettaks of ground in Bazar Calcutta, Rent 15 annas 7 pies sicca per annum.

Calcutta Cutcherry. Sd. M. Collet.
This 2nd day of January 1785 No. I. Zaminder.

উল্লিখিত পাট্টাখানি হইতে প্রমাণ হয়, তখন কোম্পানি বাহাদুরের একটি বাঙ্গলা সেরেস্তাও ছিল। উহা হইতে বুঝা যায় পুরাকালে এই প্রথা অনুসারেই জমি বিলি করা হইত। ভবিষ্যতে ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপ পাট্টাই চলিয়া আসিয়াছিল। মিঃ লিণ্ডের প্রস্তাবে ১৮১৯ সালে পুরাতন পাট্টার বয়ান পরিবর্তিত হয়। সে পরিবর্তনটুকু মোটের উপর বড় বেশী নয়।

কলিকাতায় যাঁহারা কোম্পানির আমল হইতে বংশানুক্রমে বাস করিতেছেন উল্লিখিত প্রাচীন কথাগুলি তাঁহাদের বিশেষ চিত্তরঞ্জক হইবে।[১]

প্রত্যেক কলেক্টরের অধীনে একজন করিয়া এদেশীয় সহকারী থাকিতেন। ইনি 'ব্ল্যাক-ডেপুটি' বা 'ব্ল্যাক-কলেক্টর' বলিয়া অভিহিত হইতেন। ১৭০৫ সালে নন্দরাম[২] বলিয়া একজন

১. গ্রন্থরচনার কাল অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রী. অনুযায়ী এই বক্তব্য।

২. এর বংশধর জয়ন্তী চন্দ্র সেন বিরচিত জীবনোপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে নন্দরামের বিস্তৃত বিবরণ। গ্রন্থকারের মতে নন্দরাম সেন জন্মগ্রহণ করেন শোভাবাজারের সেন বংশে। গ্রন্থটির প্রয়োজনীয় অংশ নারায়ণ দত্তের 'জন কোম্পানির বাঙ্গালী কর্মচারী' বইতে প্রকাশিত হইয়াছে, পৃ. ২০২-২৪১।

বাঙ্গালী সহকারী কলেক্টর রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু নন্দরাম উপরি উপায়ের চেষ্টা এবং তহবিল তছরূপাদি করায় কর্ম হইতে অপসারিত হন। কলিকাতার প্রথম কলেক্টর রালফ শেলডেন। নন্দরাম শেলডেনের সহকারী ছিলেন।

নন্দরাম কর্ম হইতে অপসারিত হইলে জগৎদাস তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। এই নন্দরাম ও জগৎদাসের বংশ এখনও বর্তমান কিনা তাহা আমরা জানি না। জগৎদাসও নন্দরামের ন্যায় উপরি-পাওনার চেষ্টা করিলেন। তহবিল তছরূপ করায় কোম্পানি বাহাদুর তাঁহাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন এবং নন্দরাম পুনরায় কলিকাতায় 'ব্ল্যাক-কলেক্টর' নিযুক্ত হন।

এবারেও নন্দরাম লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এখনও মফঃস্বলের জমিদারদের অনেক নায়েব-গোমস্তা, দশ পনর টাকার চাকরি করিয়া বাড়ি বালাখানা করেন। সুতরাং নন্দরাম যে না করিবেন, তাহার কারণ কি? তিনি নানা উপায়ে নিজের উদর পূরণ করিয়া প্রভু-পক্ষের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। আবার শেষ নিকাশে অনেক টাকা বাকি পড়িল। কলিকাতা কাউন্সিলের বড় কর্তা তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। বেগতিক দেখিয়া নন্দরাম হুগলীতে পলায়ন করিয়া গা ঢাকা দিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা হুগলীর ফৌজদারকে লিখিয়া পড়িয়া, কলিকাতা হইতে সিপাহী পাঠাইয়া নন্দরামকে ধরিয়া আনিলেন ও কারানিক্ষিপ্ত করিলেন।

ইহার পর আর কোন বাঙ্গালী 'ব্ল্যাক-কলেক্টরের' নামোল্লেখ দেখা যায় না। তারপর ইতিহাস প্রসিদ্ধ হলওয়েলের আমলে গোবিন্দরাম মিত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

সেকালের কলিকাতায় তিনটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত ছিল, তাহা এই—

গোবিন্দরামের ছড়ি।/বনমালী সরকারের বাড়ি।/উমিচাঁদের দাড়ি।১

গোবিন্দরামের 'ছড়ি' বা লাঠির-জোর খুব ছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উমিচাঁদ তাঁহার লম্বা দাড়ির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কুমারটুলির বনমালী সরকারের বাড়ির মত অতবড় প্রাসাদতুল্য বাড়ি সেকালের কলিকাতায় আর কাহারও ছিল না। এখনও সরকার মহাশয়ের এ বাড়ি বর্তমান।

প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত লেখক উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, "সেকালের ব্ল্যাক-ডেপুটিরা যেরূপ অসদুপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের বেতন বড়ই অল্প ছিল। জমি-বিলি ও তৎসম্বন্ধীয় কাজ কর্ম করিবার সময়, খাজনা ও সেলামী এবং বেনামী জমি-বিলি দ্বারা অনেক টাকা তাহাদের হাত দিয়া চলাফেরা করিত। কাজেই অল্প বেতনভোগী কর্মচারীর পক্ষে এরূপ সুবিধাকর স্থলে লোভ সম্বরণ করা বা বেনামী বাণিজ্য প্রভৃতিতে লিপ্ত না হওয়া নানাকারণে অসম্ভব।"

সমস্ত ব্ল্যাক-জমিদারদের মধ্যে পরবর্তী কালে গোবিন্দরাম মিত্রের২ ক্ষমতাই সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। তিনি যথেষ্ট ধনরত্নাদি সঞ্চয় করেন। এখনও চিৎপুর রোডে কুমারটুলি পল্লীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন বর্তমান। এই নবরত্নের চূড়া না কি অক্টারলোনি মনুমেণ্ট অপেক্ষা উচ্চ ছিল। কলিকাতার ভূতপূর্ব কলেক্টর স্টারেণ্ডেল সাহেব বলেন, তাহার উচ্চতা ১৬৫ ফিটের উপর। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের মহা ঝড়ে এই চূড়াটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৭২০ হইতে ১৭৫৬ বা পলাশীযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গোবিন্দরাম ব্ল্যাক-জমিদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

গোবিন্দরাম মিত্র প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে একজন অতি দুর্দান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নামে বাঘে-গরুতে একত্রে জল খাইত। হলওয়েল সাহেব কলিকাতার প্রধান কলেক্টর বা জমিদার ছিলেন। গোবিন্দরাম বহুদিন হইতেই 'ডেপুটি বা ব্ল্যাক-জমিদার' ছিলেন। সমস্ত কাগজপত্র তাঁহার

১. এই ছড়াটির পাঠান্তর রয়েছে। দ্রষ্টব্য, হরিহর শেঠের প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৪২।

২. গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতার ডেপুটি গবর্ণর (কালা জমিদার) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৭২০-১৭৫০, এবং ১৭৫০-১৭৫৬ খ্রী.।

হাতে। এরূপস্থলে হলওয়েল কলেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট কোম্পানির জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্র ও প্রয়োজনীয় হিসাবাদি চাহিয়া পাঠান। কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্র না কি দর্পের সহিত বলিয়া পাঠান, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আমাদের উভয়েরই মনিব। প্রেসিডেন্টের অনুমতি ভিন্ন আমি আপনাকে কাগজপত্র দেখাইতে পারি না।"১

যাহা হউক, হলওয়েল ও গোবিন্দরাম উভয়ে মিলিয়া কয়েক বৎসর একত্রে কাজকর্ম করিয়াছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ১৭৫২ খৃীস্টাব্দে হলওয়েলের সহিত গোবিন্দরাম মিত্রের বিবাদ উপস্থিত হয়। হলওয়েল সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে কাউন্সিলের নিকট তহবিল তছরুপের নালিশ উপস্থিত করেন। ইহার উত্তরে গোবিন্দরাম মিত্র বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা আমার মত ডেপুটিগিরি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই আমার মত স্বত্বাদি উপভোগ করিয়াছেন। আমার মত পদস্থ কর্মচারীর পদগৌরব ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যেরূপ চাকর-বাকর জাঁক-জমক ও এলবাব পোশাকের প্রয়োজন, আমার সামান্য বেতন হইতে তাহা কখনই নির্বাহ হওয়া সম্ভবপর নহে।"২

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ইংরাজের প্রথম আমলের ইতিবৃত্ত লেখক উইলসন সাহেবও বলিয়াছেন, "কোম্পানির কর্মচারীরা যে এইরূপ অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করিত তজ্জন্য কোম্পানিই দায়ী। তাঁহাদের অধীনস্থ কর্মচারিগণের মধ্যে ছোট বড় সকলেই, অন্যায় উপায় দ্বারা বেনামী ব্যবসা প্রভৃতি চালাইয়া, ছাড় ও দস্তকাদির অপব্যবহারে অর্থোপার্জন করিতেন।৩

কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের ও পার্শ্ববর্তী ৩৮ খানি গ্রামের খাজনা আদায় বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতির কার্যভার, এই কলেক্টর জমিদারের হাতে ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ফৌজদারি বিভাগেরও প্রধান কর্মচারী ও ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিতেন। তাঁহার অধীনে একটি ক্ষুদ্র পুলিসও ছিল। ১৭০৪ খৃীস্টাব্দে এই পুলিসের সংখ্যা একজন প্রধান কর্মচারী বা পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পঁয়তাল্লিশজন কনস্টেবল, দুইজন নকীব ও কুড়িজন চৌকিদার ছিল। কিন্তু সেকালের গোয়ালারা বিশেষ শক্তিমান জাতি ছিল ও উত্তমরূপে লাঠিবাজি করিতে জানিত, এই জন্য তাহাদের চৌকিদার করা হইত।৪

১৭০৬ সালে কোম্পানির অধিকারের মধ্যে চুরি-ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, আরও ৩১ জন পাইক লইবার আদেশ হয়। ইহাই সেকালের প্রথম পুলিস-বন্দোবস্ত। রোটেসন বা পূর্বোল্লিখিত 'পর্যায়ক্রমিক' ব্যবস্থার আমলে, কলেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেটের বড়বাজারে বা দেশীয় প্রধান অংশে এক কাছারি ছিল। কিন্তু হলওয়েলের আমলে তাহা কলিকাতায় উঠিয়া আসে।৫

১. That by reason of many changes in the headship of office a power in perpetuity devolved on the standing Deputy, who is always styled the Black Zaminder and such was the tyranny of this man and such the dread conceived of him that no one durst complain or give information.—Cotton's *Calcutta Old and New.*

২. When in 1752 Holwell accused Govindaram Mittra of dishonesty, the celebrated 'black collector' defended himself by pointing out that every deputy of this description was allowed similar privileges and that he could not from his wages keep up the equipage and attendance necessary for an officer of his station—Holwell's *Tracts*, p. 199-97.

৩. It was the vicious policy of the company to underpay its servants and it was notorious that these servants, both high and low, derived the greater part of their income from their perquisites and from private trade.—Wilson Vol I, p. 196.

৪. It is ordered that one chief peon and forty five peons, two chubdars (chob-dars) and twenty guallis (gowalas) be taken into pay.—*Consultation No. 52,* 1704.

৫. Several robberies having been committed in the town by country robbers who killed and wounded several on the Company's native servants and others, it is thought necessary to keep greater guard on the towns for the Company's tenant's safety, wherefore the Jemidar (Zeminder) is ordered to entertain 31 pikes or black-peons for the time to prevent like mischiefs in the future.—*Consultation No. 188,* Dec. 27.

কলেক্টর খাজনাপত্রসম্বন্ধীয় মামলার নিষ্পত্তি করিতেন এবং ফৌজদারি বিভাগেও তাঁহাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিতে হইত। ম্যাজিস্ট্রেট রূপে তিনি কেবল দেশীয়দের বিচার করিতেন। কিন্তু ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে কাউন্সিলের সদস্যগণ তাঁহাদের স্বদলের মধ্যে তিনজনকে নির্বাচিত করিয়া একটি নূতন বিচারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

তখন এইরূপ স্থির হয়, কাউন্সিলের এই তিনজন সদস্য প্রতি শনিবার প্রাতঃকালে নয় ঘটিকা হইতে দ্বাদশ ঘটিকা পর্যন্ত, বিচারকার্য নির্বাহ করিবেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা নিয়মিতরূপে চলে নাই। তবে ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাদের একটি বিচার-মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায় যে বিচারকেরা কতকগুলি চোর ও হত্যাকারীদের গণ্ডদেশে উত্তপ্ত লৌহের ছাঁকা দিয়া গঙ্গা-পার করিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে অর্থাৎ নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে সেই প্রাচীন কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল ও স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত কিরূপ ছিল, এখন তাহাই একটু আলোচনা করা যাক্।

জোব চার্নক কলিকাতা প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে এক আদেশ প্রচার করেন, "কোম্পানির দখলী যে সমস্ত পতিত-জমি আছে বা জঙ্গল আছে, তাহা কাটাইয়া ও পরিষ্কার করিয়া যে কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুসারে যে কোন স্থানে ঘর-বাড়ি করিতে পারিবে।" ইহার ফলে অনেকে কলিকাতায় ঘর-বাড়ি নির্মাণ আরম্ভ করিল। পরবর্তী কালে অধিক পরিমাণে বাসিন্দাসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত নগরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোনরূপ একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়ে।

১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে কাউন্সিলের একটি আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার মর্ম এই, "দেশীয় অধিবাসীদের অপরাধের দন্ড স্বরূপ যে সমস্ত জরিমানা আদায় হইবে, সেই আয় হইতে সহরের মধ্যের ও আশেপাশের নর্দমা, খানা ও ডোবাসমূহ ভরাট করা যাইবে।" ইহাই কলিকাতার প্রথম মিউনিসিপ্যাল বন্দোবস্ত। কলিকাতায় পুলিস সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত প্রথমে প্রচারিত হয়, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।

যাহারা সে সময়ে কলিকাতায় নূতন বসবাস করিতে আসিয়াছিল তাহারা যেখানে সেখানে জমি লইয়া ইচ্ছামত বাড়ি-ঘর নির্মাণ করিত। ১৭০৭ সালের মার্চ মাসে কাউন্সিলের একটি আদেশ হইতে জানিতে পারা যায়, "এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে আর ঘর-বাড়ি নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে অনেকে ফোর্ট উইলিয়ামের কর্তৃপক্ষীয়দের মতামত না লইয়া, বাড়ির চারিদিকে পাঁচিল তুলিয়াছে কিম্বা বাস্তুর মধ্যে পুষ্করিণী কাটাইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর এরূপ গৃহাদি নির্মিত না হয়, তজ্জন্য দুর্গদ্বারে সাধারণের অবগতির জন্য একটি নোটিশ দেওয়া হইল।" বলা বাহুল্য এই নোটিশে বিশেষ কিছু ফল হইল না।

১৭০৫ হইতে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলিকাতায় ম্যালেরিয়া প্রকোপ সমধিক বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার বারশত ইংরাজ অধিবাসীর ৪৬০ জন লোক জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতার এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়া কাউন্সিলের কর্তারা ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে একটি হাসপাতাল নির্মাণের সংকল্প করেন।

১৭১০ খ্রীস্টাব্দে বক্সীর উপর এক আদেশ প্রচারিত হয়, "ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে ও আশেপাশে অনেক গাছপালা ও চালাঘর আছে। পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্তও ভাল নাই। এই সমস্ত গাছপালা কাটিয়া ও দুর্গন্ধময় নালা-নর্দমা বুজাইয়া দিয়া দুর্গের চারিদিকের জল-নিকাশের জন্য নয়ানজুলী কাটিয়া দিতে হইবে। যাহাতে দুর্গের চারিপাশের জল নিকাশ হইয়া বড় বড় পয়নালায় গিয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে একটি করপোরেশন বা সমিতি গঠিত হয়। এই করপোরেশনের কর্তার পদবী মেয়র (Mayor) ছিল। মেয়রের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য নয়জন সহকারী বা অলডার-

ম্যান নিযুক্ত হন।[১] হলওয়েল সাহেব কলিকাতায় জমিদার রূপে সমিতির প্রথম সভাপতি হন।[২]

জমিদার সাহেব কেবল যে জমির খাজনা ইত্যাদি আদায়ে ব্যাপৃত থাকিতেন তাহা নয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কার্যও তাঁহাকে দেখিতে হইত ও তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইত।[৩]

কিন্তু সহরের রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ ছিল তাহা অতি অল্প। তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হইত না। ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই তথাকথিত ক্ষুদ্র মিউনিসিপ্যালিটির কাজ অতি ধীরে ধীরে চলিয়া আসিয়াছিল। উক্ত বৎসর সর্বপ্রথম 'জস্টিস্ অফ্ দি পীস্' পদের সৃষ্টি হয়। ইহার পর ১৮১৭ সালে লটারি-কমিটি (Lottery Committee) স্থাপিত হয়। পরে আমরা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সম্বন্ধে অনেক পুরাতন জ্ঞাতব্য কথা বলিব।

১৭৪৯ সালে দেখিতে পাই, নালা ও খাত-সমূহ কাটাইবার জন্য সামান্য কয়েকটি টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের কার্য-বিবরণী হইতে জানা যায়, "গঙ্গার স্রোতে সুতালুটির বাজারের মালঘাট বা Wharf-টি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এজন্য স্থানীয় জমিদার মিঃ এডওয়ার্ড আইলের উপর আদেশ হইল, যাহাদের মালপত্র এই ঘাটে উঠে, তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু লইয়া এই মালঘাট নূতনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে। মালঘাট-গুদামে যাহার যতটা জমিতে মাল আছে সেই অনুপাতে তাহার উপর অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিতে হইবে।" ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের এক হুকুম হইতে জানিতে পারা যায়, "কোম্পানির ব্যবহার্য ইটের-পাঁজা পোড়াইবার জন্য, কলিকাতার নিকটবর্তী একটি জঙ্গল কাটাইয়া কাষ্ঠ-সঞ্চয় করিতে হইবে।" ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের তিন বৎসর পূর্বে, দেখিতে পাওয়া যায়, কোম্পানির কলিকাতা কাউন্সিল বিলাতে পত্র লিখিতেছেন, "চারিদিকের নালা-নর্দমা কাটাইয়া নগরকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপূর্ণ করিবার জন্য সম্প্রতি জমিদারকে আদেশ করা হইয়াছে।" ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির রেকর্ড হইতে জানা যায়, "লালদীঘিতে লোকে স্নান করে ও অশ্ব প্রভৃতির গাত্র-ধৌত করে, এজন্য পুষ্করিণীর জল ক্রমশ খারাপ হইয়া যাইতেছে। এজন্য ইহা বন্ধ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করা হউক।"[৪]

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হয়। ইহাতে কলিকাতার স্বাস্থ্য অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই সময়ের কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, মেজর কার্নাক লর্ড ক্লাইভের নিকট কলিকাতার এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে "ইংরাজ-সৈন্যগণকে সে সময়ে কলিকাতায় রাখা যুক্তিযুক্ত নহে।" কাজেই লর্ড ক্লাইভ আদেশ করেন, "কলিকাতার বন্দরে জাহাজ হইতে কোন সেনাকেই নামান হইবে না।" উক্ত বৎসরে আমরা দেখিতে পাই, অনেক টাকা হাউস-ট্যাক্সের বাবতে আদায় করিয়া প্রাচীন কলিকাতার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বৃদ্ধি অর্থাৎ ঘর-দ্বার নির্মাণ ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার জন্য ব্যবস্থা

১. The Mayor's Court, according to William Bolts, was "a Court of Record, consisting of a Mayor and nine Aldermen, seven of whom, together with the Mayor, must be natural-born British subjects. The remaining two might be foreign Protestants, the subject of any state or Prince in amity with Great Britain".—R.C. Sterndale, *An Historical Account of the Calcutta Collectorate* p. 11.

২. জমিদারি সেরেস্তায় নায়েবের নীচেই বক্সীর আসন। কোম্পানি বাহাদুর তাঁহাদের বিষয় কর্মের জন্য এদেশের জমিদারদিগের নিয়মই অনুসরণ করেন। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের 'বক্সী' একটু বিভিন্ন প্রকারের। একজন ইংরাজ এই বক্সীর কার্য করিতেন।—A.K. Ray's *Census Report*, Vol XVIII.

৩. Mr Beverley's *Census Report* 1876 p. 41.

৪. Beverley's *Report* 1876 p. 41. *Despatch to Court* Jan 27, 1750 and August 10, 1750. Long's *Unpublished Records* Vol I. *Despatch to Court* Jan 13, 1753. *Proceedings of the Court* Jan 13, 1753.

যে সকল ব্যবসারী জেটি-ঘাটে মালপত্র আমদানি-রপ্তানি করিত, তাহারা এই বর্ধিত হারে ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায়, কোম্পানি আদেশ দেন—তাহাদের মালের হিসাব খাতে যে টাকা কোম্পানির নিকট পাওনা আছে, তাহা হইতে প্রত্যেকের অংশমত কাটিয়া লইয়া জেটি মেরামত হইবে।

করা হইতেছে।[১]

নিম্নে ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ সিরাজ যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ করেন, তাহার পূর্ব সময় পর্যন্ত, কলিকাতার ঘর-বাড়ি রাস্তাঘাট কিরূপ ছিল, তাহার একটি তালিকা এস্থলে প্রদত্ত হইল।

বৎসর খ্রী. অব্দ	একারের (Acre) মাপে সহরের বিস্তৃতি	ঘর বাড়ি পাকা	ঘর বাড়ি কাঁচা	রাস্তা	গলি	ছোট গলি Byelane	পুষ্করিণী
১৭০৬	১৬৯২	৮	৮০০০	২	২	*	১৭
১৭২৬	২৩৫০	৪০	১৩৩০০	৪	৮	*	২৭
১৭৪২	৩২২৯	১২১	১৪৭৪৭	১৬	৪৬	৭৪	২৭
১৭৫৬	৩২২৯	৪৯৮	১৪৪৫০	২৭	৫২	৭৪	১৩

উল্লিখিত তালিকা হইতে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন, ১৭০৬ সালে কলিকাতায় মোটে দুইটি চলাচলের রাস্তা ছিল, দুইটি গলি ছিল ও ১৭টি পুষ্করিণী ছিল। ৮টি পাকা বাড়ি ও ৮ হাজার মেটে-বাড়ি ছিল। সম্ভবত এই সমস্ত বাড়িঘর কলিকাতা, সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহেই ছিল। কিন্তু এই তালিকার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ সময়ে এই সহরে ৪৯৮টি পাকাবাড়ি, প্রায় সাড়ে চৌদ্দ হাজার মেটে-ঘর, ২৭টি রাস্তা, ৫২টি গলি, ৭৪টি বাইলেন ও ১৩টি পুষ্করিণী ছিল। সহরের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুষ্করিণীগুলি ক্রমশ বুজাইয়া ফেলা হইতেছিল। এইজন্যই পুষ্করিণীর সংখ্যা কম। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কিরূপ উপায়ে ধীরে ধীরে কলিকাতার অধিবাসী ও গৃহসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার আভাস পূর্বোল্লিখিত বিবরণসমূহ হইতেই পাওয়া যায়। পলাশী-যুদ্ধের পর সহরের নানাস্থানের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহা আমরা পরে বলিব।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জমিদারি ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে পুরাতন সেরেস্তা হইতে আমরা আরও কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। ইহার মধ্য হইতে বিশেষ কৌতূহলজনক ব্যাপারগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা পাঠকের চিত্তরঞ্জন করিব।

---

১. *Proceedings of the Court* August 1775. Beverley's *Report* p. 42.

সপ্তদশ অধ্যায়

কোম্পানি বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তা

কোম্পানির জমিদারি অর্থাৎ সুতালুটি, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের আয়-ব্যয়—এমারত ব্যাপারে খরচা—নবাব মুরশিদকুলি খাঁর নিকট প্রেরিত উপহার দ্রব্য—কলিকাতার জমির পাট্টা—প্রজাবলির ব্যবস্থা—খুন-জখম—মদের দোকানের লাইসেন্স—এদেশীয় দালালের মজুরি—রাস্তাঘাট মেরামত খরচা—গোবিন্দপুরে প্রথম বাজার—সেকালের কলিকাতায় চুরি ডাকাতি—কোম্পানির কর্মচারীদের খানা খাইবার বন্দোবস্ত—মাতাল সেলারের দাঙ্গা—গরীব প্রজার উপর কোম্পানি বাহাদুরের দয়া—সেকালের চোর-ডাকাতের শাস্তি—কলিকাতা দুর্গের জন্য বড় কামান—ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়—যত্র তত্র পুকুর কাটানো ও পাঁচিল তোলা—কলিকাতায় বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু সংবাদ—দলিল রেজেস্টারি না করার দণ্ড—কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয়ের জরিপ ও নূতন প্রজাই পাট্টা—নূতন পাটোয়ারের নিয়োগ—কলিকাতায় প্রথম হাসপাতাল—শেঠের বাগান—গোবিন্দপুরে প্রজাদের খাজনা হ্রাস—কোম্পানির জমিদারির আয় বৃদ্ধি—পাকা আস্তাবল নির্মাণ মদের ভাণ্ডার খালি—সাহেব চোরের নির্বাসন—লালদীঘির প্রথম পঙ্কোদ্ধার—ব্ল্যাক-জমিদার নিয়োগ—খোজা সরহদের ঋণ—কলিকাতায় প্রথম গির্জা—ব্ল্যাক-জমিদার নন্দরামের গ্রেপ্তার—ঘোড়া বিক্রয়—চাউলের মূল্য বৃদ্ধি—কলিকাতা দুর্গের সম্মুখের জমি পরিষ্কার—কোম্পানি বাহাদুরের রন্ধনশালার ব্যবস্থা—ক্রীতদাসী আটকের মামলা—পুরাতন চাউল বিক্রয়—'ঔরঙ্গজেব' জাহাজ—দুর্ভিক্ষ ও বাঙ্গালী প্রজার প্রতি কোম্পানির দয়া—বাজার কলিকাতা বা বড়বাজারের আয় বৃদ্ধি—প্রাচীন কলিকাতায় হাট-বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি—সেকালের হাসপাতালের আইন—ফার্সী-লেখাই খরচা—সম্রাট ফেরোকসিয়ারকে উপহার দিবার জন্য পৃথিবীর মানচিত্র—বাদসাহের জন্য ঘড়ি মেরামত—সহকারী ডাক্তার সাহেবের জন্য পালকি ব্যবস্থা—ঘনশ্যাম বেনিয়ানের কর্মচ্যুতি—পুরাতন রৌপ্য বিক্রয়— গোঁসাই ঠাকুরের বিধবা—নবাব দরবারে বিধবার তলব—কোম্পানির নূতন দালাল হরিনাথ—ডাক্তার হ্যামিল্টনের উইল—নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে কলিকাতার অবস্থা ও ক্রমোন্নতি—কলিকাতার তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে পুরাতন সেরেস্তার (১৭০৩—১৭১৮) আবশ্যকীয় অংশের সংক্ষিপ্ত প্রতিলিপি—প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য কথা—কলিকাতার জমিদারি সম্বন্ধে নানা কথা।

FORT WILLIAM

Consultations 1703 to 1718

পরপৃষ্ঠায় উল্লিখিত জমা-খরচ কেবল কলিকাতার জমিদারি-সেরেস্তার জন্য। সেকালের এক জন সহর-কোতোয়াল মাসিক চারি টাকা বেতন পাইত। চারিজন লেখকের বা কেরানীর বেতন ১৮৷৷০ ছিল। প্রত্যেক পিয়ন বা পুলিস-রক্ষীর বেতন দুই টাকা হারে ছিল। প্রত্যেক গোমস্তা ১৷৷/০ হিঃ বেতন পাইত। হালালখোর (?) কথাটার অর্থ আমরা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই।[১]

---

১. কোম্পানির সাবেক আমলের হিসাবের খাতা পত্রে হালালখোরের মাহিনা দেখানো হইয়াছে পৌনে এক টাকা। "এরাই সর্বাধিক কম মাইনে পেত। কিন্তু এরা কি কাজ করত?" কলিকাতার বিভিন্ন ঐতিহাসিক ইহাদের পরিচয় দিতে গিয়া বিভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। উইলসন সাহেব তাঁহার 'আর্লি অ্যানালস্ অব দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল' গ্রন্থেও ইহাদের পরিচয় ঠিক করিয়া দেন নাই। কেবল নির্ঘণ্ট বা ইনডেক্সিং-এর সময় পাশে 'সুইপার' শব্দটি লিখিয়া দেন। গ্লাসগোর ম্যাথিসন সাহেব 'ইংল্যাণ্ড টু ডেল্হি' বই-এ হালালখোরদের সম্বন্ধে যা লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ইহারা হইতেছে আদি কলিকাতার ডোম। সাহেব লিখিয়াছেন:

ইংরাজি সেরেস্তায় ইহা 'Hollocore' এইরূপ বানানেই লিখিত আছে। এই সেরেস্তা হইতে দেখা যায়, কোম্পানি বাহাদুরের সেরেস্তার জন্য ছয় আনার কাগজ ও দুই আনার কালি কিনিতে হইয়াছিল। এখনকার 'স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি' বিভাগের বিরাট ব্যবস্থার সহিত তুলনায় ইহা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। নিম্নে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের আয়-ব্যয়ের হিসাব উদ্ধৃত করিতেছি।

কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামের জমিদারি সেরেস্তার নকল।

মোট জমা খরচ—অক্টোবর ১৭০৩ খৃীস্টাব্দ।

জমা—		খরচ—	
বসত বাটির জমির ও বাটির		চাকরদিগের বেতন	
খাজনা	৩২৭॥৵৬	কোতোয়াল	৪৲
পাট্টা হিসাবে	৩১॥৴৯	৫ জন সেরেস্তার কেরানী	১৮॥০
ঋণ আদায়	৭/০	১৫ জন পিয়ন	৩১৲
জরিমানা	৪৲	১০ জন পাইক	৬৫৲
পেয়াদার রসুম	।৵০	খাজনা আদায়কারী গোমস্তা ৪ জন	৬৸০
বিবাহের ফিঃ	১৸০	ঢোল ও ভেরীবাদক	১৸০
সেলামি	১॥০	হালালখোর ২ জন (?)	৸০
জ্বালানি কাঠের শুল্ক	৩॥০	কাগজ	।৵০
শস্যাদির শুল্ক	১৪৸৴০	কালি	৵০
		খাজনা খানায় জমা	৩১৪॥৯

ফোর্ট উইলিয়াম কন্সলটেসন্স
ডিসেম্বর ১৭০৩ খৃীস্টাব্দ
কলিকাতা (CALCUTTA)

আয়—		ব্যয়—	
জমি ও বাটির খাজনা	২০৩৸৴৫	ভৃত্যদের বেতন	
পাট্টা	২০।৵৫	শিকদার (১ জন)	৪৲
বিবাহের সেলামি	৭৲	মণ্ডল (১ জন)	২৲
ঋণ আদায়	২।৴০	পাটওয়ারি	২৲
সেলামি	২২৲	পিয়ন (৫ জন)	১০৲
জরিমানা	২৲	কাছারি ও মেটেঘরসমূহ মেরামত	১॥/৫
বাট্টা	।৴০	সেরেস্তা বাঁধিবার খেরো	।০
ফল বিক্রয়	।৫	রাস্তা মেরামত	১॥৴০
নূতন বাজারের খাজনা (বড়বাজার ?)	২৲	মণ্ডলের বেতন	২৲
মালের কুত	১।৴১৫		
করালের নিকট প্রাপ্য	১৲		
বাট্টা	।/১০		
ওজনের শুল্ক	২২॥/১৫		

"It would appear that the meanest of all the occupations is that of the city dustmen (in Bombay called Halalcores; and in Calcutta Dhomes), a degraded order of Hindoos, whose very shadow is shunned by the Brahminical class, and with whom all ordinary mortals in the community disdain to eat or associate."—নারায়ণ দত্তের জন কোম্পানির বাঙ্গালী কর্মচারী, কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ. ১৬-১৭.

সূতালুটি (SOOTALOOTA)
(ডিসেম্বর—১৭০৩ খৃষ্টাব্দ)

আয়—		ব্যয়—	
জমি ও বাটির খাজনা আদায়	১৩৪৶০	কর্মচারীর বেতন	
বাঁটা	১৩।৵১৫	শিকদার	৩৲
বাজারের আয়	৬০।৶০	পাটওয়ারি	২৲
কয়ালের ডিউটি	৫৲	পেয়াদা (৫ জন)	১০৲
ঐ বাঁটা	॥০	কাগজ ও কালি	২/০
কুঠি-মাগন্ (Kutti Magan ?)	১৪॥১০		
ঐ বাঁটা	১।৶০		
ফল প্রভৃতির উপর শুল্ক	৫॥/১৫		
জরিমানা, ঋণ আদায়	১৶০		
সেলামি প্রভৃতি	৩৬৶০		
আসারি (আস্ওয়ারি)	*		
জেলেদের নিকট হইতে আদায়	৬।/০		
বাট্টা	॥৵০		

গোবিন্দপুর (GOVINDPORE)

আয়—		ব্যয়—	
জমির ও বাড়ির খাজনা	১৬০৲	কর্মচারীদের বেতন	
খুচরা নানাবিধ বাব হইতে আদায়	১৮৸০	শিকদার পাটওয়ারি প্রভৃতির বেতন	৬॥০
সেলামি	২৲	উকিল (Vacquell)	৫৲
ওজনের শুল্ক	৪৭।০	২জন রাইটার	৬৲
বাট্টা	৪॥৶০	কাহার ৮জন	৮৲
জেলেদের নিকট আসওয়ারি আদায়	৮৲	কাগজ কালি	১৶০
বাট্টা	॥৵১৫	তৈল	৸০
		নবাবের পেয়াদা	১।৫

কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তার[১] প্রতি বৎসরের অনেক হিসাব পত্র আছে। তাহার সকলগুলি এই পুস্তকে উদ্ধৃত করা অসম্ভব।

এই দুইশত বৎসর পরে, প্রাচীন কলিকাতায় যে সমস্ত ঘটনা পাঠকের পক্ষে উপন্যাসবৎ বোধ হইবে, তাহার কতকগুলি নিম্নে সংকলিত হইতেছে।

এমারত খরচা

খাজাঞ্চি সাহেবকে ৪০০ টাকা দেওয়া হইল। এই টাকায় সহরের বাড়িঘর নির্মাণ, মেরামত ও চুণ খরিদ করা হইবে। *(Con. 6)*

মুরশিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত উপহারদ্রব্যের তালিকা

আয়না—১০ ইঞ্চি ১ খানা ও ১২ ইঞ্চি ২ খানা ; তলওয়ার—২ খানা; পেয়ালা—৩; কাপেট এবং গ্লাস—৪; রৌপ্যময় পানের বাটা ঢাকনি সমেত (ওজন ২॥০ সের)—১; সামাদান—২; পিক্‌দানি—২; হুঁকা—৩; ছুরির বাঁট—২; গোলাপজলের বোতল—৭; খানার সরঞ্জাম

১. উল্লিখিত সেরেস্তা আজও বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত। ইহাই *Bengal Public Consultations* নামে পরিচিত। উইলসন সাহেব এই বহুমূল্য সেরেস্তার সার সংকলন করিয়া কোম্পানির জমিদারি প্রাপ্তির আমলের অনেক নূতন ও অপ্রকাশিত কথা ইতিহাস পাঠকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। আমরা এই *Consultations* বহির চিত্তাকর্ষক অংশগুলিই উদ্ধৃত করিলাম। প্রত্যেক বিষয়ের শেষে যে ইংরাজি সংখ্যা আছে তাহাই কনসলটেসন সংখ্যা।
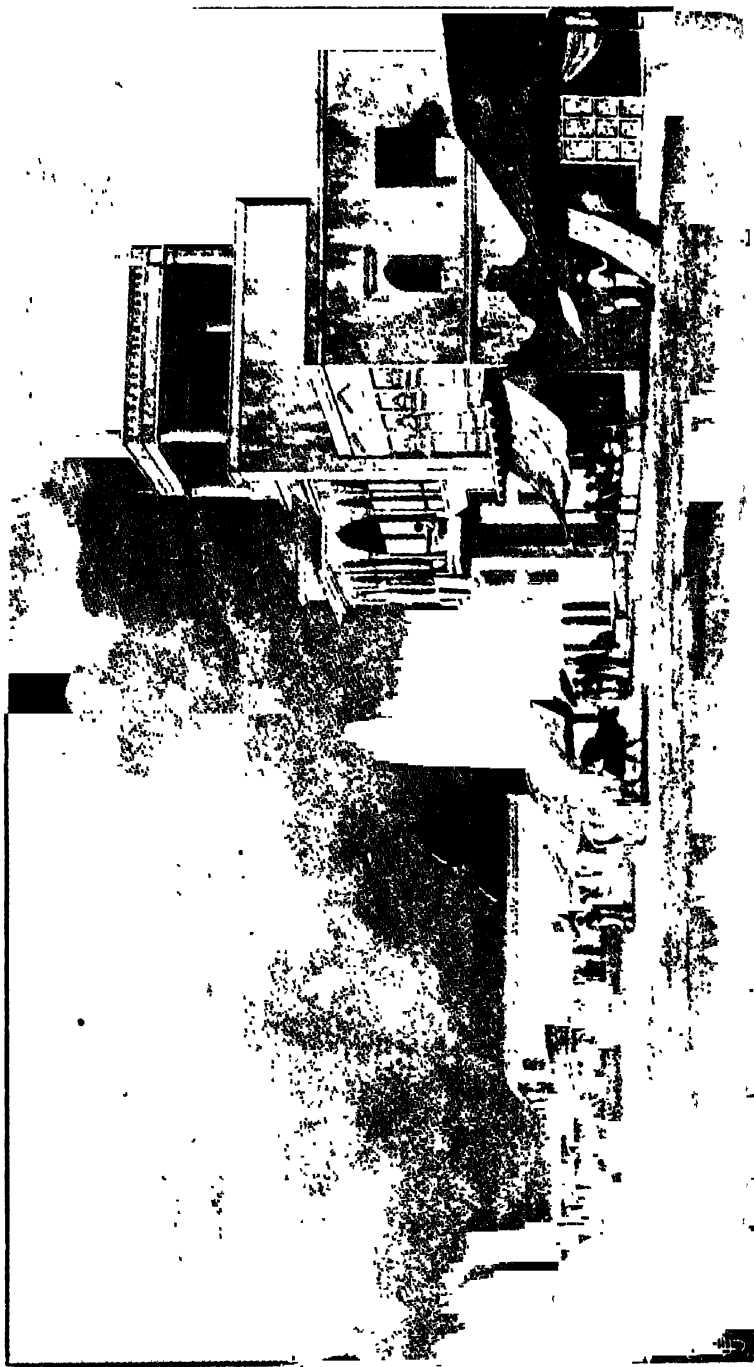
১৭৯২ খ্রীঃর বাগবাজার ও কুমারটুলির দৃশ্য
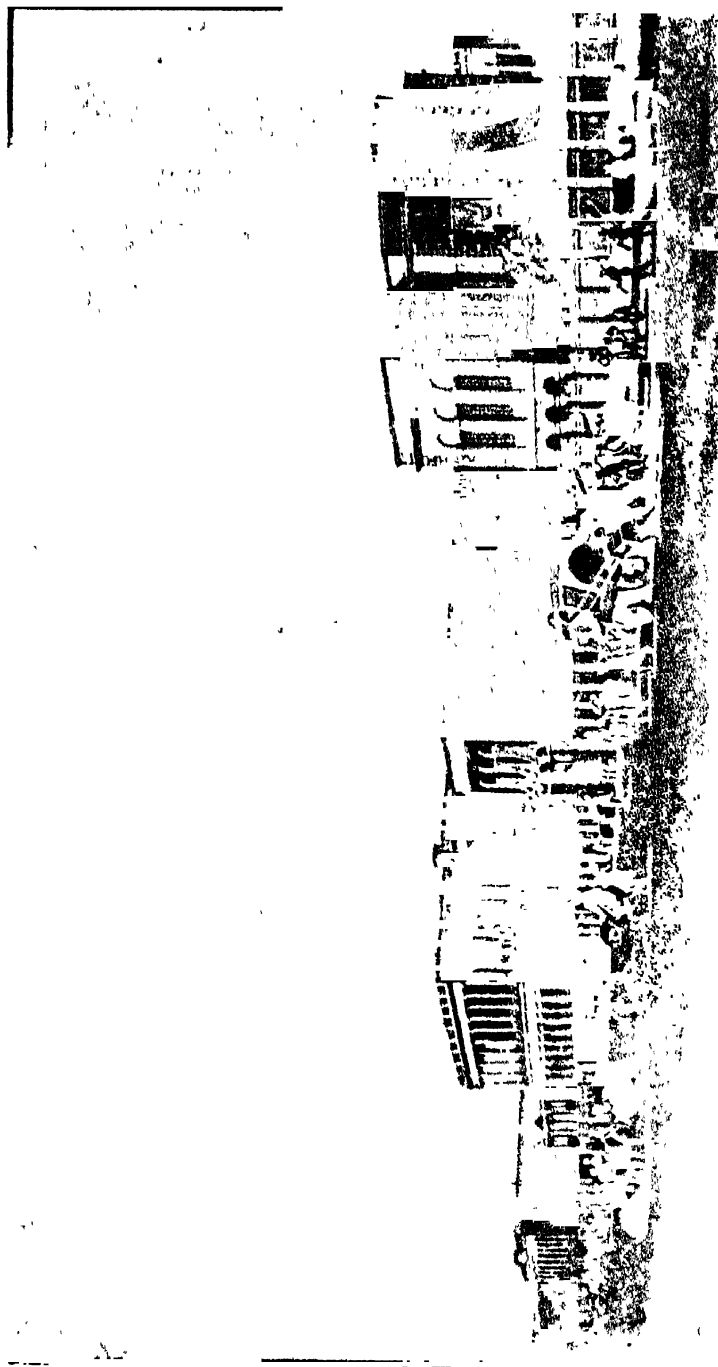
১৭৯২ খ্রীঃর কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ও এসপ্ল্যানেড
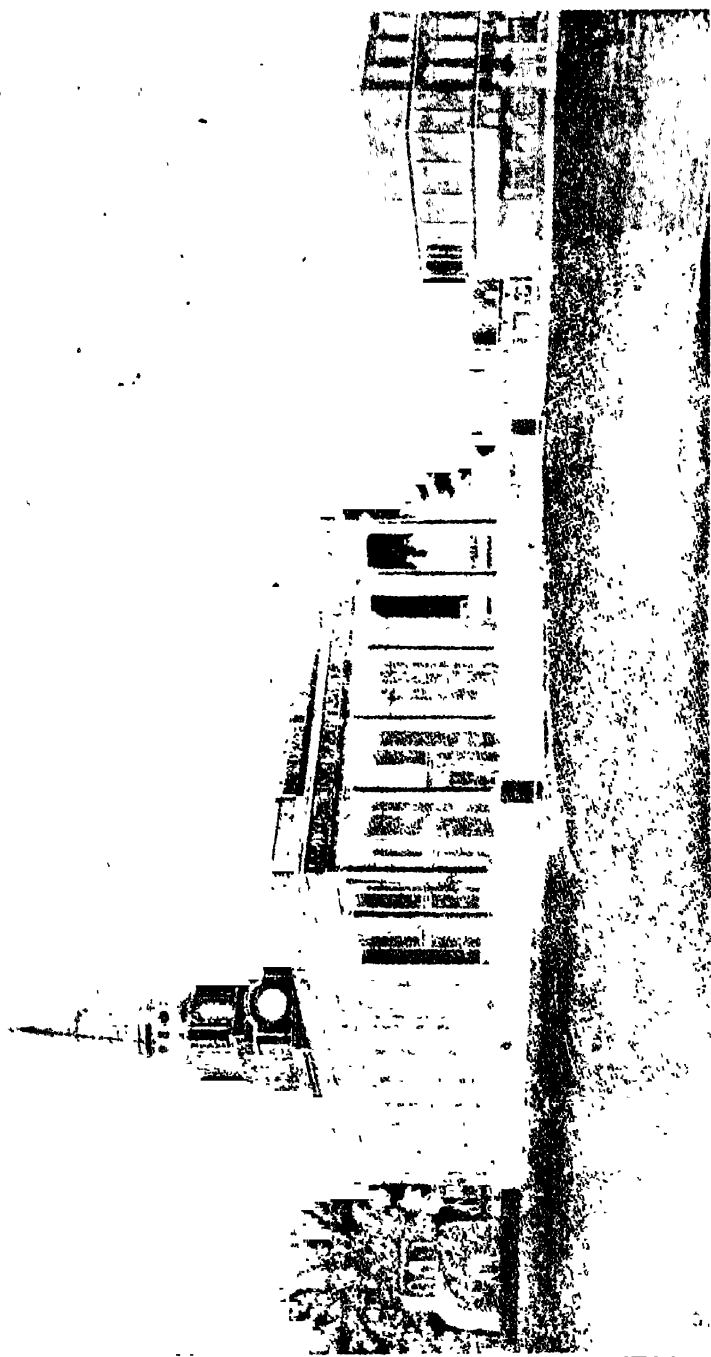
১৭৯৪ খ্রীঃ সেণ্ট জনস্ গির্জা
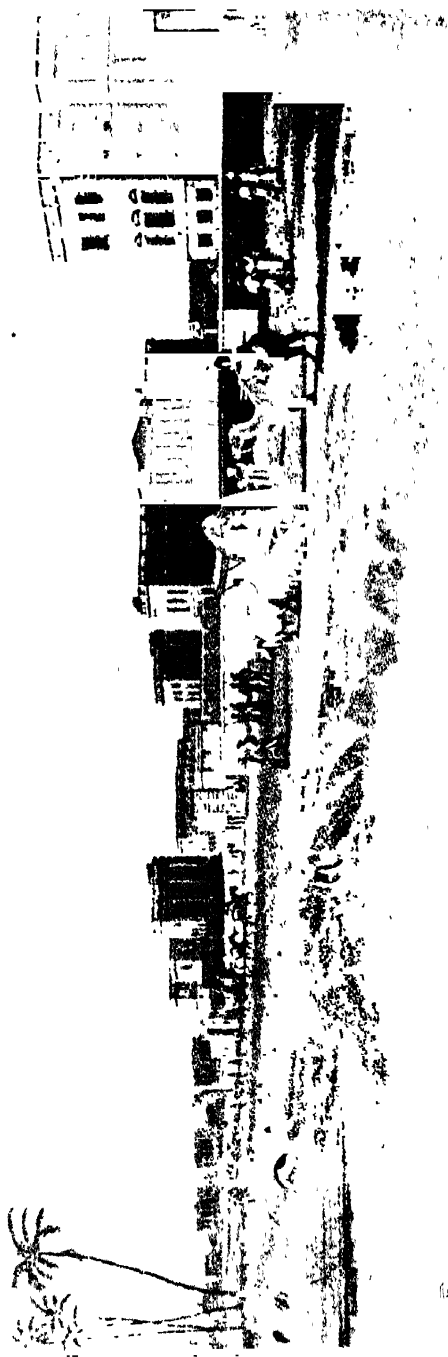
১৭৯২ খ্রীঃ চৌরঙ্গী ও তৎপার্শ্বস্থ ময়দান

(প্লেট ইত্যাদি)—২; উৎকৃষ্ট মখমল—৪ গজ; বনাত—১ দফা; লাল কাপড়—১ দফা; সবুজ রঙের কাপড়—১ দফা; মোটা রকমের বনাত—১ দফা। (*Con. 10*)

জমির-পাট্টা ও খাজনা

জন ওয়াট্স সাহেবকে পর্টুগীজ-গির্জা ও বাজারের মধ্যে এক বিঘা ও দশকাঠা জমি পাট্টা দেওয়া হইল। ইহার বাৎসরিক খাজনা ৪৸০।

অনারেবল মিঃ জন বেয়ার্ডকে এক বিঘা ষোল কাঠা জমির-পাট্টা দেওয়া হইল। ইহার বাৎসরিক খাজনা ৫।৵১০। (*Con. 75*)

জেমস জনসনকে বাড়ি ও বাগান নির্মাণ জন্য দুই বিঘা চারি কাঠা জমি পাট্টা দেওয়া হইল। খাজনা বাৎসরিক ৭।৵০।

ডাক্তার ওয়ারেনকে ময়দানের মধ্যে দুই বিঘা আঠার কাঠা জমি পাট্টা দেওয়া হইল। বাৎসরিক খাজনা ৮৸৶১৫। (*Con. 96-98*)

প্রাচীন কলিকাতায় খুন-জখম

দেশী লোক ও জাহাজের সেলারদের মধ্যে একটা দাঙ্গা উপস্থিত হওয়ায় একজন সেলার নিহত হইয়াছে। জনকয়েক অপরাধীকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের এরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিচারের কোন আদালত না থাকাতে, তাহাদের কোন শাস্তিই দেওয়া হয় নাই।

মদের দোকানের লাইসেন্স

বিবি ডেমিঙ্গো এ্যাশ্এর আরক (এক প্রকার দেশী মদ্য) চোঁয়াইবার ও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স শেষ হওয়ায় পূর্ব বৎসরের শর্তানুসারে তাহাকে পুনরায় লাইসেন্স দেওয়া হইল। পূর্ব বারের শর্ত মতে, চোলাই করিবার জন্য বাৎসরিক ৮০০ টাকা ও বিক্রয়ের জন্য বাৎসরিক ২০০ টাকা দিতে হইবে। (*Con. 112*)

আরক এক প্রকার তীব্র মদিরা। তখন এদেশে বিলাত হইতে ভাল মদিরা খুব কমই আসিত। যাহা আসিত তাহার দামও বেশী। এইজন্য 'আরক-হাউস' বলিয়া প্রাচীন কলিকাতায় এক শ্রেণীর মদের দোকান ছিল। এখনও কলুটোলা স্ট্রীটে ফৌজদারি-বালাখানা হইতে কিছুদূরে গেলে একখানি অতি পুরাতন মদের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উপর লেখা আছে—১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত।

দুইজন দেশীয় দোকানদারকে লাইসেন্স দেওয়া হইল। একজনের নাম Gossa (ঘোষ) অপর ব্যক্তি সরফালি সারঙ্গ। ঘোষ কলিকাতায় একটি গাঁজার দোকান খুলিতে চাহে। ইহার বাৎসরিক লাইসেন্স ১৮০ টাকা। সরফালি জাহাজে খালাসি যোগাইবে। তাহার লাইসেন্স ৬৫ টাকা ধার্য হইল। (*Con. 171*)

ডেমিঙ্গো এ্যাশ্ ও গোবিন্দ সুঁড়িকে (রেকর্ডে আছে—Govind Sondee কিন্তু উইলসন সাহেব ইহাকে Govinda Sunder করিয়াছেন) আরক-হাউস বা মদের-দোকান ও হোটেল করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইল। (*Con. 180*)

কোম্পানির দালাল-নিয়োগ

দীপচাঁদ বেলা (বেরা?) কোম্পানির দালাল-পদে নিযুক্ত হইল। দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট যত টাকার মাল খরিদ হইবে, দীপচাঁদ তাহার প্রতি টাকায় আধপয়সা হিসাবে কমিশন পাইবে। (*Con. 86*)

দীপচাঁদ বেলা (বেরা) বলিয়া যে ব্যক্তি এতদিন কোম্পানি দালালি করিয়া আসিতেছিল, সম্প্রতি সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এইজন্য এই ফৌত দীপচাঁদের স্থানে কোম্পানি জনার্দন

শেঠকে তাঁহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের দালালরূপে নিযুক্ত করিলেন।[১] (*Con. 183*)

রাস্তা মেরামত

দেশীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে যে সমস্ত জরিমানার টাকা আদায় হইয়াছে, তাহা কলিকাতার ভাঙ্গা রাস্তা মেরামত ও খানা-নর্দমা বুজাইবার জন্য ব্যয় করা হইবে। এজন্য জমিদার বোচার সাহেবকে আদেশ করা হইল, তিনি যেন এ সম্বন্ধে কার্য আরম্ভ করিয়া দেন। (*Con. 94*)

গোবিন্দপুর বাজার

কলিকাতার জমিদার বোচার সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন টাউন গোবিন্দপুরে একটি বাজার স্থাপন করা বড়ই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে এই বাজার খুব লাভকর হইতে পারে। এজন্য অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত বাজারের নির্মাণকার্য যত শীঘ্র সম্ভব আরম্ভ করা হউক। (*Con. 115*)

প্রাচীন কলিকাতায় চুরি ডাকাতি

দেশীয় অধিবাসীদের অংশে চুরি-ডাকাতির বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এজন্য সহরের শান্তিরক্ষার্থে একজন ইংরাজ করপোরাল ও ছয়জন গোরা-সৈন্য থানার কোতোয়ালের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইল। দরকার হইলেই তাহারা কোতোয়ালকে সাহায্য করিবে। (*Con. 138*)

দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে গোলমাল

কোম্পানির অনেক ইংরাজ কর্মচারীই অভিযোগ করিতেছেন, তাঁহাদের আহার্যাদি অপর্যাপ্ত ও খানার সময় তাঁহারা পেট ভরিয়া মনোমত খাইতে পান না। এজন্য আদেশ হইল, প্রত্যেক কর্মচারী প্রতিমাসে কুড়ি টাকা করিয়া খোরাকির জন্য অতিরিক্ত পাইবেন। জ্বালানির তৈলও তাঁহারা বিনামূল্যে পাইবেন, কিন্তু মোমবাতি দেওয়া হইবে না। (*Con. 139*)

পাঠক মনে রাখিবেন, আমরা দুইশত বৎসর পূর্বের কলিকাতার অবস্থা বলিতেছি। তখন সাধারণ লোকে তেলের আলো জ্বালিত ও পদস্থ লোকেরাই বাতির আলো উপভোগ করিত।

সেলারের দাঙ্গা

কোম্পানির জাহাজের কতকগুলি সেলার এদেশীয় জনকয়েক লোককে বিবাদের মুখে আক্রমণ করে। এই জাহাজখানি তখন কলিকাতায় নঙ্গর করিয়াছিল। কোম্পানির একজন এদেশীয় পিয়ন এই দাঙ্গায় নিহত হয়। কাউন্সিলের কানে এই কথা উঠায় তাঁহারা এই নিহত ব্যক্তির আত্মীয়দের ডাকিয়া পাঠাইয়া, তাহাদের হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিয়াছেন। নিহত ব্যক্তি কোম্পানির চাকর হইলেও মোগল-বাদসাহের প্রজা। কথাটা স্থানীয় ফৌজদারের কানে উঠিলে তিনি একটা অছিলা পাইয়া কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন, এজন্য টাকা দিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলা হইল। (*Con. 154*)

গরীব প্রজাদের উপর কোম্পানির দয়া

অনেকে দেনার দায়ে বা অন্য প্রয়োজনে বাড়িঘর বিক্রয় করিয়া থাকে। এদেশীয় লোকেরা এইরূপ বাড়িঘর বিক্রয় করিলে তাহাদের নিকট বিক্রেয় টাকার সিকিভাগ কোম্পানি মালিকানি স্বত্বরূপে পাইতেন। কিন্তু এ দেশীয় লোকেরা বড় দরিদ্র। এদিকে সাহেব-সুবা কোন বাড়ি বা জমি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিলে তাহার নিকট শতকরা দুই টাকা করিয়া কমিশন লওয়া হয়। এ পার্থক্য রহিত করা সম্পূর্ণরূপে উচিত। এরূপ ব্যবস্থা এদেশীয় গরীব লোকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর,

---

১. দীপচাঁদ বেলার (বেরা) মৃত্যুর পর জনার্দন শেঠ ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দালাল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।—নগেন্দ্রনাথ শেঠ সংকলিত কলিকাতার তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৫০, পৃ. ৩৩।

এজন্য আদেশ করা গেল, কি ইউরোপীয় কি দেশীয় লোক, যাহারা বাড়িঘর বা জমি বিক্রয় ও হস্তান্তর করিবে, বিক্রয়মূল্যের উপর তাহাদের সকলকেই ভবিষ্যতে শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে কোম্পানির প্রাপ্য দিতে হইবে। (*Con. 163*)

চোর-ডাকাতে : শাস্তি ও শান্তিরক্ষার নূতন বন্দোবস্ত

কয়েক দিন হইল কতকগুলি ডাকাত ও চোর এই সহরে গ্রেপ্তার হইয়াছে। এ সংবাদ কাউন্সিল ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। ইহারা দাগী আসামী ও অনেক লোকজন হত্যা করিয়াছে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, এখনও অনেক চোর আমাদের কোতোয়ালির হেপাজতে আছে ও ভবিষ্যতে আরও আসিবার সম্ভাবনা, এজন্য তাহাদের প্রত্যেককেই গালে লোহা পোড়াইয়া ছাঁকা দিয়া শাস্তি দেওয়া হইবে। তৎপরে তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে নদীপার করিয়া অপর পারে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে। বিচার-কর্তারা যেন এ আদেশটি বিশেষভাবে পালন করেন। (*Con. 175*)

এদেশীয় চোরগণ কলিকাতা সহরের মধ্যে বড়ই উৎপাত করিতেছে। ইহারা সাধারণ অধিবাসী ও কোম্পানির এদেশীয় চাকর-বাকরদের অনেককে অস্ত্রাহত করিয়া হত্যা করিয়াছে বা তাহাদের জখম করিয়াছে। এজন্য সহরের শান্তিরক্ষার জন্য অধিক পরিমাণে পুলিস-প্রহরী নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তন্মেধ্যু জমিদার সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে, তিনি চুরি ডাকাতির শাস্তির জন্য অতিরিক্ত দেশীয় পাইক নিযুক্ত করিবেন। (*Con. 188*)

কলিকাতা দুর্গের জন্য বড় কামান

বিলাতের কর্তারা মান্দ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ দুর্গের জন্য কয়েকটি কামান কলিকাতায় পাঠাইয়াছেন। এ কামানগুলি এখন মান্দ্রাজে চালান দেওয়ার বড়ই অসুবিধা। এজন্য তাহা কলিকাতা দুর্গেই রাখা হইল। মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষদের সহিত পত্রব্যবহারে ইহা স্থির হইল যে, আপাতত কলিকাতার কর্তৃপক্ষীয়েরা এই কামানগুলি কিনিয়া লইবেন। যদি এগুলি ভবিষ্যতে মান্দ্রাজের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের এগুলি পুনরায় বিক্রয় করা হইবে।

(*Con. 194*)

ক্রীতদাস ক্রয়বিক্রয়

পশ্চিম উপকূলে প্রায়ই ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয়। এহেতু আমরা ক্রীতদাস পাঠাইবার জন্য প্রায়ই ঐ সকল স্থান হইতে অনুরোধ-পত্র পাই। কিন্তু সকল সময়ে বাজারে ক্রীতদাস পাওয়া যায় না। এজন্য আমরা আমাদের বক্সী অর্থাৎ সাহেবকে উপদেশ দিয়াছি, সুবিধা মত ক্রীতদাস পাইলেই তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। তাহাদিগকে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে এরূপভাবে আটকাইয়া রাখিবেন, যেন তাহারা না পালায়। দাসগণেরা কোম্পানির ব্যয়ে আহারাদি পাইবে এবং বক্সী সাহেবও প্রয়োজন মত ইহাদের নানাকাজে খাটাইয়া লইতে পারেন। বালক ও যুবক দেখিয়া তিনি দাস ক্রয় করিবেন। স্ত্রীলোকের সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল। কিনিবার সময় তিনি দেখিবেন দাসগুলি যেন সুস্থদেহ ও কমনীয় গঠন হয়। (*Con. 194*)

এই সময়ে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী বিক্রয়প্রথা ভারতের নানা স্থানে অতিশয় প্রবল ছিল। এই দাস-দাসীগণকে অস্থাবর সম্পত্তির মত হস্তান্তর করাও চলিত। ইংরাজ কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানিতে পারা যায়, সেকালের কলিকাতার অনেক ইংরাজ মরিবার পূর্বে উইল করিয়া যেমন অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করিতেন, ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। কখনও বা এই সমস্ত উইলে তাঁহারা ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের মৃত্যুর পূর্বে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিতেন, তাহাদিগকে অর্থাদি দিতেন, আবার কোন কোন স্থলে বা দানপত্র করিয়া তাহাদের অপরের হস্তে দিয়া যাইতেন। এই সমস্ত ক্রীতদাসদের অধিকাংশই পর্টুগীজ ছিল। এনড্রু ক্র্যাগ নামক কোম্পানির একজন গোরা সেনানীর কলিকাতায় মৃত্যু হয়। ক্র্যাগ তাহার উইলের (২৪ জুন ১৭৭২) একস্থানে লিখিতেছেন, "I give to my

daughter Mary Cragg all that shall appear to be due to me after my death . . , I give to Mingo my slave Wench her freedom and one hundred rupees and I also leave her two slaves ক্রীতদাসী বা দাসেরা এইরূপ মুক্তি পাইবার সময় তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে নগদ মুদ্রা পাইত, আবার কেহ বা মৃত-ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হইত। উপরে উদ্ধৃত ঐ উইলের মর্মাংশই ইহার প্রমাণ। এরূপ অনেক দানপত্রেই আমরা ক্রীতদাস হস্তান্তরের উদাহরণ পাইয়াছি। তবে তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র কেবল প্রমাণরূপে পাঠকের গোচরার্থে এস্থানে উদ্ধৃত হইল। *(Con. 198)*

পুকুর কাটানো ও পাঁচিল তোলা

তখন যাহারা কলিকাতায় বাস করিত, তাহাদের অনেককেই বন জঙ্গল কাটাইয়া, খানা-খন্দ বুজাইয়া বাস্তুভিটা তৈয়ারি করিতে হইত। বাঙ্গালীর বাস্তুভিটা আবহমানকাল হইতেই, পাঁচিল দিয়া ঘেরা থাকে। পুকুর-ঘাট না হইলেও তাহাদের চলে না। কাজেই অনেকে স্বেচ্ছামত বাটির চারিদিকে পাঁচিল তুলিত ও পুকুর কাটাইত। ইহাতে কলিকাতায় এই সময়ে পুকুরের সংখ্যা কিছু বেশী হইয়া পড়ে। এইজন্য কোম্পানি বাহাদুর ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ-দ্বারে এক নোটিশ মারিয়া দেন, "সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, যে এই নগরের অনেক বাসিন্দা যত্রতত্র বাস্তুজমি পাঁচিল দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছে ও তাহার মধ্যে পুষ্করিণী খনন করিয়াছে এবং এ প্রকার কার্য করিবার পূর্বে তাহারা ফোর্ট উইলিয়াম গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লয় নাই। এইজন্য কাউন্সিল আদেশ করিতেছেন, ফোর্টের প্রবেশদ্বারে একটি নোটিশ লটকাইয়া দেওয়া হউক, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ এরূপ বিশৃঙ্খল ভাবে কাজ না করে। *(Con. 196)*

কলিকাতায় সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ

ঔরঙ্গজেব বাদসাহ দাক্ষিণাত্যে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ইহলীলা শেষ করেন।[১] তখন সংবাদপত্র ছিল না, বা এমন কোন উপায় ছিল না যাহাতে অতি দূরতর স্থানে এসব সংবাদ শীঘ্র পেঁছায়। জনশ্রুতি মুখে সরকারি দূতের সহায়তায়, এসব সংবাদ বাদসাহী শাসনকেন্দ্রে পেঁছিত। তথা হইতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদে কলিকাতার ইংরাজেরা কিরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা সেকালের কোম্পানির কাগজপত্র হইতেই জানা যায়। আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে দিলাম—

"মোগল বাদসাহের মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতা নগরে পেঁছিবামাত্র সমস্ত নগরী অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছে। রাষ্ট্রবিভাগের চারিদিকেই একটা গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়া সম্ভব বিবেচনায় সকলেই আতঙ্কিত। নানাস্থান হইতে এ মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সকলেই ইহা বিশ্বাস করিতেছে এবং সেই জন্য কলিকাতা-দুর্গেও একটা মহা হুলুস্থূল উপস্থিত। এহেতু শীঘ্রই একটি বিশেষ মন্ত্রণা-সভা আহূত হইল। সভায় এই স্থির হইল সম্রাটের মৃত্যুতে একটা রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে, এজন্য মহাজন ও পাওনাদারগণকে যাহাতে আর টাকাকড়ি না দেওয়া হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। আমাদের যে সমস্ত কর্মচারী নিকটবর্তী স্থানে কোম্পানির কার্যোপলক্ষে গিয়াছেন, তাঁহাদের কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। মিঃ ডারেল ও স্পেনসারের নিকট কোম্পানির টাকাকড়ি ও সনন্দ প্রভৃতি আছে, তাঁহাদিগকে নিরাপদে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য কুড়ি জন গোরা-সৈন্য পাঠান হউক। মিঃ বগডেন ও ফিক কাশিমবাজারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদিগের উপর আদেশ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা কোম্পানির মালপত্র লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হউন। ৩রা এপ্রিল ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের মন্ত্রণা-সভায় উল্লিখিতরূপে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়।

১. ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগরে দেহত্যাগ করেন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে।

আবার ৭ই এপ্রিল তারিখে এক মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইলে তাহাতে স্থিরীকৃত হয়, "সম্রাটের মৃত্যুতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহার উপর এখনই শস্যাদি দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছে। যদি কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ বাধে, তাহা হইলে খাদ্যের অভাবে আমাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি মান্দ্রাজে ইংরাজ উপনিবেশেও এইরূপ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গমধ্যস্থ সেনাগণ ও কোম্পানির কর্মচারিগণের ভবিষ্যত প্রয়োজন মতে, পাঁচহাজার মণ চাউল ও এক হাজার মণ গম সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডারজাত করা হউক। এ বিষয়ে আর্থার কিং সাহেবকে আদেশ দেওয়া হইল। যদি মান্দ্রাজের কুঠিতে শস্যের প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাদেরও সাহায্য পাঠাইতে হইবে।"

"কাশিমবাজারের বগডেন ও ফিক সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে, তাঁহারা আমাদের পত্রপ্রাপ্তি মাত্র কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন। কোম্পানির তহবিলে যে সমস্ত টাকাকড়ি আছে, কিম্বা সনন্দ লাভের জন্য তাঁহাদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাঁহারা যেন কলিকাতায় লইয়া আসেন। যে সমস্ত বনাত ও অন্যান্য কাপড় বিক্রয়ার্থে কাশিমবাজারে মজুত আছে, তাহা আর বিক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের বেনিয়ান হরিকৃষ্ণের জিম্মায় তাঁহারা সেইগুলি হেপাজত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন।"

"এই রাষ্ট্রবিপ্লবে নিকটবর্তী জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে কোম্পানির উপর উৎপাত করিতে পারেন, কলিকাতা লুটপাট করিতে পারেন। তাহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত সম্ভাবিত বিপদের প্রতিকার জন্য আদেশ হইল যে, ৬০ জন অতিরিক্ত দেশীয় সৈন্য কোম্পানির দলভুক্ত করা হউক। তাহারা কলিকাতা নগরীর চারিদিকে পাহারা দিয়া নগররক্ষা করিবে।" *(Con. 197)*

দলিল-রেজেস্টারি না করার দণ্ড

জোসিয়া জনসনের ২৫ টাকা অর্থদণ্ড হইল। কারণ সে সহরের মধ্যে একখানি বাটি খরিদ করিয়া চলিত প্রথামত রেজেস্ট্রি করে নাই।

দলিলাদি রেজেস্টারি করিবার ভার কলেক্টর বা জমিদারের উপর ছিল।

কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামত্রয় জরিপ ও প্রজাই-পাট্টা

"দুই বৎসর পূর্বে কোম্পানি বাহাদুর কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয়ের জরিপ করিবার আদেশ দেন। সেই জরিপি-জমাবন্দী নক্সা ও কার্যসমূহ এত দিনে শেষ হইয়াছে ও তাহার কাগজাৎ কাউন্সিলে পেশ হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজাৎ হইতে প্রমাণ হইতেছে, অনেক প্রজা কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়া, জমি ভোগ করিতেছে। অনেকে তাহাদের দখলি জমির পরিমাণের অর্ধেক অংশেরও খাজনা না দিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে ভোগদখল করিতেছে। এজন্য নিম্নলিখিত এই আদেশ প্রচারিত হইল—

১। ইহার পর হইতে জমিদার সাহেব প্রত্যেক প্রজাকে একখানি করিয়া টিকিট দিবেন। এই পাট্টায় বা টিকিটে প্রজার বাৎসরিক খাজনার হার ও জমির পরিমাণ লেখা থাকিবে।

২। প্রতিমাসে খাজনা দাখিলের সময় প্রজা এই টিকিট বা পাট্টা হাতে করিয়া আনিবে। এই দলিলের স্বত্ব এক বৎসর বলবৎ থাকিবে এবং প্রতি বৎসরের শেষে ইহা নূতন করিয়া দেওয়া হইবে।

৩। কোম্পানির কর্মচারীরা একখানি বহির মধ্যে এই টিকিট বা পাট্টাগুলি নিয়মিতরূপে রেজেস্ট্রি করিয়া রাখিবেন।

৪। প্রত্যেক গোমস্তা সহরের মধ্যে লোকজন বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার একটা হিসাব রাখিবেন। *(Con. 204)*

ধরিতে গেলে ইহাই বর্তমান কলিকাতা কলেক্টরির প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তখন স্বতন্ত্র রেজেস্ট্রি-অফিস ছিল না। এই আদেশ প্রচারের পর হইতে স্বতন্ত্র রেজেস্ট্রি-বিভাগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল। সেকালে সেন্সস্‌ প্রভৃতির ভার প্রকারান্তরে খাজনা-আদায়কারী গোমস্তাদের হাতেই দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতাদি গ্রামত্রয়ের জনসংখ্যা বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাঁহারাই ইহা স্থির করিয়া বলিতেন। আর, এই দুই শত বৎসর পরে কলিকাতা সহরের সেন্সসের বা লোকগণনার দিনে কি না একটা ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হয়!

নূতন পাটোয়ার নিয়োগ

কাউন্সিল সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছেন, বাঙ্গালী পাটোয়ারেরা নিজেদের স্বার্থের জন্য, বেনামী করিয়া জমিজমা লইতেছে এবং হিসাবপত্রে গোঁজামিল দিতেছে। আদেশ দেওয়া হইল, এই সমস্ত 'ব্ল্যাক-পাটোয়ারী'কে জবাব দিয়া তাহাদের স্থানে নূতন লোক লওয়া হউক। যাহারা নূতন নিযুক্ত হইবে, তাহারা যাহাতে এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার না করে তজ্জন্য তাহাদের বেতন মাসিক চারি টাকা হিসাবে দেওয়া যাইবে। *(Con. 206)*

কলিকাতায় প্রথম হাসপাতাল

ইংরাজ-গোরা এবং কোম্পানির জাহাজের মাঝি ও সাহেব-মাল্লাদের মধ্যে পীড়ার প্রকোপ বড়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাগৃহ বা হাসপাতাল স্থাপনের প্রার্থনাপত্রও কোম্পানি ইতিপূর্বে পাইয়াছেন। কোম্পানির বেতনভোগী ডাক্তারেরাও এই হাসপাতাল স্থাপনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এজন্য আদেশ করা গেল, "কলিকাতা-দুর্গের নিকট একটি সুবিধাকর উন্মুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া, তথায় হাসপাতাল নির্মিত হইবে। এজন্য কোম্পানি দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। যে সমস্ত ইউরোপীয় জাহাজ দেশীয় নৌকা ও ভড় ইত্যাদি, বাণিজ্যার্থ কলিকাতা বন্দর অতিক্রম করিবে, তাহাদের অধিকারের নিকট হইতে এই হাসপাতালের জন্য চাঁদা লওয়া হইবে। কলিকাতার অধিবাসিগণও এই হাসপাতাল নির্মাণের জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য। কোম্পানির বক্সী আডাম সাহেব এই সমস্ত চাঁদা আদায় ও বাড়ি-নির্মাণ কার্য তদারক করিবেন।" *(Con. 218)*

ধরিতে গেলে ইহাই কলিকাতার প্রথম হাসপাতাল বা বর্তমান জেনারেল হাসপাতালের প্রথম সূচনা।[১]

শেঠের বাগান

জনার্দন শেঠ, গোপাল শেঠ, যদু শেঠ, বারাণসী শেঠ ও জয়কৃষ্ণ শেঠ একরার দিয়াছে, যে তাহারা কলিকাতা-দুর্গের পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাংশে দেশীয় মহল্লার অংশসমূহের মধ্য দিয়া যে সদর রাস্তা গিয়াছে, তাহা নিজ ব্যয়ে মেরামত করিবে ও পরিষ্কার রাখিবে। এইজন্য তাহারা কোম্পানির নিকট বাগান-নির্মাণের জন্য যে জমি জমা লইয়াছে, তাহার খাজনা বিঘা প্রতি আট আনা কম করিয়া দেওয়া হইল। যে পঞ্চান্ন বিঘা জমিতে তাহারা বাগান-নির্মাণ করিয়াছে, তাহা আমাদের জমিদারি লাভের অনেক পূর্বে। ইহারাই নগরের পুরাতন অধিবাসী এবং কোম্পানি ইহাদের সাথে ব্যবসায়ে লিপ্ত। এইজন্য এইরূপ খাজনা রেহাই বন্দোবস্ত হইল। *(Con. 215)*

১. প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু কলিকাতার ক্রমবর্ধমান রোগের চিকিৎসার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। কাপ্তেন হ্যামিল্টনের মতে "The Company has a pretty good hospital at Calcutta, where many go in to undergo the penance of physic, but few come out to give an account of its operatives."—Quoted in W.H. Carey's *Good Old Days of John Company*, Vol I, 3rd Ed, 1980, p. 328.

গোবিন্দপুরের খাজনা হ্রাস

গোবিন্দপুর (বর্তমান কেল্লার মাঠ, চৌরঙ্গীর একাংশ ও কেল্লার অধিকৃত স্থান) গ্রামের অধিবাসীরা কোম্পানির নিকট আবেদন করিয়াছে যে, তাহাদের গ্রামের জমিসমূহ সম্বন্ধে যে খাজনা ধার্য করা হইয়াছে তাহা বড় বেশী। এজন্য তাহা নিম্নলিখিত হারে কমাইয়া দেওয়া হউক।"

মোট জমির পরিমাণ		জমির বায়নাক্কা		প্রজারা যে হারে খাজনা দিতে স্বীকৃত
৫৭ বিঘা ৯ কাঠা	...	ভদ্রাসন বাটি	...	প্রতি বিঘা ২৲ কেহবা ২৷৹
৫১০ " ১১ "	...	ধানজমি	...	১৲ করিয়া বিঘা।
৩৫ " ১৪ "	...	সবজীক্ষেত্র	...	১৷৹ " "
২ " " "	...	পানের বোরজ	...	৩৲ " "
১৩৯ " ১৬ "	...	তামাকের চাষ	...	২৲ " "
৫৯ " ২ "	...	বাগান	...	১৷৹ " "
১২ " ৩ "	...	কলা বাগান	...	২৲ " "
৪ " ১০ "	...	বাঁশঝাড়	...	২৲ " "
১৮ " " "	...	তৃণপূর্ণ ভূমি	...	১৲ " "

(Con. 233)

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিবেন, কলিকাতার বর্তমান কেল্লা ও গড়ের মাঠের অধিকৃত স্থান, উল্লিখিত হারেই বিলি হইবার বন্দোবস্ত হয়। তিন টাকার ঊর্ধ্বে বিঘা বিলির ক্ষমতা কোম্পানির সনন্দে ছিল না। কিন্তু সেকালে তিন টাকা বিঘা খাজনা দিতেও লোকে আপত্তি করিত। উল্লিখিত তালিকা হইতে প্রমাণ হয়, ধানজমির পরিমাণই সর্বাপেক্ষা বেশী। তাহার নীচে তামাকের জমি। পানের বোরজের জমি মোটে দুই বিঘা কিন্তু তাহার খাজনা সর্বাপেক্ষা বেশী। সমস্ত গোবিন্দপুরে তখন মোটে ৫৭ বিঘা ৯ কাঠা ভদ্রাসন ছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, সুতালুটি ও কলিকাতা অঞ্চলেই লোকসংখ্যা কিছু বেশী ছিল।

জমিদারির আয় বৃদ্ধি

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের মে হইতে ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত, জমিদারির আয়-ব্যয় হইতে জানা যাইতেছে যে, সুতালুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামের জমিদারির আয়, এই এক বৎসরে ৫৭৫৬।/৬ বৃদ্ধি পাইয়াছে। *(Con. 250)*

এই আয়-বৃদ্ধি হইতেই প্রমাণ হয়, কলিকাতার পার্শ্ববর্তী বন-জঙ্গল কাটান হইয়া সেই সমস্ত জমি প্রজাবিলি হইতেছিল। এক বৎসরে তিনখানি ক্ষুদ্র গ্রামের পাঁচ হাজার টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি বড় সহজ কথা নহে। *(Con. 250)*

পাকা আস্তাবল

মাটিতে নির্মিত কোম্পানির যে সমস্ত আস্তাবলগুলি ছিল তাহা পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া কাউন্সিল হুকুম দিলেন যে, বক্সী আডামস্, একটি ইষ্টক-নির্মিত আস্তাবল নির্মাণ করিয়া দিবেন। এরূপভাবে এই আস্তাবল গৃহটি নির্মিত হইবে, যেন তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। সুবিধাকর স্থানেই ইহা নির্মিত হওয়া উচিত। *(Con. 257)*

মদের ভাণ্ডার খালি

যে জাহাজের কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য বিলাত হইতে মদ আসিতেছে, তাহা এখনও কলিকাতা বন্দরে আসিয়া পৌঁছায় নাই, অথচ কোম্পানির চিহ্নিত (Covenanted) কর্মচারীদের মদিরার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে। এজন্য কাউন্সিল আদেশ করিতেছেন, পারস্য হইতে যে মদিরা ও ফল আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাই তাঁহাদের মধ্যে বিতরণ করা হউক। *(Con. 257)*

সাহেব-চোরের নির্বাসন

হ্যান্স ফোর্ট, পিটার [illegible], সাইমন জ্যান্‌সেন্‌ ও জান্‌ এক্‌ নামক চারিজন সাহেব কলি-

কাতার মধ্যে অনেক চুরি করিতেছে, চোরদিগকে আশ্রয় দিয়াছে ও তাহাদের চোরাই-মালের বখ্‌রা লইয়াছে। এজন্য এই চারিজনকে 'হ্যারল্যান্ড' জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। জাহাজে তাহারা মেহনত করিয়া স্ব স্ব খোরাকি জোগাড় করিবে। *(Con. 286)*

লালদীঘির পঙ্কোদ্ধার

আমরা বিলাত হইতে আদেশ পাইয়াছি, কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্যোন্নতি করিবার জন্য, ইহার চারিদিকে ড্রেন করিয়া দিতে হইবে। আমাদের দুর্গের পূর্বদিকে যে পুষ্করিণী আছে তাহার আয়তন তত বিস্তৃত নহে। মার্চ এপ্রিল মাসে গঙ্গার জল খারাপ হয় ও তাহা ব্যবহার করা যায় না। এজন্য কোম্পানির কর্মচারিগণের উৎকৃষ্ট পানীয়-জলের ব্যবস্থার জন্য এই পুষ্করিণীটির আয়তন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কোম্পানি আমাদিগকে ড্রেনের উন্নতিকল্পে যে অর্থব্যয় করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেই অর্থের একাংশ এখন এই পুষ্করিণীর উন্নতির জন্য ব্যয়িত হউক। এজন্য বক্সীকে আদেশ করা যাইতেছে. যে তিনি এই পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও আয়তন বৃদ্ধি করিবেন। যে সমস্ত মাটি এই পুষ্করিণী হইতে উঠিবে তাহা কেল্লার বুরুজ নির্মাণের জন্য যে সমস্ত স্থানে খাত হইয়াছে, তাহাতে ফেলিয়া ভরাট করা হইবে। *(Con. 296)*

ব্ল্যাক-জমিদার নিয়োগ

ব্ল্যাক-জমিদারের পদ বহুদিন হইতে খালি পড়িয়া আছে। উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোক পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া আমরা এ পর্যন্ত কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। নন্দরাম ইতিপূর্বে এই কাজ করিয়াছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। কলিকাতা প্রভৃতি তিনখানি গ্রাম ও এতন্মধ্যস্থিত বাজারগুলির পরিদর্শন ও হিসাবপত্র রাখা এই 'ব্ল্যাক-জমিদারের' কাজ। সন্তোষ মল্লিক জামিন হওয়ায় আমরা রামভদ্রকে এই পদে নিযুক্ত করিলাম। রামভদ্র তাহার পূর্ববর্তী কর্মচারীদের ন্যায় বেতন পাইবে।

খোজা সরহদের ঋণ

খোজা সরহদ কোম্পানির অনেক টাকা ধার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা শোধ করিতে পারিতেছেন না। পাছে মালপত্র সরাইয়া দিয়া তিনি কোম্পানিকে ফাঁকি দেন, এইজন্য দুইজন বরকন্দাজকে তাঁহার বাটি চৌকি দিবার জন্য পাঠান হউক। তাঁহার অস্থাবর সম্পত্তি অনেক। এগুলি ক্রোক; হইলেও কোম্পানির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারে। *(Con. 312)*

এই খোজা সরহদ একজন নামজাদা আর্মানী সওদাগর। সম্রাট ফেরোকসিয়ারের দরবারে ইংরাজেরা যখন দূত প্রেরণ করেন, তখন এই খোজা সরহদই ইংরাজদের দ্বিভাষীরূপে সম্রাটের দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতায় প্রথম গির্জা

কোম্পানির পাদরী উইলিয়াম অ্যান্ডারসন সাহেব, কাউন্সিলকে জানাইয়াছেন যে, তিনি কোম্পানির নবনির্মিত গির্জাটি খুলিবার জন্য বিলাতের লর্ড বিশপের অনুমতিপত্র পাইয়াছেন। গির্জার নির্মাণ কার্যও শেষ হইয়া গিয়াছে। অনুমতি দেওয়া হইল, তিনি এ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজনীয়, তাহা করিতে সক্ষম রহিলেন।

এই গির্জাই কলিকাতার সেণ্ট এ্যান চার্চ। পাঠক, পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পার্শ্বে যে গির্জার ছবি দেখিতেছেন, তাহাই সেণ্ট এ্যান গির্জা। ইহার পূর্বে কলিকাতায় এরূপ চূড়াওয়ালা সাধারণ ভজনাগার ছিল না। 'সেণ্ট এ্যানের' নামে ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। ১৭৩০ সালের ঝড়ে এই গির্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।[১] আজকালকার রাইটার্স বিল্ডিংএর যে অংশে বঙ্গের ছোটলাটবাহাদুরগণের মন্ত্রণা-সভা গৃহ ছিল, সেকালের সেণ্ট এ্যান গির্জা সেই স্থানেই ছিল।

১. ইহা কলিকাতার প্রথম প্রেসিডেন্সী গির্জা; প্রতিষ্ঠাকাল ১৭০৯; চূড়া সমেত গির্জাটির নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছিল ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার চূড়াটি ১৭৩৭ সালের (১৭৩০ নয়) ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়।
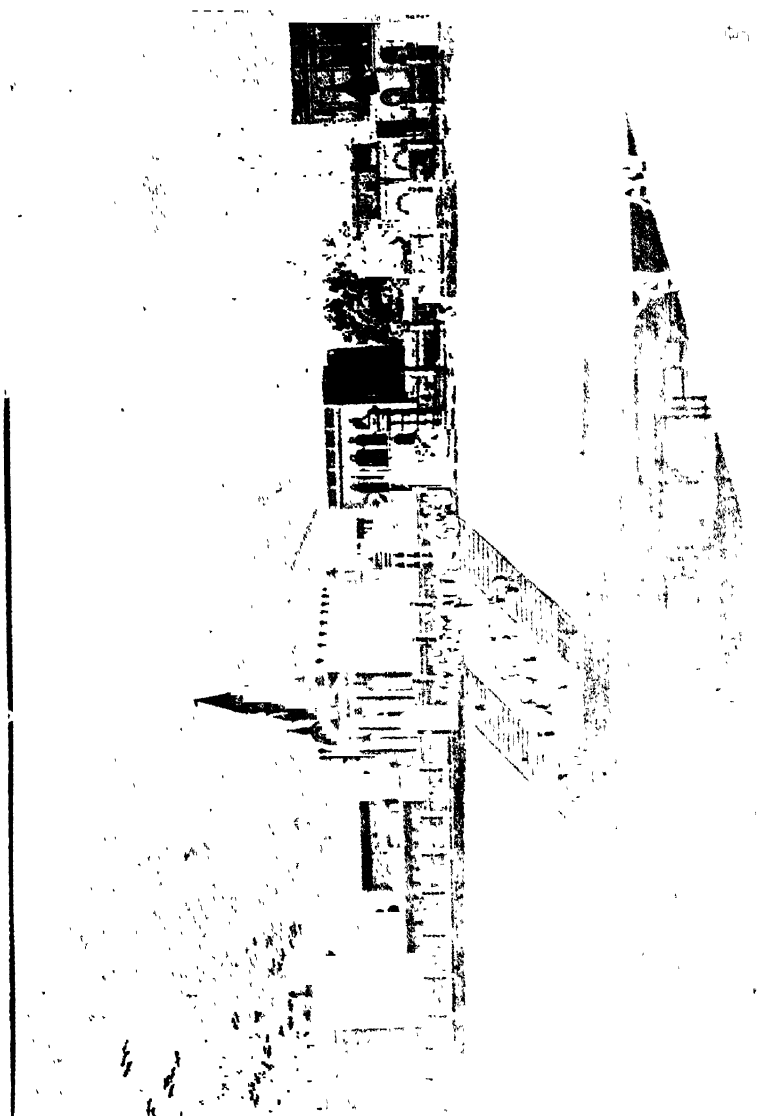
লালদীঘির দৃশ্য : ১৭৮৮ খ্রীঃ

ওল্ড কোর্ট হাউসের দৃশ্য : ১৭৮৪ খ্রী

প্রাচীন কলিকাতার সাধারণ দৃশ্য : ১৭৯৪ (বেইলির অনুকরণে)
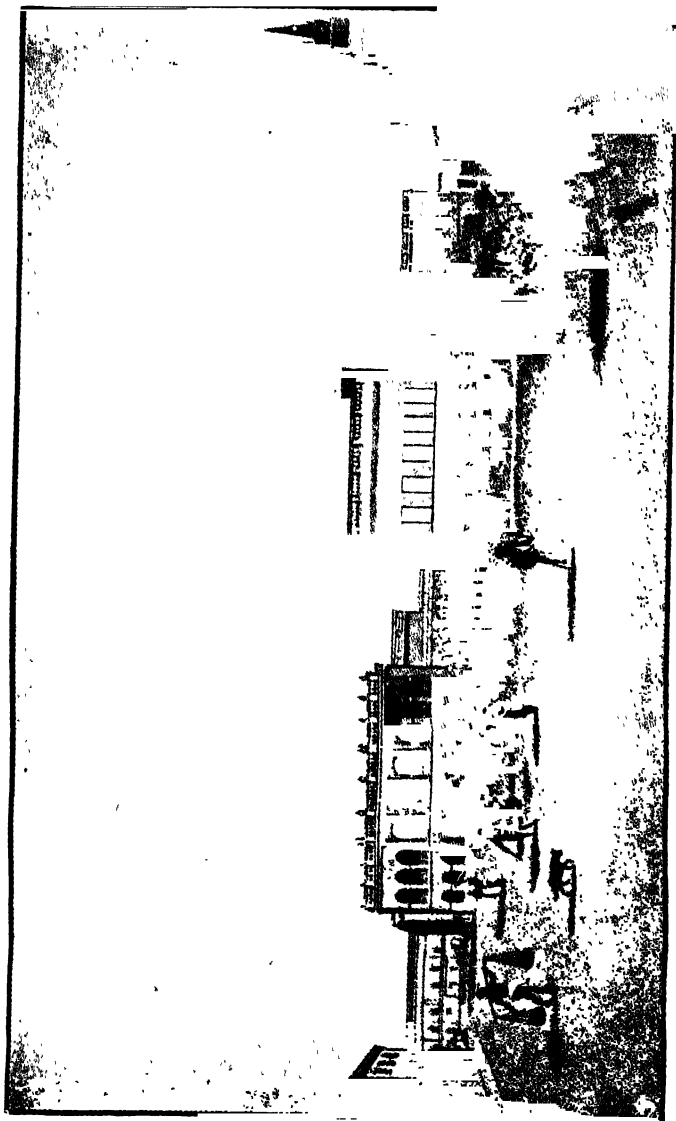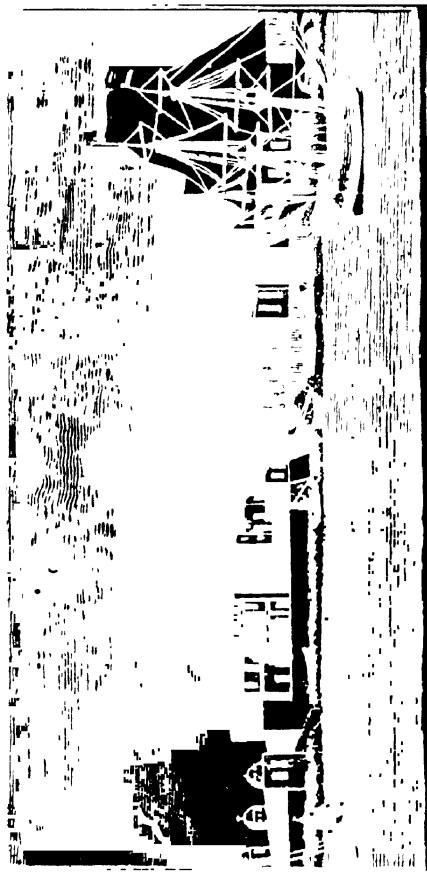
রামকৃষ্ণ শেঠের গৃহ. ১৭৫৬ খ্রী: শিল্পী : আঁম. এনগ্রেভার : কিচিন.

নন্দরামের গ্রেপ্তার

কোম্পানির ব্ল্যাক-জমিদার নন্দরাম তহবিল ভাঙ্গিয়া হুগলীতে পলাইয়া গিয়াছিল। আমরা হুগলীর ফৌজদারকে লেখায়, তিনি নন্দরামকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, "নন্দরাম যে কোম্পানির বিচারালয়কে ফাঁকি দিয়া এখানে আসিয়াছিল, আর তিনি এসব কথা না জানিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন, এজন্য তিনি অতি দুঃখিত।" যতদিন পর্যন্ত না নন্দরামের নিকাশী হিসাবপত্র পরীক্ষা হয়, ততদিন সে কারাগারে আবদ্ধ থাকিবে। আর কলিকাতার অধিবাসিগণকেও ঢেঁড়া-সহবতে জানান হউক যে, নন্দরামের জিনিসপত্র, মালামাল ও নগদ টাকাকড়ি যাহা কিছু তাহাদের নিকট হেপাজত আছে, তাহা যেন এই হিসাব পরিদর্শনের কার্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত নন্দরামকে দেওয়া না হয়। এই হিসাবপত্র দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, নন্দরাম কোম্পানির কি পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছেন। *(Con. 317)*

এই নন্দরাম কলিকাতার একজন 'ব্ল্যাক-জমিদার' ছিলেন। তিনি কোম্পানির তহবিল তছরূপ করিয়া হুগলীর ফৌজদারের আশ্রয় লয়েন। কলিকাতা-কাউন্সিল ফৌজদারকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া পত্র লেখায় তিনি নন্দরামকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের হস্তে অর্পণ করেন।

খোজা সরহদের দরখাস্ত

খোজা সরহদ আমাদের লিখিয়াছেন, "কোম্পানির প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাঁহার বাটিতে কোম্পানির সিপাহীকে চৌকি দিবার জন্য রাখায় তাঁহার অপমান ও হীনতা বোধ হইতেছে। তিনি কোম্পানির প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিতে প্রস্তুত।" হুকুম হইল যে, তাঁহার বাটি হইতে সিপাহী পাহারা তুলিয়া লওয়া হউক। *(Con. 327)*

ঘোড়া বিক্রয়

কোম্পানির আস্তাবলের তিনটি ঘোড়া একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য বক্সী সাহেবকে আদেশ দেওয়া গেল যে, তিনি প্রকাশ্য নিলামে ঘোড়া তিনটিকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন। *(Con. 312)*

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

এ বৎসর কলিকাতায় চাউল বড় মহার্ঘ হইয়াছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়েও চাউল দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে চাউল লইয়া যাইবার জন্য তিন খানি জাহাজ কলিকাতায় নঙ্গর করিয়া আছে। এরূপ অবস্থায় কলিকাতার গরীব অধিবাসীদের বিলক্ষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। এজন্য কোম্পানি বাহাদুর আদেশ প্রচার করিতেছেন যে, ব্যবসায়ীরা কলিকাতার মধ্যে চাউলের দর চড়াইতে পারিবে না। উৎকৃষ্ট চাউল টাকায় একমণ বিক্রীত হইবে। কেহ এই নির্দিষ্ট দরের ব্যতিক্রম করিলে তাহা কোম্পানি বাহাদুরের কর্মচারিগণের গোচরে আনা হইবে। কোম্পানির নিজের গুদামে ৫০০ মণ ভাল চাউল মজুত আছে। বক্সী সাহেবকে আদেশ করা হইল, তিনি উক্ত চাউল এক টাকা মণ হিসাবে সাধারণকে সুবিধাদরে বিক্রয় করিবেন। যে সকল মহাজন উচ্চ দরে চাউল বেচিবার আশায় আছে তাহাদের ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা হইবে। গরীব অধিবাসীরা যাহাতে কষ্ট না পায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। *(Con. 385)*

কোম্পানি বাহাদুর সেকালে তাঁহাদের প্রজাবর্গের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য কতদূর সচেষ্ট ছিলেন, তাহা উল্লিখিত ব্যবস্থা হইতেই জানিতে পারা যায়। তখন একটাকা করিয়া চাউলের মণ বিক্রীত হইত, তাহাতেই প্রজার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। আর এখন[১] সাড়ে সাত টাকা চাউলের মণ হইয়াছে, তাহাও গা-সহা ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে।

কলিকাতা-দুর্গের সম্মুখের জমি পরিষ্কার

দুর্গের চারিদিকেই অনেক ছোট ছোট গাছ জন্মিয়াছে। ইহার আশে পাশে অনেকগুলি চালাঘরও

১. স্বভাবতই লেখক এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশের কালকে অর্থাৎ ১৯১৫ কে 'এখন' বলিয়াছেন।

নির্মিত হইয়াছে। এগুলি পরিষ্কার করা বিশেষ প্রয়োজন, তাহা না হইলে দুর্গের অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যরক্ষা হওয়া অসম্ভব। এই স্থানগুলির চারিদিকে নালানর্দমা যেরূপ পঙ্কিল জলে পূর্ণ তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বাস্থ্যকর। এইজন্য আদেশ করা যাইতেছে যে, এই সমস্ত চালাঘর স্থানান্তরিত করিয়া দুর্গের চারিপাশ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক। চারিদিকে ড্রেন ও নর্দমা কাটান হউক। দুর্গের সম্মুখে যে পথটি গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হউক। বক্সীকে এ সম্বন্ধে যথাযথ হুকুম প্রদত্ত হইল। *(Con. 398)*

সম্ভবত এই স্থানটি বর্তমান ক্লাইভ স্ট্রীট (Clive Street) ও রাইটার্স বিল্ডিং-এর (Writers' Building) পার্শ্ববর্তী স্থান। দুইশত বৎসর পূর্বে ইহাই বা কি ছিল, আর এখনই বা কি হইয়াছে !

রন্ধনশালার ব্যবস্থা

কোম্পানি বাহাদুরের কর্মচারীদের খানা-ঘরের রূপার প্লেট ও বাসনগুলি পুরাতন ও অব্যবহার্য হইয়া পড়ায় আদেশ করা যাইতেছে যে, সেগুলি গলাইয়া তাহার পরিবর্তে নূতন বাসন প্রস্তুত করা হউক। *(Con. 399)*

ক্রীতদাসী আটকের মামলা

মিঃ আইসাক্ বার্কলি আমাদের কাছে নালিশ করিয়াছেন যে, কাপ্তেন পেটন তাঁহার ক্রীতদাসীকে অন্যায়রূপে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। কাপ্তেন পেটনকে তলব করিয়া এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলিলেন, "বার্কলি সাহেবও এইভাবে তাঁহার ক্রীতদাসীকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।" এই দুইজন ক্রীতদাসীর নাম বারবারা ও লুক্রেসিয়া। আদেশ করা যাইতেছে, তাঁহারা স্ব স্ব ক্রীত-দাসীদের প্রত্যর্পণ করিবেন। *(Con. 400)*

পুরাতন চাউল বিক্রয়

কোম্পানির গুদামে অনেক পুরাতন চাউল মজুত আছে। বেশীদিন থাকিলে এ চাউল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এজন্য বক্সী-সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে, তিনি টাকায় এক মণ দশ সের দরে এই সমস্ত পুরাতন চাউল গরীবদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলুন। নূতন চাউলের সময় আবার তাহা সঞ্চয় করা হইবে। *(Con. 401)*

'ঔরঙ্গজেব' জাহাজ

১৭১০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৭১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সমস্ত জাহাজের তালিকা পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সকলেরই নাম ইংরাজী, কিন্তু একখানি জাহাজের নাম ছিল 'ঔরঙ্গজেব'। এই জাহাজখানি বিলাত হইতে তিনবার এদেশে আসে। বঙ্গোপসাগর ও হুগলী নদী ইহার বাণিজ্যকেন্দ্রের গন্তব্য পথ। জাহাজে ৪৫০ টন মাল ধরিত ও জাহাজের অধ্যক্ষের নাম কাপ্তেন স্ট্রেসী। বলা বাহুল্য ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই জাহাজখানির এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

(List of Ships of The Hon'ble E.I.C).

দুর্ভিক্ষ ও প্রজার প্রতি কোম্পানির দয়া

১৭১১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে একটি মন্তব্যে প্রকাশ, "কয়েক মাস ধরিয়া বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে। অনেক লোকে চাউলের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। কলিকাতাতেও গরীব লোকদিগের অন্নাভাবে কষ্ট উপস্থিত হওয়ায় তাহারা জানাইয়াছে যে, খাজনা দিতে পারিবে না। কাউন্সিলের অধিবেশনে এই স্থির হইল যে, যতদিন পর্যন্ত না এ দুর্ভিক্ষের অবসান হয়, শস্য সুলভ হয়, ততদিন আমরা খাজনা লইব না। এই দুঃসময়ে গরীব প্রজাদের উপর খাজনার জন্য জুলুম করিলে তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইবে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, এ স্থানের গরীব অধিবাসী-দের পাঁচশত মণ চাউল বিতরণ করা হউক। বালেশ্বরে কোম্পানির অনেক চাউল মজুদ আছে।

'মেরী-বয়ার' জাহাজকে সেই চাউল আনিবার জন্য বালেশ্বরে পাঠাইয়া দেওয়া হউক।"

(*Con. 475*)

বাজার কলিকাতা

ইহাই সেকালের বড়বাজার। একালে যেমন প্রাসাদতুল্য দোকান-পসার লইয়া কলিকাতার গৌরব সেকালে এই বড়বাজার কোম্পানির আমলের প্রাচীন কলিকাতার গৌরবস্বরূপ ছিল। ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে জুন মাসের হিসাবপত্র হইতে জানিতে পারা যায়, বড়বাজারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল ও সেইজন্য কর্মচারীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হয়। পাঠক ইতিপূর্বে উদ্ধৃত বড়বাজারের বা 'বাজার কলিকাতার' হিসাবের সহিত নিম্নোদ্ধৃত হিসাবটি তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলেই, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

বাজার কলিকাতা

জুন, ১৭১১ খ্রীস্টাব্দ

আয়—		ব্যয়—	
বাড়ির খাজনা	১৫৭॥৵১১	৪ জন রাইটার বা লেখক	১২৲
কড়ির বাটা	॥৵০	৪ ,, গোমস্তা	৫৸০
চাউলের কুৎ	৫৬॥১০	কোতোয়াল	৬৲
মাগন	১৩৫৸৬	২০ জন পিয়ন	৪৩৲
টোলদার কয়াল ইত্যাদি	৪৪॥৵০	৮ জন পাইক	১২৲
নহলদারী	৬৵০	১ জন ঢোলওয়ালা	৸০
অন্যান্য জিনিসের শুল্ক	৬৮৶৮	৩ জন ভেরীবাদক	৩৲
কাষ্ঠ বিক্রয়	৮৵১১	হালালখোর (?)	৸০
কুম্ভকার দ্রব্য	।/১০	গোলদার	২৲
জেলিয়ার নিকট আদায়	১॥/২	৫ জন লেখক	৯॥০
কালাপাতিওয়ালা	৩৮।৬	৩ জন পাইক	২॥০
অগ্রদানী-বামন	২॥৪	১ জন দারোগা	৫৲
বেনিয়ান	৸৶০	১ জন লেখক	৩৲
বাড়ি বিক্রয়	২॥৵৴	২ জন টোলদার করালি	৫৲
সেলামি	৩॥৵৯	২ জন পিয়ন	৩॥০
ঋণ-আদায়	১০,৬		
এত্লাক্	১৪/২		
বিবাহ খাতে	৯।৶১১		
জরিমানা খাতে	২৪৸৵৮		
ক্রীতদাস	১০৩/১		
মদত	৫৬৲		

পূর্বোল্লিখিত হিসাবটি কলিকাতা বড়বাজারের। কলিকাতা বড়বাজার হইতে কিরূপভাবে আয় হইত, তাহা উল্লিখিত হিসাব হইতেই প্রমাণিত হয়। পাঠক দেখিতে পাইবেন, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ-দেরও[১] ব্যবসা চালাইবার জন্য শুল্কাদি দিতে হইত। জেলিয়ারা পুকুর জমা লইত, তজ্জন্য তাহা-দের খাজনা দিতে হইত। কেহ বাড়ি ঘর বিক্রয় করিলে কোম্পানি সেই বিক্রেয় অর্থের উপর কিছু শুল্ক আদায় করিতেন। এতদ্ভিন্ন বিবাহ খাতে ক্রীতদাস-ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে, জরিমানা প্রভৃতি বাবতেও অনেক টাকা আদায় হইত। আমরা উপরে কেবলমাত্র বাজার কলিকাতার আয়-ব্যয়ের হিসাব তুলিয়াছি। সুতানুটি, কলিকাতা, সন্তোষবাজার প্রভৃতির কথা বলি নাই।

---

১. অগ্রদানী ব্রাহ্মণ শব্দটি ইংরাজীতে (Agardany Baman) এইরূপ ভাবে লেখা আছে।

প্রাচীন কলিকাতায় হাটবাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৭১১ খৃষ্টাব্দের আয়-ব্যয়ের হিসাব হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতায় 'বাজার কলিকাতা' ছাড়া 'সন্তোষবাজার' 'মণ্ডীবাজার' ও 'লালবাজারের' নামোল্লেখ আছে। ইহার পূর্বে সন্তোষবাজার ও মণ্ডীবাজারের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু 'লালবাজারের' নাম পাওয়া যায় না। পলাশীযুদ্ধের পর কলিকাতায় বাজারসংখ্যা খুব বৃদ্ধি পায়। পাঠক পরে ইহাদের তালিকা দেখিতে পাইবেন।

সেকালের হাসপাতালের আইন

পাঠক পূর্বেই দেখিয়াছেন প্রাচীন কলিকাতায় কিরূপে প্রথম ইউরোপীয়ান হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে এই হাসপাতালের অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। উক্ত বৎসরের আগস্ট মাসের একটি মন্তব্য হইতে প্রকাশ যে, কর্তারা হাসপাতালে রোগীদের জন্য ৩০ খানা তক্তাপোষ, ত্রিশ সেট্ বিছানা, ২০ টি পরিবার ঢিলা পোষাক দিবার আদেশ করেন। সে সময়ে হাসপাতাল সম্বন্ধে যে কয়েকটি বিধান প্রচলিত ছিল আজকালকার দিনে তাহা কৌতুহলোদ্দীপক হইতে পারে। প্রথম বিধান : যে সমস্ত সৈনিক অবিবাহিত, পীড়া হইলেই তাহাদের হাসপাতালে থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় : প্রত্যেক সৈনিককে খোরাকির ব্যয় নির্বাহার্থে প্রতিদিন চারি আনা করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক করপোরাল দৈনিক ছয় আনা ও প্রত্যেক সারজেণ্ট দৈনিক আট আনা হিসাবে খোরাকির খরচ দিবেন। তৃতীয় : যাহাতে পীড়িতব্যক্তি স্থানান্তরে যাইতে না পারে তজ্জন্য একজন গোরা-সৈনিক পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইবে। চতুর্থ : যাহাতে বাহির হইতে কোনরূপ উত্তেজক মদিরা রোগীদের দ্বারা গুপ্তভাবে আনীত না হয়, তাহাও ইহার দেখা কর্তব্য। পঞ্চম : হাসপাতালের রোগীদের প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদাদি জোগাইবার জন্য ত্রিশ টাকা বেতনে একজন স্টিউয়ার্ড নিযুক্ত করা হইল। এই স্টিউয়ার্ড জ্বালানি কাঠ ও তৈলের জন্য স্বতন্ত্র ভাতা পাইবে না। *(Con. 777)*

পাঠক! এই দুইশত বৎসর পরে প্রাসাদমালা-শোভিত বর্তমান জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থার সহিত দুইশত বৎসর পূর্বের এই সাধারণ চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থাটি একবার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন।

ফার্সী-লেখার খরচা

আমরা বাদসাহ ফেরোকসিয়ারকে যে পৃথিবীর মানচিত্র উপহার দিব সংকল্প করিয়াছি, তাহার মধ্যস্থিত নামগুলি ফার্সীতে লিখিবার জন্য মির্জা ইব্রাহিমকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সে এক-মাস পরিশ্রমের পর তাহার এই কার্যটি শেষ করিয়াছে। এজন্য তাহার পারিশ্রমিক স্বরূপ নগদ একশত টাকা ও একশত টাকা মূল্যের বনাত দিবার আদেশ করা গেল। *(Con. 811)*

পৃথিবীর-মানচিত্র

বাদসাহ ফেরোকসিয়ারকে উপহার দিবার জন্য স্বর্ণরঞ্জিত ও বিবিধবর্ণে চিত্রিত যে মানচিত্র মিঃ জন বরনেলকে চিত্রণ করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহা অতি সুন্দররূপে শেষ করিয়াছেন। স্থানের নামগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যাক্ষরে ফার্সীতেই লেখা হইয়াছে। লেখাগুলি এত সুন্দর যে আমরা আশা করি, মোগল বাদসাহ ম্যাপখানি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন। এই ম্যাপ প্রস্তুতের জন্য বরনেল্ সাহেব যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, তিনি এই পরিশ্রমের জন্য নগদ দুইশত টাকা পুরস্কার পাইবেন। আর আমরা তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিতেছি। 'কিং উইলিয়াম' জাহাজে তিনি বিনা ব্যয়ে বিলাতে যাইতে পারিবেন। (এই জাহাজের ভাড়া প্রতি ব্যক্তির জন্য ১২ পাউণ্ড বা ১৮০ টাকা ছিল।)

ধরিতে গেলে পৃথিবীর এই ম্যাপখানির জন্য কোম্পানির চারিশত টাকা খরচা পড়িয়াছিল। ইংরাজি নাম থাকিলে বাদশাহ বুঝিতে পারিবেন না, এইজন্য [illegible] নাম, ফার্সীতে লিখিবার

জন্য একজন এদেশীয় মুসলমান মির্জা ইব্রাহিমকে নিযুক্ত করা হয়। মির্জা ইব্রাহিম নামগুলি ফার্সীতে লিখিয়া দিলে বরনেল, তাহা সোনা ও রূপার জলে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেন। এই ম্যাপখানির চিত্রণ-খরচা প্রায় পাঁচশত টাকা পড়িয়াছিল।

বাদসাহী ঘড়ি মেরামত

আমরা মোগল-বাদসাহকে যে সমস্ত ঘড়ি উপহার দিব মনস্থ করিয়াছি, কলিকাতা হইতে আগরা যাইবার এই সুদীর্ঘ পথে সেগুলির কল খারাপ হইয়া যাইতে পারে, বা সেগুলি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। এইজন্য এই ঘড়িগুলির মেরামতি ও হেপাজতি কার্যের জন্য মিঃ গে উডকে নিযুক্ত করা হইল। গে উড সাহেব আগরায় উপস্থিত হইয়া ঘড়িগুলিকে একবার উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিলে উহা মোগল-বাদসাহকে উপহার দেওয়া হইবে। তিনি এই কার্যের জন্য মাসিক ৩০ টাকা বেতন পাইবেন। তাঁহার আবশ্যকীয় জিনিস পত্রাদি খরিদ করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে পাঁচ মাসের বেতন অগ্রিম দিলাম। *(Con. 834)*

সহকারী ডাক্তার সাহেবের পাল্কি

কোম্পানির সহকারী ডাক্তার সাহেবকে পদব্রজে নানাস্থানে রোগী দেখিতে হয়। সম্মুখেই প্রখর গ্রীষ্মকাল। তাহার পরেই বঙ্গদেশের বর্ষা। এইজন্য আদেশ করা যাইতেছে, সহকারী ডাক্তার সাহেবের ব্যবহারের জন্য একখানি পাল্কি দেওয়া হউক। তিনি ৪ জন গোয়ালার (পাল্কিবাহক) বেতনরূপে মাসিক আট টাকা সরকার হইতে পাইবেন।

এখন সরকারি ডাক্তার সাহেবেরা মোটর চড়িয়া সহরের নানাস্থানে চিকিৎসা করেন, কিন্তু পুরাকালের এই সরকারি ডাক্তার সাহেব চারিটি বেহারা ও একখানি পাল্কি পাইয়াই চরিতার্থ হইয়াছিলেন। *(Con. 835)*

ঘনশ্যামের কর্মচ্যুতি

বক্সী সাহেবের বেনিয়ান ঘনশ্যাম বিশ্বাসঘাতকতা করায় আমরা তাহাকে পদচ্যুত করিলাম। ঘনশ্যামের স্থানে রামচাঁদ নিযুক্ত হইল। অনন্তরাম এই কলিকাতা সহরের মধ্যে একজন অবস্থাপন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি এই নবনিযুক্ত রামচাঁদের জামিন রহিলেন। *(Con. 839)*

পুরাতন রৌপ্য বিক্রয়

কোম্পানির কর্মচারিগণের ব্যবহার্য তিন খানি পুরাতন পালকির গায়ে যে রূপার পাত বসান ছিল তাহা খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এ পাল্কিগুলির পরিবর্তে নূতন পালকি প্রস্তুত করা হইবে। আদেশ করা গেল, রূপার পাতগুলি গলাইয়া ওজন করিয়া তাহা বিক্রয় করা হইবে।

সেকালে কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা পাল্কি ব্যবহার করিতেন। প্রত্যেক প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্রের কুঠির বড় সাহেবের ব্যবহারের জন্য, এইরূপ রূপার পাতমোড়া পাল্কি দেওয়া হইত। কাশিমবাজারের তদানিন্তন অধ্যক্ষ ফিক সাহেবের একখানি রূপার পাতমোড়া পাল্কি ছিল, তাহার মূল্য পাঁচশত টাকা। সেকালের পালকির বেহারাদের বেতনও খুব সস্তা ছিল। মাসিক দুই টাকা বেতনে একটি বেহারা মিলিত। *(Con. 950)*

গোঁসাই ঠাকুরের বিধবা

গতকল্য আমরা কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ ফিকের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছি। সে পত্রে লেখা আছে, "নবাব মুরশিদকুলি খাঁ শুনিয়াছেন যে, হরিরাম গোঁসাই[১] নামক একজন নিঃসন্তান হিন্দু পুরোহিতের কলিকাতায় মৃত্যু হইয়াছে। তাহার অনেক টাকাকড়ি আছে। নিঃসন্তানের ও উত্তরাধিকারীবিহীন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি মোগল সাম্রাজ্যের আইন অনুসারে বাদসাহের দখলে আসিবে। এজন্য আপনারা মৃত ব্যক্তির বিধবাকে নবাব সমীপে পাঠাইয়া দিবেন।"

১. সেরেস্তায় এই নামের বানান আছে Horram Gussoy.

এই বিধবা ব্রাহ্মণী বারাণসী শেঠের গুরুপত্নী। আমরা বারাণসী শেঠকে ডাকাইয়া তদন্ত করায় জানিতে পারিলাম যে মৃত পুরোহিতের কোন সম্পত্তি তাহার স্ত্রীর বা তাহার ভ্রাতৃগণের নিকট নাই। বারাণসী বলিল, "নবাব যদি এজন্য আপনাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করেন, এই হেতু আপনারা নবাবকে লিখুন যে, এই পুরোহিতের বিধবা পত্নী যাহাতে স্থানান্তরে না পলাইতে পারে, তজ্জন্য আমি দায়ী রহিলাম। নবাবের প্রয়োজন হইলেই আমি এই বিধবাকে নবাব দরবারে হাজির করিব।" *(Con. 984)*

ইহার পরদিন কাউন্সিলে পুনরায় হিন্দু পুরোহিতের বিধবাকে নবাব সরকারে প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। বারাণসী শেঠ, গোপাল শেঠ, যদু শেঠ, বিষ্ণুদাস শেঠ প্রভৃতিকে এই দিনে তলব করা হয়। মৃত পুরোহিতের জ্ঞাতিগণ, অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ গোঁসাই, রঘুরাম গোঁসাই, নন্দকিশোর গোঁসাই, ঘনশ্যাম গোঁসাই প্রভৃতিকেও এ ক্ষেত্রে আনান হয়। তাঁহাদের অন্য দুইজন জ্ঞাতি. অভিরাম গোস্বামী ও রঘুনন্দন গোস্বামী, নবাবদরবারে এই বিধবার সম্পত্তি সম্বন্ধে নালিশবন্দী হওয়াতেই এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা গোঁসাই ঠাকুরদের নানারূপ প্রশ্ন করায়, তাঁহারা বলিলেন, "যত শীঘ্র পারেন, তাঁহারা মুরশিদাবাদে গিয়া অভিরাম ও রঘুনন্দনের সহিত আপোসে এই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইবেন। যদি এ মীমাংসা শেষ না হয়, তাহা হইলে বারাণসী, যদু, গোপাল ও বিষ্ণুদাস প্রভৃতি শেঠগণ এই বিধবা ব্রাহ্মণরমণীর জামিনস্বরূপ রহিলেন। যাহাতে সে অন্য কোথাও পলাইয়া না যায় বা নবাবের হুকুমপ্রাপ্তিমাত্রেই তাহাকে মুরশিদাবাদে উপস্থিত করা হয়, তজ্জন্য তাঁহারা দায়ী রহিলেন।"

উল্লিখিত ঘটনা হইতে এইটুকু প্রমাণ হয় যে অভিরাম গোস্বামী প্রভৃতি দায়াদগণ মৃত গোঁসায়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ না পাইয়া নবাব দরবারে গিয়া জানায় যে হরিরামের বিধবার প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, অথচ তাহার সন্তানাদি নাই। তাঁহাদের নিকট এই গুপ্তসংবাদ পাইয়াই নবাব মুরশিদকুলি খাঁ বিধবাকে তলব করেন। কারণ, সেকালের সন্তানহীনা অবীরার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত ও বিধবা জীবনাবধি খোরাক পোষাক পাইত। শেঠদিগের এই বিধবার হইয়া লড়িবার কারণ বোধ হয় মৃত গোঁসাই ঠাকুর তাহাদের পুরোহিত বা গুরু ছিলেন। শেঠদিগের গোবিন্দজী ঠাকুর ও দেবালয় তখনকার কলিকাতার বিশেষ গণনীয় ব্যাপার। এই বিধবাকে পরিশেষে নবাব দরবারে হাজির হইতে হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

কোম্পানির নূতন দালাল হরিনাথ

সেকালে যাঁহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দালালি করিতেন তাঁহারা বিশেষ যোগ্যপন্ন বা বড়-মানুষ ছিলেন। কোম্পানির পক্ষ হইতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করাই তাঁহাদের কার্য ছিল। দালালেরা সামান্য বেতন পাইতেন বটে, সেটা কেবল কোম্পানির চাকর বলিয়া চিহ্নিত হইবার জন্য। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের দালালিতেই তাঁহাদের উদরপূর্ণ হইত। উপযুক্ত লোক ভিন্ন এই পদ পাইতেন না। কারণ, আমরা কোম্পানির সেরেস্তার কোনও মন্তব্য হইতে জানিতে পারি, "আমাদের ভূতপূর্ব দালাল রামকৃষ্ণ খাঁর মৃত্যুর পর হইতে এ পর্যন্ত কাহাকে এ পদ দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এখন মালামাল খরিদের ও মূল্য নির্ধারণের সময় অগ্রবর্তী হইয়া আসিতেছে। এজন্য একজন দালাল নিয়োগ না করিলেই নয়। এইজন্য আমরা সকলে একমত হইয়া হরিনাথকে কোম্পানির দালালরূপে নিযুক্ত করিলাম। *(Con. 989)*

এই নিয়োগের একটা ছোটখাট Ceremony বা উৎসব ছিল। কারণ উক্ত মন্তব্যে লিখিত আছে, "আমরা কোম্পানির কর্মচারিগণকে ও নবনিযুক্ত দালালকে আহ্বান করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় কর্তব্য তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম। প্রথমত নবনিযুক্ত দালালকে একটি শিরোপা ও এক বোতল গোলাপজল ও পান দিয়া সম্বর্ধনা করা হইল। *(Con. 990)*

ডাক্তার হ্যামিল্টনের উইল

সম্রাট ফেরোকসিয়ারের নিকট ইংরাজেরা যে দৌত্যাভিযান প্রেরণ করেন, তাহার সহিত কোম্পানির বেতনভোগী চিকিৎসক হ্যামিল্টন সাহেবও দিল্লী গিয়াছিলেন। সম্রাটের কঠিন পীড়া আরোগ্য করিয়া তিনি কিরূপে তাঁহার অনুগ্রহভাজন হন, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই হ্যামিল্টনের মৃত্যু হয়।[১] কলিকাতার সেন্ট জন গির্জায় তাঁহার সমাধি এখনও বর্তমান। এই হ্যামিল্টনের উইলের সারমর্ম আমরা পাঠকগণকে জানাইতেছি।—

১। আমি আমার প্রিয়বন্ধু জেমস্ উইলিয়ামসনকে (ইনি পরে কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হন) পাঁচ হাজার পাউন্ড দান করিলাম।

২। মিঃ এডওয়ার্ড স্টিভেনসনকে পাঁচ শত টাকা ও একটি হীরক অঙ্গুরীয় দিলাম।

৩। মিঃ বারকারকে কুড়ি পাউন্ড ও একটি হীরার আংটি দিলাম।

৪। ফিলিপকে কুড়ি পাউন্ড ও একটি হীরার আংটি দিলাম।

৫। বঙ্গদেশের গির্জার ফণ্ডে একহাজার টাকা দিলাম।

৬। উল্লিখিত দানসমূহ ব্যতীত আমার যে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকা ও ধনরত্নাদি রহিল, তাহা আমি আমার বিলাতবাসী পিতা জন হ্যামিল্টনকে দিলাম। তিনি তাঁহার মৃত্যুকালে আমার সহোদর ও সহোদরাগণকে তাহা সমাংশে ভাগ করিয়া দিবেন।

৭। আমার খুড়তুতো ভগ্নী অ্যাশ হ্যামিল্টন, যিনি এখন বিলাতে আছেন, তাঁহাকে পাঁচ শত পাউণ্ড দিলাম।

৮। আমি মিঃ সর্মানকে আমার ট্রাস্টি নিযুক্ত করিলাম। সম্রাট ফেরোকসিয়ার আমাকে যে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরী ও মণিখচিত কল্গাটি দিয়াছিলেন তাহা আমি এই সর্মান সাহেবকে দান করিলাম।

ইহাই আমার শেষ উইল। সূর্যগড়ে, নদীবক্ষে বোটের উপর বসিয়া আমি এই উইল লিখিলাম। এখানে স্ট্যাম্প কাগজ পাওয়া যাইবে না বলিয়া সাদা কাগজেই উইল লেখা হইল।

সম্ভবত দিল্লী হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনের পথে নদীবক্ষে বসিয়া হ্যামিল্টন তাঁহার শেষ ইচ্ছাপত্র প্রস্তুত করেন। উল্লিখিত উইল হইতে জানা যায়, তিনি সম্রাটের নিকট হইতে যে সমস্ত বহুমূল্য অঙ্গুরীয়কাদি পাইয়াছিলেন, তাহার সবই বন্ধুবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া যান।

১৭০৪ হইতে ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তায় সেকালের কলিকাতা সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পূর্বের কয়েক পৃষ্ঠায় বলা হইল। যে সকল প্রসঙ্গ পাঠকের চিত্তরুচিকর হইবে, তাহাই বাছিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এগুলি এপর্যন্ত বঙ্গভাষায় অপ্রকাশিত ছিল এগুলি হইতে পাঠক কোম্পানি বাহাদুরের জমিদারি আয়-ব্যয়, সেকালের কার্যপ্রণালী ও অন্যান্য ব্যাপারের বিবিধ তথ্য অবগত হইবেন। প্রত্যেক বিষয়ের শেষে ইংরাজি অক্ষরে যে সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা কোম্পানির সেরেস্তার মন্তব্যের সংখ্যা।

ইতিপূর্বে আমরা কোম্পানি বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তা হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিয়া নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলের কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারির কথা, অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার কথা, পুলিস ও ফৌজদারির কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। এইবার সেকালের কলিকাতা সহরের অবস্থা, সেকালের ইংরাজদের সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া এ প্রস্তাব শেষ করিব।

---

১. উইলিয়াম হ্যামিল্টনের মৃত্যুর তারিখ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর।

পাঠক! একবার লেখকের সঙ্গে বর্তমান গ্যাস্‌মালা-শোভিত প্রস্তর রেলিং বেষ্টিত লাল-দীঘির মধ্যে প্রবেশ করুন। লালদীঘিকেই মধ্য-কেন্দ্র করিয়া সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতাকে কল্পনার চক্ষে দেখিতে হইবে। লালদীঘি বহুকালের। চার্নকের কলিকাতায় আসিবার বহু পূর্বে ইহা বর্তমান ছিল, তবে বর্তমান অবস্থায় নহে। পূর্বে বলিয়াছি যে ইহার পার্শ্বে মজুমদারদের কাছারি বাড়ি ছিল। এই মজুমদার-জমিদারগণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল হইতে পাইকান, বোরো ও আমিরাবাদ পরগনার জমিদার। বড়িশার বর্তমান সাবর্ণ-চৌধুরীরাই ইহাদের বংশধর। সুতালুটি কলিকাতা প্রভৃতি গ্রাম এই মজুমদারেরাই কোম্পানি বাহাদুরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইহাই কোম্পানি বাহাদুরের প্রথম ভূসম্পত্তি, ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যলক্ষ্মী ও এই বিশাল ব্রিটিশ-ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্বসূচনা। এই জমিদারি চালাইবার জন্য, হাট-বাজার পত্তনের জন্য, প্রজাকে পাট্টা দিবার জন্য সেই অতীতকালের জঙ্গল-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কলিকাতা সহরের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য, নগরের পথঘাটের উন্নতি করিবার জন্য, একজন ইংরাজ কর্মচারি নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ইনিই কলিকাতার জমিদার। এই সাহেব-জমিদার কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। আবার অন্যপক্ষে, তিনি কাউন্সিলের অধীনস্থ ভৃত্য। কলিকাতার আয়-ব্যয়, জরিপ জমাবন্দী, রাস্তাঘাট, দাঙ্গা-হাঙ্গাম, আইন আদালত, সবই এই জমিদারের হাতে ছিল। জমিদার আয়-ব্যয়ের মাসিক ও সালতামামি হিসাব কাউন্সিলকে দিতেন।

এই লালদীঘি এক সময়ে অতীব পঙ্কিল ও শৈবালাচ্ছাদিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। তখন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে ও ক্ষুদ্র সহর কলিকাতার আশেপাশে অনেক ইংরাজ বসবাস করিতেন। ছোট ছোট পুকুর ও খাত সহরের আশেপাশে থাকিলেও বিশুদ্ধ পানীয় সংগ্রহের বড়ই কষ্ট হইত। গঙ্গার জল সকল সময়ে ব্যবহার করা চলিত না। এইজন্য কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবস্থাকল্পে এই পঙ্কিল লালদীঘির ১৭০৯ খৃীস্টাব্দে পঙ্কোদ্ধার করান হয়। ইহার চারিপাশে পথঘাট করিয়া দেওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে সবজী-বাগানও করা হয়। এই সবজী-বাগানের অনেক ফলমূল. কোম্পানির কর্মচারীদের উদরপোষণ করিত। সন্ধ্যার পর ইহা তাঁহাদের সান্ধ্য বায়ুসেবনের স্থান ছিল। ইহার পরিষ্কার জলে তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ হইত। কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, লালদীঘির এ বাগানে কমলালেবুর গাছ পর্যন্ত পোঁতা হইয়াছিল।

এইবার পাঠক এই লালদীঘির মধ্য হইতে বর্তমান জেনারেল পোস্টাফিস ও কলেক্টরি আফিসের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখুন। বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীট ও ফেয়ারলি প্লেসের মধ্যে এখন জেনারেল পোস্টাফিস বা কলিকাতার বড় ডাকঘর, তাহার পাশে কলেক্টরি আফিস, তৎ-পার্শ্বে কাস্টম-হাউস ও সর্বশেষে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির প্রাসাদতুল্য কার্যালয়। তৎপরেই ফেয়ারলি প্লেস। বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীট ও ফেয়ারলি প্লেসের অধিকৃত সীমার মধ্যেই কলিকাতার প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত ছিল। ইহাই ১৭৫৬ খৃীস্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

এই দুর্গের মধ্যে কোম্পানির মালগুদাম, কার্যালয়, গবর্ণর সাহেবের বাটি, সেনাদের থাকিবার স্থান ছিল। এই দুর্গের মধ্যে গবর্ণর সাহেবের বাটিটিই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও সুন্দর ছিল। তথাচ যুক্ত-কোম্পানির অধ্যক্ষ স্যর এডওয়ার্ড লিটলটন এই সুন্দর বাড়ি পছন্দ না করিয়া, দুর্গের বাহিরে একটি স্বতন্ত্র বাটিতে থাকিবার ব্যবস্থা করেন। দুর্গের আশেপাশে, দূরে-অদূরে অনেক ইংরাজ বাস করিতেন। বর্তমান প্রিন্সেপ-ঘাটের অদূরে, খিদিরপুরের নিকট সর্মান সাহেবের[১] বাটি ছিল। দুর্গের আশেপাশে বামে দক্ষিণে, গঙ্গার ধারে, লালবাজার প্রভৃতি

১. John Surman—ইনি বাণিজ্যিক অধিকার লাভের আশায় বাদসাহ ফেরোকসিয়ারের দরবারে প্রেরিত ইংরাজ কোম্পানির দৌত্যের নেতা ছিলেন।

স্থানেও সাহেবেরা কার্যোপলক্ষে স্বতন্ত্র কুঠিতে বাস করিতেন।

সহরের দেশীয় অংশে অনেক বাঙ্গালী লম্বা-চওড়া বাস্তুভিটা করিয়া বাস করিতেন। এ সকল বাড়ির চারিদিকে প্রাচীর ও মধ্যে পুষ্করিণী ও বাগান ইত্যাদি ছিল। অনেকে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত, জমি ঘিরিয়া লইয়া পাঁচিল দিয়া আবাসবাটি প্রস্তুত করিত। কোম্পানি-বাহাদুর যখন দেখিলেন যে, কলিকাতার মধ্যে দেশীয়দের খনিত পুষ্করিণীর সংখ্যা দিন দিন বেশী হইয়া উঠিতেছে, আর তাহারা বিনা জরিপে ইচ্ছামত জমি লইয়া বাস করিতেছে, তখন তাঁহারা ইহার প্রতিকারার্থে বদ্ধপরিকর হন। এইজন্য দুই তিনবার সহর কলিকাতা জরিপের বন্দোবস্তও হয়। ঢোল-সহবতে নোটিশ প্রচার করিয়া কোম্পানি বাহাদুর সাধারণকে জানাইয়া দেন, "এরূপ অন্যায়ভাবে জমি দখল করিয়া ভদ্রাসন নির্মাণ করিতে তোমরা আর পারিবে না। তোমাদিগকে জমিদারের নিকট হইতে দস্তুর মত পাট্টা লইতে হইবে। তাহাতে জমির পরিমাণ ও খাজনার হার নির্দিষ্ট থাকিবে। প্রয়োজন হইলেই জমিদার সাহেব এই পাট্টা তলব ও তজবিজ করিতে পারিবেন।" তখনকার পাট্টা কিরূপ ছিল, তাহার বাঙ্গলা ও ইংরাজি নমুনা আমরা ইতিপূর্বে দিয়াছি।

আজকাল যাহা 'স্ট্রাণ্ড রোড' (Strand Road) বলিয়া পরিচিত, যাহার উপর এখন ট্রাম চলিতেছে, তাহা তখন নদীগর্ভে ছিল। ভাগীরথীর স্রোত আসিয়া তখন পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গপ্রাকার চুম্বন করিত। নদীর কিনারা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার প্রমাণ এখনও আছে। নদীকূলের যে ঘাট দিয়া সিরাজের সেনারা দুর্গ-প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার চিহ্নও লর্ড কার্জন বাহাদুরের চেষ্টায় সুরক্ষিত। পাঠক রেলওয়ে আফিসের মধ্যের উঠানে প্রবেশ করিলেই ইহা দেখিতে পাইবেন।

আজকাল যেখানে বড়বাজারের পানপোস্তা, রাজার চক্ প্রভৃতি বর্তমান, তাহাও নদীগর্ভে ছিল। হিন্দু ব্যবসায়ীরা নৌকায় করিয়া মাল আনিয়া বড়বাজারের নঙ্গরেশ্বর ঘাটে নৌকা ও ডিঙ্গি ভিড়াইত।

বর্তমান কয়লাঘাট ও চাঁদপাল ঘাটের মধ্যবর্তী স্থানে, একটি খাল ছিল। এইখালে বড় বড় নৌকা যাইতে পারিত। আজকাল যাহা হেস্টিংস স্ট্রীট (Hasting's Street) বলিয়া প্রখ্যাত, যাহার আশেপাশে প্রাসাদতুল্য বাড়ি, সরকারি আফিস, সেই রাস্তা খালের গর্ভে ছিল।

এই খাল বরাবর মাঠের ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া ক্রিক্ রো (Creek Row) ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার (Wellington Square) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার পর বেলিয়াঘাটার মধ্য দিয়া আরো কিছুদূর গিয়া ইহা ধাপা বা Salt Water Lake-এর সহিত মিশিয়াছিল। এই খালের দুই দিকেই পঙ্কিল নালা-নর্দমা, দুই ধারে জঙ্গল ও বড় বড় গাছ ছিল। হেস্টিংস স্ট্রীটে যে স্থানে এখন সেণ্ট জন গির্জা বর্তমান, তাহার পার্শ্বেই কলিকাতার পুরাকালের গোরস্থান ছিল। এই সমাধিক্ষেত্রে এখনও কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক, কলিকাতায় দুর্গ-প্রতিষ্ঠাকারী স্যার জন গোল্ডস্‌বরা, কোম্পানির চিকিৎসক স্বনামখ্যাত ডাক্তার হ্যামিল্টন প্রভৃতি সেকালের অনেক লোকের সমাধি আজও বর্তমান। তখন বর্তমান সেণ্ট জন গির্জা নির্মিত হয় নাই। এই স্থানের এক অংশে সমাধিক্ষেত্র ও অন্য অংশে কোম্পানির এক হাসপাতাল ছিল।

এই খালের আশেপাশে ঝোপ, বড় বড় গাছ, মধ্যে মধ্যে পঙ্কিল জলপূর্ণ নালা ও ডোবা ছিল। এই স্থান হইতে একটি অপ্রশস্ত পথ বাহির হইয়া আজকাল যেখানে গড়ের মাঠের কেল্লা আছে ও পূর্বে যে স্থানকে গোবিন্দপুর বলিত, সেই পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিল। আজকাল যাহা এসপ্লানেড (Esplanade) বা ধর্মতলা বলিয়া কথিত, তাহার অধিকাংশই জঙ্গলপূর্ণ ছিল। তবে এই জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা গোচারণ-ভূমি, কোথাও বা [illegible] নির্মিত দুই চারিটি গ্রাম্য কুটীর।

সেই সময়ে ইংরাজগণ প্রাচীন-দুর্গের ও লালদীঘির আশেপাশের অধিকৃত ভূভাগে বাস করিতেন। প্রাচীন-দুর্গের সন্নিকটে ইংরাজ-পল্লী স্থাপিত হওয়ায় এ স্থানটির চারিদিকে ও রাস্তার দুইধারে বৃক্ষাদি রোপিত হইয়াছিল, রাস্তাঘাটও নির্মিত হইয়াছিল এবং পার্শ্বস্থ পল্লীভূমিও অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল।[১]

তখন টানাপাখার রেওয়াজ ছিল না। সেকালের সাহেবদের এইসব বাটিতে শার্সি খড়খড়ি দুলিত না। বেতের জানালা ও প্যানেল-আঁটা দরোজাগুলি তখন সাহেবদের বাড়ির সৌন্দর্য-বর্ধন করিত। সে সময়ে কলিকাতায় গাড়ি-ঘোড়ার প্রচলনও হয় নাই। পালকি তখনকার প্রধান যান। গাড়ি চলিবার মত কোন পাকা ও প্রশস্ত রাস্তাই তখন কলিকাতায় ছিল না।[২]

আজকাল যাহা ক্লাইভ স্ট্রীট (Clive Street) বলিয়া সাধারণে পরিচিত, দুইশতাধিক বৎসর পূর্বে তাহাই প্রাচীন কলিকাতার 'সাহেবী-কোয়ার্টার' ছিল। প্রাসাদ-সৌন্দর্যময়ী চৌরঙ্গী তখন জঙ্গলের মধ্যে শার্দূল ও বন্যবরাহের ক্রীড়াভূমি, দস্যু ও চোরের প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। এই ক্লাইভ স্ট্রীটই তখন সরাসর বড়বাজার পর্যন্ত গিয়াছিল ও ইহাই কলিকাতার প্রধান বর্ত্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। তখন ইহার নাম ক্লাইভ স্ট্রীট ছিল না, কি ছিল, তাহাও প্রকাশ পায় নাই। তবে ইংরাজেরা এই পথটিকে Road to Great Bazar বলিয়াই উল্লেখ করিতেন।

তখন ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের (Old Court House Street) কোন অস্তিত্বই ছিল না। আজকাল যে রাস্তাটি ওয়েস্ট-এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির ঘড়ির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া কারেন্সি আফিসের সম্মুখ দিয়া বরাবর এসপ্লানেডের বা ধর্মতলার দিকে গিয়াছে, তাহার যে অংশ লালদীঘির পার্শ্ববর্তী ছিল, তাহা তৃণশষ্পাবৃত ভূমি মাত্র। এই তৃণক্ষেত্র বর্তমান মিশন রো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই মিশন রো (Mission Row) সেই সময়ে রোপ্‌ওয়াক্ (Rope walk) নামে পরিচিত ছিল। আর একটি পথ বর্তমান কারেন্সি আফিসের সম্মুখ হইতে টেলিগ্রাফ-আফিসের সম্মুখ দিয়া, কয়লাঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছিল। এই রাস্তার শেষাংশে অর্থাৎ কয়লাঘাট রাস্তার পার্শ্বে দুর্গের সীমানার মধ্যেই কোম্পানির মালগুদাম ও বারুদের ভাণ্ডার প্রভৃতি ছিল। ইহার অপর পার্শ্বে গোরস্থান ও শূন্যভূমি। এই গোরস্থানই এখন সেণ্ট জন গির্জার অধিকৃত স্থান।

লালদীঘির বা পার্কের উত্তরে অর্থাৎ বর্তমান বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আফিসের যে স্থানে লাটদিগের মন্ত্রণা-সভার অনুষ্ঠান হইত, সেই স্থানেই কলিকাতার সর্বপ্রথম গির্জা সেণ্ট এ্যান্ (St. Anne) স্থাপিত ছিল। এখন সে গির্জার চিহ্ন পর্যন্ত নাই। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে এই গির্জার নির্মাণ-কার্য শেষ হয়।[৩] রাইটার্স বিল্ডিং এর ঠিক সম্মুখ দিয়া যে রাস্তা আজকাল লালবাজার, বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে গিয়াছে তাহা বর্তমান লালবাজারের মোড়ের নিকট আর একটি ক্ষুদ্র পথের সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-বাহী হইয়া কালীঘাট পর্যন্ত গিয়াছিল। এখন ইহা বেণ্টিক স্ট্রীট, কসাইটোলা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই

১. Round their little Fort and close to it, if not elegant houses, a church, a court-house and the like, laid-out walks, planted trees that made their own district neat, clean and convenient—Price's *Observations*. এই কোর্ট-হাউস হইতেই Old Court House Street হইয়াছে। কাপ্তেন হ্যামিণ্টন লিখিয়া গিয়াছেন— ইংরাজ ও দেশীয় অধিবাসীরা তখন স্ব স্ব আবাসস্থানের চারিদিকে বাগান নির্মাণ করিতেন। প্রত্যেক সাহেব অধিবাসীর বাসগৃহ-সংলগ্ন এক এক খানি বাগান ছিল। এই সমস্ত বাড়ি ও বাগান সম্ভবত বর্তমান ক্লাইভ স্ট্রীটের কিয়দংশ, রাইটার্স বিল্ডিং-এর পশ্চাদ্ভাগ ও চীনাবাজারের কতকাংশ স্থান ব্যাপিয়া ছিল।

২. Carriages they had none for there were no carriage-roads in the country then, nor for many years after—Hamilton's *Account*.

৩. পৃ. ৩০৪ টীকা দেখুন।

ক্ষুদ্র বনপথ ধরিয়া সেকালের কালীঘাট-তীর্থযাত্রীরা চৌরঙ্গীর জঙ্গল মধ্যবর্তী এক ক্ষুদ্র যাত্রী-পথে আসিয়া পড়িতেন। লালবাজারের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ অনেক এ দেশীয় নামজাদা বড়-লোকের বাগানবাটিরূপে পরিণত হইয়াছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অমিচাঁদের বাগান লালবাজারের অতি নিকটেই ছিল।

কোম্পানির গবর্ণর সাহেব পুরাতন কেল্লার মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার আবাসস্থানটি কেল্লার মধ্যে বিশেষ শোভাসম্পদময় ছিল। দুর্গের মধ্যে অনেক ফ্যাক্টর ও রাইটারগণ বাস করিতেন। কোম্পানির রাইটার ও ফ্যাক্টরদিগকে বড়ই কড়াকড়ি ব্যবস্থার মধ্যে রাখা হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত, তাঁহারাই কেবল দুর্গের বাহিরে বাস করিতে পারিতেন। অবিবাহিত কর্মচারিগণকে দুর্গের মধ্যে থাকিতে হইত। কোম্পানির কলিকাতার দুর্গে তখন দুইশত হইতে তিনশত বিলাতী ও দেশীয় সেনা থাকিত। ইহারা কোম্পানির মালামাল চৌকি দেওয়া কার্যেই নিয়োজিত হইত। পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি ফ্যাক্টরি হইতে মালামাল আনয়নকালে বা পেঁৗছিয়া দিবার সময় প্রহরীর কার্য করা প্রভৃতি ব্যাপারেই ইহারা প্রধানত নিয়োজিত হইত।

কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট সাহেবই সর্বোপরি কর্তৃত্ব করিতেন। ইনিই 'গবর্ণর' নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহার অধীনে একটি কাউন্সিল বা মন্ত্রণা-সভা ছিল। গবর্ণর সাহেব এই মন্ত্রণা-সভার সভাপতি ছিলেন। দ্বিতীয় সদস্যপদ প্রায়ই কাশিমবাজার, পাটনা প্রভৃতির কুঠির অভিজ্ঞ কর্ম-চারীরা পাইতেন। সভার তৃতীয় সদস্য হিসাবরক্ষক বা এ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের কার্য করিতেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সদস্য যথাক্রমে আমদানি ও রপ্তানি মালগুদামের মালামালের সর্বময় কর্তা ছিলেন। সপ্তম সদস্য বক্সী বা খাতাঞ্চি বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। কোম্পানির টাকাকড়ি ইহাঁর হাত দিয়াই খরচ হইত। সকাউন্সিল গবর্ণর যখন যে কাজে অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহার আদেশ এই বক্সী সাহেবকেই দেওয়া হইত। কাউন্সিলের অষ্টম ব্যক্তি কোম্পানির অধিকৃত গ্রামত্রয়ের জমিদারির হিসাব রাখিতেন। ইনিই কলেক্টর বা জমিদার নামে অভিহিত হইতেন। জমি প্রজা-বিলি করা, তাহার খাজনা আদায় করা, সহরের উন্নতি করা, প্রজাকে দাখিলা দেওয়া, পাট্টাকবুলতি দেওয়া, বাজারসমূহের নির্ধারিত শুল্ক আদায় করা, নগরের শান্তিরক্ষা করা, জমিদারের নির্ধারিত কার্য ছিল। জমিদারের অধীনে যে দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তিনিই ব্ল্যাক-জমিদার নামে অভিহিত হইতেন।

কোম্পানির কর্মচারিগণের বেতনের হার কিরূপ ছিল, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। প্রেসিডেণ্ট ও পাদরী সাহেব, প্রত্যেকেই বাৎসরিক একশত পাউণ্ড বা ন্যূনাধিক পনরশত মুদ্রা বেতন পাইতেন। কাউন্সিলের মেম্বরেরা প্রত্যেকে বৎসরে সাড়ে ছয়শত টাকা বা চল্লিশ পাউণ্ড বেতন পাইতেন। পূর্বে আমরা যে ডাক্তার হ্যামিল্টনের কথা বলিয়াছি, যিনি সম্রাট ফেরোক-সিয়ারের পীড়া আরোগ্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, তিনি বৎসরে ৩৪ পাউণ্ড বা ন্যূনাধিক পাঁচশত টাকা বেতন পাইতেন। কোম্পানির যে সমস্ত সাহেব কর্মচারী কলিকাতা দুর্গের মধ্যে না থাকিয়া সহরে থাকিতেন, তাঁহারা বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি বাবত ৩০ টাকা করিয়া প্রতিমাসে অতিরিক্ত ভাতা পাইতেন।

যাঁহারা দুর্গমধ্যে থাকিতেন তাঁহারা একত্রেই আহার করিতেন। আহারের নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা হইবামাত্র সকলেই সুদীর্ঘ খানার টেবিলের পাশে আসিয়া বসিতেন। দুর্গের মধ্যেই রন্ধন-শালা ছিল। আজকাল যেমন খানসামাদের চুরি অপবাদ ও জিনিসপত্র নষ্ট করার একটা অখ্যাতি আছে, দুইশত বৎসর পূর্বেও ঠিক সেইরূপ ছিল। সেকালের মশালচি, খিদমৎগার প্রভৃতি অতি লুব্ধ প্রকৃতির ছিল। পাচকরূপে অনেক পর্টুগীজ ও এদেশীয় লোক নিযুক্ত হইত। ইহারা জিনিসপত্র চুরি করিত, অতিরিক্ত দস্তুরি আদায় করিত, বাসন ও প্লেটসমূহ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিত, আর এই সব দোষের জন্য শাস্তি পাইত ও বরখাস্ত হইত।

সেকালের সাহেবদের সামাজিক জীবন বড়ই একঘেয়ে রকমের ছিল। এখনকার কালের মত এত বল-ড্যান্স, থিয়েটার, অপেরার অস্তিত্ব ছিল না। কোম্পানির কর্মচারীরা প্রাতঃকালেই আফিস করিতেন। মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্নকৃত্য হইত। অপরাহ্নে আবার আফিসের কাজ চলিত। সন্ধ্যার প্রারম্ভে কেহ বা পদব্রজে, কেহ বা পাল্কিতে চড়িয়া সান্ধ্যবায়ু সেবনে বাহির হইতেন। যাঁহারা দীর্ঘ ছুটি পাইতেন তাঁহারা বজরা করিয়া ভাগীরথী বক্ষে বেড়াইতেন। কেহ বা নদীতে মাছ ধরিতেন কেহ বা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পক্ষীশিকার করিতেন। তখন কলিকাতার আশেপাশে বনজঙ্গলের অভাব ছিল না। সন্ধ্যার পূর্বে অনেকেই বন্ধুবান্ধবদের বাটিতে গিয়া দেখাসাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। অনেক ফ্যাক্টর বিবি ডেমিঙ্গো এ্যাশের হোটেলখানায় বসিয়া সেকালে প্রচলিত 'আরক' নামধেয় উগ্র মদিরা পান করিতেন। এই হোটেলখানার জটলার মধ্যে দেশের সকলস্থানের সর্ববিধ সংবাদেরই আদানপ্রদান চলিত।

প্রত্যেক সপ্তাহের প্রথমে মন্ত্রণা-সভা বসিত। সাধারণত প্রাতঃকালে নয় ঘটিকার সময় এই সভার অনুষ্ঠান হইত। মসলিনের কামিজ, পায়জামা, সাদা টুপী ইত্যাদি পরিধান করিয়া কাউন্সিলে বসা চলিত। কাউন্সিল বসিবার সময় সভার সেক্রেটারী একটি পাত্রে জল ও আর একটি মদিরাধারে প্রচুর পরিমাণে 'আরক' ভরিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিতেন। প্রয়োজনমত ইহা মিশাইয়া 'Punch' বা উগ্র-মিশ্র করিয়া লওয়া হইত। সদস্যগণ কার্যকালে তাহা মধ্যে মধ্যে পান করিতেন। কখন কখন মদিরার উত্তেজনা ফলে নানা বিষয়ের বাদানুবাদ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলিত। তখন পুস্তকাদি বড় দুষ্প্রাপ্য ছিল।

সেকালের কলিকাতায় মেমসাহেবদের সংখ্যাও বেশী ছিল না এবং দূরাদূরে শিকার করার সখও খুব কম ছিল। সেই সময়ে 'নদীয়া' বা নবদ্বীপ যে একটি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, গবর্ণর সাহেব হইতে অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের অনেকেই নদীয়াতে বায়ু পরিবর্তন করিতে যাইতেন।

তখন কলিকাতাতে একজন মাত্র বেতনভোগী পাদরী ছিলেন। পাদরী-সাহেব প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনার জন্য দুর্গমধ্যে সমাগত হইয়া কোম্পানির কর্মচারীদের সহিত প্রার্থনাদি করিতেন। প্রতি রবিবারে কোম্পানির সমস্ত সাহেব কর্মচারীরা দলবদ্ধ হইয়া নিকটবর্তী গির্জায় যাইতেন। গবর্ণর সাহেবও পদব্রজে এই দলের অগ্রবর্তী হইতেন। এই গির্জা কলিকাতার প্রথম গির্জা সেণ্ট এ্যান্। যখন কোন কারণে এই বেতনভোগী পাদরীসাহেব অনুপস্থিত হইতেন, তখন কাউন্সিলের একজন মেম্বরকে পাদরীর হইয়া কাজ করিতে হইত। সেই পুরাকালে কোম্পানির অধিকারের মধ্যে যে কোন ইংরাজ ইহলোক ত্যাগ করিতেন, তাঁহাদের উইল বা শেষ ইচ্ছাপত্র কাউন্সিলে পেশ না হইলে পাকা দলিল বলিয়া মঞ্জুর হইত না।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্য আদৌ ভাল ছিল না। ম্যালেরিয়ার জ্বালায় তখন কলিকাতার অধিবাসীরা বড়ই জ্বালাতন হইতেন। ১৭০৭ খৃীস্টাব্দের শরৎকালে কলিকাতায় প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে কোন সাধারণ চিকিৎসালয় ছিল না। ১৭০৫ খৃীস্টাব্দে একজনের বেশী সাহেব-ডাক্তার কলিকাতায় ছিল না। ম্যালেরিয়া জ্বরে সাহেবদেরই বেশী মৃত্যু হইত। কাপ্তেন হ্যামিল্টন সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "যাঁহারা একবার হাসপাতালে প্রবেশ করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই ফিরিয়া আসিতেন।[১] ইহা হইতে প্রমাণ হয়, হাসপাতালের বন্দোবস্ত তখনও তৎসাময়িক প্রয়োজন মত সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই।

---

১. The Company has a pretty good hospital at Calcutta where many go in to undergo the grievance of physic, but few came out to give account of its operation.—Cap. Alexander Hamilton's *Account of Calcutta.*

১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের সম্রাট প্রথম জর্জের আমলে রাজকীয় সনন্দানুসারে কলিকাতার প্রথম আদালত স্থাপিত হয়। মেয়র-আদালতেই ইংরাজদের সর্বপ্রথম বিচারালয়। ইহা 'কোর্ট অব রেকর্ড' নামেও পরিচিত ছিল। এই আদালতে বিচার কার্য নির্বাহের জন্য একজন মেয়র, ও নয়জন সহকারী বিচারক বা Alderman ছিলেন। এই নয়জন মেয়রের মধ্যে সাতজন খাঁটি ইংরাজ নির্বাচিত হইতেন, বাকি দুইজন অন্য দেশীয় প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টান হইলেও চলিত। এই আদালতে প্রধানত ইংরাজদের বিষয়ঘটিত দেওয়ানী মোকদ্দমার শুনানি হইত। এই আদালতের রায়ই শেষ নহে, ইহার উপর 'কোর্ট-অব-আপিল' বলিয়া আর একটি আদালত ছিল। এই আদালতে স্বয়ং গবর্ণর ও তাঁহার কাউন্সিলের সদস্যগণ একত্রে বসিয়া বিচার করিতেন। এতদ্ব্যতীত সেকালে Court of Quarter Sessions বলিয়া আর একটি ফৌজদারি আদালত ছিল। গবর্ণর সাহেব এই আদালতে বসিতেন। সহরের যে কিছু বড় বড় ফৌজদারি মামলা, এখানেই নিষ্পত্তি হইত। ইহার আর একটি অবান্তর নাম ছিল 'Court of Oyer and Terminar and Goal Delivery' এতদ্ব্যতীত কোর্ট রিকোয়েস্টস্ (Court of Requests) বলিয়া আর একটি আদালত ছিল। কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্য হইতে গবর্ণরসাহেব কর্তৃক নির্বাচিত ২৪ জন কমিশনার এই আদালতে বসিতেন। যে সমস্ত মোৎফরেক্কা মোকদ্দমার সরাসরি বিচার হইত, তাহা এই কমিশনারেরা পালা করিয়া বিচারকরূপে বসিয়া নিষ্পত্তি করিতেন। ইহাতে অনেকটা বর্তমান ছোট-আদালতের মত কাজ হইত। সামান্য টাকাকড়ির দেনাপাওনা এই আদালতেই সরাসরভাবে বিচার হইত। পাঁচ প্যাগোডা অর্থাৎ চল্লিশ শিলিং পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ-ত্রিশ টাকার পাওনার দাবি এ আদালত হইতেই নিষ্পত্তি হইত।

কোম্পানি-বাহাদুর যে সময়ে কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয় বাদসাহী ফারমান অনুসারে লাভ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের কার্যপ্রণালী অন্যদিকে পরিবর্তিত হইল। তাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে আসিয়া জমিদারি পত্তন করিলেন। এই জমিদারিই তাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই গ্রাম তিন খানির কল্যাণেই এই বিশাল ব্রিটিশ-ভারতবর্ষ অর্জিত হইয়াছে।

এই জমিদারির জন্য তাঁহাদিগকে মোগলসরকারে ১২৮১৷৷০ খাজনা দিতে হইত। এই খাজনা তুলিবার জন্য তাঁহারা এই গ্রামত্রয়ের জমি প্রজাবিলি করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত জরিমানা, বাজেয়াপ্ত, কাস্টম ও শুল্ক প্রভৃতি আবওয়াবেও জমিদারির তহবিলে উপরি আদায় হইত। কিন্তু প্রথম প্রথম মোগলসরকারের খাজনা দিতে তাঁহাদের একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। কারণ কলিকাতা প্রভৃতি গ্রামে যে অনুপাতে প্রজাবিলি হইয়াছিল, সেই অনুপাতে খাজনা হইত না। অনেকে প্রতারণা-পূর্বক স্বেচ্ছামত বেশী জমি দখল করিয়া লইত, কিম্বা দখলি-জমির পরিমাণের তুলনায় নির্দিষ্ট হারের অপেক্ষা কম খাজনা দিত। কাজেই প্রথম প্রথম এই এই গ্রামত্রয়ের খাজনা উক্ত ১২৮১ টাকার কাছেও পৌঁছিত না।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া কোম্পানি-বাহাদুর ১৭০৪ সালে এই গ্রামত্রয়ের জরিপের আদেশ দেন। এই জরিপের ফলে যে সব অধিবাসী অতিরিক্ত জমি দখল করিয়া কম খাজনা দিত, তাহারা ধরা পড়িল। কোম্পানি বাহাদুর সেই সব অতিরিক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া, পুনরায় প্রজাবিলি করিতে লাগিলেন। ইহাতে জমিদারির আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহার পূর্ব হইতেই রালফ্ শেলডন্ কলেক্টরের বা জমিদারের কাজ করিতেন। এই জরিপ-জমাবন্দীর পর হইতে তাঁহার কাজ বাড়িয়া উঠিল। এই সময়ে স্বতন্ত্রভাবে একজন জমিদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার হস্তে খাজনা আদায়, জমিবিলি, জমির জরিপ, সহরের পথ-ঘাটের উন্নতি, জরিমানা আদায়, ব্যবসায়ীদের নিকট শুল্ক আদায়, বাজারের ব্যবসায়ীদের নিকট দস্তুরি ও তোলা আদায় প্রভৃতি কাজের ভার পড়িল। দেশীয়দের মধ্যে যে সমস্ত ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, জমিদার সাহেব তাহারও বিচার করিতেন। তাঁহার অধীনেই জমিদারি ও ফৌজদারি-কাছারি ছিল ও পুলিসবিভাগ ছিল।

তখন চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম খুবই হইত। এজন্য মধ্যে মধ্যে পুলিসের শক্তি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইত। তখন সংবাদপত্র ও ছাপাখানা প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এজন্য কোম্পানি-বাহাদুরের কোন আদেশ সাধারণে প্রচারিত হইবার সময়, তাহা ঢেঁড়া দ্বারা সহরময় প্রচার করা হইত, কিম্বা তৎসম্বন্ধে ইংরাজি, বাঙ্গলা, উর্দুতে নোটিশ লিখিয়া ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গদ্বারে লটকাইয়া দেওয়া হইত। ইউরোপীয়দের বিচার কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত আদালতেই হইত। সে সকল আদালতের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই সমস্ত আদালতে ছোট ছোট মামলার বিচার চলিত। বড় আদালতে সকাউন্সিল গবর্ণর সাহেব 'ফুলবেঞ্চে' বিচার করিতেন। খুব বড় জটিল মোকদ্দমা হইলে তাহা মান্দ্রাজের কর্তাদের নিকট বিচারার্থে পাঠান হইত।

১৭০৬ খৃীস্টাব্দের কাগজপত্র হইতে সেকালের চোর-ডাকাতের শাস্তির কথা কিছু কিছু জানা যায়। উক্ত সালের একটি মন্তব্যে দেখা যায়, "কতকগুলি চোর ও নরঘাতক ধরা পড়িয়াছে, অতএব আদেশ করা হইল তাহাদের গালে লোহা পোড়াইয়া ছাঁকা দিয়া, তাহাদিগকে কলিকাতা হইতে নদীর অপরপারে তাড়াইয়া দেওয়া হউক।" যে সকল প্রজা জমি জমা করিয়া লইয়া তাহার খাজনা দিতে অপারক হইত, খাজনা উসুল দিতে বাকি ফেলিত বা খাজনা দিবার সময় বদমায়েসী করিত, তাহাদিগকে কলেক্টরের কাছারিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, চাবুক দেওয়া হইত অথবা অন্য উপায়ে শাস্তি দিয়া খাজনা আদায়ের চেষ্টা করা হইত[১] এ বিষয়ে জমিদার বা কলেক্টর সাহেবের সরাসর ক্ষমতা ছিল। উচ্চ আদালতের সহিত কোন সংস্রব ছিল না।

জমিদার বা কলেক্টর সাহেবের সহকারীরূপে একজন এদেশীয় বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতেন ও তিনিই যে 'ব্ল্যাক-জমিদার' নামে পরিচিত ছিলেন, একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ব্ল্যাক-জমিদারগণ কলেক্টরের ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন।[২]

আমরা ইতঃপূর্বে কোম্পানি-বাহাদুরের 'Consultations' বা মন্তব্যপত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন নামের ও ঘটনার হেডিং দিয়া যে সমস্ত অংশ উদ্ধার করিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠক সেকালের কলিকাতার নানাবিধ ঘটনার কথা জানিতে পারিবেন। সেগুলির সমালোচনা ও পুনরাবৃত্তি করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে সে সময়ে দেশীয় অধিবাসীর সংখ্যা বেশী হইলেও, তাহাদের মধ্যে নামজাদা লোক খুব কমই ছিলেন। যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধেও জানিবার কিছুই উপায় নাই। কোম্পানির 'কন্সলটেসনে' যে সকল বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যায়, সেইগুলিই আমরা বহু চেষ্টায় খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি।

কোম্পানির জমিদারি সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার কথা আছে। সেগুলি হইতে পাঠক প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন।

কলেক্টরির পুরাতন সেরেস্তার মধ্যে কলিকাতার ভূতপূর্ব কলেক্টর স্টার্ণডেল্ সাহেব, ১৭৪৩ খৃীস্টাব্দের ১৫৬১ নং-এর একখানি পুরাতন পাট্টা দেখিয়াছিলেন। ঐ পাট্টায় মিঃ জ্যাক্সন বলিয়া একজন কলেক্টরের সহি আছে।

স্বনামখ্যাত হলওয়েল প্রাচীন কলিকাতার ইংরাজ-জমিদারগণের মধ্যে একজন বিশেষ নামজাদা কলেক্টর। স্টার্নডেলের মতে, হলওয়েল ১৭৫২ হইতে ১৭৫৬ অর্থাৎ সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্বকাল পর্যন্ত কলিকাতার জমিদার ছিলেন। তাঁহার আমলের পাট্টাবহি আজও বর্তমান।

---

১. In his capacity as revenue officer he held what was known as Collector's Cutcherry, where the farmers and tenants under his jurisdiction who are backward in their payments are confined, whipped, or otherwise punished independently of the other Courts at Calcutta.—R.C. Sterndale's *Reports & Cotton's Calcutta Old and New.*

২. That by reason of the many changes in the headship of the office a power in perpetuity developed on the standing Deputy, who is always styled the 'Black Zaminder' and such was the tyranny of this man and such was the dread conceived of him in the minds of the natives that no one durst complain or give information.

কোম্পানির অনেক দরকারি কাগজপত্র ও পুরাতন সেরেস্তাবহি কলিকাতা দুর্গের মধ্যে ছিল। সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে এই সকল রেকর্ডের অনেক নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য অনেক পাট্টা-কবুলতির সম্বন্ধে রেজেস্ট্রি-বহিতে নম্বর পাইলেও তাহাদের প্রতিলিপি পাওয়া দুর্ঘট।

ক্লাইভ কর্তৃক কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর কলেট সাহেব হলওয়েলের স্থানে নিযুক্ত হন। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ইহার পর উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব কলেক্টর নিযুক্ত হন। ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের সময় কলেক্টরের পদবী পরিবর্তিত হইয়া 'কলেক্টর জেনারেলে' দাঁড়ায়।

এই ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবই সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় তাঁহার বিপন্ন সঙ্গীদের পরিত্যাগ করিয়া 'ডোডালী' জাহাজে উঠিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু এই প্রকার ভীরুতা প্রকাশের জন্য তাঁহাকে কোনরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হয় নাই বা তাঁহার চাকুরি যায় নাই। ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরায় দখল করিলে ইনি কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন।[১]

এই ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের আমলে অনেক পাট্টা-কবুলতির নকল আজকালকার কলেক্টরি আফিসে বর্তমান। পাট্টা বহিগুলির বাঙ্গলা ভাষায় নামকরণ হইয়াছিল। কারণ এই ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড সাহেবের আমলের পাট্টা-বহি হইতেই দেখা যায়—'ফিরিস্তি কাগজ পাট্টা-নকল বহি আমল শ্রীযুৎ মিস্টার উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড কলেক্টর সাহেব সন ১১৬৫ সাল ১৭৫৮।'' এই পাট্টাগুলির উপর 'কলিকাতা কলেক্টরের কাছারি' বলিয়া চিহ্নিত করা আছে। আমরা কলেক্টরির পুরাতন সেরেস্তার মধ্যে ক্লাইভ কর্তৃক কলিকাতায় পুনরায় ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার সময় হইতে নিম্নলিখিত কলেক্টরদের নাম পাইয়াছি।

কলেক্টরের নাম	পদবী	কার্যকাল
মিঃ কলেট	জমিদার	১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের নবেম্বর পর্যন্ত
উইলিয়াম ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড	কলেক্টর	১৭৫৯ ডিসেম্বর হইতে ১৭৬০ নবেম্বর
উইলিয়াম সমার[২]	,,	১৭৫৯ ডিসেম্বর হইতে ১৭৬০ নবেম্বর[৩]
উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড	,,	১৭৬০ ডিসেম্বর হইতে ১৭৬১ আগস্ট
পিটার আমিয়াট	,,	১৭৬১ সেপ্টেম্বর হইতে ১৭৬৩ মার্চ
র‍্যাণ্ডলফ মেরিয়াট	,,	১৭৬৩ মার্চ হইতে ১৭৬৩ মে
উইলিয়াম বিলার্স	,,	১৭৬৩ মার্চ হইতে ১৭৬৪ মার্চ
সামুয়েল মিডলটন	,,	১৭৬৪ মার্চ হইতে ১৭৬৪ সেপ্টেম্বর
সি এস প্লেডেল্	,,	১৭৬৪ অক্টোবর হইতে ১৭৬৫ জুলাই
জর্জ গ্রে	,,	১৭৬৫ অক্টোবর (লর্ড ক্লাইভের সহিত বিবাদ হওয়ায় ইনি পদত্যাগ করেন)[৪]
ডবলু বি সমার	,,	১৭৬৫ আগস্ট হইতে ১৭৬৭ ফেব্রুয়ারি
ক্লড্ রাসেল		১৭৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৬৭ আগস্ট (বেনারসে ১৮১৭ ইঁহার মৃত্যু হয়।)

১. R.C. Sterndale's ***Report on Old Calcutta Collectorate***, p. 17.

২. দুইজন ব্যক্তি একই সময়ে কিরূপে কলেক্টরের কাজ করিয়াছিলেন, ইহা গোলমালের বিষয় বটে। কিন্তু সমার সাহেব ১৭৬০ খ্রী. অব্দে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারদের আদেশে পদচ্যুত হন, একথাও লিখিত আছে।

৩. এই এলিস সাহেব একজন লড়ায়ে গোরা ছিলেন। সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় ইনি খুব লড়িয়াছিলেন। অতি সাহসের সহিত একটি আউটপোস্ট (outpost) রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খ্রী. অব্দে অল্পমাত্র সেনা লইয়া এই এলিস সাহেব পাটনা আক্রমণ করেন। পরে নবাব মীরকাশিম কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। পাটনার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হত্যাকাণ্ডে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৪. এই বিবাদের সংক্ষিপ্ত মর্ম এই, এই গ্রে সাহেব কলেক্টর রূপে গণিকাদের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন। মহানুভব ক্লাইভ ইহাতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি পদত্যাগ করেন।—**Clive's Letter dt. 8th October 1756 to Collector of Calcutta. Sterndale's *Report*.**

কলেক্টরের নাম	পদবী	কার্যকাল
রিচার্ড বিচার	কলেক্টর	১৭৬৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১৭৬৮ মে।
চার্লস ফ্লয়ার	,,	১৭৬৭ (প্রতিনিধি)।
জেমস্ আলেকজাণ্ডার	,,	১৭৬৮ হইতে ১৭৬৯ অক্টোবর।
জন হোম	,,	১৭৭০ হইতে ১৭৭২।
স্যামুয়েল লুইস্	,,	১৭৭২ খৃস্টাব্দ।
টমাস্ লেন্	,,	১৭৭২ (খালসা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন)
পি, এম, ডেকার্স ১	,,	১৭৭৩ ফেব্রুয়ারি হইতে মে পর্যন্ত।
রিচার্ড বারওয়েল ২	,,	১৭৭৩ খৃস্টাব্দ
জে গ্রেহাম	,,	১৭৭৩ ,,
হেনরি কাট্রল	,,	১৭৭৪ ,,
চার্লস গোরিং	,,	১৭৭৬ ,,
ডি এণ্ডারসন	,,	১৭৭৮ ,,
ই গোল্ডিং	,,	১৭৭৮ ,,
জন ইভ্লিন্	,,	১৭৮০ ,,
জে মোর	,,	১৭৮২ ,,
টমাস ডগলাস্	,,	১৭৮২ ,,
জন স্কট	,,	১৭৮৫ ,,
স্যর আলেকজাণ্ডার সিটন	,,	১৭৮৬ ,,
জে লমস্ডেন্	,,	১৭৮৭ ,,
জে, এফ, হ্যারিংটন	,,	১৭৮৮ ,,
ফ্রান্সিস্ গ্ল্যাড্উইন	,,	১৭৮৮—১৭৮৯

আমরা পলাশী আমল হইতে দশশালা বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ এই ৩২ বৎসর কাল ধরিয়া যাঁহারা কলিকাতার কলেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন, উপরে তাঁহাদের তালিকা দিলাম। বর্তমান কলিকাতাবাসী পাঠক ইহা হইতে সেকালের কলিকাতা-কলেক্টরি সম্বন্ধে অনেক পুরাতন কথা জানিতে পারিবেন।

আমরা ইতিপূর্বে কলিকাতার কলেক্টরদের যে তালিকা দিয়াছি, তাহার মধ্যে শেষের নামটি (অর্থাৎ ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন সাহেব) এখনও এদেশের ইতিহাস-পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। এই গ্ল্যাডউইন সাহেব 'আইন-ই-আকবরী' নামক ফার্সী গ্রন্থের এক বিশদ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে তিনি 'কলিকাতা গেজেট ও ওরিএণ্ট্যাল এড্ভারটাইজার' নাম একখানি

১. এই ডেকার্স সাহেব কাউন্সিলের সদস্যের কাজও করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়ান ভলান্টিয়ার শ্রেণীর সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব ইনিই প্রথমে করেন। আজকাল যাহা 'ডেকার্স লেন' বলিয়া পরিচিত, অর্থাৎ বর্তমান এস্প্লানেডের ম্যাথিউসনের বাড়ির গায়ে যে লেনটির নাম স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত আছে, তাহা এই ডেকার্স সাহেবের নামানুসারেই হইয়াছে। এইস্থানে তাঁহার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রবাদ এই, এই সম্পত্তি তিনি পাঁচশত বৎসর মিয়াদে একজন এদেশীয় ব্যক্তিকে ইজারা দেন।

২. রিচার্ড বারওয়েলের নাম ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইনি ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। হেস্টিংসের সহিত তাঁহার যথেষ্ট মিত্রতা ছিল। কিন্তু কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের সহিত আদৌ বনিত না। ফ্রান্সিস ইঁহাকে cunning, cruel, rapacious, tyrannical প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮০ খ্রী. অব্দে ৮০ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া বারওয়েল এ দেশ ত্যাগ করেন। বিলাতে গিয়া তিনি পার্লামেন্টের মেম্বর হন। সেকালের ইংরাজদের মধ্যে তিনি খুব বিলাসী ছিলেন। আজকাল যাহা বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের অফিস বলিয়া পরিচিত, পূর্বে সেই স্থান অধিকার করিয়া রাইটার্স-বিল্ডিংস নামক একটি সুদীর্ঘ প্রাসাদতুল্য বাটি ছিল। বারওয়েল এই বাটির মালিক ছিলেন। কোম্পানি বাহাদুর তাঁহাদের কর্মচারিদের বাসের জন্য বারওয়েলের নিকট হইতে এই বাড়িটি ভাড়া করিয়া লয়েন। যে বাড়িতে পরে মিলিটারী-অর্ফান-এসাইলম স্থাপিত হয় অর্থাৎ যে রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আজও খিদিরপুরে সেণ্ট ষ্টিফেন গির্জার পার্শ্ববর্তী ময়দানে দণ্ডায়মান, ইহাই বারওয়েলের আবাসবাটি ছিল। এই বাটির মধ্যে একটি অতি সুসজ্জিত বলরুম ছিল। সেকালের পদস্থ সাহেবরা নৃত্যাদি উৎসবে এইস্থানে আসিতেন।

সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে কলিকাতায় প্রথম ইংরাজি ছাপাখানা হয়। গ্ল্যাডউইন সাহেব ফার্সী ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। আইন-ই-আকবরী ব্যতীত তিনি 'উলফাজ আদউয়ে' নামক একখানি ফার্সী গ্রন্থ তর্জমা করেন। সম্রাট সাহজাহানের আবদুল হাজী সিরাজি বলিয়া একজন পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। এই 'উলফাজ' তাঁহারই রচিত, ও সাহজাহানের সময়ের অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত তিনি সেকালের ইংরাজদিগকে ফার্সী ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য, 'পারশীয়ান-মুনসী' নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। মুসলমান আইন ও বঙ্গের রাজস্বসংক্রান্ত আইনঘটিত দুইখানি গ্রন্থ ও একখানি ইংরাজি-ফার্সী অভিধানও তাঁহার রচনা। পরবর্তী কালে গ্ল্যাডউইন সাহেবের অবস্থা যথেষ্ট মন্দ হইয়া পড়ে। কেন না ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে দেখা যায়, তিনি 'কোর্ট অব রিকোয়েস্টস' নামক আদালতে কেরানীগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন।

১৭২০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, কলিকাতায় কলেক্টরগণ ধারাবাহিক রূপে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছেন। রাষ্ট্রবিভাগের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিলেও ইঁহাদের পদবীর কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। তবে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের কলেক্টর ও বর্তমান কলেক্টরের কর্তব্যের মধ্যে অনেক বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে। এখন স্ট্যাম্প, এক্সাইজ, ইনকামট্যাক্স প্রভৃতি নানা বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।[১]

প্রাচীন কলিকাতার উপর দিয়া অনেক ঝড়-ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে, দেশের চারিদিক নানা-রূপে বিপ্লবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, এতৎসত্ত্বেও কলিকাতা কলেক্টরির কাজ সেই পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের মহা ঝড়ে কলিকাতায় মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। অনেক ঘরবাড়ি পড়িয়া গিয়া কলিকাতা প্রায় সমভূমি হয়। তাহার পর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা লুণ্ঠন করিয়া ইহাকে ছারেখারে দেন। লোকজন প্রাণভয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, সিপাহী-বিদ্রোহে কলিকাতা ত্রাস-পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৮৬৪ সালের ঝড়ে আবার এই কলিকাতার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কিন্তু এ সমস্ত প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রবিপ্লব সত্ত্বেও কলিকাতা কলেক্টরের কাছারি অবিচ্ছিন্নভাবে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

আজকাল যাহা কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট (Council House Street) বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত, আগে এই স্থানের সান্নিধ্যে একটি 'কাউন্সিল-হাউস' ছিল। এই কাউন্সিল-হাউস হইতেই বর্তমান রাস্তার নাম 'কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট' হইয়াছে। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিম দিকে এই কাউন্সিল-হাউস অবস্থিত ছিল। কলিকাতার পুরাতন দুর্গে স্থানাভাব হওয়ায় ও নূতন দুর্গ আরম্ভ হওয়ার সময় এই কাউন্সিল-হাউসেই কলিকাতার কলেক্টর কাছারি স্থানান্তরিত হয়। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় লাট-প্রাসাদ নির্মাণের জন্য এই কাউন্সিল বাটিটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এই সময়ে কলেক্টরি আফিস লালবাজারে স্থানান্তরিত হয়। লালবাজারে যেখানে পূর্বে Carlisles Nephew-এর আফিস-বাটি ছিল, তাহার নিকটেই কলেক্টরের আফিস স্থাপিত হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা ঐ স্থানেই থাকে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা কোথায় প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এই কলেক্টরি আফিস চৌরঙ্গী সদর রাস্তার সহিত যেখানে পার্ক স্ট্রীটের মিলন হইয়াছে, সেই স্থানে

১. পরবর্তীকালে তিনজন বাঙ্গালীকে আমরা প্রথমে কলেক্টরের সহকারীরূপে ও পরে কলিকাতার কলেক্টর-রূপে দেখিতে পাই। ১৮৫৭ খ্রী. অব্দে অর্থাৎ মিউটিনীর সময়, বাবু কৈলাশচন্দ্র দত্ত কলেক্টরের কাজ করিতেন। ১৮৬০ খ্রী. অব্দে বাবু শিবচন্দ্র দত্ত কলেক্টর হন। ১৮৬২ খ্রী. অব্দে বাবু অভয়চরণ মল্লিক এই পদ লাভ করেন। ইংরাজের উদার শাসন নীতির ফলে ইহার পর অনেক বাঙ্গালীই কলিকাতায় কলেক্টর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। হলওয়েলের আমলের জমিদার কিরূপে কলেক্টরে পরিবর্তিত হন, তাহার পরিচয় পাঠক উপরেই পাইয়াছেন।

উঠিয়া যায়। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ইহা চার্চ লেনে পুরাতন টাকশাল অফিসে উঠিয়া আসে। এই পুরাতন টাকশাল অফিসের অধিকৃত স্থানেই আজকালকার স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি অফিস-ভবন নির্মিত হইয়াছে। এই স্থানেই পঞ্চাশ বৎসর কাল ইহা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎপরে উহা পুনরায় বাঁকশাল স্ট্রীটে উঠিয়া যায়। এখন ইহা চার্নক-প্লেসে জেনারাল পোস্ট অফিসের পার্শ্বের ত্রিতল বাটিতে বর্তমান। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে ইহা ঠিক এই স্থানেই ছিল। ইহাই কলিকাতা কলেক্টরি অফিসের বৈচিত্র্যময় গতি ও পরিণতি।১

পলাশী-যুদ্ধের পরেও আমরা দেখিতে পাই, সেকালের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনেক কর্মচারী কলিকাতা, সুতালুটি ও তাহার আশেপাশের অনেক স্থানে জমি জমা লইয়াছিলেন। তাঁহারা অবশ্য কলেক্টরের নিকট হইতে পাট্টা কবুলতির দ্বারা জমি জমা লইতেন। এই জমার হার বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান প্রধান কর্মচারীদের অনেকেই স্বনামে বেনামে, অনেক বহুমূল্য সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।২

সেকালের এইরূপ কতকগুলি পাট্টার সারসংগ্রহ করিয়া আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

১। পিটার আমিয়াট সাহেব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি কলেক্টরের কাজও করিতেন। এই আমিয়াট সাহেবও রায়তি, ঠিকা, পতিত খামার জমিতে প্রায় ২৮৫ বিঘা ৬ কাঠা জমি পাট্টা করিয়া লয়েন। আমিরাবাদ পরগনার চিৎপুর অঞ্চলে এই সমস্ত জমি ছিল। ইহার বাৎসরিক খাজনা ২৫৯৶০। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে এই আমিয়াট সাহেব কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন।

২। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে ভ্যান্সিটার্ট সাহেব 'কোম্পানির প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত' এই কড়ারে ৬৩১ বিঘা ১১ কাঠা জমি পাট্টা করিয়া লয়েন। এই সমস্ত জমির অধিকাংশই বিরজি (বর্তমান বিরজীতলা) ও চক্রবেড়ে অর্থাৎ ভবানীপুর অঞ্চলে ছিল। ইহার বাৎসরিক খাজনা ৭৮৯ টাকা ধার্য হয়। ভ্যান্সিটার্ট পরে এই সম্পত্তি চার্লস সর্টকে বিক্রয় করেন। সর্ট সাহেব এই জমির কতকাংশ স্থানে বাজার স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্তমান কালে একটি রাস্তা (সর্ট বাজার স্ট্রীট) এখনও সর্ট সাহেবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

৩। কোম্পানি বাহাদুরের কাছারিতে ডি অলিভায়েরা বলিয়া একজন পর্টুগীজ চাকরি করিত। পলাশী-যুদ্ধের পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে দশ বৎসরের জন্য এ ব্যক্তি অনেকগুলি পাট্টা করিয়া লয়। পাট্টার কড়ার এই, "ধর্মার্থে মলঙ্গাতে তিনি একটা পুষ্করিণী খনন করিয়া দিবেন"। কোম্পানির ভৃত্য বলিয়া অলিভায়েরা বিনা খাজনায় এই জমিজমা পাইয়াছিলেন।

কলেক্টর সাহেবের বহিতে এ সম্বন্ধে এক মন্তব্যে লিখিত আছে, "কাছারির কর্মচারী বলিয়া খাজনা মকুব করা হইল।" (The rent is excused being Cutchary servant.) এই ডি অলিভায়েরা ভবিষ্যতে মির্জাপুর অঞ্চলেও জমি জমা লইয়াছিলেন। মির্জাপুরের জমির জন্য তাঁহাকে প্রতি বিঘা বাৎসরিক তিন টাকা খাজনা দিতে হইত।

৪। কোম্পানি বাহাদুরের সামান্য ভৃত্যগণ পর্যন্ত তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইত না। মানুল্লা সেখ, কলেক্টর সাহেবের সর্দার জমাদার ছিল। এই মানুল্লার নামে প্রদত্ত ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের একখানি পাট্টা হইতে প্রমাণ হয়, "ধর্মার্থে ব্যবহারের জন্য কলেক্টর সাহেবের জমাদার সেখ মানুল্লাকে এই জমিগুলি লাখরাজরূপে মোকররি পাট্টা দেওয়া হইল। কিন্তু মানুল্লা জমাদার বেশীদিন এ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে পায় নাই। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার বিধবাপত্নী সুতালুটির মধ্যে তাহার বাড়ি ও জমিসমূহ উনিশ শত আকট-মুদ্রায় বিক্রয়

১. *Report on Calcutta Collectorate.*—R. C. Sterndale. p. 47.

২. Nearly every servant of the Company owned valuable property in Calcutta held under Pottah from the Collector.—Sterndale's *Report*, p. 43.

করে।

৫। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের পরবর্তী বৎসরের একখানি পাট্টা হইতে দেখা যায়, "আরকুলি, সিমলা, নূতন গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্মার্থে পুষ্করিণী খনন জন্য শোভারাম বসাককে ৩০ বিঘা জমি লাখরাজ স্বরূপে জমা দেওয়া হইল।"

৬। ১৭৬৬ অর্থাৎ পলাশী-সমরের ৯ বৎসর পরে, আর একখানি পাট্টার মর্ম এই, "রামকৃষ্ণ সেন পোদ্দারের পৌত্র বীরেশ্বর সেন তাহার সুতালুটির বাস্তুভিটাভুক্ত ১৮ কাঠা জমি নবকৃষ্ণ মুন্সীকে (মহারাজ নবকৃষ্ণ) নয়শত আকট-টাকায় বিক্রয় করিল।

৭। উক্ত বৎসরে গোবিন্দচরণ শীল ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ উক্ত মহারাজা নবকৃষ্ণকে, তাঁহাদের সুতালুটি-মধ্যস্থ বাগানখানি বিক্রয় করিয়াছিলেন—এ কথার উল্লেখও দেখা যায়। কলিকাতা কলেক্টরির অন্ধতমসময় গর্ভে, এখনও এই সমস্ত পাট্টার প্রতিলিপি বর্তমান। সমস্তগুলি উদ্ধৃত করিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না, কাজেই উপরে দুই চারিটি উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হইল। এই পাট্টা ও দলিলগুলি হইতে প্রমাণ হয়, মহারাজ নবকৃষ্ণের তখন অতি সুসময়। আর কোম্পানির কর্মচারীরা সামান্য বেতনে প্রভুর কার্য সমাধা করিলেও সুবিধাকর বন্দোবস্তে বা একেবারে নিষ্করররূপে জমি জমা লইতে পারিতেন।

স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব কলিকাতা প্রভৃতি সহরের মোট জমি পরিমাণের একটি তালিকা দিয়াছেন, তাহা এই—

স্থান		বিঘা	কাঠা
ডিহি কলিকাতা	..	১৭০৪	৩
সুতালুটি	..	১৮৬১	৫
গোবিন্দপুর	..	১০৪৪	১৪
বাজার কলিকাতা	..	৫৬০	২
জন্‌নগর	..	২২৮	২
বাগবাজার	..	৫৭	১৭
লালবাজার	..	১০	৯
সন্তোষ বাজার	..	৫	৮
অতিরিক্ত	..	৭৭৩	০
		৬২০৫	০

প্রতি বিঘা তিন টাকা করিয়া খাজনার গড়-পড়তা একটি হার ধরিলে ইহা ১৮৬১৫ টাকায় দাঁড়ায়। সিক্কা টাকাকে বর্তমানের চলিত টাকায় পরিবর্তিত করিলে ১৯৮৪৫ টাকা হয়। হলওয়েল সাহেবের আমলে (১৭৫২ খ্রীস্টাব্দ) অর্থাৎ সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের চারি বৎসর পূর্বে, এই সহর কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ২০ হাজার টাকা জমির খাজনা স্বরূপ আদায় হইত।

জমির খাজনা ব্যতীত 'টাউন ডিউটি' Town Duty বলিয়া কোম্পানি বাহাদুরের আর একটা আয়ের বাব ছিল। কলিকাতার বাজার ও গঞ্জসমূহে যে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় হইত, তাহার উপর ডিউটি বা শুল্ক আদায় করা হইত। হলওয়েলের আমলের পূর্বে, এই সমস্ত ডিউটির বিশদ বৃত্তান্ত কিছুই নাই বা পাওয়া যায় না। কিন্তু হলওয়েল সাহেব কলিকাতায় জমিদার রূপে এই সমস্ত ডিউটি বা শুল্কের একটি তালিকা দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, প্রাচীন কলিকাতার গঞ্জ বা বাজারসমূহে, কিরূপ প্রকারের দ্রব্যাদি বিক্রয় হইত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন গোবিন্দপুর, মণ্ডীবাজার, সুতালুটি-বাজার, শোভাবাজার প্রভৃতি বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণত ধান, চাউল, ছোলা প্রভৃতি শস্যের উপর ডিউটি আদায় করা হইত। এতদ্ব্যতীত তামাক, ঘৃত, মাদুর, গৃহপালিত পশু-পক্ষী, সুতা, জপের মালা, কাপড়, তৈল, চট ও

থলে, কার্পাস, নানাবিধ শস্য ও পান প্রভৃতি যাহা কলিকাতা হইতে অন্যত্র চালান যাইত, তাহার উপরও চালানি-ডিউটি আদায় হইত। এক কথায়, ইংরাজিতে যাহাকে 'common food or the common necessaries of life' বলে, অর্থাৎ জীবনযাত্রার উপযোগী খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির উপর, এই পুরাকালে নির্দিষ্ট হার অনুসারে শুল্ক আদায় করা হইত।

সুতালুটি বাজার ও শোভাবাজার

সুতালুটি বাজার সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবারে বসিত। এই সমস্ত বাজার যাহার জমা ছিল, সে ব্যক্তি নিম্নলিখিত ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় দ্রব্যগুলির উপর শুল্ক বা তোলা আদায় করিত।

১। কড়িবিক্রেতা
২। সুতা
৩। ঔষধের দোকান
৪। সর্ষপাদি তৈলের দোকান
৫। লোহা লক্কড়ের জিনিস
৬। টায়ার (?)
৭। দুগ্ধ
৮। তালের গুড়
৯। মিঠাই
১০। কামার
১১। স্যাকরা (রূপার জিনিস)[১]
১২। পান
১৩। ফল-মূলাদি
১৪। গাছ-বিক্রেতা
১৫। তাঁতি
১৬। লবণ
১৭। চাউল
১৮। মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস।
১৯। ধনে
২০। চূণের দোকান
২১। তামাকের দোকান
২২। জ্বালানি কাষ্ঠের দোকান
২৩। খড়-বিচালি
২৪। মাদুর
২৫। বাঁশ
২৬। কাংস্যদ্রব্য
২৭। সুপারি
২৮। ফলমূল ও শাকসবজী
২৯। ইক্ষু
৩০। কলা
৩১। তেঁতুল
৩২। মৎস্য-বিক্রেতা জেলে
৩৩। সিদ্ধ চাউল।
৩৪। কুম্ভকার
৩৫। কাপড় বিক্রেতা
৩৬। বিনামা বিক্রেতা

উল্লিখিত দ্রব্য সমূহের শুল্ক সংগ্রহ সম্বন্ধে কোন নির্ধারিত নিয়ম ছিল না। দৈনিক হিসাবে ১ গণ্ডা হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় পণ কড়ি পর্যন্ত এই সব দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইত। প্রত্যেক বস্তা বা আঁটি, কিম্বা যেরূপভাবে বিক্রেয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ বাজারে আনীত হইত, সেইভাবেই তাহার শুল্ক আদায় হইত। মনে করুন কেহ ৫০আঁটি খড় অথবা ৩০ ছালা ধান আনিয়াছে, এরূপস্থলে প্রত্যেক আঁটি বা ছালার উপর শুল্ক লওয়া হইত। তখন আধলা ও পাই প্রভৃতির প্রচলন ছিল না। সেকালে কড়িই আধলা, সিকিপয়সা, দামড়ি, ক্রান্তি, ছেদাম প্রভৃতির কাজ করিত।

কলিকাতা সহরের মধ্যে বা আশেপাশে যে সমস্ত বাড়ি বিক্রয় করা হইত তাহার উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে কমিশন আদায় করা হইত। অবশ্য এই টাকাটা বিক্রেতার নিকটেই লওয়া হইত। পূর্বে আমরা কোম্পানির পুরাতন আমলের যে সমস্ত সেরেস্তার নকল দিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই বাড়ি বিক্রয়ের শুল্ক সেই সময়ে কোম্পানি বাহাদুরের একটি আয়ের উপায় ছিল। এই বিক্রয়-শুল্ক ইংরাজ ও এদেশীয় উভয় শ্রেণীকেই দিতে হইত। কিন্তু ইংরাজেরা ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহাদিগকে এ দায় হইতে অব্যা-

১. স্যাকরা শব্দের ইংরাজিটি লেখা আছে 'Silversmith'। 'গোল্ডস্মিথ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। সেকালে রূপার গহনাই বেশী প্রচলিত ছিল। সাধারণ গৃহস্থেরা তখন রূপার অলঙ্কারেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। খুব বড় লোক যাঁহারা, তাঁহারাই সোনার গহনা ব্যবহার করিতেন।

হতি দেওয়া হয়। এদেশীয়গণ কিন্তু ইহা হইতে অব্যাহতি পায় নাই।[১] কেবল বাঙ্গালীরা নহে, আর্মানী ও পর্টুগীজগণও বাটি বিক্রয় জন্য শুল্ক দিতে বাধ্য ছিল। কেবল বাড়ি বিক্রয় নহে, জমি বিক্রয় সম্বন্ধেও এরূপ শুল্ক গৃহীত হইত।

বোলটস্ বলেন, 'টাউন-ডিউটি বা সহরের নানাবিধ দ্রব্যের শুল্কের সহিত বিবাহের লাইসেন্সেরও একটা বাব ছিল। তখন প্রাচীন কলিকাতায় যে সমস্ত বিবাহাদি হইত, তাহার জন্য প্রত্যেক দলের নিকট তিন টাকা (সিক্কা) লাইসেন্স স্বরূপ লওয়া হইত।' আমরা ইতিপূর্বে কোম্পানি বাহাদুরের খরচপত্রের সেরেস্তার যে নকল দিয়াছি, তাহাতে Marriages বলিয়া একটি বাবের উল্লেখ আছে, পাঠক বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

প্রাচীন কলিকাতার কাগজপত্রে নিম্নলিখিত কয়েকশ্রেণীর বিপণিগুলির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিপণিগুলির প্রতিষ্ঠার একটি তালিকা পাঠকবর্গের গোচরার্থে প্রকাশিত হইল।

দোকান ও কারখানার নাম		প্রতিষ্ঠার বৎসর খৃষ্টাব্দ
গ্লাস তৈয়ারির কারখানা	..	১৭৩৮
সিন্দুক প্রস্তুতের কারখানা	..	১৭৩৮
নারিকেল দড়ির কারখানা	..	১৭৩৮
তামাকুর দোকান	..	১৭৪০
ভাঙ্গের দোকান	..	১৭৩৮
সিন্দুকের দোকান	..	১৭৪৮
মেটেসিন্দুর, তুঁতে প্রভৃতির দোকান	..	১৭৪৮
ফট্‌কিরি ও হীরাকস প্রভৃতির দোকান	..	১৭৪৬
আতসবাজী নির্মাণকারকের দোকান	...	১৭৩৮
চুণের দোকান	..	১৭৫২
শাল ও সেগুন কাষ্ঠের দোকান	..	১৭৫২
পুরাতন লোহা ও পেরেক প্রভৃতির দোকান	.	১৭৫১

নিম্নলিখিত হারে বিক্রেয় পণ্যের ও অন্যান্য ব্যাপারীর উপর 'ডিউটি' আদায় করা হইত—

পণ্য-দ্রব্যাদি	মাসুলের বা ডিউটির হার
কাপড় চোপড় ইত্যাদি	শতকরা দুই টাকা।
নৌকা বোট প্রভৃতি বিক্রয় বাবত	,, পাঁচ টাকা।
ক্রীতদাস বিক্রয় বাবত	,, ৪।০ হিঃ।
	(প্রত্যেক ক্রীতদাস বা দাসী হিঃ)
পাট্টা লইবার বাবত	৪।০ (প্রত্যেক পাট্টা)।
সালিসি-নামা	২০পণ কড়ি।
ঋণ আদায়	(ডিউটির সময়ের উল্লেখ নাই)
বন্ধকী খত	শতকরা পাঁচ টাকা।
বিবাহের লাইসেন্স	,, তিন টাকা।

১. কলেক্টরীর কাগজপত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, একবার মহারাজ নবকৃষ্ণকেও এই ব্যাপারের জন্য লড়িতে হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার ইছাপুরের জমির পরিবর্তে, ভিতর সিমলা ও বাজার কলিকাতার কতক জমি এওয়াজীরূপে পান। কোম্পানি বাহাদুরই এই দান করেন। কোম্পানির বারুদখানা নির্মাণের জন্যই ইছাপুরে এই জমির প্রয়োজন হয়। তদানীন্তন কলেক্টর সাহেব প্রথামত কমিশন দাবি করিলে, নবকৃষ্ণ তাহা দিতে অসম্মত হন। কাউন্সিলের বিচারে নবকৃষ্ণের জেদই বজায় থাকে। অর্থাৎ তাঁহাকে কোনরূপ কমিশন দিতে হয় নাই, কারণ তিনি কোম্পানির বারুদখানা নির্মাণের জন্যই এই জমি দিয়াছিলেন।

পণ্য-দ্রব্যাদি	মাসুলের বা ডিউটির হার
রসী-সেলামী (বাস্তুর জরিপি-খরচা)	,, এক টাকা।
নূতন নির্মিত নৌকা, ডিঙ্গি ও বোট প্রভৃতির জন্য	৫০ টাকা হইতে ১০০ টাকা। (নৌকার বোঝাইএর মাপ অনুসারে দরের পরিবর্তন হইত)
মদের ডিউটি	২।০ ছিঃ।
ঢেঁড়া পিটিবার খরচা	এক কাহন এক পণ কড়ি।
চাউলের রপ্তানি	প্রতিমণে একসের আট ছটাক চাউল।
এত্‌লাক বাবতে	নির্দিষ্ট হার ছিল না।
জরিমানা বাবতে	,, ,,

বাদী-প্রতিবাদীর উপর সমন বাহির করা, কোন অধমর্ণকে আটক করিয়া রাখার প্রার্থনা, কাহাকেও কারারুদ্ধ করিবার দরখাস্ত প্রভৃতির জন্য যে 'কোর্ট-ফি' দিতে হইত, তাহাই 'এত্‌লাক' নামে পরিচিত ছিল। 'এত্‌লাকের' কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না।

দেওয়ানী ও ফৌজদারি মোকদ্দমায়, প্রত্যেক আদালতের পেয়াদা, অর্থী-প্রত্যর্থীর কাজের জন্য, প্রতিদিন 'তিনপণ কড়ি' মেহনত আনা বা খোরাকি হিসাবে পাইত। এই তিন পণের মধ্যে এত্‌লাক খরচা হিসাবে কোম্পানি-বাহাদুরের খাতায় একপণ কড়ি পাইত। 'এত্‌লাক-মুড়ি' বা দরখাস্ত লেখকগণ ফি-স্বরূপে পাইত।[১]

১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের পুরাতন কাগজাত হইতে দেখা যায়, নিম্নলিখিত লোকদিগকে কোম্পানি-বাহাদুর ব্যবসায়ের জন্য লাইসেন্স দিয়াছিলেন। কি হারে এবং কোন্ দ্রব্যের ব্যবসার জন্য এই লাইসেন্সগুলি দেওয়া হইয়াছিল ও যে সকল ব্যক্তি লাইসেন্স লইয়াছিল, তাহাদের নামের তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

কারবারের নাম	লাইসেন্স গৃহীতার নাম	বাৎসরিক হার	মেয়াদ
(১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দ)		সিক্কাটাকা	একবৎসর
আয়নার কারখানা	রামকৃষ্ণ ঘোষ	৯০০	,,
নৌকা এবং বোট ক্রয় বিক্রয়	মনোহর মুখোপাধ্যায়	১০৫০	,,
আতসবাজী	ময়নদ্দী বারুদওয়ালা	৯৭০	,,
সিন্দুর প্রভৃতি	নারায়ণ সামন্ত	৭৫০	,,
মেটে সিন্দুর, হীরাকস ইঃ	ফকিরচাঁদ দত্ত	২৬০	,,
গাঁজা ও সিদ্ধির দোকান	বাবুরাম ঘোষ	৪০০০	,,
(১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ)			
আয়নার কারখানা	বাবুরাম ঘোষ	৮৫০	,,
মেটে সিন্দুর ইত্যাদি	জগন্নাথ হালদার	৮৩০	,,
হীরাকস, ফট্‌কিরি তুঁতে ইত্যাদি	জগন্নাথ হালদার	৩২৫	,,
সিদ্ধির দোকান	আনন্দরাম বিশ্বাস	৪৩০০	,,
আতসবাজী	কালীচরণ সিংহ	৮২৫	,,

উল্লিখিত লাইসেন্সগুলি ছাড়া আরও দুইটি অদ্ভুত রকমের লাইসেন্সের ব্যাপার পুরাতন রেকর্ডে দেখিতে পাইয়াছি। শ্রাদ্ধশান্তির সময় ধর্মার্থে ষাঁড় দাগিবার প্রয়োজন হইত। এজন্য কোম্পানি-বাহাদুর 'রামেশ্বর সমরুৎ গোপকে' আদেশ ও অনুমতি দান করিতেছেন, "যে সকল লোক শ্রাদ্ধাদি ধর্মকার্যে দাগ দিবার জন্য বৃষ চাহিবে, তুমি তাহা জোগাইবে। এজন্য তোমাকে লাইসেন্স দেওয়া যাইতেছে। ইহার যাহা নির্ধারিত ফি আছে, তাহাই তুমি [illegible] নিকট

১. Holwell's *Tracts. A Historical Account of Old Collector's Cutcherry* p. 94.

হইতে লইতে বাধ্য। কোনরূপে জোর জবরদস্তিতে বা অন্যায় করিয়া অতিরিক্ত মূল্যের দাবি করিতে পারিবে না। যদি এরূপ কর ও তাহা প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তোমার লাইসেন্স কাড়িয়া লওয়া হইবে।" অবশ্য ইহা লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র মাত্র। এ ব্যবসায় সম্ভূত আয়ের সহিত কোম্পানি বাহাদুরের কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। যাহাতে [illegible] উপর এই শ্রেণীর লোক জোর-জবরদস্তি করিয়া বেশী টাকা আদায় করিতে না পারে, তজ্জন্যই এই ভাবে আদেশ প্রদান করা হয়।[১]

আর একখানি লাইসেন্সের প্রতিলিপির মর্মানুবাদ হইতে জানিতে পারা যায়, ফকির বৈষ্ণব ভিক্ষুকেরা দোকানদারের নিকট প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভিক্ষা পাইত। কোম্পানি বাহাদুর সে ভিক্ষারও পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। একখানি সনন্দের প্রতিলিপিতে আছে—"নিমাই চরণ দাস ব্রজবাসী ফকিরকে আদেশ করা যাইতেছে যে, সে কলিকাতা সহর ও তাহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের প্রত্যেক দোকান হইতে দৈনিক এক কড়া কড়ি ভিক্ষারূপে চাহিতে পারিবে।" বোধ হয় সহরের প্রত্যেক ভিক্ষুককে এই ভাবে লাইসেন্স লইতে হইত। ভিক্ষুকেরা যে জোর-জবরদস্তি করিয়া দোকানির নিকট বেশী আদায় করিত, এরূপ ব্যবস্থাই তাহারই প্রমাণ।[২]

এতদ্ভিন্ন সেইসময়ে Farming-License বলিয়া কোম্পানি-বাহাদুরেব আর একটা আয়ের পথ ছিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের দশ বৎসর পরের একটি 'ফারমিং-লাইসেন্সের' নকল আমরা পাইয়াছি। তখন খাস কলিকাতা সহরে ও তাহার আশেপাশে যে অনেকগুলি বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয়। এই সমস্ত বাজারের দোকানসমূহ হইতে আমদানি-রপ্তানি মালামাল প্রভৃতির শুল্ক বা ডিউটি আদায় করিবার জন্য এই বাজারগুলি সাধারণকে দেওয়া হইত। এইরূপ জমা দেওয়াকে 'তোবাজারী' বলিত। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীরাই এই সব বাজার বেশীর ভাগ জমা লইত। তাহারা বাজারের শুল্ক ও তোলা প্রভৃতি আদায় করিত এবং কোম্পানির প্রাপ্য কোম্পানিকে চুকাইয়া দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা নিজেরা পকেটস্থ করিত। এরূপ বাজার জমা লওয়া সেকালে খুব একটা লাভের ব্যবসায় ছিল। এই তোবাজারীর তালিকা হইতে জানা যায়—১৭৬৮ সালে কলিকাতায় অনেকগুলি বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ও তাহাদের অধিকাংশ এখনও বর্তমান। অনেক সাহেবসুবোও অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় বাজার-জমা বা তোবাজারীর জন্য লোলুপ হইতেন।

কলিকাতার কলেক্টর সাহেবই জমাপ্রার্থিগণের আবেদন গ্রহণ করিতেন। তাঁহার আদেশই এ ব্যাপারে চরম আদেশ ছিল। কাউন্সিলের সহিত এ সব ব্যাপারের কোন সম্বন্ধই ছিল না। খোদ কলেক্টর সাহেবও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এ ব্যাপার দেখিতেন না। প্রায়ই তাঁহার ব্ল্যাক-ডেপুটির হাতে এই সমস্ত বাজার জমা দিবার ভার পড়িত। যাহারা জমা লইত তাহাদের অধিকাংশই ব্ল্যাক-ডেপুটির আশ্রিত লোক। এজন্য নানাবিধ অত্যাচার ও লোকপীড়ন দ্বারা তাহারা নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত টাকা, তোলা বা শুল্করূপে আদায় করিত। ব্ল্যাক-ডেপুটিও তাহাদের লাভের বখরা পাইতেন। হলওয়েল বলেন, "এই সব ব্যাপারেই ব্ল্যাক-ডেপুটি গোবিন্দরাম প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছিলেন। সেকালে গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ির দুর্গোৎসব খুব উৎসবময় ব্যাপার ছিল।"

---

১. To Ramessor Samroot Gope. Any persons that are willing to mark their bulls for the use of their funeral ceremonies, you are to receive your customary fees, provided it should not be taken by force and demanding any improper or superfluous fees on pain of punishment, and immediate dismissal from the occupation—***License, dated, Calcutta 1st April 1765.***

২. To Nemoy Churon Dass Birjobasee Fakeer—"You are to receive one cowree per diem on each shop within the Town and Districts of Calcutta as an alms for the maintenance of the beggars.—***License, dated Calcutta 31st July 1765.***

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ৪নং এর ফাইলভুক্ত 'তোবাজারী' বা কলিকাতার বাজারসমূহ জমার ফিরিস্তির নকল

বাজারের নাম	কোম্পানির সেরেস্তায় ইংরাজি নাম	বাৎসরিক জমার পরিমাণ (সিক্কাটাকা)	প্রত্যেক দোকানে তোলার হার ১৩ কড়া	জমা-গৃহীতার নাম
হাটখোলা-বাজার	Hautcollan	৫০	ঐ	নবকিশোর রায়
সুতালুটি-বাজার	Sootanuttee	৫৭০	ঐ	নবকিশোর রায়
বড়বাজার	Borow Bazar	৮০০	ঐ	রামহরি রায়
রামবাজার[১]	Ram Bazar	২০০		রামসুন্দর মিত্র
শিমলাবাজার	Simlau Bazar	২৭৫		নিমাইচরণ মিত্র
চার্লসবাজার	Charles Bazar	১৪০		রামপ্রসাদ বক্সী
বৈঠকখানাবাজার	Boytocannah	৭৫০		সন্তরাম ভুঞ্জ
অরকলিবাজার	Arcooley	৬		রামসুন্দর বসু
শোভাবাজার	Sobau Bazar	২৭৫		জমাগৃহীতার নাম নাই
জন-বাজার (জানবাজার?)	John Bazar	৫০১	ঐ	দয়ারাম চাটার্জি
ধর্মতলাবাজার	Dormotollau Bazar	৫০০	ঐ	রামদুলাল দত্ত
কলুটোলাবাজার	Collootollau Bazar	১১৫	ঐ	গোকুল শিরোমণি
মেছুয়াবাজার	Matchooah Bazar	৪৫০	ঐ	ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
কলি	Collingaw Bazar	২৫০	ঐ	ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
জননগরবাজার	John Nagor Market	২৬৫	ঐ	ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
রাজারনগরবাজার	Razernagor Bazar	২৫৫		ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
লালবাজার	Lal Bazar	২০১	ঐ	ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
বৌবাজার	Bow Bazar	৩৭৫	ঐ	ফ্রান্সিস্ পেরেরা
নৌকা ও বোট প্রভৃতির জন্য লাইনেন্স		১৮২৩	ঐ	গোপীচরণ ঠাকুর
ভাঙ সিদ্ধি গাঁজা		৫৮৩	ঐ	বাবুরাম পাল
মেটে সিন্দুর		৩২৫	ঐ	বিষ্ণুরাম পাল

(১লা মে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ) আর, বিচার, কলেক্টর। কলিকাতা।

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, কলিকাতায় ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের দশ বৎসর পরে, আঠারটি বাজার ছিল। এই সমস্ত বাজার কোম্পানি বাহাদুরের সম্পত্তি। তাঁহারা বাৎসরিক জমা ধার্য করিয়া 'ফারমার' বা ইজারাদারগণকে বাৎসরিক মেয়াদে এগুলি জমাবিলি করিতেন। এই সকল বাজার হইতে প্রতি বৎসর আট নয় হাজার টাকা আয় হইত। বাজারের ইজারাদারদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। একজন শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়ও, সেই প্রাচীন কলিকাতার বাজার জমা লইয়াছিলেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য-দ্রব্যের আয়ের অবস্থা বুঝিয়া এইরূপ ইজারায় বিলি হইত।

১৭৭৪ সালের ১লা মার্চ তারিখের একখানি পাট্টার নকল হইতে আর একটি অদ্ভুত

১. রামবাজার ত নাই! ইহা শ্যামবাজার নয় ত? বোধ হয় লিখিবার ভুল।

জিনিসের লাইসেন্স দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাট্টাখানি কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর ফিলিপ ডেকারের আমলের। এই পাট্টায় লিখিত আছে যে. "সেখ নানকুকে এই পাট্টা দেওয়া যাইতেছে। সেখ নানকু কলিকাতার একজন অধিবাসী। ইংরাজ কোম্পানির ফ্যাক্টর ও অন্যান্য সাহেব কর্মচারীদের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজদের পানীয় ও মদিরা শীতল রাখিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সোরা ব্যবহৃত হয়। এই সকল সোরার জল নালা বাহিয়া পড়িয়া বৃথা নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা আগুনে ফুটাইয়া লইলে পুনরায় এই জল হইতে নূতনভাবে সোরা প্রস্তুত হইতে পারে। এজন্য নানকুর প্রার্থনা মতে, তাহাকে বাৎসরিক ১০০ টাকা হারে এই সোরার জল সংগ্রহ করি-করিবার অধিকার দেওয়া হইল। এই পাট্টার মেয়াদ তিন বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে।"[১]

উল্লিখিত কোম্পানি-বাহাদুর তাঁহাদের প্রজাদের নিকট যে টাকা আদায় করিতেন, তাহা 'টাউন-ডিউটি' বলিয়া অভিহিত হইত। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ পরবর্তী কালে, এই টাউন-ডিউটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ইহার পুনঃ প্রচলন দেখা যায়। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের দশ আইনের বলে ইহা পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৩০ অব্দের পর আর ইহার প্রচলন দেখা যায় না।

এই সমস্ত ইজারাদারেরা বাজার প্রভৃতি জমা লইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা. বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালী ব্যবসাদারের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। কোম্পানি বাহাদুরকে তাঁহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলে, অত্যাচারাদি সম্বন্ধে সকল গোলমালই মিটিয়া যাইত। কিন্তু 'ফারমার' বা ইজারাদারেরা ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম-জবরদস্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হারের উপর বৃত্তি আদায় করিতেন। এই প্রকার উপায়ে তাঁহাদের অনেকেই প্রচুর বিত্তশালী হন। কলিকাতার ব্ল্যাক-জমিদারকে তাঁহারা হাতে রাখিতেন। কারণ, দেশীয়দের মধ্যে ছোট খাট মামলা মোকদ্দমার সরাসর বিচারের ভার এই 'ব্ল্যাক-জমিদারের' হাতেই ছিল।[২] ইহার আর আপীল ছিল না। ব্ল্যাক-জমিদারও অনেক সময়ে বেনামী করিয়া বাজার প্রভৃতি নিজের লোক দ্বারা জমা লইতেন। কাজেই ব্যবসায়ীদের উপর অন্যায় জুলুম হইলে, তাহারা নালিশ পর্যন্ত করিতে পারিত না। কারণ এ প্রকার স্থলে যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক। এই জন্যই গোবিন্দরাম মিত্রের প্রতাপ এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল। ইজারাদারদের অধীনস্থ খাজনা সংগ্রহকারিগণ দোকানীপসারী ও সর্বশ্রেণীর পণ্য-বিক্রেতার উপর ভয়ানক জুলুম করিত। এমনকি বাজারে চৌকি দিবার জন্য যে সমস্ত সিপাহী থাকিত, তাহারাও জোর জবরদস্তি করিয়া ফলমূল বিক্রেতাদের চাঙ্গারী হইতে কিছু না কিছু, বলপূর্বক উঠাইয়া লইত।[৩]

১. *Calcutta Committee of Revenue dated 18th March 1774.*—P.M. Dacres.

২. According to Alderman Bolts the Zaminder enquires into complaints of a criminal nature among the black inhabitants in cases where the natives do not apply to the English established Courts of Justice. He proceeds also in the above summary way to sentence and punishment by fine, imprisonment, condemnation to work in chains upon the roads for any space of time, even for life and by flagellation that in capital cases even to death. ব্ল্যাক-জমিদারের হস্তে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ক্ষমতা থাকিলেও মুসলমান প্রজাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা ছিল। চরম অপরাধে তাহাদের ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হইত না। কারণ, নবাবী আমলের বিধানানুসারে অপরাধী মুসলমানকে এরূপ ভাবে দণ্ডিত করা মুসলমান কর্তারা অপমানকর বলিয়া বোধ করিতেন। এজন্য ইংরাজি আইনের পরিবর্তে মুসলমানদের প্রচলিত বিধি অনুসারে হত্যাকারী বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে চাবুক মারিয়া হত্যা করা হইত। এজন্য সে সময়ে আদালতে 'চাবুক সওয়ার' বলিয়া আর এক শ্রেণীর ঘাতক নিযুক্ত ছিল। ইহারা দুই তিন চাবুকেই অপরাধীর দফা শেষ করিয়া দিত। অবশ্য এরূপস্থলে জমিদারকে কাউন্সিলের অভিমত লইতে হইত।

১. The collection of many of their dues and taxes gives occasion to great oppression from the farmers and the numberless harpies who are necessarily employed as taxgatherers and are in general of great prejudice to industry and population among the lower class of people, who are harassed on all sides for it is even a common thing to

১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে ৪নং এর ফাইলভুক্ত 'তৌবাজারী' বা কলিকাতার বাজারসমূহ জমার ফিরিস্তির নকল

বাজারের নাম	কোম্পানির সেরেস্তায় ইংরাজি নাম	বাৎসরিক জমার পরিমাণ (সিক্কাটাকা)	প্রত্যেক দোকানে তোলার হার ১০ কড়া	জমা-গৃহীতার নাম
হাটখোলা-বাজার	Hautcollan	৫০		নবকিশোর রায়
সুতালুটি-বাজার	Sootanuttee	৫৭০		নবকিশোর রায়
বড়বাজার	Borow Bazar	৮০০		রামহরি রায়
রামবাজার[১]	Ram Bazar	২০০		রামসুন্দর মিত্র
শিমলাবাজার	Simlau Bazar	২৭৫		নিমাইচরণ মিত্র
চাল সবাজার	Charles Bazar	১৪০		রামপ্রসাদ বক্সী
বৈঠকখানাবাজার	Boytocannah	৭৫০		সন্তরাম ভুঞ্জ
অরকলিবাজার	Arcooley	৬		রামসুন্দর বসু
শোভাবাজার	Sobau Bazar	২৭৫		জমাগৃহীতার নাম নাই
জন-বাজার (জানবাজার?)	John Bazar	৫০১		দয়ারাম চাটার্জি
ধর্মতলাবাজার	Dormotollau Bazar	৫০০		রামদুলাল দত্ত
কলুটোলাবাজার	Collootollau Bazar	১১৫		গোকুল শিরোমণি
মেছুয়াবাজার	Matchooah Bazar	৪৫০		ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
কলিঙ্গাবাজার	Collingaw Bazar	২৫০		ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
জননগরবাজার	John Nagor Market	২৬৫	ঐ	ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
রাজারনগরবাজার	Razernagor Bazar	২৫৫	ঐ	ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
লালবাজার	Lal Bazar	২০১		ফ্রান্সিস্ ডি মেলো
বৌবাজার	Bow Bazar	৩৭৫		ফ্রান্সিস্ পেরেরা
নৌকা ও বোট প্রভৃতির জন্য লাইনেন্স		১৮২৩	ঐ	গোপীচরণ ঠাকুর
ভাঙ্গ সিদ্ধি গাঁজা		৫৮৩	ঐ	বাবুরাম পাল
মেটে সিন্দুর		৩২৫	ঐ	বিষ্ণুরাম পাল

(১লা মে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ)

আর, বিচার, কলেক্টর।
কলিকাতা।

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, কলিকাতায় ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের দশ বৎসর পরে, আঠারটি বাজার ছিল। এই সমস্ত বাজার কোম্পানি বাহাদুরের সম্পত্তি। তাঁহারা বাৎসরিক জমা ধার্য করিয়া 'ফারমার' বা ইজারাদারগণকে বাৎসরিক মেয়াদে এগুলি জমাবিলি করিতেন। এই সকল বাজার হইতে প্রতি বৎসর আট নয় হাজার টাকা আয় হইত। বাজারের ইজারাদারদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙ্গালী। একজন শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়ও, সেই প্রাচীন কলিকাতার বাজার জমা লইয়াছিলেন এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বাণিজ্য-দ্রব্যের আয়ের অবস্থা বুঝিয়া এইরূপ ইজারায় বিলি হইত।

১৭৭৪ সালের ১লা মার্চ তারিখের একখানি পাট্টার নকল হইতে আর একটি অদ্ভুত

১. রামবাজার ত নাই! ইহা শ্যামবাজার নয় ত? বোধ হয় লিখিবার ভুল।

জিনিসের লাইসেন্স দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাট্টাখানি কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর ফিলিপ ডেকারের আমলের। এই পাট্টায় লিখিত আছে যে. "সেখ নানকুকে এই পাট্টা দেওয়া যাইতেছে। সেখ নানকু কলিকাতার একজন অধিবাসী। ইংরাজ কোম্পানির ফ্যাক্টর ও অন্যান্য সাহেব কর্মচারীদের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজদের পানীয় ও মদিরা শীতল রাখিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সোরা ব্যবহৃত হয়। এই সকল সোরার জল নালা বাহিয়া পড়িয়া বৃথা নষ্ট হয়। কিন্তু ইহা আগুনে ফুটাইয়া লইলে পুনরায় এই জল হইতে নূতনভাবে সোরা প্রস্তুত হইতে পারে। এজন্য নানকুর প্রার্থনা মতে, তাহাকে বাৎসরিক ১০০ টাকা হারে এই সোরার জল সংগ্রহ করি-করিবার অধিকার দেওয়া হইল। এই পাট্টার মেয়াদ তিন বৎসরকাল বলবৎ থাকিবে।"[১]

উল্লিখিত কোম্পানি-বাহাদুর তাঁহাদের প্রজাদের নিকট যে টাকা আদায় করিতেন, তাহা 'টাউন-ডিউটি' বলিয়া অভিহিত হইত। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ পরবর্তী কালে, এই টাউন-ডিউটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ইহার পুনঃ প্রচলন দেখা যায়। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দের দশ আইনের বলে ইহা পুনরায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৩০ অব্দের পর আর ইহার প্রচলন দেখা যায় না।

এই সমস্ত ইজারাদারেরা বাজার প্রভৃতি জমা লইতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা. বাঙ্গালী হইয়াও বাঙ্গালী ব্যবসাদারের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। কোম্পানি বাহাদুরকে তাঁহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিলে, অত্যাচারাদি সম্বন্ধে সকল গোলমালই মিটিয়া যাইত। কিন্তু 'ফারমার' বা ইজারাদারেরা ব্যবসায়ীদের উপর জুলুম-জবরদস্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হারের উপর বৃত্তি আদায় করিতেন। এই প্রকার উপায়ে তাঁহাদের অনেকেই প্রচুর বিত্তশালী হন। কলিকাতার ব্ল্যাক-জমিদারকে তাঁহারা হাতে রাখিতেন। কারণ, দেশীয়দের মধ্যে ছোট খাট মামলা মোকদ্দমার সরাসর বিচারের ভার এই 'ব্ল্যাক-জমিদারের' হাতেই ছিল।[২] ইহার আর আপীল ছিল না। ব্ল্যাক-জমিদারও অনেক সময়ে বেনামী করিয়া বাজার প্রভৃতি নিজের লোক দ্বারা জমা লইতেন। কাজেই ব্যবসায়ীদের উপর অন্যায় জুলুম হইলে, তাহারা নালিশ পর্যন্ত করিতে পারিত না। কারণ এ প্রকার স্থলে যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক। এই জন্যই গোবিন্দরাম মিত্রের প্রতাপ এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল। ইজারাদারদের অধীনস্থ খাজনা সংগ্রহকারিগণ দোকানীপসারী ও সর্বশ্রেণীর পণ্য-বিক্রেতার উপর ভয়ানক জুলুম করিত। এমনকি বাজারে চৌকি দিবার জন্য যে সমস্ত সিপাহী থাকিত, তাহারাও জোর জবরদস্তি করিয়া ফলমূল বিক্রেতাদের চাঙ্গারী হইতে কিছু না কিছু, বলপূর্বক উঠাইয়া লইত।[৩]

১. *Calcutta Committee of Revenue dated 18th March 1774.*—P.M. Dacres.

২. According to Alderman Bolts the Zaminder enquires into complaints of a criminal nature among the black inhabitants in cases where the natives do not apply to the English established Courts of Justice. He proceeds also in the above summary way to sentence and punishment by fine, imprisonment, condemnation to work in chains upon the roads for any space of time, even for life and by flagellation that in capital cases even to death. ব্ল্যাক-জমিদারের হস্তে অপরাধীর প্রাণদণ্ডের ক্ষমতা থাকিলেও মুসলমান প্রজাদের সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা ছিল। চরম অপরাধে তাহাদের ফাঁসি দিয়া হত্যা করা হইত না। কারণ, নবাবী আমলের বিধানানুসারে অপরাধী মুসলমানকে এরূপ ভাবে দণ্ডিত করা মুসলমান কর্তারা অপমানকর বলিয়া বোধ করিতেন। এজন্য ইংরাজি আইনের পরিবর্তে মুসলমানদের প্রচলিত বিধি অনুসারে হত্যাকারী বা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে চাবুক মারিয়া হত্যা করা হইত। এজন্য সে সময়ে আদালতে 'চাবুক সওয়ার' বলিয়া আর এক শ্রেণীর ঘাতক নিযুক্ত ছিল। ইহারা দুই তিন চাবুকেই অপরাধীর দফা শেষ করিয়া দিত। অবশ্য এরূপস্থলে জমিদারকে কাউন্সিলের অভিমত লইতে হইত।

১. The collection of many of their dues and taxes gives occasion to great oppression from the farmers and the numberless harpies who are necessarily employed as tax-gatherers and are in general of great prejudice to industry and population among the lower class of people, who are harassed on all sides for it is even a common thing to

প্রাচীন কলিকাতার Land Revenue (জমির খাজনা) হইতে কিরূপ আয় হইত, বাজার প্রভৃতির ইজারা হইতে কিরূপ আয় হইত, তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি পাঠকবর্গের গোচরে আনিয়াছি। এক্ষণে 'এক্সাইজ' অর্থাৎ আবকারী-বিভাগের কথা বলিব।

আবকারী বিভাগের লাইসেন্স-দানের ক্ষমতাও কলেক্টর বা জমিদার সাহেবের হাতে ছিল। পূর্বে আমরা কোম্পানি বাহাদুরের 'কন্সলটেসন' বহির যে সারসংগ্রহ দিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক এরূপ লাইসেন্স দানের উদাহরণ দেখিতে পাইয়াছেন। সেকালে আরমিনিয়ান-আরক আর জাভা ও ব্যাটোভিয়া হইতে আমদানি একপ্রকার স্বল্পদরের মদ্যই কলিকাতায় বেশী প্রচলিত ছিল। তখন এদেশে ভাটি বা চোলাইয়ের কারখানা ছিল কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহা হউক, এই সমস্ত 'আরক-হাউস' বা মদের দোকান প্রাচীন কলিকাতার অতি পুরাকাল হইতেই বর্তমান ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তখন বিলাতী-মদিরা এত সস্তা ছিল না। এই সমস্ত আরকের দোকানে যে সমস্ত মদ বিক্রয় হইত, তাহার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইত। তবে চিরকালই যেমন হইয়া আসিতেছে, মদের লাইসেন্সগুলি অতি উচ্চদরেই দেওয়া হইত। কোম্পানি বাহাদুরের অধীনস্থ সেলার ও গোরারা যাহাতে এই সব দোকানে জটলা করিয়া সহরের অশান্তি বৃদ্ধি না করিতে পারে, তাহারও কঠোর ব্যবস্থা ছিল। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বিবি ডেমিঙ্গো এ্যাশ্‌, গোবিন্দ সুঁড়ী প্রভৃতির লাইসেন্স গ্রহণের কথা শোনা যায়।

বেশী রাত্রি পর্যন্ত এই সমস্ত মদের দোকান খুলিয়া রাখিবার নিয়ম ছিল না। পাঠক মনে রাখিবেন যে, সেকালের নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা সহর, তখন একটি বন্দর মাত্র। নানা স্থান হইতে জাহাজ আসিয়া সুতালুটিতে নঙ্গর করিত। অনেক পর্টুগীজ, ফরাসী ও ইংরাজ-সেলার সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই সমস্ত দোকানে আড্ডা ও জটলা করিত। কোম্পানির কলিকাতার নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও গোরাদের অনেকে এই আরক বা পঞ্চ-হাউসের নিয়মিত খরিদদার ছিল। এজন্য সহরের মধ্যে অনেক স্থলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত হইত। অনেক সময় এদেশীয়ও সাহেবদের মধ্যে দাঙ্গা ঘটিয়া খুন-জখম হওয়াতে সহরের মধ্যে নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইত।

খাস কলিকাতা সহর ছাড়া সহরের অন্যান্য অংশে ১৭৬৮ খৃীস্টাব্দের পূর্বে মদের দোকান খুলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৭৬৮ খৃীস্টাব্দের তিন নম্বরের লাইসেন্স হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "অনন্তরাম কুণ্ডু নামক একব্যক্তি ৮৬৭ সিক্কা টাকায় চিৎপুর-পল্লীতে মদ্য বিক্রয়ের একচেটিয়া স্বত্ব লাভ করিল। মাত্র তিন বৎসরের জন্য এই স্বত্ব দেওয়া হইল।"[১]

আরক-বিক্রয়ের এইরূপ একচেটিয়া স্বত্ব লাভ করিয়া অনেক দোকান 'ফেইল' হইয়াছিল। ১৭৭৬ খৃীস্টাব্দের এক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, "মিঃ লেভেট নামক এক ব্যক্তি সহরমধ্যে আবকারী বিক্রয়ের স্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি লাইসেন্সের টাকা ক্রমাগত বাকি ফেলিয়া কোম্পানির নিকট দশ হাজার টাকার জন্য দায়ী হইয়া পড়িয়াছেন।"

কোম্পানি বাহাদুর ১৭৯০ খৃীস্টাব্দে মানবের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত শুল্ক তুলিয়া দেন। কিন্তু আবকারী বিভাগের লাইসেন্স সমভাবেই থাকে। ১৮০০ খৃীস্টাব্দের ৪নং এর রেগুলেসন হইতে জানা যায়, "মদের দোকানওয়ালাদের লাইসেন্স ও সহরের মধ্যে খুচরাভাবে মদিরা বিক্রয় প্রথা সম্বন্ধে নিয়মগুলি পরিবর্তিত হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে কলিকাতার 'জাস্টিস অব দি পীস'-গণ যে সমস্ত বিধান প্রচলন করিবেন, তাহাই বলবৎ রাখা হইবে।"

see the sepoys who are stationed as guards at different places take from the poor as they pass something out of every one's basket.—Bolt's *Considerations.*

১. Millet's *Minute.* Sterndale's *Report on Old Calcutta Collectorate.* Bolt's *Considerations.*

এই সমস্ত মদের দোকানের ফলে কলিকাতার মধ্যে চোর-ডাকাত গুণ্ডা বদমায়েসের উপদ্রব বৃদ্ধি হইত। ৯৩ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮০০ খৃীস্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারি তারিখে 'জস্টিস অব দি পীসগণ' কলিকাতার আবকারি দোকানসমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান শেষ করিয়া, এক সুবৃহৎ মন্তব্য গবর্ণমেণ্টে দাখিল করেন। সে মন্তব্যের একাংশ এই, "আরকের দোকানগুলি বদমায়েসের আড্ডা ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

এই সময়ে আরকের দোকান ছাড়া কলিকাতায় গাঁজার ও সিদ্ধির দোকানও ছিল। সেকালে তাড়ির দোকানের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। জস্টিসদিগের মন্তব্য হইতে দেখা যায়, নিম্নলিখিত শ্রেণীর চোর ও বদমায়েসেরা এই সকল মদ্যালয়ে আড্ডা করিত।—

১। ডাকাত অর্থাৎ Gang-robbers.
২। বোম্বেটে (ইহারা নদীবক্ষে ডাকাতি করিত)।
৩। গিরা-কাটা আজকাল যাহারা গাঁটকাটা নামে পরিচিত)।
৪। সাধারণ চোর।
৫। গরু-চোর।
৬। জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারক।
৭। প্রতারক ও জুয়াচোর (Cheats and Swindlers)।
৮। চোরাই-মাল গ্রহণকারিগণ।[১]

১৮০০ খৃীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, কলিকাতায় 'জস্টিস-অব-দি-পীসগণ' পূর্বোক্ত সুদীর্ঘ পত্রযোগে, তখনকার গবর্ণর জেনারেল সাহেবকে এই সমস্ত দোকানের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া, তাহার লাইসেন্স-মুদ্রা পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য এক পত্র লেখেন। তাহার একাংশের ইংরাজি প্রতিলিপি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।[২]

এই কঠোর ব্যবস্থার ফলে মদের দোকানের উপদ্রব-অত্যাচার অনেক কমিয়া আসে। এই সময়ে প্রত্যেক মদ্য-বিক্রেতাকে প্রতিদিন ১২৷৷০ গ্যালন মদ্য বিক্রয়ের স্বত্ব দেওয়া হয়। এইজন্য তাহাদের দৈনিক ৫ টাকা হারে লাইসেন্স দিতে হইত। ইহার অতিরিক্ত বিক্রয় করিলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হইত। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই সব দোকান খোলা থাকিত। গাঁজা ও তাড়ির দোকানওয়ালাদের দৈনিক আট আনা হিসাবে লাইসেন্স দিতে হইত।

সহরে যে সমস্ত সাহেবী মদের দোকান ছিল, তাহাদের দোকানে বা দোকান সংলগ্ন হোটেলে কোন্ শ্রেণীর লোকজন জমায়েত হইতেছে বা জটলা করিতেছে, তাহার একটি দৈনিক মন্তব্য পুলিসে দিতে হইত।

আজকাল যেখানে পুলিসকোর্ট হইয়াছে সেই স্থানে 'হারমোনিক ট্যাভার্ণ' (Harmonic Tavern) বা সেকালের বিখ্যাত বিলাতী মদের দোকান ছিল। বর্তমান সেণ্ট জন গির্জার নিকট 'ইউনিয়ান' ও 'রাইটস্ নিউ ট্যাভার্ণ' বলিয়া দুইখানি দোকান ছিল। আজকাল যেখানে

১. এই সমস্ত চোরাইমাল গ্রহণ ও বিক্রয়কারীদের মধ্যে "পোদ্দারগণ (Petty shorffs and poddars) স্যাকরা, পর্টুগীজ, আর্মানী ও বাঙ্গালী নিলামওয়ালাগণ, এদেশীয় ঘড়িওয়ালা, কালাপাত্তিওয়ালা (oakumsellers) পাইকারী দোকানরক্ষকগণ, বিক্রীওয়ালা, ধোপা, রিপুগার, শাল-রিপুওয়ালা, পুরাতন কাপড় বিক্রেতাগণ, মজুর, খালাসি, মাঝি, বেহারা ও অন্যান্য শ্রেণীর চাকর-বাকরের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

২. To check in some degree the vice of drunkenness now so prevalent among the lower class of natives in the town of Calcutta and to impose such restrictions on the vend of spirituous liquors and today as shall prevent these shops from continuing as at present the rendezvous of thieves and robbers, vagabond of all descriptions. we beg leave to recommend, that duty charged on licenses for the retail of spirituous liquors be considerably raised and that the vendor be required to give security and enter into penalty bonds to obey the police regulations set forth in the Appendix—*Letter from Justices of the Peace to Governor-General dated, 31st January 1800.*

কলিকাতা এক্সচেঞ্জ অফিস আছে, সেস্থানে 'এক্সচেঞ্জ' 'ক্রাউন ও এংকর' বলিয়া আরও দুইখানি দোকান ছিল।

১৮১৮ খৃীস্টাব্দে কোম্পানি বাহাদুরের আবকারি-বিভাগের আয় দুইলক্ষ টাকার উপর দাঁড়ায়।

কোম্পানি বাহাদুরের জমিদারি ও এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা সার-সংগ্রহ করিয়া আমরা পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিলাম। পাঠক ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন, ১৭০৮ হইতে ১৮০০ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ এই একশত বৎসর মধ্যে প্রাচীন কলিকাতা সর্ববিষয়ে কিরূপ ধীরে ধীরে উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

বঙ্গে বর্গী ও তৎসময়ের কলিকাতা

নবাব আলিবর্দির আমল—বর্গীর হাঙ্গামা—বর্গীবিভীষিকায় বঙ্গের অবস্থা—মহারাষ্ট্র পুরাণ বা বর্গীর হাঙ্গামার বৃত্তান্ত-সম্বলিত প্রাচীন পুঁথি—এই হাঙ্গামার সময় কলিকাতার অবস্থা—নানাস্থান হইতে লোকজনের কলিকাতা প্রবেশ—কলিকাতা সুরক্ষিত করিবার জন্য খাত খনন কল্পনা—নবাবের নিকট এই খাত খননের অনুমতি গ্রহণ—মারহাট্টা-ডিচ বা খাত—এই খাতের পূর্ণ বিবরণ ও স্থান নির্দেশ—কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীদের এই খাতখনন ব্যাপারে সাহায্য—এই খাতের পরিণামে বর্তমান সারকুলার রোডের সৃষ্টি—১৭৪২ খৃীস্টাব্দে অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামার সময় কলিকাতা সহরের অবস্থা—কলিকাতার চারিদিকে রক্ষাবন্ধনী বা প্যালিসেড—এই প্যালিসেডের মধ্যবর্তী স্থানসমূহের পরিচয়—কাপ্তেন উইলসের ১৭৫৩ খৃীস্টাব্দের কলিকাতার নক্সা—এই নক্সা-বর্ণিত বাটিগুলির বর্তমানকালে সমাবেশস্থান নির্ণয়—সেকালের কলিকাতার ইংরাজ কোয়ার্টারের পরিচয়—পলাশী আমলে বড় বড় ইংরাজদের বাটি—রামকৃষ্ণ শেঠ ও উমিচাঁদের আবাসস্থান নির্ণয়—হলওয়েলের বাটি—ক্লাইভের আবাসস্থান প্রভৃতির পরিচয়—পলাশী আমলের পূর্বে দেশীয় সহরাংশের অবস্থা—ফৌজদারি বালাখানা।

১৭৩৭ খৃীস্টাব্দে কলিকাতায় এক মহাঝড় হয়, এ ভীষণ ঝড়ের পরিচয় পাঠক ইতিপূর্বে পাইয়াছেন। এই ভীষণ ও প্রচণ্ড ঝটিকাজনিত ক্ষতি সহ্য করিয়াও প্রাচীন কলিকাতা আবার ধীর-গতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে ছিল। কিন্তু ইহার পাঁচ বৎসর পরে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া, আবার এক মহাউৎপাত উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে ‘বর্গীর-হাঙ্গামা’ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে এই বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্গীনামধারী মহারাষ্ট্রীয় দস্যুদের উৎপাতে সমস্ত বঙ্গদেশ শ্মশানবৎ হইয়া পড়ে। বর্গীরা নগর গ্রাম জ্বালাইয়া. লোকজনকে হত্যা করিয়া, নিরীহ প্রজার সর্বস্ব লুট করিয়া, সোনার বাঙ্গলার সর্ব-নাশ করিয়া যায়। ‘ঐ বর্গী আসিতেছে’ একথা শুনিলেই বাঙ্গালী স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা ভয়ে থরহরি কাঁপিয়া উঠিত, কে কোথায় পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে স্থির করিতে পারিত না। মাতৃ-ক্রোড়ে নিরীহ শিশুও এই মহারাষ্ট্রীয়জাতির কলঙ্কস্বরূপ অত্যাচারী লুণ্ঠনকারী বর্গীদের নামে শিহরিয়া উঠিত। বঙ্গদেশে এই বর্গী-হাঙ্গামার স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি ঘুমপাড়ানিয়া গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক ঠাকুমা-দিদিমা ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার সময় এই ছড়াটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়া থাকেন—

ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এল দেশে
চড়া পাখিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে ?

বর্গীর-হাঙ্গামাটা যে কি তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। বর্গীদের আক্র-মণে এই শান্তিভরা বঙ্গদেশে, বঙ্গের সুখময় পল্লীসমূহে কি ভীষণ অনর্থ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারও একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে[১] নবাব আলিবর্দি খাঁ সরফরাজ খাঁকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলার

১. গিরিয়া যুদ্ধের ঘটনাকাল ১০ এপ্রিল, ১৭৪০ খ্রী.

সুবাদারি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে শান্তিলাভ ঘটিল না। যে রাজ্য তিনি অতি সহজে লাভ করিলেন, তাহা রক্ষা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট শোণিত-ক্ষয়, সেনা-নাশ ও দশ বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে চৌথ[1] আদায়ের জন্য বর্গীগণ বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। এই মহারাষ্ট্রীয়-বর্গীদের হস্তে, বঙ্গবাসীদিগের যথেষ্ট নির্যাতন ঘটিয়াছিল। বর্গীরা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া নগর গ্রাম জ্বালাইয়া, শস্যক্ষেত্র বিমর্দিত করিয়া, বাঙ্গালী প্রজার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাদিগকে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিয়া বঙ্গদেশের একাংশ জনশূন্য করিয়া তুলিল। আলিবর্দি খাঁ বঙ্গীয় প্রজাবর্গকে এই লুণ্ঠনকারী দস্যুদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও বর্গীর উৎপাত নিবারণ করিতে পারেন নাই। বহুল নিষ্ফল চেষ্টার পর ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে নবাব আলিবর্দি বারলক্ষ টাকা ও উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গাদি দেশত্রয়কে বর্গীর অত্যাচার হইতে বিমুক্ত করেন। ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের পর সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইলে বঙ্গবাসিগণ আবার শান্তির মুখ দেখিতে পায়।

স্কুলপাঠ্য পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলায় বড় বড় ইতিহাসে এই 'বর্গীর-হাঙ্গামা' ব্যাপারের নানাপ্রকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং সেসব কথা না বলিয়া কলিকাতার সহিত এই বর্গীদের যতটুকু সম্বন্ধ, আমরা তাহাই বলিতেছি। আজকালকার প্রচলিত ইতিহাস ব্যতীত, অন্য একটি ক্ষুদ্র গাথায় এবং এক অজ্ঞাতনামা বাঙ্গালী কবির[2] কাব্যের মধ্য দিয়া, এই ব্যাপারের অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই প্রাচীন লুপ্তপ্রায় পুঁথির নাম 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ।'[3] ইহা শকাব্দ ১৬৭৩ সন ও সন ১১৫৮ সালে বিরচিত। সুতরাং ধরিতে গেলে, ইহা ১৬২ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থ।[4] ময়মনসিংহে এই পুঁথিখানির হস্তলিপি পাওয়া যায়। পরে ইহা সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় অবিকল প্রকাশিত হয়।[5]

আমরা এই কাব্যখানির বানান প্রণালী সেকালের মতই রাখিলাম। ইহা হইতে পাঠক দেড় শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গলা ভাষার নমুনাও দেখিতে পাইবেন।

১. চৌথ—The blackmail levied by the Mahrattas from the provincial Governors as compensation for leaving their districts in immunity from plunder. The term is also applied to some other exactions of like ratio.—Hobson-Jobson, New Ed. p. 215.

২. মহারাষ্ট্র পুরাণের রচয়িতা বাঙ্গালী কবি গঙ্গারাম।

৩. বইটির প্রথম প্রকাশনাকালের গণনানুসারে।

৪. মহারাষ্ট্র পুরাণের রচনার কাজ শেষ হইয়াছিল বঙ্গাব্দ ১১৫৮ সালের ১৪ই পৌষ (ডিসেম্বর ১৭৫১।)

৫. ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঙ্গলার ইতিহাসে' এই পুঁথি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে "এই পুস্তকের বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য এত নিহিত রহিয়াছে যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঘটনার যথাযথ বর্ণনা ও নবাব আলিবর্দি খাঁয়ের দরবারের অনেকের সঠিক নাম নির্দেশ দেখিয়া ইহা যে অভিজ্ঞ লোকের লিখিত তাহাতেও কোন সন্দেহ থাকে না। পারিষদের সংগৃহীত পুঁথি ভাস্কর পণ্ডিতের নিধনের ঠিক আট বৎসর পরে নকল করা। এই পুঁথিখানি ময়মনসিংহে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা রাঢ়ের লোকের লিখিত, কি মুরশিদাবাদ প্রবাসী ময়মনসিংহের কোন ব্যক্তির রচিত, তাহা স্থির করা কঠিন। মুরশিদাবাদ অঞ্চলের গ্রামগুলির যথাস্থানে নির্দেশ হইতে দেখা যায় যে, কবির এ অঞ্চল বিলক্ষণ জানা ছিল। ইহা হইতে একটা নূতন কথা জানিতে পারা যায় যে, ভাস্কর পণ্ডিত দাঁইহাটে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার ইতিহাস, পরিশিষ্ট পাদটীকা।

মহারাষ্ট্র-পুরাণ[1]

১৬২ বৎসর পুর্ব্বে রচিত, বাঙ্গালীকবির লিখিত বর্গীর হাঙ্গামার

প্রথম কাণ্ড

রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।
রাত্র দিন কুড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শ্রীঙ্গার কৌতুকে জিব থাকে সর্ব্বক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কখন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্র দিনে।
এই সকল কথা বিনে অন্য নাহি মনে॥
এত জদি পাপ হইল পৃথিবি উপরে।
পাপের কারনে পৃথি ভার সহিতে নারে॥
তবে পৃথি চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর।
কহিতে লাগীলা পৃথী ব্রহ্মা বরাবর॥
পাপের কারনে প্রভু পৃথী হইল ভারি।
কত ব্যাম পাব আমী ভার সহীতে নারি॥
এতেক সুনিঞা ব্রহ্মা বোলিছে বচন।
ব্যাকুলা না হইয় তুমি ধর্য্য কর মন॥
পৃথী সঙ্গে করি ব্রহ্মা গেলা শীব স্তানে।
কহিতে লাগিলা ব্রহ্মা স্তুতি বচনে॥
তুমি কর্ত্তা তুমি হর্ত্তা তুমি নারায়ণ।
স্থাবর জঙ্গম তুমি তুমি নিরঞ্জন॥
তুমি মাতা তুমি পীতা তুমী বন্ধুজন।
এ মহি মণ্ডল প্রভু তোমার স্রিজন॥
এতেক বিনয় যদি কৈলা ব্রহ্মাবন।
হাসিঞা তাহারে তবে বলিলা সঙ্কর॥
এতেক মিনতি কর কীসের কারণ।
বোল দেখি সুনি আমি তাহার বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা কহিলেন হাসি ত্রিলোচনে।
পৃথী ভার সহিতে নারে পাপের কারণে॥
পাপমতি হইল জিব করে দুরাচার।
পাপীষ্ট মারিআ প্রভু দুর কর ভার॥
কহিতে লাগিলা হর এতেক সুনিঞা।
পাপীষ্ট মারিছি আমী দুত পাঠাইঞা॥
এতেক বলিলা জদি ব্রহ্মার গোচর।
পৃথী সঙ্গে ব্রহ্মা তবে গেলা আপন ঘর॥
তবে ব্রহ্মা বিদাএ করিলা পৃথীরে।
ভাবিতে ভাবিতে পৃথী আইলা য়াপন ঘরে॥
ব্রহ্মাকে বিদাএ দিয়া শীব রইলা ধ্যানে।
কথোক্ষণ পরে সেই কথা পইল মনে॥
নন্দীকে ডাকীয়া সিব বলিছে বচন।
দক্ষিন সহরে তুমি জাহ ততক্ষন॥

সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবিতে।
অধিষ্ঠান হয় জাইআ তাহার দেহেতে॥
বিপরিত পাপ হইল পৃথীবি উপরে।
দুত পাঠাইঞা জেন পাপি লোক মারে॥
এতেক শুনিঞা নন্দি গেলা সিগ্রগতি।
উপনিত হইলা গিয়া সাহুরাজা প্রতি॥
সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তরে।
অনেক দিন হইল বাঙ্গালার চৌত না দেএ মোরে।
দুত পাঠাইয়া দেয় বাদসার স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কীসের কারণে॥
একখানি পত্র লিখ বাদাসা প্রতি।
দুত জেন তাহা লইয়া জাএ সিগ্রগতি॥
রঘুরাজা পত্র লিখে আখর পাচ সাতে।
পত্র লইঞা দুত তবে বাধিলেন মাথে॥
রজনি প্রভাতে দুত জাএ সিগ্রগতি।
পত্র আসি দিলেন জেখানে দিল্লিপতি॥
উজিরকে য়াজ্ঞা তবে দিলা দিল্লিশ্বরে।
সীগ্রগতি পত্র পড়ি শুনায় আমারে॥
উজির পড়েন পত্র বাদসা সুনেন।
সাহুরাজা লিখে বাঙ্গালার চৌথের কারণ॥
বাদসা তবে আজ্ঞা দিলা উজিরেরে।
পত্র লিখহ তুমি সাহু রাজারে॥
চাকর হইয়া মারিলে সুবারে।
জবর হইল নালবন্দি না দেয় মোরে॥
লোক-লস্কর তবে নাই আমার স্থানে।
হেন কোনজন নাহি তারে গিয়া য়ানে॥
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম সুখে।
দুই বৎসর হইল নালবন্দি না দেএ মোকে॥
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে।
চৌথের কারণে লোক পাঠায় তথাতে॥
এতেক বচন পত্রে লিখীলা উজির।
পত্র পাইঞা দুত তবে নোঞাইলা সির॥
তবে দুত বিদাএ হইলা ত্তরিতে।
সিগ্রগতি য়াসি পহচিলা সেতারাতে॥
সভা করিঞা রাজা বইসা আছে দ্যানে।
হেনকালে পত্র দুত আনে সেইখানে॥
পত্র আসি দিলা দুত রাজার গোচর।
ডাড়াইলা এক ভিতে করি জোড়কর॥

১. সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

আজ্ঞা দিলা দেওয়ানকে পত্র পড়িবারে।
পত্র পড়িয়া দেওয়ান সুনান রাজারে॥
জবর হইল সুবা বাঙ্গালা সহরে।
দুই বৎসর হইল খাজানা না দেএ তারে॥
আজ্ঞা দিগ্যা বাদসা ফৌজ পাঠাইঞা।
চৌথাই নেএন জেন জবর করিঞা॥
এতেক সুনিঞা রাজা লাগিলা কহিতে।
কোনজনাকে পাঠাব মুলুক বাঙ্গালাতে॥

রঘুরাজা নিকটে আছিলা বসিআ।
কহিতে লাগিলা তিনি হাসিয়া হাসিয়া॥
আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিবা তথা আনিব চৌথাই॥
তবে তারে আজ্ঞা দিলেন রাজন।
তিনি পাঠাইলেন দেওয়ান ভাস্করন॥
রঘু তবে আজ্ঞা দিলা ভাস্করে।
তৎকাণ করিয়া চৌথাই আনি দিবা মোরে॥

রাজার আদেশ পাইয়া ভাস্কর চলিল ধাইয়া
সন্য সঙ্গে করিয়া সাজন।
ডঙ্কা নাগারা কত নীসান চলে সত সত
সন্য মধ্যে বাজিছে বাজন॥
সেতারা ছাড়িয়া তবে বিজাপুর আইলা তবে
এক রাত্রি রহিলা সেইখানে।
রাগরঙ্গ হইল জত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পর দিনে॥
গ্রাম উপবন কত লস্কর এড়াএ জত
নাগপুর আসি উপনিত।
সেখান ছাড়িয়া জবে লস্কর যাইল তবে
পঞ্চকোটে আসিলা ত্বরিত॥
ডাক দিয়া দূতকে ভাস্কর কহিল তাকে
নবাব আছে কোনখানে।
আজ্ঞা দিলা সেনাপতি দূত চলে সিগ্রগতি
নবাব য়াছে জেইখানে॥
দূত সম্বাদ লইয়া সিগ্র চলিল ধাইয়া
আসিয়া কহিল তার স্থানে।
বৰ্দ্ধমান সহরে রাণির দিঘির পরে
নবাব আছে সেইখানে॥
দূত মুখে সুনি কথা ভাস্কর চলিল তথা
লস্কর লইয়া নিসাতে।
লস্কর নিসব্দে জাএ কেহু নাহি জানে তাএ
আইলা বৈসাখ উনিশাতে॥
বৈসাখের উনিসা জাএ বরগি আইল তাএ
মহা য়ানন্দিত হইয়া মনে।
বিরভুই বামে থুইয়া গোআলা ভুইএর কাছ হইয়া
আসিয়া ঘেরিল বৰ্দ্ধমানে॥
তবে বরগীর লস্করে চতুর্দিগে আসি ঘিরে
হরকারা কেহ নাহি জানে।
দুই প্রহর রাইতে হরকারা আইল তাথে
আসিয়া কহিল নবাবেরে।
রজনি প্রভাত হইল রাজারাম হরকারা আইল
আসিয়া কহিল নবাবেরে।
ইহা য়ামি না জানিল আচম্বিতে সন্য আইল
আসিয়া ঘেরিল লস্করে॥
রাজারামে এত কএ নবাব সুনিয়া রএ
তদপরে দিলেন উত্তর।
হরকারা পাঠাইয়া হকীকত আন জায়া
কোথা হইতে য়াইল লস্কর॥

এতেক সুনিল জবে হরকারা পাঠাইল তবে
ফৌজের নির্ণয় জানিবারে।
সাজিঞা হরকারা লস্করে ফিরে তারা
আসিয়া কহিল নবাবেরে॥
চব্বিস জমাদার ভাস্কর সরদার
চল্লিস হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
সাহুরাজার হুকুম পাইঞা॥
এতেক কথা সুনিয়া জমাদার আনে ডাক দিয়া
কহিতে লাগিলা নবাব।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে
ইহা কি বোলহ জবাব॥
বাদশাই খাজানা জাইত শেখানে চৌথাই পাইত
সুজা খাঁ আছিল জখন।
মুস্তফা খাঁ এত কএ জাহা তোমার চিত্তে লএ
তাহা তুমি করহ এখন॥
উকিল কহিল সন্য সাইজা কেন আইল
এই কথা বল জাইয়া তারে।
উকীল কহেন কথা ভাস্কর সুনেন তথা
তবেত কহিল তার পরে॥
সাহুরাজা পাঠাএ মোরে চৌথাই নিবার তরে
তেকারনে আইলাম আমি।
জাইয়া বোল নবাবেরে চৌথ জেন দেএ মোরে
সিগ্রগতি চলিজাহ তুমি॥
এতেক সুনিয়া জবে উকীল কহিল তবে
অন্যাএ কথা কেনে বোল।
কোনকালে বাঙ্গালাতে বরগী য়াইসে চৌথ নিতে
এইত য়ন্যায় বড় হইল॥
ভাস্কর বুলিল তারে কেবা য়ন্যাএ করে
মনেতে কৈলে ভাবনা।
কাহার হুকুম পাইয়া মুল্লুক নিলা মারিয়া
বাদসাই খাজানা ভেজ না॥
সুনিয়া উত্তর দিলা চৌথ নিতে না জানিলা
উকিল পাঠাইতা তার কাছে।
উকিল জাইয়া পরে কহিতে নবাব তরে
চৌথাই দিতেন তিনী পাছে॥
আপন কটক লইয়া পুন জায় ফিরিয়া
কহ তবে বাদসার স্থানে।
সনদ জদি দেএ খাজানা তবে জাএ
চৌথাই পাবে সেইখানে॥
ভাস্কর তবে কএ বাদসার হুকুম হএ
চৌথ নিবার কারণ।
চৌথাই না দিবে জবে রায়্য নষ্ট হবে তবে
তার সনে করিব আমি রন॥
এতেক বচন সুনি উকিল কহেন বানি
ভএ তুমি কি দেখায় তারে।
তোমার জতেক সেনা চতুর্দিগে দিল থানা
তারা সব কী করিতে পারে॥

তুমি যেমন এক জনা এমন আইসে সহস্র জনা
তব তার ভুরুক্ষেপ নাই।
চৌথ্‌টা মুলুকে সবাই জানএ তাকে
নবাবের সমান কে আছে সিপাই॥
উকিল বুলিলা জবে ভাস্কর জানিলা তবে
কহিতে লাগিলা তারপরে।
চৌথাই না দিবে জবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল জাইয়া তারে॥
উকিল আসিঞা পরে কহিল নবাবে তবে
রন করিতে সেহ চাহে।
এতেক সুনিঞা জবে নবাব জানিল তবে
ডাক দিয়া জমাদারে কহে॥
জত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।
জতেক সরদার ছিল, তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে॥
আমরা জত লোকে মারিব বরগিকে
দেসে জেন আইস্তে নাই পারে।
বরগি সব মারিব দেসে আইস্তে না দিব
কী করিতে পারে ভাস্করে॥
সুনিঞা এতেক বানি সন্তুষ্ট হইলা তিনি
কহিতে লাগিলা ভাল ভাল।
পানবাটা কাছে ছিল পান তুইলা সভারে দিল
বিদাএ হইয়া সভে আইল॥
এথা ভাস্কর সরদারে ডাক দেএ জমাদারে
কহিতে লাগিলা তা সভারে।
তোমরা কত জনা চতুদিগে দেয় থানা
কতজনা জায় লুটীবারে॥
সরদারে কহে এত সাজে জমাদার কত
চতুদিগে জাএ লুটীবারে।
সাজিল জত জন সুন তার বিবরণ
একে একে নাম বলি তারে॥

ধামধরমা জাএ আর হিরামন কাসি।
গঙ্গাজি আমড়া জাএ আর সিমন্ত জোসি॥
বালাজি জাএ আর সেবাজি কোহড়া।
সম্ভুজি জাএ আর কেসজি আমোড়া॥
কেসরি সিংহ মহন সিংহ এ দুই চামার।
জার সঙ্গে জাএ ঘোড়া পাচ হার॥
এই দসজনা জাএ গ্রাম লুটিতে।
আর চৌদ্দজনা থাকে নবাবের চাইর ভিতে॥
বালারাও সেশরাও আরসিস পণ্ডিত।
সেমন্ত সেহড়া আর হিরামন মণ্ডিত॥
মোহন রাএ পিত রাএ আর সিসো পণ্ডিত।
জার সঙ্গে আছে বরগি মহা বিপরিত॥
সিবাজি সামাজি আর ফিরঙ্গ রাএ।
লুটিতে জাহার সঙ্গে বরগি দ্রিত ধাএ॥
* * * সুনতান খাঁ আর ভাস্কর।
এই চৌদ জনাতে ঘেরিল লস্কর॥

একাদিন দুইদিন করি সাত দিন হইল।
চতুদিগে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল॥
মুদি বানিঞা জত বারাইতে নারে।
লুটে কাটে মারেহমুতে পাএ জারে॥
বরগির তরাসে কেহ বাহির না হএ।
চতুদিগে বরগির ডরে রসদ না মিলএ॥
চাউল কালাই মটর মুষরি খেসারি।
তেল ঘি আটা চিনি লবন একসের করি॥
টাকা সের হৈল আনাজ কিন্তে নাই পাএ।
খুদ্র কাঙ্গাল জত মইরা মইরা জাএ॥
গাজা ভাংগ তামাকু না পাএ কিনিতে।
আনাজ নাহি পাওয়া যাএ লাগিল ভাবিতে॥
কলার আইঠা জত আনেল তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া॥
ছোট বড় লস্করে জত লোক ছিল।
কলার আইঠা সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥

বিসম বিপত্য বড় বিপরিত হইল।
অন্য পরে কা কথা নবাবসাহেব থাইল॥
এই মতে লস্কর আছিল চোদ রোজ।
তবে নবাব কুচ কৈলা লইয়া সব ফৌজ॥
ঘোড়ার উপরে কত নিসান চলিল।
তবে ডঙ্কা নাগারা কত বাজিতে লাগিল॥
ঝাকুড় ঝাকুড় কত সাদিয়ানা বাজাএ।
সাহিসরা তবে নবাবের আগে জাএ॥
চাইরদিগে লস্কর চলে নাই লেখাজোখা।
হেনকালে চতুর্দিগে বরগী দিল দেখা॥
চাইরদিগে বরগী আইল কত য়ার।
তা সভার হাতে দেখি লাহাঙ্গা তলয়ার॥
তখন নবাবের লস্করে পইল হড়বড়।
হেন বেলা তেরহইনাতে[1] ধরিলা ডেহড়॥
হাজারে হাজারে ঘোড়া উঠাএ একিবারে।
হানা হানা কইরা য়াইসে কাছাইতে নারে॥
তবে মুস্তফা খাঁ চাইর হার ঘোড়া লইয়া।
বরগি খেদাইয়া জাএ ডেহড় মারিয়া।
তবে সামনে হইতে বরগী পলাইল।
আর কত বরগি য়াইসা পিছাড়ি ঘেরিল।
মির হবিব তবে পিছাড়িতে ছিল।
বেকাবুতে পইড়া সেহ মিসাইল॥
পিছাড়ি লুটিল বরগি আসি য়ার কত।
পোড়াইল ডেরাডাণ্ডা তাম্বু যত॥
খাজানার গাড়ি জত সাতে ছিল।
চাইর দিগে বরগি আইসা লুটিতে লাগিল॥
হাতি ঘোড়া কত লুইটা লইয়া জাএ।
বড় বড় সিপাই যত উর্মনি পলাএ॥
দউড়া দউড়ি আইলা তবে নিকুনসরাএ।
মোসাহেব খাঁ তবে পড়িল ঘেরাএ॥
ডেড় হাত্তির সাইর হৈল তার সাথে।
পচিস ঘোড়া সুর্দ্দা খেত আইল তাথে॥
মোসাহেব খাঁ জদি পইল নিকুনেতে।
জলদি নবাব সাহেব য়াইলা কাটয়াতে॥
এথাতে হাজি সাহেব রসদ লইঞাঁ।
পাঠাইঞা দিল কত নৈকায় করিঞাঁ॥
তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহচিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাচিল॥
ঘেরাও হইতে নবাব আইলা কাটঞাতে।
সুনিঞা ভাস্কর তবে লাগিলা ভাবিতে॥
ছিছিছি হাএ হাএ গেল পলাইয়া।
এতদিন বৃথা আসিয়া ছিলাম ঘেরিয়া॥
তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল।
জত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মন পণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া।
সোনার বাইনা পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত।
তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি।
জাউলা মাউছা পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
সঙ্ক বণিক পলাএ করাত লইয়া যত।
চতুর্দিগে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
ভাল মানুসের স্ত্রিলোক জত হাটে নাই পথে।
বরগীর পলানে পেটারি লইলা মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুতে জত তলয়ারের ধনি।
তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলান য়ুর্মনি॥
গোসাঞি মোহন্ত জত চৌপালাএ চড়িয়া।
বোচকা বুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া॥
চাসা কৈবর্ত্ত জত জাএ পলাইঞা।
বিছন বলদের পিঠে ঘাড়ে লাঙ্গল লইয়া॥
সেক সইয়দ মোগল পাঠান জত গ্রামে ছিল।
বরগির নাম সুইনা সব পলাইল॥
গর্ব্ভবতি নারি জত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পাইয়া প্রসবিছে পথে॥
সিকদার পাটআরি জত গ্রামে ছিল।
বরগীর নাম সুইনা সব পলাইল॥
দস বিস লোক য়াইসা পথে ডাড়াইলা।
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা॥
তারা সব বোলে মোরা চক্ষে দেখি নাই।
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই॥
কাঙ্গাল গরিব জত জাএ পলাইঞাঁ।
কেথা ধোকড়ি কত মাথাএ করিঞাঁ॥
বুড়াবুড়ি জাএ জত হাতে লইয়া নড়ি।
চাঞি ধানুক পলাএ কত ছাগলের গলাএ দড়ি॥
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগির ভএ সব পলাইল॥
চাইর দিগে লোক পলাএ ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্তিস বর্ণের লোক পলাএ তার অন্ত নাঞি।
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিল আইসা তাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটে আর নেএ সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরান॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাধি দেয় তার গলাএ।

১. 'তেরহইনাতে' পুঁথির বা ছাপার ভ্রম। 'হেন বেলাতে বহইনাতে' হইবে। বহইনাতে= হনীয়াতে অর্থাৎ বাহকগণে। 'হারা হারা'—অর্থাৎ হর হর ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ করিয়া।

একজনা ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি সব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপকর্ম্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রিলোকে জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধাএ॥
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইলা সব॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিগে বরগি বেড়াএ লুটীয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রুপি দেহ রুপি দেহ বোলে বারে বারে।
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইঞা তবে কারু প্রান জাএ॥
এই মতে বরগি কত বিপরিত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সে দেএ বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥
ত্রেতা জুগে রাজা ভগিরথ ছিলা।
অনেক তপস্যা করি গঙ্গা য়ানিলা॥
পৃথিবীতে নাম তার হইল ভাগিরথি।
তার পার হইয়া লোকে পাইল অব্যাহতি॥
তবে কোন কোন গ্রাম বরগি দিল
পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম সুন মোন দিয়া॥
চন্দ্রকোনা মেদনিপুর আর দিগনপুর।
খিরপাই পোড়াএ আর বর্দ্ধমান সহর।
নিমগাছি সেড়পা আর সিমইলা।
চণ্ডিপুর শ্যামপুর গ্রাম আনইলা॥
এইমতে বর্দ্ধমান পোড়াএ চাইর ভিতে।
পুনরপি আইলা বরগি বন্দর হুগলিতে॥
পের খাঁ ফৌজদার তবে হুগলিতে ছিল।
তাহার কারনে বরগী লুটীতে নারিল॥
সাতসইকা রাজবাটী আর চাঁন্দপুর।
কম্বারা সরাই ডামন্বে জদুপুর॥
ভাটছালা পোড়াএ আর মেরজাপুর চান্দড়া।
কুড়বন পলাসি য়ার বউচি বেড়ড়া॥
সমুদ্ধরগড় জাম্মগর আর নদিয়া।
মাহাতাপুর সুনন্টপুর থইল পোড়াএ গিয়া॥
পরাণপুর ভাটরা পোড়াএ আর মাদড়া।
সরডাঙ্গা খিতপুর আর গ্রাম চাঙ্গড়া॥
সাতসইকা জাগিরাবাদ সকল পোড়াইঞা।
কুমিরা বউলতলি নিমদা পোড়াএ গিঞা॥

কড়ুই কৈথন পোড়াএ আর চাড়ুইজ।
সিঙ্গি বাস্কা ঘোড়ানাথ মন্তইল॥
গোটপাড়া চাঁদপাড়া য়ার য়াগদিয়া।[1]
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া॥
আতাইহাট পাতাইহাট আর ডাঞিহাট।
বেড়া ভাওসিংহ পোড়াএ আর বিকীহাট॥
এইরুপে ইন্দ্রাইল পরগণা বরগি লুটি।
কাগাএ মোগাএ[2] লুটে ওলেন্দেজের কুটি॥
এইরুপে কাগা মোগা পোড়াইঞা।
রাতারাতি পহুচিলা জাউমাকান্দি গিয়া॥
তবে বিরভুই পরগণা বরগি দিল পোড়াইয়া।
আমডহরা মহসেরপুর থানা কৈল গিঞা॥
গোয়ালাভুঞি সেনভুঞি সব পোড়াইল।
চতুর্দিগ পোড়াইয়া বিষ্ণুপুর আইল॥
তবে বোনবিষ্ণুপুর গোপাল রক্ষা করে।
য়সাদ্য বরগির তবে কী করিতে পারে॥
সহর লুটীতে বরগী তবে আইল ধাইয়া।
নিইহাটি উর্দ্ধানপুর কাটাঞ ডাহিনে থুইয়া॥
বাবলা নদি বরগি তবে পার হইল।
মাঙ্গনপাড়া সাটই কামনগর আইল॥
মহুলা চৌরিগাছা আর কাঠালিয়া।
আধারমানিক আইলা বরগি রাঙ্গামাইটা
দিয়া॥
গোয়ালজান বুধইপাড়া আর নেয়ালিসপাড়া।
সিগ্রগতি য়াসিয়া পহুচিল দাহাপাড়া॥
হাজি ছোট নবাব উপারে ছিল।
বরগির নাম সুইনা কীল্লাএ সাধাইল॥
তবে বরগি পার হইল হাজিগঞ্জের ঘাটে।
সিগ্রগতি আইসা জগত সেটের বাড়ী লুটে॥
আড়কাট টাকা[3] জত ঘরে ছিল।
ঘোড়ার খুড়চি ভইরা সব টাকা নিল॥
তবে সও দুই তিন টাকা ছিটাইঞা।
সিগ্রগতি গেলা বরগি গঙ্গা পার হইয়া॥
তবে ফকির-ফাকীরা গিরস্ত জত ছিল।
সেই সব টাকা তারা লুটিতে লাগিল॥
তবে কাটঞাতে নবাব সাহেব সুনিল।
জগত সেটের বাড়ি বরগি লুইটা গেল॥
এতেক কথা জদি হরকারা কহিল।
কাটঞা হইতে নবাব শীঘ্র চলিল॥
রাতারাতী তবে নবাব আইল মোনকরা।
ভোর হইতে হইতে তবে পহুচিলা ডেরা॥
তবে হাজি সাহেবকে নবাব য়নেক বুলিল।
এতেক লস্কর রইতে বাড়ি লুইটা গেল॥
নবাব সাহেব জদি আইলা কীল্লাতে।
তবে সব বরগি জড় হইল কাটঞাতে॥

১. অগ্রদ্বীপ।
২. কাগ্রাম মৌগ্রামে তখন ওলন্দাজের কুঠী ছিল।
৩. আড়কাট টাকা—আর্কট মুদ্রা।

আসাড় মাসের দেওয়া ঘন বরিসন।
অজএ ভাসিয়া গঙ্গা ভরিল তখন॥
গঙ্গা ভরিল যদি ইপার উপার।
তবে বরগি লুটীবারে নাহি পাএ আর॥
কাটঞা ভাওসিংহ-বেড়া ডাইহাট নিয়া।
চাইরদিগে বরগি ছায়নি কৈল গিয়া॥
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সবে আসি ভাস্করে মিলিল॥
গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তারা সব জাইয়া খাজানা সাদিতে লাগিল॥
এথা মির হবিব লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
ফরাসবন্দির পত্তন করিলা তখন॥
বড় বড় নৈকা জেখানে জত ছিল।
বেগার ধরিয়া সব নৈকা আনিল॥
ইপারে উপারে লাহাস দিল তানাইয়া।
নৈকা সব তার মধ্যে রাখে বান্ধিয়া॥
গ্রামে গ্রামে হইতে আনে জত বাস।
নৈকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন ফরাস॥
ঘাস চাটাই তার উপরেত দিল।
পাইছাএ পাইছাএ মাটী ফেলিতে লাগিল॥
মাটী ফেলিয়া তবে করে বরাবর।
হাজারে হাজারে ঘোড়া জাএ তার উপর॥
ডাঞিহাটের ঘাটে জদি পুল বাঁধা গেল।
কত সত বরগি তারা লুটিতে চলিল॥
এথা ভাস্কর লইয়া কিছু সুন বিবরণ।
জেরূপে ডাঞিহাটে কৈলা পূজা আরম্ভন॥
তবে গ্রামে গ্রামে জত জমিদার ছিল।
তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি।
জগতজননি মাএর পূজা করিতে চাই॥
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে।
শ্রদ্ধা পাইয়া তারা সব উর্জোগ করে॥
ঘটকর্পূর আনে কেহ করিয়া সম্মান।
আসিঞা প্রতিমা তারা করেন নির্ম্মান॥
এইরূপে কুমার প্রতিমা বানাইয়া।
ভাস্করের ঠাই তারা গেল বিদাএ হইয়া॥
তারপর উপাদএ সামগ্রি আইল জত।
ভার বাহাঙ্গিতে বোঝাএ কত সত॥
ভাস্কর করিবে পূজা বলি দিবার তরে।
ছাগ মহিস আইসে কত হাজারে হাজারে॥
এই মতে করে ভাস্কর পূজা য়ারম্ভন।
এথা মির হবিব বরগী লইয়া করিল গমন॥
তবে বরগি ফরাসবন্দিতে পার হইয়া।
রাতারাতি ফুটিসাঁকো উঠিলেন গিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহর রাইতে হড়বড়ি হইল।
ফুটিসাঁকো বরগি আইল নবাব সুনিল॥
তবে নবাব সাহেব নকীব পাঠাএ।
দুতিয় প্রহর রাইতে নকীব সিগ্র ধাএ॥

নকীব আসিঞা তবে বোলে বার বার।
হুকুম নবাবের সয়ারি করহ তইয়ার॥
এতেক কহিল জদি নকীব আসিঞা।
তবে সব ঘোড়াএ জিন দিল চড়াইঞা॥
একে একে জমাদার লাগিল সাজিতে।
ডঙ্কা নাগারা কত লাগিল বাজিতে॥
মুস্তফা খাঁ সমসের খাঁ দুই জমাদার।
জার সঙ্গে জাএ ঘোড়া বিস হাজার॥
রহম খাঁ করম খাঁ দুইজনাতে জাএ।
দস হাজার ঘোড়া জার সঙ্গে ধাএ॥
আতাউল্লা মির জাফর দুইজনা সাজিল।
পোনের হাজার ঘোড়া সঙ্গে চলিল॥
উমর খাঁ আসালত দুই জনাতে গেল।
পাঁচ হাজার ঘোড়া সঙ্গে কইরা নিল॥
ঠাকুরসিংহ জাএ আর বক্সি বহনিয়া।
চল্লিস হাজার বহনীয়া সঙ্গেতে করিয়া॥
ফতেহাজি ছেদনহাজি দুই জনাতে গেল।
পেএতিস হাজার বহনিয়া সঙ্গে চলিল॥
সাইট হাজার ঘোড়া ডেড়লাক বহনিয়া।
তারকপুর আইলা নবাব এত ফৌজ লইয়া॥
জেইমাত্র নবাব সাহেব তারকপুর আইল।
ফৌজের ধমক দেইখা বরগি পিছাইল॥
তবে বরগি পিঠ দিয়া সিগ্র চইলা জাএ।
নবাব সাহেবের ফৌজ পিছে পিছে ধাএ॥
পলাসিতে জত বরগির থানা ছিল।
নবাব সাহেবের নাম সুইনা উর্মানি পলাইল॥
সিগ্রগতি বরগি পুলে পার হইল।
পার হইঞা পুল তবে কাটঞাত দিল॥
এথা নবাব রাতারাতি আইল রহনপুরে।
দেখে বরগির ছাউনি কাটঞার উপরে॥
রহনপুরে নবাব সাহেব মোরচা দিল।
চতুর্দিগে তোপ খাঁ রূপিয়া রাখিল॥
পুরনিঞা পাটনাএ লেখিলেন খত।
চলিলা দুইজনা শুইনা হকিকত॥

এথা জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ আইলা পাটনা হইতে।

বার হাজার ঘোড়া ফৌজ লইয়া সাথে॥
নবাব বাহাদুর আইলা পুরনিঞা হইতে।
পাচ হাজার ফৌজ সেহ লইয়া সাথে॥
তবে জয়ন্দি আহম্মদ বোলে নবাবকে।
পূজা না হৈতে আগে মার ভাস্করকে॥
নবাব বোলে আগে দসরা জাউক।
চাইর দিগে জল কাদা সকলি সুখাউক॥
এত জদি নবাব বুলিলা তার তরে।
জয়ন্দি আহম্মদ খাঁ বোলে নবাবেরে॥
জল কাদা সুখাইলে বরগির হবে বল।
চতুর্দিগে লুটিবে পোড়াবে সকল॥

১. ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাব মীরজাফর।

ফৌজ পার কইরা দি নৌকাএ করিয়া।
রাতারাতী জেন বরগি মারে গিয়া॥
জয়ন্দী আহম্মদ নবাব এই মনসুবা করে॥
মির হবিব লইঞা কিছু শুনে তার পরে॥
বড় বড় কামান আইনা থুইল থরে থরে॥
হুগলি হইতে সুলুফ য়ানে তার পরে॥
তবে গোলন্দাজে গোলা দাগিতে লাগিল।
মোরচা ছেদিয়া গোলা ফৌজে পড়িল।
যেই মাত্র গোলা আইসা ফৌজে পৈল।
তখন নবাব সাহেবের লোক উমনি পিছাইল॥
গোলা দাগিতে কামান গেল ফুইটা।
সুলুফ[১] ডুবিল তলা তার ফাইটা॥
দস বিস লোক তারা নিকটে ছিল।
কামান ফাটীঞা দুই চাইর জনা মইল॥
সুলুফ কামান জদি দুই তবে গেল।
সুনিঞা মির হবিব তবে ভাবিতে লাগিল॥
ফতে নাই ফতে নাই বোলে বারে বারে।
এতেক উর্জোগ করিলাম নারিলাম জিনিবারে॥
সুর্য্য অস্ত গেল সন্ধ্যা হইল তখন।
এথা নবাব লইঞা কিছু সুন বিবরণ॥
সম্বাদ লইঞা হরকারা আইলা হাইটা।
কহিল নবাবে কামান গেল ফাইটা॥
এতেক সুনিঞা নবাবে হৈল বল।
হুকুম করিলা ফৌজে আউগাউক সকল॥
জত লস্কর তারা পিছে হইটা ছিল।
আপন আপন মোরচাএ সভাই আইল॥
তবে রণ মাহাতাব সব জালিয়াত দিল।
বরকন্দাজের পরা মোরচাএ লাগিল॥
হাজারে হাজারে আওয়াজ হএ একিবারে।
ডাড়াইঞা বরগি সব দেখে উপারে॥
এই মতে নবাবের ফৌজ আছে বরাবরে।
এথা জয়ন্দি আহাম্মদ খাঁ আইলা উদ্ধারণপুরে॥
বড় বড় পাটেলি সাথে আইসা ছিল।
জুড়িন্দা বাধিয়া গুদারা লাগাইল॥
উদ্ধারনপুরে জত ফৌজ পার কৈলা।
য়জএর ধারে আইসা সব ডাড়াইলা॥
পুনরপি জুড়িন্দা আইনা লাগাইল।
দস হাজার ফৌজ নিসন্দে পার হইল॥
বাইস সও লোক সুর্দ্ধা রতন হাজারি।
পাটেলির উপরে তারা সভে চড়ি॥
যেই মাত্র পাটেলি আইল মধ্যখানে।
তলা ফাটীয়া ডুবিল সেই স্থানে॥
পাটেলি ডুবিল ফৌজে হইল কলরব।
উপারে বরগীর ফৌজে জানিলা সব॥

মোগল য়াইল য়াইল পইল হড়বড়ি।
তখন ঘোড়াএ চড়িয়া বরগি জাএ দউড়া দউড়ি॥
বরগির লস্করে জদি পইল হড়বড়।
হেনকালে বহইনাতে ধরিলা ডেহড়॥
এক এক ঘোড়ায় দুই দুই বরগি চড়িয়া।
দ্রব্য সার্মগ্রি কত জাএ ফেলাইয়া॥
সপ্তমি অষ্টমি দুই পুজা করি।
ভাস্কর পলাইয়া জাএ প্রতিমা ছাড়ি॥
মিষ্টান্ন সার্মগ্রি যত ছিল কাছে।
বহনিয়া লুটিতে লাগিল তার পাছে॥
ছাগ মৎস্য মইস জাহা যত ছিল।
বহনিয়া আসিয়া সব লুটিতে লাগিল॥
এই মতে সার্মগ্রি লুটে বহনিয়া।
হোতা ফৌজ লৈয়া ভাস্কর গেল পলাইয়া॥
ভাস্কর পলাইয়া জদি গেল য়নেক দুরে।
জয়ন্দি য়াহাম্মদ খাঁ সুনিল তার পরে॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজে থরে থরে।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত করে॥
আশ্বিন মাসে ভাস্কর গেল পলাইয়া।
চৈত্র মাসে পুনরুপি আইল সাজিয়া॥
জেই মাত্রে পুনরুপি ভাস্কর আইল।
তবে সরদার সকলকে ডাকীয়া কহিল॥
স্ত্রি পুরুষ আদি করি যতেক দেখিবা।
তলয়ার খুলিয়া সব তাহারে কাটিবা॥
এতেক বচন জদি বলিল সরদার।
চতুর্দিগে লুটে কাটে বোলে মারমার॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জত সন্ন্যাসি ছিল।
গোহত্যা স্ত্রিহত্যা সত সত কৈল॥
হাজারে হাজারে পাপ কৈল দুরমতি।
লোকের বিপত্য দেইখা বুঝিলা পার্ব্বতি॥
পাপিষ্ট মারিতে আদেশিলা পসুপতি।
ব্রাহ্মন বৈষ্ণব হইত্যা কৈল পাপমতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক কহিয়া তবে রুসিলা সঙ্করী॥
ভৈরবি জোগনি জত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কৈরা তারা হুমুতে ডাড়াইল॥
তবে দুর্গা কহে সুন জতেক ভৈরবি।
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি॥
এতেক বলিয়া দুর্গা করিলা গমন।
এখন জেরুপে ভাস্কর মইল সুন বিবরণ॥
ভাস্কর পণ্ডিত জদি য়াইলা কাটওাতে।
সুনিঞা নবাবের ডেরা পইল মোনকরাতে॥
পাল চাই ধুম পইল সহরেতে।
মুদি বানিঞা চলে নবাবের সাথে॥

১. Sloop—ছোট নৌকা।

মনকরাতে নবাবের ফৌজ হইল সুমার।
ভাস্কর লইয়া কিছু তবে শুন আর॥
তবে আলি ভাই বোলে ভাস্করের তরে।
এইরূপে কতবার আসিবা বারে বারে॥
ফৌজকে মানা কর গ্রাম লুটীতে।
আমি জাইয়া বন্দবস্ত করি নবাবের সাথে॥
এতেক সুনিয়া ভাস্কর কহিলেন তাকে।
সাবধান হইয়া তুমি মিল নবাবকে॥
তবে আলি পচিস ঘোড়া লইয়া সাথে।
নবাবের সাতে মিলিতে আইলা মোনকরাতে॥
ফুটিসাঁকো যদি আলি ভাই আইলা।
সেইখানে থাকিয়া উকিল পাঠাইলা॥
উকিল আসিয়া তবে কহে নবাবেরে।
আলি ভাই আইসে সাহেবকে মিলিবারে॥
তবে নবাব বোলে বোল জাইয়া তারে।
হাতিয়ার থুইয়া জাইঞা মিল নবাবকে॥
উকিল আসিঞা তবে কহিলেন তাকে।
হাতিয়ার থুইয়া জাইঞা মিল নবাবকে॥
আলি ভাই য়াইলা তবে হাতিয়ার থুইয়া॥
পচিস ঘোড়া সুদ্ধা মিলিল আসিয়া।
নবাব বোলে তুমি আইলা কি কারণ।
আলি ভাই বোলে বন্দবস্তের কারণ॥
ভাস্করের সাথে বিবাদ কেনে কর।
দুই জনাতে মিইলা কিছু বন্দবস্ত কর॥
তবে নবাব সাহেব বুলিলেন তারে।
ভাস্কর আসিঞা নাকি মিলিবে আমারে॥
জে সময়ে পূর্ব্বে ঘেইরাছিল বন্দমানে।
সে সময় উকিল আমী পাঠাইলাম তার স্থানে॥
বন্দবস্ত করিতে জদি থাকিত তার মনে।
সেই সমএ উকিল পাঠাইত আমার স্থানে॥
মুলুক পোড়াইল লুটিল বার বার।
কী উয়ার সঙ্গে বন্দবস্ত করিব য়ার॥
আলি ভাই বোলে জাহা হবার তা হইল।
কদাচিত উকথা মুখে আর না বুইল॥
দুই সরদার তুমি দেহ য়ামার সনে।
ভাস্করকে মিলাইয়া আনি এই স্থানে॥
তবে নবাব সাহেব কহিল দুজনারে।
আলি ভাইএর সঙ্গে জাইয়া আন ভাস্করে॥
জানকীরাম মুস্তফা খাঁ দুইজনা চলিল।
কাটোঞাএ জাইঞা ভাস্করকে মিলিল॥
ভাস্করকে আলি ভাই কহিতে লাগিল।
মুস্তফা খাঁ জানকীরাম দুই জনাএ আইল॥
নবাব সাহেব পাঠাইল দুই জনারে।
সঙ্গে কইরা জাইয়া মিলাবে তোমারে॥
এতেক সুনিঞা তবে মির হবিব কএ।
কদাচিত ভাস্করকে জাইতে মত নএ॥
মির হবিব কিছু তবে কহে ভাস্করে।
কদাচিত জাইয়া তুমি না মিল তাহারে॥
মোগোলের ফের তুমি কীবুঝ মনসুবা।
আমার কথা সুনে জদি কদাচিত না জাবা॥

তবে মুস্তফা খাঁ কহিতে লাগিলা।
এতেক কথা তুমি কেনে কহিলা॥
আমরা দুই জনাএ তবে সঙ্গে কইরা নিব।
বন্দবস্ত কইরা পুন এইখানে আনিব॥
কীছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরান দরমান কইরা কীরা খাইছি আমি॥
জানকীরাম কহে গঙ্গা সালগ্রাম ছুইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে য়ানিব মিলাইয়া॥
এতেক সুনিঞা ভাস্কর বোলে ভাল ভাল।
মুস্তফা খাঁ বোলে তবে সিগ্র কইরা চল॥
ভাস্কর বোলে সাথে ফৌজ নিব কত।
জানকীরাম বোলে তোমার মনে লয় জত॥
আলি ভাই বোলে ফৌজের নাহি কাম।
জনা দস বারো লোক সঙ্গে কইরা জাম॥
মিত্তুকাল হইলে যেন মতিচ্ছন্নে পাএ।
আলি ভাইএর কথাএ ভাস্কর ভুইলা জাএ॥
প্রথম বৈসাখ মাস শুক্রবার দিনে।
ভাস্কর চলিল মিলিতে নবাবের সনে॥
আলি ভাই আদি করি বাইস জনা য়াইল।
পলাসি য়াসিঞা ভাস্কর ডেরায় থাকিল॥
তার পরদিনে ভাস্কর করিলা গমন।
এথা নবাব লইয়া কিছু শুন বিবরণ॥
হরকারা বোলে নবাবকে ভাস্কর য়াইসে।
এতেক সুনিয়া নবাব সভা কইরা বইসে॥
সোটাবর্দ্ধার খাসদ্দার নবাবের আগে।
বড় বড় জমাদার বসিলা চাইর দিগে॥
দুসরাঞি বৈশাখ মাস শনিবার দিনে।
ভাস্করকে লইয়া আইল নবাবের স্থানে॥
বিধাতা বিপত্য হইল বুধ্য গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল॥
ভাস্কর পণ্ডিত জদি মিল্ল নবাবকে।
তার পরে নবাব কহেন কিছু তাকে॥
আমার মুলুক তুমি লুটিলা বারে বারে।
বন্দবস্ত করিতে পাঠাইলা আলি ভাইএর তরে॥
যে কালে আসিয়া তুমি ঘেরিলা বর্দ্ধমানে।
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলা তোমার স্থানে॥
বন্দবস্ত করিতে জদি থাকিত তোমার মোনে॥
সে সমএ উকিল আমি পাঠাইলা তোমার স্থানে॥
তবে এতেক সুনিঞা ভাই আলি কহিল।
এত দিন জাহা হবার তাহা হৈল॥
ভাস্কর পণ্ডিত যদি মিলে তোমার সনে।
কিছু দিঞা বন্দবস্ত কর ইহার সনে॥
এতেক সুনিঞা নবাবে কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কর লঘ্যি কইরা আসি॥
পূর্ব্বে সভারি মন সুবা ছিল।
সেই মন সুবাএ নবাব উইঠা গেল॥
নবাব উঠিয়া গেল হইল অনেকক্ষণ।
ভাস্কর পণ্ডিত কীছু কহেন তখন॥

দুই দণ্ড বিলম্ব হইল কহে মুস্তফার ঠাই।
এখন তবে আমি শান পুজোএ জাই॥
মুস্তফা খাঁ বোলে চলো সভাই মিজা জাই।
সেপহরিতে আসিব নবাবের ঠাঁই॥
এতেক বলিয়া মুস্তফা খাঁ উঠিল।
তাহার দেখনে তবে ভাস্কর উঠিল॥
জেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়ায় চড়িতে।
তলআর খুলিয়া তখন নারিলেখ তাথে॥
সেইক্ষণে তবে ছটাছটি হইল।
জত গুলো রাইসা ছিল সব গুলো মইল॥
তারপরে নবাব সাহেব সমাচার সুনে।
সুনি আনন্দিত নবাব হইলা সেইক্ষণে॥
সাদিয়ানা নহবত কত বাজিতে লাগিল।
ফকির ফুকুরাকে খএরাত কত দিল॥
মোনকরা মোকামে জদি ভাস্কর মইল।
মনসুবা দণ্ডাইয়া কবি গঙ্গারাম কইল॥

ইতি মহারাষ্ট্র-পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব॥ সকাব্দা ১৬৭২,
সন ১১৫৮ সাল। তারিখ ১৪ পৌষ, রোজ শনিবার॥

এই বর্গী-আক্রমণে বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্যন্ত ভূভাগসমূহ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনেক স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িল। 'অই বর্গী আসিতেছে' এই রব উঠিলেই লোকে প্রাণভয়ে নগর ও গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করে। বর্গীরা কলিকাতার নিকটবর্তী 'মকওয়া-থানা দুর্গ' দখল করে। ইহা নবাবী দুর্গ। এই দুর্গ দখলের পর তাহারা হুগলী অভিমুখে ধাবিত হয়।[১]

কলিকাতা হুগলী পর্যন্ত অনেক গ্রামের লোক প্রাণভয়ে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইল। ইংরাজেরা কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য নবাব আলিবর্দির নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠান, "কলিকাতার চারিদিকে খাত-খনন করা ব্যতীত বর্গীর হাঙ্গাম হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তির আর কোন আশা নাই।" নবাব ইংরাজদের এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে ইংরাজেরা কলিকাতার চারিদিকে খাত-খনন করিতে আরম্ভ করেন। ইহাই Mahratta Ditch বা 'মহারাষ্ট্র-খাত' বলিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। নানা কারণে কলিকাতার চারিদিক ব্যাপিয়া এই খাত খননের অবসর ও সুবিধা ঘটে নাই। ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিলে ইহার বেষ্টন সাত মাইল হইত। ছয়-মাসের মধ্যে তিন মাইল বা দেড় ক্রোশ পর্যন্ত খাত খনিত হয়। কর্তৃপক্ষ যখন বুঝিলেন, বর্গীদের আর কলিকাতায় আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন এই খাত-খনন কার্য বন্ধ করা হয়।

এই অর্ধাংশ খনিত খাতের মাটিসমূহ কলিকাতার দিকেই ফেলা হইয়াছিল। এজন্য বহুকাল পর্যন্ত ঐ সমস্ত স্থান ক্ষুদ্র পাহাড়ের মত উঁচু হইয়াছিল। এই সমুচ্চ স্থানকে সমতল করিয়া পরে একটি প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করা হয়। সেই রাস্তার দুই দিকে বৃক্ষাদি রোপিত হওয়ায় এই সুদীর্ঘ পথটি নগরবাসীদের সান্ধ্য-ভ্রমণের উপযুক্ত হইয়া উঠে।

এই খাত-খনন ব্যাপারে কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীরাও আত্মরক্ষার জন্য কোম্পানি-বাহাদুরের যথেষ্ট সহায়তা করে। খাতটি এরূপভাবে চওড়া করা হয় যাহাতে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ সহজে ইহা উত্তীর্ণ হইতে না পারে। কলিকাতা, সুতালুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি বেড়িয়া খালটি বর্তমান চৌরঙ্গীর মিডলটন স্ট্রীটের কাছে পৌঁছিবে, তৎপরে গোবিন্দ-পুরের অর্থাৎ বর্তমান গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া আসিয়া খিদিরপুর কুলিবাজারের মধ্য দিয়া গঙ্গার সহিত মিশিবে, এইরূপ কল্পনাই ছিল।[২] যে অংশটি ইতিপূর্বে খনিত হইয়াছিল, তাহাতে

১. আজকালকার বোটানিকাল গার্ডেনের যে বাড়িতে বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বাস করিতেছেন তাহাই পূর্বে 'মকওয়া থানার' অধিকৃত স্থান ছিল। বর্গীরা কলিকাতার এত নিকটে আসিয়াও যে কলিকাতা আক্রমণ করে নাই, সম্ভবত তাহা ইংরাজের কামানের ভয়েই বলিয়া অনুমিত হয়।

২. The ditch was to extend for seven miles, forming a semicircle round three sides of the town, the fourth side being protected by the river. It was begun in 1742 at Chitpur and followed the line of Circular Road southward as far as Jaun Bazar Street, here it turned to the southwest and was intended to take a line which would have crossed the Chowringee Road at the junction of Middleton Street and continuing the same direction would have reached the river at Hastings about where the Commissariat Buildings and Jetties are situated—Kathleen Blychynden, ***Past and Present Calcutta.***

দীর্ঘকাল ব্যয় হওয়ায় ও নবাব আলিবর্দি খাঁর সহিত মহারাষ্ট্র-বর্গীদের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় এই খাল অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণ সময়েও ইংরাজেরা এই খাত আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিতে পারেন নাই।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে এই খাত সহরের জঞ্জাল ও ময়লা দ্বারা ভরাট করিয়া ফেলা হয়। যে সমস্ত মাটি স্তূপাকারে কলিকাতার দিকে সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা সমতল করিয়া বর্তমান সার্কিউলার রোডের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।[১] মার্কুইস অব ওয়েলেসলির শাসনকালে এই বিস্তৃত পন্থার দুই পার্শ্ব বৃক্ষাদি দ্বারা শোভিত হওয়ায়, ইহা প্রাচীন কলিকাতার সৌন্দর্যবর্ধন করে। অনেক পদস্থ ইংরাজ সন্ধ্যায় ও সকালে চেরিয়ট গাড়ি চড়িয়া, এই পথে বেড়াইতেন। তখন চৌরঙ্গীর অবস্থা এত সমুন্নত হয় নাই কারণ ইহার অধিকাংশ স্থান বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে এই মারহাট্টা খাতের অপর পারে যথেষ্ট দস্যুভয় ছিল।

মহারাষ্ট্রীয়গণ যে সময়ে বঙ্গদেশে আগমন করে অর্থাৎ সেই ১৭৪২[২] খ্রীস্টাব্দে, কলিকাতা সহরের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা একবার পর্যবেক্ষণ করা যাউক। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার যে সকল নক্সা প্রস্তুত হয় তাহাতে এই খাতটি বিশেষরূপে চিহ্নিত করা আছে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে আপজনের ম্যাপেও এই খাতের নির্দেশ দেখা যায়। রেভারেণ্ড হাইড[৩] এই নক্সা দেখিয়াই তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অমিচাঁদ ও ব্যাংক-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের বাগানগুলিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই খাতটি হালসীবাগানের নিকট বক্রাকারে ঘুরিয়া আসে।

১৭৪২ অব্দের এই নক্সা হইতে জানা যায়, এই সময়ে কলিকাতার ইংরাজ অধিবাসিগণের অধিকৃত স্থানের চারিদিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য সুদীর্ঘ কাঠের বেড়া দেওয়া ছিল। ভাগীরথীর দিকেও এই বেড়াগুলি, ইহার তীরস্থ ইংরাজের বাগানবাটি ও বাসভবনের রক্ষাবন্ধনী স্বরূপে বর্তমান ছিল। গঙ্গাতীরে দুই এক স্থানে নগরের প্রবেশদ্বাররূপে দুই চারিটি গেট বা ফটক নির্মিত হইয়াছিল।

আজকাল আমরা স্ট্র্যাণ্ড-রোড বা ভাগীরথী তীরবর্তী প্রশস্ত পথটিকে যে ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তখন তাহা নদীগর্ভে ছিল। নদীগর্ভ সরিয়া যাওয়ায়, তটভূমি ভরাট করিয়া পরে এই পথ নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমান কয়লাঘাট স্ট্রীট ও ফেয়ার্লি-প্লেস অর্থাৎ যে স্থানের মধ্যে কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ ছিল, সেই স্থানে গঙ্গার ধার দিয়া আর একটি ক্ষুদ্র পথ ছিল বটে কিন্তু তাহা বর্তমান 'স্ট্র্যাণ্ড-রোড' নহে। এই পথের পশ্চাতে ইংরাজদের বাগানবাটি, দুর্গের মালগুদামের একাংশ, জাহাজ মেরামতের জন্য একটি ক্ষুদ্র ডক্ ছিল। তখন হেস্টিংস স্ট্রীটের অস্তিত্ব ছিল না। আজকাল হেস্টিংস স্ট্রীট বলিয়া যাহা পরিচিত, যাহার পার্শ্বে গবর্ণমেণ্ট-প্রিণ্টিং ও বার্ণ কোম্পানির কার্যালয় প্রভৃতি অবস্থিত, তাহা তখন একটি খালমাত্র ছিল। খালটি বরাবর বর্তমান

---

১. The country on the other side of the ditch was infested by bands of dacoits. When the Marquis Wellesley, whose influence gave a great stimulus to the improvement of the roads, came to Calcutta, the 'deep broad Mahratta ditch' existed near the present Circular Road. It was then commenced to be filled up by depositing the filth of the town in it. The earth excavated in forming the ditch says a writer of that day, was so disposed on the inner or townward side, as form a tolerably high road, along planted a row of trees and this constituted the more frequented and fashionable part the margin of which was about town. Another writer says in 1802—"Now on the Circular Road of Calcutta the young and the sprightly and the opulent during the fragance of morning, in the chariot of health, enjoy the gales of recreation."—W.H. Carey. *Good Old days of John Company* Vol 1. p. 42.

২. আলিবর্দির সিংহাসন লাভের পর সুবে বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম মারাঠা অভিযান চালিত হয় ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে।—রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, পৃঃ ১৪৮।

৩. Rev. H.B. Hyer ইনি The Parish of Bengal, 1678-1788 গ্রন্থের লেখক।

ক্রীক রোর মধ্য দিয়া ধাপায় গিয়া মিলিত হয়। খালটি যে নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল এরূপ বোধ হয় না। কারণ এই খালের জলে ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ঝড়ে একখানি জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ভাগীরথী ও এই খালের সংযোগস্থলে বর্তমান চার্চ লেনের কোণে ও হেস্টিংস স্ট্রীটের সান্নিধ্যে একটি চতুষ্কোণ মাটির বুরুজ ছিল। এই বুরুজের উপর কয়েকটি কামানও সাজান ছিল। ভাগীরথীর দিক হইতে শত্রুর প্রবেশপথ বন্ধ করিবার জন্য এই কামানগুলি নদীর দিকেই মুখ ফিরাইয়া রাখা হয়। গঙ্গাগর্ভ হইতে বর্তমান ফ্যান্সি লেন চিহ্নিত স্থানের মধ্যে এই খালটির উপর তিনটি পুল ছিল। ইহার একটি পুলের ধারেই কোম্পানির 'বারুদ-ভাণ্ডার' বা ম্যাগাজিন গৃহ। এই বারুদ-ভাণ্ডার, বর্তমান সেণ্ট জন গির্জার অতি সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল। আজকাল ফ্যান্সি লেন যেস্থানে ওয়েলেস্‌লি প্লেসের সহিত মিশিয়াছে সেই স্থান হইতেই সহরপরিবেষ্টনকারী এই বেড়াটি আরও বাঁকিয়া পূর্বাভিমুখী হয়। পূর্বে এই স্থানে একটি বৃহৎ বট গাছ ছিল। এই বট গাছে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হইত। রেভারেণ্ড হাইড অনুমান করেন, "এই ফাঁসি শব্দই ভবিষ্যতে 'Fancy' (ফ্যান্সি) তে পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে।" ওয়েলেস্‌লি প্লেস পার হইয়া বর্তমান লারকিন্স লেনের নিকট দিয়া এই কাষ্ঠময় রক্ষাবন্ধনী রাণীমুদির গলিমুখে পৌঁছিয়াছিল। অর্থাৎ সে পথ আজকাল ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট বলিয়া পরিচিত ও যাহার মোড়ে সুবিখ্যাত উইলসনের হোটেল বর্তমান। সিরাজ যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে এই রাণীমুদি গলির সন্নিকটে, একটি ব্যাটারি বা তোপখানা তৈয়ারি হইয়াছিল। এই ব্যাটারি হইতে অজস্র অনল-রাশি উদ্গীরিত হইয়া, সিরাজ-সৈন্যকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। আপজনের ম্যাপে ইহা Rana Madda Lane বলিয়া উল্লিখিত। এই রাণীমুদী গলি নাম কেন হইল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। প্রাচীন কলিকাতার পথঘাটের কথা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

এই রাণীমুদি গলি হইতে বারোটা লেন ও তৎপরে বর্তমান ম্যাঙ্গো-লেনের প্রথমাংশ দিয়া, এই রক্ষাবন্ধনীর গতি বর্তমান মিশন-রো'র দিকে পরিবর্তিত হয়। সেকালে এই মিশন রো—Rope-Walk নামে পরিচিত ছিল। রেভারেণ্ড কারনান্‌ডার[১] কর্তৃক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এইস্থানে একটি গির্জা স্থাপিত হওয়ার পর ভবিষ্যতে ইহা 'মিশন-রো' নামে অভিহিত হয়। এই মিশন রোর সান্নিধ্যে বর্তমান স্কচ্-গির্জার নিকটবর্তী স্থানে, সুবিখ্যাত ওয়েস্ট এণ্ড কোম্পানির ঘড়ির দোকানের পার্শ্বে, সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে আর একটি ব্যাটারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাটারির কামানগুলি সিরাজের সেনাগণকে দুর্গপ্রবেশে যথেষ্ট বাধা দিয়াছিল।

পূর্বোক্ত কাষ্ঠময় রক্ষাবন্ধনী এই রোপ-ওয়াক হইতে লালবাজারের দিকে যায়। বর্তমান পুলিসকোর্ট যেখানে অবস্থিত সেই স্থান ঘুরিয়া ইহা রাধাবাজারে আসিয়া পড়ে। তৎপরে এজরা স্ট্রীট হইতে আমড়াতলা স্ট্রীট পর্যন্ত যায়। সম্ভবত বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট অর্থাৎ কালীঘাটাভিমুখী পুরাতন যাত্রীপথটিকে এই রক্ষাবন্ধনীর সীমাভুক্ত করা হয় নাই। তখন এই স্থানে কসাই, তেলি, ডোম, প্রভৃতি জাতি বাস করিত। এই জন্য আজও এই স্থানগুলি কসাইটোলা, ডোমটোলা, কলুটোলা প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত।

তৎপরে এই রক্ষাবন্ধনী পর্টুগীজ কোয়ার্টারকে বেষ্টন করিয়া আর্মানীয়ান স্ট্রীটে আসিয়া পড়ে। তৎপরে হামাম-গলির[২] মধ্য দিয়া, মুরগীহাটা হইয়া, আর্মানী গির্জা ও গোরস্থানকে

১. পাদ্রী Kirander-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত (old) Mission Church-এর স্থাপনাকাল ১৭৭০ সালের ডিসেম্বর।

২. "হামাম গলিতে প্রাচীন কলিকাতার সাধারণ স্নানাগার ছিল।" 'হামাম' বা স্নানাগার হইতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব হইতে এই সমস্ত হামামের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে এবং এই গলিটি আজও অতীতের স্মৃতির সহিত বর্তমানকে সংযোজিত রাখিয়াছে।

বেষ্টন করিয়া, দরমাহাটা ও খেংরাপটি[১] হইয়া পুরাতন চীনাবাজারের যেখান আজকাল বন-ফিল্ডস লেন বলিয়া পরিচিত, তাহার মধ্য দিয়া রাজা উদ্‌মন্ত স্ট্রীটে আসিয়া গঙ্গার ধারে শেষ হয়। পাঠক ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন, সেকালের কলিকাতা কেবল যে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল তাহা নয়, সহরের চারিদিকে এই সুদীর্ঘ কাষ্ঠের বেষ্টনী থাকায় আর কিছুই না হউক, চোর ডাকাতেরা সহসা বাহির হইতে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না।

বাগবাজার অঞ্চলে সেকালের পেরিন্‌স্‌-গার্ডেন ছিল। সিরাজ সর্ব প্রথমে এই স্থান আক্রমণ করে। এই পেরিন্‌স বাগান ও সুতালুটির নিকটবর্তী স্থানসমূহে দুই দশ ঘর ইংরাজ বাস করিতেন। সেকালের কলিকাতার অনেক ইংরাজ, সপত্নীক বা বন্ধুবান্ধব সঙ্গে এই বাগানে বেড়াইতে যাইতেন। কলিকাতা দুর্গপ্রতিষ্ঠার পর ও সহর জনপূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অনেক ইংরাজ সুতালুটি পরিত্যাগ করিয়া খাস কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। ১৭৪৬ খৃীঃ অব্দ হইতেই, এইখানে ইংরাজ অধিবাসীদের যাতায়াত মন্দীভূত হইয়া আসে। ১৭৫৩ খৃীস্টাব্দে এই বাগান মেরামত অভাবে জঙ্গলময় হইয়া পড়ায় ২৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। কাপ্তেন পেরিনের (ইহার নিজের দুই তিনখানি বাণিজ্য জাহাজ ছিল) নামেই এই উদ্যানের নাম Perrins Garden (পেরিনস্‌ গার্ডেন) হয়। ১৭৫৫ খৃীস্টাব্দে ইহা কর্ণেল স্কটের দখলে আসে। এই কর্ণেল স্কট কোম্পানির ফৌজের অধ্যক্ষ ও ভবিষ্যৎ জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথম পক্ষের শ্বশুর ছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য ইহা কোম্পানির বারুদের কারখানায় পরিণত হয়। আপজনের ম্যাপে ইহা এই জন্য 'ওল্ড পাউডার মিল বাজার অ্যাণ্ড রোড' (Old Powder Mill Bazar and Road) বলিয়া চিত্রিত। এইস্থান হইতেই পূর্বোক্ত 'মারহাট্টা-ডিচ' আরম্ভ হইয়াছিল।

আপজনের ম্যাপ ব্যতীত লেফ্‌টেনাণ্ট উইলস্‌এর আর একখানি সমসাময়িক ম্যাপ হইতে এই সময়ের কলিকাতা সহরের আয়তন ও বাসিন্দাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।[২] এই উইলস সাহেব কোম্পানির গোলন্দাজ-সেনার অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৫৩ খৃীস্টাব্দে এই নক্‌শাখানি প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে জানিতে পারা যায়, সেকালের ইংলিশ-কোয়ার্টার বা সাহেব-পল্লী উত্তরে বর্তমান ক্যানিং স্ট্রীট বা মুরগীহাটার রাস্তা, দক্ষিণে বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীট বা সেকালের খাল, পূর্বে বর্তমান লালদীঘির নিকটস্থ মিশন রো, বা সেকালের 'রোপওয়াক' (Rope Walk) ও পশ্চিমে ভাগীরথী, এই সীমানা ব্যাপিয়া ছিল। ইহার মধ্যে ২৩০ খানি পাকা বাড়ি ছিল। এই সমস্ত বাড়ির চারিদিকে প্রশস্ত বাগান ছিল ও বাগানের মধ্যে দুই তিনটি ছোট বড় পুকুরও দেখা যাইত। কলিকাতায় তখন জমির অভাব ছিল না ও সাহেবদের মধ্যেও বাগান-বাগিচা ও পুকুরওয়ালা জমির উপর আবাসবাটি এবং ভদ্রাসন প্রস্তুত করার রেওয়াজ ছিল। কলিকাতায় পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা না থাকায়, অনেকে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া লইতেন। এই সমস্ত বাগান-বাগিচাওয়ালা সাহেবি-কুঠির নমুনা দেখিতে ইচ্ছা হইলে, পাঠক মেটিয়াবুরুজের সান্নিধ্যে গার্ডেনরিচ রোডের পার্শ্ববর্তী 'পাঁচকুঠি' প্রভৃতি বাড়ি দেখিয়া সেকালের ইংরাজদের আবাসবাটির অনেকটা আভাস পাইতে পারেন। বর্তমান চৌরঙ্গীর মধ্যেও এরূপ বাগিচা ও পুষ্করিণীসমন্বিত পুরাতন বাটি খুঁজিলে এখনও দুই চারিখানা দেখিতে পাওয়া যায়।

তখন সহরের মধ্যে যে সকল গলি ও সদর রাস্তা ছিল, আজকালকার মত তাহাদের বিশেষ-ভাবে নামকরণ হয় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও উইলসের এই ম্যাপ হইতে পুরাকালের সেই

১. খেরোপটির মধ্যে সেকালের নির্মিত আজও এই পুরাতন গির্জা ও গোরস্থান বর্তমান। পাঠক বড়-বাজারের খেরোপটির রাস্তার ধারেই এই পুরাতন গির্জাটি দেখিতে পাইবেন।

২. Plan of Fort William and part of the city by William Wills Lieutenant of the Artillery Company in Bengal 1753.

স্থানগুলিকে চিনিয়া লওয়া বেশী কষ্টকর হয় না। আমরা এক্ষণে এই ম্যাপের সাহায্যে পলাশী আমলের পূর্বের কলিকাতার পরিচয় লইব।

এই প্ল্যানের মধ্যস্থানেই লালদীঘি। এই লালদীঘির উত্তর পূর্বে কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ। দুর্গের দক্ষিণ দিকে কোম্পানি বাহাদুরের আমদানি রপ্তানির মালগুদোম বা Export and Import Warehouse. ১৭৪১ খৃস্টাব্দে এই সমস্ত মালগুদোম নির্মিত হয়। এই মালগুদামের নিকট দিয়া একটি নাতিপ্রশস্ত পথ নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাকে 'কেল্লাঘাট' বা ফোর্টঘাট স্ট্রীট বলিত।[১] দুর্গের সান্নিধ্যে, লালদীঘির কোণে বর্তমান রাইটার্স-বিল্ডিংএর কাউন্সিল-চেম্বারের নিকট, কলিকাতার আদি গির্জা সেণ্ট এ্যান। এই গির্জা ও লালদীঘির মধ্যস্থান দিয়া একটি পথ লালবাজারে গিয়া পূর্বকথিত কালীঘাট যাত্রীপথ বা Pilgrim Road-এর সহিত মিলিত হইয়াছিল।[২] এই রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপিত হওয়ায় ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়।

লালদীঘির উত্তর-পূর্ব কোণে 'কোর্ট হাউস' অবস্থিত ছিল। ইহাই প্রাচীন কলিকাতার পুরাতন আদালত-গৃহ। এই কোর্টহাউস হইতেই ইহার নিকটবর্তী বর্তমান পথটির (Old Court House Street) ওল্‌ড কোর্ট-হাউস স্ট্রীট নামকরণ হইয়াছে। আজকাল যেস্থানে সেণ্ট এনড্রু চার্চ বা ঘড়িওয়ালা স্কটিশ-গির্জা অবস্থিত সেই স্থান অধিকার করিয়াই এই 'কোর্ট হাউস' ছিল। এই কোর্ট-হাউসের পশ্চাতে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল।

লালবাজারের মোড়ে বেণ্টিস্ক স্ট্রীটের সম্মিলন-স্থলে পুরাতন জেলখানা ছিল। ইহাই ইংরাজের নির্মিত কলিকাতার প্রথম জেলখানা। ইহার পর হরিণবাড়ি জেল নির্মিত হয়। হরিণবাড়ি জেলের কথা আমরা পরে বলিব। লালদীঘির পূর্বধারে যে সমস্ত বাড়ি ও বাঙ্গালা ছিল, তাহার কোন অস্তিত্বই এখন নাই। ইহার উত্তরপূর্ব কোণে যে বাঙ্গলায় গ্রাণ্ট সাহেব[৩]বাস করিতেন, তাহার অধিকৃত স্থানে এখন ঘড়িওয়ালা 'ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোং' প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে।

মিশন রোর মধ্যে পূর্বোক্ত কাছারি বাড়ির সম্মুখে, একটি Play-House বা থিয়েটার-গৃহ ছিল। বর্তমান রাইটার্স-বিল্ডিংএর পশ্চাতে আর একটি প্লে-হাউস ছিল। এই থিয়েটার গৃহটিই সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে (১৭৫৬ খৃস্টাব্দ) নবাব-সৈন্যগণ কর্তৃক 'ব্যাটারি' রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত প্লে-হাউসের পরই, লেডী রাসেলের আবাসবাটি। ইনি সেকালের সুবিখ্যাত স্যর ফ্রান্সিস্ রাসেলের পত্নী। এই রাসেল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্রমওয়েলের বংশধর। পরবর্তীকালে এই রাসেল সাহেবের বাটির অধিকৃত স্থানে—বর্তমান মিশন চার্চ (১৭৭৫ খৃস্টাব্দে) নির্মিত হয়। ইহার পরের একটি বাটিতে মিঃ ব্রাউন বলিয়া একজন সাহেব থাকিতেন, সে বাড়িটির অস্তিত্ব এখন না থাকিলেও পরবর্তী কালে সেই স্থানে আর একটি ত্রিতল বাটি নির্মিত হয়। এই বাটি এখনও বর্তমান। এই বাটিতেই ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য জেনারেল ক্লেভারিং দেহত্যাগ করেন। পাঠক মনে রাখিবেন আমরা যে সমস্ত বাড়ির ও স্থানের কথা বলিতেছি তাহা বর্গীর হাঙ্গামার সমসাময়িক। তখন নবাব আলিবর্দির

---

১. অনেকে এই কেল্লাঘাট নাম হইতে বর্তমান কয়লাঘাটা নামকরণ হইয়াছে, এরূপ অনুমান করেন। ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা ঠিক বলা যায় না।

২. এই যাত্রিপথ বর্তমান চিৎপুর রোড, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ও ধর্মতলা। এই সকল স্থান পূর্বে জঙ্গল সমাবৃত ছিল ও কালীঘাটের যাত্রীরা এই পথ ধরিয়া চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া আদিগঙ্গা তীরবর্তী কালীঘাটে যাইত।

৩. গ্রাণ্ট সাহেব—Charles Grant কোম্পানির কর্মচারীরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন ১৭৬৭ সালে ; পরে বোর্ড অব ট্রেড-এর সদস্য হন। "When the Mission Church in Calcutta was attached by the Sheriff, Grant paid down 10,000 rupees to save it and assigned it to the Church Missionary Society—C.E Buckland. *Dictionary of Indian Biography*, Ed. 1971 p. 175.

আসন। জেনারেল ক্লেভারিং যে বাটিতে দেহত্যাগ করেন, সেই বাটিতে লর্ড কার্জন বাহাদুর একখানি প্রস্তরফলক লাগাইয়া দিয়াছেন। এজন্য তাহা আজও সেই সুদূর অতীতের স্মৃতিবহন করিতেছে। সেকালের ম্যাঙ্গো লেন আজও [illegible] বর্তমান।

এইবার মিশন রো ও ম্যাঙ্গো লেন ছাড়াইয়া কারেন্সি অফিসের পার্শ্ব দিয়া আমাদিগকে বর্তমান টেলিগ্রাফ অফিসের নিকট আসিতে হইবে। বর্তমান টেলিগ্রাফ অফিস বিল্ডিং যেস্থানে আছে সেই স্থানের সান্নিধ্যে লালদীঘি ছাড়া আর একটি পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণীর আশেপাশে কতকগুলি ছোট মেটে কোঠা বাড়ি ছিল। এই বাড়িতে কোম্পানির 'ক্যালিকো-প্রিণ্টারগণ' (Calico-Printers) বাস করিতেন। এই ক্যালিকো প্রিণ্টারদের আবাস স্থানের পরেই পলাশী আমলের পাদরী বেলামী সাহেবের আবাসস্থান ছিল। পাদরী বেলামী সাহেবের বাটির কম্পাউণ্ড বা সীমানা বর্তমান ওয়েলেস্‌লি প্লেস ও ডালহাউসী স্কোয়ার অবধি বিস্তৃত ছিল। বড়লাট বাহাদুরের মিলিটারি সেক্রেটারির বর্তমান আবাসস্থান যে বাটিতে, সেই স্থানেই পাদরী বেলামীর বাটি ছিল। কিন্তু তাঁহার বাটির চতুঃপার্শ্বের সীমানা লালদীঘির দক্ষিণ কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই বেলামী সাহেবের বাটির পরে আর একটি উন্মুক্ত স্থান। তাহার পর কোম্পানি বাহাদুরের সরকারি আস্তাবল। আজকালকার কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের পার্শ্ববর্তী স্থানেই এই আস্তাবল ছিল। আস্তাবলের পরই বর্তমান হেয়ার স্ট্রীটের প্রারম্ভস্থলে কোম্পানির সাধারণ হাসপাতাল ছিল। হাসপাতালের পরই পাউডার ম্যাগাজিন ও এই পাউডার ম্যাগাজিন বা বারুদ-ঘরের পার্শ্বেই কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গোরস্থান। এই গোরস্থানের পার্শ্ববর্তী জমিতে, বর্তমান সেণ্ট জন গির্জা রহিয়াছে। এই সেণ্ট জন গির্জার পাদরী সাহেব এখন যে বাটিতে বাস করেন,সেইস্থানে একটি পুষ্করিণী ছিল।

এই পল্লীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেবের দুইখানি বাটি ছিল। কারণ এই প্ল্যানের মধ্যে দুইখানি বাটি হলওয়েলের নামে চিহ্নিত দেখা যায়। ইহার একখানির স্থান বর্তমান বাঁক-শাল স্ট্রীটের মোড়ে, যে স্থানে বর্তমান ছোট আদালত বা স্মলকজকোর্ট বিচারালয় বিরাজিত—সান্নিধ্যে আর একখানি বর্তমান চার্চ লেন ও হেস্টিংস স্ট্রীটের সন্ধিস্থলে। হেস্টিংস-স্ট্রীটের সেই পুরাকালের খালের একাংশ এই বাটির দক্ষিণদিকে ছিল। আজকাল যেস্থানে স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি অফিস বর্তমান, হলওয়েলের দ্বিতীয় বাসগৃহ ঠিক সেইস্থানেই ছিল। এখন যেখানে স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি অফিস হইয়াছে ও পূর্বে যেস্থানে হলওয়েলের আবাসবাটি ছিল, সেই স্থানে পলাশীযুদ্ধের বহুকাল পরে কোম্পানি-বাহাদুরের পুরাতন টাঁকশাল-গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। এখন হলওয়েলের সে বাটির চিহ্নও নাই, সেই পুরাতন টাঁকশালের চিহ্নও নাই, তাহার স্থানে বর্তমান প্রাসাদতুল্য স্টেশনারি অফিস স্থাপিত হইয়াছে।

আজকালকার 'ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী' এবং সাবেক মেটকাফ-হলের বাটির অধিকৃত স্থানটি কাপ্তেন উইলসের ম্যাপে শেঠদিগের আবাসবাটি বলিয়া চিহ্নিত। কোম্পানি-বাহাদুরের প্রধান দালাল, রামকৃষ্ণ শেঠ মহাশয়ের বাস্তুভিটা এই স্থানেই ছিল। এই বাস্তুভিটার চারিদিকে বাগান-বাগিচা থাকায় বড়ই জাঁকাল দেখাইত। তখনকার কালে রামকৃষ্ণ শেঠ[১] ও অমিচাঁদ ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালীরই কলিকাতা ইংরাজ-টোলায় বাড়ি ছিল না। রামকৃষ্ণ শেঠের এই বাটি পরবর্তীকালে তাঁহার মৃত্যুর পর ভাড়া দেওয়া হয়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আমিয়াট সাহেব এই বাটি ভাড়া লন। এই আমিয়াট নবাবকর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের শোচনীয় পরিণাম হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ফলতায় পলায়ন করেন। ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে নবাব মীরকাশিমের হস্তে ইনি নিহত হন।

১. রামকৃষ্ণ শেঠ—গোবিন্দপুরে, যেখানে পরে মেটকাফ হল স্থাপিত হয় সেখানে এঁর আবাস ছিল। ইনি ইণ্ডিয়া কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন।

এইবার আমাদিগকে একবার লালদীঘির উত্তরে সেণ্ট এ্যান গির্জার কাছে যাইতে হইবে। এই স্থানে সেকালে কতকগুলি পাকা বাড়ি পাশাপাশি ভাবে বর্তমান ছিল। আজকাল যেখানে ফিনলে মুর কোম্পানির অফিস-গৃহ বর্তমান, সেইস্থানে মিঃ এডওয়ার্ড আয়ার সাহেব বাস করিতেন। এই আয়ার সাহেব চার্নকের জামাতা আয়ার নহেন, ইনি পলাশী আমলের লোক। ইনি কোম্পানি বাহাদুরের ভাণ্ডার-রক্ষক ছিলেন। কাউন্সিলে ইনি দশম সদস্য। ইনিও ব্ল্যাক-হোল হত্যাকাণ্ড হইতে বাঁচিয়া যান। ক্লাইভ ও ওয়াটসন কর্তৃক কলিকাতা পুনরাধিকৃত হইলে এই আয়ার সাহেবের বাটির অধিকৃত স্থানে একটি থিয়েটার-গৃহ নির্মিত হইয়াছিল।

আজকাল যাহা লিয়নস্-রেঞ্জ বলিয়া সাধারণে পরিচিত সেইস্থানে তিনখানি সারি সারি পাকা বাড়ি ছিল। এই তিনখানি বাড়ির একখানি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অমিচাঁদ বা আমীরচাঁদের। দ্বিতীয় খানি মিঃ কোলসের (Coles)। ইনি ব্ল্যাক-হোলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৃতীয় বাটি-খানি মিঃ জন নক্সের। ইনি কোম্পানির সেনানী ছিলেন। সিরাজকে দুর্গ সমর্পণ করিবার সময় কলিকাতা দুর্গমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ইনি সেই অবসরে প্রাণরক্ষার্থে দুর্গ হইতে পলায়ন করেন।

অমিচাঁদের এই বাটির সীমানার পার্শ্ব হইতে একটি গলির চিহ্ন আপজনের ম্যাপে দেখা যায়। তাহা 'থিয়েটার স্ট্রীট' বলিয়া চিহ্নিত। আজকাল যেস্থানে লিয়নস্-রেঞ্জ ও পুরাতন চীনা-বাজার রাস্তার সহিত নূতন চীনাবাজার রাস্তার মিলন হইয়াছে ইহাই সেকালের থিয়েটার স্ট্রীট। পাঠক যেন এই পথটিকে বর্তমান 'থিয়েটার-রোড' বলিয়া ভ্রমে পতিত না হন।

সম্ভবত এই রাস্তাদ্বয়ের সংযোগস্থলের মধ্যে কোম্পানির সেক্রেটারী কুক সাহেবের আবাস বাটি ছিল। এই কুক সাহেবও অন্ধকূপ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান। প্রসিদ্ধ-ইতিহাস-লেখক অর্মি সাহেবকে এই সেক্রেটারী কুক সাহেবই ভবিষ্যতে 'ব্ল্যাকহোল' সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য প্রদান করেন। আয়ার সাহেবের বাটির পশ্চাতেই কুক সাহেবের বাটি ছিল। ইহার পরেই চার্লস বেয়ার্ড সাহেবের আবাসবাটি। এই বাটিতে তাঁহার বিধবা-পত্নী বাস করিতেন। এই চার্লস বেয়ার্ডের পিতা জন বেয়ার্ডই রোটেসান-গবর্ণমেণ্টের আমলে কলিকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। বেয়ার্ড সাহেবের বাস্তুভিটার উপর পরবর্তী কালে আর একটি বাটি নির্মিত হয়। প্রবাদ এই—এই বাটিতে প্রথমে স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব বাস করিতেন। লর্ড কার্জন এই বাটি প্রস্তরফলক চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই বর্তমান 'রয়াল এক্সচেঞ্জের' অধিকৃত স্থান।

প্রাচীন কলিকাতা-দুর্গের উত্তরাংশে মিঃ ক্রুটেনডেনের বাটি ছিল। বাড়িটির কম্পাউন্ড বা সীমানা বহুদূরব্যাপী ও ইহা ঠিক গঙ্গার ধারেই ছিল। তখন গঙ্গাগর্ভে স্ট্র্যাণ্ড রোড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই ক্রুটেনডেন সাহেব এক সময়ে কোম্পানির গবর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান ফেয়ার্লি প্লেসের অধিকাংশ স্থানই এই বাটির সীমাভুক্ত স্থান।

ক্রুটেনডেনের বাটির পশ্চাৎভাগে মিঃ উইলিয়াম টুক বাস করিতেন। এই টুক সাহেব ব্ল্যাক-হোল ব্যাপারের ও সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের একটি বিশদ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। টুকের লিখিত এই কাহিনীটি পড়িবার ইচ্ছা হইলে ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠক মিঃ হিলের সুবৃহৎ গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

ইতিপূর্বে যে বাড়িতে বার্ড কোম্পানির অফিস-গৃহ ছিল সেই বাটির সান্নিধ্যেই কোম্পানি বাহাদুরের সোরার গুদাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজকাল সেই স্থানে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক নির্মিত হইয়াছে।

এই স্থানে নদীর দিকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ওয়াটস্ সাহেবের বাটি ছিল। এই ওয়াটস্ই কাশিম-বাজারের অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা। ইনিই পলাশীযুদ্ধ ব্যাপারের একজন প্রধান হোতা। কাশিম-

ব্যজার অবরোধের পর সিরাজের হস্তে ইনিই নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। ইনিই মীরজাফরের নিকট গুপ্তভাবে গিয়া তাঁহাকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ওয়াটস্ পত্নীই ভবিষ্যতে 'বেগম জনসন' বলিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হন।

ইতিপূর্বে ক্লাইভ স্ট্রীটের যেস্থানে গ্রেহাম কোম্পানির পুরাতন বাড়ি ছিল সেই স্থানে মিঃ গ্রিফিথসের আবাসস্থান। যে উইল্‌স সাহেবের নকসার উপর নির্ভর করিয়া, আমরা পলাশী আমলের পূর্বে কলিকাতার বাড়ি-ঘরগুলির অবস্থান বিবরণ দিতেছি, তদনুসারে তাঁহার আবাস-বাটি, বর্তমান 'গিলাণ্ডার্স-হাউসের' সান্নিধ্যে ছিল। ক্লাইভ রোর তখন কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে এইস্থানে একটি ক্ষুদ্র গলি ছিল, সেই গলি দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ম্যাকেট সাহেবের বাটি দেখিতে পাওয়া যাইত। এই ম্যাকেট সাহেব কলিকাতার বক্সী বা খাতাঞ্জি ছিলেন। হলওয়েলের লিখিত বৃত্তান্ত মতে, এই ম্যাকেট সাহেবই ড্রেক ও মিনচিনের দুর্গত্যাগের পর তাঁহার পীড়িতা পত্নীকে জাহাজে তুলিয়া দিবার অছিলায় দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন।

যে সকল ব্যক্তির নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, যাঁহারা সে সময়ে কোম্পানির আমলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, উইল্‌সের নক্‌সার অনুসরণ করিয়া আমরা কেবল বর্তমান কলিকাতার কোন কোন স্থানে তাঁহাদের আবাস স্থান ছিল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি। সুদূর বর্তমানে পুরাকালের স্মৃতি ডুবিয়া গিয়াছে। অতীতের সেই লালদীঘি ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ, যেন মায়াবলে এক সৌধময় স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ পলাশী-আমলের সময়ে সর্বজন-বিদিত ছিলেন। তাঁহারা সেই সময়ে রাষ্ট্র-বিপ্লব-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বর্তমান ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বল্পবিস্তর সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইভ, ওয়াটস্, হলওয়েল, বেলামী, ম্যাকেট, মিনচিন, অমিচাঁদ, গোবিন্দরাম মিত্র, কাপ্তেন ইলিস্, জন বেয়ার্ড, প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্র। উইল্‌স সাহেবের নক্‌সা নির্দিষ্ট পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া, আরও অনেক ইংরাজ সেই প্রাচীন কলিকাতার বাসিন্দা ছিলেন। এই সমস্ত নক্‌সার চিহ্নিত স্থান হইতে প্রমাণ হয়, তখনকার লালদীঘি ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ, বর্তমান চৌরঙ্গীর ন্যায় ইংরাজ-পল্লীরূপে পরিগণিত ছিল। দেশীয়দের মধ্যে খুব কম লোকই এইস্থানে থাকিতেন। যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহাদের নাম আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। যাঁহারা তখন 'কলিকাতার ইংরাজ' বলিয়া কথিত হইতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই 'মার্চাণ্ট' এবং কোম্পানির সেনা-বিভাগের কর্মচারী ও ফ্যাক্টর।[১]

ইংরাজ-টোলার পরই, পর্টুগীজ ও আর্মানী-টোলা। বর্তমান মুর্গীহাটার সীমা হইতে আরম্ভ হইয়া—বড়বাজার খেংরাপটির আর্মানী-গির্জা ও তৎসংলগ্ন গোরস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পর্টুগীজ ও আর্মানিয়ানগণ বাস করিত। ইহারা কোম্পানির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। খোজা সরহদ, খোজা পিট্রস প্রভৃতি আর্মানিগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ইহার পরই এদেশীয় লোকেদের বাস-পল্লী। এই পল্লী পূর্বোক্ত রক্ষাবন্ধনী বা 'প্যালিসেডের' বাহিরে। উত্তরে সুতালুটি হইতে আরম্ভ করিয়া শোভা-বাজার, কুমারটুলি, বাগবাজার বেষ্টন করিয়া, মারহাট্টাখাতের পার্শ্ব দিয়া সার্কিউলার-রোড, হালসীবাগান, শিয়ালদহ, বৌবাজার প্রভৃতি সীমানার মধ্যবর্তী ভূভাগ দেশীয় ভদ্রলোকদের আবাসস্থান ছিল। অবশ্য এই সকল স্থানে তখন এত ঘন বসতি হয় নাই। অনেক স্থান বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমান চিৎপুর রোড একটি সরু জঙ্গলময় পথ ছিল। বৌবাজারের বর্তমান রাস্তার অস্তিত্ব ছিল না। গোবিন্দরাম মিত্র ও বনমালী সরকারের জন্য কুমারটুলি জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণের জন্য শোভাবাজার

১. Omichand and the Setts are the only Indians whose names appear as house-owners and the Englishmen are all either factors or merchants or officers of the garrisson. H.E.A. Cotton, *Calcutta Old and New.*

গুলজার হইয়াছিল। বর্গীর ভয়ে অনেক লোক নানাস্থান হইতে আসিয়া কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে বাস করে। ইহাতে প্রাচীন কলিকাতার দেশীয় পল্লীসমূহ জনপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৭৯৩ খৃীস্টাব্দে আপজনের ম্যাপে আমরা দেখিতে পাই, "নেটিভ টাউনের বিস্তৃতি বড়বাজার হইতে বৈঠকখানা বাজার পর্যন্ত ছিল।" হোগলকুড়িয়া, সিমুলিয়া প্রভৃতি স্থানও ক্রমশ জনপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।[১] তখন এত বাড়ি ঘর গলিঘুঁজির অস্তিত্বমাত্র ছিল না। চারিদিকে পর্ণকুটীর, মধ্যে মধ্যে জঙ্গল, কোথাও বা নালা-নর্দামা, বড় বড় পুষ্করিণী ও বাগান-বাগিচা। তখনকার এক একটি পল্লীতে, এক এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বাস করিত। তাহাদের নামানুসারেই সেই সমস্ত পল্লীর নামকরণ হইয়াছিল। কুমারটুলিতে কুম্ভকার শ্রেণীর বাসস্থান ছিল। কলুটোলায় তৈল-জীবীরা বাস করিত। মুচিপাড়ায় মুচিদের বাসস্থান ছিল। একটি সুবৃহৎ বট-গাছের অস্তিত্ব জন্য 'বটতলা' নামকরণ হইয়াছে। তুলাপটী প্রভৃতি অঞ্চলে তুলার বাজার ছিল। হোগলকুড়িয়ায় অতিশয় হোগলাবন ছিল। প্রচুর সিমুল-গাছ পূর্ণ ছিল বলিয়া, সিমুলিয়া নামকরণ হইয়াছিল। কসাইটোলায় কসাইগণ বাস করিত। হিন্তাল বা হাঁথাল-গাছের প্রাচুর্য জন্য হিন্তালী হইতে সম্ভবত ইনটালি তৎপরে ইটালি নামকরণ হইয়াছিল। অবশ্য এই সমস্ত নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, সবই আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। পাকা রাস্তা আদতে ছিল না। বড় লোকেরা প্রাসাদতুল্য বাড়ি নির্মাণ করিতেন বটে, কিন্তু চোর ডাকাতের ভয়ে, তাঁহাদের সিপাহী-শাস্ত্রীর ব্যবস্থা করিতে হইত। ভদ্র বাঙ্গালিগণ দলবদ্ধ হইয়া এক এক পল্লীতে বাস করিতেন।

সেকালে 'ফৌজদারি-বালাখানা' একটু জাঁকাল ধরনের ছিল। এই ফৌজদারি বালাখানা বর্তমান লোয়ার চিৎপুর রোড ও কলুটোলার মোড়ে অবস্থিত। আজকাল কলুটোলার মোড়ের যে বাড়িটি, স্বর্গীয় বিনোদলাল সেন ও তাঁহার বংশধরগণের অধিকৃত, সেই বাটির অধিকৃত স্থানেই হুগলীর ফৌজদার কাছারি ছিল। তখন নবাবী আমল। হুগলীর ফৌজদারই তখন এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে মোকদ্দমাসমূহের বিচারক। এই সমস্ত ফৌজদারগণ কিরূপ প্রতাপ-শালী ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে তাঁহারা কত প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাঠক ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। অনেক প্রতাপশালী ফৌজদার কলিকাতায় আসিলে ইংরাজ-বণিকগণ তাঁহাদের ষোড়শোপচারে পূজা দিতেন। ফৌজদারদের কিরূপ উপঢৌকন দেওয়া হইত, তাহার পরিচয়ও পাঠক ইতিপূর্বে পাইয়াছেন। কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তার অনেক স্থানে তাহা উল্লিখিত আছে। কলিকাতায় ফৌজদারের এইরূপ আগমন ব্যাপার রহিত করিবার জন্য ইংরাজেরা তাঁহাকে একটা মোটা টাকা নজররূপে দান করিতেন।[২] এই উৎকোচ পাইয়াই ফৌজদার সাহেব কলিকাতা আসা বন্ধ করিয়া দেন। সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের পর তিনি কলিকাতার শাসনভার রাজা মাণিকচাঁদের উপর দিয়া যান। এই মাণিকচাঁদ হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। কলিকাতা নবাবের দখলে আসিবার পর ফৌজদার রাজা মাণিকচাঁদ কয়েক মাস কাল ফৌজদারি-বালাখানার এই বাটিতে আদালত করিয়া, দেশীয়দের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন।

---

১. The demarcation between the white and black towns, were even sharper. The people of the country were indispensible to the procperity of the factory, but they were not permitted within the pallisades. Outside the stocade two hundred and twenty acres which comprised Christian Calcutta there had therefore spaung up to the north and last a large and flourishing 'Native town' within the wider contour of the Mahratta Ditch. Its importance and extent were materially increased by the influx of population from the western bank of the river which accompanied the Mahratta Scare in 1742—H.E.A. Cotton, *Calcutta Old and New*, p. 51.

২. ১৭৪২ খ্রী. অব্দের *Fort William Consultation*-এর একাংশ এই :—"The Hoogly Phousdar demanding the annual present due in November last, amounting to current rupees two thousand seven hundred and fifty, agreed that the President do pay the same out of the cash"

জন জেফানিয়া হলওয়েল, প্রাচীন কলিকাতার জমিদার

লর্ড ক্লাইভ

ক্লাইভের বিখ্যাত সহযোগী, পলাশী যুদ্ধের অন্যতম
নায়ক অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন
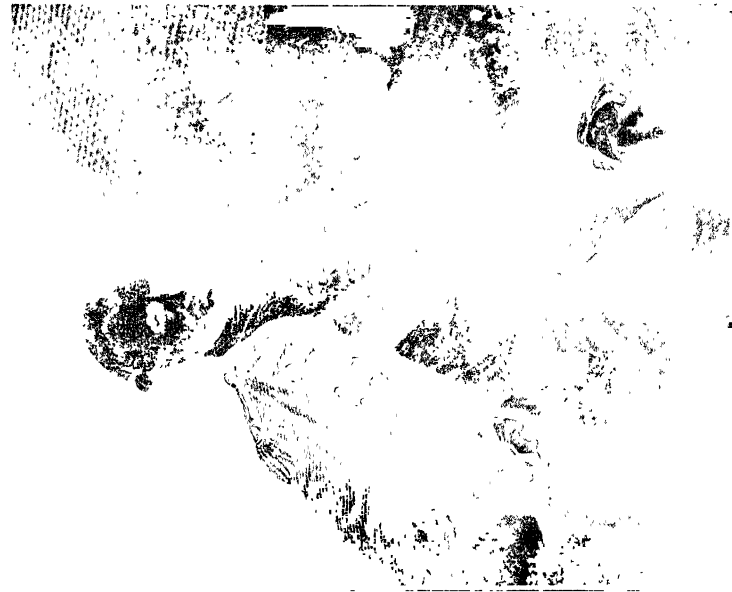
ঊনবিংশ অধ্যায়

নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ

নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ—ড্রেক সাহেবের পলায়ন—অন্ধকূপ-হত্যা ও আক্রমণের পরিণাম— প্রাচীন কলিকাতার শোচনীয় অবস্থা—হলওয়েল কর্তৃক কলিকাতা রক্ষার চেষ্টা— লালদীঘির নিকট তোপমঞ্চ—রাণীমুদী গলির মুখে তোপমঞ্চ—ক্লাইভঘাট স্ট্রীটে কোম্পানির সোরার-গুদামের নিকট তোপমঞ্চ, পেরিন্স-পয়েন্ট রক্ষার বন্দোবস্ত—মীরজাফরের সহিত পেরিন্স-পয়েন্টে ইংরাজ সেনার সংঘর্ষ—মীরজাফরের দমদমায় পলায়ন—কলিকাতা আক্রমণের সময় কোম্পানির কলিকাতার সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য—ক্লাইভ ও ওয়াটসন কর্তৃক কলিকাতার পুনরুদ্ধার—পলাশী সমর—ক্লাইভের জয় ও সিরাজের অধঃ-পতন ও মৃত্যু—ক্লাইভ কর্তৃক মীরজাফরের মসনদে অভিষেক—মীরজাফরের কৃতজ্ঞতা—মীরজাফরের সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ—কলি-কাতা আক্রমণ সময়ে গোবিন্দরাম মিত্রের সাহস—দুর্দশাগ্রস্ত কলিকাতাবাসীদের প্রতি কোম্পানির সদ্ব্যবহার—ক্ষতিপূরণ-কমিশন—গোবিন্দরাম মিত্র ও শোভা-রাম বসাক প্রভৃতি এই কমিশনের প্রধান সদস্য—অন্যান্য দেশীয় কমিশনারগণের নামের তালিকা—তাঁহাদের নষ্ট সম্পত্তির দাবির পরিমাণ—কোম্পানি-বাহাদুরের মঞ্জুরি টাকা—কমিশনের প্রধান কর্মচারী গোবিন্দরাম মিত্র প্রভৃতির অন্যায় দাবী, ক্ষতিপূরণপ্রার্থী কলিকাতাবাসীদের নামের তালিকা—কোম্পানির ২৪ পরগনার জমিদারি—নবাবের এই জমিদারি দান সম্বন্ধে পরোয়ানা—কলিকাতায় ইংরাজের প্রথম টাঁকশাল স্থাপন—সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্র-মণের পর ইহার শোচনীয় অবস্থা—এ সম্বন্ধে সমসাময়িক ব্যক্তিগণের বর্ণনা—পলাশীযুদ্ধের পর কলিকাতা সহরের অবস্থা—ব্ল্যাকহোলের স্মৃতি—কলি-কাতার নাম আলিনগরে পরিবর্তন—১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের পর ভয়ানক মড়ক ও দুর্ভিক্ষ—প্রাচীন কলিকাতায় মহাহুলস্থূল—আইভসের বর্ণনা—এই মড়কে পলাশীবিজয়ী অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের অকাল-মৃত্যু—পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় কলিকাতায় মহামারীর আবির্ভাব—পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালীর মৃত্যু—কলিকাতার রাজপথে মৃতদেহ—পনর শত সাহেবের মৃত্যু—সেণ্ট জন গির্জার সমাধি-ভূমিতে স্থানাভাব, এই ভীষণ মড়কের কারণসমূহ—কলি-কাতার এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য পদস্থ ইংরাজদিগের সহর ত্যাগ ও সহরের বাহিরে বাগানবাটিতে বাস—লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস—সার ফিলিপ ফ্রান্সিসের বাগানবাটি—উমিচাঁদের বাগানবাটি—হাতিবাগান নাম হইবার কারণ—পলাশীযুদ্ধের দশ বৎসর পরে কলিকাতার লোকের সামাজিক অবস্থা—গোবিন্দপুরে নূতন কেল্লা নির্মাণ—অনেক পদস্থ বাঙ্গালীর গোবিন্দ-পুর ত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে বসবাস—সেকালের কলিকাতার বাঙ্গালী বড়-লোক—চৌরঙ্গী অঞ্চলের জঙ্গলময় অবস্থা—পথে ডাকাতের ভয়—সহরের প্রধান শোভা লালদীঘি—গ্রাণ্ডপ্রের লিখিত বিবরণ—পলাশী-আমলের পরে কলি-কাতার পথ-ঘাটসমূহের পরিচয়—সেকালের চাকরবাকর ও তাহাদের মাহিনার হার—হুঁকাবরদার—সাহেবদের মধ্যে হুঁকায় ধূমপান প্রথা—রাইটার বা পুরাকালের সিভিলিয়ানগণ—তাঁহাদের সম্বন্ধে কোম্পানিবাহাদুরের নানাবিধ কঠোর আদেশ—পালকি ব্যবহার নিষেধ ইত্যাদি।

কি কারণে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, তাহার ইতিবৃত্ত অনেকেই জানেন। বর্তমান যুগে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া, বাঙ্গলা ভাষায় ও ইংরাজীতে লিখিত

বড় বড় ইতিহাসে, নবাব ও ইংরাজ কোম্পানির সহিত সংঘর্ষ ব্যাপারের সম্পূর্ণ গূঢ় রহস্য সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙলার মাসিক পত্রিকাসমূহেও এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি সুপণ্ডিত হিল[১] সাহেব ১৭৫৬-৫৭ খৃস্টাব্দের ঘটনাবলী অবলম্বনে, সুবৃহৎ তিনখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। ইংরাজী অভিজ্ঞ পাঠক এই পুস্তক কয়খানি বিশেষ সহিষ্ণুতার সহিত পাঠ করিলে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজ-বণিকদিগের সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণের ফলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'অন্ধকূপ-হত্যা' ঘটনা ঘটে। পাঠক এই অন্ধকূপ-হত্যার সম্বন্ধেও অনেক অপ্রকাশিত নূতন তথ্য, হিলের এই সুবৃহৎ পুস্তকত্রয়ের মধ্যে দেখিতে পাইবেন। এ সমস্ত কথা বিশদভাবে আলোচনার স্থান আমাদের নাই। সুতরাং তাহা সন্নিবিষ্ট হইল না।

সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতার পুরাতন দুর্গ আক্রান্ত হইবার সময় ইংরাজ গবর্ণর ড্রেক সাহেবের দুর্গ রক্ষার নিষ্ফল চেষ্টা, অসমসাহসিক বীর হলওয়েলের দুর্গরক্ষার চেষ্টা, নবাব কর্তৃক দুর্গজয়, ইংরাজগণের কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ফলতায় পলায়ন, নবাব কর্তৃক কলিকাতার নাম 'আলিনগরে' পরিবর্তন প্রভৃতি ঘটনাবলী ইতিহাসানুরক্ত পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের সহিষ্ণুতার উপর অযথা আক্রমণ না করিয়া আমরা কেবল সেই সময়ের কলিকাতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য কথা এস্থলে সংক্ষেপে বিবৃত করিব। তাহা হইতেই পাঠক অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিলে, এ দেশীয় অধিবাসিবর্গের অনেকে প্রাণভয়ে ও নবাবসেনা কর্তৃক সম্পত্তি প্রভৃতি লুণ্ঠনাশঙ্কায় নানাস্থানে পলাইয়া যায়। এই যুদ্ধের জন্য লালদীঘির পার্শ্বস্থ অনেকগুলি বড় বড় বাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বড়বাজার ও লালবাজার প্রভৃতি স্থানে অনেক বাড়ি নবাবের সৈন্য হস্তে অগ্নিমুখে সমর্পিত হয়। কোথাও বা কামানের জ্বলন্ত গোলা-গুলি পড়িয়া অনেক বাড়ি ঘর নষ্ট হইয়া যায়। মোটের উপর নবাবের আক্রমণে প্রাচীন কলিকাতা কিয়ৎকালের জন্য হতশ্রী হইয়া পড়ে।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন এ সংবাদ পাইয়া ইংরাজেরা কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য সহরে অস্থায়ীভাবে এক খাত খনন করেন। প্রয়োজন মত কতকগুলি বাড়িও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। লালদীঘির ধারেও এইভাবে অনেক নালানর্দমা বুজাইয়া ফেলা হয়। বর্তমান ওল্ডকোর্ট হাউস স্ট্রীটে দুইটি তোপমঞ্চ বা ব্যাটারি নির্মিত হয়। আজকাল যেখানে ওয়েস্টএণ্ড কোম্পানির ঘড়ির দোকান, নর্টন-বিল্ডিং ও সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু গির্জা অবস্থিত, সেই স্থানে একটি তোপমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। কোম্পানির সোরার গুদামের নিকট আর একটি তোপমঞ্চ নির্মিত হয়। আজকাল যাহা ক্লাইভ স্ট্রীট বলিয়া পরিচিত এই স্থানের সান্নিধ্যেই এই তোপমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল। তৃতীয় তোপমঞ্চ বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীট, কাউন্সিল-হাউস স্ট্রীট ও গবর্ণমেণ্ট প্লেসের সন্ধিস্থলে স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাগবাজারের "পেরিন্স-পয়েণ্ট" নামক স্থানটিও সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। এই পেরিন্স-পয়েণ্টেই নবাবের সেনাপতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মীর-জাফর চালিত নবাবী-সেনাদলের সহিত ইংরাজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শেষে মীরজাফর পরাজিত হইয়া দমদমার দিকে পলায়ন করেন। পিকার্ড নামক এক যুবক সৈনিকের রণকৌশলেই মীরজাফর দমদমায় পলাইতে বাধ্য হন। তৎপরে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের পর নবাব সিরাজ-

১. S. C. Hill, Bengal in 1756-57 ; a selection of public and private papers, dealing with the affairs of the British in Bengal during the reign of Siraj-ud-daula, Edited with Notes and an historical introduction ; 3 vols, 1905. List of Europeans and others in the English factories in Bengal at the time of the time of the seize of Calcutta in the year, 1756, 1902 এবং Historical and Ecclesiastical Sketches of Bengal from the earliest settlements until the virtual conquest of that country by the English in 1757—এই বইগুলি সম্পাদনা এবং রচনা করেন।

উদ্দৌলা দুর্গাধিকার করেন। এ সমস্ত আখ্যান এখন সর্বজন বিদিত।

অনেকের মনে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় কলিকাতায় প্রাচীন দুর্গ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ধারণা যে ভ্রান্ত ও অমূলক, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে প্রমাণ হয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা দুর্গের ইঞ্জিনিয়ার ও সার্ভেয়ার প্রভৃতি কর্মচারীরা মিলিয়া কর্তৃপক্ষীয়দের আদেশে কোম্পানির অধিকৃত বাটিগুলির একটি মূল্য নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রমাণ হয়—

১।	দুর্গ ও তাহার মধ্যবর্তী গৃহগুলির মূল্য—	১২০০০০৲
২।	হাসপাতাল ..	১২০০০৲
৩।	কোম্পানির আস্তাবল সমূহ ..	৪০০০৲
৪।	জেলখানা ..	৭০০০৲
৫।	সোরার গুদাম ..	৭০০০৲
৬।	কাছারি বাটি ..	১৫০০৲
৭।	কোতোয়ালি হাজত ..	১০০০৲
৮।	দুইটি পোল ..	৭০০০৲
৯।	ছিট-প্রস্তুতকারকদের বাটি ..	৬০০০৲
১০।	বারুদখানা ..	৬৯২৫৲
১১।	ডক ও তৎসংলগ্ন গৃহাদি ..	৭০০০৲
১২।	নব নির্মিত মালগুদাম ..	২৫০০০৲
১৩।	বাগবাজারের রিডাউট বা রক্ষামঞ্চ ..	২১০০০৲

ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলিকাতা আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্য সদলবলে মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। ইঁহাদের বাহুবলে কলিকাতায় ইংরাজাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরই কারণপরম্পরা উপস্থিত হইয়া পলাশী মহাসমরের সূচনা ঘটে।

পলাশীযুদ্ধে ইংরাজ পক্ষ জয়লাভ করিলে মীরজাফর, বীরপ্রবর ক্লাইভের পোষকতায় বাঙ্গলায় মসনদে উপবিষ্ট হন। মীরজাফর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ইংরাজ কোম্পানিকে ২৪ পরগনার জমিদারি প্রদান করেন। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মৌজার জন্য ইংরাজদিগকে নবাব সরকারে ইতিপূর্বে রাজস্ব দিতে হইত। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমল হইতেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মীরজাফর নবাবী প্রাপ্তির পর, কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মৌজা, নিষ্করদান রূপে কোম্পানিকে প্রদান করেন।

কলিকাতা আক্রমণের সময়, অনেক বাঙ্গালীর ঘরবাড়ি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। অনেক ইংরাজ বাসিন্দারও সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া যায়। নবাবসৈন্যে কলিকাতা লুঠে করায়, অনেকের বহুমূল্য জিনিষ পত্রাদিও নষ্ট হয়। নবাব মীরজাফর সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজ-কোম্পানির প্রজাবর্গের জন্য ও কোম্পানির যে সমস্ত ইংরাজ কর্মচারী এই আক্রমণের ফলে গতসর্বস্ব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ জন্য এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা কোম্পানিকে দিয়াছিলেন। এদেশীয়দের মধ্যে অনেকে কলিকাতা আক্রমণের সময় প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, কলিকাতা রক্ষার জন্য ইংরাজের কোন সহায়তা করে নাই—এজন্য প্রথমে এই সংকল্প স্থির হয় যে, এদেশীয় লোকেরা কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাইবে না। এ দেশীয় অধিবাসিগণের মধ্যে যাহারা নবাবের সহায়তা করিয়াছিল, তাঁহার দলে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদেরও ক্ষতিপূরণ দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। উমিচাঁদ গুপ্তভাবে নবাবের সহায়তা করিয়াছিলেন, এই সন্দেহে প্রথমে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুর বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ না পাওয়াতে এই ক্রোকী-সম্পত্তি পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

কলিকাতার বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে গোবিন্দরাম মিত্র, শোভারাম বসাক প্রমুখ কয়েকজন বাঙ্গালী সেই সময়ে কলিকাতা ত্যাগ করেন নাই। ইঁহাদের প্রার্থনামতে কোম্পানি-

বাহাদুর পরে একটি কমিশন বসান। কমিশনের কর্তারা স্থির করেন, যেসকল বাঙ্গালী, নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় সহর ত্যাগ করে নাই বা কোম্পানির কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তাহারা ক্ষতিপূরণস্বরূপ নবাব মীরজাফর প্রদত্ত টাকার অংশ পাইবে। দেশীয়দের মধ্যে এই টাকা বিতরণ করিবার ভার গোবিন্দরাম মিত্র ও শোভারাম বসাকের হাতে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা এই খেসারত পূরণের টাকার খুব বেশী অংশই নিজেরা গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে কোম্পানিকে কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ প্রথমে ক্ষতিপূরণ করিতে অস্বীকৃত হইলেও, পরে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধ্যে এই টাকা বিতরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রজা ও বসাক মহাশয়ের বন্দোবস্তের দোষে অনেকের ভাগ্যে যৎসামান্যই পড়িয়াছিল।

এই টাকা বিতরণ করিবার জন্য তেরজন এদেশীয় কমিশনার নিযুক্ত হন। আমরা তাঁহাদের নামের তালিকা, ক্ষতিপূরণের দাবির টাকার একটি তালিকা, এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই তালিকায় পলাশী-আমলে কলিকাতার জনকয়েক অবস্থাপন্ন অধিবাসীর কথা জানিতে পারা যায়।

কমিশনারগণের নাম	তাঁহাদের নষ্ট সম্পত্তির জন্য দাবির পরিমাণ	কোম্পানি বাহাদুরের মঞ্জুরি টাকা
১ গোবিন্দরাম মিত্র ও রঘুনাথ মিত্র	৪১২৬৮০।/০	৩৭৬৮০।/০
২ শোভারাম বসাক	৪৪১২৭৮॥/০	৬৬২৭৮॥/০
৩ আলিজান ভাই	৩৪৪৫৭॥/০	১৭৪৫৭৲
৪ রতু সরকার বা রতন সরকার	১৮০৩২২৶০	৪০৩২২৶০
৫ শুকদেব মল্লিক	৫০৯৪২॥০	১০৯৪২॥০
৬ নয়নচাঁদ মল্লিক	৪৩৯২২॥০	৫৯২২৲
৭ দয়ারাম বসু	৫১৫৩॥০	১১৫৩৸/০
৮ নীলমণি মিত্র	২৮১১৩॥০	১০১১৩৸/০
৯ হরেকৃষ্ণ ঠাকুর	১৩৭৮৮৵০	৩৭৮৮৵০
১০ দুর্গারাম দত্ত	৬৪৭৵০	১০০৲
১১ রামসন্তোষ	৬৪১০৵০	৯১০৲
১২ মহম্মদ সাদেক্	২৭১৬৵০	১৲
১৩ আইমুদ্দিন	*	*

পূর্বোদ্ধৃত তালিকায় কোম্পানি-বাহাদুরের নিযুক্ত তেরজন বাঙ্গালী কমিশনারের নাম ও নবাব কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের জন্য তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের দাবির পরিমাণ পাঠক জানিতে পারিয়াছেন। এই তেরজন কমিশনারের মধ্যে তিনজন মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদ সাদেকের দাবির পরিমাণ ২৭১৬ টাকা। কিন্তু কোম্পানি-বাহাদুর তাঁহাকে একটি মাত্র টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, অনেকে লোভে পড়িয়া আশার অতিরিক্ত দাবি করিয়া বসিয়াছিল। অপরন্তু এই তালিকা হইতে প্রমাণ হয় কোম্পানি বাহাদুর সকলেরই দাবি যথেষ্ট কমাইয়া দিয়াছিলেন। এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে শোভারাম বসাক সর্বাপেক্ষা বেশী টাকা পান আর গোবিন্দরাম মিত্র তাঁহার নিম্নে। এই তেরজন বাঙ্গালী কমিশনারের অনুগৃহীত কলিকাতার অন্যান্য বাঙ্গালী অধিবাসিগণ ক্ষতিপূরণস্বরূপ কত টাকা পাইয়াছিলেন, পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, আমরা তাহার আর একটি তালিকা পর পৃষ্ঠায় সংগ্রহ করিয়া দিলাম। পূর্বোল্লিখিত তালিকায় যাঁহাদের নাম আছে নিশ্চয়ই তাঁহারা সেকালের কলিকাতায় বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন ও কোম্পানি-বাহাদুর তাঁহাদের যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণের টাকা বাঁটিয়া দিবার সময় উল্লিখিত কমিশনারগণ তাঁহাদের [illegible] পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

কোম্পানি বাহাদুরের সেরেস্তার বানান	নাম	ক্ষতিপূরণের দাবি	যাহা মঞ্জুর হয়	দেশীয় কমিশনারগণের সহিত ক্ষতিপূরণপ্রার্থীদের সম্বন্ধ
Chaithon Dass	চৈতন দাস	১৭০২৲	৩০২৲	রতু সরকারের আশ্রিত ব্যক্তি
Dulob Lucky	দুর্লভ লক্ষ্মী			
Canaut Nurry	কানতনরী	৮২৩৩৷৶০	১২২৩৷৶০	শোভারাম বসাকের আশ্রিত ব্যক্তি
Churn Bysack	চরণ বসাক			
Curoy Bissas	কুড়রাম বিশ্বাস	৫৯৮৩।০	১৯৮৩।০	গোবিন্দরাম মিত্রের অধীনস্থ কুলীসর্দার
Gones Bose	গণেশ বোস	১৫১৭/০	৩১৭/০	কমিটির জনৈক কেরাণী
Rumdeb Mittre	রামদেব মিত্র	৭৩১৩৷০	১৩১৩৷০	গোবিন্দরামের সম্পর্কীয় ব্যক্তি (১৭৪৭ সালে ইহার মৃত্যু হয়)
Sookdeb Mittre	শুকদেব মিত্র	২৩৮০।০	৩৮০।০	ঐ (কলিকাতা লুণ্ঠনের চারি বৎসর পূর্বে ইহার মৃত্যু হয়)
Ruttan	রতন	৩১৫২।০	৬৫২।০	
Lolita	ললিতা	২৪১৯৷৵০	৪১৯৷৵০	গোবিন্দরাম মিত্রের আশ্রিতা গণিকাগণ
Mutty Bewah	মতিবেওয়া	৩৫৭৭৷৴০	৫৭৭৷৴০	
Ruajaram Palit	রাজারাম পালিত	৪২১৫৷৴০	১০১৫৷৴০	শোভারামের আশ্রিত ব্যক্তি
Durgaram, Binda, Gonga	দুর্গারাম, বিন্দু, গঙ্গা	৩০৯১৲	৫১৯৲	গোবিন্দরাম মিত্রের অনুগৃহীত ব্যক্তি
Durgaram Surma	দুর্গারাম শর্মা	৫৩২৷৶০	১৩২৷৶০	ঐ
Lilmoney Chandra	নীলমণি চন্দ্র	৭১০।০	১৬০।০	ঐ
Harryram Ghose	হরিরাম ঘোষ	৩৯০৷০	৯০৷০	ঐ
Ramcharn Sarkar	রামচরণ সরকার	৬৪৬৲	৯৬৲	কমিটির কেরাণী
Luckicond Ghose	লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ	৩১৮৷৵০	"	গোবিন্দরামের অনুগৃহীত
Niandas Dobah	নয়ানদাস ধোপা	১৬৬৭।/০	৪৬৭।/০	রতু সরকারের অনুগৃহীত
Guugadutt Pattar	গঙ্গাদত্ত পাত্র	২৫১৩৵০	৫১৩৵০	শোভারাম বসাকের আশ্রিত
Bindabund and Fullichund	বৃন্দাবন ও ফুলচাঁদ	১২৩৯৫।০	২৮৯৫।০	রতু সরকারের আশ্রিত
Gopichurn Bysak	গোপীচরণ বসাক	৪০৫৬।৵০	১০৫৬।৵০	শোভারাম বসাকের আশ্রিত
Ramkissor Chucerbutty	রামকিশোর চক্রবর্তী	১৪২১৲	৪২১৲	গোবিন্দরাম মিত্রের আশ্রিত
Radacond Roy	রাধাকান্ত রায়	৮৭৬৷৴০	১৭৬৷৴০	নীলমণি মিত্রের লোক
Ramsuncar Sircar	রামশঙ্কর সরকার	১১৪০।০	২৪০।০	রামসন্তোষের আশ্রিত
Berjokessore Siromony	ব্রজকিশোর শিরোমণি	২১৯৮।০	৬৯৮।০	নীলমণি মিত্রের আশ্রিত ব্যক্তি

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের জন্য অনেক বাঙ্গালী অধিবাসী কোম্পানির নিকট, তাঁহাদের নষ্ট-সম্পত্তির ক্ষতি-পূরণের জন্য দাবি করেন। কোম্পানি ইহাদের দাবি কতদূর সঙ্গত ও সত্য তাহা মীমাংসার ভার তৎকালীন কয়েকজন গণনীয় বাঙ্গালীর উপর দেন। ইহারাই 'নেটিভ কমিশনার' বা মীমাংসাকারী হইয়াছিলেন। এই মীমাংসাকারীদের মধ্যে কলিকাতার বন্যাক-জমিদার গোবিন্দ-রাম মিত্র, শোভারাম বসাক,[১] রতু সরকার, নীলমণি মিত্র, রামসন্তোষ প্রভৃতি কয়েকজন সেকালের নামজাদা বাঙ্গালী ছিলেন। গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলির অধিবাসী। নবাব যখন কলি-

১. "Sobharam left altogether thirty seven houses, situated mainly in the great Bazar, and three gardens and one pond in different parts of Calcutta—Pradip Sinha, ***Calcutta in Urban History*** p. 65.

কাতা আক্রমণ করেন তখন তিনি কলিকাতার আবাসবাটি ত্যাগ করেন নাই। নিজের সিপাহীদ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শোভারাম বসাক সম্ভবত কলুটোলা অঞ্চলে থাকিতেন। আজও তাঁহার নামে একটি রাস্তা ঐ অঞ্চলে আছে। রতু সরকার, নীলমণি মিত্র ও শোভারাম বসাক, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত ব্যবসা-সম্বন্ধে লিপ্ত ছিলেন। রতু সরকার শোভারামের প্রতিবেশী। কলুটোলার দিল্লীপটীতে আজও তাঁহার নামে একটি গলি বর্তমান। নীলমণি মিত্র সম্ভবত দরজীপাড়ায় থাকিতেন। নীলমণি মিত্রের স্ট্রীট বলিয়া একটি রাস্তা আজও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে।

উল্লিখিত তালিকা হইতে প্রমাণ হয়, যে সকল ব্যক্তি নবাব কর্তৃক সম্পত্তিনাশের ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই উক্ত মিত্রজা সরকার ও বসাক মহাশয়ের অনুগৃহীত। প্রার্থিগণ যত টাকার দাবি করিয়াছিলেন অবশ্য তাহার সমস্তটা পান নাই। প্রথম তালিকায় গোবিন্দরাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজের জন্য বার লক্ষ কুড়িহাজার চারিশত উনত্রিশ টাকা দাবি করেন। দ্বিতীয় তালিকাতেও দাবির পরিমাণ তিয়াত্তর হাজার চারিশত তিপ্পান্ন টাকা। কোম্পানি-বাহাদুর গোবিন্দরামের দাবিটা কিছু অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন। কারণ তাঁহারা বলেন নবাব কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের সময় কোম্পানির সিপাহীরাই গোবিন্দরামের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিয়াছিল। যাহা হউক, এই ক্ষতিপূরণের টাকা অনেকেই পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের মূল দাবি হইতে অনেক টাকা বাদ গিয়াছিল।

পলাশীযুদ্ধের পর ক্লাইভ মীরজাফরকে বাঙ্গলার মসনদে বসাইলেন। মীরজাফরের সহিত সন্ধির শর্তবলে ইংরাজেরা মারহাট্টা-খাতের সীমামধ্যে ও সীমার বাহিরে ৬০০ গজ পর্যন্ত জমির দখলী-স্বত্ব লাভ করেন। এই সময়ে কলিকাতার দক্ষিণে কুলপী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগগুলি কোম্পানির জমিদারিভুক্ত হয়। অন্যান্য জমিদারের ন্যায় কোম্পানিও সরকারি রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকেন। এই সরকারি রাজস্বের পরিমাণ দুইলক্ষ বাইশ হাজার নয়শত আটান্ন টাকা। এই জমিদারি চব্বিশটি পরগনায় বিভক্ত ছিল, কিম্বা ইহার মধ্যে চব্বিশটি পরগনা থাকায় ইহা 'চব্বিশপরগনা' নামে অভিহিত হয় এবং আজ পর্যন্ত এই নামই চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ে নবাব তাঁহার অধীনস্থ তালুকদারগণের উপর এক পরওয়ানা জারি করেন। এই পরওয়ানায় লিখিত থাকে, "এখন হইতে এই সমস্ত জমিদারি কোম্পানি-বাহাদুরের হইল। তাঁহারা তোমাদের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক হইলেন। তাঁহারা তোমাদের সহিত যেরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার করিবেন, তাহাই তোমাদের মান্য করিতে হইবে। ইহাই আমার আদেশ।"[১]

পূর্বে বলিয়াছি নবাব মীরজাফরের সহিত ইংরাজের সন্ধির শর্তানুসারে, সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময়, ইংরাজ ও দেশীয়গণের যে সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল বা অগ্নিদাহে যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণার্থে নবাব এক ক্রোর টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করেন। কটন সাহেবের মতে, কলিকাতার ইংরাজ-অধিবাসীরা পঞ্চাশলক্ষ, হিন্দু ও মুসলমানেরা কুড়িলক্ষ ও আর্মানিয়ানগণ সাতলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ পান। দেশীয়গণের দাবির দুইটি তালিকা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। নবাব কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে এক দফায় ৭৬ লক্ষ টাকা মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসে। এই টাকা ৭০০টি কাঠের সিন্দুকে আবদ্ধ ছিল ও একশতখানি নৌকাযোগে মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল। ইহার দুই সপ্তাহ পরে কোম্পানির

১. The *Purwana* of the Nabob to the officials and land-holders of the granted lands ends with these quaint words—"Know then ye Zaminders, Chaudharis, Talookdars, Mutsuddis, and Recayas of the Chakla of Hooghly and others situated in Bengal, the Celestial Paradise you are dependants of the Company and you must submit to such treatment as they give you, whether good or bad and this is my express injunction."

ক্ষতিপূরণের জন্য আরও চল্লিশ লক্ষ টাকা কলিকাতায় পৌঁছায়। এতকাল কোম্পানি নবাবী টাঁকশাল হইতে টাকা তৈয়ার করাইয়া লইতেন। মীরজাফরের সহিত সন্ধির ফলে ইংরাজেরা কলিকাতার টাঁকশাল স্থাপন ও তাহাতে নিজের মুদ্রা অঙ্কন করিবার স্বত্ব লাভ করেন। ১৭৫৭ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে কোম্পানি বাহাদুর নিজের টাঁকশালে সর্বপ্রথম টাকা তৈয়ারি করেন। অবশ্য এই সমস্ত টাকা দিল্লীর বাদসাহের নামযুক্ত হইয়া অঙ্কিত হইত। তাহাতে উর্দু-ফার্সী ভাষায় সব কথা লেখা থাকিত। ইংলণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের সময় হইতে[১] ইংরাজ-কোম্পানি ইংলণ্ডাধিপের মূর্তি সম্বলিত মুদ্রার প্রথম প্রচলন করেন। এ মুদ্রা এখনও অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্লাইভ ও ওয়াটসন নবাব কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের সাত মাস পরে তাহা পুনরাধিকার করেন। এই সময়ে কলিকাতার অবস্থা বর্ণনা করিয়া একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজলেখক লিখিয়াছেন, "ক্লাইভ ও ওয়াটসন আসিয়া দেখিলেন, কলিকাতার অবস্থা অতি শোচনীয়— অনেক বড় বড় বাড়ি ভগ্নস্তূপে পরিণত। সাহেব-পল্লীর অনেকগুলি বাড়ি অগ্নিবিদগ্ধ হইয়া অঙ্গারভস্মে পরিণত। সেণ্ট এ্যান গির্জা ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় উপনীত। গির্জার মধ্যে, আর্মানী ও পর্টুগীজদের গির্জা, অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল। নাগরিকগণের বহুমূল্য সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহার অধিকাংশই তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়নের সময় সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, কিম্বা তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নবাবসৈন্য কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। সহরের ইউরোপীয় অংশের অবস্থাই এইরূপ। দেশীয় বিভাগের অবস্থা আরও শোচনীয়। সমগ্র বড়বাজার অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত। অনেক ঘর বাড়ি শূন্য পড়িয়া আছে তাহাতে লোকজন নাই। কলিকাতার দুর্গের মধ্যস্থলে মুসলমানেরা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। এই মসজিদের অবস্থান-স্থান সঙ্কুলানের জন্য তাহারা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাড়ি ভাঙ্গিয়া তাহার ইঁট-কাঠ লুটিয়া লইয়াছে। অর্থলোলুপ মাণিকচাঁদকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার সর্বময় কর্তা করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। নবাবের প্রথম আক্রমণ সময়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার অধিবাসী প্রাণভয়ে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। মাণিকচাঁদের উৎপীড়ন ভয়ে তাহারা কলিকাতায় শান্তি স্থাপিত হইলেও ফিরিয়া আসিতে সাহস করে নাই। আশ্চর্যের বিষয় কলিকাতা দুর্গমধ্যস্থ মালগুদোমে তখনও অনেক টাকার মাল অলুণ্ঠিত অবস্থায় ছিল। কারণ নবাবের ভয়ে কেহ ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে নাই। 'সিরাজউদ্দোলা নিজে এইগুলি লইবেন' এই কথা শুনিয়া কেহ তাহা স্পর্শও করে নাই।

নবাব সিরাজউদ্দোলা কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠন সময়ে চার্নক প্রতিষ্ঠিত, ধীরে ধীরে নির্মিত, প্রাচীন কলিকাতার প্রায় একরূপ ধ্বংসসাধনই হইয়াছিল। নবাব মীরজাফরের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের টাকা পাইবার পর অনেকে নূতন করিয়া ঘর বাড়ি করিতে আরম্ভ করে। ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলিকাতায় ইংরেজাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলে কলিকাতার পলায়িত অধিবাসীরা পুনরায় এই সহরে ফিরিয়া আসে। ১৭৫৭ সাল হইতে আবার নূতন ভাবে কলিকাতা সহর নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ধরিতে গেলে এই সময় হইতে বর্তমান কলিকাতার দ্বিতীয়বার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

পলাশী-যুদ্ধের পর কলিকাতা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। কি করিয়া ক্লাইভ ও ওয়াটসন কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানেন। তাহার পর পলাশীক্ষেত্রে নবাব ও ইংরাজের ভাগ্য-পরীক্ষা হয়। পলাশীযুদ্ধে জয়ী হইয়া ক্লাইভ গৌরব-মুকুট-মণ্ডিত হন। দুর্ভাগ্য সিরাজউদ্দোলা সিংহাসনচ্যুত হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে পলায়ন কালে পথিমধ্যে ধৃত হন। মীরজাফরের পুত্র মীরনের হস্তে তাঁহার জীবনলীলার অবসান হয়। এই পলাশীযুদ্ধ সম্বন্ধে যাঁহারা বিশদ বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা সুপণ্ডিত

১: চতুর্থ উইলিয়ামের রাজত্বকাল ১৮৩০-১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিলের সুবৃহৎ গ্রন্থগুলি পাঠ করিবেন।

ব্ল্যাক-হোল ঘটনার শোকাবহ স্মৃতি১ পলাশীর রণাগ্নিময়ে প্রজ্বালিত হয়। ক্লাইভ ও ওয়াটসনের বীরকীর্তিতে সমগ্র বঙ্গদেশ মুখরিত হইয়া উঠে। দেশের লোকে জানিতে পারে, ইংরাজ জাতি এতদিন বাণিজ্য করিয়াই আসিয়াছে, কিন্তু সমরনীতিতেও তাঁহারা অদ্বিতীয়। অনেক দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোকে বুঝিল, "ক্লাইভ ও ওয়াটসনের বাহুবলে বঙ্গদেশে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। একদিন সমগ্র বঙ্গদেশ ইংরাজেরই হইবে।" ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি ব্যবসায়ী বণিকগণ এই সময় হইতে লোকের চক্ষে অতি হীনশক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। লোকে বুঝিল, ইংরাজের কলিকাতা এখন বিপদে আপদে তাহাদের আশ্রয়কেন্দ্র হইল। কলিকাতা আক্রমণের সময় যেসমস্ত লোক সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় সহরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। শ্রীহীন শ্মশানবৎ কলিকাতা পলাশী-যুদ্ধের পর হইতেই আবার ধীরে ধীরে নবশ্রী সম্পন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। সমগ্র বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতে ইংরাজ জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা ক্রমে ক্রমে প্রচারিত হইতে লাগিল। দিল্লীর ক্ষমতাহীন বাদসাহের কর্ণেও ক্লাইভ ও ওয়াটসন কর্তৃক কলিকাতা পুনরাধিকার ও পলাশী-সমরের বিজয়বার্তা পেঁৗছিল।

ইংরাজজাতি বাহুবলে সমগ্র বঙ্গমধ্যে যে শক্তিসঞ্চয় করিলেন, এইবার তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল । মীরজাফরের সহিত পূর্ব সন্ধির শর্তানুসারে, ক্লাইভ তাঁহাকে মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কলিকাতা লুণ্ঠনের সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কোম্পানির প্রজাবর্গের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার পূরণার্থে নবাব মীরজাফর ক্রোরাধিক মুদ্রা প্রদান করিলেন। এ মুদ্রা কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে কিরূপ ভাবে বিতরিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা পাঠক পূর্বেই দেখিয়াছেন।

সিরাজ কলিকাতার নাম আলিনগর রাখিয়াছিলেন। ক্লাইভ কলিকাতা উদ্ধারের ও পলাশী-সমরের পর তাহা পুনরায় কলিকাতায় পরিবর্তিত করেন।২

---

১. ব্ল্যাক-হোলের নৃশংস ব্যাপার প্রকৃতই ঘটিয়াছিল কি না, ইহা হলওয়েলের স্বকপোলকল্পিত কাহিনী কি না, এই কথা লইয়া বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ অনেক তর্ক-বিতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি মিঃ হিলের সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় এই ব্যাপারের একরূপ পূর্ণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা হিলের গ্রন্থ আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন ব্ল্যাক-হোলের ব্যাপার আদৌ কল্পনা-প্রসূত নহে। হলওয়েল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সম্পূর্ণরূপে এই নৃশংস ব্যাপারের জন্য কলঙ্কমুক্ত করিয়া গেলেও ঐতিহাসিকগণ তর্কের কলরব তুলিতে ছাড়েন নাই। নবাব ইহার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী না হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার জমাদারগণের দোষেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ব্ল্যাক-হোলের মৃত ব্যক্তিগণের দেহ পরদিন প্রভাতে একটি খাতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তী কালে হলওয়েল 'ব্ল্যাক-হোলের' নৃশংস ব্যাপারের স্মৃতিরক্ষার জন্য এই খাত বুজাইয়া একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন। সে স্মৃতিস্তম্ভটি পরে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। আধুনিক কালে আমাদের ভূতপূর্ব-রাজ প্রতিনিধি প্রত্নতত্ত্ববিৎ লর্ড কার্জন বাহাদুর হলওয়েলের স্মৃতিস্তম্ভের অধিকৃত স্থানে ঠিক সেইরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। বর্তমান রাইটার্স-বিলডিংএর যে কোণে সেকালের সেণ্ট এ্যান গির্জা ছিল তাহার সান্নিধ্যেই এই স্মৃতিস্তম্ভ অবস্থিত। লর্ড কার্জন বহু চেষ্টার পর ব্ল্যাক-হোলের স্থান নির্ধারণ করিয়া সেই অন্ধকূপবৎ কারাগৃহের অধিকৃত ভূমির একাংশ কৃষ্ণপ্রস্তর মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকে ব্ল্যাক-হোল স্মৃতিচিহ্ন দুইটির ছবি দিলাম।

অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা সম্পূর্ণ অলীক এ মতবাদ গ্রহণ না করিলেও এ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে হলওয়েল বর্ণিত ঘটনার মধ্যে বহু অসঙ্গতি এবং অতিরঞ্জন রয়েছে। লেখকের রচনাকালের পরবর্তী সময়ে যে সব নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে মোট মৃতের সংখ্যা অনধিক ৬৪। Dr. Brijen Gupta রচিত Sirajuddaulah and the East India Company, 1756-1757 গ্রন্থের The Black Hole শীর্ষক আলোচনা p. 70-81 দ্রষ্টব্য।

ব্ল্যাক-হোল স্মৃতিস্তম্ভটি বর্তমানে সেণ্ট জন চার্চ প্রাঙ্গণে স্থানান্তরিত হয়েছে।

২. এখনও এই আলিনগর নামের অপভ্রংশ 'আলিপুর'-এর অস্তিত্ব রহিয়াছে। নবাব মীরজাফর আলি এইস্থানে এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বসবাস করেন। আজকাল যেখানে এগ্রি-হর্টিকলচারাল সোসাইটির বাগান অনেকে অনুমান করেন সেইস্থানের উপর একটি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছিল। ইহাই মীরজাফরের আবাস-

ব্ল্যাক-হোল-এর চিত্র : প্রতিলিপি
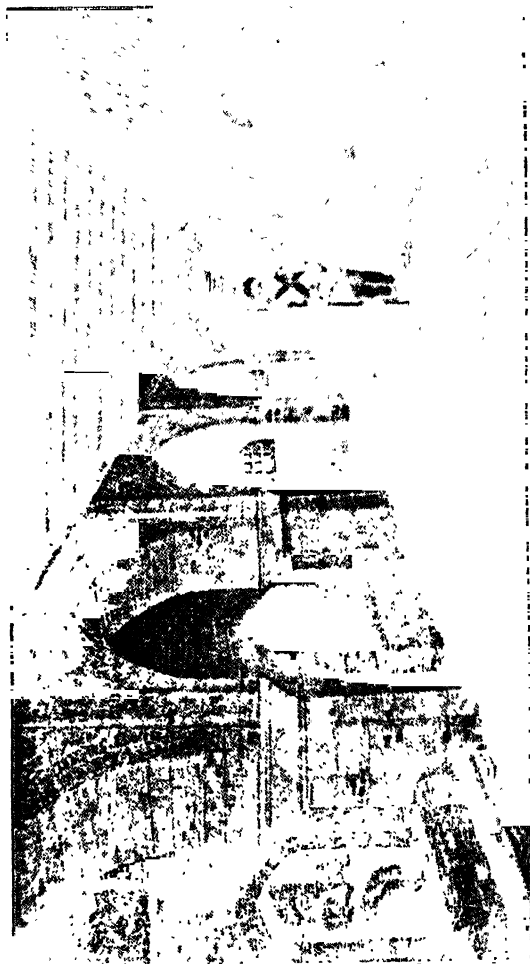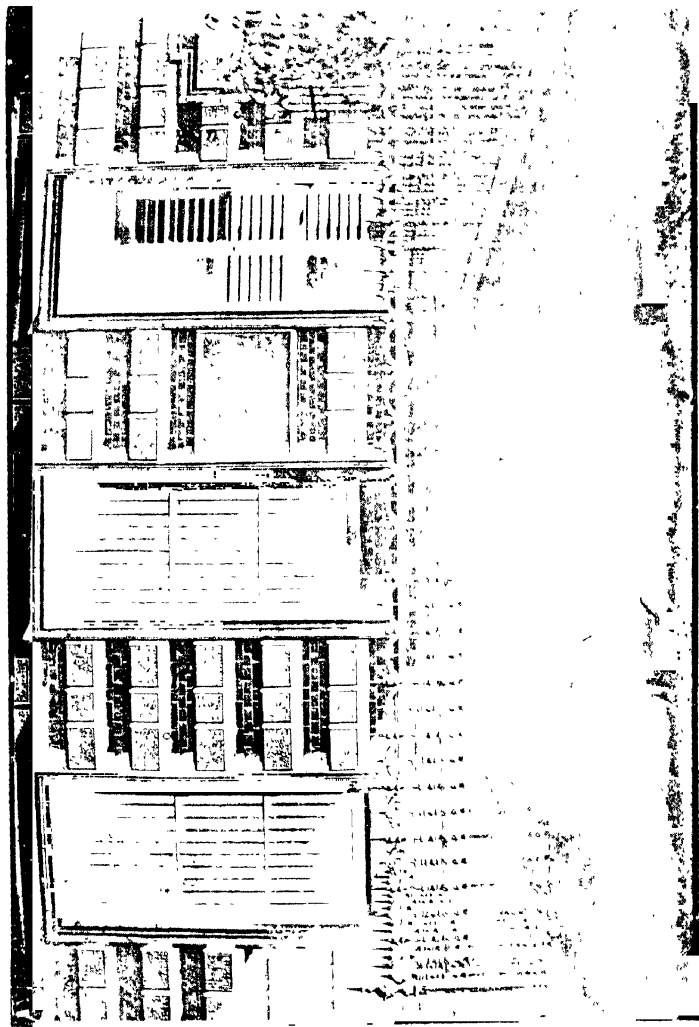
লর্ড কার্জন কর্তৃক স্থাপিত ব্ল্যাকহোল-এর স্মৃতিচিহ্ন
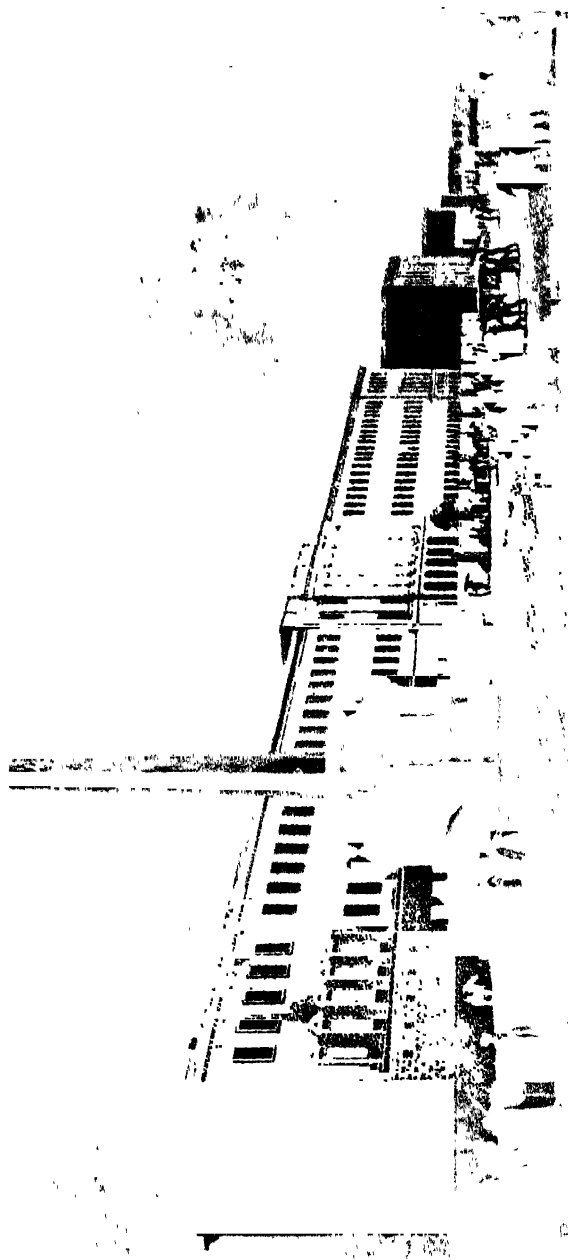
হলওয়েল-স্থাপিত ব্ল্যাকহোল স্মৃতিস্তম্ভ ও ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের রাইটার্স বিল্ডিং
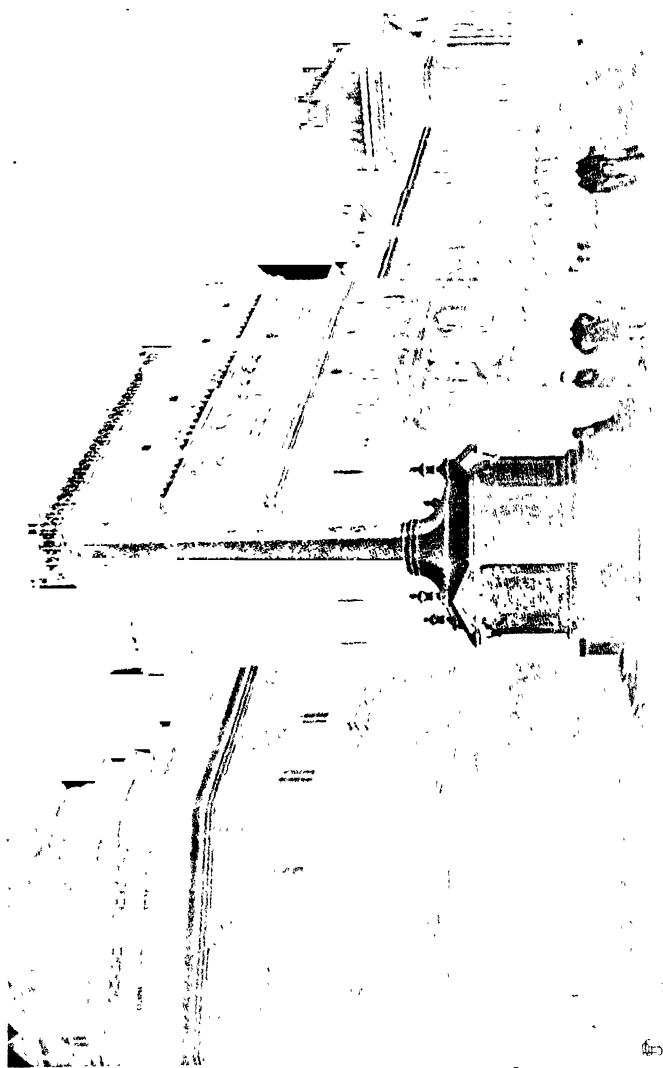
১৯১৪-র হলওয়েল মনুমেণ্ট (লর্ড কার্জন প্রতিষ্ঠিত) ও রাইটার্স বিল্ডিং

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠে। যুদ্ধ-বিগ্রহাদি-সঞ্জাত বিপ্লবের পর প্রায়ই মড়ক ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় ভীষণ মড়ক দেখা দিল। অনেক লোকজন মরিতে লাগিল। নবাবের আক্রমণে কলিকাতার যে ক্ষতি হইয়াছিল, শমনের আক্রমণে তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইতে লাগিল। সহরময় একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

ওয়াটসনের নৌ-বহরের 'কেন্ট'[১] জাহাজের চিকিৎসক আইভ্‌স সাহেব,[২] এই মড়ক সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাঁহার উক্তির একাংশ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিতেছেন—'এই সময়ে কোম্পানির হাসপাতাল রোগীতে পরিপূর্ণ। ফেব্রুয়ারি হইতে (১৭৫৭) আগস্ট পর্যন্ত এই সাত মাসের মধ্যে ১১৫০ জন রোগী হাসপাতাল হইতে রোগমুক্ত হয়। ইহাদের সকলেই ইংরাজ। স্কর্ভি, পৈত্তিক-জ্বর, পিত্তশূল প্রভৃতি রোগেই অনেকে ভুগিতেছিল। ইহাদের মধ্যে জ্বর-রোগীর সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। এই সাত মাসের মধ্যে ৫২ জন লোকের হাসপাতালে মৃত্যু হয়। ৭ই আগস্ট হইতে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরও ৭১৭ জন রোগী হাসপাতালে প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে ১০১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই মৃতের দলের মধ্যে পলাশী-বিজয়ী অ্যাডমিরাল ওয়াটসনও ছিলেন। তিনিও জ্বররোগে ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৭৫৭ অব্দের আগস্ট মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।[৩] যে ওয়াটসন এত কাণ্ড করিয়া বঙ্গদেশে ইংরাজের যশঃগৌরব বিকীর্ণ করিলেন, তাঁহাকে অধিক দিন সে যশ সম্ভোগ করিতে হয় নাই।

পলাশী-যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে, আর একবার কলিকাতায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। প্রথমবারের আক্রমণে অনেক ইংরাজ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিল। ১৭৬২ অব্দের মহামারীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার আট বৎসর পরে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী মহা দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মহামারীও দেখা দেয়। 'হিকিস্ গেজেট' সেকালের একমাত্র ইংরাজী সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রের বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় কেবল কলিকাতা সহরেই ৭৬ হাজার লোক তিন মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মেকলে এ সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই ভয়াবহ। কলিকাতার রাজপথ ও অলিগলিসমূহ মৃতদেহে পরিপূর্ণ। কোথাও বা মৃতদেহ সৎকারাভাবে পড়িয়া আছে—তাহা শকুনি-গৃধিনীর উদরস্থ হইতেছে, কোথাও বা মুমূর্ষু ব্যক্তি পথের ধারে পড়িয়া আর্তনাদ করিতেছে। যাহারা পারিতেছে তাহারা গঙ্গাতীরে বালুকার উপর মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিয়া যাইতেছে। সৎকারের লোক নাই, সৎকার করে কে? এই মড়কের সময়, জুলাই হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে, পনর শত সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বাটি। আবার অন্য মতে হরিণবাড়ি জেল যেস্থানে নির্মিত হইয়াছে, সেইস্থানে তাঁহার প্রাসাদ ছিল। আজকাল যেস্থান অধিকার করিয়া জুলজিক্যাল গার্ডেন আছে সেইস্থানে মীরজাফরের প্রণয়িনী মণিবেগমের কলিকাতা বাসগৃহ ছিল।

১. ওয়াট্‌সনের নৌবহরের জাহাজটির প্রকৃত নাম Kent.

২. Edward Ives. 'Surgeon on Admiral Watson's ship the *Kent* which was sent out to the relief of the British Settlements in India against Dupleix, 1754; wrote an account of the voyage from England to India, and of the subsequent naval and military operations 1755-57. In this book, published in 1773. . . he calls himself "Surgeon of His Majesty's Hospital in the East Indies."—C.E. Buckland, ***Dictionary of Indian Biography*** p. 217

৩. বর্তমান সেন্ট জন চার্চ-ইয়ার্ডই সেকালের সমাধিভূমি ছিল। এই সমাধিভূমির মধ্যেই ওয়াট্‌সনের মৃতদেহ প্রোথিত হয়। আজও একখানি প্রস্তর স্মৃতিফলক তাঁহার কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করিতেছে। সেন্ট জন গির্জার পার্শ্বেই কোম্পানির সাধারণ হাসপাতাল ছিল। সমাধিক্ষেত্র ততদূর প্রশস্ত ছিল না। পরিশেষে এই সমাধিক্ষেত্র পরিবর্জন করিয়া ১৭৬৮ খ্রী. অব্দে পার্ক স্ট্রীটের নূতন সমাধিক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা আজকাল Old Burial Ground বলিয়া বিখ্যাত। সেকালের অনেক গণ্যমান্য ইংরাজের সমাধি এইস্থানে আজও বর্তমান।

কলিকাতা যে এই সময়ে ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছিল, তাহা এই মড়কের আবির্ভাব হইতেই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। নগরের মধ্যে নালা-নর্দমা ও ড্রেনের সুবন্দোবস্ত ছিল না। এই ক্ষুদ্র সহরের চারিদিক ব্যাপিয়া অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও বনজঙ্গল। ধরিতে গেলে সহরের মধ্যে একমাত্র উন্মুক্ত পয়ঃপ্রণালী মারহাট্টা ডিচ্। তাহাও আবার সহরের চারিদিক ব্যাপিয়া নহে। ব্ল্যাকহোলের রাশিকৃত মৃতদেহ সহরের মধ্যবর্তী এক গভীর খাদে সমাহিত হয়। এই গলিত দুর্গন্ধময় মৃতদেহজাত বিষাক্ত বাষ্পও তৎসময়ে কলিকাতার স্বাস্থ্যহানির কারণস্বরূপ হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া তখন পূর্ণমূর্তিতে বর্তমান। সহরের বহিরাংশে পূতিগন্ধময় ধাপা বা Salt Water Lake; কাজেই কলিকাতায় ঐ প্রকার মড়ক আবির্ভাব সম্বন্ধে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

ইংরাজ অধিবাসীদের মধ্যেও মৃত্যুসংখ্যার বিরাম ছিল না। সকালে বা মধ্যাহ্নে যে ইংরাজ তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একত্রে খানা খাইয়া গিয়াছেন, হয় ত পরদিন প্রাতে তাঁহার বন্ধুগণ সেই ব্যক্তির শবদেহ বহনের জন্য আহূত হইলেন। নূতন সমাধিক্ষেত্র তখন হেস্টিংস স্ট্রীট হইতে পার্ক স্ট্রীটে নির্মিত হইতেছে। সে সময়ে আজকালকার মত শবদেহ-বাহী শকটের প্রচলন ছিল না। ইংরাজগণ তখন আমাদের মত কাঁধে করিয়া শবদেহ লইয়া যাইতেন। পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রের পথে প্রায়ই শবদেহবাহীদের যাতায়াত দেখা যাইত। ইংরাজ-রমণীগণ এই ব্যাপারে বড়ই ভীত হইয়া পড়েন। রাজপথে ইংরাজের মৃতদেহ দেখিলেই তাঁহাদের প্রাণে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত। এজন্য সেই সময়ে গভীর নিশীথে শবদেহসমূহ সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।১

এই সময়ে কলিকাতার এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থার জন্য অনেক পদস্থ ইংরাজ, সহরের বাহিরে ফাঁকা জায়গায় থাকিতে ভালবাসিতেন। লর্ড ক্লাইভ দমদমায় বাস করিতেন। সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যর উইলিয়ম জোন্স সাহেব গার্ডেনরিচে থাকিতেন। সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ চেম্বার্স, যিনি নন্দকুমারের মোকদ্দমার সময় স্যর ইলাইজা ইম্পির সহযোগী ছিলেন, তিনি কাশীপুরে থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত ভবানীপুরেও তাঁহার আর একখানি বাগানবাটি ছিল। ১৭৬৩ খৃীস্টাব্দের কাগজপত্রে আমরা দেখিতে পাই, "ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব কালীঘাট প্রান্তবাহিনী গঙ্গার উপরে একটি পুল তৈয়ারি করিবার জন্য বিলাত হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" হেস্টিংস আলিপুরে তাঁহার বাগানবাটিতেই অধিকাংশ সময় বাস করিতেন। বর্তমান আলিপুর জজ-আদালতের সান্নিধ্যে 'হেস্টিংস-হাউস' এখনও সেই অতীতের স্মৃতি-বহন করিতেছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের মেম্বর স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেবও আলিপুরে থাকিতেন। খিদিরপুরের সেন্ট স্টিফেন গির্জার সান্নিধ্যে যে প্রাসাদতুল্য বাটিটি আছে, সেই বাড়িতে গবর্ণর হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য, বারওয়েল সাহেব বাস করিতেন।২ এই বাটিটি আজও অক্ষতদেহে দণ্ডায়মান। গার্ডেনরিচে কোম্পানির খাস কর্মচারী ব্যতীত অনেক অবস্থাপন্ন ইংরাজ বাগানবাটি নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। এখনও 'পাঁচকুঠি' প্রভৃতি সৌধ, গার্ডেনরিচে বর্তমান থাকিয়া অতীতকালের ইংরাজদের ঐশ্বর্যের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাগানটি ছিল। কলিকাতা আক্রমণের সময় নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা এই বাগানেই ছাউনি করেন। প্রবাদ এই, অন্ধকূপ-হত্যার পরদিন হলওয়েলকে এই বাগানেই নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ইটালি পদ্মপুকুরের এক অংশে হাতিবাগান বলিয়া

১. State of Calcutta after Plassey—H.E.A. Cotton, *Calcutta Old and New.*

২. বারওয়েল সাহেবের এই বাড়িটি পরে 'মিলিটারি অর্ফান এসাইলম' নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহার 'বলরুম' বা নাচঘর প্রাচীন কলিকাতার একটি গণনীয় শোভনবস্তু ছিল।

একটা পল্লী আজও বর্তমান। জনপ্রবাদ এই কলিকাতা আক্রমণের সময় এই স্থানের একটি বাগানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদলভুক্ত হস্তীগুলি রক্ষিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই 'হাতিবাগান' নামকরণ হইয়াছে।

১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ বিলাতে চলিয়া যান। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে লিখিত মিসেস্ কিণ্ডার্সলির লিখিত বিবরণ হইতে, কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।১ তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই, "মান্দ্রাজের সহিত তুলনায় কলিকাতার অবস্থা যে অধিক উন্নত তাহা নহে। কলিকাতা সহরটি আয়তনে বড় হইলে কি হয়, ইহার মধ্যে যে সমস্ত বাড়িঘর নির্মিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা না থাকায় ইহার সাধারণ দৃশ্য নেত্রের বড়ই অতৃপ্তিকর। চারিদিকে যেন একটা বিশৃঙ্খল ভাব। কোথাও বা বড় বড় বাটি. কোথাও চালাঘর। রাস্তাঘাটের বিশৃঙ্খলও সেইরূপ। বাড়িগুলি কোথাও যেন আকাশের গাত্র স্পর্শ করিতে যাইতেছে, আবার কোথাও বা একেবারে নীচে নামিয়া গিয়াছে। যে যেখানে সুবিধামত জায়গা-জমি যোগাড় করিয়াছে, সেইখানেই নিজের পছন্দমত বাড়িঘর তৈয়ারি করিয়াছে।"

"বাজারের নিকটবর্তী স্থানগুলি যেন একটু জমকালো। যেখানে কোনরূপ মালপত্র বিক্রয় হইত বা তদুপোযোগী বৈঠক' বা দোকান থাকিত, সেইস্থানটাই যেন একটু গুলজার। এই সকল বাজারের দোকানদারগণ সবই এদেশের লোক।"

"ইংরাজেরা খুব কমই এই সব বাজারে যাইতেন। তাঁহাদের হাট-বাজার যাহা কিছু হইত, সবই তাঁহাদের বেনিয়ান ও চাকরদিগের মারফৎ হইত। সহরের মধ্যস্থানে পুরাতন কেল্লা। এই-স্থানেই 'ব্ল্যাকহোল' হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়।"

"সহরের একটি নির্দিষ্ট অংশে আর্মানীয়ান ও পর্টুগীজেরা বসবাস করে। উভয় জাতিরই স্বতন্ত্র গির্জা আছে। পর্টুগীজেরা রোমীয়-ধর্মের নিয়মানুসারে শোভাযাত্রা ও নানাবিধ উৎসব করে। এই সমস্ত উৎসবের অনুষ্ঠান তাহাদের নির্দিষ্ট পল্লীমধ্যেই হইয়া থাকে। পর্টুগীজদের সহিত আমাদের এইটুকু সম্বন্ধ যে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়িতে দাসীরূপে নিযুক্ত হয়, পুরুষেরা কেরাণীর কাজ অথবা পাচকের কার্য করে।"

"মান্দ্রাজে নিম্নশ্রেণী দেশীয়দের জন্য যেমন একটি স্বতন্ত্র বাসপল্লী নির্দিষ্ট আছে, কলিকাতায় সেরূপ নাই। কলিকাতায় অনেক নিম্নশ্রেণীর লোক সহরের ইংরাজ-পল্লীর নানা-স্থানে বাস করিতেছে। ইহাদের বাড়িঘরগুলি মাটির দেওয়াল ও তাহার উপর খড়ের ছাউনি। এই সকল খড়ের চালা এত ক্ষুদ্র যে একজন লোক সিধা হইয়া ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহারা সন্ধ্যার পূর্বে যখন আহারাদি প্রস্তুত করিবার জন্য উনানে আগুন দেয়, তখন কুটীরগুলির পার্শ্বস্থ রাজপথসমূহ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে দেশীয় পল্লীর রাজ-পথে পরিভ্রমণ করা অতি কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়ে।"

"কলিকাতার নূতন দুর্গ, যাহা গোবিন্দপুরে নির্মিত হইতেছে, তাহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। পুরাতন দুর্গ হইতে ইহা এক মাইল দক্ষিণে ও নদীর ধারে। ইহার সীমামধ্যে যে সমস্ত বাড়িঘর করিবার কল্পনা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ হইলে এই দুর্গই একটি ক্ষুদ্র সহরের আকার ধারণ করিবে। ইহার মধ্যে কোম্পানির রাইটারগণের জন্য স্বতন্ত্র আবাসস্থান, সেনাদের জন্য ব্যারাক, বারুদ ও তোপখানা, জেলখানা প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে।২

"পলাশী-যুদ্ধের পর ইংরাজগণ প্রকারান্তরে দেশনায়ক হওয়াতে তাহাদের অধিকৃত

১. Letters of Mrs Kindersley, June 1768.

২. মিসেস্ কিণ্ডার্সলির বর্ণিত এই দুর্গই গড়-গোবিন্দপুরের বর্তমান কেল্লা। পলাশী যুদ্ধের পর ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। কিণ্ডার্সলি ইহাকে নিতান্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়াই এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙলার রাজধানী কলিকাতা সহরের দিন দিন উন্নতি হইতেছে। নানাস্থান হইতে লোক আসিয়া ইংরাজদের এই সুরক্ষিত সহরে বাস করিতেছে। সাহেব-কোয়ার্টারে বাড়ি পাওয়াই দুর্ঘট। বিলাতের মত চিত্রিত কাগজে গৃহের দেয়াল মুড়িবার ব্যবস্থা কলিকাতায় নাই। এখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও উই প্রভৃতির জন্য এ সমস্ত কাগজমোড়া দেয়াল বেশী দিন যায় না। সমস্ত গৃহের দেয়ালগুলি চূণকাম করা। বালির উপর চুণের পলস্ত্রা দিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ দেয়ালগুলি নির্মিত হয়। ঘরের মেঝেও এইরূপভাবে চুণ সুরকির মিশ্রণে পেটা। ইহাতে বাড়িগুলি দেখিতে মন্দ হয় না।"

"গৃহসজ্জার মধ্যে চেয়ার, টেবিল ও আলমারি প্রভৃতির সংখ্যা বড় কম। এদেশে এ সকল জিনিস প্রস্তুত হয় না। ক্যাবিনেটের অর্থাৎ কাঠ-কাঠরার কোন দোকানও কলিকাতায় নাই। ঘরের মেঝেগুলির উপর ম্যাটিং করা হয়। ঘরের জানালাগুলি বেত্রনির্মিত। দুই চারিজন অবস্থাপন্ন লোকের আবাসগৃহে, গৃহভিত্তি বিলম্বিত দুই-একখানি দর্পণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল দর্পণ ইউরোপ হইতে আনীত। এক একটি বাড়ির মধ্যে কামরার সংখ্যা কম। কিন্তু কামরাগুলি খুব দীর্ঘ ও প্রশস্ত।"

"টেবিল, চেয়ার ও আলমারি প্রভৃতি বড়ই দুষ্প্রাপ্য। যাঁহারা একটু অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ইউরোপ হইতে কলিকাতায় আগত জাহাজের কাপ্তেনদের নিকট জিনিসপত্রাদি খরিদ করিয়া থাকেন। কেহ বা চীনদেশ ও বোম্বাই সহর হইতে গৃহসজ্জার উপযুক্ত কাষ্ঠনির্মিত উপাদানগুলি সংগ্রহ করেন। এ দেশের মিস্ত্রিরা যাহা কিছু আসবাব নির্মাণ করে তাহা অতি কদর্য। কলিকাতাবাসী ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা ও ভাগ্য অপ্রসন্ন, তাঁহারা এইরূপ চেয়ার আলমারিপূর্ণ গৃহসজ্জা করিয়া থাকেন।"

কিণ্ডার্সলির উল্লিখিত বর্ণনা হইতে পাঠক পলাশীযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কলিকাতার অবস্থা জানিতে পারিবেন। কিণ্ডার্সলির বর্ণনা ব্যতীত অন্যান্য উপাদান হইতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমরা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতেছি।

১৭৫৮ খৃীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের প্রস্তাবানুসারে কলিকাতায় নূতন কেল্লার নির্মাণ সূচনা হয়। ইহাই বর্তমান গড়ের-মাঠের কেল্লা। ১৭৫৮ খৃীস্টাব্দে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়া ১৭৭৩ খৃীস্টাব্দে শেষ হয়। প্রথমত ভাগীরথী তীরেই এই নব সংকল্পিত কেল্লার বনিয়াদ গড়িবার সংকল্প স্থির হয়। কিন্তু পরে সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায় গঙ্গাগর্ভের একটু দূরে গোবিন্দপুর গ্রামের অধিকৃত স্থানে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়।

গোবিন্দপুর গ্রাম তখন বেশ জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। অনেক পদস্থ ঐশ্বর্যবান বাঙ্গালী; এখানে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোবিন্দপুরের আশেপাশের জঙ্গলও অনেকটা পরিষ্কৃত হইয়াছে। গোবিন্দপুরের পাশে কালীঘাটের পথ-পার্শ্ববর্তী চৌরঙ্গীর জঙ্গল তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই। ধর্মতলার অর্থাৎ বর্তমান এসপ্লানেডের অবস্থাও তখন অনেক উন্নত।

গোবিন্দপুরে দুর্গনির্মাণ উপলক্ষে, এ স্থানের আদিম অধিবাসীদের অনেককেই গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইতে হয়। নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরাজেরা Restitution money বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহার উদ্বৃত্তাংশ গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের দেওয়া হয়। অনেকে সহরের আশেপাশে এওয়াজি-জমি পাইয়া গোবিন্দপুরের ভদ্রাসন ত্যাগ করেন। এই সময়ে তালতলা, কুমারটুলি, শোভাবাজার প্রভৃতি স্থান লোক পূর্ণ হইয়া উঠে। অনেক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী এই সব স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ক্লাইভের মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর এওয়াজিরূপে সুতানুটি অঞ্চলে ও শোভাবাজারে অনেক জমি পান। মহারাজা নবকৃষ্ণের আবাসভবন সেকালের কলিকাতায় একটি দর্শনীয় জিনিস ছিল। দুর্গোৎসব উপলক্ষে, তাঁহার বাটিতে মহা সমারোহ হইত। জনশ্রুতি এই, পলাশী-বিজয়ী লর্ড

ক্লাইভ দুই একবার তাঁহার মুন্সীর বাড়ি দুর্গোৎসবের রাত্রে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া নাচগানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

তখন কলিকাতার সুতালুটি অঞ্চলে রায়রায়াঁ মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর বাটি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস সুতালুটির মধ্যে চড়ক-ডাঙ্গায় বাস করিতেন। বর্তমানকালের নূতনবাজারের নিকটস্থ স্থানটি আজও চড়ক ডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বর্তমান বিডন-বাগানের অধিকৃত স্থানেই রাজা গুরুদাসের আবাসস্থান ছিল। বিডন স্ট্রীট পোস্টাফিসের পাশ দিয়া যে রাস্তাটি মাণিক-তলা স্ট্রীটে আসিয়া মিলিয়াছে, তাহা এখনও 'রাজা গুরুদাস স্ট্রীট' বলিয়া উল্লিখিত। আন্দুল-রাজবংশের আদিপুরুষ দেওয়ান রামচরণ গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের বেনিয়ান ছিলেন। দেওয়ান রাম-চরণ পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পাইকপাড়া রাজবংশের আদিপুরুষ। এই দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ জোড়াসাঁকোতে বাস করিতেন। কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবুর জোড়া-সাঁকোতে আবাসগৃহ ছিল। মিঃ হুইলারের দেওয়ান দর্পনারায়ণ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটায় থাকি-তেন। হেস্টিংস ও বারওয়েলের পারসী-মুন্সী সদরউদ্দিন মেছুয়াবাজারে থাকিতেন। মদন-মোহন দত্ত নিমতলায় থাকিতেন। বনমালী সরকার পাটনা কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। কুমারটুলির মধ্যে বনমালী সরকারের প্রাসাদতুল্য আবাসস্থান আজও বর্তমান আছে। বনমালী সরকারের এই প্রাসাদতুল্য আবাসভবন প্রাচীন কলিকাতার একটি বিশেষ গৌরবের জিনিস ছিল। আর ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের কথা আমরা ইতি পূর্বে বহুবার বলিয়াছি। তাঁহার প্রাসাদতুল্য কুমারটুলির আবাসভবন, নবরত্ন, কলি-কাতার একটি দর্শনীয় জিনিস ছিল। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী কালী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ১৭৩৭ খৃীস্টাব্দের মহাঝড়ে অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের কুড়ি বৎসর আগে, নবরত্ন মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ উমিচাঁদ কলিকাতা সহরের মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার আবাস-স্থান একটি সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের মত নানা অংশে ভাগ করা ছিল। কলিকাতার অনেকগুলি বড় বড় ভাড়াটিয়া বাড়ির তিনি মালিক ছিলেন। ইংরাজেরা এই বাড়িগুলি বসবাসের জন্য ভাড়া লইতেন। উমিচাঁদের হালসীবাগানে এক উদ্যানবাটিও ছিল। এই বাগানেই নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা তাঁহার তাঁবু ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট-আত্মীয় বাবু হুজুরীমলও কলিকাতায় বাস করিতেন। আজও হুজুরীমলস্ ট্যাঙ্ক লেন তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে। এই বাবু হুজুরীমল কোম্পানির পক্ষে কোন হিতজনক কার্য করিয়া কালীঘাটের মধ্যে অনেক নিষ্কর জমি পাইয়াছিলেন। কালীঘাটে একটি বাঁধাঘাট, মন্দির ও অতিথিশালা নির্মাণের কল্পনা ছিল। কিন্তু অপরের দান করা জমিতে ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিতে নাই ভাবিয়া হুজুরীমল এ সংকল্প ত্যাগ করেন। কালীঘাট-প্রসঙ্গে আমরা এ কথার উল্লেখ করিয়াছি।

মহারাজ নবকৃষ্ণের বাটিই সুতালুটি অঞ্চলের গৌরবস্বরূপ ছিল। পূজার দালান, দেব-মন্দির, নাটমন্দির, বাগান ও পুষ্করিণী-শোভিত প্রাসাদতুল্য শোভাবাজার রাজবাটি কলি-কাতার সেকালের অনেক ধনীর ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। কাশীনাথবাবু বড়বাজারে থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন ধর্মভীরু বৈষ্ণবচরণ শেঠ, নিঃস্বার্থদাতা গৌরী সেন বড়বাজারের অধিবাসী ছিলেন। বাবু শোভারাম বসাক ও নীলমণি মিত্রও এই সময়ে বেশ অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী ছিলেন। বাগ-বাজারের গোকুল মিত্রের, চোরবাগান ও বড়বাজারের মল্লিক বাবুদের আদিপুরুষগণও পলাশী-যুদ্ধের পর কলিকাতায় আবাসস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ভূকৈলাস রাজবংশের আদিপুরুষ, গবর্ণর ভেরেলস্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ইনিও গোবিন্দপুর হইতে বাস উঠাইয়া খিদিরপুরে প্রাসাদতুল্য গড়বন্দী রাজবাটি নির্মাণ করিয়া 'ভূকৈলাস' নাম প্রদান করেন। এই বংশের জয়-

নারায়ণ ঘোষাল, দেওয়ান গোকুল ঘোষাল প্রভৃতি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। এ বাটি ও গড়খাই আজও বর্তমান।

বাঙ্গালাটোলার কথা ত বলা হইল। এখন আমরা পুনরায় ইংরাজ-পল্লীর ও সমাজের অবস্থা বর্ণনা করিব। চৌরঙ্গী-অঞ্চলে ১৭৪২ খৃীস্টাব্দ হইতেই লোকের বসবাস আরম্ভ হয়। তখন ইহা একখানি জঙ্গল-বেষ্টিত গ্রাম বই আর কিছুই নহে। এই জঙ্গলে ডাকাতের ভয় বড়ই প্রবল ছিল। হলওয়েল এই পথাটকে 'the road leading to Collegot' (Kalighat) এই আখ্যা দিয়াছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে আমরা দেখিতে পাই চৌরঙ্গীর মধ্যে সেই সময়ে দুই-দশজন সাহেব-সুবো বসবাস করিতেছেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম চিফ্ জস্টিস, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্যর ইলাইজা ইম্পি সাহেব বর্তমান মিডল্‌টন রো'র সান্নিধ্যে এক সুবৃহৎ উদ্যানবাটিতে বাস করিতেন। ইম্পির বাটির চারিদিকে হরিণদিগের বিহার-ভূমি ছিল। এই 'ডিয়ার-পার্ক' হইতেই বর্তমান পার্ক স্ট্রীটের নামকরণ হইয়াছে। ইম্পির সময়ে এই জঙ্গলপূর্ণ চৌরঙ্গীর অবস্থা এত বিপদসঙ্কুল ছিল যে, পালকি-বাহকেরা সন্ধ্যার পূর্বে এ সকল স্থানে আসিতে হইলে ডবল-ভাড়া দাবি করিয়া বসিত। সাহেবদের চাকরবাকরদের মধ্যে যাহারা কাজকর্ম সারিয়া রাত্রিকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিত, তাহারা দলবদ্ধ না হইয়া ফিরিত না। তখন লুঠের ও রাহাজানির এত ভয় ছিল যে, তাহারা দামী গাত্রবস্ত্রগুলি পর্যন্ত মনিব-বাড়িতে রাখিয়া আসিত।

লালদীঘির কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। কোম্পানির প্রথম আমল হইতেই এই লালদীঘি কলিকাতার জন সাধারণের 'সখের বাগান' ছিল। তখন কলিকাতায় পুষ্করিণীর জল ব্যতীত পানীয় জলের প্রত্যাশা আর কোথাও ছিল না। ইংরাজ ও এদেশীয় সকলেই পুষ্করিণীর জল-পান করিতেন। গঙ্গার জল যে সময়ে ভাল থাকিত, সেই সময়ে গঙ্গোদক ব্যবহারও চলিত। লালদীঘির কাছে বর্তমান টেলিগ্রাফ-অফিসের অধিকৃত স্থানে, আর একটি বড় পুকুর ছিল। পরবর্তী কালে তাহার কেবল নামোল্লেখ মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাবেক নক্সা প্রভৃতি হইতে ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। লালদীঘির মত অমন সুমিষ্ট সলিলপূর্ণ বড় পুষ্করিণী কলিকাতায় আর দ্বিতীয় ছিল না। ১৭৮৯ খৃীস্টাব্দে গ্রাণ্ড-প্রে[১] কলিকাতা-ভ্রমণে আসেন। তিনি লিখিয়াছেন, সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র এই বিচিত্র শোভনোদ্যান আর তাহার মধ্যে এক বিস্তীর্ণ সরসী নেত্রপথে পতিত হয়। ইহা কলিকাতা জনসাধারণের প্রমোদোদ্যান। সন্ধ্যার সময় ও প্রাতঃকালে অনেকে এস্থানে ভ্রমণার্থে আসেন। সাধারণের বিশুদ্ধ পানীয়-জল এই পুষ্করিণী হইতেই সংগৃহীত হয়। এই বাগানের চারিদিক ব্যাপিয়া আবক্ষ-উন্নত প্রাচীর ও তাহার উপরে কাঠের রেলিং। দৃশ্যটি বড়ই মনোহর।" তখন ইডেন-গার্ডেন ও চৌরঙ্গীর গভীর জঙ্গলের মধ্যে, —কাজেই সবে ধন নীলমণি এই লালদীঘি প্রমোদোদ্যানের যথেষ্ট সমাদর ছিল।

দুর্গের কয়েক রশি দূরেই পুরাতন কাউন্সিল হাউস ছিল। এইস্থান আজও পর্যন্ত কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ও হেস্টিংস স্ট্রীট নামক দুইটি পথের সহায়তায় অতীতের স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে। ১৭৫৮ খৃীস্টাব্দে কোম্পানি-বাহাদুর এই কাউন্সিল-হাউস বাড়িটি কিনিয়া লয়েন। এই বাড়িতে মিঃ কোর্ট বলিয়া কোম্পানি-বাহাদুরের একজন কর্মচারী বাস করিতেন। এই কোর্ট সাহেবও ব্ল্যাকহোলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে বাঁচিয়া যান।

ইহার সান্নিধ্যেই যে খাল ছিল, তাহা বুজাইয়া একটি রাস্তা নির্মিত হয়। অতীতের এই

---

১. পুরা নাম Grandpre, Louis Maric Joseph Oher *Comte de.* (1761-1846), রচিত গ্রন্থের নাম "A Voyage in the Indian Ocean and to Bengal undertaken in the years 1789 and 1791 ; containing an account of Schelles Islands and Trincomale. . . to which is added, A Voyage in the Red Sea, including a description of Mocho . . . etc. Tr. from the French . . . with engravings, and a view of the citadel of Calcutta, London, 1803, 2 vols.

রাস্তা অধুনাতনকালে হেস্টিংস স্ট্রীট বলিয়া বিখ্যাত। এই হেস্টিংস স্ট্রীটে ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের কলিকাতা-নিবাস ছিল। এই বাড়িতেই তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী ব্যারনেস্ ইমহফ্ বল-নৃত্যাদি প্রভৃতির অনুষ্ঠানে প্রাচীন কলিকাতা সমাজের সজীবতা রক্ষা করিতেন।

হেস্টিংসের মন্ত্রিসভার সভ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ফ্রান্সিস সাহেবের কলিকাতার আবাসবাটি, বর্তমান রয়েল এক্সচেঞ্জ নামক বাড়ি। ফ্রান্সিসের পূর্বে লর্ড ক্লাইভ এই বাটিতে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন, গ্রেহাম কোম্পানির পুরাতন অফিস যে বাটিতে ছিল তাহাই ক্লাইভের আবাস-স্থান। কিন্তু পরবর্তী কালে মীমাংসিত হইয়াছে, বর্তমান রয়েল-এক্সচেঞ্জ বাটিই পলাশী-বিজেতা, ভারতে ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইভের কলিকাতার আবাসবাটি।

হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্য দুইজন সদস্য, জেনারেল ক্লেভারিং ও মনসন সাহেব বর্তমান মিশন-রোর পার্শ্ববর্তী দুইটি বাটিতে থাকিতেন। এই মিশন-রো সেকালে Rope-Walk নামে বিখ্যাত ছিল। ইঁহারা যে দুইটি বাটিতে থাকিতেন, লর্ড কার্জন তাহাদের গাত্রে স্মৃতিফলক মারিয়া দিয়া অতীতের কীর্তি সজীব রাখিয়াছেন।

আজকাল যেস্থান অধিকার করিয়া বর্তমান 'ট্রেজারি-বিল্ডিংস' অবস্থিত, পূর্বে এইস্থানের একটি বাটিতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্যর আয়ার কুট বাস করিতেন। আজকাল যেস্থান অধিকার করিয়া টাউনহল বর্তমান, সেই স্থানের একটি বাটিতে সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ হাইড সাহেব বাস করিতেন। হাইডের সহযোগী জজ লিমেস্টার বর্তমান ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের সন্নিকটস্থ একটি বাটিতে থাকিতেন। উপরে আমরা যে সমস্ত জজের নাম করিয়াছি, তাঁহাদের সকলেই মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমায় বিচারকরূপে বসিয়াছিলেন।

এইবার প্রাচীন কলিকাতার চাকরবাকরদের সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব। সেকালে সাহেবদের অনেক রকমের চাকর ছিল। এখন আর তাহাদের কতকগুলির নাম বড় একটা শোনা যায় না।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে তারিখে জমিদারদের মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে কলিকাতা-বাসী ইংরাজদের ভৃত্যবর্গ সম্বন্ধে নানা কথা আলোচিত হয়। এই সভায় জমিদার হলওয়েল, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ও রিচার্ড বিচার উপস্থিত ছিলেন। "কলিকাতাবাসী ইংরাজদের ভৃত্যবর্গ উদ্ধত হইয়াছে—অতিরিক্ত হারে বেতনের দাবি করিতেছে" এই সব বিষয়ের আলোচনা এই সভায় হয়। এই আলোচনার পরিণামে চাকরদের বেতনের হার নির্ধারিত হইয়া যায়। ইহাতে আরও স্থির হয়,—ভৃত্যদিগের বেতন সম্বন্ধে যে দর স্থির করিয়া দেওয়া হইল, তাহারা যদি তাহাতে চাকরি করিতে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অপরাধীরূপে জমিদার সাহেবের নিকট হাজির করা হইবে। তাহাদের এরূপ অবাধ্যতার জন্য জমিদারের বিচারে জরিমানা, বাসোচ্ছেদ, কারাদণ্ড বা দৈহিক শাস্তিবিধান পর্যন্ত হইতে পারে। যদি কোন ভৃত্য একমাস পূর্বে নোটিশ না দিয়া তাহার প্রভুর চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে জমিদার সাহেবের বিচারে তাহার পূর্বোক্তরূপ শাস্তি হইতে পারে। যদি কোন স্থলে প্রভু ভৃত্যের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন বা তাহার উপর অন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে সেই ভৃত্য জমিদারগণের আদালতে প্রভুর নামে প্রকাশ্যভাবে নালিশ করিতে পারিবে। পাঠক! পরপৃষ্ঠায় সেকালের চাকরবাকরের শ্রেণী বিভাগ ও তাহাদের মাসিক বেতনের ফর্দ দেখুন।

সেকালের জিনিসপত্র সস্তা ছিল, কাজেই চাকরবাকরদিগের মাসিক তলবানাও সেই অনু-পাতে কম ছিল ! তবুও এই সমস্ত ভৃত্যবর্গ মধ্যে মধ্যে চাকরি ছাড়িয়া পলাইত বলিয়া সাহেব মহলে সদা সর্বদা গণ্ডগোল ঘটিত।

বর্তমান কালে চোপদার, মশালচি, পরচুলা-সাজাইবার নাপিত (wig-barber) খরচ-পরদার, হুঁকাবরদার প্রভৃতি চাকরশ্রেণী লোপ পাইয়াছে। চোপদারেরা রূপার আসাসোটা লইয়া

পদবী	মাসিক বেতনের হার (আর্কট টাকা)	পদবী	মাসিক বেতনের হার (আর্কট টাকা)
১। খানসামা (খ্রীস্টান, মুসলমান)	৫৲	১৩। ধোপা (সমগ্র পরিবারের)	৩৲
২। চোপদার (হিন্দু)	৫৲	১৪। ঐ একজন ব্যক্তির	১৷৷০
৩। প্রধান বাবুর্চি	৫৲	১৫। সহিস	২৲
৪। কোচম্যান	৫৲	১৬। মশালচি	২৲
৫। পর্তুগীজ হেড-আয়া	৪৲	১৭। নাপিত	১৷৷০
৬। জমাদার	৩৲	১৮। পরচুলা সাজাইবার নাপিত	১৷৷০
৭। খিদ্মত্গার	৩৲	১৯। খরচ-পরদার	২৲
৮। পাচকের প্রধান সহকারী	৩৲	২০। মালী	২৲
৯। সর্দার বেহারা	৩৲	২১। ঘেসেড়া	১।০
১০। দ্বিতীয় আয়া	৩৲	২২। দাসী (সমগ্র পরিবারের)	২৲
১১। পেয়াদা	২৷৷০	২৩। ঐ (একজনের)	১৲
১২। বেহারা	২৷৷০	২৪। হুঁকা বরদার	১৲

মনিবের অগ্রপশ্চাৎ যাইত। মশালচির কাজ ছিল, আলোক বা লণ্ঠন হস্তে পথ দেখান।

হুঁকাবরদারেরা প্রভুর তামাকু সাজিত। মনিবের আদেশ পাইবামাত্রই তাহারা গুড়্গুড়ি লইয়া তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইত। এতদ্ব্যতীত 'আবদার' বলিয়া আর একশ্রেণীর ভৃত্য ছিল। গ্রীষ্মকালে সোরা প্রভৃতির সহায়তায় পানীয় জলকে শীতল রাখাই ইহাদের কাজ ছিল। প্রাচীন কলিকাতার সাহেবেরা ফুরসীতে তামাকুর ধূম পান করিতেন। প্রত্যেক সাহেবের এক একজন খাস হুঁকাবরদার থাকিত। কোন কোন ভোজক্ষেত্রে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সহিত অন্যান্য ভৃত্যের ন্যায় হুঁকাবরদারকেও প্রভুর সঙ্গে যাইতে হইত। ভোজনের ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে গুলের আগুনে খুব বড় কলিকায় উত্তমরূপে তামাকু সাজিয়া হুঁকা বরদারেরা তাহাদের প্রভুর পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইত। সাহেবেরা ইচ্ছামত ধূম পান করিতেন। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দেও হুঁকাবরদারদের প্রাধান্য ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের কলিকাতার বাড়িতে উক্ত বৎসরে এক ঐক্যতান-বাদন ও ভোজোৎসব উপলক্ষ্যে অতিথিদিগকে অনুরোধ করা হয়, "আপনাদিগকে সম্মানের সহিত জানান যাইতেছে, নিমন্ত্রণ-সভায় আসিবার সময় দয়া করিয়া অন্য কোন চাকর সঙ্গে আনিবেন না। তবে হুঁকাবরদার সঙ্গে আনিলে কোন আপত্তি নাই।" কিন্তু ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের এক নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রতিলিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, এ সময়ে সাহেবি-সমাজে হুঁকার প্রচলন একেবারে বন্ধ না হইলেও উপরের তলায় বা ভোজক্ষেত্রে হুঁকাবরদারের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের পর সাহেবি-সমাজে হুঁকায় তামাকু সেবনের ব্যবস্থার কথা আর শোনা যায় না।

১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চাকরদের বেতন তিনগুণ বাড়িয়া উঠে। বিচার ও হলওয়েল প্রভৃতি চাকরবাকরদের যে তলবানা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে পরবর্তী কালে আর চাকর পাওয়া যাইত না। পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায়, পরবর্তী কালে খানসামার বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা, পাচক ও কোচম্যানের মাসিক কুড়ি টাকা ও খিদমৎগার ও বেহারাদের মাসিক দশ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল। এ বেতন না দিলে তখনকার সাহেবেরা চাকর বাকর পাইতেন না। কিন্তু চাকর রাখিবার খরচবৃদ্ধির সঙ্গে চাকরের সংখ্যা কমাইবার জন্য যে কোনরূপ চেষ্টা হইত, তাহারও প্রমাণ নাই। পূর্ববর্তী তালিকায় আমরা যে কয়েকশ্রেণীর চাকরের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহারাই এইরূপ বৃদ্ধির হারে নিযুক্ত হইত। ম্যাক্রেবি সাহেব তখন কলিকাতায় জেলের বড়কর্তা ছিলেন। এই ম্যাক্রেবি হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের সেক্রেটারি ও নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয়। এই ম্যাক্রেবির কর্তৃত্বাধীনেই মহারাজ নন্দকুমার জেলের মধ্যে ছিলেন। ম্যাক্রেবি সাহেব এই সময়ে কলিকাতার সাহেব-সুবোদিগের এইরূপ

বড়মানুষী দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "চাকরের বেতন চারিগুণ বাড়িয়াছে তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন ইহার সঙ্গে চাকরের সংখ্যা কমান হইয়াছে। আমি জানি, কোন ইংরাজ-পরিবারে কেবলমাত্র চারিজন লোকের জন্য একশত দশজন চাকর নিযুক্ত আছে। হায়! এ সত্ত্বেও লোকে আমাদের মিতব্যয়ী বলিয়া থাকে!"

মোটের উপর কথা হইতেছে সেকালের ইংরাজেরা এইরূপভাবে চাকরবাকর না রাখিয়া চলিতে পারিতেন না। এই সমস্ত বেতনভোগী ভৃত্য ছাড়া অনেক সাহেব-সুবো আবার ক্রীতদাস রাখিতেন। সেকালের সাধারণ সংবাদপত্রে, এইরূপ ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের অনেক মজাদার বিজ্ঞাপন আছে। ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকেই কাফ্রি। যে সকল ক্রীতদাস খানসামা ও রাঁধুনীর কাজ জানিত, তাহারা চারি শত টাকা মূল্যে ক্রীত হইয়াছে, এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। অনেক ক্রীতদাস ক্ষৌরকার্যে পারদর্শিতার জন্য, গান-বাজনায় দক্ষতার জন্য উচ্চমূল্যে ক্রীত হইত। সকল ক্রীতদাস ও দাসী যে নিগ্রো ছিল তাহা নয়। এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও অনেক ক্রীতদাস পাওয়া যাইত। যে সকল দরিদ্র-সন্তান শৈশবে পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া আশ্রয়বিহীন হইত, তাহাদের ধরিয়া আনিয়া দাস ব্যবসায়ীরা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিত। মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময়ে এইরূপ অনেক পিতৃ-মাতৃহীন বালক-বালিকা পাওয়া যাইত। তখন ভারতের সকল কেন্দ্রেই ক্রীতদাসের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসগণের প্রভুরা এই সকল হতভাগ্যদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ সম্বন্ধে সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এক আইন প্রচলিত করেন। তাহার পর হইতেই উহা বন্ধ হইয়া যায়।

তখন কোম্পানির কার্যে 'রাইটার' বলিয়া এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। ইহারা প্রথমে কোম্পানির দপ্তরের লেখাপড়ার কাজ করিতেন, পরে কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, নানাস্থানের ব্যবসায়-কেন্দ্রে বা কুঠিতে প্রধান কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইতেন। তখনকার কালে রাইটার-সিভিলিয়ানদের বেতন খুব কম ছিল। রাইটারগণ তাঁহাদের প্রাপ্য-বেতনের অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িতেন, এবং সেই সমস্ত খরচপত্রের ব্যয় কোম্পানির তহবিলের স্কন্ধে চাপাইতেন। ইহাতে কোম্পানি-বাহাদুরের বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়েরা বড়ই বিরক্ত হইতেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা এই সমস্ত কর্মচারিগণকে সায়েস্তা রাখিবার জন্য, মিতব্যয়ী করিবার জন্য, বিলাত হইতে কলিকাতায় কড়া মেজাজে চিঠি লিখিতেন। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারদের লিখিত একখানি পত্র হইতে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণর সাহেবকে লিখিতেছেন, "আমাদের নির্ধারিত আদেশ এই. আপনি রাইটারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, যতদিন তাঁহারা রাইটাররূপে সামান্য বেতনে কার্য করিবেন,—ততদিন কেহ পালকি বা গাড়ি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে।"[১] পলাশীযুদ্ধের পর বিলাতের কর্তারা এই সমস্ত সিবিলিয়ান রাইটারদের উপর সদয় হইয়া অনেক ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন। বিলাতের কর্তাদের সেই ব্যবস্থা হইতে আমরা জানিতে পারি, "রাইটারগণ শীত ও বর্ষাকালে যাতায়াতের জন্য কেবল মাত্র পালকি ব্যবহার করিতে পারিবেন। কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দূরতর স্থানে বাস করেন। কিন্তু কলিকাতার মধ্যে কোম্পানির প্রয়োজনীয় কার্যালয় ও বাটিগুলি নির্মাণ হইয়া গেলে, তাঁহারা সেই বাটিতেই আসিবেন। তখন আর পালকি প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত খরচের আবশ্যক হইবে না।"

১. 'রাইটার্স-বিল্ডিং' এখনও এই রাইটারদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। যে বাড়িতে আজকাল বঙ্গীয়-গবর্ণমেণ্টের অফিসসমূহ স্থাপিত, সেই স্থানেই রাইটার্স-বিল্ডিং ছিল। অবিবাহিত রাইটারগণ এই বাটিতেই বাস করিতেন। পুরাতন রাইটার্স-বিল্ডিং কলিকাতার পুরাতন দুর্গের অতি সন্নিকটেই ছিল। আমরা কলিকাতার প্রাচীন কালের যে ছবি দিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক এই রাইটার্স-বিল্ডিংএর তখনকার অবস্থা দেখিতে পাইবেন। রাইটারগণই বঙ্গের প্রথম সিভিলিয়ান।

এই রাইটারদের মধ্যে অনেকেই অপরিণত বয়স্ক যুবক। ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদিগকে শাসনে রাখিতে অতি কঠোর প্রকৃতির মাস্টার মহাশয় যেরূপ এক এক সময়ে অসমর্থ হইয়া পড়েন—সেকালের সিভিলিয়ান অথবা রাইটারদিগকে শাসনে রাখিতে কোম্পানি-বাহাদুরের কর্তৃপক্ষগণকেও অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। ১৭৬৭ খৃস্টাব্দে গবর্ণর ভেরেলস্টের[১] সময়েও দেখিতে পাওয়া যায়, বিলাতের কর্তারা যেন বেত্রদণ্ড হস্তে লইয়া ইঁহাদের শাসন করিতেছেন। বিলাতের কর্তারা গবর্ণর সাহেবকে লিখিতেছেন, "এই সমস্ত অপরিণামদর্শী যুবক কর্মচারিগণের বিশৃঙ্খল ব্যবহারের মাত্রা বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার দমন একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি তাহারা কর্তব্যপরায়ণ না হয়, এখনও তাহাদের সদ্‌বুদ্ধি-সঞ্চার না হয়, তাহা হইলে তাহারা আমাদের চাকরি করিবার যোগ্য নহে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া বিলাতে আসাই তাহাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।" এই সময়ে রাইটারগণকে সায়েস্তা করিবার জন্য, একটি "তদারকী-সভা" আহূত হয়। সেই সভার বিচারে রাইটারদিগকে মিতব্যয়ী করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রচলন হয়। প্রথম, অবিবাহিত কর্মচারিগণের পক্ষে, দুইজন চাকর ও একজন রাঁধুনীই যথেষ্ট। এই দুইজন চাকরের একজন তাঁহার গৃহস্থালীর ভার লইবে। তিনি যখন কোম্পানির কার্য উপলক্ষে কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে যাইবেন, তখন দ্বিতীয় চাকর তাঁহার সঙ্গে যাইবে ও অন্য ব্যক্তি তাঁহার কলিকাতার সম্পত্তি রক্ষা করিবে। কিম্বা তিনি পীড়িত হইলে, একজন তাঁহার গৃহস্থালী দেখিবে, অপর ব্যক্তি তাঁহার রোগের সেবা করিবে। দ্বিতীয়, কোন রাইটারই গবর্ণরের অনুমতি ব্যতীত ঘোড়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না। নিজের খরচায় বা দুই তিনজনে মিলিয়া বাগান-বাগিচা করিতে পারিবেন না। তৃতীয়, তাঁহারা এমন কোনরূপ পরিচ্ছদ পরিতে পারিবেন না, যাহাতে বিলাসিতা প্রকাশ হয়। ভদ্রলোকোচিত সাদাসিধে পরিচ্ছদই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট।" পাঠক! আজকালকার সিভিলিয়ানদের সহিত সেকালের রাইটার, সিভিলিয়ানদের অবস্থার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এই দুই শ্রেণীর কর্মচারীর মধ্যে কালপরিবর্তনে অবস্থায় কত পার্থক্য ঘটিয়াছে।

১. Henry Verelost, ক্লাইভের পরবর্তী গবর্ণর (১৭৬৭-১৭৬৯)।
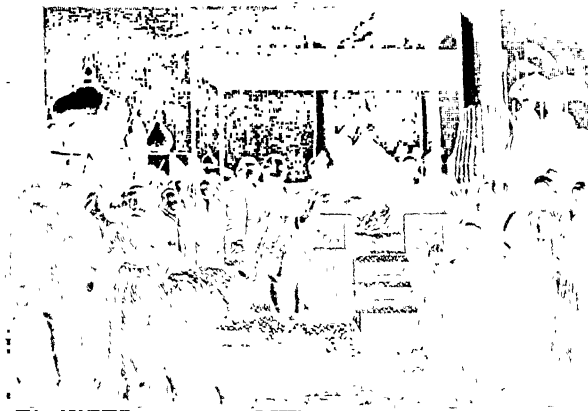
বিংশ অধ্যায়

পলাশী যুদ্ধের পূর্বে ও পরে কলিকাতার অবস্থা

(১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)

পলাশীযুদ্ধের পূর্বে ও পরে প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা—কলিকাতার ড্রেনের উন্নতি—জঙ্গল কাটিয়া ইষ্টকের পাঁজা পোড়ান—দুর্ভিক্ষ ও লোকজনের মৃত্যু—১৭৫১/৫২ খ্রীস্টাব্দে চাউলের দর—লালদীঘির উন্নতির জন্য খরচ—জমির খাজনা—মেয়র কোর্টের খরচা—লালদীঘির শোচনীয় অবস্থা—'ফিরিঙ্গি' শব্দের আইন-ঘটিত অর্থ—এ সম্বন্ধে হলওয়েলের অভিমত—সাহেবীপল্লীতে বাড়ির দর—বিবাহের শুল্কে গরীবের কষ্ট—বিলাতের কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ—গোবিন্দরাম মিত্র—বাজারে পিত্তলের বাটখারা প্রচলন—ইংরাজবণিকদের সম্বন্ধে উমিচাঁদের অভিমত—প্রাচীন কলিকাতায় পলাশী-আমলে ইট ও চুণের দর—ডাক্তার সাহেবের বিল ও ভিজিট—কড়ির বদলে আনির প্রচলন—গঙ্গাদত্ত ঠাকুরদিগের দরখাস্তের প্রতিলিপি—ফরাসডাঙ্গার ফেরারি আসামী—কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের অভিমত—অ্যাডমিরাল ওয়াটসনের মৃত্যুতে ক্লাইভের শোকপ্রকাশ—এ দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা—গোবিন্দপুরে নূতন কেল্লা ও তজ্জন্য জমি গ্রহণ—সরকারি অফিসে কড়ির ব্যবহার—তন্তুবায়দিগকে উৎসাহদানের আদেশ—থিয়েটার-গৃহে গির্জার স্থান পরিবর্তন—কলিকাতায় প্রথম দেওয়ানী আদালত—কলিকাতার রাজপথে রাত্রিকালে চৌকি দিবার ব্যবস্থা—বাগান ও আবাসবাটির জন্য অতিরিক্ত জমি-গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা—কলিকাতার প্রথম ডাক প্রতিষ্ঠা—ভোজপুরে সিপাহী—প্রতি শুক্রবারে অপরাধীদের বেত্রাঘাত ব্যবস্থা—লুকাইয়া মদ্য-বিক্রয়ের দণ্ড—আতসবাজী প্রস্তুতির লাইসেন্স—কোম্পানি-বাহাদুরের অতিথি-সৎকার—পলাশী আমলে ধোপা, নাপিত ও দর্জির মেহনত আনা—বাজেয়াপ্ত মালামাল বিক্রয়—কলিকাতায় প্রথম টাঁকশাল প্রতিষ্ঠা—গবর্ণর সাহেবের সফরের খরচা—বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদকে উপহার প্রদান—বর্গী কর্তৃক বর্ধমান লুঠ—জগৎশেঠের কাঁধ-ভাঙ্গা—নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কিস্তিবন্দী—নবাবী-সেনার তলবানা সম্বন্ধে গোলযোগ এবং ঐ বিষয়ে রাজা রাজবল্লভের পত্র—কলিকাতায় প্রথম স্ক্যাভেঞ্জার বা ময়লা-ফেলা বিভাগ—বেহালা-বড়িশার জমিদার সন্তোষ রায়—শস্যাদির দুর্মূল্যাবস্থা ও কোম্পানি-বাহাদুরের গরীবের প্রতি দয়া—প্রাচীন কলিকাতার জঙ্গল-কাটা—কলিকাতার জমির খাজনার হার বৃদ্ধি—সহরের মধ্যে আতসবাজী ছোঁড়া বন্ধ—রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যু—কোম্পানি-বাহাদুর কর্তৃক মাণিকচাঁদের শিশুপুত্রকে আশ্রয় দান—সেকালের চাউল, দাইল, ঘৃত মিষ্টান্নাদির বাজারদর—শান্তিপুর ফ্যাক্টরি লুট—১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার গণ্যমান্য বাঙ্গালীগণ—একখানি পুরাতন জমিদারি পাট্টার নকল—প্রাচীন কলিকাতার জেলখানা—এ দেশীয়গণের সহিত সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের আদেশ—ইউরোপীয় ভবঘুরের দল বৃদ্ধি—কলিকাতার জমিবিলি সম্বন্ধে লর্ড ক্লাইভের মত—রায়তের উপর কোম্পানির দয়া—লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের উন্নতি—মগের মুল্লুক।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন সেই সময়ে তিনি কোম্পানির অনেক কাগজপত্র ও সেরেস্তা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ভবিষ্যতে তিনি ইহার কতকাংশ প্রত্যর্পণ করেন।

যেগুলি হারাইয়া গিয়াছিল বা নষ্ট হইয়াছিল, কলিকাতার কর্তৃপক্ষেরা তাহাদের কপি বা নকল বিলাত হইতে আনান। এইজন্য এই সময়ের কতক কাগজপত্র দুষ্প্রাপ্য ও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশগুলি হইতে পাঠক ১৭৪৮ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। পূর্বে আমরা কোম্পানির প্রথম আমলের কতকগুলি সেরেস্তার সংক্ষিপ্ত মর্ম দিয়াছি। তাহা হইতে পাঠক নবাবী-আমলে ইংরাজ কোম্পানির অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়াছেন। নিম্নলিখিতগুলি হইতে পলাশী-আমলের কলিকাতা ও তাহার পরবর্তীকালের নানা কথা জানা যাইবে।

কলিকাতায় ড্রেনের উন্নতি

"আমরা কলিকাতার জমিদারকে আদেশ করিয়াছি, যেন তিনি কলিকাতার ড্রেনগুলির একটি সার্ভে করেন। কোন্ ড্রেন মেরামত বা নূতন করিতে কত খরচা পড়িবে, ইহারও একটি এস্টিমেট আমরা চাহিয়াছিলাম। তিনি আমাদের একটি রিপোর্টও এ সম্বন্ধে দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এই ড্রেনগুলির উন্নতি করিয়া কলিকাতাকে স্বাস্থ্যকর করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি।" *(Despatch to Court of Directors 13th January 1749, Para 12)*[১]

জঙ্গল কাটিয়া পাঁজা পোড়ান

"সহরের আশেপাশে যে সমস্ত ঝোপ ও পুরাতন গাছ আছে তাহা কাটিয়া ফেলিবার জন্য, আমরা জমিদার-সাহেবকে আদেশ প্রদান করিয়াছি। কলিকাতা দুর্গের বাকি কাজগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য, ইঞ্জিনিয়ার রবিন সাহেব এখানে পেঁছালেই আমরা ঐ জঙ্গলের কাঠগুলি দিয়া ইটের-পাঁজা পোড়াইবার ব্যবস্থা করিব। ইহাতে কোম্পানি-বাহাদুরের খরচের অনেক সাশ্রয় হইবে।" *(D to C 28th August, 1752)*

দুর্ভিক্ষ ও লোকের মৃত্যু

"কলিকাতায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে—জিনিসপত্রের দর বাড়িয়াছে—ও নিম্ন-জমিতে চাষ-আবাদ যাহা কিছু হইয়াছিল—তাহার সবই ডুবিয়া গিয়াছে। লোকে অনেকস্থলে না খাইতে পাইয়া মরিতেছে। শস্যের ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যাদির দর আরও চড়িবার সম্ভাবনা। ১৭৫১-৫২ এই দুই বৎসরে চাউল ও গম প্রভৃতি শস্যের দর চড়িয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে প্রমাণ হইবে।

খ্রীষ্টাব্দ	চাউলের দর টাকায়	অন্যান্য শস্যাদি টাকায়	গম টাকায়	ময়দা টাকায়	তৈল টাকায়
১৭৫১	১ মণ ৩২ সের	১ মণ	১ মণ ৩২ সের	১ মণ ৩ সের	১ মণ
১৭৫২	১ মণ ১৬ সের	১ মণ ১২ সের	১ মণ ৬ সের	১ মণ	১ মণ

(Letter from Govindram Mittra Black Zaminder to Hon'ble Roger Drake and Council, dated 10th November 1752)

কলিকাতায় শস্যের দর বৃদ্ধি হওয়ায় ও জমি বিলির হার কম হওয়ায় কলিকাতা-কাউন্সিল তাঁহাদের ব্ল্যাক-জমিদারের একটা কৈফিয়ৎ তলব করেন। ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দরাম আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে এই কৈফিয়তে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন। আমরা কেবল তাহার মধ্য হইতে পলাশী-

১. পূর্বোক্ত ও পরবর্তী উদ্ধৃতাংশগুলি কলিকাতার পুরাতন সেরেস্তা হইতে সংগৃহীত। কলিকাতার সকাউন্সিল গবর্ণর এখানকার কাজকর্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত পত্র বিলাতের কোর্ট-অব-ডাইরেক্টারদের লিখিতেন তাহা **Despatch to Court** বলিয়া নির্দিষ্ট। আমরা এই সমস্ত ডেসপ্যাচের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি। যেখানে D. to C. লেখা আছে তাহাই এই ডেসপ্যাচের উদ্ধৃতাংশ। পাশে যে তারিখ আছে তাহা ডেসপ্যাচের তারিখ। এতদ্ব্যতীত আমরা কোম্পানি-বাহাদুরের সেকালের ***Calcutta Consultations*** বহির উদ্ধৃতাংশ হইতেও অনেক অজ্ঞাত তথ্য পাইয়াছি। লং সাহেব এই প্রাচীন রেকর্ডগুলির সারাংশ সংকলন করিয়া দেড়শত বৎসরের অতীত ইতিহাসের একটি অভাব মোচন করিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধের পাঁচবৎসর আগের বাজার দর যে অংশটুকুতে আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছি। টাকায় ১ মণ ৩২ সের চাউল আগের বৎসরে বিকাইয়াছে। ১ মণ ১৬ সের হওয়াতেই দুর্ভিক্ষের হাহাকার। গমও টাকায় ১ মণ ৩২ সের বিকাইত। ময়দার দর ১ মণ তিন সের। তৈল টাকায় এক মণ। পাঠক! এখনকার বাজার দরের সহিত ঐ সব জিনিসের মূল্যের একটা তুলনায় সমালোচনা করিয়া তখনকার লোকে কি করিয়া সামান্য মাহিনায় দোল দুর্গোৎসব করিত, তাহা অনুমান করিয়া লউন।

লালদীঘির উন্নতির জন্য খরচ

১৭৫৩ খৃীস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারির কন্সলটেসান-বহিতে নিম্নলিখিত হিসাবগুলি লেখা আছে—

৩ জন সার্জেন্টের খোরাকি ও পথের উপরিস্থিত গাছ কাটিবার খরচা	৮৯।৵৫
লালদীঘির চারিদিকের ক্ষুদ্র পথগুলি মেরামত পুষ্করিণী-সংস্কার ইত্যাদি বাবত (মাসিক)	২০।৫
কমলা-লেবুর গাছ (বাগানে বসাইবার জন্য)	২৪৲
ঈশ্বরী ও ভবী নামক দুইজন বেশ্যার মালামাল বিক্রয় ও দয়ারাম সিংহের সম্পত্তি যাহা কোম্পানি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন তাহার মূল্য	৫৩৯।৩

পাঠক উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখিতে পাইতেছেন, কোম্পানি তাঁহাদের শখের লালদীঘির উন্নতির জন্য মাসিক ২০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। বাগানে কমলালেবুর গাছ বসাইবার জন্যও ২৪ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল।

কোম্পানির জমিদারির খাজনা

"হুগলীর ফোজদার, চারি মাসের প্রাপ্য খাজনা তলব করিয়াছেন। এজন্য নিম্নলিখিত হারে তাঁহাকে খাজনা পাঠাইবার আদেশ হইল।

দং—সুতালুটি (কলিকাতা)—৩০৫ টাকা।
দং—গোবিন্দপুর (পাইকান)— ৭০ টাকা।
দং—গোবিন্দপুর (কলিকাতা)—৩৩ টাকা।
বক্সীর খরচা— ১॥০ টাকা।

এই খাজনা ১৭৫৩ খৃীস্টাব্দে দেওয়া হইয়াছিল। প্রতি চারি মাস অন্তর কোম্পানিকে সরকারি প্রাপ্য খাজনা হুগলীতে পাঠাইতে হইত।"

মেয়র-কোর্টের খরচা

কলিকাতায় ইংরাজের প্রথম বিচারালয় 'মেয়র-কোর্ট'।[১] আগে মেয়র-কোর্টের নির্দিষ্ট কোন বাড়ি-ঘর ছিল না। কলিকাতার একটি 'চ্যারিটি স্কুলের' কর্তাদের নিকট হইতে বাড়ি ভাড়া করিয়া লইয়া, তাহাতে আদালত বসিত। এই বাড়ির ভাড়ার জন্য কোম্পানিকে মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে গণিতে হইত। মেয়র-কোর্টে যাঁহারা বিচার করিতেন তাঁহারা সকলেই ইংরাজ। কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্য হইতে এই সমস্ত বিচারক নির্বাচিত হইতেন। ইঁহাদের পদবী ছিল অল্ডারম্যান (Alderman) বিচারকার্যে ইঁহাদের তেমন একটা আগ্রহ ছিল না। অনেক অল্ডারম্যান সামান্য অছিলায় কাছারি হইতে অনুপস্থিত হইতেন। হয়ত বিচারের দিনও নির্বাচিত বিচারপতি অনুপস্থিত থাকিতেন। এইজন্য কোম্পানি ব্যবস্থা করেন, "যদি কোন নির্বাচিত অল্ডারম্যান বা বিচারক কার্য করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পঞ্চাশ পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা দিতে হইবে। পরপৃষ্ঠায় আমরা ১৭৫৩ খৃীস্টাব্দের অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের চারি বৎসরের পূর্বের মেয়র-কোর্টের খরচের একটি হিসাব তুলিয়া দিলাম।

---

১. যে বাড়িটিতে Mayor's Court প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১৭২৭) তাহার মালিকানা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। একটি মত অনুসারে এ বাড়িটি তৈরী হইয়াছিল Robert Bourchier-এর অর্থ সাহায্যে। Bourchier প্রথমে ছিলেন কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য, পরে বোম্বাইএর গবর্ণর। অন্য মতে, যে জমিতে প্রথমে Charity School এবং পরে Mayor's Court স্থাপিত হইয়াছিল সেটি চার্চ কর্তৃপক্ষ লাভ করিয়াছিলেন উমিচাদের কাছ থেকে দান হিসেবে।—H. E. A. Cotton, *Calcutta Old and New*, 2nd Reprint p. 98-99.

চ্যারিটি-স্কুলের বাটির ট্রাস্টিদের বাড়ি ভাড়া বাবত, মাসিক ৩০ (আকট টাকা) হিসাবে চারি মাসের জন্য	১২৯॥ ১০
অল্ডারম্যান সাহেবের বিচার-পরিচ্ছদ বা গাউন নির্মাণের জন্য তাফ্‌তা কাপড় খরিদ	১২।৶১৫
আদালতের হুকুমানুসারে আদালতে ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে সমস্ত সেরেস্তার নকল রাখিবার জন্য মহুরির মজুরি	৬৪৸০
মোমজামা কাপড় খরিদ	৯৲
অল্ডারম্যান সাহেবের বিচারাসনের জন্য ভেলভেট (মখমল) খরিদ	৩৭।৫
ইণ্টারপ্রেটার বা দ্বিভাষীর বেতন	২০৲
আদালতে পাহারার জন্য দুই জন এদেশীয় জমাদার ২।০ হিঃ	৪॥০
২ জন অল্ডারম্যান—পকেট খরচ ১৫৲ হিঃ	৩০৲
২ জন ইউরোপীয় কোর্ট-সার্জেণ্ট বা দারোগা সাহেব ১০৲ হিঃ	২০৲
আলোকের জন্য মোমবাতি খরিদ (৬ মাসের)	১০৲
একজন ব্রাহ্মণ (?)	৩।০
একজন হাড়ি (মেথর) (ইংরাজিতে A harry আছে)	৯৲

মেয়র কোর্টের ফোলিয়ো বহিতে (Folio-Book) মোকদ্দমার বিবরণ রেজিস্টারি করিবার জন্য প্রতি পেজে ॥৴০ ফি লওয়া হইত। এই ফি হইতে বৎসরে কমবেশী ১৬০০ টাকা আয় হইত।

পাঠক বর্তমান বিশালায়তন, জনসংঘপূর্ণ, অসংখ্য সার্জেণ্ট ও পাহারাওয়ালা পরিবেষ্টিত, শামলা-গাউনধারী উকিল-ব্যারিস্টারের জনতাপূর্ণ হাইকোর্টের সহিত এই প্রাচীন অল্ডারম্যান-কোর্টের একটা তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন। সেকালের মেয়র-কোর্টে একজন ইণ্টারপ্রেটার ২০ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন, আর বর্তমান কালের হাইকোর্টে বা পুলিস-কোর্টের ইণ্টারপ্রেটারের বেতন কাল পরিবর্তনে কত বেশী।

লালদীঘির শোচনীয় অবস্থা

"জমিদার-সাহেব (হলওয়েল এই সময়ে জমিদার ছিলেন) আমাদের গোচরে আনিয়াছেন যে, লালদীঘির অবস্থা দিন দিন বড়ই পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় হইয়া পড়িতেছে। ইহার যে অংশে কলেট, বেচার, ও নিখেল সাহেবের বাটি অবস্থিত, সেখানে পচা জলের দুর্গন্ধ অতি প্রবল। পুকুরের পাড় এরূপভাবে ধসিয়া গিয়াছে, যে তাহাতে তাঁহাদের বাড়িসমূহের অনিষ্ট হইতে পারে। এই পুষ্করিণীর জল খারাপ হওয়ায় সকলেরই বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। ধরিতে গেলে, এই পুষ্করিণীর জল খাইয়া সমগ্র নগরের গরীবেরা জীবনধারণ করে। এইজন্য পুষ্করিণীর আশু সংস্কার অতি আবশ্যক। অনেকে এই পুষ্করিণীর জলে স্নান করে ও ঘোড়ার গা ধোয়ায় বলিয়া জলের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়। যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ এরূপ করিতে না পারে তজ্জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রচার করা হইয়াছে।" (*Con. dated 12th May 1755*)

'ফিরিঙ্গি' শব্দের আইনঘটিত অর্থ

মেয়র-কোর্টে আর্মেনিয়ান মুসলমান ও হিন্দুদের সহিত ইউরোপীয়ানদের প্রায়ই মামলা মোকদ্দমা হইত। অনেক মামলা ফিরিঙ্গি বনাম মুসলমান বা হিন্দু থাকিত। এই সময়ে কোন কারণে জমিদার হলওয়েল সাহেবের সহিত মেয়র-কোর্টের বিবাদ বাধে। বিচার-সীমানা বা জুরিসডিকসান্ এই বিবাদের প্রধান কারণ। এই ব্যাপারে হলওয়েল সাহেব মেয়র-কোর্টের কর্তাদের যে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি এই 'ফিরিঙ্গি' শব্দটি লইয়া একটু আলোচনা করিয়াছেন। এ আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ এই—

"আমার মতে ফিরিঙ্গি শব্দের অর্থ এই, কলিকাতা সহরে যে সমস্ত পর্টুগীজ খৃষ্টান বাস করে, তাহারাই ফিরিঙ্গি। পর্টুগালের খাঁটি পর্টুগীজদিগের সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। এই

সমস্ত খৃস্টান-পর্টুগীজদের অধিকাংশের শরীরে হিন্দু ও মুসলমানের রক্ত আছে। ইহারা ধরিতে গেলে, এই রাজ্যের আইনানুসারে মোগলের প্রজা। একজন ইংরাজ যদি মুসলমান হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডাধিপের সহিত তাহার রাজা-প্রজা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এইজন্য রয়্যাল-চার্টারে, ইহারা হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই—'নেটিভ' বলিয়াই হইয়াছে।

(Con. dated 15th June, 1755)

সাহেবী-পল্লীতে বাড়ির দর

"হলওয়েল সাহেব, কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন—ইউরোপীয়ানগণ যে বাটিতে বাস করেন, সেই বাটির বিক্রয়মূল্যের উপর শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে ডিউটি আদায় করা হউক। কারণ এই বাড়িগুলি দ্বিতল। এগুলি দশ হইতে বারো হাজার টাকা দরেও বিক্রয় হইতে দেখা গিয়াছে। আদেশ হইল, হলওয়েল সাহেবের প্রস্তাবমত কার্য আরম্ভ হউক।"

পাঠক উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, সাহেবী-কোয়ার্টারের (White Town) বাড়িগুলি সেই পুরাকালে দশ-বার হাজার টাকাতেও বিক্রয় হইত। পাঠক যেন মনে রাখেন,আমরা পলাশী যুদ্ধের তিন বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি।

(Con. dated 26th July, 1753)

ফোতের সম্পত্তি

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রমাণ হয়, নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলেও উত্তরাধিকারীহীন ফোত বা মৃতদিগের সম্পত্তি নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। ১৭৫৫ খৃস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের কন্সলটেসনে প্রকাশ—"নবাব আলিবর্দি খাঁ এই কলিকাতার অধিবাসী লক্ষ্মী, রাধানাথ ও গোষ্ঠরামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর দাবি করিতেছেন। ইহাঁরা কলিকাতার দেশীয় ব্যবসায়ী ও নিঃসন্তান এবং অন্য প্রকার উত্তরাধিকারীবিহীন। এইজন্য এই সমস্ত ফোতের সম্পত্তি নবাব-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। কিন্তু এই সকল ব্যবসায়ীদের সকলেই কোম্পানির নিকট হইতে টাকা ধার করিয়াছে। এজন্য এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া নবাবকে পত্র লেখা প্রয়োজন।"

ব্রাহ্মণের দান বন্ধ

"কোম্পানিবাহাদুর ব্রাহ্মণদিগকে বাৎসরিক যে ১০১৩ টাকা দান করিতেন। এবৎসর তাহা বন্ধ করা হইল।" *(Con. dated 27th October, 1755)*

আড়ঙ্গের[১] দাদনি

কোম্পানির রেশমের ব্যবসায় ও সুতার কারবার কতদূর উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তাহা

১।	শান্তিপুর	Santipore	৯৩৫৯২৶/১৫
২।	হরিপাল	Harrypaul	৮৫৪৪৩৷৷১০
৩।	ধনেখালি	Dorneacally	৩৮৫৩৩৷৶/৫
৪।	গলাগোড় (?)	Gollagore	৩৮৫১৮৶/১০
৫।	কাটোরা (?)	Cuttorah	৫১৪৯০৷৵/১০
৬।	বুরন (?)	Burron	৮২২৬১৫
৭।	হরিয়াল (?)	Hurriall	২২৪১২০৷৵/১৫
৮।	বুদল (?)	Budoul	৭৯৪৮৩৸৵/১০
৯।	ক্ষীরপাই	Keerpye	১৬২৫৭০৸০
১০।	মালদহ	Malda	২৬৪০০৭৵/১০
১১।	কলিকাতা	Calcutta	৫৯৫০০৲
১২।	বরাহনগর	Barnagore	৭৩০১৫৵/০
১৩।	সোনামুখী	Soonamokie	২২০৯৯৸৵/১০

১. Aurang—'a place where goods are manufactured, a depot for such goods'. During the Company's trading days the term was applied to their factories for the purchase, on advances, of native piece goods.—Hobson-Jobson, New Ed. p. 40.

পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আড়ঙ্গগুলির দাদনি হইতে প্রমাণ হয়। এই সময়ে ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে আড়ঙ্গগুলিতে প্রায় তের লক্ষ টাকা খাটিত। আমরা সেকালের বানানসমেত আড়ঙ্গগুলির নাম ও দাদনি টাকার অঙ্ক উদ্ধৃত করিলাম।

বিবাহের শুল্কে গরীবের কষ্ট

কোর্ট-অব-ডাইরেক্টারদিগের ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারির পত্রে প্রকাশ, "আপনারা আমাদিগকে জানাইবেন, জরিমানা ও অন্যান্য বাব প্রচলন দ্বারা কোম্পানির গরীব প্রজাদের কোনরূপ কষ্ট হইতেছে কি না? উদাহরণস্বরূপ আমরা বিবাহের ডিউটির বা শুল্কের কথা বলিতেছি। অনেক গরীব লোকের পক্ষে এরূপ শুল্ক দিতে কষ্টবোধ হয়। আমাদের মতে, এইরূপ বিবাহ-শুল্ক একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত। বড়লোকদের সম্বন্ধে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা।"

কলিকাতাবাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহারের আদেশ

"আমাদের অধিকৃত স্থানসমূহে যে সমস্ত প্রজা বাস করে, তাহাদের উপর কোনরূপ কঠোরভাবে শাসন করিবেন না। বিশেষ সমদর্শিতার সহিত তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবেন। অন্যায় ও অতিরিক্ত বাবসমূহ আদায়ের দ্বারা তাহাদিগকে পীড়ন করা উচিত নহে। অবশ্য এই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা উচিত যাহাতে কোম্পানির আয়ও না কম হইয়া যায়। সাধ্যমতে যেন কোন প্রজার উপর কোনরূপ অত্যাচার চেষ্টা না করা হয়।"[১]

বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারেরা, কলিকাতা-কাউন্সিলকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার একাংশ হইতে উপরোক্ত অংশটি উদ্ধৃত হইল। তাঁহাদের দেশীয়-প্রজাদের প্রতি যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হয়, তাহাদের উপর ট্যাক্স খাজনা ও অন্যান্য বাব চাপাইয়া তাহাদিগকে অনর্থক ব্যতিব্যস্ত করা না হয়, কোম্পানি-বাহাদুরের তৎসম্বন্ধীয় এ উপদেশ, উক্ত আদেশ পত্রাংশ হইতেই প্রমাণ হইতেছে।

তখন বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টার সভাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে এ দেশের কাজকর্ম সম্বন্ধে এইরূপ নানাবিধ আদেশ পাঠাইতেন। কলিকাতাবাসীদের প্রতি এরূপ সহৃদয়তা প্রকাশে তাঁহাদের মহত্বই প্রকাশ হইয়াছে।

গোবিন্দরাম মিত্র

"কোম্পানিকে প্রতারণা করার অপরাধে গোবিন্দরাম মিত্রকে পদচ্যুত করা হইল।" এই আদেশটি ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের এক মন্তব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। হলওয়েল গোবিন্দরামকে প্রতারণার অপরাধে পদচ্যুত করিবার আদেশ দেন। কিন্তু কাউন্সিলের বিচারে গোবিন্দরাম মিত্র তহবিলে গরমিল ৩৩৯৭ টাকা দিয়া পুনরায় কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, কোম্পানি-বাহাদুরের কর্তৃপক্ষীয়েরা মিত্রজা মহাশয়কে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এই সময়ে গোবিন্দরামের পদবী ছিল 'রাজস্ব-বিভাগের ম্যানেজার'। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গোবিন্দরামকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা হয় বটে কিন্তু উক্ত বৎসরের নভেম্বর মাসের তাঁহার লিখিত একখানি পত্র হইতে প্রমাণ হয় যে, তিনি পুনরায় পূর্ব্বপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।[২]

পিতলের বাটখারা

"আমরা দেখিতেছি, সীসার ও লোহার বাটখারা বহুকাল ব্যবহারে ওজনে কমিয়া যায়। এজন্য পিতলের বাটখারাই সর্বাপেক্ষা সুবিধাকর। আমরা বিলাত হইতে পিতলের বাটখারা ও মাপদণ্ডের নমুনা তৈয়ারি করিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কলিকাতার বাজারসমূহে এইরূপ বাটখারাই অতঃপর ব্যবহার করিতে পারেন।"

কলিকাতায় যিনি জমিদার থাকিতেন জমিদারির নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত, তাঁহার উপর

১. *Court's Letter to Calcutta Council, Para 80 dated 31st January 1755.*
২. *Consultations dated 9th December 1752.*

বাজার পরিদর্শনের ভারও থাকিত। ইনি বাজারে আমদানী জিনিসের অবস্থা ও ওজন প্রভৃতির উপর নজর রাখিতেন। অপরাধিগণ ধৃত হইয়া শাস্তি পাইত। কোম্পানি-বাহাদুরের চালানি মালামালও এইরূপ বাটখারায় ওজন হইত। কিন্তু বিলাতে পুনঃপুনঃ চালানি মালের পরিমাণ কম হওয়ায়, কোর্ট অব ডাইরেক্টারেরা বাজারের বাটখারা বিভ্রাটের প্রতিকার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করেন। *(Court's letter, para 116, dated 11th February, 1757)*

ইংরাজদের সম্বন্ধে অমিচাঁদের অভিমত

কাউন্সিলের একটি মন্ত্রণাসভার কার্যবিবরণের মধ্যে লিখিত আছে, "ওয়াটস্ সাহেব আমাদিগকে তাঁহার এক পত্রে জানাইয়াছেন—অমিচাঁদ ইংরাজের সম্বন্ধে, নবাবের নিকট (সিরাজউদ্দৌলা) অতি সুন্দর মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছেন। অমিচাঁদ নবাবকে বলেন, "আমি প্রায় চল্লিশ বৎসরকাল ইংরাজদের আশ্রয়ে থাকিয়া, তাহাদের সঙ্গে ব্যবসা-সূত্রে লিপ্ত আছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কখনও আমি তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম দেখি নাই। ইংরাজেরা কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না।" একথা প্রমাণের জন্য, অমিচাঁদ নবাবের সম্মুখে ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ করিয়া দিব্য করিয়াছেন। *(Select Committee's Proceedings, 25th February, 1757)*

কুলি ও মুটিয়াদের প্রতি কোম্পানির দয়া

"বক্সী সাহেব বোর্ডকে জানাইয়াছেন, যে চন্দননগর অবরোধ ব্যাপারে, লর্ড ক্লাইভের[১] সেনাদলভুক্ত অনেক মুটিয়া ও কুলি যুদ্ধস্থলে নিহত হইয়াছে। তাহাদের পরিবারবর্গ দুরবস্থায় পড়িয়া আমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। এজন্য আদেশ করা গেল, যে-সকল কুলি ও মুটিয়া এই যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া আহত হইয়াছে বা মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের আশ্রিত ও পোষ্যগণকে সাহায্যস্বরূপ প্রত্যেক পরিবারে প্রয়োজন মত ৮-১০ টাকা হিসাবে সাহায্য দেওয়া হউক।"

(Proceedings of the Board, April, 1757)

ইট ও চুনের দর

প্রাচীন কলিকাতায় ১৭৫৭ খৃীস্টাব্দে চুন ও ইটের দর কিরূপ ছিল, তাহার একটি সামান্য উদাহরণ দিতেছি। একটি মন্তব্যে প্রকাশ—"গড়ের মাঠের নূতন কেল্লা নির্মাণের 'কমিটি অব ওয়ার্ক' সমিতির অধ্যক্ষ আমাদের রিপোর্ট দিয়াছেন যে, "তাঁহারা ৩৸৴০ করিয়া (প্রতি হাজার) কোম্পানির মাপ অনুযায়ী ইট প্রস্তুত করিবার জন্য ইটওয়ালাদের আদেশ দিয়াছেন। চুনের দরও একশত মণ ৩৯ টাকা হিসাবে ধার্য হইয়াছে। যত ইট প্রয়োজন হইবে উক্ত দরেই পাওয়া যাইবে। চুন আপাতত চল্লিশ হাজার মণ অর্ডার দেওয়া গেল।"

(Proceedings, 26th September, 1757)

ডাক্তারের বিল

"নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় যে সমস্ত ইংরাজ-সৈনিক আহত অবস্থায় চুঁচুড়ায় গিয়া পেঁছিয়াছিল, তাহারা সেইস্থানেই চিকিৎসিত হয়। চুঁচুড়ার ডাক্তার সাহেব ঔষধ ও ভিজিটের মূল্য বাবত ৬৫০ টাকা বিল করিয়াছেন। এই বিল বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য রাখা হইল।"

(Proceedings, 3rd October, 1757)

কড়ির বদলে আনির প্রচলন

এই সময়ে বহরমপুরে ইংরাজদের একটি ছোটখাট কেল্লা নির্মিত হইতেছিল। ইঞ্জিনিয়ার ব্রোহিয়ার সাহেব কুলি মজুরদিগের হিসাব-আনা প্রদান সম্বন্ধে কলিকাতা কাউন্সিলের অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব-কে লেখেন, "কারিগর ও কুলিদিগকে কড়ি দ্বারা পারিশ্রমিক দিতে গেলে বড়ই অসুবিধা হইয়া পড়ে। কড়ির পরিবর্তে তাম্র কিম্বা রৌপ্য-নির্মিত 'আনির' প্রচলন হইলে বড়ই কাজের সুবিধা হয়। কোম্পানির দুই জন 'সরফ্' এখানে আসিয়া কড়ি ও আনির আদান-প্রদান কার্যের ভার

১. চন্দননগর অবরোধকালে (মার্চ ১৭৫৭) ইনি রবার্ট ক্লাইভ নামেই পরিচিত ছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বছর পর ইনি Baron উপাধিতে ভূষিত হন (১৭৬২)।

লইবেন, এইরূপ ব্যবস্থাই সুবিধাকর। এই সরফেরা কড়ির জন্য কোনরূপ বাট্টার দাবি করিতে পারিবেন না। কারণ এরূপ বাট্টা লইলে গরীব শ্রমজীবিগণের ক্ষতি হইবে ও তাহারা কার্যে আসিবে না।" *(Proceedings, 13th October, 1757)*

গঙ্গারাম ঠাকুরদিগের দরখাস্ত

নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় গঙ্গারাম ঠাকুর, নকুড় সরকার প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ কোম্পানির তৎকালীন প্রয়োজন মত বস্তাসমেত চাউল বিক্রয় করিয়াছিল। নবাব কলিকাতা অবরোধ করিলে তাহারা কলিকাতা ছাড়িয়া ভয়ে পলায়ন করে। কলিকাতা ইংরাজের পুনরধিকৃত হইলে তাহারা পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসে ও তাহাদের প্রদত্ত মালের মূল্যের জন্য কলিকাতা-কাউন্সিলের সেক্রেটারি সাহেবের নিকট দরখাস্ত করে। সেই দরখাস্তের অনুবাদ এই—

"অনারেবল রজার ড্রেক সাহেব মহোদয় ও তদধীনস্থ কাউন্সিল বরাবরেষু—'

"কলিকাতার ব্যবসায়ী গঙ্গারাম ঠাকুর ও নকুড় সরকারের বিনীত দরখাস্ত এই—আমরা অতি সম্মানের সহিত জানাইতেছি, গত জুন মাসে (১৭৫৬) নবাব যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন সেই সময়ে কোম্পানির ব্যবহারের জন্য, আমরা চাউল ও অনেকগুলি বস্তা, বক্সীখানায় পাঠাইয়াছিলাম। আমরা আশা করি, এই চাউল ও বস্তা প্রভৃতির মূল্যদানে আদেশ দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। আমরা কলিকাতার জমিদার সাহেবের মুখে শুনিলাম, অন্যান্য ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ তাহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া পাইয়াছে। আমাদের দরখাস্ত করিতে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়াছে, কারণ নবাবের আক্রমণ সময়ে আমরা কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যাই ও সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমরা প্রথমত সেক্রেটারি সাহেবের নিকট এই পাওনা টাকার জন্য দরখাস্ত করি। কিন্তু তিনি আমাদের জানাইয়াছেন—পূর্বোক্ত দোকানদারগণের প্রাপ্য চুকাইয়া দিবার পর আপনারা আদেশ করিয়াছেন, আর কাহাকেও প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইবে না।[১] আমরা যেদিন কলিকাতায় আসিয়া পেঁাছিয়াছি, তাহার দুই এক দিন পূর্বে আপনাদের এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। আমরা গরীব লোক, অর্থাভাবে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। এজন্য প্রার্থনা, আমাদের প্রাপ্য টাকাগুলি প্রদান করিবার হুকুম-দানে বাধিত করিতে আজ্ঞা হয়। এ দয়ার কথা আমরা চিরদিনই স্মরণ রাখিব।" *(Proceedings, 17th November, 1757)*

পলাতক আসামী

শ্রীযুক্ত অনারেবল রজার ড্রেক—প্রেসিডেন্ট ও গবর্ণর এবং কাউন্সিলের সদস্যগণ বরাবরেষু—

দরখাস্তকারিগণ—ব্রজদুলাল, নাটু, কীর্তি ও শ্যাম কোতম্মা কলিকাতাবাসী ব্যবসায়িগণ।

"আমাদের বিনীত নিবেদন এই—আমাদের আত্মীয়গণ, কান্ত কোতম্মা, পরাণ কোতম্মা প্রভৃতি আমাদিগের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত চন্দননগরে গিয়া বহুদিন হইতে লুকাইয়া আছে। আমাদের এই অপহৃত সম্পত্তির মধ্যে ফরাসী ও ইংরাজ-কোম্পানির হুণ্ডি ও অনেক টাকার খত প্রভৃতি আছে। ইংরাজ-কোম্পানির প্রদত্ত দুইখানি হুণ্ডির টাকা পাইবার জন্য আমরা আপনাদের সরকারে দরখাস্ত করিয়া এই চুরির ব্যাপার পূর্বে জানাইলাম। তখন আপনারা ফরাসী-অধ্যক্ষদের লিখিয়াছিলেন যেন এই হুণ্ডিগুলির পরিবর্তে টাকা না দেওয়া হয়। এক্ষণে ভগবানের ইচ্ছায় আপনারা চন্দননগর ধ্বংস করিয়াছেন এবং উক্ত পলাতক আসামিগণও এক্ষণে কলিকাতায় উপস্থিত আছে। এজন্য প্রার্থনা, ইংরাজ কোম্পানির প্রদত্ত দুইখানি বণ্ডের টাকা আমাদিগকে প্রদান করিতে আজ্ঞা হয়। আর আমাদের দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, উক্ত পরাণ ও কান্তর নিকট আমাদের আর যে সমস্ত খত আছে, তাহাও আদায় করিয়া আমাদের প্রত্যর্পণের আদেশ হয়। শীঘ্র এ বিষয়ের ব্যবস্থা না করিলে, আসামীরা কলিকাতা ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইতে পারে।" *(Proceedings, 20th December, 1757)*

---

১. নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় যাহারা সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল বা ইংরাজদের কোনরূপ সহায়তা করে নাই, সকাউন্সিল গবর্ণর সাহেবের আদেশে তাহাদের দাবি-দাওয়া নাকচ করিয়া দিবার হুকুম হয়।

কলিকাতার অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে ক্লাইভের অভিমত

"বাজে খরচ কমাইবার উদ্দেশ্যে আমি সেনাদের জন্য 'ভাতা' ও অন্যান্য উপরি বাব বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়াছি। তাহারা কলিকাতা দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় বাস করিবে, ইহাই আমার সংকল্প। কিন্তু বর্তমানে কলিকাতার অবস্থা অতি অস্বাস্থ্যকর। এই সঙ্কট সময়ে সেনাগণকে কলিকাতায় রাখিলে তাহাদের অনেকেই 'পাক্কাজবরে' মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সেনাগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমি আপাতত তাহাদের কলিকাতা-বাস রহিত করিলাম। আমি আশা করি, আমার এই ব্যবস্থায় কোম্পানির সেনাগণের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।" ১

চৌরঙ্গীর জঙ্গল, ভাগীরথীর জঙ্গলময় আর্দ্র সৈকতভূমি কলিকাতাকে সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র করিয়া তুলিত। এই সময়ে এক রূপ জবর দেখা দিত, ইংরাজেরা তাহাকে "পাক্কাফিভার" বলিতেন। ইহা ম্যালেরিয়ার রূপান্তর। একবার যাহাকে ধরিত, সহজে তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না। তখন কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্তই ছিল না। অনেক স্থান ঝোপ-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলগুলি কাটাইবার জন্য, মধ্যে মধ্যে সরকারি আদেশ প্রচারিত হইত। কিন্তু সমস্ত গাছপালা ও জঙ্গল একেবারে পরিষ্কার করা, অতি ব্যয়সাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। এইজন্য কোম্পানি-বাহাদুর অধিবাসীদের সহায়তায় কলিকাতাকে জঙ্গলবিমুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে এ সম্বন্ধে যে আদেশ প্রচারিত হয় তাহা এই—"সহরের মধ্যে ও আশেপাশে বড় বড় গাছগুলি কাটাইয়া, কলিকাতাকে রৌদ্র ও বায়ুপূর্ণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, আমাদের অধিকারের মধ্যে যাহারা বসবাস করিতেছে, তাহারা নিজব্যয়ে স্ব স্ব দখলী জমির, বাগানের ও পতিত-ভূমির জঙ্গল কাটাইয়া লইবে। কমলা লেবু ও অন্যান্য ফলের গাছগুলি কেবল তাহারা কাটিতে পারিবে না। যাহারা নিজব্যয়ে জঙ্গল কাটাইবে, তাহারা কর্তিত বৃক্ষাদির স্বত্বাধিকারী হইবে। কোম্পানি এসব বৃক্ষ সম্বন্ধে কোনরূপ দাবি দাওয়া করিবেন না।" পাঠক মনে রাখিবেন, পলাশী যুদ্ধের পরও কলিকাতার বন জঙ্গল এই অবস্থায় ছিল। কলিকাতার অনেক বাগানে ও জঙ্গলে তখন কমলালেবুর গাছ জন্মিত তাহারও প্রমাণ উল্লিখিত আদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে। রত্নগর্ভা বঙ্গভূমি, চিরদিনই যে সুরসাল ফলের গাছপূর্ণ।

ওয়াটসনের মৃত্যুতে ক্লাইভের শোকপ্রকাশ

ইতিহাস-অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন ও লর্ড ক্লাইভই পলাশী-সমরের প্রধান অভিনেতা। ওয়াটসন একজন প্রতিভান্বিত সেনাপতি ছিলেন। হতভাগ্য অমিচাঁদের ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াটসনের নাম চির গৌরবান্বিত। তাঁহার ন্যায় সুচতুর রণকুশল সেনানী সে সময়ে খুব কম ছিল। ক্লাইভও তাঁহার উপযুক্ত সহযোগীর সহায়তাকে বড়ই বহুমূল্য জ্ঞান করিতেন। [illegible] ইহাঁর মৃত্যু হয়। যে পাক্কাজবরের কথা আমরা উপরে বলিয়াছি, তাহাই তাঁহার অকাল-মৃত্যুর কারণ। তাঁহার সমাধি এখনও সেণ্ট জন গির্জা-প্রাঙ্গণে বর্তমান। ক্লাইভ ওয়াটসনের অকাল-মৃত্যুতে যে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার মর্মার্থ এই, "ওয়াটসন আর ইহলোকে নাই, আমরা তাঁহার এই শোচনীয় অকাল-মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত ও সন্তপ্ত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ প্রকৃতির লোক অতি দুর্লভ। কোম্পানির কার্যসাধনে তিনি জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। হায় ভাগ্য! পলাশীর সঙ্কটময় যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, শেষ কি না তিনি এইরূপে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন? তাঁহার বীরকীর্তি, তাঁহার গৌরবময় বিজয়-কাহিনীর পূর্ণ ফল উপভোগ করিতে পাইলেন না। এই প্রকার মৃত্যুই আমাদিগের মনে মনুষ্যের নশ্বর জীবনের স্মৃতি পরিস্ফুট করিয়া দেয়।"২

১. *Clive's Letter to the Court, Para 11 dated 22nd August 1757.*

২. *Do Do Para 5 dated 22nd August 1757.*

এ দেশীয় ভাষাজ্ঞান প্রয়োজন

লর্ড ক্লাইভ তাঁহার একখানি পত্রে বিলাতের কর্তাদের লিখিতেছেন, "ওয়াটস সাহেব (কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ) আমার সঙ্গে আছেন বলিয়া আমি বিশেষ উপকৃত বোধ করিতেছি। তিনি বহুদিন এদেশে বাস করিতেছেন। বাঙ্গালীর রীতি-প্রকৃতি ও ভাষাজ্ঞানও তাঁহার যথেষ্ট। কোম্পানির প্রধান কর্মচারিগণের এরূপ দেশীয় ভাষাজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য।"১

ওয়াটস্ সাহেব কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। বহুদিন হইতেই তিনি বঙ্গের নানা স্থানে কোম্পানির কুঠিসমূহের অধিনায়কতা করিয়াছিলেন। নবাব কাশিমবাজারের কুঠি লুণ্ঠন করিয়া এই ওয়াটসন সাহেবকেই বন্দী করেন। পলাশীযজ্ঞে ইনি একজন প্রধান হোতা।

গোবিন্দপুরে নূতন দুর্গনির্মাণ জন্য জমিগ্রহণ

"যে সকল বাঙ্গালী ও এদেশীয় লোক গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করিত, নূতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গনির্মাণের জন্য আমরা তাহাদিগকে স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছি। যাহাদের পাকা বাড়ি আছে তাহাদের বাটিসমূহের দরদস্তুর ঠিক ন্যায্যভাবেই হইয়াছে। তাহারা মূল্যের জন্য প্রার্থনা করিলেই তখনই মূল্য দেওয়া হইবে। যাহাদের চালাঘর আছে তাহাদিগকে স্থানান্তরে চালা উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য খরচা দেওয়া হইবে। যাহাদের খরিদা জমি ছিল, তাহাদিগকে সহরের অন্য স্থানে তাহাদের ইচ্ছামত এওয়াজি-জমি দেওয়া হইয়াছে। যে সকল লোকের চালাঘর উঠাইয়া লইয়া যাইবার খরচা বেশী ও এতজ্জন্য বিশেষ অসুবিধা ও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহাদিগকে নিকটবর্তীস্থানে জমি দেওয়া হইল।"২

পলাশী-যুদ্ধের পর গড়ের মাঠের বর্তমান কেল্লা নির্মাণের জন্য গোবিন্দপুরে প্রজার বাস উঠাইয়া দেওয়া হয়। সর্বপ্রথমে গঙ্গার ধারে পুরাতন ডক্‌ইয়ার্ডের অধিকৃত স্থানে এই নূতন দুর্গনির্মাণের কল্পনা হয়। যেখানে আজকাল বেঙ্গল ব্যাঙ্ক অবস্থিত, সেইখানেই এই ডক্‌ইয়ার্ড ছিল। কিন্তু ইহার চারিদিকে দূরে অদূরে বাড়িঘর থাকায় এ সংকল্প পরিত্যক্ত হয়। সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরাজপক্ষ যে কোনরূপ সুবিধাকর আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, তাহার প্রধান কারণ দুর্গের চারিদিকে অনেক বড় বড় পাকা বাড়ি ছিল। ঠেকিয়া শিখিয়া ইংরাজ-কোম্পানি গোবিন্দপুরের উন্মুক্ত স্থানে কেল্লার স্থান নির্ণয় করেন। তখন গোবিন্দপুরের একদিকে জাহ্নবী ও চারিপার্শ্বে ব্যাঘ্র শ্বাপদাদি পূর্ণ বনজঙ্গল। ভবিষ্যতে দুর্গনির্মাণ সূচনার সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের বনজঙ্গল কাটাইয়া দুর্গের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান সম্পূর্ণরূপে ফাঁকা ময়দান করা হইয়াছিল। এইরূপ কল্পনা করিয়াই বর্তমান গড়ের মাঠের অধিকৃত স্থানে অবস্থিত গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের উঠাইয়া দেওয়া হয়। গোবিন্দপুর এই সময়ে একখানি জনপূর্ণ গ্রাম ছিল। গঞ্জ ও বাজার প্রভৃতির বাহুল্যে এ স্থান ব্যবসা-বাণিজ্যেও খুব জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল। গোবিন্দপুরের অনেক আদিম অধিবাসী এই সময়ে সহরের উত্তরাংশে অর্থাৎ শোভাবাজার প্রভৃতি স্থানে বসবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অফিসে কড়ির ব্যবহার

"বোর্ড অনেক টাকার কড়ি কিনিয়া রাখিয়াছেন। এজন্য ইহার সদ্ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। এহেতু আদেশ করা যাইতেছে, কোম্পানির অধীনস্থ কলিকাতার প্রধান প্রধান অফিসসমূহের কর্তারা যাহাতে কড়ির প্রচলন বেশী হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বক্সী-সাহেবকে লিখিলেই তাঁহারা প্রয়োজন মত 'কৌড়ি' ইন্‌ডেণ্ট করিতে পারিবেন।"৩

১. *Clive's Letter to Court, Para 2, dated 23rd December 1757.*
২. *Letter to Court, Para 110, dated 10th January 1758.*
৩. *Court's Letter dated 10th January 1758.*

তন্তুবায়দিগকে [illegible]দানে আদেশ

"কোম্পানির গোমস্তাগণ, তন্তুবায়দিগকে ইতিপূর্বে যে ভাবে দাদনির টাকা দিয়া আসিয়াছে আমাদের মতে তাহাই সমীচীন। উপস্থিতে সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। যাহাতে তন্তুবায়গণ বর্তমান অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করে, তজ্জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পার্শ্ববাহিনী নদীর দুইকূলে, কলিকাতা সহরের মধ্যে এবং আমরা কলিকাতার পার্শ্ববর্তী যে আটত্রিশখানি গ্রামের দখলীস্বত্ব পাইয়াছি, তাহার মধ্যে তন্তুবায়গণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কাশীজোড়া, শান্তিপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে চেষ্টা করিয়া ইহাদের কলিকাতায় আনান উচিত।"[১]

বস্ত্রের ব্যবসায়েই কোম্পানি বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের তন্তুবায়গণের পরিশ্রম-প্রসূত বিচিত্র বস্ত্রাবলী ইউরোপের নানা বন্দরে, বহু নগরে আদরের সহিত বিক্রীত হইত। নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় বোধ হয় অনেক তন্তুবায় কলিকাতা হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। নচেৎ বিলাতের কর্তারা এরূপ আদেশ প্রচার করিবেন কেন? শান্তিপুর ও ঢাকার আড়ঙ্গের বস্ত্র চিরদিনই বিশ্ববিখ্যাত। ঢাকাই-মসলিন বাঙ্গলার মহা-মূল্যবান কার্পাস শিল্প। ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক রাজ্ঞীর, ভারতের মোগল-সম্রাটদিগের অনেক বেগমের, বরাঙ্গের সৌন্দর্য বাঙ্গলার সূক্ষ্মবস্ত্রে বৃদ্ধি হইত। এইজন্যই জোব চার্নক ভাগীরথী তীরবর্তী অন্যান্য স্থান ত্যাগ করিয়া তন্তুবায়দিগের বসবাসপূর্ণ সুতানুটিতে কোম্পানির কুঠি নির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তখনকার কার্পাসের সূক্ষ্মশিল্পই বাঙ্গালীর ও ইংরাজদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ছিল।

থিয়েটারকে গির্জায় পরিবর্তন

"কলিকাতায় ইংরাজ-অধিবাসীদের জন্য একটি গির্জার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা শুনিয়াছি, যে বাটিটি আগে থিয়েটার-গৃহ ছিল, অভিনয় উদ্দেশ্যে তাহার এখন কোন ব্যবহারই হয় না। সেইটিকে অনায়াসেই গির্জায় পরিবর্তন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কলিকাতাবাসী ইংরাজ জনসাধারণের চাঁদায় যখন ইহা নির্মিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা এই সাধারণ গৃহটি ধর্মার্থে ব্যবহৃত হইতে দিতে সম্ভবত কোনরূপ আপত্তি করিতে পারেন না। আমরা আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি, কোম্পানির খরচায় এই থিয়েটার গৃহটিকে গির্জারূপে সুসজ্জিত করা হইবে।"

সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা অবরোধ সময়ে কলিকাতার প্রথম গির্জা সেণ্ট এ্যান্ একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর কলিকাতা পুনরায় ইংরাজাধিকৃত হইলে কোন নূতন গির্জা নির্মাণ করা হয় নাই। পূর্বোক্ত থিয়েটারগৃহ বর্তমান স্কচ-গির্জার (লালদীঘির কোণের ঘড়িওয়ালা গির্জা) উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল।

কলিকাতার প্রথম দেওয়ানি-আদালত

এদেশীয়দের মধ্যে সম্পত্তিঘটিত মোকদ্দমা সমূহের নিষ্পত্তির জন্য একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ প্রয়োজন বোধে আমরা আদেশ করিতেছি যে এদেশীয়দের মধ্যে দেনা-পাওনা ঘটিত কুড়ি টাকার উপর দাবিভুক্ত যে সমস্ত মামলা দায়ের হইবে তাহার বিচারার্থ পাঁচজন ইংরাজ-বিচারক নিযুক্ত হইবেন। কাউন্সিলের সদস্য ব্যতীত, আমাদের অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্য হইতেও বিচারক নির্বাচন করা হইবে। ইহাদের মধ্যে একজন প্রধান-জজ রূপে নির্বাচিত হইবেন ও তিনি এক বৎসরকাল ধরিয়া এই কার্য করিবেন। বৎসরান্তে পুনরায় নূতন নির্বাচন হইবে। কলিকাতার গবর্ণর সাহেব কাউন্সিলের সহিত পরামর্শ মতে এই সমস্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আবার প্রয়োজন বুঝিলে তাহাদিগকে বর-তরফ্ করিবার ক্ষমতাও সকাউন্সিল গবর্ণরের হস্তে ন্যস্ত রহিল।[২]

১. *Court's Letter dated 3rd March 1758.*
২. *Do Do Do 3rd March 1758.*

রাত্রে কলিকাতায় চৌকি দিবার ব্যবস্থা

"সহর কোতোয়ালের পদ ইতিপূর্বেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতার চারিদিকে চৌকি দিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ বন্দোবস্ত করা হইল। আমাদের মেজর সাহেব সহরের নানাস্থানে চৌকি দিবার জন্য গোরা পুলিসের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। রাত্রি দশটা হইতে প্রভাত পাঁচটা পর্যন্ত, সহরের চারিদিকে গোরা পাহারার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে কোন কোন এলাকায় চৌকি দিবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য, তাহার ব্যবস্থা আপনারাই করিয়া দিবেন। নদীতীর ও সহরের মধ্যে প্রবেশদ্বারগুলিতে যেন কঠোর চৌকি রাখিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। যাহাতে গুপ্তচর প্রভৃতি সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন।"১

বাগান ও আবাসবাটির জন্য অতিরিক্ত জমি গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা

"আমরা সন্ধির নূতন শর্তানুসারে নবাব মীরজাফরের নিকট হইতে যে সমস্ত ভূভাগ পাইয়াছি, তাহাতে লোক জন বসবাস করান প্রয়োজন। এই সমস্ত জমি বাজে লোককে বিলি না করিয়া, যাহারা কোম্পানির কাজে লাগিতে পারিবে, তাহাদেরই জমা দেওয়া উচিত। যাহাতে নূতন অধিবাসীরা পূর্বকার মত অধিক পরিমাণে জমি লইয়া বাগানবাটি ও আবাসগৃহ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যতটুকু জমি প্রত্যেক লোকের বসবাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত জমি যেন কাহাকেও বিলি না করা হয়।"

সেকালের ইংরাজেরা ও বাঙ্গালীরা বড় বড় বাগানবাটিতে থাকিতে বড় পছন্দ করিতেন। অনেকে এজন্য সুবিধামত অধিক পরিমাণে জমি জমা করিয়া লইতেন। কলিকাতায় অধিবাসী সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই বোধ হয় কর্তারা এইরূপ জমি বিলির আয়তন সংক্ষেপের আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই সময়ে ক্রীক্-রো হইতে আরম্ভ করিয়া চৌরঙ্গীর জঙ্গলাধিকৃত ভূমিতে প্রজা বসাইবার চেষ্টা করা হইতেছিল। তখন জমির দর বড় কম ছিল ও জমার হারও খুব সুলভ ছিল। চৌরঙ্গীর প্রথমার্ধের জঙ্গল কাটাইয়া বোধ হয় এই সময়ে প্রাচীন কলিকাতা সহরটিকে বিস্তৃত ও জনপূর্ণ করিবার চেষ্টা করা হয়।২

কলিকাতার প্রথম ডাক

আদেশ করা হইল, "কলিকাতা ও মুরশিদাবাদের মধ্যে নানাস্থানে ডাকচৌকি ও ডাক-পিয়াদা রাখা হইবে।"

এই ব্যবস্থানুসারে কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদ ও মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় ৩০ ঘণ্টার মধ্যে সংবাদাদি আসিবার ও যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ধরিতে গেলে, ইহাই কলিকাতার প্রথম ডাক ব্যবস্থা।

ভোজপুরী সিপাহী

"জঙ্গী-জোয়ান, এক সহস্র এদেশীয় লোককে কোম্পানির সিপাহী দলে গ্রহণ করার আদেশ পাওয়ার পর, এক হাজার ভোজপুরী সিপাহী সংগ্রহ করা হইয়াছে।" উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশ একটি মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

লর্ড ক্লাইভের দলে আগে তেলিঙ্গী বা মান্দ্রাজী দেশী সিপাহীর ভাগই বেশী ছিল। তাঁহারই প্রস্তাবানুসারে পশ্চিম প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ভোজপুরীদের সেনাদলে গ্রহণ করা হয়। সম্ভবত ইহাই কোম্পানির আমলের প্রথম হিন্দুস্থানী সিপাহীর রেজিমেন্ট।

১. *Court's Letter, dated 3rd March 1758.* সেকালের কলিকাতায় বক্সী ও পাইক্‌ম্যান্ (সড়কীধারী) বলিয়া আরও দুই শ্রেণীর পাহারাদার ছিল। এগুলি কোম্পানি বাহাদুর উঠাইয়া দেন। পূর্ব কথিত মেজর সাহেব কেল্লার মধ্যে থাকিতেন। তাঁহার অধীনে পাঁচশত গোরা সৈন্য ও পাঁচশত সিপাহী থাকিত। এই সময়ে সৈন্য-বিভাগের কার্য ব্যতীত তিনি পুলিস-বিভাগের কার্য করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

২. *Court's Letter, Para 156, dated 3rd March 1758.*

প্রতি শুক্রবারে বেত্রাঘাত

তখনকার ফৌজদারি-বিধি ব্যবস্থাও নূতন ধরণের ছিল। এখন তাহার স্মৃতিমাত্র কেবল পুরাতন সরকারি কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ফৌজদারি মোকদ্দমায় আসামীগণের প্রতি, কোন কোন অপরাধে, বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা হইত। কাহারও প্রতি বা একশত ঘা বেত, কাহারও প্রতি বা পঞ্চাশ বেত, এইরূপ আদেশ হইত। এই বেত্রাঘাতের অপর নাম ছিল 'চাবুক লাগান'। যাহারা চাবুক লাগাইত তাহাদিগকে 'চাবুক-সওয়ার' বলিত। অপরাধীকে বেত্রাঘাত করাই এই সমস্ত চাবুক-সওয়ারের কাজ ছিল। ৫ই এপ্রিল তারিখের প্রোসিডিংস্‌ বা কার্য-বিবরণী হইতে আমরা দেখিতে পাই, "জমিদার-সাহেব প্রমুখ বিচারকগণ, আসরফ্‌ খাঁ ও মানিক দাসের অপরাধের বিচার করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে প্রতি শুক্রবারে ১০১ বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা এ দণ্ড কার্যে পরিণত করিবার আদেশ প্রদান করিতেছি।"[১]

এই মানিক দাস ও আসরফ্‌ খাঁ কি অপরাধে এরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাহারা যে কোন রূপ ফৌজদারি অপরাধের জন্য এরূপভাবে শাস্তি পাইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সপ্তাহের অন্য দিনে চাবুক মারিবার ব্যবস্থা না করিয়া শুক্রবারে কেন যে দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইল, তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। প্রতি শুক্রবারে তাহাদের উপর ১০১ চাবুকের আদেশ হয়। এইরূপভাবে তিনমাস তাহাদিগকে শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছিল।

ইহার পর আর একটি হুকুম হইতে জানিতে পারা যায়, "ইদু সেখ বলিয়া একজন মুসলমান লস্কর, তাহার স্ত্রী পাঁচীকে হত্যা করার অপরাধে প্রতি শুক্রবারে এই ভাবে একশত ঘা চাবুক খাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল।"[২]

লুকাইয়া মদ্য বিক্রয়ের দণ্ড

এক জন আর্মেনিয়ান তাহার লাইসেন্সের অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 'আরক-মদ্য' কলিকাতা সহরে আনিয়া গোপনে বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিল। আদেশ হইল, এইরূপ ভাবে গোপনে আনীত মদ্য কোম্পানির লোক বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে।

আতসবাজী প্রস্তুতের লাইসেন্স

মইনদ্দি বাজীওয়ালা দরখাস্ত করিয়াছে, "হাউই ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার বাজী তৈয়ারি করিবার জন্য সে সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করে।" এই সমস্ত হাউই দ্বারা সহরের চালাঘরগুলির যথেষ্ট বিপদ সম্ভাবনা। এজন্য তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, হাউই ব্যতীত সে অন্যান্য বাজী প্রস্তুত করিতে পাইবে।[৩]

কোম্পানি বাহাদুরের অতিথি-সৎকার

একবার নবাব মীরজাফর কলিকাতার কোম্পানি বাহাদুরের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার জন্য যে সমস্ত খরচপত্র হইয়াছিল, ক্লাইভের স্বাক্ষরিত তাহার একটি বিস্তৃত হিসাব আছে। সে হিসাবটি আদ্যোপান্ত তুলিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। খাওয়া দাওয়া, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি ছাড়া আরও কয়েকটি বাব বাবতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সে বাবগুলি এই—১৫ জোড়া পিতলের দেওয়ালগিরি—২২৷৷০, কোর্ট হাউস বাড়িতে মদ্য খরচ—৭৬৯ টাকা। নবাবের জন্য একটি কাফ্রি-ক্রীতদাস খরিদ বাবত—৫০০ টাকা। সওগাদবাহী ভৃত্য-দিগের পুরস্কার—৩১০ টাকা। ১৫ বাক্স গোলাপজল—৩৯৭ টাকা। নবাবের প্রাসাদে ব্যবহারের জন্য ৭০ মণ মোমবাতি—৩৪৩ টাকা। ৬০ পাউণ্ড মসলীপট্টন চুরুট—৫০০ টাকা, দুই মণ ভিনিগার—৮০ টাকা, ৫ মণ কাফি—৩৩২ টাকা।

ধোপা-নাপিত ও দর্জির মেহনত আনা

১৭৫৫ খৃীস্টাব্দে ধোপা-নাপিত ও দর্জিরা তাহাদের কার্যের জন্য যে মেহনত আনা লইত,

১. *Report of the Select Committee dated 18th February, 1758.*
২. *Do Do dated 20th March, 1758.*
৩. *Proceedings dated 5th, 9th April and 14th May 1757.*

তাহার সহিত তুলনায় বর্তমানে (১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ) তাহার চারি গুণ দাবি করিতেছে। এজন্য আদেশ করা হইতেছে, আগামী ১লা এপ্রিল (১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ) হইতে তাহারা নিম্ননির্দিষ্ট হারে মেহনত আনা পাইবে। ইহার অতিরিক্ত দাবি করিতে পারিবে না।

১। জামা তৈয়ারি করিবার সেলাই খরচ তিন আনা।
২। চারিদিকে বর্ডার দেওয়া জামার সেলায়ের মজুরি সাত আনা।
৩। ১টা আঙ্গরাখার মজুরি দুই আনা।
৪। এক কুড়ি কাপড় কাচিবার জন্য ধোপা সাত পণ কড়ি পাইবে।
৫। একজন লোককে ক্ষৌরী করিবার জন্য নাপিত সাত গণ্ডা কড়ি পাইবে।[১]

বাজেয়াপ্ত মালামাল বিক্রয়

কাস্টম-হাউসের নিয়ম লঙ্ঘন করায় যে সকল মালামাল কোম্পানি আটক করিয়াছিলেন সেগুলি নিম্নলিখিত হারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে বিক্রয় করা হইল।[২]

দ্রব্যের জায়	বস্তার পরিমাণ	মণ	খরিদ্দারের নাম		মূল্য টাকা
মিহি চাউল	২১	৪০।০	ফৈজু খানসামা—১৸৶০	মণ	৭৭৸৶১০
মোটা চাউল	১৮	৩৭/৭॥	ফ্রান্সিস ডেকষ্টা—১॥৵০	”	১৬০।৶০
গালা বাতি	৪	৪/৯	দর্পনারায়ণ ঠাকুর—৫॥৵০	”	২৩৷১০
গালা	১৯	২৮॥৬	ঐ —৭৵০	”	২০৪৵০
লোহা	২৫৪৫ পিশ্	১১০।৫৵০	কেবলরাম নিয়োগী—৭।/০	”	৮০৬।৫
মিছরি	১৮ কুঁদো		রাধাচরণ মিত্র—		২০।০

তোপে-উড়ান

"হত্যা প্রভৃতি চরম অপরাধে আগে চাবুকের আঘাতে অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা হইত। কিন্তু এরূপ আঘাত জেলের মধ্যে করা হয় বলিয়া বাহিরের দুষ্ট লোকের মনে তাহাতে ভয়ের উদ্রেক হয় না। সুতরাং চাবুক আঘাতে মৃত্যু-সংঘটন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইল। এইবার হইতে কোম্পানির জমিদারির মধ্যে চরম অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।"

বোর্ডের এই আদেশ প্রচারের কয়েকদিন পরে, হত্যাপরাধে অপরাধী নয়ান ছুতারকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।[৩]

কলিকাতার টাকশাল প্রতিষ্ঠা

(নবাবের পরওয়ানার একাংশ)

"কলিকাতায় আপনারা টাকশাল প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা এই টাকশালে নির্মাণ হইবে। টাকাগুলি মুরশিদাবাদের নবাব সরকারের প্রচলিত আসরফি ও টাকার মত ওজন ও গঠন হইবে। তাহাতে কলিকাতার নাম মুদ্রিত থাকিবে। বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে এই সকল মুদ্রা অবাধে প্রচলিত হইবে। মুরশিদাবাদে নবাবের রাজকোষেও কলিকাতার টাকশালের টাকা গৃহীত হইবে। এই টাকার জন্য কেহ কোনরূপ বাট্টা বা কমিশন দাবি করিতে পারিবে না।"

(১১ই চান্দ্র জেলহদ্দ ৪র্থ বৎসর)[৪]

গবর্ণর সাহেবের সফরের খরচ

সেকালের ইংরাজ গবর্ণরগণ কিভাবে বিদেশ যাত্রা করিতেন, তাহার জন্য কিরূপ খরচপত্র হইত, তাহারও একটু আভাস দেওয়া প্রয়োজন। তখন রেলপথ ও ঘোড়া গাড়ির পথ ছিল না, মোটর প্রভৃতিরও প্রচলন হয় নাই। এক নদীপথেই দূরতর প্রদেশ যাত্রার প্রধান অবলম্বন। ক্লাইভের বিলাত গমনের পর হেনরি ভ্যান্সিটার্ট সাহেব বাঙলায় কোম্পানির অধিকারসমূহের গবর্ণর নিয়োজিত

---

১. *Proceedings dated 27th March 1760*
২. *Do Do 20th March 1760.*
৩. *Do Do 17th November 1760*
৪. Translation of the Nawab's *Perwannah* for the establishment of a Mint in Calcutta—*Proceedings dated 25th November 1760.*

হন। এই গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট একবার মুরশিদাবাদে নবাবদরবারে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার শোভাযাত্রার জন্য কিরূপ খরচপত্র হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা কোম্পানি বাহাদুরের পুরাতন সেরেস্তায় আছে। যাতায়াতে এক মাস ছয় দিন সময় লাগে। এ সময়ের মধ্যে যে খরচপত্র হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহার একাংশের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম।

গবর্ণর সাহেবের নিজের ব্যবহার জন্য		
৩ খানি বজরা ভাড়া	প্রতিদিন ৩৲ হিসাবে—	২১৬৲
২০ খানি ৬ দাঁড় নৌকা	মাসিক ২৮৲ হিঃ—	৬৭২৲
২২ খানি ৮ দাঁড় নৌকা	মাসিক ৩৬৲ হিঃ—	৪৯০৲
১২ খানি ১০ দাঁড় নৌকা	মাসিক ৪০৲ হিঃ—	৫৭৬৲
২ খানি ৪ দাঁড় নৌকা	মাসিক ২৪৲ হিঃ—	৫৭৲
	মোট নৌকা ভাড়া—	২০১১৲
নবাবের ভৃত্যবর্গকে বক্‌শিশ প্রদান—		১৯২০৲
নবাবের নজর (৪০ খানি সোনার-মোহর ও ৬৯ টি সিক্কা টাকা)		৬৭৪॥০
মুরশিদাবাদের উকিলকে খেলাৎ (পোষাক) প্রদান		২৫৭৲
চাকরদিগের ভাতা (১৬৯ জনের) (ইহাদের মধ্যে চোবদার, পেয়াদা, মশালচি, সোঁটাবরদার, বরকন্দাজ, মুন্সী, সরকার ও বেহারাগণও ছিল)		৭২৪।০
পালকি বেহারাদের ভাড়া (কাশিমবাজার হইতে)		৮৩৩॥০
৩০ জন মশালচির মেহনত-আনা (১ মাস ৬ দিনের জন্য)		১২০৲
যাতায়াতে, খানার ও মদ্যাদির খরচা		৩৫০০৲
বেহারাদের পরিচ্ছদ ও বন্দুকের আচ্ছাদনীর জন্য লাল কাপড়		২৪০৵০
তৈল, মশাল ইত্যাদি		২৩৮॥০

(কলিকাতা, ৩১শে অক্টোবর ১৭৬০) হেন্‌রি ভ্যান্সিটার্ট (গবর্ণর)।

মহারাজ তিলকচাঁদকে উপহার প্রদান

বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ বাহাদুরের সহিত কোম্পানির রাজস্ব সম্বন্ধীয় দেনা-পাওনা লইয়া একটা গোলযোগ বাধে। এ গোলযোগের মীমাংসাও হইয়া যায়। ১৭৬০ খৃীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর প্রোসিডিংসে মহারাজকে ও তাঁহার কর্মচারিবর্গকে যে উপহার দেওয়া হইয়াছিল— তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

উপহারের বাব	উপহার দ্রব্য	টাকা
রাজা তিলকচাঁদের জন্য	১টি হস্তী	২০০০৲
	১ প্রস্থ পোষাক	৬০০৲
	হীরকমণ্ডিত শিরপ্যাচ	৪০০৲
দেওয়ান অমরচাঁদের জন্য	১ প্রস্থ পোষাক	৫০০৲
	১টি অশ্ব	৫০০৲
	১ খানি তলোয়ার	৫০৲
	১ টি শিরপ্যাচ	৩০০৲
রামদুবে নায়ক	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
	১টি অশ্ব	৫০০৲
গোকুল মজুমদার	১ সুট পোষাক	২২৫৲
	১টি অশ্ব	৫০০৲
রাজীবেন্দ্র রায়	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
রাজচন্দ্র রায়, উকিল	১ প্রস্থ পোষাক	২২৫৲
	১টি অশ্ব	৫০০৲
ধনঞ্জয় রায়, উকিল	১ প্রস্থ কাপড়	১৭৫৲
অন্য ছয় জন, উকিল	৭ জোড়া শাল	৬০০৲

বর্গী কর্তৃক বর্দ্ধমান লুঠ

"আপনারা এস্থানের দুরবস্থার কথা বোধ হয় অবিদিত নহেন। তাহা হইলেও আমি প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে আপনাদের টাকা শোধ করিতে পারিব,এরূপ আশা করি। আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে দুর্দান্ত বর্গিগণ আমার দেশ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছে,প্রজার যথাসর্বস্ব লুঠ করিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই কোম্পানির প্রাপ্য টাকা বাকি পড়িয়াছে। আমার রাজ্যে পুনরায় সুখ সৌভাগ্যময় অবস্থা আনয়ন করিতে আমাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে। দেশের দুরবস্থাই এখন আমার প্রধান চিন্তার কারণ।"(বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচাঁদের পত্র) ১

জগৎশেঠের কাঁধ-ভাঙ্গা

"গত ২০এ মহরম, শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়, আমি কোন নিমন্ত্রণ-ক্ষেত্র হইতে আহারাদি করিয়া ফিরিতেছিলাম। পথিমধ্যে সহসা পা পিছলাইয়া যাওয়ায় আমি পড়িয়া যাই। ইহার ফলে, আমার গ্রীবা-সন্ধির অস্থি স্থানচ্যুত হইয়াছিল। ইহার দুই ঘণ্টা পরে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আমি মূর্ছিত হইয়া পড়ি। চিকিৎসা দ্বারা আমার রোগের কিছু উপশম হয়। এখন আমি অনেকটা ভাল, আছি, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার মত হস্তচালনা করিতে সমর্থ হই নাই। আপনারা আমার আহত স্থানে দিবার জন্য যে তৈল ও অন্যান্য ঔষধাদি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয়। আপনারা যে ঔষধগুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, ব্যবহার-বিধি না লিখিয়া দেওয়াতে এপর্যন্ত তাহা ব্যবহার করিতে পারি নাই। অতএব অনুগ্রহ করিয়া ব্যবস্থাপত্র পাঠাইবেন। আমার হাতখানি একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আপনাদের তৈল ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ঔষধ, ব্যবস্থাপত্র ও সেই সঙ্গে একজন ইংরাজ ডাক্তার আমার নিকটে যত শীঘ্র পারেন, পাঠাইয়া দিয়া উপকৃত করিবেন। যতদিন আমি বাঁচিব, ততদিন আপনাদের কৃতোপকার ভুলিব না।"

"পুনশ্চ—গতকল্য হইতে ডাক্তার হ্যান্‌কক্‌ আমায় ঔষধ দিতেছেন। আমি কেবল আপনাদের জ্ঞাত কারণার্থে এই পত্র লিখিতেছি। আমি আশা করি, আপনারা এ সম্বন্ধে ডাক্তার হ্যান্‌কক্‌কে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়াছেন। আপনাদের এই অনুগ্রহের জন্যই আমি উপকার পাইতেছি। ভগবান আপনাদের দীর্ঘায়ু ও প্রাচুর্যবান করুন।২

নদীয়া-রাজের কিস্তিবন্দী

"আপনার কুশল সংবাদসম্বলিত অনুগ্রহলিপি পাইলাম। নদীয়ার রাজার সম্বন্ধে আপনি যে অনুকূলজনক মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আনন্দিত হইলাম। নবাব তাঁহার নিজের কাজ ও কোম্পানির কাজ একই বলিয়া মনে করেন। আপনাদেরও নবাব-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সেইরূপ ধারণা। কিন্তু নদীয়ার রাজার সম্বন্ধে যে আমি কি বলিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। প্রায় দুই মাস কাল তিনি কেবল কড়ার ও নানাবিধ ওজর করিয়া টাকা দিতেছেন না। প্রথমত তিনি বলিয়া পাঠান, দুর্গাপূজা উপস্থিত এ সময়ে টাকা দেওয়া অসম্ভব। তার পর বলিয়া পাঠাইলেন, শ্যামাপূজা উপস্থিত। কাজেই টাকার যোগাড় হয় নাই। তারপর এখন শুনিতেছি, রাজা আপনাদিগকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পত্নীর পীড়ার জন্য টাকার বন্দোবস্ত হয় নাই। তিনি যে মুর্শিদাবাদে আসিবার জন্য এইরূপ নানা অছিলা ও ওজর আপত্তি করিতেছেন, তাহার কারণ আর কিছুই নয়—পাছে এখানে আসিলে আমরা জবরদস্তিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করি। রাজা নিজে এখানে না আসিলে টাকা আদায়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। তাঁহার উকিল আসিলে কোন ফলই হইবে না। আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন টাকার অভাবের জন্য, নবাব তাঁহার সেনাদের বেতন দিতে পারিতেছেন না। আমরা নদীয়ার জমিদারকে এখানে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। আপনারাও তাঁহাকে লিখিবেন—যেন তিনি দুইটি কিস্তিবন্দীর উপযুক্ত পরিমাণ সরকারি রাজস্ব

১. *Extract from a letter to Government in the Persian Department.*
২. *Letter from Juggut Sett dated September 1760.*

লইয়া রাজধানীতে আসেন। বাকি টাকা পরে দিলেও কোন অসুবিধা হইবে না।[১]

নবাবীসেনার তলবানা সম্বন্ধে গোলযোগ

(মহারাজা রাজবল্লভের পত্র)

আমি টাকা সংগ্রহের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। অন্য কোন উপায় করিতে না পারিয়া আমি আমিয়ট সাহেবের নিকট হইতে কয়েক থান বনাত লইয়া সিপাহীদিগকে বেতনের পরিবর্তে দিয়াছি। ১লা রবিউসশানী তারিখে, সোবাবন্দ, মীর ফজল আলি ও আনামতউল্লা খাঁ, আমার দেওয়ানখানায় উপস্থিত হয় এবং আমাকে বলে, তাহাদের বেতন চুকাইয়া না দিলে তাহারা সেখান হইতে নড়িবে না। সেখ দীন মহম্মদ প্রভৃতিও এই সময়ে দেওয়ানখানায় উপস্থিত হইয়া ঐরূপ কথা বলে। আমি অন্যঘরে বসিয়া তখন ক্ষৌরকার্য সমাধা করিতেছিলাম। মীর ফজল আলি আমার নিকটে আসিয়া মিষ্টভাষায় তাহাদের আগমনের কারণ বুঝাইয়া বলে। আমি তাহাদিগকে সমস্ত হাল বুঝাইয়া বলি, 'তোমাদিগকে যত শীঘ্র পারি সন্তুষ্ট করিব'। কিন্তু তাহারা আমার কথা না শুনিয়া আমাকে দেওয়ানখানায় যাইতে বলে। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখি, সেখানে অনেক অসন্তুষ্ট সৈনিক বসিয়া আছে। তাহারা আমাকে মধ্যে বসাইয়া আমার চারিধারে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে আমার বরকন্দাজেরা আমার রক্ষার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। দুই দলের লোক একত্রিত হওয়ায় আমি ভাবিয়াছিলাম, একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা না হইয়া যায় না। কিন্তু তাহা হয় নাই। হইলে বোধ হয় মুরশিদাবাদ লুঠপাট হইত, সরকারের কার্য হানি ঘটিত। আমি এই অশান্ত সেনাগণকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করায় তাঁহারা দেওয়ানখানা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।[২]

কলিকাতার প্রথম স্ক্যাভেঞ্জার-সর্দার

মিঃ হ্যাণ্ডেল বোর্ডকে জানাইয়াছেন যে, "সহরের ময়লা প্রভৃতি স্থানান্তরকরণ কার্যে তাঁহাকে বহুক্ষণ ধরিয়া বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়। আর এই কাজে কষ্টও যথেষ্ট।" বোর্ডও এই ঘটনা অবগত আছেন। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, হ্যাণ্ডেল সাহেব তাঁহার এই পরিশ্রমজনক কার্যের জন্য আরও ২০ টাকা অতিরিক্ত বেতন পাইবেন।[২]

এই হ্যাণ্ডেল সাহেব আগে 'আরক' নামক মদের চোলাইএর কারবার করিতেন। কিন্তু তাহা রহিত হইয়া যাইবার পর, তিনি প্রাচীন কলিকাতার 'আবর্জনা-পরিষ্কার বিভাগের' প্রথম কর্তারূপে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে সহরের মধ্য হইতে ময়লা নিষ্কাসিত করিবার জন্য আর কাহাকেও যে এরূপ তদারকি ভার দেওয়া হয় নাই, তাহা হ্যাণ্ডেলের আবেদন হইতেই বুঝা যাইতেছে।[৩]

বেহালা বড়িশার জমিদার সন্তোষ রায়

সন্তোষ রায় প্রমুখ, মাগুরা পরগনার জমিদারগণ বোর্ডের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়া জানাইতেছেন যে, মাগুরা পরগনার জমিদারি জমা লইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদিগকে অনেক টাকা কর্জ করিতে হইয়াছে। এ কর্জ নবাবী রাজস্বের জন্যই হইয়াছে। এই কর্জ জন্য তাঁহাদের নামে উত্তমর্ণেরা 'কাছারি-কোর্টে' অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এখন ঘটনাবশে, জমিদারি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এজন্য যে সমস্ত কড়ারে ইহা অর্জিত হইয়াছিল, তাহা পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই হেতু তাঁহারা আমাদের অনুরোধ করিতেছেন, "আপনারা আমাদের পাওনাদারদিগকে টাকা আদায়ের জন্য নবাব-দরবারে অভিযোগ করিতে বলুন।"[৪]

শস্যাদির দুর্মূল্যাবস্থা ও কোম্পানি-বাহাদুরের গরীবের প্রতি দয়া

কলিকাতার শস্যাদি মহার্ঘ হওয়ায় গরীব লোকের বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এই কষ্ট দূর করিবার জন্য অন্যস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য ক্রয় প্রয়োজন। এই হেতু বোর্ড প্রস্তাব করিতেছেন—

১. *Letter from Roy Rayan, dated December 1760.*
২. *Letter from Maharaja Raj Bullub, dated December 1760.*
৩. *Proceedings of the Board, dated 12th April 1760.*
৪. *Proceedings, dated 6th November 1760.*

মফঃস্বলের নানাস্থান হইতে শস্য খরিদ করিয়া কলিকাতায় আনা হউক। এজন্য বোর্ড অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত। এই শস্য মফঃস্বল হইতে কিনিয়া আনিয়া সুবিধামত দরে কলিকাতা সহরে বিক্রয় করা হইবে। এজন্য আমরা যে টাকা দিব, বাবু হুজুরীমল তাহার এক চতুর্থাংশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ও এই শস্য ক্রয়কার্যের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

আমরা এই চাউল খরিদ জন্য বক্সী সাহেবকে ৩৭৫০০ টাকা (কোম্পানির) দিতেছি। হুজুরী বাবুও ১২৫০০ টাকা দিতেছেন। এই অর্ধ লক্ষ টাকা বক্সী সাহেব হুজুরীমল বাবুর হস্তে শস্য ক্রয় জন্য দিবেন। 'চাউল প্রভৃতি মহার্ঘ হওয়ায় গরীবদের বড় কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে' এই মর্মে পত্র লিখিয়া বোর্ড এই সময়ে লক্ষ্মীপুর, ঢাকা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানের ইংরাজ-ফ্যাক্টরিতে সাহায্যের জন্য আদেশ প্রদান করেন।

কলিকাতার কলাগাছ ও জঙ্গল-কাটা

বোর্ডের অভিমত এই যে, "কলিকাতাকে কলাগাছ ও জঙ্গলশূন্য করিতে হইবে। তাহা না করিলে সহরের স্বাস্থ্য-রক্ষা অসম্ভব।" এজন্য সারভেয়ার সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে—মহারাষ্ট্র-খাতের সীমার মধ্যে জঙ্গলময় সমস্ত স্থান তিনি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিবেন।[১]

কলিকাতার জমির খাজনার হার-বৃদ্ধি

কলেক্টর সাহেব কলিকাতা সহরের এবং মারহাট্টা-খাতের মধ্যস্থ ভূমি পরিমাণ ও তাহার আদায়ী খাজনার এক ফর্দ দাখিল করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন ৬০৫৭ বিঘা ১৩ কাঠা জমি হইতে বাৎসরিক ১৭৭৪৪৸৹ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। গড়পড়তা তিন টাকা করিয়া বিঘা বিলি করা আমাদের ব্যবস্থা ছিল। তদনুসারে ধরিতে গেলে জমির খাজনা যে হ্রাস হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কলিকাতা সহরের অনেক উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করিতে হইতেছে। এইজন্য কলেক্টর সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তিনি জমির খাজনার হার দ্বিগুণ করিয়া ধরিবেন। অনেকে বিনা দলিলে অনেক নিষ্করভূমি উপভোগ করিতেছে। এই সমস্ত জমির মধ্যে যাহার দলিলপত্র কিছুই নাই, সেগুলি বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে আদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কার্য আরম্ভ করা হয় নাই। এজন্য কলেক্টর সাহেবকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তিনি এইরূপ নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। তবে যাহারা এ সম্বন্ধে দলিলপত্রাদি দেখাইতে পারিবে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।[২]

কলিকাতা সহরে আতসবাজী বন্ধ

দেখা যাইতেছে সহরের মধ্যে আতসবাজী ছোঁড়ায় অনেক স্থানের চালা ঘরে আগুন লাগিয়া পল্লীকে পল্লী ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। পেরিন্স পয়েণ্ট ও সহরের মধ্যে আমাদের যে বারুদখানা বা ম্যাগাজিন আছে, এরূপ অগ্নিক্রীড়ায় তাহারও বিপদ ঘটিতে পারে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, কলিকাতার মধ্যে আতসবাজী ছুঁড়িতে দেওয়া হইবে না, এবং বাজীর দোকানগুলি তুলিয়া দেওয়া হইবে।[৩]

রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যু

ঢাকা হইতে প্রেরিত এক পত্রে আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে, কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ান রাজা মাণিকচাঁদ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কার্টিয়ার সাহেবকে মৃত্যুর পূর্বে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, "যেন তিনি তাঁহার পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।" এই অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, কার্টিয়ার সাহেব রাজার বাড়ির দরজাগুলি সীল করিয়া দিয়া দশজন সিপাহীকে বাটি চৌকি দিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনরব এই যে তিনি মৃত্যু-কালে অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, একথা নবাবের কানেও পৌঁছিয়াছে। পাছে নবাবের কর্ম-চারীরা এজন্য কোন হাঙ্গাম উপস্থিত করে কিম্বা রাজার উত্তরাধিকারিগণকে তাঁহাদের অধিকার

১. Proceedings, dated 12th December 1762.
২. *Do* Do Do
৩. *Do* *Do* *Do*

হইতে বঞ্চিত করে, এইজন্য কোম্পানি এই রাজপরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। রাজা মাণিকচাঁদ কোম্পানির অনেক উপকার করিয়াছিলেন।[১]

মাণিকচাঁদের শিশুপুত্রকে আশ্রয়দান

"ঢাকা হইতে লিখিত ৯ই ও ১০ই তারিখের পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই পত্র হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে মাণিকচাঁদের পুত্রের বয়স মোটে চারি বৎসর। মাণিকচাঁদ কোম্পানির দেওয়ানী করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মতে তাঁহার পুত্রকে ঐ পদ প্রদান করা উচিত। কিন্তু চারি বৎসরের শিশুদ্বারা ত কোনরূপ কার্য হওয়া সম্ভব নহে। এজন্য আমাদের অনুরোধ, এই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালককে সামান্য বেতনে কোম্পানির কর্মচারিগণের তালিকাভুক্ত করিয়া রাখা হউক। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এ কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত হইবে।"

এই রাজা মাণিকচাঁদ সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে ইংরাজদের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে তিনি নানা বিষয়ে কোম্পানির যথেষ্ট উপকার করেন। এজন্য কোম্পানি-বাহাদুর, তাঁহাকে দেওয়ান পদ দেন। কার্টিয়ার সাহেব মাণিকচাঁদের শিশু পুত্রকে ও পরিবারবর্গকে কিরূপে রক্ষা করেন, তাহা পাঠক পূর্বে দেখিলেন। তাঁহার সম্পত্তির উপর নবাব সরকারের যে আইনসঙ্গত দাবিদাওয়া ছিল, তৎপ্রদানে তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। মাণিক-চাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি এইরূপ কৃপা প্রকাশ করায় কোম্পানি বাহাদুরের যথেষ্ট মহত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে। কলিকাতার সান্নিধ্যে বেহালা গ্রামে রাজা মাণিকচাঁদের একখানি বাগান ছিল। এখনও ধ্বংসপ্রায় ফটকটি বর্তমান। এই বাগান এক্ষণে বেহালার সুবিখ্যাত জমিদার রায়-পরিবারগণের দখলে।[২]

সেকালের বাজারদর

একবার নবাব মীরজাফর কোম্পানির অতিথিরূপে কলিকাতায় আসেন। তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গের লোকজনকে যে সিধা দেওয়া হইয়াছিল, তার একটি পুরাতন ফর্দ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। এই ফর্দ হইতে পাঠক সেই সময়ের জিনিসপত্রাদির মূল্য অবগত হইতে পারিবেন।

নবাব ও তাঁহার সঙ্গিগণের জন্য প্রেরিত দ্রব্যাদির তালিকা

দ্রব্যের নাম	পরিমাণ	মূল্য		
চাউল	৪০ মণ	৭৫৲	প্রতি মণ কমবেশী	১৸৴০
দাল	৮ "	২০৶০	" "	২৷৷০
ঘৃত	৫ "	৭৭৲	" "	১৫৷৶০
তৈল	৬ "	৫১৲	" "	৮৷৶০
লবণ	৩৷৷ "	৪৷৶০	" "	১৷০
ময়দা	৮ "	২৭৲	" "	৩৷৶০
চিনি	৫ "	৩৬৷০	" "	৭৷০
মিষ্টান্ন মেঠাই	৬ "	৬০৲	" "	১০৲
মোরব্বা	১ "	১৯৲	" "	১৯৲
বাদাম কিসমিস্	১ "	৩১৷০		
খাসি	৫০ টা	৫০৲	প্রত্যেক খাসি	১৲ হিঃ
শাকসব্জী		১৬৲		
লেবু		৭৲		
মসলা		১৪০৷৶০		
পান ও তামাকু		১০৸০		
হাঁড়ি ও কাঠ		২৬৲		
ঝুড়ি থলে ইত্যাদি		২৪৲		

১. *Proceedings dated 29th November 1762.*
২. *Proceedings dated 17th January 1763.*

শান্তিপুরের ফ্যাক্টরি আক্রমণ

১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দের ১২ নভেম্বরের প্রোসিডিংস হইতে দেখা যায়, কোম্পানির 'এক্সপোর্ট-ওয়্যার-হাউস কিপার' শান্তিপুরের ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত কোম্পানির গোমস্তাগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত অভিযোগটি বোর্ডের নিকট পেশ করিতেছেন।

"রামচন্দ্র সেন, পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সেন, সহসা দুই তিন শত অশ্বারোহী সিপাহী ও বরকন্দাজ লইয়া 'শান্তিপুরের আড়ঙ্গে' উপস্থিত হয়। পঞ্চাশ জন লোক আড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা আমাদিগকে বলে যে, রামচন্দ্র সেনের নিকট আমাদের তখনই হাজির হইতে হইবে। আমরা ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহারা বলপূর্বক আমাদের গোমস্তা মনোহর ভট্টাচার্যকে ধরিয়া লইয়া যায়। এই ভট্টাচার্য কোম্পানিকে সুতার যোগান দিত। তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ায় কোম্পানির কাজ অচল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এরূপ করিবার কারণ যে কি, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা নিধিরাম মুখোপাধ্যায় ও গোপাল ভট্টাচার্যকে আপনাদের নিকট কলিকাতায় পাঠাইতেছি। ইহাদের নিকট সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া আপনারা এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।" ১

১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার বাঙ্গালী অধিবাসিগণ

গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয়ের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের জাল-অপরাধে, বিলাতী আইন অনুসারে বিচার হইয়া যখন ফাঁসির হুকুম হয়, সেই সময়ে কলিকাতা সহরের তদানীন্তন অধিবাসিগণ গবর্ণর সাহেবের নিকট এই ফাঁসির হুকুম রদ করাইবার জন্য এক দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্তে কলিকাতার সেকালের ৯৫৭ জন গণ্যমান্য অধিবাসী নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এই নামের তালিকা হইতে কলিকাতার তৎকালীন গণনীয় ব্যক্তিদের নাম জানিতে পারা যায়। আমরা এই অসংখ্য স্বাক্ষরের মধ্য হইতে কতকগুলি বাছা বাছা নাম তুলিয়া দিলাম।

নবকৃষ্ণ মুন্সী (মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর)

		মদন দত্ত
হুজুরীমল	শুকদেব মল্লিক	শ্যামচাঁদ দত্ত
গোকুল ঘোষ	রাসবিহারী শেঠ	হরিকৃষ্ণ দত্ত
দয়ারাম ঘোষ	নিমাইচরণ শেঠ	মাণিক দত্ত
কন্দর্প ঘোষ	পীতাম্বর শেঠ	চূড়ামণি দত্ত
রামচাঁদ ঘোষ	বিনোদবিহারী শেঠ	কৃষ্ণচাঁদ দত্ত
শঙ্কর হালদার	গুরুচরণ শেঠ	রামনিধি ঠাকুর
পূর্ণানন্দ বসাক	নীলাম্বর শেঠ	বিশ্বনারায়ণ ঠাকুর
শোভারাম বসাক	গোকুলকিশোর শেঠ	দয়ারাম ঠাকুর
রাধামোহন বসাক	কুন্দ ঘোষাল	দুর্গারাম ঠাকুর
দুর্গারাম সেন	বাবুরাম পালিত	হরিকৃষ্ণ ঠাকুর
নন্দরাম সেন	বনমালী ব্যানার্জি	শ্যাম চক্রবর্তী
দয়ারাম শর্মা	রাধাকৃষ্ণ মল্লিক	কেবলরাম ঠাকুর
রামলাল শর্মা	দয়ারাম মুখোপাধ্যায়	রামচরণ রায়
জয়কৃষ্ণ শর্মা	মনোহর মুখোপাধ্যায়	কৃপারাম মিত্র
উদয়রাম শর্মা	তোতারাম বসু	রামসুন্দর মিত্র
রাধাকান্ত শর্মা	রামশঙ্কর বসু	গোবর্ধন মিত্র
রামনিধি শর্মা	রামশঙ্কর দত্ত	গণেশ বসু
রাধাচরণ মল্লিক	দুর্গারাম দত্ত	গঙ্গারাম বসু
		গোকুল মিত্র

সমস্ত স্বাক্ষরগুলি তুলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, এজন্য আমরা বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি নাম তুলিয়া দিলাম। পাঠক ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন কায়স্থগণই তখন কলিকাতার প্রধান ছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের আদিপুরুষ। দত্তগণের মধ্যে অনেকে বোধ হয় হাটখোলার

১. *Proceedings of the Secret Dept. dated 12th November 1764.*

দত্ত পরিবারভুক্ত। শেঠ ও বসাকগণের মধ্যে শোভারাম বসাক, রাসবিহারী শেঠ প্রভৃতি গণনীয়। ঠাকুর-গোষ্ঠির দুই একজনের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। শর্মা বলিয়া যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবত অধ্যাপক শ্রেণীর লোক। চূড়ামণি দত্তের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ইঁহারই পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামে[১] এখনও একটি রাস্তা বর্তমান। শঙ্কর হালদার আহিরীটোলার হালদারদের আদিপুরুষ। তাঁহার পাঁচফুকুরে দালানওয়ালা সুবৃহৎবাটি এখনও অর্ধ ভগ্নাবস্থায় বর্তমান। নন্দরাম সেনের নামেও একটি গলি আছে। মদন দত্তের নাম আজও একটি গলির সহিত বিজড়িত। হুজুরীমলস্ ট্যাঙ্ক লেন হুজুরীমলের নাম রক্ষা করিতেছে। গোকুল মিত্র বাগবাজারের মিত্রদের আদিপুরুষ। ইহাঁর বাড়িতেই মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ইহাই 'বাগবাজারের মদনমোহন' বলিয়া পরিচিত। গোকুল মিত্রের সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য আবাসবাটি, নাটমন্দির, দোল ও রাসমঞ্চ আজও তাঁহার অতীত ঐশ্বর্যময় অবস্থা ঘোষণা করিতেছে। শোভারাম বসাকের নামে আজও দুইটি লেন বড়বাজার ও কলুটোলায় বর্তমান।

একখানি পুরাতন জমিদারি পাট্টা

"জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে মাগুরা পরগনার জন্য এই পাট্টা দেওয়া যাইতেছে। উক্ত জগন্নাথ সরকারে ১৭৩১২৯ টাকা (বার্ষিক) খাজনা সরবরাহ করিবেন। খাজনা ১২টি কিস্তিবন্দী অনুসারে কলেক্টরের কাছারিতে জমা দিতে হইবে। ১৭৬৫ খৃীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর হইতে ১৭৬৬ খৃীস্টাব্দের ৩০এ অক্টোবর পর্যন্ত এক বৎসর মেয়াদে এই পাট্টা নিম্নলিখিত কড়ারে দেওয়া হইল।

১। তাঁহার জমিদারির মধ্যে যে সমস্ত চুরি ডাকাতি রাহাজানি ও খুন হইবে, তাহা তখনই কলেক্টরের গোচরে আনিতে হইবে।

২। বোর্ডের অনুমতি ব্যতীত তিনি কোন আওলাত নষ্ট করিতে পারিবেন না।

৩। রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্যে জমি দেওয়া প্রয়োজন হইলে তাহা কলেক্টর সাহেবকে জানাইতে হইবে।

৪। যে সমস্ত রায়তী জমি নির্ধারিত হারে ইতিপূর্বে বিলি করা আছে, তাহার নির্দিষ্ট খাজনা অপেক্ষা তিনি খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। কিম্বা যে প্রজা নিয়মিতরূপে খাজনা সরবরাহ করিয়া আসিতেছে, তাহার জোত উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।

৫। বিবাহাদির জন্য কোন আবওয়াব লইতে পারিবেন না। তাঁহার জমিদারির মধ্যে যে সমস্ত বিবাহকার্য হইবে তাহার একটি তালিকা কলেক্টরের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৬। যদি কোন প্রজা নিঃসন্তান বা উত্তরাধিকারীবিহীন অবস্থায় মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই ফৌতের সমস্ত সম্পত্তির তায়দাদ্ জনকয়েক ভদ্রলোকের সমক্ষে প্রস্তুত করিয়া তাহা শীলমোহর অবস্থায় কলিকাতার কলেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৭। কোম্পানির কার্য সম্বন্ধে তাঁহার উপর যে সমস্ত আদেশ জারি হইবে, তিনি তাহা করিতে বাধ্য রহিলেন।

৮। হস্তবুদ[২] অনুসারে যে খাজনা নির্দিষ্ট আছে, তিনি তাহাই আদায় করিবেন। কোনরূপ অতিরিক্ত খাজনা বা বাব প্রজার উপর চাপাইতে পারিবেন না।

৯। অন্য জমিদারের প্রতিষ্ঠিত যদি কোন গঞ্জ, বাজার বা হাট, তাঁহার জমিদারির নিকট থাকে, তাহা হইলে তিনি পূর্বোক্ত প্রতিবাসী জমিদারের ক্ষতি করিয়া কোনরূপ নূতন হাটবাজার ও গঞ্জ বসাইতে পারিবেন না।

১০। মেয়াদান্তে তিনি একটি সালতামামি হিসাব, কলেক্টর সাহেবের দপ্তরে দাখিল করিবেন।

১১। যদি পার্শ্ববর্তী কোন জমিদারের সহিত জমি লইয়া, তাঁহার কোন বিবাদ উপস্থিত হয়,

১. পরিশিষ্ট দেখুন

২. হস্তবুদ—ভূমি ও ভূমি রাজস্বের বিস্তৃত হিসাব (Rent Roll)।

তাহা হইলে তিনি তাহা কলেক্টর সাহেবকে অগ্রে জানাইবেন। কলেক্টর তাহা গবর্ণর ও কাউন্সিলকে জানাইলে, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই পালন করিতে হইবে।"

(পাট্টার তারিখ—১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ ১লা নভেম্বর)

কলিকাতার পুরাতন জেলখানা

জমিদার-সাহেব আমাদিগকে জেলখানার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দুইখানি পত্র পাঠাইয়াছেন। একখানিতে তিনি লিখিয়াছেন, "লালবাজারের জেলখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এহেতু কয়েদীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। তবে এখানে স্ত্রীলোক কয়েদীদের জন্য কোনরূপ স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নাই। বড়বাজারের জেলটি ক্ষুদ্রায়তন এবং এখানে কয়েদিগণ প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়ে। লালবাজারের জেলখানায় ৪/৫ শত কয়েদী ধরিতে পারে। উপস্থিত সেখানে ২২০ জন কয়েদী আছে। এই জন্য তিনি বড়বাজার জেলখানা হইতে, কতকগুলি কয়েদী লালবাজারে আনিতে চান। কয়েদীদের আহারাদি সম্বন্ধে কোনরূপ তদারক হয় না। তাহারা এজন্য বড়ই কষ্ট পায়। ইহার প্রতিকার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিতেছেন,"দশ টাকায় একজন জেল্-ওভারসিয়ার নিযুক্ত করা হউক। ইনি প্রতিদিন প্রাতে জেলখানায় উপস্থিত থাকিয়া, কয়েদীদের আহারাদি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।"

ইহা হইতে ১৭৬৭ সালের অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের দশ বৎসর পরের কথা। কাউন্সিলের এই আজ্ঞা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন লালবাজারে ও বড়বাজারে দুইটি জেলখানা ছিল। হরিণবাড়ির নামোল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় না। ধরিতে গেলে, এই সময়েই দশ টাকা বেতনে প্রথম জেল-দারোগা নিযুক্ত হন। দুইটি জেলে আন্দাজ চারিশত কয়েদী ছিল। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, তখনকার সেই ক্ষুদ্র কলিকাতা সহরে অপরাধীর সংখ্যা বড় কম ছিল না। স্ত্রীলোকগণও সে সময়ে কারাবদ্ধ হইত, তাহার প্রমাণ পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন।১

লর্ড ক্লাইভ ও দেশীয় লোকের প্রতি সদয় ব্যবহার

"লর্ড ক্লাইভ ও তাঁহার অধীনস্থ কমিটি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে কোম্পানির ইংরাজ-গোমস্তাগণ, এ দেশীয় লোকদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে। কিন্তু কলিকাতা-কাউন্সিলের ১৯এ ফেব্রুয়ারির পত্রে মহম্মদ রেজা খাঁর যে অভিযোগ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, যে এখনও ইংরাজ-গোমস্তাগণ দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারে ক্ষান্ত হয় নাই।" ২

ইউরোপীয় ভবঘুরের দলবৃদ্ধি

কলিকাতা-কাউন্সিল বিলাতের কর্তাদের যে পত্র লিখিতেছেন, তাহার একাংশ এই, "কলিকাতার বাৎসরিক সেন্সাসের ফল আপনাদের নিকট প্রেরিত হইতেছে। কলিকাতার ইংরাজগণের বর্ণানুক্রমিক একটি তালিকা আমাদের ডেস্প্যাচের মধ্যে আছে, দেখিতে পাইবেন। এই তালিকা হইতে দেখিবেন কলিকাতায় ভবঘুরে ইংরাজ ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা বড়ই বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহারা বিলাত ও ইউরোপের নানা স্থান হইতে জাহাজে করিয়া লুকাইয়া পলাইয়া আসে। এরূপ বিশৃঙখল প্রকৃতির উদ্দেশ্যহীন লোকের আগমনে সহরের অশান্তি বৃদ্ধি হয়। আমরা ইহাদের অনেককে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি বা জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছি। এবং ভবিষ্যতে যাহাতে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, তাহারও চেষ্টা করিব।"

কলিকাতার জমিবিলি সম্বন্ধে ক্লাইভের মন্তব্য

"কলিকাতায় কোম্পানির যে খাস-দখলী জমি-জমা আছে তাহা যথাযথ বিলি হইলে কোম্পানির যথেষ্ট আয়-বৃদ্ধি হইতে পারে। সিলেক্ট-কমিটি ইহা জানিয়াও কিছু করিতে পারিতেন না তাহার কারণ, এই সমস্ত জমি যাহাদের বিলি করা হইয়াছে, তাহাদের মেয়াদ এখনও শেষ হয় নাই। তাহা-

১. *Proceedings of the Board, dated 21st December 1767.*

২. *Letter of the Court of Directors to the President in Council, Para 14, dated 4th March 1767.*

মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর

সিরাজউদ্দৌলা

ক্লাইভের দমদমার বাগানবাড়ি
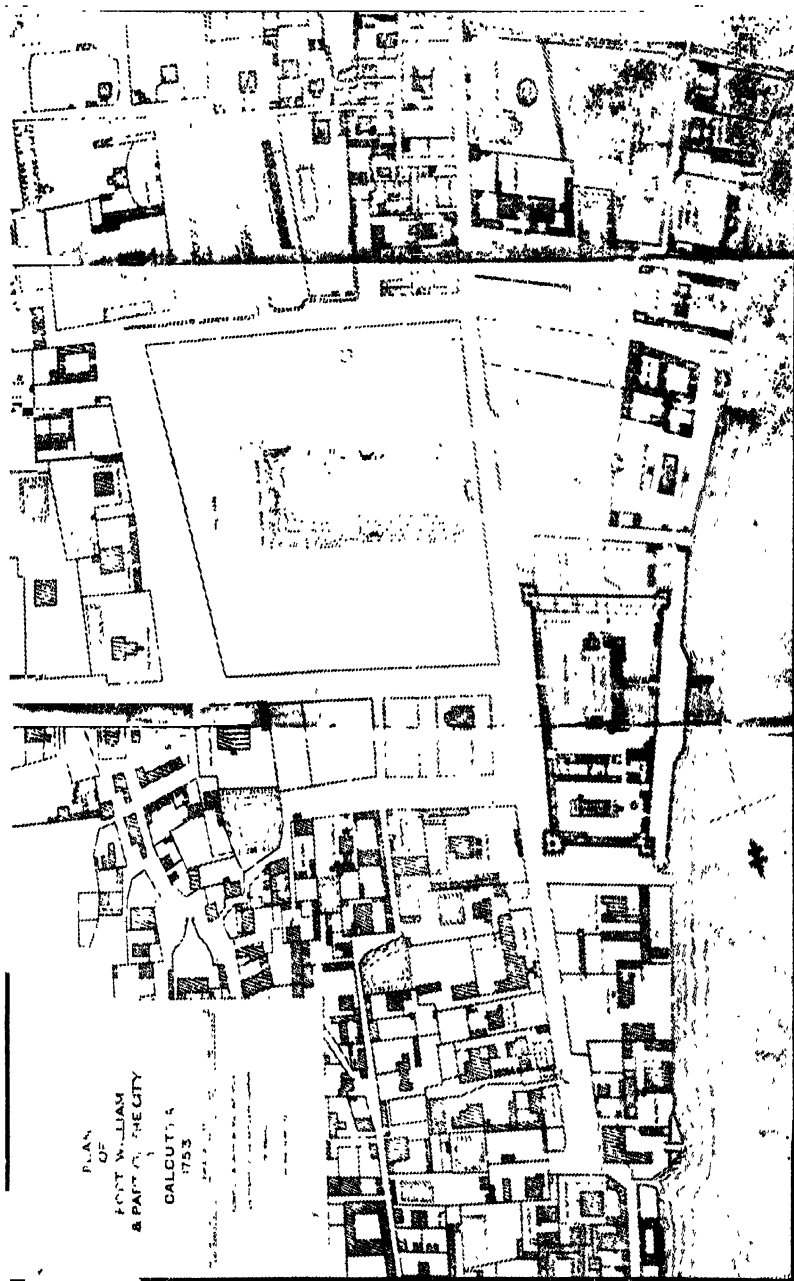
১৩৫৭ খ্রীঃ র ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ও কলিকাতা শহরের নক্শা

দের মেয়াদ শেষ হইলে আমরা বুঝিতে পারিব, কোম্পানির কত ক্ষতি হইয়াছে। কোম্পানির অনেক কর্মচারী বেনামে-স্বনামে কতকগুলি পরগনা জমা লইয়াছেন। তাহাদের অধীনস্থ দেশীয় কর্মচারীরাই এইরূপ বেনামীর প্রধান উপলক্ষ। কিন্তু লাভের অংশ দেশীয়গণই ভোগ করে। আমি শুনিয়াছি এই সমস্ত ইংরাজ কর্মচারী ও বেনিয়ানেরা আট আনা হইতে বার আনা পর্যন্ত হারে কলিকাতার জমিসমূহ জমা লইয়াছে। কিন্তু অন্য প্রজাগণ সেই স্থলে ২।০ হইতে ২৸০ পর্যন্ত খাজনা দিয়া থাকে। আমি যেরূপ বিবরণ সংগ্রহ করিতেছি তাহাতে বোধ হয়, ভবিষ্যতে এই সমস্ত জমি খাসে আনিয়া পুনরায় বিলি করিলে, কোম্পানির জমিদারির আয় বাৎসরিক চোদ্দ পনর লক্ষ টাকা হইতে পারে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কোম্পানির নিজের কর্মচারিগণই তাঁহাদের প্রভুর এইরূপ সর্বনাশ করিতেছেন।"১

আমরা পূর্বে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। বহুকাল হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু লর্ড ক্লাইভের আমলে এ সম্বন্ধে একটা আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়। আট আনা করিয়া কলিকাতার জমির বিঘা বিলি এখনকার কালে এক অদ্ভুত ঘটনা।

রায়তের উপর কোম্পানির দয়া

মহারাজ নবকৃষ্ণ ও গোকুল মিত্র উভয়ে মিলিয়া ১৭৬৭ খৃীস্টাব্দে চব্বিশ পরগনা ও খাস কলিকাতা ও ডিহি কলিকাতার জমিগুলি বাৎসরিক তের লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার অঙ্গীকারে কোম্পানি বাহাদুরের নিকট জমা লইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু গবর্ণর ও কাউন্সিল ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা এই, "দেশের মধ্যে নবকৃষ্ণের অবস্থা ও ক্ষমতা আজকাল যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে ও তাঁহার সহযোগী গোকুলকে প্রস্তাবিত শর্তানুসারে জমি জমা দেওয়া যাইতে পারে না। এরূপ করিলে রায়তেরা অত্যাচার ভয়ে ভীত হইবে। কোন দেশীয় ব্যক্তিকেই অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিত নহে। এইজন্য নবকৃষ্ণ ও গোকুলকে এই জমিসমূহ জমা দেওয়ার প্রস্তাব আদৌ গ্রহণীয় নহে। এই সমস্ত জমি, জমা দিবার জন্য, সাধারণভাবে নোটিশ জারি হউক।"

বাৎসরিক তের লক্ষ টাকা রাজস্ব দানের কড়ার হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, মহারাজ নবকৃষ্ণের অবস্থা সেই সময়ে বড়ই উন্নত ছিল। কোম্পানির সেরেস্তায় 'গোকুল' শব্দটি মাত্র আছে, উপাধি নাই। সম্ভবত ইনি বাগবাজারের গোকুল মিত্র ও মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রতিবেশী। তৎকালে সমাজে ও রাজদ্বারে মহারাজ নবকৃষ্ণের যথেষ্ট সম্মান ছিল। অর্থবল ও লোকবল প্রভৃতি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। এজন্য পাছে এই অপরিমিত ক্ষমতাবান ব্যক্তির অধীনে থাকিলে প্রজাদের উপর খাজনা আদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ জুলুম জবরদস্তি হয়, কোম্পানি-বাহাদুর এই আশঙ্কায় তাঁহাদের জমি জমা দিতে চাহেন নাই।২

লর্ড ক্লাইভের সুপারিশে নবকৃষ্ণের উন্নতি

লর্ড ক্লাইভ মুন্সী নবকৃষ্ণকে কমিটির নিকট সুপারিশ করিতেছেন, "নবকৃষ্ণ অতিশয় পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী কর্মচারী বলিয়া তাঁহাকে মাসিক দুই শত টাকা বেতনে কোম্পানির 'পলিটিক্যাল-বেনিয়ান' পদে নিযুক্ত করা গেল।"৩

ইহার পূর্বে নবকৃষ্ণ লর্ড ক্লাইভের মুন্সী ও পারসী বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মগের মুল্লুক

'এটা মগের মুল্লুক নাকি' বলিয়া একটা জনপ্রবাদ আজও কলিকাতায় প্রচলিত আছে। কোনরূপ

১. *Proceedings of the Council, dated 19th January 1767.*
২. *Proceedings, dated 20th August 1767.*
৩. *Select Committee's Proceedings, dated 16th January 1767.*

অন্যায় অত্যাচার দেখিলে লোকে এই কথাই বলিয়া থাকে। এই জনপ্রবাদের কারণ আর কিছুই নয়, মগদস্যুরা এক সময়ে কলিকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করিয়াছিল। এই মগেরা চট্টগ্রাম ও বর্মার সীমান্তবাসী দস্যু-সম্প্রদায়। নদীগর্ভে বাণিজ্যদ্রব্যাদি লুণ্ঠন, লোকজনকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া নদীবক্ষে ডাকাতি প্রভৃতি মগদিগের জীবনের লক্ষ্য ছিল। কলিকাতার কর্তাদেরও অনেক সময় এই মগদিগের কথা ভাবিতে হইত। পর্টুগীজগণ চিরদিনই 'বোম্বেটে' বলিয়া বিখ্যাত। মগেরা এই পর্টুগীজদিগকে তাহাদের দলে লইয়া বাঙ্গলার নানা স্থানে নদীবক্ষে লুটপাট করিয়া বেড়াইত। কখনও বা তাহারা তীরে নামিয়া বাটি-ঘর-দ্বার জবালাইয়া দিত, গ্রামকে গ্রাম ভস্মসাৎ করিত, ছেলেমেয়েদের ধরিয়া লইয়া যাইত। এই সমস্ত আরাকানী মগদস্যুদের উৎপাতে এক সময়ে কলিকাতাবাসীদের পর্যন্ত উত্যক্ত হইতে হইয়াছিল। সুন্দরবন, ঢাকা, ২৪ পরগনা, প্রভৃতি বিভাগের নদীর মধ্যে মগদস্যুগণ অবাধে বিচরণ করিত। নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাদের শাসন করিতে পারেন নাই। মগেরা প্রতি বৎসর এক একটি নির্দিষ্ট সময়ে, এক একটি দেশে দেখা দিত। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির পুরাতন কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কর্তৃপক্ষীয়গণ এই মগদস্যুদের দমনের জন্য নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতেছেন।

বর্তমান অধ্যায়ে প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহা কোম্পানি-বাহাদুরের কলিকাতা-কাউন্সিলের প্রোসিডিংস ও বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারদের পত্রের অংশ বিশেষ গৃহীত। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধীয় কুড়ি বৎসরের নানা বিষয়ক ঘটনার কথা এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভবিষ্যতে পরবর্তী বৎসরসমূহের ঘটনা আলোচিত হইবে।
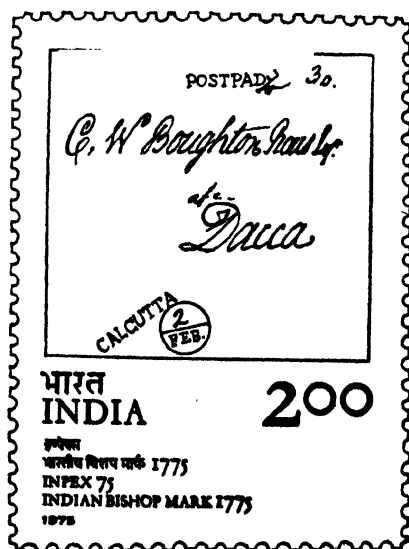
একবিংশ অধ্যায়

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের কথা

ওয়ারেন হেস্টিংস—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ইংরাজাধিকারের প্রথম গবর্ণর জেনারেল—হেস্টিংসের সহায়তার জন্য বিলাত হইতে কাউন্সিলের মেম্বরগণের নিয়োগ—নূতন মন্ত্রণা-সভার সভ্য, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস্, জেনারেল ক্লেভারিং, বারওয়েল ও কর্নেল মনসন্—সুপ্রীম-কোর্টের প্রথম চিফজস্টিস্ ইম্পি—বিলাত হইতে সভ্যগণের এদেশে আগমন ও চাঁদপাল-ঘাটের অবতরণ ঘটনা—তোপধ্বনির ব্যাপারে গোলমালের সূচনা—কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত হেস্টিংসের মনোবাদ—নন্দকুমারের ঘটনা—হেস্টিংস সম্বন্ধে নানা কথা—হেস্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ—আলিপুরের ডুয়েল এভেনিউ—হেস্টিংসের আলিপুরে বাস—হেস্টিংস-হাউস—নবাব মীরজাফরের আলিপুরে বাস—হেস্টিংসের বাগানবাটি ও সম্পত্তি বিক্রয়—হেস্টিংসের আমলে ও তাহার পরবর্তী কালে কলিকাতা সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা—কলিকাতায় পর্টুগীজ গোরার উৎপাত—বর্ষা সমাগমে ডাক চলাচল বন্ধ—সিমুলিয়ায় খুন—লারকিন্স লেনে দারোয়ান খুন—হেস্টিংসের উপর তাঁহার নিয়োগকর্তা ডিরেক্টরদের সহানুভূতি—বজরাডুবি ও সাহেবের মৃত্যু—সেকালের ডাকঘরের মাশুল খরচের কথা—দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মৃত্যু—সেকালের গাড়ি-ঘোড়া—সেকালের বেঙ্গল ব্যাঙ্ক—চীনে জেলে—ক্রীতদাস চুরি—স্থলপথে ডাক-গাড়ির খরচা—নোটের প্রথম প্রচলন—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রামকান্ত মুন্সীর বাটিতে চুরি—বজরা ও নৌকার ভাড়া—সেকালের লাট-বাড়ির কথা—হারমোনিক ট্যাভার্ণ—সেকালের সতী-দাহের একটি ভীষণ দৃশ্য—এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা—কলিকাতা চীনে-বাজারে চোরের আড্ডা—সেকালের ফ্যান্সি-ড্রেস বল—ময়দানে প্রথম বেলুন-বাজী—হেস্টিংসের মালামাল বিক্রয়—গাড়িওয়ালা স্টুয়ার্ট কোম্পানি—ঘোড়ার দানার কারখানা—সেকালের মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থা—১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ৩১টি থানার নাম—ইংরাজ-সন্তানগণের জন্য প্রথম বিদ্যালয়—বাঘ-বিক্রয়—পলাতক ক্রীতদাস—ভগবদ্‌গীতা বিক্রয়—বিলাতে গীতার প্রথম মুদ্রাঙ্কন—গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের মৃত্যু—সেকালের পর্বাদি উপলক্ষে সরকারি অফিসের ছুটি—কলিকাতায় মালাই, ম্যানিলা ও কাফ্রি গুণ্ডার উৎপাত—অহল্যা বাইয়ের গয়ায় মন্দির-প্রতিষ্ঠা—বর্দ্ধমানে দামোদরের মহাবন্যা (১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ)—সেকালের গঙ্গাতীরের ঘাটসমূহের নাম।

ধরিতে গেলে পলাশী যুদ্ধের পরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রকারান্তরে বঙ্গদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর মীরজাফর, মীরকাশেম প্রভৃতি যে সমস্ত নবাব বাঙ্গলার মস্‌নদে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই ইংরাজের সহায়তায় বাঙ্গলার সিংহাসন পাইয়াছিলেন। ক্লাইভ সহায় না থাকিলে মীরজাফর দুই এক মাসও রাজত্ব করিতে পারিতেন না। মীরকাশেম ধরিতে গেলে, বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁহার স্বাধীন প্রকৃতি, প্রজাপ্রীতি ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য ইংরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। ইহার ফলে মীরকাশেমের বাঙ্গলা ত্যাগ করিয়া পলায়ন, পাটনার হত্যাকাণ্ড, আর বঙ্গের শাসনতন্ত্রের ঘোরতর পরিবর্তন। এ সমস্ত ঘটনা, বাঙ্গলার সুবৃহৎ ইতিহাসে বর্ণিত আছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই সেসব কথা জানেন, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

বাঙ্গলার দেওয়ানী-সনন্দ লাভ করিয়া, ইংরাজের অবস্থা নূতন দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

ধরিতে গেলে, তখন ইংরাজ-কোম্পানিই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার মালিক। রাজস্ব-বিভাগের কর্তৃত্ব তাঁহাদের হস্তে। নবাব তাঁহাদের বাহুবলে সুরক্ষিত ও সকল বিষয়েই মুখাপেক্ষী।

পলাশী-রণপ্রাঙ্গনে, সমর-প্রতিভার বিকাশ করিয়া, বঙ্গে ইংরাজাধিকারের ভিত্তিস্থাপন করিয়া লর্ড ক্লাইভ[১] যথাসময়ে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। এখানে রহিল তাঁহার কীর্তি ও যশগৌরব, বাঙ্গলার ভাগ্য পরিবর্তন, রাষ্ট্র-বিভাগে বিশৃঙ্খলা, আর সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া ইংরাজের সমর-শক্তি ও বাহুবলের উদ্দাম প্রতিধ্বনি। এ ভীষণ প্রতিধ্বনি শুনিয়া দিল্লীর হীনতেজ সম্রাট পর্যন্ত বিচলিত হইলেন।

কিন্তু সমগ্র বঙ্গ ব্যাপিয়া তখন সকল বিষয়েই একটা বিশৃঙ্খলভাব। নবাব ও ইংরাজ-কোম্পানি উভয়েই দেশের শাসনকর্তা। রাজস্ব আদায়ে মহা বিশৃঙ্খলা। বিলাতের কর্তাদের কানে এই সব বিশৃঙ্খলার কথা পৌঁছিল। তাঁহারা এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার প্রতিকারার্থে ওয়ারেন হেস্টিংস-কে বাঙ্গলার গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করিলেন। বঙ্গে ইংরাজাধিকার প্রতিষ্ঠার পর হেস্টিংসই প্রথম গবর্ণর-জেনারেল। বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা হেস্টিংসের বেতন ধার্য হইল। তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রণা-সভাও স্থাপিত হইল। এই মন্ত্রণা-সভার কয়েকজন সভ্য বিলাত হইতে প্রেরিত হইলেন। বিচার-বিভাগে সুশৃঙ্খলা আনয়নের জন্য কলিকাতায় সর্বপ্রথম সুপ্রীম-কোর্ট বা প্রধান বিচারালয় স্থাপিত হইল। এই সুপ্রীমকোর্টের জন্য একজন চিফ্-জাস্টিস ও তিনজন 'পিউনি' বা সহকারী জজ নিযুক্ত হইলেন।

হেস্টিংস এ দেশে থাকিয়া এই সমস্ত পরিবর্তনের সংবাদ পাইলেন। তাঁহার সহকারী ও মন্ত্রণা-সভার সভ্যগণের মধ্যে বারওয়েল সাহেবই এ দেশে ছিলেন। অপর তিনজন অর্থাৎ স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস, জেনারেল জন্ ক্লেভারিং ও কর্নেল জর্জ মন্সন্ বিলাত হইতে আসেন। অপর একখানি জাহাজে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পি ভারতে যাত্রা করেন।

কাউন্সিলের সদস্য ও জজেরা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় উপস্থিত হন। যাহা আজকাল 'চাঁদপাল-ঘাট' বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা সেই ঘাটেই অবতরণ করেন। তাঁহাদের সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ প্রাকার হইতে তোপধ্বনি হয়। এই তোপধ্বনির সংখ্যা কম হইয়াছিল বলিয়া ফ্রান্সিস-প্রমুখ সদস্যগণ অপমানিত বোধ করেন ও তাঁহাদের মনে একটা অভিমান জন্মে। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, "তবে কি আমরা গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অপেক্ষা পদ-গৌরবে ছোট ! তিনি তাঁহার সম্মান স্বরূপ যে তোপধ্বনি পান, আমাদের তাহা দেওয়া হইল না কেন ?"

ধরিতে গেলে চাঁদপাল-ঘাটের এই অবতরণ ব্যাপার হইতে, হেস্টিংস ও তাঁহার সহযোগিগণের মধ্যে বিষম মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। এ মনোমালিন্য পরিশেষে কিরূপ ভয়ানক অবস্থায় পরিবর্ধিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ এস্থলে দেওয়া অসম্ভব। হেস্টিংসের দলে রহিলেন কেবল মাত্র বারওয়েল। কাউন্সিলের অপর তিনজন সদস্য প্রত্যেক কার্যেই হেস্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের মধ্যে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ স্যর ইলাইজা ইম্পি হেস্টিংসের প্রধান সহায় ছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার তখন দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক। তাঁহার ক্ষমতাও যথেষ্ট। ফ্রান্সিসের সহায়তা পাইয়া মহারাজ নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের সমক্ষে, তাঁহার নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করেন। ব্যাপারটি ক্রমে বড়ই সাংঘাতিক অবস্থায় উপস্থিত হইল। কিন্তু ঘটনাচক্রে মহারাজার নামে সুপ্রীমকোর্টে জাল করার এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মোকদ্দমার প্রধান বিচারক স্যর ইলাইজা ইম্পি ও তাঁহার সহযোগিগণ। ইম্পির বিচারে তৎকালে প্রচলিত

১. এই সময়ে, অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী ৪ বৎসর কাল পর্যন্ত ইনি লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল নামেই পরিচিত ছিলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লাভ করেন 'Baron of Plassey'র মর্যাদা। এই সময় হইতে তিনি লর্ড ক্লাইভ নামে পরিচিত হইলেন।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে মহারাজ নন্দকুমার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন।

নন্দকুমারের মোকদ্দমা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা, তাঁহার ফাঁসির দিনের[১] ঘটনা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা কথা পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন। বর্তমানে এইটুকু জানিয়া রাখুন, কলিকাতায় ইহাই প্রথম ব্রাহ্মণের ফাঁসি। এই ব্যাপার লইয়া তখন কলিকাতায় একটা মহা হুলুস্থুল উপস্থিত হয়। অনেক বাঙ্গালী এই শোচনীয় ঘটনায় মর্মাহত হইয়া, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর অপর পারে বাস উঠাইয়া লইয়া যান।

হেস্টিংসের প্রতিপক্ষ সহযোগিগণের মধ্যে, মন্‌সন্‌ সাহেব ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। কলিকাতায় আসিবার পর এক দিনও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যায় নাই। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি হুগলীতে যান ও সেই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনিয়া সমাহিত করা হয়। মন্‌সন্‌ সাহেবের পত্নীও স্বামীর অনুগামিনী হন। এই দম্পতির সমাধিস্তম্ভ, এখনও পার্কস্ট্রীটের পুরাতন গোরস্থানে বর্তমান। ইহার পর বৎসরে জেনারেল ক্লেভারিংও গতাসু হন।[২]

ক্লেভারিং ও মন্‌সন্‌-এর মৃত্যু হওয়ায় ফ্রান্সিস্‌ একা পড়িলেন। হেস্টিংসের ক্ষমতা পুনরায় বাড়িয়া উঠিল। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ইহার তিন বৎসর পরে ফ্রান্সিসও কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যান।[৩]

হেস্টিংসের আমলের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা, বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। এই সমস্ত ঘটনার পুনরবতারণা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সহযোগী সদস্যগণের মৃত্যুতে হেস্টিংস যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। বঙ্গের রাজস্ব ও বিচার-বিভাগ সম্বন্ধে, সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য-বৃদ্ধিকল্পে মনোযোগ প্রদান করেন। তাঁহার আমলের দুইটি কীর্তি এখনও অক্ষতভাবে দণ্ডায়মান। ইহাদের একটি বর্তমান সেণ্ট জন বা পাথুরিয়া-গির্জা—দ্বিতীয় এসিয়াটিক-সোসাইটি। সেণ্ট জন-গির্জা যে জমিতে অবস্থিত, তাহা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের জমি। হেস্টিংস চেষ্টা করিয়া নবকৃষ্ণের নিকট হইতে এই জমিটুকু অধিকার করিয়া গির্জা নির্মাণের জন্য প্রদান করেন। আজও তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এই জমি-দানপত্র উক্ত গির্জার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। এই দানপত্রে হেস্টিংস মহারাজ নবকৃষ্ণের ধর্মার্থে দান ও সৌজন্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। হেস্টিংসের চেষ্টায়, বর্তমান এসিয়াটিক-সোসাইটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এই সোসাইটি দ্বারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের কিরূপ সহায়তা হইয়াছে, তাহা সুধীমাত্রেই জানেন। সোসাইটির সদস্যগণ ওয়ারেন হেস্টিংসকে এই সভার মুরুব্বি বা 'পেট্রন' নির্বাচিত করেন। প্রাচ্য ভাষানুশীলনের উৎসাহ-দান কল্পে হেস্টিংস যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া-

১. নন্দকুমারের ফাঁসির তারিখ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট।

২. জেনারেল ক্লেভারিংএর মৃত্যু ঘটে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট।

সেকালের 'রোপ্-ওয়াক্' (আজকালকার মিশন রোর মধ্যে) যে বাটিতে বর্তমান পিগট চ্যাপম্যান কোম্পানির-অফিস আছে সেই বাটিতেই মনসন সাহেব বাস করিতেন। যে বাটিটি আজকাল জে টমাস কোম্পানির দখলে সেই বাটিতে জেনারেল ক্লেভারিংএর মৃত্যু হয়। এই দুইটি বাটির ভিত্তিগাত্রে লর্ড কার্জন দুইটি প্রস্তর-ফলক মারিয়া দিয়াছেন। স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস বর্তমান রয়েল-এক্সচেঞ্জের অধিকৃত বাটিতে বাস করিতেন। ফ্রান্সিসের পূর্বে লর্ড ক্লাইভ এই বাটিতে বাস করিয়া গিয়াছেন। বারওয়েল সাহেব খিদিরপুরে থাকিতেন। কলিকাতা সহরে তাঁহার আবাসস্থান কোন্‌টি ছিল তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। হেষ্টিংস সাহেব বর্তমান হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে বার্ণ কোম্পানির অধিকৃত বাটিতে বাস করিতেন।

৩. হেষ্টিংসের সহিত ফ্রান্সিসের কোন দিনই বনিবনাও হয় নাই। কাউন্সিলের এক অধিবেশনে ফ্রান্সিসের চরিত্র সম্বন্ধে হেষ্টিংস সাহেব কোন কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যে তিনি ফ্রান্সিসকে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলিয়া উল্লেখ করেন। এ অপমান বাক্য সহিতে না পারিয়া ফ্রান্সিস হেষ্টিংসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেন। বর্তমান জুওলজিকাল উদ্যানের বা আলিপুরের পশুশালার পশ্চাতে শাস্ত্রী-লাইনের মধ্য দিয়া যে দেবদারু-বৃক্ষ-শোভিত একটি বর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে ইহারই সান্নিধ্যে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। এইজন্য এই দেবদারু-কটক Duel Avenue নামে এখনও পরিচিত। এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ফ্রান্সিস হেষ্টিংসের গুলিতে আহত হন।

ছিলেন। তিনি নিজে উর্দু ও ফার্সী খুব ভালরূপে জানিতেন। সংস্কৃত জানিতেন কি না তাহা ঠিক জানি না। তাঁহার প্রস্তরমূর্তি যাহা এখন কলিকাতা টাউনহলে সুরক্ষিত,[১] তাহার এক পার্শ্বে একজন পণ্ডিত ও অপর পার্শ্বে একজন মৌলবীর প্রতিমূর্তি আছে। হেস্টিংসের অনুরোধে স্বনাম-খ্যাত স্যর উইলিয়াম জোন্স সাহেব এই এসিয়াটিক-সোসাইটি সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন।

হেস্টিংসের সহিত কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী আলিপুরের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। এই আলিপুরেই হেস্টিংস সাহেব বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বাস-ভবন আজও 'হেস্টিংস-হাউস'[২] নামে পরিচিত। এই বাড়িটি লর্ড কার্জনের চেষ্টায়, নবভাবে সংস্কৃত হইয়াছে। ইদানীং ইহা কলিকাতায় সমাগত ভারতীয় সামন্তরাজগণের আবাস বাটিরূপে পরিণত হইয়াছিল। হেস্টিংসের আমলের অনেক পুরাতন বৃক্ষ ইতিপূর্বে এই স্থানে দেখা যাইত। এখনও তাঁহার আমলের পুরাতন 'লেক' বা ঝিলটি বর্তমান।

কেবল হেস্টিংস নহেন, ফ্রান্সিসের স্মৃতির সহিতও এই আলিপুরের নাম বিজড়িত। নবাব মীরজাফরও বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের তিন বৎসর পরে যখন মীর-জাফর বাঙ্গলার মসনদ্ হইতে গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক অপসৃত হন এবং তাঁহার জামাতা মীর-কাশেম বাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত হন, সেই সময়ে বৃদ্ধ নবাব গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে আলিপুর আগমন করেন।

নবাব মীরজাফর আলিপুরের কোন্ স্থানে বাস করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে একটু মত বিভিন্নতা আছে। কেহ কেহ বলেন এগ্রিহর্টিকালচরাল সোসাইটির উদ্যানের অধিকৃত স্থানে তাঁহার প্রাসাদ ছিল, আর মণিবেগম বর্তমান জুলজিক্যাল-গার্ডেনের অধিকৃত স্থানে বাস করিতেন। আবার অন্য মতে, বর্তমান জজ-আদালত যেস্থানে, সেই স্থানেই বাঙ্গলার নবাব বাস করিতেন। পরে এই সমস্ত সম্পত্তি, তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে দান করিয়া যান।[৩] এই কথাই যেন প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়।

১৭৬৩ খৃস্টাব্দে মীরজাফর আবার বাঙ্গলার মসনদে বসেন। এই সময়ে আলিপুরের সম্পত্তি তাঁহার হস্তান্তরিত হয়। এ সম্পত্তি তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে দান করেন, কি হেস্টিংস নবাবের নিকট হইতে ইহা কিনিয়া লয়েন, তাহার কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইহার কয়েক মাস পরে আমরা দেখিতে পাই, "হেস্টিংস সাহেব কলিকাতা-বোর্ডের নিকট টলিস-নালার' উপর, কালিঘাটের সন্নিকটে, একটি পোল নির্মাণ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ এই স্থানে পোলটি নির্মিত হইলে তাঁহার বাগানবাটিতে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে।[৪]

আজকাল যাহা 'হেস্টিংস-হাউস' বলিয়া পরিচিত, তাহা হেস্টিংসেরই নির্মিত। তবে তখন

১. বর্তমানে এই প্রস্তর মূর্তিটি ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে সুরক্ষিত।

২. বর্তমানে হেস্টিংস হাউসের নাম পরিবর্তিত হইয়াছে, ইহা 'ভবানী ভবন' নামে পরিচিত রাজ্য সরকারের দপ্তর।

৩. মীরজাফর ক্লাইভের প্রতিও যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি ক্লাইভকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ এক লক্ষ সোনার মোহর পঞ্চাশ হাজার টাকার জহরত ইত্যাদি বাবত প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন। কারণ ক্লাইভের জন্যই তিনি বাঙ্গলার মসনদে বসিতে পান। তাঁহার দানপত্রের একাংশের ইংরাজী অনুবাদ এই, Three lacs and fifty thousand Rupees in money, fifty thousand rupees in Jewels and one lac in Gold Mohurs, in all five lacs of rupees in money and effects, to the light of my eyes, the Nabob firm in war, Lord Clive the Hero—"*Calcutta Past and Present* by Miss Blechynden." 2nd Impression, p. 80.

কিন্তু উদার-হৃদয় ক্লাইভ নবাব মীরজাফরের এ দান নিজে গ্রহণ করেন নাই। আহত সৈনিক ও তাহাদের বিধবাদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদের সাহায্য জন্য তিনি একটি ফাণ্ডের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন এবং নবাব-প্রদত্ত এই পাঁচ লক্ষ টাকা সেই ফাণ্ডে দান করেন।

৪. তখন টলিস নালা বা আদিগঙ্গা এত সংকীর্ণকায়া ছিল না। ইহার উপরে সেই সময়ে যে পোল নির্মিত হয় তাহা এখন নাই। কালীঘাটের গঙ্গা আদিগঙ্গা বলিয়া পরিচিত। বর্তমান পুল আধুনিক। হেস্টিংসের নির্মিত 'ঝোলা-পুল' আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। সেই পুল এক দিন সহসা ভাঙ্গিয়া পড়ায় বর্তমান পুল তৈয়ারি করা

ইহার এরূপ অবস্থা ছিল না। বর্তমানে আবার লর্ড কার্জন সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। হেস্টিংস-হাউসের বর্তমান বাটির সান্নিধ্যে আর একটি দ্বিতল বাটি ছিল। হেস্টিংস প্রথমে সেই বাটিতেই বাস করিতেন। পরে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বর্তমান সুবৃহৎ বাটিটি নির্মিত হয়।

১৭৮৫ খৃীস্টাব্দে কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, "ওল্ড-কোর্ট-হাউস স্ট্রীটে, মেসার্স উইলিয়াম ও লি অ্যাণ্ড কোম্পানি —আগামী ১০ই মে তারিখে (১৭৮৫) বঙ্গের গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের সম্পত্তির কয়েকটি অংশ প্রকাশ্য-নিলামে বিক্রয় করিবেন। ইহা তিনটি 'লটে' বা অংশে বিভক্ত হইয়াছে। ক্রেতাগণ ইচ্ছা করিলে উক্ত কোম্পানির অফিসে এই 'লট' বা বিভাজিত অংশগুলির নক্‌সা দেখিতে পাইবেন।"

লট নং ১—'প্যাডক গেটের সম্মুখের দিকে একটি বাড়ি। এই বাড়িতে একটি হল আছে। হলের চারিদিকে বারান্দা। এই বাটির সান্নিধ্যে দুইটি ছোট ছোট 'বাঙ্গলো' আছে। জমির পরিমাণ ৬৩ বিঘা। ইহার কতকাংশ তৃণাচ্ছাদিত জমি। বাকি অংশ নানাবিধ ফলন্ত বৃক্ষ-পরিপূর্ণ উদ্যান। বাগানের বৃক্ষগুলির অধিকাংশই ফলের গাছ। বাগানের সীমার মধ্যে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীও আছে।

লট নং ২—একটি দ্বিতল বাটি। প্রত্যেক তলেই একটি করিয়া সুবৃহৎ হল-কামরা। হল-কামরার পার্শ্বে দুইটি বড় বড় ঘর। প্রস্তর নির্মিত সিঁড়ি। মান্দ্রাজী-চুণে দেওয়ালগুলি চুণকাম করা। নীচের হল-কামরার পার্শ্বে চারিটি শয়নগৃহ। শয়নগৃহের পার্শ্বেই স্নানাগার। সমস্ত অট্টালিকাটি মান্দ্রাজী-চুণে 'পঙ্খের' কাজ করা। চৌদ্দটি ঘোড়া রাখিবার উপযুক্ত সুবৃহৎ আস্তা-বল ও চারিখানি কোচগাড়ি রাখিবার গৃহ। এই পাকা আস্তাবল ভিন্ন আরও একটি চালায় নির্মিত আস্তাবল আছে। শেষোক্ত আস্তাবলে বারটি ঘোড়া ও ছয়খানি গাড়ি রাখা যাইতে পারে। জমির পরিমাণ ৪৬ বিঘা।

লট নং ৩—প্যাডক-গেট সম্বলিত ৫২ বিঘা জমি। এই জমির চারিদিকে কাষ্ঠের রেলিং দেওয়া।

হেস্টিংস সাহেব বিলাতে তাঁহার পত্নীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহারও এক অংশে আছে, "আমার জমিজমা বাগান প্রভৃতি তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়া বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছি। পুরাতন বাটি ও তৎসংলগ্ন বাগান লইয়া একটি লট্‌ হইয়াছে। নূতন বাড়ি ও তাহার পার্শ্ববর্তী বহির্বাটিগুলি দ্বিতীয় লট্‌ হইয়াছে। প্যাডক-সম্বলিত জমিখণ্ড তৃতীয় লটে বিভক্ত। আমার সমস্ত অশ্বগুলিই আমি ইতিপূর্বে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি।

এই জমিগুলির অবস্থান স্থান নির্দেশে কোন গোলযোগই হয় না। আমরা পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই স্থানগুলি দেখিয়াছি। তখন যাহা দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহা নাই। পূর্বে যেস্থানে বহু বিঘাব্যাপী অ্যারারুট বাগান ছিল, এখন সেইস্থানে অসংখ্য অট্টালিকা দেখা দিয়াছে। বনজঙ্গল পূর্ণ উদ্যান ভূমি এক্ষণে আলিপুরের 'ছোট-চৌরঙ্গীতে' পরিণত হইয়াছে। বর্ত-মান জজকোর্টের সম্মুখবর্তী স্থানটি সম্পূর্ণরূপে অট্টালিকাশূন্য খালি জমি ছিল। এখানে তখন অ্যারারুটের চাষ হইত।

হেস্টিংসের এই সম্পত্তির প্রথম দুইটি লটের ক্রেতা মেসার্স টার্ণার ও জ্যাকসন। অ্যারা-রুট বাগানের প্লট হনিকুম্ব বলিয়া একজন সাহেব ক্রয় করেন। এই হনিকুম্ব সাহেব সেকালের সুপ্রীমকোর্টের একজন এ্যাটর্নি ছিলেন। ইহার পর ইহা স্পিড্‌ সাহেবের দখলে আসে। স্পিড্‌ সাহেব এইস্থানে অ্যারারুটের চাষ আরম্ভ করেন ও ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া দেন। তাঁহার আমলে ও তাহার পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইহা 'The Penn'—এই নামে পরিচিত ছিল। প্রস্তর-

হয়। অনেকে মনে করেন হেস্টিংসের নির্মিত পুলই বর্তমান জিরাট-ব্রিজ—যাহা বেলভেডিয়ার যাইবার পথের উপর সংস্থিত। কিন্তু জিরাট-ব্রিজ ইহার অনেক পরে নির্মিত হইয়াছিল।

গ্রন্থরচনার সময় অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা এখানে বলা হইয়াছে।

ফলক-মণ্ডিত 'পেনের' এই পুরাতন গেটটি আমরা দেখিয়াছি। এই পুস্তক মধ্যে অতি প্রাচীন এবং বর্তমানকালের এই হেস্টিংস-হাউসের দুইখানি চিত্র প্রদান করা হইল। গবর্ণর হেস্টিংস বেল-ভেডিয়ারে বাস করিতেন বলিয়া একটা জনপ্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহা অমূলক জনরব মাত্র।[১]

লর্ড ক্লাইভ, ভারতে ব্রিটিশাধিকারের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পরবর্তী গবর্ণরগণের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসই সেই ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করেন। দেশের মধ্যে "ডবল-গবর্ণমেণ্ট" অর্থাৎ নবাবী ও ইংরাজ শাসন দুইই প্রবর্তিত থাকায় মহা অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। হেস্টিংসের চেষ্টায় সে অনর্থের প্রতিকার হয়। রাজস্ব-সম্বন্ধে নানাবিধ সুব্যবস্থা প্রণোদিত হওয়ায় প্রজাগণ কোম্পানির অধীনে শান্তির সুখময় ক্রোড়ে বিরাজ করিতে থাকে। হেস্টিংসের একাধিপত্যের একান্ত বিরোধী স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৮০ খৃীস্টাব্দে বাঙ্গলা ছাড়িয়া চলিয়া যান। ইহার পরবর্তী পাঁচ বৎসর কাল হেস্টিংস স্বাধীনভাবে কার্য করিয়া বঙ্গদেশে ইংরাজ-শাসনের একটা স্থায়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। যে ইংরাজ কোম্পানি এতদিন ধরিয়া দেশীয় শাসনকর্তাদের হস্তে নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়া আপনাদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন—তখন তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা হইয়া উঠিলেন। ১৭৮৫ খৃীস্টাব্দে হেস্টিংস বঙ্গদেশের নিকট চির-বিদায় লইয়া বিলাত-যাত্রা করেন। কিন্তু হায় ! জীবনের শেষ অবস্থাতেও তিনি আদৌ সুখী হন নাই। পার্লামেণ্টের মহা-বিচারে দীর্ঘকাল ধরিয়া জড়িত থাকায় তাঁহার যথাসর্বস্ব নষ্ট হইয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের 'ইম্‌পিচ্‌মেণ্ট' বা মহা-বিচার সম্বন্ধীয় ঘটনা সুশিক্ষিত পাঠকের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ও পরবর্তীকালে প্রাচীন কলিকাতার সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথা (১৭৮৪ হইতে ১৭৯৭ পর্যন্ত)

১৭৮৪ খৃীস্টাব্দের মার্চ মাসে, কলিকাতা-গেজেট সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা তখনকার কালে আধা-সরকারি ও আধা সাধারণ সংবাদপত্র ছিল। পুরাতন কলিকাতা গেজেটের জীর্ণপত্র-গুলি অনুসন্ধান করিলে একশত ত্রিশ বৎসরের পূর্বের অনেক ঘটনা জানিতে পারা যায়। কাজেই আমরা ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৭ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত, প্রাচীন কলিকাতার এই একমাত্র সংবাদপত্রের জীর্ণপত্রগুলির মধ্য হইতে কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপারের সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। পাঠক ইহা হইতে ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁহার পরবর্তী আমলের অর্থাৎ একশত ত্রিশ বৎসরের পুরাতন কথা জানিতে পারিবেন। 'আইন-ই-আকবরী'র অনুবাদক, ফার্সীভাষাবিৎ, সুপ্রসিদ্ধ ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন[২] সাহেব সর্বপ্রথমে এই গেজেটের সম্পাদক পদে ব্রতী হন। ধরিতে গেলে ইহাই প্রাচীন কলিকাতার প্রথম সরকারি সংবাদপত্র।

কলিকাতায় পর্টুগীজ গোরাদের উৎপাত

সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল সাহেবের নিকট গ্র্যাণ্ডজুরির একখানি আবেদন পত্র পেঁাছিয়াছে। তাহার সারমর্ম এই, "পর্টুগীজ জাহাজের গোরাগণ সহরে নামিয়া নানাবিধ উৎপাত অত্যাচার করে। এজন্য আদেশ করা যাইতেছে, এই সকল জাহাজের অধ্যক্ষেরা, যেন নিম্নলিখিত আদেশটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পালন করেন। অর্থাৎ প্রাতঃকালে সাতটার পূর্বে কোন পর্টুগীজ মাঝি-মাল্লা সহরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সন্ধ্যা পাঁচটার পর সহর ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে জাহাজে উঠিতে হইবে। এই বিধানের লঙ্ঘন করিলে তাহারা সহরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

১. Dr. Busteed's letter to the Calcutta 'Englishman' dated 17th May, 1872.

২. ইনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ফার্সীর প্রথম অধ্যাপক। আইন-ই-আকবরী ছাড়া ইনি গুলিস্তানের অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তিনি History of Hindusthan রচনা করেন।
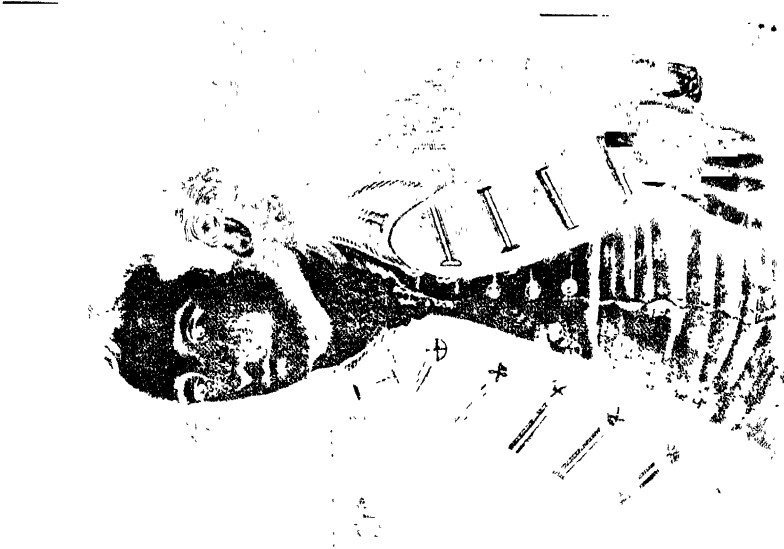
ওয়ারেন হেস্টিংস (যৌবনে)
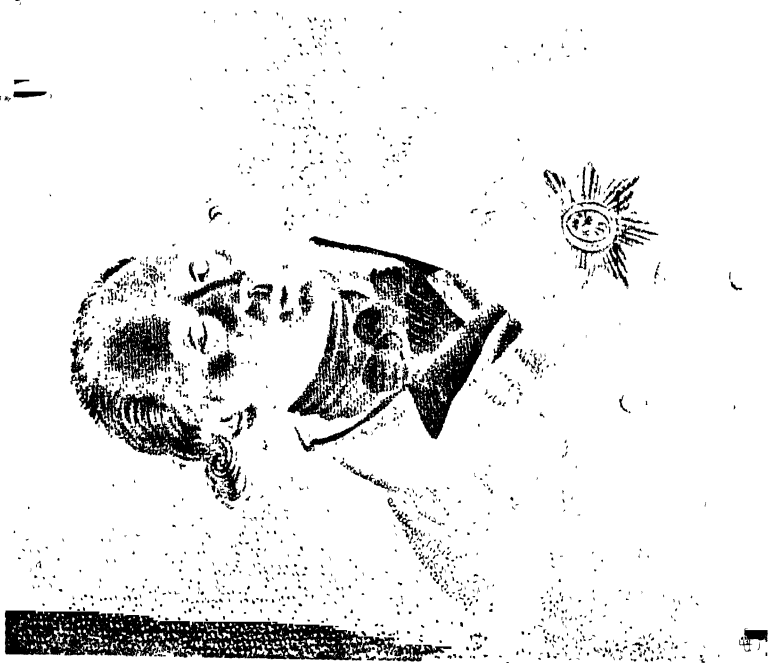
স্যার ফিলিপ্‌ ফ্রান্সিস্‌ (হেস্টিংসের কাউন্সিল সদস্য)

রিচার্ড বারওয়েল (হেস্টিংসের মন্ত্রীসভার সদস্য)

স্যর জন ক্লেভারিং (হেস্টিংসের কাউন্সিল সদস্য)

কর্তৃক ধৃত হইয়া ফাটকে আবদ্ধ থাকিবে।"[১] (১১।৩।১৭৮৪)

ডাকবন্দোবস্ত রহিত

"আগামী ৩০শে জুন হইতে অনারেবল কোম্পানি বাহাদুরের ডাকবেহারাগণ ডাকের কার্য বন্ধ করিবে।" (১০।৬।১৭৮৪)

তখন ডাক-বিভাগের কার্য প্রথম আরম্ভ হইয়াছে। ডাকের মাশুলে প্রভৃতি কিরূপ বেশী ছিল, কোন স্থান হইতে কত দিনে ডাক যাইত, তাহার পরিচয় পাঠক পরে পাইবেন। ডাকবেহারাদের চলাচল বন্ধ করিবার কারণ, বর্ষা সমাগমে পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষার সময়ে সেকালে ডাক-চলাচল বন্ধ থাকিত।

উক্ত বৎসর ৩০শে সেপ্টেম্বর এক সরকারি আদেশ প্রচারিত হয়, "আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কোম্পানি-বাহাদুরের ডাকবেহারাদ্বারা পুনরায় কার্য আরম্ভ করিবে।" এই আদেশ হইতে জানিতে পারা যায়, জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, এই চারিমাস ডাক-বিভাগের কার্য বন্ধ থাকিত।

সিমুলিয়ায় খুন

সিমুলিয়ায় হরিনারায়ণ শেঠ নামক এক ব্যক্তিকে কোন দুর্বৃত্ত অতি নিষ্ঠুর ভাবে খুন করিয়া গিয়াছে। দত্তরাম নাপিত বলিয়া একজনের উপর সন্দেহ হওয়ায় সকাউন্সিল গবর্ণর-জেনারেল আদেশ করিতেছেন, "যে ব্যক্তি উক্ত দত্তরামকে ধরিয়া সহরের বা মফঃস্বলের কোন আদালতে হাজির করিয়া দিতে পারিবে বা তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশ-অফিসে সংবাদ দিতে পারিবে, তাহাকে সকাউন্সিল গবর্ণর-জেনারেল সাহেব দুইশত সিক্কা টাকা পুরস্কার প্রদান করিবেন।" (২৮।৯।১৭৮৪)

গেজেটের মধ্যে নাম আছে 'সিমুলশা'। সম্ভবত এটি বানানের ভ্রম-প্রমাদ। সেকালে সহরের মধ্যে বা আগে পাশে সিমুলিয়া ব্যতীত সিমুলশা নামের কোন স্থান ছিল না। এই সরকারি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায়, সেকালের খুনের পুরস্কার ঘোষণা পুলিশ হইতে না হইয়া, গবর্ণর-জেনারেল সাহেবের দপ্তর হইতেই হইত।

দারোয়ান খুন

গত রাত্রের প্রভাতে, মার্টিন সাহেবের দারোয়ানকে কে অতি নৃশংস ভাবে খুন করিয়া গিয়াছে। সাহেবের বেহারারা, কাজকর্ম সারিয়া প্রথম প্রহরের পর সাহেবের কুঠি ত্যাগ করে। এই সময়ে দারোয়ান তাহাদের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। সাহেবের সর্দার-বেহারা সাহেবের নিকট দ্বিতলেই ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কোন প্রয়োজনে সহসা নীচে আসায় সর্দার-বেহারা দেখিতে পায়, মেঝের উপর রক্তের চিহ্ন রহিয়াছে। আর, দারোয়ানের ঘর হইতেই সেই রক্তস্রোত বাহির হইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া ভয় পাইয়া, সে খিদমতগার[২] ও হুঁকাবরদারকে[৩] জাগাইয়া, এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখে যে, দারোয়ানের গলা সম্পূর্ণরূপে কাটা। আর তাহা হইতেই এই রক্তধারা বাহির হইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই, দারোয়ান যে গৃহে থাকিত, তাহার ঠিক উপরের ঘরেই মার্টিন সাহেব ছিলেন। তিনিও কোনরূপ ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনেন নাই। দারোয়ান যে আত্মহত্যা করিয়াছে তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অথচ অন্য কোনও ব্যক্তির উপর এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কোনরূপ সন্দেহও হইতেছে না। (৮।৪।১৭৮৪)

---

১. প্রত্যেক বিষয়ের শেষে বন্ধনীর মধ্যে যে তারিখ ও বৎসর আছে তাহাই সেকালের গেজেটের তারিখ। পাঠক উল্লিখিত আদেশ হইতে দেখিতে পাইবেন, কলিকাতা সহরে তখন একজন পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্টই সহর-কোতোয়ালির কর্তা ছিলেন।

২. খিদমতগার—"The Anglo-Indian use is peculiar to the Bengal Presidency, where the word is habitually applied to a Musulman servant whose duties are connected with serving meals and waiting at the table under the Consumah, if there be one".—*Hobson-Jobson*, New Ed. p. 486.

৩. হুঁকাবরদার—"the servant whose duty it was to attend to his master's *hooka*, and who considered that duty sufficient to occupy his time.—*Hobson-Jobson*, New Ed. p.424.

মারকিন্স লেনে এই হত্যাকাণ্ড হয়। সে সময়েও যে হুঁকাবরদারগণ সাহেবদের বাটিতেই থাকিত ও রাত্রিকালে প্রচুর তামাকু সাজিত, তাহাও এই ঘটনা হইতে জানা যায়।

হেস্টিংস ও তাঁহার নিয়োগকর্তাগণ

গত নভেম্বর মাসে বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টার সভা, সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল (মিঃ হেস্টিংসকে) ধন্যবাদ দিয়া ও তাঁহার কৃতকার্যসমূহের পোষকতা করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছেন— যতদিন পর্যন্ত না বাঙ্গলার ও ভারতীয় ইংরাজাধিকারসমূহে পূর্ণশান্তি স্থাপিত হয়, ততদিন তিনি যেন পদত্যাগ না করেন। (২৪।৬।১৭৮৪)

বজরা-ডুবি ও সাহেবের মৃত্যু

মার্টিন সাহেব তাঁহার বজরা করিয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে যাত্রা করেন। তখন ভোর পাঁচটা। একে ভোরের অন্ধকার, আবার তাহার উপর চারিদিকে কুয়াসা। সাহেব মাঝিদিগকে নিষেধ করেন, তাহারা যেন খুব সাবধানে জাহাজের পথ ছাড়িয়া ফাঁকা পথে নৌকা চালায়। কিন্তু দাঁড়িমাঝিরা তাঁহার উপদেশমত কার্য না করায় বজরা উলটাইয়া যায়। মার্টিন সাহেব বজরার মধ্যে ছিলেন। তাঁহার নিকট তাঁহার হেড্-বেহারাও ছিল। বজরা-ডুবির পর বেহারা ও সাহেব দুই জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মার্টিন সাহেবের মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও পাওয়া যায় নাই। বেহারার মৃতদেহ হোয়েলার সাহেবের বাগানের ঘাটে পাওয়া গিয়াছে। নৌকার দাঁড়িমাঝিরা সকলেই নিরুদ্দেশ। (১৬।৯।১৭৮৪)

দ্বন্দ্বযুদ্ধে মৃত্যু

গত শনিবার প্রাতে লেফ্‌টেনাণ্ট হোয়াইটের মৃত্যু হইয়াছে। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় তিনি একটি দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন ও দুর্ভাগ্যক্রমে আততায়ীর গুলিদ্বারা আহত হন। এই আঘাতের ফলেই তাঁহার জীবন বায়ু দেহত্যাগ করিয়াছে। (২৭।৭।১৭৮৪)

গবর্ণর জেনারেল হেস্টিংসের সহিতই যে তাঁহার কাউন্সিলের সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে। সেকালের এই নিয়ম ছিল, প্রকাশ্যে বা অপর কাহারও কাছে কেহ কাহাকে কোনরূপ অপমানকর বা নিন্দাসূচক কথা বলিলে নিন্দিত ও অপমানিত ব্যক্তি তাঁহার আততায়ীর সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। তরবারি এবং অধিকাংশ স্থলে পিস্তল লইয়া এই যুদ্ধ হইত। এই যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের নির্বাচিত এক একজন সহকারী বা Second থাকিতেন। ইহাঁরা দেখিতেন, যুদ্ধার্থিগণের মধ্যে কেহ কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার করিতেছেন কিনা। এই ব্যাপারে যে-কোন পক্ষ আহত হইতেন, তাঁহার দলের লোক তখনই তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া আসিতেন। তখনকার আইনে এরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধ-প্রথা দূষণীয় ছিল না।

আলিপুরে গবর্ণর হেস্টিংসের সহিত যখন তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়, তখন কর্নেল পিয়ার্স হেস্টিংসের 'সেকেণ্ড' বা সহকারী ছিলেন। কর্নেল ওয়াটসন ফ্রান্সিস সাহেবের সহায়তা করেন। এই কর্নেল ওয়াটসন[১] কোম্পানি-বাহাদুরের সেনাবিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। খিদিরপুরের গবর্ণমেণ্ট ডক্‌ইয়ার্ড ইহাঁরই প্রতিষ্ঠিত। খিদিরপুরে তিনি একটি বাজার বা গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বাজার আজও 'ওয়াটগঞ্জ' বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

সেকালের গাড়ি-ঘোড়া

একটি ফিটন, একটি চার-স্প্রিংওয়ালা বগী, আর একখানি দুই স্প্রিংওয়ালা বগী, একখানি সুন্দর পাল্কি (Lady's Palanquin) রাধাবাজারে মিঃ ম্যানের দোকানে বিক্রয়ার্থে মজুত আছে। এই মালগুলি সমস্তই নূতন।

১. Col. Henry Watson joined E. I. Company's service at Calcutta, 1764 ; Field Engineer and commanded the troops : Chief Engineer, 1765 : Commenced docks at Calcutta . . . built vessels and commenced docks at Kidderpur, near Calcutta.—C. E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography* p. 447.

এই বিজ্ঞাপন হইতে দেখা যায়, তখনকার দিনে বগী, চিরেট ও পাল্কির ব্যবহারাদি বেশী ছিল।

সেকালের বেঙ্গল ব্যাঙ্ক

সেকালে (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতার একটি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমান বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, তাহারই উত্তরাধিকারী কি না তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তখন টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধে অনেক ইংরাজ-সেনা টিপুর হস্তে বন্দী হয়। টিপু পরিশেষে তাহাদের স্বাধীনতা দান করেন। এই যুদ্ধে যাহারা মরিয়া গিয়াছিল, তাহাদের পরিবারবর্গের ও সেনাগণের সাহায্যার্থে একটি চাঁদার ভাণ্ডার খোলা হয়। সমস্ত চাঁদার টাকা 'বেঙ্গল ব্যাঙ্কে' গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল ও এই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক গৃহে চাঁদাদাতাগণের সভা হইয়াছিল। (২৭।৫।১৭৮৪)

সেকালের ডাকঘরের কথা

বৃহস্পতিবার (২রা ডিসেম্বর ১৭৮৪)।

কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহের মধ্যে ডাকের খরচা।

স্থানের নাম	২॥ সিক্কা টাকা ওজনের চিঠি মাশুলের হার	২॥ ও তদূর্ধ্ব সিক্কা টাকার ওজন মাশুলের হার	২॥ হইতে ৪॥ সিক্কা ওজন মাশুলের হার	৪॥ হইতে ৫॥ পর্যন্ত মাশুলের হার	৫॥ হইতে ৬॥ পর্যন্ত মাশুলের হার
বারাকপুর	/০ আনা	৵০ আনা	৶০ আনা	।০ আনা	।/০ আনা
হুগলী	/০ ,,	৵০ ,,	৶০ ,,	।০ ,,	।/০ ,,
চন্দননগর	/০ ,,	৵০ ,,	৶০ ,,	।০ ,,	।/০ ,,
বর্ধমান	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ ,,	॥৵০ ,,
মুরশিদাবাদ	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ ,,	॥৵০ ,,
রাজমহল	৶০ ,,	।৵০ ,,	॥/০ ,,	৸০ ,,	৸৶০ ,,
ভাগলপুর	৶০ ,,	।৵০ ,,	॥/০ ,,	৸০ ,,	৸৶০ ,,
দিনাজপুর	।০ ,,	॥০ ,,	৸০ ,,	১ টাকা	১।০ টাকা
মুঙ্গের	।০ ,,	॥০ ,,	৸০ ,	১ টাকা	১।০ টাকা
পাটনা	।/০ ,,	॥৵ ,,	৸৶০ ,,	১।০ টাকা	১॥/০ টাকা
বক্সার	।৵০ ,,	৸০ ,,	১৵০ ,,	১॥০ টাকা	১৸৵০ টাকা
বারাণসী	।৶০ ,,	৸৵০ ,,	১।/০ ,,	১৸০ টাকা	২৶০ টাকা
রাজাপুর	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ আনা	॥৵০ আনা
ঢাকা	৶০ ,,	।৵০ ,,	/০ ,,	৸০ ,,	৸৶০ আনা
চট্টগ্রাম	।৵০ ,,	৸০ ,,	১৵০ ,,	১॥০ টাকা	১৸০ টাকা
কুলপী	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ আনা	॥৵০ আনা
মেদিনীপুর	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ ,,	॥৵০ ,,
বালেশ্বর	৵০ ,,	।০ ,,	।৵০ ,,	॥০ ,,	॥৵০ ,,
কটক	৶০ ,,	।৵০ ,,	॥/০ ,,	৸০ ,,	৸৶০ ,,
গঞ্জাম	।/০ ,,	॥৵০ ,,	৸০ ,,	১।০ টাকা	১॥/০ টাকা

সাধারণকে নোটিস দেওয়া যাইতেছে যে, সাড়ে নয় ইঞ্চি লম্বা ও চার ইঞ্চি চওড়ার অতিরিক্ত আয়তনের পত্র আগামী ৩০ নভেম্বরের পর হইতে প্রতিদিন আর লওয়া হইবে না। সোমবার ও বৃহস্পতিবার রাত্রে কেবল এইরূপ পত্র লওয়া হইবে। ইহার অতিরিক্ত ওজনের পত্র ও পার্শেল ডাকে প্রেরিত না হইয়া বাঙ্গিতে যাইবে।

জেনারেল পোস্ট অফিস
(২০ নভেম্বর ১৭৮৪।)

সি কক্‌রেল
পোস্টমাস্টার-জেনারেল।

পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন, সেকালে ভারতের নানাস্থানে পত্র-প্রেরণের

কিরূপ ব্যয় ছিল। কোন্ বৎসরে কলিকাতায় জেনারেল পোস্টাফিস প্রথম স্থাপিত হয়, তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ও পলাশী সমরের সাতাশ বৎসর পরে যে বঙ্গদেশে একটি জেনারেল পোস্টাফিস ও একজন পোস্টমাস্টার জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ উল্লিখিত নোটিস হইতে পাওয়া যাইতেছে।

চীনে জেলে

জেলেই বলুন, আর যাহাই বলুন—টম ফ্যাট্ বলিয়া একজন চীনাম্যান ১৭৮৪ খৃীস্টাব্দে কলিকাতায় এক দোকান স্থাপন করে। শালকিয়াতে তাহার একটি 'রমের' (মদ্যবিশেষ) কারখানাও ছিল। টম ফ্যাট্ বিজ্ঞাপন দিতেছে, "টম ফ্যাট্ চীনাম্যান, কলিকাতার ভদ্র মহাশয়গণকে জানাইতেছে, কলিকাতায় ও উপনগরে যাঁহাদের বাগান ও পুষ্করিণী আছে, তাঁহারা টমের দ্বারা অল্প খরচে যথেষ্ট উপকার পাইবেন। পুকুরের পানা-তোলা, পুকুর পরিষ্কার-করা, পুকুরের জল সেঁচিয়া ফেলা প্রভৃতি কার্য স্বল্পব্যয়ে শীঘ্র সম্পন্ন করা হয়। এদেশের মজুরেরা যে সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করিবে, টম তাহার চীনা-দমকলের সাহায্যে তদপেক্ষা অতি অল্প সময়েই সে কাজ করিয়া দিবে। এজন্য তাহার কলিকাতার ও শালিকার কার্যালয়ে আবেদন করুন। সাধারণে জানিয়া রাখুন—টমের রম মদ্য বড় মজাদার। টমের কারখানায় তৈয়ারি দানাদার, চীনে চিনি ও মিছরি অতি উপাদেয়। এতদ্ব্যতীত এখানে ছুতারের কাজও হইয়া থাকে। (৪।৩।১৭৮৪)

কিন্তু এই টম ফ্যাটকে বেশী দিন কারবার করিতে হয় নাই। ১৭৮৪ খৃীস্টাব্দে একটি নিলামের ইস্তাহার হইতে দেখা যায়, "টম ফ্যাটের শালকিয়া চোলাই-খানার দশহাজার গ্যালন রম কতকগুলি কামারের ও ছুতারের যন্ত্র, শিশু ও শালের তক্তা, দানাদার চিনি ও মিছরির কুদা, মিঃ বন্‌ফিল্ড কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবে।" বোধ হয়, এই চীনেম্যানের মৃত্যু হওয়াতেই তাহার কারবারটি নিলামে চড়ে। (১০।৬।১৭৮৪)

কলিকাতার প্রথম সাহেবী হোটেল

হারমোনিক ট্যাভার্নের প্রধান পাচক ট্রেন হোম কলিকাতাবাসী ভদ্র নরনারীগণকে জানাইতেছে যে, সে ব্যক্তি কসাইটোলা বাজারে একটি হোটেল খুলিয়াছে। ভদ্রলোকের উপযোগী ডিনার, সাপার, ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি সবই সুন্দররূপে সরবরাহ করা হয়। সকল রকমের বিস্কুটও পাওয়া যায়। হাঁস, মুরগী, পায়রা প্রভৃতিও নিত্য পাওয়া যায়। (৬।৫।১৭৮৪)

ক্রীতদাস চুরি

"উইল্‌ক্ নামক এক মালয়-দেশীয় ক্রীতদাস ময়দাপুরে তাহার প্রভুর বাটি হইতে পলাইয়া গিয়াছে। সেই পলাতকের বিবরণ এই—তাহার মাথায় চুলগুলি বড় বড়। সে সামান্যরূপ ইংরাজী জানে। পলায়নের সময়, তাহার পরিধানে পেণ্টুলান, একটি সাদা কামিজ ছিল। ওয়েস্টকোট, টুপি বা জুতা পরিয়া সে যায় নাই। সম্ভবত সে কালকাপুরে লুকাইয়া আছে, অথবা কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। বেশী দূরে যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়, কারণ সে মোটে চারিমাস কাল বাঙ্গলাদেশে আছে। পথ ঘাট চেনে না। ভদ্র মহোদয়গণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, যদি উক্ত ক্রীতদাস তাঁহাদের কাহারও নিকট চাকরির জন্য যায়, তাহা হইলে তাহাকে আটক করিয়া আমাকে সংবাদ দিবেন।"

এই ময়দাপুর ফ্যাক্টরি মুরশিদাবাদ অঞ্চলে। সম্ভবত কোন ইংরাজের অধীনে এই ক্রীতদাস কাজ করিত। সেকালে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম-সহিষ্ণু দক্ষ ক্রীতদাসকে লোকে ফুসলাইয়া লইয়া যাইত। আবার কখনও বা তাহারা স্বেচ্ছায় পলায়ন করিত। হয়ত অনেক সময়ে প্রভুগণের দুর্ব্যবহারেও ইহারা পলাইয়া যাইত। প্রভুরাও টাকা দিয়া কিনিয়াছেন বলিয়া এইরূপ অপহৃত এবং নিরুদ্দিষ্ট ক্রীতদাসের সন্ধান করিতে ছাড়িতেন না। (১৭।৬।১৭৮৪)

চুনার হইতে লেফ্‌টেনাণ্ট ডুবয় ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বরের গেজেটে বিজ্ঞাপন দিতেছেন, "গত ১৫ই অক্টোবরে, দুইজন ক্রীতদাস চুনার হইতে পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের হাতের উপর উল্‌কিতে V. D. এই দুইটি অক্ষর চিহ্নিত আছে। তাহাদের নাম সাম ও টম। তাহাদের দুই জনেরই বয়স এগার কি বার। মালিকের কতকগুলি রূপার বাসন লইয়া তাহারা পলাতক। ভদ্রমহোদয়গণকে আমার অনুরোধ, যদি এইরূপ দুইটি বালক তাঁহাদের কাহারও নিকট চাকরির জন্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সর্বাগ্রে তাহাদের হাতের উল্‌কি চিহ্নটি দেখিয়া লইয়া তাহাদের আটক করিয়া আমায় সংবাদ দিবেন। যদি এদেশীয় কোন লোক তাহাদের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে একশত সিক্কা টাকা পুরস্কার দিব।"

ডাকের খরচ

তখন দেশের নানাস্থানে, কোম্পানি-বাহাদুরের ডাক-চৌকি ছিল না। এই সমস্ত ডাক-চৌকিতে পালকি ও বেহারা থাকিত। এই ডাক-চৌকি সমূহ পোস্টাফিস বিভাগের অধীন ছিল। কোন দূরবর্তী স্থানে যাইতে হইলে, অবস্থাপন্ন লোকে এই সমস্ত ডাক-পালকির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইহাদের ভাড়াও কম ছিল না। সরকারি-ডাক ছাড়া, বাহকগণ ভ্রমণকারীর মালপত্রও লইত। এইরূপ মালের-ডাককে তখন 'বাঙ্গি' বলিত। নিম্নে আমরা একটি ভাড়ার তালিকা উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে সেকালের লোকের ভ্রমণের ও মালের খরচা সমেত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইতে কত টাকা পড়িত, পাঠক তাহার আভাস পাইবেন। কলিকাতা হইতে এই এই ডাক কাশী পর্যন্ত যাইত।

কলিকাতা হইতে	ভাড়া	কলিকাতা হইতে	ভাড়া
চন্দননগর কিম্বা ঘিরেটি ও	২৪॥০	রাজমহল	২৫৭৸০
চুঁচুড়া, হুগলী, বাঁশবেড়ে মির্জা-	৪৬।০	ভাগলপুর	৩৫৪৸০
পুর (উত্তর পশ্চিমের নহে)	৭৬৲	মুঙ্গের	৪০৬।০
বহরমপুর কালকাপুর ময়দাপুর	১৫৯॥০	পাটনা বাঁকিপুর	৫৪০৲
কাশিমবাজার মুরশিদাবাদ মুরাদবাগ	১৫৯॥০	দানাপুর	৫৫৩॥০
		বক্সার	৬৬৪৸০
সুতী	২০৮৲	বেনারস	৭৬৪৲

উল্লিখিত তালিকায়, পালকি-বেহারার ভাড়া ও যাত্রীর লগেজ বা মালের ভাড়া একত্র করিয়া দেখান হইয়াছে। তখনকার অর্থাৎ একশত ত্রিশবৎসর পূর্বে, কাশী যাইতে হইলে সাতশত চৌষট্টি টাকা পালকি-ডাক ব্যয় পড়িত। তখন রাজমহল ও ভাগলপুর হইয়া বেনারস যাওয়ার প্রথা ছিল। (৬।১।১৭৮৫)

নোটের প্রথম প্রচলন

ইংরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁহার পরবর্তী কালে, আমরা সেকালের কলিকাতার মধ্যে 'বেঙ্গল' ও 'জেনারেল' নামক দুইটি ব্যাঙ্কের নাম দেখিতে পাই। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক দুইজন স্বাধীন ব্যবসায়ীর সম্পত্তি। তাঁহাদের নাম জ্যাকব রাইডার ও এডওয়ার্ড হে। ইহাঁদের নামেই ব্যাঙ্কের নোট প্রভৃতি চলিত। এই বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটি বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত রাইডার ও হে সাহেব সাধারণে প্রচার করিতেছেন—"অতঃপর এই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, নোট প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। স্বত্বাধিকারীদের স্বাক্ষরযুক্ত পাঁচশত টাকা, একশত টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও এক মোহরের নোট সাধারণে প্রচলিত হইল।"

'জেনারেল ব্যাঙ্ক' ইহার পরে স্থাপিত হয়। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক যেমন দুইজন ব্যক্তির সম্পত্তি,

জেনারেল ব্যাঙ্ক সেরূপ ছিল না। ইহা সাধারণের নিকট হইতে শেয়ার লইয়া প্রতিষ্ঠিত। (১৮।৮।১৭৮৫)

ভয়ানক চুরি

রামকান্ত মুন্সী নামক কলিকাতার জনৈক ধনী অধিবাসীর বনমালী বলিয়া একজন ভৃত্য ছিল। কোন দোষের জন্য রামকান্ত বনমালীকে কর্মে জবাব দেয়। বনমালী জানিত তাহার প্রভুর গুপ্ত সম্পত্তি কোথায় থাকে। সে কলিকাতা সহরের বদমায়েসের আড্ডায় ঢুকিয়া তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তার জন্য উপযুক্ত লোক খুঁজিতে থাকে। মুন্সীবাবুর বাটি প্রহরী-রক্ষিত, কাজেই কেহ সহজে স্বীকৃত হইতে চাহিল না। সেই সময়ে শ্রীরামপুরে গোবিন্দরাম চক্রবর্তী বলিয়া একজন নামজাদা সিঁদেল-চোর ছিল। আগে লোকটা কলকাতাতেই থাকিত, কিন্তু ইংরাজ-পুলিস তাহাকে কলিকাতা হইতে তাড়াইয়া দেওয়ায় সে শ্রীরামপুরে দিনেমার সেটেলমেণ্টে আশ্রয় লয়। বনমালী অবশেষে এই গোবিন্দরামের নিকট গিয়া তাহার পূর্ব মনিবের সম্পত্তি চুরির প্রস্তাব করে। গোবিন্দরাম তাহার দুইজন সঙ্গীকে লইয়া গুপ্তভাবে কলিকাতায় আসে ও বনমালীর সহিত পরামর্শ মতে চুরি সম্বন্ধে সমস্ত কথাবার্তা ঠিক করে। একদিন গোবিন্দরাম সকলকে লইয়া কালী-ঘাটে চলিয়া যায়। কালীঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর সে তাহার সঙ্গীদের ও বন-মালীকে লইয়া একটু রাত্রি হইলে মুন্সীর বাগানের কাছে উপনীত হয়। তৎপরে সে মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন কিছু করিয়া তাহার সঙ্গীদের বলে, "আর কোন ভয় নাই। ধুলোপড়া ছড়াইয়া দিয়াছি। বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই মড়ার মত ঘুমাইবে। যা তোরা সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া আয়।" বনমালী পাঁচিল টপকাইয়া তাহার সঙ্গীদের সহিত বাগানের ভিতর পড়ে। বাড়ির ঘর-দ্বার সবই তাহার জানাশুনো ছিল, সুতরাং সে অতি সহজে যে ঘরে টাকা থাকিত সেই ঘরে যায়। সেই ঘরের মধ্যে কর্তা স্বয়ং ঘুমাইতেছিলেন। বাড়ির মধ্যেও চাকরবাকর প্রভৃতি লইয়া ৬৪ জন লোক ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই, বনমালী ও গোবিন্দরাম অতি সহজেই সিন্দুক খুলিয়া সমস্ত টাকা কড়ি সংগ্রহ করিয়া পলাইয়া যায়। গোবিন্দরাম চক্রবর্তী তাহার বখরা লইয়া সেই রাত্রেই শ্রীরামপুরে চলিয়া গিয়াছিল। শীতকাল, পৌষমাস। কাজেই রাত্রে এ ঘটনাটা কোনরূপে প্রকাশ হইল না। পরদিন প্রাতে সকল কথা জানিতে পারিয়া, রামকান্ত মুন্সী প্রধান সহর কোতোয়াল মট সাহেবকে সংবাদ দেন। মট সাহেব আসিয়া অকুস্থল দেখিয়া বলেন, "জানাশুনা লোকের সহায়তা ভিন্ন একাজ হয় নাই।" পরিশেষে বনমালীর উপর সন্দেহ হওয়ায় তাহাকে পাকড়াও করা হয়। বনমালী সমস্ত দোষ গোবিন্দ চক্রবর্তীর ঘাড়ে চাপায় ও সমস্ত ঘটনা বলিয়া ফেলে। মিঃ বাই তখন শ্রীরাম-পুরে দিনেমার সেটেলমেণ্টের কর্তা। ইংরাজ-পুলিস পত্র লিখিয়া মিঃ বাইয়ের সহায়তায় গোবিন্দ-রামকে গ্রেপ্তার করান। গোবিন্দরাম ও তাহার সঙ্গীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে আটক করিয়া রাখা হয়। বনমালীও হাজতে যায়। শেষে নিরুপায় হইয়া কঠোর শাস্তির ভয়ে, গোবিন্দরাম হাজতের মধ্যে গলায় দড়ি দেয়। (২০।১।১৭৮৫)

সেকালের বজরা ও নৌকার ভাড়া

ডাক পাল্কিতে যাইবার খরচপত্রের একটি তালিকা আমরা ইতিপূর্বে দিয়াছি। তাহা হইতে পাঠক স্থলপথে যাতায়াতের ভাড়ার পরিমাণ জানিতে পারিয়াছেন। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে পাঠক জানিতে পারিবেন, সেকালে বজরা, নৌকা ও বড় বোটসমূহের ভাড়া কিরূপ ছিল।

তখন কলিকাতা পুলিস-অফিস, এই সমস্ত বোট ও বজরার বন্দোবস্ত করিতেন। পুলিসের অধীনেই এই বোট-বিভাগটি ছিল। পুলিস জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাসী লোক দেখিয়া দাঁড়ি-মাঝি নির্বাচন করিতেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ তারিখের এক পুলিস বিজ্ঞাপনী হইতে আমরা এই ভাড়ার ও কলিকাতা হইতে নদীপথে নানা স্থানে পৌঁছিবার সময় জানিতে পারি।

উল্লিখিত তালিকা হইতে একটা আনুমানিক হিসাব করা যাইতে পারে। ১৮ দাঁড় বজরায়,

কাশী যাইতে হইলে ৭৫ দিনে পৌঁছিত, প্রতিদিন ৬॥০ টাকা হিসাবে এই পঁচাত্তর দিনে প্রায় ৪৮৮৲ টাকা পড়িত। দাঁড়ি-মাঝির সংখ্যা যত কম হইত, নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছিতেও তত বিলম্ব

কলিকাতা হইতে	সময়	মোট ও বজরার প্রকার ভেদ	দৈনিক ভাড়া
বহরমপুর	২০ দিন	৮ দাঁড়	২৲
মুরশিদাবাদ	২৫ „	১০ „	২॥০
রাজমহল	৩৭॥ „	১২ „	৩॥০
মুঙ্গের	৪৫ „	১৪ „	৫৲
পাটনা	৬০ „	১৬ „	৬৲
বেনারস	৭৫ „	১৮ „	৬॥০
কানপুর	৯০ „	২০ „	৭৲
ফৈজাবাদ	১০৫ „	২২ „	৭॥০
মালদহ	৩৭॥ „	২৪ „	৮৲
রঙ্গপুর	৫২॥ „	মালবোঝাই বোট	
ঢাকা	৩৭॥ „	২৫০ মণ	২৯৲
লক্ষ্মীপুর	৪৫ „	৩০০ „	৩৪৲
চট্টগ্রাম	৬০ „	৪০০ „	৪০৲
গোয়ালপাড়া	৭৫ „	৫০০ „	৫০॥০

হইত। এজন্য অবস্থাপন্ন লোকেরা বেশী দাঁড়ওয়ালা বজরাই পছন্দ করিতেন। তখনকার দিনে, ভাগীরথীবক্ষ বাহিয়া কাশী যাইতে হইলে যে খরচ পড়িত, এখনকার দিনে সেই টাকায় তদপেক্ষা স্বল্প সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসা যায়। এত বেশী খরচপত্র পড়িত বলিয়া সেকালে বড়লোক ভিন্ন অন্য কেহ কাশী প্রভৃতি স্থানে যাইতে সাহস করিতেন না। যাঁহারা যাইতেন, তাঁহারা নিজের সেপাহী-শান্ত্রী সঙ্গে লইতেন। কেন না সে সময়ে সর্বত্রই প্রবল দস্যুভয়। ভারতের সর্বস্থলে ইংরাজের শক্তি ও বাহুবল তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

লাটবাড়ির কথা

ম্যাকফারসন[১] সাহেব হেস্টিংসের পর মাস কয়েকের জন্য বাঙ্গলার লাট হইয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যেরূপ জনসাধারণের সহিত অবাধ ভাবে মিশিতেন, ম্যাকফারসনও সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। পুরাতন সরকারি গেজেটের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায়, "মিঃ ম্যাকফারসন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার প্রাতে গবর্ণমেণ্ট-হাউসে সাধারণ প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্বাহ্নে বেলা আটটা হইতে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তিনি জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত। এজন্য প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে সরলভাবে একখণ্ড কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইবেন। গবর্ণর বাহাদুর সেই কাগজগুলি হইতেই তাঁহাদের বক্তব্য বিষয় জানিয়া তাহার উত্তর দিবেন। প্রতি বুধবার প্রাতে লাট-বাহাদুর এদেশীয় প্রধানবর্গ ও জমিদারদের উকিলগণের সহিত সাক্ষাতের সময় নির্দেশ করিয়াছেন।" (৩।২।১৭৮৫)

হারমোনিক ট্যাভার্ন

এই 'হারমোনিক-ট্যাভার্ন' একটি ঐতিহাসিক জিনিস। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন হইতে ইহা বর্তমান ছিল। লালবাজারেই এই 'ট্যাভার্ন' বা সাধারণ বিশ্রামা-

১. স্যর জন ম্যাকফারসন, ইনি ১৭৮৫-র ফেব্রুয়ারি হইতে ১৭৮৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতের অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেকালের বল নাচ, অ্যাসেম্‌ব্লি ও অভিনয় প্রভৃতি এই 'হারমোনিকেই' হইত। সেকালের অনেক বড় বড় ইংরাজ, যাঁহারা অতীতযুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বিশ্রাম-সুখ-সম্ভোগার্থে এখানে আসিতেন। সন্ধ্যার পর অসংখ্য বর্তিকা প্রজ্বলিত হারমোনিকের কক্ষগুলি বড়ই সুন্দর দৃশ্যের বিকাশ করিত। তখন টাউনহল বা সাধারণের সভা করিবার জন্য কোন প্রকাশ্য স্থান ছিল না। এই 'হারমোনিকই' তখন সাধারণের জমায়েত হইবার প্রধান আড্ডা ছিল। আমরা পুরাতন গেজেটের ১৭৮৫ খৃীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখের এক বিজ্ঞাপনী হইতে জানিতে পারি, "গত সোমবার কলিকাতাবাসী জনসাধারণ ও গণনীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই হারমোনিক ট্যাভার্নে সমবেত হইয়া বিদায়-প্রাপ্ত গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবকে, একটি অভিনন্দন দিবার জন্য মহাসভা করেন। তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই অভিনন্দন-পত্র সর্বজন স্বাক্ষরিত হয়। ২৬০টি স্বাক্ষর সম্বলিত এই অভিনন্দন-পত্র পরদিন মধ্যাহ্নে গবর্ণর সাহেবকে দেওয়া হয়।" হেস্টিংস বহুদিন এদেশে ছিলেন। বঙ্গদেশ হইতে বিদায় গ্রহণকালে তাঁহাকে বড়ই ব্যথিত হইতে হইয়াছিল।

সতীদাহের একটি দৃশ্য

লোমহর্ষক সতীদাহের দৃশ্য অধুনাতনকালে অতীত ইতিহাসের কুক্ষিগত হইয়াছে। বর্তমান যুগে অনেকে বিশ্বাসই করেন না যে, সেকালে এদেশের সাধ্বী-বিধবারা স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত চিতায় তাঁহার সহিত সহমৃতা হইতেন। ১৭৮৫ খৃীস্টাব্দের অর্থাৎ এক শত ত্রিশ বৎসরের পুরাতন কলিকাতা-গেজেটে একটি সতীদাহের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাটি এখনকার কালে অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হইলেও সেকালে সতীদাহ কিরূপ ভীষণ প্রথা ছিল, তাহার একটি চিত্র পাঠক দেখিতে পাইবেন। এজন্য আমরা গেজেটের লেখকের বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলীর সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম। লেখক কোম্পানি বাহাদুরের একজন সৈনিক কর্মচারী। তিনি লিখিতেছেন, "চুঁচুড়ায় আমার একটি নিমন্ত্রণ ছিল। চন্দননগরের নিকট ঘেরিটিতে আমি থাকিতাম। বজরা করিয়া আমি চুঁচুড়া যাইতেছিলাম। চন্দননগরের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, নদীতীরে ভয়ানক জনতা। কারণানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, এক হিন্দু স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইতে আসিয়াছেন। কথাটা শুনিয়া আমার একটু কৌতূহল বাড়িল। কারণ আমি ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলাম, এদেশে এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু কখনও চোখে দেখিবার সুবিধা উপস্থিত হয় নাই।"

"আমি বজরা হইতে নামিয়া, নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সহমরণোদ্যতা স্ত্রী-লোকটির বয়স ২০।২১ বৎসর। সে স্থিরভাবে সেই শ্মশানক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মণি-বন্ধে দুই টুকরো লাল রেশমী কাপড় বাঁধা। তাহার সম্মুখে দুইটি বালক দাঁড়াইয়াছিল। এই দুইটি হতভাগ্য শিশু তাহারই গর্ভজাত সন্তান। বড় শিশুটি একটি মৃৎপাত্রে মাটির হাঁড়িতে চাউল সিদ্ধ করিয়া লইয়া সেই অন্ন পিণ্ডাকারে তাহার পিতার মুখের উপর দিতেছিল। সেই সময়ে একজন পুরোহিত নিকটে দাঁড়াইয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছিল। বালকের মৃত পিতার দেহ, চিতার উপরই চিৎ করিয়া শোয়ান ছিল। চিতাটি চারিহস্ত উচ্চ। তাহা কাষ্ঠ ও খড় দ্বারা রচিত। এই স্ত্রীলোকটি বড়ই ভয় পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হইল। কেন না তাহার কম্পিতাবস্থা দেখিয়া দুই-জন ব্রাহ্মণ তাহাকে ধরিয়াছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বোধ হইল, তাহাকে সিদ্ধি বা অন্য কোনরূপ মাদক দ্রব্য খাওয়ান হইয়াছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী লোকজনকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা একথা অস্বীকার করিল। শ্মশানমধ্যে সমবেত জনতার দিকে সেই স্ত্রীলোক স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার মুখভাব উদ্বেগশূন্য ও চিত্ত যেন উৎসাহপূর্ণ। ব্রাহ্মণেরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। সে গঙ্গায় স্নান করিল। স্নানের সময়ে সে যে কাপড় পরিয়াছিল, তাহা ছাড়াইয়া লইয়া তৎপরিবর্তে একখানি লাল রেশমী শাড়ী (চেলী) তাহাকে পরিধান করান হইল। স্নানান্তে এই লাল কাপড় পরিয়া পুনরায় শ্মশানে আসিবার পর তাহার গলায় ফুলের মালা

দেওয়া হইল। এই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি যে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে যাইতেছ, তাহা কি তোমার নিজের ইচ্ছায়, না কেহ তোমাকে জোর করিয়া বা বুঝাইয়া সুঝাইয়া এই কার্যে ব্রতী করিয়াছে?' সেই স্ত্রীলোক ইহার কি উত্তর দিল, কোলাহল জন্য তাহা শোনা গেল না। তৎপরে সে মৌনভাবে রহিল। ব্রাহ্মণেরা এইবার তাহার হস্তে কড়িপূর্ণ চাঙ্গারি দিলেন। সেই স্ত্রীলোক সমবেত জনতার মধ্যস্থলে কড়ি ছড়াইয়া দিতে লাগিল। সমবেত লোকেও আগ্রহের সহিত সেই কড়ি কুড়াইতে লাগিল। চারিদিকে একটা মহা কোলাহল উত্থিত হইল। ইহার পর সেই স্ত্রীলোকটির মাথায় একখানি চিরুণী গুজিয়া দিয়া, পুরোহিত তাহাকে সাতবার সেই চিতা প্রদক্ষিণ করাইল। প্রত্যেকবারই সে তাহার স্বামীর পায়ের দিকে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া সম্মান দেখাইল। এই সময়ে সে শবদেহকে লক্ষ্য করিয়া কি যেন বলিল ও ব্রাহ্মণেরাই তাহাকে যেন সেই সব কথা বলাইল। তৎপরে সেই স্ত্রীলোক চিতার উপর উঠিয়া স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। এই চিতার চারিপার্শ্বে ছয়টি বাঁশের খুঁটি পোতা হইয়াছিল। এই বাঁশের খুঁটিগুলিতে আবদ্ধ দড়ির একদিক টানিয়া লইয়া চিতার উপরিস্থ দেহ দুইটিকেও সেই দড়ি দিয়া ছয় স্থানে বাঁধা হইল। ইহার কারণ এই, জ্বলন্ত অগ্নি মধ্য হইতে উঠিবার কোনরূপ চেষ্টা করিলেও সেই স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ অক্ষম হইবে। আমি যে লোকটির কাছে দাঁড়াইয়া তাহাকে এতক্ষণ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—তাহাকে বলিলাম, "এই স্ত্রীলোক যখন স্বেচ্ছায় মরিতে প্রস্তুত, তখন তাহাকে এরূপভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিবার প্রয়োজন কি?' তাহাতে সেই লোকটি বলিল, 'এরূপভাবে বাঁধিবার কারণ আর কিছুই নহে, অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে যত বড়ই সহিষ্ণু ও সাহসী হউক না কেন, একটা ভয় পাইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ঐ ছয়টি বাঁশের খুঁটির সহিত ছয় স্থানে চিতায় ন্যস্ত উভয় দেহ দুইটিকে বাঁধা হইয়াছে।' ইহার পর তাহার সঙ্গীরা সেই চিতার উপর আরও কাষ্ঠ এবং খড়ের আঁটি চাপাইয়া দিল। তাহার উপর কয়েক পাত্র ঘৃত ঢালিয়া দিল। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে অনেকটা সময় ব্যয় হইয়াছিল। জানি না এই সময়ে সেই হতভাগ্য রমণীর মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল। তাহার এ যন্ত্রণা মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও ভয়াবহ! তখনও লোকে 'আরো কাঠ চাই' বলিয়া চিৎকার করিতেছে। সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে তাহার সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিয়া খড়ের নিম্নে আগুন ধরাইয়া দিল। মুহূর্ত মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। দুইজন লোক দুইটা বাঁশ দিয়া জ্বলন্ত দেহ দুটিকে চাপিয়া রহিল। যেদিকে লোকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল, অগ্নির উত্তাপ সেখানে খুব বেশী হওয়ায়, অন্য লোকে দাহকারীদের মাথায় জল ঢালিয়া দিল। আরও কাঠ চাপান হইল। ক্রমে ক্রমে সেই জ্বলন্ত চিতার অঙ্গারময় অবস্থার সহিত সেই স্বামীগতপ্রাণা রমণীর সব শেষ হইল।

চীনাবাজারে চোরের আড্ডা

এক দল চোর চীনাবাজারে একটি দোকান খুলিয়া কায়েমী আড্ডা করিয়াছে। তাহারা এই দোকানে নানাবিধ মালপত্র সাজাইয়া রাখে, ও দিবাভাগে বস্ত্রাদির ফেরিওয়ালা বেশে নাগরিকদিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া যাহা কিছু সুবিধামত সম্মুখে পায়, তাহাই লইয়া আসে। রেশম ও কার্পাস বস্ত্র বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসার প্রধান উপলক্ষ। সম্প্রতি তাহারা ধরা পড়ায় বামাল স্বরূপ কয়েকটি টেঁক-ঘড়ি তাহাদের নিকট পাওয়া গিয়াছে। (১০।২।১৭৮৫)

সেকালের ফ্যান্সি-ড্রেস বল

'ফ্যান্সি-ড্রেস বল' ইংরাজ সমাজের একটা আরামদায়ক আনন্দ। সেকালেও ইহার প্রচলন ছিল। ইংরাজ নরনারিগণ কৃত্রিম বেশ পরিয়া কোন লোক বা শ্রেণী বিশেষের অভিনয় দেখাইতেন। একটি ছদ্মবেশধারী নৃত্যের (Masquarde) সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশ হয়। "গত সোমবার রাত্রের 'মস্কারেড' অতি সুন্দরভাবে হইয়া গিয়াছে। গৃহসজ্জা ও আলোকের বন্দোবস্ত

অতি সুন্দর। নিম্নলিখিত অংশাভিনয়গুলিই অতি সুন্দর হইয়াছিল। (১) দুইটি জিপসী (২) ফরাসী বাবু ও বিবি, (৩) একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী, (৪) তিনজন জাহাজী গোরা, (৫) এক সুন্দর গোয়ালিনী, (৬) এক নাগা-সন্ন্যাসী (খুব ভাল হইয়াছিল), (৭) এক ইহুদী, (৮) এক পাহারাওয়ালা, (৯) একজন যোগী (Joghee), (১০) একজন গোরা, (১১) এক মেথরাণী (A Methrany) (খুব ভাল হইয়াছিল), (১২) একজন সুবাদার, (১৩) একজন মুন্সী। ইহা ব্যতীত অনেক মোগল, পাঠান ও পারসীর ভূমিকা।

পাঠক ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন, সেকালের সাহেবেরা ছদ্ম-আনন্দ-নৃত্যে, যোগী, নাগা, ফকির, মেথরাণী, সুবাদার, মুন্সী প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয়ে আনন্দ উপভোগ করিতেন।

ময়দানে বেলুন বাজী

গত শুক্রবার রাত্রে মিঃ উইনটল রাত্রি আটটা নয়টার সময় একটি বেলুনে চড়িয়া শূন্যে উঠেন। এসপ্লানেড হইতে উঠিয়া কিয়ৎক্ষণ শূন্য-ভ্রমণের পর তিনি পুনরায় ভূতলে অবতরণ করেন। তিনি প্রায় পোয়াটাক মাইল উপরে উঠিয়াছিলেন। আবার আগামী সোমবার তিনি ঐ সময়ে বেলুন যাত্রা করিবেন। (৪।৮।১৭৮৫)

গবর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসের মালামাল বিক্রয়

আগামী ৭ই মার্চ সোমবার (১৭৮৫) ওল্ড-কোর্ট-হাউস বাড়িতে প্রকাশ্য নিলামে ভূতপূর্ব গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের মালামালসমূহ বিক্রয় করা হইবে। সে মালগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা এই—(১) রৌপ্যের-বাসন ও প্লেট প্রভৃতি, (২) টেবিল চেয়ার কৌচ ইত্যাদি, (৩) অয়েলপেণ্টিং ও স্টিল-প্রিণ্টস, (৪) একটি বড় অর্গান বা সংগীতযন্ত্র, (৫) কারুকার্য-খচিত ঘোড়ার সাজ, (৬) কারুকার্যময় হাতীর-হাওদা, (৭) কয়েকখানি ঝালরদার-পালকি, (৮) কার্পেট ও সতরঞ্চ ১ দফা, (৯) ফিলচেরা বা সখের দেশী ভ্রমণ-নৌকা, (১০) কতকগুলি তাম্বু আর নানাবিধ মালামাল। তাহাদের পূর্ণ পরিচয় এখানে দেওয়া অসম্ভব। নগদ টাকায় বিক্রি। মালামাল খরিদের পাঁচ দিন পরে ক্রীত-মাল উঠাইয়া না লইলে পুনরায় তাহা অন্য লোককে বিক্রয় করা হইবে।

গাড়িওয়ালা স্টুয়ার্ট কোম্পানি

পাঠক, আজও নর্টন-বিল্ডিংএর নিকট স্টুয়ার্ট কোম্পানির পুরাতন গাড়ির কারখানা দেখিতে পাইবেন। এই স্টুয়ার্ট কোম্পানি ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত স্টুয়ার্ট কোম্পানির ১৭৮৫ সালের ১৭ই মার্চ তারিখের একটি বিজ্ঞাপন এই, 'আমরা বিলাত হইতে একখানি সুন্দর গাড়ি আনাইয়াছি। তাহার মূল্য আট শত সিক্কা টাকা। আমরা অর্ডার পাইলে চিরেট, ফিটন, বগী প্রভৃতি ইউরোপের মত নিখুঁতভাবে তৈয়ারি করিয়া দিব।'

কলিকাতার প্রথম মাসিকপত্র

১৭৮৫ খৃস্টাব্দের ৭ই এপ্রিলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে দেখা যায়, 'ওরিয়েণ্ট্যাল ম্যাগাজিন এবং কলিকাতার আমোদ-প্রমোদ' নামক একখানি নূতন মাসিক-পত্রের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে।[১] প্রতি মাসের প্রথম বুধবারে ইহা বাহির হইবে। বর্তমান সংখ্যায় নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলি আছে (১) হেস্টিংস সাহেবের জীবনী ও এদেশের কার্য-বিবরণী সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস—(ভূতপূর্ব গবর্ণর সাহেবের সুবৃহৎ ছবি সম্বলিত), (২) ভারতের ইংরাজাধিকার সমূহে সুশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য, পার্লিয়ামেণ্ট যে নূতন বিধান বা রেগুলেশন প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিবরণ। ইহা ছাড়া আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে আছে। গর্ডন ও হে সাহেবের ছাপাখানায় ইহা পাওয়া যাইবে।"

১. On the 6th April 1785 was published by Messrs. Gordon and Hay the first number of the Oriental Magazine or Calcutta Amusements, a monthly.—W. H. Carey, *Good Old Days of John Company,* Riddhi Ed. 1980, p. 273.

উল্লিখিত বিজ্ঞাপনী হইতে জানিতে পারা যায় যে, তখন কলিকাতার ইংরাজ-পরিচালিত আর একটি নূতন ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল। আর এই ছাপাখানার স্বত্বাধিকারী দুইজন ইংরাজ। অন্য ছাপাখানা হইতে সরকারি গেজেট প্রভৃতি মুদ্রিত হইত।

ঘোড়ার দানা-যোগান

১৭ই মার্চ তারিখে (১৭৮৫) একজন ইংরাজ-ব্যবসায়ী যে বিজ্ঞাপন সাধারণে প্রকাশ করেন, তাহার সার মর্ম এই, "কলিকাতায় যে-সকল ভদ্রলোক ঘোড়া-গাড়ি রাখেন, তাঁহাদিগকে ঘোড়ার খোরাক লইয়া মধ্যে মধ্যে বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হয়। সহিস, সরকার ও মুদী এই তিন শ্রেণীর লোকে চক্রান্ত করিয়া দানার দর চড়াইয়া দেয়। অনেক সময়ে নিয়মিতরূপে পাওয়াও দুর্ঘট হইয়া উঠে। এজন্য আমি জনসাধারণের সমক্ষে প্রস্তাব করিতেছি, যদি তাঁহারা আমার নিকট তাঁহাদের নামধাম ও প্রয়োজনীয় দানার পরিমাণ লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে বা প্রতি ছয়মাস অন্তর তাঁহাদের ঘোড়ার খোরাক যোগাইতে পারি। খরিদ-দারের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইলে আমি একার্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। যাঁহারা এইভাবে নির্ধারিত দরে আমার নিকট হইতে দানা লইয়া আমায় উৎসাহিত করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ত্বরায় নাম ধাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।"

রামরতন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ি

"নূতন কোর্ট-হাউসের নিকট এসপ্লানেডে যে সুন্দর বাড়িটির ভাড়া আগে মাসিক ছয় শত টাকা ছিল, তাহা পাঁচশত টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাটির স্বত্বাধিকারী রামরতন ঠাকুরের নিকট আবেদন করুন।"

এই বিজ্ঞাপনে বর্তমানে প্রচলিত 'Tagore' শব্দটিই ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সময়ে ঠাকুর-গোষ্ঠির অবস্থা যে উন্নত ছিল, তাহা এই বিজ্ঞাপন হইতেই প্রমাণ হইতেছে।

সেকালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে, পলাশী-সমরের ২৮ বৎসর পরে, কলিকাতায় বর্তমান মিউনিসি-প্যালিটির মত কোন কিছু ছিল না বটে, তবে তখন পুলিস কমিশনারদের অধীনে একটি 'ময়লা-ফেলা বিভাগ' যে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত আদেশপত্র হইতে প্রকাশ।

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ৯ই জুন তারিখে নোটিশ দেওয়া হয়, "কমিশনার অব পুলিস সহরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি নূতন বিধান প্রচলিত করিয়াছেন। সেগুলি সাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশিত হইল। এই বিভাগ মিঃ জোসেফ সেরবোরনের তত্ত্বাবধানে খোলা হইল। তাঁহার নিজ-প্রতিষ্ঠিত বাজারের এক হইতে তিন নম্বর কামরায় 'স্ক্যাভেঞ্জার অফিস' স্থাপিত হইয়াছে। সহরের অধিবাসিগণকে জানান যাইতেছে, মহামান্য গবর্ণর জেনারেল ও কাউন্সিলের আদেশে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আইনগুলি গঠিত হইয়াছে।"

১। সমগ্র সহর ৩১টি থানায় বিভক্ত হইল। প্রত্যেক অংশই এক একজন স্বতন্ত্র থানাদারের অধীন।

২। সাহেবী-পল্লীতে সাতটি থানা স্থাপিত হইল। প্রত্যেক থানার অধীন চারিখানি ময়লা-ফেলা গাড়ি থাকিবে। দেশীয়-পল্লীর থানাগুলির প্রত্যেকের অধীনে দুইখানি করিয়া ময়লা-ফেলা গাড়ি রাখিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

৩। ময়লা-সাফ্ সম্বন্ধীয় দরখাস্ত প্রত্যেক থানার কর্মচারিগণকে দিতে হইবে। ইহাতে যদি নিযুক্ত কর্মচারীরা কোনরূপ মনোযোগ প্রদান না করে, তাহা হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-জেনারেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত দিলেই কার্যোদ্ধার হইবে।

৪। বর্তমানে রাস্তায় ময়লাফেলা ড্রেন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহাই পূর্ণভাবে বলবৎ রহিল।

এই ৩১টি থানার নাম হইতে সহরের তৎকালীন [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য

কেবল থানার নামগুলিই উদ্ধৃত করিলাম। প্রত্যেক থানার পার্শ্বে যে-সমস্ত থানাদারের নাম আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। তবে পাঠক এইটুকু জানিয়া রাখুন, সেকালের থানাদারের অধিকাংশই মুসলমান।

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা সহরের ৩১টি থানার নাম

১। আর্মেনিয়ান চার্চ
২। ওল্ড ফোর্ট (পুরাতন দুর্গ)
৩। চাঁদপাল ঘাট
৪। লালদীঘির দক্ষিণদিক
৫। ধর্মতলা
৬। ওল্ড কোর্ট-হাউস
৭। ডোমতলা (?)
৮। আমড়াগলি পঞ্চাননতলা
৯। চীনাবাজার
১০। চাঁদনি-চক
১১। তুরুলবাজার (?)
১২। গোমাপুকুর (?)
১৩। চড়কডাঙ্গা
১৪। শিমলাবাজার
১৫। নুন-লঙ্কা-বাজার (?)
১৬। মলঙ্গা পটলডাঙ্গা
১৭। কুবের-ডাঙ্গা (?)
১৮। বৈঠকখানা
১৯। শ্যামপুকুর
২০। শ্যামবাজার
২১। পদ্মপুকুর
২২। কুমারটুলী
২৩। জোড়াসাঁকো
২৪। মেছুয়াবাজার
২৫। জানবাজার
২৬। ডিঙ্গাভাঙ্গা
২৭। সুতালুটি-হাটখোলা
২৮। দয়েহাটা
২৯। হাঁসপুকুরিয়া
৩০। কলিঙ্গা
৩১। জোড়াবাগান

খাস কলিকাতা সহরের দেশীয় পল্লিগুলির অধিকাংশই যে সে সময়ে লোকজনপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা উল্লিখিত থানা বিবরণেই প্রকাশ। ডোমতলা, সম্ভবত কসাইটোলার নিকটবর্তী স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। কেন না ওল্ড-কোর্ট-হাউসের পরই ডোমতলা-থানার নাম আছে। তুরুলবাজার কোথায় ছিল, তাহার নির্দেশ নাই। গোমাপুকুর, নুন-লঙ্কা-বাজারের স্থান নির্দেশ করাও দুরূহ ব্যাপার। ইহা ব্যতীত আর যে স্থানগুলি আছে, তাহা বর্তমানকালে বিশেষরূপে পরিচিত। পাঠক একটু মনে রাখিবেন, আমরা ওয়ারেন-হেস্টিংসের আমলের কথা বলিতেছি। ভবিষ্যতে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রস্তাবে, আমরা এ সম্বন্ধে আরও নূতন কথার আলোচনা করিব।

ইংরাজের জন্য স্কুল

জন স্ট্যান্সবেরো সাধারণকে জানাইতেছেন, তিনি মির্জাপুরে একটি বাগানবাটির মধ্যে একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। এইস্থলে গণিত ও পাঠ্য-পুস্তক পড়ান হইবে। হাতের লেখারও বন্দোবস্ত থাকিবে। বালক ও বালিকা, উভয় শ্রেণীর জন্য ক্লাস থাকিবে। বালিকাদিগকে ছুঁচের কাজ ও লেসের-কাজ শিখান হইবে। প্রত্যেক বালিকার জন্য মাসে ৩০ টাকা, বালকের জন্য ২০ টাকা পড়িবে। যাহারা কেবল দিনের বেলা পড়িবে তাহাদিগকে ১৬ টাকা দিতে হইবে। জে. এস, এই নামে ১৬ নং চীনাবাজারে আবেদন করুন। (১০।১১।১৭৮৫)

বাঘ-বিক্রয়

"একটি সুন্দরবনের বাঘ ও একটি বাঘিনী বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। স্বভাব উগ্র প্রকৃতির নহে, অনেকটা পোষমানা। ইউরোপে জাহাজে করিয়া পাঠাইবার উপযুক্ত। ৮০০ সিক্কা টাকার কমে বিক্রয় করা হইবে না। বাঘ দুটি বেশ মোটা-সোটা ও তাহাদের খাদ্যের জন্য প্রতিদিন মাত্র দুই আনা পয়সা খরচ হয়।" (১৭।১১।১৭৮৫)

পলাতক ক্রীতদাস

"গত শনিবার মট্‌ সাহেবের বাড়ি হইতে দুইজন মালয়ী-ক্রীতদাস পলাইয়া গিয়াছে। যাইবার সময় তাহারা সোনার-ঘড়ি, চেইন, সোনার নস্যদানী আর টাকাকড়ি ইত্যাদিতে প্রায় ৩।৪ হাজার

টাকা লইয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব, তাহারা দূরদেশে যাইবার জন্য কোন জাহাজে উঠিয়াছে। এজন্য জাহাজের কাপ্তেনগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা ইহাদের সংবাদ যেন মিঃ মট্‌কে অনুগ্রহ করিয়া জানান। যে কোন ব্যক্তি এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ আনিতে পারিবে, তাহাকে তিন শত সিক্কা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।" (৪।১২।১৭৮৫)

ভগবদ্গীতা বিক্রয়

"হিন্দুর প্রধান ধর্মগ্রন্থ—(কৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথন) ভগবদ্গীতার ইংরাজী-অনুবাদ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত। মুর, সণ্ডার্স ও লেসি কোম্পানির কার্যালয়ে আবেদন করুন। গ্রন্থের অনু-বাদক চার্লস উইলকিন্স। মূল্য প্রতি কপি এক সোনার-মোহর।" (১৫।৬।১৭৮৬)

গ্রন্থখানি বিলাত হইতেই ছাপা হইয়া এদেশে বিক্রয়ার্থে আসে। পুস্তক ছাপাইবার ব্যয়ভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টারেরা গ্রহণ করেন। ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশে বিলাতের কর্তারা গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিয়াছিলেন। অবশ্য এ গ্রন্থ বিক্রয়ের লভ্যাংশ কোম্পানি বাহাদুর লয়েন নাই। গ্রন্থকর্তা উইলকিন্স সাহেবকে[১] তাহা দিবার জন্য বিলাতের কর্তারা আদেশ করিয়া পাঠান। এক দফায় জাহাজে করিয়া সর্বপ্রথম এক শত কপি পুস্তক বিলাত হইতে এদেশে আসে। বিলাতের কর্তারা পুস্তক পাঠাইবার সময় গীতার অনুবাদক এই উইলকিন্স সাহেবকে যে প্রশংসাসূচক পত্র লেখেন, তাহার শেষাংশ এই—"আপনার অনুবাদ বিশেষ প্রশংস-নীয়। ইহা কেবল আমাদের অভিমত নহে—এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে এ অনুবাদের প্রশংসা করিতেছেন। আমরা আশা করি, আপনি ভবিষ্যতে সুস্থদেহে থাকিয়া এইরূপ অনেক প্রাচ্য লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার করুন।[২] (১৫।৬।১৭৮৫)

গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের মৃত্যু

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই ভ্যান্সিটার্টের[৩] নাম ও কার্যপ্রণালী জানেন। সেকালের সংবাদপত্রে প্রকাশ,—"গত ৭ই অক্টোবর শনিবার অপরাহ্নে, গবর্ণর হেন্‌রি ভ্যান্সিটার্ট কয়েকদিবসব্যাপী পীড়ার পর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইংরাজ ও এদেশীয় উভয় সম্প্রদায়ের তিনি অতি প্রিয় ছিলেন। কোম্পানির লবণ-বিভাগের আয় এই ভ্যান্সিটার্ট সাহেব পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড় করাইয়া-ছিলেন। এদেশীয় যে-সমস্ত লোক তাঁহার অধীনে কর্মে নিযুক্ত ছিল, তাহারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিত। তিনি তাহাদের সমস্ত ন্যায্য অভাব অভিযোগ শুনিয়া, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। গ্রীক, ল্যাটিন ভাষায় তাঁহার খুব দক্ষতা ছিল। আরবিক, ফার্সী ভাষাতেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। আরবী হইতে তিনি অনেকগুলি পদ্যের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া-ছিলেন। ফার্সী হইতে আলমগীর (ঔরঙ্গজেব) বাদসার রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের ঘটনার এক ইংরাজি ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক-সোসাইটির তিনি একজন উজ্জ্বল-রত্ন ছিলেন।" (১২।১০।১৭৮৬)

১. Orientalist, published a Sanskrit Grammar in 1779; translated the Bhagavadgita, under Warren Hasting's patronage in 1785, deciphered Sanskrit inscriptions ; himself prepared the first Bengali and Persian types, set up a printing press for Oriental languages ; helped Sir W. Jones to found the Asiatic Society of Bengal, 1784 ; established the Asiatic Researches ; published translations of the Hitopodesa and Sakuntala . . . First Librarian of the India House Library.—C. E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography,* p. 451.

২. *Copy of a letter from Nath. Smith, Chairman of the Hon'ble Court of Directors, Dated 24.9.1785 to Mr. Wilkins.*

৩. হেনরী ভ্যান্সিটার্ট—ইনি ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই বাংলার গবর্ণরের পদ গ্রহণ করেন। ১৭৬৪ সালে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ছয় বৎসর পর ১৭৭০ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হিন্দু ও মুসলমান পর্বদিন

"রায়রায়াঁর নিকট হইতে হিন্দু ও মুসলমানদের পর্বদিন সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে—গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীদিগের অবগতির জন্য তাহার ইংরাজি অনুবাদ গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের আদেশানুসারে প্রকাশিত হইল। জে, ডনক্যান (রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট,—৩০।৪।১৭৮৭)

হিন্দু পর্ব ও উৎসব-দিনের তালিকা
(বাঙ্গলা ১১৯৪ সাল)

রথযাত্রা	১ দিন	বসন্ত-পঞ্চমী	১ দিন
পুনর্যাত্রা	১ দিন	রাখী পৌর্ণমাসী	১ দিন
দুর্গাষ্টমী	২ দিন	জন্মাষ্টমী	২ দিন
অমাবস্যা মহালয়া	১ দিন	শিবরাত্রি	২ দিন
দুর্গাপূজো	৫ দিন	হোলি	৫ দিন
দেওয়ালী	৩ দিন	বারুণী	১ দিন
উত্থান-একাদশী	১ দিন	চড়কপূজো	১ দিন
তিলওয়া-সংক্রান্তি	১ দিন	রামনবমী	১ দিন

নিম্নলিখিত পর্বাহগুলিতে প্রয়োজন হইলে ছুটি পাওয়া যাইত

অক্ষয়-তৃতীয়া	১ দিন	লক্ষ্মী-পূজো	১ দিন
নৃসিংহ-চতুর্দশী ও পৌর্ণমাসী	২ দিন	যমতর্পণ (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া)	১ দিন
দশমী ও একাদশী (জ্যৈষ্ঠমাসে)	২ দিন	অন্নকূট-যাত্রা	১ দিন
স্নানযাত্রা	১ দিন	কার্তিক-পূজো	১ দিন
শয়ন-একাদশী	১ দিন	দুর্গা-নবমী (জগদ্ধাত্রী)	১ দিন
অরন্ধন	১ দিন	রাস-যাত্রা	১ দিন
গণেশ-পূজো	১ দিন	অগ্রহায়ণ নবমী	১ দিন
অনন্ত-ব্রত	১ দিন	রটন্তী অমাবস্যা	২ দিন
বুধ-নবমী	১ দিন	মৌনী সপ্তমী, ভীষ্মাষ্টমী	২ দিন
নবরাত্রি	১ দিন	বাসন্তী-পূজো	৪ দিন

এখনকার কালের সহিত তুলনায় সেকালে অনেকগুলি সরকারি ছুটির প্রচলন ছিল। কিন্তু এ তালিকার মধ্যে আমরা অন্নপূর্ণা-পূজোর কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। জনপ্রবাদ, মহারাজ-রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গদেশে অন্নপূর্ণা-পূজোর প্রচলন করেন। "চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে" ইহা ভারতচন্দ্রের উক্তি। বোধ হয় সে সময়ে এই পূজো সমগ্র বঙ্গব্যাপী হয় নাই।

এইসব পর্বদিনের ইংরাজি নামকরণ, যেরূপভাবে কোম্পানির সেরেস্তায় বর্তমান, তাহার দুই একটি নমুনা দিব। অন্নকূট-যাত্রা (Ancote jaterah) বাসন্তী-পূজো (Byunt poojeh) মৌনী সপ্তমী (Mauney Septumy) শয়ন একাদশী (Syne Ekadassy) অক্ষয় তৃতীয়া (Akhy Tirtea) এইরূপ বানানের জন্য অনেক পর্বদিন সহজে বুঝা যায় না। (৩।৫।১৭৮৭)।

মুসলমানদেরও (১) ইদলফেতর, (২) ইদুজ্জোহা, (৩) সোবেবরাৎ, (৪) মহরম, (৫) বরা-উয়াফাৎ, (৬) তেরাতাজিয়া, (৭) আখেরিচাহার, (৮) নওরোজ প্রভৃতি উৎসবে ১৩ দিন বন্ধ থাকিত। হিন্দু ও মুসলমান উভয় পর্বে মোট ৭২ দিন ছুটি হইত।

কলিকাতায় মালাই, ম্যানিলা ও কাফ্রির উৎপাত

"রাইট অনারেবল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বরাবরে অভিযোগ আসিয়াছে যে, মালাই ও ম্যানিলা দেশীয় জাহাজের খালাসীরা ও কাফ্রিরা কলিকাতায় চুরি-ডাকাতি দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিতেছে। এজন্য আদেশ করা হইল. আগামী ১লা সেপ্টেম্বরের পর এই শ্রেণীর যে সমস্ত লোক জাহাজে চাকরি জোগাড় করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া না যাইবে, তাহাদিগকে ফাটকে

আটক করা যাইবে।" (৮ই জুলাই ১৭৮৭)।

অহল্যাবাইয়ের গয়ার মন্দির

"রাণী অহল্যাবাই গয়াতীর্থে একটি বিষ্ণুমন্দির ও লক্ষ্মীর-মন্দির প্রতিষ্ঠা-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। শোনা যাইতেছে, এই স্থানে তাঁহার নিজেরও একটি প্রতিমূর্তি গঠিত হইবে। ভবিষ্যৎ যুগে তিনিও অন্যান্য হিন্দুদেবতাদের মত পূজিতা হইবেন।"

Calcutta Gazette—(News) 3-8-1787

বর্ধমানে দামোদরের বন্যা

গত বৎসরের বর্ধমানের বন্যার কথা, আজও পাঠকের স্মৃতিমধ্যে উজ্জ্বলভাবে জাগরূক। ইহার ৫০ বৎসর পূর্বে না কি আর একবার এইরূপ ভয়ানক বন্যা হয়। কিন্তু শতাধিক বৎসর পূর্বে লর্ড কর্ণ-ওয়ালিসের আমলে একবার দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গে। সেই সময়ের কলিকাতা গেজেটে (১০।১১। ১৭৮৭) একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।—পত্রখানি অবশ্য ইংরাজিতেই প্রকাশ হয়। বর্ধমান-বাসী কোন ভদ্রলোক, এই ভীষণ বন্যার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কলিকাতাবাসী সহোদরকে বাঙ্গলায় একখানি পত্র লেখেন। গেজেট-সম্পাদক তাহা ইংরাজিতে তর্জমা করিয়া বন্যার প্রকৃত অবস্থা সাধারণের গোচর করেন। সে তর্জমার বাঙ্গলা এই—"ভায়া ! এস্থানের অবস্থা তোমাকে আমি লিখিয়া বুঝাইতে পারিব কি না সন্দেহ ! ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। গত ১৬ই আশ্বিনের মহাবৃষ্টিতে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। বারদ্বারীর নিকট যে বাঁধ ছিল, তাহা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই বাঁধ-ভাঙ্গায় অনেক গঞ্জ গোলা হাটের চিহ্নমাত্র নাই। কত বড় বড় গাছপালা ও গরু, ছাগল, ভেড়া ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের অবস্থা এখনও নিরাপদ। কিন্তু ঘর-বাড়ি কাহারও নাই। ধনী দরিদ্র সবারই সমাবস্থা। আমাদের ঘরবাড়ি এখনও থাকিলেও ভবিষ্যতে থাকিবে কি না সন্দেহ। এ বিপদ ঘটিলে কি যে হইবে, তাহা ভগবানই জানেন।"

গেজেট ইহার উপর মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছেন, "এই পত্র ছাড়া অন্যান্য স্থান হইতেও আমরা সংবাদ পাইয়াছি, দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া সহরের পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রাম নষ্ট করিয়াছে। দুই হইতে তিন ফিট পর্যন্ত জল জমিয়াছে। লোকে কেবল পুষ্করিণী প্রভৃতির উচ্চ পাহাড়ের উপর আশ্রয় লইয়া বসিয়া আছে।"

ইহা হইতেছে ইংরাজি ১৭৮৭ খৃস্টাব্দের কথা, অর্থাৎ বর্তমান বৎসর হইতে একশত সাতাইশ বৎসরের পূর্বের ব্যাপার।

প্রাচীন কলিকাতার (১৭৯২ খৃস্টাব্দে) প্রধান প্রধান ঘাটসমূহের তালিকা

১।	ওল্ড পাউডার মিল ঘাট।	১৩।	জোড়াবাগান ঘাট।
২।	রঘুমিত্রের ঘাট।	১৪।	গোকুল বাবুর ঘাট।
৩।	কাশীরাম মিত্রের ঘাট।	১৫।	কত্মার ঘাট।[২]
৪।	বনমালী সরকারের ঘাট	১৬।	পাথুরিয়া ঘাট।
৫।	কিতোয়া ঘাট।[১]	১৭।	গিরি বাবুর ঘাট।
৬।	বটতলা ঘাট।	১৮।	শিবতলা ঘাট।
৭।	সুতানুটি ঘাট।	১৯।	হাটতলা ঘাট।
৮।	আহিরিটোলা ঘাট।	২০।	হরিনাথ দেওয়ানের ঘাট।
৯।	মানিক বসুর ঘাট।	২১।	শোভারাম বসাকের ঘাট।
১১।	টুনু বাবুর ঘাট।	২২।	নবাবের ঘাট।
১০।	মদন দত্তের ঘাট।	২৩।	বৈষ্ণব দাস শেঠের ঘাট।
১১।	টুনু বাবুর ঘাট।	২৪।	কাশীনাথ ঘাট।

১. রাধারমণ মিত্রের মতে কেটুয়া ঘাট। বড় বড় মোটা কাঠ দিয়ে এই ঘাট তৈরি হয়েছিল বলে নাম কেটুয়া বা কেটো ঘাট। কলিকাতা দর্পণ, পৃ. ২৬৬।

২. কলিকাতা দর্পণ, পৃ. ১৭৪ দ্রষ্টব্য।

২৫। কদমতলা ঘাট।
২৬। কাশীনাথ বাবুর ঘাট।
২৭। হুজুরীমল্‌স ঘাট।
২৮। নয়ান মল্লিকের ঘাট।
২৯। বলরাম চন্দ্রের ঘাট।
৩০। বড়বাজার ঘাট। (Great Bazar)
৩১। রস সাহেবের ঘাট।[১]
৩২। বারেটো সাহেবের ঘাট।
৩৩। জ্যাক্‌সন ঘাট।
৩৪। ফোরম্যান্‌স ঘাট।
৩৫। ব্রাইথার সাহেবের ঘাট।
৩৬। ওল্ড কোর্ট ঘাট।
৩৭। নিউ হোয়ার্ফ ঘাট।
৩৮। কাঁচাগুঁড়ি ঘাট।
৩৯। চাঁদপাল ঘাট।

বাগবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত তখন ৩৯টি ঘাট ছিল। এখন এ সমস্ত ঘাটের মধ্যে অনেকগুলির নাম ও অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। সেকালের সাহেবেরাও বাঙ্গালীদের মত গঙ্গাতীরে ঘাট বাঁধাইয়া স্ব স্ব নামে তাহার নামকরণ করিতেন।

১. পাঠান্তর রসবিবির ঘাট।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

লর্ড কর্ণওয়ালিস ও স্যর জন্ শোরের আমল

(১৭৮৯—৯৮ পর্যন্ত দশ বৎসরের কথা)

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রতিকার—নদীপথে বোম্বেটের উৎপাত—বাগবাজার চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি—সেকালের বাঙ্গালীর সাহেব-পূজা—অতিকায় ভেটকিমাছ—সুন্দরবন বিভাগে ডাকাতি—কলিকাতা সহরের মধ্যে চুরি ও রাহাজানি—বেহারি বাবুর চাকরি জবাব—ময়দানে ঘোড়া-ব্রেক করা সম্বন্ধে পুলিস অর্ডার—ক্রীত-দাস ক্রয় সম্বন্ধে গবর্ণর-জেনারেলের আদেশ—বাঙ্গলাদেশে প্রথম নীলের চাষ আরম্ভ—ধর্মতলার পুষ্করিণী খনন—উড়িষ্যা-মহলের বাব—কলিকাতা হইতে নানাস্থানের ডাক মাশুল—সাহেব চোর—সূর্যাস্তের পর মদের দোকান বন্ধ—পুরীতে জগন্নাথদেবের রথে সিপাহী-পাহারার বন্দোবস্ত—লাটসাহেবের বল—বজবজ দুর্গত্যাগ—কলিকাতা সহরের পথে কুকুরের উৎপাত—পাল্কির ভাড়া—স্যর উইলিয়াম জোন্স—সাহেব-চোরের উৎপাত—কলিকাতা হইতে কাশী যাইবার খরচা—মহারাজা নবকৃষ্ণের দান—চাউলের দরবৃদ্ধি—কলিকাতা ভবানী-পুরে ডাকাতি—খিদিরপুরে ছেলে-বিক্রির আড্ডা—বরানগরে ডাকাতি—বাজারে হত্যাকাণ্ড—ব্রহ্মহত্যা—মহরম ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহাদাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড—কালিদাসের শকুন্তলার অনুবাদ— কলুটোলায় ডাকাতি—আলিপুরে এক সাহেব-বাড়িতে ডাকাতি—সতীমন্দির ও জীবন্ত-সমাধির এক ভীষণ ঘটনা—কাশীনাথ-বাবুর মৃত্যু—সুখসাগরে বাঘ—সেকালের বাঙ্গালীদের অভিনন্দনের নমুনা—সেকালের নববর্ষের উৎসব—সেকালের ঘোড়দৌড়— স্যর উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু—কলিকাতা সহরের সীমা নির্দেশ—কলিকাতায় প্রথম পাকা রাস্তা—সাহেব-ডাকাত কর্তৃক কোম্পানি-বাহাদুরের খাজনা-লুট—রসাপাগলায় ডাকাতি—ভয়ানক শিলাবৃষ্টি ও ঝড়—বাঙ্গালীর বাড়িতে সাহেব-ডাকাত—ধর্মতলায় রাহাজানি—আলিপুরের পুল ভাঙ্গা—প্রথম বাঙ্গলা গ্রামার ও ডিক্সনারি সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের আবেদন—কলিকাতায় প্রথম নেটিভ-হাসপাতাল—ইংরাজের বিপদে বাঙ্গালীর সহানুভূতি—সেকালের ইংরাজদের বিবাহ—সেকালের ঔষধের দাম ও ডাক্তারের ভিজিট—খসখসের টাটির প্রচলন—সেকালের যানবাহন—নাচের মজ-লিস—ইংরাজি-থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—সেকালের থিয়েটারের কথা—ঘোড়দৌড়ের মাঠ—কলিকাতায় প্রথম ক্রিকেট-খেলা—সেকালের আদালতের জজদিগের এদেশীয় ভাষাশিক্ষা—সেকালের লাট-দর্শনের ব্যবস্থা—এক মজাদার বিজ্ঞাপন—কলিকাতায় বাঁধা-কপির প্রথম চাষ—পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন সম্বন্ধে প্রথম লেকচার—কলিকাতায় প্রথম ইন্সুয়োরেন্স কোম্পানি—শতবৎসর পূর্বে লংক্লথের দাম—লালবাজারে সুন্দরবনের বাঘ বিক্রি।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে প্রতিকার

গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতা সহর, মুরশিদাবাদ ও ঢাকায় শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এইজন্য কাউন্সিলের সহিত মন্ত্রণাক্রমে গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, এই প্রকার ব্যবস্থায় উক্ত স্থানসমূহে শস্যের মহার্ঘতা দূর হইতে পারে।

আদেশ করা হইল—কলিকাতা, মুরশিদাবাদ ও ঢাকা প্রভৃতি সহরে যে-সকল স্থানে চাউলের গঞ্জ ও আড়ত আছে, সেই সকল স্থান হইতে সরকারের প্রাপ্য কোনরূপ টোল, ডিউটি ও কাস্টম

আদায় করা হইবে না। যতদিন না শস্যের মূল্য চলিত অবস্থায় আসে, ততদিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে। এজন্য কাস্টম-অফিসার ও জেলার জজসমূহকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই এই শুল্ক ও বাবসমূহ পরিত্যক্ত হইবে। কোম্পানির উল্লিখিত কর্মচারীরা যদি জানিতে পারেন যে, গঞ্জের দারোগারা জুলুম করিয়া এই সমস্ত স্থানে টোল প্রভৃতির টাকা আদায় করিতেছে, কিম্বা এই আদেশের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে—তাহা হইলে এই সকল স্থলে তাহারা যত টাকা শুল্ক আদায় করিবে, কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাহার দশগুণ টাকা তাহাদিগকে জরিমানা করিতে পারিবেন।

এরূপ শোনা গিয়াছে যে, এই প্রকার দুর্ভিক্ষের সময় অনেক মহাজন ও গোলদারগণ অধিক পরিমাণে শস্য কিনিয়া গোলায় সঞ্চয় করিয়া রাখে, পরে সুযোগ বুঝিয়া তাহা খুব চড়া দামে বিক্রয় করে। এই নোটিশ দ্বারা জানান যাইতেছে, যদি কেহ এইরূপভাবে শস্যাদি চড়া দামে বিক্রি করে, কিম্বা আরও দর চড়াইবার জন্য শস্যাদি আটক করিয়া রাখে, কোম্পানি-বাহাদুরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা, তাহা জানিতে পারিলে তাহাদের সমস্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারিবেন। (ফোর্ট উইলিয়াম—১।২।১৭৮৮)

নদীপথে বোম্বেটের উৎপাত

ডায়মণ্ড-হারবারের মুখে, হিজলীর পথে, গেঁয়োখালি প্রভৃতি স্থানে সে সময়ে বোম্বেটের বড় উৎপাত ছিল। এজন্য সরকার বাহাদুর নানাস্থানে 'গার্ড-বোট' বা চৌকি-নৌকার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এই সকল নৌকা নদীর নানাস্থানে পাহারা দিত। পাহারা দিবার জন্য থানাদারেরাই নৌকায় থাকিতেন। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪এ এপ্রিল তারিখের একটি সরকারি আদেশ হইতে জানিতে পারা যায়—"গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর হিজলীর ম্যাজিস্ট্রেটকে হুকুম দিতেছেন যে, নিম্নলিখিত স্থানে চৌকি স্থাপিত হইল। (১) ফলতা—এই চৌকিতে ১ হইতে ২ নংএর বোট থানাদারের অধীনে উলুবেড়িয়া হইতে কুকড়াহাটি পর্যন্ত চৌকি দিবে। (২) রাঙ্গাফুলি—এই চৌকিতে ৩ ও ৪ নংএর গার্ডবোট থাকিবে। এই বোট কুকড়াহাটি হইতে বড়তলা পর্যন্ত স্থান চৌকি দিবে। (৩) সন্দীয়া-গণ্ডিয়া—এই স্থান হলদি নদীর মুখে। বড়তলা হইতে তালপাতি পর্যন্ত স্থান—৫ ও ৬ নংএর গার্ডবোট দ্বারা রক্ষিত হইবে। (৪) গেঁয়োখালি—তালপাতি হইতে হিজলির বাঁক পর্যন্ত ৭ ও ৮ নংএর বোট পাহারা দিবে। থানাদারের বোট চিনিবার সঙ্কেত এই, প্রত্যেক চৌকি-নৌকায় একটি করিয়া লাল-নিশান ও সেই সেই নিশানের উপর সাদা অক্ষরে বাঙ্গলা ভাষায় নৌকার নম্বর থাকিবে।" গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের হুকুমে এই আদেশ প্রচারিত হইল। (২৪।৪।১৭৮৮)।

ঠিক বলিতে পারা যায় না—বাঙ্গালী বা মগ কোন্ শ্রেণীর দস্যুরা, সেই সময়ে এই সকল স্থানে নদীপথে রাহাজানি করিত। কোম্পানি বাহাদুরের রাজত্বের প্রথম আমলে, মগ-দস্যুরা যে মেটিয়াবুরুজ ও কলিকাতার সীমা পর্যন্ত ধাওয়া করিত—ইহার প্রমাণ পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন।

বারাসতে ঘোড়দৌড়

তখনকার দিনে বর্তমান ঘোড়দৌড়ের-মাঠ জঙ্গলে আবৃত ছিল। তাহা বলিয়া সাহেবদের প্রধান আমোদ ঘোড়দৌড় বন্ধ থাকিত না। ঐ সময়ে একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায় যে, "যদি আবহাওয়া ভাল থাকে, তাহা হইলে বারাসতের মাঠে ঘোড়দৌড় হইবে। সময় অপরাহ্ন। সেলবি সাহেব উপস্থিত ভদ্রমহোদয়দের জন্য খানার ও টিফিনের বন্দোবস্ত করিবেন।"

বাগবাজার চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি[১]

গত ৬ই এপ্রিল তারিখে, অমাবস্যার দিন শনিবারে, চিৎপুরের কালীমন্দিরে একটি ভীষণ নরবলি হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারময় রজনীর অন্তরালে এই ভীষণ কাণ্ড একজন বা একাধিক লোক দ্বারা

---

১. চিত্তেশ্বরী অথবা চিত্রেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং এই মন্দিরের অবস্থান কোথায় ছিল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ রাধারমণ মিত্রের 'কলিকাতা দর্পণ' পৃ. ৭৪-৭৫ দ্রষ্টব্য।

সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কয়জন লোক এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মন্দিরের পুরোহিত বলেন যে, তিনি রাত্রে পূজাদির পর যথারীতি দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। সম্ভবত কেহ গভীর রাত্রে দ্বার ভাঙ্গিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে। যে মানুষটিকে বলি দেওয়া হইয়াছিল তাহার রুধিরাক্ত মুণ্ডটি মন্দিরের প্রতিমার পদতলের উপর ছিল, ধড়টা মন্দিরের বাহিরে একটি স্থানে পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া একখানি বহুমূল্য বেনারসী শাড়ি, সোনার কণ্ঠমালা ও দুইখানি রৌপ্যালঙ্কারও সেই প্রতিমার নিকট ছিল। এই নরবলি-যজ্ঞের উপযুক্ত যে-সমস্ত পাত্রাদির প্রয়োজন, তাহাও সেইস্থানে পাওয়া গিয়াছে। যে শাস্ত্রের বিধানানুসারে এইরূপ নরবলি দিবার নিয়ম আছে, তদনুযায়ী এই সমস্ত পাত্রাদি নির্মিত হইয়াছে। পূজার উপকরণ, জিনিসপত্র ও মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারাদি দেখিয়া প্রমাণ হইতেছে, কোন ধনবান বাঙ্গালী এই ঘটনার মূলে আছেন। অনুষ্ঠান পদ্ধতি দেখিয়া ইহাও বোধ হয়, তিনি কেবল ধনবান নহেন, তন্ত্রাদি-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত। যাহাকে বলি দেওয়া হইয়াছে তাহার আকৃতি দেখিয়া চণ্ডাল-শ্রেণীর লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। সাধারণে এই অনুমানেরই সমর্থন করিয়াছে। নিহত ব্যক্তি কলিকাতার লোক নহে, সম্ভবত নিকটস্থ কোন পল্লীগ্রাম হইতে তাহাকে আনা হইয়াছিল। ঘটনাস্থলে ফৌজদার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তদারক করেন। তিনি মন্দিরের নিত্যপূজক ব্রাহ্মণকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোনরূপ নূতন কথা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। (২৪।৪।১৭৮৮)

সেকালের বাঙ্গালীর সাহেব-পূজা

সেকালের সাহেবেরা বাঙ্গালীদিগকে খুব ভালবাসিতেন, তাহাদের সহিত খুব মেলামেশা করিতেন। কিসে তাহাদের দুঃখ দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গালী প্রজাগণকে সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন। এখনকার কালেও যে এ দৃশ্য দুর্লভ তাহা নহে। আজকালও এমন অনেক প্রজাপ্রিয় রাজ-কর্মচারী আছেন, যাঁহারা এ দেশের লোকদিগকে যথেষ্ট প্রীতির চক্ষে দেখেন। এ যুগের বাঙ্গালীরা তাঁহাকে, জোর হয় একটা বিদায়ী অভিনন্দন না হয় প্রীতি-ভোজ দিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়া থাকে। কিন্তু সেকালের অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্বের একটি ঘটনা শুনিয়া রাখুন।

মিস্টার টিলম্যান হেংকেল সাহেব যশোহরের প্রথম কলেক্টর। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে তিনি এই পদ লাভ করেন। শেষ তিনি সুন্দরবনের নিমকিমহলের সর্বপ্রধান কর্মচারী হন। যে সকল গরীব 'মলঙ্গী'[১] তাঁহার অধীনে চাকরি করিত, লবণ প্রস্তুত করিত, তিনি তাহাদের সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। তখনও তিনি কর্মে নিযুক্ত। কৃতজ্ঞ প্রজারা তাহাদের প্রাণের অনুরক্তি দেখাইবার জন্য, প্রত্যেক গৃহে তাঁহার মৃন্ময় মূর্তি গড়িয়া দেবতার মত পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই কথাটি পরে সংবাদরূপে সেকালের একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। (২৪।৪।১৭৮৮)

অতিকায় ভেট্‌কি

লক্ষ্মীয়া নদীতে একটি ভেট্‌কি (সেকালে ইংরাজেরা ভেট্‌কি-মাছকে Cockup বলিতেন) ধরা পড়িয়াছিল। এত বড় ভেট্‌কি-মাছ কখনও কাহারও চোখে পড়ে নাই। মাছটিকে কোম্পানির ঢাকা-ফ্যাক্টরিতে আনা হয়। দুইটি বংশদণ্ডে বাঁধিয়া আটজন কুলীতে ইহা বহিয়া আনে। মাছের পিঠে নয়টি বড় বড় কাঁটা ছিল। এ দেশের লোকেরা বলিল, মাছটি নয় বৎসরের। প্রত্যেক বৎসরে একটি করিয়া কাঁটা গজাইয়া উঠে। চোয়াল হইতে লেজের শেষ পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ছয় ফিট আট ইঞ্চি। দেহের পরিধি চারি ফিট দশ ইঞ্চি। সমস্ত মাছের পাক্কা ওজন তিন মণ দশ সের। (১৫।৫।১৭৮৮)

খিচুড়ি বিতরণ

বোধ হয় ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা সহরের মধ্যে গরীবদের বিশেষ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল।

১. মলঙ্গীরা "Salt workers were placed under the agents from whom they received advances. They could not sell salt to any person. The agents stored salt and sold it to wholesale dealers at a price to be fixed by Government every year."—N.K. Sinha, *Economic History of Bengal*, Vol I. p. 217.

এজন্য দরিদ্রদের মধ্যে অন্ন বিতরণ জন্য, একটি কমিটি সংগঠিত হয়। এই কমিটি চাউল ও নগদ পয়সা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উক্ত খৃষ্টাব্দের এক বিবরণী হইতে দেখা যায়, নগদ পয়সা ও চাউল বিতরণে কুলাইয়া না উঠায় কর্তৃপক্ষগণ দরিদ্র সাধারণের মধ্যে 'খিচুড়ি বা ভাত' বিতরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ—"প্রেসিডেন্সির মধ্যে দরিদ্রদের সাহায্য জন্য, যে ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহার সদস্যগণ সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইবে না। খিদিরপুর, বৈঠকখানা ও বীর্জিতালাও[১] এই তিনটি স্থানে তিনটি 'অন্নছত্র' প্রস্তুত হইবে। এই স্থানসমূহ হইতে দরিদ্রদিগকে ভাত বা খিচুড়ি বিতরণ করা যাইবে। যাহারা অনাহারে ইতি পূর্বে রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য এই ফণ্ডের অর্থ হইতে বৈঠকখানার বাজারে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল করা হইল।" (৪।৯।১৭৮৮)

ডাকাতির সংবাদ

"আজকাল ডাকাতগণ বড়ই সাহসী ও অত্যাচারী হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকজন সিপাহী পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া বীরভূম হইতে বর্ধমানে আসিতেছিল। ডাকাতেরা দুইজন সিপাহী ও তিনজন পেয়াদাকে হত্যা করিয়া ৩০ হাজার টাকা লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।" (১৬।১০।১৭৮৮)

সুন্দরবন হইতে ঢাকা পর্যন্ত নদীপথে এই সময়ে ডাকাতের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। ডাকাতেরা নৌকা করিয়া দল বাঁধিয়া নদীবক্ষে ডাকাতি করিত। অনেক ডাকাতি-নৌকায়, কোম্পানি-বাহাদুরের নিশানের অনুরূপ নিশান রাখা হইত। প্রকাশ্য দিবাভাগেও এই দুর্দান্ত ডাকাতগণ যাত্রী ও মালের নৌকা আক্রমণ করিত। কিন্তু সাহেবগণের নিকট বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি থাকায় ডাকাতেরা অনেক স্থলে নিরাশ হইয়া প্রস্থান করিত। (১৩।১১।১৭৮৮)

সুন্দরবন ছাড়া কলিকাতার পার্শ্ববর্তী নদীসমূহেও ডাকাতের ভয় ছিল। একজন নায়েক ও আট জন সিপাহী-পূর্ণ একখানি নৌকা কলিকাতা হইতে কালনা যাইতেছিল। চূর্ণী নদীর উপর ডাকাতেরা এই সিপাহী-নৌকা আক্রমণ করে। ডাকাতদের সঙ্গেও অনেকগুলি নৌকা ছিল। প্রত্যেক নৌকায় ১৬ হইতে ১৮ জন লোক ছিল। ডাকাতেরা সিপাহীদের নৌকায় উঠিয়া তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করে। অনেক সিপাহীকে তাহারা জখম করিয়া রাখিয়া যায়। প্রস্থানের সময়, তাহারা সিপাহীদের বন্দুক ও কিরিচগুলি কাড়িয়া লইয়া যায়।

সেই সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশ, যশোহরের ম্যাজিস্ট্রেট হেংকেল সাহেব এক সময়ে ২২ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেন। নিমকির-এজেণ্ট, সল্ট সাহেবও ১১জন ডাকাতকে বন্দী করেন।

(২০।১১।১৭৮৮)

সুন্দরবনের এই ডাকাতের দলের সর্দার পরে ধরা পড়ে ও তাহার ফাঁসি হয়। (৬।১২।১৭৮৮)

সহরের মধ্যে চুরি ও রাহাজানি

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের সেসনে সুবিখ্যাত সুপ্রীমকোর্টের জজ স্যর উইলিয়াম জোন্স পুলিশ ব্যবস্থার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার মর্মার্থ হইতে জানা যায়, কলিকাতা সহরে তখন গুণ্ডা ও বদমাইসদের বিশেষ প্রাবল্য ছিল। স্যর উইলিয়াম বলিয়াছিলেন—"গত দেড় মাসের মধ্যে সহরের মধ্যে আমি নানারূপ অশান্তির অভিযোগ পাইয়াছি। ইহার পূর্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। মারামারি দাঙ্গা ও রাত্রে সিঁধ কাটিয়া বা জবরদস্তিতে কাড়িয়া লওয়া প্রভৃতি ব্যাপার, সহরের মধ্যে ইদানীং বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে।" ফৌজদারি বালাখানার নিকটস্থ একটি রাস্তার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"এই রাস্তার উপর অনেকগুলি ইটালিয়ান, স্প্যানিশ; এবং পর্টুগীজ হোটেল ও মদ্যপানাগার আছে। এই সকল স্থানেই উপদ্রব কিছু বেশী।"

(১১।১২।১৭৮৮)

---

১. সেন্টপলস্ ক্যাথিড্রালের দক্ষিণে অবস্থিত পুকুর। আপজন-এর মানচিত্রে পার্ক ষ্ট্রীট, সার্কুলার রোড ও চৌরঙ্গীর মধ্যবর্তী অঞ্চল 'ডিহি বির্জি' নামে চিহ্নিত হইয়াছে।

চাকরি জবাব

শতাধিক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ছাড়া আর একটি ব্যাঙ্ক ছিল। তাহার নাম জেনারেল ব্যাঙ্ক। ১ এই ব্যাঙ্কের একটি সাধারণ নোটিশ হইতে জানিতে পারা যায়, "বেহারিলাল বাবু এদেশীয় লোকেদের নিকট হইতে "ব্যাঙ্ক-বিলের উপর অন্যায় দস্তুরি লইতেন। সম্প্রতি তাঁহার এ কার্য ধরা পড়ায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল।" এ সকল সংবাদও তখন আবশ্যকীয় বোধে সরকারি-গেজেটে প্রকাশ হইত। তখন ইংরাজি জানা বাঙ্গালী চাকুরের সংখ্যা খুব কম ছিল। (১৭।৭।১৭৮৮)

ঘোড়া-ব্রেক সম্বন্ধে পুলিশ অর্ডার

"এসপ্লানেডের মধ্য দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে, সেই রাস্তায় ও তাহার সংশ্লিষ্ট পথসমূহে, আগামী ২০এ মার্চ হইতে আর কেহ ঘোড়া 'ব্রেক' করিতে পারিবেন না। এইজন্য সাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে, তাঁহারা তাঁহাদের সহিস-কোচম্যানদের এই আদেশটি ভাল বুঝাইয়া দিবেন। সহরের যে অংশে লোক-চলাচল কম, সে সকল স্থলে ঘোড়া-ব্রেক করিতে লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে কোন আপত্তি ঘটিবে না।" (১২।৩।১৭৮৯)

ক্রীতদাস ক্রয় সম্বন্ধে গবর্ণর-জেনারেলের আদেশ

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে সরকারি-গেজেটে নিম্নলিখিত ঘোষণা-পত্রটি বাহির হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, তাঁহার আমলেও সাহেব ব্যবসায়ী ও এদেশীয় ব্যবসাদারগণ দাস ক্রয় করিয়া বিক্রয়ার্থে তাহাদের নানাস্থানে পাঠাইতেন।

"গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছেন যে, অনেক এ দেশীয় ব্যক্তি ও সাহেব-সুবাগণ প্রচলিত আইনের ও মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে কার্য করিয়া নানা স্থান হইতে ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন ও বিক্রয়ার্থে তাহাদের ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দেন। এই ক্রীতদাসের দলে অনেক বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতী থাকে। এই নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন প্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য সকাউন্সিল গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর আদেশ করিতেছেন, "ভবিষ্যতে যাহারা এইরূপ ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে ধরা পড়িয়া অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, কোম্পানি-বাহাদুর নিজের খরচায় তাহাদের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন ও তাহারা যাহাতে কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে। যে-সকল ব্যক্তি ব্রিটিশবরুন কিম্বা সুপ্রীমকোর্টের জুরিসডিকসনের সরাসর অধীন নহে, তাহাদিগকে বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। যে-সকল ব্যক্তি, ইংরাজ-কোম্পানির প্রজা নহে, তাহারা যদি এ সম্বন্ধে কোনরূপ অপরাধ করে, তাহা হইলে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট, তাহার অপরাধের প্রমাণ লইয়া তখনই তাহাকে কারাবদ্ধ করিবেন। তৎপরে দেশ-প্রচলিত আইনানুসারে তাহার দণ্ডবিধান হইবে। যাহারা এই প্রকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাহাদের ধরাইয়া দিতে পারিবে, বা ক্রীতদাসগণ কোথায় আবদ্ধ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটকে তাহার সন্ধান দিতে পারিবে, তাহারা অপরাধীর দণ্ডাজ্ঞার পর একশত সিক্কা পুরস্কার পাইবে।"

"এই ঘোষণাপত্র প্রত্যেক জেলার, স্থানীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হইবে। প্রত্যেক বৎসর জানুয়ারি মাসে নূতন করিয়া এই ঘোষণা-পত্র একবার পাঠ করা হইবে। ভবিষ্যতে যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করে 'আইন না জানাতে আমরা এইরূপ অপরাধ করিয়াছি' তাহা আমলে আসিবে না। অপরাধীর দণ্ডবিধানের পর ম্যাজিস্ট্রেট গোয়েন্দাদিগকে একখানি

১. "On March 17, 1786 the leading merchants of Calcutta met and floated a bank under the name of The General Bank of India. It was the earliest liability bank in India, consisting of 100 subscribers of 20,000 *sicca* rupees each. It went into voluntary liquidation five years after it had started."—See *Home Public O.C.* dated 3rd January 1707, No. 48, *I.H.R.C. Proceeding* Vol. IX, pp. 80-86. Quoted in *Fort William—India House Correspondence*, Vol X, p. 708.

পরিচয়-পত্র দিবেন। গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি সাহেবের অফিসে সেই পত্র দাখিল করিলেই প্রতিশ্রুত পুরস্কার দেওয়া হইবে।" (২২।৭।১৭৮৯)

নীলের চাষ

২৯এ অক্টোবর ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে সরকারি ঘোষণাপত্র হইতে জানা যায়, ঐ সময়ে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম নীলের চাষ আরম্ভ হয়। এজন্য গোয়াটিমালা হইতে নীলের নমুনা এদেশে আনীত হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের আদেশে, যাহারা নীলের ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে বিনামূল্যে নমুনা দেওয়া হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চেয়ারম্যান বাহাদুরই তৎকালীন লাটসাহেব লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট এই নীল বঙ্গদেশে পরীক্ষার্থে পাঠাইয়া দেন।

ধর্মতলায় পুষ্করিণী খনন

গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে এসপ্লানেড অর্থাৎ বর্তমান ধর্মতলার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের উন্নতির জন্য কার্য আরম্ভ করেন। এই সময়ে ধর্মতলার (অর্থাৎ এখন যেখানে ট্রাম কোম্পানির বিশ্রাম-গৃহ ও কার্জন পার্ক হইয়াছে) একটি স্থানের জঙ্গল কাটিয়া স্থানটিকে পরিচ্ছন্ন করা হয়। তখন কলিকাতায় পানীয় জলের জন্য এক লালদীঘি ব্যতীত আর কোন ভাল পুকুর ছিল না। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের আদেশে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারিতে এই স্থানে একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খননের জন্য কনট্রাক্ট দেওয়া হয়। কেবল ধর্মতলার এই পুষ্করিণী নহে, হরিণবাটি জেলের নিকট আরও দুইটি পুষ্করিণী খননের আদেশও এই সময়ে দেওয়া হইয়াছিল। এই তিনটি পুকুরের মধ্যে দুইটি কেবল সাহেবদের ও সম্ভ্রান্তশ্রেণীর পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত হইত ও অপরটি ঘোড়া ধোয়াইবার ও সাধারণের জল পানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ধর্মতলার পুষ্করিণী অধুনাতনকালে বুজাইয়া ফেলা হইয়াছে। এখন এই স্থানের উপর ট্রাম কোম্পানির ধর্মতলার স্টেশন ও কার্জন পার্ক হইয়াছে।

উড়িয়া মহলের বাব[১] আদায়

পাঠক! কলিকাতায় সেকালে উড়িয়ার আমদানি যথেষ্ট না থাকিলেও কতক পরিমাণে ছিল বটে। কলিকাতা সহরে এই সমস্ত উড়িয়াদের একজন সর্দার থাকিত। তাহাকে 'পরামানিক' বলিত। পরামানিকেরা কলিকাতায় নবাগত ও অধিবাসী উড়িয়াদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয় বাবতে বৃত্তি আদায় করিত।

১। যে কোন উড়িয়া কলিকাতায় চাকরির জন্য আসিবে, তাহাকে বাৎসরিক চারি আনা দিতে হইবে।

২। যে কোন উড়িয়া সহরের মধ্যে স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করিবে, তাহাকে বাৎসরিক এক টাকা দিতে হইবে।

৩। যে সমস্ত উড়িয়া স্ব স্ব শ্রেণী মধ্যে বিবাহাদি করিবে, তাহাকে ক্ষমতামত কিছু 'রুসুম' দিতে হইবে।

৪। বিবাদস্থলে যাহার দোষ প্রমাণ হইবে, তাহার নিকট হইতে 'দণ্ড স্বরূপ' কিছু আদায় করা হইবে।

৫। যখন কোন লোকের বিবাহের অনুষ্ঠান হইবে, তখন তাহাকে একশত পান ও দশটি সুপারি দিতে হইবে।

৬। যদি কোন উড়িয়া অন্য লোকের নিকট দুই চার টাকা ধার করে, আর দুষ্টামি করিয়া তাহা শোধ করিতে না চায়, এবং এরূপ স্থলে মহাজন যদি নালিশ করে, তাহা হইলে পরামানিক খাতককে উক্ত ঋণের টাকা দিতে বাধ্য করিবে।

৭। যে কোন উড়িয়া, নিজের শ্রেণী ভিন্ন দুষ্টামি করিয়া অন্য শ্রেণীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে 'দণ্ড স্বরূপ' কিছু দিতে হইবে।

৮। যে উড়িয়া নিজের জাতি ছাড়া অপরের অন্ন গ্রহণ করিবে, তাহাকে 'দণ্ড স্বরূপ'

১. বাব—অতিরিক্ত আদায়।

কিছু দিতে হইবে।

৯। যদি কোন উড়িয়া ব্যাপারী, বা কাপড়-বিক্রেতা, ভগবানের কৃপায় (?) কলিকাতায় ব্যবসা করিতে আসে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার দোকানের জন্য পাঁচ টাকা করিয়া দিবে।

১০। উড়িয়া সেকরা, ধোপা, চিনি-ব্যবসায়ী, শস্য-বিক্রেতাগণ কিছু কিছু বৃত্তি দিতে বাধ্য।

১১। যে-সকল উড়িয়াবাসীর কলিকাতায় মৃত্যু হইবে, তাহার মৃত্যুসংবাদ তখনই পরামানিকের বা সহরের মধ্যে উড়িয়া-সর্দারের নিকট পাঠাইতে হইবে। এরূপ স্থলে পরামানিক সেই মৃত-ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদির জন্য যে টাকা প্রয়োজন, তাহা মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে দেওয়াইবেন। বাকি যাহা থাকিবে, তাহা তাহার উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইবে। যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধাদির ব্যয়ের জন্য কিছু দিয়া বাকি যাহা তাহা পরামানিকই লইবে।

১২। যদি কোন উড়িয়া বেহারা মরিয়া যায়, আর উক্ত মৃত ব্যক্তির কলিকাতায় কেহ না থাকে, তাহা হইলে পরামানিক তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছয় মাসকাল রাখিয়া দিবেন। ইতিমধ্যে দেশ হইতে যদি কোন উত্তরাধিকারী আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই মৃতের সমস্ত সম্পত্তি লইবে। কিন্তু এরূপ উত্তরাধিকারীর অবর্তমানে পরামানিক মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি কোন দাতব্য-কার্যে ব্যয় করিবেন।

১৩। উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও যাদুকর-বৃত্তি (?) অবলম্বনকারী উড়িষ্যাবাসিগণ পরামানিককে সাধ্যমত কিছু দিবে।

একজন উড়িয়া পরামানিক তৎকালীন বোর্ড-অব-রেভেনিউর সেক্রেটারী সাহেবের নিকট তাহার প্রাপ্য বাব সম্বন্ধে উল্লিখিত একটি তালিকা দাখিল করে। এইরূপ প্রথা কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। গবর্ণর-জেনারেল সাহেবের চক্ষে এই সকল বাব-আদায় প্রথা নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই আগস্টের ঘোষণাপত্র দ্বারা এই উপরি আদায়ের পথ বন্ধ করিয়া দেন।

এই 'পরামানিকই' সেকালের কলিকাতার অধিবাসী উড়িয়াগণের নেতা ছিল। এই ঘটনা হইতে জানা যাইতেছে, উড়িয়াগণ কোম্পানির মধ্যের আমল হইতেই শতাধিক বৎসর পূর্বে কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরির জন্য জুটিয়াছে।

উড়িয়া বেহারারা সেকালে অনেক বড় মানুষের বাড়ি চাকুরি করিত। মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের অনেক উড়িয়া চাকর ছিল। তখনকার দিনে গাড়ি-ঘোড়ার প্রচলন বেশী ছিল না। পালকিই তখনকার সাধারণের ব্যবহার্য যান ছিল। ভাড়াটিয়া পালকি ছাড়া অনেক বাঙ্গালী ও সাহেব বড়লোক পালকিতে চড়িতেন। উড়িয়ারাই এই সব পালকি বহন করিত।

কলিকাতা হইতে নিম্নলিখিত স্থানসমূহে চিঠি পাঠাইবার পোস্টেজের হার (১৭৯১ খ্রীস্টাব্দ)

	ঠিক ২॥ তোলা ওজনের চিঠি	২॥ হইতে ৩॥ তোলা ওজনের চিঠি	৬॥ হইতে ৭॥ তোলা ওজনের চিঠি
বেনারস	।৶০ আনা	৸৵০ আনা	২॥৵০ টাকা
পাটনা	।/০	॥৵০	১৸৵০
সারগটি ও রামগড়	।/০	॥৵০	১৸৵০
বৌগা (?) চৌসা	।৶০	৸৵০	২॥৵০
সরকার সারণ	।৵০	৸০	২।০
বক্সার	।৵০	৸০	২।০

	ঠিক ২॥ তোলা ওজনের চিঠি	২॥ হইতে ৩॥ তোলা ওজনের চিঠি	৬॥ হইতে ৭॥ তোলা ওজনের চিঠি
ত্রিহুত	।৵০	৸০	২।০
রঘুনাথপুর	৶০	।৵০	১৵০
বারাকপুর, হুগলী, চন্দননগর	৴০	৵০	।৵০
নদীয়া, শান্তিপুর, সুখসাগর	৵০	।০	৸০
বর্ধমান	৵০	।০	৸০
সুরী, বীরভূম	৶০	।৵০	১৵০
মুরশিদাবাদ	৵০	।০	৸০
বহরমপুর	৵০	।০	৸০
রাজমহল	৶০	।৵০	১৵০
ভাগলপুর	৶০	।৵০	১৵০
পূর্ণিয়া ও কুচবিহার	।০	॥০	১॥০
রঙ্গপুর ও দিনাজপুর	।০	॥০	১॥০
নাটোর	৶০	।৵০	১৵০
মুঙ্গের	।০	॥০	১॥০
ঢাকা	৶০	।৵০	১৵০
কয়দা (Coydah)	।৴০	॥৵০	১৸৵০
শিলেট	।৴০	॥৵০	১৸৵০

সাহেব-চোর

গত মঙ্গলবার রাত্রে (নভেম্বর ১৭৯১,) চৌরঙ্গীর পথে তিনজন সাহেব রাহাজানি ও চুরি করিয়াছে। সম্ভবত ইহারা জাহাজের নাবিক। এই ব্যাপারে এক ভদ্রলোকের সোনার-ঘড়ি ও সোনার-চেন খোয়া গিয়াছে। যে কেহ এই সমস্ত অপহৃত দ্রব্যের বা চোরের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে বা চোর ধরাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে চারিশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। (২।১১।১৭৯১)

সূর্যাস্তের পর মদের দোকান-বন্ধ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, মদের দোকানের অধিকারিগণ এই নোটিসের তারিখ হইতে ঠিক সূর্যাস্তের সময় তাহাদের মদের দোকান বন্ধ করিবেন।

পুলিশ অফিস — জি, সি, মেয়ার
১৯ নভেম্বর ১৭৯১ — সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

জগন্নাথের রথে সিপাহীর বন্দোবস্ত

"প্রত্যেক সেনাদল হইতে একজন জমাদার ও ২০ জন করিয়া সিপাহী লইয়া একটি দল সংগঠিত হইবে। এই জমাদার ও সিপাহী হিন্দু ব্রাহ্মণ হওয়া চাই কারণ তাহাদিগকে পুরীধামে জগন্নাথের রথ-যাত্রার সময় পাহারা দিতে হইবে। তাহারা দুই তিনদিন জগন্নাথক্ষেত্রে থাকিয়া যাত্রীদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবে।" *(Extract from D.O. dated 26/12/1792*

লাটসাহেবের বল

সেকালে বল ও সাপার (নাচ ও রাত্রে-ভোজনের) নিমন্ত্রণ উৎসব লাটসাহেবের বাড়িতে হইত না। তখন বর্তমান লাটপ্রাসাদের অস্তিত্ব-মাত্র ছিল না। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি তাহার প্রমাণ, "যে সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণ ইংলণ্ডেশ্বরের ও কোম্পানি-বাহাদুরের সেনাবিভাগে ও সিভিল-বিভাগে নিযুক্ত আছেন, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাদিগকে ১৮ই জানুয়ারি (১৭৯৩) থিয়েটার-গৃহে বল ও সাপারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ঐ দিন ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মতিথি, এইজন্যই এই ভোজের ও আমোদের আয়োজন।" *(C.G. 10.1.1798)*

বজবজ দুর্গত্যাগ

বহুকাল হইতে ঐতিহাসিক বজবজ-দুর্গ কোম্পানির দখলে ছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ে

ও তাহার পূর্ব হইতে 'বজবজের-কেল্লা' ইংরাজের একটি প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। লর্ড কর্ণওয়া-লিসের আমলে তাঁহার আদেশে বজবজ-দুর্গ পরিত্যক্ত হয়। এখানে যে সমস্ত কামান ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ছিল তাহা গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের আদেশে নবনির্মিত বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে স্থানান্তরিত হয়। এই সঙ্গে বজবজ-দুর্গ সহর ও তৎসংক্রান্ত বাড়িঘরগুলি বোর্ড অব রেভেনিউয়ের হস্তে দেওয়া হয়। (৭-৩-১৭৯৩)। ইহার পরে ২৩এ মে ১৭৯৩ খৃীস্টাব্দের নোটিস হইতে জানিতে পারা যায়, "সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আগামী ১০ই জুন (৩০এ জ্যৈষ্ঠ ১২০০ সাল) ২৪ পরগনার কলেক্টর সাহেবের কাছারিতে অনারেবল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বজবজিয়ার যে সমস্ত বাড়িঘর ও মালামাল আছে, তাহা প্রকাশ্য-নিলামে বিক্রয় করা হইবে। এই সমস্ত বাড়িঘর ও জিনিসপত্র দেখাইবার জন্য বজবজিয়াতে কোম্পানির একজন কর্ম-চারীকে রাখা হইয়াছে।

সহরের পথে কুকুরের উৎপাত

"পুলিস-কমিশনারগণ সাধারণকে জানাইতেছেন, কলিকাতা সহরের রাজপথে কুকুরের উৎপাত বড় বেশী হইয়াছে। এজন্য স্ক্যাভেঞ্জার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আগামী ২১শে মে হইতে জুন মাসের ১লা তারিখ (১৭৯৩ খৃীস্টাব্দ) পর্যন্ত, সহরের পথে যে সমস্ত কুকুর দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাদিগকে হত্যা করা যাইবে। প্রত্যেক কুকুরের জন্য দুই আনা হিসাবে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। যাঁহাদের পোষা কুকুর আছে, তাঁহারা যেন ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাদের কুকুরগুলিকে বাহিরে ছাড়িয়া না দেন। এই প্রথানুসারে এখনও Stray dog সম্বন্ধে নোটিস পুলিস অফিস হইতে বাহির হইয়া থাকে।

(*Police Notification 21st May, 1793*)

পালকির ভাড়া

বালেশ্বরবাসী উড়িয়া বেহারাদের সর্দার-পরামানিকদিগকে জস্টিস-অব-দি-পিস্ মহোদয়দিগের নিকট আহ্বান করিয়া পালকির ভাড়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধানগুলি বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারাও এই মতে কার্য করিতে স্বীকৃত।

(*Order dated 28.5.1794*) *Office of the Sitting Justices*

(১) পাঁচজন ঠিকা বেহারার সমগ্র একদিনের জন্য ভাড়া, এক সিক্কা টাকা। (২) পাঁচ-জন ঠিকা বেহারার অর্ধদিনের জন্য আট আনা মাত্র। (৩) কলিকাতার বাহিরে পাঁচ মাইল পর্যন্ত দূরে যাইতে হইলে প্রত্যেক বেহারার ভাড়া দৈনিক চারি আনা। (৪) চারি ক্রোশ বা আট মাইলের ভাড়া একদিনের ভাড়ার মত। উড়িয়া বেহারাদের সর্দার পরামানিকেরা এই ভাড়ায় স্বীকৃত হইয়া তাহাদের নাম সহি করিয়া দিয়াছে।

স্যর উইলিয়াম জোন্স

লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর, স্যর জন শোর গবর্ণর জেনারেল হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই বর্তমান এসিয়াটিক-সোসাইটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তখন গবর্ণরেরাই, সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি পদে নিযুক্ত হইতেন।[১] স্যর উইলিয়াম জোন্স বহু ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতিতে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে তিনি সুপ্রীম কোর্টের জজরূপে নিযুক্ত হন। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, মেধাবী, সর্বশাস্ত্রবিৎ সর্ববিধ জ্ঞানাধার, মহাপণ্ডিত জজ এদেশে একজনও আসেন নাই। তিনি হিন্দু-পণ্ডিত ও মুসলমান-মৌলবী-দিগের সহায়তায় হিন্দু ও মুসলমান আইনঘটিত মোকদ্দমাসমূহের বিচার করিতেন। তাঁহার হিন্দু-

---

১. এসিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সভাপতি স্যর উইলিয়ম জোনস। গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে সভাপতি পদের জন্ত বিচারপতি জোন্সই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি।

সহকারীকে 'জজ-পণ্ডিত' বলিত। প্রবাদ এই, সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন[১] জোন্সের আমলে জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। স্যর উইলিয়াম জোন্স গার্ডেনরিচে একটি বাগানবাড়িতে থাকিতেন। তাঁহার আমলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় বিভাগেরই আমূলে সংস্কার হইয়াছিল। সেকালে কলিকাতায় চোর-ডাকাতের বড় উৎপাত ছিল। স্যর উইলিয়াম তাহাদের প্রায় একরূপ উচ্ছেদ করিয়া যান। তিনি বলিতেন, "আমি যদি পৃথিবীর সমস্ত ভাষা না শিখিয়া মরি, তাহা হইলে আমার জন্য কেহ যেন অশ্রুপাত না করে।"

স্যর উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যুর পর এসিয়াটিক-সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে (২রা মে ১৭৯৪) গবর্ণর জেনারেল স্যর জন শোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) মৃতব্যক্তির গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া একটি সুদীর্ঘ সন্দর্ভ পাঠ করেন। উক্ত সন্দর্ভ অতি দীর্ঘ ও নানা কথায় পরিপূর্ণ। সবিস্তারে তাহা অনুদিত করা অসম্ভব। এজন্য আমরা তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠক দেখিবেন, স্যর উইলিয়াম জোন্স কিরূপ প্রতিভাশালী ও বাণীর বর-পুত্র ছিলেন। গবর্ণর সাহেবের বক্তৃতার সারমর্ম এই—"এই সভার ভূতপূর্ব সভাপতি স্যর উইলি-য়াম জোন্স ইহজগতে আর নাই। কিন্তু তিনি আমাদের সকলের মনের মধ্যে জাগ্রতভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় একজন মহাজ্ঞানী পণ্ডিতকে সভাপতিরূপে পাইয়া এই সভা ধন্য হইয়াছে।

তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা কতদূর ছিল, তাঁহার জ্ঞান কতদূর বৈচিত্র্যময়ী ছিল, তাঁহার গবেষণা কিরূপ মৌলিক ছিল, নানাদেশের ভাষায় অতি অল্প বয়সে তিনি কিরূপ ভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার অধিকার ও শক্তি আমার নাই।

পৃথিবীর সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান ভাষায় তিনি প্রচুর দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমান-সাহিত্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ ও অপরিমেয়। কিশোর অবস্থাতেই তিনি এই পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, ইটালিয়ান, জার্মান ও পর্টুগীজ ভাষাতেও তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। জীবনের মধ্যাবস্থায় তিনি প্রাচ্য-ভাষাসমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সর্বপ্রথমে হিব্রু, তৎপরে ফার্সী ও আরবী ভাষা তাঁহার আয়ত্তাধীনে আসে। তুর্কি ও চীনা ভাষাতেও তাঁহার মোটামুটি জ্ঞান হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে আগমনের পর তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রগাঢ় মনীষাবলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা একবাক্যে আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন, সংস্কৃতে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অতি গভীর ও ভাষাজ্ঞান অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি এই সমস্ত পণ্ডিত-দিগকে ডাকাইয়া আনি। পণ্ডিতেরা স্যর উইলিয়ামের মৃত্যুতে অধীর হইয়া আমার সম্মুখে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

সুপ্রীমকোর্টের জজরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি মূল ফার্সী ও আরবী ভাষা হইতে মুসল-মান ধর্মসম্বন্ধীয় আইনের মুসাবিদা করেন। সংস্কৃত হইতে হিন্দু-দায়াধিকার ও অন্যান; প্রয়ো-জনীয় বিধি-ব্যবস্থার সঙ্কলন করেন। যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান অর্থী--প্রত্যর্থী মোকদ্দমার বিচারকালে তাহাদের জাতীয়-আইন হইতে যথারীতি সাহায্য পায়, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে তিনি কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। এই জন্য তিনি হিন্দুর প্রধান ধর্মশাস্ত্র 'মনুসংহিতা' ও মুসল-মানের দায়াধিকার তত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক 'সিরাজিয়া' 'জেইদ' প্রভৃতি আরবী-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।

স্যর উইলিয়াম জোন্সের গুণ-গরিমা, পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাই গবর্ণর জেনারেল স্যর

---

১. জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৫-১৮৬০)—"A very distinguished member of the race of Pandits, who flourished in Bengal in the early days of British rule; son of Rudradeva Bhattacharya, a poor Brahman of Tribeni Hughli . . . He had a wonderful memory, and became a remarkable logician and unrivalled in his knowledge of Hindu law."—C.E. Buckland, ***Dictionary of National Biography***, p. 415.

জন শোর বলিয়া গিয়াছেন। তাহার সবিস্তার অনুবাদ দিতে গেলে আট দশটি পৃষ্ঠা হইয়া পড়ে। ধরিতে গেলে, তাঁহারে ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত-ইংরাজ এদেশে খুব কম আসিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়াম জোন্স বহু বিষয় সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ বা রচনা করিয়াছিলেন আমরা গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের বর্ণিত তালিকা হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতেই পাঠক তাঁহার অদ্বিতীয় মনীষার ও গবেষণার পরিচয় পাইবেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে—(১) ভারতের পুরাতন ভূগোল (পুরাণাদি হইতে)। (২) ভারতীয় নানাবিধ গাছগাছড়া ও ভৈষজ্য সম্বন্ধে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান। (নানা কোষ হইতে সংগৃহীত)। (৩) পাণিনি ব্যাকরণের সার মর্মানুবাদ। (৪) ৩২ খানি অভিধান ও নিরুক্ত হইতে সঙ্কলিত সংস্কৃত ভাষাবিধান বা শব্দকোষ। (৫) প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীত শাস্ত্র। (৬) ভারতীয় ভৈষজ্য-বিজ্ঞান আয়ুর্বেদ ও দ্রব্যগুণাভিধান। (৭) ভারতের পুরাকালের বিজ্ঞান ও দর্শনাদির স্থূল মর্ম। (৮) বেদের অনুবাদ। (৯) প্রাচীন হিন্দুদিগের জ্যামিতি, বীজগণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র। (১০) পুরাণ সমূহের অনুবাদ। (১১) মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ। (১২) ভারতীয় প্রাচীন নাট্যকলা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সন্দর্ভ। (১৩) হিন্দু জ্যোতিষ ও গ্রহ-বিজ্ঞান। (১৪) ভারতের হিন্দুপ্রধান কালের ইতিহাস (মুসলমান অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত) কাশ্মীরের সংস্কৃত ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত।

আরবী—(১) মহম্মদের জন্মের পূর্বে আরব দেশের ইতিহাস। (২) হামাসার অনুবাদ। (৩) হারিরির অনুবাদ। (৪) তকাবাৎ-উল্-খুল্সার অনুবাদ।

ফার্সী—(১) সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক, তুর্কি, ফার্সীর প্রাচীন পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলিত পারস্যের ইতিহাস।(২) মহাকবি ফেরদৌসির 'খরচনামা'। (৩) ফার্সী ভাষার অভিধান। (৪) নিজামীর পদ্য-সমূহের গদ্যানুবাদ।

চীন—(১) শি-শিং-এর অনুবাদ। (২) কন্‌ফুৎসুর অনুবাদ।

তাতার—(১) মোগল, অটোম্যান, প্রভৃতি তাতার-জাতির বিস্তৃত ইতিহাস। (তুর্কি ও ফার্সী ভাষা হইতে অনুদিত)।[১]

সাহেব চোরের উৎপাত

পুলিস অফিস হইতে ১৭৯৫ খৃস্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল একটি নোটিস জারি হয়, তাহার মর্ম এই—
"গত দুই মাস কাল ধরিয়া এসপ্লানেড ও কেল্লায় যাইবার ও আসিবার পথে ও ময়দানে বড়ই রাহাজানি চলিতেছে। নীচ প্রবৃত্তির সাহেবেরা যে ছদ্মবেশে এই সমস্ত রাহাজানি করিয়া থাকে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের কয়েকজন গোরা-সৈনিককে এই ব্যাপারে জড়িত বলিয়া প্রমাণ হওয়ায় সাধারণকে জানান যাইতেছে, যাঁহাদের জিনিসপত্র খোয়া গিয়াছে, তাঁহারা কলিকাতা সহরের প্রতিনিধি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিবেন।

কলিকাতা হইতে কাশী

সেকালের জেনারেল পোস্টাফিসের ২২ মার্চ, ১৭৯৬ তারিখের এক নোটিস হইতে জানা যায়, পোস্টাল-ডিপার্টমেণ্ট কলিকাতা হইতে পাটনা ও বেনারস যাতায়াতের সম্বন্ধে আর একটি নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

"সাধারণকে জানান যাইতেছে সকাউন্সিল গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের আদেশে কলিকাতা হইতে বেনারস ও পাটনা পর্যন্ত পুনরায় ডাক বসান হইয়াছে। ভাড়ার নিয়ম এই—

কলিকাতা হইতে বারাণসী—৫০০ সিক্কা টাকা।

কলিকাতা হইতে পাটনা—৪০০ সিক্কা টাকা।

যাঁহারা এই পথের মধ্যে অন্য কোন মধ্যবর্তী স্থানে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে মাইল

১. *A discourse delivered at a meeting of the Asiatic Society on the 2nd of May 1794 by Sir John Shore Bart, President.*

হিসাবে এক টাকা দুই আনা ভাড়া দিতে হইবে। এক ক্রোশের ভাড়া দুই টাকা চারি আনা।

ডাকবেহারা ভাড়া লইবার জন্য পোস্টমাস্টার-জেনারেল (জেনারেল পোস্ট-অফিস) বরাবর দরখাস্ত করুন। বারাণসী, পাটনা, চৌসা প্রভৃতি স্থানের পোস্ট-মাস্টারদিগের নিকট আবেদন করিলেও চলিবে। যাঁহারা কলিকাতা হইতে বারাণসীর মধ্যপথে কোন স্টেশনে অবতরণ করিবেন, পোস্টমাস্টারকে পূর্বে জানাইলে তিনি ডাকবেহারা বন্দোবস্ত ও যাইবার ভাড়া ঠিক করিয়া দিবেন।

তখনকার দিনে কাশী যাইবার ভাড়া ছিল পাঁচশত টাকা। এখনকার দিনে থার্ড-ক্লাশে পাঁচটি টাকা দিলেই কাশী যাওয়া হয়। সেকালে যাঁহারা খুব বড়লোক তাঁহারা ভিন্ন কাশী যাইতে অপরে সক্ষম হইতেন না।

মহারাজ নবকৃষ্ণের দান

নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। সেণ্ট জন গির্জা-নির্মাণের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার নিজখরিদা ছয় বিঘার উপর জমি, সাহেবদের দান করেন। শুনিয়াছি, এই দানপত্র ও তৎসঙ্গে হেস্টিংসের ধন্যবাদ-পত্র এখনও সেণ্ট জন-গির্জার মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত। এই গির্জা নির্মাণের জন্য একটি কমিটি সংগঠিত হয়। এই কমিটির মধ্যে স্বয়ং গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস হইতে সেকালের সমস্ত পদস্থ ইংরাজ কার্যকারকরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই কমিটির সম্পাদক-সাহেব এই দানের জন্য মহারাজ নবকৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিয়া যে পত্র লেখেন তাহার অবিকল প্রতিলিপি এই—

Letter of Thanks From The Gentlemen of The Church Committe:—
To Maharaja Nobkissen Bahadur of Calcutta,

Sir,

The Committee of Gentlemen appointed by the subscribers for erecting a a church, to carry into effect the purpose of their subscription, have received from the Honorable Governor General and Council, a copy of your Durkhast in which you give and make over to the Hon'ble Warren Hastings Esquire, Governor General, in order that a Church may be erected thereon, Six Bighas and ten Biswas of land purchased by you for your own use in Calcutta.

This gift is a most liberal instance of your generosity and has afforded to the English Settlement general, a great and most seasonable aid, towards giving effect to their wishes for building a place of public worship and I am, desired, Sir, to render you the thanks of the Committee for it.

I am also to acquaint you that the Hon'ble Governor General and Council, entertain the same sense of your liberality and have particularly marked it in a letter which they have lately written to the Hon'ble the Court of Directors.

I am Sir,
Your Most Obedient humble Servant.
(Signed by the Secretary to the Committe.)

কলিকাতায় চাউলের দরবৃদ্ধি

কলিকাতায় চাউলের দর ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা বড় ভাবনার কথা। বেনারস ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবারে শস্য জন্মায় নাই, এজন্য শস্যাদি ঐ সমস্ত স্থানে চালান হওয়াই বোধ হয় এ মূল্য বৃদ্ধির কারণ। কলিকাতা সহরে আজকাল যে দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে, তাহার তালিকা এই—১

মুরশিদাবাদী চাউল	(টাকায়) সাতাশ সের।	হুগলী ও হিজলীর চাউল ১নং	(টাকায়) কুড়ি সের।
পাটনাই চাউল	(টাকায়) সাতাশ সের।	হুগলী ও হিজলীর চাউল ২নং	(টাকায়) পঁচিশ সের।
দিনাজপুরী চাউল	(টাকায়) আটাশ সের।	বীরভূম ও বর্ধমানের চাউল	(টাকায়) বাইশ সের।

১. Calcutta Gazette—9-4-1789.

কলিকাতা ভবানীপুরে ডাকাতি

"গত শুক্রবার রাত্রে একদল ডাকাত ভবানীপুরের একজন ভদ্রলোকের বাটিতে প্রবেশ করে। তাহারা গৃহস্বামীকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরে। এজন্য সে বেচারা প্রথমে একটুও চীৎকার করিতে পারে নাই। বিশেষ সুযোগ পাইয়া তাহারা প্রায় সহস্রাধিক টাকা সংগ্রহ করে। তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। ডাকাতেরা কতকগুলি দরকারি কাগজপত্রও লইয়া গিয়াছিল। ভদ্রলোকটি তাহা জানিতে পারিয়া ডাকাতদের চীৎকার করিয়া বলেন, "আমার দরকারি কাগজগুলি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া যাও।" ডাকাতেরা তাঁহার এ চীৎকারের অর্থ বুঝিতে না পারায় মনে ভাবিল, লোকটা গোলমাল করিয়া হয়ত লোকজনকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। এজন্য তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তিনবার পিস্তলের আওয়াজ করে। কিন্তু সেই ভদ্রলোকটির সৌভাগ্যক্রমে একটিও তাঁহার গায়ে লাগে নাই।

যে ভদ্রলোকের বাটিতে ডাকাতি হইয়াছিল, তাঁহার কোন নামোল্লেখ নাই। তখনও চৌরঙ্গী অঞ্চলের অনেকাংশ জঙ্গলপূর্ণ এবং লোকের বসবাস হয় নাই, সুতরাং এরূপ ডাকাতি অসম্ভব নহে। ১

খিদিরপুরে ছেলে-বিক্রী

৯ই এপ্রিল, ১৭৮৯ তারিখের গেজেটে সম্পাদকীয় মন্তব্যের একাংশ এই—"আমাদের দৃঢ়-বিশ্বাস, খিদিরপুরে ছোট ছেলে ও বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিবার একটি গুপ্ত আড্ডা-গৃহ আছে। এই খিদিরপুর হইতে, অনেক ক্রীতদাস নানাস্থানে চালান হয়, এ সংবাদেও আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। এরূপ নিষ্ঠুর প্রথার মূলোচ্ছেদ করা গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্তব্য। সুবিচার, দয়া ও মনুষ্যত্ব এই তিনটি কারণের জন্যই এ কুপ্রথা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আমরা আশা করি, শীঘ্রই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে।"

বরাহনগরে ডাকাতি

৩০এ এপ্রিল, ১৭৮৯ খৃীস্টাব্দ তারিখের গেজেটে প্রকাশ হয়—"গত বৃহস্পতিবার রাত্রে এক-দল অস্ত্রধারী ডাকাত বরাহনগরের দত্তরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটিতে ডাকাতি করিতে যায়। বাড়িতে যাহা কিছু মূল্যবান সম্পত্তি ছিল, সবই ডাকাতেরা লইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত লুণ্ঠিত-সম্পত্তির মূল্য দশ হাজার টাকা। ডাকাতেরা যখন লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তখন চট্টোপাধ্যায় তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন, 'আচ্ছা! এখন তোমরা যাও। পরে আমি তোমাদের দেখিয়া লইব। তোমাদের সনাক্ত করিবার জন্য আমাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না। আদালতে তোমাদের ভাল করিয়া দেখিব।' এই কথা শুনিয়া ডাকাতেরা পুনরায় ফিরিয়া আসে এবং অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার শরীরের চারি পাঁচ স্থানে 'রাম-দা' দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এই চট্টো-পাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ তুলা-ব্যবসায়ী। ইহাঁর মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করিবার জন্য আনা হইলে ইহার স্ত্রীও সেই সময়ে সহমরণে যান। ২

বাজারে হত্যাকাণ্ড

গত শনিবার, ১লা অক্টোবর, ১৭৮৯ সুতালুটি-হাটখোলা বাজারে একজন কয়লা-বিক্রেতার শোচ-নীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। লোকটা এই বাজারের একজন পুরাতন কয়লা-বিক্রেতা। বাজারের ইজারা-দার তাহার নিকট দাদন বা তোলা আদায় করিতে আসিলে সামান্য কারণে উভয়ের মধ্যে বচসা উপস্থিত হয়। ইজারাদারের পিয়নেরা তাহাকে আক্রমণ করে এবং এই আক্রমণের ফলে সেই কয়লা-বিক্রেতার মৃত্যু হয়। পিয়নদিগকে তখনই ধৃত করা হইয়াছে। তাহাদিগকে শীঘ্রই মিঃ মটের (পুলিসের কর্তা) নিকট হাজির করা হইবে। (সংবাদ)।

১. Calcutta Gazette—22-1-1789.

২. গেজেটের লেখক Chatterjee স্থলে Chillimille ও Baranagar কে Balanagar বলিয়া লিখিয়াছেন। ইহা সেকালের সাহেবদের দেশীয় নাম ও উপাধিজ্ঞানের অজ্ঞতার ফল।—*Calcutta Gazette*, 30-4-1789.

ব্রহ্মহত্যা

"ব্রাহ্মণের ক্রোধ কিরূপ ভয়ানক, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে প্রমাণ হইবে। গতকল্য ১লা আগস্ট, ১৭৮৯ প্রভাতে, একজন পশ্চিম-প্রদেশীয় কাশীর ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী নিমাই মল্লিকের বেহারাও সেই সময়ে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সহসা সেই ব্রাহ্মণের গায়ে বেহারার গা ঠেকে। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই চাকরকে এক চপেটা-ঘাত করেন। চাকরও মায় সুদ সেই আঘাত ফিরাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণ পরিশেষে নিমাই মল্লিকের বাটিতে গিয়া বলে, 'আপনার চাকর আমাকে মারিয়াছে।' নিমাই মল্লিক চাকরকে ডাকাইয়া এই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে জানিতে পারেন যে ব্রাহ্মণই প্রথমে চাকরকে প্রহার করেন। কাজেই তিনি বলেন, 'চাকরের কোন দোষ নাই। আপনি চলিয়া যান।' ব্রাহ্মণ ইহাতে বড়ই মর্মাহত হন এবং পরদিন প্রাতে একটি বন্দুক হস্তে উক্ত মল্লিকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দরোজার পার্শ্বেই আত্মহত্যা করেন।"

"এই ব্যাপারে ভয়ানক হুলস্থূল বাধিয়া যায়। নিমাই মল্লিকের চাকরেরা ভয়ে দরোজা বন্ধ করিয়া দেয়। সেই স্থলে অনেক লোক সমবেত হইয়া একটা মহা জনতা উপস্থিত করে। অন্যান্য পশ্চিমে ব্রাহ্মণেরা আসিয়া নিমাই মল্লিকের বাটির সম্মুখেই চিতা-রচনা করিয়া, মৃতদেহ দাহ করে। পাছে এই অসন্তুষ্ট নাগরিকগণ তাঁহার বাড়ি লুঠ করে, এই ভয়ে তিনি পুলিসের বড়-কর্তা মট্‌ সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পুলিস হইতে চোপদারগণ আসিয়া তাঁহার বাটি চৌকি দেয়।[১] ইহা হইতেছে ১২৫ বৎসরের পূর্বের ঘটনা। তখন কলিকাতায় এই সব অসম্ভব ঘটনাও ঘটিত। (সংবাদ)।

মহরম ও দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহাদাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড

আমরা বর্তমান বৎসর হইতে ১২৫ বৎসর[২] পূর্বের আর একটি সংবাদ দিতেছি। এ সংবাদটি তৎকালীন সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়।

"এই বৎসরে দুর্গোৎসব ও মহরম একই সময়ে পড়ে।[৩] এই উপলক্ষে বাজারে ইতিপূর্বে কয়েকটি ছোট খাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাটি অতি ভয়ানক। এজন্য ইহার সবিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।"

"গত সোমবার, ১লা অক্টোবর, ১৭৮৯ অপরাহ্নে কোম্পানির প্রসিদ্ধ ধনী ও বেনিয়ান রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুর্গা-প্রতিমা ভাসানের জন্য রাজপথে বাহির করা হয়। প্রতিমার সঙ্গে অনেক লোক-জন ছিল। পাল্‌কিতে বাড়ির মেয়েরাও ছিলেন। দরোয়ান-পাইক, আশাসোটারও অভাব ছিল না। বৈঠকখানা বাজারের নিকট প্রতিমাখানি আসিলে একদল মুসলমান সেই প্রতিমা আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে ভয়ানক দাঙ্গা বাধে ও উভয় পক্ষের লোকজন জখম হয়। অবশেষে মুসল-মানেরা প্রতিমাখানিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়। তৎপরে রামকান্তবাবুর পুত্রবধূর পাল্‌কিও বদমায়েসেরা আক্রমণ করে, ইহাতে তাঁহার পুত্রবধূ সাংঘাতিকরূপে আহত হন। রামকান্ত বাবু এ ব্যাপারে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে ষাটজন অস্ত্রধারী বরকন্দাজ লইয়া বৈঠকখানা অঞ্চলে মুসলমানদের যতগুলি 'দরগা' ছিল, সবই ধ্বংস করিয়া দেন।

"মুসলমানেরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় দুই তিনশত লোক সংগ্রহ করিয়া একটি দল বাঁধে। রামকান্তের বাটি অস্ত্রধারী প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত সুতরাং তাঁহার কিছু করিতে না পারিয়া তাহারা বৌবাজারে সুখময় ঠাকুরের বাটি আক্রমণ করে। যাহা কিছু তৈজসপত্র, জুয়েলারি

১. সম্ভবত এই মট্‌* সাহেবের নাম হইতে মট্‌স্‌ লেন নামকরণ হইয়াছে। এ লেনটি এখনও বর্তমান।

*Calcutta Old and New গ্রন্থের রচয়িতা H.E.A. Cotton এর মতে মট (Motte) সাহেব ছিলেন জনৈক 'free merchant'। পরে কিছুকালের জন্য কলিকাতার পুলিশ বিভাগে কর্মগ্রহণ করেন। পৃ. ২৪০।

২. গ্রন্থ রচনার কাল অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রী. অনুযায়ী।

৩. ১৮৫৭ খ্রী. অব্দে মিউটিনির বৎসরে দুর্গোৎসব ও মহরম এক সময়ে পড়িয়াছিল।

সবই লুঠে করে। পাঁচ হাজার টাকার সোনার মোহর, ও আট হাজার টাকার কোম্পানির-বণ্ড ও সার্টিফিকেট প্রভৃতিও তাহারা লুঠ করিয়া লইয়া যায়। যাইবার সময়ে সেই বাটির মধ্যে দুইটি গোহত্যা করে। সুখময় ঠাকুর ইতিপূর্বেই পলায়ন করেন। এই ব্যাপারে, তাঁহার দুইজন ভৃত্য ও একজন দরোয়ান নিহত হয়। মুসলমানদের পক্ষে অনেকে আহত হইয়াছিল।"

সুপ্রীমকোর্টে মিঃ জস্টিস হাইডের[১] নিকট এই মোকদ্দমার বিচার হইতেছে। জজের নিকট সুখময় ঠাকুর এফিডেবিট করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার বাটি হইতে লুণ্ঠিত অনেক মালামাল মুসলমানেরা নিকটস্থ এক মাদ্রাসায় লুকাইয়া রাখিয়াছে। এজন্য জজ-বাহাদুর[২] সার্চওয়ারেণ্টের আদেশ দেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, অনেক অপহৃত দ্রব্য এইস্থানে পাওয়া গিয়াছে ও অনেকগুলি দাঙ্গাকারী পুলিসের হস্তে ধৃত হইয়াছে।

মচ্ছিবাজারে (মেছুয়াবাজারে ?) কানাই-বৈরাগীর বাটিও এইরূপে লুঠে করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু কোম্পানির সিপাহীরা আসিয়া পড়ায় দুর্বৃত্তেরা পলায়ন করে।

সহরের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য, কোম্পানি বাহাদুর নানাস্থানে সিপাহী পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

কালিদাসের শকুন্তলা

সুপ্রীমকোর্টের মহানুভব বিচারক পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ স্যর উইলিয়াম জোন্স মহোদয় প্রাচীন হিন্দু-নাটক শকুন্তলা (Fatal Ring) ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। ইহার বিক্রয়-লব্ধ অর্থ অসমর্থ অধমর্ণদের (Insolvent Debtors) উদ্ধারের জন্য ব্যয়িত হইবে, জজ-বাহাদুর এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার এ মহত্ত্বময় দান প্রশংসনীয়।

স্যর উইলিয়ম জোন্সকে ভগবান আদর্শ মনুষ্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণা যেরূপ অদ্বিতীয়, নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতি ও অপরাধীর প্রতি দয়াও অতুলনীয়। তিনি অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক হইলেও কলিকাতার চোর-বদমায়েসেরা তাঁহার নামে ভয়ে কাঁপিত। হিন্দু-আইন ঘটিত ব্যাপারের বিচার সময়ে তিনি একজন পণ্ডিতের সাহায্য লইতেন। অক্ষম যোগ্র-হীন আসামীরা তাঁহার আদেশেই জেলে প্রেরিত হইত, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জরিমানার টাকা প্রভৃতি নিজের পকেট হইতে দিয়া তাহাদের মুক্তির উপায় করিতেও ছাড়েন নাই।

..কলুটোলায় ডাকাতি

গত শনিবার ২১এ অক্টোবর ১৭৮৯ রাত্রে কলুটোলার বিখ্যাত ধনী চৈতন দত্তের বাটিতে ডাকাত পড়িয়াছিল। এই ডাকাতদের মধ্যে অনেক পর্টুগীজ ও বাঙ্গালী ছিল। ডাকাতেরা অতি সহজে ছয় হাজার টাকা লুঠে করিয়া লইয়া যায়। চৈতন দত্ত বাধা দিতে গিয়া শরীরের অনেক স্থলে ভয়ানক আঘাত পান এবং এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

আলিপুরে এক সাহেবের বাড়িতে ডাকাতি

গত সোমবার ২১এ জুলাই ১৭৯০ রাত্রে অসংখ্য ডাকাত, বর্শা ও তলোয়ার লইয়া টার্নার সাহেবের 'বাঙ্গলো' আক্রমণ করে। ডাকাতেরা প্রথমে কোনরূপ বাধা পায় নাই। অনেক দ্রব্যাদি লুঠে করিয়া তাহারা যখন পলাইতে উদ্যত, সেই সময়ে টার্নার সাহেবের লোকজনেরা জাগিয়া উঠে ও বাধা দিবার চেষ্টা করে এবং ডাকাতেরা ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

সতীমন্দির ও জীবন্ত-সমাধির ভীষণ ঘটনা

একজন সংবাদদাতা ২৯এ জুলাই ১৭৯০ খৃীস্টাব্দে নিম্নলিখিত সংবাদটি আমাদের নিকট প্রকাশার্থে প্রেরণ করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার খুব কমই শ্রুতিগোচর হয়। সতীর কথা মধ্যে মধ্যে শোনা যায় বটে, কিন্তু 'সমাধির' কথা কখনও শুনি নাই। আমাদের সংবাদদাতার নিজের কথা-

১. জন হাইড—সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি ১৭৭৪-১৭৯৬ খ্রী.।
২. মিঃ জস্টিস হাইড, মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমার একজন বিচারক ছিলেন

তেই ঘটনাটি প্রকাশ করিলাম। তিনি লিখিতেছেন—"বর্দ্ধমানের রাজবলহাট গ্রামে যখন আমি ছিলাম, সেই সময়ে বাঁশের বেড়া দেওয়া একটি স্থান আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। সেই স্থানটিতে দুইটি লাল-রঙের নিশান বাঁধা ছিল। আমার প্রথমে সন্দেহ হয় যে ইহা হয়ত কোন শবদাহ-ক্ষেত্র। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম ইহা প্রকৃতই তাই। কিন্তু যে দুইটি ব্যাপারের জন্য ঐ নিশান দুটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি ভয়ানক। বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম, এক স্থানে এক ব্রাহ্মণকন্যা তাহার স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিল। অপর স্থানে চিতার কোন চিহ্ন নাই, তবে একটি গোর আছে। এই গোরটির মধ্যে যোগী তাঁতি নামক এক ব্যক্তি সস্ত্রীক সমাহিত হইয়াছে। যোগীর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী স্বামীর অনুগমন করে ও তাহাকে জীবিতাবস্থায় এই সমাধির মধ্যে প্রোথিত করা হয়। দুই মাস পূর্বে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে এই ঘটনাটি ঘটিয়াছে।

কিরূপে এই সমাধি হইল তাহার বিবরণ দিতেছি। শববাহিগণ মৃত ব্যক্তির দেহ শ্মশানে আনিল। তাহার আত্মীয়-স্বজনগণও সঙ্গে আসিয়াছিল এবং বাদ্যভাণ্ডেরও অভাব ছিল না। তাহার স্বজাতীয় অনেক লোক এমন কি তাহার ক্ষুদ্র শিশুগুলিকেও সেই শ্মশানে এই ভীষণ দৃশ্য দেখাইবার জন্য আনা হইয়াছিল।

প্রথমে কোদালির সাহায্যে চারি ফিট গোর খোঁড়া হইল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব প্রথমে কোদালি দ্বারা একটু মাটি তুলিয়া দিলে তাহার অপেক্ষা জোয়ান ও বয়ঃপ্রাপ্ত লোকে এই সমাধি খনন করিল। তৎপরে সেই শবদেহ খনিত গোরের মধ্যে রাখা হয়। তাহার স্ত্রী স্নান করিয়া আসিয়া স্বামীর মৃতদেহের নিকটে বসিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। তৎপরে তিনবার এই গোরটি প্রদক্ষিণ করিয়া ও উপস্থিত নিকট আত্মীয়গণকে টাকাকড়ি ও তাহার গায়ের অলঙ্কারগুলি দিয়া সে গোরের মধ্যে নামিল। এই সময়ে তাহার হস্তে একে একে চারিটি প্রদীপ দেওয়া হয়। সে স্বহস্তে সেই প্রদীপগুলি খনিত সমাধির চারিকোণে রাখিয়া ও তাহার স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া সেই সমাধিমধ্যে শয়ন করিল।

এই সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এক আঁটি উলুখড় জ্বালিয়া সমাধিমধ্যে নামিয়া গিয়া, পিতার মুখাগ্নি করিল ও মাতার দেহেও সেই অগ্নি স্পর্শ করাইল। তৎপরে মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে উপরে আসিয়া কয়েক খণ্ড মৃত্তিকা সেই সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার আত্মীয়েরা তখন কোদালির সাহায্যে সমস্ত মৃত্তিকা টানিয়া সেই সমাধি সমতল করিল। তৎপরে উত্তমরূপে মাটি চাপিয়া সমাধিটিকে চোস্ত করিয়া দিয়া তাহারা প্রস্থান করিল।

এই বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকের সতীধর্মের গৌরব ও এই জীবন্তাবস্থায় মৃত্যু-আলিঙ্গন সময়ের সাহসের অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এই প্রথা অতি নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন, তবুও এ দৃশ্য দেখিলে জ্বলন্ত চিতায় মৃত স্বামীর বক্ষে থাকিয়া পুড়িবার সাহস বস্তুতই এক দুর্লভ-দর্শন দৃশ্য! বাঙ্গলা দেশের অনেক স্থানে আমি গিয়াছি এবং অনেক স্থলে বাঁশের বেড়া দেওয়া 'সতী-মন্দিরও' দেখিয়াছি। কিন্তু এই যোগী-তাঁতীর স্ত্রীর জীবন্ত-সমাধির মত কোন ব্যাপার আমার চক্ষে পড়ে নাই বা আর কাহারও মুখে কখনও শুনি নাই। জীবিতাবস্থায় সমাধি হওয়া আরও ভয়ানক ব্যাপার! যদি আপনার পাঠকগণের মধ্যে কাহারও চক্ষে এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা সাধারণে প্রকাশ করিলে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিব।"

কাশীনাথবাবুর মৃত্যু

গত সোমবার, ১২ই এপ্রিল ১৭৯২ কলিকাতার জনৈক বিখ্যাত ধনী কাশীনাথ বাবুর[১] মৃত্যু হইয়াছে। কাশীনাথবাবু একজন সর্বজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহার নিজের নির্মিত

১. ইনি দেওয়ান কাশীনাথ নামে পরিচিত ছিলেন। পৈতৃক উপাধি ট্যাণ্ডন। কলিকাতায় তিনি বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। এ ছাড়া মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগনায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাহার জমিদারিভুক্ত ছিল। এ বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন রাধারমণ মিত্র 'কলিকাতা দর্পণ' গ্রন্থে। পৃ. ২৮৪-২৮৫।

গঙ্গাতীরের ঘাটে মৃতদেহ ভস্মীভূত করা হয়। প্রচুর চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা চিতা রচিত হইয়াছিল। তাঁহার চারিটি সহধর্মিণী। সুখের বিষয়, ইহাঁদের কেহই স্বামীর সহিত সহমৃতা হন নাই। লোকের বিশ্বাস, কাশীনাথবাবু মৃত্যুকালে ষাট লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। এক উইল দ্বারা তিনি এই সম্পত্তি তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সমানাংশে বিভাজিত করিয়া দিয়াছেন। এই কাশীনাথ-বাবু নন্দকুমারের মোকদ্দমায় একজন গণনীয় সাক্ষী ছিলেন।

সুখসাগরে বাঘ

সুখসাগরে (নদীয়া বিভাগে) তিনটি খুব বড় বাঘ বাহির হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বারেটো সাহেব[১] তাহাদের একটিকে গুলিদ্বারা নিহত করিয়াছেন। অপর দুইটিকে ফাঁদ পাতিয়া ধরা হয়। (১১।৪।১৭৯২)

সুখসাগর তখন একটি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। অনেক পদস্থ ইংরাজ নৌকা, বোট, বজরা করিয়া সুখসাগরে বেড়াইতে ও শিকার করিতে যাইতেন।

সেকালের বাঙ্গালীদের অভিনন্দনের নমুনা

লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতের ইংরাজাধিকারের সেনাপতি ও গবর্ণর-জেনারেল দুইই ছিলেন। সেকা-লের গবর্ণর-জেনারেলদের এই দুই কাজই করিতে হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের অমিত পরাক্রমে টিপু সুলতানের ধ্বংস-সাধন হয়। 'শ্রীরঙ্গপত্তন-অবরোধ' ভারতের ইতিহাসের একটি অত্যুজ্জ্বল ঘটনা। এই যুদ্ধ উপলক্ষে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে বহুকাল ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে থাকিতে হয়। বিজয়লাভান্তে যখন তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময়ে কলিকাতার ইংরাজ-সম্প্রদায় তাঁহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দনপত্র অবশ্য ইংরাজি ভাষাতেই দেওয়া হয়।

অসীম সম্মানাস্পদ, অমিত বীরচূড়ামণি, শ্রীল শ্রীযুক্ত আরল কর্ণওয়ালিস কে, জি, গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর বরাবরেষু—

টিপু সুলতানের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আপনি তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন। আমা-দের স্থির বিশ্বাস ছিল, ভগবান আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। যাহাতে আপনি রণজয়ী হইয়া বিজয়-গৌরব লাভ করেন, তজ্জন্য আমরা ভগবৎসমীপে চিরদিন প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছি।

আপনি মহাবল-চমূ লইয়া শত্রুর রাজ্য আক্রমণ করেন। অসীম সাহসে শত্রুবিজয় করিয়া আপনি এখন যশস্বী। যেমন অগ্নি-সংযোগে তৃণের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন হয়, আপনার অমিতবিক্রমে শত্রুসৈন্য সেইরূপ ধ্বংস হইয়াছে।[২] ইহাতে আপনি যশোগৌরবে অমরত্বলাভ করিয়াছেন এবং এই বিজয়-ব্যাপারে আপনার প্রজাগণের সম্পত্তি, সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন।

সেকালের নববর্ষের উৎসব

আজকাল নববর্ষের দিনে গড়ের মাঠে কুচ-কাওয়াজ, সৈন্যপ্রদর্শনী ও উপাধি বিতরণ হইয়া থাকে। সেকালে অর্থাৎ ১৩০ বৎসর পূর্বে কিরূপভাবে উৎসব হইত তাহা দেখুন—"গত মঙ্গলবার ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মদিন উপলক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে তাঁহার সম্মানার্থে প্রভাত-প্রারম্ভে তোপধ্বনি হইয়াছিল। অপরাহ্নে লর্ড কর্ণওয়ালিস থিয়েটারগৃহে একটি নাচ ও সান্ধ্য-ভোজনের আয়োজন করিয়া ছিলেন। অনেক পদস্থসাহেব এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। মিসেস চ্যাপম্যান

১. Joseph Barretto. আঠার শতকের শেষভাগে কলিকাতার পর্টুগীজ সমাজের দলপতি। সুখসাগরে তিনি একটি চিনি তৈয়ারীর কল ও রোমান ক্যাথলিক গির্জা নির্মাণ করেন।

২. পাঠকের অবগতির জন্য এই অভিনন্দনের একটি পরিচ্ছেদের মূল এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

Your Lordship entered the enemy's country with a brave army, and by the ardour of your courage destroyed the enemy's numbers in every place as straw is consumed by fire and by thus humbling his (Tippoo's) pride accomplished our prayers, the news of which was equally as a draught from the cup of immortality. Your Lordship has secured the safety of our persons, liberty and properties.—*Extract from an Address to Right Hon'ble Earl Cornwallis signed by (162) principal Native Inhabitants of Calcutta.*

প্রথমে নৃত্য সূচনা করেন। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত সাহেবি-নাচ চলিয়াছিল। রাত্রি বারটার সময় নিমন্ত্রিত অতিথিগণ ভোজনাগারে গিয়া আহারাদি শেষ করেন। তাহার পর তাঁহারা পুনরায় থিয়েটার-হলে ফিরিয়া আসেন, এইবার বাইনাচ প্রভৃতি আরম্ভ হয়। এ দেশীয় নৃত্যকলা দেখিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাত্রি চারিটার সময় এই নৃত্য শেষ হয়।"

তখনকার দিনে নববর্ষ উৎসবে সমস্ত রাত্র-ব্যাপী বল ভোজ হইত। ভোজ সভায় এ দেশীয় নৃত্য-কলাও প্রচলিত ছিল। বাইনাচ প্রভৃতি দেখিয়া সেকালের সাহেবেরা নাসিকা কুঞ্চন করিতেন না।

সেকালের ঘোড়দৌড়

১২ই ডিসেম্বর ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে যে ঘোড়দৌড়ের ইস্তাহার বাহির হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই, ৮ই, ৯ই ও ১০ই জানুয়ারি বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার ঘোড়দৌড় হইবে। এজন্য প্রাতরাশ ও সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছে। ঘোড়দৌড়ের পর শুক্রবার 'বল ও সাপার' হইবে। যাঁহারা ঘোড়া ছুটাইতে ইচ্ছুক,তাঁহারা ঘোড়াসম্বন্ধে সমস্ত আবশ্যকীয় তথ্য সম্পাদকের নিকট জানিতে পারেন।"

সম্ভবত এই ঘোড়দৌড়, কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানে হইয়াছিল। সেই সময়ে বারাসতেও ঘোড়দৌড় হইত। বর্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠ তখন সম্পূর্ণরূপে জঙ্গল-বিমুক্ত হয় নাই। কিন্তু স্যর জন শোর-এর (পরে লর্ড টেনমাউথ) আমলে, কলিকাতার মাঠে ঘোড়দৌড়ের বন্দোবস্ত দেখা যায়।

স্যর উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু

গত রবিবার, ১লা মে ১৭৯৪ প্রাতঃকালে সুপ্রীমকোর্টের স্বনাম-প্রসিদ্ধ জজ স্যর উইলিয়াম জোন্সের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স এই সময়ে মোটে ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। গার্ডেনরিচের বাগানবাটিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তৎপরে তাঁহার মৃতদেহ সহযোগী জজ হাইড সাহেবের বাটিতে চৌরঙ্গীতে আনা হয়। সোমবার প্রাতঃকালে সাত ঘটিকার সময় শববাহী-গাড়ি করিয়া এই মৃতদেহ 'পার্কস্ট্রীট সমাধি-ক্ষেত্রে' লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতাবাসী সমস্ত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ, পাল্কি ও গাড়ি করিয়া শবদেহের অনুগমন করেন। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ-প্রাকার হইতে প্রতি মিনিটে শোকসূচক তোপধ্বনি করা হয়। দুর্গ হইতে প্রেরিত পদাতিক-সৈন্য ও গোলন্দাজের দল এই সমাধিযাত্রার সঙ্গী হইয়াছিল। সমাধি-ক্ষেত্রের দ্বারের নিকটবর্তী হইলে কোম্পানির সৈন্যগণ রাস্তার দুইদিকে অস্ত্র অবনত করিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইল। ব্যাণ্ড হইতে পবিত্র ধর্ম-সঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। মিঃ জাস্টিস হাইড [১] ও স্যর উইলিয়াম উইলকিনের[২] তত্ত্বাবধানে স্যর উইলিয়াম জোন্সের পবিত্র দেহ সমাহিত হয়।

কলিকাতা সহরের সীমা-নির্দেশ

গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি মিঃ হে কলিকাতার শেরিফ্ ও মিঃ এডমণ্ডস্টোনকে (সরকারি ফার্সী অনুবাদক) সঙ্গে লইয়া কোর্ট-হাউসে, উপস্থিত হন। কলিকাতা সহরের সীমা-নির্দেশ করিয়া যে মন্তব্য গবর্ণমেণ্ট সাধারণে বিজ্ঞাপিত করিতে ইচ্ছুক, তাহা সর্বসমক্ষে 'ঘোষণা' রূপে পাঠ করা হয়। (১১।৯।১৭৯৪)

কলিকাতায় প্রথম পাকা রাস্তা

গবর্ণমেণ্টের আদেশে কলিকাতার কাঁচা রাস্তাগুলি পাকা করিবার জন্য বীরভূম হইতে অনেক পাথর আনা হইয়াছে এই পাথরগুলির সহায়তায়, নূতনভাবে পথাদি-সংস্কার হইলে, সহরের যথেষ্ট উন্নতিসাধিত হইবে। ধূলা ও কাদার জন্য সহরের অনেক পথই সময়ে সময়ে দুর্গম হইয়া পড়ে। রাস্তাগুলি পাকা হইলে, সহরবাসিগণ সকল বিষয়েই উপকৃত হইবেন। (১১।৯।১৭৯৪)

সাহেব-ডাকাত কর্তৃক কোম্পানির খাজনা-লুট

গত সোমবার নয়জন সাহেব একদল সিপাহীকে উলুবেড়িয়ার নিকট আক্রমণ করে। সিপাহীরা

---

১. এই হাইড সাহেব বহুদিন ধরিয়া সুপ্রীমকোর্টের জজিয়তি করিয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত জাল মোকদ্দমাতেও হাইড সাহেব চারিজন জজের অন্যতম ছিলেন।

২. স্যর উইলিয়াম উইলকিন-এর পরিবর্তে স্যর চার্লস উইলকিন্‌স্ (১৭৪১-১৮৩৬) পড়িতে হইবে।

মেদিনীপুর হইতে, কোম্পানি-বাহাদুরের খাজনা লইয়া কলিকাতায় আসিতেছিল। সহসা সাহেব-দের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তাহারা একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। ডাকাতেরা টাকাকড়ি লইয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল এরূপ সময়ে সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া পুনরায় তাহাদের আক্র-মণ করে ও তাহাদের সকলকে বন্দী করে। বহু চেষ্টার পর অপহৃত অর্থ উদ্ধার করিয়া তাহারা কলিকাতায় চলিয়া আসে। সুখের বিষয়, এই ডাকাতদের মধ্যে অনেকেই সেলার বা নাবিক। আরও সুখের কথা এই, তাহাদের মধ্যে একজনও ভদ্র ইংরাজ নহে।" (২০।১১।১৭৯৪)

রসাপাগলার ডাকাতি

রসাপাগলা ভবানীপুর ও কালীঘাটের সান্নিধ্যে এখনও রসা রোড পূর্বের স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারির একটি সংবাদে প্রকাশ, "গত শুক্রবার রাত্রে লেফ্‌টেনাণ্ট মার্শারের বাটিতে (রসাপাগলায়) ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। লেফ্‌টেনাণ্ট সাহেব বাটিতে ছিলেন না, তিনি সপরিবারে চুঁচুড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাড়িটি দুইজন চৌকিদারের জিম্মায় ছিল। সোমবার রাত্রি প্রভাতের পূর্বে একশত কি দেড়শত ডাকাত বন্দুক ও তলোয়ার লইয়া বাটি-রক্ষাকারী চৌকিদারদের আক্রমণ করে ও সমস্ত টাকাকড়ি লুঠ করিয়া লইয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, দুইজন ডাকাত ধরা পড়িয়াছে ও এ ডাকাতি সম্বন্ধে তদারক চলিতেছে।

ভয়ানক শিলাবৃষ্টি

"গত রবিবার সন্ধ্যার সময়, ভবানীপুরে রসা পাগলা অঞ্চলে ও সহরের দক্ষিণাংশে ভয়ানক শিলা-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এমন ভয়ানক শিলাবৃষ্টি পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই। এক একটি শিলা কমলালেবুর মত বড়। আলিপুরে একজন ভদ্রলোক একটি শিলা ওজন করিয়া দেখেন, তাহার ভার সাত আউন্স। অনেক গরীব লোকের কুটীরাদি এই ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে।" (২।৪।১৭৯৫)

বাঙ্গালীর বাড়িতে সাহেব-ডাকাত

সেকালের কলিকাতায় কিরূপভাবে চুরি ডাকাতি হইত, নিম্নলিখিত মোকদ্দমার বিবরণই তাহার প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে কলিকাতা সহরের মধ্যে বাঙ্গালী ধনীর বাড়ি লুঠ করিবার জন্য সাহেব-ডাকাত, আর তাহাদের পথপ্রদর্শক একজন বাঙ্গালী গোয়েন্দা। ডাকাতগণ এই সময়ে কলিকাতায় চৈতন শীল নাম এক ধনীর বাটিতে ডাকাতি করে। চৈতন শীলের চীনাবাজারে একখানি দোকান ছিল। এই ডাকাতের দলে সত্তর জন বেকার ভবঘুরে সাহেব থাকিত ও তাহারা এত দুঃসাহসী,যে সেই সময়ের কলিকাতার প্রধান ব্যাঙ্ক 'হিন্দুস্থান-ব্যাঙ্ক'[১] পর্যন্ত লুঠ করিবার কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই।

মোকদ্দমার বিবরণ ও সাক্ষীর জবানবন্দী হইতেই এই ডাকাতি সম্বন্ধে সমস্ত ঘটনা পাঠক জানিতে পারিবেন। বিচার অবশ্য সুপ্রীমকোর্টে হইয়াছিল।

কলিকাতা সুপ্রীমকোর্ট

(মিস্টার জস্টিস হাইড সাহেবের এজলাস)

ফরিয়াদী—অনারেবল কোম্পানি বাহাদুর ও চৈতন শীল।	আসামীগণ—মিঃ রুসো, মিঃ বুফাস্, মিঃ জারান্, মিঃ ব্ল্যাঙ্ক, মিঃ কোয়েল, মিঃ ফ্যাসিনেভ্, ও মোহন পাল

চৈতন শীলের জবানবন্দী—আমি একজন হিন্দু-ব্যবসায়ী। চীনা বাজারে আমার একখানি দোকান আছে। গত ২৮এ মাঘ তারিখের রাত্রে আমার বাটিতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। তখন রাত্রি

১. "Alexander & Co, one of the leading agency houses started the Bank of Hindostan which was perhaps the first European bank in India. It was actually a department or the counting house of Alexander & Co".—N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. III, p. 57.

দুইটা। এই সময়ে সহসা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বাড়ির মধ্যে অনেকগুলি লোকের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়া আমি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ি। দেখিলাম—বাটির সদর-দরোজা খোলা। তখন আমি খুব উচ্চৈঃস্বরে আমার চাকরদের ডাকিতে লাগিলাম। একজন চাকর আমার ডাক শুনিয়া উঠানের দিকে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে আমি তাহার চিৎকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। তারপর আর কোন সাড়া শব্দ নাই। অনুমানে বুঝিলাম, ডাকাতেরা তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। কথাটি কহিবার বা চেঁচাইবার কোন উপায় রাখে নাই। এই সময়ে আমি বুঝিতে পারি ডাকাতেরা আমার অন্দরমহলেও প্রবেশ করিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চিৎকার করিতেছে। বাহিরের মহলে আমার একটি গুদামঘর ছিল। ডাকাতেরা একটি শাবল দিয়া সেই ঘরের হুড়কা খুলিয়া গুদামের মধ্যে প্রবেশ করিল। তারপর দেখিলাম ডাকাতেরা আমার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়াছে। আমি প্রাণভয়ে মশারির আড়ালে লুকাইলাম। ডাকাতেরাও সেই গৃহে কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া একটি কাঠের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া সোনারূপার জিনিসগুলি লইয়া চলিয়া গেল। একখানি চৌকির উপর কতকগুলি নূতন কাপড় ও পরিচ্ছদাদি ছিল। প্রস্থান-সময়ে ডাকাতেরা তাহাও লইতে ভুলে নাই।

ডাকাতদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার বোধ হইল, তাহারা সকলেই সাহেব। তবে তাহাদের সঙ্গে আর একজন লোক ছিল, তাহার বেশ-ভূষা দেখিয়া তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। আমার ক্ষতির পরিমাণ, আনুমানিক চারি হাজার টাকা। (কতকগুলি বামাল এই সময়ে সাক্ষীকে দেখান হয়। সাক্ষী সেগুলি সনাক্ত করিয়া বলে, এসবই আমারই জিনিস)।

চৈতন শীলের চাকরের জবানবন্দী—গত ১৮ই মাঘ তারিখে রাত্রি আন্দাজ দুটোর সময় আমার মনিবের বাটিতে ডাকাত পড়ে। ঐ সময়ে আমি গোয়াল-ঘর সংলগ্ন একটি চালায় ঘুমাইতেছিলাম। রাত্রি দুইটার সময় বাড়ির উঠানে অপরিচিত লোকজনের কথা শুনিতে পাইয়া আমি বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসি। দেখিলাম উঠানে তের চোদ্দজন সাহেব দাঁড়াইয়া। তাহাদের দুই তিনজনের হাতে একটি করিয়া জ্বলন্ত মোমবাতি। সাহেবেরা আমায় দেখিতে পাইয়া তখনই আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিল। তাহারা মুহূর্ত মধ্যে দড়ি দিয়া আমার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল, আর একজন আমার বুকের উপর বসিল। আমি ভয়ে চিৎকার করিতে পারিলাম না, বা কোথায় কি হইতেছে দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর আমি সিন্ধুক ও দরজা ভাঙ্গার শব্দ পাইলাম। কাজ শেষ হইলে, তাহারা বাড়ি হইতে চলিয়া গেল। তাহাদের দলে কেবল একজন লোক ছিল সে লোকটাকে বাঙ্গালী বলিয়াই বোধ হইয়াছিল।

গোরা সার্জেণ্ট ওগিলবি সাহেবের জবানবন্দী—গত ৬ই মার্চ তারিখে আমি মিঃ স্মিথের (জস্টিস অব দি পীস) নিকট হইতে এক ওয়ারেণ্ট পাই। এই ওয়ারেণ্টে বর্তমান আসামিগণের অন্যতম রুসো সাহেবকে ধরিবার আদেশ ছিল। এই আদেশপত্র পাইয়াই আমি ফিট্‌জেরাল্ড নামক আর এক কনস্টেবলকে লইয়া রুসোর বাটি খানা-তল্লাসির ফলে আমরা একটা আঁধারে লণ্ঠন, কতকগুলি কাপড়ের থান, একখানি তরবারি ও একটি লালরঙের জ্যাকেট পাই। এই জ্যাকেটটি যাহাতে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তজ্জন্য আসামী রুসো আমাদের বিস্তর অনুরোধ করে। সেই জ্যাকেট পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি জামার আস্তরের মধ্যে এক গুপ্তস্থানে একটি গুলিভরা পিস্তল লুকান আছে। তাহার পর আমি রুসো ও অন্যান্য আসামীদের ধরিয়া ফেলি। অপহৃত মালপত্র আদালতে দাখিল করিয়াছি।

জারানের জবানবন্দী—এই ব্যক্তিও একজন আসামী। কিন্তু কোম্পানি-বাহাদুরের পক্ষে ইহাকে সাক্ষী করিয়া লওয়া হয়। জারান বলিল, "আমি হানোভার দেশের লোক। পনর বৎসর এই ভারতবর্ষে বাস করিতেছি। পাঁচ বৎসর আমি মান্দ্রাজে একজন ইংরাজের চাকরি করিয়াছিলাম। তৎপরে আমি কলিকাতায় আসি। কলিকাতাতেও আমার পাঁচ বৎসর কাটিয়াছে। কলিকাতায় টাইলার ও মেডলি সাহেবের বাটিতে চাকরি করিয়াছি। আমি আসামীদের সকলকে চিনি। আমরা সকলে

মিলিয়া চৈতন শীলের বাড়ি ডাকাতি করিতে গিয়াছিলাম। গত ২৭এ জানুয়ারি মার্কস্ আমার কাছে আসিয়া বলে তুমি রুসোর বাড়ি চল। একটা ডাকাতি করিতে হইবে। আমি তাহার সঙ্গে রুসোর বাটিতে যাই। সেখানে আরও নয়জন সাহেব ডাকাত উপস্থিত ছিল। রাত্রি দশটার পর, মোহন পাল (ঐ আসামী) আমাদের নিকট আসিয়া সংবাদ দিল, "আজ আর ডাকাতির কোনরূপ সুবিধা হইবে না। কারণ এখনও তাহার বাটিতে অনেক লোকজন জাগিয়া বসিয়া আছে।" সেদিন আর ডাকাতি করা হইল না। ২৯এ তারিখে আবার আমরা রুসোর বাড়ি জমায়েত হই। মোহন পাল সেদিন রাত্রি বারটার সময়ে আসিয়া বলিল, "দল সব জমায়েত হইয়াছে ত? আজই বেশ সুযোগ।" তার পর মোহন পাল পর্টুগীজ ভাষায় আমাদের বলিল,"আমি আবার একবার সন্ধান লইয়া আসি— পথ পরিষ্কার কি না।" তারপর সে রাত্রি একটার সময় ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া চৈতনের বাড়ি উপস্থিত হইল।

তখন আমাদের মধ্যে একটা বচসা আরম্ভ হইল। বচসার বিষয় এই, সদরদ্বারের কাছে চৌকি দিবে কে? শেষ ঠিক হইল, আমি, কোয়েল ও আর একটি লোক সদর-দরোজা চৌকি দিব। ইহার পর, দলের অন্যান্য লোক বাটির মধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময়ে আমরা বাটির ভিতরে একটি দরোজা ভাঙ্গার শব্দ পাইলাম। তখনই মার্কস্ আসিয়া বলিল, কোয়েল রাস্তার ধারে দরোজায় চৌকি দিক। তুমি ও ঐ পর্টুগীজ ভদ্রলোকটি ভিতরের যে দরোজা ভাঙ্গা হইয়াছে সেইখানে চল। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন লোক "বাবু। বাবু। দোহাই সাহেব।" বলিয়া চিৎকার করিতেছে শুনিতে পাইলাম। তারপরে স্ত্রীলোক ও ছেলেদের কান্নার শব্দও আমার কানে আসিল। এই সময়ের মধ্যে মোহন পাল দুইবার বাটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিয়া গেল, বাহিরের চৌকি বন্দোবস্ত ঠিক আছে কি না। দলের লোকেরা বেশী দেরী করিতেছে দেখিয়া আমি বলিলাম, "তোমরা শীঘ্র কাজ সারিয়া লও। বড় দেরী হইতেছে।" এই সময়ে মোহন পাল ও তাহার সঙ্গীরা ফিরিয়া আসিল। মোহন বলিল, "এইখানে কোথায় একটা মালগুদাম আছে। তাহার দরোজাটা ভাঙ্গিয়া একবার দেখা যাউক।" রুসো শাবল দিয়া সম্মুখের একটা ঘরের দরোজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার ভিতর হইতে কতকগুলি দামী কাপড় বাছাই করিয়া লইয়া ম্যাথিয়াস তাহার ক্যাম্বিসের ব্যাগটি পূর্ণ করিল। তাহার পর সমস্ত দল বাটির বাহিরে আসিয়া, তাহাদের হাতের বাতি নিভাইয়া ফেলিল। মোহন পাল ছাড়া আমরা সকলেই রুসোর বাটিতে গেলাম।

রুসোর বাটিতে ম্যাথিয়াস ব্যাগ খুলিয়া লুণ্ঠিত কাপড় বখরা করিতে আরম্ভ করিল। আমার সঙ্গীরা ও আমি আট পিস্ কাপড় ভাগে পাইলাম। সোনা রূপার জিনিসগুলি মোহন পালকে দিয়া সেকরার কাছে বিক্রয় করাইবার জন্য পাঠান হইল।

পরদিন প্রভাতে আমি পুনরায় মার্কসের বাড়ি গেলাম। সেখানে ম্যাথিয়াস, বুয়াকস্, মোহন পাল ও আর একজন বাঙ্গালীকে দেখিতে পাই। মার্কস বলিল, "সোনারূপার জিনিস বিক্রয় করা হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকের ভাগে ছাব্বিশ টাকা বখরা পড়িয়াছে।" সাক্ষী জারান জেরার মুখে একথাও স্বীকার করে, "আমাদের দলে ইউরোপীয়ান,পর্টুগীজ, ইটালিয়ান, ও অন্যান্য লোকও আছে। সকলকে জড় করিলে দুই শত লোক হয়। এই সমস্ত লোক জড় করিয়া আমরা একদিন 'হিন্দুস্থান-ব্যাঙ্ক' লুঠ করিব মনে ভাবিয়াছিলাম।"

চিফ জুস্টিস হাইড সাহেব[১] জুরিদের চার্জ দিলেন। জুরিরা একবাক্যে আসামীদের দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। ষোলঘণ্টা কাল ধরিয়া এই চুরি মোকদ্দমার বিচার চলিয়াছিল।

৬ই আগস্ট ১৭৯৫ খৃীস্টাব্দের এক সংবাদে প্রকাশ, "পূর্বোক্ত ডাকাতির আসামীদিগকে জেলখানায় আনিয়া রাখা হইয়াছে। ছয়জনের উপর এইরূপ ডাকাতি করার জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ

১. জন হাইড সুপ্রীমকোর্টের পিউনি জজ ছিলেন (১৭৭৪-১৭৯৬)। ১৭৯৫ সালে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্যর রবার্ট চেম্বার্স।

করা হইয়াছে। অন্যান্য ডাকাতদের মনে ভয়োৎপাদন জন্য যেখানে তাহারা ডাকাতি করিয়াছিল, তাহার নিকটে প্রকাশ্য স্থানে তাহাদের ফাঁসি দেওয়া হইবে। চৈতন শীলের বাড়ির কাছে একটি বাজার আছে। স্থির হইয়াছে, এই বাজারেই ডাকাতদের ফাঁসি হইবে।" পাঠক উল্লিখিত ঘটনা হইতে সবই বুঝিতে পারিবেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আর একটি সাহেবি রাহাজানি

টমাস গিলবার্ট, টমাস হকিন্স ও দানিয়েল বেকার, তিন নম্বর ইউরোপীয়ান সেনাদলের সেনা। তাহাদের বিরুদ্ধে এসপ্লানেডে (ধর্মতলায়) রাহাজানি করিবার অভিযোগ উপস্থিত হয়। বিচারাজ্ঞা এই হইল যে, "তাহাদের হস্তের একাংশ দগ্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ও তৎপরে তাহাদিগকে জেলের মধ্যে আটক রাখা হইবে। এজন্য তাহাদের উপর দুই বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দন্ডাজ্ঞা দেওয়া হইল।"

সেকালে ডাকাতির দায়ে ফাঁসি হইত। চুরি ও রাহাজানি করিলে হাত পোড়াইয়া দেওয়া হইত, তারপর দীর্ঘকাল সশ্রম মেয়াদ। সে সময়ে চোর-ডাকাতের বড়ই উৎপাত ছিল। পরে সুপ্রীমকোর্ট প্রসঙ্গে পাঠক এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

আলিপুরের পোল ভাঙ্গা

"গত ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৭৯৫ আলিপুরের পোল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পোলটি বহুদিন হইতেই বেমজবুত হইয়াছিল। গভীর রাত্রে পুলটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে না।"

এই আলিপুরের পুল যে কোনটি, আমরা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার আলিপুরস্থ হেস্টিংস-হাউসে আসিবার সুবিধার জন্য যে পুল প্রস্তুত করান, তাহা কালীঘাটের পোল। অবশ্য বর্তমান পোলটি নহে—ইহার পূর্বে আর একটি ঝোলা পুল ছিল। জিরাটের নিকট যে পুলটি আছে, সেইস্থানে ইতিপূর্বে আর একটি পুরাতন পুল ছিল। সম্ভবত সেইটিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গলা গ্রামার ও ডিক্সনারি

২৩এ এপ্রিল, ১৭৮৯ খৃীস্টাব্দের পুরাতন কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হয়ঃ

We humbly beseech any gentleman will be so good to us as to take the trouble of making a Bengali Grammar and Dictionary in which we hope to find all the common Bengal Country words made into English. By the means, we shall be enabled to recommend ourselves to the English Government and understand their orders, this favour will be remembered by us and our posterity for ever.

ইংরাজি-অভিজ্ঞ পাঠক এই বিজ্ঞাপনটির প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করুন। সেকালে, অর্থাৎ ১২৫[১] বৎসর পূর্বে, বাঙ্গালীরা একখানি অভিধান ও গ্রামারের জন্য কতই না লালায়িত ভাবে ইংরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে খুব কম বাঙ্গালীই ভালরূপে ইংরাজি বুঝিতে পারিতেন। সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যে কথাবার্তা অধিকাংশস্থলে হিন্দি ও ফার্সীতে হইত।

উক্ত আবেদনের ফলে ডাক্তার মেকিনান নামক একজন সাহেব একখানি বাঙ্গলা ও ফার্সী গ্রামারের বিজ্ঞাপন দেন। ১৭৯০ সালের ২৩এ সেপ্টেম্বরের গেজেটে এই বিজ্ঞাপনটি বাহির হয়। এই ব্যাকরণখানি ইংরাজি, ফার্সী ও বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা একাধারে ব্যাকরণ, শব্দকোষ, ইংরাজি ভাষা শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থ হইয়াছিল। সেই সময়ে কোম্পানি বাহাদুর কলিকাতায় একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। তাহা The Hon'ble East India Company's Press বলিয়া পরিচিত ছিল। উক্ত গ্রন্থখানি কোম্পানির মুদ্রাযন্ত্রেই ছাপা হয়।

১. গ্রন্থের রচনাকালের গণনা অনুসারে।

কলিকাতায় প্রথম নেটিভ হাসপাতাল[১]

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তাহার নাম হইয়াছিল 'A Hospital for the relief of Natives requiring the assistance of a Surgeon'। এই হাসপাতালের কার্য-নির্বাহের ভার, সাহেব ও এদেশীয় লোক লইয়া সংগঠিত একটি কমিটির হস্তে থাকে। কলিকাতার অধিবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কার্য-নির্বাহক হন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আটাশ জন লোকের অর্থ-সাহায্যে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে তৎকালীন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস একাই তিন হাজার টাকা দান করেন। গঙ্গানারায়ণ দাস ও কৃষ্ণকান্ত সেন বলিয়া দুই জন বাঙ্গালী প্রত্যেকে ৫০০ টাকা দান করিয়াছিলেন।

ইংরাজের বিপদে বাঙ্গালীর সহানুভূতি

বিলাত হইতে সংবাদ আসে (১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দ) যে ফরাসীগণ ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে। ইহাতে ইংলণ্ডে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। সমস্ত ইংলণ্ডবাসী সভাসমিতি করিয়া তাঁহাদের মাতৃভূমির রক্ষার্থে ও ইংলণ্ডাধিপের অর্থবল প্রবল করিবার জন্য চাঁদা তোলেন। এই চাঁদার পরিমাণ বড় কম নহে। 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে' ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত দেড় মিলিয়ান টাকা জমা দেওয়া হয়।

লণ্ডনের ও সমগ্র ব্রিটিশ-দ্বীপবাসীদের এইরূপ সহানুভূতির কথা এদেশে আসিয়া পৌঁছিলে, কলিকাতাবাসী ইংরাজেরা শেরিফের সহায়তায় থিয়েটার-গৃহে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করেন। ১৭ই জুলাই কলিকাতায় এই মহাসভা হয়। কেবল কলিকাতায় নহে, মান্দ্রাজে, বোম্বাই প্রভৃতি ইংরেজাধিকৃত স্থানসমূহেও এই সময়ে সভাসমিতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতার এই ইংরাজ-সভায় একদিনে দেড় লক্ষ টাকার উপর চাঁদা উঠে। মান্দ্রাজের সভায় ১৮৫৯১৬ প্যাগোডা আদায় হয়। বোম্বাইয়ের সভায় ২৪৪৭০৭ টাকা আদায় হইয়াছিল। এই সমস্ত টাকাই বিলাতে প্রেরিত হয়। এই বিষয় লইয়া সমগ্র ভারতের ইংরাজ-মহলে তখন এমন একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যে সামান্য ইংরাজ গোরা পর্যন্ত তাহাদের এক মাসের বেতন চাঁদা স্বরূপ দান করে।

ইংরাজদিগকে এই ভাবে সভা-সমিতি করিতে দেখিয়া ইংলণ্ডাধিপের বিপদে সহানুভূতি দেখাইবার জন্য ও রাজভক্তি প্রকাশের জন্য কলিকাতা সহরের সেই সময়ের গণ্যমান্য বাঙ্গালিগণ একটি সভা করেন। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২১এ আগস্ট এই সভা কলিকাতায় আহূত হয়। এই সভার অনুষ্ঠাতাগণের মধ্যে গৌরচরণ মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক, রামকৃষ্ণ মল্লিক, গোপীমোহন ঠাকুর, কালীচরণ হালদার, রসিকলাল দত্ত, গোকুলচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সভায় সেই দিনে ২০৮০০ টাকা চাঁদা আদায় হয়।

সেকালের ইংরাজের বিবাহ

তখন অতি অল্প সংখ্যক ইংরাজ মহিলাই এদেশে আসিতেন। যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদেরও সহজে বিলাত যাওয়া ঘটিত না। এজন্য কোন নূতন ইংরাজ মহিলা কলিকাতায় আসিলে তাঁহার বাড়িতে পরিচিত অপরিচিত ইংরাজদের ভিড় লাগিয়া যাইত। অবশ্য ইহাদের সকলের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইত না। যে ভাগ্যবান ইংরাজ সেই নবাগত বরবর্ণিনীর হৃদয়াধিকার করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি তাঁহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করিতেন। খোদ গবর্ণর-সাহেবের লাইসেন্স ব্যতীত কোন বিবাহই সেকালে মঞ্জুর হইত না। পাদরী সাহেবেরা বিবাহ দিবার সময় খুব লম্বা চৌড়া বৃত্তি পাইতেন।

---

১. "A Hospital was established by Sir John Shore . . . in the Fouzdaree House, Chitpur Road, for the relief of the native inhabitants of Calcutta generally and more particularly for the labouring parts of them".—H.E.A Cotton, *Calcutta Old & New*, 2nd Ed. p. 781.

এক একটি বিবাহে পাদরিগণ ১৬ হইতে ২০ মোহর পর্যন্ত যজমানের নিকট আদায় করিতেন।

সেকালের ঔষধ ও ডাক্তারের ভিজিট

সেকালে এদেশীয় লোকেরা বিলাতি ঔষধ খাইত না। সাহেব ডাক্তারও খুব কম লোকই দেখাইত। মধ্যবিত্ত ইংরাজদেরও সেই দশা। সেকালের ইংরাজ ডাক্তারেরা পালকি করিয়া রোগী দেখিতেন। ডাক্তারের ভিজিট ছিল একটি সোনার মোহর। যদি কোন বাটিতে একটির অধিক রোগী থাকিত, তাহা হইলে এই হিসাবেই প্রত্যেক রোগীর জন্য ভিজিট দিতে হইত। ঔষধের দামও সেইরূপ চড়া ছিল। কলিকাতায় বর্তমান কেল্লা নির্মিত হইবার পর কোম্পানি-বাহাদুর পুরাতন কেল্লার মধ্যে একটি ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে সুবিধা দরে ঔষধ বিক্রি হইত। এই সুবিধার দরটা একবার দেখুন। কোন কিছু ভেষজ-দ্রব্যের ছালের দাম প্রতি আউন্স তিন টাকা। কোন প্রকার বিরেচক শোধিত-লবনের মূল্য প্রতি আউন্স এক টাকা। একটি বেলেস্তারার দাম দুই টাকা। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের একটি মোকদ্দমার বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়, ডাক্তার হ্যালিডে তাঁহার রোগীর নামে ছয়টি ভিজিটের মূল্য বাবত ৩৮৪ সিক্কা টাকার দাবিতে 'কোর্ট অব দি রিকোয়েস্টস্' নামক আদালতে নালিশ রুজু করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভিজিটের দাম তাহা হইলে ৬৪ টাকায় দাঁড়াইতেছে। সেই সময়ে ডাক্তারের দরটা কত বেশী ছিল, তাহা পাঠক উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারিবেন।

খস্‌খসের টাট্টি

তখন টানা পাখা ছিল না। 'ইলেকট্রিক্-ফ্যান' ত স্বপ্ন-রাজ্যের কথা। গ্রীষ্মকালে জল ঠাণ্ডা করিবার জন্য সোরার স্তূপের মধ্যে জল পাত্র বসাইয়া রাখা হইত। দুর্দমনীয় গ্রীষ্মের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তখন অবস্থাপন্ন ইংরাজেরা খসখসের টাট্টি ব্যবহার করিতেন। ডাক্তার ক্যাম্বেল বলিয়া একজন সমসাময়িক ইংরাজ লিখিতেছেন, "বাহিরে হাওয়া খুব গরম হইলে বাড়ির মধ্যে কামরার হাওয়া অতি ঠাণ্ডা। এ ঠাণ্ডাটা ঠিক যেন বিলাতের মত। যে সকল গৃহে এরূপ পরদা নাই, কার সাধ্য সেখানে বাস করে।" (১০।৫।১৭৮৯)

সেকালের যান-বাহন

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে কলিকাতায় গাড়ির প্রচলন হয়। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় স্টুয়ার্ট কোং বেশ জাঁকাইয়া উঠে। এই কোম্পানি বিলাত হইতে গাড়ি আমদানি করিতেন। সে সকল দামি গাড়ি, পদস্থ ইংরাজেরাই ব্যবহার করিতেন। সেকালের 'হিকিস গেজেটে' এইরূপ গাড়ি আমদানির বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের চেরিয়ট গাড়ি ছিল। আরও অনেক পদস্থ ইংরাজেরও ছিল। অনেকে তখন বগি-গাড়িও ব্যবহার করিতেন। মেম-সাহেবেরা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহেবেরা পাল্‌কি ব্যবহার করিতেন। অনেকে অশ্বারোহণে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় নদীতীরে বেড়াইতে যাইতেন।

সেকালের লাট-সাহেবদের 'ময়ূরপঙ্খী' প্রভৃতি সুবৃহৎ জলযান ছিল। লর্ড ভ্যালেন্‌সিয়া[১] ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লির সুবৃহৎ জলযানে কলিকাতায় উপস্থিত হই। এই জলযান সোনালির কাজ করা ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে সুন্দর রূপে চিত্রিত। এই জাহাজের সম্মুখ দিকে, সোনার গিলটি করা ঈগল-পক্ষীর প্রতিমূর্তি। পশ্চাতে একটি সুচিত্রিত বাঘের মাথা। কুড়িজন লোক সুখাসীন হইয়া এই নৌকায় যাইতে পারে।" তখন অনেক ইংরাজ প্রতিদিন কলিকাতা হইতে গার্ডেনরিচে নৌকা করিয়া বেড়াইতে যাইতেন। দূরবর্তী স্থানে যাইতে হইলে তাঁহারা চন্দননগর, সুখসাগর প্রভৃতি

---

১. George Annesley Valentia (1770-1844) started on his voyage to India (1802), attended by Henry Salt, his draughtsman and secretary. On return to England in 1806 he published ***"Voyages and Travels in India, The Red Sea, Abyssinia and Egypt."*** —C.E. Buckland, ***Dictionary of National Biography***, p. 433-434.

স্থানে যাইতেন। স্টাভোরিন্স[১] ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। তিনি লিখিতেছেন, "এদেশের একরকম বোট দেখিতে অতি সুন্দর ও বিচিত্র রূপে চিত্রিত। এগুলি 'ময়ূরপঙ্খী' বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বোটগুলি খুব লম্বা ও সরু। অনেক স্থলে লম্বায় একশত ফিট। চওড়ায় আট ফিট। ৪০ জন লোকে দাঁড় লইয়া এই 'ময়ূরপঙ্খী' চালাইত। নৌকার মাথার দিকে হয় সুবৃহৎ সর্পমূর্তি, না হয় সুচিত্রিত ময়ূর-মূর্তি। নৌকার পশ্চাতের দিকে ডেকের উপর চারিটি রৌপ্য-দণ্ডে একখানি রেশমি চাঁদোয়া খাটানো থাকিত। নৌকার অধিকারী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এই উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া এই নদীবক্ষে প্রবাহিত শীতল বায়ুসেবন করিতেন। এই সব নৌকা নানাবিধ বিচিত্রবর্ণে সোনালী রঙে চিত্রিত করা হইত, এজন্য এগুলির দাম বড় বেশী। গঙ্গার উপর এ প্রকার নৌকায় চড়িয়া প্রভাত বা সান্ধ্য-ভ্রমণ বড়ই তৃপ্তিজনক।"

নাচের মজলিস্

সেকালে দুর্গোৎসব উপলক্ষে অনেক বড় বড় বাঙ্গালীর বাড়িতে নাচের মজলিস্ হইত। মহারাজ নবকৃষ্ণ খুব জাঁকাইয়া দুর্গোৎসব করিতেন তাহাতে অনেক বড় বড় ইংরাজ নিমন্ত্রিত হইতেন। এরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি এই সব নাচের মজলিসে উপস্থিত থাকিতেন। রাজা সুখময় রায়ের দুর্গোৎসবও খুব জাঁকালো ছিল। সাহেবদের সুবিধার জন্য রাজা বাহাদুর দুইখানি বড় বড় টানা পাখার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর বাটিতেই হিন্দুস্থানী গতের সহিত ইংরাজি গত মিশাইয়া সাহেবদের তৃপ্ত্যর্থে ত্রৌর্যত্রিকানুষ্ঠান হইত।

ইংরাজি থিয়েটারে বিদ্যাসুন্দর রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

প্রথমে লালবাজারে ইংরাজদের একটি থিয়েটার স্থাপিত হয়। এ থিয়েটার সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময় বর্তমান ছিল। তারপর সেটি উঠিয়া যাওয়ায় বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংএর পিছনে আর একটি থিয়েটার হয়। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বাটিতে থিয়েটার চলে। তাহার পর গোপীমোহন ঠাকুর এই বাড়ি ও ইহার পার্শ্ববর্তী জমিগুলি কিনিয়া লইয়া, একটি বাজার স্থাপন করেন। সেই বাজারের নামকরণ হয়—নূতন চীনেবাজার। এখনও পর্যন্ত এই নাম প্রচলিত।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ডোমতলায় আর একটি থিয়েটার স্থাপিত হয়। পুরাতন চীনেবাজারের নিকটস্থ একটি পল্লী ডোমতলা বলিয়া অভিহিত হইত। এইখানে মিস্টার লেফেডফ্[২] বলিয়া একজন সাহেব, থিয়েটার খোলেন। তাহার নাম ছিল 'মিঃ লেফেডফ্‌স নিউ থিয়েটার।' এই থিয়েটারের একটু বিশেষত্ব আছে। তাহা নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি হইতেই প্রকাশিত—বিজ্ঞাপনটি এই "গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের সম্মতি অনুসারে মিঃ লেফেডফের থিয়েটার বাঙ্গালী-ধরনে সজ্জিত করা হইয়াছে। শীঘ্রই এখানে 'Disguise' বলিয়া একখানি নাটকের অভিনয় হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই অভিনয় করিবেন। ঐকতান-বাদ্যে অনেক হিন্দুস্থানী-গত বাজান হইবে। বিলাতী বাদ্যযন্ত্রের সহিত যে সকল বাদ্যযন্ত্র বাঙ্গালীদের প্রিয়, তাহাও ব্যবহৃত হইবে। বাঙ্গালীর সর্বজন প্রিয় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের একটি শব্দঝঙ্কারপূর্ণ কবিতার সঙ্গীতাবৃত্তি হইবে।"

ইহার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় আরও দুইটি থিয়েটারের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একটির নাম 'কলিকাতা থিয়েটার' অপরটির নাম 'হোয়েলার-প্লেস থিয়েটার।'

ইহার পর দুইটি থিয়েটারের অস্তিত্ব লোপ হয়। তখন চৌরঙ্গী জনপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। এইজন্য চৌরঙ্গীতে একটি নূতন থিয়েটার নির্মিত হয়। ইহার নাম হইয়াছিল 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'।

১. ষ্টাভোরিন্স-এর পরিবর্তে পড়িতে হইবে Stavorinus. ইনি ওলন্দাজ নৌ-অধ্যক্ষ ছিলেন।

২. রুশ Herashim Lebedeff "১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতার ডোমতলায় (বর্তমান এজরা ষ্ট্রীট) 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে একটি থিয়েটার স্থাপন করে গোলকনাথ দাস নামে এক বাঙ্গালীর সহায়তায় বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করে কলকাতায় প্রথম বাংলা অভিনয়ের আয়োজন করেন।"—অতুল সুর, [কল]কাতার চালচিত্র, পৃ. ১০৭।

১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ইহা অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। এই থিয়েটার বর্তমান 'থিয়েটার রোডের' উপর ছিল, এবং তাহা হইতেই 'থিয়েটার-রোড' নামকরণ হইয়াছে।

১৮১২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ একশত বৎসর পূর্বে ১৮ নং সার্কিউলার রোডে আর একটি থিয়েটার নির্মিত হয়। তাহার নাম ছিল 'দি এথিনিয়াম।' 'আর্ল অব এসেক্স' নামক ঐতিহাসিক নাটক ও Raising the Wind নামক প্রহসন, এখানে খুব সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। টিকিটের দাম ছিল একটি মোহর।

এতদ্ব্যতীত 'চৌরঙ্গী ড্রামাটিক সোসাইটি' নামে এক সখের থিয়েটার ১৮১৪য় স্থাপিত হয়। তাহাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে খিদিরপুরে এক থিয়েটার স্থাপিত হইয়াছিল। এ থিয়েটারও স্বল্পজীবী। Lying Valet বলিয়া একখানি নাটক এখানে অভিনয় হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে বহুদূরে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে সেই সময়ে আর একটি থিয়েটার স্থাপিত হয়। (এপ্রিল ১৮০৮) এখানে একদিন অভিনয়ের সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সে ঘটনাটি এই—চন্দননগরের এই থিয়েটারে একদিন L' Afocat নামক একখানি ফরাসী-নাটক অভিনয় হইতেছিল। নাটকের সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই—এক মেষপালক কোন ধনী ব্যক্তির অধীনে চাকরি করিত। এই ধনীর ফারমের মেষগুলি দেখিতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আর তাহাদের গায়ের লোমও অতি সুন্দর। হতভাগ্য মেষপালক দুইটি মেষ চুরি করিয়া মারিয়া ফেলে। তাহার প্রভু ভৃত্যের নামে স্থানীয় জজের-আদালতে মেষহত্যা দাবীতে নালিশ করেন। নাটকের ঘটনাস্থল ইংলণ্ড।

তখন থিয়েটার চলিতেছে। যে দৃশ্যে জজ বিচারাসনে উপবিষ্ট, মেষপালক অপরাধীরূপে দণ্ডায়মান, জজ অপরাধীকে দণ্ড দিলেন—সেই দৃশ্যাভিনয়ের সময়ে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

চন্দননগর থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয় উইংসের পার্শ্বে ছিলেন। একজন বাঙ্গালী মিস্ত্রি সেই স্টেজে ভৃত্যরূপে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে মিস্ত্রিও তখন স্টেজের মধ্যে। এমন সময়ে ম্যানেজার জানিতে পারেন, যে জনৈক অভিনেতার একটি দামী জিনিস তখনই চুরি গিয়াছে। সেই মিস্ত্রির উপর তাঁহার সন্দেহ হয়। অভিনেতা জজ তখনও স্টেজে বসিয়া। অপরাধী মেষপালকের উপর যেমন দণ্ডাজ্ঞা হইয়া গেল—ঠিক সেই সময়ে ম্যানেজার সেই অপরাধী মিস্ত্রিকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, সেই অভিনেতা বিচারকের সম্মুখে খাড়া করিয়া বলিলেন, "ধর্মাবতার! এ ব্যক্তি একজন অভিনেতার কোন জিনিস চুরি করিয়াছে, কিন্তু কবুল করিতেছে না।" জজ ভ্রূকুটিভঙ্গি করিয়া বলিলেন —"সত্য কথা বল, তুই চোর কিনা?" সেই মিস্ত্রিও এই ব্যাপার দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। সেই অভিনেতা জজের সম্মুখে সে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। জজ তাহাকে কঠোর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "এবার তোমায় ছাড়িয়া দেওয়া গেল। কিন্তু আর কখনও চুরি করিও না ও এই থিয়েটারের ত্রিসীমানায় আসিও না।" বলুন দেখি পাঠক! এটা জীবন্ত অভিনয় নয় কি?

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে দমদমাতেও একটি থিয়েটার স্থাপিত হয়। এই থিয়েটার বহুদিন বর্তমান ছিল। এতদ্ব্যতীত বৈঠকখানা বাজারেও 'থিয়েটার বৈঠকখানা' বলিয়া একটি থিয়েটার ছিল।

তখনকার থিয়েটারে ইলেকট্রিক পাখা ছিল না, গ্যাসের আলোও ছিল না। তেলের আলোতেই কাজ চলিত। ভবিষ্যৎ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী, কুমারী ইডেন[১] তাহার একখানি বিলাতি-পত্রে সেকালের সাহেবি থিয়েটারের কষ্টের কথা অনেক বলিয়া গিয়াছেন।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ

ঘোড়দৌড় কলিকাতায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের "হিকিস-গেজেটে" এই ঘোড়-দৌড়ের প্রথম বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের শেষভাগে। ইহার

১. বর্তমান ইডেন-গার্ডেন এই কুমারী ইডেনই প্রতিষ্ঠা করেন।

পর ১৭৯৫ পর্যন্ত যে সমস্ত ঘোড়দোড় হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠক পূর্বে দেখিয়াছেন। ১৮০৩ খৃীস্টাব্দে 'জকি ক্লাবের' প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। আগে গার্ডেনরিচের বর্তমান মেটিয়া বুরুজের উপান্তভাগে, আকড়া-বারুদখানায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল। বারুদখানা নামের কারণ এখানে কোম্পানির একটি ম্যাগাজিন বা বারুদাগার ছিল। বর্তমান ঘোড়দৌড়ের মাঠ ১৮১৯ খৃীস্টাব্দে খোলা হয়। এতদ্ভিন্ন বারাসতেও ঘোড়দোড় হইত।

ক্রিকেট

প্রাচীন কলিকাতায় ক্রিকেটের প্রথম প্রচলন হয়, ১৮০৪ খৃীস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি। উক্ত দিবসে কোম্পানির ইটোনিয়ান সিভিল সার্ভেন্ট ও অন্যান্য ইংরাজদের মধ্যে প্রথম 'ক্রিকেট-ম্যাচ' হয়। ইহার পূর্বে প্রকাশ্য ভাবে ক্রিকেট-ম্যাচের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

সেকালের আদালতের জজদিগের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা

তখন আদালতসমূহে ইংরাজির এত প্রচলন হয় নাই। ফার্সী ভাষায় লিখিত দলিলের ও সওয়াল-জবাবের তখন খুব প্রাধান্য ছিল। অনেক দলিল বাঙ্গলাতেও লিখিত হইত। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর ও তৎপরে ১৮০১ সালের ১লা জানুয়ারি এক আদেশ প্রচার করেন —"আদালতের জজদিগকে হিন্দি, ফার্সী ও বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ঐ সমস্ত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহারা জজিয়তি পাইবেন না।"

১। যে কোন সিভিলিয়ান, বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি আদালতের জজ কিম্বা রেজিস্ট্রারের কাজ করিবেন, তাঁহাদের ফার্সী ও হিন্দুস্থানী জানা আবশ্যক।

২। রেভেনিউ-কলেক্টর, কাস্টম-কলেক্টর, কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট, নিমকির-এজেণ্ট প্রভৃতি কর্মচারিগণ, যাঁহারা বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার মধ্যে কাজ করিবেন, তাঁহাদের বাঙ্গলা ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

৩। রেভেনিউ-কলেক্টর, কাস্টম-কলেক্টর, ওপিয়ম-এজেণ্ট, কমার্সিয়াল-রেসিডেণ্ট প্রভৃতি কর্মচারিগণ, যাঁহারা বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে কাজ করিবেন, তাঁহাদের হিন্দুস্থানী ভাষা জানা আবশ্যক।[১]

সেকালের লাট-দর্শনের ব্যবস্থা

সেকালের এরূপ ব্যবস্থা ছিল, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের যে কোন ভদ্রশ্রেণীর প্রজা, লাট-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার অভাব অভিযোগ জানাইতে পারিত। সাধারণের অভিযোগ ও দরখাস্ত, সবই লাট-বাহাদুর একটি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রহণ করিতেন। ১৮০০ খৃীস্টাব্দের ২৫এ সেপ্টেম্বরের একটি সাধারণ নোটিস হইতেই ইহা প্রমাণিত। সে নোটিসটি এই—The Most Noble the Governor General will give audience from 6 untill 12 o'clock on Monday next.

একটি মজাদার বিজ্ঞাপন

সেকালের টাকার কত ছড়াছড়ি ছিল, তাহা নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি হইতে প্রকাশ হইতেছে। কোন ভদ্রলোকের আঙ্গুলে জুতার কড়া হইয়াছিল। ইহার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সেই ক্ষুদ্র নবাব বিজ্ঞাপন দেন—"আমার পায়ে কতকগুলি কড়া হওয়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছি। যে লোক এই কড়াগুলি আরাম করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে এক হাজার সিক্কা টাকা পারিতোষিক দিব। ৮০ নং জিগ্-জ্যাগ্ লেনে সংবাদ লউন।" (১৭৯৩ খৃীস্টাব্দ।)

কলিকাতায় প্রথম বাঁধাকপির চাষ

এদেশে ইংরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গোলআলুর প্রচলন হইয়াছে। সেকালের অনেক দুর্গা পূজার হিসাবে গোলআলুর নাম নাই, তবে রাঙ্গাআলুর ব্যবস্থা আছে। সর্বপ্রথমে ১৭৯৪ খৃীস্টাব্দে কলিকাতায় বাঁধা-কপির প্রথম প্রচলন হয়। ইহা সাহেবি-মহলে অবশ্য প্রথম সমাদৃত হয়। এ

১. *Government Order dated 21st December, 1798.*

সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞাপন দেখুন। "যাঁহারা বাঁধাকপির লোভনীয় আস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিতে চান, তাঁহারা চাঁদপাল ঘাটের সান্নিধ্যে, পুরাতন অর্গান-হাউসের একটু দক্ষিণে, কাপ্তেন ম্যাকিনটারের বাগানে অনুসন্ধান করুন। একশত কপির দাম—৮ সিক্কা টাকা।"

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন

তখন এদেশে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষার জন্য কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। ইংরাজি স্কুল সংখ্যা খুব কম ছিল। উচ্চ শিক্ষার নাম গন্ধ ছিল না। এজন্য বিলাত হইতে মধ্যে মধ্যে এক একজন বিশেষজ্ঞ সাহেব আসিয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেকচার দিতেন। অবশ্য সাহেবেরাই এই সমস্ত লেকচার শুনিতেন। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা দেখিতে পাই, "ডাক্তার ডিগ্‌উইডি ভদ্রসাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন—যে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) এবং রসায়ন (Chemistry) সম্বন্ধে আগামী ২১এ এপ্রিল হইতে কয়েকটি লেকচার দিবেন। ২৫ বা ৩০টি লেকচারেই 'কোর্স' সম্পূর্ণ হইবে। ইহার ব্যয় ১০টি সোনার মোহর।"

কলিকাতায় প্রথম ইন্‌স্যুওরেন্স-কোম্পানি

আজকাল পঙ্গপালের মত দেশী-বিদেশী ইন্‌স্যুওরেন্স কোম্পানিতে কলিকাতা ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন, অর্থাৎ শতাধিক বৎসর পূর্বে, কলিকাতায় 'ইউনিয়ন ইন্‌স্যুওরেন্স কোম্পানি' বলিয়া একটি বীমা-কোম্পানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এই কোম্পানি কেবল জাহাজ ও জাহাজের মাল বীমার কাজ করিত, জীবন বীমা করিত না।

শত বৎসর পূর্বে লংক্লথের দাম

"কয়েক থান সুন্দর লংক্লথ বিলাত হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে, কেন না বিশেষভাবে অর্ডার দিয়া ইহা প্রস্তুত করান হইয়াছে। প্রত্যেক থানের মূল্য ৫৬ হইতে ১১০ সিক্কা টাকা। (১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ)

লালবাজারে বাঘ বিক্রি

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বরের একটি বিজ্ঞাপন হইতে প্রকাশ—২৩০ নং লালবাজারে মিঃ স্মিথের দোকানে একটি Royal Bengal Tiger বা সুন্দরবনের বৃহৎ বাঘ বিক্রয়ার্থে আনান হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চারি মাস বয়সের দুইটি বাঘের ছানা ও একটি চিতাবাঘও বিক্রয় করা হইবে। গ্রাহকগণ স্বচ্ছন্দে দেখিয়া বাঘের মূল্যাদি স্থির করুন। বাঘ দেখিবার জন্য ইহার রক্ষককে আট আনা বক্‌শিশ দিতে হয়।
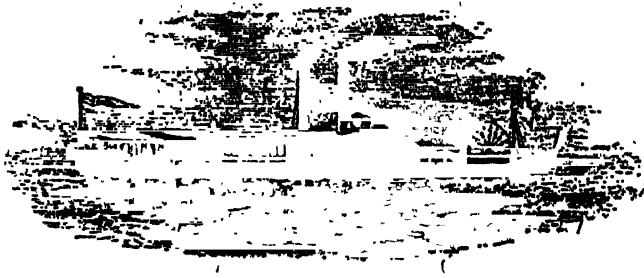
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রাচীন কলিকাতার ক্রমোন্নতি ও আয়তন বিস্তার

লর্ড কর্ণওয়ালিসের বঙ্গদেশে আগমন—লাট-কাউন্সিলে তাঁহার একাধিপত্য, সেকালের লাট-সাহেবদের দৈনিক জীবন—ওল্ড কোর্ট হাউসের ধ্বংসসাধন—সদর দেওয়ানি আদালত—দশ-শালা বন্দোবস্ত—টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে কর্ণওয়ালিসের জয়লাভ—কর্ণওয়ালিসের আমলে কলিকাতার উন্নতি—লর্ড ওয়েলেসলির আমল—তাঁহার আমলে কলিকাতা-সহরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি—বর্তমান লাট-প্রাসাদে প্রথম বল ও দরবার—শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ—মার্শম্যান, ওয়ার্ড ও কেরি—বাঙ্গালীর মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা—বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম অক্ষর নির্মাণ ও ছাপাখানা স্থাপন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের প্রথম মুদ্রাঙ্কণ—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—গঙ্গাসাগরে পুত্র-কন্যা ভাসাইয়া দেওয়ার প্রথা রহিত হওয়া—কলিকাতায় তৎকালীন জন-সংখ্যা—আইন আদালতের কথা—সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চিফ্-জস্টিস স্যর ইলাইজা ইম্পি সম্বন্ধে নানাকথা—ইম্পির কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ ও অভিনন্দন ব্যাপার—সুপ্রীমকোর্টের জজ স্যর রবার্ট চেম্বার্স— ম্যাডাম গ্রাণ্ডের মোকদ্দমা—স্যর উইলিয়ম জোন্স—১৭৭৪ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের চিফ্-জস্টিস ও পিউনি জজগণের নামের তালিকা ও কার্যকাল—সেকালের ব্যারিস্টারের ফি—সেকালের সুপ্রীমকোর্টের দণ্ড ব্যবস্থা—চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি, মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি সম্বন্ধে মোকদ্দমার বিচার ও দণ্ডের নমুনা—সেকালের ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা—সেকালের ইংরাজি সংবাদপত্রাদি—সেকালের বাঙ্গলা সংবাদপত্রের তালিকা (১৮১৬ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) —সেকালের প্রকাশিত বহুমূল্য ইংরাজি পুস্তক—প্রথম বাঙ্গলা সংবাদপত্র—সমাচার দর্পণ, চন্দ্রিকা ও কৌমুদী—রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মণ-পত্রিকা—বঙ্গদূত—বাঙ্গলা দেশে ছাপার অক্ষরে প্রথম পত্রিকা প্রচার—অগ্র দ্বীপের ছাপাখানা—লটারি কমিটি—লটারি-কমিটির সহায়তায় কলিকাতার সৌন্দর্যবৃদ্ধি—বঙ্গদেশে প্রথম স্টীমার-সার্ভিস—হুগলি নদীতে প্রথম স্টীমার চলাচল—কাশী পর্যন্ত স্টীমার যোগে যাতায়াত—খিদিরপুর গবর্ণমেণ্ট ডক-ইয়ার্ড—লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে জলপথে স্টীমার চালাইবার জন্য নানাবিধ বন্দোবস্ত।

(লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল হইতে লর্ড ওয়েলেসলির আমল পর্যন্ত)

ওয়ারেন হেস্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সমূহের দ্বিতীয় গবর্ণর-জেনারেল রূপে এদেশে আসেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হন। হেস্টিংসের পদত্যাগের পর হইতে কর্ণওয়ালিসের কলিকাতায় আগমন সময় পর্যন্ত, এই কুড়ি মাস কাল[১] স্যর জন ম্যাক্‌ফারসন অস্থায়ী গবর্ণরি করেন। ম্যাক্‌ফারসনের আমলে এমন কোন নূতন ঘটনা ঘটে নাই যাহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তবে তিনি গর্ব করিয়া সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতেন, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকারসমূহের সুব্যবস্থা ও দুর্নীতিসূচক কর্মের মূলোচ্ছেদ করিয়া আমি কোম্পানির আড়াই লক্ষ টাকা বাঁচাইয়া দিয়াছি।"

---

১. ওয়ারেন হেস্টিংসের পদত্যাগ (১লা ফেব্রুয়ারি ১৭৮৫) এবং লর্ড কর্ণওয়ালিসের ক্ষমতা গ্রহণের (সেপ্টেম্বর ১৭৮৬) মধ্যবর্তী ১৮ মাস অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কাউন্সিল-এর প্রবীণতম সদস্য স্যর জন ম্যাক্‌ফারসন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস একজন শক্তিমান পুরুষ। ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজমন্ত্রী পিট্ ও কোম্পানির ডাইরেক্টারগণ তাঁহার হস্তে শাসন-সম্বন্ধে অসীম ক্ষমতা ও একাধিপত্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। হেস্টিংসের আমলে রাজ্যশাসন ব্যাপার সম্বন্ধে ক্ষমতা প্রকাশ ব্যাপার লইয়া কাউন্সিলের সদস্যগণের সহিত গবর্ণর হেস্টিংসের অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছিল। তাহার ফলে হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ, রাজ শাসন প্রণালীতে ঘোর বিশৃঙ্খলা। কিন্তু বিলাতের কর্তারা কর্ণওয়ালিসকে স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়াছিলেন, "কাউন্সিলের সদস্যগণের উপর আপনার হুকুমই শেষ হুকুম। যাহাতে বাঙ্গলার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য হয়, তাহার ব্যবস্থা আপনি স্বেচ্ছানুসারে করিবেন।"

লর্ড কর্ণওয়ালিস দৃঢ়চেতা ও নির্ভীক রাজপুরুষ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই শাসনতন্ত্র সংস্কারে মনোযোগ দেন। কোম্পানির কর্মচারীরা ও সেকালের সিবিলিয়ানেরা বেতন কম পাইতেন বলিয়া গুপ্তভাবে নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেনামি কারবারে যোগ দিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রচুর পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাহাদের গুপ্ত ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করিয়া এবং এ সম্বন্ধে অপরাধীদের শাস্তি দিয়া শাসনতন্ত্রের এক বিরাট সংস্কার সাধন করেন। লর্ড ক্লাইভ বহু চেষ্টাতেও যে সমস্ত কুপ্রথা দমন করিতে পারেন নাই, কর্ণওয়ালিস তাহা অতি সহজে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। টিপু সুলতানের ধ্বংসসাধন ও মহারাষ্ট্রশক্তির ক্ষয় করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস ইতিহাসে প্রথিতযশা হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে তাঁহার যশের কীর্তিস্তম্ভ 'Permanent Settlement' বা 'চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত' এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধির সংস্কার।

তাঁহার শাসনকালের[১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তিনি খুব কমই কলিকাতায় থাকিতেন। টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযান ও মহারাষ্ট্রীয়-যুদ্ধ ব্যাপারের জন্য অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে রণক্ষেত্রে থাকিতে হইয়াছিল। কলিকাতায় শান্তিময় জীবন তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না।

কর্ণওয়ালিস তাঁহার পুত্র লর্ড ব্রোমারকে তাঁহার কলিকাতা-বাস সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একাংশের সারমর্ম এই, "কলিকাতায় থাকার সময়ে আমাকে ঘড়ির কাঁটার অধীন হইয়া কাজ করিতে হয়। প্রত্যেক দিন সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে আমি অশ্বারোহণে ময়দানে বেড়াইতে যাই। একই রাস্তা, একই দূরত্ব, একই দৃশ্য দেখিয়া রোজ ঘুরিয়া আসিতে হয়। তাহার পর সূর্যকিরণ প্রখর হইতে আরম্ভ হইলে আমি বাড়িতে ফিরিয়া আসি। মধ্যাহ্নকালের সমস্ত সময়টাই রাজকর্মে অতিবাহিত হয়। তার পর মধ্যাহ্ন ভোজন। অবশেষে অপরাহ্ণে ফিটনে করিয়া পুনরায় নগর-ভ্রমণ ও সান্ধ্যবায়ু সেবন। ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের পর আমার কাছে সরকারি কাজের যে সমস্ত চিঠিপত্র ডেস্‌প্যাচ্ আসিয়াছে, তাহা পাঠ করা। তাহার পর রাত্রি নয়টার সময় আমার সহকারী দুই তিনজন পদস্থ কর্মচারীকে লইয়া রাত্রি-ভোজন বা সাপার। রাত্রি-ভোজনের পর প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দশটা রাত্রে আমি শয্যা আশ্রয় করি।"

কলিকাতায় অতি স্বল্পকাল থাকিলেও তিনি কলিকাতার বাহ্যিক উন্নতি ও সৌষ্ঠবসাধনে ত্রুটি করেন নাই। সহরের মধ্যে যাহাতে শান্তিরক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়, নগরবাসীরা নিঃশঙ্কচিত্তে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। তখন সহর কলিকাতায় ও ইহার উপকণ্ঠবর্তী স্থানসমূহে, অর্থাৎ ভবানীপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানে রাহাজানি ও ডাকাতি যেন নিত্য-প্রথা ছিল। ইহার পরিচয় পাঠক ইতিপূর্বেই পাইয়াছেন। যাহাতে কলিকাতাবাসী বদমায়েসদের ও নরহন্তাদের সম্পূর্ণরূপে দমন হয়, তজ্জন্য তিনি কঠোর পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার আমলেই বাঙ্গলায় দাস ক্রয়বিক্রয়-প্রথার মূলোচ্ছেদের জন্য প্রথম সরকারি আদেশ বাহির হয়।

১. কর্ণওয়ালিসের প্রথম শাসনকাল ১৭৮৬-১৭৯৩ খ্রী.।

'ওল্ড-কোর্ট-হাউস' অর্থাৎ যে বাটিতে মহারাজা নন্দকুমারের নামে জাল অপরাধের বিচার হয়, তাহা বর্তমান 'কোর্টহাউস' পথের শেষাংশে, স্টুয়ার্ট কোম্পানির বাড়ির গায়েই ছিল। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে, এই পুরাতন কাছারি বাড়িটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। আজ কাল যেখানে হাইকোর্ট আছে, সেইস্থানে 'নিউ কোর্ট হাউস' নির্মিত হয়। ভবিষ্যতে এই নিউ কোর্ট হাউস ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, সেইস্থানে প্রথমে সদর দেওয়ানী আদালত, তৎপরে বর্তমান হাইকোর্টের স্থান হইয়াছে। আর পুরাতন কোর্ট হাউসের ভূমি অধিকার করিয়া, বর্তমান স্কচগির্জা (যাহা রাইটার্স বিল্ডিংএর নিকট আজও বর্তমান) নির্মিত হইয়াছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৬[১] খ্রীস্টাব্দে এদেশ ত্যাগ করেন তাঁহার স্থানে স্যর জন শোর (পরে লর্ড টেন্‌মাউথ) বাঙ্গলার ভাগ্যবিধাতা হন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব কলিকাতার প্রথম 'সাহেব-জমিদার'। এই জমিদারের কাজ ছিল সহরের উন্নতি, পথ সংস্কার, শান্তিস্থাপন ও কলিকাতার প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করা। স্যর জন শোর এই 'জমিদারের' পদ উঠাইয়া দেন। 'জস্টিসেস অব দি পীস' নামধেয় সমিতির হস্তে তাঁহার আমলেই কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল-বিভাগের ভার অর্পিত হয়। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই পরিবর্তন ঘটে। এই সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা ও উপকণ্ঠবর্তী স্থানসমূহের সীমাও নির্দিষ্ট হইয়া যায়।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে[২] ভারতের সর্বস্থানেই ইংরাজের রাজশক্তি প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহার আমলেই কলিকাতার বর্তমান গবর্ণমেন্ট-হাউস নির্মিত হয়। নবনির্মিত গবর্ণমেন্ট-হাউসে প্রবেশ সময়ে খুব জাঁক-জমক হইয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে ইংরাজেরা কোম্পানির আমলের 'আকবর' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সময়ে কলিকাতার লাট-প্রাসাদে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়, সেরূপ মহোৎসব সেকালে আর হয় নাই। সাত আট শত পদস্থ ইংরাজ নরনারী ও এদেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ গবর্ণর ওয়েলেস্‌লির এই নিমন্ত্রণ মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। এসপ্লানেডের নিকটস্থ বাড়িগুলি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গপ্রাকার ও কলিকাতার প্রধান অট্টালিকা উজ্জ্বল আলোকমালায় পরিশোভিত হইয়াছিল। নদীবক্ষে অসংখ্য পোতরাজি ও পতাকাদি শোভিত হইয়া এই দৃশ্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

বর্তমান নূতন লাট-প্রাসাদের উত্তরদিকের বারান্দায় এই গৃহপ্রবেশ দিনে লর্ড ওয়েলেস্‌লি একটি দরবার করেন। এই দরবারে ভারতীয় প্রধান প্রধান সামন্তরাজ ও জমিদারগণের প্রতিনিধি-সমূহ উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোকও এই দরবারে হাজির হন। দরবারের কার্য শেষ করিয়া লাট বাহাদুর 'বলরুমে' যান। এইস্থানে এক সুদীর্ঘ বিচিত্র ও বহুমূল্য কার্পেটের উপর এক সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এই বহুমূল্য কার্পেটখানি একসময়ে টিপু সুলতানের দরবার-গৃহের সৌন্দর্যবর্ধন করিত।

গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সিংহাসনে বসিলে নৃত্যাদি আরম্ভ হইল। রাত্রি দুইটা পর্যন্ত এই নৃত্যোৎসব চলিয়াছিল। তারপর আতসবাজি ছোঁড়া আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌ, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত কারিগরগণ এই সমস্ত বাজি তৈয়ারি করিয়াছিল। আতসবাজির পর আবার নৃত্যারম্ভ। রাত্রি চারিটা পর্যন্ত সমানভাবে নৃত্য চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, দরবারের পূর্বেই ভোজের ব্যাপারটা শেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহাই বর্তমান গবর্ণমেন্ট-হাউসের প্রথম 'স্টেট বল'।

ওয়েলেস্‌লির আমলে কলিকাতার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। সার্কিউলার রোড এই সময়ে পাকা করা হইয়াছিল। 'জস্টিস অব দি পীস'গণ মহোৎসাহে সহরের উন্নতির জন্য খাটিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে (১৮০১ খ্রীস্টাব্দে) একটি বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ৮৫ জোড়া বলদ ও ৮৫ খানি স্ক্যাভেঞ্জার গাড়ির জন্য টেণ্ডার দিতেছেন।" কলিকাতা সহরের ময়লা নিষ্কাশনের জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছিল। বর্তমান কালে যেরূপ টাউন-ইমপ্রুভ-

১. কর্ণওয়ালিস প্রথম শাসনকালের অবসানে ভারতত্যাগ করেন ১৭৯৩ সালে।
২. ওয়েলেস্‌লির আমল ১৭৯৮-১৮০৫ খ্রী.।

মেণ্ট কমিটি স্থাপিত হইয়াছে ; শতাধিক বৎসর পূর্বে লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলেও এইরূপ একটি কমিটি স্থাপিত হয়। কি করিলে কলিকাতা সহরের প্রকৃত উন্নতি হইবে, কিরূপভাবে ড্রেন ও পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করা উচিত, কি প্রকারে বাঁধ প্রভৃতি প্রস্তুত দ্বারা সহরের মধ্যে বর্ষার সময় গঙ্গার জল প্রবেশ সূচনা বন্ধ হয়, ইত্যাদি বিধানও লর্ড ওয়েলেস্‌লি করিয়া দেন। রাস্তাঘাটের ও গলিগুলির সংস্কার ও নামকরণ, সাধারণ কশাইখানা, গোরস্থান সম্বন্ধে বিশেষ বিধান প্রচলন ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তিনি কলিকাতাকে প্রাচ্যদেশের একটি 'শ্রেষ্ঠ নগরী' করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এদেশ হইতে চলিয়া যান, কিন্তু এই সময়ে তাঁহার অনুষ্ঠিত সংস্কার কার্যগুলি শেষ হয় নাই।

মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি অতি সুদক্ষ, দৃঢ়চেতা শাসনকর্তা ছিলেন। সামরিক প্রতিভাতে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার অমিত পরাক্রমেই টিপু সুলতানের অধঃপতন হয়, মহীশূর ইংরাজের দখলে আসে। দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি ভূভাগ ইংরাজসাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। এই কৃতকার্যতার জন্য তাঁহার নিয়োগকর্তা বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণ তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বাৎসরিক বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বনামখ্যাত ডাক্তার মার্শম্যানের তত্ত্বাবধায়নে শ্রীরামপুরে প্রথম মিশনারি-সমিতি স্থাপিত হয়।[১] মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড সাহেবই প্রথমে কার্য আরম্ভ করেন। পাদরী কেরি সাহেব মালদহে ছিলেন, তিনিও তথা হইতে আসিয়া ইহাদের সহিত যোগ দেন। এই মিশনারি-সমিতির নিকট বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালিগণ বড়ই ঋণী।

তখন এদেশে বাঙ্গলাভাষার অক্ষর ছিল না, বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা বই ছিল না। মার্শম্যান সাহেব একজন এদেশীয় কারিগরকে[২] ধরিয়া বাঙ্গলার টাইপ প্রস্তুত করান। এই নবনির্মিত টাইপে সর্বপ্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাপা হয়। উন্নতপ্রাণ, স্বার্থত্যাগী এই মিশনারিত্রয় বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে ইংরাজি-স্কুল স্থাপন করিয়া বাঙ্গালীদের ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় প্রথম বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ধরিতে গেলে, শ্রীরামপুর বঙ্গ-ভাষার বর্তমান উন্নতির আদি কর্মক্ষেত্র।

লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের আমলে সেকালের 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' স্থাপিত হয়।[৩] লর্ড সাহেব দেখিলেন, যে সকল সিবিলিয়ান এদেশে রাজকর্মে নিয়োজিত হইয়া আসেন, তাঁহাদের কেহই এদেশীয় ভাষা জানেন না। ইহাতে শাসনকার্যের বড়ই অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়া অবধি সিবিলিয়ানগণ বিলাত হইতে কলিকাতায় পেঁাছিবার পরে এই কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হইতেন। এদেশীয় ভাষা অর্থাৎ উর্দু, ফার্সী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তবে তাঁহারা রাজকর্মে নিয়োজিত হইতেন। অনেক নামজাদা বড় বড় পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। স্বনামখ্যাত আচার্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ইহার সর্বপ্রথম পণ্ডিত। রেভারেণ্ড কেরি সাহেবও এই কলেজে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন।

সেই সময়ে গঙ্গাসাগরে পুত্র কন্যা ভাসাইয়া দেওয়ার প্রথা বঙ্গদেশে বর্তমান ছিল। যাহাদের বন্ধ্যাত্বদোষ জন্য সন্তানাদি হইত না বা যাহাদের হইয়া মরিয়া যাইত, তাহারা মানসিক

১. ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় লণ্ডনে (১৭৯২ খ্রী.) ; পরের বছর স্বনামধন্য উইলিয়াম কেরি কলিকাতায় পদার্পণ করিলেও কোম্পানির মিশন-বিরোধী নীতির ফলে কয়েক বছর বাংলার মফঃস্বলে কাটাইয়া ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়াম ওয়ার্ডের সহায়তায় দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের কর্মক্ষেত্র স্থাপন করেন।

২. প্রথমে পঞ্চানন কর্মকার এবং পরে তাহার জামাতা মনোহর এবং মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশন কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বই-এর হরফ ঢালাইর কাজে সহায়তা করেন।

৩. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির শাসন কালে।

করিত যে, ভবিষ্যতে পুত্র বা কন্যা জন্মিলেই, প্রথমজাত শিশুকে গঙ্গাসাগরে ভাসাইয়া দিব। এজন্য অনেকে নবপ্রসূত পুত্রাদি লইয়া সাগরসঙ্গমে যাইত। সেখানে গিয়া একটা মন্ত্র ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান হইত। পুরোহিত মন্ত্রাদি পাঠ করিতেন, তৎসঙ্গে হৃদয়হীন পিতা-মাতা সেই নিরীহ শিশুকে গঙ্গাজলে বিসর্জন করিয়া আসিতেন। এ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন প্রথা সম্বন্ধে লর্ড ওয়েলেস্‌লির মনোযোগ আকর্ষিত হওয়ায়, তিনি ১৮০২ খৃস্টাব্দের ২০এ আগস্ট, তারিখে এক ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করান। সঙ্গে সঙ্গে এই কার্যে বাধা দিবার জন্য এক দল সিপাহীও গঙ্গাসাগরে প্রেরিত হয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে হিন্দু-সমাজে সে সময়ে একটা সাময়িক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে তাহা আপনা-আপনিই থামিয়া যায়।

ধরিতে গেলে এই মার্কুইস অব ওয়েলেস্‌লির সময়েই কলিকাতায় নূতন ধরণে আয়তন বৃদ্ধি ও পথ-সংস্কার প্রভৃতি কার্য বিশদভাবে হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধীরে ধীরে ইহার ক্রমোন্নতি হইয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা দুইটি হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন এ উন্নতি কতদিনের পরিশ্রমের ফল।

কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি

ধর্মাবলম্বী	১৭১০ খ্রী. অব্দ	১৭৫২ খ্রী. অব্দ	১৮২১ খ্রী. অব্দ	১৮৯১ খ্রী. অব্দ	১৯০১ খ্রী. অব্দ
হিন্দু	৮০০০	৭৫৬৯৬	১১৮২০৩	৩৩১২৬৬	৩৮৬৫০২
মুসলমান	২১৫০	৩৭৮৭৮	৪৮১৬২	১৪০৯৭২	১৫২২০০
খ্রীষ্টান[১]	১৮৫০	৩৮০০	১৩১৩৮	২৩৭৭৩	৩০৩৪৪
বর্মিজ্	১৮৫০	৩৮০০	১৩১৩৮	৬৭৪	১৩২৬
চীনে	১৮৫০	৩৮০০	৪১৪	৭৭১	১৪৬৬
পারসী	১৮৫০	৩৮০০	৪১৪	১৪৩	২৭৪
ইহুদী	১৮৫০	৩৮০০	৪১৪	১৩৭৪	১৮০৮
অন্যধর্মাবলম্বী	১৮৫০	৩৮০০	৪১৪	১৯১৯	৩২৬৬

বাড়িসমূহের ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি

১৭৯৩ খ্রী. হইতে	পাকা বাড়ি	কাঁচা বাড়ি
১৮২১	১৪২৩০	৬৭৫১৯
১৮৫০	১৩০৭৮	৬১৩৯২
১৮৮১	১৭৯৮৪	৩৮৬৫১
১৯০১	৩৮৫৭৪	৮৭৫৮১

পাকা বাড়ির মধ্যে একতল, দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি বাড়ি ছিল। কাঁচার মধ্যে অনেকগুলির খোলার চাল, বাকি খড়ের বা গোল পাতার।

বর্তমানে আমরা প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে নানাবিষয়ক কথার আলোচনা করিব।

আইন আদালতের কথা

পাঠক পূর্বে ওল্ড কোর্ট হাউসের কথা শুনিয়াছেন। এ নামকরণ হইবার কারণই 'মেয়র্স কোর্ট' বা ওল্ড কোর্ট। ইংরাজের প্রজাকে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত বিলাতি-আইন দ্বারা বিচার বিতরণ করিবার জন্যই, এই আদালত স্থাপিত হয়। পুরাতন কোর্ট বাড়িটি ব্রোচিয়ার সাহেবের নির্মিত। এই মেয়র কোর্টে বিচার করিবার জন্য একজন মেয়র ও নয়জন অল্ডারম্যান নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের বিচারই চূড়ান্ত ছিল না। ১৭২৭ খৃস্টাব্দে এই আদালত স্থাপিত হয়। আপিলের মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন প্রেসিডেণ্ট-ইন-কাউন্সিল বা স্বয়ং কলিকাতার গবর্ণর সাহেব।

১. খ্রীষ্টানদের মধ্যে চারি শ্রেণী ছিল আমরা উপরে ১৭৯৩ খ্রী. অব্দ হইতে ১৯০১ খ্রী. পর্যন্ত কলিকাতার মোট খ্রীষ্টানের সংখ্যা দিয়াছি।

ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হইত, সেইগুলিই মেয়র সাহেব করিতেন।

মেয়রের নীচেই ছিলেন জমিদার সাহেব। তিনি একাধারে কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট। এই সাহেব-জমিদার আজকালকার বাঙ্গালী জমিদার বা ভূম্যধিকারী নহেন। এই জমিদার সাহেব, কোম্পানি-বাহাদুরের সেকালের সিবিলিয়ান। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব, বহুদিন জমিদারের কাজ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার বাঙ্গালী সহকারী ছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র। নন্দরাম সেন[১] বলিয়া আরও একজন বাঙ্গালী-ডেপুটি হইয়াছিলেন। ইহাঁদের দুইজনের নাম ছাড়া, আরও অনেক বাঙ্গালী জমিদারের নাম পাওয়া যায়। পাঠক তাহা পূর্বেই দেখিয়াছেন। জমিদার কোম্পানি-বাহাদুরের জমিদারির প্রাপ্য খাজনা, প্রজার নিকট হইতে আদায় করিতেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে সে সমস্ত ছোট খাট দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমা হইত, তাহারও বিচার করিয়া দণ্ডাজ্ঞা দিতেন। সামান্য অপরাধের দণ্ডবিধানে তাঁহার সরাসর ক্ষমতা ছিল। কিন্তু যখন কোন আসামীর চরম বা প্রাণদণ্ডের আদেশ হইত, সেই সময়ে তাঁহাকে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের মত লইতে হইত। তবে সাধারণ দণ্ড অর্থাৎ বেত্রাঘাত. চাবুক মারা, কয়েদ করা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি সর্বেব ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। একাধারে তিনি জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টরের কাজ করিতেন।

এই সাহেব-জমিদারের একজন এদেশীয় সহকারী বা ডেপুটি ছিলেন. একথা আমরা আগে বলিয়াছি। ইনিই 'ব্ল্যাক-জমিদার'। ইহাঁরও ফৌজদারি-বিভাগে শাসনকর্তৃত্ব চলিত—দস্তুরমত কোর্ট-কাছারি বসিত। ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র বড়ই দোর্দণ্ড-প্রতাপ ছিলেন। তিনি তাঁহার উপরওয়ালাদের বড় একটা ভয় করিতেন না। তাঁহার প্রচণ্ড-শাসনে চৌরঙ্গীর জঙ্গলে ও কলিকাতার নির্জনতর স্থানসমূহের ডাকাতগণ বড়ই জব্দ হইয়াছিল। তাঁহার নামে তাহারা ভয়ে জড়সড় হইত। এরূপ জনপ্রবাদ যে, একবার তাহারা লোক চিনিতে না পারিয়া খোদ মিত্রজার পাল্কি ঘেরাও করে। শেষে তাহারা যখন শুনিল যে সে পাল্কি মিত্রজার, তখন 'এ যে ডাকাতের বাবার পাল্কি, ছেড়ে দে' বলিয়া সরিয়া পড়ে। এটা গল্পই হউক, আর জনপ্রবাদই হউক, সেকালের ইংরাজি অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী যে খুব জবরদস্ত হাকিম হইতে পারিত, তাহার প্রমাণ বটে।

প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসা করিতেই আসিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন না এই বাণিজ্য ব্যাপার হইতেই তাঁহাদের রাজলক্ষ্মী লাভ হইবে। সেকালের প্রতাপশালী বাদসাহ আর প্রাদেশিক নবাব ও ফৌজদারের হাতে তাঁহারা এই বাণিজ্যের স্বত্বাদি লাভ, বাণিজ্য ছাড়, কুঠি-নির্মাণ প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। এই নিগ্রহকারীদের মধ্যে সর্ব-প্রধান হইতেছেন বাঙ্গলার মোগল-ভাইসরয় নবাব-উল-মুলুক সায়েস্ত খাঁ বাহাদুর। তারপর নবাব মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ান এবং সুবাদারের যুক্তপদ লাভ করিয়া ইংরাজ-বণিকদের বড় কম উৎ-পীড়ন করেন নাই। ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ সুপণ্ডিত উইলসন সাহেবের যত্নে ও চেষ্টায় আজ তাহা শিক্ষিত পাঠক সমাজে অপরিচিত নহে।

ভারতের নানাস্থানে কোম্পানির কুঠি ছিল। মান্দ্রাজ, বোম্বাই. সুরাট, বালেশ্বর ও বাঙ্গলার নানাস্থানে, বিশেষত পাটনা, মালদহ, কাশিমবাজার, কলিকাতা প্রভৃতি কেন্দ্রে তাঁহাদের কুঠিতে অনেক ইংরাজ কর্মচারী কাজ করিতেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে 'সিভিল ও ক্রিমিন্যাল' উভয় শ্রেণীর অপরাধ করিত। কিন্তু ইহাদের শাসনকর্তা হইতেছেন কোম্পানি বাহাদুর। তখন কোম্পানি ইংলণ্ডের সম্রাটের নিকট চার্টার বা সনন্দপ্রাপ্ত বণিকসমিতি বই আর কিছু নয়। এজন্য এদেশে ইংরাজগণের বিচারকার্যে ইংলণ্ডীয়-আইন প্রচলন করিবার জন্য কোম্পানির বিলাতের ডাইরেক্টারেরা বিলাতের পার্লামেণ্টের নিকট তিনবার সনন্দ প্রার্থনা করেন। ১৬৬১, ১৬৮৩, ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দের তিন সনন্দের বলে তাঁহারা এদেশে আদালত স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই জন্য প্রাচীন কলি-

১. প্রথম জীবনে ছিলেন কলিকাতার প্রথম জমিদার রালফ শ্লেলডন-এর সহকারী। পরে তিনি নিযুক্ত হন ডেপুটি জমিদার অথবা কালা জমিদার।

কাতায় এই মেয়র্স-কোর্ট, কোর্ট অব আয়ার অ্যান্ড টারমিনার, কোর্ট অব রিকোয়েস্টস্ প্রভৃতি নানা নামধারী আদালত স্থাপিত হয়। লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি পর্যন্ত এই ভাবেই বিচার কার্য চলিয়া আসিয়াছিল। তখনকার সরকারি আদালত নবাব নাজিমের খাসে, তবে তাহাতে ইংরাজের কতক কর্তৃত্ব চলিত। ইহাতে বিচার সম্বন্ধে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হয়। শেষ ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের চার্টারে সুপ্রীমকোর্টের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সময় হইতে কলিকাতায় শাসনকেন্দ্র যেন একটু পাকা রকমের হইল। ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙ্গলা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের এবং বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম গবর্ণর জেনারেল বা লাট-সাহেব হইলেন। তাঁহার অধীনে একটি মন্ত্রিসভাও স্থাপিত হইল। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ বা চিফ জস্টিস ও তাঁহার সহযোগিগণ বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া এদেশে বিচার বিতরণে আসিলেন।

সুপ্রীমকোর্টের উদ্দেশ্য এই—"To protect natives from oppression and to give India benefits of English Law." অর্থাৎ এদেশীয় লোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা ও তাহাদের ইংলণ্ডীয় আইনের স্বত্ব ও সুবিধা প্রদান। অবশ্য সুপ্রীমকোর্টের পরবর্তী বিচারক-গণের মধ্যে, অনেকেই এদেশবাসীদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। আজকালও অনেকে করি-তেছেন। বর্তমানের উজ্জ্বল উদাহরণ, সর্বজনপ্রিয় হাইকোর্টের চিফ জস্টিস স্যর লরেন্স জেন্‌কিন্স বস্তুত এই সুপ্রীমকোর্ট ছিল বলিয়া আর ইহার রূপান্তর হাইকোর্ট আছে বলিয়াই আজও ইংরাজ-শাসনের ন্যায়পরতা ও গৌরব সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।[১]

ইম্পি বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠে নাম রাখিয়া গিয়াছেন। নন্দকুমারের মোকদ্দমার জন্য তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। বাল্যকালে ছেলেরা ইতিহাসে পড়ে—'সুপ্রীমকোর্টের জজ স্যর ইলাইজা ইম্পির বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।' আজকালকার ঐতি-হাসিক গবেষণার দিনে নন্দকুমারের কথা সর্বজনজানিত ঘটনা। অধুনাতনকালে ভূতপূর্ব সিভি-লিয়ান বেভারিজ সাহেব, স্যর জেমস ফিটসস্টিফেন সাহেব, নন্দকুমারের নামে আনীত জাল ও চক্রান্ত মোকদ্দমা, তাঁহাদের প্রধান বিচারক ইম্পির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন।

সুপ্রীমকোর্টের প্রথম জজ স্যর ইলাইজা ইম্পির একটু পরিচয় প্রয়োজন। ১৭৩২ খৃস্টাব্দে তাঁর ইংলণ্ডে জন্ম হয়। তখন কলিকাতা জঙ্গলময়। তাঁহার পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পাঁচ বৎসর পূর্বে ইম্পি বিলাতের ট্রিনিটি-কলেজে প্রবিষ্ট হন। পলাশী যুদ্ধের বৎসরে তিনি বি, এ পাশ করিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। বিলাতে ওয়েস্ট-মিনিস্টারে থাকিবার সময় ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত ইম্পির প্রথম পরিচয় হয়। কে জানিত যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের দুইজনকেই দুইটি বিভিন্ন প্রকার কার্যের কঠোর দায়িত্বপূর্ণ ভার লইয়া কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে। ইম্পি হেস্টিংস অপেক্ষা ছয় বৎসরের বড়। বাল্যকালের এই বন্ধুত্ব বরাবরই অবিচলিত ছিল। কি ইংলণ্ডে, কি এদেশে। ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় ইম্পি যখন ভয়ানক পীড়িত হন তখন গবর্ণর হেস্টিংস ইম্পিকে তাঁহার আলিপুরের বাগানবাটিতে থাকিতে অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হইয়া-ছিল কি না, তাহা শুনি নাই। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি উইলিয়াম কাউপারও ইম্পির সহাধ্যায়ী।

ইম্পি ও তাঁহার সহযোগী জজ তিনজন ১৭৭৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলিকাতা চাঁদ-পাল ঘাটে অবতরণ করেন। ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্ট বসে নাই। পার্লামেণ্টের যে আইন অনুসারে গবর্ণর জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল এবং সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল, সে আইনের অনেক গলদ ছিল। প্রত্যক্ষ কার্যক্ষেত্রে, এই সমস্ত গলদ বাহির হইয়া পড়িল। গবর্ণরের কাউন্সিল ও সুপ্রীমকোর্ট উভয়ের মধ্যে কে বড়, এই ব্যাপার লইয়া ক্ষমতা প্রকাশ ব্যাপারে মহা-বিপত্তি উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষই স্ব স্ব প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিলেন। নন্দকুমারের ব্যাপার লইয়াই কাউন্সিল ও কোর্টের মধ্যে এই বিবাদটা যেন কিছু বেশী প্রস্ফুট

১. এ ধরণের মন্তব্য গ্রন্থরচনাকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য।

হইয়া উঠে। এই শোচনীয় মনোমালিন্যের সময়েই নন্দকুমার সুপ্রীমকোর্টের করাল চক্রনেমিপিষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও কাউন্সিল ও সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা লইয়া এই বিবাদ মেটে নাই। শেষে হেস্টিংস এই ব্যাপারটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ইম্পিকে সদর দেওয়ানি-আদালতের অতিরিক্ত চাকরি বা জজিয়তি পদ প্রদান করিলেন। ইহার বেতন মাসিক পাঁচ হাজার টাকা। এইবার ইম্পির ডবল চাকরি হইল। একদফা সুপ্রীমকোর্টের চিফ-জস্টিসগিরি, অন্য দফা সদর-দেওয়ানি-আদালতের জজিয়তি। ইম্পি হেস্টিংসের খাতিরে এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তিনি বড় একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না।১

ইম্পির প্রধান শত্রু ছিলেন কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস সাহেব। ফ্রান্সিস বিলাতে গিয়াও ইম্পির প্রতিযোগিতা করিতে ছাড়েন নাই। দুই বৎসরকাল ইম্পি সদর-দেওয়ানির জজিয়তির এই অতিরিক্ত চাকরি করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া সম্ভবত ফ্রান্সিসের প্ররোচনাতেই বিলাতের লর্ড-চ্যান্সেলার ভবিষ্যতে একটা মহা হুলস্থূল উপস্থিত করেন। ইহার ফলে ইম্পিকে চাকরি ছাড়িতে হয়, তৎপরে তিনি কর্মত্যাগ করিয়া বিলাতযাত্রা করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর পর্যন্ত তিনি কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে বসিয়াছিলেন। ইহার পর বৎসর জুন মাসে তিনি বিলাতে পেঁছান। তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থাটা তাঁহার প্রিয়বন্ধু হেস্টিংসের মত দুঃখেই কাটিয়াছিল। ইম্পির আমলে সুপ্রীমকোর্টে দুইটি বড় বড় মোকদ্দমা হইয়াছিল। একটি মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল-মোকদ্দমা ও অপরটি 'পাটনা-কজ' বলিয়া পরিচিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে স্যর গিলবার্ট ইলিয়াট (পরে লর্ড মিণ্টো) হাউস অব কমন্সের নিকট ইম্পিকে 'ইমপিচ' বা অভিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। এজন্য একটি কমিটি স্থাপিত হইয়া ইম্পির বিরুদ্ধে সাক্ষ্যাদি পর্যন্ত গৃহীত হয়। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়া গিয়াছিলেন। মিঃ টমাস ফারার যিনি নন্দকুমারের কৌসুলি ছিলেন, তিনিও ইম্পির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে ইম্পি হাউস অব কমন্সের সম্মুখে আত্ম-পক্ষ সমর্থন জন্য নিজেই বক্তৃতা আরম্ভ করেন। এরূপ তেজগর্ভ বক্তৃতা আর কেহ কখনও শোনে নাই। কি আইনের কূটতর্কে, কি ভাষার ইন্দ্রজালে ইম্পি সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দেন। ইহার ফলে হাউস অব কমন্স তাঁহাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। ইম্পিও গৌরবের সহিত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পান।২

দোষ ও গুণ লইয়া মানুষ। তা মূর্খই বা কি পণ্ডিতই বা কি। ইম্পির দোষ গুণ দুইই ছিল। নন্দকুমারের মোকদ্দমা যে Fair-trial হয় নাই—এই লইয়া সেই সময়ে ও বর্তমানকালে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। লর্ড মেকলে ইম্পিকে 'নররাক্ষস' প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। আবার অন্য পক্ষে বিলাতের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ লর্ড ম্যান্সফিল্ড, স্যর হেনরি মেইন, ব্ল্যাক-স্টোন প্রভৃতি আইনজ্ঞ মনীষিগণ নন্দকুমারের মোকদ্দমা ব্যাপারে প্রথমে ইম্পির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত-পোষণ করিলেও পরে মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র পড়িয়া ইম্পিকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। অধুনাতন কালে স্যর জেমস্ স্টিফেন তাঁহার, Story of Nundcomer and Impey' নামক পুস্তকে দক্ষ ব্যারিস্টারের ন্যায় তাঁহার -পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। অন্য পক্ষে বঙ্গের সুদক্ষ সিবিলিয়ান, ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ, মহাত্মা বেভারিজ স্যর জেমসের ভ্রমপ্রমাদসমূহ স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়া 'Trial of Maharaja NandaKumar বলিয়া এক সুবৃহৎ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক লিখিয়াছেন। এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে সুপণ্ডিত পাঠক ইম্পি-চরিত্রের

১. The Sudder Dewani Adalat is placed under my management. It will be no agreeable thing to me but as it was the Governor's act, I am contented.—*Impey's letter to Barwell*, 27-1-1781.

২. এই বক্তৃতা ও মুক্তির পর বিলাতের তদানীন্তন আইনজ্ঞ পণ্ডিত লর্ড ম্যান্সফিল্ড ইম্পির সহিত করমর্দন করিয়া বলেন, "So Sir Elizah you have passed safe over the coals."—*Impey's Memoirs*, p. 295.

গভীর রহস্য অবগত হইবেন।

যাহা হউক, ইম্পি এ দেশ হইতে যাইবার সময় আর্মেনিয়ান, হিন্দু, ইংরাজ, সকল সম্প্রদায়ের স্বাক্ষরিত এক অভিনন্দনপত্র পাইয়াছিলেন। ইংরাজ সম্প্রদায় যে অভিনন্দন দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রথম স্বাক্ষরকারী মিঃ ম্যাক্রেবী সাহেব সেকালের কলিকাতার জেলের বড় কর্তা ছিলেন। নন্দকুমার তাঁহারই হেপাজতে কলিকাতার কারাগারে থাকেন। ইনি সম্পর্কে ফ্রান্সিসের ভগ্নীপতি বা শ্যালক এইরূপ একটা কিছু হইবেন। ফ্রান্সিস সাহেব হেস্টিংস ও ইম্পির প্রধান শত্রু। এই ফ্রান্সিসের জন্যই ভবিষ্যতে ইম্পিকে খুব লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

ইম্পি ফার্সী পড়িতে ও লিখিতে জানিতেন। এটা অবশ্য এদেশে আসিয়া হইয়াছিল। তাঁহার এক মাতামহ বিলাতে বসিয়া নাদির সাহের এক জীবনবৃত্ত লিখিয়া গিয়াছেন।

ইম্পির বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার কবল হইতে তিনি অতি সহজেই উদ্ধার পান। কিন্তু হেস্টিংস তাঁহার নিজের মোকদ্দমার জন্য পথের ভিখারি হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও শেষ দশাটা ইম্পির বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। সঞ্চিত ধন সুদে বাড়াইবার জন্য. তিনি বিলাতে গিয়া অনেক টাকার 'ফ্রেঞ্চ-বণ্ড' বা নোট কেনেন। তদানীন্তন ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য সে সব নোটের দাম খুব কমিয়া যায়। ইম্পি এইরূপে বড়ই হীনাবস্থা হইয়া পড়েন ও লণ্ডনের বাটি বিক্রয় করিয়া সাসেক্সে নিউইক পার্ক নামক এক গ্রামে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ঐ গ্রামেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

হাইকোর্টে এখনও স্যর ইলাইজা ইম্পির দুইখানি সুবৃহৎ তৈলচিত্র আছে[১]। যেরূপ পরচুলা পরিয়া লাল-পোষাকে তিনি সুপ্রীমকোর্টে নন্দকুমারের ও অন্যান্য মোকদ্দমার বিচার করিতেন সেই মূর্তিই এ চিত্র দুইখানিতে চিত্রিত হইয়াছে। ইহাদের একখানি নন্দকুমারের মোকদ্দমার পর চিত্রিত হয়। কেট্‌ল্ ইহার চিত্রকর। আর একখানি ছবি যাহা সুবিখ্যাত চিত্রকর জোফানির হস্তাঙ্কিত, তাহা ইম্পির ভারত ত্যাগের পর চিত্রিত হইয়াছিল। পাঠক ! ইচ্ছা করিলে হাইকোর্টে গিয়া ছবি দুখানি দেখিয়া আসিতে পারেন।

সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ স্যর রবার্ট চেম্বার্স। ইনি নন্দকুমারের বিচারকালে ইম্পির সহযোগী ছিলেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ইনি এম, এ, পাশ করেন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মিডল-টেম্পল হইতে বি, সি, এল, উপাধি পান। চেম্বার্স একজন আইনজ্ঞ ও সুপণ্ডিত জজ ছিলেন। স্যর উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন অবসর গ্রহণ করিলে ইনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজের আইনের অধ্যাপক হন। চেম্বার্সের সহিত প্রসিদ্ধ রাসেলাস্-প্রণেতা ডাক্তার জন্‌সনের সহিত খুব বন্ধুত্ব ছিল। বসওয়েলের লিখিত জন্‌সন-জীবনীতে বহুবার এই জজ চেম্বার্সের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এদেশে আসিবার সময়, জন্‌সনই চেম্বার্সকে হেস্টিংসের নিকট একখানি সুপারিস পত্র দেন।

চেম্বার্স আইনজ্ঞ ও সুপণ্ডিত জজ ছিলেন। তাঁহার অন্য দুইজন সহযোগী, অর্থাৎ লিমেস্টার ও হাইডের অপেক্ষা তাঁহার আইন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান খুব বেশী ছিল। তিনি যদি একটু দৃঢ়চিত্তে কাজ করিতেন, সহজে তাঁহার সহযোগীদের মতে সায় না দিতেন, তাহা হইলে নন্দকুমার হয়ত প্রাণে বাঁচিয়া যাইতেন। সম্রাট দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুসারে নন্দকুমারের নামে জাল-অপরাধের 'চার্জ' হয়। চেম্বার্স প্রথমে আপত্তি তোলেন, "দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুসারে না হইয়া সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলের আইনানুসারে এই মোকদ্দমার চার্জ করা হউক।" দ্বিতীয় জর্জের আইন অনুসারে ইংলণ্ডে জাল করার দণ্ড ছিল ফাঁসি। কিন্তু এলিজাবেথের আইনে তাহা ছিল না। তাঁহার সহযোগিগণ তাঁহার এই অভিমতের বিরুদ্ধে মত প্রদান করেন—এবং চেম্বার্স তাঁহার হৃদয়ের দুর্বলতার জন্য এ বিষয়ে আর তর্কাতর্কি না করিয়া সহযোগীদের মতেই মত দেন। ইহার পর সমস্ত মোকদ্দমাটার সময়ই তিনি প্রতিদিন বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন, বাদ-প্রতিবাদ সবই শুনিয়াছিলেন, এবং প্রাণ-

১. বর্তমানে হাইকোর্ট ভবনে ইম্পির একটি তৈলচিত্র (Kettle-অঙ্কিত) আছে ; অপর চিত্রটি ভারত বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হয়।

দণ্ডাজ্ঞাও সমর্থন করিয়াছিলেন।

ইম্পির এজলাসে আর একটি মজার মোকদ্দমা হয়। ঘটনাস্থল বর্তমান আলিপুর। কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিসের আলিপুরে একটি পল্লী-নিবাস ছিল। ইহা বর্তমান বেলভেডিয়ারের নিকটস্থ কোন স্থানে হইবে এবং হেস্টিংস-হাউস হইতে কিছু দূরে। বেলভেডিয়ার সান্নিধ্যে মিঃ লি গ্রাণ্ড বলিয়া একজন ইংরাজ থাকিতেন। তাঁহার পত্নী সেকালের কলিকাতা সমাজে পরমা সুন্দরী রমণী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কেতাদুরস্ত সুন্দরী তখনকার কলিকাতায় ছিল না।

স্বনামখ্যাত ফিলিপ ফ্রান্সিস এই সুন্দরীর রূপ দেখিয়া মোহিত হন। এবং প্রবৃত্তিদমন করিতে না পারিয়া নিশাভিসারে উদ্যত হন। একটি দড়ির সিঁড়ির সহায়তায় গভীর রাত্রে তিনি লি গ্রাণ্ডের বাড়ির উপরতলে উঠেন। সাহেব সেদিন বাড়ি ছিলেন না। মেম-সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলে তিনি সহসা ফ্রান্সিসকে তাঁহার বিশ্রাম কক্ষে উপস্থিত দেখিয়া বড়ই আতঙ্কিত হন।

এই ঘটনার পনর মিনিটের পরে একটা সোরগোল হইয়া পড়ায় ফ্রান্সিস ধরা পড়িবার ভয়ে সেই দড়ির সিঁড়ি দিয়া নীচে পলায়ন করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়বন্ধু মিঃ শ্রী ছিলেন। (পরে স্যর জর্জ শ্রী)। লি গ্রাণ্ডের একজন জমাদার-সিপাহী মেম-সাহেবের চীৎকার শুনিয়া এই শ্রী সাহেবকে ধরিয়া ফেলে।

গ্রাণ্ড পরদিন এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ফ্রান্সিসকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিস কতকগুলি কারণ দেখাইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করায়, গ্রাণ্ড সাহেব সুপ্রীম-কোর্টে ফ্রান্সিসের নামে তাঁহার স্ত্রীর মানহানি, ইজ্জতনাশ ও তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিচারক ছিলেন স্যর ইলাইজা ইম্পি, চেম্বার্স ও হাইড। চেম্বার্স বলেন, 'যখন প্রকৃত অপরাধের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, তখন কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে না।' কিন্তু ইম্পি বলেন, "কোনরূপ অত্যাচারের প্রমাণ না থাকিলেও গ্রাণ্ড-পত্নীর বিশ্রামকক্ষে গভীররাত্রে প্রবেশ করিয়া ফ্রান্সিস তাঁহার সম্ভ্রমের হানি করিয়াছেন।" এরূপ স্থলে চেম্বার্স তাঁহার সহযোগীদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পারিয়া বলেন, "বিশ হাজার টাকা ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হউক।" জজ হাইড বলেন, "মান ও ইজ্জতের তুলনায় এ ক্ষতিপূরণ বড় কম, এক লাখ টাকা দেওয়া হউক।" শেষ ইম্পি মধ্যে পড়িয়া রফা করিয়া দেন, "পঞ্চাশ হাজার।" ইহাই সর্ববাদীসম্মতক্রমে গৃহীত হয়।

ইম্পি এদেশ ত্যাগ করিলে ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে চেম্বার্স সুপ্রীমকোর্টের চিফ-জস্টিস হন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি এদেশ হইতে চলিয়া যান। তিনিও এসিয়াটিক-সোসাইটির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। চেম্বার্সের কলিকাতার বাটিতে একটি সুবৃহৎ লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরির মধ্যে অনেক সংস্কৃত, উর্দু, ফার্সী—দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গ্রন্থ ছিল। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এই লাইব্রেরিতে ছিল। এগুলি তিনি বিলাতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলি বার্লিনের 'রয়্যাল-লাইব্রেরি' উচ্চমূল্যে কিনিয়া লয়েন।

ইহার পর সুপ্রীমকোর্টের রত্ন, ইংলণ্ডের ও সর্বজগতের গৌরবস্থল বাঙ্গালীর ও সর্বভারতের অতিপ্রিয় স্যর উইলিয়াম জোন্সের সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা উচিত। যিনি আমাদের দেশের সংস্কৃত-সাহিত্য লইয়া অতটা নাড়াচাড়া করিয়া গেলেন, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য সংক্ষেপেই বলিতেছি।

১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে স্যর উইলিয়ামের জন্ম হয়। তিনি ইংরাজ নহেন, ওয়েলস্ দেশ তাঁহার জন্মস্থান। কিন্তু তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় আচার-ব্যবহারে জগতের গর্বস্বরূপ। তাঁহার পিতা একজন সুদক্ষ গণিতবিৎ এবং স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের ছাত্র ও বন্ধু। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া জোন্স সাহেব ভ্রমণে বাহির হন। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে কয়েক মাস তিনি প্যারিসে বাস করেন। ঘটনাক্রমে ফ্রান্সের অধিপতির দরবারে তিনি সম্রাটের সহিত পরিচিত হন। জোন্সের সহিত ফরাসী-সম্রাটের নানাবিষয়ক কথোপকথন হয়। জোন্স রাজসভা হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইলে,

সম্রাট তাঁহার একজন প্রিয় সদস্যকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "এ যুবকের পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। আমার অপেক্ষাও দেখিতেছি ইনি আমার মাতৃভাষায় দক্ষ।" সভাসদ বিনয়ের সহিত উত্তর করিলেন, "সম্রাট! আপনার অনুমানই ঠিক। লোকটা অতি অদ্ভুত শক্তিশালী। তবে জগতের সকল ভাষাই উনি জানেন বটে, কিন্তু নিজের দেশের ভাষা অর্থাৎ 'ওয়েলস' ভাষা জানেন না।"

১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে স্যর উইলিয়াম জোন্স বাঙ্গলার সুপ্রীমকোর্টের একজন পিউনী-জজরূপে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ইহার পূর্বে বিলাতে তিনি 'Law of Bailments' বলিয়া একখানি গবেষণাময় আইনগ্রন্থ প্রচার করেন। ইহাতে তাঁহার নাম ও যশ বাড়িয়া যায়। এদেশে আসিবার পর জোন্স এসিয়াটিক-সোসাইটির মধ্যে সঞ্জীবনী শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও ইহার সভাপতি পদে বরিত হন। এই সময় হইতে ইনি সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী পড়িতে আরম্ভ করেন ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'Digest of Hindu and Mohamedan Law' নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি এ পুস্তক শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।[১] ইহার পরই তিনি 'মনুসংহিতা'র ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করেন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইহা প্রকাশিত হয়। উক্ত বৎসরের ২৭এ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সুপ্রীমকোর্টের সমস্ত জজগণের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। সুপ্রীমকোর্টের পর হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হয়।[২] হাইকোর্টের বিবরণ যথাস্থানে দেওয়া যাইবে। ১৭৭৪ হইতে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত চিফ-জস্টিস ও পিউনী-জজ সুপ্রীমকোর্টে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।—

চিফ-জস্টিস	খ্রীস্টাব্দ	পিউনী-জজ	খ্রীস্টাব্দ
স্যর ইলাইজা ইম্পি *	১৭৭৪	স্যর রবার্ট চেম্বার্স	১৭৭৪
স্যর রবার্ট চেম্বার্স *	১৭৯১	স্টিফেন সিজার লিমেস্টার *	১৭৭৪
স্যর জন এন্সট্রুথার	১৭৯৮	জন হাইড *	১৭৭৪
স্যর হেনরি রসেল	১৮০৬	স্যর উইলিয়াম জোন্স	১৭৮৩
স্যর এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট	১৮১৩	স্যর উইলিয়াম ডন্‌কিন	১৭৯১
স্যর রবার্ট বন্নসেট	১৮২৩	স্যর জেমস্ ওয়াট্‌সন	১৭৯৬
স্যর ক্রিস্টোফার বুলার	১৮২৪	স্যর জন রয়েড্‌স্	১৭৯৭
স্যর চার্লস গ্রে	১৮২৫	স্যর হেনরি রসেল	১৭৯৮
স্যর উইলিয়াম রসেল	১৮৩২	স্যর উইলিয়াম বরোজ	১৮০৬
স্যর এডওয়ার্ড রায়ান	১৮৩৩	স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকনাটন	১৮১৫
স্যর লরেন্স পিল	১৮৪২	স্যর এন্থনি বুলার	১৮১৬
স্যর জেমস্ কলভিলি	১৮৫৬	স্যর জন ফ্রাঙ্কস	১৮২৫
স্যর বার্ণিস পীকক	১৮৫৯	স্যর এডওয়ার্ড রায়ন	১৮২৭
		স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট	১৮৩৩
		স্যর বি, কে, ম্যালকিন্	১৮৩৫
		স্যর এইচ, ডব্লু, সিটন	১৮৩৮
		স্যর আর্থার বাটলার	১৮৪৮
		স্যর উইলিয়াম কলভিলি	১৮৫৫
		স্যর চার্লস জ্যাকসন	১৮৫৫
		স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্	১৮৫৯

* চিহ্নিত জজগণ মহারাজ নন্দকুমারের মোকদ্দমার বিচারকরূপে উপবিষ্ট হন। স্যর রবার্ট চেম্বার্স ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে চিফ-জস্টিস পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

সেকালের সুপ্রীমকোর্টে, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা-মোকদ্দমা আজকালকার মত এত বেশী না থাকিলেও ব্যারিস্টারের অভাব ছিল না। যে সকল ইংরাজ তখন এদেশে ব্যারিস্টারি করিতে আসিতেন, তাঁহারা অতুল ধনেশ্বর হইয়া গিয়াছেন। 'হার্টলি হাউস' নামক একখানি গ্রন্থে

১. সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কোলব্রুক পরিশেষে ইহা সম্পূর্ণ করিয়া ১৮০০ খ্রী. অব্দে *Digest of Hindu Law* বলিয়া বাহির করেন। আইন ব্যবসায়ীদের পক্ষে ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ।

২. কলিকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৬২ খ্রী.।

এই সময়ের ব্যারিস্টারদের সম্বন্ধে লিখিত আছে, 'ব্যারিস্টারদের মুখে কেবল টাকা, টাকা রব।' উক্ত গ্রন্থের একাংশে লিখিত আছে, "এদেশ হইতে যাহারা ব্যারিস্টারি করিয়া বিলাতে ফিরিয়া যায়, তাহারা যে অতুল ধনেশ্বর হইবে, তাহা বেশী কিছু আশ্চর্যের কথা নহে। ব্যারিস্টারদের ফি (fee) বড়ই বেশী। যদি তুমি তাঁহাদের একটি প্রশ্ন করিতে চাও, তখনই একটি সোনার মোহর দিতে হইবে। যদি তিনি তোমার জন্য তিন লাইন একখানি চিঠি লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তখনই আটাশ টাকা গুণিয়া দিতে হইবে। যদি কখনও কোন ব্যারিস্টারের পাল্লায় আমায় পড়িতে হয়, এই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইয়া উঠি। একখানি উইল করিতে হইলে তাহার দীর্ঘতা অনুসারে ব্যারিস্টারের ফি পাঁচ সোনার মোহর হইতে আরও বেশী। বিবাহ-সম্বন্ধে চুক্তিনামার দরও এইরূপ। আর যাহারা মোকদ্দমার জন্য তাহাদের হাতে গিয়া পড়ে, তাহাদের হৃতসর্বস্ব হওয়া অনিবার্য। যদি কোন ব্যারিস্টার সাতটি বৎসর ধরিয়া একমনে রোজগার করেন, আর জুয়া খেলায় মত্ত না হন, তাহা হইলে তিনি লক্ষপতি হইয়া বিলাতে ফিরিতে পারেন।"

এই ত গেল সেকালের ব্যারিস্টারের কথা। এখন অপরাধীদের দণ্ডের কথা কিছু বলিব। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই আগস্টের গেজেট হইতে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি জানিতে পারা যায়। উক্ত গেজেটের এক জায়গায় আছে, "অনেকগুলি অপরাধী বিচারার্থে সুপ্রীমকোর্টে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকের হাত পোড়াইয়া দিবার আদেশ হইয়াছে।" বোধ হয়, সেই সময়ে গরম লোহা বা আর কিছু দিয়া অপরাধীকে ছাঁকা দেওয়া হইত। আর কতকগুলিকে 'তুড়ুম' ঠুকিবার ব্যবস্থা হয়।[১] "টুলক্ কোম্পানির দোকান হইতে যে ফিরিঙ্গিটা ঘড়ি চুরি করিয়াছিল, তাহার হাত পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের এক আদেশ হইতে দেখা যায়, ডাকাতির জন্য কতকগুলি বদমায়েসের ফাঁসি হইবার আদেশ হইয়াছে। সেকালের সুপ্রীমকোর্টের নিম্নলিখিত দণ্ডগুলি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। টমাস ফরেস্ট, একজন গোরা। অপরাধ—দুর্ব্যবহার ও গুণ্ডামি। দণ্ডাজ্ঞা—জেলের মধ্যে গোপনে বেত্রাঘাত ও একমাস ফাটক।

২। ল, করুন, ইউরোপীয়। অপরাধ—হাফ-মোহর ও রূপার গহনা চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—বড়বাজারে সাধারণের সমক্ষে বেত্রাঘাত এবং তিন মাস জেল।

৩। কানাই দে। অপরাধ—হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক হইতে মোহর চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—১০ই তারিখ পর্যন্ত জেলে থাকিবে। ইহার পর বড়বাজারের দক্ষিণদিকে লইয়া গিয়া, চাবুক মারিতে মারিতে উত্তরদিক পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে তার পর ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত সশ্রম কারাবাস।

৪। কৃষ্ণমণি বেওয়া। অপরাধ—চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—তাহার হাত পোড়াইয়া দিবার আদেশ হইল। তৎপরে কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিনমাস জেল। (১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ)

৫। সেখ মহম্মদ। অপরাধ—মানুষকে ছুরি মারা। দণ্ডাজ্ঞা—হাত পোড়াইয়া দিবার পর এক বৎসর জেল। (১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ)

৬। ফ্রান্সিস রোজা ও অন্যান্য অপরাধিগণ। অপরাধ—ডাকাতি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু ব্যবস্থা।

৭। রঘুনাথ কুমার। অপরাধ—বড় গোছের চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—হাত পোড়াইয়া দিবার পর দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস। (১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ)

৮। গঙ্গারাম মিত্র ও কাঙ্গালী। অপরাধ—হত্যা করিবার জন্য নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ। দণ্ডাজ্ঞা—এক বৎসর কারাগারে থাকিবে। তৎপরে পাঁচশো সিক্কা-টাকার মুচলেকা লইয়া তিন বৎসর সদ্ব্যবহারের কড়ারে মুক্তি দান। মুচলেকা না দিতে পারিলে আবার কারাবাস। (১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ)

---

১. এই দণ্ড-কাষ্ঠ বা pillory-র মধ্যে অপরাধীর মাথা গলাইয়া ও তাহার হাত দুখানিকে আবদ্ধ করিয়া সাধারণের সম্মুখে অপমানিত করা হইত।

৯। স্বরূপ পোদ্দার, মোহন সিং, গঙ্গারাম ও রামজয়। অপরাধ—জাল-টাকা চালান। দণ্ডাজ্ঞা—৪ঠা জানুয়ারি পর্যন্ত অপরাধিগণ জেলে থাকিবে। তৎপরে লালবাজারে লইয়া গিয়া দুই ঘণ্টাকাল দণ্ডকাষ্ঠেতে (Pillory) আবদ্ধ রাখা হইবে। তার পর ১৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত তাহাদিগকে পুনরায় জেলে আটক রাখিয়া বড়বাজারের দক্ষিণদিকে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করা হইবে। এইভাবে বাজারের উত্তরদিক পর্যন্ত চাবুক লাগাইতে লাগাইতে আনা হইলে ও দুইদিন এইভাবে চাবুক খাইলে, তাহাদের পুনরায় জেলে আটক করা হইবে। ইহাদের মধ্যে যাহাদের দীর্ঘকাল মেয়াদের হুকুম হয় নাই—তাহাদের এক সিক্কা টাকা জরিমানা ও পাঁচ হাজার টাকার মুচলেকো লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। (১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ)

১০। পার্বতী বেশ্যা। অপরাধ—চোরাই মাল রাখা। দণ্ডাজ্ঞা—৮ই আগস্ট অবধি জেলে আবদ্ধ থাকিবে। তার পর বড়বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করত এক টাকা জরিমানা আদায় করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। (১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ)

১১। হিঙ্গন ওরফে শিবু। অপরাধ—সামান্য চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—বড়বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত ও এক টাকা জরিমানা। (১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ)

১২। প্রহলাদ রক্ষিত ওরফে আত্মারাম রক্ষিত। অপরাধ—মিথ্যাসাক্ষ্য। দণ্ডাজ্ঞা—ছয়মাস কারাবাস ও এক টাকা জরিমানা। (১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দ)

১৩। মীর গোলাম আলি। অপরাধ—চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু।

১৪। ব্রজমোহন দত্ত। অপরাধ—এক গৃহস্থের বাড়ি ২৫ টাকা মূল্যের জিনিসপত্র চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (১৮০০ খ্রীস্টাব্দ)

১৫। হরি পাল, প্রসাদ পাল, রামজয় ও চৈতন। অপরাধ—রাজপথে রাহাজানি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (১৮০০ খ্রীস্টাব্দ)

১৬। বিষ্ণুপ্রসাদ শ্রীমানী। অপরাধ—জাল। দণ্ডাজ্ঞা—লালবাজারে লইয়া গিয়া তুড়ুম-প্রয়োগ। তৎপরে দুই বৎসর সশ্রম কারাবাস। (১৮০০ খ্রীস্টাব্দ)

১৭। জোসেফ লেপারুজ। অপরাধ—হত্যা ও নৌকা লুঠ। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। ফাঁসির পর দেহ লোহার শিকলে বাঁধিয়া, সাধারণ রাজপথে গাছের ডালে ঝোলাইয়া দেওয়া হইবে। (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ)

১৮। বৈজু মশালচি। অপরাধ—চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ)

১৯। পলি স্ট্রাটি, আনন্দীরাম ইত্যাদি। অপরাধ—চক্রান্ত। দণ্ডাজ্ঞা—দুই বৎসরের মেয়াদ ও তুড়ুম। (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ)

২০। রামসুন্দর সরকার। অপরাধ—মিথ্যা সাক্ষ্য। দণ্ডাজ্ঞা—সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর। (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ)

২১। টার জ্যাকব, টার পিট্রস। অপরাধ—মিথ্যা সাক্ষ্য। অপরাধী একজন আর্মেনিয়ান পাদরী। দণ্ডাজ্ঞা—দুই বৎসর জেল ও জরিমানা এক টাকা। (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ)

২২। ইমামবক্স গলিয়া। অপরাধ—চুরি। দণ্ডাজ্ঞা—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

২৩। টমাস নর্মান মর্গান। অপরাধ—জাল। দণ্ডাজ্ঞা—দুই বৎসর মেয়াদ, তুড়ুম ও জরিমানা এক টাকা। (১৮০২ খ্রীস্টাব্দ)

২৪। জন ম্যাকলচিন। অপরাধ—নরহত্যা। দণ্ডাজ্ঞা—একমাস জেল ও এক টাকা জরিমানা। (১৮০৪ খ্রীস্টাব্দ)

২৫। মহম্মদ টিণ্ডাল। অপরাধ—নরহত্যা। দণ্ডাজ্ঞা—এক মাস জেল ও এক টাকা জরিমানা। (১৮০৪ খ্রীস্টাব্দ)[১]

---

১. ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে সেকালের আইনের চক্ষে চুরি, জাল প্রভৃতি অপরাধ নরহত্যা অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইত। হাত পোড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সকল অপরাধেই ছিল।

২৬। কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রামকানাই ঘোষ। অপরাধ—জাল। ইহারা তামার প্লেট প্রস্তুত করিয়া ২৫০০ টাকার 'ট্রেজারি-বিল' জাল করে। প্লেট করিয়া নোট জাল বা বিল জাল কলিকাতায় এই প্রথম হয়। দণ্ডাজ্ঞা—অপরাধিগণের দুই বৎসরের মেয়াদ ও একদিন তুড়ুমের ব্যবস্থা হয়।

২৭। এন্‌সাইন সোডে। অপরাধ—নরহত্যা। দণ্ডাজ্ঞা—২০০ টাকা জরিমানা, এক বৎসরের মেয়াদ।

২৮। উইলিয়াম সোবিজ। অপরাধ—বাঙ্গলো ঘরে আগুন লাগান। দণ্ডাজ্ঞা—দুই বৎসরের মেয়াদ।

২৯। বৃন্দাবন দোবে। অপরাধ—নরহত্যা। দণ্ডাজ্ঞা—হাত পোড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার উপর এক বৎসরের মেয়াদ। (১৮১২ খ্রীস্টাব্দ)

৩০। ব্যারী ও বয়েল নামক দুইজন গোরা। অপরাধ—রাহাজানি। দণ্ডাজ্ঞা—মৃত্যু। (১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ)

৩১। রডরিক। অপরাধ—পে-এ্যাবস্ট্রাক্ট অর্থাৎ তলবানাপত্র জাল। দণ্ডাজ্ঞা—তুড়ুম ব্যবস্থা,[১] দুই বৎসর মেয়াদ ও ৩০০ প্যাগোডা জরিমানা।

৩২। ফরখউন্নিসা বেগম। জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিয়া এক ক্রীতদাসীর প্রাণনাশ। অপরাধের সহকারী তাঁহার তিনজন চাকর। অপরাধ প্রমাণ হওয়ায় দণ্ডাজ্ঞা হয়—"পরদিন বেলা বারটা পর্যন্ত বেগমকে কয়েদ থাকিতে হইবে। তৎপরে তিনি খালাস পাইবেন।" এই বেগম যে কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ মোকদ্দমার বিবরণে তাঁহার কোন পরিচয় ছিল না। তবে তিনি যে সম্ভ্রান্ত-কুলোদ্ভূতা তাহার প্রমাণ, এই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবামাত্রই বেগম সাহেবা জজদের নিকট দরখাস্ত করেন, "এতদপেক্ষা আমার অন্য দণ্ড হওয়া ভাল ছিল। ইহাতে আমার ইজ্জৎ ও সম্ভ্রম নষ্ট হইবে। আমি বিলাতে আপিল করিলে ইংলণ্ডের রাজা আমায় মার্জনা করিতে পারেন।" জজেরা অভিমত দেন, "প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। কিন্তু বেগম ইতিমধ্যে একখানি মুচলেকা ও জামিন-নামা দিবেন, যেন ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বিলাত হইতে রাজার হুকুম আসিলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিবার জন্য পুনরায় আদালতে হাজির হইবেন।" মোকদ্দমার তারিখ—১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ ২১এ এপ্রিল।

তখনকার কালে ফাঁসি দেওয়া ব্যাপারটা চুপে চুপে হইত না। প্রকাশ্য স্থলে অসংখ্য জনতার মধ্যে ফাঁসি হইলে লোকের মনে ভয় সঞ্চার হইবে ও এরূপ দুষ্কর্ম লোকে আর করিবে না, এই ভাবিয়া প্রায়ই 'চৌমাথার উপর' (where four roads meet) অস্থায়ী ফাঁসি-কাষ্ঠ রচিত হইত। বেত্রাঘাত ব্যবস্থা তুড়ুমের ব্যবস্থা—তাও প্রকাশ্য রাজপথে জনসঙ্ঘের দৃষ্টির সম্মুখে। লালবাজারে ও বড়বাজারের জনপূর্ণ স্থানে বাজারের একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধীকে চাবুকের দ্বারা আঘাত করা হইত। তুড়ুম দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রকাশ্য স্থানে। তা—অপরাধী এদেশীয় লোকই হউক বা সাহেবই হউক। এইরূপ দুই একটি ফাঁসির উদাহরণ দিয়া আমরা আদালতের কথা শেষ করিব। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি কুলিবাজারের নিকটস্থ মাঠে হয়। ইহার পরে প্রাণদণ্ডের আসামীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রায় চোর বদমায়েস ও ডাকাত। কাজেই তাহাদের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বা ধারাবাহিক বিবরণ কিছুই নাই। আমরা ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে তাহার পরবর্তী দুই শতাধিক বৎসর পূর্বের দুই চারিটি ঘটনা হইতে সেকালে কি ভাবে লোকের ফাঁসি হইত তাহা দেখাইব।

১৮০৭ সালের জুন মাসে, একজন ম্যানিলা-দেশীয় লোক এক বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে ছুরি মারিয়া হত্যা করে। সুপ্রীমকোর্টের বিচারে তাহার ফাঁসি হয়। ফাঁসির আদেশের শেষ অংশ

১. তুড়ুম বা Pilloryর ব্যবস্থা ১৮১৬ খ্রী. অব্দের এক আইন দ্বারা উঠাইয়া দেওয়া হয়।

এই—"To be executed on Saturday the 13th. at the four roads, which meet at the head of Lallbazar." অর্থাৎ লালবাজারের চৌমাথায় ঐ ব্যক্তির ফাঁসি হইবে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনা বড়ই অদ্ভুত। ঘটনাটি শুনুন। কাপ্তেন স্টুয়ার্ট নামক একজন ইংরাজ 'এসিয়া' নামক জাহাজের কর্তা ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ পাঁচজন নাবিক কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই শ্রেণীর গুণ্ডা নাবিকদের মনে ভয়োৎপাদন করিবার জন্য কর্তারা গঙ্গাগর্ভের উপরই পাঁচজন দণ্ডিত আসামীর ফাঁসির ব্যবস্থা করেন। দুই খানা ভড় পাশাপাশি রাখিয়া তাহার উপর ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মিত হয়। এরূপ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় যে, হুগলী নদীতে যত জাহাজ আছে, সকল জাহাজ হইতেই একখানি বোট আসিবে ও সেই বোটে সেই জাহাজের লোকজন থাকিবে। নাবিকদের মনে ভয়োৎপাদন করাই এই ব্যবস্থার মূল কারণ। প্রভাতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হইতে একটি কামানধ্বনি হইল। যেখানে ফাঁসি হইবে সেইস্থানে বধমঞ্চের উপর একটি হলদে রঙের পতাকা উড়িল। দেখিতে দেখিতে জাহ্নবী বক্ষে নৌকার গাদি লাগিয়া গেল। নদীর উভয় কূলবর্তী জাহাজের ডেকও লোক-পরিপূর্ণ। বেলা নয়টার সময় একদল সিপাহী বেষ্টিত হইয়া অপরাধিগণকে ওল্ডফোর্ট ঘাটে আনা হয়। তার পর তাহাদের সমভাবে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া সেই ফাঁসিমঞ্চের উপর লইয়া যাওয়া হয়। যাহা কিছু সে ক্ষেত্রে করণীয় কাজ তাহা শেষ করিয়া ঠিক ৯টা ২০ মিনিটে আবার এক তোপ পড়িল এবং সেই সঙ্গে পাঁচজন অপরাধীর ফাঁসি হইয়া গেল। অপরাধটা সেলার বা নাবিক দলেরই কৃত, সুতরাং তাহাদের সমবৃত্তিসম্পন্ন অন্যান্য লোকদের মনে ভয় জন্মাইবার জন্য গঙ্গাবক্ষে ফাঁসি দিবার এই অদ্ভুত ব্যবস্থা হয়।

আর একটি ঘটনা, ইহা ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারির কথা। ঘটনাটি এক ফকিরের ফাঁসি। বলা যায় না, কি কারণে এই ফকির উইলিয়াম বোচ্যাম্প বলিয়া এক সাহেব-শিশুকে হাবড়াঘাটে হত্যা করে। তখন হাবড়ার যে স্থান 'স্কুলগ্রাউণ্ড' বলিয়া পরিচিত ছিল, সেইখানে ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মিত হয়। এ ফাঁসি দেখিবার জন্য অনেক মুসলমান জড় হইয়াছিল, কেন না মুসলমান ফকিরের ফাঁসি। কিন্তু সমবেত জনতা অপরাধীকে প্রহরীদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইবার কোন চেষ্টাই করে নাই, বরঞ্চ স্থিরভাবে ব্যাপারটা দেখিয়াছিল।

তার পর আর এক পেটুকের ফাঁসির কথা বলিতেছি। কথায় বলে, 'ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নেওয়া।' লোকটার ঠিক তাই হইয়াছিল। একজন সমসাময়িক ভ্রমণকারী তাঁহার পুস্তকে লিখি-তেছেন, "আমরা ফাঁসির স্থলে উপস্থিত হইলাম। কলিকাতার জেল হইতে কিছুদূরে এক মাঠে ফাঁসির স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, ফাঁসি দেখিবার জন্য একটিও লোক সেখানে উপস্থিত নাই। লোকের মধ্যে কেবল আমরা কয়েকজন। অপরাধী একটি পাত্রে করিয়া ভাত খাইতেছে, আর সিপাহীরা তরোয়াল খুলিয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। একজন বাঙ্গালী কেরাণী কাগজ-কলম লইয়া সে স্থানে উপস্থিত। ফাঁসির সময়ে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট পাঠাইবার জন্যই কেরাণীবাবুকে উপস্থিত রাখা হইয়াছে।

জেলার বা কারাধ্যক্ষ একজন মুসলমান। তিনিও কেরাণীর কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক-জন সাহেব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-ম্যাজিস্ট্রেটও সেখানে উপস্থিত। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট জেলারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সব প্রস্তুত ত?" জেলার বলিল, "হ্যাঁ জনাব। তবে লোকটার এখনও খাওয়া শেষ হয় নাই।" সেই অপরাধী একথা শুনিতে পাইয়া বলিল, "আর এক মিনিট অপেক্ষা করুন সাহেব। এই কটা ভাত আমি এখনই খাইয়া লইতেছি।" এই বলিয়া সে ভাতক'টা খাইয়া লইল। একটা টিনের পাত্রে দুধ ছিল তাহাও চুমুক দিয়া খাইল। ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে বলিলেন, "অপরাধী! তোমার কিছু বলিবার আছে?" এই কথা শুনিয়া লোকটা সত্য মিথ্যা, অনেক-

গুলো কথা একবারে বলিয়া ফেলিল। কেরাণী তাহা টুকিয়া লইলেন। তার পর উপযুক্ত সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হস্তেঙ্গিতে বলিলেন, "এইবার লটকাইয়া দাও।" এই আদেশ পাইবামাত্রই, লোকটাকে বধমঞ্চে উঠান হইল ও তাহার গলায় ফাঁস পড়িল।[১]

সেকালের সংবাদপত্রাদি

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ হইতে অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী কালের ইংরাজী সংবাদপত্রগুলির কথা আমরা প্রথমে বলিব। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়া-গেজেট' নাম দিয়া এক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির হয়। এই সংবাদপত্রের প্রচার মহারাজ নন্দকুমারের সমসময়ের। কিন্তু ইহা সরকারি সংবাদপত্র বই আর কিছুই ছিল না —তবে অনেক এদেশীয় সংবাদ ও বিলাতী খবর, সরকারি আদেশ ও ইস্তাহারসমূহ পাশাপাশি হইয়া ইহাতে ছাপা হইত।

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ নন্দকুমারের ফাঁসির পাঁচ বৎসর পরে 'হিকিস-গেজেট' বা "বেঙ্গল-গেজেট' বলিয়া এক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির হয়। হিকি সাহেব এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যর ইলাইজা ইম্পি, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রভৃতি অনেক পদস্থ কর্মচারীদের গালাগালি দিয়া গিয়াছেন। এখনও এই জীর্ণ গেজেটের কপি বিলাতের ব্রিটিশ-মিউজিয়মে বর্তমান। পঁচিশ বৎসর পূর্বে লেখক তাহার একখণ্ড বাঁধান কপি সাবেক মেটকাফ-হল বা বর্তমান ইম্পিরিয়্যাল-লাইব্রেরিতে[২] দেখিয়াছিলেন।

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে গর্ডন ও হে কোম্পানির ছাপাখানা হইতে 'ওরিয়েণ্টাল ম্যাগাজিন' নামক এক মাসিকপত্র বাহির হয়। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে 'কলিকাতা ম্যাগাজিন' ও 'ওরিয়েণ্টাল মিউজিয়াম' এই যুগ্ম-নামে আরও একখানি মাসিক সংবাদপত্রের জন্ম হয়। মেসার্স হোয়াইট অ্যাণ্ড কোং ৫১ নং কসাইটোলা স্ট্রীট হইতে ইহা বাহির করেন।

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে ইণ্ডিয়া গেজেটের নব পরিবর্তিত সংস্করণ বাহির হয়। এই সময়ে বিলাতের ও ইউরোপের নানা স্থানের সংবাদ এই কাগজে প্রকাশ হয়। তবে সে সময়ের কাগজে আজকাল-কার মত টাটকা বিলাতি সংবাদ দেখিতে পাওয়া যাইত না, কারণ তখন টেলিগ্রাফও ছিল না এবং বিলাত হইতে কলিকাতায় জাহাজ আসিতে ছয় মাসের উপর সময় লাগিত। ফরাসীবিপ্লব, লুই ও বোঁর্বো পরিবারগণের ফাঁসির ঘটনা, বারমিংহামের মহাদাঙ্গা, লর্ড কর্ণওয়ালিসের শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ অবরোধ সম্বন্ধে নানাবিধ সংবাদ, এই সব কাগজে থাকিত। তখনকার সংবাদপত্রের কর্তারা এই সব অতি বিলম্বিত বিলাতি সংবাদ পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকিতেন। কোন জাহাজ ভাগীরথী-মুখে ঢুকিয়াছে সংবাদ পাইবামাত্র কাগজে-কর্তারা দ্রুতগামী বোট ভাউলে পাঠাইয়া ভাগীরথীর মোহানা পর্যন্ত লোক পাঠাইতেন। শোনা গিয়াছে, অনেক সময়ে ইহাঁরা কেজিরি পর্যন্ত গিয়া বিলাতি সংবাদ এই সব নবাগত জাহাজ হইতে সংগ্রহ করিতেন।

১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর 'কলিকাতা মন্থলি জার্নাল' বলিয়া আর একখানি নূতন মাসিকপত্র বাহির হয়। ওয়েস্টন লেন হইতে এ কাগজখানি বাহির হইয়াছিল। ইহার প্রিণ্টার ছিলেন জে, হোয়াইট বলিয়া একজন সাহেব।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি 'বেঙ্গল হরকরার' প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। এখানি কলি-কাতার দ্বিতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। ওরিয়েণ্ট্যাল স্টার অফিসে ইহা মুদ্রিত হয়।

উক্ত বৎসরের ৪ঠা অক্টোবর 'ইণ্ডিয়ান এপলো' বলিয়া আর একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কলিকাতা হইতে বাহির হয়। এ পত্রখানি প্রতি রবিবারে ১৫৮ নং চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশ হইত।

১. Lang's Wanderings—*Good Old days of Hon'ble John Company* by W.H. Carey.
২. ইহা বর্তমানে National Library নামে পরিচিত।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল 'রিলেটার' বলিয়া আর একখানি সংবাদপত্র বাহির হয়। ইহা সপ্তাহে দুইবার বাহির হইত ও ইহাতে বিলাতি সংবাদই কিছু বেশী থাকিত। জন্ হাউএল ইহার সম্পাদক।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে 'কলিকাতা জার্ণাল' ও 'কলিকাতা এক্সচেঞ্জ প্রাইস-কারেণ্ট' নামে দুখানি সংবাদপত্র বাহির হয়। শেষোক্ত কাগজখানি এখন সর্বজন বিদিত 'এক্সচেঞ্জ-গেজেট' নামে পরিচিত। উক্ত বৎসরের জুলাই মাসে 'এসিয়াটিক ম্যাগাজিন' ও 'মেডিকেল-মিসলেনি' বলিয়া আর একখানি ইংরাজি মাসিকপত্র বাহির হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারি-গণ কর্তৃক 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' নামক ইংরাজি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন এই ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া স্টেটস্‌ম্যানের সহিত মিলিত।

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জুন 'এসিয়াটিক ম্যাগাজিন' বলিয়া আর একখানি মাসিক ৭নং পোস্ট অফিস স্ট্রীট হইতে বাহির হয়। এই মাসিকের প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য নির্দিষ্ট গ্রাহকের জন্য চারি টাকা। যাঁহারা নিয়মিত গ্রাহক নহেন তাঁহাদের জন্য প্রত্যেক সংখ্যা ছয় সিক্কা টাকা।

প্রত্যেক সংবাদপত্রের ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। এজন্য আমরা নীচে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলাম। এই সংবাদপত্রগুলির প্রচার হইতে প্রমাণ হইতেছে তখন কলিকাতা সহরে একাধিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর এই সব ইংরাজি কাগজের পাঠক ইংরাজ-সম্প্রদায়।

ইহার পরবর্তী যুগে ইণ্ডিয়ান মিরার, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দু পেট্রিয়ট প্রভৃতি স্বনামখ্যাত সংবাদপত্রসমূহের আবির্ভাব হয়। ইণ্ডিয়ান মিরার প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন

ইংরাজি সংবাদপত্রের নাম	আবির্ভাব সময় খ্রীস্টাব্দ	মন্তব্য
উইকলি গ্লিনার	৩১।১০।১৮২৪	* * *
জন বুল ইন দি ইস্ট	২।৭।১৮২১	জেমস মেকেঞ্জি (সম্পাদক)
কলিকাতা কুরিয়ার	৬।৫।১৮২৭	এইচ, নেলন কোং
ওরিএণ্ট্যাল ম্যাগাজিন	১৮২৭	* * *
কলিকাতা ক্রিস্টিয়ান	১৮২৯	মিশনারি সম্প্রদায়ের প্রথম মুখপত্র।
ইনটেলিজেন্সার	১৮২৯	মিশনারি সম্প্রদায়ের প্রথম মুখপত্র।
কলিকাতা ক্রিশ্চিয়ান অবজারভার	১৮২৯	মিশনারি সম্প্রদায়ের প্রথম মুখপত্র।
বোম্বে গেজেট	১৭৯০	বোম্বাই হইতে প্রকাশিত।
কলিকাতা লিটারারি গেজেট	১৮২৫	সম্পাদক, সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন।
ইস্ট ইণ্ডিয়ান	১৮৩১	স্বনামখ্যাত ইউরেসিয়ান অধ্যাপক এইচ, ভি, এল, ডিরোজিও। ইনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও একজন বিখ্যাত কবি।
জন বুল	১৮২১	* * *
রিফরমার	—	ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা।
জ্ঞানান্বেষণ	—	ইহার অর্ধেক ইংরাজি ও অর্ধেক বাঙ্গলায় ছাপা হইত।
ইংলিশম্যান	১৮৩৩	জে. এইচ. স্টকেলার (সম্পাদক)।
ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া (পরে স্টেটসম্যান)	১৮১৮	ডাক্তার মার্শম্যান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
বেঙ্গল হরকরা ও পরে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ	১৭৯৫	বেঙ্গল-হরকরা নামে প্রথম বাহির হয়।

ও রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেনের আমলে খ্যাতিলাভ করে। বেঙ্গলীর সম্পাদক বর্তমান যুগে স্বনামখ্যাত বাগ্মী ও দেশহিতৈষী অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[১] নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী অমৃতবাজার প্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ইহা ইংরাজি সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিকে পরিণত হইয়াছে। স্বনামখ্যাত বৈষ্ণবচূড়ামণি এবং মহাপণ্ডিত স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ, ও পরে সুপণ্ডিত বাবু মতিলাল ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন। বেঙ্গলী পত্রিকা আগে সাপ্তাহিকরূপে বাহির হইত, পরে দৈনিক হইয়াছিল। হিন্দু পেট্রিয়টের প্রবর্তক, স্বনামধন্য স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তৎপরে অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের আমলে ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে। পরিশেষে ইহা দৈনিকে পরিবর্তিত হয়। পরে ইহা সচিত্র সাপ্তাহিকে পরিচয় লাভ করিয়াছিল।

আমরা নিম্নে একটি তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে পাঠক সেকালের বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও সাময়িক ও মাসিকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইবেন।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রের নাম	আবির্ভাব সময় খৃীস্টাব্দ	সম্পাদকের নাম
বেঙ্গল গেজেট	১৮১৬	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জে, মার্শম্যান—শ্রীরামপুর
সংবাদ কৌমুদী	১৮১৯	তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সংবাদ তিমির-নাশক	—	কৃষ্ণমোহন দাস
বঙ্গদূত	—	নীলরতন হালদার
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩০	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ সুধাকর	—	প্রেমচাঁদ রায়
অনুবাদিকা	—	—
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক
সুখকর	—	পি. রায়
সংবাদ রত্নাকর	—	ব্রজমোহন সিংহ
সমাচার শুভরাজেন্দ্র	—	দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শাস্ত্র প্রকাশ	—	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার
বিজ্ঞানসেবাধীশ	—	গঙ্গাচরণ সেন
জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ	—	রসিককৃষ্ণ মল্লিক
জ্ঞানোদয়	—	রামচন্দ্র মিত্র
পশ্বাবলী	—	রামচন্দ্র মিত্র
সংবাদ রত্নাবলী	১৮৩২	মহেশচন্দ্র পাল
সংবাদ সারসংগ্রহ	—	বেণীমাধব দে
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়	১৮৩৫	হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সংবাদ সুধাসিন্ধু	১৮৩৭	কালীশঙ্কর দত্ত
সংবাদ দিবাকর	১৮৩৭	গঙ্গানারায়ণ বসু
সংবাদ গুণাকর	—	গিরিশচন্দ্র বসু
সংবাদ সৌদামিনী	—	কালাচাঁদ দত্ত
সংবাদ ভাস্কর	—	শ্রীনাথ রায়
রসরাজ	১৮৩৮	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (গুড়গুড়ে ভট্চাজ)
সংবাদ অরুণোদয়	১৮৩৮	জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
সজ্জন রঞ্জিকা	—	হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট	১৮৩৯	জে. মার্শম্যান

১. গ্রন্থরচনাকালে অর্থাৎ ১৯১৫-র কাছাকাছি সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে (১৯০৫-১৯১২) তাঁর বাগ্মিতার জন্য প্রখ্যাতি অর্জন করেন।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রের নাম	আবির্ভাব সময় খ্রীস্টাব্দ	সম্পাদকের নাম
মুরশিদাবাদ পত্রিকা	১৮৪০	গুরুদয়াল চৌধুরী
জ্ঞানদীপক	—	ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়
জগৎবন্ধু	—	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গদূত	—	নীলকমল দাস
বদন-দর্শন	—	অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রমথচন্দ্র ঘোষ
বেঙ্গল-স্পেক্টেটার	—	শ্রীনারায়ণ রায় (বারাকপুর)
আইনবাদ দর্শন	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	গঙ্গানারায়ণ বসু
সংবাদ রাজরাণী	১৮৪৪	—
সর্বরসরঞ্জিনী	—	শ্রীনাথ ঘোষ ইত্যাদি
জগৎবন্ধু পত্রিকা	১৮৪৬	রেভারেণ্ড ডবল্যু. স্মিথ
সত্যার্ণব[১]	১৮৫০	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
পাষণ্ড পীড়ন	—	উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
সমাচার জ্ঞানদর্পণ	—	মৌলভী বাবুরালি
জগৎ-দীপক ভাস্কর	—	নন্দকুমার কবিরত্ন
নিত্যধর্ম রঞ্জিকা	—	—
ভৈরব দণ্ড	—	মথুরানাথ গুহ
	—	উমাকান্ত ভট্টাচার্য
কাব্য-রত্নাকর	১৮৪৭	চৈতন্যচরণ অধিকারী
জ্ঞানাঞ্জন	—	হরিনারায়ণ গোস্বামী
হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়	—	গুরুচরণ রায়
রঙ্গপুর বার্তাবহ	—	গঙ্গানারায়ণ বসু
জ্ঞান সঞ্চারিণী	—	ঈশ্বরচন্দ্র কুণ্ডু
সাধুরঞ্জন	—	দ্বারকনাথ মুখোপাধ্যায়
দিগ্বিজয়	—	নবীনচন্দ্র দে
সুজনবন্ধু	—	উমাচরণ ভদ্র
হিন্দুবন্ধু	—	—
আক্কেল-গুড়ুম	১৮৪৭	ব্রজনাথ বসু
মনোরঞ্জন	১৮৪৭	ব্রজনাথ বসু
জ্ঞানচন্দ্রোদয়	—	রাধানাথ বসু
জ্ঞানরত্নাকর	১৮৪৮	তারিণীচরণ রায়
ভৃঙ্গদূত	—	আনন্দচন্দ্র বর্ম্মা
সংবাদ অরুণোদয়	—	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
সংবাদ দিনমণি	—	গোপালচন্দ্র দে
সংবাদ রত্নবর্ষণ	—	মাধবচন্দ্র ঘোষ
বারাণসী চন্দ্রোদয়	—	উমাকান্ত ভট্টাচার্য
মুক্তাবলী	—	কালীকান্ত ভট্টাচার্য
রসমুদ্গর	১৮৪৯	গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রসসাগর	—	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রসরত্নাকর	—	যদুনাথ পাল
সুজনরঞ্জন	—	গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত
মহাজন দর্পণ	—	জয়কালী বসু
কৌস্তুভ কিরণ	—	রাজনারায়ণ মিত্র
জ্ঞানপ্রদায়িনী	—	বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১. সত্যার্ণবের সম্পাদক পাদরী জেমস লঙ।

বাঙ্গলা সংবাদপত্রের নাম	আবির্ভাব সময় খৃষ্টাব্দ	সম্পাদকের নাম
সত্যধর্ম প্রকাশিকা	—	গোবিন্দচন্দ্র দে
সর্বশুভকরী	—	মতিলাল চট্টোপাধ্যায়
সত্য-প্রদীপ	—	এম. টাউনসেণ্ড
বর্ধমান চন্দ্রোদয়	—	রামচরণ ভট্টাচার্য
সংবাদ-সুধাংশু	১৮৫২	রেভারেণ্ড. কে. এম. ব্যানার্জি
উপদেশক	—	রেভারেণ্ড, জে, ওয়েনজার
সত্যসঞ্চারিণী	—	শ্যামাচরণ বসু
সংবাদ-নিশাকর	—	নীলকমল দাস
ধর্ম-অর্থ-প্রকাশিকা	—	
ভক্তিসূচক	—	রামনিধি দাস
দূরবীক্ষণিকা	—	
জ্ঞানোদয়	—	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
জ্ঞানদর্শন	—	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়
কাশীবার্তা প্রকাশিকা	—	কাশীদাস মিত্র
মেদিনীপুর ও হিজলী গার্জিয়েন	১৮৫২	এইচ. ভি. বেলী, সি. এস
বিবিধার্থ সংগ্রহ	—	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
জ্ঞানারুণোদয়	—	কেশবচন্দ্র কর্মকার
সুলভ পত্রিকা	—	তারানাথ দত্ত

উল্লিখিত তালিকা হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন, ১৮১৬ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৭ বৎসরের মধ্যে কতগুলি সংবাদপত্র, এই কলিকাতা সহরে ও উপকণ্ঠের নানাস্থানে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চৌদ্দ আনা পরিমাণ সংবাদপত্র অতি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। উক্ত তালিকা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কেবল বাঙ্গালী সম্পাদক নহে, জনকয়েক পাদরী সাহেবও কয়েকখানি বাঙ্গলা কাগজ বাহির করিয়াছিলেন। এই দলের মধ্যে একজন সিভিলিয়ানও আছেন। সেকালের কাগজগুলির কিরূপ ভাবে নামকরণ হইত, তাহাও পাঠক উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখিতে পাইবেন।[১]

এক্ষণে সেই পুরাকালে ইংরাজি ভাষায় কি কি আবশ্যকীয় পুস্তকাবলী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। সকলগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব বিবেচনায় আমরা কেবল সেই সমস্ত পুস্তকের নাম, গ্রন্থকর্তার পরিচয় ও মুদ্রণের বা প্রকাশের বৎসর দিয়া একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।

পুস্তকের নাম	মুদ্রণের বা প্রকাশের তারিখ খৃষ্টাব্দ	গ্রন্থকর্তার নাম	মূল্যাদি মন্তব্য
ইণ্ডিয়ান গাইড (সচিত্র ভ্রমণ পুস্তক)	১৭৮৫	নাম নাই	—
দি মিরর (পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ কমেডি)	১৭৯৫	মিঃ সনাব্যাট	২ সোনার মোহর
ইণ্ডিয়ান ট্রাভেলার (৩ ভল্যুম)	—	—	

১. সংবাদপত্র সমূহের এই বিস্তীর্ণ তালিকা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রেভারেণ্ড জেমস্ লং কর্তৃক গবর্ণমেণ্টে পেশ হয়।—Vide *Selections from Records of the Bengal Government No XXII* p. 145 quoted by Raja B. K. Dev.

পুস্তকের নাম	মুদ্রণের তারিখ খ্রীস্টাব্দ	গ্রন্থকর্তার নাম	মূল্যাদি ও মন্তব্য
বেভি অব ক্যালক্যাটা বো	—	—	১ মোহর
উর্দু ডিক্সনারি	১৭৮৭	প্রোফেসর গিল-ক্রাইস্ট	—
বাঙ্গলা ও ফার্সী মিশ্রিত ইংরাজি ব্যাকরণ	১৭৯০	ডাক্তার মেকিনন	কোম্পানি বাহাদুরের ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়।
উল্‌কাদ্‌ উদ্‌উইয়ে (Materia Medica) (মহম্মদ আবদুল সিরাজী, সাহজাহান বাদসাহের গৃহ চিকিৎসক প্রণীত।)	১৭৯৩	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	২ মোহর
পার্সিয়ান মুন্‌সী	১৭৯৩	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	৬০ সিক্কা টাকা
ডিক্সনারি অব মেহমেডান ল	—	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	৩০ টাকা
সিস্টেম অব রেভেনিউ অ্যাকাউণ্টস্‌	—	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	৩০ টাকা
পারস্য ভাষার ছন্দ ও কবিতার বিচার	—	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	৩০ টাকা
ইংলিশ ও ফার্সী ভোকাবুলারি	—	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	১৬ টাকা
তুতি নামা	—	ফ্রান্সিস গ্লাডউইন	১৬ টাকা
বাঙ্গলা ভাষার অভিধান	১৮১৫	—	—
কলিকাতা সহরের নক্সা	১৭৯২	মিঃ বেলি	বাঁধান ম্যাপ—২৫ সিক্কা টাকা।
জেনারেল মিলিটারি রেজিস্টার	১৭৯৫	—	১ মোহর প্রতি কপি—(ইহাই প্রথম আর্মি লিস্ট)
ইণ্ডিয়ান সার্পেণ্টস (সচিত্র)		ডাঃ প্যাট্রিক রাসেল	৩৫ সিক্কা টাকা।
ভারতের উদ্ভিদ বিজ্ঞান	—	ডাঃ রক্সবরা	১২ সিক্কা টাকা।
মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাস	—	—	৫০ টাকা।
মুসলমানি দায়ভাগ	১৭৯২	স্যর উইলিয়ম জোন্স	১৬ টাকা কপি। এই পুস্তকের লব্ধ অর্থ, যোগ্রহীন ঋণীদিগের কারামুক্তির জন্য গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়।
সাহ আলমের রাজত্বের ইতিহাস	১৭৯৮	লেফটেনাণ্ট কোলব্রুক	১২০ আর্কট টাকা প্রতি কপি।
মহীসুর দৃশ্যাবলী (সচিত্র)	—		
বাঙ্গলা হইতে উত্তর ভারতের মধ্য দিয়া স্থলপথে ইংলণ্ড-যাত্রা	—	জর্জ ফরস্‌টার	২৫ সিক্কা টাকা।
বাঙ্গলা ব্যাকরণ	১৭৭৮	মিঃ হ্যাল্‌হেড[১]	

এই সময়ে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের চেষ্টায় 'সমাচার-দর্পণ' নামক এক বাঙ্গলা খবরের কাগজ

১. 'হ্যালহেড সাহেব চলিত বাঙ্গলা খুব ভাল জানিতেন। তিনি স্বচ্ছলভাবে বাঙ্গালী সমাজে মিশিতেন। বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়া তিনি যখন কথাবার্তা কহিতেন তখন কাহারও সাধ্য ছিল না যে তাঁহাকে ইংরাজ বলিয়া চিনিতে পারে। বাঙ্গালা গ্রামারের অক্ষর খোদাই স্যর চার্লস উইলকিন্সের যত্নেই হইয়াছিল। এই উইলকিন্সই গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। উইলকিন্স সাহেবের উপদেশানুসারে পঞ্চানন কর্মকার প্রথম বাঙ্গালা টাইপ তৈয়ারি করেন। পঞ্চানন একজন সুদক্ষ হরফ-মেকার ছিল। এই টাইপে প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রথম মুদ্রিত হয়। (১৮০১)'। বাঙ্গালী পোষাক পরিয়া যিনি স্বচ্ছন্দে বাঙ্গালী সমাজে মিশিতেন, তিনি বাঙ্গালা গ্রামারের রচয়িতা N. B. Halhed নন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

বাহির হয়। ২৩শে মে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল মার্কুইস অব হেস্টিংস এদেশীয় সংবাদপত্র প্রচারের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। এদেশীয়দের মধ্যে সংবাদপত্র সাহায্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সমাচার-দর্পণ বাহির হইলে তিনি ইহার সম্পাদককে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া উৎসাহ প্রদান করেন। মার্কুইস অব হেস্টিংসের মনে এদেশীয়দিগকে উচ্চশিক্ষা দানের কিরূপ ইচ্ছা ছিল তাহা পাদটীকায়[১] উদ্ধৃত ইংরাজি অংশটুকু হইতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে। এই সমাচার-দর্পণ প্রায় ত্রিশবৎসর জীবিত ছিল।

১৮২১ খ্রীস্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়—'ব্রাহ্মণপত্রিকা' বলিয়া এক মাসিক প্রকাশ করেন। কিন্তু এই পত্রিকা বহুদিন স্থায়ী হয় নাই।

১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গলা ভাষায় প্রথম পঞ্জিকা প্রচারিত হয়। প্রচার স্থান অগ্রদ্বীপ। এই স্থানে বাঙ্গালীদিগের পরিচালিত একটি ছাপাখানা প্রথম স্থাপিত হওয়ায় পঞ্জিকা এই ছাপাখানা হইতেই বাহির হইয়াছিল।

এই সময়ে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রিকা ও কৌমুদী নামে দুইখানি প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র বাহির হয়। চন্দ্রিকা হিন্দুধর্মের মুখপত্র ছিল। ইহার ক্রিয়াশক্তি লোপ করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে কৌমুদী বাহির করেন।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গদূতের' জন্ম হয়। মিঃ আর মার্টিন, প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতির সমবেত চেষ্টায় এই কাগজখানির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে মহাকবি কালিদাসের 'ঋতুসংহারের' ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মূল্য—প্রতি খণ্ড দশ টাকা।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে 'সামসুল অকবার' নামে একখানি ফার্সী পত্রিকার প্রচার হয়। বলা বাহুল্য এ কাগজখানি তৎকালীন মুসলমান সমাজের নিকট কোনরূপ উৎসাহ না পাওয়ায় ইহার অকালমৃত্যু হইয়াছিল।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে পণ্ডিতপ্রবর এইচ, এইচ, উইলসন সাহেব কালিদাসের 'মেঘদূতের' ইংরাজি অনুবাদ Cloud Messenger প্রকাশ করেন। সমগ্র পুস্তকের মূল্য ১৬ সিক্কা টাকা।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে মে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন হইতে 'মধুসূদন মুখার্জির ওরিএণ্টাল লাইব্রেরী' বলিয়া একটি পুস্তকালয়ের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত সেকালের কলিকাতায় উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রথম ইংরাজি পুস্তক-বিক্রেতা। তাঁহার দোকান বর্তমান লালদীঘির নিকট সেণ্ট এনড্রু গির্জার কাছে ছিল।

লটারি কমিটি

সেকালের কলিকাতার উন্নতির জন্য, যে সমস্ত বড় বড় ঘর বাড়ি তৈয়ারি হইয়াছিল সবই লটারি কমিটির সহায়তায় নির্মিত। এই লটারি কমিটির সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রথম প্রথম যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। প্রাচীন-কলিকাতার উন্নতির ইতিহাসের সহিত এই লটারি কমিটির নাম ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত।[২] আমরা বর্তমানে এই লটারি কমিটির সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। বিলাতেও এই

১. ১৮১৬ খ্রী. অব্দে তদানীন্তন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, "It is human—it is generous to protect the feeble it is meritorious to redress the injured but it is godlike bounty to bestow expansion of intellect to infuse the Promethean spark into the statue and waken it into a man." ইহার সারমর্ম এই—যাহারা দুর্বল তাহাদের রক্ষা করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত তাহাদের ক্ষতিপূরণ করা প্রশংসার্হ কিন্তু জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধির চেষ্টা ঐশ্বরিক দানের মত গৌরবজনক।—*Good Old days of Hon'ble John Company,* Vol I.

২. Strange that for almost every laudable Charitable scientific or educational project lotteries were considered the sine qua non in those days.—*The Good Old days of Hon'ble John Company,* Vol II.

সময়ে একটা লটারির বাতিক জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই ব্যাধি ক্রমশ এদেশে সংক্রামিত হইয়া পড়ে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের শেষভাগে এই লটারি কমিটির ক্রিয়াশক্তি অতি প্রবল হইয়া উঠে। ধরিতে গেলে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ হইতেই কলিকাতায় ইহার কার্য আরম্ভ হয়।

১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার 'এক্সচেঞ্জ' গৃহ প্রথম স্থাপিত হয়। এই গৃহ-নির্মাণ সম্বন্ধে সমস্ত খরচা লটারি দ্বারা উঠিয়াছিল। এই লটারির টিকিট ছোট বড় সকলেই কিনিতেন। এমন কি পাদরী সাহেবরা পর্যন্ত বাদ যাইতেন না।

১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার একটি সাধারণ সমিতিগৃহ নির্মাণের জন্য লটারি করা হয়। ইহাই ভবিষ্যৎ টাউন-হলের পূর্ব সূচনা। এই লটারিতে পাঁচ হাজার টিকিট বিক্রয় হয়। টিকিটের মূল্য ৬০ সিক্কা টাকা। ইহার মধ্যে ১৩৩১টি প্রাইজ ছিল, বাকি সব ব্ল্যাঙ্ক।

নামজাদা চিত্রকরগণের নানাবিধ বহুমূল্য অয়েল-পেয়িণ্টিং, কাচের জিনিস, উৎকৃষ্ট মদিরা, সৌখীন দ্রব্য ও পুস্তকাদি এই সময়ে বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া এদেশে আসিত। লটারিতে এই সমস্ত জিনিস টিকিট করিয়া বিক্রয় হইত। এক একজন লোভের বশে একাধিক টিকিট ক্রয় করিতেন। যাঁহাদের ভাগ্যে কোন জিনিস উঠিত, তাঁহারা টিকিটের দামের অপেক্ষা মূল্যবান জিনিস পাইতেন। এইজন্য এই সমস্ত লটারির গ্রাহক সংখ্যা খুব বেশী ছিল। সময়ে সময়ে লাখটাকারও টিকিট বিক্রয় হইয়া যাইত।

বর্তমান টাউনহল নির্মাণের জন্য ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে এক লটারি হয়। এই লটারির বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, Under the sanction and patronage of His Excellency the Most Hon'ble the Governor General in Council". অর্থাৎ, সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে এই লটারি খোলা হইতেছে। এই লটারির টিকিটের মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা। ইহাতে এক হাজার প্রাইজ ও চারি হাজার Blank বা শূন্য ছিল। কিন্তু টাউনহল নির্মাণের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রথমবারে সংগৃহীত না হওয়ার জন্য তাঁরা যতদিন পর্যন্ত না পুরাদস্তুর টাকা জোগাড় হয়, তজ্জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া উপরিউপরি কয়েকটি লটারি করিয়াছিলেন। চতুর্থ বারের 'টাউনহল' লটারিতে, ছয়লক্ষ যাট হাজার টাকার প্রাইজ বিতরিত হয়। ইহার মধ্যে পনর হাজার টাকা লটারির খরচ বাবদ বাদ যায়। উদ্বৃত্ত পঁচাত্তর হাজার টাকা টাউনহল নির্মাণের জন্য প্রদত্ত হয়। পাঠক মনে রাখিবেন, তখন পাব্‌লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট বলিয়া কোন কিছু ছিল না।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা সহরের উন্নতির জন্য আর একটি লটারি হয়। ইহাতেও লাট সাহেবের সহানুভূতি ও সম্মতি ছিল। এই লটারির সর্বাপেক্ষা দামী প্রাইজ বা পুরস্কার একলক্ষ টাকা। সর্বসমেত তিন লক্ষ টাকা প্রাইজ দেওয়া হয়। লটারির খরচ-খরচা বাদে যে টাকা উদ্বৃত্ত হয় তাহার দ্বারা কলিকাতার রাস্তাঘাট সংস্কার, ড্রেনের উন্নতি, সাধারণ ভ্রমণ-স্থান বা স্কোয়ার প্রভৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও কয়েকখানি বড় বড় বাড়ি নির্মিত হয়।

অনেক ইংরাজ-ব্যবসায়ী এবং কলিকাতার ও উপনগরের অধিবাসিগণ তাহাদের দ্রব্যজাত এবং বাড়ি ও বাঙ্গলো এই লটারির সহায়তায় নিলাম করিতেন। টেরিটিবাজারের প্রতিষ্ঠাও এই-রূপে লটারির দ্বারা হইয়াছিল। অনেক বহুমূল্য পুস্তকাদিও লটারি দ্বারা বিক্রয় হইত। তখন এক মোহরের কম কোন পুস্তকেরই মূল্য ছিল না। পাঠক ইতিপূর্বে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

এই সময়ে প্রসিদ্ধ গাড়িওয়ালা স্টুয়ার্ট কোম্পানিরও একটি লটারির বিজ্ঞাপন দেখা যায়। উক্ত কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিতেছেন, "বিলাত হইতে আমরা একখানি অতিসুন্দর কারুকার্য খোদিত বহুমূল্য কোচগাড়ি আমদানি করিয়াছি। ইহা চারি ঘোড়ায় টানিবার উপযুক্ত। গাড়ি ও ঘোড়ার সাজের দাম ছয় হাজার টাকা। প্রত্যেক টিকিটের মূল্য দুইশত টাকা। যাঁহারা টিকিট লইতে

ইচ্ছুক, তাঁহারা অনতিবিলম্বে উক্ত স্টুয়ার্ট কোম্পানিকে জানাইবেন।"

কিন্তু পরিশেষে গবর্ণমেণ্টের আদেশে[১] এই প্রকার লটারিপ্রথা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ২০শে মে লটারি প্রথার রদ সম্বন্ধে এক হুকুমনামা বাহির হয়।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'বেঙ্গল লটারি' বলিয়া আর একটি প্রথার অনুষ্ঠান হয়। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল—এদেশীয়দের জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপন। কিন্তু টাকা অতি কম উঠায়, হাসপাতাল কমিটি তাহা লইতে অস্বীকার করেন। এই টাকা পরিশেষে যোগ্রহীন অক্ষম ঋণী—যাহারা দেনার দায়ে কারাগারে আবদ্ধ আছে, তাহাদের সাহায্যে ব্যয়িত হয়। একটি সভায় স্থির হয়, প্রত্যেক ইংরাজ দেনদার দশ টাকা, পর্টুগীজ সাত টাকা ও এদেশীয় দেনদারগণ দুই টাকা হিসাবে এই ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইবে।

১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে এইরূপ লটারির দ্বারা একটি 'চ্যারিটেবল ফণ্ড' বা দাতব্য-ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। গবর্ণর-জেনারেল এই ভাণ্ডারের পেট্রন বা মুরুব্বি ছিলেন। বড়দিন ও গুড্ ফ্রাইডে প্রভৃতি খ্রীস্টান উৎসব দিনে খ্রীস্টানদিগকে অর্থ বিতরণ করা এ ফণ্ডের উদ্দেশ্য। পরবর্তী কালে ইহা 'ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে' পরিবর্তিত হয়। এ সোসাইটি এখনও বর্তমান।

নদীপথে গমনাগমন

তখন রেল ছিল না, এজন্য কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিমে কোন স্থানে যাইতে হইলে হয় পালকি ডাক, না হয় বোট-বজরার সহায়তা লইতে হইত। বোট বজরার ভাড়ার তালিকা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাষ্পীয়-তরণীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেই সময়ে বিলাতে আর্ল স্ট্যানহোপ এ সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর বারাকপুরে এক মন্ত্রণা-সভা আহ্বান করেন। এই সভায় স্থির হয়, "পিটার স্পিক সাহেব ফোর্ট উইলিয়ামের ডেপুটি গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন।" এই সময়ে খোদ লাট-বাহাদুর একবার জলপথে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই যাত্রার বিবরণী হইতে জলপথে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ভ্রমণের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বারাকপুর হইতে যাত্রা করিয়া তিনি প্রথমে চুঁচুড়ায় পোঁছান। ২৬শে তারিখে দায়ুদপুরে পোঁছিলে মুরশিদাবাদের নবাব তাঁহাকে সেইস্থানে প্রত্যুদ্গমন করিতে আসেন। ৩১শে তারিখে লাট-বাহাদুর বরহমপুরে পোঁছান। ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি মুরশিদাবাদ নবাব প্রাসাদের ঘাটে অবতরণ করেন। মুরশিদাবাদে নামিয়া নবাবের আতিথ্য স্বীকার করিয়া ও বেগমদের সঙ্গে সাক্ষাতে লাট-বাহাদুর রাজমহল যাত্রা করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজমহল ছাড়াইয়া যান। ১৬ই তারিখে ভাগলপুর ও ২১শে তারিখে মুঙ্গের অতিক্রম করেন ২৬শে তারিখে দানাপুরে পোঁছেন। ১০ই নভেম্বরে গাজিপুর অতিক্রম করিয়া ১৫ই নভেম্বরে বেনারসে পোঁছেন। ৩রা ডিসেম্বরে মির্জাপুর অতিক্রম করিয়া ১১ই তারিখে এলাহাবাদে উপস্থিত হন। তারিখগুলি দিবার কারণ এই, লাট-বাহাদুর কয়দিনে এক একটি নগর অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে লাট-বাহাদুর অনেকস্থানে পদস্থ রাজা, মহারাজা বা সিবিল ও মিলিটারি কর্মচারীদের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, আগস্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কমবেশী পাঁচমাসকাল লাট-সাহেবকে জলপথে যাত্রা করিয়া এলাহাবাদ পোঁছিতে হইয়াছিল।

১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে খিদিরপুরের ডকের মধ্যে 'জন শোর' বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র স্টীমার

১. "Notice is hereby given that the Right Honourable the Governor General in Council has been pleased to prohibit the establishment of any lotteries, the prizes in which are to be payable in money without the express permission of His Lordship in Council."—*Good Old days of Hon'ble John Company,* Vol II.

ভাগীরথীতে ভাসান হয়। নদীপথে গমনাগমনই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এর নবাবের ব্যবহারের জন্য ট্রিকেট বলিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ার একখানি ক্ষুদ্র 'স্টীম-বজরা' নির্মাণ করেন। এখানি ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দেও বর্তমান ছিল। উক্ত বৎসর লাট-সাহেব লর্ড অকল্যান্ড লক্ষ্ণৌ ভ্রমণে যান। নবাব তাঁহার ব্যবহারের জন্য এই স্টীম-বজরাখানি দিয়াছিলেন।

হুগলী নদীতে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কলের স্টীমার চলাচল আরম্ভ হয়। সমসাময়িক কলিকাতা গেজেটে (১৪-৮-১৮২৩) এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশ হইয়াছিল। 'বর্তমানে এই স্টীমারখানি হুগলী নদীতেই ফেরির কাজ করিতেছে। এদেশীয় লোকেরা কলের সহায়তায় জলের উপর জাহাজ চলিতেছে, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে নদীর উভয় উপকূলে সমবেত হইয়া নিত্যই মহাজনতা উপস্থিত করে। আমরা শুনিয়াছি, গত কল্য রবিবার এই স্টীমারখানি কতকগুলি যাত্রী লইয়া চুঁচুড়া পর্যন্ত গিয়াছিল।'' এই স্টীমারের নাম 'ডায়েনা'।

১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে নদীর মধ্যে বড় জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য 'পাইলট-ভেসেল' সম্বন্ধে এক রিপোর্ট সরকারে দাখিল হয়। এই সময়ে দুই একখানি জাহাজটানা-স্টীমারও তৈয়ারি হইয়াছিল। 'গ্যাঞ্জেস' নামক একখানি স্টীমার সমুদ্রপথে বোম্বাই পর্যন্ত যাত্রা করিয়াছিল। প্রথম বর্মাযুদ্ধ সময়ে এই স্টীমারখানি যুদ্ধের সরঞ্জাম বহিবার কার্যে নিয়োজিত হয়।

'টেনিকা' বলিয়া আর একখানি জাহাজ, কোন উদ্যমশীল ইংরাজ ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় আনেন। এই স্টীমারখানি জাহাজ টানিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ৬১ হাজার টাকায় ইহা কিনিয়া লয়েন।

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে পূর্বোক্ত 'ডায়েনা' জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এণ্ডারসন 'কমেট ও ফায়ার-ফ্লাই' বলিয়া দুইখানি ফেরি স্টীমার, কলিকাতায় নির্মাণ করেন। এই স্টীমার চুঁচুড়া অবধি যাতায়াত করিত। প্রত্যেক লোকের যাতায়াতের ভাড়া ছিল আট টাকা।

হাবড়ার ডকে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে আর একখানি 'টগ' বা জাহাজটানা স্টীমার তৈয়ারি হয়। এই স্টীমারের নাম 'ফরবস্'। ইহার অধিকারী ছিলেন ম্যাকিণ্টস অ্যাণ্ড কোং। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ফরবস্ স্টীমার জামিসানা নামক একখানি আফিম বোঝাই পাইলের জাহাজকে চীন পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়।

বর্মাযুদ্ধে ডায়েনা স্টীমারের দ্বারা উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর বিলাতের কর্তাদের লিখিয়া পাঠান, 'দুইখানি স্টীমার, কামান দ্বারা সজ্জিত করিয়া যুদ্ধের জন্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যথেষ্ট ফললাভ সম্ভাবনা।'' বিলাতের কর্তারা ইহাতে সম্মতি দান করিয়া ডেল্টফোর্ড হইতে বড় স্টীমারের উপযোগী দুইখানি এঞ্জিন কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ কিড্ কোম্পানি এই দুইখানি এঞ্জিন সহায়তায়, বিলাতি প্ল্যানে দুইখানি ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজ তৈয়ারি করেন। ইহাদের প্রত্যেক খানিতেই দশটি করিয়া কামান রাখিবার স্থান ছিল। স্টীমার দুইখানির নাম হইয়াছিল 'গাঞ্জেস্' ও 'ইরাবতী'। কিড্ কোম্পানি এই দুইখানি জাহাজ নির্মাণের জন্য জাহাজপ্রতি একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট লইয়াছিলেন।

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে আর একখানি স্টীমার গঙ্গাবক্ষে ভাসান হয়। এই স্টীমার মালদহ পর্যন্ত গিয়াছিল। গঙ্গার স্রোত অতি প্রবল হওয়ায়, ইহা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'হুগলী' বলিয়া একখানি স্টীমার কাশী পর্যন্ত যায়। কাশী যাইতে ২৪ দিন সময় লাগে। কিন্তু ফিরিতে ২৪ দিনের বেশী সময় লাগে নাই। জাহাজখানি মোটে দুইদিন মাত্র বেনারসে অপেক্ষা করিয়াছিল। বেনারস হইতে কলিকাতা জলপথে ১৬১৩ মাইল। এই পথ অতিক্রম করিতে স্টীমারখানির তিনশত ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ধরিতে গেলে গড়-

পড়ুতায় স্টীমারখানি প্রতি ঘণ্টায় সারে চারি মাইল গিয়াছিল। তাহার পর আর একবার এই স্টীমারখানি এলাহাবাদ অবধি অগ্রসর হয়। কিন্তু বালির চড়ায় বসিয়া যাওয়ায় বড়ই বিপত্তি ঘটে।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল কিম্বা মে মাসে, দ্বিতীয়বার এই স্টীমার পুনরায় কাশী যাত্রা করে। এবারে ২১ দিনে কাশী পেঁাছাইয়াছিল। ইহা মির্জাপুর পেঁাছিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু নদীর জল কম হওয়ায় পারে নাই।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সাহেব, এই সময়ে ভারতের গবর্ণর-জেনারেল। যাহাতে স্টীমার সহায়তায় জলপথে যাত্রার পথ সুগম হয়, তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম লোহ নির্মিত নির্মিত হয়। এই জাহাজের নাম 'লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক।'

খিদিরপুর গবর্ণমেণ্ট ডকইয়ার্ড হইতে নিম্নলিখিত জাহাজগুলি প্রস্তুত হয়। (১) হরিণঘাটা (১৮৪১), (২) ব্রহ্মপুত্র (১৮৪১), (৩) ইণ্ডস্ (১৮৪২), (৪) দামোদর (১৮৪৩), (৫) মহানদী (১৮৪৬), (৬) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮৪৫), (৭) নর্মদা (১৮৪৫)।

উল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, এই মহানগরী কলিকাতা এক সময়ে সমগ্র ভারতের রাজধানী কলিকাতা, বর্তমানে বঙ্গদেশের অন্যতম রাজধানী কলিকাতা, জোব চার্নকের আমল হইতে (১৬৯৮) আর এই ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ২২৬ বৎসরের ঘটনা স্রোতের মধ্য দিয়া অতি ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে। সমুদ্রমেখলা বোম্বাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়িয়া দিলে কলিকাতার মত সুবৃহৎ নগরী ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। দুইশত বৎসর পূর্বের বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ, বাদাভূমি-সমাকীর্ণ, ব্যাঘ্রাদি-শ্বাপদগণের নিবাসভূমি, সুতালুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের পরিবর্তে, আজ আমরা এক প্রাসাদসৌধময়ী, 'স্বপ্ন-সৌন্দর্যপূর্ণ' সুবৃহৎ নগরী দেখিতে পাইতেছি। কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের পক্ষে, সমাধিগর্ভ হইতে উঠিয়া আসা যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে তিনিও ঠিক বুঝিতে পারিতেন না—মাত্র একখানি পাকা বাড়ি অর্থাৎ সাবর্ণ-মজুমদারদের কাছারি বাড়ি লইয়া তিনি যে কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা যুগ যুগান্তরের ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া বর্তমান ঐশ্বর্যময় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে।
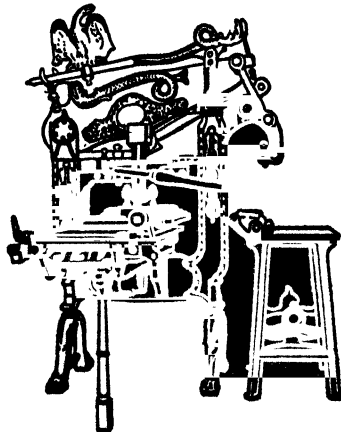
চতুর্বিংশ অধ্যায়

পথের কথা[1]

চৌরঙ্গী রোড—থিয়েটার রোড—হ্যারিংটন স্ট্রীট—মিডলটন স্ট্রীট—রাসেল স্ট্রীট—পার্ক স্ট্রীট—ক্যামাক স্ট্রীট—উড্ স্ট্রীট—ফ্রিস্কুল স্ট্রীট—মটস্ লেন—রয়েড্ স্ট্রীট—ইলিয়ট রোড—রিপন স্ট্রীট—কিড্ স্ট্রীট—সদর স্ট্রীট—লিণ্ডসে স্ট্রীট—ধর্মতলা স্ট্রীট—বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট—ওয়েস্টন লেন—এস্‌প্লানেড্ রো—ডেকার্স লেন—ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট—মারকিন্স লেন—ফ্যান্সি লেন—কাউন্সিল-হাউস স্ট্রীট—হেস্টিংস স্ট্রীট—ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট—স্ট্র্যাণ্ড রোড—চার্চ লেন—হেয়ার স্ট্রীট—কয়লাঘাট স্ট্রীট—লালবাজার স্ট্রীট—ক্লাইভ স্ট্রীট—ফেয়ার্লি প্লেস—ক্যানিং স্ট্রীট—রাজা উদমন্ত স্ট্রীট—হ্যারিসন রোড—টিরেটাবাজার স্ট্রীট—হরিণবাড়ি লেন—সার্কিউলার রোড—বোল্টস্ লেন—কটন স্ট্রীট—ফিয়ার্স লেন—আর্মহার্স্ট স্ট্রীট—অ্যাণ্টনিবাগান লেন—চিৎপুর রোড—বৌবাজার স্ট্রীট—বৈঠকখানা—শোভাবাজার রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীট—রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট—বাগবাজার স্ট্রীট—শ্যামবাজার স্ট্রীট—নন্দরাম সেনের স্ট্রীট—অভয়চরণ মিত্রের স্ট্রীট—কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট—সুকিয়াস্ স্ট্রীট—বৃন্দাবন মল্লিকের লেন—রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট—রাজা গুরুদাসের স্ট্রীট—মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট—ভীম ঘোষের লেন—বিশ্বনাথ মতিলালের লেন—বৈষ্ণবচরণ শেঠের স্ট্রীট—বনমালী সরকারের স্ট্রীট—দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্ট্রীট—দুর্গাচরণ পিতুড়ির লেন—ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন—দর্পনারায়ণ ঠাকুরের স্ট্রীট—দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন—গোকুল মিত্রের গলি—বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট—হরি ঘোষের স্ট্রীট—হুজুরীমল্‌স ট্যাঙ্ক লেন—কাশী ঘোষের লেন—খেলাত ঘোষের গলি—কেশবচন্দ্র সেনের গলি—কৃষ্ণদাস পালের লেন—মথুর সেনের গার্ডেন লেন—নীলমণি হালদারের লেন—নীলমণি মিত্রের লেন—নরেন্দ্রনাথ সেনের গলি—নন্দলাল মল্লিকের লেন—উমেশচন্দ্র দত্তের লেন (রামবাগান)—অনাথ দেবের লেন—অনাথবাবুর বাজার লেন—বলরাম দের স্ট্রীট—দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর স্ট্রীট—মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর গলি—মতিলাল শীলের স্ট্রীট—পিয়ারীচরণ সরকারের স্ট্রীট—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রীট—প্রতাপ ঘোষের লেন—রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ লেন—রাজা কালীকৃষ্ণ লেন—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ লেন—রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ লেন—রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ লেন—রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট—রমাপ্রসাদ রায়ের স্ট্রীট—রামমোহন মল্লিকের স্ট্রীট—মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণের লেন—রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের লেন—সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট—শোভারাম বসাকের লেন—শঙ্কর ঘোষের লেন—অক্রুর দত্তের লেন—বিদ্যাসাগর স্ট্রীট—বলরাম মজুমদারের স্ট্রীট—হিদেরাম ব্যানার্জি লেন—কাশী মিত্রের ঘাট স্ট্রীট ও কলিকাতার অন্যান্য গলি ও পথসমূহের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয়।

এইবার আমরা বর্তমান কলিকাতার রাজপথগুলির ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বলিয়া যাইব। এই সমস্ত রাজপথের সহিত অতীত যুগের অনেক খ্যাতিসম্পন্ন, উচ্চপদস্থ ইংরাজ, বাঙ্গালীর নামেরও স্মৃতি বিজড়িত।

১. এই অধ্যায়ে বর্ণিত পথঘাটের পরিচয় বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত ; অনেক ক্ষেত্রে পথঘাটের নূতন নামকরণ হইয়াছে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সব উল্লেখ আছে তাহা গ্রন্থরচনার সমসাময়িক তথ্যকে ভিত্তি করিয়া।

চৌরঙ্গী রোড[১]

এখন যে চৌরঙ্গী সাহেবী-কোয়ার্টার, কলিকাতা নগরীর মুকুটমণি, আগে তাহা বনজঙ্গল সমাচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এই গ্রাম ও তাহার আশেপাশের স্থানগুলি গভীর জঙ্গলপূর্ণ ছিল। দিনের বেলায় লোকে সাহস করিয়া গোবিন্দপুর বা সুতানুটি যাইতে পারিত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে বা গভীর রাত্রে ডাকাতের ভয়ে কেহই চৌরঙ্গীর এ জঙ্গল পার হইত না।

জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গী নামক এক সন্ন্যাসী এই জঙ্গলে বাস করিতেন। তাহার নাম হইতেই এই ক্ষুদ্র গ্রামের নাম চৌরঙ্গী হইয়াছিল। জঙ্গলগিরি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে অনেক কথা বলিয়াছি।

চৌরঙ্গী একটি গ্রামের বা স্থানের নাম। এই গ্রামের নাম হইতেই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দেও চৌরঙ্গীর নাম শোনা যায়। হলওয়েল সাহেবও চৌরঙ্গীর রাস্তাকে 'কালীঘাটের রাস্তা, 'Road to Colligot' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আজকাল যাহা বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট ও সেই বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট যেখানে ধর্মতলায় মিশিয়াছে, তাহা ইংরাজদের কলিকাতায় আগমনের বহুপূর্ব হইতেই একটি সরু রাস্তা ছিল। এই সরু রাস্তার দুই ধারে গভীর জঙ্গল। এই জঙ্গল-মধ্যবর্তী পথ দিয়াই যাত্রিগণ চিত্রেশ্বরীর মন্দির হইতে কালীঘাটে যাইত। পুরাতন ম্যাপসমূহে চৌরঙ্গী একটি স্থানের নাম বলিয়াই উল্লিখিত। পরে এই চৌরঙ্গী নাম রাস্তাকে দান করা হইয়াছে।

১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে উড্ সাহেব কলিকাতার এক নক্সা তৈয়ারি করেন। উডের এই ম্যাপে ধর্মতলা হইতে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত পথটি চৌরঙ্গী রোড বলিয়া চিহ্নিত ছিল। পার্ক স্ট্রীটের দক্ষিণের স্থানটিকে চৌরঙ্গী গ্রাম বলিত। কিন্তু ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রস্তুত আপজনের ম্যাপে চৌরঙ্গী ও তাহার দক্ষিণ পূর্ব ভূভাগ 'ডিহি বির্জি' বলিয়া উল্লিখিত।

এই সময়ে চৌরঙ্গীর সীমা ছিল—পূর্বে সার্কিউলার রোড, দক্ষিণে পার্ক স্ট্রীট, উত্তরে কলিঙ্গা ও পশ্চিমে বর্তমান রোডের কিয়দংশ। পাঠক, একবার কল্পনাবলে চৌরঙ্গীর বর্তমান প্রাসাদ-তুল্য, বিদ্যুতালোক উজ্জ্বলিত বাড়িগুলির চিত্র মন হইতে মুছিয়া ফেলুন। আর সেই কল্পনার সহায়তায় দেখুন—বর্তমান চৌরঙ্গীর পার্শ্বস্থ মাঠটি, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই জঙ্গলে বাঘ, বন্যশূকর ও ডাকাতের বিহারভূমি।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে চৌরঙ্গীর জঙ্গল কাটান আরম্ভ হয়। উক্ত বৎসরেই বর্তমান গড়ের মাঠের কেল্লার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। জনরব এই, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেও বির্জি-তলায় অবস্থিত বর্তমান লাটগির্জার[২] চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস এই জঙ্গলে হরিণ শিকার করিতে যাইতেন, এরূপ একটা জনপ্রবাদও আছে।

থিয়েটার রোড[৩]

চৌরঙ্গীর থিয়েটার রোড পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। এই রাস্তার উপর চৌরঙ্গী ও বর্তমান থিয়েটার রোডের মিলনস্থলে একটি ইংরাজি থিয়েটার ১৮১৩—৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ইহা হইতেই রাস্তাটির নামও 'থিয়েটার রোড' হইয়াছে। থিয়েটার রোডের এই থিয়েটারের অভিনেতারা শখের জন্য অভিনয় করিতেন—কিন্তু অভিনেত্রীরা বেতন গ্রহণ করিতেন ও থিয়েটার-গৃহেই থাকিতেন। আগুন লাগিয়া ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে এই থিয়েটার বাড়িটি পুড়িয়া ভস্মসাৎ হয়। তাহার পর আর এস্থানে নূতনভাবে থিয়েটার-গৃহ নির্মিত হয় নাই। থিয়েটারাধিকৃত স্থানে পরবর্তীকালে একটি সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত জজ ম্যাক্রেবি সাহেব এই বাড়িতে বাস করিতেন, বর্তমানে ইহা একটি বোর্ডিং-হাউস

---

১. চৌরঙ্গী রোডের কিয়দংশ বর্তমানে জওহরলাল নেহরু রোড নামে পরিচিত। এই রাস্তার শুরু ২, লেনিন সরণি হইতে। জওহরলাল নেহরু রোডের পরবর্তী অংশ এখনও চৌরঙ্গী রোড নামযুক্ত।

২. লাট গির্জা অর্থাৎ সেন্ট পলস্ ক্যাথিড্রাল। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৪৭ খ্রী.।

৩. থিয়েটার রোডের বর্তমান নাম শেক্সপীয়র সরণি।
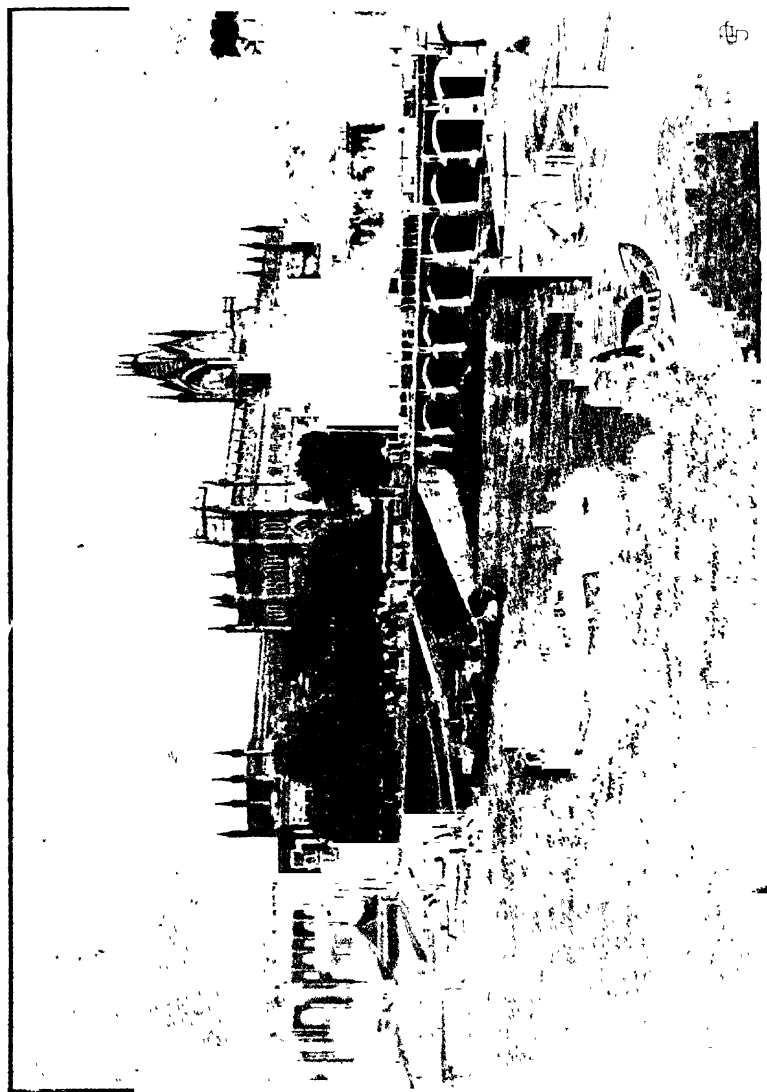
১৯১৪ খ্রী র হাইকোর্ট ও গঙ্গাতীর
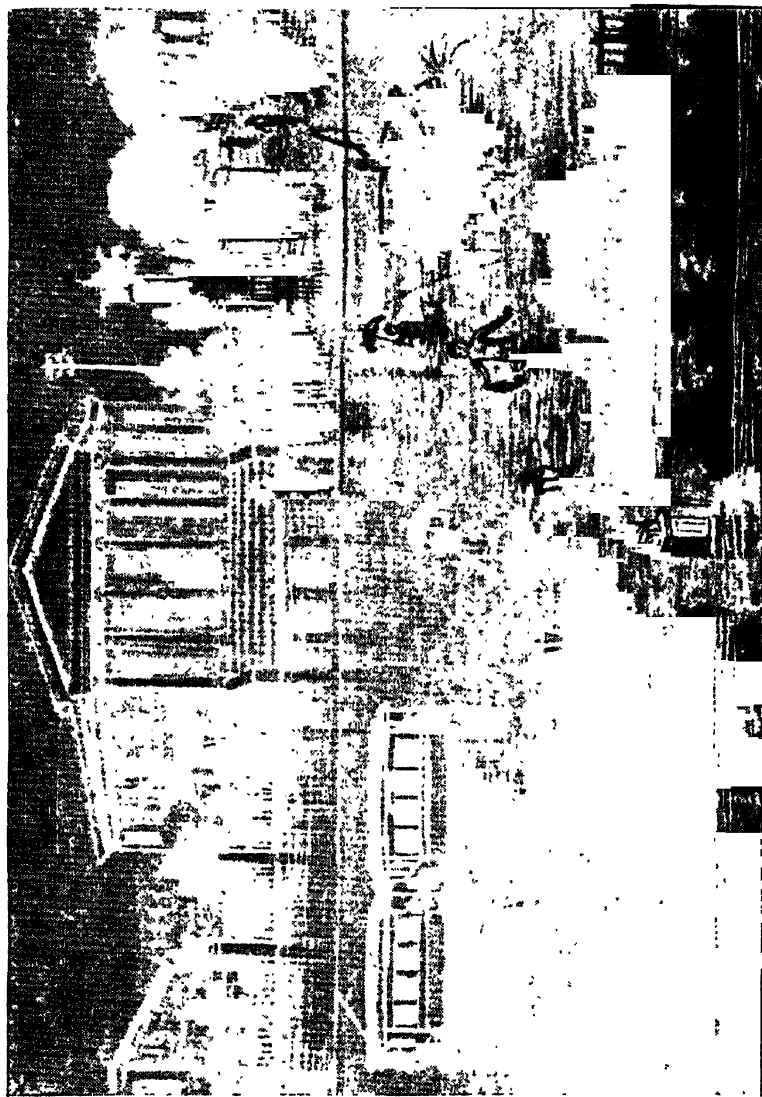
শিল্পীর চোখে বর্ষার গোলদীঘির দৃশ্য (১৯২০)

হইয়াছে।

হ্যারিংটন স্ট্রীট[১]

থিয়েটার রোডের পরই হ্যারিংটন স্ট্রীটের নাম উল্লেখযোগ্য। সেকালের সদর-দেওয়ানি আদালতের জজ হ্যারিংটন[২] সাহেবের নামানুসারে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। ৪নং হ্যারিংটন স্ট্রীটে হাই-কোর্টের বিখ্যাত চিফ্-জস্টিস স্যর রিচার্ড গার্থ সাহেব বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। তিন নম্বরের বাড়িতে স্বনাম খ্যাত বিশপ হিবার সর্বপ্রথমে বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে এ বাটিতে তাঁহার সুবৃহৎ লাইব্রেরি ও পরিজনবর্গের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি রাসেল স্ট্রীটে উঠিয়া যান।

মিডলটন স্ট্রীট

মিডলটন স্ট্রীটের নামকরণ লইয়া একটু মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন মতে, বিশপ মিডলটনের[৩] নামানুসারে, এই পথের নামকরণ হইয়াছে। আবার অন্যমতে স্যামুয়েল মিডলটনের নাম হইতেই এই রাস্তার নামকরণ। এই স্যামুয়েল মিডলটন, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে, কোম্পানির সিভিল-সার্ভিসভুক্ত ছিলেন। ইনি কয়েকমাস কাল কলিকাতার পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন, তৎপরে সুন্দরবন কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইয়া অনেক ডাকাত দমন করেন। (১৭৯২ খ্রীস্টাব্দ)। এই পথের আশে পাশে এই শেষোক্ত মিডলটন সাহেবের অনেক জমি জমা ছিল। এই মিডলটন স্ট্রীট সাহেবি-কোয়ার্টার হইলেও এখানে দ্বারবঙ্গের মহারাজের একটি প্রাসাদ আছে।

রাসেল স্ট্রীট

সেকালের সুপ্রীমকোর্টের চিফ্-জস্টিস স্যর হেনরি রাসেলের নামে, এই পথের নামকরণ হইয়াছে। রাসেল সাহেব ১৮০৬ হইতে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুপ্রীমকোর্টের জজিয়তি করিয়াছিলেন। তিনিই এই পথিপার্শ্বে প্রথম বাটি নির্মাণ করেন। এই পথের ১২ নম্বরের বাড়িতে স্বনামখ্যাত চিফ্-জস্টিস স্যর বার্নিস পীকক[৪] বাস করিতেন। ১৮৫৯ হইতে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি জজিয়তি করেন। ১৩নং বাটিতে স্বনামপ্রসিদ্ধ জন নর্মান সাহেব বাস করিতেন। এই নর্মান সাহেব-কেই একজন মুসলমান হাইকোর্টের মধ্যে হত্যা করে। (১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ)

পার্ক স্ট্রীট

সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চিফ্-জস্টিস স্যর ইলাইজা ইম্পির সময় হইতে 'পার্ক স্ট্রীট' নামের উদ্ভব সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ইম্পি এক সুবৃহৎ উদ্যানবাটির মধ্যে বাস করিতেন। তাহার চতুঃপার্শ্ব ব্যাপিয়া একটি "পার্ক" ছিল। আজকাল যাহা 'লরেটো কনভেণ্ট' বলিয়া পরিচিত, তাহাই স্যর ইলাইজা ইম্পির আবাসবাটি ছিল। এই স্থান ইম্পির সময়েও জঙ্গলপূর্ণ ছিল। সেকালে অস্ত্রধারী সিপাহীরা ডাকাত তাড়াইবার জন্য চিফ্-জস্টিস ইম্পির বাটি পাহারা দিত। যে সকল চাকর-বাকর তাঁহার বাড়িতে কাজ করিত, তাহারা সন্ধ্যার পর পার্ক স্ট্রীট হইতে কলিকাতায় আসিতে হইলে দলবদ্ধ না হইয়া আসিত না। এই স্থানে গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টের বাগানবাটি ছিল। (১৭৬০-৬৪ খ্রীস্টাব্দ)। ইম্পির আমলে এই পার্ক পূর্ব-পশ্চিমে বর্তমান রাসেল স্ট্রীট হইতে ক্যামাক স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পার্ক স্ট্রীটের সর্বাপেক্ষা সুবৃহৎ বাটিটি (৬নং) সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার মিঃ ডবলু, সি,

---

১. হ্যারিংটন স্ট্রীটের বর্তমান নাম হো চি মিন সরণি।

২. স্যর জন হারবার্ট হ্যারিংটন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নামে যে রাস্তাটি তার নাম Harington Street। ভুলক্রমে বানান ছিল Harrington Street.

৩. Rt. Rev. Thomas Fanshaw Middleton ; ১৮১৪-১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ কাল পর্যন্ত ইনি ছিলেন কলিকাতার বিশপ (Lord Bishop of Calcutta)।

৪. Sir Barnes Peacock ১৮৫৯-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীমকোর্টের পরিবর্তে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি নূতন প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি সুপ্রীমকোর্টের শেষ প্রধান বিচারপতি এবং হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি।

বোনার্জির আবাসভবন ছিল। ইহার পূর্বে বঙ্গদেশের লেফ্‌টেন্যাণ্ট-গবর্ণর স্যর জন পিটার গ্রাণ্ট (১৮৫৯-৬২ খ্রীস্টাব্দ) এই বাটিতে বাস করিতেন। বঙ্গের ছোটলাটদিগের ব্যবহারের জন্য গ্রাণ্ট সাহেব এই ৬নং এর বাড়িটি গবর্ণমেণ্টকে ক্রয় করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অমত করেন। পরিশেষে বেলভেডিয়ার-ভবনেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ছোটলাটদের বাসভবন[1] নির্ধারিত হয়।

৫নং ২ পার্ক স্ট্রীটের বাটিতে, এসিয়াটিক সোসাইটি গৃহ বর্তমান। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি,[3] এই সোসাইটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল স্বনামখ্যাত ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব, ইহার প্রধান মুরুব্বি বা পেট্রন, এবং স্বনামখ্যাত স্যর উইলিয়াম জোন্স ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট। প্রাচীন ভারতের লুপ্ত প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ঘটনাদির উদ্ধারই, এই সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, জীবজন্তু-তত্ত্ব, ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ের গবেষণাময় আলোচনা এখানে হয়। দেশের বড় বড় লোক, নামজাদা পদস্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই সভার সদস্য ও অলঙ্কারস্বরূপ। এই সোসাইটি ধরিতে গেলে, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। লাট-সাহেবগণ সাধারণত এই সভার প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারগণও কখন কখন সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। পুরাকালে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বিদ্বৎ-সমিতির অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। বর্তমান যুগে জস্টিস স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুপণ্ডিত শরৎচন্দ্র দাস প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি মনীষিগণ এই সভার সদস্য। ইহাঁদের দ্বারা অনেক নূতন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়িণী তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাকালে স্যর উইলিয়াম জোন্স, কোলব্রুক, উইলকিন্স, ডেভিস, এইচ, এইচ, উইলসন, জেমস প্রিন্সেপস, হজসন, মিল, ওয়ালিস, ম্যাকলেল্যাণ্ড, বেভারেজ, প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই সমিতির নামজাদা সদস্য ছিলেন।

সর্বপ্রথমে এই এসিয়াটিক সোসাইটির নিজের গৃহ ছিল না। তদানীন্তন সুপ্রীমকোর্টের 'গ্র্যাণ্ড-জুরি' গৃহের মধ্যে ইহার অধিবেশন হইত। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে এই সোসাইটির জন্য স্বতন্ত্র বাটি নির্মাণের কল্পনা হয়—কিন্তু ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে এ কল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই। জ্যাকো পিচার নামক এক ফরাসী-স্থপতি এই বাটির নির্মাণ কার্য শেষ করেন। বাড়িটি তৈয়ারি করিতে ত্রিশহাজার টাকা খরচ হইয়াছিল।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে নানা ভাষার পুস্তক শ্রেণী অসংখ্য। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের একটি তালিকা হইতে প্রমাণ—

ইংরাজি পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি		১৯৮৪২ ভল্যুম
আরেবিক	,,	১১৬১ ,,
ফার্সী	,,	১৫০৬ ,,
উর্দু	,,	৩০০ ,,
সংস্কৃত	,,	৩০৭৮ ,,
সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ও হস্তাক্ষর লিখিত পুঁথি		২৫০৭ ,,

১. 'বেলভিডিয়ার ভবনেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার ছোটলাটদের বাসভবন'—বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থাগার এই-স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

২. বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটি ১নং পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে অবস্থিত।

৩. এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালীন কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৭৮৪ সালের ১৫ই জানুয়ারি it was agreed that the Society be established for the purpose of inquiring into the "History and Antiquities, Arts, Sciences and Literature of Asia" সুতরাং সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি—*Proceedings of the Asiatic Society*, Vol I (1784-1800) p. 2.

তিব্বতীয়	,,	২৫৬	,,
চাইনিজ	,,	৩৫০	,,
বর্মিজ ও সায়ামিজ লিপি		১২৫	,,
	মোট	২৯৪২৫	,,

ইহাই হইতেছে আট-দশ বৎসরের পূর্বের তালিকা। বর্তমানে এই সংখ্যার উপর আরও নূতন পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরঙ্গপট্টন প্রাইজ-কমিটি এই সমিতিতে অনেক বহুমূল্য পুস্তক দান করেন। (১৮০৮ খৃস্টাব্দ ফেব্রুয়ারি) টিপু সুলতানের ধ্বংসসাধনের পর তাঁহার বহুমূল্য পাঠাগারটি বিজয়ী ইংরাজেরা দখল করিয়া লয়েন। টিপুর এই লাইব্রেরিতে অনেক বহুমূল্য ও প্রাচীন পুস্তকাদি ছিল। সুন্দর সুচিত্রিত, দুই তিনশত বৎসরের লিখিত কোরাণ প্রভৃতি এই পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইত। অতি পুরাকালে গুলেস্তাঁর যে প্রথম নকল হয়, সে পুস্তকখানিও টিপুর পাঠাগারে ছিল। দুই একখানি কোরাণে এবং তৎসাময়িক পুস্তকে (যাহা মোগল-বাদসাহদের সম্পত্তি ছিল) আকবর প্রভৃতি বাদসাহগণের স্বহস্তলিখিত স্বাক্ষর আজও বর্তমান। "পাদসা-নামা" বা সাজাহান বাদসাহের রাজত্বের ইতিহাস নামধেয় সুবৃহৎ সুচিত্রিত পুস্তক, সাজাহানের রাজত্বকালে তাঁহারই আদেশে লিখিত হয়। ইহাতে সাজাহান বাদসাহের স্বাক্ষর আছে। এই প্রাচীন বাদসাহি গ্রন্থগুলি এখন এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। সোসাইটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের জন্য গবর্ণমেণ্টকে এগুলি প্রদান করিয়াছেন। পাঠক ইচ্ছা করিলে বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদে গিয়া এগুলি দেখিয়া আসিতে পারেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অনেক প্রাচীন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী পুস্তকের হস্তলিখিত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ছিল। উক্ত কলেজ উঠিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট সেই দুষ্প্রাপ্য রত্নগুলি, এসিয়াটিক সোসাইটিকে প্রদান করেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগার একটি দর্শনীয় পদার্থ। ইহা অতীত যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মহাপণ্ডিতগণের গবেষণা-মন্দির এবং ওয়ারেন হেস্টিংস ও স্যর উইলিয়াম জোন্সের জীবন্ত কীর্তিস্তম্ভ।

পার্ক স্ট্রীটের পার্শ্ববর্তী বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের সহিত প্রাচীন কালের একটু সম্বন্ধ আছে। আগে এই বাড়িতে 'Sans Souci' থিয়েটার ছিল। সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের প্রবেশপথে যে বড় বড় সিঁড়িগুলি আজও বর্তমান, তাহা উক্ত 'সাঁ-সুশী' থিয়েটারের সিঁড়ি। এই থিয়েটারের সহিত অতীত কালের একটি শোচনীয় ঘটনার স্মৃতি বিজড়িত। মিসেস্ এস্থার লিচ্ নামক এক যুবতী ইংরাজ-মহিলা, এই থিয়েটারের একজন নামজাদা অভিনেত্রী ছিলেন। ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে থিয়েটার রোডের পূর্বকথিত থিয়েটারটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া ধ্বংস হইলে পার্ক স্ট্রীটে এই 'সাঁ-সুশী' থিয়েটারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ইংলিশম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্টকেলার সাহেব এই মিসেস্ লিচকে পুরোবর্তী করিয়া একটি থিয়েটার খুলিবার চেষ্টা করেন। তজ্জন্য অনেক টাকা চাঁদাও সংগৃহীত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড অক্ল্যাণ্ড এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য এক হাজার টাকা চাঁদা দেন। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে এই থিয়েটারের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ১৮৪১ খৃস্টাব্দ হইতে অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথম অভিনয় রাত্রে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। মিস্ লিচ্ এক অভিনয় রাত্রে তাঁহার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য, 'উইংসের' নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখন কলিকাতায় কেরোসিন ল্যাম্প বা গ্যাসের প্রচলন হয় নাই, থিয়েটারের স্টেজের ভিতর তেলের আলো জ্বলিত। এই আলোতে মিস্ লিচের পোষাক ধরিয়া যায়। ব্যাকুলভাবে প্রাণভয়ে তিনি স্টেজের মধ্যে আসিয়া সাহায্যের জন্য চিৎকার করেন। দর্শকমণ্ডলী স্টেজে আগুন লাগিয়াছে ভাবিয়া বিচলিত হইয়া উঠেন। মিস্ লিচ্কে সাহায্য করা দূরে থাক, তাঁহারা নিজের ভাবনাতেই বিভোর হইয়া পলায়নে উদ্যত। স্টেজের একজন লোক এই অগ্নিদগ্ধ অভিনেত্রীর সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসে। কিন্তু জ্বলন্ত আগুন নিভাইবার পূর্বেই, মিস্ লিচের শরীরের নানাস্থান ভয়ানকরূপে পুড়িয়া যায়। ইহার দুই দিন পরে এই প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। যে বাটিতে এখন রোমান-ক্যাথলিক আর্চবিশপ

বাস করিতেছেন, সেই বাড়িতেই মিস্ লিচের মৃত্যু হয়। 'সাঁ-সুশী' থিয়েটারটি পরিশেষে এক ফ্রেঞ্চ-কোম্পানি ভাড়া লয়েন। তাহার পর এই বিখ্যাত থিয়েটারের জীবলীলার পরিসমাপ্তি হয়।

ক্যামাক্ স্ট্রীট[১]

পার্ক স্ট্রীট হইতে আরম্ভ করিয়া এই পথটি লোয়ার সার্কিউলার রোড অবধি গিয়াছে। ক্যামাক্ সাহেব লর্ড ওয়েলেস্‌লি ও কর্ণওয়ালিসের আমলে একজন সিনিয়ার-মার্চেণ্ট ছিলেন। এই রাস্তার আশেপাশে অনেকটা স্থান তাঁহার সম্পত্তিভুক্ত ছিল। ১৭৮৮ খৃীস্টাব্দে কলিকাতা গেজেটে এই সব সম্পত্তি বিক্রয়ের একটি বিজ্ঞাপন দেখা যায়। ১৭৮৫ খৃীস্টাব্দের ডাইরেক্টরিতে দেখা যায়, এই ক্যামাক্ সাহেব ঢাকা ও ত্রিপুরার জেলার জজ হইয়াছিলেন। ইহাঁর এক সহোদর লর্ড ওয়েলেস্‌লির এডিকং ছিলেন। ২৫ বৎসর পূর্বে এই স্থানের চারিদিকে অনেক বস্তি ছিল, এখন সেই সব বস্তির ধ্বংসসাধন করিয়া প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাসমূহ নির্মিত হইয়াছে। আগে এই পথটির নাম ছিল— 'ডন্‌কান্ বস্তিকা-রাস্তা'। তৎপরে উক্ত ক্যামাক্ সাহেবের নামানুসারে ইহা 'ক্যামাক্ স্ট্রীট' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

উড স্ট্রীট

উড সাহেবের নাম হইতে এই রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। এই উড সাহেব কোম্পানির আমলে একজন পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। এই উড স্ট্রীটের একটি বাটিতে 'হিন্দু-স্টুয়ার্টের' আবাস স্থান ছিল। তাঁহার আসল নাম কর্ণেল স্টুয়ার্ট। তিনি হিন্দু ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'হিন্দু স্টুয়ার্ট' বলিত। খৃীস্ট ও কৃষ্ণ এই উভয়ের মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখিতেন না। জনশ্রুতি এই, তিনি নিত্য গঙ্গা স্নান করিতেন। অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি তিনি নিজ বাটিতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সাউথ পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে আজও তাঁহার সমাধিস্তম্ভ বর্তমান। এ সমাধিস্তম্ভটি একটি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ইহার গাত্রে 'ভগীরথ' 'পৃথিবদেবী' প্রভৃতির খোদিত আকৃতি ও অনেক সাধুসন্ন্যাসীর মূর্তি আছে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রীট[২]

ইহা আগে (১৭৮০ খৃীস্টাব্দ) বাঁশের জঙ্গল ছিল। রাত্রে লোকে এ ভীষণ জঙ্গল পার হইতে ভয় পাইত। ১৭৮৯ খৃীস্টাব্দে, এখানে সাহেবদের জন্য একটি ফ্রি স্কুল স্থাপিত হয়। এই স্কুল হইতেই এ পথের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। যেখানে এখন এই স্কুল গৃহটি বর্তমান—বহুকাল পূর্বে সেই-স্থানে আর একটি বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ লিমেস্টার সাহেব থাকিতেন। এই লিমেস্টার নন্দকুমারের মোকদ্দমার অন্যতম বিচারক। ইনিই নন্দকুমারকে জেলে পুরিবার আদেশ প্রদান করেন। এই রাস্তার ৩৯ নং বাড়িতে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার উইলিয়াম থ্যাকারের জন্ম হয়। ইহাঁর পিতা রিচমণ্ড থ্যাকারে কোম্পানির আমলে বোর্ড অব রেভেনিউর সেক্রেটারি ও চব্বিশ পরগনার কলেক্টর ছিলেন। আলিপুরে তিনি যে বাড়িতে বাস করিতেন, সেই বাড়িতেই হেস্টিংসের কাউন্সিলের মেম্বর স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস বাস করিতেন বলিয়া একটি জনপ্রবাদ আছে। আলিপুর জেলের প্রবেশের পথটি এখনও 'থ্যাকারে-রোড' বলিয়া পরিচিত।

মট্‌স লেন[৩]

মট্‌স লেন মিঃ মটের নামানুসারে চিহ্নিত হইয়াছিল। হেস্টিংসের বিলাতি চিঠিপত্রে এই মট সাহেবের নাম বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। মট সাহেব প্রথমে প্রাচীন কলিকাতার একজন স্বাধীন ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৭৬৬ খৃীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভের আদেশে তিনি উড়িষ্যায় মণির খনি আবিষ্কার করিতে গমন করেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি একখানি কেতাবও লিখিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের

---

১. ক্যামাক স্ট্রীটের অংশ বিশেষ বর্তমানে আনন্দীলাল পোদ্দার স্ট্রীট নামে পরিচিত।
২. ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের বর্তমান নাম মির্জা গালিব স্ট্রীট ।
৩. অধুনা মট্‌স্ লেন ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট নামে পরিচিত।

প্রথম আমলে তিনি বেনারসে থাকিতেন। তৎপরে চুঁচুড়ায় আসেন। গবর্ণর হেস্টিংস প্রায়ই মট সাহেবের চুঁচুড়ার বাড়িতে আমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহার গোপনীয় চিঠিপত্রের অনেকস্থলে তিনি 'বিবি মটের' নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসরকাল মটসাহেব সেকালের কলিকাতার পুলিশ-বিভাগের বড়কর্তার কাজ করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইম্পির স্বহস্ত লিখিত যে সব কাগজপত্র আজও বর্তমান, তাহার মধ্যেও মিঃ মটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "জীবনের শেষভাগে তাঁহার দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটিয়াছিল ও এজন্য তিনি কলিকাতা-জেলে দেনার দায়ে আবদ্ধ হন".. ইম্পি তাঁহার পত্রে মটের সম্বন্ধে এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন এই মট্‌স-লেন ইণ্ডিয়ান-মিরার স্ট্রীট নামে পরিচিত। এই গলির মধ্যে মিরার-সম্পাদক স্বর্গীয় রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের আবাসবাটি ও মিরার অফিস।

রয়েড্‌ স্ট্রীট

৪১ নং ফ্রি স্কুল স্ট্রীট হইতে এই রাস্তা আরম্ভ হইয়া, ইলিয়ট রোড়ে গিয়া মিশিয়াছে। কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের পিউনি-জজ স্যর জন রয়েডের[১] নামে এই রাস্তার নামকরণ হয়। রয়েড্‌ সাহেব ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮১৬ পর্যন্ত এদেশে জজিয়তি করেন। দুই একবার তিনি সুপ্রীমকোর্টের সেসনেও বসিয়াছিলেন। জজ রয়েডের এক মন্তব্য হইতে জানিতে পারা যায়, তাঁহার দাপটের চোটে এই সময়ে কলিকাতার পুলিশ-বন্দোবস্ত খুব ভাল ছিল। কারণ প্রথম সেসনে তিনি দুইটি বই মোকদ্দমা পান নাই ও তাহা একদিনেই শেষ হয়। পার্ক স্ট্রীটে ইহাঁর সমাধি এখনও বর্তমান আছে।

ইলিয়ট রোড

ট্রাম-কোম্পানির দৌলতে এখন ইলিয়ট রোড সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত। ইলিয়ট সাহেব পূর্বোক্ত জজ রয়েডের সমকালীন ব্যক্তি। ইলিয়ট সাহেব সেকালের কলিকাতা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং পুলিশ ও কন্জারভেন্সির বড় কর্তা ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে কলিকাতা সহরে চোর ডাকাতের ভয় কমিয়া যায়। চোর-ডাকাত ধরিতে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পার্ক স্ট্রীটে ইহাঁর সমাধি বর্তমান। ইলিয়ট রোড কলিকাতার পুরাতন ম্যাপে আহম্মদ জমাদারের রাস্তা' বলিয়া উল্লিখিত।

রিপন স্ট্রীট

রিপন স্ট্রীট, মার্কুইস স্ট্রীট, রিপন লেন পাশাপাশি ও নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। সর্বজনপ্রিয় ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড রিপনের নামে এই পথগুলির নামকরণ হইয়াছে। আগে এই গলিগুলি সাউথ-কলিঙ্গা, এনিস্‌ বারবারের লেন, জোড়া-তালাও লেন, মির্শির-খানসামার লেন প্রভৃতি অপ্রসিদ্ধ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান নয় নম্বর রিপন স্ট্রীটে জন উইলিয়াম রিকেট্‌স সাহেব বাস করিতেন (১৭৯১-১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ)। এই রিকেটস্‌ সাহেব জাতিতে ফিরিঙ্গি। তিনি ফিরিঙ্গি ও এদেশীয় লোকদের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ডভ্‌-টন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিলাতে গিয়া হাউস অব লর্ড'স ও কমন্সের সম্মুখে ফিরিঙ্গি-সমাজের প্রতিনিধিরূপে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। এই সময়ে ভারতের সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে বিলাতে একটি সিলেক্ট কমিটি বসে। তিনি এই কমিটিতে ভারতবাসীর হইয়া সাক্ষ্য দেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে যে চার্টার অ্যাক্‌ট্‌ প্রচলিত হয় তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আদেশ থাকে, যে কোন জাতি বা ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, গবর্ণমেণ্টের অধীনে সিভিল-বিভাগে নিযুক্ত হইতে পারিবে। এরূপ বন্দোবস্ত রিকেটস্‌ সাহেবের পার্লামেণ্টে সাক্ষ্য-প্রদানের ফলেই হইয়াছিল।

---

১. এঁর প্রকৃত নাম Sir John Royds, ইনি ১৭৯৭-১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন। এঁর নামচিহ্নিত রাস্তাটির নাম হওয়া উচিত রয়েড্‌স স্ট্রীট, রয়েড স্ট্রীট নয়।

কিড্ স্ট্রীট[১]

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বোটানিকেল গার্ডেন প্রতিষ্ঠাতা লেফটেনাণ্ট কর্নেল রবার্ট কিডের নামানুসারে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। কর্নেল কিড বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের-মিলিটারি-সেক্রেটারি ও একজন শ্রেষ্ঠদরের উদ্ভিদ-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পুত্র জেমস্ কিড্ ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে খিদিরপুরে এক ডক্ প্রতিষ্ঠা করিয়া যশস্বী হন। এই কিডের নাম হইতেই 'কিডারপুর' ও তদপভ্রংশ 'খিদিরপুর' নামকরণ হইয়াছে। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে খিদিরপুরেই কিডের মৃত্যু হয়। কিড্ তৎকালীন ফিরিঙ্গি সম্প্রদায়ের জনৈক প্রধান নেতা ছিলেন।

সদর স্ট্রীট

সদর স্ট্রীট বর্তমান মিউজিয়াম বিল্ডিংএর নিকট আরম্ভ হইয়া ফ্রি স্কুল স্ট্রীট পর্যন্ত সরাসর চলিয়া গিয়াছে। আগে এই পথের একাংশের নাম ফোর্ড স্ট্রীট ও অপরাংশ স্পিক স্ট্রীট বলিয়া পরিচিত ছিল। মিঃ স্পিক ১৭৮৯ হইতে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাউন্সিলের মেম্বর ছিলেন। বর্তমান মিউজিয়াম বিল্ডিংএর অধিকৃত স্থানের মধ্যে তাঁহার বাটি ছিল। এই বাড়ির চারিদিকে সুবৃহৎ কম্পাউণ্ড থাকায় বাটির সীমা কিড্ স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। স্পিক সাহেবের এই বাটিতে একদিন একটি ভয়ানক ঘটনা ঘটে। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাউন্সিলের-মেম্বর ছিলেন। তাঁহার বাটির ফটকে সিপাহী পাহারা থাকিত। একজন শিখ কোন অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা জন্য তাঁহার নিকট এক দরখাস্ত করে। স্পিক সাহেব শিখের দরখাস্ত লইতে অস্বীকার করায় সেই শিখ ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেবের এক ভৃত্যকে হত্যা করিয়া উপরের ছাদে উঠিয়া যায় ও অপর লোকদিগকে হত্যা করিবার ভয় দেখায়। শেষ সিপাহীদিগকে ডাকিয়া স্পিক সাহেব সেই উন্মত্ত শিখকে হত্যা করান। এই বাড়িটি স্পিক সাহেব পরিশেষে গবর্ণমেণ্টকে ভাড়া দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই বাড়িটিতে 'সদর কোর্ট' বলিয়া একটি আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। এই জন্য পথটির 'সদর স্ট্রীট' নামকরণ হইয়াছে।

লিণ্ডসে স্ট্রীট

এই লিণ্ডসে স্ট্রীট, বর্তমান মিউনিসিপ্যাল বাজারের নিকট। ইহার পার্শ্বেই কলিকাতার সুবিখ্যাত গ্র্যাণ্ড-অপেরা-হাউস।[২] এই রাস্তাটি বহুদিনের। অনারেবল রবার্ট লিণ্ডসে, কোম্পানির অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। লিণ্ডসে সাহেব ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে একজন রাইটার বা সিভিলিয়ান রূপে এদেশে আসেন(১৭৭২ খ্রীঃ)। কয়েক বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া তিনি ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার কলেক্টর পদে নিযুক্ত হন। তখন কোম্পানির সিভিল সার্ভেণ্টগণ বেতন কম পাইতেন বলিয়া অর্থাগমের জন্য নানারূপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন। লিণ্ডসেরও এরূপ অনেক গুপ্ত কারবার ছিল। তাঁহার প্রধান ব্যবসা ছিল বাঘ শিকার ও হাতি ধরা। তখন শ্রীহট্টের জঙ্গলে এসব জানোয়ারের অভাব ছিল না। বৎসরে তিনি ৬০/৭০টি ব্যাঘ্র বধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এক তালিকা পাঠাইতেন। কোম্পানি-বাহাদুর এজন্য তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিতেন। হাতি ধরিয়া তিনি কোম্পানির সেনাবিভাগে ব্যবহৃত হইবার জন্য পাঠাইতেন। এই সব হাতি গবর্ণমেণ্ট উচ্চদরে কিনিয়া লইতেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীহট্টের জঙ্গল কাটাইয়া তিনি শাল-সেগুনের ব্যবসাও করেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হইয়া বিলাতে চলিয়া যান।

এই লিণ্ডসে স্ট্রীটে অপেরা-হাউস ছিল। ইহার পূর্বের অবস্থা আমরা দেখিয়াছি। এখন অবস্থা অন্যরূপ ও সর্ব বিষয়ে উন্নত। স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে, যখন প্রিন্স অব ওয়েলস রূপে কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার সম্মানার্থে 'My Awful Dad' নামক

১. কিড স্ট্রীটের বর্তমান নাম ডঃ মহম্মদ ইশাক রোড।

২. 'বর্তমান মিউনিসিপ্যাল বাজার' এখন 'নিউ মার্কেট' নামে পরিচিত। 'গ্র্যাণ্ড-অপেরা-হাউস' এখন অস্তিত্বহীন, বর্তমানে সেই স্থানে 'নিউ এম্পায়ার' অবস্থিত।

একখানি নাটিকা এই অপেরা-হাউসে অভিনীত হয়। সেদিন এত ভিড় হয় যে অধ্যক্ষেরা বসিবার আসনের মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। ছয় জনের বসিবার উপরের বক্সের দাম হইয়াছিল একহাজার টাকা। নীচের বক্স (ছয় জনের বসিবার) পাঁচশত টাকা। স্টল পঞ্চাশ টাকা।

ধর্মতলা স্ট্রীট[১]

ধর্মতলা স্ট্রীট এই নামকরণ কেন হইল, তদ্বিষয়ে দুইটি মত প্রচলিত আছে। এখন ধর্মতলায় যে মসজিদ আছে, তাহার পার্শ্বেই কুক কোম্পানির ঘোড়ার আস্তাবল বাটির অধিকৃত জমিতে, অতি পুরাকালে আর একটি মসজিদ ছিল। অনেকের মতে, এই মসজিদ ও তৎসংলগ্ন দরগা হইতে 'ধর্মতলা' নামকরণ হইয়াছে। সে মসজিদ এখন আর নাই। ইহার পার্শ্বের বর্তমান মসজিদটি টিপু সুলতানের বংশধর প্রিন্স গোলাম মহম্মদ কর্তৃক ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। দ্বিতীয় মতের প্রচারক ডাঃ হর্ণেল। ইনি বলেন, জানবাজারে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের যে আড্ডা ছিল, তাহা হইতেই 'ধর্মতলা' নামকরণ হইয়াছে। আগে এই ধর্মতলা স্ট্রীটের দুইধারে বড় বড় খানা ছিল পথটিও পাকা হয় নাই। ওয়ারেন হেস্টিংসের বড়-জমাদার জাফরের অনেক জমিজমা এই ধর্মতলায় ছিল। ধর্মতলায় শীলবাবুদের একটি বাজার ছিল। আর একটি বাজার তাঁহাদের দখলের বহুপূর্বে অর্থাৎ ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই স্থানে ছিল বলিয়া শুনা যায়। সে বাজারের নাম ছিল মেম্বাপীরের বাজার। ধর্মতলার হগ সাহেবের বাজার প্রতিষ্ঠার পর পুরাতন বাজারের প্রতিপত্তি কমিয়া যায়।

এই ধর্মতলার উত্তরদিক দিয়া একটি ছোট খাল চাঁদপাল-ঘাট হইতে বেলিয়াঘাটা সল্ট লেক বা ধাপা পর্যন্ত পুরাকালে প্রবাহিত ছিল। বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ক্রীক রোর মধ্য দিয়া সেই খালটি হেস্টিংস স্ট্রীটে চলিয়া গিয়াছিল। খালটি খুব প্রশস্ত ছিল ও ইহাতে বড় বড় মালের নৌকা যাতায়াত করিত। বর্তমান ক্রীক রোর নিকটস্থ কোন স্থানে এই খালের উপর একখানি জাহাজ ও কতকগুলি ডিঙ্গি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই স্থানের নাম 'ডিঙ্গাভাঙ্গা' হইয়াছে। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের মহাঝড়ে এই জাহাজখানি গঙ্গাগর্ভ হইতে বিতাড়িত হইয়া এইখানে উপস্থিত হয়, ও তৎপরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। হউইট সাহেবের অতি পুরাকালে লিখিত ইংলণ্ডের ইতিহাসে 'ভারতে ইংরাজ-বাণিজ্য ও কলিকাতা-সেটেলমেণ্ট' প্রস্তাবে এই খালের একটি নক্‌সা দেওয়া আছে। তাহা হইতে প্রমাণ হয়, পূর্বোল্লিখিত এই খালটি কলভিন ঘাট বা কাঁচাগুড়ি ঘাট হইতে আরম্ভ হইয়া হেস্টিংস স্ট্রীটের অধিকৃত স্থান দিয়া পুরাতন সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্ববাহিনী হইয়া (এই পুরাতন সমাধিক্ষেত্র বর্তমান কালের সেণ্ট জন গির্জার পার্শ্বস্থ ভূমি) বরাবর ধর্মতলার দিকে চলিয়া গিয়াছিল। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে উইলসের ম্যাপে খালের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই ম্যাপে দেখা যায়, বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীট ও কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের সন্ধিস্থলে এই খালের উপর একটি পুল ছিল। অর্মিও এই খালের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জলের যে ট্যাঙ্ক আছে, তাহা এই খালের গর্ভের উপর নির্মিত। আগে এই স্থান ডিঙ্গাভাঙ্গা নামেই পরিচিত ছিল। পরবর্তী কালে 'ক্রীক রো' 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার' ইত্যাদি বিবিধ নামকরণ হইয়াছে। এই খাল বুজাইয়া জমি ভরাট করা পূর্বোক্ত 'লটারি-কমিটির' দ্বারাই হইয়াছিল। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দের কলিকাতা গেজেট হইতে জানা যায়, পুরাকালে এই সমতল ক্ষেত্র 'ধর্মতলা স্কোয়ার' বলিয়া পরিচিত ছিল। তখনও ইহার নাম 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার' হয় নাই।[২]

বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট

ভারতের প্রসিদ্ধ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের নামে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। পুরাকালে এই স্থান 'কসাইটোলা' নামে পরিচিত ছিল। কসাই শ্রেণীর নীচ জাতীয় লোক এই-

১. ধর্মতলা স্ট্রীটের বর্তমান নাম লেনিন সরণি।

২. ধর্মতলা স্কোয়ার পরবর্তীকালে ওয়েলিংটন স্কোয়ার নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে ইহা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নামে পরিচিত।

স্থানে বাস করিত বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। চিৎপুর হইতে বরাবর একটি জঙ্গলময় বন-পথ বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের উপর দিয়া আসিয়া ধর্মতলায় মিশিয়াছিল ও তাহা চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া কালীঘাটে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাই সেকালের 'কালীঘাট-যাত্রীর' পুরাতন পথ। পলাশী-যুদ্ধের বৎসরেও এই সমস্ত স্থান জঙ্গলপূর্ণ ছিল। কারণ পুরাতন নক্সাসমূহে, বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের পূর্বদিকের স্থানগুলি কেবল বৃক্ষ ও ঝোপ দ্বারা চিহ্নিত দেখা যায়। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের এক বিবরণী হইতে জানা যায়, বৃষ্টির ফলে অত্যন্ত কাদা হইত বলিয়া এই পথটি অতি দুর্গম ছিল। ১৭৮৪ হইতে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই কসাইটোলা পল্লীতে অনেক ফিরিঙ্গি ও ইংরাজ-ব্যবসায়ী দোকান খুলিয়া কারবার আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই পল্লীতে সেকালের 'ট্রনহোমের ট্যাভার্ণ', জন পায়ারের আণ্ডার-টেকারের কারখানা, গাড়িওয়ালা মিঃ অলিফ্যাণ্টের ইউনিয়ান টাভার্ণ, মিঃ মেকিনানের ইংরাজি স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। আজকাল যে বাড়িতে লোয়েলীন কোং'র কার্যালয়, সেই বাড়িতে কয়েক বৎসরের জন্য অতি পুরাকালে অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট-হাউস স্থাপিত হইয়াছিল। এখনও এই বাড়ির মধ্যে সেকালের থ্রোনরুম ও কাউন্সিল-চেম্বাররূপে ব্যবহৃত, পুরাকালের কামরাগুলি বর্তমান।

এই পথের আশেপাশের পল্লীতে যে সমস্ত গলিগুলি আজও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের নামের কোন পরিবর্তন হয় নাই। সেই পুরাকালের নামই আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ, গ্র্যাণ্টস্ লেন, মেরিডিথ্স লেন, ওয়েস্টন স্ট্রীট, জিগ্‌জ্যাগ্ লেন, ইমামবাড়ি লেন, স্টারকিন্স লেন, চাঁদনী চক, ম্যাঙ্গো লেন, ডেকার্স লেন, ক্রুকেড্ লেন, ফ্যান্সি লেন, লার্কিন্স লেন প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কেবলমাত্র সেকালের 'রাণীমুদী গলির' নামটি ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে পরিবর্তিত হইয়াছে।

গ্র্যাণ্টস্ লেন

গ্র্যাণ্টস লেনটি অতি পুরাতন। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট হইতে এই গলি আরম্ভ হইয়াছে। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দের ম্যাপ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মাত্র কয়েক ঘর ইংরাজ এই গলির মধ্যে প্রথম বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চার্লস গ্র্যাণ্টের নামানুসারে এই গলির নামকরণ হইয়াছে। এই গ্র্যাণ্ট সাহেব কোম্পানির অধীনে একজন সিভিলিয়ান বা রাইটার ছিলেন। তিনি একজন খাঁটি খ্রীস্টান ছিলেন। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে তিনি কোম্পানির কার্য হইতে অবসর লয়েন। ওয়ারেন হেস্টিংসের গবর্ণর হইবার পূর্বে তিনি কোম্পানির কার্যে প্রবেশ করেন। ভবিষ্যতে বিলাতে গিয়া ইনি প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডাইরেক্টার ও পরে চেয়ারম্যান পর্যন্ত হইয়াছিলেন। (১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ) মিশন রোর পুরাতন গির্জা, যাহা পাদরী জন কারনাণ্ডারের স্থাপিত—সেই ভজনালয়েই তিনি 'গির্জা' করিতেন। এই গির্জা কারনাণ্ডারের নিজের সম্পত্তি। পাদরী সাহেবের ব্যক্তিগত দেনার দায়ে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে এই গির্জা আদালতের হুকুমে সীল করা হয়। কিন্তু গ্র্যাণ্ট সাহেব দশ হাজার টাকা দিয়া গির্জাটি নিজের দখলে আনেন। এখনও এই গির্জার মধ্যে তাঁহার নামে একটি ট্যাবলেট বা স্মৃতিফলক বর্তমান। ৭৮ বৎসর বয়সে লণ্ডনে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উপনিবেশসমূহের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে ইনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

ওয়েস্টন স্ট্রীট

আজকালকার ওয়েস্টন স্ট্রীট সকলেরই পরিচিত। এই পথ বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া কপালিটোলা পল্লীতে মিশিয়াছে। চার্লস ওয়েস্টনের নামে এই গলির নামকরণ হইয়াছিল। ওয়েস্টন সেকালের কলিকাতার একজন নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন। লালবাজারের সন্নিহিত টিরাটাবাজারের একটি বাড়িতে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সেকালের মেয়রকোর্টের রেকর্ডার বা সেরেস্তাদার ছিলেন। নন্দকুমারের মোকদ্দমায় এই ওয়েস্টন সাহেব একজন জুরিরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

দক্ষিণ পার্ক স্ট্রীট গোরস্থানে ইহাঁর সমাধি হয়। ৭৮ বৎসর বয়সে সেকালের এই নামজাদা দান-শীল ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ওয়েস্টন সাহেব সেকালের কলিকাতার একজন বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তিনি দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, সকলকেই সমানভাবে অর্থ বিতরণ করিতেন। জীবনের প্রারম্ভে তিনি ইতিহাস-বিখ্যাত হলওয়েল সাহেবের অধীনে চিকিৎসকের শিক্ষানবিশি করিয়াছিলেন। হলওয়েল সাহেব তাঁহাকে একবার বিলাতে লইয়া যান। হলওয়েল ভবিষ্যতে সিভিলিয়ান রূপে কোম্পানির অধীনে কার্যে নিযুক্ত হইলে ওয়েস্টনও ডাক্তারি ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন। সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের সময় ওয়েস্টন দুর্গ-মধ্যে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রভু হলওয়েলের মালামাল নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দুর্গাধিকারের আগের দিনে তিনি গোপনে দুর্গের বাহিরে চলিয়া যান। এজন্য তিনি অন্ধকূপ-হত্যা ব্যাপার হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। ওয়েস্টন তাঁহার প্রভু হলওয়েলের মালামাল লইয়া ফলতায় না গিয়া বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া চুঁচুড়ার ডাচ্‌দিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। হলওয়েল এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার সময় ওয়েস্টনকে দুই হাজার টাকা পুরস্কার এবং আরও পাঁচ হাজার টাকা ঋণ স্বরূপে দেন। এই টাকা মূলধন করিয়া নিজের প্রতিভা ও বুদ্ধিবলে ওয়েস্টন সাহেব এক এজেন্সির কারবার খোলেন। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের লটারিতে টেরিটি বাজার বিক্রয় হইয়া যায়। ওয়েস্টনের ভাগ্যে এই বাজার পড়ে। এই বাজারের আয় হইতে তিনি জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। আর হলওয়েল প্রদত্ত মূলধন সুদে খাটাইয়া, যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি করিয়া তাহা দাতব্য-কার্যে ব্যয় করিতেন। সেন্ট জন গির্জায় এই দয়ালু ওয়েস্টন সাহেবের একখানি তৈলচিত্র আজও সুরক্ষিত। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ওয়েস্টন সাহেব তাঁহার চুঁচুড়ার বাগানবাটিতে গিয়া প্রতি রবিবারে এদেশীয় দরিদ্রদের মধ্যে অর্থাদি বিতরণ করিতেন।

এই ওয়েস্টন স্ট্রীট বর্তমানে ফিরিঙ্গি কোয়ার্টার। বর্তমান ওয়েস্টন স্ট্রীটের প্রান্তভাগে কপালিটোলার এলাকায় বগুড়ার নবাব আবদস সোভান চৌধুরী সাহেবের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বর্তমান। এই নবাব-প্রাসাদের পার্শ্বে, ধনবাড়ির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ও বঙ্গদেশের লাট-কাউন্সি-লের অন্যতম সদস্য, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী সাহেবের প্রাসাদতুল্য বাটি। ইহাঁরা বর্তমান শিক্ষিত মুসলমান সমাজের নেতা ও অধিনায়ক। নওয়াব আলি সাহেব একজন বঙ্গসাহিত্য-সেবী। ইহাঁর প্রণীত কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ মুসলমান সমাজে বিশেষ সমাদৃত।

এস্‌প্লানেড রো

লাট-সাহেবের বাড়ির অর্থাৎ বর্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকট যে প্রশস্ত পথ সরাসর ধর্মতলায় আসিয়া মিশিয়াছে, তাহা 'এস্‌প্লানেড রো' নামে পরিচিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এই পথ বর্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস-কম্পাউণ্ডের উপর দিয়া বরাবর ইডেন গার্ডেন ও চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লির সময়ে বর্তমান লাট-প্রাসাদ নির্মিত হয়। এখন এই লাট-প্রাসাদ এস্‌প্লানেড রোর দীর্ঘতা ও প্রশস্তভাব কমাইয়া দিয়াছে। হেস্টিংসের আমলে ইডেন গার্ডেন ও বর্তমান লাট-প্রাসাদের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। এজন্য এই এস্‌প্লানেড পথটি চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত সরাসরভাবে বিস্তৃত ছিল। জনপ্রবাদ, ওয়ারেন হেস্টিংস ৪নং এস্‌প্লানেড রোডের একটি বাটিতে থাকিতেন। ইহাই তাঁহার কলিকাতায় কাছারি-বাটি ছিল। ব্যারনেস্‌ ইম্‌হফ্‌কে বিবাহ করিবার পর হেস্টিংস সাহেব বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীটের বাড়িতে বসবাস আরম্ভ করেন। পূর্বে বলিয়াছি, এই বাড়িটি এখন সুপ্রসিদ্ধ বার্ন-কোম্পানির অফিস। লর্ড কার্জন ওয়ারেন হেস্টিংসের অধিকৃত পুরাকালের এই বাড়ির গায়ে একখানি স্মৃতিফলক বা ট্যাবলেট মারিয়া দিয়াছেন।

ডেকার্স লেন

এই গলিটি এসপ্লানেড রো হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর ওয়াটারলু স্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। এই পথটি কলিকাতার মধ্যে অতি প্রাচীন। পি, এম, ডেকার্স সাহেব ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ ওয়ারেন

হেস্টিংসের আমলে কলিকাতার কলেক্টর ছিলেন। পরে তিনি কাউন্সিলের মেম্বরও হন। কোম্পানির জমিদারি-লাভের পর, দিনকতক ইনি হলওয়েলের মত 'জমিদারের' কাজও করিয়াছিলেন। নবাব কর্তৃক কলিকাতা দুর্গ-অবরোধের সময়ে, এই ডেকার্স সাহেব ২০ টাকা মাসিক বেতনের একজন 'রাইটার' ছিলেন। ইনিই কলিকাতার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট বা গবর্ণর ড্রেকের নিকট সর্বপ্রথমে ভলাণ্টিয়ার-সৈন্যদল সংগঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন।

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট

এই রাস্তাটির এক প্রান্তে লাট-প্রাসাদ ও অপর প্রান্তে ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালদীঘি। বর্তমান সেণ্ট এন্‌ড্রু (ঘড়িওয়ালা গির্জা) যেখানে আছে, সেই স্থানে পুরাতন কোর্ট-হাউস ছিল। এই কোর্ট-হাউস হইতেই পথটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে এই পথটি বর্তমান মিশন রো পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে এই রাস্তাটির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। আগে এই পথটি গির্জার কোল হইতে আরম্ভ হইয়া বর্তমান রেড্ রোডের স্থান অধিকার করিয়া, গড়ের মাঠের মধ্য দিয়া অতীতকালের 'সরম্যান্‌স-ব্রিজ' এবং বর্তমানকালের খিদিরপুরের পোল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেকালের দীর্ঘ পথটি এখন নানাস্থানে নানাবিধ নামে বিভক্ত হইয়াছে। আজকাল পেলিটি-কোং'র পার্শ্বে যে বাড়িটি এজরা-ম্যান্‌সন্‌স বলিয়া পরিচিত, সেই স্থানে ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য, জেনারেল ক্লেভারিংএর অস্থায়ী আবাস-বাটি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ লং সাহেব এইরূপ একটা অনুমান করেন। জেনারেল ক্লেভারিং কলি-কাতায় মোটে তিনবৎসর ছিলেন। ৮নং মিশন রোর বাড়িটি, এখন যাহা টমাস কোং'র কার্যালয়, সেই বাড়িতে জেনারেল সাহেবের মৃত্যু হয়। সম্ভবত পূর্বোক্ত ওল্ড কোর্ট হাউসের বাটিতে তিনি অল্পদিনই বাস করিয়াছিলেন। এখানে ইতিপূর্বে যে পুরাতন বাটিটি বর্তমান ছিল, এবং যাহা ভাঙ্গিয়া এখন 'এজ্‌রা বিলডিংস্‌' নামক সুবৃহৎ নূতন বাটি নির্মিত হইয়াছে, সেই পুরাতন বাটিতে মিসেস্ লিচ্ ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে চারি শত লোক বসিবার উপযুক্ত এক অস্থায়ী থিয়েটার নির্মাণ করেন। ইহার পরই 'সাঁ সুশী' থিয়েটার, বর্তমান সেণ্ট জেভিয়ার কলেজবাটিতে পার্ক-স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শেষোক্ত থিয়েটারে অভিনয় কালে পরিচ্ছদে আগুন লাগায় পরমা সুন্দরী মিস্ লিচ্ অকালে পরলোকে প্রস্থান করেন।

লারকিন্স লেন

ওল্ড কোর্ট-হাউস হইতে এই ক্ষুদ্র গলিটি আরম্ভ হইয়া ওয়েলেসলি প্লেসে মিশিয়াছে। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে উডের ম্যাপেও এই লেনটি বর্তমান ছিল। উইলিয়াম লারকিন্স সাহেবের নামে এই গলির নামকরণ হয়। এই লারকিন্স সাহেব ওয়ারেন হেস্টিংসের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কয়েক বৎসরের জন্য তিনি কোম্পানির অধীনে অ্যাক্যাউণ্টাণ্ট-জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশীয় রাজাদের নিকট যে অর্থ নজরানা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য পার্লামেণ্টে তাঁহার মহা-বিচারের সময় লারকিন্স সাহেব বিলাতে গিয়াছিলেন।

ফ্যান্সি লেন

এই গলিটি ওয়েলেস্‌লি-প্লেসের এক অংশ হইতে আরম্ভ হইয়া, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে গিয়া পড়িয়াছে। আর্চডিকন হাইডের মতে 'ফ্যান্সি' কথাটি 'ফাঁসি' শব্দের সহজ অপভ্রংশ। পুরাকালের কলিকাতায় সম্ভবত জোব চার্নকের পরের আমলে এই স্থানের সান্নিধ্যে একটি ফাঁসি-মঞ্চ ছিল। ইহার নিকট দিয়া একটি খাল বরাবর পশ্চিমবাহিনী হইয়া গঙ্গার সহিত মিশিয়াছিল। ইহাই হেস্টিংস স্ট্রীটের সেই পুরাতন ক্রীক বা খাল।

কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট

এই পথটি বর্তমান পাথুরিয়া-গির্জা বা সেণ্ট জন ভজনাগারের পার্শ্ব দিয়া বরাবর হেস্টিংস স্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। এইখানে বহুকাল পূর্বে একটি 'কাউন্সিল-হাউস' বা মন্ত্রণাগৃহ ছিল। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে এই পুরাতন মন্ত্রণাসভা-গৃহটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। পুরাকালে এই কাউন্সিল হাউস

স্ট্রীট, সরাসর ময়দানের মধ্যে গিয়া পূর্বোক্ত এসপ্লানেড-রোডের সহিত মিশিয়াছিল। এখন এই পথের কিয়দংশ 'গবর্ণমেণ্ট প্লেস ওয়েস্ট' বলিয়া পরিচিত। যে বাড়িতে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে কাউন্সিল হাউস বা কোম্পানির মন্ত্রণাগৃহে স্থাপিত হয়, সেই বাড়িটি, আগে কোর্ট্ নামক একজন ইংরাজের সম্পত্তি ছিল। কোম্পানি, মন্ত্রণাগৃহরূপে ব্যবহার করিবার জন্য, কোর্ট সাহেবের নিকট হইতে এই বাটি কিনিয়া লয়েন। এই কোর্ট সাহেব কোম্পানির-আমলের একজন 'সিনিয়ার-মার্চেণ্ট' ছিলেন ও অন্ধকূপ হত্যাকাণ্ডে মৃত্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া হলওয়েলের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মুরশিদাবাদে প্রেরিত হন। গঙ্গা নদীতে ডুবিয়া গিয়া ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে এই কোর্ট-সাহেবের অপমৃত্যু ঘটে।

হেস্টিংস স্ট্রীট[১]

হেস্টিংস স্ট্রীট সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে অনেক কথা বলিয়াছি। একটি খাল বুজাইয়া বর্তমান পথটি নির্মিত হয়। নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের সময় বর্তমান সেণ্ট জন গির্জার নিকট এই হেস্টিংস স্ট্রীটের পূর্বপ্রান্তে এক তোপখানা বা ব্যাটারি নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমান বার্ন কোম্পানির বাড়িটিই গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আবাস বাটি ছিল। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে হেস্টিংস ব্যারনেস ইমহফ্‌কে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি এই বাটিতেই বাস করিয়াছিলেন। পুরাকালের কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়, যে, গবর্ণর হেস্টিংস পদব্রজে গির্জায় যাইতেন। কোন কোন মতে এই গির্জাটি বর্তমান সেণ্ট জন গির্জা। গির্জার অধিকৃত স্থান মহারাজ নবকৃষ্ণের সম্পত্তি। তিনি এই গির্জা নির্মাণের প্রয়োজনীয় সমস্ত জমি গির্জা-নির্মাণ-কমিটির হস্তে দান করেন। এই সেণ্ট জন গির্জা নির্মাণের প্রধান উদ্যোগী গবর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস।

ওল্ড পোস্টঅফিস স্ট্রীট

চার্চ লেন ও হেস্টিংস স্ট্রীটের সংযোগস্থল হইতে ওল্ড পোস্টঅফিস স্ট্রীট আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমান হাইকোর্টের নিকটে সেকালের পোস্টাফিস বা বড় ডাকঘর ছিল। আগে এই স্থানে অনেক ইংরাজের বসবাস ছিল। হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ইহা উকিল ও অ্যাটর্ণি-পাড়ায় পরিণত হইয়াছে। সেকালের পুরাতন বাড়িগুলি এখন ছায়াবাজির দৃশ্যের ন্যায় হওয়ায় তাহাদের অধিকৃত স্থানে প্রাসাদতুল্য ত্রিতল চতুস্তল নূতন বাটিসমূহ নির্মিত হইতেছে। ওল্ড পোস্টঅফিস স্ট্রীট পার হইয়া গেলেই সেকালের এসপ্লানেডের বড় রাস্তা। ইহা 'চাঁদপাল ঘাট' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজকাল যে স্থানে কলিকাতা মহানগরীর টাউনহল বর্তমান ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সেই স্থানে সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম জজ হাইড সাহেবের আবাস-স্থান ছিল। জনশ্রুতি এই, জজ হাইড এই বাড়িটির জন্য মাসিক বারশত টাকা ভাড়া দিতেন। বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ দিনই এই বাটি উৎসব-সমাকুল হইয়া থাকিত। জজ সাহেবের পত্নী সেকালের কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও ব্যারিস্টারগণকে প্রত্যেক 'টার্মের' পূর্বে একটি করিয়া ভোজ দিতেন। বর্তমান হাইকোর্টের অধিকৃত স্থানে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে নূতন কোর্ট-হাউস স্থাপিত হয়। ব্যারিস্টারেরা জজ হাইডের বাড়ি হইতে এই 'টার্ম' আরম্ভের দিনে প্রাতরাশাদি করিয়া দলবদ্ধ হইয়া আদালত গৃহে যাত্রা করিতেন। এখনকার দিনে এরূপ ব্যাপার অতি দুর্লভ!

স্ট্র্যাণ্ড রোড

এই স্ট্র্যাণ্ড রোড বর্তমান কলিকাতার এক বিশেষ গৌরবের জিনিস। প্রিন্‌সেপস্ ঘাট হইতে আরম্ভ হইয়া হাটখোলা পর্যন্ত এই পথটির বিস্তৃতি। ইহার পার্শ্বেই নন্দনকানন সদৃশ 'ইডেন উদ্যান।' ইহার একদিকে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ও বহুবিধ সওদাগরি ও রাজকীয় কার্যালয় এবং অপরদিকে পোর্ট কমিশনারদের জেটি। এখন এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের দুই পার্শ্ব বড় বড় প্রাসাদতুল্য অট্টা-

১. হেস্টিংস স্ট্রীটের বর্তমান নাম কিরণশঙ্কর রায় রোড।

লিকায় পরিপূর্ণ। কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে সময়ে এই স্ট্র্যাণ্ড রোড গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ১৮২৩ খৃীস্টাব্দে ইহার পত্তন আরম্ভ হয়। পূর্বো-ল্লিখিত লটারি কমিটির সহায়তায় এই সুদীর্ঘ রাজপথটি নির্মিত হইয়াছিল।

এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর ইডেন গার্ডেনের সান্নিধ্যে 'বাবু ঘাট'। জানবাজারের সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণির স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাস এই ঘাটটি নির্মাণ করিয়া দেন। তৎকালের গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের নামে এই ঘাটটি উৎসর্গীকৃত হয়।

ইডেন গার্ডেন অতি পুরাকালে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল। লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসন কালে এই উদ্যানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নী মিসেস ইডেন[১] ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরে এই সাধারণ ভ্রমণোদ্যানের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে লোহিত কঙ্করময় ভ্রমণপথ, শ্যামল দূর্বাক্ষেত্র, ফলপূর্ণ বৃক্ষাদি, কৃত্রিম হ্রদ থাকায়, ইহা এক শোভনীয় রমণো-দ্যানে পরিণত হইয়াছে। ইহা এখন ইংরাজ, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর আরাম-উদ্যান। সন্ধ্যার পর এই উদ্যানের এক অংশ বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সেই সময়ে সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য অসংখ্য ইংরাজ নরনারী ও এদেশীয় ভদ্রজনসঙ্ঘ এই উদ্যানে সমবেত হন। ইহার মধ্যে একটি 'ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ড' আছে। প্রতিদিন কেল্লার ও ভলাণ্টিয়ার-ব্যাণ্ডসমূহ মধুর বাদ্য-নিক্বণে দিকদিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলে। মোটর-ফিটন, ভিক্টোরিয়া-ব্রুহাম প্রভৃতি অসংখ্য যানসমূহে এই উদ্যান পার্শ্ববর্তী রাজপথ উৎসব-দৃশ্যময় হইয়া পড়ে।

এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপরই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেকালের 'চাঁদপাল ঘাট' বর্তমান ছিল। কটন ও লং সাহেবদ্বয় বলেন, "এই ঘাটের সান্নিধ্যে চন্দ্রনাথ পাল বলিয়া এক মুদী দোকান করিত। তখন ইহার চারি পাশ গভীর বন-জঙ্গল সমাবৃত। যে সকল পান্থ বা নৌকাযাত্রী এই স্থানে নামিত, তাহারা চন্দ্র পালের দোকান হইতে আহার্যাদি সংগ্রহ করিত। নবাব যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে চাঁদপাল ঘাটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৭৭৪ খৃীঃ অব্দে ইহা যে নিশ্চয়ই বর্তমান ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সেকালের যে সমস্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজ এদেশে কোম্পানি-বাহাদুরের চাকুরি করিতে আসিতেন, তাঁহারা এই ঘাটেই অবতরণ করিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যর ফিলিপ্, ফ্রান্সিস এই ঘাটের সিঁড়িগুলির উপর দাঁড়াইয়া ফোর্ট উইলিয়াম হইতে তাঁহার সম্মানার্থে যে কয়েকটি তোপধ্বনি হইতেছিল, তাহার এক একটি করিয়া গুণিয়াছিলেন। গবর্ণর-জেনারেলের প্রাপ্যসম্মান-তোপ ১৯টি। কিন্তু ফ্রান্সিস তাঁহার মন্ত্রণা-সভার সদস্য হইয়া যখন ১৭টি তোপ সম্মানার্থে পাইলেন, তখনই তাঁহার রোষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজেকে বড়ই অপমানিত বোধ করিলেন। এই অপমান-স্মৃতি তাঁহার মনে গবর্ণর হেস্টিংসের উপর বিরাগ উৎপাদন করিল। ফ্রান্সিস যতদিন এদেশে ছিলেন, ততদিন সকল কাজেই হেস্টিংসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বেভারিজের মত এই, "যদি ফ্রান্সিস ও হেস্টিংসের এইরূপ ভীষণ মনান্তর না ঘটিত, তাহা হইলে হয়ত নন্দকুমারের নামে জাল মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত হইত না।" ফ্রান্সিসকে সহায়রূপে পাইয়াই মহারাজ নন্দকুমার কাউন্সিলের নিকট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ আনয়ন করেন। ইহার অবান্তর পরিণাম, নন্দকুমারের নামে চক্রান্ত ও জাল-মোকদ্দমা। এই ঘাটে সুপ্রীমকোর্টের প্রথম চিফ-জস্টিস স্যর ইলাইজা ইম্পি ও তাঁহার সহযোগিগণও অবতরণ করিয়া-ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী চিরকালই শুধু পায়ে থাকে। কাউন্সিলের মেম্বর ও সুপ্রীমকোর্টের জজদিগকে দেখিবার জন্য এই সময়ে চাঁদপাল ঘাটে এদেশীয়দের একটি মহা জনতা হয়। এই জনতার মধ্যে অধিকাংশ লোকই নগ্নগাত্র ও নগ্নপদ। ইহাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইম্পি তাঁহার সহযোগীদের বলিয়াছিলেন, "দেখ ভাই! আমরা ঠিক সময়েই এদেশে আসিয়াছি। এদেশের

১. লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নী এমিলি ইডেন। ইনি ছিলেন চিরকুমারী। সুতরাং মিসেস ইডেন পরিচয় ভ্রমাত্মক।

লোকের পায়ে জুতো নাই—তাহারা নগ্নগাত্র! কি ভয়ানক অত্যাচার! দেখিতেছি, ঠিক সময়েই এদেশে উচ্চ-আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ছয়মাস এখানে কাজ করিবার পর আমি এই সব লোককে নিশ্চয়ই জুতা ও স্টকিং পরাইতে বাধ্য করিব। ইহাদের এ দুর্দশা দূর করিব।"[১]

চার্চ লেন

পাথুরিয়া গির্জা বা সেণ্ট জন চ্যাপেলের[২] পার্শ্ব দিয়া, যে পথটি ছোট আদালতের সম্মুখে আসিয়া মিশিয়াছে, তাহা চার্চ লেন নামে অভিহিত। সেণ্ট জন গির্জা ইহার পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া এই গলিটির 'চার্চ লেন' নামকরণ হইয়াছে। ১৭৮৪ খৃীস্টাব্দে পাথুরিয়া গির্জা প্রস্তুত হয়। এই পাথুরিয়া গির্জার সংলগ্ন ভূভাগটি যাহা এখন গির্জার কম্পাউণ্ড বা সীমানাভুক্ত, তাহার মধ্যে অতি পুরাকালে একটি প্রাচীন সমাধিভূমি বহুদিন ধরিয়া বর্তমান ছিল। এই সমাধিক্ষেত্র-গর্ভে প্রাচীন কলিকাতার অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইংরাজের দেহাবশেষ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। ১৭৫৩ খৃীস্টাব্দের উইলস্ সাহেবের ম্যাপে এই পথটির অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তার শেষ মুখ যাহা বর্তমানে হেস্টিংস স্ট্রীটের সহিত সম্মিলিত, সেইস্থানে নবাবের কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে একটি পুল ছিল। হেস্টিংস স্ট্রীটের অধিকৃত স্থান দিয়া যে ক্রীক বা খালটি গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল, এই পুল সেই খালের উপর ছিল। ১৭৮৪ খৃীস্টাব্দে উড্ সাহেব কলিকাতার যে নক্সা প্রস্তুত করেন, তাহাতে 'চার্চ লেন' -এর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথের চার ও পাঁচ নম্বরের বাড়ি, যাহা সেকালে গঙ্গাতীরে ছিল, সেই বাড়ি দুটিতে পুরাতন টাকশাল-গৃহ ছিল। এখন সেই বাড়ি ভাঙ্গিয়া প্রাসাদতুল্য বর্তমান স্ট্যাম্প ও স্টেসনারি অফিস নির্মিত হইয়াছে।[৩]

হেয়ার স্ট্রীট

হেয়ার স্ট্রীটের নাম ইংরাজি বাঙ্গলা সংবাদপত্রের জন্য আজকাল খুব জাহির হইয়াছে। বাংলা-সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা প্রায়ই আমাদের 'হেয়ার স্ট্রীটের সহযোগী' বলিয়া অবান্তর ভাবে ইংলিসম্যানকে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধাদি লেখেন। এই হেয়ার স্ট্রীটের পত্তন লটারি কমিটির চেষ্টাতেই হইয়াছিল। বাঙ্গালীর অমায়িক বন্ধু এদেশে বঙ্গবাসীর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক মনস্বী ডেভিড্ হেয়ারের নামে এই পথটির নামকরণ হইয়াছে। এই পথ হেয়ারস্কুল আর প্রেসিডেন্সি কলেজের ময়দানে তাঁহার শ্বেত প্রস্তরমূর্তি ও গোলদীঘিতে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ ডেভিড্ হেয়ারের পবিত্র স্মৃতি আজও জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। এই হেয়ার স্ট্রীটেই ইংরাজের মুখপত্র ইংলিসম্যান পত্রিকার অফিস।[৪] এই হেয়ার স্ট্রীটেই ছোট-আদালত, র‍্যালি ব্রাদার্সের প্রাসাদতুল্য অফিস, ইম্পিরিয়্যাল-লাইব্রেরি[৫] বা সাবেক মেট্‌কাফ্-হল অবস্থিত। বর্তমান ছোট-আদালতের প্রবেশ পথ যেখানে, অর্থাৎ যে অংশটি বাঁকশাল স্ট্রীটের দিকে, অতি পুরাকালে সেইস্থানে আর একটি বৃহৎ বাটি ছিল। সেই বাটিতে অতীতকালের কলিকাতার সর্বময় কর্তা প্রেসিডেণ্ট বা গবর্ণর-সাহেব বাস করিতেন। প্রাচীন কলিকাতা-দুর্গের মধ্যেও গবর্ণর-সাহেবের একটি সুন্দর আবাস-বাটি ছিল। কিন্তু অনেক সময় তিনি দুর্গের মধ্যে না থাকিয়া উদ্যান-পরিবেষ্টিত এই

১. See brother! the wretched victims of tyranny! The Crown Court was not surely established before it was needed. I trust it will not have been in operation six months before we shall see all these poor creatures comfortably clothed in shoes and stockings.—H.E.A. Cotton's *Calcutta Old and New*, 1st ed. p. 324.

২. চ্যাপেল কথাটির পরিবর্তে 'চার্চ' বা গির্জা কথাটি প্রযোজ্য।

৩. বর্তমানে এই অফিস লেনিন সরণিতে অবস্থিত।

৪. 'ইংলিশম্যান'—বর্তমান 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার পূর্বসূরি।

৫. ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি প্রথমে স্থান পরিবর্তন করিয়া এসপ্লানেড অঞ্চলে আসে পরে বেলভেডিয়ারে স্থানান্তরিত হয়; নামও অবশ্য পরিবর্তিত হয় জাতীয় গ্রন্থাগার বা ন্যাশান্যাল লাইব্রেরি। এসপ্লানেডে পুরোনো লাইব্রেরি (বর্তমান জাতীয় গ্রন্থাগারের) একটি অংশ এখনও বর্তমান।

বাটিতেই বাস করিতেন। এই বাটি-সংলগ্ন বাগানটি গঙ্গার ধার হইতে বরাবর লালদীঘি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব কলিকাতা আক্রমণ করেন। ইহার পর বৎসর রবার্ট ক্লাইভ ও কর্ণেল ওয়াটসন কলিকাতা পুনরুদ্ধার করেন। সেই সময়ে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের এই বাড়িটি কোম্পানি বাহাদুরের 'মেরিন ইয়ার্ডে' পরিণত হয়।

চার্চ লেনের পূর্বে ও পুরাতন গোরস্থান অর্থাৎ সেণ্ট জন গির্জার উত্তরে হেয়ার-স্ট্রীট হইতে একটি ক্ষুদ্র গলি আরম্ভ হইয়াছে। এই গলিটির নাম 'গারস্টিন্‌স প্লেস' মেজর-জেনারেল জন গারস্টিনের নামে এই গলিটি প্রতিষ্ঠিত। এই গারস্টিন সাহেবের তত্ত্বাবধানে ও প্ল্যান অনুসারে বর্তমান টাউনহল নির্মিত হয়। গারস্টিন সাহেব এই গলির মধ্যে কতকগুলি দ্বিতল ও ত্রিতল বাড়ি নির্মাণ করিয়া ভাড়া দিয়াছিলেন।

কয়লাঘাট স্ট্রীট

ডালহৌসি স্কোয়ারের পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটি স্ট্র্যাণ্ড রোডের সহিত মিশিয়াছে। এই রাস্তার ধারেই কলিকাতার পুরাতন-কেল্লার পশ্চিম প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীর নিকটে, গঙ্গাতীরে একটি ঘাট সেই সময়ে বর্তমান ছিল। তাহার নাম ছিল 'কেল্লা ঘাট'। এই কেল্লা ঘাটের অপভ্রংশ হইতে 'কয়লাঘাট' দাঁড়াইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ঘাট হইতেই জাহাজে করিয়া পাথুরিয়া-কয়লা চালান হইত। এজন্যও কয়লাঘাট নামকরণ হইতে পারে। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে আপ্‌জনের ম্যাপে এই পথটি Tankshall টাঁকশাল স্ট্রীট নামে লিখিত হইয়াছে।

এইবার আমাদের লালদীঘির নিকট আসিতে হইবে। আজকাল লালদীঘির চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান ডালহৌসি স্কোয়ার[১] নামে পরিচিত। আগে এই স্থানটির নাম ছিল ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। ডাচ্‌ অ্যাডমিরাল স্ট্যাভোরিন্‌স্‌ ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা দেখিতে আসেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিয়াছেন, "গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে স্থানীয় অধিবাসীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য এই পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছিল। ইহার জল অতি পরিষ্কার ও পুষ্করিণীর তলদেশে কয়েকটি গুপ্ত-প্রস্রবণ থাকায় এই পুষ্করিণীর জল কখনও কমিয়া যায় না। ইহার চারিদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া। এই পুষ্করিণীতে সাধারণের স্নান করা নিষিদ্ধ।" ইংরাজাধিকারের প্রথম আমলে এই লালদীঘির সাধারণ নাম ছিল 'Green before the Fort'। সেই সময়ে গড়ের মাঠ, চৌরঙ্গী ও এসপ্লানেড ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সাহেবদের বেড়াইবার উপযুক্ত কোন স্কোয়ার বা ময়দান ছিল না। এই জন্য এই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারই তখন ইডেন গার্ডেনের কাজ করিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে এই পুষ্করিণী বৃহদায়তনে পরিণত হয়, ইহার চারিদিকে পাহাড় বা 'পাড়' বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

লালদীঘির মধ্যেই আকবরি-আমলের লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কাছারি বাড়ি এবং শ্যামরায়ের মন্দির ছিল। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের পাকা কাছারি বাড়িটিই কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক কোম্পানির সেরেস্তা রাখিবার জন্য কিনিয়া লয়েন। শ্যামরায়ের দোল উপলক্ষে এই পুষ্করিণীর জল আবীরে লাল হইয়া যাইত। এইজন্য ইহার নাম 'লালদীঘি' হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা অ্যাণ্টনি সাহেবের পিতামহ জন্‌ অ্যাণ্টনি বলিয়া একজন ফিরিঙ্গি লক্ষ্মীকান্তের কর্মচারী ছিলেন। একবার কয়েকজন ইংরাজ ফ্যাক্টর ঠাকুরবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় এই জন্‌ অ্যাণ্টনি তাহাদিগকে বাধা দেন। জোব চার্নক এই কথা শুনিয়া সেই স্থানে আসিয়া অ্যাণ্টনিকে উত্তম করিয়া চাবকাইয়া দিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ নির্মিত হয় নাই।

বর্তমান জেনারেল পোস্ট-অফিস ও লালদীঘির মধ্যে 'চার্নক প্লেস।' লর্ড কার্জন কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য এই স্থানটি 'চার্নক-প্লেস' নামে

১. 'ডালহৌসি স্কোয়ার' বর্তমানে বিনয়-বাদল-দীনেশ (সংক্ষেপে বি-বা-দী) বাগ নামে পরিচিত।

অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমান লিয়ন্স (লায়ন্স) রেঞ্জের উত্তর পশ্চিম দিকে যে বাটিতে আজকাল ফিন্‌লে-মুর কোম্পানির অফিস, সেইস্থানে কলিকাতার প্রাচীন থিয়েটার-গৃহ ছিল। এই থিয়েটার-গৃহ ১৭৭৫ হইতে ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণ কেবল শখের-অভিনয় করিতেন। এই থিয়েটারের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বল-রুম ছিল। এইজন্য এই থিয়েটার-গৃহের একটু বিশেষত্ব আছে। থিয়েটার-সংলগ্ন বল-রুমে সেকালে লাট-সাহেবদের বলনাচ প্রভৃতি হইত। গবর্ণমেণ্ট-হাউস বা লাটপ্রাসাদ তখন তৈয়ারি হয় নাই। লাট-সাহেবদের বল, স্টেট্‌-রিসেপ্‌শান্‌ ও ভোজ প্রভৃতি সবই এই থিয়েটার-গৃহেই হইত। এই সব অনুষ্ঠানের সাধারণ বিজ্ঞাপন আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেসলির সময় পর্যন্ত ইহা গবর্ণর-জেনারেলদের দরবার-গৃহরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

ইহার পরই রাইটার্স বিল্ডিংস্‌। এখনও এই সুবৃহৎ প্রাসাদ-তুল্য বাটিটি বর্তমান। পূর্বে ইহা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেকালের 'রাইটার' বা সিভিলিয়ানদের বাসের জন্য নির্মিত হইয়াছিল। তবে সে সময়ে ইহার বাহ্যিক সৌষ্ঠব এরূপ গৌরবময় ছিল না। অধুনাতনকালে, এই সুবৃহৎ বাড়িটি সম্পূর্ণ নূতনভাবে নির্মিত হইয়াছে। রাইটার্স বিল্ডিংসে ইতিপূর্বে বঙ্গদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণরদিগের সর্ববিভাগীয় কার্যালয় সংস্থাপিত ছিল। এখন ইহা বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের কার্যালয় হইয়াছে।

এই বাড়ির যে গৃহটি বঙ্গদেশীয় ছোটলাটগণের মন্ত্রণাসভারূপে ব্যবহৃত হইত, অর্থাৎ যে চূড়াময় গৃহটি বর্তমানে হলওয়েল-স্মৃতিস্তম্ভের অতি সান্নিধ্যে, পূর্বে এই স্থানাধিকার করিয়া কলিকাতার প্রথম গির্জা সেণ্ট অ্যানস্‌ চার্চ বর্তমান ছিল। ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে[১] এই গির্জা নির্মিত হয়। ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দের মহাঝড়ে ইহার সুবৃহৎ চূড়াটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন সে সময়ে দুর্গ-রক্ষার ও যুদ্ধকার্যের সুবিধার জন্য এই গির্জাটি সমভূমি করিয়া ফেলা হয়।।

বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংসের পশ্চাতের পথটির নাম 'লিয়ন্স-রেঞ্জ'। টমাস লিয়ন সাহেবের নাম হইতে এই পথটির নামকরণ হইয়াছে। ইনি পলাশী-আমলের লোক। সিরাজের আক্রমণ সময়ে পুরাতন রাইটার্স বিল্ডিংসের অস্তিত্ব ছিল না। যুদ্ধকালে গোলাগুলি চালাইবার সুবিধার জন্য এইস্থানে অন্যান্য যে সব বাড়ি ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূমি করা হয়। ক্লাইভ কর্তৃক কলিকাতার পুনরধিকারের পরও বহুদিন পর্যন্ত এই সব জমি এবং এবং ইহার পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড পতিত অবস্থায় থাকে। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে মিঃ লিয়ন এই জমিখণ্ড পাট্টা করিয়া লয়েন। এই পাট্টা এখনও কলিকাতা কলেক্টরিতে বর্তমান। লিয়ন সাহেব এই জমি পাট্টা করিয়া লইয়া ইহার উপর প্রাসাদতুল্য এক প্রকাণ্ড সৌধ নির্মাণ করেন। প্রকৃত পক্ষে এ জমিগুলি হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বারওয়েল সাহেবেরই বেনামে গৃহীত। লিয়ন সাহেব কেবল বেনামদার হইয়া তাঁহার হইয়া কাজ করিয়াছিলেন। কারণ ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানি বাহাদুর যখন তাঁহাদের অধীনস্থ জুনিয়র সিভিলিয়ান কর্মচারীদের জন্য এই বাড়িটি ভাড়া লয়েন, তখন যে দলিল প্রস্তুত হয় তাহাতে বারওয়েল সাহেবেরই নাম ছিল, লিয়নের ছিল না। কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য হেস্টিংসের পরম শত্রু ফ্রান্সিস তাঁহার ডায়ারির একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাৎসরিক ৩১৫৭২০ টাকা ভাড়ায় বারওয়েল সাহেব এই বাটিটি ভাড়া লইয়াছেন।" বহুদিন পর্যন্ত এই বাটিতে কোম্পানির সেকালের সিভিলিয়ানেরা বাস করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর স্যর অ্যাস্‌লি ইডেনের সময় এই সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য বাটির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এখনও ইহা সেইভাবেই আছে।

১. সেণ্ট অ্যানস্ গির্জার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭০৯ খ্রী.।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে সুবিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। স্বনামধন্য গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি সেকালের সিভিলিয়ানদিগকে এ দেশীয় ভাষায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য এই কলেজের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। আজকালকার লালদীঘির কোণে অর্থাৎ কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটের মোড়ে ও হংকং-সাংঘাই ব্যাঙ্কের পার্শ্বে যে বাড়িটি আছে, ইতি-পূর্বে যেখানে মের্কিঞ্জি-লায়াল কোম্পানির পুরাতন অফিস ছিল এবং পরে বেঙ্গল-নাগপুর-রেলের অফিস হয়,[১] সেই বাটিতেই সেকালের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রথম স্থাপিত হয়।

লালদীঘির অপর পারে আজকাল যেখানে নিউম্যান কোং নামধারী বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতার দোকান আছে—এইস্থানের ইতিহাসও একটু পুরাতন কালের। পলাশী-আমলে এই জমি পতিত অবস্থায় ছিল। তৎপরে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে হলওয়েলের সহকারী পূর্বোক্ত ওয়েস্টন সাহেব এই জমি পাট্টা করিয়া লয়েন। সেই পাট্টায় লিখিত আছে, "ডিহি কলিকাতার অন্তর্ভুক্ত কোম্পানি-বাহাদুরের দখলীকৃত এক বিঘা ষোল কাঠা আন্দাজ জমি ওয়েস্টন সাহেবকে নিম্নলিখিত কড়ারে পাট্টা দেওয়া হইল যে, তিনি ইহার উপর কোনরূপ এমারতাদি প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। জমিটি কেবলমাত্র কাঠের বেড়া দিয়া রাখিবেন।" ওয়েস্টন সাহেব পনর বৎসরকাল এই কড়ার পালন করিয়া ১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। তখনও এই কড়ার পূর্ববৎ বলবৎ থাকে। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে মিঃ বারেটো ইহা ক্রয় করেন। তৎপরে আরও নয় বৎসরকাল এই জমি পতিত অবস্থায় ছিল। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে, দলিলের এই অদ্ভুত কড়ারটিকে প্রত্যাহার করা হয়। তাহার পর এই জমির উপর বাড়ি নির্মিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে অ্যালপোর্ট কোং এই বাড়ি ভাড়া লয়েন। তৎপরে এই বাটিতে 'বেঙ্গল-ক্লাব' স্থাপিত হয়। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই জমি ও বাটি ৮২ হাজার টাকায় আবার বিক্রয় হয়। তৎপরে আরও দুই তিন হাত ফিরিবার পর, স্যর ওয়াল্টার ডিসুজা নামক একজন ধনী ইউরেশীয়ান এই বাটি এক লক্ষ আশি হাজার টাকায় কিনিয়া পরিশেষে সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় ইহা হস্তান্তর করেন। এই সময়ে জমির দাম প্রায় ষাট গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সর্বশেষে এই বাড়িতে নিউম্যান কোম্পানির বর্তমান কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্তমান স্ট্যাণ্ডার্ড বিল্ডিংএর পার্শ্বে ও ডালহৌসি ইনস্টিটিউটের সম্মুখের ক্ষুদ্র গলিটি ভ্যান্সিটার্ট রো নামে বিখ্যাত। হলওয়েলের পর ভ্যান্সিটার্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন। তিনি কলি-কাতা কাউন্সিলের একজন জুনিয়ার সদস্য ছিলেন। লর্ড ক্লাইভের সুপারিসে তিনি গবর্ণরি পদ পান। এই ব্যাপার লইয়া তাঁহার সহযোগীরা বিলাত পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন। ভ্যান্সিটার্টের শাসনকালে বঙ্গের শেষ নবাব মীরকাসেমের অধঃপতন ঘটে। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাটনার ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটে। বিলাতে গিয়া ভ্যান্সিটার্ট পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডাইরেক্টাররূপে নিযুক্ত হন। ভ্যান্সিটার্ট আরবী ও ফার্সী ভাষা ভাল-রূপ জানিতেন। এদেশের লোককে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন।

লালবাজার স্ট্রীট

লালবাজারের কোণে বর্তমান নর্টন-বিল্ডিংসের সম্মুখ হইতে মিশন রো পথটি আরম্ভ হইয়া ম্যাঙ্গো লেনে আসিয়া মিশিয়াছে। এখানে যে গির্জাটি আজও বর্তমান, তাহা ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে নির্মিত। জন্‌ জ্যাকরিয়া কারনাণ্ডার ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে এই গির্জা নির্মাণ করেন। ভবিষ্যতে তাঁহার দেনার দায়ে এই গির্জাই 'সীল' হইয়াছিল। গ্র্যাণ্টস্‌ লেনের পূর্বকথিত গ্র্যাণ্ট সাহেব ইহা কিনিয়া লয়েন। এই গির্জাটি কলিকাতার অতি পুরাতন গির্জা। এখন মিশন রো ও

১. বেঙ্গল-নাগপুর-রেলের অফিস বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব-রেলের (সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ে) অফিসে স্থানান্তরিত হইয়াছে এসপ্ল্যানেড ইস্ট-এ।

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের মধ্যের ভূমিখণ্ডে নিউম্যান কোং,[১] কারেন্সি অফিস, ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ কোং,[২] স্মিথ স্ট্যানিস্ট্রীট কোং প্রভৃতির যে বাড়িগুলি বর্তমান, ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে এগুলির অস্তিত্বমাত্র ছিল না। এজন্য লালদীঘির সীমা এই মিশন রো পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ সময়ে, এই স্থানে ইংরাজ ও নবাবপক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ বাধে। বর্তমান স্কচ-গির্জার সন্নিকটে মিশন রোর পার্শ্বে একটি ব্যাটারি বা তোপখানা স্থাপিত হইয়াছিল। হলওয়েল এই স্থানে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তৎপরে দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। এই মিশন রো আগে 'Rope-walk' নামে পরিচিত ছিল। লালবাজার ও মিশন রোর কোণে একটি বাড়ি ছিল, সেই বাড়িটি প্রাচীন কলিকাতার পুরাতন থিয়েটার। নবাব-সৈন্য এই থিয়েটার-গৃহটি দখল করিয়া তাহাদের আশ্রয়-কেন্দ্র করে। মিশন রোর মধ্যে ১নং ও ৮নং বাড়িটি ঐতিহাসিক বাড়ি। ১নং বাড়ি অর্থাৎ যে বাড়িটি, ঠিক ওল্ড-মিশন-চার্চের সম্মুখে, সেই স্থানে ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য জেনারেল মনসন বাস করিতেন। ৮নং বাড়ি যাহা এখন টমাস কোংর অফিস, সেই বাড়িতে হেস্টিংস-কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার জন ক্লেভারিংএর মৃত্যু হয়। মনসনের মৃত্যু হুগলীতে হইয়াছিল। পূর্বোক্ত থিয়েটার-গৃহের কয়েকখানি বাড়ির পরে— একটি বাড়িতে লেডী রাসেল বাস করিতেন। তাঁহার স্বামী স্যার ফ্রান্সিস রাসেল ১৭৩১ খৃঃ অব্দে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ অলিভার ক্রমওয়েলের কন্যা লেডী ফ্রান্সিস স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের মাতামহী ছিলেন। নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণ সময়ে লেডী রাসেল, ফলতায় পলায়ন করেন। সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দেড় শতাধিক বৎসরের মধ্যে এই স্থানগুলির যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অনেকে নিত্য এই সব পথ অতিবাহিত করিয়া, অফিস, ব্যাঙ্ক ও কলেক্টরিতে যান, কিন্তু তাঁহারা জানেন না, সেই পুরাকালে এই সমস্ত স্থান একদিন ভীষণ গোলাগুলি বর্ষণে, সমরক্ষেত্রের অংশরূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল।

ম্যাঙ্গো লেন

ম্যাঙ্গো লেন বহুদিনের। ১৭৫৩ খৃস্টাব্দে কাপ্তেন উইলস্ কলিকাতার যে নক্সা বা ম্যাপ তৈয়ারি করেন, তাহাতে এই 'ম্যাঙ্গো লেনের' নাম লিখিত ছিল। বোধ হয়, এই গলিতে পথের ধারে বা কোনস্থানে রসাল বৃক্ষের প্রাচুর্য জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ২৫নং ম্যাঙ্গো লেন, অর্থাৎ যে বাড়িতে আজকাল লায়াল-মার্শাল কোম্পানির অফিস বসিতেছে, সেই বাড়িটি পুরাকালে 'ব্যাঙ্ক' ছিল। ব্যারেটো কোং এই ব্যাঙ্কের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এখনও 'ব্যারেটোস্ লেন' দ্বারা এই ব্যারেটোর স্মৃতি সংরক্ষিত। জোসেফ্ ব্যারেটো একজন ধনী পর্টুগীজ। তিনিই এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। ১৮২৭ খৃস্টাব্দে এই ব্যাঙ্ক 'ফেইল' হয়। জোসেফ্ ব্যারেটো ইউরেশীয়ানদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ধনী ছিলেন। তিনি খুব ভালরূপ ফার্সী জানিতেন। মৃত্যুকালে তিনি অনেক টাকার সম্পত্তি ধর্মার্থে দান করিয়া যান।

ক্লাইভ স্ট্রীট[৩]

লালদীঘির পূর্বদিক ছাড়িয়া এবার আমাদিগকে ক্লাইভ স্ট্রীটে যাইতে হইবে। এই পথটি পলাশী-বিজেতা রবার্ট ক্লাইভের স্মৃতিচিহ্ন। চিরকালই এই পথের সন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া আছে। কলিকাতার মধ্যে ইহা অতি পুরাতন পথ। আজকাল যে বাটিতে রয়্যাল এক্সচেঞ্জ বর্তমান, রবার্ট ক্লাইভ প্রথমে সেই বাটিতে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এই বাটিতে বাস করেন। লর্ড কার্জন এই বাড়িটি প্রস্তরফলক দ্বারা চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। ফ্রান্সিসের আলিপুরেও একটি বাগানবাড়ি ছিল। এই বাগানবাড়ির বর্ণনা-

---

১. 'নিউম্যান কোং' এখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের নিচে অবস্থিত।
২. এই প্রতিষ্ঠানের কোনো অফিস এখন আর নাই।
৩. ক্লাইভ স্ট্রীটের বর্তমান নাম নেতাজী সুভাষ রোড।

কালে ফ্রান্সিস বার্ককে লিখিয়াছিলেন (প্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্কের পুত্র), "আলিপুরে আমার এক আবাস-বাটি আছে। সমগ্র বঙ্গদেশে সেরূপ সুন্দর বাড়ি আর নাই। আমি দেড়শত চাকর নিযুক্ত করিয়াছি। ঘোড়া গাড়ি সবই আছে। কিন্তু আমার কেমন একটা স্বভাবদোষ, যে আলিপুর হইতে কলিকাতায় গিয়া 'হন্' নামক ট্যাভার্নে ক্লারেট-মদ্য দুই চারি গ্লাস না খাইলে আমার মাথা ঠিক থাকে না।" সম্ভবত ক্লাইভ স্ট্রীটের এই বাড়িতে ফ্রান্সিস খুব কমই থাকিতেন। সেকালের কাউন্সিলের মেম্বর হইতে গবর্ণরেরা পর্যন্ত দুইটি করিয়া বাড়ি রাখিতেন। বাগান-বাড়ি সমূহ তাঁহাদের অতি প্রিয় ছিল। তাহার প্রমাণ হেস্টিংসের হেস্টিংস-হাউস ও লর্ড ক্লাইভের দমদমার বাগান-বাটি।

ফেয়ার্লি প্লেস

ফেয়ার্লি প্লেসের নাম এখন আর কাহারও অপরিচিত নহে। প্রায় সহস্রাধিক কর্মচারী এখন ফেয়ার্লি প্লেসের ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল-অফিসে[১] কাজ করেন। উইলিসন ফেয়ার্লি নামক এক সওদাগরের নাম হইতে, এই পথের নামকরণ হইয়াছে। ইনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির আমলে বর্তমান ছিলেন। ফেয়ার্লি সাহেব সেকালের গবর্ণমেণ্টের পিলখানার কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। 'হাতীর খোরাক যোগান' একটা অসম্ভব ব্যাপার হইলেও ইনি বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের সেনা-বিভাগে যে সকল হস্তী ও উষ্ট্র ছিল, তাহাদের খোরাক সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট লইয়াছিলেন। বহুবার ইনি 'গ্র্যাণ্ড-জুরির' সদস্য হইয়াছিলেন। ফেয়ার্লি গিলমার বলিয়া এক পুরাতন ইংরাজ সওদাগরি ফারমের তিনি সিনিয়ার-পার্টনার বা অংশীদার ছিলেন। এই ফেয়ার্লি প্লেসে মিঃ ক্রুটেনডেনের উদ্যান-বেষ্টিত বিস্তৃত আবাস-বাটি ছিল। নবাবের কলিকাতা অবরোধের দ্বিতীয় রাত্রে এই বাড়ি কামানের গোলায় অগ্নিদগ্ধ হইয়া ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

ক্লাইভ স্ট্রীটের একাংশ হইতে ক্লাইভঘাট স্ট্রীট আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে গঙ্গাতীরস্থ ঘাটটি পূর্বে 'ব্লাইথস্ ঘাট' বলিয়া পরিচিত ছিল। তখন গঙ্গাগর্ভ বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের স্থান অধিকার করিয়া ব্যাপ্ত ছিল। এই 'ব্লাইথস্ ঘাটের' চিহ্ন উড্ সাহেবের ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ম্যাপে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে ইহা 'ইস্মিথ ঘাটকা রাস্তা' বলিয়া এ দেশীয় লোকের নিকট পরিচিত ছিল। কাপ্তেন ম্যাথু স্মিথ কোম্পানির পোত-বিভাগে চাকরি করিতেন। পরে ইনি চাকরি ছাড়িয়া দিয়া হাবড়ায় একটি ডক নির্মাণ করেন। এই স্মিথের নাম হইতেই 'স্মিথ ঘাটকা রাস্তা' নামকরণ হইয়াছিল। তাহার পরে ইহা 'ক্লাইভঘাট স্ট্রীট' বলিয়া পরিচিত হয়।

ক্লাইভ স্ট্রীট ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া মেসার্স আর, সি, গুপ্ত অ্যাণ্ড সন্সের সুবিখ্যাত ঔষধালয় পর্যন্ত গিয়া আমাদের একবার বনফিল্ডের লেনে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বনফিল্ড লেন পুরাকালের একটি পুরাতন রাস্তা। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে উডের ম্যাপে ইহার স্থান চিহ্নিত আছে। এই গলিতে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে মিঃ বনফিল্ড বলিয়া একজন প্রসিদ্ধ নিলাম-ওয়ালা বাস করিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের রিষড়াতে অনেক জমি জমা ছিল। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে সেকালের কলিকাতা গেজেটে এই জমি নিলাম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ হইয়াছিল।

"On Thursday the 2nd September next, will be sold by public outcry, by Mr Bonfield at his auction-room, if not before sold by private sale, that extensive piece of ground belonging to Warren Hastings Esqr; called Rishra (Ishara) situated on the Western Bank of the river, two miles below Serampur, consisting of 136 Bighas, 18 which are Lakhrage-land or the land paying no rent." হেস্টিংসের এই বাটিটি একটি স্মৃতি-ফলক দ্বারা

১. 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল অফিস' বর্তমানের পূর্ব রেলওয়ে (ইস্টার্ন রেলওয়ে)।

চিহ্নিত হইয়াছে। এখন এই স্থানে 'হেস্টিংস-জ্‌ট মিল' স্থাপিত হইলেও ইহা এখনও ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম ঘোষণা করিতেছে।

ক্যানিং স্ট্রীট

গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোড হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটি বরাবর চিৎপুর রোডে ফৌজদারি-বালাখানায় আসিয়া মিশিয়াছে। পূর্বে ইহা 'মুরগিহাটা' বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এখনও আছে। ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় স্বনাম-প্রসিদ্ধ লর্ড ক্যানিংএর নামে এই পথটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। পুরাকালে এই অংশে পর্টুগীজগণ বাস করিত। এখানে একটি বাজারে মুরগি বিক্রয় হইত বলিয়া 'মুরগিহাট্টা' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উডের ম্যাপে (১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ) মুরগিহাট্টার অস্তিত্ব দেখা যায়। এই পথের সান্নিধ্যে পর্টুগীজদের একটি পুরাকালের গির্জা আছে। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে অর্মির ম্যাপেও এই গির্জার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

স্ট্র্যাণ্ড রোডের পার্শ্বেই আরমানি-ঘাট। পুরাকালের এই আরমানি-ঘাট এখন মতি শীলের ঘাট বলিয়া পরিচিত। মহানুভব মতিলাল শীল সামান্য অবস্থা হইতে নিজের উদ্যম ও প্রতিভা বলে ক্রোরপতি হন। তিনি কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ শীল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মতিলাল শীলের মত দাতা ও বদান্য লোক এ যুগে অতি দুর্লভ। তিনি সেকালের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। সামান্য শিশি-বোতলের ব্যবসা হইতে তিনি পরিশেষে ক্রোরপতি হয়েন। বিলাতে জন্মিলে তাঁহার কার্যময় জীবনের একটা ইতিহাস থাকিয়া যাইত। ধর্মতলার পুরাতন-বাজারও স্বর্গীয় মতিলাল শীলের সম্পত্তি ছিল। মতি শীলের নাম কলিকাতায় আজও সর্বসাধারণে পরিচিত। তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ 'শীলস ফ্রী কলেজ।' কত দরিদ্র অবস্থাহীন ছাত্র যে এই বিদ্যালয়ে বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ইহজীবনে অন্নসংস্থান করিতে পারিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমান হ্যালিডে স্ট্রীটে[১] মতি শীলের এই কলেজ-বাটি এখনও বর্তমান।[২] মতিবাবু তাঁহার সমসাময়িক কলিকাতার সর্ববিধ হিতানুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। কলুটোলায় তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা এখনও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

মল্লিক-ঘাট এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর। হাওড়া পুলের নিকট ইহা অবস্থিত। বড়বাজারের মল্লিকবাবুরা এই ঘাটটি নির্মাণ করিয়া দেন। নয়ান মল্লিকের পুত্র রামমোহনবাবু সাধারণের স্নানের জন্য এই ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন। নয়ান মল্লিক পলাশীর আমলের লোক। নবাব কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর কলিকাতার অধিবাসিগণের ক্ষতিপূরণ জন্য যে কমিশন বসে, নয়ান মল্লিক সেই কমিশনে ছিলেন। তিনিও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৪৩৯৯২ টাকা দাবি করিয়াছিলেন। কিন্তু কোম্পানি-বাহাদুর ৫৯২২ টাকা মঞ্জুর করেন। লবনের ব্যবসায়ে ও জমি-জারাতের কাজে নয়ান মল্লিক যথেষ্ট বিত্তসম্পন্ন হইয়া উঠেন। মৃত্যুকালে তিনি ক্রোর টাকা রাখিয়া যান।

রাজা উদমন্ত স্ট্রীট

এই পথ বড়বাজারের মধ্যে। ক্লাইভ স্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজা উদমন্ত সিংহ ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা দেবী সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও দেবী সিংহ নানা কারণে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-

---

১. হ্যালিডে স্ট্রীট—সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গঠিত হইবার পর এই পথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ধর্মতলা স্ট্রীট (বর্তমান লেনিন সরণি) সংযোগস্থল হইতে বৌ-বাজার স্ট্রীট (বর্তমান বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট) পর্যন্ত নির্মিত হয়। বাংলার প্রথম ছোটলাট ফ্রেডরিক হ্যালিডের নামানুযায়ী এই পথের নাম রাখা হয় হ্যালিডে স্ট্রীট ; পরে বিডন স্ট্রীট পর্যন্ত পথটি নির্মিত হইলে নাম রাখা হয় সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ। পরে (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬-এ মে থেকে) সমগ্র রাস্তাটির নাম হয় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। এই পথের আরও প্রসারিত উত্তর অংশের (শ্যামবাজার ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ সংযোগস্থলের উত্তরে) নাম যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ।

২. শীলস্ ফ্রি কলেজ বর্তমানে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-র উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিদ্যালয়স্তরে পড়াশুনা হয়।

ছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে, মহারাজা দেবী সিংহ বাঙ্গালার দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হন। উদমন্ত সিংহ ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার অধীনে অনেক নগদি-সেনা ছিল। রেওয়া রাজার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সময়ে অভিযান করেন সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উদমন্ত সিংহ কোম্পানিকে সেনা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদের নবাব-নাজিম আলিজার আমলে ১৮১০ হইতে ১৮২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজা উদমন্ত দেওয়ানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। মুরশিদাবাদ নশিপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর এই বংশাবতংশ। বর্তমান নশিপুরাধিপতি বর্তমানকালের একজন বিদ্যোৎসাহী সর্ব সৎকর্মের পোষক ও লাট-কাউন্সিলের মেম্বর এবং সর্বজন-জানিত ব্যক্তি।

হ্যারিসন রোড[১]

হ্যারিসন রোড কলিকাতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গৌরববান। চৌরঙ্গীর শান্তভাব এখানে নাই বটে, কিন্তু এখানে যে সব প্রাসাদতুল্য ত্রিতল চতুস্তল ও পঞ্চতল বাটি আছে, তাহাদের নিকট চৌরঙ্গী এখন প্রাসাদ-সম্পদে পরাজিত। এই হ্যারিসন রোড লক্ষ্মীর আবাসস্থান—ইংরাজ-বাণিজ্যের সৌভাগ্য নিকেতন। কেন তাহা বোধ হয় খুলিয়া বলিতে হইবে না। হাওড়ার পুল হইতে আরম্ভ করিয়া, শিয়ালদহ পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। আর এই দীর্ঘ বিস্তারময় রাস্তার দুইধারে, অগণিত বাণিজ্য-বিপণী। ধরিতে গেলে হ্যারিসন রোড, মাড়োয়ারীদের সৌভাগ্য ও লক্ষ্মীলাভ-ক্ষেত্র। বড়বাজার কলিকাতার সর্ব শ্রেষ্ঠ বাজার। নানাবিধ পণ্য দ্রব্যপূর্ণ এত বড় বাজার ভারতের অন্য কোন নগরে আছে কি না সন্দেহ। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান, স্যর হেনরি হ্যারিসনের নামে এই পথটির নামকরণ হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক। ১৮৮৯ সালে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে শেষ হয়।

টিরেটা বাজার স্ট্রীট

চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত, টিরেটা বা টেরিটি বাজার হইতে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। এডওয়ার্ড টিরেটা নামক ভিনিস দেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,[২] ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে এই বাজারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে আমরা যে লটারির কথা বলিয়াছি, তাহার একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়—১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে এই টিরেটা বাজার এক 'লটারিতে' উঠিয়াছিল। সেই বিজ্ঞাপনটি এই—'প্রথম প্রাইজ, এক সুবৃহৎ ও পাকাবাড়ি সমেত বাজার। ইহা এখন মিঃ টিরেটার দখলে আছে ও ইহার ভূমি পরিমাণ নয় বিঘা ও আট কাঠা।" এই বাজারের মধ্যে উত্তম বাঁধান পাকা রাস্তা, বারান্দাওয়ালা বাড়ি ও পাকা দোকান ঘর আছে। এই সম্পত্তির দাম, একলক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে টিরেটা বাজারের এই দর ছিল। এখন কি হইয়াছে, একবার অনুমান করিয়া দেখুন। তখন টিরেটা সাহেব এই বাজার হইতে মাসিক ৩৫০০ টাকা আয় দাঁড় করাইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই বহুমূল্য প্রাইজটি ওয়েস্টন সাহেবের অদৃষ্টে উঠে। এই ওয়েস্টন সাহেবের লক্ষ্মী-ভাগ্য, হলওয়েল প্রদত্ত অর্থ হইতেই সূচিত হইয়াছিল। এই বাজার এখন বর্ধমানাধিপের সম্পত্তি।

হরিণবাড়ি লেন

২২নং টিরেটা বাজার স্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব হইতেই, এই স্থানটি 'হরিণবাড়ি' বলিয়া পরিচিত। সম্ভবত কলিকাতার বনজঙ্গলময় অবস্থার সময়, এই স্থানে প্রচুর হরিণ দেখা যাইত। এই লেনটি উডের ম্যাপে (১৭৮৪ খ্রীঃ) অঙ্কিত দেখা যায়। এই হরিণবাড়ির সান্নিধ্যে সেকালের

১. হ্যারিসন রোডের বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড।

২. "Edward Tiretta was an Italian of good family who, having had to fly his own country for a political offence, drifted to Calcutta, where for many years he held the post of civil architect to government, returning at last to his native land where he died at an advanced age"—K. Blechynden, *Calcutta Past and Present*, 2nd ed. p. 148.

পুরাতন জেলখানা ছিল। বর্তমান লালবাজার পুলিসকোর্টের নিকট, সেখানে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, বৌবাজার স্ট্রীট, লালবাজার স্ট্রীট ও চিৎপুর রোড আসিয়া একটি চৌমাথায় পরিণত হইয়াছে, পূর্বে সেই স্থানে অপরাধীদিগকে ফাঁসী দেওয়া হইত। এখানে একটি Pillory বা তুড়ুম-মঞ্চও স্থাপিত হইয়াছিল। এই তুড়ুম-ওয়ালা শাস্তির সম্বন্ধে, আমরা সুপ্রীমকোর্ট প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছি।

সার্কিউলার রোড[১]

সার্কিউলার রোডের বিস্তৃতি, কলিকাতার অন্যান্য রাজপথের অপেক্ষা খুব বেশী। শ্যামবাজারের মোড় হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর ইহা চৌরঙ্গীর পার্শ্ব দিয়া, ধরিতে গেলে একরূপ খিদিরপুর পুলের নীচে শেষ হইয়াছে। এই পথটির দেশী নাম 'বাহার-কা-সড়ক' বা 'বারসড়ক'। যে সময়ে কলিকাতা ও তদুপকণ্ঠবর্তী স্থানসমূহের সীমানা, লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে প্রথম বিঘোষিত হয়, সেই সময়ে ইহা সহর কলিকাতা বাহিরের সীমা ছিল। এই প্রাসাদময়ী রাজধানীর মধ্যে, এই পথটি দৈর্ঘ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী। শ্যামবাজার হইতে বর্তমান লাটগির্জা পর্যন্ত, ইহার দূরত্ব তিন ক্রোশ। এই সার্কিউলার রোডের যে বাড়িটি এখন ১৫৫ নম্বর বলিয়া চিহ্নিত, সেই বাটি স্বনামখ্যাত ইউরেশীয়ান কবি ও সুবিখ্যাত স্কুল-মাস্টার ডিরোজিও সাহেবের বাটি। স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই ডিরোজিওর ছাত্র। ডিরোজিও, তখনকার নব্য-বাঙ্গালীর চক্ষে আদর্শ শিক্ষক রূপে পরিগণিত ছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে, ভবিষ্যতে অনেকেই বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

বোল্টস্ লেন

অনেক পাঠক হয়ত এ ক্ষুদ্র গলিটির অস্তিত্বই অবগত নহেন। রিপণ স্ট্রীটের ঠিক বিপরীত দিকে এই গলিটি বর্তমান। এই বোল্টস্ সাহেব কোম্পানির আমলের একজন নামজাদা কর্মচারী ছিলেন[২]। তাঁহার *Considerations on Indian affairs* নামক পুস্তকখানি তৎসাময়িক নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ' ইনি পলাশী আমলের লোক। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির কর্মচারী হইয়াও গুপ্তবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া তখনকার কর্তারা জোর করিয়া তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দেন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি পূর্বোক্ত Considerations নামধেয় একখানি সুবৃহৎ পুস্তকের প্রচার করেন। এই পুস্তকে তিনি তৎকালীন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বোল্টস সাহেবের নাম হইতেই উক্ত গলির নামকরণ হইয়াছে।

কটন স্ট্রীট

কটন স্ট্রীট তুলাপটির রাস্তা বলিয়া সর্বজন পরিচিত। নামটি 'কটন' হইলেও ইহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নামে প্রতিষ্ঠিত নহে। যদিও প্রাচীন কলিকাতার একজন সেনাপতির নাম কটন ছিল, বড় লাটপাদরির নামও কটন ছিল, গবর্ণমেণ্টের একজন প্রধান সেক্রেটারির নামও কটন ছিল, তাহা হইলেও তাহাদের কাহারও নামে এই পথটির নামকরণ হয় নাই। বহু পূর্বকালে জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা স্থাপনের অনেক পূর্বে, এই স্থানে তুলা ও সুতার দোকান-পাট ছিল এবং নিত্য হাট হইত। এই জন্য ইহা সেই পুরাকালে 'রুয়েহাটা' (রুই—হিন্দুস্থানী শব্দ, অর্থ তুলা) বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তাহার ইংরাজী নাম কটন স্ট্রীট ও বাঙ্গালা নাম তুলাপটি।

ফিয়ার্স লেন

এই গলিটি সম্পূর্ণ আধুনিক। ফিয়ার্স লেন নাম হইবার পূর্বে ইহার পুরাতন নাম আর কিছু ছিল কি না তাহা আমরা জানি না। কলিকাতা হাইকোর্টের পিউনি জজ স্যর জন বড্ ফিয়ার্সের

১. সার্কিউলার রোড—আপার ও লোয়ার ; আপার সার্কিউলার রোডের বর্তমান নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, লোয়ার সার্কিউলার রোডের বর্তমান নাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড।

২. William Bolts—a merchant of Dutch extraction who joined the E.I. Company's service in 1759.—C.E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography*, p. 48.

নামে এই পথটির নামকরণ হইয়াছে। স্যর জন ফিয়ার ১৮৬৪ হইতে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জজিয়তি করেন। ইহার পর তিনি সিংহলদ্বীপে চিফ্‌জস্টিস্ নিযুক্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করেন। এ দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তৎকালীন বাঙ্গালীরা এই জন্য ইহাঁকে শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষে দেখিতেন।

আমহার্স্ট স্ট্রীট[১]

বহুবাজার স্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়া, ইহা সরাসর মানিকতলা স্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। আমহার্স্ট স্ট্রীট যে যে স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে অবস্থাপন্ন বাঙ্গালিগণের বাস। এই পথের ৮৫নং বাটিতে স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায় বাস করিতেন।[২] ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ১১৩ নং সার্কিউলার রোডে বাস করিয়াছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পনের বৎসর পরে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিস্টলে এই অতুল প্রতিভাবান ধর্ম-সংস্কারকের দেহান্ত হয়। এখনও ব্রিস্টলে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ বর্ত্তমান। এই রাস্তার সন্নিকটেই সুপ্রসিদ্ধ লং সাহেবের পুরাতন গির্জা[৩] বর্তমান। পাদরী লং সাহেব বাঙ্গালীদের উপকারার্থে অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। দীনবন্ধুর অমর-লেখনী-প্রসূত নীল-দর্পণের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া ইনি হাইকোর্টে অভিযুক্ত হন। তাহাতে ইহাঁর অর্থদণ্ড হয়। মহাভারতের অনুবাদক স্বনামধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এই জরিমানার টাকা প্রদান করিয়া লং সাহেবকে কারাদণ্ড হইতে উদ্ধার করেন।

এই আমহার্স্ট স্ট্রীটের ৩২ নম্বরের বাড়ির নিকট হইতে 'ক্যারিস-চার্চ[৪] লেন' নামে আর একটি গলি চলিয়া গিয়াছে। কেরি শ্রীরামপুরের স্বনাম প্রসিদ্ধ মিশনারী-সম্প্রদায়ের অন্যতম। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে রেভারেণ্ড কেরি, সর্বপ্রথমে এ দেশে আসেন। এরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায়পূর্ণ মিশনারী বোধ হয় এদেশে আর দ্বিতীয় কেহ আসেন নাই। কেরি সাহেব ব্যাপ্টিস্ট-মিশনভুক্ত লোক ছিলেন। এই মিশনের অবস্থা তখন তত উন্নত ছিল না। কেরি সাহেবের পরিবারে তাঁহার স্ত্রী, চারিটি পুত্র এক শ্যালিকা। এই সোসাইটির নিকট হইতে তিনি মোটে পঞ্চাশটি টাকা বৃত্তি পাইতেন। কাজেই ইহাতে তাঁহার দিন চলিত না। এই জন্য কেরি সাহেব সুন্দরবনের মধ্যে হোসেনাবাদ নামক স্থানে গমন করেন। এখানে তিনি স্বহস্তে হালচালনা করিয়া কৃষিকার্য করিতেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার বিশেষ কিছু সুবিধা না ঘটায় মালদহের উডনি সাহেবের অধীনে তিনি এক চাকুরি গ্রহণ করেন। এই স্থানে তিনি উড্‌নি সাহেবের ফ্যাক্টরিতে কাজ করিতেন ও অবসর কালে বাইবেল বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও প্রচারকার্য করিয়া দিন কাটাইতেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও স্বনামখ্যাত জন মার্শাল সাহেব এদেশে মিশনারীরূপে আসিয়া শ্রীরামপুরে এক গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কেরি সাহেবকে তাঁহারা মালদহ হইতে আনাইয়া লয়েন। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে কেরি সাহেব এই কলেজে সাহেবদিগকে বাঙ্গলাভাষা শিখাইবার ভারপ্রাপ্ত হন। শ্রীরামপুরেই এই কেরি সাহেবের মৃত্যু হয়।

অ্যাণ্টনি বাগান লেন

অ্যাণ্টনি বাগান লেনের একটু ইতিহাস আছে। অ্যাণ্টনি সাহেবের নামে এই গলির নামকরণ

---

১. আমহার্স্ট স্ট্রীটের বর্তমান নাম রাজা রামমোহন সরণি।

২. এই বাড়িটি রামমোহনের নয় রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে নির্মিত হয়। রামমোহন বাস করিতেন মাণিকতলায় সার্কিউলার রোড-এর বাড়িতে।

৩. এই গির্জাটি Holy Trinity Church নামে পরিচিত। প্রথম হইতেই এখানে বাংলা ভাষায় প্রার্থনা পরিচালিত হইত।

৪. এই পরিচয়টি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। রাস্তাটির নাম ক্যারিস চার্চ লেন (Carey's Church Lane) নয়; প্রকৃত নাম Corrie's Church Lane। Daniel Corrie প্রথমে ছিলেন কলিকাতার চ্যাপলিন, পরে আর্চডিকন এবং সর্বশেষে মাদ্রাজের বিশপ। ১৮০৬ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহার কর্মস্থল ছিল কলিকাতা। Corrie'র নামানুসারেই এই গির্জাটির নামকরণ হইয়াছিল।

হইয়াছে। এই অ্যাণ্টনি সাহেব জোব চার্নকের আমলের লোক। অ্যাণ্টনি সাহেব লক্ষ্মীকান্ত মজুম-দার বা বড়িশার সাবর্ণ-জমিদারের আদিপুরুষের কাছারির একজন কর্মচারী ছিলেন। তখন কলিকাতা সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রামের ও ইহার পার্শ্ববর্তী মৌজার স্বত্বাধি-কারী ছিলেন বিদ্যাধর রায়। মজুমদার ইহাদের নবাবি-আমলের উপাধি। তৎপরে ইহাঁরা রায়-চৌধুরী উপাধিলাভ করেন। বিদ্যাধরের পুত্র রামচাঁদ ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানিকে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয় বিক্রয় করেন। তখন নবাব মুরশিদ-কুলি খাঁর আমল।১ নবাব এই গ্রামত্রয় ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিতে তদধিকারিগণকে নিষেধ করিলেও রামচাঁদ তাহা শোনেন নাই। ভবিষ্যৎ কলিকাতা মহানগরীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা এই তিন খানি গ্রাম লইয়াই হইয়াছিল। একা রামচাঁদ নহেন তাঁহার সঙ্গে আরও চারিজন জ্ঞাতি ইংরাজদিগকে এই গ্রামগুলি বিক্রয় করেন।

বিদ্যাধরের কাছারিবাড়ি ছিল বর্তমান লালদীঘির পার্শ্ববর্তী এক ভূখণ্ডে। কাছারি বাড়িটি পাকা-কোঠা। তখন এস্থানে আর একখানিও পাকা কোঠা ছিল না। জোব চার্নক দেখিলেন, উপ-যুক্ত কোঠা বাড়ির অভাবে কোম্পানির পুরাতন সেরেস্তাগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তিনি অগত্যা বিদ্যাধরের এই পাকা-কোঠাটি কিনিয়া লইলেন।২ কোঠা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলি-কাতার প্রথম রেকর্ড-রুম হইল।

সেই পুরাকালে এই কাছারি-বাড়ির নিকট সাবর্ণদের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায় বিগ্রহের ঠাকুর-বাড়ি ছিল। এই শ্যামরায় পরে কালীঘাটে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত মিঃ এ, কে, রায় বলেন, "এই শ্যামরায়ের দোল পর্বোপলক্ষে লালদীঘির জল আবীরে লাল হইয়া যাইত। এইজন্য লালদীঘির এইরূপ নামকরণ।" পূর্বোক্ত অ্যাণ্টনি সাহেব বিদ্যাধরের ম্যানেজার ছিলেন। দোল উপলক্ষে মহাসমারোহ হইত। লালদীঘিতে একবার এই দোলের সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জনকয়েক ফ্যাক্টর শ্যামরায়ের ঠাকুরবাড়িতে জোর করিয়া প্রবেশ করি-বার চেষ্টা করেন। অ্যাণ্টনি সাহেব তাহাদিগকে ঢুকিতে দেন নাই। কথাটা জোব চার্নকের নিকট পেঁাছিলে, তিনি ঘোড়ার চাবুক লইয়া অ্যাণ্টনিকে প্রহার করেন। তাহার পর বিবাদ মিটিয়া যায়। ইহার পর হইতে অ্যাণ্টনি সাহেব কলিকাতা ছাড়িয়া কাঁচড়াপাড়ায় বাস করেন। এখনও কাঁচড়াপাড়ায় অ্যাণ্টনি সাহেবের বাড়ি ও হাটের স্থান লোকে দেখাইয়া দেয়। এই অ্যাণ্টনি সাহেবের পৌত্রই বিখ্যাত কবিওয়ালা ফিরিঙ্গি-অ্যাণ্টনি।

চিৎপুর রোড৩

চিৎপুর রোড কলিকাতার একটি অতি পুরাকালের পথ। মোগল বাদসাহদিগের আমল হইতে এই পথটির অস্তিত্ব। তখন ইহার দুই পার্শ্বে ভীষণ জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যস্থলে অপ্রশস্ত বনপথ। এই পথে যাত্রীরা, কাপালিক এবং শাক্ত-সন্ন্যাসীরা, সেই পুরাকালে চিত্রেশ্বরী-ঠাকুর দেখিয়া, জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়া কালীঘাটে যাইতেন। হলওয়েল এই পথটির একাংশকে a road leading to Collegot বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চিত্রেশ্বরীর নাম হইতেই এই পথটির নাম 'চিৎপুর' হইয়াছে। চিত্রেশ্বরীর মন্দির বহুকালের। স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেবের আমলের বন্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয় এই মন্দিরটি নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়া দেন।

---

১. ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুরের জমিদারি স্বত্ব ইংরাজ কোম্পানি ক্রয় করে তখন বাংলার সুবাদার মুরশিদকুলি খাঁ নন। বাংলার শাসনকর্তা তখন আজিমওশান।

২. লালদীঘির পার্শ্ববর্তী সাবর্ণ চৌধুরীদের কোঠাবাড়ি সম্পর্কে রাধারমণ মিত্রের উক্তি "উইলসন সাহেব (C.R. Wilson) প্রমাণ করেছেন যে এ পাকাবাড়িও (চার্ণকের আমলে) ছিল না।"—কলিকাতা দর্পণ, ১ম সংস্করণ, পৃ. ১২।

৩. চিৎপুর রোড (লোয়ার ও আপার)-এর বর্তমান নাম রবীন্দ্র সরণি। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে হইতে এই নাম পরিবর্তন হয়।

গোবিন্দরাম মিত্র কুমারটুলির মিত্রগণের আদিপুরুষ। পুরাতন কলিকাতার মধ্যে তিনি একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার নবরত্ন আজও তাঁহার কীর্তি-ঘোষণা করিতেছে। ১৭৩৭ অব্দের ঝড়ে এই নবরত্নের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার বাড়ির দুর্গোৎসবও সেকালের কলিকাতার এক দর্শনীয় জিনিস ছিল। এই গোবিন্দরাম কলিকাতার ব্ল্যাক জমিদার ও সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চোর ডাকাতেরা তাঁহার নাম শুনিলে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা লুঠ করেন, সেই সময়ে গোবিন্দরাম নিজের বরকন্দাজ ও কোম্পানির কয়েকজন সিপাহী লইয়া নিজের সম্পত্তি রক্ষা করেন। অন্যান্য বাঙ্গালীদের মত তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ মিত্রবংশের এক শাখা, কাশীধামে প্রাসাদতুল্য বাড়ি নির্মাণ করিয়া আজও বসবাস করিতেছেন।

এই চিৎপুর রোডের বিস্তৃতি ধরিতে গেলে বহুদূর ব্যাপী। একদিকে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী রোড, রসা রোড ও অন্যদিকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। সেকালে মুরশিদাবাদ নবাবী কেন্দ্র হইতে এই পথই কলিকাতা, কালীঘাট প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের প্রধান বর্ত্ম ছিল। বর্তমান ফৌজদারি-বালাখানায় নবাবী-আমলে, ফৌজদারের কাছারি হইত। হুগলী তখন নবাবী শাসন-কেন্দ্রের একটি প্রধান অংশ ছিল। মুরশিদাবাদের নীচেই হুগলী। হুগলীতে একজন ফৌজদার থাকিতেন। ধরিতে গেলে, ফৌজদার দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। এই ফৌজদারের প্রতিনিধি যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন তিনি ফৌজদারি-বালাখানাতেই থাকিতেন।

বৌবাজার ও বৈঠকখানা

লালবাজারের মোড় হইতে আরম্ভ হইয়া, এই রাস্তা বরাবর পূর্বদিকে শিয়ালদহের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। আগে অর্থাৎ পলাশী আমলে এই পথের দুই ধারে বড় বড় গাছ ছিল। ইহা সেকালে Avenue to the Eastward বলিয়া পরিচিত হইত। এই পথের ধারে শিয়ালদহের নিকট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'বৈঠকখানা-বৃক্ষ'। পূর্বে এইস্থানে একটি বৃহৎ বটগাছ ছিল। সেই বটগাছের শান্ত-শীতল ছায়ানত, নানাস্থানের ব্যবসায়ীরা অর্থাৎ যাহারা পুরাকালের কলিকাতায় বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করিত, মনের আনন্দে বিশ্রাম করিত। প্রবাদ আছে, কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকও এই বৃক্ষতলে বসিয়া, বিশ্রামকালে প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় পাইপ টানিতেন। এ 'বৈঠকখানা-বৃক্ষ' বহুদিন লোপ হইয়াছে। কিন্তু বৈঠকখানা নামটি আজও বর্তমান। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলেও এইস্থান 'বৈঠকখানা' বলিয়া পরিচিত ছিল।

বহুবাজারের নাম—স্বনামপ্রসিদ্ধ এই বাজার হইতেই হইয়াছে। বহুবাজারের প্রসিদ্ধ মতিলাল বংশের আদিপুরুষ, বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয়, তাঁহার এক পুত্রবধূকে এই বাজারটি দান করেন। 'বধূবাজার' এই কথা হইতে 'বহুবাজার' ও ক্রমশ তদপভ্রংশে 'বৌবাজার' নামকরণ হইয়াছে। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দের ম্যাপে, লালবাজার হইতে শিয়ালদহ পর্যন্ত এই সমস্ত পথটি 'বৈঠকখানা-রোড' বলিয়া চিহ্নিত ছিল। এই বৈঠকখানা-বৃক্ষটি আপজনের ম্যাপেও চিহ্নিত ছিল। আজকাল যে স্থানে শিয়ালদহ রেল-স্টেশন হইয়াছে, সেই স্থানেই বৈঠকখানা গাছটি ছিল। এই বৈঠকখানাতেই 'ব্রেড অ্যাণ্ড চিজ' বাঙ্গলো বলিয়া সেকালের ইংরাজদের সুপ্রসিদ্ধ আড্ডা-গৃহটি বর্তমান ছিল। এই বাঙ্গলোটি কলিকাতার একটি বিখ্যাত ট্যাভারন্—বা সেকালের সাহেবদের জমায়েতের আড্ডা। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে হিকিজ গেজেটে, এই বাঙ্গলো বিক্রয় সম্বন্ধে এক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৈঠকখানা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী বাস করিতেন। তবে বাঙ্গালী অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা এ অঞ্চলে যেন কিছু বেশী ছিল। পূর্বে আমরা মহরমের ও দুর্গাপূজার সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গার কথা বলিয়াছি—তাহা হইতেই প্রমাণ হয়, এ অঞ্চলে পলাশী-আমলের ৩০ বৎসর পরে অনেক লোকের বসবাস হয়। গবর্ণর হেস্টিংস সাহেব ১৭৮২ খৃস্টাব্দে 'মাদ্রাসা বা পার্শিয়ান কলেজ' স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসা সর্বপ্রথমে এই বৈঠকখানাতেই স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানকালে, এই বহুবাজার অঞ্চলে অনেক সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র বাঙ্গালী বসবাস করেন। চিৎপুর রোডের
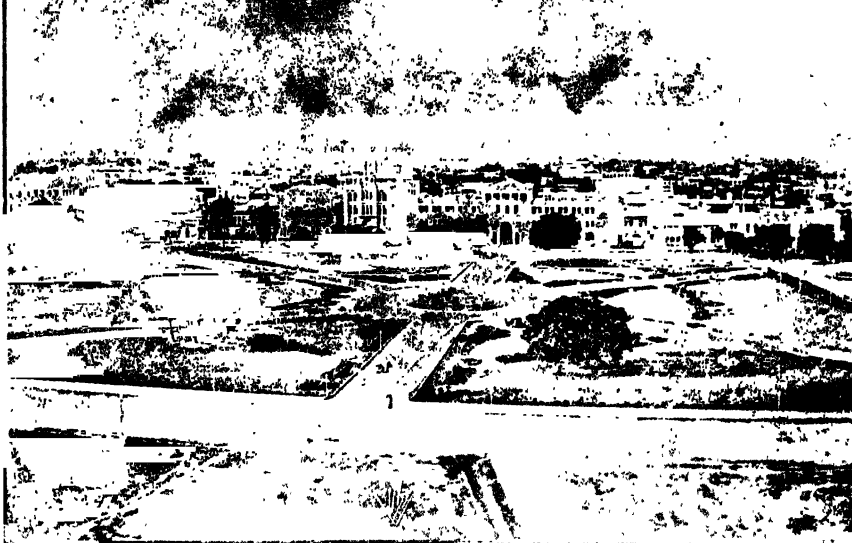
শহীদ মিনারের (মনুমেণ্ট) উপর হইতে পরিদৃশ্যমান ১৯১৫-র কলিকাতা

১৯১৪ খ্রী:র এসপ্ল্যানেডের দৃশ্য

কলিকাতার বর্তমান রাজভবনের (গবর্ণমেণ্ট হাউস বা লাটপ্রাসাদ) দৃশ্য : ১৯১৫

Post Office from Dalhousie Square Calcutta.
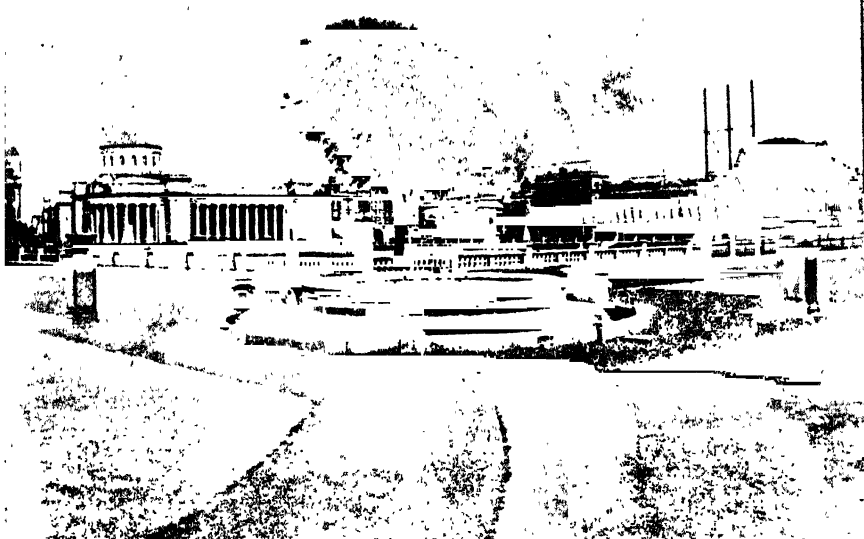
লালদীঘির দৃশ্য : ১৯১৪

ন্যায় বৌবাজার স্ট্রীটও সর্বদা জনপূর্ণ। ইহার দুইধারে, অলি-গলিতে, নানাস্থানে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা সমূহ নির্মিত হওয়ায় ইহা যথেষ্ট জনপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বড়বাজারের মত অনেক দোকান-পাট এখন এই পথের দুই পার্শ্বে বর্তমান। বহুবাজার এখন কলিকাতার একটি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত-পল্লী।

শোভাবাজার রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীট

মহারাজ নবকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বড় বড় ইংরাজ ঐতিহাসিক অর্থাৎ অর্মি, মিল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই বাঙ্গালী-শ্রেষ্ঠের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই। নবকৃষ্ণের দোষগুণ অনেক ছিল। কিন্তু তিনি যে সেকালের একজন প্রতিভাবান ও ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সত্য বটে, তিনি নন্দকুমারের ঘোর শত্রু ছিলেন, সত্য বটে, জীবনের অনেক কাজে তিনি ভ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি যে একজন সর্বজনমান্য লোক ছিলেন, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। সেকালের বাঙ্গালী ইংরাজি জানিতেন না, নবকৃষ্ণ চেষ্টা করিয়া ইংরাজি ভাষায় দখল লাভ করেন। ফার্সী ও উর্দুতে তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসকে তিনি ফার্সী পড়াইতেন। পলাশী-সমরের সময় তিনি ক্লাইভের সঙ্গে ছিলেন। যে সময়ে মুরশিদাবাদে সিরাজের ভাণ্ডার লুঠ হয়, সে সময়ে নবকৃষ্ণ মুরশিদাবাদে। লর্ড ক্লাইভের চেষ্টাতেই তাঁহার পদোন্নতি হয়। তিনি প্রথমে কোম্পানি-বাহাদুরের দ্বিভাষীর কাজ করেন। তৎপরে তিনি কোম্পানির 'পলিটিক্যাল-বেনিয়ান' পদে উন্নীত হন। ধরিতে গেলে, শেষোক্ত পদটি অনেকটা বর্তমানকালের ফরেন-সেক্রেটারির মত। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পর গবর্ণর ড্রেক প্রভৃতি ফলতায় পলায়ন করেন তখন অসীম সাহস অবলম্বনে মহারাজ নবকৃষ্ণ নৌকা বোঝাই করিয়া গবর্ণর ও তাঁহার সঙ্গিগণের জীবনরক্ষার্থে গোপনে খাদ্যাদি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। একদিকে নবকৃষ্ণ ও অন্যদিকে চুঁচুড়ার ডাচেরা যদি বিপন্ন ইংরাজদিগকে এই সময়ে সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। পরবর্তীকালে মহারাজ নবকৃষ্ণ ক্লাইভ ও হেস্টিংসের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া উঠেন। তখন গবর্ণরের দেওয়ান আর মুন্সী নবকৃষ্ণই প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে বড়লোক ছিলেন। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে গবর্ণরের দেওয়ান রামচাঁদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে দেওয়ানজী রামচাঁদ সাড়ে বার লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে নবকৃষ্ণ মুন্সী কোম্পানির নিকট ষাটটি মাত্র মুদ্রা মাসিক বেতন পাইতেন। কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধে নবকৃষ্ণ বাহাদুর নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইহা হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্যের পরিমাণ অনুমান করিয়া লউন। একবার মহারাজ নবকৃষ্ণ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে একলক্ষ টাকার জমিদারি দান করেন। কিন্তু তর্কপঞ্চানন মহাশয় 'বিষয়-বিষ ও উহাতে আমাকে মাটি করিবে' বলিয়া সে দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

পলাশী-যুদ্ধের পর কলিকাতার অধিবাসীদের যখন ক্ষতিপূরণের টাকা ও এওয়াজি জমি দেওয়া হয় সেই সময়ে কুমারটুলি অঞ্চলে নবকৃষ্ণ অনেক জমি পান। নবকৃষ্ণের উন্নতির সহিত এই সকল স্থান ক্রমশ ভদ্রলোকের বসবাসে পূর্ণ হইয়া উঠে। বর্তমানে নবকৃষ্ণের বংশধরেরা এই শোভাবাজারের অর্ধেক অংশ অধিকার করিয়া আছেন।

শোভাবাজার, সভাবাজার ও সুবাবাজার, এই তিন প্রকারে ঐতিহাসিক ও কলিকাতার প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ 'শোভাবাজার' নামের নির্দেশ করিয়া থাকেন। যে কারণেই এই শোভাবাজার নাম হউক না কেন, শোভাবাজার যে নবকৃষ্ণের জন্য জাঁকাইয়া উঠিয়াছিল, এই সিদ্ধান্তে কোন সন্দেহই নাই। যে পথটি আজকাল গ্রে স্ট্রীট নামে পরিচিত ও যাহা সার্কিউলার রোডে গিয়া মিশিয়াছে, এইরূপ প্রবাদ যে, এই সুদীর্ঘ পথটি মহারাজ নবকৃষ্ণের ব্যয়েই নির্মিত। এখন আর একটি তদপেক্ষা কম প্রশস্ত পথ 'মহারাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীট' বলিয়া সাধারণে পরিচিত। মহারাজ নবকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় রাজা রাজকৃষ্ণ ও রাজা গোপীকৃষ্ণের নামেও দুইটি লেন এখনও বর্তমান। শোভাবাজার রাজবাটি প্রসঙ্গে পাঠক মহারাজার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট

নবাবি-আমলে রাজা রাজবল্লভ সেন[১] ঢাকার ডেপুটি-গবর্ণর ছিলেন। কি জন্য তাঁহার সহিত নবাব সিরাজউদ্দৌলার মনোমালিন্য ঘটে, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস ইংরাজ-গবর্ণর ড্রেকের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন, আর এই ব্যাপার লইয়া নবাবের সহিত ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে ও নবাব ইংরাজদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করেন, সে সব কথা এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।[২] ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই রাজা রাজবল্লভ হইতেই এই পথের নামকরণ হইয়াছে।

বাগবাজার স্ট্রীট

বাগবাজার কলিকাতার মধ্যে অতি পুরাতন স্থান। বহুকাল হইতেই এ অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাস করিয়া আসিতেছেন। বাগবাজার-ঘাট হইতে বাগবাজার স্ট্রীটের আরম্ভ। আগে এই ঘাট রঘু মিত্রের ঘাট বলিয়া পরিচিত ছিল। রঘু মিত্র হলওয়েলের আমলের নামজাদা ব্ল্যাক জমিদার, গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র। বাগবাজারের নামের সহিত 'বাঘের' কোন সংস্রব নাই। আগে এখানকার জঙ্গলে যে বাঘ বাস করিত, আর সেই জন্যই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহা নয়। 'বাগ' অর্থাৎ বাগান হইতে সম্ভবত এই নামোৎপত্তি। এই স্থানে পলাশী-যুদ্ধের পূর্বে 'পেরিনস গার্ডেন' বলিয়া একটি বাগান ছিল। পেরিং বাগান যখন নির্মিত হয়, তখন ক্লাইভ মান্দ্রাজে রাইটারি করিতেন, আর ওয়ারেন হেস্টিংস সবে মাত্র কাশিমবাজারের কুঠিতে কোম্পানির চাকরিতে প্রবেশ করিয়াছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে Perrin's Garden ইংরাজদের শখের ভ্রমণের স্থান ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেব কলিকাতায় যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বাগবাজারের নামোল্লেখ ছিল। ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে এই বাগবাজার অঞ্চলটি কোম্পানি বাহাদুর প্রজাবিলি করেন। কিন্তু এই প্রজা যে কে, তাহার নাম পাওয়া যায় না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের উডের ম্যাপেও বাগবাজারের নামোল্লেখ ও স্থাননির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি বাহাদুর গঙ্গার উপর চৌকি দিবার জন্য বাগবাজার সান্নিধ্যে ৩৩৮ টাকা ব্যয়ে এক রক্ষামঞ্চ প্রস্তুত করেন। এই স্থানে স্বল্প সংখ্যক গোরা ও কয়েকজন দেশীয় সেনা এনসাইড পিকার্ডের অধীনে নবাব কর্তৃক এই স্থান আক্রমণ সময়ে (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ) মহা সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। বর্তমান বাগবাজার স্ট্রীট পুরাকালে 'গনপাউডার-ফ্যাক্টরি-রোড' বলিয়া পরিচিত ছিল। যেখানে বাগবাজার স্ট্রীট আজকাল চিৎপুর রোডে মিশিয়াছে, পূর্বে তাহা ছিল না। পেরিনস গার্ডেনের পূর্ব সীমা পর্যন্ত সাধারণ রাস্তা ছিল, উহা বর্তমান হরলাল মিত্রের স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার পর বাগানের দক্ষিণদিক দিয়া একটি সুঁড়িপথ-মাত্র চিৎপুর রোডে গিয়া মিশিয়াছিল। হলওয়েল সাহেব ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর কোম্পানির নিকট হইতে ইহা প্রকাশ্য নীলামে ক্রয় করেন। তৎপরে এই স্থানে বারুদখানা তৈয়ারি হয়।

শ্যামবাজার স্ট্রীট

শ্যামবাজার স্ট্রীট নামকরণ কেন হইল, তৎসম্বন্ধে একটু মত বিভিন্নতা দেখা যায়। অনেকে বলেন পলাশী-আমলে সুপ্রসিদ্ধ শোভারাম বসাকের শ্যামরায় বিগ্রহের নাম হইতে 'শ্যামবাজার' হইয়াছে। হলওয়েলের তালিকা মধ্যে, এই স্থান 'চার্লস বাজার' বলিয়া উল্লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ গৌরদাস বাবু শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর ইত্যাদি নামকরণের কারণ এই শ্যামরায় ঠাকুর ইহাই সিদ্ধান্ত

১. রাজবল্লভ সেনের জন্ম ১৬৯৮, মৃত্যু ১৭৬৩ খ্রী.

২. যাঁহারা সিরাজের সহিত কি কারণে ইংরাজদের মনোমালিন্য ঘটে তাহার সবিস্তার বৃত্তান্ত জানিতে চান—তাঁহারা S.C.Hill's *Bengal in 1756-57*, *Indian Record Series*, নামধেয় তিন ভল্যুম গ্রন্থগুলি পাঠ করিবেন। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সিরাজউদ্দৌলা ও নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ-কাহিনী পাঠ করুন।

করিয়া গিয়াছেন। অমির ম্যাপে শ্যামবাজার ও শ্যামপুকুর স্পষ্টভাবে চিত্রিত। কিন্তু নব্যভারতের প্রবন্ধ লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের ধারণা অন্যরূপ। তিনি বলেন, "পূর্বে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ এ অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁহার বাটির সান্নিধ্যে তাঁহার নিজ ব্যয়ে খনিত দীঘির নামই শ্যামপুকুর। শ্যামবাজারও তাঁহারই সম্পত্তি।" ইহাই যেন সঙ্গত সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। শ্যামবাবুর পুত্র মনোহর মুখোপাধ্যায় এই পল্লীর সান্নিধ্যে একটি বালাখানা বা বৈঠকখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অমির ম্যাপে উক্ত বালাখানার চিত্র অঙ্কিত আছে। এখনও এই স্থান 'বালাখানা স্ট্রীট' বলিয়া পরিচিত। এই সকল কারণে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর সিদ্ধান্তই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

নন্দরাম সেনের স্ট্রীট

নন্দরাম সেন কলিকাতার একজন প্রাচীন অধিবাসী। কুমারটুলি ওয়ার্ডে তাঁহার নাম-সংযুক্ত এই গলিটি আজও বর্তমান। এই নন্দরাম সেন কোম্পানির প্রথম আমলে গোবিন্দরাম মিত্রের ন্যায় একজন ব্ল্যাক-ডেপুটি ছিলেন। ১৭০০ খৃীস্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম কলেক্টর নিযুক্ত হন রাল্‌ফ শেল্‌ডন্। নন্দরাম বাবু এই শেলডনের সহকারী ছিলেন। ইহার পরবর্তী কলেক্টর বেঞ্জামিন বোচার তহবিল তছরূপ অভিযোগে সেনজাকে পদচ্যুত করেন। ১৭০৭ খৃীস্টাব্দের পর নন্দরাম পুনরায় পূর্বপদে নিয়োজিত হন। তহবিল তছরূপ অপরাধে কোম্পানি যে সময়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করেন সেই সময়ে তিনি হুগলির মুসলমান ফৌজদারের নিকট পলায়ন করেন। কিন্তু ইংরাজ-কোম্পানির অধ্যক্ষ হুগলীর ফৌজদারকে লিখিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় কলিকাতায় আনেন ও কারাবদ্ধ করেন। পরিশেষে নন্দরাম কোম্পানির দাবির টাকা দিয়া কারামুক্ত হন। 'রথতলা-ঘাট' ইহাঁরই নির্মিত।

অভয়চরণ মিত্রের স্ট্রীট

অভয়চরণ মিত্র মহাশয় ব্ল্যাক-জমিদার গোবিন্দরামের বংশধর[১]। অভয়বাবু ২৪ পরগনার কলেক্টর সাহেবের অধীনে দেওয়ানি করিতেন। প্রবাদ এই, তাঁহার গুরুকে তিনি লাখ টাকা দান করিয়াছিলেন।[২] কুমারটুলির মিত্র-পরিবার বরাবরই ধনাঢ্য। অভয়চরণের পূর্বপুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র পলাশী আমলে একজন নামজাদা লোক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্বে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি।

কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট

এই কালীপ্রসাদ দত্তের[৩] পিতার নাম চূড়ামণি দত্ত। কালীপ্রসাদের নামেই বর্তমান রাস্তার নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ নবকৃষ্ণ তখন নূতন বড় মানুষ, আর চূড়ামণি তাঁহার পূর্বের বড়লোক। উভয়েই স্ব স্ব দলস্থ ব্যক্তিগণের অধিনায়ক ছিলেন। নবকৃষ্ণের দলকে 'রাজার দল' বলিত। চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময় একটা গোলমাল ঘটায় ও নবকৃষ্ণ তাঁহার দলস্থ কায়স্থগণকে সভাক্ষেত্রে যাইতে নিষেধ করায় কালীপ্রসাদ বড়িশা-বেহালার তৎকালীন বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরী জমিদার সন্তোষ রায়ের শরণাপন্ন হন। সন্তোষ রায় স্বদলস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে লইয়া কালীপ্রসাদের বাটিতে উপস্থিত হইয়া এই মহাদায় হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। মহা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কালীপ্রসাদ সন্তোষ রায়ের সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণদের বিদায় ও পাথেয় জন্য অনেক টাকা দেন। কিন্তু এইরূপ দান লওয়া অকর্তব্য বিবেচনায় মহাত্মা সন্তোষ রায় তাহা কালীঘাটের বর্তমান মন্দির নির্মাণার্থে দান করেন। নব্যভারতের লেখক প্রাণকৃষ্ণ বাবুও এই কিম্বদন্তীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থলেখক বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরীদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া এ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য কোন কিছু জানিতে পারেন নাই।

---

১. অভয়চরণ মিত্র ছিলেন গোবিন্দরামের প্রপৌত্র।

২. হাটখোলার দত্ত পরিবারের কোন মহাত্মার সম্বন্ধে গুরুকে এইরূপ লাখ টাকা দিবার একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে।

৩. এই প্রসঙ্গে পরিশিষ্ট দ্র.

সুকিয়াস্ স্ট্রীট

সুকিয়াস স্ট্রীটে আজকাল অনেক ভদ্রলোকের বাস। এই রাস্তাটি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সংযোগ-স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া, বরাবর [illegible] রোডে গিয়া মিশিয়াছে। সুকিয়াস প্রাচীন কলিকাতার একজন পুরাতন অধিবাসী। তিনি জাতিতে আর্মেনিয়ান। বৈঠকখানাতে তাঁহার একটি বাগানবাটি ছিল। সুকিয়াস দান-খয়রাতে অনেক টাকা ব্যয় করেন। মুরগীহাটায় 'সুকিয়াস লেন' বলিয়া আর একটি ক্ষুদ্র গলি এখনও তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

বৃন্দাবন মল্লিকের লেন

বৃন্দাবন মল্লিকের লেন ৪ নং ওয়ার্ডে। এই বৃন্দাবন মল্লিক যে কে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা জানা যায় না। তবে এই গলির নামটি স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবাসবাটির জন্য যথেষ্ট বিখ্যাত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ২৫ নং বাটিতে বাস করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনকথা না জানেন, এমন শিক্ষিত-বাঙ্গালী খুব কমই আছেন। তাঁহার 'প্রথমভাগ', 'দ্বিতীয়ভাগ', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী' পড়িয়া সকলেই প্রায় বাঙ্গলা শিখিয়াছেন। এরূপ স্বাধীনচেতা, দয়ার আদর্শমূর্তি, ব্রহ্মণ্য-তেজের জ্বলন্ত আদর্শ, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ খুব কমই বঙ্গদেশে জন্মিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মেট্রোপলিটন কলেজ তাঁহার অক্ষয়কীর্তি। যতদিন এদেশে সংস্কৃত কলেজ বর্তমান থাকিবে, ততদিন [illegible] নাম কেহই ভুলিতে পারিবেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় পিতৃ-পরিচয়ে সর্বত্র সম্মানিত। তাঁহার উপযুক্ত দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রের সম্পাদক। সুরেশচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রের সহস্র বিভীষিকা ও প্রতিযোগিতাকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার জীবনের ব্রত 'সাহিত্য' আজও দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন।[১] ইহার নিকটস্থ পল্লীতে ৬ নং মানিকতলা রোডে আর একজন মনীষী বাঙ্গালী বাস করিতেন। ইনি স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালের শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার ও মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া ইনি অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সেকালের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গবেষণাময় প্রবন্ধ সমূহের বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি ইহাঁরই লেখনীপ্রসূত।

রতন সরকারের গার্ডেন স্ট্রীট

ইহা পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে অবস্থিত। দরমাহাটা হইতে এই পথের আরম্ভ। রতন সরকারের সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে। প্রবাদ এই, রতন সরকার জোব চার্নকের আমলের পূর্বের লোক। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে 'ফ্যাকন' নামক একখানি জাহাজ কলিকাতায় গার্ডেনরিচে নঙ্গর করে। ইহা হইতেছে আড়াই শত বৎসরের পূর্বের কথা। কাপ্তেন স্ট্যাফোর্ড এই জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এ জাহাজখানি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-জাহাজ। কাপ্তেন সাহেবের একজন দ্বিভাষীর প্রয়োজন হয়, কেন না তিনি এদেশের কোন ভাষাই জানিতেন না। 'দ্বিভাষী'কে মাদ্রাজীতে 'দুবাস' বলে। সাহেব নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগকে বলেন, "আমার জন্য একজন 'দুবাস' আনিয়া দাও।" তাহারা সাহেবের কথা বুঝিতে না পারিয়া, একজন ধোপাকে পাঠাইয়া দেয়। সেই ধোপার তখন অদৃষ্ট প্রসন্ন। সে ইংরেজির কোন কিছু না জানিলেও সামান্য দুই দশটা কথা জানিত। এই বিদ্যার সহায়তায় আর বুদ্ধির জোরে সে কাপ্তেন স্ট্যাফোর্ডের মনের ভাব বুঝিয়া লয়। ইহা হইতেই তাহার অদৃষ্ট পরিবর্তন ঘটে। এই 'দুবাস' রতন সরকারকে কাপ্তেন স্ট্যাফোর্ড সাহেব কোম্পানির দ্বিভাষীরূপে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই কাজ করিয়া রতন সরকার প্রচুর বিত্তশালী হইয়া উঠেন। আর এক রতন সরকার, পূর্বকথিত ব্যাঙ্ক-জমিদার, কুমারটুলির নন্দরাম সেনের অধীনে চাকরি করিতেন। তাঁহার নামেও একটি গলি

১. সুরেশচন্দ্র সমাজপতির জন্ম ১৮৭০, মৃত্যু ১৯২১ খ্রী.

আছে। এই দুই রতন সরকার একই ব্যক্তি কি না, তাহা এই সুদূর বর্তমানে নিশ্চয় করিয়া বলা অতি অসম্ভব ব্যাপার। এই রতন সরকার সম্বন্ধে বর্তমান কিম্বদন্তীটি মহাত্মা রামকমল সেনের অভিধানের মুখবন্ধে আছে।

রাজা গুরুদাসের স্ট্রীট

ইহা বর্তমান বিডন স্ট্রীট পোস্টাফিসের সম্মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া সরাসর মানিকতলা স্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসের নামানুসারে ঐ পথের নামকরণ হইয়াছিল। মহারাজ নন্দকুমারের আবাস-ভবন কোথায় ছিল, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। তবে অনুমান-সঙ্গত মত এই—চড়কডাঙ্গা-পল্লীতে, অর্থাৎ বর্তমান বিডন স্কোয়ার যে স্থানে নির্মিত, সেই জমির উপর পুরাকালে এক বাটি ছিল, তাহাই মহারাজের আবাস স্থান। রাজা গুরুদাস বাঙ্গলার পঞ্চম নাজিম মোবারকউদ্দৌলার দেওয়ান ছিলেন।

মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট

এই রাস্তাটি চোরবাগান পল্লীতে। এ পথের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বাঁশতলা স্ট্রীটের সম্মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। এই পথের ধারেই চোরবাগান মল্লিক-গোষ্ঠীর প্রাসাদতুল্য আবাস-ভবন। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রাসাদের ন্যায় সুবৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় আছে কি না সন্দেহ। 'রাজেন্দ্র-মল্লিকের-চিড়িয়াখানা' মেটিয়াবুরুজের নবাবের চিড়িয়াখানার নিম্নে। নবাব ওয়াজিদ আলিশা লক্ষ্ণৌ হইতে নির্বাসিত হইয়া মেটিয়াবুরুজে এক বহুদূর বিস্তৃত প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এই প্রাসাদ-সংলগ্ন ভূমিতে এক সুবৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল ও বৎসরের মধ্যে একদিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি তাহা সাধারণকে বিনাব্যয়ে দেখিতে দেওয়া হইত। কিন্তু রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানার দ্বার চিরদিনই অবারিত। রাজেন্দ্র মল্লিকের অক্ষয়কীর্তি—নিত্য সদাব্রত। এই কলিকাতা সহরে অনেক লক্ষপতি আছেন, কিন্তু এই রাজেন্দ্র মল্লিক ও আর দুই একজন ভিন্ন এরূপ কীর্তি অতি অল্পলোকেই রাখিয়া গিয়াছেন। আজও অক্ষুণ্ণভাবে ইহা চলিয়া আসিতেছে। যে মুক্তারামবাবুর নামে এই পথের নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার পুরা নাম বাবু মুক্তারাম দে। মুক্তারামবাবু বহুদিন ধরিয়া সুপ্রীম-কোর্টের দেওয়ানি করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অনুসারে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হইলে তিনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ভীম ঘোষের লেন

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে এই গলির আরম্ভ। ভীম ঘোষের নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। ভীম ঘোষ সেকালের একজন বড় লোক ছিলেন। কিন্তু কৃপণ-স্বভাবের জন্য তাঁহার একটা খারাপ নাম-ডাক হইয়াছিল। লোকজনকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া অল্প আহার দিতেন, ইহাই তাঁহার বদ্ নামের কারণ।

বিশ্বনাথ মতিলালের লেন

বহুবাজার সান্নিধ্য হইতে এই পুরাতন গলি আরম্ভ হইয়া বরাবর বিশ্বনাথ মতিলালের বাটির দিকে গিয়াছে। মতিলালেরা শুদ্ধ-শ্রোত্রীয়। চারি মেল ইহাদের ঘরে বাঁধা। বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় এই মতিলাল-বংশের স্থাপয়িতা। তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা আজও এই গলিতে বর্তমান। বিশ্বনাথ মতিলাল মাসিক আট টাকা বেতনে কোম্পানির নুনের-গোলায় চাকরি আরম্ভ করেন এবং মৃত্যু সময়ে কম-বেশি পনর লক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। বর্তমান বহুবাজার তাঁহারই স্থাপিত। তাঁহার এক পুত্রবধূর নামে এই সম্পত্তি নির্দিষ্ট ছিল বলিয়া ইহা 'বহুবাজার' বা বৌবাজার আখ্যা পাইয়াছে। এই মতিলাল-বংশীয় এক কন্যাকে, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ ডবলু, সি, বোনার্জি বিবাহ করেন। মিসেস বোনার্জির গর্ভজাত মিঃ শেলি বোনার্জি হাইকোর্টের এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার অপর পুত্র মিঃ আর, সি, বোনার্জি একজন উদীয়মান ব্যারিস্টার।

বৈষ্ণবচরণ শেঠের স্ট্রীট

বৈষ্ণবচরণ শেঠ জনার্দন শেঠের পুত্র। এই নামজাদা জনার্দন শেঠ ইংরাজের প্রথম আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্রোকার বা দালাল ছিলেন। জনার্দন শেঠ কোম্পানির দালালি করিয়া অনেক টাকা উপায় করেন। ইহাঁর বংশধর বৈষ্ণবচরণ ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। তিনি অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার প্রেরিত গঙ্গাজল ভিন্ন তৈলঙ্গদেশীয় রামরাজার পূজা উপলক্ষে অন্য গঙ্গাজল ব্যবহার হইত না। এই শেঠ-গোষ্ঠী মোগল্য-বংশীয়। ইহাদের আদি-পুরুষ মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সপ্তগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া সর্বপ্রথমে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দপুর তখন গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এজন্য শেঠেরা কলিকাতার 'জঙ্গলকাটা-বাসিন্দা' বলিয়া উল্লিখিত। এই শেঠদিগের কুলদেবতা গোবিন্দজীউ। এই গোবিন্দজীউ এখন টাঁকশালের নিকট এক দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সুন্দর দেবমূর্তি তিনশত বৎসরের পুরাতন।

বনমালী সরকারের স্ট্রীট

প্রাচীন কলিকাতায় দুইটি দুই রকমের প্রবাদ প্রচলিত ছিল। মিঃ এ, কে, রায় তাঁহার সেন্সাস্-রিপোর্টে এই দুইটিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রবাদবাক্যগুলি এই—

নন্দরামের ছড়ি।	গোবিন্দরামের ছড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি।	উমিচাঁদের দাড়ি।
হুজুরীমলের কড়ি।	নকু ধরের কড়ি।
বনমালী সরকারের বাড়ি।	মথুর সেনের বাড়ি।

নন্দরাম ও গোবিন্দরাম উভয়েই কোম্পানির আমলে ব্ল্যাক-জমিদারের কাজ করিতেন। উভয়েরই নিবাস এক পল্লীতে অর্থাৎ কুমারটুলি অঞ্চলে। ব্ল্যাক জমিদারেরা সেকালের কলিকাতার 'ছোট-হাকিম' ছিলেন। উমিচাঁদ তাঁহার 'দীর্ঘ-দাড়ির' জন্য প্রাচীন কলিকাতায় বিখ্যাত ছিলেন। বনমালী সরকার ও মথুর সেন তাঁহাদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার জন্য বিখ্যাত। নকু ধরের পুরা নাম লক্ষ্মীকান্ত ধর। ইনি রবার্ট ক্লাইভের নিকট চাকরি করিতেন। বনমালী সরকার জাতিতে সদ্‌গোপ। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম সরকার। আত্মারাম সর্বপ্রথমে কুমারটুলিতে আসিয়া বসবাস করেন। বনমালী সরকার কোম্পানি-বাহাদুরের পাটনায় রেসিডেন্ট-সাহেবের দেওয়ান ছিলেন, তৎপরে কলিকাতার 'ডেপুটি-ট্রেডার' হন। এই সময়ে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে বৎসর কলিকাতা আক্রমণ করেন তাহার পাঁচ বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রাসাদতুল্য বাটির নির্মাণ কার্য শেষ হয়। এই বাড়িখানি কুমারটুলি অঞ্চলে। নির্মিত হইতে দশ বৎসরকাল সময় লাগিয়াছিল।

দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্ট্রীট

সেকালের যে সকল লোক আফিং ও নিমকির দেওয়ানি করিয়া বড়লোক হইয়াছিলেন, দেওয়ান দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের একজন। দেওয়ান দুর্গাচরণ কোম্পানি বাহাদুরের পাটনা ওপিয়ম-এজেন্সির সর্বেসর্বা ছিলেন। এই দেওয়ানি চাকরি করিয়াই তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে সাধারণের স্নানের জন্য তিনি একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন।

দুর্গাচরণ পিতুড়ীর লেন

এই গলিটি দুর্গাচরণ পিতুড়ীর নামানুসারে হইয়াছে। পিতুড়ীরা কলিকাতায় বহুদিনের অধিবাসী। ইহাঁদিগের আদিনিবাস কোথায়, তাহার পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। তবে দুর্গাচরণ যে একজন বর্ধিষ্ণু লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দুর্গাচরণ তেজারতি ও কণ্ট্রাক্টের কাজে প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হয়েন। পলাশী-যুদ্ধের পর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের বা গড়ের মাঠের বর্তমান কেল্লার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। দুর্গাচরণ এই দুর্গ-নির্মাণ কার্য "কন্ট্রাক্ট" করেন। শুনা যায়, এই ব্যাপারেই তিনি প্রচুর বিত্তশালী হন।

ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন

সেকালের কলিকাতায় ডাক্তার দুর্গাচরণের[১] নাম সর্বগৃহেই পরিচিত ছিল। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট সুনাম সঞ্চয় করেন। রোগনির্ণয়ে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। লোকে দুর্গাচরণ ডাক্তারকে 'সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি' বলিয়া বিবেচনা করিত। অনেক সাহেব-ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। অসংখ্য মৃতকল্প রোগীর প্রাণদান করিয়া দুর্গাচরণ অশেষ কীর্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। আজও অশীতিপর প্রাচীনদের মুখে তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসা-কাহিনীর অনেক গল্প শুনা যায়। ডাক্তার দুর্গাচরণ তালতলায় বাস করিতেন। দুর্গাচরণের প্রধান কীর্তিস্তম্ভ তাঁহার গৌরববান পুত্র অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় অদ্বিতীয় বাগ্মী ও প্রতিভাশালী সম্পাদক বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছে। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের আর নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। উজ্জ্বল সূর্যকে প্রদীপ দিয়া দেখাইতে হয় না। সুরেন্দ্রবাবু বারাকপুর মণিরামপুরে বাস করেন। সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গলী-পত্রিকা ও রিপন-কলেজ (১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ) [বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ] তাঁহার লোকবিশ্রুত কীর্তিস্তম্ভ। দেশ-হিতব্রতে আজ পর্যন্ত (১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ) এই বৃদ্ধ বয়সে সুরেন্দ্রনাথ, অক্লান্তহৃদয়ে যৌবনের শক্তি লইয়া কর্মময় জগতে বিরাজ করিতেছেন।[২]

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের স্ট্রীট

কলিকাতায় ঠাকুর-গোষ্ঠির পরিচয় আমরা যথাস্থানে দিব। দর্পনারায়ণ[৩] পরলোকগত মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন বাহাদুরের বৃদ্ধ পিতামহ। এই বংশের পঞ্চানন ঠাকুর গোবিন্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তাঁহারা কলিকাতায় জঙ্গল কাটাইয়া বাস করেন। পঞ্চাননের পুত্র জয়-রাম পাথুরিয়াঘাটায় প্রথম বাসস্থান নির্মাণ করেন। দর্পনারায়ণ ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ানি করিয়া প্রচুর বিত্তের অধিকারী হন। তাঁহার নামে স্থাপিত একটি গলি আজও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন

দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী, সুপণ্ডিত প্রতিভাবান বাঙ্গালী খুব কমই জন্মিয়াছেন। বিলাতে তিনি 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকা-নাথ রাজা রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। দ্বারকানাথ সর্বপ্রথমে সুপ্রীমকোর্টে ওকা-লতি আরম্ভ করেন। তার পর তিনি চব্বিশ পরগনার নিমক-বিভাগের দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত হন। এই দেওয়ানি কার্যে তিনি প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। তৎপরে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ও আরম্ভ করিয়া একটি 'ব্যাঙ্ক'[৪] স্থাপন করেন। তাঁহার এই ব্যবসায়ের অংশীদার অনেক বাঙ্গালী ও নামজাদা সাহেব ছিলেন। এতদ্ভিন্ন নীল, রেশম ও চিনির ব্যবসায় দ্বারাও দ্বারকানাথ প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ দুইবার বিলাতে গিয়াছিলেন। প্রথমবারে তিনি আমাদের মাতৃপ্রতিম ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নিকট যথেষ্ট সম্মানলাভ করেন। বিলাতে গিয়া তিনি আতিথ্যপরায়ণতায় ও পদোচিত ঐশ্বর্যবিকাশে এবং নানাবিধ হিতকর কার্যে বিলাতের লোকের নিকট 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' বলিয়া পরিচিত হন। বেলফাস্ট নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। 'কেন্থাল-গ্রীনে' তাঁহার সমাধিস্থান এখনও বর্তমান।

দ্বারকানাথের বংশের যশঃপ্রতিভা এখনও মলিন হয় নাই, বরং আরও সমুজ্জ্বলিত। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাটি লক্ষ্মী-সরস্বতীর লীলানিকেতন। দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর[৫]

---

১. দুর্গাচরণের জন্ম ১৮১৯, মৃত্যু ১৮৭০ খ্রী.

২. স্যর সুরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪৮, মৃত্যু ১৯২৫ খ্রী.

৩. দর্পনারায়ণের জন্ম ১৭৩১, মৃত্যু ১৭৯৩ খ্রী.

৪. ব্যাঙ্কটির নাম Union Bank ; প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৯ খ্রী.

৫. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭, মৃত্যু ১৯০৫ খ্রী.

সর্বজন পূজ্য ও সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ,[১] সত্যেন্দ্রনাথ,[২] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,[৩] ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ,[৪] বিশেষ যশস্বী। ইহাঁরা সকলেই স্বনামধন্য। বঙ্গসাহিত্য এই বংশের নিকট বড়ই ঋণী। বাঙ্গালীর 'রবি-কবি' দ্বারকানাথের উপযুক্ত পৌত্র। সম্প্রতি এই কবীন্দ্রের, বীণার ঝঙ্কারের মধুরতায় সমগ্র ইউরোপ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালীর কবি রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত 'নোবেল-প্রাইজ' লাভ করিয়া সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী সিভিলিয়ান কুলের উজ্জ্বল রত্ন। তিনি বোম্বাই-প্রদেশে তাঁহার কর্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়া এখন পেন্সন লইয়া বঙ্গ-সাহিত্যালোচনা করিতেছেন। 'বোম্বাই-চিত্র' তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর 'অশ্রুমতি', 'সরোজিনী' প্রভৃতি কতকগুলি সুন্দর নাটক অতীত যুগের বড়ই আদরের সামগ্রী ছিল। প্রবীণ বয়সেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গ-সাহিত্যচর্চা ছাড়েন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কেবল যে পুত্র-গৌরবে যশস্বী, তাহা নহে। তাঁহার কন্যা শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবী[৫] বঙ্গসাহিত্যের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছেন। সুপ্রসিদ্ধ 'ভারতী' নামক পত্রিকার সম্পাদকীয়-ভার, দেবী স্বর্ণকুমারী বহুদিন ধরিয়া বহন করিয়া, এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনেও তাহাকে রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। মহিলা উপন্যাস-লেখিকাদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথিতযশা। তাঁহার দীপনির্বাণ, ছিন্নমুকুল প্রভৃতি গ্রন্থ অতি উপাদেয়। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বর্গগত স্বামী, মিঃ জানকীনাথ ঘোষাল (মিঃ জে, ঘোষাল), কংগ্রেসের একজন নেতা ছিলেন। সর্ববিধ লোকহিতকর কার্যেই তাঁহার উৎসাহ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আবাস-বাটি এই গলিতে অবস্থিত বলিয়া গলিটির নামকরণ তাঁহার নামেই হইয়াছে।

গোকুল মিত্রের গলি

গোকুল মিত্র সেকালের বাগবাজারের একজন নামজাদা লোক। তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য বাটি আজও চিৎপুর-রোডের উপর বর্তমান। এতবড় নাট্যমন্দির বা নাটমন্দির আর কোন বাটিরই নাই। বাগবাজারের 'মদনমোহন ঠাকুর' এই গোকুল মিত্রের বাটিতেই আছেন। গোকুল মিত্র অতি ক্রিয়াবান লোক ছিলেন। দুর্গোৎসব, রাস, দোল ইত্যাদিতে তাঁহার এই প্রাসাদতুল্য বাটি বৎসরের সকল সময়ই কোলাহল-সঙ্কুল থাকিত। এখনও তাঁহার নির্মিত পুরাকালের দোল ও রাসমঞ্চ বর্তমান। কোজাগরী প্রতিপদে প্রতিবৎসর এই গোকুল-মিত্রের বাটিতে 'অন্নকূট-মহোৎসব' এখনও হইয়া থাকে। প্রবাদ এই, মদনমোহন বিগ্রহ পূর্বে বিষ্ণুপুরের রাজাদের দখলে ছিল। বিষ্ণুপুরাধীপ রাজা দামোদর সিংহ দেনার দায়ে ইহা গোকুল মিত্রের নিকট এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখেন। কিন্তু খালাস করিতে না পারায় এ বিগ্রহ গোকুল মিত্রেরই হয়। আর একটি প্রবাদ আছে, গোকুল মিত্র, বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের যুগল মূর্তির অনুরূপ আর একজোড়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্মাণ করেন ও রাজাকে তাঁহার নিজের বিগ্রহ বাছিয়া লইতে বলেন। রাজা ঠিক চিনিতে না পারিয়া নকল মদনমোহন লইয়া যান। আসল বিগ্রহ মিত্রজারই হয়। গোকুল মিত্রের পিতার নাম সীতারাম মিত্র। বালি ইহাঁদের আদি বাসস্থান। তৎপরে কলিকাতায় বাস হয়। গোকুল মিত্র কোম্পানির নিমকি-বিভাগে কাজ করিয়া বড়লোক হন। ইনি মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক। সেকালের কোম্পানির সেরেস্তার কাগজপত্রের দুই চারি স্থলে মিত্রজার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিত্রজার প্রাসাদ-তুল্য বাটি কলিকাতার পুরাকালের একটি প্রধান দর্শনীয় জিনিস।

বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট

বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট জোড়াসাঁকো হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই পথের উপর স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রাসাদ-তুল্য বাটি। মহাভারতের অনুবাদ করিয়া সিংহ মহোদয় অক্ষয় কীর্তি

১-৪. দেবেন্দ্রনাথের পুত্রগণের জন্ম ও মৃত্যু : দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৪০-১৯২৬ খ্রী., সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৪২-১৯২৩ খ্রী., জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৪৯-১৯২৫ খ্রী. ও রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১-১৯৪১ খ্রী.

৫. স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম ১৮৫৫, মৃত্যু ১৯৩২ খ্রী.

রাখিয়া গিয়াছেন। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া লং সাহেবের যখন জেল ও জরিমানা হয়, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ই তাঁহার জরিমানার টাকা প্রদান করেন। বারাণসী ঘোষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের জামাতা। দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ। বারাণসী ঘোষ কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর আইন-ই-আকবরীর অনুবাদক গ্ল্যাডউইন সাহেবের অধীনে দেওয়ানি করিতেন। তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র বলরাম ঘোষ ফরাসী গবর্ণর স্বনামপ্রসিদ্ধ ডুপ্লের অধীনে চন্দননগরের ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন। এই বারাণসী ঘোষের নাম হইতেই বর্তমান পথটির নামকরণ হইয়াছে। বলরাম ঘোষের পুত্রের নাম শ্রীহরি ঘোষ।

হরি ঘোষের স্ট্রীট

ফ্রেঞ্চ-গবর্ণর ডুপ্লের দেওয়ান বলরাম ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহরি ঘোষ।[১] এই হরি ঘোষ পরে মুঙ্গেরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। হরি ঘোষ কোম্পানির অধীনে দেওয়ানি করিয়া অনেক টাকা উপায় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচুর সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি দানধ্যানে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অনেক বেকার কর্মহীন যোগ্রহীন জ্ঞাতি-গোত্র ও আত্মীয়বর্গ তাঁহার কলিকাতার আবাস-বাটিতে আশ্রয় লইয়া, তাহা কোলাহল-সঙ্কুল করিয়া তুলিত। অনাহূত এবং রবাহূতগণেরও নিত্য অন্নপ্রাপ্তির বিঘ্ন ঘটিত না। এই জন্যই আজও কোন বাটিতে বেশী লোক থাকিলে লোকে বলে, "এটা যেন হরি-ঘোষের আড্ডা।" হরি ঘোষ অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সারল্যের সুযোগ পাইয়া এক অন্তরঙ্গ মিত্র তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ অবস্থাটা তাঁহার বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি মনের দুঃখে কাশীবাসী হন।

হুজুরীমলস্ ট্যাঙ্ক লেন

হুজুরীমল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উমিচাঁদ বা আমীরচাঁদের খুব নিকট আত্মীয়। ইনি জাতিতে শিখ্। প্রাচীন কলিকাতায় হুজুরীমল একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন। বৈঠকখানা বাজারের নিকট তিনি একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই পুকুরটি বহুকাল বুজাইয়া দিয়াছেন। পূর্বে এখানে হুজুরীমলের পুকুর ছিল বলিয়া ইহা হুজুরীমলের ট্যাঙ্ক লেন নামে বিখ্যাত। কালীঘাটের-বাজার আজকাল যে স্থানে সেই স্থানাধিকৃত সমস্ত জমি হুজুরীমলবাবু কোম্পানির নিকট কোনও কার্যের জন্য পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সেই জমির উপর দেবালয় ও গঙ্গার তীরে এক ঘাট করিয়া দেন। কিন্তু দানপ্রাপ্ত জমিতে এরূপ ভাবে দেবালয় ও সদাব্রত প্রতিষ্ঠিত করিতে নাই, এরূপ একটা শাস্ত্রীয়-বিধান পাওয়ায় তিনি নিজ তহবিল হইতে জমি কিনিয়া গঙ্গাতীরে একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন।

কাশী ঘোষের লেন

কাশী ঘোষ রামদেব ঘোষের পুত্র। রামদেব সেকালের নদীয়ার রাজাদের দেওয়ান ছিলেন। রামদেবের পুত্র কাশী ঘোষ ফেয়ার্লি ফারগুসান কোম্পানির ফারমের সহকারী বেনিয়ান ছিলেন। সেকালে যাঁহারা সওদাগরি অফিসের মুচ্ছুদি বা বেনিয়ান-গিরি করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিত্তসম্পন্ন হইয়াছিলেন। কাশী ঘোষ মৃত্যুকালে অনেক টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান।

খেলাত ঘোষের গলি

পাথুরিয়া-ঘাটার ঘোষ বংশ চিরদিনই ক্রিয়াবান ও বিখ্যাত জমিদার। খেলাত ঘোষ[২] মহাশয়ের প্রাসাদ-তুল্য আবাসভবন এখনও কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটায় বর্তমান। খেলাত ঘোষ মহাশয় ক্রিয়া-কলাপাদির জন্য সেকালের সমাজে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ তাঁহার বংশধর। রমানাথবাবুও সাধারণ হিতকর কার্যে ও সভাসমিতিতে পূর্ণোৎসাহে যোগদান করিতেন।

---

১. হরি ঘোষের মৃত্যু ১৮০৬ খ্রী.
২. খেলাত ঘোষের মৃত্যু ১৯০৩ খ্রী.

খেলাত ঘোষ মহাশয় দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পৌত্র। রামলোচন ঘোষ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। খেলাতচন্দ্রের খুল্লতাত আনন্দনারায়ণ ঘোষ পূর্বকালে ধর্মতলায় একটি বাজারের অধিকারী ছিলেন। ইহাঁর নামানুসারে এই বাজার 'আনন্দবাজার' বলিয়া পরিচিত ছিল।

কেশবচন্দ্র সেন্‌স্ স্ট্রীট

স্বর্গত কেশব সেনের নাম পূর্বযুগের লোকের নিকট খুব পরিচিত ছিল। যাঁহারা তাঁহার ধর্মানন্দময় প্রসন্নমুখ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। কেশববাবু ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আদিসমাজভুক্ত ছিলেন, তৎপরে সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার কন্যার সহিত স্বর্গীয় কুচবিহারাধিপের বিবাহের পর হইতে তিনি সাধারণ-সমাজের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া নববিধান-সমাজ স্থাপন করেন। কেশব সেনের ন্যায় ধর্ম-বিষয়ক ইংরাজি-বক্তা এ দেশে খুব কম জন্মিয়াছে। তিনি বিলাতে গিয়া বহুবার ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া তথাকার মনীষিবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন। কেশববাবু রামকমল সেনের পৌত্র। রামকমল সেন মহাশয় ২৪ পরগনার গরিফা হইতে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। বর্তমান হিন্দু হোস্টেলের সান্নিধ্যে যে গলিটি আছে, সেখানেই সেন-গোষ্ঠীর কলিকাতার আদি বাটি। রামকমল সেন মহাশয় সরকারি টাকশাল ও পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেশববাবু হইতে তাঁহার পিতৃপুরুষের গৌরব দেশে বিদেশে ব্যক্ত হয়। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র যখন বিলাতে ধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করেন, সেই সময়ে তিনি খ্রীস্টিয়ান-সমাজের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চির গৌরবান্বিতা মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও রাজপরিবারবর্গের সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারি তারিখে কেশবচন্দ্র সেন ইহলোক ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণদাস পালের লেন

অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল [১] বঙ্গদেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর অনেকে ভাবিয়াছিল, তৎকালীন হিন্দু সমাজের একমাত্র মুখপত্র 'হিন্দু-পেট্রিয়টের' আর পুনরভ্যুদয় হইবে না। কিন্তু কৃষ্ণদাস ধাত্রীরূপে হিন্দু-পেট্রিয়টকে আজীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দু পেট্রিয়টের নির্ভীকতা তাঁহার আমলে চিরদিনই সমানভাবে বর্তমান ছিল। কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সম্পাদিত হিন্দু-পেট্রিয়ট উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ এবং বড়লাট ও ছোটলাটগণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। কৃষ্ণদাসের বাল্য-জীবন অতি কষ্টে কাটিয়াছিল। কিন্তু তিনি ভগবদ্দত্ত প্রতিভাবলে, আত্ম-নির্ভরতার শক্তিতে একজন সর্বজন-জানিত লোক হইয়াছিলেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট সম্পাদন ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান বা ভারতীয় জমিদার-সভার সম্পাদকতা, লাট-কাউন্সিলের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি কার্যে তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ ব্যয়িত হয়। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে তিনি করদাতাগণের একজন নিঃস্বার্থ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বড়ই সুখের কথা, এই উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান অনারেবল রাধাচরণ পালও মিউনিসিপ্যালিটির গণনীয় কমিশনাররূপে ও লাট-কাউন্সিলের সদস্যরূপে পিতৃ-পদাঙ্কানুসরণে বিবিধ লোকহিতকর কার্য করিতেছেন।

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর লাট-কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশবাসীর যথেষ্ট হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। জমিদার-সভার সম্পাদক হইয়া তিনি যে জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কারস্বরূপ বঙ্গীয় জমিদার-সভা তাঁহার এক শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্তি এখন হ্যারিসন-রোড ও কলেজ-স্ট্রীটের সঙ্গমস্থলে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, রাজপথবাহী পান্থগণের নিকট তাঁহার স্মৃতি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বর্তমান কৃষ্ণদাস পালের স্ট্রীটেই তাঁহার বাসভবন ছিল। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, রাধাচরণ বাবু

১. কৃষ্ণদাসের জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৮৮৪ খ্রী.

পৈতৃক বাসস্থানটি আজকাল নূতন ধরনে নির্মাণ করিয়াছেন।[১]

মথুর সেনস্ গার্ডেন লেন

মথুর সেনের পিতার নাম জয়মণি সেন। তেজারতি ও ব্যাঙ্কিং কারবারে, মথুর সেন প্রচুর বিত্ত-সঞ্চয় করেন। তাঁহার চারি ফটকওয়ালা বাটি, এখনও ধ্বংসাবস্থাতে অতীত ঐশ্বর্যের কীর্তি প্রকাশ করিতেছে। কালের বিচিত্রগতিতে, তাঁহার কারুকার্যময় বৈঠকখানা গৃহে এখন কাবুলীরা ভাড়াটিয়ারূপে বাস করিতেছে। সেনজার এই প্রাসাদতুল্য বাটিটি বর্তমানে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। মথুর সেনের বাটির ফটক লাটসাহেবের বাটির অনুকরণে নির্মিত। আজও পর্যন্ত নিমতলাঘাট স্ট্রীটের উপর এ ফটক বর্তমান। ইহার নিকটেই মথুর সেনের ফুল-বাগান ও ঠাকুরবাটি বর্তমান ছিল। এখনও সেই ঠাকুরবাটি ও ফুলবাগানের অধিকৃত স্থান বে-মেরামত অবস্থায় বর্তমান। মথুর সেন জীবদ্দশায় প্রচুর বিত্ত-সঞ্চয় করিলেও মৃত্যুকালে তাঁহার বংশধরদের জন্য বিশেষ কিছু রাখিয়া যান নাই।

নীলমণি হালদারের লেন

চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ ধনী প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নাম বর্তমান যুগের স্মৃতি বহির্ভূত হইলেও, অতীত যুগের নিকট তাহা অতি পরিস্ফুটিত। নোট ও কোম্পানি-কাগজ জাল করিয়া প্রাণকৃষ্ণ হালদার যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। তাঁহার প্রাসাদ-তুল্য আবাসবাটি ও বৈঠকখানা আজও বর্তমান। এই জাল করা অপরাধে, প্রাণকৃষ্ণের দ্বীপান্তর হয়। আর তাঁহার ভ্রাতা নীলমণি সহোদরের সহায়তা-কারী বলিয়া দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। এই নীলমণি হালদার হইতেই পথ-টির নামকরণ হইয়াছে।

নীলমণি মিত্রের গলি

যে প্রাসাদ-তুল্য আবাসবাটি বর্তমানে দরজিপাড়ায় মিত্র-বাবুদের আবাসবাটি বলিয়া পরিচিত তাহা নীলমণি মিত্র মহাশয়ের বাটি। নীলমণি মিত্র পলাশী-আমলের লোক। নবাব কর্তৃক কলি-কাতা লুণ্ঠনের পর সহরবাসীদিগের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য যে একটি কমিশন বসে নীলমণি মিত্র সেই কমিশনের সদস্য ছিলেন। মিত্রজা মহাশয় কোম্পানির অধীনে চাকরি করিয়া বড় মানুষ হন। তাঁহার বংশধরেরা এখনও পৈতৃক বাটিতে বাস করিতেছেন।

নরেন্দ্রনাথ সেনের গলি

রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর দেওয়ান হরিমোহন সেনের পুত্র। দেওয়ান হরিমোহন জয়পুরের মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বহুদিন ধরিয়া 'ইণ্ডিয়ান-মিরর' নামক সুবিখ্যাত দৈনিক-পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ অবস্থায় ইনি 'রায়-বাহাদুর' উপাধি-লাভ করেন। কয়েকবার ইনি লাট-কাউন্সিলের সদস্যপদেও নির্বাচিত হন। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার রূপেও ইনি অনেকদিন কাজ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বহুদিন ধরিয়া অ্যাটর্ণির কাজ করেন। দেশ-হিতকর অনেক কাজে তিনি যোগদান করিতেন। নরেন্দ্রনাথ একজন স্পষ্টবাদী ও নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেনের নামে কলিকাতা সহরের মধ্যে এই গলিটি ও একটি সাধারণ ভ্রমণ-ক্ষেত্র বা 'পার্ক'[২] নির্মিত হইয়াছে।

নন্দলাল মল্লিকের লেন

পাথুরিয়াঘাটার মল্লিক-বংশ কোম্পানির প্রথম আমলের অধিবাসী। নন্দলাল মল্লিক রাজা শ্যামাচরণ মল্লিকের পুত্র।

এই মল্লিক-পরিবারের আদিপুরুষ অতি পুরাকালে পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বসবাস করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া ইহাঁরা প্রচুর বিত্তশালী হয়েন।

---

১. রাধাচরণ বাবু লোকান্তরিত।
২. 'একটি সাধারণ ভ্রমণক্ষেত্র বা পার্ক' নরেন সেন স্কোয়ার নামে পরিচিত। এঁর জন্ম ও মৃত্যু ১৮৪৩-১৯১১খ্রী.

এই বংশীয় নন্দ মল্লিক মহাশয়ের নাম হইতে এই গলিটির নামকরণ হইয়াছে।

উমেশচন্দ্র দত্তের লেন[1]

এই গলিটি কলিকাতার রামবাগান পল্লীতে। রামবাগানের দত্ত-বাবুরা বহুকাল হইতে সুবিখ্যাত। বাঙ্গলা ও ইংরাজি সাহিত্য-চর্চার জন্য ইহাঁদের খুব নামডাক। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও সুপণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্তের[2] নাম বঙ্গের সকল গৃহেই পরিচিত। রমেশবাবু বঙ্গভাষায় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস প্রচার করেন। ইহাদের মধ্যে বঙ্গবিজেতা, মাধবীকঙ্কণ, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সমাজ ও সংসার বলিয়া উপন্যাসগুলি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষভাবে পরিচিত। জীবনের শেষ দশায় রমেশচন্দ্র তাঁহার মাধবীকঙ্কণ ও সংসার নামক দুইখানি উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ করেন। এই দুইখানি পুস্তকের নাম Slave Girl of Agra এবং Lake of Palms. বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার উচ্চ অঙ্গের উপন্যাসগুলি সংবাদপত্রের ও থিয়েটারের উপহাররূপে প্রদত্ত হইলেও [illegible] ও প্রতিভার বিকাশস্থল বিলাতে তাঁহার বাঙ্গলা উপন্যাসের অনুবাদগুলি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রমেশচন্দ্র ইংরাজিতে Civilisation in Ancient India প্রভৃতি কয়েকখানি গবেষণা-পূর্ণ সারগর্ভ ইংরাজি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

রমেশচন্দ্রের কর্মময় জীবন অতি গৌরবান্বিত। ১৮৪৮ খৃীস্টাব্দে ১৩ই আগস্ট ইহাঁর জন্ম হয়। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ বিহারীলাল গুপ্ত (B. L. Gupta) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র একই সময়ে (১৮৬৭ খৃীঃ) বিলাতে সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য গমন করেন। ১৮৬৯ খৃীস্টাব্দে তাঁহারা সিভিলিয়ান হইয়া এদেশে আসেন। রমেশচন্দ্র অনেক স্থলে ম্যাজিস্ট্রেট-কলেক্টরের কাজ করিয়া পরিশেষে ১৮৭৯ খৃীস্টাব্দে ডিভিশন্যাল-কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে আর কোন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান এই উচ্চ পদ লাভ করেন নাই। ১৮৮৭ খৃীস্টাব্দে, রমেশচন্দ্র সরকারি কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই. উপাধিদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। সরকারি কর্মে অবসর লইয়াও রমেশচন্দ্রের কর্মময় জীবন এক দিনের জন্যও সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত হয় নাই। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে বহুদিন ধরিয়া ইনি ভারতীয়-ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। তৎপরে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া বরোদা-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। প্রতিভার জয় সর্বত্র। এই নূতন দায়িত্বপূর্ণ কার্যে রমেশচন্দ্র যথেষ্ট যশসঞ্চয় করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামক বিদ্বৎ-সমিতির ইনি প্রথম প্রেসিডেণ্ট। ১৯০৯ খৃীস্টাব্দের জুন মাসে ইনি বরোদার প্রধান রাজ-মন্ত্রী হন দুর্ভাগ্যক্রমে বেশীদিন এই মন্ত্রিত্ব কাজ করিতে পারেন নাই। ১৩১৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ তাঁহার দেহান্তর হয়। রমেশচন্দ্র রামবাগান দত্তপরিবারের উজ্জ্বল রত্ন। ইনি রসময় দত্তের ভ্রাতা পীতাম্বর দত্তের পৌত্র ও ঈশানচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র। রমেশচন্দ্রের উপযুক্ত জামাতা প্রথিতনামা সিভিলিয়ান মিঃ জে, এন, গুপ্ত (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাঁহার স্বর্গগত শ্বশুর-মহাশয়ের এক জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। এ জীবনবৃত্তান্তে রমেশচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক অপ্রকাশিত জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। রমেশচন্দ্র প্রতিভাবান লেখক হইয়াও বাঙ্গালীর নিকট প্রাণভরা আদর ও সম্মান পান নাই। তাঁহার বাঙ্গলা গ্রন্থগুলি মনিমুক্তার দরে বাঙ্গলায় বিক্রীত হয় নাই, কিন্তু কর্ম-ভূমি ইংলণ্ড রমেশচন্দ্রের প্রতিভার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন।

রামবাগান দত্ত-পরিবারের রসময় দত্ত মহাশয় ডেভিড্সন কোম্পানির বুককিপার ছিলেন। রসময় বাবু সেকালের কোর্ট অব রিকোয়েস্টস্ নামক বিচারালয়ে একজন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মিঃ ও, সি, দত্ত মহাশয় কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান রূপে নিযুক্ত হন। তারপর ইনি মিউনিসিপ্যালিটির কলেক্টরের কাজ করেন। ইহাঁর ইংরাজি

১. উমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৯০৭ খ্রী.
২. রমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম ১৮৪৮, মৃত্যু ১৯০৯ খ্রী.

কবিতাগুলি সর্বজন সমাদৃত। এই রামবাগান দত্ত পরিবারেই মিস্ তরু দত্তের জন্ম হয়।[১] বর্তমান যুগের লোক তরু দত্তকে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। তরু দত্ত রামবাগান দত্ত-বংশের গোবিন্দ দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা। ইহাঁর আর এক ভগ্নী ছিলেন, তাঁহার নাম অরু। তরু ও অরু উভয় ভগ্নীই পিতামাতার সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তৎপরে তরু ফ্রান্সে যান। ইংরাজি ও ফরাসী ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৭৩ খৃীস্টাব্দে মিস তরু দত্ত বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। এদেশে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তরু দত্ত অনেক ফরাসী কবিতা ইংরাজি ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃীষ্টাব্দে A sheaf gleaned from the French Fields নাম দিয়া তিনি এই খণ্ড কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। গোবিন্দ দত্ত মহাশয় খৃীস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। তরু ও অরু উভয়েই অবিবাহিতা ছিলেন। ইংলণ্ড ও ফরাসী-মুলুকে তরু কিছু বেশী পরিচিত। তাঁহার রচিত একখানি ফরাসী-ভাষার উপন্যাসও ছিল। তরুর উদ্দাম প্রতিভা-বিকাশ অতি অল্প বয়সেই হয়। তরু আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে তাহার নাম হয়ত ইংরাজি ও ফরাসী সাহিত্যে চিরবিরাজিত থাকিত। উভয় ভগ্নীই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন।

অনাথ দেবের লেন ও অনাথবাবুর বাজার লেন

অনাথ দেব মহাশয় সুবিখ্যাত রামদুলাল দে বা দুলাল-সরকারের পৌত্র। রামদুলালের দুই পুত্র—আশুতোষ ও প্রমথনাথ। ইহাঁরা সাধারণে সাতুবাবু ও লাটুবাবু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রমথ বা লাটুবাবু অনাথবাবুকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। অনাথবাবু এখন তাঁহার পৈতৃক-বাটিতে বাস করিতেছেন।[২] বর্তমানকালে সাতুবাবুর বাজারের সম্মুখে যে সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বিরাজিত, ইহাই রামদুলাল সরকার মহাশয়ের বাসভবন।

রামদুলাল লক্ষ্মীর বরপুত্র। ভাগ্যলক্ষ্মী ইহাঁর উপর কিরূপভাবে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত। অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি কোটিপতি হইয়া উঠেন। এরূপ সচ্চরিত্র, নির্লোভ, আত্মত্যাগী, প্রভুভক্ত কর্মচারী বর্তমান যুগে উপকথা মাত্র।

রামদুলাল সরকার মহাশয়ের জীবনের কথা আমরা অতি সংক্ষেপে বলিব।[৩] দমদমা রেকুজানি গ্রামে তাঁহার আদি নিবাস। তাঁহার পিতার নাম বলরাম সরকার। বলরাম গুরুমশাই-গিরি করিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব সময় বাঙ্গলায় তখন নবাবী আমল, দেশে বর্গীর-হাঙ্গামা। রামদুলালের পিতা বর্গীর ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে পলায়ন করেন। তাঁহার পত্নী অন্তর্বত্নী ছিলেন। প্রান্তরমধ্যে পত্নীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হওয়ায় বলরাম সরকার মহাশয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই : এই প্রান্তরমধ্যে নিরাশ্রয় অবস্থায় রামদুলাল সরকার জন্মগ্রহণ করেন।

নিতান্ত দুর্ভাগ্য ক্রমে রামদুলাল অল্প বয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হন। তাঁহার একটি শিশু ভ্রাতা ও ভগিনীকে লইয়া তিনি বড়ই বিপন্ন অবস্থায় পড়িলেন। কলিকাতায় তাঁহার মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাস মহাশয় থাকিতেন। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি ভ্রাতা-ভগ্নীকে লইয়া মাতামহের আশ্রয়ে আসিলেন।

মাতামহের অবস্থাও 'অদ্যভক্ষ্য-ধনুর্গুণঃ' গোছ। সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দিন চলিত। কিন্তু এ অবস্থাতেও তিনি তাঁহার দুঃস্থ দৌহিত্রকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মাতামহী হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ দত্ত-বংশোদ্ভব মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের বাটিতে পাচিকার কাজ করিতেন। রামদুলালও দত্ত মহাশয়ের গৃহে আশ্রয়লাভ করিলেন। তালপাতায় ও কলাপাতায় লিখিয়া চেষ্টা ও উদ্যমবশে রামদুলাল বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন।

---

১. তরু দত্তের জন্ম ১৮৫৬, মৃত্যু ১৮৭৭ খ্রী.

২. অনাথ দেব লোকান্তরিত।

৩. রামদুলাল সরকারের জন্ম ১৭৫২, মৃত্যু ১৮২৫ খ্রী.

মদন দত্ত মহাশয় দেখিলেন, বালকটি বেশ চৌকোশ ও পরিশ্রমী। তিনি তাহাকে বিল-সরকার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঁচ টাকা মাসিক বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। একবার রামদুলাল কোন দূরতর স্থানে বিল সাধিতে যান। পথে সন্ধ্যা হইয়া পড়ে। তাঁহার সঙ্গে অনেক টাকা ছিল। সে টাকা তাঁহার মনিবের। পথে চোর-ডাকাতের ভয়ও সে সময়ে যথেষ্ট। রামদুলাল ভাবিতেছেন টাকাগুলি যদি চোর-ডাকাতে লয় ত মনিবকে গিয়া কি বলিব? উপস্থিত বুদ্ধিবলে রামদুলাল নিজের গাত্র বস্ত্রাদি খুলিয়া তাহাতে সেই টাকা বাঁধিলেন এবং অতি দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় সেই টাকার পুঁটুলি মাথায় দিয়া গাছতলায় শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইলেন। ভগবানের ইচ্ছায় সে রাত্রে কোন চোর বা ডাকাত তাঁহার টাকা লইতে আসিল না। পরদিন রামদুলাল আসিয়া প্রভুর নিকট সমস্ত কথা বলিয়া সেই টাকা বুঝাইয়া দিলেন। এই দরিদ্র বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সততা দেখিয়া দত্তজা মহাশয় দশ টাকা বেতন করিয়া তাঁহাকে শিপ্-সরকারে কাজ দেন।

এই শিপ্-সরকারি কার্য্যেই তাঁহার ভাগ্য-প্রসন্ন হইল। শিপিং-অফিসের কাজকর্ম তিনি খুব ভালরূপ বুঝিতেন। সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে গঙ্গার চড়ায় দুই একখানি জাহাজ প্রায় জলমগ্ন হইত। এ জলমগ্ন জাহাজগুলি মালামাল সমেত বিক্রয় হইত। যাহারা এ সব জলে-ডোবা জাহাজ কিনিতেন, তাঁহারা ইহার মাল বেচিয়া টাকা পাইতেন। অবশ্য এটা ভাগ্যের কথা। কাহারও ভাগ্যে যথেষ্ট লাভ হইত, কাহারও বা ক্ষতি হইত। রামদুলাল অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিবলে এই সকল জাহাজ কিনিলে লাভ কি ক্ষতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেন।

একবার তাঁহার মনিব দত্তজা মহাশয় তাঁহাকে এইরূপ একখানি জলমগ্ন জাহাজ কিনিবার জন্য চৌদ্দ হাজার টাকা গণিয়া দেন। রামদুলাল নিলামি-অফিসে উপস্থিত হইয়া দেখেন তাঁহার আসিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় জাহাজখানি ইতিপূর্বেই ডাক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আর একখানি ডোবা-জাহাজ তখনও নিলামের মুখে আছে। রামদুলাল দেখিলেন দ্বিতীয় জাহাজখানি কিনিলেও যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। তিনি প্রভুর অনভিমতে দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই জাহাজখানি চৌদ্দ হাজার টাকায় কিনিলেন।

তাহার পর মুহূর্তেই জাহাজের অধিকারী এক সাহেব আসিয়া উপস্থিত। সাহেবের বড় ইচ্ছা ঐ জাহাজখানি তিনি কেনেন। তিনি যুবক রামদুলালকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন, তাহাকে চৌদ্দ-হাজার টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু রামদুলাল কিছুতেই হটিলেন না। শেষ সেই সাহেব এক লাখ চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়া সেই জাহাজ খরিদ করেন। এক মুহূর্তে বুদ্ধিবলে এক লাখ টাকা নগদ লাভ পাইয়া রামদুলাল উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন ও তাঁহার সম্মুখে সেই এক লাখ চৌদ্দ হাজার টাকা গণিয়া দিলেন। দত্তজা মহাশয় এই যুবকের নির্লোভিতা ও প্রভুভক্তি দেখিয়া বড়ই মোহিত হইয়া বলিলেন, "রামদুলাল। এই এক লাখ টাকা লাভ, তোমার বরাতেই হইয়াছে। আমার চৌদ্দ হাজার টাকা আমি লইতেছি। কিন্তু প্রারব্ধ-লব্ধ ঐ লাখ টাকা তোমার।"

এই ঘটনায় রামদুলালের ভাগ্য-পরিবর্তন হইল। এই লাখ টাকাকে মূলধন করিয়া তিনি ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। সততায় ও তীক্ষ্মবুদ্ধিবলে তিনি অতুল ধনেশ্বর হইয়া উঠেন। এইবার তাঁহার খুব উন্নতির সময় আসিল। তিনি সাহেব-পার্টনার বা অংশীদার লইয়া চারিখানি বাণিজ্য-জাহাজ চালাইতে লাগিলেন। সুদূর আমেরিকার সহিত তাঁহার চালানি বাণিজ্য-দ্রব্যের আদান প্রদান চলিত।

মৃত্যুকালে তিনি এক কোটির উপর টাকা রাখিয়া যান। আরও অধিক রাখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু দান-ধ্যানেই তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয় হইত। ১২৩১ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়।

ইহাঁর দানের কথাটা এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ, হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তিন হাজার এবং প্রত্যহ অফিসে বসিয়া ৭০/৮০ টাকা ইনি দরিদ্রদিগকে

দিতেন। অনেক গরীব-দুঃখী তাঁহার বাটিতে নিয়মিতরূপে অন্ন পাইত। দরিদ্র-প্রতিবাসীদের অবস্থা সম্বন্ধে সন্ধান লইবার জন্য তিনি চাকর নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়ার অতিথিশালায় এখনও অনেক লোক অন্ন পায়। দুই লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করিয়া ইনি কাশীতে তেরটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকালে ইনি দুই পুত্র পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান; ইহাঁর শ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রামদুলাল সরকার মহাশয় একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। টাকা হইলে অনেকেই দাম্ভিক হয়। কিন্তু ভগবান রামদুলালের চরিত্রে দাম্ভিকতা বলিয়া কোন কিছু দেন নাই। অতুল ধনেশ্বর হইলেও রামদুলাল একখানি চাদর গায়ে দিয়া চটীজুতা পায়ে দিয়া মদন দত্ত মহাশয়ের নিকট তাঁহার পূর্ব বেতন দশটি টাকা আনিতে যাইতেন। মদন-বাবুর মৃত্যুর পর আর তিনি দত্ত বাড়িতে যান নাই। তাই বলি, হায় রে সেকাল! সেকালের বাঙ্গালীর যে মহত্ত্ব ছিল, এখন কি তাহা আছে?

বলরাম দের স্ট্রীট

এই পথটি জোড়াসাঁকো-পল্লী হইতে আরম্ভ হইয়া, বরাবর মানিকতলা স্ট্রীটে আসিয়া মিশিয়াছে। এই বলরাম দের স্ট্রীটের যে অংশটি মানিকতলা স্ট্রীটে মিশিয়াছে, তাহার অতি সান্নিধ্যে সিমুলিয়ার গোঁসাইদিগের বাটি। পাঠক মোটের উপর জানিয়া রাখুন, প্রভুপাদ বলাইচাঁদ গোস্বামী ও প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই গোঁসাই-বংশ সম্ভূত। বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়ের বাটির গায়েই ৬৯নং বলরাম দের স্ট্রীট। এই বাটিতে বঙ্গের ব্যারিস্টার কুলতিলক, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ডবলু, সি, বোনার্জির) পৈতৃক বাসভবন। উমেশচন্দ্র[১] বাঙ্গালীর অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ ব্যবহারজীবি বঙ্গদেশে খুব কম জন্মিয়াছে। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাঁর পিতামহ পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঘাণ্ডা গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করেন। তিনি কলিয়ার বার্ড কোংর অফিসের বড়বাবু বা মুৎসুদ্দি ছিলেন। সেকালের সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে, এই উকিল কোম্পানির খুব প্রতিপত্তি ছিল। পীতাম্বর সর্বানন্দী-মেল ভুক্ত। পীতাম্বর খিদিরপুরের সোনাই নামক স্থানে এক ত্রিতল বাটিতে বাস করিতেন। এক যোত্রহীন মক্কেলের মোকদ্দমায় তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন। এক সময়ে উচ্চ অবস্থাসম্পন্ন, পরে যোত্রহীন এই অবীরা, পীতাম্বরের চেষ্টাতেই এই বাটি সম্বন্ধীয় সরিকানি মোকদ্দমা জেতেন। তাঁহার এমন কিছু ছিল না যে তিনি উকিলের ফি বা উপকারী পীতাম্বর তাঁহার জন্য যে অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা পরিশোধ করেন। শেষে এই ত্রিতল বাটিখানি তিনি পীতাম্বরকে বিক্রয় করিয়া ঋণমুক্ত হন। এই বাড়ির কম্পাউন্ড পঁচিশ বিঘা জমি। পীতাম্বর এই বাড়ি উত্তমরূপে মেরামত করিয়া প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় পরিণত করেন। এই বাড়িতে পীতাম্বর অনেক ক্রিয়াকলাপ করিয়াছিলেন। দোল, রাস প্রভৃতিতে খিদিরপুর, ভবানীপুর, বেহালা, কালীঘাট, কলিকাতা প্রভৃতি সমাজের ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হইতেন।

পীতাম্বর কুলক্রিয়ায় অগ্রগণ্য ছিলেন। এই দীন লেখকের পিতামহ ৺গুরুচরণ মুখোপাধ্যায় পীতাম্বরের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। গুরুচরণের আদিনিবাস শান্তিপুর। শান্তিপুরের বিখ্যাত তেজস্বী পণ্ডিত লক্ষ্মীতলা পাড়ার ভট্টাচার্য-বংশীয় রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ গুরুচরণের প্রপিতামহ। রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। তৎকালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মত শান্তিপুরে তাঁহার সমকক্ষ দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিত খুব কম ছিল। এখন কালধর্মে লক্ষ্মীতলা-পাড়ার এই ভট্টাচার্য বংশ নানাস্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁদের এক শাখাভুক্ত স্বর্গীয় বাবু শ্যামলাল ও কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়। এই কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় হাবড়া-শালখিয়ায় বাস করিতেন। ইনিই সুপ্রসিদ্ধ কে, এল, মুখার্জি এণ্ড কোংর প্রতিষ্ঠা করেন।

পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করিবার পর এ দীন লেখকের পিতামহ

১. উমেশচন্দ্রের জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৯০৬ খ্রী.

পূর্বপুরুষ খিদিরপুরে আসিয়া বসবাস করেন। এই অধম লেখকের পিতৃদেব স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়েই এক বয়সী। দুই ভায়ে বড়ই ভালবাসা ছিল।

উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিখ্যাত অ্যাটর্ণি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীন-চেতা, ধর্মভীরু অ্যাটর্ণি, খুব কমই জন্মিয়াছে। গিরিশচন্দ্র, ত্রিবেণীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বংশোদ্ভূতা এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভেই উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। উমেশচন্দ্রের আর এক সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও অ্যাটর্ণি হইয়াছিলেন। কিন্তু অপরিণত যৌবনে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া সত্যধন বাবু পরলোক গমন করেন। সত্যধনের পুত্রাদি নাই, তিন কন্যা। উমেশচন্দ্র বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল-বংশের এক ভাগ্যবতী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সদ্‌গুণসম্পন্না রমণীর গর্ভে মিঃ শেলী কমলকৃষ্ণ বোনার্জি ও মিঃ আর, সি, বোনার্জি প্রভৃতি গণনীয় ব্যারিস্টারগণের জন্ম হইয়াছে।

বাল্যকালে উমেশচন্দ্র পড়াশুনায় বড় অমনোযোগী ছিলেন। শখের থিয়েটারের উপর তাঁহার বড়ই ঝোঁক ছিল। একদিন কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁহাদের শখের দলের অভিনয় হয়। অভিনীত নাটক মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা'। বোনার্জি মহাশয় শর্মিষ্ঠার ভূমিকা লইয়াছিলেন। প্রতিভা সকল কাজেই নিজের শক্তি প্রকাশ করে। শর্মিষ্ঠার কলাকৌশলময় অভিনয় সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। সেই সভায় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন একজন দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি যখন পরিচয় পাইলেন, কলিকাতা সদর-দেওয়ানি আদালতের প্রধান অ্যাটর্ণি গিরিশবাবুর পুত্র এই শর্মিষ্ঠার ভূমিকা লইয়াছেন, তখন তিনি আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ মগ্ন হইয়া বলেন, "কি? গিরিশবাবুর ছেলে! সে থিয়েটার করিতেছে।"

বোনার্জি মহাশয় প্রথমে ওরিয়েন্ট্যাল-সেমিনারি, তৎপরে হিন্দু স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করেন। পাঠে অমনোযোগী দেখিয়া তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে 'আর্টিকেল্ড ক্লার্ক' করিয়া নিজের অফিসে বাহির করেন। কিন্তু ভাগ্য, যশ ও প্রতিভা এই অফিসের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে কেন? ভবিষ্যৎ স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের প্রতিভা, আইন-অভিজ্ঞতা, উকিলের অফিসের কক্ষ প্রাচীর মধ্যে বিলীন হইবে কেন? স্বাধীনচেতা উমেশচন্দ্রের এ অ্যাটর্ণি-গিরি ভাল লাগিল না।

১৮৬৪ খৃস্টাব্দে রোস্তমজি নামক এক পারসী সদাগর-প্রদত্ত বৃত্তি অবলম্বনে, উমেশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। তিনি পিতামাতার অজ্ঞাতসারে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা সাত্ত্বিক হিন্দু। তাঁহার পিতা মহাষ্টমীর দিন দুর্গোৎসবের পূজার দালানে বসিয়া এই সংবাদ পাইয়া বিশেষ মর্মাহত হন। গিরিশবাবুর বলরাম দের স্ট্রীটের বাটিতে খুব সমারোহে দুর্গোৎসব হইত। সেবার পূজার আনন্দ একেবারে নিভিয়া গেল।

১৮৬৮ খৃস্টাব্দে, তিনি ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। পিতার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কারণ তিনি ইতিপূর্বেই লোকান্তরবাসী হইয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের ন্যায় পিতৃমাতৃভক্ত সন্তান খুব কমই দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ব্যারিস্টারি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এই আনন্দস্রোত পিতৃবিয়োগ জনিত বিষন্নতার মধ্যে ঢাকা পড়িয়া গেল।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার মাতা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় সমাজ-ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। তদুত্তরে উমেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "মা! যদি হিন্দুধর্মের কোন বিশেষত্ব থাকে, স্বাতন্ত্র্য থাকে, পবিত্রতা থাকে তাহা হইলে বিলাত বাস করায় তাহা আমার গিয়াছে। আমি একটা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সহায়তায় জাতে উঠিয়া তোমার ও কুলদেবতা রাধাকান্তের পবিত্রতা নষ্ট করিতে চাই না। তবে আমি তোমার খুব কাছেই থাকিব, যাহাতে তুমি সর্বদা আমায় দেখিতে পাও তাহাও করিব। সন্তানের কর্তব্য যে সমস্ত কাজ, তাহা করিতেও আমি বিরত থাকিব না।"

ভবিষ্যৎ জীবনে তিনি অক্ষরে অক্ষরে এ প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়াছিলেন। খিদিরপুর সোনাই নামক স্থানে তাঁহার পিতামহের যে বাড়ি ছিল, তাহার অবস্থা তখন অতি জীর্ণ। গিরিশবাবু সোনাই ত্যাগ করিয়া তখন বলরাম দের স্ট্রীটের বর্তমান বাটি খরিদ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র পিতামহের এই ভদ্রাসনের নবভাবে সংস্কার করিয়া, লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে পরবর্তীকালে এইস্থানে এক প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কম্পাউণ্ডের মধ্যে তিন চারিটি পুষ্ক-রিণী-খনন করিয়া তাহা জননীকে দিয়া প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। নবগৃহে প্রবেশের পূর্বে উমেশ-চন্দ্রের জননী এই বাটিতে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে গ্রহযাগ ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি করান। তাহার কয়েক-মাস পরে সাহেবি-ধরণে এই বাটিটি সজ্জিত করিয়া উমেশচন্দ্র বহুদিন এই বাটিতে বসবাস করেন। এখন এ প্রাসাদ-তুল্য বাটির চিহ্ন মাত্র নাই। খিদিরপুরের-ডকে এই বাটি গ্রাস করিয়াছে। ইহার পর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পার্ক স্ট্রীটের মধ্যে ৬নং সুবৃহৎ ত্রিতল বাটিটি খরিদ করেন। এই বাটিতে ১৮৫৯ হইতে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের ভূতপূর্ব লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের আবাসস্থান ছিল। গ্রাণ্ট সাহেব এই বাটিটিকেই লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরগণের প্রাসাদে পরিবর্তন করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইতি-পূর্বে 'বেলভেডিয়ার প্রাসাদটি' লাট-সাহেবদের বাসের জন্য নির্বাচিত করায় ছোটলাট গ্রাণ্টের এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়।

উমেশচন্দ্র যে সময়ে সর্ব প্রথমে ব্যারিস্টারি কার্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে হাইকোর্টে আরও দুইজন বাঙ্গালী ব্যারিস্টার ছিলেন। ইহাদের একজন বঙ্গের অমর-কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও অপর ব্যক্তি স্বনামখ্যাত স্বদেশ-হিতৈষী মহাপ্রাণ মনোমোহন ঘোষ। মনোমোহন মফঃস্বলের ব্রিফ্‌ লইয়াই কিছু ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, আর মাইকেলের ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে আদৌ মনোযোগ ছিল না। থাকিলে আমরা হয়ত 'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমা', 'ব্রজাঙ্গনা', প্রভৃতি কাব্যগুলি বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কাররূপে পাইতাম না। ক্রমে ক্রমে উমেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উদীয়মান ব্যারি-স্টার হইয়া পড়িলেন। দিনে দিনে তাঁহার যশঃপ্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। এই সময়ে সাহেব-ব্যারিস্টারগণ দলে পুষ্ট, বাঙ্গালীর মধ্যে একা উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্র শোভাবাজার রাজা কমল-কৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট এ সময়ে যথেষ্ট সাহায্য পান। এইজন্য উমেশচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'শেলী কমলকৃষ্ণ বোনার্জি' রাখেন। উমেশচন্দ্রের আয় পরবর্তী কালে মাসিক দশ হাজার টাকার উপর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথমে Standing-Counsel হয়েন। একবার নয় চারি চারিবার উমেশচন্দ্র এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট দুইবার তাঁহাকে হাইকোর্টের জজের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উমেশচন্দ্র তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। উমেশচন্দ্র ন্যাশা-ন্যাল-কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার স্থায়িত্ব জন্য তিনি বিলাতে গিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বিলাতের 'ইণ্ডিয়া' কাগজের জন্যও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। কয়েকবার[১] ইনি জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে উমেশচন্দ্র ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া শরীরের অসুস্থতা বশত ইংলণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনের সান্নিধ্যে 'ক্রয়ডেনে' খিদিরপুর-হাউস নামধেয় এক প্রাসাদতুল্য বাটিতে উমেশচন্দ্র বিলাতে থাকিতেন। এ বাটি তাঁহার নিজের সম্পত্তি। বিলাতে গিয়া তিনি প্রিভি-কাউন্সিলে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। পসারও খুব জাঁকিয়াছিল। তৎপরে পার্লামেণ্টের সদস্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এ সময়ে চক্ষুরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে কর্মময় জীবন হইতে অবসর লইতে হয়। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুলাই বিলাতের এই 'খিদিরপুর-হাউসেই' ইহাঁর দেহত্যাগ হয়। বাহিরে সাহেবি ভাবাপন্ন হইলেও উমেশ-চন্দ্র অন্তরে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষী খুব কম জন্মিয়াছে। ইহাঁর

১. উমেশচন্দ্র দুইবার কংগ্রেসের সভাপতির পদে নির্বাচিত হন; প্রথম (১৮৮৫) ও অষ্টম (১৮৯২) অধিবেশনে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ শেলী বোনার্জি হাইকোর্টের রিসিভার; অন্যতম পুত্র আর, সি, বোনার্জি হাই-কোর্টে ব্যারিস্টার।

দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর স্ট্রীট

দয়ারাম বসু পলাশী আমলের লোক। নবাব কর্তৃক কলিকাতা লুণ্ঠনের পর যে ক্ষতিপূরণের টাকা কলিকাতার অধিবাসীদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল, তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকজন বাঙ্গালী কমিশনার নিযুক্ত হন। দয়ারাম বসু ইহাঁদের অন্যতম। ইহাঁর বংশোদ্ভূত দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর নাম হইতেই উল্লিখিত পথের নামকরণ হইয়াছে। ১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান কৃষ্ণরামের জন্ম হয়। কৃষ্ণরাম লবণের ব্যবসায়ে যথেষ্ট ধনশালী হইয়া উঠেন। পরবর্তী কালে ইনি মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে হুগলীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় দেওয়ান কৃষ্ণরাম লাখ-টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছিলেন। দেওয়ান কৃষ্ণরাম কাশীতে অনেক মন্দির নির্মাণ করিয়া-ছিলেন এবং কটক হইতে পুরী পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল, তাহার দুইধারে পথিকদের ব্যবহারের জন্য আম্রবৃক্ষ শ্রেণী বসাইয়া দেন। ৭৪ বৎসর বয়সে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ান কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয়।

মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর গলি

এই গলিটি শিমলা অঞ্চলে। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী আদর্শ বৈষ্ণব ও পরম ভাগবত ছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র পরম পণ্ডিত বৈষ্ণব চূড়ামণি প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী[১] এখন বঙ্গের সর্ব-ত্রই পরিচিত। অতুলকৃষ্ণের বাহ্য-সৌন্দর্য যেমন মনোরম তাঁহার অন্তরও সেইরূপ সুন্দর। এরূপ বিনয়ী, শিষ্টাচারী পণ্ডিত লোকের সহিত যাঁহারা একবার আলাপ করিয়াছেন তাঁহারাই মোহিত হইয়াছেন। কার্যে, কথায়, ব্যবহারে, আচারে ইনি আদর্শ-বৈষ্ণব। কেবল পাণ্ডিত্যের ও বৈষ্ণব-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের জন্য নয়, অতুলকৃষ্ণ বঙ্গদেশে একজন সুবক্তা বলিয়াও যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ ইহাঁর দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

মতিলাল শীলের স্ট্রীট[২]

মতিলাল শীল (১৭৯২—১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ) লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে জন্মগ্রহণ করেন। মতি-লালের প্রথম জীবন অবস্থাহীনতা নিবন্ধন সুখের ছিল না। এই মহাত্মার পিতার নাম চৈতনচরণ শীল। মতিলাল বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখা-পড়া শিখিয়া যৌবনে কলিকাতার কেল্লায় একটি কেরাণীগিরি কর্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি কর্ক ও বোতলের ব্যবসা করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। এই অর্থ তাঁহার প্রথম লক্ষ্মীলাভ। স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার প্রথম পুরস্কার। ইহার পর ইনি চাকরি ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার বন্দরে যে সমস্ত জাহাজ আসিত, তাহাদের মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। কাপ্তেনদের নিকট এই মুৎসুদ্দিগিরি এবং মালামাল বিক্রয়ে ও ক্রয়ে মতিলাল বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ভাগ্য সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্তিত হয়। এই সময়ে তিনি প্রচুর ধনেশ্বর। জাহাজের কাপ্তেনী ছাড়িয়া এই সময়ে মতি-লাল হাউসের মুচ্ছুদ্দিগিরি আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি তিনটি বড় বড় নামজাদা সওদাগরি অফিসের মুচ্ছুদ্দি হন। মা লক্ষ্মীর কৃপাপাত্র হইয়া মতিলাল তাঁহার স্বোপার্জিত অর্থ অনেক পুণ্যানুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইনি 'শীলস্ স্কুল' স্থাপন করেন। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের এক টাকা বেতন ছিল। কিন্তু পরিশেষে মতিলাল বিদ্যালয়টিকে 'ফ্রি' করিয়া দেন। পরে এটি কলেজে পরিণত হইয়াছে ও অনেক গরীবের ছেলে এই ধনকুবের মতিলালের কলেজে বিনা বেতনে লেখা-পড়া শিখিয়া দুই পয়সা করিয়া খাই-তেছে। এই কলেজের পরিচালনার জন্য মতিলাল অনেক টাকা মূলধন দিয়া গিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মত মতিলালও এক অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এ অতিথিশালা ই, বি, রেল-

১. অতুলকৃষ্ণের জন্ম ১২৭৪, মৃত্যু ১৩৫৩ ব.

২ 'শীলস্ স্কুল' ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

ওয়ের বেলঘরিয়া নামক স্থানে। আগে প্রতিদিন তিন চারিশত অতিথি-সেবা হইত। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্য মতিলাল বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দান করেন। মতিলাল এক কথায় শরণাগত-পালক, বিপন্নের রক্ষক। পরোপকারের জন্যই বিধাতা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আরও অনেক সৎকার্যে মতিলালের দান আছে। সব বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিবার স্থান আমাদের নাই। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে মতিলাল শীল মহাশয় গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। গঙ্গাতীরে সাধারণের স্নানের জন্য ইনি একটি ঘাট নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা 'মতিশীলের ঘাট' বলিয়া পরিচিত।

প্যারীচরণ সরকারের স্ট্রীট

যাঁহার ফার্স্টবুক, সেকেণ্ডবুক, থার্ডবুক[১] পড়িয়া বাঙ্গালী প্রথম ইংরাজি শিখে, সেই মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার হইতেই এই পথটির নামকরণ হইয়াছে। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। হেয়ার সাহেবের স্কুলে ইনি প্রথমে ইংরাজি শিক্ষা করেন। তিন বৎসর হেয়ার-স্কুলে পড়িয়া ইনি জুনিয়ার স্কলারশিপ্ প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। পরে সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪০ টাকা বৃত্তি পান। স্কুল ছাড়িয়া ইনি মাস্টারি আরম্ভ করেন এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি প্রণয়নেই প্যারীচরণ জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। হুগলী ব্র্যাঞ্চ ও বারাসত বিদ্যালয়ে মাস্টারি করার পর ইনি হেয়ারস্কুলে হেড-মাস্টার হন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালীকে ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক করা হইত না। প্যারীচরণই প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি ভাষার প্রথম অধ্যাপক। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হইলে প্যারীচরণ তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হন। প্যারীচরণ ছাত্রদের বড়ই প্রিয় ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত ও তিনিও তাঁহাদের পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। প্যারীচরণের চেষ্টায়, 'সুরাপান-নিবারণী-সভা' প্রতিষ্ঠা হয়। সাধারণকে সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইংরাজিতে 'Well-wisher' ও বাঙ্গলায় 'হিতসাধক' বলিয়া দুইখানি পত্রিকা প্রচার এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্যারীচরণ চোরবাগানে একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার মহা দুর্ভিক্ষের সময় প্যারীচরণ একটি অন্নসত্র খুলিয়া অনেককে অন্ন দান করেন। ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর ফার্স্টবুক, সেকেণ্ডবুক প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থগুলি আজও সমাদৃত।

প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্ট্রীট

প্রসন্নকুমার ঠাকুর[২] স্বনামধন্য পুরুষ। পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে তাঁহার প্রাসাদ যেখানে ছিল, এখন সেখানে 'Tagore Castle' হইয়াছে। ইনি গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র এবং মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের খুল্লতাত। প্রসন্নকুমার অতুল ধনেশ্বর ছিলেন। তিনি ওকালতি পাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখনও প্র্যাক্‌টিস করেন নাই। আবার অন্য মতে, স্বশ্রেণীর ধনবানগণের মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য ওকালতি করিয়া বৎসরে গড়ে দেড়লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে যখন গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ-জমি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'বেঙ্গল-হরকরা' নামক সংবাদপত্রে এই সম্বন্ধে তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্যের আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের এই আন্দোলন ও টাউন-হলে এ সম্বন্ধে এক বিরাট সভা পরবর্তী কালে সুফল প্রসব করিয়াছিল। তখনকার গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড এই আন্দোলনের ফলে নিয়ম করিয়া দেন যে, পঞ্চাশ বিঘার অনধিক লাখেরাজ জমিগুলি বাজেয়াপ্ত বন্ধ হইল। লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে ব্যবস্থাপক-সভার সৃষ্টি হইলে

১. আধুনিক পদ্ধতির নতুন নতুন বহু বই প্রচলিত হইবার ফলে এই সকল বইয়ের একদা জনপ্রিয়তা অধুনা বহুলাংশে ম্লান।

২. প্রসন্নকুমারের জন্ম ১৮০১ খ্রী.

প্রসন্নকুমার ঐ সভার ক্লার্ক-অ্যাসিস্টাণ্টের পদে নিযুক্ত হন ও গবর্ণমেণ্টকে আইন-প্রণয়নে সাহায্য করেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রথম সভ্য হন, কিন্তু পীড়িত থাকায় এ কার্য করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি দেন। তিনি ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে আগস্ট দেহত্যাগ করেন।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের লেন

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ স্মল-কজ-কোর্টের জজ স্বনামখ্যাত হরচন্দ্র ঘোষের পুত্র। ইহাঁদের আদিনিবাস বেহালা-সরশুনা। এখনও এই সরশুনার ঘোষ পরিবারের আবাস-বাটির নিকটে রাজা বসন্তরায়ের খনিতে কমলা, বিমলা ও রায়দীঘি নামক তিনটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী বর্তমান আছে। প্রতাপ ঘোষ মহাশয় একজন বিখ্যাত জমিদার। বারাণসী ঘোসের স্ট্রীটে ইহাঁর সুবৃহৎ অট্টালিকা বিদ্যমান। প্রতাপচন্দ্র বহুদিন কলিকাতা-কলেক্টরিতে 'রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স' পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য করেন ও পরে তিনি পেন্সন লইয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে নির্জনবাস করিতেন।[১]

রাজা গুরুদাসের স্ট্রীট

এ রাস্তাটি বর্তমান বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসের পার্শ্ব দিয়া বরাবর মানিকতলা স্ট্রীটে গিয়া মিলিত হইয়াছে। রাজা গুরুদাস মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র এবং নবাব মীরজাফরের আমলে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমারের শোচনীয় পরিণামের পর গুরুদাস কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদে যান। বর্তমান বিডন গার্ডেন এখন যে স্থান অধিকার করিয়া আছে, জনপ্রবাদ এই, এই স্থানেই মহারাজা নন্দকুমারের আবাসভবন ছিল এবং এই বাটি হইতেই বৃদ্ধ মহারাজা সুপ্রীম কোর্টের জজ লিমেস্টারের আদেশে গ্রেফতার হইয়া সেকালের কলিকাতা-জেলে প্রেরিত হন।

রাজা কালীকৃষ্ণের লেন

রাজা বাহাদুর কালীকৃষ্ণের[২] নামানুসারে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র। বিডন স্কোয়ারের বর্তমান উদ্যানে এই কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের এক প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ লেন

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পুত্র। হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিতেন এবং বহুদিন ধরিয়া তিনি শিয়ালদহের পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

রাজা গোপীমোহন স্ট্রীট

রাজা গোপীমোহন দেব মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পোষ্যপুত্র। গোপীমোহন সুপ্রীম-কাউন্সিলের মেম্বর মিঃ স্টেবলস, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল স্যর জেমস রিবেট কার্ণাক (প্রথম কম্যাণ্ডার ইন-চিফ) স্যর জন ম্যাকফারসন (বঙ্গের প্রতিনিধি-গবর্ণর) প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণের দেওয়ানি করিয়াছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের আমলে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে গোপীমোহন 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক গোপীমোহনকে বড়ই ভালবাসিতেন। অনেক সময়ে রাজকার্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাকে ডাকিয়া পরামর্শ লইতেন। গোপীমোহন সংস্কৃত-ভাষায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য-লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সময় ন্যায় দর্শন ও উপনিষদ প্রভৃতির কূটতর্ক তুলিয়া ও তাহার মীমাংসা করিয়া তিনি অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন। ভূগোল ও জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা ছিল। হিন্দু-ভূগোলের মতে তিনি প্রচুর ব্যয়ে পৃথিবীর একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করান। গোপীমোহনই সেকালের সর্বজনবিদিত 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন।

---

১. প্রতাপচন্দ্র ঘোষের জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৯২১ খ্রী.

২. রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের জন্ম ১৮০৮, মৃত্যু ১৮৭৪ খ্রী.

ধনীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইনি সালিশি দ্বারা মিটাইয়া দিতেন। সংগীতশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ১৭ই মার্চ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এক-মাত্র পুত্র স্বনামখ্যাত রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ লেন

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর স্যর রাজা রাধাকান্তের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার জন্ম। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে ইনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ৩০ এপ্রিলের গেজেটে গবর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়, "রাজা রাধাকান্ত দেবের উন্নত চরিত্র, পরোপকার ব্রত এবং তিনি ও তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টকে যেরূপ ভাবে বরাবর সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য ভাইসরয় ও সকাউন্সিল গবর্ণর-জেনারেল কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেবকে (স্যর রাধাকান্তের পুত্র) রাজা বাহাদুর উপাধি দান করিলেন।" রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত, ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। 'কায়স্থকুল-সঙ্গ-রক্ষিণী সভা' ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা জমিদার-সভা ও সমাজ-ধর্ম বর্ধিনী সভার সভাপতিত্ব পদেও কয়েকবার বরিত হন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর প্রজাহিতৈষী জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারির মধ্যে অনেক স্থানে তিনি পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন ও গ্রামে গ্রামে নিম্ন-প্রাইমারি শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করেন। নানা সৎ-কার্যে অর্থসাহায্য, লোকহিতকর সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি দেশের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক[১] পাথুরিয়াঘাটার সুবিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৈষ্ণবদাস মল্লিকের পোষ্যপুত্র। চোরবাগানে এই রাজা বাহাদুরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা 'মার্বেল-প্যালেস' বলিয়া সাহেব মহলে পরিচিত। এতাদৃশ সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা কলিকাতায় খুব কমই আছে। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ আমরা মুক্তারামবাবুর স্ট্রীটের পরিচয়ে দিয়াছি। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে রাজা-বাহাদুর প্রতিদিন অসংখ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোককে আহার্য প্রদান করিতেন। এখনও পর্যন্ত ইহাঁর বংশধরেরা একটি অতিথিশালা বজায় রাখিয়াছেন।[২] এই কলিকাতা সহরে প্রত্যহ দুই তিন শত গরীব ভিখারী এই অতিথিশালা হইতে নিয়মিত অন্ন প্রাপ্ত হয়।

রমাপ্রসাদ রায় স্ট্রীট

ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের নাম রমাপ্রসাদ রায়।[৩] তাঁহার নাম হইতেই এ পথের নামকরণ হইয়াছে। রমাপ্রসাদ হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই উকিলশ্রেণী হইতে সর্বপ্রথমে প্রধান ধর্মাধিকরণ হাইকোর্টের জজ-রূপে নির্বাচিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটায় তিনি হাই-কোর্টের বেঞ্চে বসিতে পান নাই। রমাপ্রসাদ বিদ্যায় ও শক্তিতে পিতার সমকক্ষ না হইলেও তাঁহার অনুপযুক্ত পুত্র ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, ফার্সী ও ইংরাজি-ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পৈতৃক বিষয়-আশয়ও তিনি নিজের বুদ্ধিবলে অনেক বাড়াইয়া গিয়াছেন। ২৪ পরগনা এবং অন্যান্য জেলায় ইহাঁদের জমিদারি আজও বর্তমান।[৪] রমাপ্রসাদ রায়ের দুই পুত্র বাবু হরিমোহন রায় ও

---

১. রাজেন্দ্র মল্লিকের জন্ম ১৮১৯, মৃত্যু ১৮৮৭ খ্রী.

২. বর্তমানকালে অতিথিশালাটির পূর্বের জৌলুষ আর নাই।

৩. রমাপ্রসাদের জন্ম ১৮১৭, মৃত্যু ১৮৬২ খ্রী.

৪. জমিদারি প্রথা বিলোপের ফলে এখন এই জমিদারি আর নাই।

বাবু প্যারীমোহন রায়। সুকিয়াজ স্ট্রীটে ইহাঁদের কলিকাতার বাসভবন।[১]

রামমোহন মল্লিকের লেন

বড়বাজারের মল্লিক-বংশের নিমাই মল্লিক মহাশয়ের প্রথম পুত্র রামমোহন মল্লিক। ১৭৭৯ খৃীঃ অব্দে রামমোহনের জন্ম হয়। রামমোহন অতিশয় দাতা ও সদাশয় লোক ছিলেন। দেবসেবা ও অতিথি-সেবায় তিনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লবণের ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন এবং অনেক বড় বড় জমিদারি কিনিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি এক ক্রোর টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খৃীস্টাব্দে পিতার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য বড়বাজারে গঙ্গার-তীরে তিনি একটি স্নানের-ঘাট নির্মাণ করিয়া দেন।

মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণের লেন

মহারাজা স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কে, সি, আই, ই,[২] রাজা রাজকৃষ্ণের পুত্র এবং মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁহার সময়ে একজন সর্বজন-বিদিত ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। সাধারণ রাজকার্য ও সভা-সমিতিতে তিনি অবাধে যোগ দান করিতেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত জমিদার-সভা বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মহারাজ স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করিয়াছিলেন। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বড়-লাটের মন্ত্রণা-সভার একজন সদস্যপদেও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

স্যর রাজা রাধাকান্তের লেন

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব[৩] রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র। শোভাবাজার রাজবংশের তিনি কুল-প্রদীপ। সুপ্রসিদ্ধ 'শব্দ-কল্পদ্রুম' নামক অভিধান তাঁহার প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর সুপণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী ও গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তাঁহার সময়ে তিনিই কায়স্থ-সমাজের নেতা ছিলেন একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজা রামমোহন রায়ের তিনি ঘোর প্রতিযোগী ছিলেন। রামমোহন একদিকে যেমন ব্রাহ্মধর্মের উদারমত প্রচারে মহোদ্যোগী, অন্যদিকে স্যর রাধাকান্ত তেমনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে, হিন্দুসভার পরিচালনা করিয়া প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব জীবনের শেষ অবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করেন ও সেইখানেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট

বেহালা-বড়িশার ঘোষ-পরিবারের আদিপুরুষ এই সীতারাম ঘোষ। তাঁহার পুত্র অভয়চরণ ঘোষ। তাঁহার পৌত্র স্বনামপ্রসিদ্ধ হরচন্দ্র ঘোষ। হরচন্দ্র ঘোষই ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী-জজ। এখনও হরচন্দ্রের একটি প্রস্তর-মূর্তি (Bust) ছোট আদালতের প্রবেশদ্বারে বর্তমান। বেহালা-সরশুনা ও বড়িশায় ইহাঁদের অনেক জমিজমা ও জমিদারি আছে। ডায়মণ্ডহারবার রোডের ধারে রাজা মানিক-চাঁদের গড়খাদ করা যে সুবৃহৎ বাগান ছিল, তাহা পরে হরচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্রের দখলে আসে। এখন এই সুবৃহৎ উদ্যানের সমস্ত অংশ বেহালার ধনাঢ্য-জমিদার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অম্বিকাচরণ রায়ের সম্পত্তি-ভুক্ত। রায় অম্বিকাচরণের উপযুক্ত পুত্র অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ রায়[৪] হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকিল, সাউথ-সুবার্বন-মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের মন্ত্রণা-সভার একজন সদস্য।

শোভারাম বসাকের স্ট্রীট ও লেন

শোভারাম বসাক পলাশী-আমলের একজন বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী। এই শেঠ ও বসাকগণ কলি-

---

১. রমাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত বাসভবনটি আমহার্স্ট স্ট্রীটে অবস্থিত। পিতা রামমোহন বাস করিতেন মানিক-তলার বাসভবনে, বর্তমানে এই বাড়িটি উত্তর কলিকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়।

২. নরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ১৮২২, মৃত্যু ১৯০৩ খ্রী.

৩. রাধাকান্তের জন্ম ১৭৮৩, মৃত্যু ১৮৬৭ খ্রী.

৪. সুরেন্দ্রনাথ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন।

কাতার অধিবাসী। সর্ব প্রথমে ইঁহারা সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া জঙ্গল কাটাইয়া, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত সুতার ও কার্পাস-শিল্পের ব্যবসায়ে, শেঠ ও বসাকগণ প্রচুর ধনসঞ্চয় করেন। জনপ্রবাদ এই, হলওয়েল সাহেব শ্যামবাজারের নাম এক সময়ে চার্লস বাজারে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শোভারাম চেষ্টা করিয়া তাঁহার নিকট আত্মীয় শ্যাম বসাকের নামানুসারে পুনরায় ইহা শ্যামবাজারে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন। আবার অন্যমতে, শ্যামবাজার নাম অন্য কারণ হইতে হইয়াছে। সে কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কলুটোলায় শোভারাম বসাকের নামে একটি স্ট্রীট ও বড়বাজারে একটি লেন আছে।

শঙ্কর ঘোষের লেন

দৈবকীনন্দন ঘোষ আড়পুলির ঘোষ-পরিবারের আদি-পুরুষ। দৈবকীনন্দনই সর্বপ্রথমে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পুত্রগণের নাম উদয়রাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, মনোহর, গোকুল ও গোরা-চাঁদ ঘোষ। ইহারা আড়পুলির ঘোষ-বংশ বলিয়া পরিচিত। দৈবকীনন্দনের পৌত্র রামশঙ্কর ঘোষের নাম হইতে বর্তমান গলিটির নামকরণ হইয়াছে। রামশঙ্কর ঘোষ মহাশয় 'শঙ্কর ঘোষ' নামেই সাধারণে পরিচিত ছিলেন। কোন ইংরাজ কাপ্তেনের অধীনে বেনিয়ানের কাজ করিয়া শঙ্কর ঘোষ প্রচুর বিত্তশালী হয়েন। এই অর্থের অধিকাংশই তিনি ধর্মার্থে ব্যয় করিয়া যান। কলিকাতা চোরবাগানের মোড়ে অর্থাৎ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর এই শঙ্কর ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত 'সিদ্ধেশ্বরী' কালীমন্দির আজও বর্তমান। মন্দিরগাত্রে আবদ্ধ, প্রস্তরফলকে 'শঙ্কর হৃদয়-মাঝে কালী বিরাজে' এই কয়টি কথাই শঙ্কর ঘোষের স্মৃতি বর্তমানের সহিত জড়িত করিয়া রাখিয়াছে।

বিদ্যাসাগর স্ট্রীট

দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৌরবান্বিত নামে এই পথের নামকরণ হইয়াছে। বিদ্যা-সাগর নিজেই তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। এ পথটির এরূপ নামকরণে বড় কিছু আসে যায় না। তাঁহার প্রথমভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, বর্ণপরিচয় পড়িয়া বাঙ্গালী কয়েকযুগ ধরিয়া তাহাদের মাতৃভাষা শিক্ষা করিয়া আসিতেছে। এরূপ উদ্যোগী, শ্রমশীল, কর্মবীর বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতে আর দ্বিতীয় কেহ জন্মিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। ১২২৭ সালে (১৮২০ খ্রীঃ অব্দে) বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জননীর নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাসের অবস্থা ভাল ছিল না। নয় বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে বীরসিংহ হইতে বিদ্যাসাগর পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮২৯ খৃীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। সংস্কৃত-ব্যাকরণ, স্মৃতি, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, ব্যবহার প্রভৃতি শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিয়া ১৮৪০ খৃীস্টাব্দে কলেজ হইতে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ খৃীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর ৫০ টাকা বেতনে লর্ড ওয়েলেসলির প্রতিষ্ঠিত 'ফোর্ট উইলিয়াম' কলেজের প্রধান পণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বিলাত হইতে নবাগত সাহেব সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাহেবদের লইয়া কাজ করিতে হইত বলিয়া বিদ্যাসাগর এই সময়ে ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে অমানুষী প্রতিভাবলে ইংরাজি ও হিন্দী-ভাষায় সুদক্ষ হন। ইহার পর ১৮৪৬ খৃীস্টাব্দে তিনি পুনরায় সংস্কৃত কলেজে কর্মে নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ খৃীস্টাব্দে তিনি আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫০ খৃীঃ অব্দে ৯০ টাকা বেতনে আবার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫১ খৃীস্টাব্দে প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হইলে দেড়শত টাকা বেতনে তিনি এই সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ পদে বরিত হন। পরে তিনি এই কর্মের জন্য ৩০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পান ও Special Inspecter of Schools পদে নিযুক্ত হওয়ায় এই দুই কার্যের জন্য তাঁহার পাঁচ শত টাকা বেতন হয়। এই সময়ে হিন্দু-বালবিধবাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিদ্যাসাগর 'বিধবা-বিবাহ'

নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন।[১] এজন্য সমস্ত হিন্দু-সমাজ তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। এমন কি অনেকে গোপনে তাঁহার প্রাণবধ করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নির্ভীক-হৃদয় বিদ্যাসাগর, ইহাতে বিচলিত হন নাই। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইনি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিধবা-বিবাহ আইন' বিধিবদ্ধ করিয়া লয়েন। বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগের যুবক ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত কোন কারণে মনোবাদ ঘটায়, তেজস্বী বিদ্যাসাগর এক কথায় পাঁচশো-টাকা বেতনের চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন, এবং বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠোপযোগী পুস্তক প্রণয়ণে মনোযোগ দেন। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষা-জননীর অঙ্গশোভা বর্ধনের জন্য এই সময়ে গদ্য-সাহিত্যের যুগ পরিবর্তন করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের বিক্রয়াধিক্যই এই সময়ে তাঁহার অর্থোপার্জনের প্রধান উপায় হইয়াছিল এবং ইহা হইতেই বিদ্যাসাগর প্রভূত ধনশালী হয়েন। পরদুঃখে বিদ্যাসাগরের হৃদয় স্বতঃই বিচলিত হইত। এরূপ দানবীর অধুনাতন যুগে খুব কমই জন্মিয়াছেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে (১৮৬৬ খ্রীঃ) নিজ জন্মক্ষেত্র বীরসিংহ গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ছয়মাসকাল শত সহস্র বুভুক্ষুর জঠরজ্বালা নিবারণ করেন ও অনেক বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করেন। কলিকাতার মেট্রোপলিটন কলেজ তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তি। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে মেট্রোপলিটনে বি, এ, ক্লাস খোলা হয়। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর গবর্ণমেণ্টের নিকট সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। তাঁহার নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামেও তিনি একটি উচ্চ-শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক অনাথ দরিদ্র-বালক তাঁহার অর্থসাহায্যে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন। অত বড় বিদ্যাসাগরের জীবনের সব কথা এই ক্ষুদ্র স্থানে বলা অসম্ভব। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ২৯এ জুলাই বাঙ্গালীর বিদ্যাসাগর অনন্তধামে গমন করেন।

বলরাম মজুমদারের স্ট্রীট

কুমারটুলির মজুমদার পরিবার বহুদিন হইতে বিখ্যাত। রামচন্দ্র ঘোষ এই পরিবারের আদিপুরুষ। হুগলীর নিকটস্থ আকনা গ্রাম হইতে আসিয়া ইনি সুতালুটির অন্তর্গত কুমারটুলিতে বাস করেন। নবাবের নিকট হইতে ইনি মজুমদার উপাধি লাভ করায় এই পরিবার তদবধি কুমারটুলির মজুমদার-পরিবার বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। বলরাম মজুমদার এই রামচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতার পৌত্র। এই মজুমদার পরিবার কাশীতে শিব স্থাপনা, মাহেশে দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ, কলিকাতা কুমারটুলিতে ঘাট-প্রতিষ্ঠা দ্বারা কীর্তিমান হইয়াছেন।

হিদেরাম ব্যানার্জির লেন

হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বা হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় সেকালের কলিকাতার একজন গণনীয় লোক ছিলেন। তাঁহার নামেই বর্তমান গলিটির নামকরণ হইয়াছে। সেকালে বহুবাজার অঞ্চলে অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থের বসবাস হইয়াছিল। তাঁহারা কোম্পানির আমলে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরি দ্বারা প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হইয়াছিলেন। হৃদয়রাম একজন ক্রিয়াবান লোক ছিলেন। দোল-দুর্গোৎসবে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন।

কাশী মিত্রের ঘাট স্ট্রীট

কাশীপ্রসাদ মিত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয়। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের তোষাখানায় দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইহাঁর অন্যতম পুত্র বাবু গোপাললাল মিত্র [illegible] উকিল ছিলেন। কাশী মিত্র মহাশয়ের নামে আজও একটি ঘাট কলিকাতা সহরে বর্তমান। এখানে শবদাহ হইয়া থাকে। এই ঘাট 'কাশী মিত্রের ঘাট' বলিয়া পরিচিত।

---

১. বিদ্যাসাগর রচিত 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে। এই বৎসরেই অক্টোবরে প্রকাশিত হয় 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব'।

কাশী ঘোষের স্ট্রীট

শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ সেকালের কলিকাতার একজন নামজাদা লোক। তিনি ফার্সী ভাষায় অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামদেব ঘোষ কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে বক্সীর কাজ করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। রামদেবের পুত্র রামলোচন। রামলোচনের পুত্র কাশী ঘোষ। কাশী ঘোষ স্বনামপ্রসিদ্ধ ধনী শ্রেষ্ঠ রামদুলাল দের পরম বন্ধু ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, রামদুলাল ক্রোরপতি হইবার পূর্বে মদন দত্তের সরকার ছিলেন। এই মদন দত্তের পুত্র কাশীপ্রসাদ দত্ত মহাশয় হিন্দু সমাজ বিগর্হিত অখাদ্যাদি খাওয়ায় তৎকালীন কায়স্থ-সমাজ ইহাঁকে একঘরে করিবার চেষ্টা পান। রামদুলাল তাঁহার ভূতপূর্ব মনিব পুত্রকে জাতিতে তুলিতে এক 'সমন্বয়' সভার অনুষ্ঠান করেন। ইহাতে অনেক বড় বড় কুলীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হন। এই কার্যে রামদুলালের দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু কাশী ঘোষও প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই সমন্বয়ের ফলে কাশীপ্রসাদ দত্ত পুনরায় কায়স্থসমাজে গৃহীত হন। কাশী ঘোষ সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ফেয়ার্লি ফারগুসান কোম্পানির বাড়ির মুৎসুদ্দি ছিলেন। এই কার্যে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। দান-ধ্যানও তাঁহার বিস্তর ছিল। মৃত্যুকালে ইনি ছয় পুত্র রাখিয়া যান।

জগদীশনাথ রায়ের লেন

এই গলিটি হরিঘোষের স্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাবু জগদীশনাথ রায়ের নামে এই গলির নামকরণ হইয়াছে। জগদীশবাবু একজন স্বনামধন্য পুরুষ। কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়া ইনি কলিকাতায় বসবাস করেন। কাঁচরাপাড়ার বিখ্যাত বৈদ্য-বংশে ইহাঁর জন্ম। পুলিশ-বিভাগে অতি দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া জগদীশবাবু ডিস্ট্রিক্ট-সুপারিন্টেণ্ডের পদে উন্নীত হন। জগদীশনাথ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'বিষবৃক্ষ' এই জগদীশনাথকে উৎসর্গ করেন। দীনবন্ধু, বঙ্কিম, জগদীশনাথ—এই তিন জনই এক সময়ে সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনজনেরই যশোভাগ্য একরূপ ছিল। জগদীশনাথের জামাতা জয়পুরের প্রধান রাজমন্ত্রী স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেন।[১] জগদীশবাবুর পুত্র বাবু খগেন্দ্রনাথ রায়।[২] একজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী। ইংরাজি বাঙ্গলা সাহিত্যালোচনায় ইনি বিশেষ বিখ্যাত। খগেন্দ্র-বাবু কলিকাতা পুলিসের একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট।

মানিকতলা স্ট্রীট

এই মানিকতলা স্ট্রীটের একাংশে রামবাগান পল্লীর সান্নিধ্যে রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসুর বাটি। রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয় একজন কৃতকর্মা পুরুষ। ইহাঁদের আদিনিবাস ২৪ পরগনা বহড়ু গ্রাম। বহড়ুর বসুরা এ অঞ্চলের জমিদার। শ্যামসুন্দর, ইহাঁদের গৃহদেবতা। বৈকুণ্ঠ-নাথ আজীবন যে সঙ্গীতানুরাগী হইয়া আছেন, তাহার কারণই এই শ্যামসুন্দর। বাল্যকাল হইতেই তিনি কীর্তনের ও সঙ্গীতের বড়ই অনুরাগী। প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ইনি গবর্ণমেণ্ট টাঁকশালের নায়েব-দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮০ খৃীস্টাব্দে, ইনি শিয়ালদহ পুলিস-কোর্টের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৮৮২ খৃীস্টাব্দে কলিকাতা পুলিসের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ইহাঁকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেন। ১৮৮২ খৃীস্টাব্দে ইনি কারেন্সি-অফিসের ডেপুটি-ট্রেজারার হন। ইহার পর বৎসর ইনি ভারত-সম্রা-টের রাজকীয় টাকশালের দেওয়ানপদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪ খৃীস্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে বৈকুণ্ঠনাথ অতি সুদক্ষ। সেতার, সুরবাহার, এসরাজ ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্রবাদনে ইহাঁর অতুলনীয় দক্ষতা। সাহিত্য-পরিষদের ইনি একজন গণনীয় সদস্য। সর্ববিধ লোক-হিতকর

---

১. সংসারচন্দ্র সেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

২. খগেন্দ্রবাবু গ্রন্থরচনাকালীন সময়ে সাহিত্যালোচনায় বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমানে ইনি লোকান্তরিত।

সভা সমিতিতে ইনি উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। অনেকগুলি নাটক ও মেলো-ড্রামা ইহাঁর রচিত। এগুলি কলিকাতার বেঙ্গল, ন্যাশান্যাল, এমারেল্ড প্রভৃতি থিয়েটারে খুব দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল। সঙ্গীতের সুর-যোজনায় ইনি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। বাঙ্গলা সাহিত্যের ন্যায় বৈকুণ্ঠনাথ ইংরাজি সাহিত্যেরও যথেষ্ট আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহাঁর ন্যায় নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, ইংরাজি-ভাষায় সমালোচক খুব কমই আছেন। বৈকুণ্ঠনাথ একদিকে যেমন বিদ্যাবান, অন্যদিকে তেমনি পরোপকারী, সুহৃদ-বৎসল, সদালাপী ও মিষ্টভাষী। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়া এখনও কর্মময় জগতে সুস্থ শরীরে বিচরণ করিতেছেন।[১]

কেশবচন্দ্র সেনের গলি

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের নাম হইতে এই গলির নামকরণ হইয়াছে। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন একজন অদ্বিতীয় বক্তা ও ধর্ম-প্রচারক ছিলেন। ইহাঁরই চেষ্টায় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে ইনি নববিধান-সমাজের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। কুচবিহারের স্বর্গগত মহারাজ বাহাদুরের সহিত কেশববাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন। বর্তমান কুচবিহারাধিপতি এই কন্যার গর্ভজাত সন্তান ও কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দৌহিত্র। কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় অদ্বিতীয় ইংরাজি-বক্তা এদেশে খুব কম জন্মিয়াছেন। কেশবচন্দ্র দেওয়ান রামকমল সেনের পৌত্র। রামকমল সেন ১৮০০ খৃঃ অব্দে গরিফা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। রামকমল সেন সরকারি টাকশাল ও বেঙ্গল-ব্যাঙ্কের দেওয়ানি করিয়া প্রচুর বিত্তশালী হন। রামকমল সেনের বাটি লর্ড কার্জন একটি ট্যাবলেট দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে ৮ই জানুয়ারি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

বোসপাড়া লেন[২]

এই বোসপাড়া লেন অতি পুরাতন পল্লী ও অনেক সম্ভ্রান্ত কুলীন-কায়স্থ এই পল্লীতে বাস করেন। প্রসিদ্ধ নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই বাগবাজার বসু-পাড়াতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। পাঠশালাতে প্রতিভার আধার গিরিশচন্দ্রের প্রথম হাতে খড়ি। তারপর তিনি গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে (বর্তমান ওরিএণ্টাল সেমিনারি) ও হেয়ার স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা করেন। দৈব-দুর্বিপাক বশত অর্থাৎ ১১ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ও ১৪ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। গিরিশচন্দ্র সর্বপ্রথমে বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল করিয়া সধবার একাদশী অভিনয় করেন এবং ইহাতে নিমচাঁদের ভূমিকা লয়েন। পরে এই থিয়েটার জোড়াসাঁকোর সান্যাল-বাড়িতে উঠিয়া আসে। ইহাই প্রথম ন্যাশান্যাল-থিয়েটার। প্রথমে ইহা অবৈতনিক ছিল। কিন্তু অধ্যক্ষেরা টিকিট বিক্রয় আরম্ভ করায় গিরিশচন্দ্র ইহার সংস্রব ছাড়িয়া দেন। তৎপরে বিডন স্ট্রীটে গ্রেট-ন্যাশান্যাল-থিয়েটার আরম্ভ হইলে গিরিশচন্দ্র একশত টাকা বেতনে ইহার ম্যানেজার হন। এই সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী হইতে অমৃত-ধারা বর্ষিত হইতে আরম্ভ হয়। আমরা আজকাল বঙ্গীয় নাট্যশালাকে যে বর্তমান উন্নত অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি, তাহা গিরিশচন্দ্রের জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল। স্টার ও মিনার্ভা তাঁহার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ। বঙ্গীয় নাট্যশালার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহার প্রধান উপলক্ষ গিরিশচন্দ্র ও তাঁহার উপযুক্ত সঙ্গীদ্বয় বাবু অমৃতলাল বসু ও স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। গিরিশচন্দ্র গভীর জ্ঞানী ও লোকচরিত্র রহস্যজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি নাটক যথা, চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল তাঁহার অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। এমন এক যুগ গিয়াছে, যে যুগে চৈতন্যলীলা ও বুদ্ধদেব এই বঙ্গদেশে এক বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। গিরিশচন্দ্র নিজের কীর্তিস্তম্ভ নিজে স্থাপন করিয়া দিব্যধামবাসী হইয়াছেন। অর্ধেন্দু ও পূর্ণেন্দুর মত জ্যোতিঃবিকাশ করিয়া মরজগতে চির-

১. বৈকুণ্ঠনাথ বসুর মৃত্যু হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে।
২. বর্তমানে ইহা ভগিনী নিবেদিতা লেন নামে পরিচিত।

বিশ্রামলাভ করিয়াছেন, তবে সুখের বিষয় এই যে, অমৃতলাল বসু মহাশয় এখনও বর্তমান।[১] অমৃতবাবুর নূতন পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইঁনি দক্ষতার সহিত স্টার-থিয়েটারের অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন। রঙ্গরহস্য রচনায় দীনবন্ধুর পর অমৃতলালের আসন। তাঁহার বিবাহ-বিভ্রাট প্রভৃতি প্রহসন আজও সমাদরে সর্বত্র অভিনীত। বিজয়বসন্ত, তরুবালা প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক ও অমৃতমদিরা নামক কাব্য প্রণয়ণ করিয়াও অমৃতবাবু যশস্বী হইয়াছেন। অমৃতলালের প্রতিভা বহুবিষয়-প্রসারিণী। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠের জন্য অমৃতলাল বহু অর্থব্যয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য ইংরাজি ইতিহাস গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া এক পাঠাগার স্থাপন করেন। নাট্যশালার বর্তমান উন্নতির জন্য গিরিশচন্দ্রের ন্যায় অমৃতলালও জীবনব্যাপী পরিশ্রম করিয়াছেন। নাট্যরথী স্বনামপ্রসিদ্ধ বাবু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (গিরিশবাবুর পুত্র) ও গিরিশচন্দ্রের শ্যালক পুত্র প্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু চুনীলাল দেব ও নিখিলেন্দ্র দেব, নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য ও নাট্যজগতে যশস্বী অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতির সহিত কলিকাতার থিয়েটারগুলির অস্তিত্ব সর্ববিধায়ে বিজড়িত। গিরিশচন্দ্র নিজের কীর্তি নিজেই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একজন প্রধান ভক্ত-শিষ্য। গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনে রচিত তপোবল এবং শঙ্করাচার্য তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অমৃতময় ফল।

নিমু গোঁসাইয়ের গলি

আজও একটি প্রবাদ-বাক্য কলিকাতায় প্রচলিত আছে যে, 'জন্মের মধ্যে কর্ম নিমাই' চৈত্রমাসের রাস।' নিমাইচাঁদ গোস্বামী আহিরীটোলা গোঁসাই-বংশের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হন। এখনও তাঁহার বংশধরেরা পৈতৃক-ভদ্রাসনে বহু গোষ্ঠীরূপে বাস করিতেছেন। নিমু গোঁসাইয়ের রাস সেকালের কলিকাতায় একটা দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। নানা দেশ হইতে দর্শকগণ এই রাস দেখিতে আসিত। চৈত্র মাসেই এই রাস হইত। ঐই গোঁসাই-বংশ এখনও উন্নত অবস্থাপন্ন।

খেলাতচন্দ্র ঘোষের লেন

খেলাতচন্দ্র ঘোষ দেওয়ান রামলোচন ঘোষের পৌত্র। দেওয়ান রামলোচন গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান ছিলেন। আবার কোন কোন মতে তিনি লেডি-হেস্টিংসের বেনিয়ান ছিলেন। সাধারণত তিনি গবর্ণরের দেওয়ান বলিয়াই পরিচিত। পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে এই দেওয়ান রামলোচনের বংশধরেরা পাশাপাশি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বহুদিন হইতে এ অঞ্চলে বাস করিতেছেন। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশ, বিশেষত খেলাত ঘোষ মহাশয় অনেক ক্রিয়াকর্ম করিয়া যশস্বী হন। খেলাতচন্দ্রের খুল্লতাত আনন্দনারায়ণ ঘোষ। সেকালের ধর্মতলার বাজার সর্ব প্রথমে আনন্দনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল 'আনন্দ-বাজার'। খেলাতচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র রমানাথ ঘোষ মহাশয় পিতার পদাঙ্কানুসরণে ক্রিয়াকলাপাদি বজায় রাখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট

চূড়ামণি দত্তের পুত্রের নাম কালীপ্রসাদ দত্ত। কালীপ্রসাদ দত্তের নাম হইতেই এই গলিটির নামকরণ হইয়াছে। চূড়ামণি দত্ত শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের সমসাময়িক ছিলেন। চূড়ামণি ও নবকৃষ্ণের মধ্যে স্ব স্ব সমাজের দলপতিত্ব লইয়া অনেক মনোবাদ ঘটিয়াছিল। চূড়ামণি দত্ত সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প আমরা ইতিপূর্বে কালীঘাট-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। এক সময়ে কোন সামাজিক পাপের জন্য এবং শত্রুদের চক্রান্তে চূড়ামণির পুত্র কালীপ্রসাদ সমাজচ্যুত হয়েন। রাজার দলের লোকেরা প্রবল হইয়া তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করেন। সেকালে এইরূপ সামাজিক দলাদলির বড়ই প্রাবল্য ছিল, আর এই সব ব্যাপার লইয়া উভয়পক্ষের মধ্যে যথেষ্ট মনোবাদ

১. অমৃতলাল বসুর মৃত্যু হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে।

জম্পিত। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও রাজা নবকৃষ্ণের দল চূড়ামণির দলকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। কালীপ্রসাদ দত্ত বিপদে পড়িয়া বড়িশার সাবর্ণ-জমিদার সন্তোষ রায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। সন্তোষ রায় একজন পরোপকারী দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। তিনি কালীঘাট, ভবানীপুর, বেহালা, বড়িশা, সরশুনা প্রভৃতি স্থানের কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া কালীপ্রসাদের পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হইতে দেন নাই। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কালীপ্রসাদ তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের পাথেয় স্বরূপ কয়েক সহস্র টাকা দেন। সন্তোষ রায় এই টাকা কাহাকেও লইতে না দিয়া কালীঘাটের কালীমন্দির নির্মাণার্থে তাহা প্রদান করেন, ইহাই জনপ্রবাদ।[১]

শম্ভুনাথ পণ্ডিতের লেন

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের[২] নাম সর্বসাধারণে পরিচিত। সর্বপ্রথমে রমাপ্রসাদ রায় হাইকোর্টের বাঙ্গালী-জজ হন। কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় জজিয়তি পদ লাভ করেন। হাইকোর্টের বিচারগৃহে এখনও শম্ভুনাথের একখানি প্রমাণ তৈলচিত্র বর্তমান। শম্ভুনাথের পিতার নাম শিবনারায়ণ পণ্ডিত। ইহাঁরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। শম্ভুনাথ ভবানীপুরে আসিয়া বসবাস করেন। সেকালের সুপ্রীম কোর্টের তিনি একজন নামজাদা উকিল ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি উকিল-সরকারের কাজও করিয়াছিলেন। ছোট-আদালতের তদানীন্তন জজ রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়কে গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের প্রথম বাঙ্গালী-জজরূপে নির্বাচিত করেন। কিন্তু এই সম্মানসূচক উচ্চপদ প্রাপ্তির পর তাঁহার সহসা লোকান্তর ঘটায় পণ্ডিত শম্ভুনাথ এই পদ লাভ করেন। শম্ভুনাথ পাঁচ বৎসরকাল ধরিয়া এই জজিয়তি করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র প্রাণনাথ পণ্ডিত সরস্বতী মহাশয় একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনিও হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন এবং এসিয়াটিক-সোসাইটির একজন সদস্য ছিলেন। ভবানীপুরে এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় শম্ভুনাথ পণ্ডিতের বংশধরেরা আজও বাস করিতেছেন।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্ট্রীট

দেশহিতৈষী হরিশচন্দ্র আমাদের পূর্ব যুগের লোক। মহাত্মা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বর্তমানে কেবল ভবানীপুরের একটি প্রশস্ত পথ দ্বারা সুরক্ষিত। এতদ্ভিন্ন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান বা জমিদার সভায় ইহাঁর নামে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত আছে। হরিশচন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান এবং ভবানীপুরে মাতামহাশ্রমে পালিত। ১৮২৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী হইলেও অবস্থা-বৈগুণ্যে বেশী লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সর্বপ্রথমে ইনি টুলা কোম্পানির অফিসে আট টাকা বেতনে সামান্য কাজে নিযুক্ত হন। তৎপরে ২৫ টাকা বেতনে মিলিটারি অডিট-অফিসে একটি চাকরি পান পরে এই অফিসে তাঁহার ৪০০ টাকা বেতন হয়। ইংরাজি-ভাষার উপর ইহাঁর খুব দখল ছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট হরিশচন্দ্রের অবিনশ্বর কীর্তি। ১৮৫৫ খৃস্টাব্দ হইতে তিনি একাকী এই পত্রিকার সম্পাদন ভার পান। হিন্দু পেট্রিয়টের সম্মান তখন এত বেশী ছিল যে, গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এই পত্রিকা পড়িবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিতেন। নীলকর হাঙ্গামার সময় হরিশচন্দ্র মহাসাহসের সহিত প্রজাদের হইয়া লেখনীচালনা করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যুক্তিপূর্ণ সন্দর্ভ সমূহ, হিন্দু পেট্রিয়টে লিখিয়া ইনি গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দেন যে, বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভক্ত জাতি আর নাই। ১৮৬১ সালে ১৪ই জুন ইহাঁর দেহত্যাগ হয়।

সার্কিউলার গার্ডেনরিচ রোড[৩]

এই পথটি খিদিরপুরের পুলের নীচে হইতে আরম্ভ হইয়া বরাবর মেটিয়াবুরুজের দিকে গিয়াছে।

---

১. কালের ব্যবধানে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে।

২. শম্ভুনাথের জন্ম ১৮২০, মৃত্যু ১৮৬৭ খ্রী.

৩. সার্কিউলার গার্ডেনরিচ রোডের বর্তমান নাম কার্ল মার্ক্স সরণি।

খিদিরপুরে এই পথের ধারে যে বাড়িটি এখন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের দখলে,[১] সেই বাটিতে কবি মাইকেল মধুসূদন বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। সার্কিউলার রোড হইতে কিছু-দূরে কবিশ্রেষ্ঠ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবাসবাটি। খিদিরপুর ধরিতে গেলে, বঙ্গের তিনটি শ্রেষ্ঠ কবির লীলা-নিকেতন। হেমচন্দ্র এই সার্কিউলার গার্ডেনরিচ রোড হইতে আধমাইল দূরে পদ্মপুকুর নামক স্থানে বাস করিতেন। এই সার্কিউলার রোডের পশ্চিমদিক হইতে ভূকৈলাসের রাজবাটির রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। সার্কিউলার গার্ডেনরিচ রোড সরাসর মেটিয়াবুরুজে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই মেটিয়াবুরুজে অযোধ্যার নির্বাসিত শেষ নবাব ওয়াজিদ আলিশার বাসভবন ছিল। এখন তাহা ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত। সার্কিউলার গার্ডেনরিচ রোডের একটি উদ্যানবাটিতে সুপ্রীম-কোর্টের অন্যতম জজ স্যর উইলিয়াম জোন্স বাস করিতেন। বর্তমানে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের কার্যালয় সমূহ স্থাপিত হওয়ায় এ অংশটি বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

রসাপাগলা রোড[২]

সাধারণত ইহা রসারোড নর্থ ও সাউথ নামে পরিচিত। চৌরঙ্গী হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটি টালিগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পথের ধারেই কালীঘাট ভবানীপুর প্রভৃতি উপকণ্ঠবর্তী নগর। কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই স্থান ভয়ানক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। যে স্থান আজকাল ভবানীপুর চড়কডাঙ্গা বলিয়া পরিচিত, সেই স্থান কালীমাতার আদি সেবায়েত ভুবনেশ্বরের দৌহিত্র হালদার মহাশয়গণের কয়েক ঘরের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। আগে এই সব স্থানে চোর ডাকাতের বড় ভয় ছিল। এই রসারোডের মত সুদীর্ঘ পথ কলিকাতায় খুব কমই আছে। রাস্তাটির এরূপ নামকরণ কেন হইল, তাহা অনুমান করা বড়ই কঠিন।

বৈষ্ণবচরণ শেঠের স্ট্রীট

শেঠ ও বসাকগণ সপ্তগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া জঙ্গল কাটাইয়া বসবাস করেন। ইহারা কলিকাতার আদিম অধিবাসী। আগে ইহারা গোবিন্দপুরে বাস করিতেন, সুতানুটি অঞ্চলেও কয়েক ঘরের বসবাস ছিল। কলিকাতার নূতন দুর্গ নির্মাণের সময় গোবিন্দপুরের জমি গৃহীত হওয়ায় তাঁহারা বড়বাজারে গিয়া বাস করেন। এই বড়বাজারে শেঠ-বংশের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোবিন্দজীউ আজও বর্তমান। কোম্পানির প্রথম আমলে যাদবেন্দু শেঠ, বৈষ্ণবচরণ শেঠ, শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক ও কৃষ্ণচন্দ্র বসাক বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ শেঠ পরম হিন্দু ও অতি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সোমনাথ ও দ্বারকানাথে স্নানের জন্য, আবার কোন কোন মতে, মান্দ্রাজ-প্রদেশের রামরাজা বিগ্রহের জন্য তিনি শীলমোহর করিয়া গঙ্গাজল পাঠাইয়া দিতেন। এই ধার্মিক বৈষ্ণবচরণের নামে বর্তমান পথটির নামকরণ হইয়াছে।

বিডন স্ট্রীট[৩]

স্যর সিসিল বিডন ১৮৬২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসরকাল বঙ্গদেশের লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে কার্য করিয়াছিলেন। ছোট লাট বিডনের নামেই বর্তমান বিডন স্ট্রীটের নামকরণ হইয়াছে। কয়েকটি এদেশীয় নাট্যশালার জন্য এই বিডন স্ট্রীট সর্বসাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। এই বিডন স্ট্রীটের উপরই স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের প্রাসাদতুল্য আবাস-ভবন। স্যর সিসিল বিডনের নাম কেবল এই পথটি নহে, 'বিডন-গার্ডেনের'[৪] সহিতও বিজড়িত। এই উদ্যানটি সাধারণের সান্ধ্য-ভ্রমণ-ক্ষেত্র। সহরের প্রধান জনপূর্ণ স্থানের মধ্যে এই উন্মুক্ত ভ্রমণক্ষেত্র শ্রান্ত নগরবাসিগণের পক্ষে বড়ই আরামপ্রদ স্থান। জনপ্রবাদ এখন যেস্থান অধিকার করিয়া

---

১. বাড়িটির মালিকানা হস্তান্তরিত হইয়াছে।
২. বর্তমানে এই রাস্তার উত্তরাংশ আশুতোষ মুখার্জি রোড এবং দক্ষিণাংশ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।
৩. বিডন স্ট্রীটের বর্তমান নাম স্বামী অভেদানন্দ রোড।
৪. বিডন গার্ডেন বর্তমানে রবীন্দ্রকানন নামে পরিচিত।

রিডন্ বাগান প্রতিষ্ঠিত, এইস্থানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের কলিকাতার আবাস-বাটি ছিল।

বেলভেডিয়ার রোড

বাঙলার ছোট-লাটগণের আবাসস্থান ছিল বলিয়া বেলভেডিয়ার এখন সর্বজনপরিচিত। এই বেলভেডিয়ার রোডের আশে পাশে, দূরে অদূরে সেকালের অনেক উচ্চপদস্থ ও গণনীয় ইংরাজগণ বসবাস করিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রভৃতি এইস্থানে বাগান-বাটিতে বাস করিতেন। জনপ্রবাদ এই, মসনদ বিচ্যুত হইয়া নবাব মীরজাফর যখন কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন, তখন এই বেলভেডিয়ার রোডের সান্নিধ্যেই তাঁহার কলিকাতার আবাস-বাটি ছিল। এ সম্পত্তি পরে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে দিয়া যান। আর একটি জনপ্রবাদ এই, বর্তমানে যেস্থানে জ্যুওলজিক্যাল বাগান প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানে মীরজাফর-প্রণয়িনী ইতিহাস প্রসিদ্ধ মণি-বেগমের জন্য একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্মিত হয়। এখনও এইস্থানকে লোকে 'বেগম-বাটি' বলিয়া থাকে। বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদের পার্শ্বেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ Duel Avenue বা দ্বন্দ্বযুদ্ধের স্থান। এইস্থানে কাউন্সিলের মেম্বার স্যর ফিলিপ ফ্রান্সিসের সহিত গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। ইহার অদূরেই কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য বারওয়েল সাহেবের বাটি। এই বাটি বর্তমানে Kidderpur House[১] বলিয়া পরিচিত।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট[২]

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের পার্শ্ব হইতে এই গলিটি আরম্ভ হইয়া বরাবর বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়া মিশিয়াছে। ইহার পুরাতন নাম রাণী মুদির গলি। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতার পুরাতন দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই রাণী মুদির গলি বা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের সান্নিধ্যে নবাব-সৈন্যের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য একটি তোপখানা বা ব্যাটারি স্থাপিত হয়। এই পথের পার্শ্বেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান বা জমিদার সভা। এই জন্যই পথটির এইরূপ নামকরণ। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ এ, কে, রায় ও মিঃ কটন প্রভৃতির সিদ্ধান্ত এই, "বর্তমান গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের নিকট সিরাজ-সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য একটি ব্যাটারি বা তোপমঞ্চ স্থাপিত হয়। এখানে ইংরাজ পক্ষ প্রাণপণে নবাব-সৈন্যকে বাধা দিয়াছিলেন। 'রণমদ গলি' হইতে এই রাণী মুদি নামকরণ হওয়া সম্ভব।" রাণী মুদি বলিয়া কোন মুদি সেকালে এস্থানে ছিল কি না তাহা বলা দুষ্কর। কেহ কেহ অনুমান করেন চন্দ্রপাল হইতে যেমন চাঁদপাল-ঘাট নাম হইয়াছে, সেইরূপ রাণী মুদি হইতে এই গলির সেইভাবে নামকরণ হইয়াছিল।

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের গলি

মেডিকেল-কলেজের অপর পারে প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের গলি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই গলিতে জীবনের শেষ অবস্থায় বাস করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন এই সর্বজনপূজ্য প্রতিভাময় ঔপন্যাসিকের স্মৃতিরক্ষার জন্য ইহাঁর বাটির গায়ে একটি প্রস্তর-ফলক মারিয়া দিয়াছেন। কাঁটালপাড়ার পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র এই বাটিটি ক্রয় করেন। এই বাটিতেই তাঁহার জীবনের শেষভাগে রচিত উপন্যাস ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। এই বাটি হইতেই 'রাজসিংহের' নূতন সংস্করণ 'সীতারাম' ও 'প্রচার' পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আবাস-ভবনের জন্যই এই গলিটি বর্তমানে বিশেষ বিখ্যাত।

বজবজ-রোড

ডায়মণ্ড-হারবার রোড হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটি বরাবর বজবজ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই পথটি বহুদিনের। ক্লাইভ কর্তৃক কলিকাতা উদ্ধারের আয়োজন সংবাদ পাইয়া রাজা মানিকচাঁদ

১. বর্তমানে এই বাড়ির অস্তিত্ব নাই।
২. ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট বর্তমানে আবদুল হামিদ স্ট্রীট নামে পরিচিত।

এই বজবজের রাস্তা দিয়া সসৈন্যে পলায়ন করেন বলিয়া একটা জনপ্রবাদ আছে। নবাব কলিকাতা আক্রমণ করিয়া দুর্গাধিকার করিলে ড্রেক ও তাঁহার সঙ্গীরা প্রথমত বজবজে পলায়ন করেন ও তৎপরে ফলতায় আশ্রয় লন। এক সময়ে এই পথ দিয়া কোম্পানির সৈন্যগণ বজবজ দুর্গে যাতায়াত করিত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল পর্যন্ত বজবজ দুর্গের প্রাধান্য বজায় ছিল। তৎপরে বজবজ দুর্গের সমস্ত কামান ও সাজসরঞ্জাম নবনির্মিত কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ামে আনা হয়।

ডায়মণ্ড-হারবার রোড

খিদিরপুর হইতে আরম্ভ হইয়া এই পথটি আলিপুর, মোমিনপুর, দুর্গাপুর, বেহালা, বড়িশা, ঠাকুরপুরের মধ্য দিয়া আমতলা ও রাজার-হাট হইয়া সরাসর ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়াছে। জনপ্রবাদ এই, মহারাজ নবকৃষ্ণ এই পথটি নির্মাণ করিয়া দেন। এই পথ দিয়া কোম্পানির সেনারা কুচকাওয়াজ করিতে পুরাকালে ডায়মণ্ড-হারবার দুর্গে যাইত। যখন ডায়মণ্ড-হারবার পর্যন্ত রেল হয় নাই, তখন এই পথই ডায়মণ্ড-হারবার যাইবার প্রধান উপায় ছিল। আলিপুরের সান্নিধ্যে ডায়মণ্ড-হারবার ও আলিপুর রোডের সন্ধিস্থলে 'বিজয়-মঞ্জিল'। এই বিজয়-মঞ্জিলে বর্তমান বর্ধমানাধিপতি মহারাজ স্যার বিজয়চন্দ্র মহাতপ বাহাদুর বাস করিতেন। মহারাজের অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তিনি একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী, ও দেশের সকল হিতকর কার্য ও সভা সমিতিতে যোগদান করেন।

সার্কিউলার রোড

সার্কিউলার রোডটি কলিকাতার পূর্বপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া শ্যামবাজার হইতে চৌরঙ্গীর পার্শ্ববাহী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বর্গীর-হাঙ্গামের সময়, মারহাট্টা-ডিচের খনিত স্তূপাকার মৃত্তিকাকে সমভূমি করিয়া এই প্রশস্ত পথটি নির্মিত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়া লর্ড ওয়েলেসলির আমলে তাহা শেষ হয়। তখন ইডেন গার্ডেন ও স্ট্র্যাণ্ড রোড বর্তমান ছিল না। এই সার্কিউলার রোডই সেকালের সাহেব-মেমদিগের সান্ধ্যভ্রমণের স্থান ছিল। সার্কিউলার রোড নির্মিত হইবার পূর্বে ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে বড়ই ডাকাতের ভয় ছিল।

কলেজ স্ট্রীট

হেয়ার-স্কুল, হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি এই পথের সান্নিধ্যে ও আশে পাশে অবস্থিত বলিয়া এই পথটি কলেজ স্ট্রীট বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ওয়েলিংটন স্ট্রীট,[১] কলেজ স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট এই তিনটির সমবায়ে একটি দীর্ঘ পথ শ্যামবাজার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতার দেশীয়াংশে এরূপ সুবৃহৎ বর্ত্ম, খুব কমই আছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয় এই পথের পার্শ্বে অবস্থিত। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি আইন কলেজ,[২] ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি প্রভৃতি নির্মিত হওয়াতে এই পথের সৌন্দর্য ও গৌরব আরও বর্ধিত হইয়াছে।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট[৩]

সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের নামে এই পথটি সাধারণে সুপরিচিত। এই পথের আশে পাশে অনেক নামজাদা বাঙ্গালী বাস করেন।[৪] সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ দুর্গাচরণ লাহার প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকা এই পথের পার্শ্বে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দির, আর্য-সমাজ মন্দির, সঙ্গীত-সমাজ,

---

১. ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বর্তমান নাম নির্মলচন্দ্র চন্দ্র স্ট্রীট।

২. গ্রন্থরচনাকালীন সময়ের ইউনিভার্সিটি আইন কলেজ বর্তমানের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পুরানো দিনের সেনেট হাউসের স্থানে বহুতল সেন্টিনারি বিল্ডিং নির্মিত হইয়াছে। আইন কলেজ হাজরা রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে: বালিগঞ্জ সার্কিউলার রোড, হাজরা রোড এলাকায় বেশ কয়েকটি বিভাগ (ভূগোল, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি ইত্যাদি) স্থানান্তরিত হইয়াছে।

৩. কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বর্তমান নাম বিধান সরণি।

৪. বর্তমানে সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত বাঙ্গালীরা বালিগঞ্জ, নিউ আলিপুর, লেকটাউন, সল্টলেক প্রভৃতি এলাকায় বাস করিতেছেন।

বেথুন কলেজ, স্কটিশ চার্চ মিশন কলেজ[১] প্রভৃতি এই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর অবস্থিত। রাস্তার নামটি ইংরাজি হইলেও এই পথটির উভয় পার্শ্বে অনেক নামজাদা বড় বড় বাঙ্গালীর বাস। সকলের নামোল্লেখ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান এস্থানে অসম্ভব।

করপোরেশান স্ট্রীট ও জানবাজার স্ট্রীট

আগে সমগ্র পথটি 'জানবাজার স্ট্রীট' বলিয়া পরিচিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহার একাংশের নাম করপোরেশান স্ট্রীট[২] হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রকাণ্ড অফিস, হিন্দুস্থান সমবায়-কোম্পানির প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এই পথের পার্শ্বে। করপোরেশান স্ট্রীট হইতে কিয়দ্দূর গেলে স্যর স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট বা মিউনিসিপ্যাল বাজার। এরূপ সুবৃহৎ বাজার কলিকাতার আর কোন স্থানেই নাই[৩] এই বাজারটি বর্ত্তমান প্রাসাদময়ী কলিকাতার গৌরব-চিহ্ন। কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটিই এই বাজারের স্বত্বাধিকারী। ইহার পার্শ্বেই জানবাজার। জানবাজার 'জনবাজার' (John Bazar) শব্দের অপভ্রংশ। অতি পুরাকালে জন নামধারী একজন সাহেব এইস্থানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ রাণী রাসমণির প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা এই পথের উপর। ইহাই 'জানবাজারের মাড়-বাবুদের বাটি' বলিয়া সাধারণে পরিচিত। পরে এই রাণী রাসমণির সম্বন্ধে নানা কথা বলা যাইবে।

ক্রীক্ রো

সুদূর অতীতের একটি 'ক্রীক্' বা 'খাল' হইতে এই স্থানটির নাম ক্রীক্ রো হইয়াছে। পলাশী-আমলে অথবা তাহার বহু পূর্বে একটি খাল আধুনিক ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে আরম্ভ হইয়া বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের উপর দিয়া বর্তমান হেস্টিংস স্ট্রীট বহিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। পর-বর্তীকালে এই খাল বুজাইয়া ফেলিয়া বিদ্যমান হেস্টিংস স্ট্রীট নির্মিত হয়। অবশ্য পলাশী-যুদ্ধের পরই এই খালটি বুজাইয়া ফেলা হইয়াছিল। ক্রীক্ রো আজও সেই খালের বিলুপ্ত স্মৃতি-রক্ষা করিতেছে।

ডিঙ্গা-ভাঙ্গা লেন

ক্রীক্ রোর সান্নিধ্যেই এই ডিঙ্গা-ভাঙ্গা পল্লী। পূর্বোক্ত খালটি ডিঙ্গা-ভাঙ্গার মধ্য দিয়া ধাপায় গিয়া মিলিত হইয়াছিল। হলওয়েলের গ্রন্থেও এই খালের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই খালের জলস্রোত নাকি অতি প্রবল ছিল। বিশেষত বর্ষাকালে জলের তোড় বড়ই বেশী হইত বলিয়া এইস্থানে অনেক ডিঙ্গা বা নৌকা ডুবিয়া যাইত। এইজন্য এইস্থানের নাম 'ডিঙ্গা-ভাঙ্গা' হইয়াছে।

শ্রীনাথ দাসের লেন

এই গলিটি ওয়েলিংটন স্ট্রীট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সদর রাস্তা হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা স্বনাম-প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের উকিল স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের প্রাসাদতুল্য বাটি পর্যন্ত গিয়াছে। বাবু শ্রীনাথ দাস হাইকোর্টের একজন নামজাদা উকিল ছিলেন। এই ওকালতি কাজে তিনি প্রচুর অর্থো-পার্জন করেন। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া শ্রীনাথ দাস মহাশয় নিজের নাম কলিকাতা-সমাজে সুপরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর এক পুত্র উপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ 'শরৎ-সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামক দুইখানি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেন। সেকালের থিয়েটারে এই দুই-খানি নাটক একদিন মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। বাবু শ্রীনাথ দাসের অন্যতম পুত্র, বাবু

১. স্কটিশ চার্চ মিশন কলেজ বর্তমানের স্কটিশ চার্চ কলেজ।
২. অধুনা ইহা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্ট্রীট নামে পরিচিত।
৩. হগ মার্কেট বা নিউমার্কেট এখনও কলিকাতার প্রসিদ্ধ বাজার, কিন্তু বালিগঞ্জ, সল্টলেক প্রভৃতি স্থানে বৃহদাকার বাজারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম, এ, বি, এল, মহাশয় 'সময়' নামক সুবিখ্যাত সংবাদ-পত্রের সম্পাদক।[1]

আনন্দ চ্যাটার্জির গলি[2]

এ গলিটি স্বনামখ্যাত 'অমৃতবাজার পত্রিকার' জন্য বিশেষরূপে পরিচিত। আবার এই অমৃতবাজার পত্রিকার সহিত স্বর্গীয় বাবু শিশিরকুমার ঘোষের নাম[3] বিশেষরূপে বিজড়িত। এরূপ তেজস্বী, নির্ভিক ও স্পষ্টবাদী সম্পাদক বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। যশোহর জেলার মাগুরার সুবিখ্যাত ঘোষবংশে শিশিরকুমারের জন্ম হয়। এইস্থানে শিশিরকুমার প্রথমে অমৃতবাজার পত্রিকা বলিয়া একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রজার পক্ষ তিনি চিরদিনই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। নীলকরদিগের অত্যাচার দর্শনে ও তাহার প্রতিবিধানার্থে এবং সমস্ত ঘটনা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবার জন্য বাঙ্গলা 'অমৃতবাজারের' উৎপত্তি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা অমৃতবাজারের প্রথম প্রচার হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট এক আইন প্রচার করেন। এই সময় হইতে অমৃতবাজার ইংরাজিতে সম্পাদিত হইতে থাকে। আগে ইহা সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিকে পরিণত হয় । ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অমৃতবাজার কার্যালয় কলিকাতায় আসে। শিশিরবাবু তাঁহার ভ্রাতৃগণ সহ কলিকাতাতেই বসবাস করিতে থাকেন। শিশিরকুমার একজন পরম বৈষ্ণব। তাঁহার ইংরাজি ভাষায় Lord Gouranga-এর জীবন-কথা সর্বত্র সমাদৃত। 'অমিয়-নিমাই--চরিত' প্রভৃতি সুবৃহৎ বৈষ্ণবগ্রন্থ ইহাঁরই রচিত। শ্রীচৈতন্যের জন্মদিনে ইহাঁরই চেষ্টায় কলিকাতার বিডন গার্ডেনে[4] একটি বাৎসরিক উৎসবানুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। অমৃতবাজার ভিন্ন Hindu Spiritual Magazine নামক একখানি মাসিক পত্রও তিনি বাহির করেন। এখন এই অমৃতবাজার ও স্পিরিচুয়াল-ম্যাগাজিন পত্রিকা শিশিরকুমারের সুযোগ্য সহোদর বাবু মতিলাল ঘোষের দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। জীবনের শেষাবস্থায় শিশিরকুমার সহোদর মতিলালের হস্তে পত্রিকার ভার দিয়া ধর্মালোচনায় জীবন যাপন করিতেন। মতি বাবুও তাঁহার জ্যেষ্ঠের ন্যায় সর্ববিষয়ে উপযুক্ত। আজও তাঁহার স্পষ্টবাদিতায় অমৃতবাজারের পূর্বগৌরব সংরক্ষিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১০ই জানুয়ারি শিশিরকুমার স্বর্গারোহণ করেন। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত তাঁহার কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইল না।

অক্রুর দত্তের গলি

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের জলের কলের নিকটেই, একটি গলির মধ্যে অক্রুর দত্ত মহাশয়ের সুবিস্তৃত বাস-ভবন। এই দত্ত-পরিবার নানাকারণে কলিকাতা-সমাজে পরিচিত। অক্রুর দত্ত মহাশয় কোম্পানির আমলে কমিশেরিয়েট বিভাগে কার্য করিয়া প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করেন। বীরভূমের যুদ্ধ ব্যাপারে তিনি ইংরাজ-সেনার সহিত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রাণী অত্যাচার ভয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি সেনাধ্যক্ষকে বলিয়া তাঁহাদের নিরাপদ স্থানে রক্ষা করেন। নানাবিধ ক্রিয়াকলাপাদির জন্য এই দত্ত-বংশ কলিকাতা-সমাজে বিশেষ পরিচিত। এই পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত হোমিওপ্যাথি প্রচারের যথেষ্ট সাহায্য করেন। সুপ্রসিদ্ধ মহিলা-কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী, যাঁহার বীণার-ঝঙ্কারে এক সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যে একটা নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তিনি এই দত্ত পরিবারের কুলবধূ। এই দত্ত বাটিতেই সাবিত্রী-লাইব্রেরী বলিয়া এক 'Free Circulating লাইব্রেরী' স্থাপিত হয়। এই সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক

১. জ্ঞানেন্দ্রনাথের জন্ম ১২৬০, মৃত্যু ১৩৩৯ ব.

২. ইহা আনন্দ চ্যাটাজি লেন নামেই বিশেষ পরিচিত। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত বাঙ্গলা দৈনিক পত্রিকা 'যুগান্তর' এবং ইংরাজি দৈনিক পত্রিকা 'অমৃতবাজার'-এর কার্যালয় এখনও এই রাস্তার উপর বিদ্যমান।

৩. শিশিরকুমার-এর নামে প্রতি বৎসর বাঙ্গলা সাহিত্যে পুরস্কার দেওয়া হয়।

৪. বিডন গার্ডেন বর্ত্তমানে রবীন্দ্রকানন।

উৎসব দত্তবাড়ির প্রশস্ত আঙ্গিনাতেই হইত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি এই সভার উৎসবে বক্তৃতাদি করিতেন। বাবু গোবিন্দলাল দত্তই এই সভার প্রধান কর্মশক্তি। গোবিন্দবাবুও তরুণ যৌবনে যথেষ্ট সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন।

কাঁটাপুকুর লেন[১]

এই কাঁটাপুকুর লেন প্রাচ্য-বিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু[২] মহাশয়ের আবাস বাটির জন্য বিশেষরূপে বর্তমানে সুপরিচিত। এরূপ একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। 'বিশ্বকোষ' নামক মহাভিধান এই নগেন্দ্রনাথের অক্ষয়-কীর্তি। যখন রঙ্গলাল বাবুর হস্ত হইতে নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষ মহাগ্রন্থ সম্পাদন ভারগ্রহণ করেন, তখন কেহই আশা করেন নাই যে তিনি এতাদৃশ পরিশ্রম, ও ব্যয়বহুল কার্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিবেন। অনেক পরিশ্রম, গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির চরমফল এই 'বিশ্বকোষ'। শব্দকল্পদ্রুম অপেক্ষাও ইহার গৌরব অধিক। বিশ্বকোষই নগেন্দ্রনাথের অবিনশ্বর কীর্তি। নগেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুপরিচিত পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। অনেকগুলি বহুমূল্য, অপ্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থের পুনঃ সংস্করণ করিয়া তিনি প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছেন। পুরাতন লুপ্তপ্রায় পুঁথি-সংগ্রহ, তাহার পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনই নগেন্দ্র বাবুর জীবনের মহাব্রত।

এই কাঁটাপুকুর সান্নিধ্যে বাবু নন্দলাল বসু ও পশুপতিনাথ বসুর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা বর্তমান। নন্দলাল বসু মহাশয় একজন ক্রিয়াবান জমিদার ছিলেন। গয়া জেলায় ইহাঁদের এক বিস্তৃত জমিদারি আছে।[৩] মাধবচন্দ্র বসু মহাশয়ের তিন পুত্র মহেন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও পশুপতি। মহেন্দ্র বাবু বড়ই পরোপকারী ছিলেন। নন্দবাবু ও পশুপতি বাবু কলিকাতা সমাজে সবিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সর্ববিধ সাধারণ হিতকর কার্যে এই দুই ভ্রাতা, সমান উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছেন। নন্দলাল বাবু ও পশুপতি বাবু উভয়েই এখন পরলোকগত। এখন তাঁহাদের বংশধরেরা এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় বসবাস করিতেছেন।

কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার[৪]

বর্তমান স্কটিশ চার্চ বা ভূতপূর্ব জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউসনের সান্নিধ্যে যে এক প্রাসাদতুল্য ত্রিতল অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার অধিকারী বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। নীলাম্বর বাবুর নাম কলিকাতাবাসীর নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। ১৮৪২ খৃীস্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি ও সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি গৌরবের সহিত এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৬ খৃীস্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৯ খৃীস্টাব্দে কাশ্মীর-রাজ্যের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া নীলাম্বরবাবু যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। পরে তিনি কাশ্মীরের রাজস্ব-সচিবের পদও লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খৃীস্টাব্দে ইনি কলিকাতায় আসিয়া স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খৃীস্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইনি সি, আই, ই, উপাধি লাভ করেন। অতীব দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া সম্প্রতি ইনি Special পেন্সন ভোগী হইয়া মিউনিসিপ্যালিটির সহকারী সভাপতির পদ হইতে অবসর লইয়াছেন।[৫]

রসা রোড[৬]

ভবানীপুর কালীঘাট হইয়া রসা রোড বরাবর টালিগঞ্জের দিকে চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান ভবানী-

---

১. কাঁটাপুকুর লেন-এর বর্তমান নাম শচীন মিত্র লেন।
২. নগেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৬, মৃত্যু ১৯৩৮ খ্রী.
৩. জমিদারি প্রথা বিলোপের ফলে এখন আর জমিদারির প্রশ্নই নাই।
৪. কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার বর্তমানে আর্কুহার্ট স্কোয়ার নামে পরিচিত।
৫. নীলাম্বরের জন্ম ১৮৪২, মৃত্যু ১৯২০ খ্রী.
৬. বর্তমানে এই রাস্তার উত্তরাংশ আশুতোষ মুখার্জি রোড এবং দক্ষিণাংশ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।

পুর থানার অর্ন্তিপুরে ভবানীপুরের এই সদর রাস্তার উপর একটি ত্রিতল বাটিতে বঙ্গের উজ্জ্বল-রত্ন মিস্টার জস্টিস স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় বাস করেন। স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়[১] ভবানীপুরের মধ্যে অতীতকালে একজন নামজাদা ডাক্তার ছিলেন। স্যর আশুতোষ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রথম জীবনে এই স্বনামধন্য মনীষী সাউথ সুবার্বান স্কুলে এণ্ট্রান্স-ক্লাস অবধি অধ্যাপনা করেন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এ, পরীক্ষায় গণিতশাস্ত্রে এম, এ, উপাধি লাভ করেন ও তৎপরে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ উপাধি পান। বি, এল, পাশ করিয়া স্যর আশুতোষ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর অমানুষিক প্রতিভা ও অদম্য উদ্যম সর্বদিক-প্রসারিণী। এরূপ প্রতিভাবান বাঙ্গালী খুব কমই জন্মিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে ইনি অতি দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব বর্ধন করিয়াছেন। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উন্নতি ইহাঁরই আমলে হইয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে স্যর আশুতোষ হাইকোর্টের জজের পদে নির্বাচিত হন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির পদে বরিত হন। সংস্কৃত-ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য নবদ্বীপ-পণ্ডিত-সমাজ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে 'সরস্বতী' উপাধি দান করেন। বর্তমানে তিনি এই ভাইস-চ্যান্সেলারের পদ ছাড়িয়া দিয়াছেন ও তাঁহার স্থানে, স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত ডাক্তার অনারেবল দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম, এ, বি, এল, মহোদয় বিরাজ করিতেছেন।[২] স্যর আশুতোষ হাইকোর্টের একটি উজ্জ্বলরত্ন। রাজদ্বারে সর্ববিষয়ে সম্মানিত বাঙ্গালী তাঁহার ন্যায় খুব কমই আছেন।[৩]

এই রসা রোডের উত্তরাংশে লণ্ডন মিশন কলেজের বাটির পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ জজ দ্বারকানাথ মিত্রের আবাস-ভবন ছিল। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। আমতার নিকট আগুনেসি বা আগুনসে গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। জজ দ্বারকানাথের পিতা হুগলী আদালতের একজন মোক্তার ছিলেন। দ্বারকানাথ কিয়ৎকালের জন্য কিশোরীবাবুর কোর্টে ইণ্টারপ্রিটারের বা দ্বিভাষীর কাজে ভর্তি হন। ইংরাজিতে তাঁহার খুব দখল ছিল। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু স্কুলে পঠদ্দশায় তিনি লর্ড বেকন সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভ লিখিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডি, এল, রিচার্ডসন দ্বারকানাথের এই সুন্দর প্রবন্ধটির বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহার সম্পাদিত লিটারেরি গেজেটে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই সময়ে অতীত যুগের স্বনামপ্রসিদ্ধ বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র (আলালের-ঘরের-দুলাল প্রণেতা[৪]) কলিকাতা পুলিশ-কোর্টের জুনিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দ্বারকানাথ কিয়ৎকালের জন্য কিশোরী বাবুর কোর্টে ইণ্টারপ্রিটারের বা দ্বিভাষীর কাজ করেন। তৎপরে তিনি সেকালের সদর-আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। হাইকোর্টে এক শম্ভুনাথ পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহই দ্বারকানাথের অদ্ভূত প্রতিভা বিকাশের আভাস পান নাই। শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় তখন হাইকোর্টের জুনিয়ার গবর্ণমেণ্ট প্লিডার ছিলেন। ক্রমে ক্রমে দ্বারকানাথের যশঃপ্রতিভা আদালতের উকিল ব্যারিস্টার ও জজেদের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। তখনকার চিফ্ জস্টিস স্যর বার্ণেস পিকক তাঁহার আইন-অভিজ্ঞতায় বিমুগ্ধ হইলেন। তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ, সুবক্তা, সচ্চরিত্র উকিলের প্রতিভা দৃষ্টে অন্যান্য জজেরাও তাঁহার গুণমুগ্ধ হইলেন। সকলদিক উত্তমরূপে না ভাবিয়া দ্বারকানাথ কোন মোকদ্দমা লইতেন না, আর তিনি বিশেষ বিবেচনার সহিত যে সব মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন তাহাতে প্রায়ই জয়লাভ করিতেন।

১. গঙ্গাপ্রসাদের জন্ম ১৮৩৬, মৃত্যু ১৮৮৯ খ্রী.
২. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।
৩. স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হ'ন।
৪. 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকৃতপক্ষে প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা, ইনি কিশোরীচাঁদের ভ্রাতা।

১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের নামজাদা রেণ্ট-কেসের (The Great Rent Case) মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ ক্রমাগত ছয় দিন ধরিয়া বক্তৃতা করেন। বেলা এগারটা হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পাঁচটা ছয়টা পর্যন্ত সাতদিন ধরিয়া দ্বারকানাথ অক্লান্তভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমাটি 'ফুল-বেঞ্চেই' হইয়াছিল। পরিশেষে দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমায় জয়ী হন।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে দ্বারকানাথ জজের পদে নিযুক্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ স্যর বার্ণেস পিকক, জস্টিস ফিয়ার্স প্রভৃতি স্বনামখ্যাত জজগণ তখন হাইকোর্টের রত্নস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকায় দ্বারকানাথ নিজের প্রতিভাবলে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধর্মাধিকরণের এক সমুজ্জ্বল রত্নরূপে পরিগণিত হইলেন।

অনেক সময়ে জজ দ্বারকানাথ কোন কোন মোকদ্দমায় তাঁহার সহযোগী জজগণের সহিত একমত হইতে পারিতেন না। তিনি স্বতন্ত্রভাবে নিজের রায় দিতেন। কিন্তু অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, প্রিভিকাউন্সিল তাঁহার রায়ই বজায় রাখিতেন।

বিজ্ঞানালোচনায় দ্বারকানাথের খুব একটা শখ ছিল। এজন্য তিনি ফাদার লাফো[১] নামক প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতাদি শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রস্তাবিত বিজ্ঞান-সভায় তিনি চারি হাজার টাকা চাঁদা দেন। দ্বারকানাথের সাহিত্যিক জীবনের কোন একটা বিশেষ বিকাশ হয় নাই। একবারমাত্র তিনি স্বর্গীয় শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন' পত্রিকায় Analytical Geometry সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

দুর্দমনীয় ক্যানসার রোগে দ্বারকানাথের জীবলীলার অবসান হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই রোগে তিনি শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় হাইকোর্টের জজেরা তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে আসিতেন। এমন কি স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর তাঁহার একজন এডিকংকে পাঠাইয়া রোগশয্যাশায়ী দ্বারকানাথের তত্ত্ব লইতেন। এই ক্যানসার বা কণ্ঠনালী-ক্ষত রোগে দ্বারকানাথ ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ ইহলোক ত্যাগ করেন। দ্বারকানাথের বৃদ্ধা মাতা উপযুক্ত পুত্ররত্ন হারাইয়া শোকে অতিশয় মুহ্যমান হইয়া পড়েন। দ্বারকানাথের তিন বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া পত্নী একে একে গতাসু হন। তাঁহার তৃতীয়া পত্নী বর্ধমান বেনাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার প্রাণগোবিন্দ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা। তাঁহারই অদৃষ্টে এই নিদারুণ বৈধব্য-যোগ ঘটে।

দ্বারকানাথের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াই চিফ জস্টিস তাঁহার সহযোগিগণকে তখনই আহ্বান করিয়া একটি সভা করেন, এবং তাঁহার সম্মানার্থে তখনই হাইকোর্ট বন্ধ করিয়া দেন। স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরও সরকারি-গেজেটে এক শোক-সূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের আয়ও যেমন ছিল, ব্যয়ও সেইরূপ হইত। তাঁহার বাটিতে অনেক অনাথ বালক সযত্নে প্রতিপালিত হইত। তিনি তাহাদের অন্নবস্ত্র ও স্কুলের বেতন পর্যন্ত দিতেন। তাঁহার জন্মভূমি আগুনসি গ্রামে, তিনি একটি ইংরাজি-স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। প্রতিবৎসরই তিনি নিজ গ্রামে গিয়া মহা সমারোহে দুর্গোৎসব সমাধা করিতেন ও এতদুপলক্ষে অনেক কাঙ্গালী-ভোজন করাইতেন। বাঙ্গালাদেশের গৌরবের যাহা কিছু একবার যায়, তাহার সমযোগ্য ভবিষ্যতে আর পাওয়া যায় না। দ্বারকানাথের মত প্রতিভাবান উকিল ও জজ একালে বড় কম দেখা যায়।

ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোড

ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের মোড় হইতে পদ্মপুকুর রোড আরম্ভ হইয়াছে। এই পদ্মপুকুর রোডের উপর স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের ত্রিতল প্রাসাদতুল্য আবাসবাটি বর্তমান। স্যর রমেশচন্দ্রের

১. Rev. Enugene Lafont সেণ্ট জেভিয়াস কলেজের অধ্যাপক এবং পরবর্তী কালে অধ্যক্ষ (১৮৭১)।

আদিনিবাস রাজার-হাট বিষ্ণুপুরে। এই বিষ্ণুপুর ২৪ পরগনার দক্ষিণ-বিষ্ণুপুর নহে। দমদমার নিকট অবস্থিত। রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রপিতামহ কালীপ্রসাদ মিত্র সেকালের নদীয়ার কলেক্টরের অধীনে কার্য করিয়া প্রচুর বিত্ত-সঞ্চয় করেন। তাঁহার পুত্রের নাম রামধন মিত্র। রামধন মুন্সেফের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামধনের পুত্রের নাম রামচন্দ্র মিত্র। রামচন্দ্র ২৪ পরগনার সদর-দেওয়ানি-আদালতের সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রসন্নচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, প্রবোধচন্দ্র, ও রমেশচন্দ্র নামে ছয় পুত্র জন্মে। প্রসন্নচন্দ্রের কৈশোরে মৃত্যু হয়। উমেশচন্দ্র বর্ধমান চকদিঘির জমিদার বাবুদের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। কেশববাবুর নাম কলিকাতা সমাজের অতীত যুগের সঙ্গীতানুরক্তগণের নিকট অপরিচিত নহে। কারণ তিনি একজন উচ্চদরের পাখোয়াজী ছিলেন। কাশীচন্দ্র ছোট-আদালতে ওকালতি করিতেন ও প্রবোধচন্দ্র হাইকোর্টের একজন নামজাদা অ্যাটর্নি।

রামচন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র স্যর রমেশচন্দ্র।[১] বাল্যকাল হইতেই রমেশচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষায় প্রগাঢ় মনোযোগী ছিলেন। রমেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি আরম্ভ করেন।

উকিল হইবার পর রমেশচন্দ্র সর্বপ্রথমে সদর-দেওয়ানি-আদালতে ও তৎপরে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর কালের মধ্যে তাঁহার যশঃপ্রতিভা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়।

জজ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর রমেশচন্দ্র হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি জজিয়তি করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে দুইবার তিনি মহামান্য হাইকোর্টের প্রতিনিধি চিফ জস্টিস বা প্রধান-জজের পদলাভ করেন। এরূপ সৌভাগ্য চন্দ্রমাধববাবু ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালীরই এ পর্যন্ত ঘটে নাই। পাবলিক-সার্ভিস-কমিশনের সদস্যরূপেও রমেশচন্দ্র বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য করেন। ইনি বড়-লাট-বাহাদুরের ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যপদে নির্বাচিত হইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইহার পর রমেশচন্দ্র কে, সি, আই, ই, উপাধি পান। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে জুলাই মাসে রমেশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। ইহাঁর উপযুক্ত পুত্র ব্যারিস্টার মিঃ বি, সি, মিত্র মহোদয় এখন হাইকোর্টের স্ট্যাণ্ডিং-কাউন্সিল পদে নিযুক্ত আছেন।[২]

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি (ভবানীপুর)

চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি ও বর্তমান হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোডের সন্ধিস্থলে যে ত্রিতল প্রাসাদতুল্য বাটি বর্তমান, তাহার অধিকারী স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ। ইনি হাইকোর্টের জজিয়তি করিয়া বর্তমান সুস্থদেহে অবসর সুখ উপভোগ করিতেছেন।[৩] চন্দ্রমাধবের জন্মস্থান বিক্রমপুর। ইহাঁর পিতৃদেব রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ডেপুটি-কলেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে ঘোষজা মহাশয় ওকালতি পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কিয়ৎকাল বর্ধমানের উকিল-সরকারের কাজও করিয়াছিলেন। তৎকালীন কলেক্টরের সহিত স্বাধীনচেতা চন্দ্রমাধবের বনিবনাও না হওয়াতে, তিনি এই উকিল-সরকারের পদ ত্যাগ করিয়া ডেপুটি-কলেক্টর হয়েন। তৎপরে এই ডেপুটিগিরি ত্যাগ করিয়া তিনি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় যে Rent-Case মোকদ্দমার প্রধান উকিল ছিলেন, সেই মোকদ্দমাতেই মনীষী চন্দ্রমাধব সহকারী উকিলের কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে চন্দ্রমাধব বাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে বরিত হন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করেন। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে অফিসিয়েটিং চিফ জস্টিসের

১. স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের জন্ম ১৮৪০ খ্রী.
২. স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্র ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।
৩. স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৯২৮ খ্রী.

কাজও করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করিয়া গুণগ্রাহিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। স্যর চন্দ্রমাধব তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বিশ্রামাবসর কাল, নানাবিধ সামাজিক সংস্কার কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কায়স্থগণের বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র অনারেবল যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ও বঙ্গসমাজে সুপরিচিত। যাহাতে ভারতীয় যুবকগণ ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে গিয়া সুশিক্ষা লাভ করিয়া স্বাধীন ভাবে গৌরবের সহিত জীবিকা সংস্থান করিতে পারেন, তজ্জন্য একটি সভা এই যোগেন্দ্র বাবুর চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়।

ষষ্ঠীতলা রোড (নারিকেল ডাঙ্গা)

এই পল্লীতে অনেক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী বসবাস করেন। বর্ত্তমানে ইহা স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসভবনের জন্য সুবিখ্যাত। স্যর গুরুদাস জ্ঞানে, গুণে, অর্থে অদ্বিতীয়। তিনি একজন নিষ্ঠাবৃত্তিসম্পন্ন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ্যের উজ্জ্বল আদর্শ। স্যর গুরুদাসের পরিচয় বঙ্গবাসীর নিকট বেশী করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এ পর্য্যন্ত শিক্ষা সমাপন করিয়া স্যর গুরুদাস সগৌরবে বি. এল, পাশ করেন। ইহার পর বহরমপুর কলেজে কিয়দ্দিবস আইনের অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। স্যর গুরুদাসের মত হিন্দু-আইন-অভিজ্ঞ ব্যবহারজীবী খুব কমই জন্মিয়াছেন। এইজন্য ইউনিভার্সিটি হইতে ইনি ডি, এল, উপাধি পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-আইন অধ্যাপক পদে বরিত হইয়া স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Hindu Law, Stridhan and Marriage প্রভৃতি দায়ভাগ-ঘটিত বিষয় সমূহের উপদেষ্টা বা লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছোটলাট সাহেবের মন্ত্রিসভায় একজন সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্যর গুরুদাস বঙ্গের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মাধিকরণ হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন। উক্ত বৎসর ইহাঁকে 'নাইট' উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস কলিকাতা ইউনিভার্সিটির একটি অতি সমুজ্জ্বলরত্ন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত হইয়া অতীব সুযশের সহিত এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট Indian University Commission বলিয়া একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। স্যর গুরুদাস অতি দক্ষতার সহিত, এই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

স্যর গুরুদাস খাঁটি হিন্দু, সংস্কৃতজ্ঞ ও আদর্শ ব্রাহ্মণ। পাশ্চাত্য শিক্ষার কোন দোষই ইহাঁকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। এইরূপ বিনয়ী, সরলচিত্ত, আড়ম্বরবিহীন, মহাপণ্ডিত ও সর্ব্ববিষয়ে আদর্শ বাঙ্গালী আজকালকার সমাজে অতি দুর্লভ। স্যর গুরুদাস ইংরাজিতে ও বাঙ্গলায় অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ সদগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। একাধারে তিনি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র। পুত্রভাগ্য, যশোভাগ্য, লক্ষ্মীভাগ্য,—আর রাজদ্বারে ও সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্মান, যাহা কিছু এই মানব-জীবনে স্পৃহনীয়, স্যর গুরুদাসের তাহার সবই হইয়াছে। স্যর গুরুদাসের মত মাতৃভক্ত সন্তান খুব কমই এদেশে জন্মিয়াছেন। দেশের সকল হিতকর কার্য্যে ও সভা-সমিতিতে ইনি সমুৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। হাইকোর্টের জজিয়তি হইতে অবসর লইয়াও এখনও তিনি পূর্ণোৎসাহে এই কর্ম্মময় জগতে বিচরণ[১] করিতেছেন।

গ্রে স্ট্রীট[২]

গ্রে স্ট্রীটে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাস করেন। রাস্তাটি আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট গ্রে সাহে-

১. স্যর গুরুদাস ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।
২. বর্ত্তমানকালে গ্রে স্ট্রীট অরবিন্দ সরণি নামে পরিচিত।

বের নামে পরিচিত। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে গ্রে স্ট্রীটে প্রবেশ করিলে, উত্তর দিকে যে একটি ত্রিতল বাটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকারী অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ বাবু সারদাচরণ মিত্র। ১৮৪৮ খৃীস্টাব্দে সারদাচরণের জন্ম হয়। সারদাচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান ছাত্র। এম, এ, পরীক্ষায় ইনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বি, এল, পাশ করিয়া সারদাচরণ হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন, জ্ঞানগভীর আইনজ্ঞ ব্যবহারজীবী। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে ১৯০২ খৃীস্টাব্দে এই জন্য অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজিয়তি দেন। জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে সারদাবাবু স্থায়িভাবে এই পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খৃীঃ অব্দে ইনি জজিয়তি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সারদাচরণও তাঁহার অবসর কাল নানাবিধ দেশহিতকর কার্যে অতিবাহিত করিতেছেন।[১] বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার অমূল্য সহায়তার নিকট যথেষ্ট ঋণী। সারদাচরণ বঙ্গসাহিত্যসেবী ও বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবক। বাঙ্গলায় কায়স্থ-সমাজের ইনি শীর্ষস্থানীয় ও কায়স্থ-পত্রিকা ইহাঁরই যত্নে পরিচালিত। কলিকাতার নানা স্থানে আরও অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বাস করেন। সকলের পরিচয় দিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই স্থানে কলিকাতার পথসমূহের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল।

১. সারদাচরণ মিত্র ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।
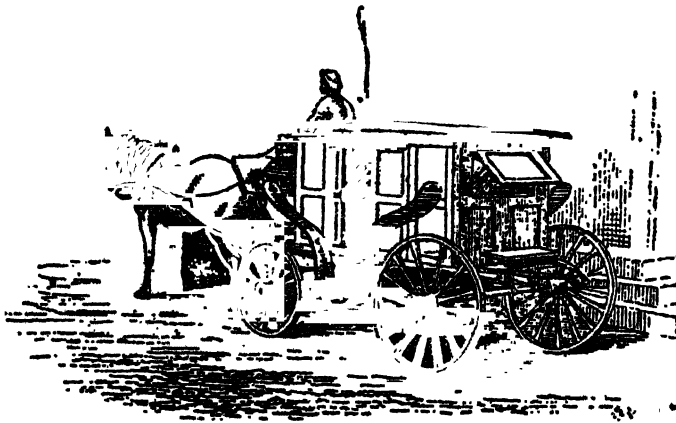
পঞ্চবিংশ অধ্যায়

বর্তমান কলিকাতার ঐতিহাসিক পরিচয়[১]

গবর্ণমেণ্ট-হাউস বা বড়লাট বাহাদুরের রাজপ্রাসাদ—গবর্ণমেণ্ট-হাউসে রক্ষিত গবর্ণর-জেনারেলগণের চিত্রপরিচয়—হাইকোর্টের ইতিবৃত্ত—বর্তমান হাইকোর্টের জজদিগের নামের তালিকা—টাউনহল—টাউনহলে রক্ষিত চিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ভূতপূর্ব মেটকাফ-হল এবং ইম্পিরিয়্যাল-লাইব্রেরি—বেলভেডিয়ার রাজ-প্রাসাদ—সেকালের বঙ্গদেশের ডেপুটি-গবর্ণরগণের নামের তালিকা—লেফটে-ন্যাণ্ট-গবর্ণরগণের নামের তালিকা—জেনারেল পোস্টাফিস—গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিস—পেপার-কারেন্সি অফিস—সম্রাট-বাহাদুরের টাঁকশাল—বেঙ্গল-ক্লাব—ইউনাইটেড সার্ভিস-ক্লাব—ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম—গবর্ণমেণ্ট আর্ট-স্কুল—মিউনি-সিপ্যাল অফিস—স্যর স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট বা মিউনিসিপ্যাল বাজার—সেনেট-হাউস ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি—বেথুন কলেজ—প্রেসিডেন্সি-হাসপাতাল—মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল—মেও-হাসপাতাল—জ্যুওলজিক্যাল গার্ডেন—বোটানিকেল গার্ডেন—ইডেন গার্ডেন—প্রিন্সেপস্-ঘাট—কলিকাতা সহরের প্রধান প্রধান স্ট্যাচুসমূহের পরিচয়—লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা—গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট—স্যর উইলিয়াম পিল—লর্ড অকল্যাণ্ড—লর্ড নর্থব্রুক—লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক—ওয়ারেন হেস্টিংস—লর্ড ক্যানিং—লর্ড লরেন্স—মহারাণী ভিক্টো-রিয়া—লর্ড রবার্টস—লর্ড ল্যান্সডাউন—লর্ড ডাফরিন—স্যর জেমস্ আউটরাম লর্ড মেয়ো—অক্টার্লোনি-মনুমেণ্ট—প্যানিয়টী প্রস্রবণ—কার্জন উদ্যান (Park)—লর্ড হেস্টিংস—দ্বারবঙ্গের মহারাজা—স্যর এস্‌লি ইডেন—স্যর স্টুয়ার্ট বেলী স্যর জন উডবার্ণ—হলওয়েল মনুমেণ্ট—লর্ড কার্জন—লর্ড কিচ্‌নার—প্রসন্ন-কুমার ঠাকুর—ডেভিড হেয়ার—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর—মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন—কালীঘাট মন্দির—সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—পাকড়াশির শিবমন্দির—আনন্দ-ময়ীর মন্দির—ঠনঠনিয়া সিদ্ধেশ্বরী মন্দির—নিমতলা ঘাট—ধর্মতলার মসজিদ—মাণিকপীরের গোর—জুম্মাপীরের গোর—ওয়াজির আলির গোর—জোব চার্ন-কের গোর—কর্ণেল ওয়াটসনের গোর—সার্জন হ্যামিলটনের গোর—মাইকেল মধুসূদন দত্তের গোর।

বর্তমান কলিকাতা সহরের বিশিষ্ট স্থানগুলির পরিচয়

ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সহরের সৌন্দর্যে কলিকাতা এখন সমগ্র ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরী সমূহের মুকুটমণি। সপ্তদশ শতাব্দীতে জোব চার্নক জঙ্গল ও বাদাভূমিপূর্ণ স্থানে যে কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই দুই শতাব্দীতে কালধর্মে এখন তাহা ইন্দ্রের বৈজয়ন্তী হইয়া উঠিয়াছে। যদিও দিল্লী নগরী আমাদের গৌরবান্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জের আদেশে ও আমাদের সর্বজনপ্রিয় বড়লাট হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অভিলাষানুসারে ভারতের রাজধানীরূপে গৌরবলাভ করিয়াছে, তথাপি কলিকাতার সৌন্দর্য দিন দিন পরিবর্দ্ধিত! মহামান্য ভারতেশ্বর স্বমুখে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"যদিও দিল্লী আমার সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল, তথাপি কলিকাতার গর্ব ও গৌরব কিছুতেই নষ্ট হইবে না।" ভারত সম্রাটের শ্রীমুখ-নির্গত ভবিষ্যৎবাণী এখন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। এই রাজধানী পরিবর্তনের ফলে, আমরা লর্ড কারমাইকেলের মত একজন উদারচেতা, লোকপ্রিয়, সহানুভূতিপূর্ণ, রাজনীতিজ্ঞ বঙ্গেশ্বর পাইয়াছি। তাঁহার আমলে কলিকাতার অনেক-

---

১. স্বভাবতই লেখক তাঁহার গ্রন্থরচনা কাল (১৯১৫ খ্রী) পর্যন্ত কলিকাতা পরিচয় দিয়াছেন।

গুলি প্রাসাদতুল্য নূতন অট্টালিকা নির্মিত হওয়ায় কলিকাতার পূর্ব সৌন্দর্য-গৌরব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। বর্তমান প্রস্তাবে আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কলিকাতার সেকালের বিখ্যাত বাড়িগুলির একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিব।[১]

গবর্ণমেন্ট-হাউস বা লাট-প্রাসাদ

সেকালের কলিকাতার গবর্ণমেন্ট-হাউস—সর্বপ্রথমে প্রাচীন কলিকাতা দুর্গের মধ্যে ছিল। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে কাপ্তেন আলেকজান্দার হ্যামিল্টন[২] দুর্গমধ্যস্থ এই বাড়িরই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ অট্টালিকা না হইলেও, শ্রীসৌন্দর্যসম্পন্ন বাসভবন ছিল বটে। বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সির সেকালের কলিকাতার গবর্ণরগণ এই বাটিতেই বাস করিতেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকার এবং ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াট্‌সন কর্তৃক কলিকাতা পুনরুদ্ধারের পর, পুরাতন দুর্গমধ্যস্থ গবর্ণরী-আবাসভবনটি পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীকালে দুর্গের দক্ষিণদিকে গঙ্গাতীরে একটি সুবৃহৎ বাড়ি গবর্ণরের আবাস জন্য নির্ধারিত হইয়াছিল। ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে এই বাড়িটির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। এবং বর্তমান লাট-প্রাসাদের সান্নিধ্যে তৃতীয় লাট-প্রাসাদ নির্মিত হয়। ইহা 'বাকিংহাম-হাউস, বলিয়া সেকালের লোকের নিকট পরিচিত ছিল। বর্তমান ট্রেজারি এবং এই তৃতীয় প্রাসাদ ও ইম্পিরিয়্যাল-অফিস-সমূহের পার্শ্বেই লাটসাহেবের নূতন প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল।[৩]

এই বাকিংহাম-হাউসে[৪] বঙ্গের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, প্রতিনিধি-গবর্ণর স্যর জন ম্যাকফ্যারসন, লর্ড কর্ণওয়ালিস ও স্যর জন শোর (লর্ড টেইনমাউথ) বাস করিয়া গিয়াছেন। হেস্টিংস সকল সময়ে এই বাড়িতে থাকিতেন না। পূর্বে বলিয়াছি, হেস্টিংস স্ট্রীটে ওয়ারেন হেস্টিংসের আর একটি নিজস্ব বাটি ছিল। এই বাটির কতকাংশ এখনও বর্তমান। বর্তমানে ইহার বহির্দিকটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বার্ণ কোম্পানির অফিস এখন এই বাটিতে অবস্থিত। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে ব্যারনেস্ ইম্‌হফের সহিত বিবাহ হওয়ার পর হইতে হেস্টিংস এই বাড়িতেও মধ্যে মধ্যে বসবাস করিতেন। ইহার পরবর্তীকালে তিনি সহর ছাড়িয়া তাঁহার আলিপুরের বাগানবাটি, 'হেস্টিংস-হাউসে' বাস করিয়াছিলেন। হেস্টিংসের এই বাগানবাটি বর্তমান আলিপুর জজ-কাছারির নিকটে আজও 'হেস্টিংস-হাউস' বলিয়া পরিচিত। সরকারি কাজ পড়িলে হেস্টিংস কলিকাতায় আসিতেন, নচেৎ আলিপুরের নির্জন আবাসভবনই তাঁহার কর্মময় জীবনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। কলিকাতা হেস্টিংস স্ট্রীটের এই বাটি ছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংসের নিজের একটি প্রাইভেট অফিস-গৃহও কলিকাতা সহরের মধ্যে ছিল। ওল্ডকোর্ট-হাউস স্ট্রীটের শেষাংশে যেখানে ইতিপূর্বে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ-বিক্রেতা স্কট টমসন কোম্পানির কার্যালয় ছিল, আর এখন যেখানে 'এস্‌প্লানেড-ম্যান্‌সন্‌' নামক পাঁচতলা সুবৃহৎ বাটি নির্মিত হইয়াছে, এই স্থানেই গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাইভেট-অফিসের সেই পুরাতন বাটিটি অবস্থিত ছিল। স্কট টমসন কোম্পানির সুবিখ্যাত ডাক্তার ফের্গিস এই বাটির একটি প্যানেলের কাচের উপর হেস্টিংসের নামের আদ্যঅক্ষরগুলি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন।

কলিকাতার পুরাতন লাট-প্রাসাদটি তদুপযুক্ত জাঁকালো ছিল না ও ইহার পার্শ্বে আরও অনেক ভদ্রলোকের বাড়িঘর ছিল যাহা গবর্ণর-জেনারেলের আবাসবাটির অপেক্ষা দেখিতে ভাল। এইজন্য হেস্টিংস, এইরূপ সামান্য বাড়িতে থাকিতে পছন্দ করিতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি আলিপুরেই থাকিতেন। কাউন্সিলের কিম্বা সরকারি অন্যান্য কাজ পড়িলে তিনি কলিকাতায়

---

১. গ্রন্থরচনাকালের (১৯১৫) বিখ্যাত বাড়িগুলির পরিচয় এখানে লভ্য, তৎপরবর্তী কালের নহে।

২. পৃ. ১৯১-এর পাদটীকা দ্র.

৩. কালের পরিবর্তনে স্বাধীনভারতে ইম্পিরিয়্যাল অফিস বলিয়া কিছু নাই, উল্লিখিত অট্টালিকাগুলির কোনো কোনোটি রূপান্তরিত হইয়াছে, প.ব. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফ্‌তর সেগুলিতে আছে।

৪. বাকিংহাম হাউসের মালিক ছিলেন নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খান।

আসিতেন। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে গ্রাণ্ড প্রে কলিকাতা দেখিতে আসেন। তিনি এই লাট-প্রাসাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"লাট সাহেব এসপ্লানেডের নিকট, একটি দ্বিতল বাটিতেই বাস করেন। বাড়িটি দেখিতে তত জাঁকালো শ্রীসম্পন্ন নয়। ইহার আশেপাশের অনেক ভদ্রলোকের বাড়িঘর দেখিতে বরঞ্চ খুব ভাল। পণ্ডিচারির-গবর্ণরের বাড়িও কলিকাতার লাটের বাড়ি অপেক্ষা বেশী শ্রীসৌন্দর্য-সম্পন্ন।" পাঠক! মনে রাখিবেন, আমরা সেকালের পুরাতন লাট-প্রাসাদের কথাই বলিতেছি।

এইজন্য এই সব আমলের বল, দরবার, লেভি ইত্যাদি কার্য, অতীতকালে লাট-বাড়িতে না হইয়া, পূর্বোক্ত থিয়েটার-গৃহে এবং তৎপূর্ববর্তীকালে কোর্ট-হাউসে হইত। এই 'কোর্ট-হাউস' গৃহটি, লালদীঘির কোণে ও রাইটার্স-বিল্ডিংএর পার্শ্বে, সেণ্ট এণ্ড্রু গির্জা যেখানে আজকাল বর্তমান—সেইস্থানেই ছিল। থিয়েটার-গৃহটি বর্তমান ফিন্‌লে-মিউর কোম্পানির অফিস-বাটির অধিকৃত স্থানে ছিল। এখন তাহার কোন চিহ্নই নাই। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির প্রথম আমলেও এই থিয়েটার-গৃহে সরকারি উৎসবাদি হইত। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে ১৩ ডিসেম্বরের সরকারি-গেজেটে, একটি বিজ্ঞাপন ছিল—তাহা হইতেই এ কথা প্রমাণ হয়। সে বিজ্ঞাপনটি এই—"আগামী ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার, সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে, থিয়েটার-গৃহে একটি বল ও সপার হইবে। মাননীয় গবর্ণর-জেনারেলের অভিপ্রায় এই, উক্ত দিনে, কোম্পানি-বাহাদুরের কলিকাতাবাসী সিভিল ও মিলিটারি কর্মচারিগণ, উক্ত সভায় যোগদান করিলে গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুর বড়ই প্রীতিলাভ করিবেন।"

কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি এসব অসুবিধা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কোর্ট-অব-ডাইরেক্টারদের সহিত লেখালেখি করিয়া, বর্তমান লাট-প্রাসাদ[১] নির্মাণের অনুমতি আনাইলেন। কাপ্তেন চার্লস ওয়াইএ্যাট নামক একজন স্থপতি, এই প্রাসাদ নির্মাণের ভার পান। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি, এই প্রাসাদের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর মহাসমারোহে প্রোথিত হয়। এই লাট-প্রাসাদ নির্মাণে তের লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। লং সাহেবের মতে "জমি কিনিতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। গৃহ সাজাইবার জন্য চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারি, ঝাড়লণ্ঠন প্রভৃতিতে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগিয়াছিল।" এই বাড়ির বাহ্যদৃশ্য ও নির্মাণ-প্রণালী বিলাতের ডার্বিশায়ারের 'কেড্‌লস্টন-হলের' মত। বিলাতের এই প্রাসাদতুল্য কেড্‌লস্টন-হল বর্তমানে, আমাদের ভূতপূর্ব গবর্ণর-জেনারেল লর্ড কার্জনের সম্পত্তি। এই বাটি-নির্মাণ সময়ে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতার বর্তমান ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে একটি অট্টালিকায় বাস করিতেন। এখন এই বাড়িটি 'আউটরাম-ইনস্টিটিউট' বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে ৪ঠা মে লর্ড ওয়েলেসলি বর্তমান লাট-প্রাসাদে প্রথম প্রবেশ করেন। এই দিনে 'শ্রীরঙ্গপত্তনের-বিজয়োৎসব' এই নব-নির্মিত লাট-প্রাসাদেই মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মুখেই অর্থাৎ উত্তরদিকে 'গ্র্যাণ্ড-স্টেয়ার-কেস্' বা প্রাসাদে যাইবার বিস্তৃত অধিরোহিণী শ্রেণী। এরূপ সুদীর্ঘ সিঁড়ি কলিকাতায় কোন প্রাসাদতুল্য বাড়িতেই নাই। সিঁড়ির উপর 'পোর্টিকো' বা সুদীর্ঘ থামওয়ালা বারান্দা। রাস্তা হইতে এ বারান্দাটি বড় সুন্দর দেখায়। বড়লাট-সাহেবগণ সিমলা হইতে ইতিপূর্বে যখন কলিকাতায় আসিতেন, কিম্বা কোন নূতন বড়-লাট যখন বিলাত হইতে আসিতেন, তখন এই 'পোর্টিকোর' নিম্নে, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ ও দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সমবেত হইয়া তাঁহার সম্বর্ধনা করিতেন। রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার পর, বঙ্গদেশের গবর্ণর-বাহাদুরকে এই স্থানে সম্বর্ধনা করা হয়। এই অধিরোহিণী শ্রেণীর সম্মুখের জমিতে, একটি পাখাওয়ালা সুবৃহৎ কামান আছে। ভূতপূর্ব গবর্ণর-জেনারেল লর্ড অ্যালেনবরা চীনযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, এই লুণ্ঠিত কামানটি এখানে সংস্থাপিত করেন। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট-হাউসের কম্পাউণ্ডের মধ্যে, এইরূপ আরও অনেকগুলি তোপ ব্রিটিশ-বাহিনীর

১. বর্তমান লাটপ্রাসাদ, ইহা এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিবাস, 'রাজভবন'।

বিজয়চিহ্ন স্বরূপ সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে শিখযুদ্ধে সংগৃহীত কামানগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লাট-প্রাসাদটি এমন কৌশলের সহিত নির্মিত, যে সকল ঋতুর সকল সময়েই ইহার উপরিতলের কক্ষগুলি বিশুদ্ধ বায়ুপ্রবাহ পরিপূর্ণ থাকে। এই পোর্টিকোর উপরে ভারত-সম্রাটের যে রাজচিহ্ন খোদিত আছে, লর্ড কার্জন তাহা নির্মাণ করাইয়া দেন। আগে লাট-প্রাসাদের গাত্রটি, হরিদ্রাবর্ণে চুণকাম করা হইত। লর্ড কার্জনের আমলে ইহা শ্বেতবর্ণে পরিবর্তিত হওয়ায় প্রাসাদের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফার্স্ট-ফ্লোর বা দ্বিতলে ব্রেক-ফাস্ট-রুম বা প্রাতরাশাগার। তাহার পূর্বদিকে কাউন্সিল-রুম বা বড়লাট-বাহাদুরের মন্ত্রণাসভাগৃহ বর্তমান। কাউন্সিল রুমের পূর্বদিকে 'থ্রোন-রুম' (Throne-Room), এইস্থানে টিপু সুলতানের ব্যবহৃত একখানি স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দ্বিতলের উপরই 'ডাইনিং-রুম' বা ভারত-রাজপ্রতিনিধির ভোজনাগার। এই প্রাসাদের কয়েকটি বড় বড় হল, সাধারণ রাজকার্য সম্বন্ধে দরবার এবং লেভি প্রভৃতি উৎসব কার্যের জন্য ব্যবহৃত হইত।

সেকেণ্ড-ফ্লোর বা ত্রিতলে—'বলরুম'। বড়লাট-সাহেবদের বাড়ির বলরুমের সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। এই হলের দুই ধারে, পঙ্কের কাজ করা সোনালি-রঞ্জিত অসংখ্য উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের স্তম্ভশ্রেণী। বলরুমের নিম্নভাগ, চকচকে পালিশ করা কাষ্ঠে নির্মিত। উপরে অসংখ্য ঝাড় ও চতুর্দিকে সোনালি মণ্ডিত দর্পণশ্রেণী।

এই লাট-প্রাসাদে ভূতপূর্ব গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়গণের অনেক দেহপ্রমাণ অয়েল-পেইণ্টিং বা তৈল-চিত্র বর্তমান ছিল। কোন্ গৃহে কিরূপ চিত্রাদি ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিতেছি। এই চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি অতি পুরাকালের।

বড়লাট-বাহাদুরের ভূতপূর্ব প্রাসাদে রক্ষিত চিত্রাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ
(কাউন্সিল-চেম্বার বা মন্ত্রণাগৃহ)

১। ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ—(জন্ম ১৭৮৫, মৃত্যু ১৮৫৬ খৃীঃ)। বর্তমান বড়লাটের পূর্বপুরুষ। ইহাঁরই আমলে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিখযুদ্ধ হয়। শিখযুদ্ধে জয়ী হওয়ায়, ইহাঁর যশপ্রতিভা চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। ১৮৪৪—৪৮ খৃীঃ পর্যন্ত ইনি লাটসাহেব ছিলেন। চিত্রকর : জন লুকাস [চিত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে (ভি,মে,হলে) রক্ষিত আছে।]

২। আরল অব্ এলগিন এবং কিংকারডাইন—(জন্ম ১৮১১, মৃত্যু ১৮৬৩ খৃীঃ)। ১৮৬২ হইতে ১৮৬৩ খৃীঃ অব্দ ইনি গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। চিত্রকর : এ, ডায়ার

৩। ডিউক অব ওয়েলিংটন—(জন্ম ১৭৬৯, মৃত্যু ১৮৫২ খৃীঃ)। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ, ইতিহাস-বিখ্যাত, অসাধারণ বীরপুরুষ। চিত্রকর : রবার্ট হোম। [ভি,মে, হলে আছে।]

৪। রবার্ট লর্ড ক্লাইভ কে, বি, (প্রথম লর্ড ক্লাইভ)—(জন্ম ১৭২৫, মৃত্যু ১৭৭৪ খৃীঃ)। ১৭৫৮ হইতে ১৭৬০ ও ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৭ খৃীঃ অব্দ পর্যন্ত ক্লাইভ বঙ্গের গবর্ণর ছিলেন। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ পলাশী-সমর-বিজয়ী লর্ড ক্লাইভ। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। সম্প্রতি লর্ড ক্লাইভের এক প্রস্তরমূর্তি বেলভেডিয়ারে, লর্ড কারমাইকেল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে এই প্রস্তরমূর্তি ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হলে রক্ষিত আছে। চিত্রকর : ডান্স।

৫। ওয়ারেন হেস্টিংস—(জন্ম ১৭৩৩, মৃত্যু ১৮১৮ খৃীঃ। ইনি স্বনামপ্রসিদ্ধ। কোম্পানির প্রথম আমলের ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত। অতিরিক্ত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশের (ফোর্ট-উইলিয়ামের) ইনি প্রথম গবর্ণর-জেনারেল। (১৭৭৪ খৃীঃ) মন্তব্য : প্রথম চিত্রকর ডেভিসের চিত্র হইতে মিস্ হকিন্সের কপি। ডেভিসের কপি বিলাতের ন্যাশান্যাল-গ্যালারিতে রক্ষিত। ইহা বর্তমানে ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হলে রক্ষিত আছে।

৬। মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিস, কে, জি,—(জন্ম ১৭৩৩, মৃত্যু ১৮০৫ খৃীঃ)। বঙ্গদেশের দ্বিতীয় গবর্ণর-জেনারেল ও প্রথম প্রধান-সেনাপতি। দুইবার ইনি এই উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত

হইয়া ছিলেন। প্রথমবারে (সেপ্টেম্বর ১৭৮৬ হইতে অক্টোবর ১৭৯৩ খৃঃ) ইহাঁর আমলে 'দশশালা-বন্দোবস্ত' প্রচলিত হয়। এ দেশেই ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছিল। চিত্রকর : এ, ডব্‌লু, ডেভিস। [এই চিত্র এবং প্রস্তর মূর্তি ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

৭। আরল অব মিণ্টো—(জন্ম ১৭৫১, মৃত্যু ১৮১৪ খৃঃ)। ইনি সম্প্রতি পরলোকগত ভারতের গবর্ণর-জেনারেল বা রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টোর পিতামহ। চিত্রকর : জর্জ চিনারি।

মন্ত্রণা-সভায় যাইবার বারান্দার দিকে

৮। ভাইকাউণ্ট হালিফাক্স—(জন্ম ১৮০০, মৃত্যু ১৮৮৯ খৃঃ)। ১৮৫২—১৮৫৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত, ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'বোর্ড-অব-কন্‌ট্রোলের' প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। চিত্রকর : জিঃ রিচমণ্ড, R.A.

৯। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক—(জন্ম ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৯ খৃঃ)। ফোর্ট-উইলিয়াম-ইন-বেঙ্গলের গবর্ণর জেনারেল—(১৮২৮—৩৪ খৃঃ) ১৮৩৪—৩৫ খৃঃ ইনি কোম্পানি-বাহাদুরের ভারতীয় অধিকার সমূহের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর আমলে সতীদাহ-প্রথা উঠিয়া যায় ও ঠগ-দস্যুদের দমন হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ফার্সীর পরিবর্তে বঙ্গের আদালতসমূহে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম প্রচলন আরম্ভ হয়। মন্তব্য : ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ডের সংগৃহীত ছবির নকল। [এই চিত্র এবং প্রস্তরমূর্তি ভি, মে. হলে রক্ষিত আছে।]

১০। আরল অব অকল্যাণ্ড—(জন্ম ১৭৮৪, মৃত্যু ১৮৪৯ খৃঃ)। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ১৮৩৬—১৮৪২ খৃঃ। ইহাঁর একটি পিত্তলময় আবক্ষ প্রতিমূর্তি ইডেন-গার্ডেনের সম্মুখে [বর্তমানে ভি, মে, হলে] আছে। ইহাঁর সময়ে কাবুল-যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়। চিত্রকর : স্টুয়ার্ট উরলী।

আছে। ইহাঁর সময়ে কাবুল-যুদ্ধ প্রথম আরম্ভ হয়। চিত্রকর : স্টুয়ার্ট উরলী।

১১। মার্কুইস অব রিপন—(জন্ম ১৮২৭ খৃঃ)। লর্ড রিপনের নাম ভারতবাসীর মনে চিরদিন জাগরিত থাকিবে। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়, (১৮৮০—১৮৮৪ খৃঃ)। ইহাঁর আমলে সুপ্রসিদ্ধ 'ইলবার্ট বিল' পাস হওয়ায় সমগ্র দেশে মহান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন-প্রথা. ইহাঁর আমলেই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। ইহাঁর প্রস্তর মূর্তি ভি, মে, হলে আছে। চিত্রকর : ই, জে, পয়েণ্টার, R.A.

১২। মার্কুইস অব ডাফরিন এণ্ড আভা—(জন্ম ১৮২৬, মৃত্যু ১৯০৩ খৃঃ)। সমগ্র ভারতের রাজ-প্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনারেল (১৮৮৪—১৮৮৯ খৃঃ)। ইহাঁর আমলে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরাজ-বাহাদুরের দখলে আসে। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে 'ন্যাশানাল কংগ্রেস' নামধেয় জাতীয়-মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। এই আমলে আমাদের মাতৃপ্রতিম স্বর্গীয় ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশ বাৎসরিক রাজত্বকালের স্মৃতি-উৎসব মহা সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছিল। লর্ড ডাফরিনের আমলে এদেশীয়গণ অধিক পরিমাণে উচ্চ রাজপদ লাভ করেন। লাট-পত্নী লেডি ডাফরিনের যত্নে এ দেশে 'ডাফরিন-জেনানা হাসপাতাল' প্রথম স্থাপিত হয়। [বর্তমানে চিত্র ভি, মে. হলে] চিত্রকর : এফ, হল, R.A.

১৩। ভাইকাউণ্ট ক্যানিং—(জন্ম ১৮১২, মৃত্যু ১৮৬২ খৃঃ)। ভারতের গবর্ণর জেনারেল (১৮৫৬—৫৮ খৃঃ)। ইনি ভারতের প্রথম ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি। ইহাঁরই আমলে, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, ভীষণ 'সিপাহী-বিদ্রোহ' আরম্ভ ও শেষ হয়। ইহাঁর শাসনকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারত-সাম্রাজ্যের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সিপাহিগণ ইংরাজদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল। কিন্তু দয়াবান ক্যানিং পরিশেষে বিদ্রোহীদের প্রতি যথেষ্ট করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজেরা ইহাঁকে বিদ্রূপচ্ছলে 'Clemency Canning' বলিতেন। [চিত্রখানি ভি, মে, হলে এবং প্রস্তর মূর্তি ব্যারাকপুরে লাটবাগানে আছে। চিত্রকর : সি, এ, মর্শউইক্।

১৪। মার্কুইস অব হেস্টিংস—(জন্ম ১৭৫৪, মৃত্যু ১৮২৬ খৃঃ)। ফোর্ট উইলিয়ামের গবর্ণর-জেনারেল ও কমাণ্ডার-ইন-চিফ্ রূপে, ইনি ১৮১৩—১৮২৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে যাহাতে এদেশীয়েরা ইংরাজি-ভাষায় উচ্চশিক্ষা পান তাহার প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয়। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন প্রতি বৎসর সাধারণ শিক্ষা-কার্যে, এক লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিবেন। লর্ড হেস্টিংসের আমলেই ইহা কার্যে পরিণত হয়। ইহাঁরই আমলে, রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতি স্বনামধন্য মহাত্মা-

গণের চেষ্টায় কলিকাতায় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড নামক তিনজন স্বনামখ্যাত পাদরীও এই সময়ে শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ইহা এখনও বর্তমান। এই মিশনারী সম্প্রদায়ের চেষ্টায় 'সমাচার-দর্পণ, নামক প্রথম বাঙ্গলা-সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই সময়ে মেডিকেল-কলেজও স্থাপিত হইয়াছিল।[১] [চিত্রখানি ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।] চিত্রকর : এ, ই, ডায়ার।

১৫। লর্ড লরেন্স—(প্রথমে জন লরেন্স) (জন্ম ১৮১১, মৃত্যু ১৮৭৯ খৃঃ)। ভারতের ভাইসরয় ও গবর্ণর জেনারেলের পদে ইনি ১৮৬৪—১৮৬৯ খৃঃ পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় সুদক্ষ শাসনকর্তা সেকালে খুব কমই আসিয়াছিলেন। শিখ-যুদ্ধের পর পাঞ্জাব ইংরেজাধিকারে আসিলে এই জন লরেন্স সেই বিপ্লবময় স্থানে শান্তিস্থাপন করিয়া আসেন। ইনিই প্রথম 'লর্ড লরেন্স'। গবর্ণমেণ্ট-হাউসের ঠিক সম্মুখে মাঠের মধ্যে ইহাঁর একটি প্রস্তরমূর্তি আছে। ইহাঁরই আমল হইতে বড়লাট-সাহেবগণের সিমলা-শৈলে প্রথম বসবাস আরম্ভ হয়। চিত্রকর : ভি, প্রিন্‌সেপ্ R.A. [ইহাঁর প্রস্তর মূর্তি ব্যারাকপুর লাটবাগানে আছে।]

১৬। আরল মেয়ো—(জন্ম ১৮২২, মৃত্যু ১৮৭২ খৃঃ)। ইনি ১৮৬৯—১৮৭২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। আণ্ডামান-দ্বীপে সূর্যাস্ত দেখিবার সময়, সিয়ার আলি নামক এক নিষ্ঠুর ওয়াহেবী-কয়েদী পিছন হইতে ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়া ইহাঁকে হত্যা করে। চিত্রকর : জন কলিয়ার; [প্রতিলিপি জে, হেলি। ইহা ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

উত্তরপূর্ব দিকের সিঁড়ির পথে (গ্রাউণ্ড-ফ্লোর)

১৭। সেখ করিমবক্স—(লাট-সাহেবের বড়-খানসামা) (জন্ম ১৮৪৮, মৃত্যু ১৮৭৭ খৃঃ)। মন্তব্য : লর্ড ডালহৌসির আমল হইতে, লর্ড লিটনের আমল পর্যন্ত, এই করিমবক্স লাট-প্রাসাদের [বর্তমান রাজভবন] হেড-খানসামা ছিল। সাতজন বড়লাটের অধীনে এই ব্যক্তি হেড-খানসামার কাজ করে।

(ফাস্ট-ফ্লোর)

১৮। আরল লিটন—(জন্ম ১৮৩১, মৃত্যু ১৮৯১ খৃঃ)। ইনি ১৮৭৬—১৮৮০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। ইহাঁর আমলে ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত-সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করেন। এজন্য দিল্লীতে একটি মহা-দরবার হইয়াছিল। ইহাই দিল্লীর প্রথম রাজসূয়-দরবার।[২] মন্তব্য : স্যার জে, ই, মিলেইসের তৈলচিত্রের নকল। [ইহা ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

১৯। আরল্ অফ্ নর্থব্রুক—লর্ড নর্থব্রুকের[৩] একটি প্রস্তরমূর্তি হাইকোর্টের ঠিক সম্মুখেই অবস্থিত। ১৮৭৩—১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত লর্ড নর্থব্রুক বড়লাট-সাহেবের পদে নিয়োজিত ছিলেন। ইহাঁর আমলে আমাদের ভূতপূর্ব সর্বজনপ্রিয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ রূপে ভারত-ভ্রমণে আসেন। সে সময়ের মহোৎসবের ব্যাপার এখনও আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক। চিত্রকর : ডবলু, আউলেস। [চিত্রখানি ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

(প্রথম ও দ্বিতীয়-ফ্লোরের মধ্যে)

২০। গবর্ণর জন জেফানিয়া হলওয়েল—ইনি কলিকাতার জমিদার বা কলেক্টর ছিলেন। পরে গবর্ণর হন। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলে, হলওয়েল কিরূপ অসম-সাহসের সহিত কলিকাতা-দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বর্ণিত। কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র, এই হলওয়েলের সহকারী বা ডেপুটি জমিদার ছিলেন।

---

১. কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩৫। এই সময় গবর্ণর জেনারেল এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক।

২. ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে গৃহীত Royal Title Act অনুসারে ভারত সম্রাজ্ঞী (Empress of India) উপাধিলাভ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দিল্লীতে এক আড়ম্বরপূর্ণ দরবারে নূতন উপাধি ঘোষিত হয়।

৩. ইনি ক্লাইভের অবসর গ্রহণ এবং ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক গবর্ণর পদ গ্রহণের মধ্যে ২৮ জানুয়ারি, ১৭৬০ এবং ২৭ জুলাই ১৭৬১ খ্রী. অস্থায়ী গবর্ণর রূপে ক্ষমতাসীন ছিলেন।

চিত্রকর : জোফানী।[1] [চিত্রখানি ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

ব্রেক-ফাস্ট রুম (Breakfast Room)

২১। মার্কুইস অব ডালহৌসি—(জন্ম ১৮১২, মৃত্যু ১৮৬০ খ্রীঃ)। ইনি গবর্ণর-জেনারেলের পদে ১৮৪৮—১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত কার্য করেন। ইহাঁর আমলে ভারতবর্ষে প্রথম রেল-ওয়ে ও টেলিগ্রাফ্-প্রতিষ্ঠা হয়। অর্ধআনার ডাক টিকিট ইহাঁরই আমলেই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। রেল খাল প্রভৃতির উন্নতির সহিত ইহাঁর শাসনকালে সরকারি 'পূর্তবিভাগ' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ দ্বিতীয় বর্মা-যুদ্ধ ইহাঁর আমলের প্রধান ঘটনা। ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অযোধ্যা-প্রদেশ ইংরেজাধিকারভুক্ত করেন। চিত্রকর : স্যার জে, ডবল্যু, গর্ডন। [ইহার প্রস্তর মূর্তি ভি, মে, হলে আছে।]

২২। আরল অব অ্যালেন্‌বরা—(জন্ম ১৭৯০, মৃত্যু ১৮৭১ খ্রীঃ। ১৮৪২—৪৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় কাবুল-যুদ্ধে সমস্ত ইংরাজ-সেনাই নিহত হয়। এই শোচনীয় ব্যাপারের প্রতিশোধ লইবার জন্য লর্ড অ্যালেনবরা পুনরায় ব্রিটিশ-সম্মান রক্ষার জন্য কাবুলে সেনা প্রেরণ করেন। এই সৈন্য-দল কাবুল অধিকার করিয়া ইংরাজ-বন্দীদিগকে উদ্ধার করে। ইহাঁর আমলে সিন্ধুদেশের আমীরদের সহিত যুদ্ধ ঘটে এবং ব্রিটিশসৈন্য বিজয়ী হওয়ায় সিন্ধুদেশ ইংরাজের দখলে আসে। গোয়ালিয়রের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া গোলযোগ ঘটায় লর্ড অ্যালেন-বরা গোয়ালিয়রে সেনা প্রেরণ করেন। মহারাজপুর ও পুণিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে, সিন্ধিয়ার পক্ষ ইংরাজের হস্তে পরাজিত হন। তৎপরে উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইয়া এই যুদ্ধের অবসান হয়। চিত্রকর : এফ. আর, সে; [প্রতিচিত্র এ, ই, ডায়ার। ইহা ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

২৩। চার্লস থিওফিলস, ব্যারণ মেটকাফ—(জন্ম ১৭৮৫, মৃত্যু ১৮৪৬ খ্রীঃ)। ইনি ২০এ মার্চ ১৮৩৫—৪ঠা মার্চ ১৮৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত (অর্থাৎ লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড বিলাত হইতে ভারতে না পেঁছান পর্যন্ত) গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান করিয়া লর্ড মেটকাফ চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'মেটকাফ-হল' নামক সুবৃহৎ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে লর্ড কার্জনের আমলে ও তাঁহার চেষ্টায় এই সুবৃহৎ লাইব্রেরিটি গবর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইয়া তাহা 'ইম্পিরিয়্যাল-লাইব্রেরিতে' পরিবর্তন করিয়াছেন। চিত্রকর : চার্লস পট। [চিত্রখানি ভি, মে, হলে আছে।]

২৪। জন শোর (ব্যারন টেনমাউথ)—(জন্ম ১৭৫১, মৃত্যু ১৮৩৪ খ্রীঃ)। লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর ইনি অস্থায়ীভাবে গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ইনি প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে, সিভিলিয়ান রূপে এ দেশে আসেন। রাজস্ব-বন্দোবস্ত কার্যে ইহাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। যে 'দশশালা-বন্দোবস্ত' প্রণোদিত করিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাহার সূচনা এই স্যর জন শোর সাহেবই করিয়াছিলেন। ইহাঁর আমলে রাজস্ব-বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়। এই সমস্ত কার্যের জন্য ইনি পরে লর্ড টেনমাউথ উপাধি পান। ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাইটির একজন গণনীয় সদস্য ছিলেন। চিত্রকর : জি, রিচমণ্ড। [চিত্রখানি ভি, মে, হলে আছে।]

থ্রোনরুম (Throne Room)

২৫। সম্রাট তৃতীয় জর্জ—(জন্ম ১৭৩৮, মৃত্যু ১৮২০ খ্রীঃ)। চিত্রকর : এল্যান রামসে।

২৬। সার্লোটি সোফিয়া অফ মেক্‌লেনবর্গ স্ট্রেলিজ—(সম্রাট তৃতীয় জর্জের পত্নী)। চিত্রকর : এ্যালান রামসে।

২৭। আরল অব আমহার্স্ট—(জন্ম ১৭৭৩, মৃত্যু ১৮৫৭ খ্রীঃ)। ১৮১৩ লর্ড হেস্টিংস ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইহার পর জন এড্যাম্স নামক একজন সিভিলিয়ান, গবর্ণর-জেনা-রেলের কাজ করিয়াছিলেন। তৎপরে লর্ড আমহার্স্ট এদেশে আসেন। আমহার্স্টের আমলে বর্মা ও ভরতপুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। মন্তব্য : স্যর টমাস লরেন্সের তৈলচিত্রের নকল। [ইহা বর্তমানে ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

২৮। মার্কুইস অব ওয়েলেসলি—(জন্ম ১৭৬০, মৃত্যু ১৮৪২ খ্রীঃ) ১৭৯৮—১৮০৫ খ্রীঃ

[1] জফরেন-এর তৈলচিত্রটির চিত্রকর Joshua Reynolds.

অব্দ পর্যন্ত ইনি ফোর্ট উইলিয়ামের গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় সাহসী সেনাপতি ও অভিজ্ঞ শাসনকর্তা খুব কমই এদেশে আসিয়াছেন। এই জন্য ইংরাজ-ইতিহাস লেখকেরা ইহাঁকে কোম্পানির-আমলের 'আকবর' বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাঁরই হস্তে টিপু সুলতানের ধ্বংস-সাধন ঘটে এবং মহীশূর-রাজ্য পুনরায় হিন্দুরাজার দখলে আসে। দ্বিতীয় মারহাট্টা-যুদ্ধ এই ওয়েলেসলির আমলেই হইয়াছিল। ওয়েলেসলি বাহুবলে অনেক রাজ্য জয় করিয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহাঁর সময়েই বর্তমান লাট-প্রাসাদ নির্মিত হয়। এবং কলিকাতা সহরেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। চিত্রকর : রবার্ট হোম। [ইহা ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

২৯। ডিউক অব ওয়েলিংটন—(থ্রোনরুমের দ্বারের নিকট)। চিত্রকর : রবার্ট হোম।

৩০। মহম্মদ আলি (কর্ণাটের নবাব)—(১৭৫৪—১৭৯৫ খৃীঃ)। চিত্রকর : এস, উইলিসন। [ইহা ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

৩১। রাজকুমার ডিউক অব ক্লারেন্স এণ্ড এভনডেল কে, জি, (জন্ম ১৮৬৪, মৃত্যু ১৮৯২ খৃীঃ)। চিত্রকর : এ, সোডেল।

৩২। লেডি উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক। চিত্রকর : এফ, আর, সে।

৩৩। শের আলি খাঁ—কাবুলের আমীর (১৮৬৩—১৮৭৯ খৃীঃ)। চিত্রকর : অজানিত। [ইহা রাজভবনে আছে।]

৩৪। নেপালের স্বনামপ্রসিদ্ধ জঙ্গ বাহাদুর—(১৮৪৬—১৮৭৭ খৃীঃ)। চিত্রকর : এফ, ব্রিগস্টোক

৩৫। যশোবন্ত সিংহ—(মহারাজা ভরতপুর) (১৮৫৩—১৮৯৩ খৃীঃ)। চিত্রকর : অজানিত। ইহা রাজভবনে আছে।

৩৬। টিপু সুলতানের দুই শিশুপুত্রের বিদায় গ্রহণ। চিত্রকর : অজানিত। [ইহা ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

৩৭। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর—(বর্তমান নিজামের বাল্যকালের চিত্র)। চিত্রকর : ডাউনার্ড।

৩৮। আরল অব বিকনসফিল্ড।

৩৯। ফতে আলি সাহ (পারস্যের সাহ) (১৭৯৮—১৮৩৪ খৃীঃ)। চিত্রকর : মেহের আলি। [ইহা ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

৪০। মহেন্দ্র সিংহ (পাতিয়ালার মহারাজা)—১৮৬২—১৮৭২ খৃীঃ)। চিত্রকর : অজানিত।

৪১। নবাব সাদত আলি খাঁ—(অযোধ্যার নবাব) (১৭৯৮—১৮১৪ খৃীঃ)। চিত্রকর : আর, হোম। [চিত্রখানি ভি, মে, হলে রক্ষিত আছে।]

৪২। ফ্রান্সের সম্রাট পঞ্চদশ লুই—(জন্ম ১৭১০, রাজত্বকাল ১৭১৫—১৭৭৪খৃীঃ)। চিত্রকর : কার্লেতন লুঃ।

৪৩। মেরী লেক্‌জিনস্কা—(পঞ্চদশ লুইয়ের পত্নী)। চিত্রকর : কার্লেতন লুঃ।

মোটের উপর—লাট-প্রাসাদ ৮২ খানি সুবৃহৎ তৈলচিত্রে সুশোভিত ছিল। উপরে কতকগুলির পরিচয় আমরা সংক্ষেপে দিয়াছি, এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত চিত্রগুলিও লাট-ভবনের সম্পত্তি।

(১) টিপু সুলতানের পুত্রগণ, (২) ভুটান ও সিকিমের অধিপতি, (৩) ভারত সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া, (৪) আগরার তাজমহল, (৫) মহারাজ বীরচন্দ্র দেব (ত্রিপুরাধিপতি), (৬) মুস্কিল আসান, (৭) গোলাম আলি খাঁ (টিপুর বিশ্বস্ত মন্ত্রী), (৮) আলিরাজ খাঁ, (৯) নন্দরায়, (১০) রাজ খাঁ (টিপুর বিশ্বস্ত সেনাপতি), (১১) কৃষ্ণরাজা ওয়াদিয়া (মহীশূরের হিন্দুরাজা) (১৭৯৯—১৮৩১ খৃীঃ)। ইনিই টিপুর পতনের পর লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক মহীশূর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন, (১২) একখানি প্রাকৃতিক দৃশ্য, (১৩) চন্দ্রালোকে সমুদ্রতীরের দৃশ্য, (১৪) দ্বিতীয় আকবর সাহ (১৮০৬—১৮৩৭ খৃীঃ), (১৫) নদী-কূলের দৃশ্য, (১৬) ১৮৭৬ খৃীঃ অব্দে যোধপুরের মহারাজার কলিকাতায় অভিষেক-দৃশ্য। মন্তব্য : পূর্বোক্ত চিত্রগুলির অধিকাংশই প্রমাণ-সাইজের এবং সেকালের নামজাদা বিলাতী চিত্রকরদের দ্বারা প্রস্তুত, বহুমূল্য তৈলচিত্র। এই চিত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—হলের জন্য নির্বাচিত হইয়াছে।

হাইকোর্ট

হাইকোর্ট টাউনহলের পশ্চিমদিকে 'গথিক' (Gothic) প্রণালীতে নির্মিত। ভারত-সম্রাটের প্রধান

বিচারালয়, বঙ্গসাম্রাজ্যের প্রধান ধর্মাধিকরণ—এই হাইকোর্ট। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে ইহার ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয়। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে এই সুবৃহৎ বাড়িটি সম্পূর্ণ হয়। ওয়াল্টার গ্রাণভিল বলিয়া পূর্ত-বিভাগের একজন ইঞ্জিনিয়ার, এই আদালতগৃহের প্ল্যান বা নক্সা প্রস্তুত করেন ও এই প্রকাণ্ড সৌধ তাঁহার তদারকিতেই নির্মিত হইয়াছিল। এই আদালত-গৃহটি বিলাতের 'ইপ্রেস-টাউনহলের' অনুকরণে নির্মিত।[১] বর্তমান হাইকোর্টের পশ্চিমদিকে সেকালের সুপ্রীমকোর্ট ছিল। যে স্থানে আজকাল হাইকোর্ট নির্মিত হইয়াছে, সেইস্থানের জমি অধিকার করিয়া পূর্বোক্ত সুপ্রীমকোর্ট ও তিনজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের বসত-বাটি ছিল। সেইগুলি ভাঙ্গিয়া বিদ্যমানকালে তদধিকৃত স্থানে এই হাইকোর্ট নির্মিত হইয়াছে।

১৭৮০ হইতে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পুরাতন সুপ্রীমকোর্ট বাটি নির্মিত হয়। এই সুপ্রীমকোর্টের নিকটে সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার লঙ্গভিলি ক্লার্ক সাহেবের আবাসবাড়ি ছিল। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের আমলে এই ক্লার্ক সাহেব একজন খুব নামাজাদা ব্যারিস্টার ছিলেন। প্রাচীন কলিকাতার হিতকর অনেক কার্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। আগে এদেশে ইংরাজগণ বরফ খাইতে পাইতেন না। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা সহরে প্রথম 'আইস-হাউস' বা বরফ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন জাহাজে করিয়া বরফ আসিত এবং একটি গুদামে জমা থাকিত। বরফের সের সময়ে সময়ে এক টাকা পর্যন্ত দাঁড়াইত। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের মধ্যে একটি 'বার-লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বর্তমান কালের বিরাট বার-লাইব্রেরির প্রথম সূত্রপাত। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে মেটকাফ হল নির্মিত হয়। এই ক্লার্ক সাহেবই ইহার নির্মাণ কমিটির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রধান কার্যকারী ছিলেন।

বর্তমান এসপ্লানেড ও ওল্ড পোস্টাফিস স্ট্রীটের সন্ধিস্থলে আর একটি বাটি ছিল। 'পঞ্চাশ' খ্রীস্টাব্দের আমলে এই বাটিতে উইলিয়াম ম্যাকফারসন নামক একজন সাহেব বাস করিতেন। ইনি একজন নামজাদা ব্যারিস্টার ও সেকালের সুপ্রীমকোর্টের মাস্টারের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ইহাঁর সহোদর স্যার জর্জ ম্যাকফারসন পরবর্তীকালে হাইকোর্টের জজ হন (১৮৬৪—১৮৭৭)। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে স্যার জেমস কলভিলির আবাসবাটি ছিল। এই কলভিলি সাহেব ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে সেকালের সুপ্রীমকোর্টের এড্ভোকেট জেনারেল ছিলেন। ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, ইনি সুপ্রীমকোর্টে জজিয়তি করেন। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম পীল প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কলভিলি সাহেব সুপ্রীমকোর্টের চিফ্-জস্টিস হন।

এক্ষণে পুরাতন সুপ্রীমকোর্টের কথা বলিব। এই আদালত-গৃহটি দ্বিতল ছিল। উপরের তলায় 'গ্র্যাণ্ডজুরী রুম' (Grand Jury Room) আর নীচের তলায় আদালত-গৃহ ছিল। মারহাট্টা-খাতের সীমামধ্যস্থ অধিবাসীদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমার বিচার জন্য সেকালের মনীষী বিচারকগণ, এই নিম্নতলস্থ কক্ষগুলির শোভা-সম্বর্ধন করিতেন। এই আদালত-বাটির একটি কক্ষে সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্সের বিশ্রাম-স্থান ছিল। স্যার উইলিয়াম ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে সুপ্রীমকোর্টের পিউনী-জজ নিযুক্ত হন।[২] ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই কলিকাতাতেই তাঁহার দেহান্ত হয়। স্যার উইলিয়াম প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার গার্ডেন-রিচের 'বাঙ্গলো' হইতে পদব্রজে আদালতে আসিতেন। আদালতের মধ্যস্থ এই বিশ্রাম কক্ষটি তাঁহার জ্ঞানানুশীলনের পবিত্র মন্দির ছিল। অপরাহ্ণে তিনি এই আদালত-গৃহের নির্জন কক্ষে বসিয়া, পণ্ডিত ও মৌলবীদের নিকট সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষার পাঠ লইতেন। ইহাঁদের সাহায্যে তিনি সংস্কৃত ও উর্দু ভাষায় বহুবিধ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করিতেন।

১. Ypres বেলজিয়ামে অবস্থিত।
২. স্যর উইলিয়াম জোন্স সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এই সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত তখন কলিকাতার সহরে আর একটি "আপিলেট-কোর্ট" ছিল। বর্তমান ঘোড়-দৌড়ের মাঠের পশ্চাৎদিকে, ভবানীপুর অঞ্চলে যে প্রাসাদতুল্য বাটি আজকাল 'মিলিটারি-হাসপাতালে' পরিবর্তিত, সেই বাড়িতেই সেকালের জন্য এই আপীল-আদালত ছিল। এখানে দেওয়ানি, ফৌজদারি, উভয়বিধ মামলাই নিষ্পত্তি হইত। সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এই আদালতের 'জুরিসডিকসান' বা বিচারসীমা নির্ধারিত ছিল। পুরাকালের সাধারণের নিকট ইহা 'সদর-দেওয়ানী-আদালত' বলিয়া পরিচিত ছিল।

ব্রিটিশ-পার্লামেণ্টের ১৭৭৪ খৃীস্টাব্দের ২৬এ মার্চের বিধান অনুসারে সুপ্রীমকোর্ট প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চার্টারের বলে ওয়ারেন হেস্টিংস ফোর্ট-উইলিয়ামের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল হন। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন স্বনামখ্যাত স্যর ইলাইজা ইম্পি। এই আদালত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এই—"To protect the natives from oppression and to give India the benefits of English Law." স্যর ইলাইজা ইম্পি হইতে স্যর বার্ণিস পীকক পর্যন্ত সেকালের সুপ্রীম-কোর্টে যে সমস্ত প্রধান জজ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদের কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

সমগ্র বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সির জন্য আরও দুইটি আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের একটির নাম 'সদর-নিজামত-আদালত'। সমগ্র বঙ্গের ফৌজদারি-মামলাসমূহের আপীলের শুনানি এই আদালতে হইত। ইতিপূর্বে দেওয়ানী-মোকদ্দমার আপীলের শেষ বিচারভার সকাউন্সিল গবর্ণর সাহেবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু নূতন চার্টার দ্বারা গবর্ণর ও কাউন্সিলের কার্য-প্রণালীর পরিবর্তন ঘটায়, হেস্টিংস ইম্পিকে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজিয়তি ছাড়া, সদর-দেওয়ানি আদালতের প্রধান জজ করিয়া দেন। ইম্পির প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। যাহা হউক, এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইম্পি মফঃস্বলের নিম্ন আদালতসমূহের কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। বর্তমানকালের নিয়মসমূহ ইম্পির প্রণোদিত এই নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৮৬২ খৃীস্টাব্দের ১৪ই মে এক নূতন আইনের বলে, এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন আদালতের সমীকরণ হইয়া বর্তমান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের প্রথম চিফ-জস্টিস স্যর বার্ণিস পিকক। তাঁহার সহযোগীরূপে দ্বাদশজন পিউনী-জজও এই আইনের বলে নিযুক্ত হন। হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সদর-দেওয়ানি-আদালত, সদর-নিজামত-আদালত ও সুপ্রীমকোর্টের লোপসাধন হয় এই নব প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের জজদের মধ্যে আটজন কোম্পানি-বাহাদুরের ভূতপূর্ব আদালত হইতে আসেন। বাকি চারিজনের মধ্যে, দুইজন (স্যর চার্লস জ্যাকসন ও স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েলস্) সুপ্রীমকোর্টের জজ আর জজ নর্মান ও মর্গান ব্যারিস্টার-জজ। পূর্বোক্ত আদালতত্রয়ের হস্তে যে সমস্ত বিচার ক্ষমতা ছিল তাহা নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের জজেদের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৬৫ খৃীস্টাব্দের নূতন 'লেটার্স-পেটেন্ট' (Letters patent) দ্বারা, হাইকোর্টের জুরিস্‌ডিক্‌সান বা বিচারসীমা পর্যন্ত নির্ধারিত হইয়া যায়।

বর্তমানে এই হাইকোর্টে অনেক বাঙ্গালী-জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা ১৯১৪ খৃীঃ অব্দের হাইকোর্টের জজদিগের একটি তালিকা নিম্নে দিতেছি।

(চিফ-জস্টিস।)

অনারেবল জস্টিস্ স্যর লরেন্স, হিউ জেনকিন্স (K. C. I. E.)

পিউনী-জজগণ

অনারেবল স্যর এইচ, এ, স্টিফেন Kt. (বার-এট্-ল)

,, জন জর্জ উড্রোফ্ এম. এ, বি, সি, এল্। (বার-এট্-ল)

,, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় Kt. K. C. I. E. M. A; D. L.

,, হারবার্ট, হোমউড্ I. C. S.

অনারেবল চার্লস্, উইলিয়াম চিটি, বি, এ। (বার-এট্-ল)
,, আরনেস্ট, এডওয়ার্ড শ্লেচার। (বার-এট্-ল)
,, সৈয়দ সরফুদ্দিন। (বার-এট্-ল)
,, হেন্‌রি, রেনেল, হল্যাণ্ড, কক্স I. C. S.
,, হারবার্ট, উইলিয়াম, ক্যামেরান কারণডফ্ Kt. I. C. S; C. I. E.
,, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
,, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।
,, উইলিয়াম টিউনন্ আই, সি, এস।
,, আশুতোষ চৌধুরী (বার-এট্-ল)
,, সৈয়দ হাসান ইমান (বার-এট্-ল)
,, টমাস, উইলিয়াম রিচার্ডসন I. C. S.
,, চার্লস, বিচক্রফট I. C. S.
,, এডমণ্ড, পি, চ্যাপম্যান I. C. S.
,, বসন্তকুমার মল্লিক I. C. S.

টাউন-হল

হাইকোর্টের পার্শ্বেই কলিকাতার টাউন-হল। পূর্বে আমরা যে 'লটারি-কমিটির' কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের সহায়তাতেই এই সুবৃহৎ টাউন-হল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একবারের লটারিতে ইহার নির্মাণোপযোগী টাকা না উঠায়, তজ্জন্য দুই তিন বৎসর ধরিয়া লটারি করিয়া টাকা তুলিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার আদেশে ও তত্ত্বাবধানে ১৮০৬—১৮০৭ খৃঃ মধ্যে এই প্রাসাদ-তুল্য বাটি নির্মিত হয়। প্রথমে সেণ্ট এণ্ড্রু গির্জার অতি সান্নিধ্যে, পুরাতন কোর্ট-হাউসের অধিকৃত স্থানে, কলিকাতা টাউন-হল নির্মাণের কল্পনা হইয়াছিল। শেষ বর্তমান স্থানই বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, গারস্টিন ও অবেরী নামক দুইজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায়, বর্তমান টাউন-হল বাটি নির্মিত হইয়াছে।[১]

প্রয়োজনীয় রাজকীয় ঘোষণাসমূহ বা কোনরূপ সরকারি 'প্রোক্লামেসন' (proclamation) এই টাউন-হলের বিস্তৃত সোপানরাজির উপর হইতেই রাজপুরুষগণ কর্তৃক বিঘোষিত হইয়া থাকে। আমাদের ভারত-সম্রাট রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ ও সাম্রাজ্ঞী মেরীর রাজ্যাভিষেক সংবাদ এইস্থান হইতেই বিঘোষিত হইয়াছিল। এ দৃশ্য বর্তমানকালের অনেকেই চক্ষে দেখিয়াছেন।

টাউনহলের নীচের তলাটি সাধারণ কার্যে খুব কমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন সরকারি অফিস স্থানাভাব জন্য অস্থায়ীভাবে এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানকালে মিউনিসিপ্যাল-ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এই টাউন-হলেই প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান হাইকোর্ট নির্মাণ সময়েও এইস্থানে অস্থায়ীভাবে ইহার কার্য চলিয়াছিল। এই টাউন-হলের সিঁড়ির উপরই সুবিখ্যাত চিফ জস্টিস স্যর জন নর্মান বিশ্বাসঘাতক আততায়ীর হস্তে ছোরা দ্বারা আহত হন।

টাউনহলের দুইটি প্রবেশ পথ আছে। একটি এসপ্ল্যানেড-রোর দিক দিয়া অপরটি গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিংএর সম্মুখদিকে। সভা-সমিতি উপলক্ষে এসপ্লানেডের পথ দিয়াই জনসঙ্ঘ টাউন-হলে প্রবেশ করেন।

এই পথ দিয়া প্রবেশ করিলেই সর্বপ্রথমে নিম্নতলে স্বর্গীয় মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের প্রস্তর-মূর্তি (Bust) [এখন টাউন হলে] পরিদৃশ্য হয়।[২] ভিতরের দিকের হলে বেকন নামক প্রসিদ্ধ ভাস্করের খোদিত স্বনামখ্যাত গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের সুবৃহৎ প্রস্তর-মূর্তি খা

১. টাউন হলের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয় ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে।
২. রমানাথ ঠাকুর (১৮০০–১৮৭৭) স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতা। দশ বৎসর ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যা[illegible] সভাপতি ছিলেন।

স্ট্যাচু [এখন ভি, মে, হলে] অপরদিকের বারান্দায়, প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শ্বেত-মর্মরময় সুবৃহৎ প্রতিমূর্তি বা স্ট্যাচু [এখন ভি, মে, হলে] আছে। আগে এই হলের মধ্যে পরবর্তী গবর্ণর-জেনারেল মার্কুইস অব হেস্টিংসের স্ট্যাচুও ছিল। [পরবর্তী কালে ইহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল হলে স্থানান্তরিত হইয়াছে।]

টাউনহলের মধ্যে যে সমস্ত তৈল-চিত্র ও প্রস্তর-মূর্তি আছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকের জানিয়া রাখা উচিত।

পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেলেই প্রথমে স্যর হেনরি হ্যারিসনের প্রস্তর-নির্মিত অর্ধমূর্তি বা Bust [বর্তমানে টাউন হলে]। এই হ্যারিসন সাহেব কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ও বর্তমান হ্যারিসন-রোড নামক সুপ্রশস্ত পথটি ইহাঁর নামেই পরিচিত।

দেয়ালের গায়ে—নিম্নলিখিত চিত্রগুলি আছে।—(১) মেজর জেনারেল নট [বর্তমানে টাউন হলে] (২) কেশবচন্দ্র সেন [বর্তমানে ভি, মে, হলে] (৩) স্যর চার্লস মেটকাফ [বর্তমানে ভি, মে, হলে]।

উপরের তলায়—(১) ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া (২) মহারাণীর স্বামী প্রিন্স কন্সর্ট [বর্তমানে ভি, মে, হলে] (৩) জজ স্যর হেনরি নর্মান (৪) পি, এইচ, ক্যামেরান (৫) স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর [আবক্ষ মূর্তি ভি, মে, হলে] (৬) স্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

উপরতলে পশ্চিমদিকের দেয়ালে—(১) হিজ্ রয়াল হাইনেস্ ডিউক অব এডিনবরার গ্র্যাণ্ডকমাণ্ডার-অব-স্টার-অব-ইণ্ডিয়া উপাধি লাভ উপলক্ষে গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মেয়োর দরবার।

উত্তরদিকের দেয়ালে—(১) পাদরী ডল্ সাহেব (২) কাউন্সিলের-মেম্বর অনারেবল জেমস জিব্‌স আই, সি, এস; সি, আই, ই, (৩) মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারী রবার্ট টার্ণবুল(৪) কলিকাতার প্রথম সেরিফ্ মানেকজী রস্তমজী (৫) স্যর উইলিয়াম গ্রে, লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর (১৮৬৭-৭১) (৬) লেডি ডাফরিন (৭) লেডি ল্যান্সডাউন (৮) স্যর রিভার্স টমসন, বঙ্গদেশের লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর (৯) পঞ্চম বিশপ ড্যানিয়েল (১০) স্যর হেন্রি হ্যারিসন। [ছবিগুলির সন্ধান এখন পাওয়া যায় না।]

দক্ষিণদিকের দেয়ালে—(১) সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ (২) সুপ্রসিদ্ধ পাদরী ডাক্তার ডফ্ [এখন ভি, মে, হলে] (৩) মাদ্রাজের গবর্ণর কর্ণেল কলিস মেকেঞ্জি (পরে সরভেয়ার-জেনারেল) (৪) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর [এখন ভি, মে, হলে] (৫) ভারত গবর্ণমেণ্টের ফরেন-সেক্রেটারী স্যর হেন্রি ডুরাণ্ড (৬) বিশপ জনসন (৭) হেনরি লি, আই, সি, এস, (৮) রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর (৯) এফ, জে, জনস্টন, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের চিফ-এঞ্জিনিয়ার। [৫-৮ ছবিগুলির সন্ধান এখন পাওয়া যায় না।]

সমস্ত ছবি ও প্রস্তর-মূর্তিগুলির সবিস্তার ইতিহাস দিবার স্থান আমাদের নাই। এই টাউনহলে স্বনামখ্যাত বাবু পিয়ারীচাঁদ মিত্র ও বাবু রামগোপাল ঘোষের[১] আবক্ষ প্রস্তর-মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্ব্যতীত স্যর হেনরি কটন [প্রস্তর মূর্তি ভি, এম, হলে], জজ প্রিন্সেপ [প্রস্তরমূর্তি ভি, এম, হলে], স্যর উইলিয়ম নট, স্যর উইলিয়াম কেসমেণ্ট [প্রস্তরমূর্তি ভি, মে, হলে] চার্লস হে, ক্যামরান, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর উইলিয়াম গ্রে, মানেকজী রস্তমজী, স্যর চার্লস নিভেন্স, স্যর হেনরি রিকেট্‌স প্রভৃতি সেকালের নামজাদা সম্ভ্রান্ত ইংরাজগণের ছবিগুলি এখনও বর্তমান।

বড় বড় সভাসমিতি ও সাহেবদের-ভোজ বল প্রভৃতি উৎসবে এই টাউনহল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমান টাউনহল প্রাসাদময়ী কলিকাতার গৌরব স্বরূপ। বহু জনসমাগমের স্থান সঙ্কুলান করিবার

---

১. রামগোপাল (১৮২৫-১৮৬৮), হিন্দু কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন, অসাধারণ বাগ্মী হিসাবে তৎকালে সুপরিচিত ছিলেন, দেশে শিক্ষাপ্র[illegible] সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, 'জ্ঞানান্বেষণ, ও বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকা[illegible]নির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। যাইবার সময় আলিপুরের অধিকাংশ সম্পত্তি তিনি গবর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসকে দান বা বিক্রয় করিয়া যান। অতীতকালের নানাবিধ ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়, গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের বসবাসের জন্যই এই আলিপুর সেই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। হেস্টিংসের জন্যই কালীঘাটের গঙ্গার উপর প্রথম পুল নির্মিত হয় আর 'হেস্টিংস-হাউস' এখনও তাঁহার কীর্তিঘোষণা করিতেছে।

১৭৬২ খৃীঃ অব্দে বেলভেডিয়ারের প্রথম নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে গবর্ণর সাহেবের জন্য একটি বাগান-বাটি নির্মাণের প্রস্তাব বিলাতে কোর্ট-অব-ডাইরেক্টারের নিকট গিয়াছিল। বেলভেডিয়ারে মিঃ ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের বাটিটি কিনিয়া লইয়া তাহা গবর্ণর-সাহেবের বাগান বাটিতে পরিণত করিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বিলাতের-কর্তারা এ প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করায়, তখন এ সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। ইহার পর ডাচ্ এড্‌মিরাল স্ট্যাভোরিনসের উক্তি হইতে জানা যায়, ১৭৭০ খৃীঃ অব্দে এই বেলভেডিয়ারে গবর্ণরের বাগান-বাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইংরাজ-গবর্ণর ডাচ্ গবর্ণর ও এড্‌মিরালগণকে একবার নিমন্ত্রণ করেন। স্ট্যাভোরিনস এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে প্রমাণ হয়, ১৭৭০ খৃীঃ অব্দে বেলভেডিয়ারে ইংরাজ-গবর্ণরের আবাস-বাটি বর্তমান ছিল। পাঁচ বৎসর পরে গবর্ণর-জেনারেল হইয়া ওয়ারেন হেস্টিংস আলিপুরে বাগান-বাড়ি নির্মাণ করেন। তাঁহার লেখা হইতে প্রমাণ হয় তখন তিনি এই বেলভেডিয়ারে (অবশ্য বর্তমান প্রাসাদে নহে, কারণ এ প্রাসাদ তখনও নির্মিত হয় নাই) কোন একটি বাড়িতে বাস করিতেন। এই বাড়িতেই তিনি মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে আনীত চক্রান্ত-মোকদ্দমার প্রধান নায়ক কামাল-উদ্দিন সেখের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এই কামালউদ্দিন নন্দকুমারের নামে আনীত 'জাল-মোকদ্দমার' একজন প্রধান সাক্ষী ছিল। ১৭৭৫ খৃীঃ অব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্যর ইলাইজা ইম্পিকে তাঁহার বাগান-বাটিতে কিয়দ্দিন বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই বাগান-বাটি আলিপুর বেলভেডিয়ারের কোনও বাটি কি হেস্টিংসের রিষড়ার বাগান-বাটি, কিছুই স্থির করা যায় না। ইহার পরবর্তীকালে মিসেস ফে'র[১] একখানি পত্র হইতে প্রমাণ হয়, তিনি হেস্টিংসের এই বেলভেডিয়ার বাটিতেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

রেভারেন্ড ফারমিঞ্জার বলেন, "নূতন বাড়ি প্রস্তুত করা এবং পরে সেই বাড়ি বিক্রয় করা হেস্টিংসের একটা বাতিকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। কলিকাতা ও আলিপুরে তাঁহার একাধিক বাটি ছিল। এই জন্য কোন বাটিতে তিনি বাস করিতেন, তাহা নিঃসন্দেহে স্থির করা বড়ই দুরূহ।" ১৭৮০ খৃীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হেস্টিংস এই বেলভেডিয়ারের বাটিটি মেজর টলিকে বিক্রয় করেন। এই মেজর টলিই খিদিরপুরের বর্তমান টলিস-নালার খনক ও টালিগঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা। টলি সাহেব এই বাটিতে প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, পরে তিনি ইহা ভাড়া দেন। টলির মৃত্যুর পর ১৮০২ খৃীঃ অব্দে তাঁহার এটর্ণি কর্তৃক ইহা নীলামে বিক্রীত হয়। তৎপরে এই বাটি ব্রেরেটন বার্চ নামক এক ইংরাজের সম্পত্তি হয়। (১৮১০ খৃীঃ অব্দ)। বার্চ সাহেবের পর ইহা বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর সম্পত্তি হইয়াছিল। (১৮২৪ খৃীঃ অব্দ) এই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস স্থান কোথায়, তাহা আমরা ঠিক করিতে পারি নাই। ১৮৪১ খৃীঃ অব্দে এই বেলভেডিয়ার বাটি জেম্স ম্যাকিলপ্ নামক একজন ইংরাজের দখলে আসে। ১৮২৩ খৃীঃ অব্দে দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি অনারেবল স্যর এডওয়ার্ড প্যাজেট কে, সি, বি, এই বাটিতে ভাড়াটিয়া ছিলেন।

১. এই মিসেস্ ফের পূর্বকালে কলিকাতায় একজন ব্যারিষ্টার পত্নী। ইনি স্থলপথে সরাসর বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কালিকটে অবস্থানকালে ইনি হায়দর আলির হস্তে বন্দী হন। মিসেস ফের লিখিত অনেক চিঠি-পত্র হইতে সেকালের কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। গবর্ণর-পত্নী লেডী হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার খুব বন্ধুত্ব ছিল।

১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসি বিলাতের কর্তাদের এক পত্র লেখেন। তাহার সারমর্ম এই—"বঙ্গের লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরগণের জন্য স্বতন্ত্র আবাস-বাটি নির্মিত হওয়া উচিত। এই বাটি গবর্ণমেণ্টের খরচায় খরিদ করা ও সাজান হইবে। ভারতের গবর্ণর-জেনারেল এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির গবর্ণরদের জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র আবাস-স্থান আছে, বঙ্গের লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণরদের জন্য সেইরূপ কোন কিছু হওয়া উচিত।" লর্ড ডালহৌসির এই মন্তব্যের ফলে ও চেষ্টায় বেলভেডিয়ার বাটিটিই শেষ লাট-প্রাসাদের জন্য মনোনীত হয়। তখন এই বাটিটি সুপ্রীমকোর্টের অ্যাডভোকেট জেনারেল রবার্ট প্রিন্সেপ সাহেবের দখলে ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট এই বাটিটি ক্রয় করিয়া লয়েন।

তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন লেফটেনাণ্ট গবর্ণরদিগের আমলে এই বাটির নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। স্যর উইলিয়াম গ্রে, স্যর এসলি ইডেন, স্যর স্টুয়ার্ট বেলী, স্যর চার্লস ইলিয়ট, স্যর রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি লেফটেনাণ্ট গবর্ণরদের আমলে এই প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার নানাস্থান নূতনভাবে নির্মিত হইয়া ইহা বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গলার গবর্ণর ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দের চার্টারের বলে গবর্ণর-জেনারেল অব ইণ্ডিয়া এবং গবর্ণর-অব-বেঙ্গল বলিয়া আখ্যাত হইলেন। এই গবর্ণর জেনারেলের হস্তে এরূপ ক্ষমতা দেওয়া ছিল যে তিনি ইচ্ছা করিলে একজন ডেপুটি-গবর্ণর নিযুক্ত করিতে পারেন। সমগ্র বঙ্গদেশের শাসনভার এই ডেপুটির হস্তেই ন্যস্ত হইত। ডেপুটি-গবর্ণরেরা, এই কার্যের জন্য স্বতন্ত্রভাবে কোন বেতনাদি পাইতেন না। কোম্পানির অধীনে তাঁহারা পূর্ব কর্মে নিযুক্ত থাকিবার সময় যে বেতন পাইতেন, তাহা লইয়াই এই ডেপুটির কাজ করিতে হইত। যে কয়জন ডেপুটি-গবর্ণর এইভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকের জানিয়া রাখা উচিত।

বঙ্গের ডেপুটি-গবর্ণরগণ (১৮৩৭—১৮৪৯ খ্রীঃ)

(১) আলেকজাণ্ডার রস	১৮৩৭ খ্রীঃ
(২) কর্ণেল উইলিয়াম মরিসন সি, বি, (মান্দ্রাজ-আর্টিলারি)	১৮৩৮ খ্রীঃ
(৩) টমাস ক্যাম্বেল রবার্টসন	১৮৩৯ খ্রীঃ
(৪) স্যর টমাস হারবার্ট ম্যাডক্ সি, বি,	১৮৪৫—১৮৪৮ খ্রীঃ
(৫) মেজর-জেনারেল স্যর, জে, লিট্‌লার জি, সি, বি,	১৮৪৯ খ্রীঃ
(৬) অনারেবল জে, এ, ডোরিন্	১৮৫৩ খ্রীঃ

১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পার্লামেণ্টের নিকট এক নূতন চার্টার প্রাপ্ত হন। লর্ড ডালহৌসির বিশেষ অনুরোধে পার্লামেণ্ট বঙ্গের লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরের পদ সৃষ্টি করেন। ইহার পর হইতেই লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরগণ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার ভাগ্য পরিচালক হন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিত লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরগণ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে বসিয়াছিলেন।

বঙ্গের লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরগণের নাম

নাম	নিয়োগ সময়	
স্তর ফ্রেডরিক জেমস হ্যালিডে K.C.B.	১৮৫৪ খ্রী. (১লা মে)	১ম লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর।
স্তর জন পিটার গ্রাণ্ট, K.C.B.,G.G.M.G.	১৮৫৯ খ্রী. (১লা মে)	
স্তর সিসিল বিডন, K.C.S.I.	১৮৬২ খ্রী. (২৩ এপ্রিল)	ইহঁারই নামে বিডন ষ্ট্রীট।
স্তর উইলিয়াম গ্রে, K.C.S.I.	১৮৬৭ খ্রী. ঐ	ইহঁারই নামে গ্রে ষ্ট্রীট
স্তর জর্জ ক্যাম্বেল M.P.K.C.S.I.D.C.L.	১৮৭১ খ্রী. (১লা মার্চ)	
দি রাইট অনারেবল স্তর রিচার্ড টেম্পল M.P.C.S.I.C.I.E.D.C.L.	১৮৭৪ খ্রী. (৯ই এপ্রিল)	

নাম	নিয়োগ সময়	মন্তব্য
দি অনারেবল স্তর এস্‌লি ইডেন K.C.S.I	১৮৭৭ খ্রী. (৮ই জানুয়ারি)* ঐ (১লা মে)	প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ।
স্তর ষ্টুয়ার্ট কলভিন্ বেলী K.C.S.I.C.I.E.	১৮৭৯ খ্রী. (১৫ই জুলাই হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত)	প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ।
স্তর অগষ্টস্ রিভার্স টমসন্ K.C.S.I.	১৮৮২ খ্রী. (২৪ এপ্রিল)	
হোরেস এবেল্ ককরেল্ C.S.I.	১৮৮৫ খ্রী. (১১ই আগষ্ট হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর)	প্রতিনিধি
স্তর ষ্টুয়ার্ট কলভিন্ বেলী K.C.S.I.	১৮৮৭ খ্রী. (২রা এপ্রিল)	
স্তর চার্লস আলফ্রেড ইলিয়ট K.C.S.I.	১৮৯০ খ্রী. (১৭ই ডিসেম্বর)	
স্তর অ্যান্টনি প্যাট্রিক ম্যাকডনেল K.C.S.I.	১৮৯৩ খ্রী. (৩০ এ মে)	প্রতিনিধি
স্তর আলেকজান্দার মেকেঞ্জি K.C.S.I.	১৮৯৫ খ্রী. ১৮ই ডিসেম্বর হইতে ১৮৯৮ খ্রী. অব্দের ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত)	
স্তর চার্লস সিসিল ষ্টিভেন্স K.C.S.I.	(১৮৯৭ খ্রী. অব্দের ২২ এ জুন হইতে ১৮৯৭ খ্রী. অব্দের ডিসেম্বর '	প্রতিনিধি
স্তর জন উড্‌বরণ	১৮৯৮ খ্রী.	
স্তর জন বোর্ডিলন্	১৯০৩ খ্রী.	
স্তর এণ্ড্রু ফ্রেজার	১৯০৪ খ্রী.	
স্তর উইলিয়াম ডিউক	১৯০৪ খ্রী.	

অসীম গৌরবান্বিত আসমুদ্র ভারতের-অধীশ্বর মহাপ্রতাপান্বিত ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের আদেশে ও আমাদের সর্বজনপ্রিয় প্রজাহিতৈষী, বড় লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জের অভিপ্রায়ানুসারে সমগ্র ভারতের রাজধানী এক্ষণে ১ কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশ একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হওয়ায়, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মত একজন গবর্ণরের হস্তে বঙ্গের শাসনভার ন্যস্ত হইয়াছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে বঙ্গের প্রথম গবর্ণররূপে আমরা লর্ড কারমাইকেলের মত একজন উদারহৃদয়, প্রজাহিতৈষী দয়ালু গবর্ণর পাইয়াছি। বঙ্গেশ্বর কারমাইকেলের বিশেষ পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজনই নাই। তিনি নিজের গুণগরিমায় প্রজাবর্গের নিকট বিশেষরূপে সম্মানিত। বঙ্গের শিক্ষিত অন্তঃপুরিকাগণও তাঁহার গৌরবান্বিত নামের সহিত পরিচিত। তাঁহার শাসনাধীন স্থানসমূহে প্রজাকুল তাঁহার নামোচ্চারণেও ধন্য হয়।

আমাদের বর্তমান সর্বজনপ্রিয় বড়লাট-বাহাদুরের দিল্লীতে অবস্থান হেতু, যদিও বঙ্গবাসীর সহিত তাঁহার একটু দূরসম্পর্ক হইয়াছে, তাহা হইলেও আদর্শ প্রজারঞ্জিনী বৃত্তিদ্বারা তিনি সমগ্র বঙ্গবাসিগণের মনে সর্বদাই স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার সহানুভূতির ফলেই বঙ্গদেশ একটি স্বতন্ত্র প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হইয়াছে ও সুদূর দিল্লীতে থাকিয়াও তিনি বঙ্গবাসীর রাজভক্তিতে প্রীত ও তাহাদের মঙ্গলসাধনে সর্বদাই ব্রতী এবং বঙ্গবাসিকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

কলিকাতার লাট-প্রাসাদ যাহাতে গবর্ণর-জেনারেলগণ বাস করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের রাজপ্রাসাদ হইয়াছে। লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরগণের বাসস্থান বেলভেডিয়ার এখন গবর্ণমেণ্টের খাসে থাকিলেও, সেখানে কোন রাজকর্মচারী বাস করেন না। কলিকাতা ও ঢাকা এই দুইটি নগরী বঙ্গদেশের প্রধান শাসনকেন্দ্র নির্বাচিত হওয়ায়, বঙ্গেশ্বরকে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে ঢাকাতেও থাকিতে হয়।

জেনারেল পোস্ট অফিস

কোম্পানির প্রথম আমলে যখন ডাকের প্রচলন হয় নাই, তখন কলিকাতায় কোন পোস্টাফিসই ছিল

১. ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে ১৯১২ খ্রী.-তে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

না। কোন সময়ে প্রথম পোস্টাফিস স্থাপিত হয়, ডাকের কার্য আরম্ভ হয়, সেকালে চিঠি-পত্র ও পার্শেল প্রভৃতির মাশুল কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। আজকাল যে পথটি Old Post Office Street বলিয়া কথিত, সেইস্থানে পুরাকালে একটি ডাকঘর ছিল। ইহাই কলিকাতার প্রথম ডাকঘর। বর্তমান বড় ডাকঘর ১৮৬৮ খৃীঃ অব্দে নির্মিত হয়। যেস্থানে এই ডাকঘর নির্মিত হইয়াছে সেইস্থানে পূর্বে প্রাচীন কলিকাতা দুর্গের একাংশ বর্তমান ছিল। প্রাচীন দুর্গ অর্থাৎ যে দুর্গ নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন, তাহার বিশেষ কোন চিহ্ন না থাকিলেও বর্তমান বড় ডাকঘরের একাংশে এখনও একটু বর্তমান আছে। লর্ড কার্জন পুরাতন-দুর্গের কয়েকটি গৃহ অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন। তাহার উপরে কয়েকটি প্রস্তর-ফলকও সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন। পুরাতন-দুর্গের এই কয়েকটি কক্ষে এখন গবর্ণমেণ্টের মেল-ভ্যান থাকে ও পোস্টাফিসের বাবুদের টিফিনের বা জলখাবারের ঘর হইয়াছে। বর্তমান প্রাসাদতুল্য জেনারেল পোস্টাফিস-বাটিটি, 'ওয়াল্টার গ্রাণ্‌ভিল্' নামক একজন সেকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান অনুসারে প্রস্তুত।

গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিস

একদিকে জেনারেল পোস্টাফিস ও অপর দুইদিকে যথাক্রমে রাইটার্স বিল্ডিংস ও গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ অফিস, এই কয়টি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা দ্বারা সেকালের ইতিহাসবিশ্রুত লালদীঘির গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। কোম্পানির প্রথম আমলে অর্থাৎ নবাবের কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে, বর্তমান টেলিগ্রাফ অফিসের অধিকৃতস্থানে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। কাপ্তেন উইলসের প্ল্যানে এই পুষ্করিণীটি চিহ্নিত দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ সেই সময়ে এই পুষ্করিণী ভরাট করিয়া তদধিকৃত স্থানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির Calico Printer's Yard স্থাপিত হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসির আমলে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপিত হওয়ার পর, গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ-ডিপার্টমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান প্রাসাদতুল্য বাটিটি ১৮৭৩ খৃীঃ অব্দে নির্মিত হয়। এই বাটির দৃশ্য অতি সুন্দর। তিনটি ব্লকে বা অংশে ইহা গঠিত। প্রথম ব্লকে অর্থাৎ যেটি ওল্ড কোর্ট হাউসের দিকে, এই ডিপার্টমেণ্টের নানাবিধ অফিস ছিল। মধ্যের ব্লকে কলিকাতা সিগন্যাল অফিস। সর্বশেষের ব্লকে টেলিগ্রাফ চেক অফিস। বর্তমানে Calcutta Central Telegraph-এর জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ওয়েলেসলী প্লেসের পার্শ্বে এক প্রাসাদতুল্য নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এখন পুরাতন বাটিতে চেক-অফিস ও ডাক-বিভাগের কয়েকটি অফিস আছে। নূতন টেলিগ্রাফ-বিল্ডিংসের নিম্নতলে বুকিং অফিস বা তারে খবর পাঠাইবার স্থান। এইস্থানে মেজর জেনারেল ড্যানিয়েল জর্জ রবিনসন R, E, মহোদয়ের এক প্রস্তরমূর্তি (Bust) প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের প্রথম ডাইরেক্টার জেনারেল। ১৮৬৬ হইতে ১৮৭৮ খৃীঃ অব্দ পর্যন্ত ইনি এই বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। বুকিং-অফিসের প্রবেশপথের দক্ষিণ দিকে একখানি প্রস্তরফলক আছে। এই ট্যাবলেট বা প্রস্তর-ফলক টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট W, B, মেলভিল সাহেবের স্মৃতি-রক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। মণিপুর-যুদ্ধের সময়, এই মেলভিল সাহেব আসাম-ডিভিসনের টেলিগ্রাফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মণিপুরের বিদ্রোহী সৈন্যগণ আসামের চিফ-কমিশনার মিঃ কুয়েইনটন, টেলিগ্রাফ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মেলভিল ও সিগন্যালার ও'ব্রায়েনকে নিহত করে। এখন এই প্রস্তরমূর্তি ও ট্যাবলেট নূতন বাটিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

পেপার-কারেন্সি অফিস

ডালহৌসি-স্কোয়ারের পূর্বদিকে এই পেপার-কারেন্সি অফিস। এই বাড়িটি ইটালিয়ান প্যাটার্ণে নির্মিত। ইহাই গবর্ণমেণ্টের Office of Issue and Exchange of Government Paper Currency। এখানে টাকা, নোট, গিনি হইতে সিকি, দুয়ানি, আধুলি, পাই প্রভৃতির বিনিময় কার্য সম্পন্ন হয়। পেপার-কারেন্সির নিম্নতলে রিসিভিং ও ইস্যুইং অফিস। এই স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম। হলটির মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহার সৌন্দর্য দেখিয়া মনে হয় যেন প্রকৃতই ইহা

কমলার আবাস-ভবন। লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার নোট, সুদৃঢ় লোহার আলমারিতে এখানে সুরক্ষিত। এস্থান দিবারাত্র টাকার মধুর-নিক্কণে প্রতিধ্বনিত। বাড়িটি ত্রিতল। ইহার মধ্যে দ্বিতলাংশে ও ত্রিতলে সরকারি অফিস ও পেপার-কারেন্সির অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনার সাহেবের বাসভবন। নিত্য কার্যের প্রয়োজনীয় বহু লক্ষ টাকা এই সব আলমারিতে থাকে। বাকি টাকা কলিকাতা ফোর্ট-উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে সুরক্ষিত। ইহাই গবর্ণমেণ্টের Reserve Treasury । এই বাড়িটি সিপাহী পাহারার দ্বারা সুরক্ষিত। প্রথমে আগরা ও মাস্টারম্যান ব্যাঙ্ক কোম্পানি (The Agra and Masterman's Bank Co.) এই বাটিটি তাঁহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করান। কিন্তু উক্ত কোম্পানি ফেল হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট পেপার-কারেন্সি অফিসের জন্য বাটিটি কিনিয়া লয়েন।

হিজ্ ম্যাজেস্টিস মিণ্ট[১]

মিণ্ট বা টাঁকশাল স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর। এই স্থানে ভারত-সম্রাটের ভারত-সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত টাকা তৈয়ারি হয়। বহু বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া টাঁকশাল-সংলগ্ন বাটিগুলি নির্মিত। ইহার সীমানার মধ্যে কয়েকটি পুষ্করিণী আছে। ভিতরে টাকা তৈয়ারি করিবার জন্য যে সমস্ত এঞ্জিন আছে, তাহাতে জল সরবরাহ করিবার জন্য এই সুবৃহৎ পুষ্করিণীগুলি খনিত হইয়াছে। ধরিতে গেলে টাঁকশালের দুইটি প্রধান বিভাগ আছে। একটিতে Copper বা তাম্র-মুদ্রা প্রস্তুত হয়, অপরটি Silver বা টাকা, সিকি, আধুলি, দুয়ানি প্রস্তুতের জন্য নির্দিষ্ট।[২] স্ট্র্যাণ্ড রোডের দুই পার্শ্বেই মিণ্টের কার্যালয়। দক্ষিণপার্শ্বে রাজপ্রাসাদের ন্যায় সুন্দর বাটি। বামপার্শ্বে ইঞ্জিনিয়ারের আবাস স্থান, রক্ষকদিগের কোয়ার্টার ও পুলিশ-সাহেবের বাসস্থান। মেজর ডবলু, এন, ফর্বস, আর, ই, এই টাঁকশাল বাটিটি নির্মাণ করেন। এই সুন্দর বাটিটির সম্মুখে অসংখ্য স্তম্ভশ্রেণী। বাহিরের দৃশ্য এথেন্স নগরীর মিনার্ভা-দেবীর (Temple of Minerva) মন্দির-দৃশ্যের অনুকরণে নির্মিত। জনরব—এই বাটির ভিত্তি অতি গভীর। উপরে যতটা দেখা যায় নীচেও নাকি ততটা ভিত্তি আছে। মিণ্ট সীমানার সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পার্শ্বে সিভিল ও মিলিটারী গার্ডগণের আবাসস্থান। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে কপার-মিণ্ট খোলা হয়। এই বাটির সীমানার মধ্যে Mint-Master, Accountant's Office, Record Room, Assay Office ও Laboratory আছে। এতদ্ভিন্ন ইহার মধ্যে কয়েকটি কারখানাও আছে। মিণ্ট-মাস্টারের অনুমতিপত্র লইতে পারিলে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাওয়া যায়। বেলা ১১টা হইতে ১টা পর্যন্ত রূপা গলান হয়; এই সময়েই টাঁকশাল দেখা উচিত।

এই টাঁকশালের একটি অতীত ইতিবৃত্ত আছে। পাঠকের তাহা শুনিয়া রাখা উচিত। পুরাকালে কাউন্সিলের এক মন্তব্যে প্রকাশ—

"১৭০৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে কোম্পানির কলিকাতা কাউন্সিলের এক মন্তব্য হইতে দেখা যায়, বাঙ্গলার নবাব জাফর খাঁ (মুরশিদকুলি খাঁ) কোম্পানির মান্দ্রাজী-টাকা মোগলের খাজনা হিসাবে লইতে আপত্তি করিতেছেন। মান্দ্রাজী-টাকার জন্য কোম্পানিকে অনেক বাটা দিতে হয়, এজন্য তাঁহাদের আর্থিক ক্ষতি হইয়া থাকে। আমরা নবাবের নিকট হইতে মুরশিদাবাদের টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত করাইবার সম্মতি পাইয়াছি। যদিও বাদশাহ তাঁহার ফারমানে (১৭১৭ খৃঃ অব্দে) বিনাব্যয়ে নবাবী টাঁকশাল হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করাইবার আদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু এই নবাব জাফর-খাঁর প্রতিযোগিতায় তাহা হয় নাই। আমাদের কাশিমবাজারের কর্মচারীরা এ সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইয়াছেন।" ইহার পর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ক্লাইভের সন্ধি-পত্রের পঞ্চমধারা অনুসারে, কোম্পানি মুরশিদাবাদ টাঁকশালেই টাকা প্রস্তুত করাইবার সম্মতি

১. হিজ ম্যাজেষ্টিস্ মিণ্ট—বলা বাহুল্য স্বাধীন ভারতে সরকারের মিণ্ট। বর্তমানে এটি আলিপুরে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত।

২. বর্তমানে ভারতীয় মুদ্রার দশমিক রীতি প্রচলিত এজন্য দুয়ানি অপ্রচলিত, সিকি অর্থাৎ বর্তমান পঁচিশ পয়সা, আধুলি অর্থাৎ বর্তমান পঞ্চাশ পয়সা। বর্তমানে সাধারণভাবে তামা ও রূপা মুদ্রা নির্মাণে ব্যবহৃত হয় না।

পান। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে মীরজাফরের আমলে ইংরাজেরা কলিকাতায় নিজের টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত করিবার সম্মতি পান। এই সময়ে জগৎশেঠগণ ভয়ানক প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন।

১৭৬২ খৃঃ অব্দে কলিকাতার টাঁকশালে কোম্পানি বাহাদুর প্রথম টাকা তৈয়ারি করেন। এই টাকার একদিকে বাদসাহের মুখ ও অন্যদিকে ফার্সী লেখা ছিল। ১৭৭০ খৃঃ অব্দের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতার এই টাঁকশালে পয়সা তৈয়ারি হয় নাই। তখন এদেশে কড়ির খুব প্রচলন ছিল। পয়সার কাজ কড়িতেই চলিত। জন প্রিন্সেপ বলিয়া একজন ইঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্ট লইয়া কোম্পানি-বাহাদুরের জন্য টাকা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ফলতায় ইহাঁর কারখানা ছিল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে প্রিন্সেপ সাহেব তাঁহার যন্ত্রাদি গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিয়া যান।

১৭৯১ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট নিজে টাঁকশালের কাজ চালাইতে আরম্ভ করেন। এই পুরাতন টাঁকশাল বর্তমান স্ট্যাম্প ও স্টেশনারি অফিসের অধিকৃত স্থানে ছিল। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে বর্তমান টাঁকশালের প্রাসাদতুল্য বাটির ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হয়। এই বাটিটির নির্মাণ কার্য শেষ হইতে ছয় বৎসর লাগে। টাঁকশালের উপযুক্ত যন্ত্রাদি ও বাটি নির্মাণ কার্যে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দ হইতে ইংলণ্ডাধিপের মুখ-সমন্বিত মুদ্রা প্রথম প্রচলিত হয়।

বেঙ্গল ক্লাব

বেঙ্গল ক্লাব চৌরঙ্গীর শোভা-সম্পদ স্বরূপ। এটি উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান ইংরাজদের 'Club House' বা আবাসস্থান। তিন চারিটি সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা লইয়া এই ক্লাব স্থাপিত। বেঙ্গল ক্লাবের পূর্বেকার বাড়িটি ভাঙ্গিয়া এক্ষণে তথায় একটি চতুস্তল প্রাসাদতুল্য বাটি নির্মিত হইয়াছে। এখানে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান রাজকর্মচারী বাস করেন। সভ্য সংখ্যা সাত শতের উপর। তিন প্রকার সভ্য আছেন। প্রথম, যাঁহারা এই বাটিতেই বাস করেন। দ্বিতীয় উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে থাকেন, এবং কলিকাতায় আসিলে এখানে থাকিতে পান। তৃতীয়, যাঁহারা কলিকাতাতেই থাকেন অথচ এখানে বাস করেন না। এই ক্লাবের একজন প্রেসিডেণ্ট, একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ও একটি কার্যনির্বাহ-সভা আছে। তাঁহারাই ভোট দ্বারা সদস্য বা মেম্বর নির্বাচন করিয়া থাকেন। বড়-লাট, প্রধান-সেনাপতি, কাউন্সিলের-মেম্বর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ এই ক্লাবের সদস্য। এই ক্লাবের মধ্যে একটি সুবৃহৎ পাঠাগার স্থাপিত আছে। তথায় ইউরোপের সর্বদেশের সকল ভাষার পত্রিকাগুলি সংগৃহীত হয়। আজকাল যেখানে ক্লাবের প্রাসাদতুল্য বাটি নির্মিত হইয়াছে, পূর্বে তথায় আর একটি দ্বিতল বাটি ছিল। এই বাটিতে স্বনাম-খ্যাত লর্ড মেকলে বহুদিন ধরিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। স্বনাম-খ্যাত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও সেকালের জঙ্গীলাট লর্ড কম্বরমিয়ারও বহুদিন এই বাটিতে বাস করিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল ক্লাব সর্বপ্রথমে ওল্ড কোর্ট হাউসে, বর্তমান নিউম্যান কোম্পানির অধিকৃত বাটিতে ছিল। তৎপরে ইলিসিয়াম রোডে উঠিয়া যায়। বর্তমানে ইহা চৌরঙ্গী রোডের উপর প্রতিষ্ঠিত ও নূতনভাবে নির্মিত।

ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব

এই ক্লাব গৃহটি পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের উপর। বেঙ্গল ক্লাবে যেমন সিভিল-সার্ভিসভুক্ত রাজ-কর্মচারীরা বাস করেন, এই ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে সেইরূপ মিলিটারি বা সেনাবিভাগভুক্ত বড় বড় [illegible] থাকেন। 'বেঙ্গল মিলিটারি ক্লাব' এই নামে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ইহা প্রথম সংস্থাপিত হয়। সেনাবিভাগভুক্ত উচ্চ কর্মচারিগণ ব্যতীত সিভিল-বিভাগের জজ, মিলিটারি ও নৌ-সেনা বিভাগের পাদরিগণ ইহার সদস্য হইতে পারেন। এখানেও বেঙ্গল ক্লাবের ন্যায় 'ব্যালট' বা ভোট দ্বারা মেম্বর নির্বাচিত হয়। তবে বড়-লাট, প্রধান-সেনাপতি, চিফ-জস্টিস ও কাউন্সিলের-সদস্য প্রভৃতির নির্বাচন বিনা ভোটেই হইয়া থাকে। এই ক্লাবের সদস্য হইতে হইলে দেড় শত টাকা প্রাবেশিক ফিঃ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন লাইব্রেরি ব্যবহার করা ও বিলিয়ার্ড খেলার জন্য স্বতন্ত্র মাসিক চাঁদার ব্যবস্থা আছে। ইহার সদস্য সংখ্যা ছয় শতের উপর। যাঁহারা স্থায়িভাবে এই ক্লাব

গৃহে বাস করেন তাঁহাদের জন্য সুবিধাকর স্থান নির্দিষ্ট করা আছে।[১]

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম

বঙ্গদেশের সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট এই মিউজিয়ামের নাম সুপরিচিত। নিরক্ষর মূর্খ হইতে শিক্ষিত সুপণ্ডিত পর্যন্ত, সকলেই ইহা বহুবার দেখিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে 'যাদুঘর' বলেন। সাধারণের ইহাতে প্রবেশ সম্বন্ধে কোন বাধাই নাই, তবে এজন্য কয়েকটি বিশেষ দিন নির্বাচিত আছে। ইহা এক কথায় একটি উচ্চশ্রেণীর আনন্দপ্রদ শিক্ষাগার। সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকের প্রত্নতত্ত্বানুশীলনকারীর আনন্দময় পরীক্ষা-ক্ষেত্র। অশোকের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু অতীত যুগের, হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের, স্থপতি-বিদ্যার, শিলালিপির, অনুশাসন ও প্রাচীন মুদ্রাদির পূর্ণ সমাবেশ এই বাড়িতে সংগৃহীত। খনিবিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনার জন্য নানাবিধ উপাদান এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের পরিচয়ের জন্য এক একখানি মুদ্রিত পুস্তক আছে। মূল্য দিয়া সেই Guide Book কিনিতে হয়। ইহা ত গেল পণ্ডিতদিগের পক্ষের ব্যবস্থা। সাধারণ লোকে এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভালুক, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ও পক্ষী প্রভৃতির দেহাবশেষ ও অস্থি কঙ্কালাদি দেখিতে যায়। সমগ্র ভারতের শিল্পকলার নিদর্শন ইহাতে সংগৃহীত।

বর্তমান বাড়িটি ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে সাধারণের জন্য খোলা হয়। এই বাটির প্ল্যান গবর্ণমেণ্টের সেকালের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ওয়াল্‌টার গ্রাণভিল সাহেব প্রস্তুত করেন। চৌরঙ্গীর দিকে ইহার পুরোভাগের পরিসর তিন শত ফিট। সদর স্ট্রীটের দিকে ২৭০ ফিট। বাড়িটি আগে ত্রিতল ছিল এক্ষণে চতুস্তল হইয়াছে। এরূপ সুবৃহৎ উঠানওয়ালা বাটি কলিকাতার সাহেব-পল্লীতে খুব কম আছে। ধরিতে গেলে এই সুবৃহৎ মিউজিয়াম, এসিয়াটিক-সোসাইটির দ্বারাই প্রথম স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতায় একটি সাধারণ মিউজিয়াম স্থাপিত হইবে, এ সম্বন্ধে একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের বলে ইহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হয়। এখানে যে সমস্ত কর্মচারী কার্যে নিযুক্ত তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেই বেতনাদি প্রাপ্ত হন।

কলিকাতার মিউজিয়াম একটি দর্শনীয় জিনিস। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অতীত যুগের ঐতিহাসিক গবেষণার প্রশস্ত ক্ষেত্র। পূর্বকার সরকারি আইন অনুসারে এই বাটির মধ্যেই এসিয়াটিক সোসাইটি গৃহ থাকিবে এরূপ ব্যবস্থাই হয়। কিন্তু মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত অসংখ্য দ্রব্যাদির স্থান সংকুলান না হওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট পুনরায় এক নূতন আইন প্রণয়ন দ্বারা সোসাইটি অন্য বাটিতে স্থানান্তরিত করেন।

একুশ জন ট্রাস্টি দ্বারা এই মিউজিয়ামের কার্যপ্রণালী নির্বাহিত হইয়া থাকে। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পাঁচজন, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পাঁচজন ও এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পাঁচজন ট্রাস্টি নির্বাচিত হন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিগণ ডাইরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান ইহার সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান সদস্য গ্রহণেরও ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুল

মিউজিয়ামের পার্শ্বের বাড়িতেই গবর্ণমেণ্টের আর্টস্কুল ও আর্টগ্যালারি প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে চিত্রবিদ্যার উন্নতি সাধনের জন্য 'স্কুল-অব-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-আর্ট' নামক একটি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ড্রয়িং, কাষ্ঠ, পিত্তল ও তামার উপর এচিং ও এনগ্রেভিং প্রভৃতি শিখাইবার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অবশ্য বিদ্যালয়টি সর্বপ্রথমে ফিরিঙ্গি ও এদেশীয় ছাত্রদের জন্যই খোলা হয়। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বিলাত হইতে লক নামক একজন চিত্রবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত, এই

১. এই প্রাসাদোপম বাড়িটি বর্তমানে সরকারি কাজে ব্যবহৃত হয়।

শিল্প-বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের জন্য অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার পর হইতেই এই আর্টস্কুলের ক্রমোন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে ড্রয়িং, অয়েল ও ওয়াটার-কলার পেইণ্টিং, এচিং, ইঞ্জিনিয়ারিং-ড্রয়িং, মডেলিং, উড-এনগ্রেভিং লিথোগ্রাফি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই আর্টস্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া অনেক বাঙ্গালী-সন্তান স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। লক সাহেবের পর মিঃ জবিন্স ও তৎপরে মিঃ হ্যাভেল এই বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ঠাকুর-গোষ্ঠীর স্বনামপ্রসিদ্ধ কলাশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর এই বিদ্যালয়ের একজন উচ্চশ্রেণীর অধ্যাপক। এই স্কুলগৃহ-সংলগ্ন গবর্ণমেণ্টের একটি আর্ট-গ্যালারি বা চিত্র-শিল্প-প্রদর্শনী স্থাপিত আছে। এই শিল্প-প্রদর্শনীতে অতীত যুগের ভার-তীয় শিল্প এমন কি পুরাতনকালের মোগলবাদসাহগণের আমলের শিল্পবিদ্যার অনেক দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই প্রদর্শনী দেখিয়া নেত্রের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিস

কলিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটির মত অর্থবান ও প্রসিদ্ধ মিউনিসিপ্যালিটি খুব কমই এদেশে আছে। বর্তমান প্রাসাদতুল্য কলিকাতা মহানগরীর যাহা কিছু উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, তাহা এই মিউনিসিপ্যালিটির সুব্যবস্থার জন্য। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটির প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ বাটীটি কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্লক বা বিভাগে নির্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির সর্ব-বিভাগীয় অফিসসমূহ স্থাপিত। এই প্রাসাদের উপর একটি 'টাওয়ার' বা গম্বুজ আছে। বাটির উচ্চতা ১০৫ ফিট। বিভাগীয় কার্যালয় ব্যতীত এই সুবৃহৎ বাটির মধ্যে সেক্রেটারির আবাসস্থান, কাউন্সিল-চেম্বার, কমিটিরুম, প্রভৃতির স্থান সমাবেশও আছে। কাউন্সিল-চেম্বারটি দেখিতে অতি সুন্দর ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির গৌরবেরই উপযুক্ত। মিউনিসিপ্যাল অফিসের সম্মুখে হগ-সাহেবের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ বাজার। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও পুলিশ-কমিশনার স্যর স্টুয়ার্ট হগসাহেবের নামে এই সুপ্রশস্ত বাজারটি স্থাপিত হয়। বোম্বাইয়ের ক্রফোর্ড-মার্কেট বিখ্যাত হইলেও কোন অংশেই ইহার সমতুল্য নহে। বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সিভিলিয়ানগণ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান বা সভাপতির পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।[১] পুরাকালের এই সকল চেয়ারম্যানগণের মধ্যে স্যর হেনরি হ্যারিসনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। স্যর হেনরি একাদিক্রমে ১৮৮১ হইতে ১৮৯০ খৃীঃ অব্দ পর্যন্ত এই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে সুপ্রশস্ত হ্যারিসন রোড তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার আমলে কলিকাতার অধিবাসিগণের জন্য, প্রচুর পরিমাণ কলের জল জোগাইবার ব্যবস্থা করা হয়। আগে ভবানীপুর, কালীঘাট, খিদিরপুর, টালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। ইহা সাউথ-সুবার্বান মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া উল্লিখিত হইত। স্যর হেনরি এই মিউনিসিপ্যালি-টিকে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সহিত মিলিত করিয়া দেন। অতীতকালের মিউনিসিপ্যালি-টির কথা বলিতে গেলে স্যর হেনরি হ্যারিসন, আর. মিট, গ্রীয়ার, স্যর চার্লস অ্যালেন, অনারে-বল বাবু কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর প্রভৃতি স্বনামখ্যাত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কৃষ্ণদাস বাবুর পুত্র অনারেবল রাধাচরণ পাল এখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির একজন গণনীয় সদস্য।[২] কাশ্মীরের ভূতপূর্ব রাজমন্ত্রী বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরিয়া এই মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানের কাজ করিয়া আসিয়াছেন। বর্তমানে তিনি পেন্সন লইয়া অবসরসুখ সম্ভোগ করিতেছেন।[৩] কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রধানকীর্তি এই সৌন্দর্য-

---

১. স্বাধীনভারতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার পৌর আইন পরিবর্তন করিয়াছেন, কলিকাতা পৌর প্রশাসনও পরিবর্তিত হইয়াছে।

২. পৃ. ৫০৬ ও ৫০৭ পাদটীকা দ্র.

৩. নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৪২, মৃত্যু ১৯২০ খ্রী.

শালিনী বৈজয়ন্তীতুল্য অট্টালিকাপূর্ণ উজ্জ্বল আলোকমালামণ্ডিত এই কলিকাতা মহানগরী।

স্যর স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট বা মিউনিসিপ্যাল বাজার

কলিকাতাবাসী ইংরাজ-সম্প্রদায়ের ও দেশীয়দের ব্যবহারের জন্য, সর্ববিধ দ্রব্যজাতপূর্ণ একটি আদর্শ বাজারের বড়ই অভাব ছিল। এজন্য ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে একটি কমিটি সংগঠিত হয়। এই কমিটি পুরাতন 'ফেনউইক' বাজারটি ক্রয় করিয়া তাহার অধিকৃত স্থানে একটি নূতন বাজার নির্মাণ করিবার সংকল্প করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে এই নব সংকল্পিত বাজারের নির্মাণকার্য শেষ হয়। জমির মূল্য ও এই বাজারের গৃহাদি নির্মাণের জন্য ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই বাজারের নানাবিধ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আয় উন্নতি সম্পাদিত হইয়াছে। নূতন জমি ক্রয় করিয়া আরও কয়েকটি সু-প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বিপণী-গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এই বাজারে একটি ক্লক-টাওয়ার বা ঘণ্টাঘর আছে। ধরিতে গেলে, এই বাজারটি কলিকাতা সহরের আদর্শ বাজার। সভ্য সমাজের প্রয়োজনীয় ও ব্যব-হার্য সমস্ত দ্রব্যাদি এখানে পাওয়া যায়। ধর্মতলা স্ট্রীটের মোড়ে ধর্মতলার বাজার বলিয়া আর একটি বাজার ছিল। ইহার অধিকারী ছিলেন বাবু হীরালাল শীল। প্রথম প্রথম এই বাজারের জন্য মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের উন্নতির পথে বড়ই বাধা পড়ে। এজন্য জস্টিস অব দি পীসগণ সাতলক্ষ টাকা ব্যয়ে ধর্মতলার এই পুরাতন বাজারটি ক্রয় করিয়া লয়েন। বর্তমানে এই মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের অবস্থা অতি উন্নত। সন্ধ্যার পর ইহার আলোকোজ্জ্বল মূর্তি বড়ই নয়ন-তৃপ্তিকর। খাস-বাজার ছাড়া ইহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে, প্রভাতে ও সন্ধ্যার সময় শাক-সব্জীর বাজার বসিয়া থাকে। সর্বশ্রেণীর লোকই এই বাজার হইতে জিনিসপত্রাদি ক্রয় করেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ-কার রুডইয়ার্ড কিপলিং তাঁহার The City of the dreadful Nights নামক পুস্তকে ইহার একটি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন।

সেনেট হাউস ও ইউনিভার্সিটি

শিক্ষিত-সমাজকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির স্থান নির্দেশ করিয়া দেখান নিষ্প্রয়োজন। কলেজ-স্ট্রীটে গোলদীঘির সম্মুখে এই প্রাসাদতুল্য 'সেনেট হাউস' পবিত্র দেব-মন্দিরের ন্যায় বর্তমান।[১] ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে এই বাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। ইহার বাহিরে সুন্দর কারুকার্যময় সুবৃহৎ স্তম্ভরাজি, তন্নিম্নে প্রশস্ত অধিরোহণী শ্রেণী। এই সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিলেই প্রবেশ পথের দালানের উপর স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি প্রস্তরমূর্তি পরিদৃষ্ট হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইউনিভার্সিটির হস্তে অনেক টাকা দিয়া যান, এবং তাহা হইতে Tagore Law Professorship বৃত্তি দেওয়া হয়। ভিতরের হলটির দৈর্ঘ্য ২০০ ফিট, বিস্তার ৬০ ফিট। এই হলের দুইপার্শ্বে দুইটি দালান। এ দালান ২০ ফিট প্রশস্ত। ইহার মধ্যে বহুবিধ পুস্তকপূর্ণ একটি ইউনি-ভার্সিটি-লাইব্রেরি ছিল। বর্তমানে সেনেট হাউসের সীমা সরহদ্দের প্রচুর বিস্তৃতি ঘটায় এবং ইউনিভার্সিটি ল-কলেজ এবং হার্ডিঞ্জ-হোস্টেল ও একটি লাইব্রেরি গৃহ নির্মিত হওয়ায় এই সেনেট হাউসের সীমানা ও পরিসর বহুদূরব্যাপী। মহারাজ দ্বারবঙ্গেশ্বর ইউনিভার্সিটি লাই-ব্রেরির জন্য প্রচুর মুদ্রা দান করিয়াছেন। এই সেনেট হলের মধ্যে অনেকগুলি অর্ধকায় প্রস্তরমূর্তি (Bust) আছে। প্রথম মূর্তিটি উড্রো সাহেবের। মিঃ হেনরি উড্রো প্রথমে লা-মার্টিনিয়ার কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে গবর্ণমেণ্টের চাকুরিতে প্রবেশ করেন। ভবিষ্যতে ইনি স্কুল-ইনস্পেক্টার ও তৎপরে ডাইরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান পদে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় মূর্তি জেমস সাট্‌ক্লিফ এম, এ, সাহেবের। সাট্‌ক্লিফ সাহেব ২১ বৎসরকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ইনি ১২ বৎসর কাল ধরিয়া ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রারের কাজ করেন। তাঁহার জীবনের

১. গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

শেষ দুই বৎসরকাল তিনি শিক্ষাবিভাগের বড়-কর্তার পদে নিযুক্ত হন। তৃতীয় মূর্তিটি স্যার সিসিল বিডন কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের। ইনি বঙ্গদেশের লেফটেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। (১৮৬২-১৮৬৭)। (৪) চার্লস এইচ, টনি, এম, এ,। ইনি একজন সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষরূপে এরূপ মহাপণ্ডিত খুব কম এদেশে আসিয়াছেন। সুবৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ 'কথাসরিৎসাগর' ও ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ইনি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদত্যাগ করিবার পর টনি সাহেব ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রার ও তৎপরে ডাইরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান পদে নিযুক্ত হন। ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের কার্য হইতে অবসর লইয়া ইনি বিলাতে ইণ্ডিয়া-অফিসের লাইব্রেরিয়ানের পদে কয়েক বৎসরকাল কাজ করিয়াছিলেন। (৫) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি, আই, ই, ডি, এল। (জন্ম ১৮২৪, মৃত্যু ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দ)। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। নূতনবিধ প্রত্নতত্ত্বাবিষ্কারের পথ ইনিই ভবিষ্যৎ বঙ্গীয় ঐতিহাসিকের জন্য প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার মিত্রের বয়স যখন ২২ বৎসর, সেই সময়ে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। দশ বৎসরকাল তিনি এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে থাকায় তাঁহার অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করে। এই দশ বৎসরের মধ্যে তিনি সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভাষায় বিশেষরূপে দক্ষতা লাভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ফার্সী, হিন্দি, উড়িয়া, গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মাণ প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁহার পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "The most effectively-learned Hindu of his day both as regard English and Oriental Classics." উড়িষ্যায় প্রাচীন-তথ্য বুদ্ধ-গয়া সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন ঘটনার আবিষ্কার করেন। তাঁহার Edicts of Asoka নামক পুস্তকে ভারত-সম্রাট অশোকের শিলালিপি সমূহের সম্পূর্ণ ইংরাজি ভাষান্তর সাধারণে প্রচার হয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, টেক্সট-বুক কমিটির সভাপতি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান বা জমিদার-সভার অধ্যক্ষপদেও বরিত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত চিত্রগুলি ব্যতীত ইউনিভার্সিটি হলে (ক) রায় মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর বি, এ, বি, সি, ই, এম, আই, সি, ই, (জন্ম ১৮৪১, মৃত্যু ১৯০২ খ্রীঃ)। (খ) ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এম, এ, ডি, এল।[১] (গ) ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতির চিত্রিত মূর্তি স্থাপিত। ভিক্টোরিয়ার এই প্রতিকৃতিটি মহারাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইউনিভার্সিটিকে উপহাররূপে দান করেন। এতদ্ভিন্ন রেভারেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায় বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিকৃতিও এই সেনেট হাউসের মধ্যে আছে। স্বয়ং বড়লাট-বাহাদুরগণ ইহার 'চ্যান্সেলারের' কার্য করিয়া থাকেন। বর্তমান যুগে মহাপণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ, অনারেবল মিস্টার জস্টিস স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, সরস্বতী মহোদয়, ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া, অতীব দক্ষতার সহিত সর্ববিধায়ে এই কলিকাতা ইউনিভার্সিটির উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান যুগের ল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি-লাইব্রেরি প্রভৃতি তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ও উদ্যমের নিকট যথেষ্ট ঋণী। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভবানীপুরের স্বনামখ্যাত ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র ও বঙ্গদেশের অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁহার ন্যায় এরূপ সর্ববিষয়িণী প্রতিভাবান বাঙ্গালী বঙ্গদেশে খুব কম জন্মিয়াছেন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বর্তমানে ভাইস-চ্যান্সেলারের উচ্চপদ হইতে অবসর লওয়ার পর, সুপণ্ডিত মহাপ্রাজ্ঞ অনারেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম, এ, বি, এল মহোদয় এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার সর্বাধিকারীর মত যোগ্য ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ করায়, বঙ্গবাসী মাত্রেই

১. ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের জন্ম ১৮৪৪, মৃত্যু ১৮৯৫ খ্রী.

গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ।[১]

বেথুন কলেজ

অনারেবল জে, ই, ডি, বেথুন মহোদয়ের চেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ দানের জন্য এই বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ম্মময় জীবনের প্রথম অবস্থায় বেথুন সাহেব হোম-অফিসের একজন কাউন্সিলী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি গবর্ণমেণ্টের Law Member বা আইন-বিভাগে সদস্যরূপে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। বাঙ্গলার তৎকালীন ডেপুটি-গবর্ণর অনারেবল স্যর জন লিট্লার সাহেব এই বেথুন-কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত করেন (১৮৫০ খ্রীঃ)। বেথুন কলেজে বঙ্গদেশীয় বালিকারাই শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। এই কলেজ হইতে অনেক মহিলা, বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। এখন এই কলেজের সহিত একটি বোর্ডিং-হাউস সংশ্লিষ্ট। কলিকাতার মধ্যে স্ত্রীজাতির শিক্ষাবিধান জন্য আরও দুই-একটি বিদ্যালয় হিন্দু ব্রাহ্মগণ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বটে কিন্তু কোনটিই এই বেথুন কলেজের সমকক্ষ নহে। বেথুন কলেজের প্রাইজ বিতরণ কার্য প্রতি বৎসর মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয় এবং এতদুপলক্ষে বড়লাট-পত্নী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহিলাগণ পারিতোষিক বিতরণ করিয়া থাকেন।

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল[২]

লোয়ার-সার্কিউলার রোডের উপর এই হাসপাতাল বাটিটি প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে সদর-দেওয়ানি-আদালত যে বাটিতে ছিল তাহাতেই জেনারেল হাসপাতাল অস্থায়ীভাবে কয়েক বৎসরের জন্য স্থাপিত হয়। বর্তমানকালে ইহা অসংখ্য কক্ষপূর্ণ এক চতুস্তল নবনির্মিত বাটিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই হাসপাতাল সাহেবদের ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট বর্তমান হাসপাতালের নিকট জেনারেল হাসপাতাল স্থাপনের জন্য অনেকটা জমি ক্রয় করেন। ইহার পূর্বে ইংরাজদের প্রথম হাসপাতাল বর্তমান সেণ্ট জন গির্জার নিকট ছিল। সেই সময় হইতে ইহার ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়া ইহা বর্তমান অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। সকল শ্রেণীর ইউরোপীয়গণই এই হাসপাতালে থাকিতে পারেন। একটি ডবল-রুমের বা দুইটি কক্ষের জন্য দৈনিক পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন একটি ঘরের জন্য তিন ও দুই টাকা পর্যন্ত দৈনিক ভাড়া নির্দিষ্ট আছে। এই ভাড়াতেই ডাক্তারের খরচ, ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয়নির্বাহ হয়। এই হাসপাতালে ১২৫টি শয্যা রোগীদের বিনাব্যয়ে দেওয়া হয়। সংক্রামক রোগের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্র ওয়ার্ড আছে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

কলেজ স্ট্রীটে এই সুবৃহৎ হাসপাতাল অবস্থিত। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসি এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পুরাকালের ফিভার-হাসপাতালের ফণ্ডের উদ্ধৃত টাকা লটারি-কমিটির সংগৃহীত অর্থ, পাইকপাড়ার স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের প্রদত্ত অর্ধলক্ষ টাকা হইতে এই হাসপাতালের প্রথম কার্য সূচনা হয়। এই সহরের সুপ্রসিদ্ধ বার্ণ কোং হাসপাতাল বাটিটির একটি নক্সা প্রস্তুত করিয়া দেন। বাড়িটির নির্মাণ কার্য শেষ হইতে চারি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ইহা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয়। পুরাতনবাটির সঙ্গে বর্তমানে আরও কয়েকটি নূতন বাটি ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই হাসপাতালে তিন চারিশত রোগীর স্থান সমাবেশ হইতে পারে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাটিসংলগ্ন, ইডেন হাসপাতালটি কেবল মাত্র স্ত্রীলোকদের জন্য ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যর এস্‌লি ইডেনের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এই হাসপাতালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কলিকাতার লাহা-বংশের বিখ্যাত ধনী বাবু

১. স্তর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জন্ম ১৮৬২, মৃত্যু ১৯৩৫ খ্রী.

২. এখনকার শেঠ সুখলাল করনানি (এস.এস.কে. এম) হাসপাতাল।

শ্যামাচরণ লাহা, রায় অমৃতনাথ মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি পরদুঃখকাতর হিন্দু মহাত্মাগণের বদান্যতায় একটি চক্ষুরোগের হাসপাতালও মূল হাসপাতালের সীমানিবদ্ধ হইয়াছে। হীরালাল শীলের বংশধর চুনীলাল শীল মহাশয় Out Door Patient দিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র হাসপাতাল করিয়া দেন। এই হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট এজরা হাসপাতাল, স্বনামখ্যাত ইহুদী-সওদাগর বিবি এজরার ব্যয়ে নির্মিত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নির্মাণকার্যে, অনেক বাঙ্গালী ধনী মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম হাসপাতালের মধ্যে একটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে। এই হাসপাতালসমূহের একমাত্র অধ্যক্ষ বা সর্বময় কর্তা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব।

মেও হাসপাতাল

স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর মেও নেটিভ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাপিত। এই হাসপাতালটি এদেশীয় লোকের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাচীন কলিকাতাতেও এদেশীয় লোকের চিকিৎসার জন্য একটি নেটিভ হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃীস্টাব্দে তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল স্যর জন শোরের (লর্ড টেনমাউথ) যত্নে এই প্রথম নেটিভ হাসপাতালের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে যে বাটিটি ফৌজদারি-বালাখানার মোড়ে অবস্থিত, সেই স্থানেই এই দেশীয় হাসপাতাল প্রথম খোলা হয়। অতীতকালে গবর্ণর শোর সাহেবের ও সেণ্ট জন গির্জার তৎকালীন জনৈক পাদরী রেভারেণ্ড জন ওয়েনের চেষ্টায় এই দেশীয় হাসপাতালটি সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। অতি গরীব দুঃখী ও সহায়হীন লোকই তখন এখানে চিকিৎসিত হইত। পরে এই হাসপাতালটি ধর্মতলা স্ট্রীটের একটি বাটিতে উঠিয়া আসে (১৭৯৬ খৃীঃ)। তখন ধর্মতলা স্ট্রীটের উপর মোটে তিন-চারিখানি দ্বিতল বাটি ছিল। স্যর জন শোর গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই দেশীয় সাধারণ চিকিৎসালয়ের সাহায্য জন্য, মাসিক পাঁচশত টাকা অর্থসাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সাধারণের নিকট সংগৃহীত চাঁদা দ্বারাও প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা উঠে। পরবর্তীকালে এই দেশীয় হাসপাতালের খরচপত্র বৃদ্ধি হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয় নির্বাহার্থে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দেন। ১৮৭১ খৃীস্টাব্দে এই মেও হাসপাতাল কোন বায়ুপূর্ণ স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব উঠে। তজ্জন্য গঙ্গার ধারে বর্তমান বাটিটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক এই বাটির ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। বাড়ির প্ল্যান তৈয়ারি করেন সুপ্রসিদ্ধ মেকিণ্টস বার্ণ কোং। তিনলক্ষ টাকা এই মেও নেটিভ হাসপাতাল বাটি নির্মাণে ব্যয় হয়। ১৮৭৪ খৃীঃ ইহতে ইহা সাধারণের ব্যবহারে আসে। এখানে প্রায় দেড় শতাধিক রোগীর শয্যানির্দিষ্ট আছে। পরলোকগত বড়-লাট লর্ড মেয়োর নামে ইহা প্রতিষ্ঠিত।

জুওলজিক্যাল গার্ডেন

জুওলজিক্যাল গার্ডেন বা আলিপুরের চিড়িয়াখানা না দেখিয়াছেন এমন বাঙ্গালী নাই বলিলেই হয়। এমন কি বঙ্গের কুলমহিলারা পর্যন্ত কালীঘাট তীর্থাদি দর্শনার্থে গমন করিলে, আলিপুরের চিড়িয়াখানা না দেখিয়া বাড়ি ফেরেন না। বর্তমানে যে স্থানে এই রাজকীয় পশুশালাটি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা পুরাকালে একটি বস্তি ছিল। ইহাকে 'জিরাট-বস্তী' বলিত। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণই এখানকার প্রধান অধিবাসী ছিল। বহুদিন হইতেই এই কলিকাতা সহরে একটি সরকারি-পশুশালা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছিল। এ চেষ্টায় প্রধান উদ্যোগী ডাক্তার ফেয়ার ও ডাক্তার স্কোয়েণ্ডলার (Dr. Schwendler) ১৮৭৫ খৃীস্টাব্দে এই বিষয়টি বঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণর স্যর রিচার্ড টেম্পলের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। এজন্য উক্ত বৎসরে গবর্ণমেণ্ট এই বাগান নির্মাণের জন্য জমিগ্রহণের আদেশ করেন। বস্তির লোকদিগকে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়া সেই স্থানে এই বাগান নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ১৮৭৬ খৃীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি এই বাগানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময়ে আমাদের স্বর্গগত ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলস রূপে এদেশে আসিয়াছিলেন। এ ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করার উৎসবাদি তাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল। বহুদিনের পরিশ্রমে, চেষ্টায় ও যত্নে বাগানের বর্তমান অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।[১] স্বর্গীয় বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের আমলে এই বাগানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়।[২] অনেক এ দেশীয় বড় বড় রাজা, জমিদার এই বাগান নির্মাণ কার্যে মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী,[৩] মহারাজ যতীন্দ্রমোহন[৪] ও আরও অনেক বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তগণের নাম এই বাগানের সহিত এখনও সংশ্লিষ্ট।

বোটানিক্যাল গার্ডেন

ইহা কলিকাতার উপকণ্ঠে শিবপুরে স্থাপিত। এতাদৃশ সুবৃহৎ রাজকীয় উদ্যান এ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ণেল কিডের পরামর্শানুসারে এই বাগান স্থাপিত করেন। কর্ণেল কিড কোম্পানির অধীনে একজন প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। এই কিডের নাম হইতেই বর্তমান Kidderpur ও তদপভ্রংশ খিদিরপুর নামকরণ হইয়াছে। এই প্রশস্ত উদ্যানের পাদদেশ চুম্বন করিয়া জাহ্নবী প্রবাহিতা হইতেছেন। বাগানের জমির পরিমাণ ২৭২ একর। এই বাগানের অধিকৃত ভূমির মধ্যে সেকালের মোগলের থানা ও মৃৎদুর্গ ছিল। এই থানা শব্দের অপভ্রংশ 'টানা'। টানা দুর্গের অস্তিত্ব জোব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব হইতেই ছিল।

এই বাগান প্রতিষ্ঠার প্রধান উপলক্ষ কর্ণেল কিড ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে, কোম্পানি বাহাদুরের মিলিটারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনিই তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের নিকট এ সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলে, সকাউন্সিল লাট-সাহেব তাঁহার এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া সুপারিশপত্র সমেত, তাহা বিলাতের কোর্ট অব ডাইরেক্টার সভার নিকট পাঠান। ডাইরেক্টারদের সম্মতি আসিলে এই বাগানের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয় ও কিড সাহেব ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করেন। এই বাগানের উন্নতির জন্য কিড সাহেব জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এদেশের নানাস্থানে যত প্রকারের প্রয়োজনীয় বৃক্ষ ও লতাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহার সবই সংগ্রহ করিয়া এই বাগানটিকে সৌন্দর্যময় করেন। তিনি যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহার ড্রয়িং বা নক্শা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিড তাঁহার অন্তিম ইচ্ছাপত্রে এরূপ বাসনা করেন, যেন তাঁহার স্বহস্তে স্থাপিত এই বাগানের মধ্যেই তাঁহার সমাধি হয়। কিন্তু কোম্পানি বাহাদুর তাঁহার ন্যায় একজন উপযুক্ত উদ্ভিদ-বিদ্যাবিৎ মহাপণ্ডিতের দেহ এই নির্জন স্থানে সমাহিত না করিয়া, পার্ক স্ট্রীটের পুরাতন গোরস্থানে তাঁহার সমাধির ব্যবস্থা করিয়া দেন। তবে এই বাগানে কিডের নামে একটি স্মরণ-চিহ্ন স্থাপিত আছে। নেপাল, ভুটান, আসাম প্রভৃতি সুদূরবর্তীস্থানের জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া, তিনি তত্তৎস্থানের দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আসাম প্রদেশ হইতেই তিনি দারুচিনি গাছের ক্ষুদ্র চারা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় আনেন। এই চারাগুলি ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবকে তিনি প্রদান করেন। হেস্টিংসের বিলাত প্রস্থানের পর, নানাপ্রকারের গাছ তাঁহার বাগান হইতে সংগৃহীত হইয়া এই বাগানে রোপিত হয়। জনপ্রবাদ, ওয়ারেন হেস্টিংসের এই বাগানে এলাচি লবঙ্গ প্রভৃতিরও গাছ ছিল।

এই বাগানস্থ সুপ্রসিদ্ধ সুবৃহৎ বৃক্ষটি এখনও কর্ণেল কিডের কীর্তি কাহিনী প্রকাশ করিতেছে। ইহার মধ্যস্থিত পালমিরা বৃক্ষশ্রেণী শোভিত সুন্দর ভ্রমণপথটি বড়ই নেত্রতৃপ্তিকর। ইহার

---

১. বস্তুত লেখক যে সময়ে একথা লিখিয়াছেন তৎপরবর্তীকালে আলিপুর চিড়িয়াখানার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

২. রামব্রহ্ম সান্যাল (১৮৫০-১৯০৮ খ্রী.) একাধিক বিখ্যাত বিজ্ঞান ভিত্তিক পুস্তক লিখিয়াছেন।

৩. মহারাণী স্বর্ণময়ী (১৮২৭-১৮৯৭)। কাশিমবাজারের কুমার কৃষ্ণকান্ত নন্দীর পত্নী। ১৭ বৎসর বয়সে স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর ইনি জমিদারির ভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন। জনহিতকর কার্যে দানশীলতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

৪. মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮ খ্রী.) পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের কৃতী সন্তান।

স্থানে স্থানে বিচিত্র লতাকুঞ্জ ও অর্কিড্‌-হাউস। বঙ্গদেশের ও ভারতের নানাস্থানে উৎপন্ন ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত লতাগুল্মাদি, এইস্থানে জন্মাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহার কতক চেষ্টা সফল হইয়াছে কতক বা হয় নাই। চায়ের প্রথম চাষ এই বাগানেই আরম্ভ হয়। এই চাষের ফল সন্তোষজনক হওয়ায়, ভারতের নানাস্থানে চায়ের চাষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী এখন কাল ধর্মে ঘোর চা-পায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। Cinchona Febrifuge বা কুইনাইনের চাষ প্রথমে এখানেই হয়। কুইনাইন সম্বন্ধে পরীক্ষা সফল হওয়ায় এখন গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং কুইনাইনের চাষ করিতেছেন। এই এই সিনকোণা বা দেশী কুইনাইন এখন এই ম্যালেরিয়া পীড়িত বঙ্গে গরীবদুঃখীর এক মাত্র আশ্রয়স্থল। এই রাজকীয় উদ্যানের পরবর্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার রক্সবরা ও স্যর জর্জ কিংএর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুই মহা পণ্ডিতই আয়ুর্বেদ ব্যবহার্য দ্রব্যাদির ঔষধ ও লতাগুল্ম প্রভৃতির একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া, কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া শ্রীরামপুরের পরলোকগত সিভিলসার্জন ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত Materia Medica of the Hindus নাম দিয়া একখানি পুস্তক রচনা করেন। পরবর্তীকালে ফৌজদারি-বালাখানার প্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় বিনোদলাল সেন মহাশয় ইহার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই রাজকীয় উদ্যানের সৌন্দর্য চক্ষে না দেখিলে বুঝাইবার যো নাই। আশি বৎসর পূর্বে স্বনাম-খ্যাত বিশপ হিবার[১] তৎকালীন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের সহিত এই উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, "It is not only curious but a picturesque and most beautiful scene and more perfectly answers Milton's idea of Paradise, except that it is on a deadflat instead of a hill than anything ever saw"— বর্তমানে এই বাগানে অনেক উন্নতি হইয়াছে ও তাহা দেখিবার জিনিস।

ইডেন গার্ডেন

লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে এই বাগানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার ভগিনীদ্বয় মিসেস ইডেন[২] এই বাগানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত-সম্প্রদায় এবং পদস্থ ইংরাজগণ প্রতিদিনই এই রমণীয় উদ্যানে সান্ধ্য-ভ্রমণে আসেন। জোব চার্নকের কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পর লালদীঘিই ইংরাজদের প্রথম সান্ধ্যভ্রমণ স্থানরূপে নির্বাচিত হয়। তারপর বাগবাজারের পেরিন্স-উদ্যান (Perrins Garden)। মারহাট্টা-ডিচ বুজাইয়া ফেলিয়া সার্কিউলার রোডের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে. লর্ড ওয়েলেসলির ও তৎপরবর্তী আমলে এই প্রশস্ত সার্কিউলার রোডই কলিকাতাবাসিগণের রমণীয় ভ্রমণস্থান রূপে বিবেচিত হইত। তাহারপর লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে জাহ্নবীতীরে এই সুন্দর রম্যোদ্যানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে, এই ইডেন গার্ডেনই সাধারণের ভ্রমণোদ্যানে পরিণত হয়। এতন্মধ্যস্থ কৃত্রিম হ্রদ ও বর্মিজ প্যাগোডা, সুন্দর ভ্রমণক্ষেত্রগুলি দেখিলে অশান্ত প্রাণেও একটা শান্তি আসে। এই বর্মিজ প্যাগোডা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বর্মার যুদ্ধের বিজয়চিহ্নরূপে প্রোম হইতে ইংরাজ বাহাদুর কলিকাতায় লইয়া আসেন। সন্ধ্যার পর এই উদ্যানের বৈদ্যুতিক-আলোক-শোভিত মূর্তি নন্দনের শোভা বিকাশ করে।

কলিকাতা সহরের মধ্যস্থ স্ট্যাচু ও অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নসমূহের পরিচয়

প্রিন্সেপস্‌-ঘাট

'প্রিন্সেপস্‌-ঘাটের' নাম না জানেন এরূপ কলিকাতাবাসী খুব কমই আছেন। স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর এই ঘাটটি প্রতিষ্ঠিত। এই ঘাটে আগে বড়লাট-সাহেবগণ নদীপথে আসিয়া কলিকাতায় নামিতেন। আমাদের সর্বজনপ্রিয় মহাগৌরবান্বিত ভারতেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও তাঁহার স্বর্গীয় জনক সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও কলিকাতায় আসিবার সময় এই ঘাটে নামিয়াছিলেন। প্রিন্সেপস্‌-ঘাটের ন্যায়

---

১. Bishop Heber—কলিকাতার দ্বিতীয় বিশপ (১৮২২-১৮২৬ খ্রী.)

২. Hon'ble Miss Emily Eden এবং Miss Fanny Eden. গ্রন্থের পৃ. ৪৮৪ দ্র.

সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ ঘাট কলিকাতায় আর দ্বিতীয় নাই। আগে এই ঘাটটির পাদমূল বিচুম্বিত করিয়া খরস্রোতা জাহ্নবী প্রবাহিতা হইতেন। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের মধ্যে গঙ্গা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন ও এই ঘাটটির পার্শ্ব দিয়া পোর্ট-কমিশনারেরা বর্তমানকালে এক প্রশস্ত রাস্তা বাহির করিয়া দিয়াছেন।

যাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার জন্য এই ঘাট-প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জেমস প্রিন্সেপ সাহেব ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। ২০ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা টাকশালের Assay Masterএর পদে নিযুক্ত হন। স্বনামখ্যাত সুপণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব[১] তাঁহার পূর্বে এই সরকারি টাকশালে 'এসে মাস্টারের' কাজ করিতেন। উইলসনের অবসর গ্রহণের পর, জেমস প্রিন্সেপ এই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। উইলসন সাহেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ও এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহার Theatre of the Hindus নামধেয় প্রাচীন হিন্দু নাট্য-কলার ইংরাজিতে লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থ, মৌলিক গবেষণাপূর্ণ। প্রিন্সেপ সাহেব উইলসনের সাহচর্য লাভ করিয়া ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বাদি অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন। প্রাচীন শিল্পকলার দিকেই তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল। তাঁহার স্থপতি-বিদ্যানুশীলনের কয়েকটি ফল এখনও বিদ্যমান। কর্মনাশা নদীর উপর তিনি একটি পঞ্চখিলানময় সুবৃহৎ পুল নির্মাণ করিয়া দেন। এই পুল বেনারস ও বিহারকে পৃথক করিয়া দিয়াছে। এখনও এই পুল বর্তমান। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবের মসজিদের ভগ্নপ্রায় মিনারগুলিরও ইনি সংস্কার করেন। সুন্দরবন বিভাগে বাণিজ্য কার্যের সুবিধার জন্য তিনি একটি খাল খনন করিয়া দেন। বর্তমান ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম গৃহ তাঁহারই পরিশ্রমের শ্রেষ্ঠ ফল। এসিয়াটিক সোসাইটির তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। এইজন্য সোসাইটির সদস্যগণও তাঁহার একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় প্রিন্সেপ সাহেব ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে বিলাতে চলিয়া যান। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা[২]

প্রিন্সেপস্-ঘাটের পূর্বদিকে লর্ড নেপিয়ারের স্ট্যাচু বা পিত্তলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। লর্ড নেপিয়ার ১৮৬১ হইতে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লাট কাউন্সিলের মিলিটারি-মেম্বরের কার্য করেন। ১৮৭০ হইতে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ বা প্রধান সেনাপতির কাজ করিয়া-ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি জিব্রালটারের গবর্ণর পদে নিয়োজিত হন। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড এলগিনের পঞ্জাবের ধর্মশালায় সহসা মৃত্যু ঘটিলে, লর্ড নেপিয়ার কয়েক মাসকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলের কাজও করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্মময় জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন তিনি রয়্যাল-ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে দার্জিলিং পাহাড়ে ইংরাজগণের জন্য একটি গ্রীষ্মনিবাস স্থাপনের চেষ্টায় ছিলেন। লর্ড নেপিয়ারের চেষ্টায় দার্জিলিঙের অত্যুচ্চ শৈলমালার বক্ষভেদ করিয়া কয়েকটি পথ নির্মিত হয়। এ পথগুলি এখনও বর্তমান। আবিসিনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি প্রচুর যশসঞ্চয় করেন ও নেপিয়ার অব ম্যাগডালা বলিয়া সাধারণে পরিচিত হন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে ইনি স্বদেশে দেহত্যাগ করেন।

গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট

এই স্মৃতিস্তম্ভটি কলিকাতা দুর্গের সান্নিধ্যে গঙ্গার ধারে অবস্থিত। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে লর্ড অ্যালেন-বরার আমলে ইহা প্রথম নির্মিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের গোয়ালিয়র যুদ্ধে যে সমস্ত ইংরাজ সেনানী নিহত হন তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য লর্ড অ্যালেনবরা ইহা নির্মাণ করিয়া দেন। ইহার

১. H. H. Wilson (১৭৮৬-১৮৬০ খ্রী.)—বিষ্ণুপুরাণ, ঋগ্বেদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদক।

২. Napier—Military Member of the Supreme Council 1861-1865, C-in-C in Bombay 1865-1869, C-in-C in India 1870-1876.—C.E. Buckland, *Dictionary of Indian Biography*, p. 312-313.

নিম্নভাগ জয়পুর-মার্বেলে নির্মিত। উপরিভাগে একটি 'ডোম' বা গোলাকার ছাদ আছে। গোয়ালিয়র যুদ্ধের বিজয়চিহ্নস্বরূপ যে সমস্ত কামান সংগৃহীত হয় তাহা ঢালাই করিয়া এই ছাদ নির্মিত হইয়াছিল। স্যর হিউ গফ্ এই যুদ্ধের সেনানায়ক ছিলেন। পুনিয়ার ও মহারাজপুর যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব ইংরাজ-সৈনিক জীবন-বিসর্জন করেন, তাঁহাদের নামসংযুক্ত একখানি স্মৃতিফলক ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। কেবল ইংরাজ-সৈন্য নহে, অনেক দেশীয় সৈন্যেরও ইহা কীর্তিস্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। 'Peer Baccass নাম যে পীরবক্সের অপভ্রংশ বানান এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

স্যর উইলিয়াম পিল

ইডেন গার্ডেনের সম্মুখেই স্পিড নামক বিখ্যাত ভাস্করের খোদিত পিল সাহেবের এই শ্বেত মর্মরময় মূর্তি এখনও অতীতকালের এক শোচনীয় স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী মহাবিদ্রোহের সময় স্যর উইলিয়াম পিল ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার 'শ্যানন' নামক রণপোতের সেনানায়ক ছিলেন। স্যর কলিন ক্যাম্বেল যে সময়ে লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিতে যান, পিল সেই সময়ে তাঁহার নৌসেনা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সহায়তার জন্য সহগামী হইয়াছিলেন। মার্টিনিয়ার কলেজে গোলা বর্ষণের সময় পিল যুদ্ধের সম্মুখভাগেই ছিলেন। এজন্য তিনি বিপক্ষের গুলিতে দক্ষিণপদে আঘাত প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যার নবাবের একখানি সুন্দর চেরিয়ট গাড়ি বন্দোবস্ত করা হয়, কিন্তু আজন্ম-সৈনিক পিল বলেন 'আমি এই বহুমূল্য নবাবী-গাড়িতে যাওয়া অপেক্ষা সামান্য ডুলিতে একজন সামান্য সেলারের মত যাইতে পারিলে বড়ই সুখী হইব।' পিলের এইরূপ নির্বন্ধাতিশয় দেখিয়া অগত্যা ডুলির বন্দোবস্ত করাই হয়। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে এই ডুলিতে ইতিপূর্বে একজন বসন্তরোগীকে বহন করা হইয়াছিল। এই ডুলি সংক্রামক-রোগের বীজ-দূষিত হওয়ায়, কানপুরে পৌঁছিবার পর পিল এই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হন ও তাহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তাঁহার ন্যায় দুঃসাহসী, সমরে অজেয়, নৌ-সেনাপতি সেকালে এদেশে খুব কম আসিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়াম পিলের স্ট্যাচু আগে ইডেন উদ্যানের মধ্যে ছিল। এক্ষণে এই বাগানের সম্মুখে কেল্লার ময়দানের এক বিশিষ্ট স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।[১]

লর্ড অকল্যাণ্ড

লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ হইতে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের গবর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই লর্ড অক্ল্যাণ্ড ও তাঁহার ভগ্নীদ্বয় (মিসেস ইডেন) অবিবাহিত ছিলেন। তাঁহার সহোদরাদ্বয়ের প্রধান কীর্তি কলিকাতার নন্দনকানন বর্তমান ইডেন গার্ডেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড কাবুলের আমির সাহসুজার পক্ষ সমর্থন করায়, কাবুল-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি তাঁহার কাউন্সিলের সহযোগীরূপে স্বনামপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলের সহায়তা লাভ করেন। তাঁহার আমলেই মার্শম্যান সাহেব 'Friend of India' নামক সমাচারপত্র প্রচার করেন। অক্ল্যাণ্ডের এই পিত্তল-প্রতিমূর্তি এখন ইডেন গার্ডেনের বহির্দেশে অবস্থিত। আগে ইহা উক্ত বাগানের মধ্যেই ছিল।[১]

লর্ড নর্থব্রুক

হাইকোর্টের যে পথ দিয়া জজেরা আদালত-গৃহে প্রবেশ করেন, সেই পথের অপর পার্শ্বে ভারতের ভূতপূর্ব ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুকের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।[১] ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি গবর্ণর-জেনারেল ও বড়লাট-সাহেবের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাঁর শাসন সময়ে আমাদের ভূতপূর্ব গৌরবান্বিত ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলস্ রূপে এদেশে আসেন। ইহাঁর আমলে ১৮৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। লর্ড নর্থব্রুকের একান্ত চেষ্টায় এই মহাদুর্ভিক্ষের শান্তি হইয়াছিল। এই প্রজাবৎসল শাসনকর্তা সেই সময় নিজে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানগুলি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন। দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও তিনি সিমলা-প্রবাসে যাওয়া বন্ধ করিয়া, প্রজাগণের দুঃখ মোচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১. পিল, অকল্যাণ্ড, নর্থব্রুক—এঁদের মূর্তিগুলি বর্তমানে ব্যারাকপুর লাটবাগানে অবস্থিত।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক

টাউনহলের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র ময়দানে লর্ড বেণ্টিঙ্কের পিত্তল-প্রতিমা সংস্থাপিত।[1] ইনি ১৮২৮ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লাট-সাহেবের কার্য করিয়াছিলেন। এই পিত্তল নির্মিত স্ট্যাচুর গায়ে সতীদাহের একটি চিত্র খোদিত আছে। কারণ, ইহাঁর আমলেই এই ভীষণ সতীদাহ-প্রথা নিবারিত হয়। ১৮০৩ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি মান্দ্রাজের গবর্ণরি করেন। ইহাঁর আমলে সতীদাহ ও ঠগী-নিবারণ, এদেশবাসিগণকে উচ্চশিক্ষা দানের জন্য লর্ড মেকলে প্রণোদিত Education Bill পাশ, মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা, ভারতে স্টীমারের প্রথম প্রচলন ও বর্তমান পেনাল-কোড্ বা ফৌজদারি-দণ্ডবিধি-আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়।

ধরিতে গেলে, এই লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল। কারণ ইহাঁর পূর্ববর্তী শাসনকর্তাগণের পদবী ছিল 'Governor General of the Presidency of Fort William in Bengal.' বিলাতে প্রত্যাগমনের পর ইনি পার্লামেণ্টের সদস্যপদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের প্যারী-নগরীতে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংস

টাউন হলের বারান্দায় বঙ্গদেশের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের সুবৃহৎ শ্বেতমর্মর নির্মিত প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। ইংরাজাধিকারের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল হেস্টিংস এদেশের লোকের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এখনও সুদূর পশ্চিম-প্রদেশে তাঁহার নামে রচিত—

"হাতীপর্ হাওদা, ঘোড়েপর্ জীন্,
জল্‌দি যাও, জল্‌দি যাও, ওয়ারেন হস্টিন্।"

এই কবিতাটি অনেকের মুখে শুনা যায়। বোধ হয় বেনারসের চেত্ সিংহের ব্যাপারের সময় এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি এই মূর্তিটি শ্বেতমর্মর প্রস্তরে নির্মিত। এই মূর্তির এক পার্শ্বে এক ব্রাহ্মণের মূর্তি এবং অপর পার্শ্বে এক মুসলমান মৌলবীর প্রতিকৃতি খোদিত আছে। স্যার রিচার্ড ওয়েস্টমেকট বলিয়া একজন বিখ্যাত শিল্পী এই প্রস্তরমূর্তি প্রস্তুত করেন। এগার বৎসরকাল এদেশে শাসন-কর্তৃত্ব করিয়া, ওয়ারেন হেস্টিংস সমগ্র ভারতে ইংরাজের শাসনশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বিলাতের ডেইলসফোর্ড নামক স্থানে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের মৃত্যু হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের মৃত্যুর পর বিলাতে তাঁহার আরও দুইটি প্রস্তর-মূর্তি গঠিত হইয়াছিল। ইহার একটি বর্তমানে ইণ্ডিয়া অফিসে ও অপরটি বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ওয়েস্টমিনিস্টার-অ্যাবিতে রক্ষিত। বর্তমান জজ-আদালতের পার্শ্বে 'হেস্টিংস-হাউস' ও কলিকাতায় তাঁহার আবাস-বাটি এবং হেস্টিংস স্ট্রীট[2] আজও এদেশে হেস্টিংসের নাম সাধারণের মনে জাগরূক রাখিয়াছে। বর্তমানে ইহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বরে আছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিস

দশশালা-বন্দোবস্তের বিধাতা লর্ড কর্ণওয়ালিসের এক সুবৃহৎ প্রস্তরমূর্তি টাউনহলের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। ইহাঁরই আমলে মহীশূর-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া টিপু সুলতানের পতন হয়। এবং পুনরায় ইহাঁরই চেষ্টায় মহীশূরের গদীতে হিন্দু রাজা প্রতিষ্ঠিত হয়েন। এই রাজবংশ এখনও মহীশূরে রাজত্ব করিতেছেন। ১৭৮৭ হইতে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয়বার গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। এদেশে আসিবার আড়াই মাস পরে, গাজিপুরে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন ও তথায় তাঁহার দেহান্ত হয়। বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও কলিকাতা এই তিনটি প্রধান সহরেই তাঁহার প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত আছে। বর্তমানে ইহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বরে আছে।

১. বেণ্টিঙ্কের মূর্তিটি ব্রোঞ্জ নির্মিত। বর্তমানে ইহা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে আছে।
২. বর্তমানে কিরণশঙ্কর রায় রোড।

লর্ড ক্যানিং

গবর্ণমেণ্ট-হাউসের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, এক তৃণাবৃত ক্ষেত্রে লর্ড ক্যানিংএর পিত্তল প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহাঁর শাসনকালে সুপ্রসিদ্ধ সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর, ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন-কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে ধরিতে গেলে কোম্পানির রাজত্বের অবসান হয়। লর্ড ক্যানিং সমগ্র ভারতবর্ষের প্রথম রাজ-প্রতিনিধি বা ভাইসরয়এর পদ লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বারাকপুরে লেডী ক্যানিংএর মৃত্যু হয়। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্যানিং বিলাতে চলিয়া যান ও ইংলণ্ডে পোঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ব্যারাকপুর লাটবাগানে বর্তমানে অবস্থিত।

লর্ড লরেন্স

লর্ড লরেন্সের এই স্ট্যাচুটি গবর্ণমেণ্ট-হাউসের দক্ষিণ দিকের ফটকের ঠিক সম্মুখে অবস্থিত।১ জন লরেন্স কোম্পানির আমলের একজন প্রতিভাবান সিভিলিয়ান ছিলেন। তাঁহার সুবন্দোবস্তের গুণেই নববিজিত পঞ্জাবে সেই ভয়ানক সিপাহী-বিদ্রোহ সময়েও কোনরূপ অশান্তি উপস্থিত হয় নাই। তাহার পূর্বে বা পরে, সিভিল-সার্ভিস হইতে নির্বাচিত হইয়া কেহই ভারতের সর্বময় কর্তৃত্বলাভ করেন নাই। তাঁহার আমলে প্রথম সিমলা-শৈলে-প্রবাস আরম্ভ হয়। ভুটান-যুদ্ধ ও উৎকলের মহাদুর্ভিক্ষ ইহাঁর শাসনকালের অন্য দুইটি প্রধান ঘটনা। ১৮৬৪ হইতে ৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বড়লাটের কার্য করেন। লর্ড লরেন্স বড়ই প্রজাপ্রিয় শাসনকর্তা ছিলেন। পদোচিত জাঁকজমক তিনি খুব কমই পছন্দ করিতেন। অনেক সময়ে পদব্রজে গড়ের মাঠে ও ইডেন গার্ডেনের নিকটে পদচারণা করিতেন। এ সম্বন্ধে একটি রহস্যকর গল্প আমরা শুনিয়াছি। একবার এই বড়লাট সাহেব লরেন্স সামান্য বেশে সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হন। তখন নিয়ম ছিল রাত্রি নয়টার পরে কেহ 'গবর্ণমেণ্ট-হাউসে' প্রবেশ করিতে পারিত না। যে সিপাহী পাহারা দিতে ছিল সেও লাট-সাহেবকে ইতিপূর্বে চক্ষে দেখে নাই। কাজেই সে তাঁহাকে সামান্য ইংরাজ-কর্মচারি ভাবিয়া প্রাসাদ-প্রবেশে বাধা উপস্থিত করে। শেষ তাঁহার সেক্রেটারীদের মধ্যে দুই-একজন এই ঘটনাক্ষেত্রে সহসা উপস্থিত হইয়া সিপাহীকে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করেন। বলা বাহুল্য লর্ড লরেন্স এই সিপাহীর কর্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পদোন্নতি করিয়া দেন।

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া

এই লরেন্স-স্ট্যাচুর অতি সন্নিকটে বর্তমান রেড রোডের শেষ প্রান্তে ময়দানের মধ্যে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পিত্তলপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত।২ এই মাতৃরূপিণী, দেবীরূপিণী, ভারতের শাসন-কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করার পর হইতে ভারতবাসী নানাবিষয়ে সুখশান্তি উপভোগ করিতেছে। তাঁহার আমলে অনেক লোভনীয় উচ্চ রাজপদ বঙ্গবাসীর করতলগত হইয়াছে। রেলওয়ে প্রভৃতি দ্বারা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি ও সর্বস্থানে যাতায়াতের পথও সুগম হইয়াছে। তিনি ভারতীয় প্রজাগণকে বড়ই স্নেহের ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় তিনি হিন্দুস্থানী-ভাষা পর্যন্ত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাকিংহ্যাম, ব্যালমোরাল, অস্‌বর্ণ, উইণ্ডসর প্রভৃতি রাজপ্রাসাদে, ভারতীয় আরদালি বা সিপাহিগণ আজ্ঞাপালনের জন্য নিযুক্ত ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের সর্বজনপ্রিয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড, জননীর নিকট হইতেই এই ভারতপ্রীতিগুণে অনুপ্রাণিত হন। তাঁহার পৌত্র আসমুদ্র ভারতের বর্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জও পিতামহীর সদগুণসমূহের অধিকারী হইয়াছেন। অনেক সময়ে তাঁহার শ্রীমুখ-নির্গত অভয় বাণীতে. আমরা তাঁহার ভারতপ্রীতির আভাস পাইয়াছি। এই পিত্তলমূর্তির পরিবর্তে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণময়মূর্তি নির্মিত হইলে যেন

১. লরেন্সের মূর্তিটি বর্তমানে ব্যারাকপুর লাটবাগানে।
২. মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্তিটি ব্রোঞ্জ নির্মিত। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে।

আরও ভাল হইত।[১] যাহা হউক লর্ড কার্জন প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল হল সম্পূর্ণ হইলে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আর একটি অক্ষয়কীর্তি স্থাপিত হইবে। মস্তকে মুকুট, হস্তে রাজদণ্ড ও সাম্রাজ্ঞীর বেশ-পরিহিতা, এক গৌরবময়ী নারীমূর্তি এই স্ট্যাচুতে প্রকটিত। চিত্রের নিম্নভাগটি সবুজবর্ণ আইরিশ-মার্বেলমণ্ডিত। সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশে শিল্প, সাহিত্য ও সুবিচারের প্রস্ফুট মূর্তি। নিম্নে একজন গুর্খা সিপাহী বেশে ঢাল তরোয়াল হস্তে দণ্ডায়মান। মোটের উপর এই চিত্রটি ভাস্করের শিল্পকলার সুন্দর নিদর্শন। মহারাণীর রাজভক্ত প্রজাগণের অর্থসাহায্যে এই মূর্তি নির্মিত। তাঁহার ষষ্ঠি বৎসরব্যাপী রাজত্বকাল স্মরণীয় করিবার জন্য ইহা গঠিত হইয়াছিল।[২] ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন মহারাণীর এই মূর্তি বিশেষ সমারোহের সহিত উন্মোচন করেন। বর্তমানে এই মূর্তিটি গড়ের মাঠে স্থাপিত থাকিলেও, ভবিষ্যতে ইহা ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল হলের স্থানান্তরিত হইবে। এই মূর্তি ভিন্ন মহারাণীর আর একটি সুন্দর মর্মর মূর্তি এসিয়াটিক মিউজিয়ামের গৃহমধ্যে স্থাপিত আছে। এই মূর্তিটি বর্ধমানাধিপতি স্বর্গীয় মহাতপচাঁদের প্রদত্ত। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে অবস্থিত।

লর্ড রবার্টস্

লর্ড রবার্টস্ ১৮৮৫ খৃীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৯৩ খৃীস্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। গবর্ণমেন্টের নিকট প্রাপ্ত চৌদ্দটি পিত্তলের কামান গলাইয়া তাহা হইতে স্ট্যাচু নির্মিত হইয়াছে। কাবুল, কান্দাহার, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগরা, খোদাগঞ্জ, অম্বালা, আবিসিনিয়া (১৮৬৭), লুসাই, আফগানিস্থান (১৮২৮—১৮৪০) পিওয়ার-কোটাল, সুতার-গর্তন, চারাসিয়া, শেরপুর প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রের নাম এই স্ট্যাচুর গায়ে লিখিত। এই স্ট্যাচুর একদিকে 'যুদ্ধ' ও অপরদিকে 'জয়' এই দুইটি ঘটনা পিত্তলে খোদিত। যুদ্ধচিত্রের সম্মুখে শিখ, দক্ষিণে হর্স-আর্টিলারি, বামে হাইল্যাণ্ডার ও গুর্খা সৈন্য চিত্রিত আছে। মিঃ বেটস নামক একজন ইংরাজ-ভাস্কর এই পিত্তল প্রতিমা প্রস্তুত করেন। লর্ড রবার্টসের বীর-কীর্তির পরিচয় যেস্থানে পিত্তলের অক্ষরে লিখিত, তাহার নিম্নে 'I now bid farewell to the Army of this Country both British and Native' এই কয়েকটি কথা লেখা আছে।

লর্ড ল্যান্সডাউন

লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮১৮ হইতে ১৮৯৪ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতসাম্রাজ্যের ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড রবার্টসের স্ট্যাচুর মত ইহাঁর পিত্তলপ্রতিমাটিও ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত এগারটি পিত্তলের কামান গলাইয়া প্রস্তুত করা হয়।[৩] বেটস্ ও ফোর্ড নামক দুইজন ভাস্কর এই মূর্তি প্রস্তুত করেন। ইহাঁর আমলে নির্বাচন প্রথা দ্বারা বড়লাট সাহেবের মন্ত্রণাসভায় সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয়। লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালেই 'মণিপুরের হত্যাকাণ্ড' সংঘটিত হয়। ভারতে আসিবার পূর্বে লর্ড ল্যান্সডাউন কানাডার গবর্ণর ছিলেন। ভারতীয় রাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি ইংলণ্ডের ওয়ার-মিনিস্টার বা প্রধান যুদ্ধসচিব পদে নিযুক্ত হন।

লর্ড ডাফরিন

বর্তমান রেড রোডের সম্মুখে লর্ড ডাফরিনের পিত্তলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত।[৩] স্যর এডগার বোয়েম নামক সুবিখ্যাত শিল্পী এই স্ট্যাচু নির্মাণ করেন। লর্ড ডাফরিন ১৮৮৪ হইতে ১৮৮৮ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্মা-বিজয় ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে ইংরাজাধিকারের সীমানির্দেশ ও শান্তিস্থাপন, লর্ড ডাফরিনের আমলের প্রধান ঘটনা। লর্ড ডাফরিনের চেষ্টায় ও যত্নে এদেশীয় স্ত্র[illegible] সুচিকিৎসার জন্য, একটি ফণ্ড ও জেনানা-হাস-

---

১. যে সময়ে এ গ্রন্থ রচিত (১৯১৫) তখন ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা বোধ বাঙালি সমাজে তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল এখানে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

২. মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬৪ বৎসর (১৮৩৭-১৯০১ খ্রী.)। ভি, মে, হল নির্মিত ১৯২১ খ্রী.

৩. ল্যান্সডাউন এবং ডাফরিন—উভয়ের মূর্তিই ব্রোঞ্জের। বর্তমানে ব্যারাকপুরে লাটবাগানে।

পাতাল স্থাপিত হয়। বর্মা-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার আদেশ অনুসারে, ইনি 'মার্কুইস অব ডাফরিন এণ্ড আভা ও আরল অব আভা' উপাধিলাভ করেন। ১৯০২ খৃীস্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ অবস্থায় ইনি সুখে কাটাইতে পারেন নাই। বুয়ার-যুদ্ধে লেডী স্মিথ অবরোধকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড আভা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্যর জেমস আউটরাম

পার্ক স্ট্রীটের ও আউটরাম রোডের সন্ধিস্থলে স্যর জেমস আউটরামের অশ্বারূঢ় পিত্তলপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত।[১] আউটরাম একজন প্রকৃত যোদ্ধা ও অসমসাহসিক সেনাপতি ছিলেন। গজনী, খেলাত, পারস্য প্রভৃতির যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহস প্রদর্শন করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই জেনারেল আউটরামের শক্তি ও সাহসের জন্য অবরুদ্ধ লক্ষ্ণৌ-নগরীর উদ্ধার সাধন হয়। মধ্যভারতের ভীলজাতির সহিত অবাধে মিশিয়া, নিজের শক্তিবলে ইনি তাঁহাদের সুশান্ত করেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, তিনি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায়, দুর্ধর্ষ বন্য ভীলদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেন। এই স্যর জেমস আউটরামই অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি সাহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, অযোধ্যা-প্রদেশ ইংরাজাধিকারভুক্ত করেন। আউটরামের ন্যায় দুঃসাহসিক যোদ্ধা সেনাপতি সে আমলে খুব কম ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কিরূপ মূর্তি ধারণ করিতেন তাঁহার স্ট্যাচুতে তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃীস্টাব্দে স্যর জেমস আউটরামের মৃত্যু হয়।

লর্ড মেয়ো

গড়ের মাঠের মধ্য হইতে যে রাস্তাটি ধর্মতলার দিকে গিয়াছে, সেই পথের উপর লর্ড মেয়োর স্ট্যাচু প্রতিষ্ঠিত। আমাদের স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ১৮৭৫ খৃীস্টাব্দে প্রিন্স অব ওয়েলস্‌রূপে এদেশে আসেন, তখন তিনি এই পিত্তলপ্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন।[২] লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খৃীস্টাব্দে বড়লাটের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার আমলে 'ভারত-গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের' প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়ায়, এদেশের কৃষিকার্যের উন্নতির সূচনা আরম্ভ হয়। নানা স্থানে খাল-খনন, নূতন পথ-নির্মাণ ও রেলওয়ের প্রসার ব্যাপ্তি, ইহাঁর আমলেই হইয়াছিল। ভীষণ গুপ্ত আততায়ীর হস্তে লর্ড মেয়ো পোর্টব্লেয়ারে নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ প্রথমে কলিকাতায় আনা হয়, তৎপরে তাঁহার জন্মভূমি আয়ারল্যাণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। ইহার ঠিক ছয় মাস পূর্বে, অন্য একজন পাঠান-ঘাতক কর্তৃক হাইকোর্টে চিফ জস্টিস নর্মাণ সাহেবও নিষ্ঠুর ভাবে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন নূতন হাইকোর্ট নির্মিত হইতেছিল বলিয়া টাউনহলেই হাইকোর্ট বসিত। জয়পুরের রাজোদ্যানে লর্ড মেয়োর আর একটি স্ট্যাচু আছে।

অক্টারলোনি মনুমেণ্ট[৩]

মফঃস্বলের অনেক লোক কলিকাতা দেখিতে আসিলে, 'মনুমেণ্ট' দেখিয়া যান। এই মনুমেণ্ট ধর্মতলার মাঠে সংস্থাপিত। স্যর ডেভিড অক্টারলোনির স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য, সাধারণের চাঁদায় এই মনুমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮২৮ খৃীস্টাব্দে কলিকাতার সর্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভ এই সুবৃহৎ মনুমেণ্টের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। অক্টারলোনি সেকালের একজন বীরসেনানী ছিলেন। মালব ও রাজপুতানায় ইনি প্রথমে রেসিডেণ্টের কাজ করিতেন। নেপাল-যুদ্ধে ইহাঁর সুনাম ও যশপ্রতিভা সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এই মনুমেণ্টটি ১৫২ ফিট উচ্চ। ইহা নির্মাণ করিতে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই মনুমেণ্টের চূড়ার উপর উঠিলে, কলিকাতা সহরের দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়। কলিকাতার পুলিস-কমিশনার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করিলে এই মনুমেণ্টের উপরে উঠিবার পাশ পাওয়া যায়। অক্টারলোনি সুপ্রসিদ্ধ সেনানী স্যর আয়ার কূটের আমল হইতে যুদ্ধকার্যে ব্রতী হন। হায়দার আলির আমল হইতে পরবর্তী অনেক বিখ্যাত যুদ্ধে এই অক্টারলোনি বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

---

১. বর্তমানে মূর্তিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বাগানে রক্ষিত।
২. লর্ড মেয়োর মূর্তিটি ব্রোঞ্জে তৈয়ারী।
৩. বর্তমান নাম 'শহীদ মিনার'।

১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে মাল্টায় তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষাবস্থায় তিনি মাল্টার গবর্ণর হইয়াছিলেন।

প্যানিয়টি ফাউণ্টেন

ওল্ড কোর্ট হাউস ও এসপ্লানেড রোর নিকটে একটি ফাউণ্টেন বা সাধারণের জলপানের স্থান নির্মিত হইয়াছে। ডেমিট্রিয়াস প্যানিয়টি সাহেবের[১] স্মরণার্থে এই প্রস্রবণটি সাধারণের ব্যবহারের জন্য ধর্মতলার কার্জন-বাগানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই প্যানিয়টি সাহেব ৪২ বৎসর কাল ধরিয়া, ভিন্ন ভিন্ন বড়লাট-সাহেবদের সহকারী প্রাইভেট-সেক্রেটারীর কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রস্রবণটি জয়পুরের মার্বেল-পাথরে প্রস্তুত। লর্ড কার্জনের চেষ্টাতেই এই স্মৃতিচিহ্নটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লেডী কার্জনের ফাউন্টেন

আমাদের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জনের পত্নী, পরলোকগতা লেডী কার্জনের স্মৃতিরক্ষার্থে, ধর্মতলায় বর্তমান 'কার্জন-পার্ক' নির্মিত হইয়াছে।[২] এই কার্জন-পার্ক নামক ভ্রমণোদ্যানটি ধর্মতলায় বর্তমান ট্রাম-আড্ডার পার্শ্বে। এই স্থানে পূর্বে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। তাহা বুজাইয়া ফেলিয়া ও এসপ্লানেডের কয়েক বিঘা জমি লইয়া, এই ক্ষুদ্র পার্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার পূর্বে অনেক ইংরাজ ও বাঙ্গালী এইস্থানে বেড়াইতে আসেন। উদ্যানটির চারিদিক লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। মধ্যে সুবিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও কঙ্করময় ভ্রমণপথ। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে লেডী কার্জনের এক সাংঘাতিক পীড়া হয়। সেই সময়ে কলিকাতাবাসিগণ তাঁহার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। এই জন্য লেডী কার্জন কলিকাতাবাসীকে একটি 'প্রস্রবণ' প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইহাই 'লেডী কার্জনের ফাউণ্টেন' নামে বিখ্যাত।

লর্ড হেস্টিংস

ডালহৌসি ইনস্টিটিউটের বারান্দায় গবর্ণর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের শ্বেত প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত। ইনি আরল ময়রা এবং লর্ড হেস্টিংস এই দুই নামেই পরিচিত। ১৮১৩ হইতে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইনি গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর আমলে বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড ও ময়দান মধ্যবর্তী পথগুলি প্রথম নির্মিত হয়। পুরাকালে এই স্ট্র্যাণ্ড রোড গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। ভারতীয় রাজকর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর, লর্ড হেস্টিংস মাল্টার গবর্ণর পদে নিযুক্ত হন। এবং এই মাল্টাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সাধারণের চাঁদায় লর্ড হেস্টিংসের এই শ্বেত মর্মরময় মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে মূর্তিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে রক্ষিত।

দ্বারভাঙ্গার মহারাজা

ডালহৌসি স্কোয়ারের কোণে লালদীঘির এক প্রান্তে, হেয়ার স্ট্রীটের মোড়ের উপর, মহারাজা স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিং বাহাদুর, মহারাজা অব দ্বারভাঙ্গার শ্বেতপ্রস্তর মূর্তি স্থাপিত। মহারাজ বীরবেশে তরবারি হস্তে গদিতে উপবিষ্ট এইভাবেই মূর্তিটি সংগঠিত। অনস্লো ফোর্ড নামক জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ-স্থপতি এই মূর্তিটি গঠন করেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশের তদানীন্তন গবর্ণর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার কর্তৃক এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ৪৩ বৎসর বয়সে মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা স্যর রামেশ্বর সিং বাহাদুর দ্বারবঙ্গের গদিতে আরোহণ করেন। দ্বারবঙ্গ রাজ্যের আয় ত্রিশ লক্ষের উপর। ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর বড়লাট বাহাদুর কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সর্ববিধ লোকহিতকর কার্যে ও সভা-সমিতিতে তিনি যোগদান করিতেন।

১. Demetrius Panioty C.I.E, a highly respected member of the domiciled Greek Armenian Community who filled for many years the office of the Assistant Private Secretary to the Viceroy and died in 1895 at Simla—see Cotton's *Calcutta Old and New, 2nd Impression*, p. 331-332.

২. বর্তমানে এই উদ্যানের নাম সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি পার্ক।

স্যার এস্‌লি ইডেন

লালদীঘির বাগানের মধ্যে রাইটার্স-বিল্ডিংসের সম্মুখে বঙ্গেশ্বর স্যার এস্‌লি ইডেনের প্রস্তর-মূর্তি স্থাপিত।[১] ইনি ১৮৭৭ হইতে ১৮৮২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি গবর্ণমেণ্টের বোর্ড অব্ রেভেনিউএর জুনিয়ার-সেক্রেটারীর পদ লাভ করে। ৩১ বৎসর বয়সে বেঙ্গল-গবর্ণমেন্টের চিফ্-সেক্রেটারী হন। ৪২ বৎসর বয়সে বর্মার চিফ্-কমিশনারের পদ লাভ করেন। তৎপরে ৪৬ বৎসর বয়সে বঙ্গদেশের ভাগ্য-বিধাতারূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। জনপ্রবাদ এই 'ইলবার্ট বিল' তিনিই প্রথম প্রণয়ন করিয়াছিলেন। স্যর এসলি ইডেন প্রজার প্রতি সহানুভুতিপূর্ণ, একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। দার্জিলিঙের বর্তমান উন্নতি তাঁহার আমলেই হইয়াছিল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইডেন হাসপাতাল, দার্জিলিঙের ইডেন স্যানিটারিয়ম, চিরদিনই তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিবে।

স্যর স্টুয়ার্ট বেলি

স্যর স্টুয়ার্ট কলভিন বেলি, কে, সি, এস, আই, ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আসামের চিফ্-কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেলি সাহেব বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্যগিরি করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, ইনি বঙ্গদেশ শাসন করেন। এদেশের রাজকর্ম হইতে অবসর লইয়া, স্যর স্টুয়ার্ট বিলাতের ইণ্ডিয়া-অফিসে পলিটিক্যাল-ডিপার্টমেণ্টের পদে নিযুক্ত হন। ইনি সেকালের হেলিবার-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ সিভিলিয়ান। ইহাঁর পিতা মিঃ উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেলি ১৮২৮ খৃস্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য বঙ্গের গবর্ণর-জেনারেল পদে নিযুক্ত ছিলেন। লর্ড আমহার্স্টের এদেশ হইতে প্রস্থানের পর ও লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের এদেশে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত, ইনি মার্চ হইতে জুলাই পর্যন্ত ছয়মাস-কাল গবর্ণরের কাজ করিয়াছিলেন। স্যর স্টুয়ার্ট বেলি একজন প্রজারঞ্জক শাসনকর্তা ছিলেন। বেলি সাহেবের শ্বেত প্রস্তরময় মূর্তি অ্যাশক্রফট নামধেয় একজন বিখ্যাত শিল্পীর হস্তপ্রসূত। বর্তমানে ইহা ব্যারাকপুর লাটবাগানে অবস্থিত।

স্যর জন উডবার্ণ

স্যর জন উডবার্ণ, কে, সি, এস, আই মহোদয় ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গের লেফটেনাণ্ট-গবর্ণরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁর আমলে কলিকাতার কপালীটোলা অঞ্চলে প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। এই প্লেগ উপলক্ষে সেই সময়ে লোকের মনে কিরূপ আতঙ্কের উদয় হয়, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া প্লেগের টিকা দিবেন, দুষ্টলোক এইরূপ একটা জনরব রটাইয়া দেওয়ায়, সমগ্র কলিকাতা সহরের অধিবাসিগণ অতিশয় সন্ত্রাসিত হইয়া উঠেন। দলে দলে লোক কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। তার পর গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এ আতঙ্কভাব অপসারিত হয়। প্রজাপ্রিয় স্যর জন উডবার্ণ লোকের মনের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য, প্রায়ই অশ্বারোহণে সহরের দেশীয় পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। স্যর জন উডবার্ণ প্রজাপ্রিয় শাসনকর্তা ছিলেন। এ দেশেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

হলওয়েল মনুমেণ্ট

১৭৫৬ খৃস্টাব্দের অন্ধকূপ-হত্যাকাণ্ডে[২] যে সব ইংরাজের শোচনীয় মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার্থে স্বনামপ্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া দেন। প্রাচীন কলিকাতা-দুর্গের সম্মুখে একটি খাত ছিল। অন্ধকূপ-হত্যার পরবর্তী দিবসে, সেই খাতে সমস্ত মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। পরে এই খাত বুজাইয়া ফেলা হয়। হলওয়েল এই নরকঙ্কালপূর্ণ

---

১. বর্তমানে ব্যারাকপুর লাটবাগানে ওঁর পত্নীর সমাধির পাশে রক্ষিত।

২. হলওয়েল বর্ণিত অন্ধকূপ হত্যা কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে প্রথম প্রশ্ন তোলেন বিখ্যাত বাঙ্গালী ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র। ১৯৪০ খ্রী. সুভাষচন্দ্র বসুর আন্দোলনে এই মনুমেণ্ট সম্প্রসারিত হয়।

খাতের উপর একটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করেন। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড হেস্টিংসের আমলে হলওয়েল প্রতিষ্ঠিত এই স্মৃতিচিহ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইহার প্রায় আশি বৎসর পরে, লর্ড কার্জন এই স্মৃতিস্তম্ভটি নূতনভাবে বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লর্ড কার্জনের স্থাপিত এই স্মৃতিচিহ্নের একটু বিশেষত্ব আছে। হলওয়েলের স্থাপিত মনুমেণ্টে সিরাজের নামটি জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড কার্জন মিঃ হিলের সংগৃহীত ১৭৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দের রেকর্ডগুলি পাঠে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সিরাজউদ্দৌলা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নহেন, এই জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই মনুমেণ্টে নবাবের নামটি প্রস্তর-ফলক হইতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জনের নাম নানাকারণে বাঙ্গালীর নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। ইহাঁরই আমলে বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়। এই ব্যাপার লইয়া সেই সময়ে বঙ্গদেশে একটা হুলস্থুল বাধিয়া যায়। বর্তমান যুগের বাঙ্গালীমাত্রেই সে ঘটনা জানেন। সুতরাং তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের সর্বজনপ্রিয় বড়লাট, লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে, এই দ্বিধা-বিভক্ত বঙ্গদেশ আবার এক হইয়া যায় এবং ইহারই ফলে, আমরা প্রজারঞ্জক শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেলকে গবর্ণররূপে পাইয়াছি। লর্ড কার্জনের আমলে ফ্যামিন-কমিশন ও ইউনিভার্সিটি-কমিশন বসে। পুলিসের সর্ব বিভাগের সংস্কারের জন্য পুলিস-কমিশনও বসিয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের পুরাকালের স্মৃতিচিহ্নগুলি রক্ষা করিয়া লর্ড কার্জন তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। লর্ড কার্জনের আমলে ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করেন। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, সর্বজনপ্রিয় ভূতপূর্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনাধিরোহন করেন।[১] এতদুপলক্ষে লর্ড কার্জন দিল্লীতে একটি বিরাট দরবারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জনের আমলে তিব্বত যুদ্ধ ঘটে। লর্ড কার্জন সর্ব বিষয়ে একজন প্রতিভাবান শাসনকর্তা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল চৌরঙ্গী-রোডের ও আউটরাম স্ট্রীটের সন্ধিস্থলে কার্জনের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে এঁর ব্রোঞ্জ মূর্তি লাটবাগানে ও মর্মর মূর্তিটি ভি, এম, বাগানে অবস্থিত।

লর্ড কিচ্‌নার

লর্ড কিচ্‌নার লর্ড কার্জনের শাসনকালে সমগ্র ভারতের জঙ্গীলাট বা কমাণ্ডার ইন-চিফ ছিলেন। বর্তমানকালে তাঁহার মত বীরাগ্রগণ্য রণকুশল সেনাপতি খুব কমই আছেন। তাঁহার সমর-প্রতিভা দিকদিগন্তে বিঘোষিত। গত জার্মাণ যুদ্ধের সময়, লর্ড কিচ্‌নার War Minister এর পদে নিযুক্ত হইয়া অতুলনীয় প্রতিভার সহিত সমগ্র ব্রিটিশবাহিনী পরিচালিত করেন। লর্ড কিচ্‌নার সেনাবিভাগের বহুবিধ সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। গড়ের মাঠে কেল্লার সান্নিধ্যে তাঁহার প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল এই পিত্তলপ্রতিমার প্রথম আবরণ উন্মোচন করেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

স্বনামধন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পরিচয় আমরা ঠাকুর-গোষ্ঠীর বিবরণ প্রদানকালে পূর্ণভাবে দিব। প্রসন্নকুমারের প্রদত্ত দানেই 'Tagore Professorship of Law' নামক হিন্দু-আইন সম্বন্ধীয় লেকচারের ব্যবস্থা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর একজন আইনজ্ঞ ব্যবহারজীবী ও সর্ববিধ দেশ হিতকর কার্যের সমর্থক ছিলেন। এই প্রস্তরমূর্তির নিম্নে, 'জন্ম ১৮০১ খ্রীস্টাব্দ ২১ ডিসেম্বর ও মৃত্যু ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দ ৩০ আগস্ট'—এই কথাগুলি খোদিত। বঙ্গবাসিগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে বড়লাট সাহেবের কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত হন। বাঙ্গলার ছোটলাট-কাউন্সিলেও তিনি একবার গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ওকালতি করিয়া প্রসন্নকুমার ঠাকুর বৎসরে দুইলক্ষ টাকা পর্যন্ত উপায় করিয়াছেন। পরে তিনি ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া, সাধারণ হিতকর কার্যে মনোযোগ দেন। মৃত্যুর পূর্বে এক উইল করিয়া প্রসন্নকুমার সাড়ে ছয়লক্ষ

১. সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনারোহণ কাল ১৯০১ খ্রী.

টাকা ধর্মার্থে ও শিক্ষাকার্যের উৎসাহের জন্য দান করিয়া যান। ইহার মধ্যে তিনলক্ষ টাকা 'Tagore Law Professorship' এর জন্য নির্দিষ্ট হয়। তাঁহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার। কিন্তু খ্রীস্টধর্মাবলম্বন করায়, প্রসন্নকুমার জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া যান। প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেকালের একজন আদর্শ জমিদার, আদর্শ ব্যবহারজীবী ও আদর্শ দাতা ছিলেন।

ডেভিড হেয়ার

বর্তমান হেয়ার স্কুল ডেভিড হেয়ারের অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ। কিন্তু তাহা হইলেও. কলেজ স্ট্রীটের গোলদীঘিতে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ এখনও তাঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠেও তাঁহার একটি শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্তি স্থাপিত আছে। হেয়ার সাহেব এদেশীয় ছাত্রদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। এদেশীয়গণ যাহাতে ইংরাজি ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে, তজ্জন্য তিনি জীবন-ব্যাপী চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ডেভিড হেয়ার স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে তিনি ঘড়ির ব্যবসায়ে জীবিকা অর্জন করিতেন। পরে নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়া এদেশীয় জনসাধারণের শিক্ষা ও উন্নতির মহাব্রতে জীবন সমর্পণ করেন। জীবনে তিনি যাহা কিছু উপায় করিয়াছিলেন সবই বঙ্গদেশবাসীর জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ যে জমির উপর স্থাপিত, তাহা এই মহানুভব ডেভিড হেয়ারের দান করা সম্পত্তি। মেডিকেল কলেজের উন্নতির জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ভয়ে যখন কোন বাঙ্গালী ছাত্র মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিতে চাহিত না, ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় তাহাদের এই কুসংস্কার দূরীভূত হয়। কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষার সুব্যবস্থার দিকেই তাঁহার দৃষ্টি ছিল তাহা নহে, সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষা শিক্ষার সম্বন্ধেও তিনি অনেক সুব্যবস্থা করেন। এখনও প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু দিনে একটি উৎসবের মহদনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাঙ্গলার বিদ্যাসাগর তাঁহার নিজের কীর্তিস্তম্ভ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানকালে গোলদীঘির প্রবেশপথে তাঁহার একটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত আছে। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বময় জীবনকথা বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলা অনাবশ্যক। কারণ বিদ্যাসাগরকে না জানেন এমন বাঙ্গালীই নাই। বিদ্যাসাগর পরিশেষে এই মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল বা প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'বর্ণপরিচয়', 'বোধোদয়', 'চরিতাবলী', প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য আর মেট্রোপলিটান কলেজ এবং বঙ্গভাষা যতদিন বর্তমান থাকিবে, ততদিন বিদ্যাসাগরের স্মৃতি রক্ষার জন্য অন্য কোনরূপ নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইবে না।[১]

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর

কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মধ্যস্থলে, স্বর্গীয় অনারেবল রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রস্তর-মূর্তি স্থাপিত। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কৃষ্ণদাসের স্বর্গলাভ ঘটে। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-সভার সম্পাদক পদে নিযুক্ত থাকিয়া, তিনি এই বঙ্গীয় জমিদার-সভাটিকে নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনাররূপে তিনি দরিদ্র করদাতাদের পক্ষসমর্থনে জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াছেন। সেকালের হিন্দু পেট্রিয়ট কৃষ্ণদাসের জ্বলন্ত কীর্তি। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক স্পষ্টবাদী, রাজনীতিজ্ঞ সম্পাদক খুব কমই জন্মিয়াছেন। আইন-প্রণেতারূপে লাটকাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া তিনি সমগ্র ভারতের ও বঙ্গদেশের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া কর্মবীর কৃষ্ণদাস, এই

১. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিবছর বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট প্রাবন্ধিককে 'বিদ্যাসাগর পুরস্কার' (অর্থে দেয়) দেন; মেদিনীপুরে 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হইয়াছে।

নরজগতে অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করিয়া রাজদ্বারে ও সাধারণের নিকট অযাচিত সম্মান লাভ করিয়া লোকান্তরবাসী হইয়াছেন। তাঁহার উপযুক্তপুত্র অনারেবল রাধাচরণ পালও পিতৃপদাঙ্কানুসরণে দেশের ও দশের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে রাজা কালীকৃষ্ণের জন্ম হয়। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের মৃত্যুর পর রাজা কালীকৃষ্ণ হিন্দু কায়স্থ-সমাজের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করেন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর একজন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক গ্রন্থ তিনি ইংরাজিতে অনুদিত করিয়া, এদেশের ও ইউরোপের সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-ভাজন হয়েন। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর সাধারণ সভাসমিতি ও অন্যান্য দেশ-হিতকর কার্য সমূহে যোগদান করিয়া, সাধারণের অনেক উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে তিনি সর্বজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর দেহত্যাগ করেন। বিডন বাগানের প্রস্তরমূর্তি ব্যতীত টাউনহলেও তাঁহার আর একখানি তৈলচিত্র আছে।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন

১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে কবিরাজ দ্বারকানাথ সেনের জন্ম হয়। ফরিদপুর জেলার খাণ্ডারপাড়া গ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য অভিরাম কবীন্দ্র দ্বারকানাথের পূর্বপুরুষ। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোপালকর 'রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ' নামে প্রসিদ্ধ বৈদ্যক-গ্রন্থ রচনা করেন। মুরশিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া, দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা-কার্য আরম্ভ করেন। চিকিৎসাসম্বন্ধে শীঘ্রই তাঁহার সুযশ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রাজপুতনার মেবার রাজবংশের যুবরাজের পীড়া হইলে, রাজসরকার গবর্ণমেণ্টের নিকট একজন সুবৈদ্য চাহিয়া পাঠান। বাঙ্গালী বৈদ্য দ্বারকানাথই এই কার্যে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া মেবারে প্রেরিত হন। এই রাজকুমারের চিকিৎসায় তাঁহার যশঃপ্রভা সুদূর রাজপুতানা পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়। দ্বারকানাথ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুচিকিৎসক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ইহাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রদান করেন। কবিরাজদের মধ্যে দ্বারকানাথই সর্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়।

কালীঘাট মন্দির

কালীঘাট প্রসঙ্গে আমরা এই শক্তিপীঠ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। বর্তমান কালীমন্দির নবাবী আমলের শেষভাগে নির্মিত। কামদেব ব্রহ্মচারী যিনি মহারাজ মানসিংহের গুরু ছিলেন ও বড়িশার সাবর্ণগণের আদিপুরুষ, তাঁহার সময়েই এই কালীঘাটের কথা সাধারণ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। প্রবাদ এই, যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্তরায় কালীর জন্য সেবায়েত বন্দোবস্ত ও একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। তখন এই স্থান ভীষণ বন জঙ্গল-পরিপূর্ণ ছিল। বসন্তরায়ের নিয়োজিত কালীর সেবায়েত, ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র-বংশ বর্তমান হালদার মহাশয়গণ। বর্তমান মন্দির নির্মাণ সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তী আছে, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়। ধরিতে গেলে, এই মন্দিরটি একশত পাঁচ বৎসর হইয়াছে। কালীক্ষেত্র-রক্ষক ভৈরব নকুলেশ্বর আগে এক পর্ণকুটিরের মধ্যে থাকিতেন। ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে তারাসিং বলিয়া একজন পাঞ্জাবী বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। দুর্গাপূজার কয়দিন নীলষষ্ঠী, চড়ক, শিবরাত্রি ও কালীপূজা উপলক্ষে এবং যোগ ও গ্রহণের দিনে এই শক্তিপীঠ মহাতীর্থ কালীঘাটে খুব জনতা হয়।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

আপার চিৎপুর রোডে বাগবাজার পল্লীতে এই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখনও সুপ্রশস্ত

চিৎপুর রোডের পার্শ্বে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। কিন্তু এরূপ জনপ্রবাদ আছে, পুরাকালে জাহ্নবী এই পথ পর্যন্ত প্রবাহিতা ছিলেন। বাগবাজারের মদনমোহন স্থাপিত হইবার বহুপূর্বে এই সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির বর্তমান ছিল। এই মন্দিরে অতি পুরাকালে, অর্থাৎ পলাশী-আমলের পরও নর-বলি হইয়া গিয়াছে এরূপ প্রমাণ সেকালের সরকারি-গেজেট হইতে আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এক সন্ন্যাসী এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধর, বাবু অভয়চরণ মিত্র বর্তমান দেবস্থানটি নির্মাণ করিয়া দেন। বর্তমানের কালী-প্রতিমা মৃত্তিকা-গঠিত। কিন্তু ইহার স্থাপয়িতা সন্ন্যাসী যে প্রস্তরমূর্তি পূজা করিতেন, তাহাও নাকি এই মন্দিরের মধ্যে আছে। বাগবাজারের গঙ্গার ধারে চিত্রেশ্বরী বলিয়া আর এক অতি পুরাকালের কালীঠাকুর বর্তমান। তখন এই চিৎপুর রোড অতি অপ্রশস্ত বনপথ মাত্র ছিল। সন্ন্যাসী ও কাপা-লিকেরা এই জঙ্গলময় পথ ধরিয়া বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের মধ্যে দিয়া চৌরঙ্গীর জঙ্গল-মধ্যস্থ অপ্রশস্ত পথাবলম্বনে কালীঘাটে আসিতেন।

পাকড়াশির শিবমন্দির

বহুবাজার কেণ্ডারডাইন লেনের মধ্যে কয়েকটি শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগুলি পলাশী মহাসমরের পরে নির্মিত। ক্লাইভের আমলে যখন কলিকাতার দুর্গ গড়ের মাঠের অধিকৃত স্থানে নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ত্রিলোকরাম পাকড়াশি এই মন্দির ও নবরত্ন নির্মাণ করেন। পাকড়াশি মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। একটা জনশ্রুতি এই, কেল্লার প্রাচীর ও গড়খাই প্রভৃতি নির্মাণের জন্য যেরূপ ভাবে ইষ্টক প্রস্তুত করান হইয়াছিল, পাকড়াশি মহাশয় সেইরূপ পাকা ইট দ্বারা এই মন্দিরগুলি নির্মাণ করান। মন্দিরগুলির নির্মাণ-প্রণালী ও ইষ্টকাদির ব্যবস্থা দেখিলে তাহা প্রকৃত বলিয়াই বোধ হয়। দেওয়ান অব ফোর্ট উই-লিয়ামের পদ, কোম্পানির আমলে প্রথম সৃষ্ট হয়। এখন ইহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। বর্তমান গড়ের মাঠের কেল্লা বা নূতন ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণের ভার অনেক বাঙ্গালীর উপর ন্যস্ত হয়। ইহাঁরা লোকজন কুলীমজুর জোগান দিতেন, মালমশলা জোগাইতেন, এমারত নির্মাণের তদারকী কাজও করিতেন। এই কাজ করিয়া সেকালে দুইজন লোক প্রচুর বিত্তসঞ্চয় করিয়া ছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন দুর্গাচরণ পিতুড়ি ও অপর ব্যক্তি এই পাকড়াশি দেওয়ানজী। দুর্গাচরণ পিতুড়ির নাম বৌ-বাজার পল্লীর একটি গলিতে সুরক্ষিত। আর পাকড়াশি মহাশয়ের নাম এই শতাব্দী পূর্বে প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন শিবমন্দিরগুলি আজও ঘোষণা করিতেছে।

আনন্দময়ীর মন্দির

নিমতলা ঘাটের পল্লীতে এই দেবী আনন্দময়ীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্তি বহুকালের পুরাতন। শতাধিক বৎসর পূর্বে একজন মোহন্ত গঙ্গাতীরে সর্বপ্রথম এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গা তখন বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোড পর্যন্ত প্রবাহিতা ছিলেন। নিমতলার পুরাতন দাহঘাট ইহার পরিচয়। আনন্দময়ী সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে। এ কিম্বদন্তীটি এই, জগন্নাথ বলিয়া একজন লোক খড়ের ব্যবসা করিত। এই জগন্নাথ পূর্বোক্ত মোহন্তের অতি ভক্ত ছিল। মৃত্যুর সময় মোহন্ত-ঠাকুর জগন্নাথের হস্তেই আনন্দময়ীর সেবার ভার দিয়া যান। জগন্নাথের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া, সে নারায়ণ মিশ্র নামক এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণকে এই কালীস্থান ও তাহার পার্শ্বস্থ জমি বিক্রয় করে। মিশ্র মহাশয় ঘোর শাক্ত ছিলেন। তিনি দেবীর নিত্যপূজার ও সেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেন। নারায়ণ মিশ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরদেব মিশ্র, এই দেবমন্দিরের সেবায়েতের কার্য করেন। হরদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় নিমতলা স্ট্রীটের জমিদার, স্বর্গীয় মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উত্তরাধিকারসূত্রে এই মন্দিরটি প্রাপ্ত হন। মাধববাবুর পর স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে এই আনন্দময়ী কালীর সেবার ভার অর্পিত হয়। বর্তমানে বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার-বংশীয় বাবু ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরের কার্য পরিচালিত হইতেছে। আনন্দময়ী আগে এক পর্ণকুটীরের

মধ্যে থাকিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারগণ বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। এই কালীমূর্তি প্রস্তরনির্মিত। বর্তমানে এই আনন্দময়ী দেবীর মন্দির সর্বদাই জাঁকজমকপূর্ণ। কালীপূজো ও দুর্গাপূজোর সময় এখনো মহাসমারোহে পূজো-পাঠাদি হইয়া থাকে। সন্ধ্যার আরতির সময় অনেক ভক্ত হিন্দু এইস্থানে আরতি দর্শনার্থে সমবেত হন।

ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর ঠনঠনিয়ায় সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। এই কালীমূর্তি মৃত্তিকানির্মিত। কিন্তু পূর্বে ইহার আর এক মূর্তি প্রকটিত ছিল। উদয়নারায়ণ বলিয়া একজন শাক্ত ব্রহ্মচারী এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্বহস্তেই দেবীর পূজো করিতেন। তখন এ অঞ্চলে লোকের বসতি এত অধিক ছিল না। অধিকাংশ স্থান বন জঙ্গলাবৃত ছিল। উদয়নারায়ণ ব্রহ্মচারীর মৃত্যুর পর হালদারবংশীয় একজন পুরোহিত এই দেবী-মন্দিরের ভার লয়েন। এই সময়ে বাঙ্গলা ১১১০ সালে, ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ ধনী ও কালীভক্ত শঙ্কর ঘোষ মহাশয় বর্তমান মন্দিরটি ও প্রতিমাখানি নির্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দিরগাত্রে আজও— শঙ্করহৃদয় মাঝে কালী বিরাজে। লিখিত একখানি প্রস্তরফলক সংযোজিত আছে। এই প্রস্তরফলকখানির লিখিত 'শঙ্কর' শব্দটি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। শঙ্কর ঘোষ মহাশয় এই কালীমন্দিরের পার্শ্বে একটি শিবমন্দিরও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

নিমতলা ঘাট

নিমতলা ঘাট কলিকাতার ন্যায় জনপূর্ণ সহরের শ্মশান। দম্ভ, ঐশ্বর্য ও আত্মগরিমার দীপ্তিবিকাশ এই মহাশ্মশানেই পর্যবসিত হয়। সেকালের নিমতলাঘাট আনন্দময়ী মন্দিরের নিকটেই ছিল। বর্তমানকালে গঙ্গা দূরে সরিয়া যাওয়ায় পোর্ট-কমিশনারগণ প্রচুর অর্থব্যয়ে এই মহাশ্মশানটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার পার্শ্বে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়, শবযাত্রীদিগের ও মুমূর্ষ গঙ্গাযাত্রীগণের অবস্থানের জন্য একটি দ্বিতল বাটি নির্মাণ করিয়া দিয়া যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। এই নিমতলা শ্মশানক্ষেত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্যের শিক্ষাভূমি। কলিকাতা সহরের নামজাদা যত বড় বড় লোক, বাণীর অতি প্রিয়পুত্রগণের দেহের ভস্মাবশেষ এই স্থানেই রক্ষিত। রামগোপাল, কৃষ্ণদাস, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতির পবিত্র চিতাভস্মে এই স্থান মহাতীর্থে পরিণত।[১] নিমতলা শ্মশানঘাটের ন্যায় সুপ্রশস্ত ও সুবৃহৎ দাহক্ষেত্র বঙ্গদেশে আর কোথাও নাই। নিমতলা ঘাটের একটু দূরে স্বর্গীয় কাশীনাথ মিত্রের ঘাট। ইহা সাধারণের নিকট 'কাশীমিত্রের ঘাট' বলিয়া পরিচিত। নিমতলা ঘাটের দাহকার্যাদির ব্যয় সম্বন্ধে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি একটি মূল্যের তালিকা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারেই সাধারণকে দাহ-কার্যের খরচা দিতে হয়। অক্ষম ও যোত্রহীনগণের ব্যয় মিউনিসিপ্যালিটিই বহন করিয়া থাকেন।

ধর্মতলার মসজিদ

ধর্মতলার মোড়ে কুক কোম্পানির আড়গড়ার পার্শ্বে, যে সুবৃহৎ মিনার সম্বলিত মসজিদটি আছে তাহা 'ধর্মতলার মসজিদ' বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত।

মহীশূরের স্বনামখ্যাত টিপু সুলতানের পুত্র, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ ১৮৪২ খৃস্টাব্দে এই মসজিদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে এই সুবৃহৎ মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের উপর একখানি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—"This Musjid was erected during the Government of Lord Auckland G. C. B. by the Prince Gholam Mahomed son of the late Tippoo Sultan, in gratitude to God and in commemoration of the Honourable Court of Directors granting him arrears of his stipend in 1840."

---

১. রবীন্দ্রনাথের মরদেহ এই শ্মশানেই দাহ করা হয় ; দাহক্ষেত্রটির উপর একটি বেদী নির্মিত হইয়াছে এবং তাহা প্রাচীর ঘেরা অবস্থায় রক্ষিত আছে। দেশ বিদেশের রবীন্দ্রানুরাগীরা স্থানটি দর্শন করেন।

টিপুর পতন হইলে তাঁহার বংশধরেরা ইংরাজবাহাদুরের বন্দীরূপে টালিগঞ্জে স্থানান্তরিত হন। গোলাম মহম্মদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কোম্পানিবাহাদুর ভাতা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এখনও টিপুর বংশধরেরা টালিগঞ্জে বাস করিতেছেন।[১] ইহাঁরা 'টালিগঞ্জের নবাব' বলিয়া পরিচিত। টিপুর অধঃপতনের পর কোম্পানি এক হিন্দু রাজবংশধরকে মহীশূর-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান মহীশূর রাজ্যেশ্বর এই হিন্দু রাজারই বংশোদ্ভূত।[২]

মাণিকপীরের গোর

আপার সার্কিউলার রোডের ও মাণিকতলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে, এই মাণিকপীরের গোরস্থান অবস্থিত। পীর সৈয়দ হোসেনউদ্দিন সাহ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এইস্থানে ধর্মসাধনা আরম্ভ করেন। তিনিই সাধারণ্যে 'মাণিকপীর' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই স্থানে উক্ত মাণিকপীরের দেহাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। মাণিকপীর সম্বন্ধে কোন বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই মসজিদটি যে শতাধিক বৎসরের পুরাতন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জুম্মাপীরের গোর

বড়বাজার ক্লাইভ স্ট্রীটে এই জুম্মাপীরের গোর অবস্থিত। এতৎসম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তখন এই স্থানের সান্নিধ্যে গঙ্গা নদী প্রবাহিতা হইতেন। গঙ্গার তটেই সেকালের সুতালুটি-ঘাট। এই সুতালুটি-ঘাটের উপর নঙ্গরেশ্বর মহাদেব স্থাপিত ছিলেন ও এখনও স্ট্র্যান্ড রোডের পার্শ্বে এই নঙ্গরেশ্বর বিরাজিত। এ লিঙ্গমূর্তি দুইশত বৎসরের পুরাতন। কাশীনাথ বলিয়া একজন সামান্য ব্যবসায়ী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া, সেকালের সুতালুটিতে দোকানপাট করিতেন। কাশীনাথ মধ্যে মধ্যে হুগলী ও বাঁশবেড়ে হইতে মালপত্র কিনিয়া আনিয়া কলিকাতায় ব্যবসা করিতেন। একবার কাশীনাথ হুগলী হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। এক ফকির তাঁহাকে বলে, "তুমি দয়া করিয়া আমায় কলিকাতায় পোঁছিয়া দাও।" কাশীনাথ তাঁহাকে তাঁহার নৌকায় তুলিয়া লইয়া কলিকাতায় আসেন ও ফকিরের যথাসাধ্য পরিচর্যা করেন। তদবধি ফকিরসাহেব কাশীনাথের দোকানের পাশ্বেই থাকিয়া যান। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল। এই ফকির পরে 'জুম্মাসাহ' বলিয়া পরিচিত হন। এক সময় লর্ড কর্ণওয়ালিসের দপ্তরে একটি দেওয়ানি পদ খালি হয়। ফকির জুম্মাসাহর উপদেশ ও নির্বন্ধে, কাশীনাথ এই দেওয়ানি পদের জন্য দরখাস্ত করেন। কাশীনাথ লেখাপড়া না জানিলেও ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই পদলাভ ঘটে। ফকিরের অদ্ভুত কৃপায় কাশীনাথ দেওয়ানিপদ লাভ করিয়া প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হন। ভবিষ্যতে ইনি দেওয়ান কাশীনাথ বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দেওয়ান কাশীনাথ জুম্মাসাহর মৃত্যুর পর, তাঁহার সমাধিস্থানে একটি সুন্দর অট্টালিকা করিয়া দেন। ১৮০৮ খৃীস্টাব্দে এই অট্টালিকা প্রস্তুত হয় ও ইহা এখনও বর্তমান। প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু মুসলমান বড়বাজারের এই পীরস্থানে সিন্নি দিতে আসেন। কাশীনাথ চেষ্টা করিয়া গুমনসাহ বলিয়া এক ফকিরকে এই দরগার মতোয়ালিরূপে নিযুক্ত করেন এবং ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর পীরোত্তর সম্পত্তি দান করেন।

ওয়াজির আলির গোর

বামনবস্তী পুলিশ সেকসনের এলাকাধীনে কাশিয়াবাগানে ওয়াজির আলির গোর প্রতিষ্ঠিত। এই ওয়াজির আলি অযোধ্যার রাজবংশোদ্ভব। তাঁহার জীবনের আদ্যোপান্তই শোচনীয় ঘটনাময়, এজন্য তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। ইনি অযোধ্যার দাতা নবাব আসফউদ্দোলার পোষ্যপুত্র। নবাব আসফউদ্দোলা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে, 'যিস্কো না দে মৌলা, উসকো দে আসফউদ্দোলা।' ১৭৯৭ খৃীস্টাব্দে নবাব আসফউদ্দোলার মৃত্যু হয়। ওয়াজির আলি অযোধ্যার

---

১. বর্তমানে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ টিপু সুলতানের বাড়িতে অবস্থিত। টিপুর বংশধরগণ শুধু টালিগঞ্জেই নয়, কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া আছেন।

২. স্বাধীন ভারতে রাজন্যপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় প্রশাসনিক দায়িত্ব এই রাজবংশের উপর আর নাই।

সিংহাসনে বসেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা অপরাধে, তিনি সিংহাসনচ্যুত হয়েন ও নবাবের ঔরসজাত পুত্র সাদত আলি অযোধ্যার সিংহাসন পান। গবর্ণমেণ্ট রাজ্যচ্যুত ওয়াজির আলিকে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া বেনারসে যাইতে বলেন। এই সময়ে মিঃ চেরী বেনারসের রেসিডেণ্ট ছিলেন। তখন লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমল। মিঃ চেরি একদিন ওয়াজির আলিকে প্রাতরাশের জন্য নিমন্ত্রণ করেন (১৭৯৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি)। ওয়াজিরের মনে এক কু-উদ্দেশ্য জাগিয়া উঠে, যে তিনি মিঃ চেরীকে এই সুযোগে হত্যা করিবেন। তিনি অনেক পারিষদ সঙ্গে লইয়া চেরীর আবাসস্থানে উপস্থিত হন। এই সদস্যবর্গের মধ্যে অনেক গুণ্ডা বদমায়েস ছিল। তাহারা বস্ত্রের মধ্যে গোপনে অস্ত্রাদি লইয়া যায়। আহারাদির সময়ে সুযোগ পাইয়া, ওয়াজির আলি মিঃ চেরীকে আক্রমণ করেন।

মিঃ চেরী আক্রমণের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই এই অতর্কিত আক্রমণে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া কাপ্তেন কনওয়ে ও মিঃ গ্রেহাম বলিয়া আর দুইজন ইংরাজও নিহত হইয়াছিলেন। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর, ওয়াজির আলি সদলবলে বেনারসের জজ মিঃ ডেভিসের আলয়ে উপস্থিত হন।[১] এখানে যথাসম্ভব বাধা প্রাপ্ত হইয়া এই নরঘাতক নবাবপুত্র বেরারে পলায়ন করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেরার হইতে ধরিয়া আনিয়া কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আবদ্ধ রাখেন। সতর বৎসরকাল এইভাবে অবরুদ্ধ থাকিবার পর, প্লুরিসি বা বক্ষপ্রদাহ রোগে ৩৬ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়। তাঁহার সমাধির সময় মোটে ৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এইজন্য একজন ইংরাজ লেখক বলিয়া গিয়াছেন, "তাঁহার কবরের জন্য ৭০ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু ১৭৯৪ খৃীস্টাব্দে তাঁহার বিবাহের সময় নবাব আসফ-উদ্দৌলা ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন।" কলিকাতা কাশিয়াবাগানেই এই হতভাগ্যের সমাধি হয়।

জোব চার্নকের গোর

জোব চার্নকের সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা অনেক কথা বলিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বর্তমানে কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের সমাধির উপর একটি মসোলিয়াম বা সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সেণ্ট জন চার্চের সীমানার মধ্যে এই মসোলিয়াম প্রতিষ্ঠিত। আমরা ইহার একখানি প্রতিকৃতি পুস্তকে দিলাম। সম্ভবত ১৬৯৬ খৃীস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়। জোব চার্নকের মনুমেণ্টের উপর যে প্রস্তরফলকখানি আছে, তাহা লাটিন ভাষায় লিখিত। জোব চার্নক ১৬৫৫-৫৬ খৃীস্টাব্দে এদেশে আসেন। তৎপরে তিনি কাশিমবাজার কাউন্সিলের জুনিয়ার মেম্বর হন। কাশিমবাজার হইতে তিনি পাটনায় বদলি হন। এই অসমসাহসী জোব চার্নক কি প্রকার উদ্যমের সহিত বাঙ্গলার তৎকালীন নবাব সায়েস্তা খাঁর সহিত যুঝিয়াছিলেন, তাহার ইতিবৃত্ত আমরা পূর্বে বিস্তারিতভাবে দিয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয় কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের কোন প্রতিকৃতি আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে এই পুস্তকে তাঁহার স্বাক্ষরের একটি প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। যতদিন এই কলিকাতা মহানগরীর অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন জোব চার্নকের নাম ইহার স্থাপয়িতা রূপে সাধারণের স্মৃতিপথ বহির্ভূত হইবে না।

এড্‌মিরাল ওয়াটসনের গোর

কর্ণেল ওয়াটসনের বা এড্‌মিরাল ওয়াটসনের গোরও এই সেণ্ট জন গির্জার মধ্যে অবস্থিত। ইনি সিরাজের কলিকাতা দখলের পর বৎসর, ক্লাইভের সহিত একযোগে কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন।

১. মিঃ ডেভিস অসমসাহসের সহিত এই সময়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পরিজনবর্গকে তেতালার ছাদে তুলিয়া দেন ও একটিমাত্র বর্শা হস্তে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করেন। সিঁড়ির প্রবেশমুখেই এই যুদ্ধ হয়। পরিশেষে পরাজিত ওয়াজির আলি পলায়ন করেন। আমি বেনারসে অবস্থানকালে মিঃ ডেভিসের আত্মরক্ষার এই স্থানটি দেখিয়া আসিয়াছি। লর্ড কার্জন তাঁহার এই বিপত্তি-কাহিনী একখানি ট্যাবলেটে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ডেভিস সাহেবের এই কুঠিটি এখন কাশীনরেশের সম্পত্তি। ইহা 'নন্দেশ্বর-কুঠী' বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। এই বাটির সীমানার মধ্যে 'নন্দেশ্বর' বলিয়া এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

তাঁহার গোরের উপর লিখিত আছে—"এইস্থানে 'হোয়াইট' নামক রণপোতের ভাইস-এড্‌মিরাল ও ইংলণ্ডেশ্বরের নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি চার্লস ওয়াটসনের দেহ নিহিত আছে। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে ইনি গতাসু হন। ৪৪ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দ ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইনি গিরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ ১১ই জানুয়ারি ইনি কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩এ মার্চ ইনি চন্দননগর দখল করেন।" যাঁহারা ১৭৫৬ ও ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত, তাঁহাদের নিকট এই এড্‌মিরাল ওয়াটসন অপরিচিত নহেন।

সার্জন হ্যামিলটনের গোর

সার্জন হ্যামিলটনের নাম মোগল রাজত্বের ও কোম্পানির প্রথম আমলের ইতিহাস পাঠকের নিকট অপরিচিত নহে। ইনিই দিল্লীর সম্রাট ফেরোকসিয়ারের পীড়া আরাম করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধাকর কতকগুলি স্বত্বলাভ করিয়াছিলেন। এই সার্জন হ্যামিলটনের দিল্লীগমন প্রভৃতি ব্যাপারের একটি বিরবণ আমরা যথাস্থানে দিয়াছি। ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে ইনি কোম্পানি বাহাদুরের 'সেরবোরণ' নামক জাহাজের ডাক্তাররূপে ভারতে আসেন। ১৭১১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার বাণিজ্যকেন্দ্রে কোম্পানির অধীনে 'দ্বিতীয় চিকিৎসকের' (Second Surgeon) পদ লাভ করেন। কোম্পানি-বাহাদুর কর্তৃক সরম্যান প্রমুখ যে দৌত্যাভিযান সম্রাট ফেরোকসিয়ারের দরবারে ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেরিত হয়, হ্যামিলটন সেই অভিযানের চিকিৎসকরূপে দিল্লীতে গমন করেন। ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে বাদসাকে রোগমুক্ত করায় বাদসাহ তাঁহাকে প্রচুর পুরস্কার দেন, তদ্ব্যতীত তাঁহাকে কয়েকটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। এমন কি যে অস্ত্র সহায়তায় তিনি দিল্লীশ্বরের পীড়া আরোগ্য করেন, সেগুলিও বাদসাহ সোনা দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এই সুযোগে অন্যবিধ পুরস্কার প্রার্থনা না করিয়া স্বদেশহিতৈষী, স্বজাতির মঙ্গলকামী এই স্বার্থত্যাগী হ্যামিলটন সাহেব, ইংরাজ-কোম্পানির বাণিজ্যকার্যের সুবিধার উদ্দেশ্যে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার জন্য অনুমতি বা সনন্দ প্রার্থনা করেন। হ্যামিলটনের এইরূপ গরিমাময় আত্মত্যাগের জন্যই বর্তমান কলিকাতার প্রসার বৃদ্ধি হয়। এই তিনখানি গ্রামই কোম্পানির সৌভাগ্যলক্ষ্মী। দিল্লী হইতে প্রত্যাগমনের পরই ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। চার্নকের সমাধির নিকটেই ডাক্তার হ্যামিলটনের সমাধিটি অবস্থিত।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের গোর

এই কলিকাতা সহরে সার্কিউলার রোড সমাধিক্ষেত্রে, কবিকুলপিক মাইকেল মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভটিই বঙ্গবাসীর বিশেষ সম্মানের সমাধিক্ষেত্র। 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য-রচয়িতা, 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' প্রভৃতি খণ্ডকাব্য প্রণেতা, 'কৃষ্ণকুমারী' প্রভৃতি নাটক প্রণেতা, বঙ্গভাষার মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মদাতা, মাইকেলের জীবনের বিস্তৃত ঘটনা আজকাল শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট অপরিচিত নহে। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল জীবনী', কবীন্দ্র মধুসূদনের ঘটনাময় জীবনের নানাবিধ জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। মধুসূদনের জন্মস্থান যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রাম। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, জননীর নাম জাহ্নবী দাসী। মধুসূদন প্রথমাবস্থায় গ্রামের স্কুলে অধ্যয়ন কার্য শেষ করিয়া ইংরাজি শিক্ষার জন্য হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। ইংরাজি ভাষার সহিত এই নবীন যৌবনে তিনি গ্রীক ও লাটিন ভাষাও শিক্ষা করেন। হিন্দু মধুসূদন ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টিয়ান-ধর্ম অবলম্বন করেন। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজে চলিয়া যান। মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তিনি 'Captive Lady' বলিয়া একখানি ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই ইংরাজি গ্রন্থখানি তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। মান্দ্রাজ প্রবাস কালেই মধুসূদন মান্দ্রাজ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহে-

বের কন্যার১ পাণিগ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতে এই রমণীর সহিত বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন২ হইলে, হেনরিয়েটা নাম্নী আর এক ইংরাজ রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।৩

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় আসার পর, জীবিকার্জনের জন্য প্রথমে তাঁহাকে পুলিস-কোর্টে চাকুরি গ্রহণ করিতে হয়। এই সময়েই মধুসূদনের কাব্যময় জীবনে মধুর ঝঙ্কার উঠে। মধুসূদন প্রথমে 'রত্নাবলী' নাটকের এক ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। আগে মধুসূদন বঙ্গভাষার চর্চায় বিমুখ ছিলেন। কিন্তু তিনি বাণীর বরপুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এজন্য স্বয়ং বীণাপাণি তাঁহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার সাহিত্যিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। দুই তিন বৎসরের মধ্যে মধুসূদন, 'কৃষ্ণ-কুমারী', 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটক, 'একেই কি বলে সভ্যতা' (প্রহসন), 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (প্রহসন), 'মেঘনাদবধ', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য প্রভৃতি রচনা করেন। যাঁহারা মধুসূদনের এই সমস্ত গ্রন্থাবলীর সহিত পরিচিত, তাঁহাদিগকে কবিবরের অমানুষিক প্রতিভার নূতন পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন ব্যারিস্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। এই প্রবাসজীবনে ভাগ্যবিড়ম্বনায় তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এই সময়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য না করিলে তিনি বড়ই বিপদে পড়িতেন। মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার প্রবাসকালে সুদূর ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে লিখিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। মধুসূদন বড়ই অর্থব্যয়ী ছিলেন। বুঝিয়া সুঝিয়া চলিতে পারিতেন না। এই জন্য তাঁহার ভয়ানক অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘটে। ব্যারিস্টারি কার্যে মধুসূদন কোন উন্নতিই করিতে পারেন নাই। পত্নীবিয়োগের পর মধুসূদনের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। রোগের চিকিৎসার উপযুক্ত পরিমান অর্থ না থাকায়, তিনি জেনারেল হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ জুন রবিবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার জীবনান্ত হয়।৪ মধুসূদন দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না। কিন্তু শেষ জীবনে বাঙ্গলার এই অমর কবিকে অর্থাভাবে সাধারণ হাসপাতালে দেহত্যাগ করিতে হইয়া ছিল। মৃত্যুর পূর্বে মধুসূদন তাঁহার পুত্র-কন্যাদির ভার তাঁহার প্রিয়বন্ধু স্বনামখ্যাত ব্যারিস্টার স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের উপর দিয়া যান। মনোমোহন বাবুও পুত্রবৎ স্নেহে পুত্র অ্যালবার্ট নেপোলিয়ানকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। মধুসূদনের এই পুত্র এখন গবর্ণমেণ্টের অধীনে Opium Agent এর উচ্চপদে নিযুক্ত।৫

মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ মহাত্মাগণের চেষ্টায় ও সাধারণের চাঁদায় সার্কিউলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে মধুসূদনের যে সমাধিস্থান আছে, তাহার উপর নিম্নলিখিত প্রস্তরফলক তাঁহার স্মৃতি-চিহ্নরূপে সংযোজিত।

দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে.
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত

দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী, কপোতাক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১. ইঁহার নাম রেবেকা ম্যাকটাভিস। প্রকৃতপক্ষে ইঁহার পিতা একজন নীলকর ছিলেন।

২. এ পর্যন্ত লব্ধ তথ্যাদি হইতে প্রতীয়মান যে, রেবেকার সহিত মধুসূদনের বিবাহবন্ধনে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তবে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন।

৩. হেনরিয়েটা—পুরা নাম এমিলিয়া হেনরিয়েটা সোফিয়া। ইনি ফরাসী নারী। সুখে দুঃখে আমৃত্যু ইনি মধুসূদনের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। ইঁহার কবর মধুসূদনের কবরের পার্শ্বেই অবস্থিত।

৪. মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যুর তারিখ ২৯শে জুন, ১৮৭৩ খ্রী.।

৫. বর্তমানে অ্যালবার্ট নেপোলিয়ান দত্ত লোকান্তরিত।

পাইকপাড়া রাজবংশ (দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ)

এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের পূর্বের বাসস্থান মুরশিদাবাদ জিলায় কান্দিগ্রামে ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম হরকৃষ্ণ সিংহ। তিনি মুসলমান রাজগণের আমলে প্রচুর ধনসংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাঁর পৌত্র বিহারীর দুই পুত্র রাধাগোবিন্দ ও গঙ্গাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দ নবাব আলিবর্দি খাঁ ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীনে খাজনা-সংক্রান্ত পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ভবিষ্যৎকালে খাজনা সংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তে যাওয়াতে তিনি এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ায় পুরস্কার স্বরূপ একটি 'সইয়ারমহল' অর্থাৎ হুগলীতে বাণিজ্যের শুল্ক আদায়ের স্বত্ব পাইয়াছিলেন।

১৭৯০ খৃস্টাব্দে এই 'সইয়ারমহল' ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার বদলে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁদিগকে হুগলীতে বাৎসরিক ৩৬৯৮ টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই বংশের বংশধরগণ আজিও সেই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তৎকালের বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে দক্ষতা লাভ করেন। এজন্য তিনি গবর্ণমেণ্টে সম্মানিত হন। তাঁহার দানশীলতা সুবিখ্যাত। মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাকে 'দেওয়ান' পদে নিযুক্ত করেন এবং সুবা-সংক্রান্ত বন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ মৃত্যু-কালে পুত্র প্রাণকৃষ্ণের ভার জ্যেষ্ঠ রাধাগোবিন্দের হস্তে ন্যস্ত করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আমলেই পাইকপাড়া রাজবংশ যথেষ্ট ধনশালী হইয়াছিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যেরূপ যশঃসঞ্চয় করেন, গঙ্গাগোবিন্দের মনেও সেইরূপ একটা যশসঞ্চয়ের অভিলাষ হয়। মহম্মদ রেজা খাঁ যখন বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা, গঙ্গাগোবিন্দ সেই সময়ে তাঁহার অধীনে প্রধান কর্মচারী বা কানুনগো পদে নিযুক্ত ছিলেন। গবর্ণর হেস্টিংস সাহেব তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এজন্য গঙ্গাগোবিন্দ এই কাজে ক্রমে ক্রমে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে গঙ্গাগোবিন্দের চাকরী যায়। এই সময়ে কাউন্সিলের সদস্যেরা বিরোধী হওয়ায় ও নন্দকুমার হেস্টিংসের প্রতিযোগিতা করায় কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার একচ্ছত্র ক্ষমতার হ্রাস হয়। হেস্টিংস পূর্ব ক্ষমতা লাভ করিলে গঙ্গাগোবিন্দ পুনরায় তাঁহার দেও-য়ান রূপে নিযুক্ত হন। তখন এদেশে 'দশশালা বন্দোবস্ত' প্রচলিত হয় নাই।[1] প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর জমিদারি সমূহ জমিদারের সহিত বিলি বন্দোবস্ত হইত। এই সময়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হস্তে এইরূপ বন্দোবস্তের ভার পড়ায় তিনি কমলার কৃপানেত্রে পতিত হন। জমিদারেরা গঙ্গা-গোবিন্দের এইরূপ একচ্ছত্র ক্ষমতাবৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহাকে বড়ই ভয় করিয়া চলিতেন। গঙ্গাগোবিন্দকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে কাহারও জমিদারি থাকিত না। এমন কি নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দের কৃপাভিখারী হইয়াছিলেন। নদীয়া রাজসংসারে কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের একটি পুরাতন প্রবাদ বাক্যই এই—'দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য, ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ।' গঙ্গা-গোবিন্দ দুর্গাপূজা, দোল, রাস, পূজা-পার্বণ প্রভৃতি কার্যেই যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। নিত্য নৈমিত্তিক দান, ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর প্রদান, দেবসেবা, দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও অতিথি সেবার বন্দোবস্ত প্রভৃতি ছাড়া মাতৃশ্রাদ্ধ ও পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্রের (লালাবাবুর) অন্নপ্রাশনের সময় তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার রাজসূয় যজ্ঞের

১. ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া আসিবার কালে তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকবর্গ তাঁহাকে এদেশে 'দশশালা বন্দোবস্ত' প্রচলিত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত তিনি 'দশশালা বন্দোবস্ত' কার্যে পরিণত করেন নাই, তৎপরিবর্তে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (Permanent Settlement)-এর জন্য সুপারিশ পরিচালকবর্গের নিকট প্রেরণ করেন এবং ২২ মার্চ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

মত হইয়াছিল। নানাদেশ হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আহূত ও অনাহূত ব্যক্তিগণ এই শ্রাদ্ধ দেখিতে আসিয়াছিলেন। পথে যে কোন লোক বলিত, "দেওয়ানবাড়ির শ্রাদ্ধ দেখিতে যাইতেছি", চটীওয়ালারা তাহাদিগকে বিনামূল্যে সিধা ও থাকিবার স্থান দিত। অবশ্য গঙ্গাগোবিন্দের বন্দোবস্তেই এরূপ হইয়াছিল। এই সমারোহ ব্যাপারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু তিনি নিজে না আসিয়া পুত্র শিবচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। শিবচন্দ্র দেখিলেন, "গঙ্গাগোবিন্দ যে ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতই রাজসূয় ব্যাপার।" কিন্তু সকল কার্যেই যেন একটা সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার অভাব। গঙ্গাগোবিন্দ আত্মগরিমায় মত্ত হইয়া কুমার শিবচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত আয়োজনই দেখাইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন দেখিলেন কুমার?' শিবচন্দ্র রহস্য করিয়া বলিলেন, 'হাঁ যা দেখিলাম, তাহা যেন দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার বলিয়াই বোধ হইল।' গঙ্গাগোবিন্দ কিন্তু হটিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, 'না কুমার! এ ত দক্ষযজ্ঞ নয়। তার চেয়েও একটা বড় ব্যাপার। দক্ষযজ্ঞে শিবের অধিষ্ঠান হয় নাই। কিন্তু আমার এ মাতৃযজ্ঞে স্বয়ং শিব অধিষ্ঠিত।' বলা বাহুল্য শিবচন্দ্র এই কৌশলময় উত্তরে একটু অপ্রতিভ হইলেন। পৌত্রের অন্নপ্রাশনের সময় গঙ্গাগোবিন্দ ব্রাহ্মণদিগকে স্বর্ণপত্রে খোদিত লিপি দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

দেওয়ান প্রাণকৃষ্ণ জমিদারি কার্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার দয়া এবং দানশীলতা প্রসিদ্ধ। তাঁহার পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু। ইনি কিছুকাল বর্ধমান ও কটকের কলেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। লালাবাবু যৌবনেই সাংসারিক কার্য হইতে অবসর লইয়াছিলেন এবং যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। বহুদিন তীর্থভ্রমন করিবার পর তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কয়েকটি আখ্যান পাঠকবর্গের শুনিয়া রাখা উচিত। লালাবাবুর বৈরাগ্য সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এ সম্বন্ধীয় অনেক গল্পের মূলে আবার সত্য ঘটনাও নিহিত থাকে। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে লালাবাবু তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ধীবর তাহার সঙ্গীকে ডাকিতেছিল, 'ওরে বেলা গেল যে! পারে কখন যাবি রে?' সে বোধ হয় গঙ্গার ওপার হইতে এ পারে মাছ বেচিতে আসিয়াছিল। আর তাহার কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় তাহার সঙ্গীকে এভাবে আহ্বান করিতেছিল। লালাবাবু এই সামান্য কথাটার মধ্যে একটা গভীর ভাব দেখিতে পাইলেন। তিনি যেন ভগবৎ-প্রেরিত সঙ্কেত-বাণীতে শুনিলেন, ভগবান তাঁহাকেই যেন এই সঙ্কেত কথায় সাবধান করিয়া দিলেন। তিনি মনে জানিলেন, 'আমারও ত দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, পারে যাইবার সময় হইয়াছে।' এই কথায় তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় তিনি বৃন্দাবন চলিয়া যান। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ বাক্য এই, প্রথম যৌবনে পিতার সহিত মনোবাদ হওয়ায় ইনি স্বাধীনভাবে জ[illegible] জন্য, বর্ধমান জেলার সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। তৎপরে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ইনি সরকারি বন্দোবস্তী মহলসমূহের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। একটা জমিদারি পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পথে সন্ধ্যার সময় এক গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হন। সেইস্থানে শুনিলেন এক রজক-কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে, 'বাবা বেলা যে গেল। বাসনায় আগুন দাও।' সেকালে কলার-বাসনার ক্ষারে কাপড় কাচা হইত বলিয়া, রজক-কন্যা তাহার পিতাকে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু লালাবাবু মনে মনে ভাবিলেন, 'কই আমার ত জীবনের বেলা গেল। দিন ত শেষ হইয়া আসিতেছে। বাসনার দাস হইয়া সুখে ও বিলাসে জীবন কাটাইতেছি, বাসনায় আমি আগুন ধরাইতে পারিলাম কই?'

ত্রিশ বৎসর বয়সে লালাবাবু মথুরাবাসী হয়েন। ধনী-সন্তানের এরূপ অদ্ভুত বৈরাগ্য, বাঙ্গালীর ইতিহাসে অতি দুর্লভ। বৃন্দাবনে লালাবাবুর নাম এবং তাঁহার কীর্তিকলাপ এখনও পূর্ণশক্তিতে সঞ্জীবিত আছে। কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া এক বিগ্রহ ও তৎসংলগ্ন সেবাবাড়ি তাঁহার ব্যয়ে এখনও পরিচালিত হইয়া তাঁহার কীর্তি-ঘোষণা করিতেছে। আজও পর্যন্ত এখানে সদাব্রত ব্যবস্থা আছে। এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রাজপুতানা হইতে মার্বেল পাথর আনাইয়া এই বিগ্রহ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই মন্দির-প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে লালাবাবুকে এক মহাবিপদে পড়িতে হইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ওরফে লালাবাবু, এই সময়ে পছন্দমত প্রস্তর ক্রয় করিবার জন্য স্বয়ং রাজপুতানায় যান। তখন স্বনামপ্রসিদ্ধ লর্ড মেটকাফ রাজপুতানার পলিটিকাল-রেসিডেণ্ট। এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ হইতে তিনি রাজপুতানার কয়েকটি রাজাকে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। লালাবাবুও তখন রাজপুতানায় ছিলেন। রাজপুতানার একজন স্থানীয় রাজা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হওয়ায়, লর্ড মেটকাফের মনে সন্দেহ হয় যে লালাবাবু তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিয়া বিরুদ্ধাচারী করিয়াছেন। এই সন্দেহবশে তিনি লালাবাবুকে দিল্লীতে লইয়া যান। সেইখানে তাঁহার অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান হওয়ায় প্রকাশ পায়, যে তিনি সেই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। স্যর চার্লস লালাবাবুর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, তৎকালীন দিল্লীর সম্রাটের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন। দিল্লীশ্বর লালাবাবুর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে 'মহারাজা' উপাধি দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, লালাবাবু বলেন, 'সম্রাট! আমি সর্বত্যাগী ভিখারী। উপাধির লোভ ও ইহলোকের গর্বচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াই আমি বৈরাগ্য-মার্গ অবলম্বন করিয়াছি। রাজোপাধিতে আমার আর কোন প্রয়োজন নাই।'

চল্লিশ বৎসর বয়সে লালাবাবু বৈষ্ণব-শাস্ত্রোক্ত 'মাধুকরী' ব্রতাবলম্বন করেন। এই সময় হইতে ইনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। মাত্র একমুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন উদর পোষণার্থে তাঁহার নিত্য প্রয়োজন হইত। ইহার অতিরিক্ত ভিক্ষা তিনি কখনই করিতেন না।

মথুরার শেঠেরা বিখ্যাত ধনী। অভিমান বশে তিনি এতদিন শেঠ বাড়িতে ভিক্ষা করিতে যান নাই। একদিন সহসা তাঁহার মনে হইল, "কই! এখনও ত অভিমান দমন করিতে পারিলাম না। এক সময়ে অতুল ঐশ্বর্যের উপর বসিয়াছিলাম, তাহার ত সবই ত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু এখনও ত আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে পারি নাই। তাই যদি পারিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই শেঠগৃহে ভিক্ষা করিতে যাইতাম। যে শেঠেরা আমায় দেখিলে ইতিপূর্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, তাহাদের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে যাইতে যখন আমার এত আপত্তি, তখন বুঝিতেছি এখনও আমি প্রবৃত্তির দাস হইয়া আছি। আত্মাভিমান দম্ভের মূর্তিভেদ বইত কিছুই নয়।" এই সব চিন্তায় কাতর হইয়া সেইদিনই তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে শেঠগৃহে উপস্থিত হইলেন। শেঠেরা তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া, বাষ্পালোচনে মহাসমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। আর তিনি শেঠবাড়িতে মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রসন্নমুখে চলিয়া আসিলেন।

গল্পচ্ছলে লালাবাবুর জীবনের অনেক কথা, আজও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ ভক্তমালের বঙ্গানুবাদকারী, পবিত্রচেতা কৃষ্ণদাস বাবাজী লালাবাবুর ধর্মোপদেষ্টা গুরু ছিলেন বলিয়া একটা প্রবাদ শোনা যায়।

বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি লালাবাবুর এত গভীর অনুরাগ ছিল যে, তাহা একরূপ গোঁড়ামিতে পরিণত হইয়াছিল। যখন বজরা করিয়া গঙ্গার উপর দিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন, সেই সময়ে মহাপবিত্র শাক্ততীর্থ বারাণসীতে অবতরণ করেন নাই। পাছে নদীগর্ভ হইতে বারাণসীর কায়া দেখিতে হয়, এজন্য ভৃত্যদিগকে তাঁহার বজরার জানালার পর্দাগুলি ফেলিয়া দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। অনেকে বলেন এইজন্য তাঁহার অপঘাতমৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুকাহিনীর প্রবাদটিও অতি অদ্ভুত। একজন দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলেন যে, 'ক্ষুরে' তাঁহার অপমৃত্যু হইবে। এজন্য এই অতর্কিত অপঘাত মৃত্যুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ক্ষৌরকর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করেন। কিন্তু ভাগ্যরেখার শক্তি অতিক্রম করিবার ক্ষমতা ত ক্ষুদ্র মানবের নাই। একদিন লালাবাবু বৃন্দাবনের রাজপথে ভিক্ষার্থে বাহির হইয়াছেন। তখন তিনি মৌনব্রতাবলম্বী সন্ন্যাসী মাত্র। কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্তা কহেন না। সেই সময়ে গোয়ালিয়রের মহারাণী রাজপথ দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে লোকজন এবং অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। লালাবাবুর ধর্মময় জীবনের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার পদধূলি লইবার জন্য বহুদিন হইতেই ব্যগ্র ছিলেন। রাণী পাল্কি

হইতে নামিয়া পদবন্দনার জন্য, লালাবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হন। লালাবাবু রাণীকে পদস্পর্শ করিতে দিবেন না এই ভাবিয়া যেমন পশ্চাৎ দিকে হাঁটিয়া যাইবেন, সেই সময়ে রাণীর কোন অশ্বারোহীর একটা ঘোড়া সহসা ক্ষেপিয়া উঠায়, তাহার ক্ষুরের আঘাতে তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হন। এই আঘাত পরিণামে সাংঘাতিক অবস্থা ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া দেয়। অন্য একটি প্রবাদমতে, গিরি-গোবর্ধনের নিভৃত গুহায় তিনি যোগসাধনে ও ভগবচ্চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। এই সময়ে একদিন সহসা পিচ্ছিল প্রস্তর-পথে পদস্খলন হওয়ায় তিনি ভূপতিত হইয়া আহত হন। তাহাতেই তাঁহার দেহান্ত ঘটে। যাহাই হউক না কেন, লালাবাবুর যে অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়াছিল এ কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত। এই দানবীর, কর্মবীর, ধর্মবীর লালাবাবু বা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ৪০ বৎসর বয়সে হিন্দুর পুণ্যময় বৈকুণ্ঠতীর্থে দেহ রক্ষা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বা লালাবাবুর পত্নীর নাম রাণী কাত্যায়নী। রাণী কাত্যায়নীর পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণ অপুত্রক হওয়ায় রাজা প্রতাপ সিংহ ও রাজা ঈশ্বর সিংহকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ শ্রীনারায়ণের জ্যেষ্ঠ দত্তক-পুত্র। রাজা প্রতাপ সিংহের আমলে পাইক-পাড়া রাজবংশের যশপ্রভা চারিদিকে প্রচারিত হয়। ১৮৫৪ খৃীস্টাব্দে ইনি রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সি, আই, ই, উপাধিও তিনি লাভ করেন। প্রতাপ সিংহও পিতামহের ন্যায় অনেক সৎকার্যে দান ধ্যান করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মেডিকেল কলেজে ফিভার-হাসপাতাল বা জ্বর-রোগীদের আশ্রয়স্থান নির্মাণার্থে তিনি প্রচুর মুদ্রাদান করেন। পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগেছিয়ার বাগান (Belgachia Villa) একটি সুন্দর রম্যোদ্যান। এখানে আদম এবং ইভের একখানি বহুমূল্য প্রাচীন তৈলচিত্র আছে। ১৮৭৫ খৃীস্টাব্দে আমা-দের স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স অব ওয়েলস রূপে এদেশে আসেন, তখন এই বেলগেছিয়া ভিলায় বঙ্গবাসী ধনী সন্তানগণ তাঁহাকে একটি প্রীতিভোজ প্রদান করেন। ধরিতে গেলে এই বেলগেছিয়া উদ্যানই বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্মভূমি। স্টেজ বাঁধিয়া সাধারণের সম্মুখে অভিনয় করার চেষ্টা পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপ সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র ও মহারাজা-বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টাতেই হইয়াছিল। মাইকেলের অনেক নাটক এই বাগানে প্রথম অভিনীত হয়। বর্তমান প্রণালীর এদেশীয় ঐক্যতানবাদন বা 'কনসার্ট' এই বেলগেছিয়ার বাগানেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।[১]

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র গীতবাদ্যাদির বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বেলগেছিয়ার বাগানে 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়।[২] রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ৩৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র নামে চারি পুত্র হয়। শরৎচন্দ্রের পুত্রের নাম বীরেন্দ্রচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র ১৮৮৭ খৃীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইনি পৈতৃক বাসস্থান কাঁদিগ্রামে একটি হাসপাতাল পরিচালনার জন্য এক লক্ষ পনের হাজার টাকা প্রদান করেন। কুমার পূর্ণচন্দ্র ১৮৮৫ খৃীস্টাব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন ও ১৮৯০ খৃীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র কুমার ইন্দ্রচন্দ্র প্রথমে অতি ভোগবিলাসী ছিলেন। এক সময়ে সমগ্র কলিকাতা রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের ঐশ্বর্যগরিমা প্রকাশে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। হ্যারিংটন স্ট্রীটে এক প্রাসাদতুল্য বাটিতে রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাস করিতেন। ঐশ্বর্যজনিত ভোগবিলাসে বিতৃষ্ণা জন্মিলে, তিনিও তাঁহার পূর্ব-পুরুষ লালাবাবুর মত সংসার-বিরাগী হয়েন। 'বোধানন্দনাথ স্বামী' নাম ধারণ করিয়া জীবনের

---

১. প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৫ খ্রী. অব্দে রুশ পর্যটক লেবেডফের প্রচেষ্টায় ডোমতলায় মঞ্চ নির্মাণ করিয়া যে অভিনয় (দুইখানি অনূদিত নাটক) হয়, তাহাতে ঐকতান বাদন প্রথম প্রয়োগ করা হয়।

২. বস্তুত মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকখানি (প্রকাশকাল ১৮৫৮ খ্রী.) বেলগেছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, কেন না ইহার পর মধুসূদন যে দুইখানি প্রহসন ('বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা') এবং একখানি নাটক ('পদ্মাবতী') রচনা করেন, সেগুলি বেলগেছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয় নাই। বেলগেছিয়া রঙ্গমঞ্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর (২৯ মার্চ ১৮৬১ খ্রী.) পর বন্ধ হইয়া যায়।

শেষাবস্থায় তিনি নানাস্থানে সন্ন্যাসীবেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে রাজা ইন্দ্রচন্দ্রের দেহান্ত হয়। এখন কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ তাঁহার বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ-রূপে অবস্থান করিতেছেন।[১]

এই পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কোম্পানির আমলে একজন ক্ষমতাপন্ন ও গণনীয় লোক ছিলেন। দান, ধ্যান ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা এই রাজবংশের প্রধান কীর্তি। ইতিহাসে গঙ্গাগোবিন্দের সুনাম না থাকিলেও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ ও তাঁহার বংশধরগণের গৌরব-কীর্তি ও দানশৌণ্ডতা তাঁহার নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কোম্পানির আমলে যে সমস্ত শক্তিমান মনস্বী বাঙ্গালী জন্মিয়াছিলেন, বর্তমানকালে তাঁহাদের আদর্শ অতি দুর্লভ। তাঁহাদের দোষও অনেক ছিল কুকীর্তিও অনেক ছিল, কিন্তু সর্ববিষয়ে তাঁহারা অসীম ক্ষমতাবান ছিলেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ মহারাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মহারাজ নন্দকুমার রায় প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পাইকপাড়া রাজবংশ সম্বন্ধে বলিবার আরও অনেক কথা থাকিলেও, স্থানাভাবে অতি সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল।

নাটোর রাজবংশ[২]

ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কামদেব রায়, লস্করপুর পরগনার মৌজা নাটোরে বাস করিতেন। তিনি নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে বারাইহাটির তহশীলদার নিযুক্ত হন। এই নরনারায়ণ পুটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কামদেবের তিন পুত্র, রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণুরাম। ইহাদিগের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠটি কামদেবের জীবিতাবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। রঘুনন্দন প্রথমে দর্পনারায়ণের (নরনারায়ণের কনিষ্ঠভ্রাতা) মোক্তার ছিলেন, পরে মুসলমানদিগের আইন-কানুনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তিনি নায়েব কানুনগো হন। অতঃপর তিনি নবাব মুরশিদকুলি খাঁর রায়রায়ান[৩] এবং দেওয়ানের অর্থ-সচিব পদ লাভ করেন। সরকারি জমির বন্দোবস্তে এবং অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কার্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, তিনি নবাব সরকার হইতে রাজা উপাধি এবং জমিদারি লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে রাজা রঘুনন্দন এই সম্পত্তিটি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামজীবনকে প্রদান করেন। রামজীবনও ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। কালক্রমে তিনি ভিতারিয়ার জমিদার রামকৃষ্ণ, বনগাছি পরগনার চৌধুরী ভগবতী ও গণেশনারায়ণ, রাজসাহীর রাজা উদিতনারায়ণ, ভুষণার জমিদার রাজা সীতারাম রায় প্রভৃতির জমিদারির উত্তরাধিকারী না থাকাতে, অথবা রাজস্ব প্রদানের অসামর্থ্যের জন্য সেগুলি নিজের জমিদারিভুক্ত করেন। অবশেষে এই জমিদারি এত বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে বঙ্গের সমস্ত প্রধান প্রধান জেলায় এমন কি মুঙ্গের এবং ভাগলপুরেও রামজীবনের অধিকার বিস্তৃত হয়। ইহার বার্ষিক আয়ের পরিমাণ প্রায় দুই কোটি টাকা এবং মুসলমান রাজসরকারে দেয় রাজস্বের পরিমাণ ৫২,০০০—৫৩,০০০ টাকা ছিল।

১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে রাজা রামজীবন দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর-সাহের নিকট হইতে রাজা-বাহাদুর উপাধির সনন্দ ও অসংখ্য খিলাত লাভ করেন এবং রাজছত্র, দণ্ড, জয়ঢক্কা প্রভৃতি ব্যবহার করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হন। রাজা রামজীবন এবং রাজা রঘুনন্দন উভয়েই তাঁহাদের জমিদারির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জমিদারি মধ্যস্থ দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয়বিধ শাসনভারই স্বহস্তে লইয়াছিলেন। এক কথায় তাঁহারা তখন বঙ্গদেশের একাংশের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। রাজা রামজীবনের পত্নী রামকান্ত রায়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজা রামকান্তও মৃত্যুকালে নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার দুই শিশু পুত্র তাঁহার জীবিতকালেই দেহত্যাগ করে। এই রামকান্তের পত্নীই বঙ্গবিশ্রুতা

১. কুমার অরুণচন্দ্র বর্তমানে লোকান্তরিত।

২. নাটোর বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত।

৩ রায়রায়ান—Principal officer of the *Khalsa* or revenue department—N. K. Saha, *Economic History of Bengal*, Vol II, p. I.

মহারাণী ভবানী। মহারাণী ভবানী তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর ৫৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব কীর্তিকাহিনী কেবল বাঙ্গলায় নহে ভারতের অধিকাংশ স্থানেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত। কথিত আছে, এই প্রাতঃস্মরণীয়া বঙ্গমহিলা পুণ্যকার্যে এবং দানে পঞ্চাশ কোটিরও উপর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণ সাবালক হইয়া সমস্ত জমিদারির পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সম্রাট শাহ-আলমের নিকট হইতে 'মহারাজাধিরাজ-পৃথ্বীপতি-বাহাদুর' উপাধিপ্রাপ্ত হন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সময়ে, স্বকীয় জমিদারির অধীনস্থ তালুকদারগণের ব্যবহারে বীতরাগ হইয়া মহারাজা রামকৃষ্ণ জমিদারিকার্যে অমনোযোগী হইয়া পড়েন এবং সমস্ত মনোযোগ ধর্মার্জনে উৎসর্গ করেন। এই অবসরে তাঁহার ভৃত্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সর্বনাশ সাধন করিয়া স্ব স্ব ভাগ্যগঠনে সচেষ্ট হন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ জমিদারি সংস্থাপনও করিয়াছিলেন। এই শেষোক্তগণের মধ্যে নড়াল রাজবংশের কালীশংকর রায় এবং দীঘাপতিয়া রাজবংশের দয়ারাম রায়ই প্রধান। ইহাঁরা উভয়েই নাটোর-রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন।

রাজা রামকৃষ্ণের এই ঔদাসীন্য দেখিয়া মহারাণী ভবানী পুনরায় জমিদারিকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু নবাব সরকার তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। এই সময়েই তাঁহার সুবিশাল জমিদারি কতকগুলি পরগনা ও ডিহিতে বিভক্ত হইয়া [১] বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

মহারাজা রামকৃষ্ণ ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দুই পুত্র কুমার বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। এই সময়ে জমিদারির আয় মাত্র ২৭,০০,০০০ টাকায় পর্যবসিত হইয়াছিল। মহারাজা রামকৃষ্ণ তাঁহার জমিদারি পূর্বেই পুত্রদ্বয়ের মধ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ মহারাজা বিশ্বনাথ ১৮,০০,০০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং কনিষ্ঠ মহারাজা শিবনাথ সমস্ত দেবোত্তর ও লাখেরাজ জমিদারি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর অংশের বার্ষিক মোট লাভ ৯,০০,০০০ টাকা। মহারাজা বিশ্বনাথ ও মহারাজা শিবনাথ উভয়েই বিষয়কার্যে অত্যন্ত অমনোযোগী ছিলেন। তাঁহাদিগের জমিদারির অবস্থাও উত্তরোত্তর দুর্দশাপন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল।

মহারাজা বিশ্বনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী কৃষ্ণমণি মহারাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজা গোবিন্দচন্দ্র সাবালক হইবার অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন। তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার পত্নী মহারাণী শিবেশ্বরী মহারাজা গোবিন্দনাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। মহারাজা গোবিন্দনাথও অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করায়, তাঁহার পত্নী জগদীন্দ্রনাথ রায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কুমার জগদীন্দ্রনাথ ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে 'মহারাজা' উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনিই এক্ষণে নাটোর রাজবংশের বড় তরফের উজ্জ্বল কোহিনূর।[২]

অনারেবল মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ একজন সাহিত্যসেবী। লাট-কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি দেশের হিতসাধন করিতে সর্বদাই অগ্রসর। নানাবিধ লোকহিতকর সভাসমিতিতেও তিনি মহোৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার করিয়াছেন। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের মধ্যে বাণীর এরূপ একান্ত সেবক অতি অল্পই আছেন।[৩]

মহারাজা শিবনাথের কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার বিধবা পত্নী কুমার আনন্দনাথকে

১. ওয়েস্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন—ভূষণার তালুকই বহুবিধ পরগনার বিভক্ত হইয়া বিক্রয় হইয়া যায়। নলদী, সাহজালাল, সাতোড়, মুকিমপুর প্রভৃতি বড় বড় তালুকগুলিও এই দশাপ্রাপ্ত হয়। আড়পাড়ার বড় তালুকখানি গোবরডাঙ্গা জমিদার বংশের আদিপুরুষ খেলারায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্রয় করেন। ঠাকুর বংশের পূর্বপুরুষ গোপীমোহন ঠাকুর, কানেশাপুর ডিহি সারুপুর তালুক কিনিয়া লয়েন।—Westland's *Jessore* p. 63.

২. কুমার জগদীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬৮, মৃত্যু ১৯২৬ খ্রী.

৩. 'মানসী' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ থেকে জগদীন্দ্রনাথ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর পরে 'মর্মবাণী' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হইবার ফলে 'মানসী ও মর্মবাণী' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমৃত্যু জগদীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনাকার্যে যুক্ত ছিলেন।

পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনিও নানা সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে রাজা আনন্দনাথ তাঁহার পিতামহের অধিকৃত 'মহাজারাধিরাজ-পৃথ্বীপতি-বাহাদুর' উপাধি লাভ করিবার নিমিত্ত সরকার বাহাদুরের নিকট দরখাস্ত করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, এস, আই, উপাধি প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরেই রাজসাহী লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার অন্যান্য সৎকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। রাজা আনন্দনাথ ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার চারি পুত্র, কুমার চন্দ্রনাথ, কুমার কুমুদনাথ, কুমার নগেন্দ্রনাথ ও কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায়। কুমার চন্দ্রনাথ রায় ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরে জীবদ্দশায় তাঁহার দুই ভ্রাতা—কুমার কুমুদনাথ রায় ও নগেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হয়। রাজা চন্দ্রনাথও নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর ছোট তরফের সমস্ত সম্পত্তি কুমার যোগেন্দ্রনাথেরই অধিকারে আইসে। যোগেন্দ্রনাথের পুত্রের নাম কুমার যতীন্দ্রনাথ।

নদীয়া রাজবংশ : মহারাজ-রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়

নদীয়া রাজবংশের রায়-রাজগণ, স্বনাম প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ-ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ পুত্র নিপু হইতে তাঁহাদিগের বংশ গণনা করেন।

আদিশূর তাঁহাকে যে কয়খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন ভট্টনারায়ণ সেই কয়টি এবং তাঁহার স্বক্রীত গ্রামগুলি একত্র মিলাইয়া একটি জমিদারি গঠিত করিয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণের অধঃস্তন ত্রয়োদশ পুরুষোদ্ভূত বিশ্বনাথ প্রথমে গৌড়াধিপতির নিকট কর্মপ্রার্থী হইয়া গমন করেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাৎসরিক করপ্রদানে স্বীকৃত করাইয়া লইয়া, নদীয়ার রাজপদ ও কাঁকদি প্রভৃতি পরগনা প্রদান করেন। ইহাঁর অধস্তন পুরুষগণের নাম—রামচন্দ্র সুবুদ্ধি, ত্রিলোচন, কংসারি, ষষ্ঠীদাস ও কাশীনাথ। কাশীনাথের আমলে কোন এক সময়ে সম্রাট আকবরের নিকট কররূপে, ত্রিপুরারাজ কয়েকটি হস্তী উপঢৌকন প্রেরণ করেন। কথিত আছে, এই হস্তীযূথের মধ্যে একটি হস্তী সহসা উন্মত্ত হইয়া নদীয়ার অধিবাসিগণের বিস্তর অনিষ্ট করায়, রাজা কাশীনাথ তাহাকে হত্যা করেন। প্রবাদ আছে যে, কাশীনাথের দ্বারা বাদসাহী হস্তী নিহত হওয়ায় নবাব তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন। যাহাই হউক, এই সময়ে কাশীনাথের পত্নী অন্তর্বত্নী ছিলেন। তিনি পলায়ন করিয়া হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেইখানেই এক পুত্র প্রসব করেন।

এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষা ও স্বভাবচরিত্র গুণে হরেকৃষ্ণের প্রিয় হওয়াতে, হরেকৃষ্ণ মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে পোষ্যপুত্র লইয়া পলাশী ও জলাঙ্গীর মধ্যবর্তী জমিদারি প্রদান করিয়া যান। এই সময় হইতে রাম রামচন্দ্র সমাদ্দার নামে অভিহিত হইতে থাকেন। রাম সমাদ্দারের চারি পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস, মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে কানুনগো পদে নিযুক্ত হন এবং ভবিষ্যতে 'মজুমদার ভবানন্দ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মজুমদার ভবানন্দ দুর্গাদাস উপাধি ও কানুনগো পদ হইতে অবসর লইয়া, বল্লভপুরে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং কুড়ি বৎসর ধরিয়া তাঁহার পিতার জমিদারি শাসন করেন। ভবানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ হরিবল্লভ, জগদীশ ও সুবুদ্ধি, ফতেপুরে, কোদালগাছি ও পাটকাবাড়িতে তাঁহাদিগের আবাসবাটি নির্মাণ করেন। ভবানন্দ যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সময়ে মানসিংহকে সাহায্য করায়, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে নদীয়ার রাজপদ পুনঃপ্রদান করেন এবং তৎসহ 'মহারাজা' উপাধিও দান করেন। ইতিপূর্বে এই রাজপদ তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের মৃত্যুর পর বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে মানসিংহের সহায়তায় ভবানন্দ মহৎপুর, নদীয়া, সুলতানপুর প্রভৃতি চৌদ্দখানি পরগনা জমিদারিরূপে প্রাপ্ত হন। (১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ)।

মহারাজ ভবানন্দ মাটিয়ারি ও দিনলিয়াতে দুইটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ভবানন্দ প্রথমে তাঁহার রাজ্য তিন পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দরামের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার

প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণ এই প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করায়, মহারাজা ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, "তুমি নিজের জন্য জমিদারি অর্জন করিয়া লও।" এইজন্য তিনি গোপালকে তাঁহার জমিদারি দান করিয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় প্রার্থনা অবগত করান এবং সম্রাটও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কুশদহ ও উখড়া পরগনা প্রদান করেন।

ভবানন্দ মজুমদারের মৃত্যুর পর গোপাল ও গোবিন্দরাম তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বোপার্জিত সম্পত্তি ব্যতীত পিতার নিকট হইতে কিছুই লয়েন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দরাম নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন, কিন্তু গোপালের রাঘব নামে এক পুত্র ছিলেন। পরে তিনিই সমগ্র রাজ্যলাভ করেন।

গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব, ভ্রাতৃদ্বয়কে যথাযোগ্য পিতৃসম্পত্তির অংশ দিয়া মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই পল্লীতে সে সময় গোয়ালা প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতি বাস করিত। রাঘবের আমলে এই স্থানে ব্রাহ্মণের বসবাস হয়। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট ব্রহ্মোত্তর লইয়া এই স্থানে বসবাস করায়, ইহা ব্রাহ্মণ-প্রধান হইয়া উঠে।

রাঘব রেউই গ্রামে এক সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহা শিবের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁহার পুত্র রুদ্র রায় রেউইএর নাম পরিবর্তিত করিয়া কৃষ্ণনগর রাখেন এবং সেখানে একটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করান। তিনি সাধারণের প্রভূত উপকার করায় পুরস্কার স্বরূপ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে 'মহারাজা' উপাধি, কয়েকটি পরগনা এবং তাঁহার প্রাসাদের উপর রাজকীয় বিশিষ্ট সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ একটি 'কাঙ্গড়া' নির্মাণ করিবার অনুমতি লাভ করেন। ইহার পরিবর্তে মহারাজা রুদ্র রায় এক সহস্র গাভী, তাঁহার নিজের ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ এবং অনেক মূল্যবান সামগ্রী দিল্লীর দরবারে নজররূপে প্রেরণ করেন।

রাঘবের দুই পুত্র। তাঁহাদের নাম রুদ্র রায় ও প্রতাপনারায়ণ রায়। রুদ্র রায় তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধিশালী থাকায় পিতার মৃত্যুর পর প্রকারান্তরে সমস্ত জমিদারি দখল করেন। ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে ১৬৭৬ খৃস্টাব্দে ফারমান পাইয়া, তিনি মহাসমারোহের সহিত রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই ফারমানে বাদসাহের অনুগৃহীত ব্যক্তিরূপে তিনিও নিজের রাজপ্রাসাদের উপর "কাঙ্গড়া' নির্মাণ করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন।

রুদ্র রায়ের আমলে তাঁহার নবস্থাপিত রাজধানীর যথেষ্ট উন্নতি হয়। তিনি ঢাকা হইতে কারিগর আনাইয়া সুন্দর চক ও অট্টালিকা নির্মাণ করান। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিয়া তিনি সাধারণের যাতায়াতের কষ্টমোচন করেন।

রুদ্র রায়ের দুই মহিষী। জ্যেষ্ঠার গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং কনিষ্ঠার গর্ভে রামকৃষ্ণের জন্ম হয়। পৈতৃক জমিদারি লইয়া রামচন্দ্র ও রামজীবনের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছিল। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামজীবন জমিদারি প্রাপ্ত হন। কিন্তু জমিদারি তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণ নবাবের সহিত কৌশল করিয়া, তাঁহাকে ঢাকায় কারারুদ্ধ করান ও পৈতৃক জমিদারি দখল করেন। এই রামকৃষ্ণের সময়ে শোভাসিংহের বঙ্গবিপ্লবকারী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।

শোভা সিংহের দলভুক্ত বিদ্রোহী হিম্মৎ সিং রামকৃষ্ণের আমলে নদীয়া-রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সম্রাটপুত্র আজিমওশ্বান হিম্মৎ খাঁকে দমন করিবার জন্য যখন বর্ধমানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময়ে রামকৃষ্ণও কলিকাতার তৎকালীন ইংরাজ শাসনকর্তার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করায়, ইংরাজেরা রামকৃষ্ণের অধীনে অনেক সৈন্য রাখিয়া দেন। রামকৃষ্ণের প্রতি আজিমওশ্বানের এই অনুগ্রহে মুরশিদকুলি জাফর খাঁ বিরক্ত হন এবং ছল করিয়া তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া গিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

রামকৃষ্ণ কারাগারে বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে আজিমওস্থান অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, জাফর খাঁকে লিখিয়া পাঠান, "নদীয়া-রাজ্য অবিলম্বে রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হউক"। কিন্তু রামকৃষ্ণের অন্য উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনকে কারামুক্ত করিয়া উক্ত রাজ্য প্রদান করা হয়। জাফর খাঁ রামজীবনকে এক সময়ে তাঁহার দেয় বার্ষিক সরকারি খাজনার হিসাব করিবার জন্য মুরশিদাবাদে ডাকিয়া পাঠান। এই মুরশিদাবাদেই রামজীবনের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রঘুরাম রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরেই জাফর খাঁ কর্তৃক তিনি মুরশিদাবাদে বন্দী হন। রঘুরাম অতি অসমসাহসী বীরপুরুষ ছিলেন বলিয়া তিনি রঘুবীর নামে সাধারণে পরিচিত। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে, তিনি রাজসাহীর রাজার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির কার্য করিয়া নবাবকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু জমিদারির রাজস্ব বাকি ফেলায়, ভবিষ্যতে তিনি নবাব কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। রঘুরামের যথেষ্ট দানশীলতা ছিল। তিনি পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের উপর বিরক্ত থাকায়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া দেহত্যাগ করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে অনুমতি পত্র আনাইয়া, পিতৃপরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়। এই যজ্ঞসভায় সর্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী সমেত তাঁহাকে 'অগ্নিহোত্রী-বাজপেয়ী-শ্রীমান মহারাজ রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র রায়' উপাধি প্রদান করেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একদা মৃগয়াব্যাপদেশে বর্তমান শিবনিবাস নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং এই স্থানের সৌন্দর্যমুগ্ধ হইয়া তথায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং নদীয়া, কুমারহট্ট শান্তিপুর ও ভাটপাড়া এই চারিটি পণ্ডিতসমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বহুসহস্র বিঘা নিষ্কর জমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকত্বে যে সমস্ত পণ্ডিত অবস্থান করিতেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগণ সুবিখ্যাত—শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর, দেবল, মধুসূদন, রামপ্রসাদ সেন, বিখ্যাত কবি ভুমেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, নৈয়ায়িক শরণ তর্কালঙ্কার ও জ্যোতির্বিৎ অনুকূল বাচস্পতি। নৈয়ায়িক কালিদাস সিদ্ধান্ত তাঁহার সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। হুগলীর অন্তর্গত সুগন্ধোর গোবিন্দরাম রায় রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। চরকে তাঁহার অসীম বুৎপত্তি ছিল। তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম আগমবাগীশ তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। তিনি তন্ত্রসার রচয়িতা। তিনিই সর্বপ্রথমে কালীপূজা, এবং কালীপূজার রাত্রিতে পথ ও বাটি প্রভৃতি আলোকিত করিবার প্রথা প্রচলিত করেন। এই প্রথা এক্ষণে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আগমবাগীশ নামে অভিহিত হইতেন। কৃষ্ণচন্দ্রই বঙ্গদেশে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেন। তাঁহার সভার আর একটা উজ্জ্বল রত্ন—অন্নদামঙ্গল রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র। সঙ্গীত ও স্থপতিবিদ্যার উন্নতি সাধনে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। বারাণসীর জ্ঞানবাপীর মধ্যে সুবৃহৎ অবতরণিকা শ্রেণী তিনিই নির্মাণ করেন। তৎকালে তিনি হিন্দুসমাজের নেতৃত্বস্থান অধিকার করেন।

মহারাজা রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের সময়ে নদীয়া রাজ্যের যশ ও প্রতিপত্তি এবং আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কবি ভারতচন্দ্রের কালিকা-মঙ্গলে[১] প্রকাশ—

রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথীখাদ। পূর্বসীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গাপাড়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র চারি সমাজের অর্থাৎ নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপের কর্তা ছিলেন। নদীয়া জেলার এমন কোন ব্রাহ্মণ নাই যিনি মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর পান নাই। অপরিসীম দানশীলতার জন্যই নদীয়া-রাজ্যের রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই এক এক

১. 'অন্নদামঙ্গল' নামেই গ্রন্থটি সমধিক প্রসিদ্ধ। বস্তুত 'কালিকামঙ্গল' নামটি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

সময়ে সরকারি সদর-মালগুজারি দিতে অপারক হইয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব কর্তৃক কারারুদ্ধ হইতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক রাণী ভবানীর মত দানশীলতার জন্য যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেন। নবদ্বীপের গৌরব রবি তাঁহার সময়েই পুনরায় প্রবল তেজে জ্বলিয়া উঠে। আবার তাঁহারে সঙ্গে সঙ্গেই তাহা নির্বাপিত হইয়া যায়।

শান্তিপুরের লক্ষ্মীতলা-পাড়ায় সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মহারাজের গুরু ছিলেন। কোন কারণে রাজার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি তাঁহার সাহচর্য ত্যাগ করেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শাসনকালে বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সহিত ইংরাজগণের বিবাদকালে, তিনি নবাব কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ইংরাজগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইংরাজগণকে যে অমূল্য সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পুরস্কার স্বরূপ ক্লাইভ তাঁহাকে 'রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি এবং পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত বারটি কামান উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। এই কামানগুলি আজিও নদীয়ার রাজবাটিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্র মেয়াদী বন্দোবস্ত অনুসারে বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। শিবচন্দ্রও পিতার ন্যায় ধার্মিক এবং সুবিদ্বান ছিলেন। নিয়মিত সময়ে সরকারি রাজস্ব না দিতে পারায়, শিবচন্দ্রের আমলেও অনেক বিষয় হস্তান্তর হইয়া যায়। এজন্য তিনি ভগ্নহৃদয়ে ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মহারাজ শিবচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। ইহাঁর দানশীলতা সুবিখ্যাত।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রণোদিত দশশালা-বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র আপন জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র ব্যতীত আর সকল পুত্রের মাসহারা করিয়া যান। তাঁহারা এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু দশশালা-বন্দোবস্ত প্রচলনের পর পৈতৃক-জমিদারির অংশ পাইবার জন্য তাঁহারা আদালতে নালিস রুজু করিয়া দেন। এই মোকদ্দমার খরচ জোগাইতে ও নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব দিতে না পারায়, নদীয়া রাজের বহু মূল্যবান সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিষয়কর্মে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। বড়ই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া তাঁহার ভাগ্য পরিবর্তন ঘটিল। ঈশ্বরচন্দ্র অঞ্জনা নদীতীরে, শ্রীবন নাম দিয়া এক সুরম্য হর্ম নির্মাণ করেন। এই স্থানেই তিনি আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত থাকিতেন। পরিশেষে উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া বহুদিন অজ্ঞানাবস্থায় থাকার পর ৫৫ বর্ষ বয়সে (১৮০২ খ্রীঃ) লোকান্তরে গমন করেন। 'সারদামঙ্গল' প্রণেতা বিনয় বাকপতি নামক এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। (বিশ্বকোষ) রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময় প্রায় অর্ধেক জমিদারি তাঁহার হস্তবহির্ভূত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্রও পিতার ন্যায় অপব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার আমলে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া রাজের একটি মূল্যবান জমিদারি উখড়া পরগনা, কোম্পানি বাহাদুরের প্রাপ্য বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া যায়। আত্মীয় স্বজন ও বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীদের দোষে এই সব হইতেছে এরূপ একটা সংস্কার জন্মাইবার পর, তিনি সংসার বিরাগী হইয়া পড়েন। তাঁহার বুদ্ধির দোষে চুরাশী পরগনার নদীয়া রাজ্য, পাঁচ সাতখানি পরগনায় পর্যবসিত হয়। নবদ্বীপে তিনি দুইটি বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া একটিতে কালীমূর্তি ও অপরটিতে শিবমূর্তি স্থাপন করেন।

গিরীশচন্দ্রের রাজত্বকালে কবি 'রসসাগরের' বা কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর যশোরাশি চারিদিকে ব্যপ্ত হয়। ১২৪৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসে রাজা গিরিশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র কুমার শ্রীশচন্দ্র রায় নদীয়া রাজের উত্তরাধিকারী হন।

শ্রীশচন্দ্র স্বীয় চেষ্টায় উখড়া পরগনার কতকাংশ উদ্ধার করেন। তিনি ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং হিন্দু সঙ্গীতের উৎসাহদাতা ছিলেন। নানাবিধ সৎকার্যে অর্থব্যয় করিয়া

তিনি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগর-কলেজের স্থাপনার সময় তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কুমার শ্রীশচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'মহারাজা-বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র উত্তরাধিকারী হন। রাজা সতীশচন্দ্র ১৮৭০ অব্দের অক্টোবর মাসে মুসৌরীতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠাপত্নী রাণী ভুবনেশ্বরী ক্ষিতীশচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কুমার ক্ষিতীশচন্দ্র রায় নাবালক থাকায় রাণীর জমিদারি কোর্ট ওয়ার্ডের হস্তে যায়।

বর্তমানে রাজকুমার ক্ষোণীশচন্দ্র রায় এই ইতিহাস বিশ্রুত নদীয়া-রাজ্যের অধিকারী। মহারাজা ক্ষোণীশচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী সুশিক্ষিত ও সৎকর্মে উৎসাহশীল।[১]

কাশিমবাজার রাজবংশ

এই সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশ দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী, ওরফে কান্তবাবু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কান্তবাবু বঙ্গের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুগ্রহে প্রচুর বিত্তশালী হইয়া উঠেন। পূর্বে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ইংরাজদের কাশিমবাজারের বাণিজ্য-কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলা কুঠি আক্রমণ করিয়া হেস্টিংস প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু হেস্টিংস কোন উপায়ে পলায়ন করিয়া, কান্তবাবুর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। হেস্টিংসের এই দুঃসময়ে কান্তবাবু তাঁহার কলিকাতায় পলায়নের উপায় করিয়া দেওয়ায় এবং নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখায়, হেস্টিংস তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ হন। অতঃপর ১৭৭২ খৃস্টাব্দে যখন তিনি বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তখন কান্তবাবুকে তাঁহার দেওয়ানের পদ প্রদান করেন।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী গবর্ণমেণ্টের নানাকার্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করায় এবং অসাধারণ রাজভক্তির পরিচয় দেওয়ায়, মিঃ হেস্টিংস তাঁহাকে গাজীপুর ও আজিমগড় জেলায় অবস্থিত 'দুহা-বেহারা' নামক একটি জায়গীর এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত ১১৯৫ সালের পৌষ মাসে ইং ১৭৮৮ অব্দে, পুত্র লোকনাথকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

রাজা লোকনাথ নন্দী বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। ইহার মধ্যে শেষ কয়েক বৎসর দুরারোগ্য কঠিন রোগে ভুগিয়া, তিনি ১২১১ সালের বৈশাখ (ইং ১৮০৪ খৃঃ) পরলোক গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার পুত্র কুমার হরিনাথ এক বৎসরের শিশু। ১৮২০ খৃস্টাব্দে কুমার হরিনাথ সাবালক হন এবং ১৮২৫ খৃস্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লর্ড আমহার্স্টের নিকট হইতে 'রাজা বাহাদুর' উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ দানশীল ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য দানের মধ্যে হিন্দুকলেজ স্থাপনের জন্য ২০,০০০ টাকা দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২৩৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, (ইং ১৮৩২ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন।

১২৪৭ সালে, (ইং ১৮৪০ খৃঃ) কুমার কৃষ্ণনাথ সাবালক হন এবং পর বৎসর, লর্ড অকল্যাণ্ডের শাসনকালে রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা কৃষ্ণনাথ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং দানশীল ছিলেন। এক সময়ে স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই, কে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করেন।

রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুর ভাগ্যলিপিফলে ১৮৪৪ খৃস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে আত্মহত্যা করেন। রাজার মৃত্যুর পর কাশিমবাজার রাজবংশের সমস্ত সম্পত্তি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজা কৃষ্ণনাথের উইলের বলে, স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। রাজা কৃষ্ণনাথের বিধবা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ী, সামান্যমাত্র স্ত্রীধনের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য হন।

যাহা হউক অল্পদিন পরেই মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বামীর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সুপ্রীম-কোর্টে এক মোকদ্দমা রুজু করেন। পরিত্যক্ত সম্পত্তির উইলপ্রভৃত-

১. কুমার ক্ষৌণীশচন্দ্র বর্তমানে লোকান্তরিত।

কালে রাজা কৃষ্ণনাথের অব্যবস্থিতচিত্ততা প্রমাণ হওয়ায়, মহারাণীই এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করেন। এই সময়ে কাশিমবাজার রাজবংশের জমিদারির ভয়ানক দুরবস্থা ঘটে। কিন্তু মহারাণী স্বর্ণময়ীর অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে এবং তাঁহার দেওয়ান রাজীব লোচন রায় বাহাদুরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিষয়কর্মে অসামান্য দক্ষতায়, কিছুদিনের মধ্যেই জমিদারি পুনরায় উন্নত হইয়া উঠে।

মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, ১২৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, (ইং ১৮২৭ খৃঃ) বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতাকুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৩৪ খৃঃ) তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বিশাল জমিদারি বঙ্গদেশে মুরশিদাবাদ, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজপুর, মালদহ রঙ্গপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া, বর্ধমান, হাওড়া ও চব্বিশ পরগনায় এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গাজীপুর ও আজিমগড় জেলায় বিস্তৃত। কলিকাতা এবং সহরতলীতেও তাঁহার প্রচুর সম্পত্তি আছে। রঙ্গপুর জেলার সুবিখ্যাত 'বাহারবন্দ-পরগনা' তাঁহার বৃহত্তম জমিদারি এবং তাঁহার নদীয়ার জমিদারিরও একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইতিহাস-বিখ্যাত পলাশীর প্রান্তর এই জমিদারির অন্তর্গত।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর ঐকান্তিক রাজভক্তি, সাধারণের উপকারের জন্য নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠান এবং অসীম দানশীলতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ১০ই আগস্ট তারিখে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাণী' উপাধি প্রদান করেন। সেই বৎসরেই ১৩ই অক্টোবর তারিখে. কাশিমবাজার রাজবাটিতে একটি দরবার অনুষ্ঠান করিয়া বিভাগীয় কমিশনার মিঃ মোলোনি তাঁহাকে রাজকীয় সনন্দ প্রদান করেন।

১৭৮৪ খৃীস্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষের সময় মহারাণী স্বর্ণময়ীর অকাতর দান ও দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্টের জীবনরক্ষাকল্পে অক্লান্ত আত্মত্যাগে প্রীত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৫ খৃীস্টাব্দে ১০ই মার্চ তারিখে ঘোষণা করেন. "মহারাণী স্বেচ্ছামত যে কোন ব্যক্তিকেই উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করুন না কেন, তাঁহাকেই মহারাজা উপাধি প্রদান করা হইবে।" অতঃপর তাঁহার বদান্যতায় অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭৮ খৃীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, নামক সম্মানজনক উপাধি (Member of the Imperial Order of the Crown of India.) প্রদান করেন। সেই বৎসরের ১৪ই আগস্ট তারিখে কাশিমবাজার রাজবাটিতে দরবার করিয়া প্রেসিডেন্সি-বিভাগের কমিশনার মিঃ পীকক এই গৌরবান্বিত বঙ্গমহিলাকে রাজ-সম্মানের নিদর্শন প্রদান করেন। স্বর্ণময়ী ব্যতীত আর কোন বঙ্গ-মহিলাই এই উচ্চ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

এই দরবারে মিঃ পীকক যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর অসংখ্য দানের একটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাব অনুসারে ১৮৭৬-৭৭ খৃীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার দানের পরিমাণ একাদশ লক্ষ টাকা। ১৮৭৮ খৃীস্টাব্দের ২২শে আগস্ট তারিখের ইংলিশম্যান পত্রিকা কমিশনার পীককের অভিভাষণ ও এই বিস্তৃত দানের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অসংখ্য দানের মধ্যে যে কয়েকটির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই দান পরিমাণ আরও কয়েক লক্ষ টাকা বেশী হয়। এই সমস্ত ঘটনা হইতেই মহারাণীর অসাধারণ দান-শীলতার ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর এই সকল সদগুণের পূর্ণবিকাশের সহায়তা কল্পে তাঁহার মনস্বী দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহারই দূরদর্শিতা ও বিষয়কার্যে পারদর্শিতাই মহারাণীকে এতদূর গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। মহারাণী স্বর্ণময়ী এখন স্বর্গবাসিনী এবং বঙ্গদেশে আর যে তাঁহার ন্যায় দানশীলা রমণী জন্মিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই।

মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী আমাদের বাঙ্গালী জমিদার কৃতবিদ্য মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় উদার হৃদয়, মনস্বী ও দানশীল উত্তরাধিকারী আমলে কাশিমবাজার রাজবংশের পূর্বগৌরব আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র গৌরব

মাথা-খোলা দুইতলা বাসের উপর হইতে চৌরঙ্গী (১৯৩০)

পুরাতন ভাসমান হাওড়া

ছিলেন মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভাগিনেয়। ইহাঁর পিতৃদেবের নাম নবীনচন্দ্র নন্দী। মাতার নাম গোবিন্দসুন্দরী। গোবিন্দসুন্দরী রাজা কৃষ্ণনাথের ভগ্নী। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র শ্যামবাজারে পিতৃভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাণীর স্বর্ণময়ীর দেহান্ত ঘটিলে, উত্তরাধিকারীর অভাবে কাশিমবাজার রাজস্টেট রাণী হরসুন্দরীতে গিয়া অর্শে। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধা, তীর্থবাসিনী রাণী হরসুন্দরী এই বিষয় উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় তাঁহার দৌহিত্র মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রকে অর্পণ করেন। মহারাণীর উত্তরাধিকারীকে গবর্ণমেণ্ট মহারাজ উপাধিদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এজন্য মণীন্দ্রচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'মহারাজ-বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া গদীতে আরোহণ করেন।

এই বঙ্গবিশ্রুত দানশীল রাজবংশের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ইহার গৌরব-কীর্তি আরও পরিবর্ধিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সরলচিত্ত, সুবিনয়ী, সুপণ্ডিত সর্ববিধ সৎকার্যে উৎসাহদাতা, ঐশ্বর্যগৌরবে আড়ম্বরশূন্য জমিদার বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্মগুণে ও দানশীলতার জন্য, একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা-রূপে গণ্য।

বিষয় কর্মে মহারাজের খুব দক্ষতা। জমিদারি সম্বন্ধে সকল কার্যই ইনি নিজের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এজন্য জমিদারি ও বিষয় সম্পত্তিরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মহারাজ নিজে একজন সাহিত্য-সেবী, সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীগণ ইহাঁর নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলন কাশিমবাজার রাজবাটিতেই হয়। মহারাজ এই সময়ে একটি সময়োচিত অভিভাষণ পাঠে সমাগত বিদ্বমণ্ডলীকে আবাহন করিয়াছিলেন। তাঁহারই দান-প্রদত্ত জমিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান প্রাসাদতুল্য বাসভবন নির্মিত হইয়াছে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুর লাটকাউন্সিলের একজন গণনীয় সদস্য। যাহাতে দেশের ও দশের হিতসাধন হয়, এরূপ সৎকার্যে দান করিতে তিনি সর্বদাই মুক্তহস্ত। নিজের আদর্শ চরিত্রের জন্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সর্ব সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বিনয় সৌজন্য-মণ্ডিত, রাজশ্রী সমন্বিত মুখমণ্ডল দেখিলে যথার্থই একটা ভক্তির উদ্রেক হয়। মহারাজ পরম হিন্দু, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী' নামক ধর্মসভা ইহাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত।[১]

বর্ধমান রাজবংশ

নিম্নবঙ্গের সর্বাপেক্ষা ধনশালী বর্ধমান-রাজবংশ, কপূর-ক্ষত্রিয় জাতীয় আবু রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্ধ দুই শতাব্দী পূর্বে আবু রায় পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, বর্ধমানে বসবাস করেন। এইস্থানে তিনি ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে ফৌজদারের অধীনে চৌধুরী ও কোতোয়ালের পদে নিযুক্ত হন। আবু রায়ের পুত্র বাবু রায়, বর্ধমানের জমিদারি ক্রয় করিয়া তাঁহার বংশের ভবিষ্যৎ প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রের নাম ঘনশ্যাম রায়, এবং তৎপুত্র কৃষ্ণরাম রায়। কৃষ্ণরাম রায় দিল্লীর সম্রাট আলমগীরের নিকট হইতে বাদসাহী-ফারমান লাভ করেন এবং এই সনন্দের সহিত আরও অনেকগুলি জমিদারি লাভ করেন। ১৬৯৬ খ্রীঃ অব্দে বর্ধমানের অন্তর্গত, জেতোয়া ও বর্দার তালুকদার শোভা সিংহ, আফগান সর্দার রহিম খাঁর সাহায্য লইয়া বিদ্রোহী হয় এবং রাজা কৃষ্ণরাম রায়কে হত্যা করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে বন্দী করে। কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র জগৎরাম রায় ঢাকায় পলাইয়া গিয়া তত্রস্থ শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্বৃত্ত শোভা সিংহ একসময়ে কৃষ্ণরাম রায়ের কন্যার মর্যাদা নষ্ট করিতে উদ্যত সেই সাহসী রাজকুমারী তাহাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন। পরিশেষে শোভা সিংহের সৈন্যদল বর্ধমান পরিত্যাগ করিয়া হুগলী আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই বিদ্রোহ সময়ে সুতানুটিতে ইংরাজগণ, চন্দননগরে ফরাসীগণ এবং চুঁচুড়ায়

১. মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর মৃত্যু ১৯৩১ খ্রী.

ওলন্দাজগণ বিদ্রোহিগণের ভয়ে ভীত হইয়া, তাহাদিগের বাণিজ্য কুঠিগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য, নবাব নাজিমের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এবং নবাবের অনুমতিক্রমে এতৎসম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহের পূর্ণবিবরণ আমরা ইতিপূর্বে দিয়াছি।

শোভা সিংহের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া জগৎরাম রায় ঢাকা হইতে ফিরিয়া আইসেন এবং বিনা-কষ্টে পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন। সম্রাট আলমগীর তাঁহাকে একখানি নূতন ফারমান প্রদান করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে জগৎরাম গুপ্তশত্রুর হস্তে নিহত হন। তাঁহার দুই পুত্র কীর্তিচন্দ্র রায় ও মিত্ররাম রায়। ইহার মধ্যে জ্যেষ্ঠই পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনিও দিল্লীর-সম্রাটের নিকট হইতে 'ফারমান' প্রাপ্ত হন। নিজের চেষ্টায় তিনি পৈতৃক জমিদারিতে চাতুয়ান, ভুরসুট, বার্দা ও মনোহরসাহী প্রভৃতি পরগনাগুলি যোগ করেন। তিনি ইহার পর ঘাটালের নিকটবর্তী চন্দ্রকোণা ও বার্দার রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদের রাজ্য এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরের নিকটবর্তী বালঘরার রাজার নিকট হইতে কয়েকটি জমিদারি কাড়িয়া লন। ভবিষ্যতে তিনি বিষ্ণুপুরের রাজার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সময়েই মহারাষ্ট্রীয় উপদ্রব বা বর্গীর-হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়ায়, বিষ্ণুপুর রাজের সহিত সন্ধি করিয়া উভয়ে একত্রে মারহাট্টাগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন।

মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায় ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র চিত্রসেন রায় পৈতৃক জমিদারি আরও বর্ধিত করেন। তিনিই প্রথমে সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা চিত্রসেন রায় ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার খুল্লতাত পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ওরফে তিলচন্দ্র রায় তাহার উত্তরাধিকারী হন। সম্রাট শাহ আলমের নিকট তিলকচন্দ্র 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধি এবং পাঁচহাজারী মন্সবদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মারহাট্টাগণ দেশব্যাপী লুটপাট দ্বারা প্রজাবর্গের অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছিল। ১৭৭১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে সম্রাট শাহ আলম তাঁহার পুত্র তেজচন্দ্রকে পৈতৃক উপাধি 'মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর' প্রদান করেন এবং উক্ত উপাধি তাঁহার বংশানুক্রমিক বলিয়া নির্দেশ করিয়া দেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জননী মহারাণী বিষ্ণুকুমারী জমিদারির বন্দোবস্তের জন্য তাঁহার হস্ত হইতে জমিদারির যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাহা ফিরাইয়া লয়েন। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সময় মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বাহাদুরের সহিত গবর্ণমেণ্টের এই বন্দোবস্ত হয় যে, তিনি নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর ৪০১৫১০৯ টাকা রাজস্ব প্রদান করিবেন এবং ইহা ব্যতীত পুলবন্দী (বাঁধ সারাইবার খরচ) হিসাবে ১৯৩৭২৯ টাকা সরকারে সরবরাহ করি-বেন। কিন্তু বিষয়কার্যে মহারাজার পারদর্শিতার অভাবে শীঘ্রই তাঁহার দেয় রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাবধান করিয়া দেওয়াতে কোন ফল হইল না। অবশেষে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অব রেভেনিউ তাঁহার বিশাল জমিদারির কিয়দংশ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই জমিদারির কিছু কিছু অংশ সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ, ভাসতাড়ার হুকু সিং, জনাইয়ের মুখোপাধ্যায় বাবুগণ ও তেলেনিপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুরা ক্রয় করেন। ইহা-সত্ত্বেও মহারাজা তেজচন্দ্র বেনামীতে অধিকাংশ সম্পত্তি নিজেই ক্রয় করিয়া লয়েন এবং এই সময়ে তাঁহার মৃত্যু না হইলে বোধহয় সমস্ত অংশই পুনরুদ্ধার করিয়া লইতেন। যাহা হউক কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহারাজা বৈষয়িক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণের হিতার্থে তিনি বর্ধমান হইতে কালনা পর্যন্ত একটি সুবৃহৎ রাজপথ এবং মগরাতে একটি পুল প্রস্তুত করিয়া দেন। বর্ধমান সহরের বাহ্যিক উন্নতি তাহার সময়েই হইয়াছিল।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা তেজচন্দ্রের মৃত্যু হইলে, এক দুষ্টু ব্যক্তি আপনাকে রাজকুমার প্রতাপচন্দ্র নামে অভিহিত করিয়া রাজ-সম্পত্তি পাইবার জন্য আদালতে এক মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করে। প্রতাপচন্দ্র নামে স্বর্গীয় মহারাজের এক পুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। আদালতের মীমাংসায় এই প্রতাপচন্দ্র পরিশেষে জাল বলিয়া সাব্যস্ত হয়

এবং সমস্ত সম্পত্তি মহারাজ তেজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র মহতাবচন্দ্রকে প্রদত্ত হয়। এই 'প্রতাপচাঁদের' ব্যাপার লইয়া তখন এক মহা হুলস্থুল হইয়াছিল। সঞ্জীববাবুর[1] জাল প্রতাপচাঁদ পুস্তকে ইহার প্রচুর বিবরণ আছে।

মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্র বাহাদুর বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ জমিদার ছিলেন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে একটি দরবার করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'মহারাধিরাজ-বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। সাঁওতাল বিপ্লবের সঙ্কটকালে এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাজাধিরাজ মহতাব চাঁদ বিশ্বস্তভাবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৭৭ খৃঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লী-দরবারে, তাঁহার জীবিতকালের জন্য ১৩টি কামান-ধ্বনির সম্মান লাভ করেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একটি শ্বেতপ্রস্তরমূর্তি এসিয়াটিক সোসাইটিকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিলেন। ইহা এখনও কলিকাতার মিউজিয়ম গৃহে বর্তমান আছে।

মহারাজ মহতাপচাঁদ বর্ধমান রাজ্যের ও নগরের অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের এক বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। ইহা 'বর্ধমান-রাজবাটির মহাভারত' বলিয়া পরিচিত।

কালনার সমাজবাটিতে মহারাজ মহতাপচাঁদের একটি সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাহা দেখিবার জিনিস।

তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাজ আফতাবচাঁদ বর্ধমানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ আফতাব সুশিক্ষিত, সৎকর্মপরায়ণ ও সাধারণ হিতকর কার্যে মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু অতি তরুণ বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজচাঁদ মহতাপ বাহাদুর,[2] মহারাজ আফতাপচাঁদের মৃত্যুর পর বর্ধমান সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। (১৮৮৭ খৃঃ ২৩ জুলাই)। এই তরুণবয়স্ক মহারাজই গবর্ণমেণ্টের নিকট স্থায়ীভাবে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন। বর্ধমানের বর্তমান অধিপতি মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর একজন উচ্চশিক্ষিত, সর্ববিধ সৎকার্যের সমর্থক এবং উৎসাহদাতা ও সর্বজন পরিচিত রাজ্যেশ্বর। বর্তমান কালে তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর নিকট অজানিত নহে। ধনীসন্তান হইয়াও তিনি বিশ্রামাবসর কাল বঙ্গ-সাহিত্যালোচনায় কাটাইয়া থাকেন। Studies নামক একখানি চিন্তাপ্রসূত ইংরাজি-গ্রন্থ ও 'বিজয়-গীতিকা' নামক গ্রন্থখানি মহারাজের ইংরাজি ও বঙ্গভাষানুশীলনের ফল। সম্প্রতি মহারাজ-বাহাদুর ভারতবর্ষ নামক পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতেছেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে মহারাজ বিজয়চাঁদ ইউরোপে দেশভ্রমণে যান। সর্বস্থানেই তিনি পদোচিত সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গলার লাট-কাউন্সিলের সদস্যরূপে মনোনীত হন। ওভারটুন-হলের প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গলার ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে অসম সাহসের সহিত রক্ষা করিয়া, ইনি একদিন যথেষ্ট সৎসাহসের ও রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। এ ঘটনা এখনও অনেকের স্মৃতিপথে জাগরূক।

এই সৎসাহসের ও রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইনি কে, সি, আই, ই, নামক সম্মানজনক উপাধিপ্রাপ্ত হন। সাধারণ হিতকর কার্যে বর্তমান মহারাজ রায়বাহাদুর মুক্তহস্তে অর্থ দান করিয়া থাকেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি বড়লাটের সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কলিকাতায় আগমনকালে ইনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। গত বৎসরের বর্ধমান বন্যার সময় মহারাজ বাহাদুর বহু চেষ্টা করিয়া প্রজাবর্গের কষ্ট

---

১. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯ খ্রী.) বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ, প্রবন্ধ—'যাত্রা সমালোচনা' 'সৎকার' 'বাল্যবিবাহ' প্রভৃতি ; উপন্যাস 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' 'দামিনী' 'মাধবীলতা,' প্রভৃতি; ভ্রমণ কাহিনী—'পালামৌ' ।

২. বিজয়চাঁদ মহাতাপের (মহাতব) জন্ম ১৮৮১, মৃত্যু ১৯৪১ খ্রী.

দূর করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ কলিকাতা আলিপুরে 'বিজয়মঞ্জিল' নামে এক শোভাদর্শন রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার কলিকাতার বাসভবন।

ভূকৈলাস রাজবংশ

এই প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর। ইনি কন্দর্প ঘোষালের পৌত্র। ব্রাহ্মণবংশধর পবিত্রচেতা এই কন্দর্প ঘোষাল প্রচুর ধনশালী ছিলেন। সার্দ্ধেক শতাব্দী পূর্বে তিনি বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অধিকৃত স্থানে, প্রাচীন গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করিতেন। গোবিন্দপুর গ্রামটি কোম্পানি বাহাদুর যখন দুর্গ নির্মাণের জন্য অধিকার করেন, তখন তিনি খিদিরপুরে উঠিয়া যান। তাঁহার দুই পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ও গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। গোকুলচন্দ্র বাঙ্গলার শাসনকর্তা মিঃ ভেরেলস্টের দেওয়ান হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের মৃত্যুর পর, সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজা জয়নারায়ণের দখলে আইসে। মহারাজা জয়নারায়ণ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের একমাত্র পুত্র।

মহারাজা জয়নারায়ণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কিছুকাল সন্দ্বীপের কানুনগো ছিলেন। তিনিই প্রথমে খিদিরপুরের নিকটস্থ ভূকৈলাসে রাজবাটি নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন, এইজন্য তিনিই প্রকৃতপক্ষে এই বংশের গৌরব প্রতিষ্ঠাতা। এইস্থানে তিনি স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীর জন্য একটি সুন্দর মর্মরখচিত দেবায়তন নির্মাণ করেন এবং শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা নামধেয় দুইটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। ইহাঁর আমলেই রাজবাটির চারিদিক গড়খাই বা পরিখা দ্বারা বেষ্টন করা হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি ভূকৈলাসে দুইটি সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শিবরাত্রির সময়ে এখানে আজও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এখনও ভূকৈলাস রাজবাটিতে, এই পুণ্যাত্মা জয়নারায়ণের একটি প্রতিমূর্তি এক মন্দির মধ্যে রক্ষিত আছে। তাহা নিত্যই দেবমূর্তির মত পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত হয়। পতিতপাবনী দেবী স্বর্ণনির্মিত দেবী প্রতিমা। ইহার মর্মর মণ্ডিত মন্দিরটি দেখিবার জিনিস।

জয়নারায়ণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি এবং ৩৫০০ ঘোড়-সওয়ার রাখিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। জয়নারায়ণ ইংরাজি, ফার্সী, সংস্কৃত, আরবী ও বাঙ্গলা ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের উন্নতির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং বিভিন্ন জাতীয় বালকগণকে বিনাব্যয়ে সংস্কৃত, বাঙ্গলা, হিন্দি, ফার্সী ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য, বহুব্যয়ে বারাণসীতে একটি কলেজ স্থাপন করেন। ইহা 'জয়নারায়ণস্ কলেজ' বলিয়াই সাধারণে পরিচিত ছিল। এই কলেজ আজও তাঁহার কীর্তিঘোষণা করিতেছে। কলেজটি বারাণসীর বর্তমান গবর্ণমেণ্ট কলেজ প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে মিশনারিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মহারাজা জয়নারায়ণ তাঁহাদিগের হস্তে কলেজটি এবং ইহার পরিচালনার জন্য, প্রচুর অর্থ ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি বারাণসীতে 'গুরুধাম' নামে একটি ঠাকুর-বাটি নির্মাণ করাইয়া 'করুণানিধান মহাদেবের' নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর অশীতিপর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র কালীশঙ্কর ঘোষাল, কাবুল-যুদ্ধের সময় ইংরাজদের সাহায্য করার জন্য, লর্ড অ্যালেনবরার নিকট হইতে এই অত্যাবশ্যকীয় উপকারের ও অন্যান্য দানশীলতার পুরস্কারস্বরূপ সরকার হইতে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজা [illegible] ঘোষাল, বারাণসী-অন্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে অন্ধগণ বিনাব্যয়ে খাদ্য বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইত। তাঁহার সময়ে ভূকৈলাসে এক যোগময় সুন্দরাকৃতি মহাপুরুষ, সাধারণ সম্মুখে আবির্ভূত হন। এই অদ্ভুত সন্ন্যাসীকে কেহই কথা কহিতে বা পান ভোজন করিতে কিম্বা বস্ত্র পরিধান করিতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, সকল জাতীয় লোকই প্রত্যহ দল বাঁধিয়া ভূকৈলাসে উপস্থিত হইত। হিন্দুগণ—স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, পুষ্প ও নৈবেদ্য দিয়া

তাঁহাকে পূজা করিতেন। কথিত আছে—এই মহাপুরুষকে কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী 'শিবপুরের-চর' হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। ইনি তথায় গঙ্গার জোয়ারের সময়, জলের উপরে ভাসমান থাকিতেন। তাঁহার সুন্দর শরীরের কতকাংশ শৈবালে সমাচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। কথিত আছে, ভূকৈলাসে আনীত হইবার অল্পকাল পরেই ইনি কথা কহিতে এবং ভোজন করিতে আরম্ভ করেন। এমন কি ভূকৈলাসের রাজবংশীয়গণের মধ্যে যে কেহ কোনরূপ আদেশ করিতেন, ইনি নাকি তাহাই সম্পাদন করিতেন।

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের সাত পুত্র। কুমার কাশীকান্ত ঘোষাল, কুমার সত্য-প্রসাদ ঘোষাল, কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল, কুমার সত্যচরণ ঘোষাল, কুমার সত্যশরণ ঘোষাল কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল এবং কুমার সত্যভক্ত ঘোষাল।

কুমার সত্যকিঙ্কর ঘোষাল প্রথমে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে, রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, পিতার লোকান্তরের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে—রাজকুমার সত্যচরণ ঘোষাল মহাশয় ভবিষ্যতে বিষয়ের অধিকারী হন। পরে ইনি রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া-ছিলেন।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর নানা সৎকার্যে প্রভূত অর্থ দান করিয়া এই রাজবংশের গৌরব রক্ষা করেন। তাঁহার দুই পুত্র—কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল ও কুমার সত্যসত্য ঘোষাল। কিন্তু রাজা সত্যচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা, কুমার সত্যশরণ ঘোষাল 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর সুপণ্ডিত এবং পরহিতকামী ছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সি, এস, আই, উপাধি সম্মানে ভূষিত করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের অনেকগুলি সন্তান হইয়া-ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় একটি কন্যা ব্যতীত তাহাদের সব কয়টিই বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কন্যাটির সহিত প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবাহ হয়। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুরের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই, ১৮৬৯ খৃীঃ অব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে, গবর্ণমেণ্ট রাজা সত্যচরণ ঘোষালের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার সত্যানন্দ ঘোষালকে 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, ব্রিটিশ-ইণ্ডি-য়ান-অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য এবং কিছুকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য ছিলেন। তিনি সাধারণের হিতার্থে অনেক লোকহিতকর কার্যানুষ্ঠান করিয়াছেন। কুমার সত্যসত্য ঘোষাল (রাজা সত্যচরণের দ্বিতীয় পুত্র) এবং কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল এই বংশের আরও দুইজন কৃতী বংশধর। কুমার সত্যকৃষ্ণ ঘোষাল সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার এবং কলিকাতা পুলিশের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

ইহাঁদিগের জমিদারি ত্রিপুরা, ভুলুয়া, বাখরগঞ্জ, ঢাকা এবং চব্বিশপরগনা জিলায় অবস্থিত। ইহাঁদিগের বিশাল জমিদারির সরকারে দেয় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা।

ভূকৈলাস রাজ-পরিবার নদীয়া ও নাটোরের মত অনেক ব্রাহ্মণকে প্রচুর ব্রহ্মোত্তর দিয়া গিয়া-ছেন। পতিতপাবনী দেবীর পূজার সময়, এই রাজবাটিতে দুর্গাষ্টমী ও ঝুলনে খুব জাঁকজমক হইয়া থাকে। ঝুলনের সময় দশভুজা স্বর্ণময়ী পতিতপাবনী দেবীকে, দ্বিভুজ মুরলীধারী কৃষ্ণমূর্তিতে পরিণত করা হইত। এই দীন লেখকের জন্মস্থান ও প্রথম নিবাস ভূকৈলাস রাজবাটির পশ্চিমদিকে বাদামতলা লেনে ছিল। এখন তাহা খিদিরপুরে 'ডকের' সীমানা ভুক্ত হইয়াছে।

দীঘাপতিয়া রাজবংশ[১]

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় মহাশয় প্রথমে নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের অধীনে এক-

১. দীঘাপতিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত। এই জমিদারির অস্তিত্ব এখন আর নাই

জন সামান্য আমলা ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই জমিদারি কার্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায়, তিনি নাটোররাজ কর্তৃক দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন।

দয়ারাম বঙ্গবিশ্রুতা মহারাণী ভবানীর আমল পর্যন্ত, নাটোরের জমিদারির দেওয়ান ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যেই প্রচুর ধনসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মু[illegible] নবাব যখন যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায়কে গ্রেপ্তার করেন, তখন দয়ারাম তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন এইজন্য নবাব সরকার হইতে তিনি 'রায়রায়ান' উপাধি প্রাপ্ত হন। দয়ারাম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং স্বধর্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। দরিদ্রের প্রতি দয়া তাঁহার ধর্ম ছিল। তিনি রাজসাহীতে অনেকগুলি 'টোল' স্থাপন করিয়াছিলেন। যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত কিনাদিনের গোপাল-দেব এবং দীঘাপতির রাজবাটির কৃষ্ণজী, গোবিন্দজী ও গোপালজী নামক তিনটি বিগ্রহ তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। তিনি গরুড় ও হাগুরিয়াতে দুইটি দীঘি, স্বীয় জমিদারিতে কতকগুলি সুবৃহৎ পুষ্করিণী এবং রাজবাটির চতুর্দিকে একটি চৌকী বা গড় খনন করাইয়াছিলেন। দয়ারাম রায়ের পুত্র জগন্নাথ রায় তাঁহার মৃত্যুর পর অল্পদিন মাত্র জীবিত ছিলেন। জগন্নাথ রায়ের এক পুত্র প্রাণনাথ রায়। ইনি মাতৃশ্রাদ্ধে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

প্রাণনাথ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পোষ্যপুত্র প্রসন্ননাথ রায় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার সমকালীন জমিদারগণের মধ্যে দানশীলতা ও মহত্ত্বে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দীঘাপতিয়া হইতে বোয়ালিয়া পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৩৫০০০ টাকা প্রদান করেন। অন্যান্য প্রচুর দান ব্যতীত তিনি দীঘাপতিয়ায় একটি স্কুল এবং নাটোর ও [illegible] একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহাদিগের পরিচালনের জন্য এক লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হস্তে দান করেন।

রাজা প্রসন্ননাথ রায় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রাজা-বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি রাজসাহী জিলায় সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তিনি দীঘাপতিয়ার রাজবাটির আমূল সংস্কার করিয়া প্রাসাদটিকে সুদৃশ্য ও পরিবর্ধিত করিয়া তুলেন। তাঁহার আমলে রাজবাটির একপার্শ্বে একটি সুন্দর নাচঘর ও অন্য পার্শ্বে একটি সিংহদালান নির্মিত হয়। রাজবাটির সুবৃহৎ তোরণ-দ্বারও তাঁহার সময়ে নির্মিত। তাঁহার আমলে হোলী ও ঝুলন-উৎসবের সময় রাজবাটি অসংখ্য আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়া নূতন শোভার বিকাশ করিত এবং নৃত্য, গীতবাদ্য ও আতসবাজী প্রভৃতিতে একটা মহোৎসবের সূচনা হইত। এই উৎসব সময় সেখানে বহুসংখ্যক পদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী ও জমিদারগণের নিমন্ত্রণ হইত।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রসন্ননাথ রায় দেহত্যাগ করেন। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দ তাঁহার পোষ্যপুত্র প্রমথনাথ রায় পিতার উইল অনুসারে কলিকাতা ওয়ার্ডস ইন্‌স্টিটিউশনের ছাত্ররূপে পাঠাভ্যাস করেন। এই সময় তাঁহার বুদ্ধিমতী জননী তাঁহার অভিভাবিকা ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি সাবালক হন। সাবালক হইয়া প্রথমেই রামপুর-বোয়ালিয়ায় তাঁহার পিতৃস্থাপিত হাস-পাতাল ও চিকিৎসালয়ের পাকাবাটি নির্মাণের জন্য তিনি ১০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। দীঘা-পতিয়া হইতে রামপুর-বোয়ালিয়া পর্যন্ত যে রাস্তাটি নির্মিত হইয়াছিল, তাহার সংস্কারকল্পেও তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই সকল কার্যের জন্য তৎকালীন ছোটলাট বাহাদুর কর্তৃক তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে বিভাগীয়-কমিশনার গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্মে রিপোর্ট করেন যে, "কুমার প্রমথনাথ রায় নানা সৎকার্যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন। তিনি নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত এবং নিম্নবঙ্গের জমিদারদিগের মধ্যে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ ও জমিদারি পরিচালন কার্যে অতি সুদক্ষ। অতএব তাঁহাকে 'রাজা-বাহাদুর' রাজোপাধি দেওয়া হউক।" এই রিপোর্টের ফলে লর্ড মেয়ো তাঁহাকে রাজোপাধির সনন্দ প্রদান করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ

অব্দে রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন।[১]

দীঘাপতিয়া রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধিকারী রাজা পি, এন, রায় ও তাঁহার ভ্রাতাগণ। বর্তমানে তাঁহারাই এই স্টেটের মালিক। ইহাঁরা বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যসেবী ও সৎকর্মে দানশীল।

শোভাবাজার রাজবংশ

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কাণসোণা বা কর্ণসুবর্ণ গ্রামে এই বংশের আদি বাসস্থান ছিল। ইহাঁরা চিত্রপুরের দেব-বংশোদ্ভব মৌলিক কায়স্থ। পরে এই রাজবংশের একটি সংক্ষিপ্ত বংশবৃক্ষ দেওয়া হইল।

এই দেববংশের আদিপুরুষের নাম শ্রীহরি। পীতাম্বর এই শ্রীহরি হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। ইনি নবাব সরকার হইতে 'খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর প্রচুর ধান্যসম্পত্তি ছিল। কথিত আছে, একদা কোন কার্যোপলক্ষে ইনি বহুসংখ্যক উচ্চ বংশোদ্ভব কায়স্থগণকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহাদিগের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি ক্ষুদ্র নদীর কিয়দংশ ধান্য দ্বারা পূর্ণ করিয়া, নদী পার হইবার সেতুস্বরূপ করিয়া দেন। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা, তৎক্ষণাৎ চতুর্দিকে প্রচার হইয়া পড়ে এবং পীতাম্বর দে মহাশয় সেই সময় হইতে 'ধান্য পীতাম্বর' এই নূতন নামে অভিহিত হন। পীতাম্বর, স্বীয় সমাজে গোষ্ঠীপতি ছিলেন। পীতাম্বর দেবের চারিজন প্রপৌত্র পৈতৃক বাসগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নগ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। চৌখণ্ডী উপাধিধারী জ্যেষ্ঠ শিবদাস মলুই গ্রামে, মধ্যম নিত্যানন্দ সোদপুর গ্রামে, তৃতীয় চতুর্ভুজ তালা গ্রামে এবং কনিষ্ঠ শ্রীনাথ ধলেপুর গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে মধ্যম, তৃতীয় ও কনিষ্ঠ 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের বংশধর কাশীনাথ 'মল্লিক' এবং বিজয়বল্লভ 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহাঁরা নিত্যানন্দ হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। বিজয়বল্লভের প্রপৌত্র বিদ্যাধর সোদপুর ত্যাগ করিয়া প্রথমে নাজরা ও পরে নিতাড়া গ্রামে বাস করেন। ইহাঁর ছয় পৌত্রের মধ্যে চতুর্থ দেবীদাস রায় 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মুড়াগাছা পরগনার (২৪ পরগনা) কানুনগো পদে নিযুক্ত হন। ইহাঁর ছয় পুত্র। তন্মধ্যে চতুর্থ সহস্রাক্ষ মজুমদার, নবাব মহব্বতজঙ্গ কর্তৃক তাঁহার পৈতৃক কর্ম অর্থাৎ মুড়াগাছা পরগনার কানুনগো পদে নিযুক্ত হন। পঞ্চম রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার সরকার উপাধি পাইয়া কামারপোল গ্রামে বাস করেন এবং কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত নবাব কর্তৃক মুড়াগাছা পরগনার অপ্রাপ্তবয়স্ক বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী জমিদার কেশবরাম রায়চৌধুরীর বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হন এবং নবাব-সরকার হইতে 'ব্যবহর্তা' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামেশ্বর ব্যবহর্তা পৈতৃক পদে নিযুক্ত হন কিন্তু তাঁহার আমলে নবাব-সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব বাকি পড়ায়, সাবর্ণ জমিদার কেশবরাম তাঁহাকে নিজালয়ে কারারুদ্ধ করেন। রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র রামচরণ দেব মুরশিদাবাদে গিয়া তদানীন্তন রায়-রায়ানের নিকট পরিচিত হয়েন এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মুড়াগাছা পরগনার ভার গ্রহণ করেন। রায়-রায়ান তাঁহাকে উক্ত পরগনার 'উদেদারী' পদ প্রদান করেন। অতঃপর রামচরণ পিতার উদ্ধারসাধন করেন এবং প্রতিহিংসা সাধনোদ্দেশ্যে কেশবরামকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে কেশবরাম কারামুক্ত হইলে, তাঁহার দ্বারা অনিষ্টাশঙ্কা সম্ভাবনা ভাবিয়া মুড়াগাছা ত্যাগ করিয়া রামচরণ প্রাচীন কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ গঙ্গাতীরবর্তী গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। অতঃপর তিনি নবাব কর্তৃক হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমক-মহলের কর সংগ্রাহক কার্যে নিযুক্ত হন। এই কার্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করায় নবাব তাঁহাকে কটকের সুবাদারের অধীনে দেওয়ানি পদ প্রদান করেন। তৎকালীন আর্কটের নবাবের ভ্রাতা মনিরুদ্দীন খাঁ সহোদরের সহিত বিবাদ করিয়া মুরশিদাবাদে নবাব আলিবর্দি খাঁর আশ্রয় লাভ করিয়া মুরশিদাবাদে ছিলেন। নবাব আলিবর্দি খাঁ ভবিষ্যতে এই মনিরুদ্দীনকে কটকের সুবাদারি

১. রাজা প্রমথনাথ রায়ের জন্ম ১৮৪৯, মৃত্যু ১৮৮৩।

দিয়া উড়িষ্যার বর্গী দমনার্থে প্রেরণ করেন ও রামচরণ তাঁহার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। জনশ্রুতি এই, এই কটকযাত্রার পথে সুবাদার মনিরুদ্দীন খাঁ ও তাঁহার দেওয়ান রামচরণ পিণ্ডারী দস্যুগণ কর্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া নিহত হন।

রামচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী তিনটি শিশু পুত্র ও পাঁচটি কন্যা লইয়া বড়ই বিভ্রাটে পড়িলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে আবার তাঁহাদের গোবিন্দপুরের বাটি গঙ্গার ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ায়, দেওয়ান রামচরণের পত্নী নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। রামচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণের দুর্দশা ঘটিবার আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। রামচরণ উড়িষ্যা যাত্রাকালে হুগলীর বিখ্যাত সওদাগর খোজা ওয়াজিদের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ভার প্রদান করিয়া যান। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই খোজা ওয়াজিদেরও মৃত্যু হওয়ায়, রামচরণ পত্নী অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে সহায়শূন্য হন। এই সময়ে গঙ্গার ভাঙ্গনে বসতবাটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায়, গোবিন্দপুরেই আর একখানি বাটি নির্মিত হয়, কিন্তু দুর্গ নির্মাণের জন্য উক্ত স্থান প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানি আড়পুলীতে কয়েক বিঘা জমি ও কয়েক সহস্র টাকা তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার পরে রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসুন্দর আড়পুলীর জমি বিক্রয় করিয়া সুতালুটির মধ্যস্থিত পাবনার বাসনা (আধুনিক শোভাবাজার) নামক স্থান জমি ক্রয় করিয়া বাড়ি নির্মাণ করান। যাহা হউক, অত্যন্ত সাংসারিক কষ্টেও রামচরণ-পত্নী পুত্র তিনটিকে সুশিক্ষিত করিতে বিন্দু মাত্রও ত্রুটি করেন নাই। অবশেষে জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পঞ্চকোটের দেওয়ান হন এবং সাংসারিক অস্বচ্ছলতা দূর করেন। অতঃপর তিনি ও মধ্যম মাণিক্যচন্দ্র ১১৭৯ হিজরীতে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে রায় উপাধি ও এক হাজারী মনসব-দারের পদ প্রাপ্ত হন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহাদিগেরই কনিষ্ঠ সহোদর।

নবকৃষ্ণ ১১৩৯ সালে (১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে) মুড়াগাছার পৈতৃক-বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন গোবিন্দপুরেই তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে জননীর যত্নে ইনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অর্থোপার্জন চেষ্টায় ইনি প্রথমে কলিকাতায় ধনকুবের লক্ষ্মীকান্ত ধরের (নকুধর) সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহারই চেষ্টায় কলি-কাতায় ইংরাজ মহলেও পরিচিত হন। কিন্তু নবকৃষ্ণের বংশধরেরা এ কথা অস্বীকার করেন। এই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সামান্য কেরাণী ছিলেন, তিনি নব-কৃষ্ণকে তাঁহার ফার্সী-শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হেস্টিংস ও নবকৃষ্ণ সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহা-দিগের মধ্যে বিশেষ মিত্রতা জন্মিয়া ছিল। ইহার তিন বৎসর পরে হেস্টিংস সাহেব কাশিমবাজারের কুঠিতে প্রেরিত হইলে নবকৃষ্ণও তাঁহার সঙ্গে যান।

কাশিমবাজারে বাসকালে নবকৃষ্ণ হেস্টিংসের দূতরূপে মধ্যে মধ্যে কলিকাতার কাউন্সিলে আসিতেন, সুতরাং নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রথমে যে ষড়যন্ত্র হয়, তিনি তাহা সম্পূর্ণই অবগত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্র সংবাদ অবগত হইয়া, নবাব যখন কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসেন, তখন তিনি [illegible] কুঠি লুণ্ঠন করিয়া হেস্টিংস প্রভৃতি কুঠিয়াল ও রেসিডেন্টকে বন্দী করেন। নবকৃষ্ণ এই সময়ে হেস্টিংসকে কান্তবাবুর সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া, স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের এই দুঃসংবাদ দেন। নবকৃষ্ণেরই সহায়তায় কলিকাতার ইংরাজগণ পূর্ব হইতে সতর্ক হইবার অবসর পাইয়াছিলেন।

অল্পকাল পরেই নবাব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া চিৎপুরের মধ্যে ছাউনি স্থাপন করিলেন। ইহার অল্পদিন পূর্বে মু[illegible] নবাবের বিরুদ্ধে আর একটি ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। রাজা রাজ-বল্লভ এই সময়ে কলিকাতার ইংরাজগণের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভের দূত কলিকাতার তদানীন্তন গবর্ণর ড্রেকের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিল, যেন রাজার পত্রখানি একজন বিশ্বস্ত হিন্দুকে দিয়া পাঠ করান হয় এবং সেই বিশ্বস্ত হিন্দুই যেন ইহার উত্তর লিখেন। ড্রেক নবকৃষ্ণকে দিয়া গোপনে পত্র পড়াইলেন এবং তাহার উত্তর লিখিয়া দিলেন। অতঃপর বিশেষ

ভাবে এই ষড়যন্ত্রের লেখাপড়া কাজ কর্মের জন্য মুন্সী তাজউদ্দীনকে বরখাস্ত করিয়া, ড্রেক-সাহেব নবকৃষ্ণকে কোম্পানির মুন্সীপদে নিযুক্ত করিলেন। এই পদের বেতন ৬০ টাকা নির্ধারিত হইল।

নবকৃষ্ণের কার্যদক্ষতায় ড্রেক ও হলওয়েল বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার হস্তে ক্রমে গুরুতর রাজকার্যের ভার ন্যস্ত করা হইল। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা লুণ্ঠন করিয়া কলিকাতার আলীনগর নামকরণ করিয়া চলিয়া গেলে, মান্দ্রাজ হইতে কর্ণেল ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসন কলিকাতা উদ্ধারার্থে আগমন করেন। ১৭৫৬ খৃীস্টাব্দে ক্লাইভ নবাবের আদেশ অমান্য করিয়া চন্দননগর আক্রমণ করিলে, নবাব পুনরায় কলিকাতা আক্রমণের জন্য কলিকাতার পূর্বদিকস্থ হালসি বাগানে ছাউনি করিলেন। কূটনীতিজ্ঞ ক্লাইভ তাঁহার সৈন্যবলের সম্বন্ধে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য, নবকৃষ্ণকে নানাবিধ উপঢৌকন সমেত দূতরূপে নবাবের নিকট পাঠাইলেন। নবকৃষ্ণ প্রকাশ্যভাবে দূতস্বরূপ গিয়া নবাবের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ক্রোধশান্তির চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার সৈন্যবলের বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইয়া ক্লাইভকে জানাইলেন। পরদিন কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে তাঁহারই বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ক্লাইভ অসতর্ক নবাবসৈন্যকে আক্রমন করেন। এদিকে নবকৃষ্ণ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ৩০০ গোপ আনাইয়া হালসির বাগান, নন্দনবাগান ও বজবজ প্রভৃতি স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরাজ-সৈন্যগণ যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহারাও অমনি চারিদিক হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে লাগিল। ইহাতে নবাবের সৈন্যগণ ইংরাজপক্ষকে বহুবলশালী মনে করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। ক্লাইভ বিনা আয়াসেই কলিকাতা উদ্ধার করিলেন। ক্লাইভ নবকৃষ্ণের এ কার্যকুশলতা কখনও বিস্মৃত হন নাই।

রেভারেণ্ড লং সাহেব লিখিয়াছেন, ১৭৫৬ খৃীস্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন তখন নবকৃষ্ণ আপনার জীবনের প্রতি মমতা না রাখিয়া, ফলতায় পলায়িত জাহাজবাসী ইংরাজদিগকে জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয়মাসকাল রসদ যোগাইয়াছিলেন। বস্তুত তিনি এরূপ দুঃসাহসিক ভাবে কার্যদক্ষতা দেখাইতে না পারিলে, নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে ইংরাজগণকে এভাবে সাহায্য না করিলে, তাঁহাদিগকে যে ভীষণ-বিপদে পড়িতে হইত তাহার আর সন্দেহ নাই।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে নবাবের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, নবকৃষ্ণই তাহাতে ইংরাজ পক্ষের যন্ত্রস্বরূপ ছিলেন। ক্লাইভই তাঁহাকে ছদ্মবেশে মুরশিদাবাদে পাঠাইয়াছিলেন।

ধরিতে গেলে নবকৃষ্ণই ইংরাজপক্ষ হইতে পলাশী যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি যে শুধু নবাবের ওমরাহগণের সহিত পরামর্শে ইংরাজগণের মুখপাত্র ছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু বহু জমিদারকে তিনিই ইংরাজপক্ষের সহায় করিয়া তুলেন। আবার যখন নবাবের ভীষণ অগ্নি-বৃষ্টির সম্মুখে ইংরাজগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনিই ক্লাইভের দূতরূপে মীরজাফরের নিকট উপস্থিত হইয়া ইংরাজের জয় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরের সিংহাসনারোহণের দিন নবকৃষ্ণ দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবাবের ধনাগার পরীক্ষার সময়েও তিনি ক্লাইভের সঙ্গে ছিলেন। কথিত আছে, নবাবের প্রকাশ্য কোষাগার ব্যতীত একটি গুপ্ত ধনাগারও ছিল। ইংরাজেরা এ সংবাদ রাখিতেন না। তাঁহারা প্রকাশ্য ধনাগারের দুই কোটি টাকা বিভাগ করিয়া লইবার পর মীরজাফর আমীর বেগ খাঁ, ইংরাজদিগের দেওয়ান রামচাঁদ রায় (আন্দুল রাজবংশের পূর্বপুরুষ) ও মুন্সী নবকৃষ্ণ এই গুপ্ত ধনাগার হইতে আট কোটি টাকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি গ্রহণ করেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের জীবনচরিত লেখক বলেন, একথার মূলে কোন বিশ্বাসযোগ্য সমর্থক প্রমাণ নাই। যে কোন কারণেই হউক নবকৃষ্ণ এই সময়ে প্রচুর বিত্তশালী হইয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর দুর্গোৎসবের অত্যল্প দিন মাত্রই অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু নবকৃষ্ণ সেই

অনুরূপ আর একটি গোপীনাথ প্রস্তুত করাইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আসলটি বাছিয়া লইতে বলেন। গোপীনাথের পুরোহিত স্বপ্নে গোপীনাথের আদেশ পাইয়া, ঘর্ম-চিহ্ন দর্শনে আসলটি বাছিয়া লয়েন। ইহাতে নবকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দ ও দ্বিতীয় শ্রীগোপীনাথকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হন। তাঁহার এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময় বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, সাইবনের নন্দদুলাল, খড়দহের শ্যামসুন্দর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিগ্রহ তাঁহার ভবনে আনীত হইয়াছিল।

পণ্ডিতগণের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা নবকৃষ্ণ বহু গায়ককে মাসিক সাহায্য প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। কবির দল ও আখড়াই গানের জন্য প্রসিদ্ধ রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু),[১] হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরু ঠাকুর), নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিওয়ালা তাঁহার সভায় প্রতিপালিত হইতেন।

এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য বহুবিধ দানও ছিল। তৎকালে গঙ্গায় বড় বড় জাহাজ কেবল কল্যাগাছি পর্যন্ত আসিতে পারিত। যাত্রীগণের সুবিধার জন্য তিনি বেহালা হইতে কুলপী পর্যন্ত ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ একটি পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন। উহা 'রাজার-জাঙ্গাল' নামে বিখ্যাত হয়। আজিও এই পথ বর্তমান আছে।[২]

কেবল স্বধর্মাবলম্বিগণের প্রতি নহে, ভিন্নধর্মাবলম্বিগণের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় গির্জা নির্মাণের জন্য হেস্টিংস ইংরাজ মহল হইতে মাত্র ৩৬,০০০ টাকা চাঁদা তুলিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু নবকৃষ্ণ একাকীই পুরাতন কেল্লার নিকটবর্তী গোরস্থান ও গোলা বারুদের আড্ডার জমি ৪৫,৭৭৭ টাকায় ক্রয় করিয়া ইংরাজগণকে দান করেন। এইস্থানে যে গির্জা নির্মিত হয় তাহাই সেণ্ট জনস্ চার্চ বা পাথুরে-গির্জা। নবকৃষ্ণের এই দান সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।

হেস্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠার টাকা নবকৃষ্ণ প্রদান করিয়াছিলেন। হেস্টিংস কোম্পানির প্রাপ্য তাঁহার ঋণ মিটাইবার জন্য, মহারাজ নবকৃষ্ণের নিকট হইতে খত লিখিয়া তিন লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ইহার কতকাংশ হইতে মাদ্রাসা প্রস্তুত হয়।

ইহা ব্যতীত কলিকাতা শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট এবং বাগবাজার ও কুমারটুলিতে গঙ্গার দুইটি ঘাট তাঁহারই কীর্তি।

শক্তি ও অর্থের আধিক্য ঘটিলে অনেকেরই পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, কিন্তু নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে এ যুক্তি বিশেষ সারবান নহে। কোম্পানির কাগজপত্র হইতে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে একটি মাত্র কারণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায়।

বাঙলা ১১৭৬ সালে বিখ্যাত ছিয়াত্তরে-মন্বন্তর সংঘটিত হয়, এই সময়ে নবদ্বীপাধিপতির প্রচুর রাজস্ব বাকি পড়ায় তাঁহার কর্মচারিগণ রাজ্য ইজারা-বিলির প্রস্তাব করেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ ও কলিকাতার অন্যান্য বণিকগণ ইজারা লইতে সম্মত হন। অতঃপর এই প্রস্তাবিত ইজারাদারগণ খাজনা তহশীল করিতে আরম্ভ করিয়া, লোভবশত নবদ্বীপাধিপতির স্বত্বনাশ করিতে উদ্যত হওয়ায়, তিনি পুনরায় জমিদারি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে ইজারাদারগণের বিপক্ষে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আদায়ের দাবী দিয়া অভিযোগ উপস্থিত করেন। নবকৃষ্ণ প্রভৃতি এই অভিযোগের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নাই। এই অভিযোগের মীমাংসার কোনও বিবরণ কোম্পানির কাগজপত্রে পাওয়া যায় না।

ইহা ব্যতীত শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্রে তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেগুলি সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হয়।

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র মহারাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক এক সুবৃহৎ সংস্কৃত কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া তাহা বিনামূল্যে দান করিয়াছিলেন। মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

---

১. রামনিধি গুপ্ত—(১৭৪১-১৮৩৯ খ্রী.) বাংলায় 'টপ্পা' গানের প্রচলন করেন।

২. কালের পরিবর্তনে পথটির রূপান্তর হইয়াছে।

নন্দকুমার

মহারাজা নন্দকুমার খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্ভবত ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাঙ্গলার মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরাজশক্তির অভ্যুদয়ের সময়ে সম্ভ্রম, গৌরব, প্রতিপত্তি ও প্রতিভায় মহারাজ নন্দকুমার অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার বহুঘটনাপূর্ণ জীবনী সম্যক আলোচনা করিতে হইলে একখানি সুবিস্তৃত পুস্তক হইয়া পড়ে, এই জন্য আমরা এখানে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনকথার অবতারণা করিব।

মহারাজা নন্দকুমার কাশ্যপ গোত্রের পীতমুণ্ডী-গ্রামী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পীতমুণ্ডী-গ্রামীরা কুলীন নহেন। তাঁহারা প্রথমে গৌণকুলীন ও পরে শ্রোত্রীয় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগের ধবল ও মলিন নামে দুই শাখা আছে। নন্দকুমার ধবল শাখায় জন্মিয়াছিলেন। ইহাঁর বংশীয়গণ কৌলিক উপাধি 'পীতমুণ্ডী' পরিত্যাগ করিয়া 'রায়' উপাধিতেই আখ্যাহিত হইয়া আসিতেছিলেন। নিম্নে মহারাজার বংশবৃক্ষ দেওয়া হইল;—
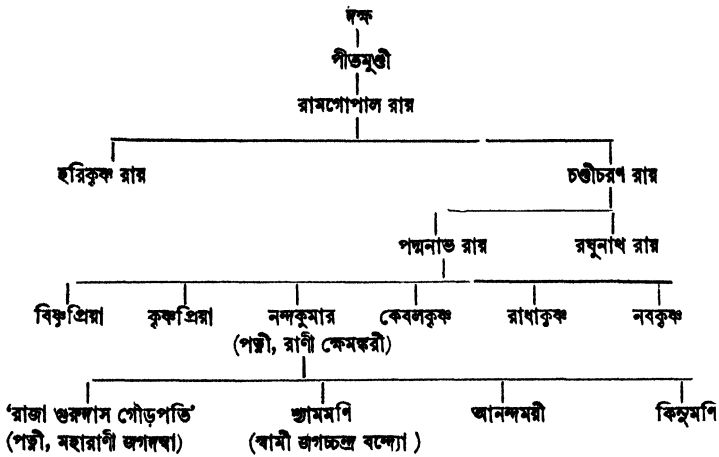
মুরশিদাবাদ জিলার জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত জরুল গ্রামে নন্দকুমারের পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল। পরে রামগোপাল রায় মুরশিদাবাদের অন্তর্গত (অধুনা বীরভূমের) ভদ্রপুর (ভাদুর) গ্রামের আচারভ্রষ্ট মথুরানাথ মজুমদারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, জ্ঞাতিবর্গের উৎপীড়নে ভদ্রপুর গ্রামেই আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণের প্রথমা পত্নীর গর্ভে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ রায় জন্মগ্রহণ করেন।

নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ রায় বিচক্ষণ নবাব মুরশিদকুলি খাঁর অধীনে ফতেসিংহ, ঘোড়াঘাটা ও সাতশইকা এই তিনটি খাস পরগনার করসংগ্রাহকের (আমীন) পদে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার পরে পিতার শিক্ষাধীনে রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্মে পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহারই সহকারী বা নায়েব-আমীনপদে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশ তাঁহার বিষয়কর্মে দক্ষতার কথা নবাবের কর্ণগোচর হয়।

১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে সরফরাজ খাঁর পতনের সহিত আলিবর্দি খাঁ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। এই বিপ্লবের সময় নন্দকুমারের বয়স ৩৫ বৎসর। বিপ্লব-শান্তির পর তিনি নবাব কর্তৃক হিজলী ও মহিষাদল পরগনার আমীন নিযুক্ত হন। কিন্তু ইহা হইতেই তিনি এক বিষম বিপদে পতিত হন। তৎকালে আমীনগণ আদায়ের সমস্ত টাকা এককালে নবাব সরকারে পাঠাইতেন না।

যেমন যখন আদায় হইত তেমনি ভাবেই টাকা পাঠাইতেন। কয়েকটি অসুবিধার জন্য সরকারে নন্দকুমারের ৮০ হাজার টাকা অনাদায়ের দরুণ বাকি পড়ে। আইনানুসারে এ টাকার জন্য তিনিই দায়ী ছিলেন। আবার অন্যদিকে তাঁহার তহশীলের পীড়াপীড়িতে, প্রজা ও জমিদারগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া নবাব আলিবর্দির খালসা-দেওয়ান রায়রায়ান চয়েন রায়ের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। দেওয়ান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মুরশিদাবাদে আহ্বান করিলেন এবং বাকী টাকার জন্য অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন। এই বিপদের সময় তাঁহার পিতা তাঁহার এই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। ইহার পর নন্দকুমার নবাব শাহ আমেদজঙ্গের নায়েব, হোসেনকুলি খাঁর নিকট একটি কর্ম প্রার্থনা করেন, কিন্তু খালসা-দেওয়ান বাহাদুরের বিরুদ্ধতায় তাঁহার চাকুরী হইল না। অতঃপর নন্দকুমার উপায়ান্তর না দেখিয়া নানা কৌশলে প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁর সহিত পরিচিত হইলেন।

এই সময়ে তাঁহার অদৃষ্টে আর একটি বিপদের সূচনা হইতেছিল। সৈন্যদলের বেতন বাকি পড়ায় মুস্তাফা খাঁ কয়েকটি জমিদারি হইতে স্বয়ং টাকা আদায় করিয়া লইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহাতে পীড়নের আশঙ্কায় জমিদারগণ এ ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য নন্দকুমারের শরণাপন্ন হন। নন্দকুমার স্বয়ং জামিন হইয়া জমিদারগণকে রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন বটে, কিন্তু উক্ত জমিদারগণ যথাসময়ে প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদান করিতে বিশেষ মনোযোগী হইলেন না। মুস্তাফা খাঁ যথাসময়ে টাকা না পাওয়াতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দকুমারকে বন্দী করিতে সঙ্কল্প করিলেন। নন্দকুমার কলিকাতায় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অনন্তর কিছুদিন পরে মুস্তাফা ও দেওয়ান রায় মজকুরের মৃত্যু হইলে, তিনি পুনরায় মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইয়া বহু-চেষ্টায় সাতশইকা পরগনার আমীনের পদ লাভ করেন। কিন্তু এই কর্মে তাঁহার প্রয়োজনমত আয় হয় নাই বলিয়া তিনি অল্পদিন পরেই উক্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া হুগলীতে গমন করেন। এই সময়ে তাঁহাকে বড়ই অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে তাঁহার অর্থকষ্ট এতদূর বর্ধিত হইয়া উঠে যে হুগলী হইতে মুরশিদাবাদে আসিবার উপযোগী অর্থের অভাবে তাঁহাকে নিজের ব্যবহার্য একখানি বহুমূল্য শাল বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

মুরশিদাবাদে কিছুদিন অবস্থানের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদারের অধীনে চাকুরী প্রার্থনা করিতে পাঠান। নন্দকুমার নবনিযুক্ত ফৌজদার হেদায়েৎ আলির অধীনে দেওয়ানি পদের প্রার্থী হন, কিন্তু তাঁহাকে বিফলমনোরথ হইয়া মুরশিদাবাদে প্রত্যাবৃত হইতে হয়। এই সকল কারণে তাঁহার অর্থকষ্ট এই সময়ে চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। যাহা হউক ইহার কিছুদিন পরে মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ পুনরায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হইলে, নন্দকুমার তাঁহার বন্ধু সাদকউল্লার সহায়তায় তাঁহার নিকটে পরিচিত হন এবং তাঁহার অধীনে দেওয়ানি-পদ প্রার্থনা করেন। কিয়ৎকাল ইতস্তত করিয়া পরিশেষে ইয়ারবেগ সাহেব তাঁহাকেই দেওয়ান পদে নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমারের আর্থিক কষ্ট দূর হইল এবং এই সময় হইতেই তিনি 'দেওয়ান-নন্দকুমার' নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন।

তিন বৎসর পরে ফৌজদার ইয়ারবেগ খাঁ পুনরায় পদচ্যুত হন এবং দেওয়ান নন্দকুমারকে সঙ্গে লইয়া মুরশিদাবাদে নিকাশ দিতে আসেন। মুরশিদাবাদে তাঁহার এক বৎসর বিলম্ব হয়। ইতোমধ্যে নবাব আলিবর্দি খাঁ দেহত্যাগ করিলেন। যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইংরাজগণের সহিত বিবাদ বাধাইয়া বসিলেন এবং এই সংস্রবে রাজা মাণিকচাঁদকে কলিকাতায় ও মির্জা মহম্মদ আলিকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মহম্মদ আলির দ্বারা শাসনের সুব্যবস্থা না হওয়ায়, নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ওমরউল্লাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন এবং নন্দকুমারকে পুনরায় তাঁহার দেওয়ান করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে আবার ওমরউল্লাকেও পদচ্যুত করিয়া নন্দকুমারকেই হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন।

ক্লাইভ এই সময়ে চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। নবাব এই সংবাদে বিরক্ত

হইয়া নন্দকুমারকে ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যের জন্য রাজা দুর্লভরামকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া কলিকাতা-নিবাসী রাজা হুজুরীমলের ভগিনীপতি আমীরচাঁদকে (উমিচাঁদ) হুগলীতে পাঠাইলেন। তিনি ইংরাজদিগের পরামর্শ মত নন্দকুমারকে নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে ফরাসীদিগের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিলেন। উমিচাঁদের নিকট সিরাজের বিরুদ্ধে ওমরাহগণের ষড়যন্ত্রের বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া নন্দকুমার ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন। অনেকে অনুমান করেন নন্দকুমারের এই আনুগত্য স্বীকারের অন্তরালে একটা গভীর উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল। তিনি তৎকালীন উদীয়মান ইংরাজ-শক্তির বিপক্ষে প্রকাশ্যভাবে দণ্ডায়মান না হইয়া কৌশলে তাহার দমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

অতঃপর নন্দকুমারের কৌশলে দুর্লভরাম মুরশিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন। ইংরাজগণ চন্দননগর আক্রমণ করিয়া তাহা জয় করিয়া লইলেন। একে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য এই সময়ে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, তাহার উপর চন্দননগর জয় করাতে ইংরাজের শক্তি যথেষ্ট পরিবর্ধিত হইল। নবাব এই সময়ে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া নন্দকুমারকে পদচ্যুত করিয়া হুগলীতে অন্য একজন ফৌজদার নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য কারণ সম্বন্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নন্দকুমার পরিশেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করিলে নন্দকুমার ক্লাইভের দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার সহায়তায় ইংরাজগণের চন্দননগর জয়। ইহা ব্যতীত রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার যেরূপ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল, তাহাও ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে। যাহা হউক, ক্লাইভের দেওয়ানরূপে তিনি অসামান্য কার্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়া ইংরাজগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তিও এতদূর বর্ধিত হইয়াছিল যে, এই সময়ে লোকে তাঁহাকে 'কালা-কর্ণেল' নামে অভিহিত করিত।

ক্লাইভ তাঁহার আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ নবাবকে অনুরোধ করিয়া হুগলী প্রভৃতি স্থানের দেওয়ানি নন্দকুমারকে প্রদান করাইলেন এবং কোম্পানির অধীনেও একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্মের ভার দিলেন। নবাব মীরজাফর সন্ধির প্রতিশ্রুত টাকা শোধ করিতে না পারায়, নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা ইংরাজগণকে ছাড়িয়া দেন। নন্দকুমার ১৭৫৮ খৃঃ অব্দের ১৯শে আগস্ট তারিখে ইংরাজ পক্ষ হইতে এই দুই স্থানের তহশীলদারী পদ প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ দুই স্থানের রাজাদিগকে ডাকাইয়া খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত স্থির করিয়া লন।

ইহার অল্পদিন মাত্র পরেই এক বিশেষ ঘটনায় নন্দকুমারকে নবাব-সরকারের চাকুরী পরিত্যাগ করিতে হয়। নবাব মীরজাফর এই সময় বড়ই অর্থকষ্টে পতিত হন। এইজন্য তিনি সর্বদাই রাজা রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। অবশেষে রায়দুর্লভের সহিত নবাবের বিবাদ বাধিয়া যায়। ইহার উপর আবার ঢাকার শাসনকর্তা নবাবপুত্র মীরণ রাজা রায়দুর্লভের নিকট ঢাকা-বিভাগের হিসাবপত্রের নিকাশ তলব করেন। এইরূপে সর্ববিষয়ে উৎপীড়িত হইয়া রায়দুর্লভ নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহায়তায় কলিকাতায় পলায়ন করিতে সমর্থ হন। এই ব্যবহারে নবাব তাঁহাদিগের উভয়েরই উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু নন্দকুমারের নিকট হইতে ইংরাজগণ প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দান করিলেন। অতঃপর নবাব প্রকাশ্যভাবে নন্দকুমারের কোন ক্ষতি করিতে না পারিয়া, তাঁহার প্রতি কার্যের দোষ ধরিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে নন্দকুমার ক্রমে ক্রমে উত্যক্ত হইয়া নবাব সরকারের চাকুরী পরিত্যাগ করেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে নন্দকুমার ইংরাজগণের অধীনে নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন। নবাবের সহিত ইংরাজের বন্দোবস্ত অনুসারে এই রাজস্ব আদায় হইয়া প্রথমে নবাব-

সরকারে ও পরে তথা হইতে ইংরাজ-কোম্পানির নিকট যাইবার কথা ছিল। কিন্তু নন্দকুমার কাউন্সিলের সরাসরি ব্যবস্থা অনুসারে তহশীলের টাকা একেবারেই কলিকাতায় লইয়া আসিতে লাগিলেন। ইহাতে নবাব-দরবারে তদানীন্তন রেসিডেন্ট ওয়ারেন হেস্টিংস প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া, তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং কাউন্সিলের নিকট এই ব্যাপারের প্রকৃত তথ্য জানিতে চাহেন। ক্লাইভ ইহার উত্তরে তাঁহাকে প্রকৃত সংবাদ অবগত করিলেও নন্দকুমারের এতদূর প্রভুত্ব হেস্টিংসের মনঃপূত হইল না। নিজের স্বার্থে আঘাত লাগায়, তিনি নানা উপায়ে নন্দকুমারের প্রভাব খর্ব করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সর্ববিষয়েই ক্লাইভ নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থন করায় তিনি নন্দকুমারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। হেস্টিংস রাজস্বের টাকা স্বহস্তে আদান প্রদান করিয়া ইহার মধ্য হইতে কৌশলে কিছু নিজের তহবিলে ফেলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু কলিকাতা-কাউন্সিল রাজস্ব সম্বন্ধে নবাবকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিতে মনস্থ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন।

ক্লাইভের পর ভ্যান্সিটার্ট কলিকাতার গবর্ণর হইয়া আসিলেন। তিনি প্রথমত নন্দকুমারকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাঁহার শত্রু হেস্টিংসের প্ররোচনায় তাঁহাকে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাসিমকে সিংহাসন প্রদান করেন। মীরজাফর পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় আলিপুরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং নন্দকুমারের প্রতি পূর্ব বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া পড়েন। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে ইংরাজের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে নন্দকুমারেরও ক্ষমতা লোপ হইতেছিল। তিনি মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসন প্রদান করিবার জন্য বিহারপ্রবাসী সম্রাট শাহ আলমের সহিত অতি গোপনে পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। দৈবদুর্বিপাকবশত এই ষড়যন্ত্রের একখানি পত্র ইংরাজগণের হস্তগত হয়। অতঃপর নন্দকুমারের বাটি খানাতল্লাসী করিয়া ভ্যান্সিটার্ট আরও কতকগুলি গুপ্ত পত্র প্রাপ্ত হন। হেস্টিংস এই সকল পত্র পাইয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করেন এবং নন্দকুমার কোন প্রকারে এ যাত্রা অব্যাহতি পান।

এই সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ গুপ্তভাবে ব্যবসায় চালাইয়া কোম্পানির যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছিলেন। এ সম্বন্ধে কতকগুলি চিঠিপত্র নন্দকুমারের হস্তে পতিত হওয়ায়, নন্দকুমার সেইগুলি লইয়া কাউন্সিলে এক আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইহাতে বহু ইংরাজ তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। যাহা হউক, এই আন্দোলনের ফলে কোম্পানির কর্মচারী মহলে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। এক দলে হেস্টিংস ও ভ্যান্সিটার্ট এবং অপর দলে আমিয়ট ও এলিস মুখপাত্র হন। বিহারের গোলমাল মিটাইবার জন্য কলিকাতায় নবাগত কর্ণেল কুটকে পাটনায় পাঠান সাব্যস্ত হইলে, কুট, আমিয়ট ও এলিসের পরামর্শে নন্দকুমারকে তাঁহার প্রধান কর্মচারীরূপে সঙ্গে লইয়া যান। নন্দকুমারের ইচ্ছা ছিল স্বাধীনচেতা নবাব মীরকাসিমকে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিয়া তাঁহাকে ইংরাজদমনে প্রবৃত্ত করিবেন, কিন্তু নবাব তাঁহার অসীম ইংরাজানুরক্তির নিমিত্ত অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে নিজপক্ষে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই।

এই সময়ে 'রামচরণ রায়' স্বাক্ষরিত কয়েকখানি গুপ্তলিপি আবিষ্কার হওয়াতে, নন্দকুমার আবার ইংরাজের সন্দেহনেত্রে পতিত হন। এই সকল পত্রে ইংরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস ছিল। এজন্য গবর্ণর তাঁহাকে প্রহরী-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়া দেন। কিন্তু ইহার অল্প দিন পরে মীরকাসিমের পতনের পর, মীরজাফর যখন পুনরায় সিংহাসনপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি নন্দকুমারকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিতে চাহেন। ইংরাজ পক্ষ প্রথমে এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেও, অবশেষে নবাবের অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইলেন। সম্রাটের সহিত সন্ধি হইবার পর নবাব মীরজাফর আলি খান বাদসাহের নিকট হইতে 'মহারাজা' উপাধি আনাইয়া নন্দকুমারকে প্রদান করিলেন। এই সময়ে নন্দকুমার দেওয়ান হইয়া রাজস্ব আদায়ের যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করেন।

মহারাজ নন্দকুমারের বিহারে অবস্থানকালে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের এক গুপ্ত পত্র ইংরাজগণ

ঘটনাচক্রে ধরিয়া ফেলেন। ইহাতে সপ্রমাণ হইল নন্দকুমার বাদসাহের সাহায্যে ইংরাজদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং বলবন্ত সিংহ এই ব্যাপারে মধ্যস্থ হইয়াছেন। এই পত্র পাইয়া ইংরাজেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। জেনারেল কার্ণাক নন্দকুমারকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু রাজা নবকৃষ্ণ ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিশেষ অনুরোধে অবশেষে তিনি এ কার্যে নিরস্ত হন।

ইহার পর দুই বৎসরকাল ধরিয়া নবাবের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নন্দকুমার ইংরাজগণের সহিত প্রচুর বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতি ইংরাজগণের বিরক্তি ও ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। অবশেষে ১৭৬৫ খৃীস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে এই তর্কবিতর্কের পরিসমাপ্তি হয়। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলা নবাব হইয়া নন্দকুমারকে দেওয়ান নিযুক্ত করিবার জন্য ক্লাইভকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ক্লাইভ এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ক্লাইভ এই সময়ে দ্বিতীয়বার গবর্ণর হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পূর্বে নন্দকুমারের বন্ধু ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে ভ্যান্সিটার্টের তীব্র মন্তব্য পাঠ করিয়া তাঁহার উপর বীতরাগ হইয়া উঠেন। মহারাজ নন্দকুমার পদচ্যুত হওয়ায়, তাঁহার স্থানে মহম্মদ রেজা খাঁ বঙ্গের নায়েব-সুবাদার হইলেন। ক্লাইভ নন্দকুমারকে কেবল পদচ্যুত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না পরন্তু তাঁহাকে চট্টগ্রামে নির্বাসিত করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু এ বারেও মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতির সনির্বন্ধ অনুরোধে নন্দকুমার এ ঘোর বিপত্তি হইতে বাঁচিয়া যান।

ইহার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাদসাহের নিকট হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেওয়ান হওয়া সত্ত্বেও মহম্মদ রেজা খাঁকেই তাঁহাদিগের প্রতিনিধিরূপে নায়েব দেওয়ান করিয়া দিলেন। এই মহম্মদ রেজা খাঁ ইতঃপূর্বে নায়েব-সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মুসলমান সমাজের উপর বড়ই আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাজা নন্দকুমারও হিন্দুসমাজের সর্ববাদিসম্মত নেতা ছিলেন।

নন্দকুমার সরকারি কার্য পরিত্যাগের পর কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্লাইভ ক্রমে ক্রমে ভ্যান্সিটার্টের শাসনের অনেক নিন্দা শুনিতে পাইয়া, নন্দকুমারকে উক্ত শাসনের একটি যথাযথ বিবরণী লিখিতে আদেশ করেন। নন্দকুমার উপযুক্ত তথ্যানুসন্ধান করিয়া এক বিবরণী লিখিলে, ক্লাইভ এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের পর, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহা বিলাতে লইয়া যান। ইহাতে নন্দকুমার ভ্যান্সিটার্ট কর্তৃক আপনার চরিত্রের উপর আরোপিত কতকগুলি অভিযোগ মিথ্যা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

ক্লাইভের পর ভেরেলস্ট বাঙ্গলার গবর্ণর হন। তিনি প্রথম প্রথম নন্দকুমারকে বিশ্বাস করিতেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার শত্রুপক্ষের প্ররোচনায় তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়েন। কথিত আছে, মহারাজা নবকৃষ্ণ এই সময়ে নন্দকুমারের যথেষ্ট শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকারে ভেরেলস্টের বিরক্তি বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার কারণও ছিল। নন্দকুমার তখন সর্ববিষয়ে দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু নবকৃষ্ণ প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াও সমাজে কিছুমাত্র আধিপত্য করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই নন্দকুমারের এই সামাজিক প্রতিপত্তির উপর তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে নবকৃষ্ণ অত্যধিক অত্যাচারপরায়ণও হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহারা নবকৃষ্ণের দ্বারা উৎপীড়িত হইত তাহারা মহারাজা নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। নন্দকুমার ইহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। ইহাও তাঁহার উপর নবকৃষ্ণের ক্রোধের আর এক কারণ।

১৭৬৯ খৃীস্টাব্দে কার্টিয়ার সাহেব বঙ্গদেশের গবর্ণর হন। ইহাঁর সময়েই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' আরম্ভ হয়। নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ এই মন্বন্তরের অনুচরের ন্যায় ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সর্বনাশকর অত্যাচারের তালিকায় বাঙ্গলার ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি বাজারের সমস্ত চাউল স্বয়ং ক্রয় করিয়া লইয়া অত্যধিক

উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং সরকারি তহবিল হইতে বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইহার উপর রাজস্ব আদায়ের জন্য পৈশাচিক অত্যাচারেরও বিরাম ছিল না। প্রজার কষ্টে অত্যন্ত কাতর হইয়া মহারাজা নন্দকুমার স্বীয় ব্যয়ে বিলাতে একজন এজেণ্ট পাঠাইয়া ডাইরেক্টারগণকে এই অত্যাচার-সংবাদ অবগত করান। এই প্রতিনিধি প্রেরণের ফলে, বিলাতের কর্তারা হেস্টিংসকে নন্দকুমারের সাহায্যে সর্বাগ্রে রেজা খাঁর বিচার করিতে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। হেস্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁ ও পাটনার শাসনকর্তা রাজা সিতাব রায়কে ধরিয়া আনাইলেন এবং বাধ্য হইয়া মহারাজা নন্দকুমারের উপরই এ বিষয়ের তদন্তের প্রধান ভার প্রদান করিলেন। এমন কি সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি নন্দকুমারকে সমগ্র বঙ্গদেশের আমীন নিযুক্ত করিবার আশা পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন। গবর্ণরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া, নন্দকুমার উভয়ের তহবিল-তছরুপাতের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ নবাব-সরকারের বহুবিধ মূল্যবান রত্নালঙ্কার, হস্তী, অশ্ব এবং ১১৭২ সাল হইতে ১১৭৮ সাল পর্যন্ত ছয় বৎসরে বাঙ্গলা ও ঢাকার রাজস্ব হইতে ২০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। মন্বন্তরের সময় বাজারের সমস্ত চাউল একচেটিয়া করিয়া অত্যন্ত উচ্চদরে বিক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন কয়েকটি সরকারি-সম্পত্তির উপস্বত্ব নিজে ভোগদখল করিতেছিলেন। হুগলীর ফৌজদার রেয়াজউদ্দিন মহম্মদ খাঁ শ্রীহট্টের ফৌজদার মহম্মদ আলি খাঁ কোম্পানি বাহাদুরের নিকট প্রায় এক লক্ষ টাকার দায়ী ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি কোম্পানির হস্তে না দিয়া, রেজা খাঁ নিজে ক্রোক করিয়া ভোগদখল করিতেছিলেন। পদচ্যুত হইয়াও নায়েব সুবাদারের পদোচিত জায়গীর ও জমিদারি তখন পর্যন্ত দখল করিতে ছাড়েন নাই। আর সিতাব রায় ১১৭৩ (ফসলী) সালের প্রথম হইতে ১১৮১ (ফসলী) সালের শেষ পর্যন্ত কম-বেশী নব্বই লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার এ বিষয়ে প্রমাণ জন্য বহু গণ্যমান্য সাক্ষীও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উদ্ধারের উপায়ান্তর না দেখিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ হেস্টিংসকে দশ লক্ষ ও নন্দকুমারকে দুই লক্ষ এবং সিতাব রায় হেস্টিংসকে চারি লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চাহেন, কিন্তু হেস্টিংস ও নন্দকুমার উভয়েই ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহার অল্পদিন পরে নজমউদ্দৌলার নাবালক পুত্র মোবারকউদ্দৌলা সিংহাসন গ্রহণ করিলে, তাঁহার অভিভাবক হইবার জন্য তাঁহার মাতা বহু বেগম ও তাঁহার বিমাতা মণিবেগম উভয়েই আবেদন করিয়াছিলেন। মণিবেগম নন্দকুমারের মধ্যস্থতায় হেস্টিংসকে আড়াই লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান করিতে চাহেন। ইহার পর নন্দকুমার স্বীয় পুত্র গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত করিবার প্রার্থনা করিলে, হেস্টিংস তাঁহার নিকট হইতেও কিছু নজর চাহেন। নন্দকুমারও লক্ষাধিক টাকা প্রদান করিয়া মণিবেগম ও গুরুদাসের নিয়োগ-পত্র সংগ্রহ করেন। রাজা গুরুদাসের নিয়োগ-ব্যাপারে হেস্টিংস কাউন্সিলের মতামত উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করেন।

তাহার পর মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের বিচার চলিতে লাগিল। ইহাঁদিগের বিরুদ্ধে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও, হেস্টিংসের দুই বর্ষব্যাপী বিবেচনার ফলে ও বিচারে তাঁহারা নির্দোষ সাব্যস্ত হইলেন। সিতাব রায় মুক্তিলাভের পর অল্পকালমাত্রই জীবিত ছিলেন। যাহা হউক, হেস্টিংস সাধারণের চক্ষে নন্দকুমারকে এইরূপে অপদস্থ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পরন্তু ১৭৭৪ খৃীস্টাব্দের মার্চ মাসে এই মোকদ্দমার বিবরণী বিলাতে পাঠাইবার সময়, তাহাতে তাঁহাকে শঠ, প্রবঞ্চক, অকৃতজ্ঞ প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করেন। ইহার পর পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মত মহারাজাকে বঙ্গদেশের আমীনপদে নিযুক্ত করা দূরে থাক, কি অপরাধে তাঁহাকে এরূপ গালি দেওয়া হইয়াছে, হেস্টিংস তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

এই সময়ে বিলাতের প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ ভারতের শাসনকার্য সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 'রেগুলেটিং-অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুসারে হেস্টিংস বঙ্গদেশের গবর্ণর জেনারেল হইলেন এবং তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য জেনারেল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন ও ফিলিপ

ফ্রান্সিস ও বারওয়েল নামে চারিজন অতিরিক্ত সভ্য সদস্যরূপে নিযুক্ত হন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের বিচার-পদ্ধতি সুসংস্কৃত করিবার জন্য স্যর ইলাইজা ইম্পি প্রধান বিচারপতি এবং হাইড লিমেস্টার ও চেম্বার্স নামক আর তিনজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি সরকারি বিচারকরূপে নিযুক্ত হন। প্রধান বিচারপতি ইম্পি গবর্ণর জেনারেল হেস্টিংসের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবর মাসে যখন এই সকল নব-নিযুক্ত কর্মচারী চাঁদপাল ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গপ্রাকার হইতে ২৭টি তোপধ্বনি হইল বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য কয়েকজন সামান্যমাত্র কর্মচারি ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। হেস্টিংসের এই অহঙ্কারপূর্ণ ব্যবহারে তাঁহার সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট নবাগত সদস্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। যাহা হউক, তাঁহারা ইহার পর সভায় হেস্টিংসের কৃতকর্মের ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং এই ব্যাপারে অনেকটা নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা দেবীসিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, মিঃ গুডল্যাড, মুক্তিপ্রাপ্ত রেজা খাঁ ও মহারাজা নবকৃষ্ণ প্রভৃতি হেস্টিংসের অনুচরগণ কর্তৃক জমিদার ও প্রজাবর্গ বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহারা প্রতিকারের আশায় নন্দকুমারের শরণাপন্ন হইলেন। একেই ত নন্দকুমারের উপর হেস্টিংস প্রথম হইতেই বিরূপ ছিলেন, ইহার উপর আবার এক্ষণে তাঁহাকে তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বলিয়া ধারণা জন্মিল।

এ দিকে কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত নন্দকুমারের পরিচয় হইল। তাঁহারা নন্দকুমারের সম্যক পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকেই হেস্টিংসের অবিচার ও অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহের ভারগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নন্দকুমারও ইদানিং হেস্টিংসের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই প্রস্তাবিত ভার গ্রহণ করিতে সহজেই স্বীকৃত হইলেন।

ইহার পর তিনি হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ একত্র করিয়া এক আবেদনপত্র প্রস্তুত করিলেন এবং তাহা কাউন্সিলের সদস্য মিঃ ফ্রান্সিসের হস্তে প্রদান করিলেন। এই সময়ে হেস্টিংসের বিরুদ্ধবাদী মিঃ ফ্রান্সিসের সহিত নন্দকুমারের বিশেষ সৌহার্দ্য হইতে দেখিয়া হেস্টিংস নন্দকুমারের সর্বনাশের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করেন। বর্ধমানের রাজস্ব আদায় লইয়া রেসিডেণ্ট মিঃ গ্রেহামের সহিত নন্দকুমারের পূর্ব হইতেই মনান্তর ছিল। বোলাকিদাস শেঠ নামক এক-জন আগরওয়ালা মণিকারের মৃত্যুর পর হিসাবাদি লইয়া তাহার আমমোক্তার মোহনপ্রসাদের সহিত নন্দকুমারের বিবাদ হইয়াছিল। আর নন্দকুমারের আপন জামাতা কুঞ্জঘাটা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বশুরের সহিত তুলনায় নিজের হীনতার জন্য শ্বশুরের উপরে অকারণে বিরূপ ছিলেন। হেস্টিংস নন্দকুমারকে জব্দ করিবার মতলবে এই তিন ব্যক্তিকে হস্তগত করিলেন। এ দিকে কাউন্সিলের সদস্যগণের সহিত হেস্টিংসের প্রকাশ্য বিবাদ চলিতে লাগিল। হেস্টিংস তাঁহার প্রত্যেক কার্যেই বাধা পাইয়া দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন।

ইহার পরে যে ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহাতে তদানীন্তন কলিকাতা তথা সমগ্র বঙ্গদেশে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সমগ্র হিন্দু সমাজ আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যাপারটি ইতিহাস-বিখ্যাত—'নন্দকুমারের ফাঁসী'।

নন্দকুমারের ফাঁসী-সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান, অথবা উভয় পক্ষের দোষগুণ বিচার, বর্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা এখানে সংক্ষেপে কেবল ঘটনাগুলির উল্লেখ করিলাম মাত্র।

হেস্টিংস নন্দকুমারের সর্বনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কমলউদ্দিন খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে হাত করিয়া তাঁহার নামে একটি মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, কিন্তু এই মোকদ্দমার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠায় হেস্টিংস নিরাশ হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একখানি অঙ্গীকার-পত্র জালের অভিযোগ আনীত হয়। তৎকালে ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে অর্থাৎ তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জের বিধানানুসারে 'জাল' এবং 'খুনের' অপরাধের দণ্ড একরূপই ছিল। এজন্য হেস্টিংস এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

মীরকাসিমের আমল হইতে বোলাকিদাস জহুরীর জহরতের কারবার ছিল। নন্দকুমারের সহিত বোলাকিদাসের কারবার চলিত। মীরকাসিমের আমলে নন্দকুমার এক ছড়া মুক্তার কণ্ঠী, একখানি কলকা, একটি শিরপ্যাচ ও একটি হীরকাঙ্গুরী বোলাকিদাসকে বিক্রয় করিতে দেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় [illegible] লুট হওয়ায় বোলাকিদাসের নিজের মালামালের সহিত এগুলিও লুট হয়। অতঃপর বোলাকিদাস নন্দকুমারকে সেই দ্রব্যগুলির মূল্যবাবদ ৪৮০০২১ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া এক অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেন এবং শতকরা চারি আনা সুদ দিতেও স্বীকার করেন। এই দলিলে মাতাব রায় (মহাতাপ রায়), মহম্মদ কমল ও বোলাকির উকিল সিলাবৎ সাক্ষী হইয়া সহি করেন। তৎপরে বোলাকি নিজের সহি ও মোহর করিয়া দিয়া উহা নন্দকুমারকে প্রদান করেন।

কোম্পানির নিকট বোলাকির দুই লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। বোলাকির মৃত্যুর পর এই টাকা আদায় হইলে, তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক পদ্মমোহন দাস নন্দকুমারের পাওনা টাকা পরিশোধ করেন। অতঃপর পদ্মমোহনের মৃত্যুর পর, বোলাকির এক আত্মীয় গঙ্গাবিষ্ণু এই টাকার হিসাব লইয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। কিন্তু নন্দকুমার পূর্বোক্ত অঙ্গীকারপত্রের বলে এই মোকদ্দমায় জয়ী হন।

এক্ষণে হেস্টিংসের মনে সেই মোকদ্দমার কথা উদয় হইবামাত্র তিনি বোলাকির আমমোক্তার মোহনপ্রসাদকে দিয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে বোলাকির উক্ত অঙ্গীকারপত্র জাল করার দাবিতে, এক অভিযোগ উপস্থিত করাইলেন (১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে)। অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রীম-কোর্টের জজেরা তৎকালীন সেরিফ মিঃ ম্যাক্রেবীকে আদেশ দিয়া নন্দকুমারকে কারারুদ্ধ করাইলেন। নন্দকুমারের মত গণ্যমান্য সমাজনেতা পদস্থ ব্যক্তিকে সাধারণ কারাগারেই থাকিতে হইয়াছিল। সাধারণ্যে বিশেষ আন্দোলন সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত করা জজগণ সঙ্গত মনে করেন নাই। কারাগারে নন্দকুমার উপর্যুপরি তিন দিন জলগ্রহণও না করায়, অবশেষে কারাগারের উঠানে একটি তাঁবু খাটাইয়া সেই খানেই তাঁহাকে স্নান, পূজার ও আহারের অধিকার দেওয়া হয়।

৮ই জুন জাল মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। ৯ই জুন প্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজা ইম্পি অন্য তিনজন বিচারপতি এবং ১২জন জুরী বিচার আরম্ভ করিলেন। কয়েকদিন ব্যাপী মোকদ্দমার পর অবশেষে ১৫ই জুন অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিচার হইয়া তৎপরদিন মহারাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল।

নন্দকুমার দণ্ডাদেশের পর ২২ দিন যাবৎ কারাগারের একটি দ্বিতল গৃহে আবদ্ধ ছিলেন। নবাব মোবারকউদ্দোল্লা কাউন্সিলে এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করেন যে, ইংলণ্ডাধিপতির নিকট এই ব্যাপার লিখিয়া পাঠান হউক এবং তাঁহার আদেশ না আসা পর্যন্ত, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় নবাবের এ অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

৫ই আগস্ট তারিখে খিদিরপুরের নিকট [illegible] (আধুনিক হেস্টিংস) মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী হইয়া গেল। কথিত আছে, বহু স্বধর্মানুরক্ত ব্রাহ্মণ এই ঘটনার পর কলিকাতায় বাস করিতে ভীত হইয়া গঙ্গার অপর পারে যাইয়া বাস করেন।

জানবাজারের মাড়বাবুগণ
(রাণী রাসমণি)

পলাশী-যুদ্ধের চারি বৎসর পূর্বে ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে এক দরিদ্রের গৃহে প্রীতিরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সামান্য বাঙ্গলা ভাষা ও গণিত শিক্ষা করিয়া ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে চতুর্দশ বৎসর বয়সে মাতৃপিতৃহীন প্রীতিরাম, রামতনু ও কালীপ্রসাদ নামক দুই কনিষ্ঠ সহোদর সহ কলিকাতায় জানবাজারের তদানীন্তন বিখ্যাত জমিদার মান্নাবাবুদিগের পুরস্ত্রী, তাঁহার পিতৃম্বসার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অল্প ইংরাজি ভাষা শিখিয়া দালালী ও ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে ইংরাজসৈন্যের রসদ যোগাইবার কার্য করিতে লাগিলেন।

এই সূত্রে ফোর্টের অনেক পদস্থ ইংরাজ কর্মচারীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া প্রীতিরাম তাঁহার সহিত ঢাকায় গমন করেন ও তথায় উক্ত ইংরাজের সহায়তায় নাটোর রাজসরকারে এক বিশিষ্ট কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রীতিরাম সঞ্চিত অর্থ সহ নাটোর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, আশ্রয়দাতা মান্না-পরিবারের যুগল-মান্নার একাদশ বর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ ফলে জানবাজারের কয়েকখানি বাড়ি ও ষোল বিঘা জমি যৌতুক লাভ করেন। এই বিবাহের ফলস্বরূপ ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুত্র হরচন্দ্র এবং ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রীতিরাম আমদানি ও রপ্তানির কার্য করিতেন। পরে ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে বার্ন কোম্পানি নামক তদানীন্তন ইংরাজ-বণিকদলের মুৎসুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে নাটোররাজের অধিকারস্থ কয়েকটি পরগনা লাটে উঠিলে, দেওয়ান শিবরাম সান্যা-লের সহায়তায় প্রীতিরাম উনিশ হাজার টাকায় মকিমপুর পরগনা খরিদ করিলেন। কনিষ্ঠ সহোদর কালীপ্রসাদ নবক্রীত পরগনার নায়েবী কার্যভার গ্রহণ করিয়া এই জমিদারি হইতে কলিকাতার বাটিতে বাঁশ, কাঠ, মৎস্য প্রভৃতি চালান দিতে লাগিলেন। প্রীতিরাম ঐ সকল পণ্য বিক্রয়ের জন্য বেলেঘাটায় একটি আড়ত স্থাপন করিলেন। সেকালে অনেকগুলি বাঁশ একত্রে বাঁধিয়া নদীতে ভাসাইয়া আনা হইত। ইহাকে চলিত কথায় 'বাঁশের মাড়' বলে। বংশ-ব্যবসায়ী প্রীতিরাম এইরূপে 'মাড়' নামক ব্যবসায়গত উপাধি লাভ করেন। এই সময়েই বেলেঘাটায় একটি লবণের আড়ত স্থাপিত হয়।

প্রীতিরাম পুত্রদ্বয়কে তৎকালসুলভ শিক্ষা প্রদান করিয়া তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কনিষ্ঠ রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ ও সেই বৎসরেই স্ত্রীবিয়োগ হইলে, প্রীতি-রাম পরবৎসর পুত্রের পুনর্বার বিবাহ দেন। সে স্ত্রীও বিবাহবৎসরেই গতায়ু হন। ঐ বৎসরেই জ্যেষ্ঠপুত্র হরচন্দ্র একমাত্র বিধবা রাখিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রীতিরাম কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্রের তৃতীয়বার বিবাহ দেন। রাজচন্দ্রের এই সহধর্মিণী উত্তরকালপ্রবিখ্যাতা রাণী রাসমণি। প্রীতিরামের জীবদ্দশায় রাজচন্দ্র ও রাসমণির দুইটি কন্যা পদ্মমণি ও কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে প্রীতিরাম জানবাজারের বর্তমান সু-বৃহৎ পারিবারিক আবাস নির্মাণ আরম্ভ করেন। সার্ধ ছয়লক্ষ মুদ্রা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে চৌষট্টি বৎসর বয়সে প্রীতিরাম দাস পরলোকগমন করেন।

প্রীতিরামের মৃত্যুর পর পুত্র রাজচন্দ্র পিতার ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধান ও উন্নতিবিধান করিতে লাগিলেন। ইংলন্ডে কলভিন কাউই কোম্পানিকে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া, তিনি তসরের চাদর, মৃগ-নাভি, অহিফেন, নীল প্রভৃতি দ্রব্য বিলাতে রপ্তানি করিতেন। রাজচন্দ্র ব্যবসায়দক্ষ ভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। নিলামে পঁচিশ হাজার টাকার অহিফেন ক্রয় করিয়া সেই দিনেই পঁচাত্তর হাজার টাকায় তাহা বিক্রয় করত, তিনি একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেন।

পিতৃবিয়োগ বৎসরেই রাজচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী ভূমিষ্ঠ হন। পর বৎসর রাজচন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দেন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে রাজচন্দ্রের পত্নী রাসমণি এক মৃতপুত্র প্রসব করি-লেন। ইহার চারি বৎসর পরে কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে, রাজচন্দ্র পরবৎসর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার সহিত করুণাময়ীর স্বামী মথুরামোহন বিশ্বাসের বিবাহ দেন। মথুরামোহন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রথম ভক্ত।

রাজচন্দ্র প্রভূত অর্থোপার্জন ও বিষয় সম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন এবং সৎকার্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করিয়াছিলেন। তিনি দশ-বারজন ছাত্রের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে পত্নীর প্রার্থনায় সাধারণের স্নানের জন্য, রাজচন্দ্র 'বাবুঘাট' প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে একটি রাস্তা নির্মাণ, বেলেঘাটায় খালখনন, নিমতলায় পুরাতন ঘাট ও মুমূর্ষু

নিবাস স্থাপন, আহিরীটোলার ঘাট নির্মাণ, মেটকাফ হলে পাঁচহাজার টাকা দান এবং হিন্দু-কলেজে ও দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে অর্থসাহায্য প্রভৃতি বিবিধ সদনুষ্ঠান তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। লোকহিতকর কার্যে তাঁহার অনুরাগ দর্শনে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজচন্দ্রকে 'রায়' উপাধিমণ্ডিত করেন। রাজসম্মান লাভের তিন বৎসর পরে, পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ও অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে রায় রাজচন্দ্র দাস পরলোক গমন করেন। রাজচন্দ্রের নির্মিত ঘাট, তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের সম্মানার্থে ও সাধারণের স্নানের জন্য নির্মিত হয়। এই ঘাট এখনও বর্তমান, এবং 'বাবুঘাট' বলিয়া সাধারণে বিখ্যাত ও ইডেন গার্ডেনের সান্নিধ্যে সংস্থাপিত।

রাজচন্দ্রের সহধর্মিণী রাসমণি দাসী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে হালিসহরের নিকটবর্তী এক গণ্ড-গ্রামে কোন কৃষ্ণভক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস ও মাতার নাম রামপ্রিয়া দাসী। হরেকৃষ্ণের কয়েকটি পুত্র ছিল, একমাত্র কন্যা রাসমণি তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার সন্তান। হরেকৃষ্ণ শ্রমজীবী ছিলেন। কায়িক পরিশ্রমে যাহা-কিছু উপার্জন করিতেন, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহার সমস্তই ব্যয়িত হইত এবং সঞ্চয়ের জন্য প্রায় কিছুই থাকিত না। তিনি বাঙ্গলা লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন এবং কন্যা রাসমণিকে স্বয়ং লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষ বয়সে রাসমণির মাতৃ-বিয়োগ হয়।

রাজচন্দ্রের দ্বিতীয় বার স্ত্রী-বিয়োগ হইলে, বধূ-অন্বেষণে প্রেরিত প্রীতিরামের লোক হালিসহরে জাহ্নবী তীরে জীর্ণ বস্ত্র পরিধানা, গৌরবর্ণা, পরম লাবণ্যময়ী রাসমণিকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকেই রাজচন্দ্রের ভাবী পত্নী মনোনীত করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে একাদশ বর্ষ বয়সে রাসমণি রাজচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হন। রাজচন্দ্র রাসমণির পিতৃ-গৃহে প্রাপ্ত শিক্ষার যথেষ্ট উৎকর্ষ বিধান করেন। তাঁহাদের তেত্রিশ বৎসরের দাম্পত্যজীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাসমণির পিতৃ-বিয়োগ ও তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে রাজচন্দ্র পরলোকগমন করিলে, রাসমণি পঞ্চান্ন হাজার টাকা ব্যয়ে তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পতি-পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

রাসমণি তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিশালিনী ছিলেন। ভাগীরথীতে মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরগণের উপর করস্থাপনের চেষ্টা এই প্রতিভাময়ী রমণীর অব্যর্থ কৌশলে নিষ্ফল হইয়াছিল। পতি-বিয়োগের পর বৎসর রাসমণি জানবাজার বাটিতে মহাসমারোহে রাসোৎসব করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ রথযাত্রার জন্য এক রৌপ্যরথ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এ রথ এখনও বর্তমান। এই জন্য দুইটি উৎসব ব্যতীত রাসমণি শরৎকালে আনন্দময়ী শারদীয়া প্রতিমার বাৎসরিক অর্চনার অনুষ্ঠান করিতেন। লোকহিতকর কার্যে তাঁহার স্বভাবতই একটা উৎসাহ ছিল। সোনাই, বেলে-ঘাটা ও ভবানীপুরের বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষুনিবাস, হালিসহরে জাহ্নবী তীরে ঘাট, সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কতকদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি ধর্মকামনায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। পুরীধামে তিনি তিনখানি বৃহৎ ও কয়েকখানি ক্ষুদ্র সুবর্ণ-মুকুট, জগন্নাথদেবকে প্রদান করেন ও সর্বসাধারণকে এক দিন মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। এই তেজস্বিনী ও দয়াবতী রমণী দয়া ও দানমুগ্ধ জনসাধারণ কর্তৃক 'রাণী রাসমণি' নামে অভিহিত হইতেন।

দেবালয় নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়া রাসমণি বারাণসীতে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে বারাণসী প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাইতে হইলে নদীর পথে জলপথই প্রশস্ত ছিল। বিশ্বেশ্বর দর্শনাভিলাষিণী রাণী রাসমণি প্রয়োজনীয় খাদ্য, রক্ষক, চিকিৎসক, অনুচর এবং আত্মীয়বর্গ সমভিব্যাহারে বারাণসী যাত্রার উদ্দেশে পঁচিশখানি বজরা সজ্জিত করাইলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্বে

তাঁহার এ সঙ্কল্প সহসা পরিবর্তিত হইল। তখন বঙ্গে ঘোর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। রাসমণি গঙ্গা-স্নান করিতে যাইয়া বজরায় যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ছিল তাহা দরিদ্রসাৎ করিলেন। বারাণসীর পরিবর্তে তিনি নিম্নবঙ্গে ভাগীরথী তীরে দেবালয় নির্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। এই সদিচ্ছার পরিণতি পুণ্যভূমি দক্ষিণেশ্বরের নবরত্ন ও সুবিখ্যাত কালী-মন্দির। বারাণসীতে ক্রীত ভূমিখণ্ডে ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে ১৯ মার্চ (১৩০০ সাল ৬ই চৈত্র) সোমবার রাসমণির দৌহিত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস 'ত্রৈলোকেশ্বর' নামক শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব-সেবার নিত্য ব্যয়নির্বাহের জন্য মাসিক চারি শত টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করেন।

রাসমণি তাঁহার জামাতা মথুরামোহনের উপর স্থান নির্বাচন ও দেবালয় নির্মাণের ভার অর্পণ করেন। দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথী-তীরে কোম্পানির বারুদাগারের দক্ষিণে, কলিকাতা সুপ্রীম-কোর্টের হেস্টিংস নামক একজন ইংরাজ এটর্ণি কুঠি নির্মাণ করিয়া তাহাতে বসবাস করিতেন। মথুরামোহন এই কুঠি সমেত ষাট বিঘা জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে দেবালয় প্রস্তুত করিলেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে ৩১শে মে (১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রা দিবসে রাসমণির ইষ্ট-দেবতার নামে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই উপলক্ষে সেই শুভদিনে নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থান, এমন কি সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান হইতে আমন্ত্রিত বহু অধ্যাপক, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সমাগত হয়েন এবং প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং পাথেয় ও বিদায় হিসাবে, অন্যূন একটি স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াছিলেন। দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাসমণি নয়লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন এবং পাঁচ লক্ষ মুদ্রা বিনিময়ে, ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলায়, ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগনা ক্রয় করিয়া তাহা দেবালয়ের সম্পত্তি করিয়া দেন। রাসমণির এই কীর্তির অনুকরণে তাঁহার কন্যা জগদম্বা দাসী ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ১২ই এপ্রিল (১২৮১ সাল ৩০ শে চৈত্র) তিনলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বারাকপুরের সন্নিহিত টিটা-গড়ে অন্নপূর্ণার মন্দির এবং দৌহিত্রের পুত্রবধূ গিরিবালা দাসী ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ১লা জুন (১৩১৮ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ) বৃহস্পতিবার, দুই লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে আগড়পাড়ায় রাধাকৃষ্ণের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

রাসমণি তাঁহার মকিমপুর জমিদারির প্রজাগণকে নীলকরের ভীষণ অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন এবং প্রজার মঙ্গলের জন্য দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার খালের সংযোগ বিধান করেন। এই নবখনিত খালের নাম টালার খাল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের সময় যখন সকলেই কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে ব্যস্ত, রাসমণি তখন বিস্তর কাগজ খরিদ করিয়াছিলেন। সেই অশান্তি ও গোলযোগের সময় তিনি কোম্পানিকে ছয়টি হস্তী, প্রচুর খাদ্য ও অর্থদান করিয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্যময় জীবনযাপনের পর ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ১৯শে ফেব্রুয়ারি (১২৬৭ সাল ৯ই ফাল্গুন) মঙ্গলবার জ্বর রোগে এই পুণ্যবতী রাণী রাসমণি পরলোকে গমন করেন।

দক্ষিণেশ্বরের একখানি ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ইহার লেখক। প্রসাদবাবুর লিখিত কাহিনী হইতে পূর্বোক্ত বিবরণগুলি সংগৃহীত হইল।

দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ

(জোড়াবাগান)

দেওয়ান রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র এবং রাজা রমানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র। তিনি ২৪ পরগনার অন্তর্গত কেটিয়ারি নামক গ্রাম হইতে আসিয়া, কলিকাতায় বসতি করেন এবং গবর্ণমেন্টের অধীনে পাটনার আফিমের কুঠির দেওয়ান হইয়া প্রচুর অর্থসংগ্রহ করেন। ইংরাজি ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় তিনি ইংরাজ ও দেশীয় সকলের কাছেই সমাদৃত হইয়াছিলেন। তিনি নিমতলায় একটি স্নানের ঘাট নির্মাণ করাইয়া তাহা তখনকার বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং নিমতলার

আনন্দময়ীর মন্দির তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মন্দির সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি।

দেওয়ান রাধামাধব কলিকাতা ও সহরতলীতে বহু সম্পত্তি, উড়িষ্যায় অনেকগুলি জমিদারি এবং বহু অর্থ রাখিয়া যান। তাঁহার পাঁচ পুত্র, নবকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, শম্ভুকৃষ্ণ, শিবকৃষ্ণ ও তারাকৃষ্ণ। ইহাদের মধ্যে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চমপুত্রের সন্তানাদি হয় নাই। দ্বিতীয়-তৃতীয়ের প্রত্যেকের দুই কন্যা। শিবকৃষ্ণ তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। তিনি নলীমোহনকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

শিবকৃষ্ণ প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তিনি নানাপ্রকার ঘোড়া ও গাড়ি ভালবাসিতেন। একজন শ্রেষ্ঠ দরের অশ্বারোহী বলিয়াও তাঁহার একটা প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু একটি বিশেষ দোষ ছিল। তিনি গাড়ি চালাইয়া যাইবার সময় তাঁহার গাড়ির নিকট যে কেহ আসিত তাহাকেই চাবুক মারিতেন; এই দুর্ব্যবহারে অনেকেই তাঁহার শত্রু হইয়া উঠে। তিনি পৈতৃক জমিদারি সংক্রান্ত এক মোকদ্দমায় চোদ্দ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরিত হন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই নির্বাসন মুক্তির পর ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বীপান্তরের পূর্বে তিনি মাহেশের বাৎসরিক রথযাত্রা উৎসবের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। জনপ্রবাদ এই, যে দ্বীপান্তরকালে সুদূর আন্দামানে তিনি মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

শেঠ ও বসাক বংশ

শেঠগণ প্রথমে গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু পরে সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা, কাশিমবাজার, মুরশিদাবাদ এবং হুগলী জিলার হলদপুরে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা প্রথমে সূত্রপ্রস্তুতের কার্য করিতেন কিন্তু পরে বস্ত্রাদির ব্যবসাদার হইয়া পড়েন। তাঁহারা ব্যবসায়ের অনুরোধে বঙ্গের প্রত্যেক বড় বড় সহরেই বাস করিতেন এবং ভারতে পর্টুগীজ ও ওলন্দাজগণের আগমনের সময় হইতে কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রবাদ আছে, পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ধনশালী শেঠগণ তখনকার জঙ্গলময় কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং গোবিন্দজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার জন্য একটি মন্দির উৎসর্গ করেন। কলিকাতা নগরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর, শেঠগণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বসাকগণকে আনয়ন করিয়া কলিকাতায় সংস্থাপিত করেন। বসাকগণের সহিত বিবাহের আদান-প্রদানই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। বসাকগণও ধনী ছিলেন। তাঁহারা পূর্বে আলিবর্দি খাঁর আমলে ব্যবসায়-ব্যপদেশে মুরশিদাবাদ কাশিমবাজার ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ইদানীন্তনকালে কলিকাতার শেঠ ও বসাকগণের সঙ্গে উক্ত স্থানের বসাকগণের বিবাহাদি চলে না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বর্তমান দুর্গ নির্মাণ করেন, তখন তাঁহারা শেঠ ও বসাকগণের গোবিন্দপুরের জমির পরিবর্তে তাঁহাদিগকে বড়বাজারে জমি প্রদান করেন। শেঠগণ এই সময়ে তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজীউকে বড়বাজারে স্থানান্তরিত করেন। বড়বাজারে স্বর্গীয় বৈষ্ণবদাস শেঠের আবাসবাটির সান্নিধ্যে, বর্তমান টাকশালের নিকট এই মূর্তি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। শেঠ ও বসাকগণের মধ্যে তৎকালে কেবল পাঁচজন মাত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নাম, যাদবেন্দু শেঠ ও বৈষ্ণবদাস শেঠ, শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক ও কৃষ্ণচন্দ্র বসাক। যাদবেন্দু শেঠ কলিকাতার বাঁশতলা গলির ৫নং বাটিতে রাধাকান্তজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহটি পূর্বে বিষ্ণুপুরের রাজার ছিল। প্রবাদ আছে, বৈষ্ণবদাস শেঠ গঙ্গাজলে কলসী পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া এবং তাহাতে শীলমোহর করিয়া সোমনাথ ও জগন্নাথ দেবের পূজার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রপৌত্র গণ পর্যন্ত এই প্রথা বজায় রাখিয়াছিলেন।

যাদবেন্দু শেঠের দুইজন বংশধর, চৈতন্যচরণ শেঠ ও আনন্দচন্দ্র শেঠও অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর চৈতন্যচরণের শাস্ত্র সদগুণ ও বদান্যতার জন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে চল্লিশ লক্ষ টাকা

রাখিয়া যান। রাধাকৃষ্ণ শেঠের পুত্র মাধবচন্দ্র শেঠ, চৈতন্যচরণ ও আনন্দচন্দ্র উভয়েই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন।

যাদবেন্দ্রের আর একজন বংশধর নন্দলাল শেঠের পৌত্র রাধাকান্ত শেঠ হিন্দুকলেজের প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। স্যর রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই, তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। তাঁহার পুত্র প্রিয়নাথ শেঠ।

তারিণীচরণ বসাক শোভারাম বসাকের বংশধর রাধাকৃষ্ণ বসাকের পুত্র। বৃন্দাবনচন্দ্র বসা-কের বংশধরগণ কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বসাকের বাসভবন বিডন স্কোয়ারের নিকট চিৎপুর রোডের উপর আজিও অবস্থিত রহিয়াছে।

এই শেঠ ও বসাকবংশ কলিকাতার প্রাচীন আদিবাসী। কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পূর্বেও ইহাঁরা বেতোড়ের হাটে পর্টুগিজদিগের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। জোব চার্নক জঙ্গলের মধ্যস্থিত স্থানে কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে, শেঠগণ গোবিন্দপুরে ও সুতালুটিতে বাস আরম্ভ করেন। প্রাচীন কলিকাতায় ইতিহাসের সহিত এই শেঠ ও বসাকগণের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। এই বংশের পূর্বোক্ত বৈষ্ণবচরণ শেঠ মহাশয় অতি ধার্মিক ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। বৈষ্ণব-চরণ শেঠ ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া, প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। দেবালয় প্রতিষ্ঠা, দানধ্যান প্রভৃতি কার্যে ইহাঁরা সবিশেষ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় বাসকালে তাঁহাদের জ্ঞাতি গোত্র অনেক বাড়িয়া উঠে এই-জন্য তাঁহারা কলিকাতার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এই শেঠগণের মধ্যে হরিনারায়ণ শেঠ কোম্পানির প্রথম আমলে বিশেষ ক্ষমতা সঞ্চয় করেন। বর্তমান মেটকাফ হল যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থান অধিকার করিয়া হরিনারায়ণের বাসভবন ছিল। এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। শোভারাম বসাক পলাশীর যুদ্ধের সময় ও পরে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার নামের কয়েকটি পথ ও গলি আজিও তাঁহার নাম-ঘোষণা করিতেছে।

রামদুলাল দেবের বংশ

রামদুলাল দেব ওরফে দুলাল সরকার অতি সামান্য অবস্থা হইতে যশ এবং সমৃদ্ধির শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতা বলরাম দেব, দমদমার নিকট-বর্তী রেকজানি নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং শিক্ষকতা করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। বর্গীর হাঙ্গামায় (১৭৫১-৫২ খৃঃ) বলরাম পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করেন। রামদুলালের জন্মের অল্পকাল পরেই তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয় এবং তিনি মাতামহের আশ্রয়ে পালিত হন। তাঁহার মাতা প্রতি-বেশীদের সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করিতেন ও তাঁহার মাতামহী বহু কষ্টভোগের পর হাটখোলায় ধনবান ব্যবসায়ী মদনমোহন দত্তের বাটিতে পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ করেন। রামদুলালও এই মদন-মোহন দত্তের বাটিতে থাকিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হন। এই স্থানে তিনি বাঙ্গলা ও তখনকার কালের উপযোগী সামান্যমাত্র ইংরাজি শিক্ষা করেন। অতঃপর মদনমোহনবাবু তাঁহাকে প্রথমে ৫ টাকা বেতনে বিল-সরকার ও তৎপরে ১০ টাকা বেতনে জাহাজ-সরকার করিয়া দেন। দুর্ভাগ্য বিতাড়িত এই রামদুলাল এক সময় এক মহত্ত্বময় কার্য দ্বারা স্বীয় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া লয়েন। এক দিন তিনি নিলামওয়ালা টুল্লো কোম্পানির অফিসে তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় ১৪০০০ টাকায় একখানি জলমগ্ন জাহাজ কিনিয়া লন। তিনি টাকা জমা দিয়া চলিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় সেই জাহাজ ক্রয়েচ্ছু একজন সওদাগর সাহেব আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং কিছু কম এক লক্ষ টাকা মূল্যস্বরূপ সেই জাহাজ ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। রামদুলাল এই সমস্ত টাকা প্রভুকে ফিরাইয়া দিতে চাহিলে, প্রভু মদনমোহনবাবু তাঁহার সততা দর্শনে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত টাকা দান করেন। এই টাকাই রামদুলালের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের ভিত্তি। অতঃপর রামদুলাল আমেরিকার সওদাগরগণের এজেন্ট এবং কলিকাতার অনেক সওদাগরের

বেনিয়ান হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

রামদুলাল অশেষ সদগুণে সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার ধর্মপ্রবৃত্তি ও দানশীলতা অসাধারণ ছিল। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের সময় টাউনহলের মিটিংএ তিনি সর্বসমেত নগদ এক লক্ষ টাকা দান করেন। হিন্দু কলেজ নির্মাণকালে তিনি ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছিলেন। কাশীতে ত্রয়োদশ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেও তাঁহার ২২২০০০ টাকা ব্যয় হয়। ৭৩ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রগণ ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাঁহার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন।

রামদুলালের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয়া পাঁচটি কন্যা এবং আশুতোষ ও প্রমথনাথ নামক দুইটি পুত্রের জননী। আশুতোষ ও প্রমথনাথ (সাতুবাবু ও লাটুবাবু) সর্ববিষয়ে পিতার নাম রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা সৌখীন কার্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করাতে, কলিকাতা-অঞ্চলে 'বাবু' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তখনকার বাবুর অর্থ বর্তমান কালের বাবুর অর্থ হইতে বিভিন্ন ছিল। তাঁহাদের মত বাবু তখন খুব অল্পই ছিল। সাতুবাবুর পুত্র গিরিশচন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই দুইটি কন্যা রাখিয়া পরলোকে যান। সাতু-বাবুর দুইটি কন্যা ছিল। একজন চারুচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্রের জননী ও অন্যটি রাম-বাগানের উমেশ-চন্দ্র দত্তের পত্নী। প্রমথবাবুর দুইটি বিধবা পত্নীর প্রত্যেকেই এক একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম মন্মথনাথ ও অনাথনাথ।

রামদুলাল দেবের বিশাল সম্পত্তি তাঁহার বংশধরগণের অপরিমিত খরচাদির জন্য পূর্বা-পেক্ষা কতক কমিয়া গিয়াছে। কথিত আছে প্রাতঃস্মরণীয় রামদুলাল দেবমহাশয় ১কোটি ২২ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। রামদুলাল যেমন অতি নিঃস্ব অবস্থা হইতে স্বাবলম্বন ও ভাগ্যবলে কোটিপতি হইয়াছিলেন, তেমনি নানাবিধ সৎকার্যে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠায় পূজা পার্বণে ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্যে অসংখ্য অর্থব্যয় করিয়া, নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে বাবু অনাথনাথ দেব এই দেববংশের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি একজন দানশীল, স্বধর্মনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ হিন্দু ও কায়স্থ কুলের রত্নস্বরূপ।[১]

দেওয়ান শান্তিরাম সিংহের বংশ
(জোড়াসাঁকো)

শান্তিরাম সিংহ কোম্পানির আমলে কলেক্টর মিঃ মিডল্টন ও স্যর টমাস্ রমবোল্ড সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। তিনি পাটনা ও মুরশিদাবাদ জিলা সম্বন্ধীয় কার্যের অধ্যক্ষ ছিলেন।

দেওয়ান শান্তিরাম জাতিতে কায়স্থ। তিনি স্বধর্মানুরাগী হিন্দু ছিলেন। নানাবিধ পুণ্য-কার্যেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তিনি বারাণসীতে একটি বৃহৎ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ ও জয়কৃষ্ণ সিংহ। জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ কোম্পানির সাধারণ ধনাগারের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র রাজকৃষ্ণ সিংহ, নবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ এবং কনিষ্ঠ জয়-কৃষ্ণের এক পুত্র নন্দলাল সিংহ। রাজকৃষ্ণ সিংহের পুত্র মহেশচন্দ্র সিংহ। মহেশচন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র এবং হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলাইচন্দ্র। প্রাণকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র নবকৃষ্ণের সন্তানাদি ছিল না এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র কন্যা রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

নন্দলাল সিংহের পুত্র সুবিখ্যাত মহাভারতকার কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি বাঙ্গলা ভাষার প্রসিদ্ধ পুস্তক 'হুতোম-পেঁচার-নক্সা' রচয়িতা এবং মহাভারতের অনুবাদ তাঁহার অমূল্য অক্ষয়কীর্তি। মহাভারত প্রকাশকালে তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইয়া-ছিল এবং ইহারই ফলে উড়িষ্যার বহু মূল্যবান জমিদারি ও কলিকাতার বেঙ্গল-ক্লাব প্রভৃতি বহু মূল্যবান সম্পত্তি তাঁহার হস্ত বহির্ভূত হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক তিনি যে নানা সদ্‌গুণে বিভূ-

১. অনাথনাথ দেব বর্তমানে লোকান্তরিত।

ষিত ছিলেন, ইহা তাঁহার সমসাময়িক সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

কালীপ্রসন্ন বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব যেমন 'শব্দকল্পদ্রুমের' প্রচার দ্বারা সাধারণে যশস্বী হইয়া গিয়াছিলেন, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় সেইরূপ হিন্দুর কল্পবৃক্ষ অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারতের অনুবাদ করিয়া যশস্বী হয়েন। এই জন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম আজও প্রত্যেক বঙ্গবাসীর স্মৃতিপটে জাগরূক। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক 'বেণীসংহার' ও 'বিক্রমোর্বশী'র প্রথম অভিনয় তাঁহার চেষ্টাতেই তাঁহার নিজ বাটিতে হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এই সময়ে প্রচারিত হয়। কবি মধুসূদনের সম্মানের জন্য কালীপ্রসন্নবাবু নিজের প্রাসাদতুল্য বাটিতে একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় তিনি মাইকেলকে একটি অভিনন্দনপত্র ও ক্ল্যারেট-মদ্য পানোপযোগী এক রৌপ্যময় পাত্র দান করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সর্ববিধ দেশহিতকর সাধারণকার্যে যোগদান করিতেন। অসংখ্য পণ্ডিত-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকায় তাঁহার বিদ্যালোচনার প্রবৃত্তি অতি প্রবল হইয়া উঠে। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও কালীপ্রসন্নের 'হুতোম-পেঁচার-নক্সা' প্রভৃতি পুস্তক সেকালের বঙ্গসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। সেকালের কলিকাতার বাঙ্গালী-সমাজের দোষ-গুণ 'হুতোমে' অতি উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বর্তমানকালে এই শ্রেণীর পুস্তক রুচিপ্রদ না হইলেও অতীত যুগে ইহার যথেষ্ট আদর ছিল। 'হক-কথা' বলিয়া আরও একখানি এই শ্রেণীর সমাজ-চিত্র ইহার পরবর্তী সময়ে রচিত হয়। ইহার প্রণেতা যে কে, তাহার কোন পরিচয় নাই।

সমগ্র মহাভারতের অনুবাদকার্যে আট বৎসর অতীত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সুবৃহৎ গ্রন্থ বিনামূল্যে সুধীসমাজে বিতরণ করিয়াছিলেন। ধরিতে গেলে, জোড়াসাঁকোর সিংহবাটির সমুজ্জ্বল রত্ন এই কালীপ্রসন্ন সিংহ বা 'কালী-সিঙ্গি'। লং সাহেব 'নীলদর্পণের' ভাষান্তর করিয়া যে সময়ে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, মহানুভব কালীপ্রসন্ন, তাঁহার সেই বিপত্তিকালে জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া, লং সাহেবকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। কালী সিংহের উপযুক্ত পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় বর্তমানে পিতার সুনাম রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।[১] হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রিকা এখন তাঁহারই তত্ত্বাবধায়নে নূতনভাবে প্রকাশিত হইতেছে। তিনি অতি বিনয়ী সদালাপী ও সৎকর্মে উৎসাহশীল।

কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠী

মানে, সম্ভ্রমে, বিদ্যায় ও যশগৌরবে কলিকাতার ঠাকুর-গোষ্ঠী, ভারতের সর্বত্র বিখ্যাত। জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরমহাশয়গণ একই বংশ-সম্ভূত। এই গোষ্ঠীর বিশেষত্ব এই, একাধারে এই বংশে বাণী ও কমলার বরপুত্রগণ আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাঁদের সকলের সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিতে গেলে, একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। এই জন্য আমরা পুরাকালে যাঁহারা স্বনামধন্য ও প্রথিতযশা হইয়াছিলেন তাঁহাদের কথাই বলিব। কেননা আমাদের স্থান অতি সংক্ষিপ্ত।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ এই গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। ভট্টনারায়ণের পুত্র নানু বা নৃসিংহ কুশারীর বংশে ইহাঁদের উদ্ভব। ইহাঁরা রাঢ়ীয়শ্রেণী ভুক্ত এবং পিরালী-দোষযুক্ত। কিন্তু তাহা হইলেও ধনে, মানে ও ঐশ্বর্যে ইহাঁরা সর্বজনবিদিত।

এই বংশের আদিনিবাস যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটিয়া পরগনায় ছিল। এতদ্বংশীয় পঞ্চানন ঠাকুর সর্বপ্রথমে কলিকাতায় আগমন করেন। তখন কলিকাতা বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। সুতালুটি কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গণ্ডগ্রাম তখন ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইতেছিল।

পঞ্চানন ঠাকুরমহাশয় কলিকাতায় গোবিন্দপুরে আসিয়া বসবাস করেন। পুরাকালের এই গোবিন্দপুরের স্থানাধিকার করিয়া বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হইয়াছে। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আমীনের কার্য করিতেন। পলাশী-যুদ্ধের পর, যে সময়ে

১. বিজয়চন্দ্র সিংহ কালীপ্রসন্ন সিংহের পালিত পুত্র। ইনি ১৯৩৩ খ্রী. লোকান্তরিত হন।

গড়ের মাঠের বর্তমান কেল্লা নির্মিত হইবার বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া যায়, সেই সময়ে গোবিন্দপুরের অনেকের বাড়িঘর সেইস্থানে ভাঙ্গা পড়ে। ইহাঁদের অনেকে গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া সুতানুটি অঞ্চলে চলিয়া যান। জয়রামও এই ঘটনায় বাসচ্যুত হইয়া পাথুরিয়াঘাটায় আসিয়া বসবাস করেন। কোম্পানি সে সময়ে ২৪ পরগনার জমিদারি প্রাপ্ত হন। কর্মকুশল জয়রাম সেই সময়ে এই সুবৃহৎ জেলার বিলি-বন্দোবস্ত কার্যে কোম্পানিকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে জয়রামের মৃত্যু হয়।

জয়রামের চারি পুত্র আনন্দীরাম, দর্পনারায়ণ, নীলমণি ও গোবিন্দরাম। প্রথম ও চতুর্থের বংশ নাই। দ্বিতীয় দর্পনারায়ণ ও নীলমণির বংশধরেরাই এখন কলিকাতা সমাজ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। দর্পনারায়ণের বংশধরেরা সিনিয়ার-ব্রাঞ্চ ও নীলমণির বংশধরেরা ঠাকুর গোষ্ঠীর জুনিয়ার-ব্রাঞ্চ বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

পঞ্চানন ও তৎপুত্র যে সময়ে গোবিন্দপুরে বসবাস করিতেন সেই সময়ে গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণ সংখ্যা বড় কম ছিল। এই জন্য অন্য জাতীয় অধিবাসীরা তাঁহাদের 'ঠাকুর' বলিয়া সম্বোধন করিতেন পরে ইহা উপাধিরূপে দাঁড়াইয়াছে। এখন এই ঠাকুর শব্দটি স্রোতমুখে Tagore-এ পরিণত হইয়াছে।

দর্পনারায়ণ সেকালের যুগে একজন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইংরাজি ও ফরাসী ভাষা খুব ভাল জানিতেন। তিনি তদানীন্তন ফরাসী-গবর্ণমেণ্টের অধীনে দেওয়ানি চাকরী ও স্বাধীন ব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা প্রচুর বিত্তসম্পন্ন হন। এই সময়ে নাটোরের জমিদারিসমূহ বিক্রীত হইতে আরম্ভ হওয়ায় দর্পনারায়ণ রঙ্গপুরে এক জমিদারি ক্রয় করেন।

দর্পনারায়ণ দুই সংসার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে রাধামোহন, গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন, হরিমোহন ও পিয়ারীমোহন বলিয়া পাঁচপুত্র হয়। কোন কারণে বাধ্য হইয়া রামমোহন ও কৃষ্ণমোহনকে তিনি বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন। পঞ্চম পুত্র পিয়ারীমোহন বাকশক্তিহীন ছিলেন। অন্যান্য দান ব্যতীত বিশহাজার টাকা তিনি দেব-সেবার জন্য বন্দোবস্ত করেন। সম্পত্তির বাকি অংশ তিনি সকল পুত্রকেই সমান ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান।

দর্পনারায়ণের দ্বিতীয়পুত্র গোপীমোহন পুত্রসোভাগ্যে বড়ই যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর হরকুমার ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর বঙ্গদেশের উজ্জ্বলরত্ন। এই হরকুমারের পুত্রই স্বনামখ্যাত মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর ও রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। প্রসন্নকুমারের জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলিয়া এক পুত্র জন্মে।

গোপীমোহন ঠাকুর মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। সে কালের অনেক পদস্থ ইংরাজ, এমন কি গবর্ণর-জেনারেলগণও এই উৎসবক্ষেত্রে আমন্ত্রিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটন এক বার এই পূজাক্ষেত্রে আহূত হইয়া নৃত্যগীতাদি উপভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে টানা-পাখার দড়ি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় পাখাখানি মহাবেগে নীচে পড়িয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে জেনারেল-সাহেব এই দৈব বিপদজনিত আঘাত হইতে বড়ই বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

গোপীমোহন সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাবিস্তার কল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও ঘটক তাঁহার নির্দিষ্ট বৃত্তিতে নিয়মিতরূপে প্রতিপালিত হইতেন। সঙ্গীতালোচনায় তাঁহার একটা স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ ছিল। পশ্চিম প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, বারাণসী, আগরা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানের গায়ক ও বাদকগণ তাঁহার সঙ্গীত-সভায় আসিতেন। ইহাঁরা কালোয়াতী দেখাইয়া গোপীমোহনের নিকট প্রচুর পুরস্কার লাভ করিতেন, অথবা বেতনভোগীরূপে তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন।

রাধাগোয়ালা সেকালের একজন প্রসিদ্ধ আতিষবাজ ও কুস্তিগীর। এই রাধাগোয়ালা গোপীমোহনের বেতনভোগী ভৃত্য ছিল। প্রাচীন কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ব্যারেটো কোম্পানির স্বত্বাধিকারী ব্যারেটো সাহেবের সহিত গোপীমোহনের খুব বন্ধুত্ব ছিল। ব্যারেটোও তাঁহার বন্ধু গোপী-

মোহন ঠাকুরের ন্যায় পালোয়ান পুষিয়া তাহাদের লড়াই দেখিতে ভালবাসিতেন। তিনি প্রায়ই গোপীমোহনের সুঁড়োর বাগানে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার ও গোপীমোহনের অধীনস্থ পালোয়ানদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিতেন। এই পালোয়ানদের মধ্যে রাধাগোয়ালাই শ্রেষ্ঠ ছিল। গোপীমোহন তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও[১] রাধাগোয়ালা তাঁহার বংশধর গণের নিকট নিয়মিত বৃত্তি পাইয়াছিল।

হুখেকাণা বা লক্ষ্মীকান্ত সে সময়ে বিদ্রুপপূর্ণ কবিতা রচনার জন্য বড়ই প্রসিদ্ধ ছিলেন। কালীমির্জা সেকালের একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। এই দুইজনই গোপীমোহনের সভা অলঙ্কৃত করেন।

নানাবিধ সৎকার্যে গোপীমোহনের দান ছিল। কন্যাদায়, মাতৃদায়, পিতৃদায়গ্রস্তগণকে সাহায্য করা, অধ্যাপকগণকে বৃত্তিদান করা, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দান করায় তিনি কখনও কৃপণতা করেন নাই। একবার তিনি রাজসাহী জেলায় এক জমিদারি ক্রয় করেন। তাঁহার দেওয়ান গোন্দলপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় রামমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এই জমিদারিখানি তিনি অতি অল্প মূল্যে কিনিতে সক্ষম হন। কিন্তু পরিশেষে রামমোহনের প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, এই নবক্রীত জমিদারি তিনি তাঁহাকেই দান করেন। এখনও রামমোহনের বংশধরেরা এই জমিদারির স্বত্বভোগ করিয়া আসিতেছেন।

গোপীমোহন নবস্থাপিত হিন্দু কলেজের Hereditary Governor পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই হিন্দু কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের উপকারার্থে তিনি অনেক বৃত্তি ব্যবস্থা করিয়া যান। অনেক দরিদ্র অর্থহীন ছাত্র তাঁহার ব্যয়ে প্রতিপালিত হইত।

শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত গোপীমোহনের যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। উভয় বন্ধুতে পাগড়ী বিনিময় করিয়া বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু ভবিষ্যতকালে কোন সরিকানী মোকদ্দমায় তিনি রাজা গোপীমোহন দেবের (স্যর রাজা রাধাকান্তের পিতা) সহায়তা করায় রাজা রাজকৃষ্ণের সহিত তাঁহার এই বন্ধুত্ব-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়।

গোপীমোহন ঠাকুর সংস্কৃত ফরাসী, পর্টুগীজ, ইংরাজি, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি নানা ভাষা জানিতেন। মূলাজোড়ের কালীবাড়ি তাঁহার প্রধান কীর্তি। সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার. কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার নামধেয় গোপীমোহনের ছয় পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম চারি জনের কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই।

হরকুমার ও প্রসন্নকুমার স্বনামধন্য মহাপুরুষ। হরকুমারের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কনিষ্ঠ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইহাঁরা অতীতযুগের বঙ্গ-সমাজের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। হরকুমার সংস্কৃত ভাষায় অতীব দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত চর্চা, পূজাপাট ও দেবারাধনাতেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতীত হইত। 'দক্ষিণার্চ্চ-পারিজাত', 'হরতত্ত্ব-দীধিতি', 'পুরশ্চরণ-পদ্ধতি', 'শিলো-চক্রার্থবোধিনী' প্রভৃতি সংস্কৃত-গ্রন্থ তাঁহারই বিরচিত। এরূপ মহাসাত্ত্বিক, স্বধর্মে নিষ্ঠাবান, মহাপণ্ডিত ধনীসন্তান বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়।

মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেকালের বাঙ্গালী-সমাজের একজন নেতা ছিলেন; তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ-পণ্ডিত সেকালে খুব কমই ছিল। প্রসন্নকুমার সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে অনেক কথাই বলিয়াছি। ঠাকুর-আইন সম্বন্ধে বৃত্তি এই প্রসন্নকুমারের গৌরবময় দানকীর্তি।

হরকুমারের প্রথম পুত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া বাড়িতে সাহেব শিক্ষকদের নিকট ইংরাজি ও পণ্ডিতগণের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ২৭ বৎসর বয়সে ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হইলে খুল্লতাত প্রসন্নকুমারের শিক্ষাধীনে ইনি জমিদারি সম্বন্ধীয় বিষয়কার্যাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৮০ খৃঃ

১. গোপীমোহন ঠাকুরের জন্ম ১৭৬০, মৃত্যু ১৮১৯ খ্রী.

অব্দে ইনি ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সভার সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড মেয়োর আমলে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে সময়ে ভারত-সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন, সেই সময়ে লর্ড লিটন রাজা [illegible] 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করেন। তৎপরে ইনি কে, সি, এস, আই ও পুরুষানুক্রমে 'মহারাজা-বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়া ঠাকুরবংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন আদর্শ ধনীসন্তান ছিলেন। এরূপ সামাজিক, সহৃদয়, সৎকর্মে উৎসাহশীল, বিদ্যোৎসাহী জমিদার বঙ্গদেশে খুব কমই জন্মিয়াছেন। রাজদ্বারে তাঁহার মত সম্মানিত ব্যক্তি তাঁহার সময়ে খুব কমই ছিল। বঙ্গীয় বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণার্থে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর কাশীর দেবালয়ে, মূলাজোড়ের মন্দিরে, নিত্য সদাব্রতের অনুষ্ঠান হয়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন আজীবন হিন্দু-ধর্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার পাথুরিয়াঘাটার রাজবাটিতে আজও মহা সমারোহে শারদীয়া-পূজা হইয়া থাকে। স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর বঙ্গসাহিত্যের একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি নিজে অনেকগুলি সংস্কৃত পুস্তক, বাঙ্গলা কবিতা-পুস্তক, নাটক ও প্রহসনাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান নাট্যশালার প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা ইহাঁরই যৌবন সময়ে হয়। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি আজীবন সাহিত্য, সঙ্গীত ও নানাবিধ সৎকার্য অনুষ্ঠানে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। কলিকাতার জমিদারসভার সভাপতিরূপে ইনি দক্ষতার সহিত বহুদিন কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহারাজের পারিবারিক সুবৃহৎ পুস্তকাগারটি তাঁহার জ্ঞানালোচনার কীর্তিরূপে আজও বর্তমান।[1] বড়-লাট, ছোট-লাট হইতে অনেক গণ্যমান্য রাজা-মহারাজাগণ [illegible] প্রাসাদে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের কবিকুলতিলক মাইকেল মধুসূদন মহারাজের নিকট হইতে সর্ববিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের মুদ্রাঙ্কণব্যয় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনই প্রদান করেন।

মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর[2] বর্তমানে স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের উত্তরাধিকারীরূপে বিরাজ করিতেছেন। বয়সে নবীন হইলেও ইনি পিতার বিবিধ সদ্‌গুণসমূহের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ইহাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের মত ইনিও রাজদ্বারে যথেষ্ট সম্মানলাভ করিয়াছেন। পরলোকগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার বাহাদুর কলিকাতাবাসিগণের প্রতিনিধিরূপে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া, ইংলণ্ডে গমন করেন ও তথায় যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। ইটালিতে ভ্রমণকালে ইনি ইউরোপের মহা সম্মানিত পোপের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত হইয়াছিলেন। প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স যখন কলিকাতা পরিদর্শনে আগমন করেন সেই সময়ে মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার তাঁহার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা ত্যাগ সময়ে সম্রাটপুত্র ইহাঁকে 'স্যর' বা 'নাইট' উপাধি-মণ্ডিত করিয়া যান। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-অ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি দেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-হল ও ইণ্ডিয়ান-মিউজিয়ামের ইনি একজন ট্রাস্টি। সর্ববিধ সাধারণ হিতকর কার্যের অনুষ্ঠানে ও এতৎসম্বন্ধীয় সভা-সমিতিতে মহারাজ স্যর প্রদ্যোৎকুমার বাহাদুরের গভীর সহানুভূতি দেখা যায়। ১৯০৮ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি কলিকাতার সেরিফের পদে কার্য করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশলাভ করেন। আমাদের গৌরবান্বিত রাজরাজেশ্বর, ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের কলিকাতায় শুভাগমন সময়ে, মহারাজ প্রদ্যোৎকুমার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকরূপে কার্য করিয়াছিলেন। এই শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ভারতসম্রাট মহারাজ বাহাদুরকে নিজের নামাঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত একগাছি বহু-

১. মহারাজের এই পারিবারিক সুবৃহৎ পুস্তকাগারটি কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থশালায় উপহৃত হইয়াছে।
২. প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর জন্ম ১৮৭৩, মৃত্যু ১৯৪২ খ্রী.

মূল্য ছড়ি উপহার দেন।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর হরকুমারের কনিষ্ঠ পুত্র ও স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের সহোদর। ইনি 'ছোটরাজা' বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর দেহান্ত ঘটে। হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রে ইহাঁর আজীবন অনুরাগ ছিল। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন আজীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়া নানাবিধ পুস্তকাদি প্রণয়ণে, হিন্দু-সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রাধান্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর এই সাধু উদ্দেশ্যের পুরস্কারস্বরূপ, ইনি সভ্য-জগতের রাজন্যবর্গ ও অনেক বৈজ্ঞানিক সমিতির নিকট উপাধি-সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া ও ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড ইউনি-ভার্সিটি হইতে 'ডক্টর-অব-মিউজিক' নামক গৌরবজনক উপাধি লাভ করেন। এ পর্যন্ত কোন ভারত-বাসীই এ উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি ইউরোপের অনেক স্বাধীন রাজন্য-বর্গের নিকট এই সঙ্গীতবিজ্ঞান চর্চার জন্য, সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 'যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকা', 'ছয় রাগের জীবন্ত-মূর্তি', 'রসাবিকার-বৃন্দক' প্রভৃতি ৫০ খানি সঙ্গীত-শাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইহাঁর গৌরবময় কীর্তি।

জয়রামের দ্বিতীয় পুত্র দর্পনারায়ণের বংশের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার তৃতীয় পুত্র নীলমণি ঠাকুরের কথাই বলিব। ভ্রাতৃবিবাদ বঙ্গসংসারে চিরদিনই আছে, সেকালেও ছিল। এই ভ্রাতৃবিবাদে নীলমণি ঠাকুর পৈতৃক-আবাস স্থান ত্যাগ করিয়া জোড়াসাঁকোতে বাস করেন। সেকালের কলিকাতার সুবিখ্যাত বৈষ্ণবচরণ শেঠ নীলমণি ঠাকুরকে বসবাসের জন্য যে জমি বিক্রয় করেন, তাহার কতকাংশের উপরই এই আবাসবাটি নির্মিত হয়।

নীলমণি ঠাকুর কোম্পানির অধীনে সেরেস্তাদারী কর্মে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেন। নীলমণি ঠাকুরের পাঁচ পুত্র হয়। তাহাদের মধ্যে প্রথম ও পঞ্চম নিঃসন্তান। তৃতীয় রামমণির তিন পুত্র। তাঁহাদের নাম রাধানাথ, দ্বারকানাথ ও রমানাথ।

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর প্রথমে ইউনিয়ান-ব্যাঙ্কের দেওয়ানরূপে কার্য করেন। রাজা রাম-মোহন রায়ের ইনিও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-সভা স্থাপনের ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী এবং দশ বৎসরকাল তাহার সভাপতিত্ব করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহায়তায় ইনি বহুদিন ধরিয়া 'ইণ্ডিয়ান-রিফরমার' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নিযুক্ত হন। রমানাথ ঠাকুর নিজে একজন জমিদার হইলেও প্রজার স্বত্ব সংরক্ষণে তিনি প্রভূত যশসঞ্চয় করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রমানাথ ঠাকুর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। ভারতের তদা-নীন্তন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে রমানাথ ঠাকুরের পরামর্শ গ্রহণ করি-তেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রমানাথ ঠাকুর পরলোক গমন করেন।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। দ্বারকানাথ ফার্সী ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেকালের সুবিখ্যাত সেরবোর্ন সাহেবের বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষা সমাপ্ত হয়। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ রাধানাথ বিদেশে চাকরী করিতেন। দ্বারকা-নাথ বিষয়কর্ম খুব ভালরূপই বুঝিতেন কাজেই পৈতৃক জমিদারির ভার তাঁহার উপরই পড়ে।

দ্বারকানাথের প্রতিভা সর্ববিষয়িণী। তিনি আইন পাশ করিয়া প্রথমত মোক্তারের কার্য আরম্ভ করেন। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায় ব্যাপারেও বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় নিমকী-বিভাগের চাকরী খুব গৌরবজনক রাজকর্ম ছিল। দ্বারকানাথ দক্ষতা ও প্রতিভাবলে নিমকী-বিভাগের সামান্য সেরেস্তাদারি পদ হইতে দেওয়ানি পদ লাভ করেন। এমন কি তিনি কাস্টম ও অহিফেন-বিভাগের দেওয়ানি পদ পর্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু চাকুরীতে দ্বারকানাথের ততটা স্পৃহা ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে বাণিজ্যকার্যে নিযুক্ত হইবার মনস্থ করিয়া কার ও প্রিন্সেপস নামক দুইজন ইংরাজের সহিত একযোগে 'কার-

ঠাকুর' নামধেয় এক বাণিজ্যাগারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই বাঙ্গালীর প্রথম স্বাধীন চেষ্টা-সম্ভূত বাণিজ্যকুঠি। ইতিপূর্বে আর কোন বাঙ্গালীই এরূপ [illegible] ব্যবসায় করেন নাই। দ্বারকানাথের এই কার্যে প্রীত হইয়া তদানীন্তন গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক তাঁহাকে এ সম্বন্ধে এক উৎসাহসূচক পত্র লিখিয়া ব্যক্তিগতভাবে সম্মানিত করেন। ইহার পর দ্বারকানাথ আরও কয়েকজন অবস্থাপন্ন ইংরাজের সহিত মিশিয়া 'ইউনিয়ান-ব্যাঙ্ক' স্থাপন করেন। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক বেশী দিন চলে নাই।

কার-ঠাকুর কোম্পানির ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া, দ্বারকানাথ প্রচুর অর্থ লাভ করেন। এই কুঠির আয়ে দ্বারকানাথ রাজসাহী, পাটনা, রঙ্গপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলায় অনেক জমিদারি ক্রয় করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের সহিত দ্বারকানাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। দ্বারকানাথ দেশের ও দশের হিতার্থে অনেক ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ প্রভৃতির স্থাপনের সময় তিনি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। সতীদাহ নিবারণ ব্যাপারের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে সামাজিক মিশ্রণের প্রথা প্রবর্তিত হয়। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, গবর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক কয়েকবার তাঁহার বাটিতে গিয়া আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিয়াছিলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড দ্বারকানাথকে বঙ্গদেশীয়গণের মুখপাত্র স্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং অনেক সময়ে এতদ্দেশীয় ব্যাপারসমূহ সম্বন্ধে সদুপদেশ দিবার জন্য তিনি লাট-সাহেব কর্তৃক আহূত হইতেন।

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে দ্বারকানাথ বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার পূর্বে আর কোন বাঙ্গালীই ইংলণ্ডে যান নাই। তখন কালাপানিতে গেলে লোকের জাতি যাইত। কিন্তু স্বাধীনচেতা দ্বারকানাথ, সমাজশাসনের ভয়ে এ কার্যে পশ্চাদপদ হন নাই।

দ্বারকানাথের এই সৎসাহস দেখিয়া সেকালের ইংরাজেরা টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা করিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র দেন। বিলাতে গিয়া তিনি তদ্দেশবাসিগণের বিশেষ সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডাইরেক্টরেরা, তাঁহার সম্মানের জন্য একটি প্রীতিভোজ প্রদান করেন। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়াও দ্বারকানাথকে তাঁহার রাজ-প্রাসাদে একদিন ভোজের আয়োজন করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। মহারাণী তখন বাকিংহাম-প্রাসাদে থাকিতেন। সুতরাং এই প্রাসাদেই ভোজের আয়োজন হয়। তাঁহার পূর্বে আর কোন বাঙ্গালীই এরূপভাবে রাজসম্মান লাভ করেন নাই। বড়মানুষীর জন্য দ্বারকানাথ বিলাতে 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' বলিয়া সর্বসাধারণে পরিচিত হন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে সেই ভোজের দিনে মুদ্রিত কয়েকটি নূতন বিলাতী স্বর্ণ-মুদ্রা উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি দ্বারকানাথকে তাঁহার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট ও তাঁহার নিজের একখানি ছবি উপহাররূপে প্রদান করেন। সেই ছবি এখনও কলিকাতা টাউনহলে আছে।

দ্বারকানাথ, কেবল যে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে। রোমনগরীতে ভ্রমণব্যপদেশে উপস্থিত হইলে, তিনি রোমান-ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের সার্বজনীন ধর্মগুরু পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বলা বাহুল্য, পোপ মহাসমাদরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন। ফ্রান্সের অধিপতি লুই ফিলিপের দরবারেও বাঙ্গালী দ্বারকানাথ মহাসমাদরে পরিগৃহীত হন।

দ্বারকানাথ ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে ম্লেচ্ছান্ন গ্রহণ ও ম্লেচ্ছদেশে বাস হেতু প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হন, কিন্তু তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। দ্বারকানাথের ব্যয়েই সূর্যকুমার চক্রবর্তী (পরে গুডিভ চক্রবর্তী) পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা-শিক্ষার্থে সর্বপ্রথমে বিলাতে করেন।[১]

ইহার পর দ্বারকানাথ ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। এবার তিনি

১. সূর্যকুমার চক্রবর্তীর জন্ম ১৮২৪, মৃত্যু ১৮৭৪ খ্রী.

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ইংরাজ-সেক্রেটারিকে সঙ্গে লইয়া বিলাতে যান। পথিমধ্যে কায়রো-নগরীতে তিনি মহম্মদ আলি পাশার দরবারে সম্মানিত হন। তৎপরে ইটালি দেশে গমন করেন। এখানকার রাজ-দরবারেও তিনি যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন লাভ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের অধিপতির গৃহেও তিনি এইবারে পনর দিন সম্মানিত বিদেশীয় অতিথিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে জুন মাসে বিলাতে তিনি সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া পড়েন। এই পীড়াতেই তাঁহার দেহান্ত হয়। বিলাতের কেন্সাল্-গ্রীন' নামক গির্জাক্ষেত্রে দ্বারকানাথের সমাধি হইয়াছিল। তাঁহার সমাধির সময় ভারতেশ্বরী চারিজন অশ্বারোহী সৈনিক পাঠাইয়া দেন। দ্বারকানাথের শবাধারে ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় রূপার পাতে "বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতার জমিদার ৫২ বৎসর বয়সে—১৮৪৬ খৃস্টাব্দের ১লা আগস্ট মৃত্যু" এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল।

দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ এদেশে পৌঁছিলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তৎকালীন ছোট-লাট স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের নেতৃত্বাধীনে টাউন হলে এ জন্য এক শোক সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দ্বারকানাথের ন্যায় সর্ববিষয়ে প্রতিভাশালী বাঙ্গালী খুব কমই জন্মিয়াছেন।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বজনবিদিত ও 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়া সর্বসাধারণে সম্মানিত। ধর্মময় পবিত্র জীবন ও আজীবন ধর্মালোচনার জন্য বঙ্গসমাজে ইনি 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনব্যাপী চেষ্টায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের শক্তি সুদৃঢ় হয়। সাধারণ হিতকর কার্যে তাঁহার চিরদিনই উৎসাহ ছিল। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ সর্বজনবিদিত।[১] রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি তাঁহার কবিত্ব প্রতিভায় পাশ্চাত্য জগতকে মুগ্ধ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'নোবেল-প্রাইজ' লাভ করিয়াছেন।[২] ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে Poet Laureate of Asia বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটিও তাঁহাকে গৌরবান্বিত ডাক্তার উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। (১৯১৪ খৃঃ)।

১. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) +সারদা দেবীর সন্তানসন্ততি—১ দ্বিজেন্দ্রনাথ (১৮৪০-১৯২৬) ২. সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) ৩. হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) ৪. বীরেন্দ্রনাথ (১৮৪৫-১৯১৫) ৫. সৌদামিনী (১৮৪৭-১৯২০) ৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫) ৭. সুকুমারী (১৮৫০-৬৪) ৮. পুণ্যেন্দ্রনাথ (১৮৫১-৫৭) ৯. শরৎকুমারী (১৮৫৩-১৯২৫) ১০. স্বর্ণকুমারী (১৮৫৬-১৯৩২)*১১. বর্ণকুমারী (১৮৫৮-১৯৪৮)*১২. সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৪-১৯২০) ১৩. রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ১৪. বুধেন্দ্রনাথ (১৮৬৩-৬৪)।

*. উভয়েই বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখিকা।

২. গ্রন্থ প্রকাশের দুই বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯১৩ খ্রী. অব্দে রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন।

পরিশিষ্ট

২য় সংস্করণের পরিশিষ্ট

কিরূপ অসমসাহসিকতা, অধ্যবসায় বলে, ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আমরা পূর্বে দিয়া আসিয়াছি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-বিখ্যাত 'সিপাহী-বিদ্রোহ' ঘটে। কিন্তু ইংরাজ শক্তির অদম্য সাহস ও রণকৌশলে এই বিদ্রোহ-অনল নির্বাপিত হইয়া পুনরায় সমগ্র ভারতে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ইংলণ্ডের তদানীন্তন সম্রাজ্ঞী ভারতজননী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। ভিক্টোরিয়ার মত অসীম শক্তিশালিনী, প্রজার মাতৃরূপিণী সম্রাজ্ঞী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তিনি ভারতীয়গণকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহার প্রমাণ, রাজ্য গ্রহণের পর রাজঘোষণা। ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক সাধারণ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। এই ঘোষণাপত্র ভারতের প্রধান প্রধান সহরে ইংরাজি ও সকল প্রদেশের স্থানীয় ভাষায় গঠিত হয়। এই ঘোষণাপত্রই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অমূল্য দান ও ভারতবাসীর চির গৌরবের জিনিস। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সন্তানবৎ প্রজাপালন, তাহাদের গুণানুসারে উচ্চ রাজপদ প্রদান, ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের প্রচলিত আইন-কানুনের স্বত্ব উপভোগ প্রভৃতি নানা ব্যাপার এই পত্রে উল্লিখিত ছিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম রাজ-প্রতিনিধি বা 'ভাইসরয়' পদে নিযুক্ত হন। কোম্পানির আমলে ভারতের প্রধান শাসমকর্তা গবর্ণর-জেনারেল নামে অভিহিত হইতেন। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে সমগ্র ভারতের রাজধানী এই কলিকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই যুগেই বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট প্রভৃতির সুব্যবস্থা প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও রাজপথসমূহ দ্বারা নগরীর সৌন্দর্য সাধন প্রভৃতি লোক-হিতকর ব্যাপারে অনুষ্ঠান হয়। আজকাল আমরা কলিকাতায় যে উন্নতি দেখিতে পাইতেছি তাহা ভিক্টোরিয়ান-যুগেই হইয়াছিল।

লর্ড ক্যানিংএর পর লর্ড এলগিন, লর্ড লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন, লর্ড রিপন, লর্ড ডাফরিন, লর্ড ল্যান্সডাউন, লর্ড এলগিন, লর্ড কার্জন, লর্ড মিণ্টো ভারত-সাম্রাজ্যের রাজ-প্রতিনিধি বা ভাইসরয়ের কাজ করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমানে স্বনামখ্যাত লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয় আমাদের রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয়। তাঁহার ন্যায় সমদর্শী, রাজনীতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ, প্রতিভাবান, সহৃদয় ও প্রজার প্রতি সমবেদনাপূর্ণ শাসনকর্তা খুব কমই এদেশে আসিয়াছেন। ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনার্থে তিনি যেরূপ আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা ভারতবাসীকে চিরদিন তাঁহার গুণানুরক্ত করিয়া রাখিবে। সমগ্র বঙ্গদেশকে একজন গবর্ণরের শাসনাধীনে আনিয়া ও বিভক্ত বঙ্গের সম্মিলনসাধন করিয়া, তিনি বঙ্গবাসীকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

লর্ড কার্জন যখন এদেশের রাজপ্রতিনিধি সেই সময়ে ভারতবাসীকে কাঁদাইয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবলোকে প্রস্থান করেন। মাতৃপ্রতিম মহারাণীর শোকে সমগ্র ভারত গভীর শোকাচ্ছন্ন হয়। সেই পবিত্র মৃত্যুর স্মরণার্থে, কলিকাতা গড়ের মাঠে যে বিরাট শোক-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না।

মহারাণীর স্বর্গলাভের পর তাঁহার সর্বগুণান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের গৌরবান্বিত ভারত-সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বিবিধ সদগুণশালিনী মাতার সমস্ত মহৎ গুণের তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন, এজন্য ভারতবাসীগণ তাঁহার রাজত্বকালে যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ করে। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মত শান্তিপ্রিয়, উদারপ্রাণ সম্রাট এ জগতের কোন দেশের সিংহাসন সমলঙ্কৃত করেন নাই। ভারতবাসীকে তিনি বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

কিন্তু আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, এইরূপ উদারচরিত পিতৃপ্রতিম রাজ্যেশ্বরের স্নেহ হইতে আমরা অকালে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে প্রথম আরোহণ করিবার দিনে, এই প্রার্থনা করেন, "হে দয়াময় বিধাতা! আমায় শক্তি দিন, ক্ষমতা দিন—যেন আমি প্রজার হিতসাধন করিতে পারি।" কিন্তু অধিক দিন তিনি ইংলণ্ডের চিরগৌরবান্বিত রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার অকালমৃত্যুতে আবার ভারতে শোকের ক্রন্দন জাগিয়া উঠে।

কিন্তু জগতে চিরদিন শোকের দিন থাকে না। সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে সেইজন্য আবার আনন্দের দিন আসিল। সর্বজনপ্রিয় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গলাভের পর আমাদের বর্তমান গৌরবান্বিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রজাবৃন্দ তাঁহাদের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রূপে পাইয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের শোক ভুলিয়াছে।

আমাদের বর্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তিনি একবার ভারতভ্রমণে আসেন। এই সময়ে ভারতীয় প্রজার রাজভক্তিতে তিনি বড়ই প্রীত হইয়া তাহাদের সম্বন্ধে একটা উচ্চ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন।

নব সম্রাট পঞ্চম জর্জের শুভাভিষেক মহোৎসব ভারতের ইতিহাসে এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা। ভারতবাসী যাহা কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই তাহাই তাহাদের অদৃষ্টে সফলস্বপ্নের মত হইয়া দাঁড়াইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আমাদের সর্বজনপূজিত সম্রাট জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ভারত রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার জন্য এদেশে আসেন। এ সময়ে দিল্লীতে এক বিরাট দরবারের অনুষ্ঠান হয়। এই দরবারের উৎসব ব্যাপার এখনও সকলেরই স্মৃতিপটে সমুজ্জ্বলভাবে জাগরিত।

সম্রাটের অভিষেক এবং দিল্লী-দরবারের সময় সমগ্র ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই সময়ে রাজরাজেশ্বর সম্রাটের আদেশে ভারত সাম্রাজ্যের সর্বজনপ্রিয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ অতীতকালের গৌরবান্বিত দিল্লীনগরীকে সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে ঘোষণা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতে কলিকাতা এতাবৎকাল সমগ্র ভারতের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল, কিন্তু গৌরবান্বিত ভারত-সম্রাটের ঘোষণানুসারে, ভারত-সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে উঠিয়া যায় এবং কলিকাতা বঙ্গ-সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। ইহাই কলিকাতার ইতিহাসের একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা।

এই রাজধানী পরিবর্তনের ফলে বঙ্গদেশ একজন প্রাদেশিক লাট সাহেবের বা গবর্ণরের শাসনাধীনে আইসে। বঙ্গবাসীর ভাগ্যবলে ও এই পরিবর্তনবশে, লর্ড কার্জনের আমলের দুইভাগে বিভক্ত বঙ্গদেশ এক হইয়া যায়। এই যুক্তবঙ্গের একাধিপত্য ও শাসনভার লর্ড কারমাইকেলের হস্তে অর্পিত হয়। লর্ড কারমাইকেলের মত একজন উদারচেতা, সহানুভূতিপূর্ণ শাসনকর্তাকে বঙ্গ-সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা রূপে পাইয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আজ গৌরবান্বিত ও বঙ্গবাসীগণ ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় আনন্দে উৎফুল্লচিত্ত। অবশ্য এই উদার দানের জন্য আমরা সর্বজনপ্রিয় বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের নিকট অতি কৃতজ্ঞ।

দিল্লীতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরিত হইলেও কলিকাতার প্রাধান্য পূর্ববৎ অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশের রাজধানী পদে বরিত হইয়া অতীত যুগে গৌড়, ঢাকা, রাজমহল, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নগরী যে গৌরব উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে কলিকাতা আজ সেই গৌরব লাভে গরীয়সী।

পাঠক! একবার কল্পনাবলে দুইশতাধিক বৎসর পূর্বের বনজঙ্গল সমাচ্ছন্ন কলিকাতার চিত্র কল্পনা করিয়া লউন। বর্তমানকালের গড়ের মাঠের কেল্লা হইতে প্রাসাদময়ী চৌরঙ্গী একদিকে ও অপর দিকে বর্তমানকালের হাটখোলা, বাগবাজার প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লী। এই সীমার মধ্যে বনজঙ্গলসমন্বিত, শ্বাপদসঙ্কুল, বাদাভূমিপূর্ণ, সর্ববিধ রোগের নিবাস, চোর ডাকাতদের উপদ্রবে সর্বদা অশান্তিময়, প্রাচীন কালের সেই কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামত্রয় বর্তমান ছিল। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে যেন বিচিত্র মায়াবলে সেই জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন কলিকাতা এখন গ্যাসালোকপূর্ণ, প্রস্তরময় প্রশস্ত রাজপথ-মণ্ডিত বিদ্যুতালোকোজ্জ্বল, প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা শ্রেণীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুই শতাব্দী পূর্বে চৌরঙ্গীর যে জঙ্গলে বাঘ ডাকিত, চোর ডাকাতেরা নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিত, এখন সেখানে সেণ্ট পল বা লাট-গির্জা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল ও প্রাসাদতুল্য অট্টালিকারাজি বিদ্যমান। কাল পরিবর্তনে সেই জঙ্গল ও বাদাভূমি পূর্ণ, অস্বাস্থ্যকর কলিকাতা এখন গ্যাসালোক রঞ্জিত বিদ্যুতালোকমণ্ডিত, গগনস্পর্শী সুবৃহৎ প্রাসাদসমূহে পরিপূর্ণ। বঙ্গদেশের রাজধানীর যাহাকিছু স্পৃহনীয় শোভাসম্পদ ও গৌরবের কলেবর বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা এই স্থানেই লেখনী সংযত করিলাম।

সকল বৃহৎ কর্মের শেষে স্বস্তি উচ্চারণ করিতে হয়। তাই আমরা প্রাণের আবেগে, ভক্তির উচ্ছ্বাসে এই সুবিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা চির গৌরবান্বিত ও চিরযশোপ্রভামণ্ডিত, ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর জয়োচ্চারণ করিয়া পুস্তকখানি পরিসমাপ্তি করিলাম।

ভগবানের কৃপায় আমাদের পঞ্চম জর্জ ও মেরী দীর্ঘায়ু, চিরসুখী ও চির জয়যুক্ত হউন।
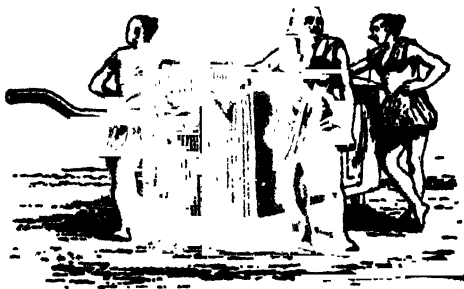
হরিসাধন মুখোপাধ্যায় : জীবনী

হরিসাধন হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে ডভটন কলেজ, পরে সিটি কলেজে কিছুদিন পাঠ গ্রহণ করেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি টেলিগ্রাফ চেক অফিসে একটি কর্মলাভ করেন এবং দীর্ঘদিন দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন থেকে যথা সময়ে অবসর গ্রহণ করেন। এই অফিস তখনকার ইম্পিরিয়্যালে লাইব্রেরির কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় তিনি প্রায় প্রতিদিন ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করতে যেতেন। এইখানেই সেকালের বিখ্যাত সিভিলিয়ান গবেষক বেভারিজ সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং বেভারিজ সাহেব তাঁকে বহুমূল্যবান গ্রন্থ এবং দলিল উপহার দান করেন।

এই ভাবেই ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখতে তিনি উৎসাহিত হন। 'নবজীবনে' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি সেই প্রবন্ধটির প্রতি আকর্ষিত হয়। তিনি তাঁর জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে লেখক হরিসাধনকে ডেকে পাঠালেন। রাখালচন্দ্র ছিলেন হরিসাধনের বন্ধু।

হরিসাধন লিখেছেন—"আমি সেই সৌম্যমূর্তি, প্রতিভার জীবন্ত আদর্শ সাহিত্য-সম্রাটের চরণ বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বঙ্কিমবাবুর পরিধানে একখানি পট্টবস্ত্র, গায়ে একখানি গরদের নামাবলী—বোধ হইল যেন 'ভবানীপাঠক' কিংবা 'সত্যানন্দ' আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।"

বঙ্কিমচন্দ্র হরিসাধনকে ঐতিহাসিক রচনাদির জন্য প্রশংসা করে উৎসাহিত করেন। তাঁর অনেকগুলি রচনা তখন 'নবজীবন', 'প্রচার', 'সাহিত্য', 'ভারতী' ও 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক ভাবে এবং হরিসাধনের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মনে করা হয়ত অসঙ্গত হবেনা যে 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' হরিসাধনকে এই জনসমাদর সেদিন উৎসাহিত করেছিল।

আজ থেকে প্রায় একানব্বুই বছর আগে যখন স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা তখন হরিসাধনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত উৎসাহ হরিসাধনের সাহিত্য জীবনের উষালগ্নে বিশেষ প্রেরণা দান করেছিল। এক সময় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় হরিসাধনের সহকর্মী ছিলেন, সেই সময় হরিসাধন প্রভাতকুমারের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্বর্ণকুমারীর কাছে নিয়ে যান এবং তার পর প্রভাতকুমারের ভাগ্য নূতন পথে চালিত হয়। সে অন্য ইতিহাস।

'ভারতী' পত্রিকাতেই হরিসাধনের অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইতিহাসবেত্তা সিভিলিয়ান বেভারিজ সাহেবের সঙ্গে এই সময় হরিসাধনের পরিচয় ঘটে। তখন উভয়েই মহারাজা নন্দকুমার বিষয়ে গবেষণায় রত ছিলেন।

১২৯১ থেকে ১২৯৯ এই কয়েক বছরের মধ্যে হরিসাধনের 'ঠগী রহস্য', 'আকবর শাহের হিন্দু প্রীতি', 'আকবর শাহের খোশরোজ', 'মোগল দরবারে ইংরাজ দূত', মোগল রাজত্বে বৈদেশিক দূত', 'জাহাঙ্গীর বাদশার দরবার', 'আকবরের স্বপ্ন', 'আবুল ফজল কলেমি', 'নূরজাহান', 'মুসলমান রাজদণ্ডবিধি' এবং 'নন্দকুমারের ফাঁসী' প্রকাশিত হয়। এইগুলি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। এছাড়া সেই সময় 'সাহিত্য', 'মানসী' এবং 'জাহ্নবী' পত্রিকাতেও অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

হরিসাধনের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের নাম 'পঞ্চপুষ্প' কয়েকটি ঐতিহাসিক কাহিনীর সমষ্টি। এই গল্পগ্রন্থ পাঠ করে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কমিশনার ক্রাইনার সাহেব লিখেছিলেন—

'Your writing is worthy of Sir Walter Scott."

হরিসাধনের অন্যান্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির নাম 'রঙ্গমহল' (১৩১৬), 'শীশমহল' (১৩২১), 'রঙ্গমহল রহস্য' (১৩২১) এবং ১৩২২ সালে প্রকাশিত হয় 'হারেম কাহিনী', ১৩২০ সালে 'নূরমহল', ১৩২৫ সালে 'শাহজাদা খসরু', 'লালচিঠি' ও 'মতিমহল' প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া প্রতি বছর পুজোর সময় কেশরঞ্জন পুরস্কার নামে একটি করে সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন। মোট প্রায় পঞ্চাশখানি উপন্যাস লিখেছেন। প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এই সব গ্রন্থগুলিই রাখা আছে।

এখন যুগের পরিবর্তনে এবং কালের ব্যবধানে হরিসাধন বিস্মৃত লেখকগণের পর্যায়ে কিন্তু একদা তাঁর গল্প এবং উপন্যাস বাঙালী পাঠকের চিত্তজয় করেছিল।

২৪। কমলার অদৃষ্ট (সামাজিক উপন্যাস, সচিত্র); ১৩২৪ সাল (২৬,১০,১৯১৭); পৃঃ ১-১২৫।
২৫। সফল-স্বপ্ন (উপন্যাস); আষাঢ় ১৩২৫ (১৯১৮); পৃঃ ১-১৮৪।
২৬। শাহজাদা খসরু (ঐতিহাসিক উপন্যাস, সচিত্র); ২৪,১১,১৯১৮; পৃঃ ১-২৭৬; মূল্য ২৲; পি, এম, বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং।
২৭। নাঁলা বেগম (রঙ্গমহল কাহিনী-১, সচিত্র); বৈশাখ ১৩২৬ (১৯১৯); পৃঃ ১-১৯২; মূল্য ১৸০; পি, এম, বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং।
২৮। শয়তানের দান (উপন্যাস); শ্রাবণ ১৩২৬ (১৯১৯); পৃঃ ১-১৪০; ৷৷০ (আট আনা) সংস্করণ গ্রন্থমালা, নং ৩৪।
২৯। পাপ্পার প্রতিশোধ (রঙ্গমহল কাহিনী-২ সচিত্র); ভাদ্র ১৩২৬ (৫,১১,১৯১৯); পৃঃ ১-২০৮; মূল্য ১৸০; পি, এম, বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং।
৩০। দেওয়ানা (রঙ্গমহল কাহিনী-৩); পৌষ ১৩২৬ (২৫,২,১৯২০); পৃঃ ১-১৯২।
৩১। চারুদত্ত (মৃচ্ছকটিক অবলম্বনে, সচিত্র); ফাল্গুন ১৩২৬ (১৯২০); পৃঃ ১-৩১০; মূল্য ২৲; পি, এম, বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোং।
৩২। গুল কাশেম (উপন্যাস); ১ বৈশাখ ১৩২৭ (১৯২০); পৃঃ ১-১৭০।
৩৩। সতীর সিন্দুর (উপন্যাস); ১৩২৭ সাল (১৯২০); পৃঃ ১-২৬২।
৩৪। রূপের মোহ (উপন্যাস); ৪,৬,১৯২৩; পৃঃ ১-১৫৬।
৩৫। লাল পলটন (উপন্যাস)
৩৬। রঙ্গমালা (উপন্যাস); ১৩১৫।
৩৭। মায়া (নাটক)

গ্রন্থ প্রসঙ্গে
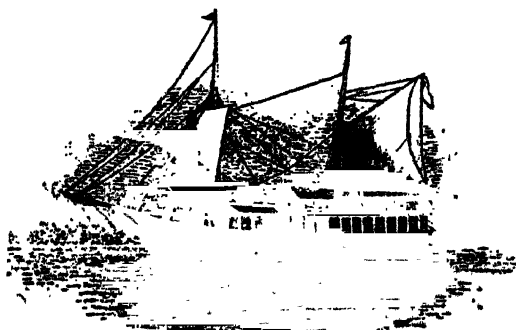
আচার্য সুকুমার সেন তাঁর আত্মকথা 'দিনের পরে দিন যে গেল' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ে, বঙ্কিম-রমেশ-হরিসাধনের উপন্যাস পড়ে ছেলেমানুষ আমাদের মনে ইতিহাস নিয়ে যে রোমান্টিক ভাব জমে উঠত তাতে আমাদের দৃষ্টি হত রঙীন। সেই রঙীন দৃষ্টি নিয়ে আমি প্রথম আগ্রা দেখেছি।' (পৃষ্ঠা ৫৮, ২য় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ)। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, ইতিহাসের রসসৃস্টিতে, ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের বিন্যাসে ইতিহাস-চর্চায় হরিসাধন মুখোপাধ্যায় কী পরিমাণ পারদর্শী ছিলেন। এখন থেকে সত্তর বছর আগে বাঙালি পাঠকসমাজে হরিসাধন ছিলেন প্রভাবশালী লেখক—কি ইতিহাস-আশ্রিত রোম্যান্স রচনায়, কি গোয়েন্দা কাহিনীতে, কি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিবন্ধ ও গ্রন্থ লেখার ক্ষেত্রে, কি সামাজিক গল্প উপন্যাস সৃষ্টিতে।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) সম্পর্কে তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র কল্লোল যুগের সাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় যে সুসমৃদ্ধ হরিসাধনের জীবনী মূলক লেখাটি দিয়েছেন তা থেকে হরিসাধনের কথা আমরা লাভ করি।—

" 'কলিকাতা সেকালের ও একালের উপন্যাস আকারে গঠিত ইতিহাস' খৃীস্টের সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কলিকাতা-ইতিবৃত্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৫-য়; ১৯২১-এ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণে 'গ্রন্থকারের নিবেদন' হিসাবে হরিসাধন লিখেছিলেন, "আজ বঙ্গীয় পাঠক-সাধারণের সম্মুখে, আমার সমগ্র জীবনের ঐকান্তিক সাধনার ফল, "কলিকাতা সেকালের ও একালের" লইয়া উপস্থিত হইলাম। বঙ্গ-সাহিত্যে এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ অভিনব। সুতরাং আশা হইতেছে—সুধী-সমাজে ইহার অনাদর না হইতেও পারে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে—যখন বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ—সেই সময়ে আমি আমার প্রথম রচনা লইয়া, কুণ্ঠা-কম্পিত হৃদয়ে, আচার্য অক্ষয়চন্দ্রের "নবজীবনে" প্রথম আত্মপ্রকাশ করি। আমার ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, নবজীবনের "প্রাচীন কলিকাতা"। তৎপরে সাহিত্যভারতী প্রভৃতি দীর্ঘজীবি মাসিক-পত্রিকা সমূহে, এই ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া, প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ লিখিয়া আসিয়াছি। সাময়িক সাহিত্যের সহিত পরিচিত আধুনিক যুগের মত, তখন বাঙ্গলার বহু ঐতিহাসিকের সৃষ্টি হয় নাই। তখনও অনেক জ্ঞাতব্য ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের এই অভাব অপনোদন-কল্পে আমার ইতিহাসালোচনা-সঞ্চিত ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা, সময়ে সময়ে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম, এবং সেই সময় হইতে আজি পর্যন্ত সংসার-সংগ্রামে কর্মক্লান্ত জীবনে যখনই অবসর পাইয়াছি, তখনই ভারতের বিভিন্ন শতাব্দীর বিভিন্ন পর্যায়ের ইতিহাস হইতে যাহা কিছু নূতন আবশ্যক মনে হইয়াছে—যৎকিঞ্চিত হইলেও, অসঙ্কোচে তাহা বাণীর চরণে অর্ঘ্য দিয়া আসিয়াছি। বলিতে পারিনা—আমার ক্ষীণ চেষ্টায়, সাহিত্যের কিছুমাত্র পুষ্টি হইয়াছে কিনা? অন্তরের সেরূপ কোনও স্পর্ধা করিবার সাহস ও শক্তি আমার নাই।

যাউক সে কথা। বাঙ্গলার ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন—সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই প্রকৃতপক্ষে কলিকাতার ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ের ও তাহার পরবর্তীকালের প্রাচীন কলিকাতার বিবরণ এ পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় এতাদৃশ বিশদভাবে আলোচনা হয় নাই বলা যায়, এবং এরূপ আলোচনা একান্ত সহজসাধ্যও নহে। এই নিমিত্ত প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে দুষ্প্রাপ্য বিবরণসমূহ সংযোজন করিতে আমাকে বহু দুষ্প্রাপ্য উপাদান সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তথ্যানুসন্ধিৎসু পাঠক, বর্তমান গ্রন্থে এই সকল কষ্টার্জিত উপাদানের অনেক পরিচয় দেখিতে পাইবেন। কি করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়—কি করিয়া ইংরাজবণিক বঙ্গে প্রবেশ করেন, কি করিয়া কলিকাতা, সুতানুটি প্রভৃতি জঙ্গলপূর্ণ গণ্ডগ্রাম, কোম্পানি বাহাদুরের হস্তগত হয়, কি করিয়া এই সামান্য জমীদারী হইতে এই বিশাল ভারত, মহাশক্তিমান ইংরাজ জাতির শাসনাধিকারে আসিয়াছে—তৎসম্বন্ধে এবং সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য ঘটনা এই সুবৃহৎ গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এরূপ সুবৃহৎ গ্রন্থে নানা বিষয়ের ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ বর্তমান গ্রন্থেও অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে। সুতরাং সহৃদয় পাঠক ও সমালোচকগণ কেহ এ সম্বন্ধে কোন ভ্রম আমাকে প্রদর্শন করিলে, অথবা পুস্তকের উৎকর্ষের জন্য কোনরূপ পরামর্শ প্রদান করিলে, ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থখানি সুধী-সমাজের উপযুক্ত করিবার জন্য, জ্ঞানতঃ যে কোন প্রকার ত্রুটী করি নাই—একথা বলাই বাহুল্য। সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার উদ্যম আমার এই প্রথম এবং বোধ হয়, গৌরবান্বিতা বাণীর চরণে ইহাই আমার শেষ শতদল। এক্ষণে ইহার উদ্দেশ্য সফল হইলে, আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

যে সকল দুষ্প্রাপ্য ও সহজপ্রাপ্য পুস্তকাদির সহায়তায়, এই গ্রন্থের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার এক সংক্ষিপ্ত তালিকা এই পুস্তকে সংযোজিত হইল। সহৃদয় পাঠকগণ কেবল এইটুকু মনে রাখিবেন, এই পঁচিশ বৎসরকাল, আমি প্রাচীন কলিকাতা সম্বন্ধে যে সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছি, এই গ্রন্থ তাহার চরম ফল।

দুই বৎসরকাল ধরিয়া এই সুবৃহৎ ইতিহাস-গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেক আদিব্যাধি ও মনের অশান্তি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এরূপ বহু ব্যয়সাধ্য ও শ্রম-সাধ্য ব্যাপার নিষ্পন্ন করিতে, আমায় যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পুস্তকখানি সুধীগণের যৎকিঞ্চিত চিত্তরঞ্জন করিলেও বুঝিব, আমার জীবনব্যাপী উদ্যম ও পরিশ্রম বিফল হয় নাই।

বর্তমান পুস্তকে অনেকগুলি হাফটোন-ছবি সংযোজিত হইয়াছে। ছবিগুলি অতি পুরাকালের দুষ্প্রাপ্য চিত্রের প্রতিলিপি। ইংরাজী ইতিহাসের মত এক বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, নানা অসুবিধায় এ সংস্করণে তাহা করিতে পারিলাম না।

সুপ্রসিদ্ধ পি, এম, বাকচী কোম্পানির স্বত্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন বাকচী মহাশয়, এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে ভারগ্রহণ করায়, এতাদৃশ সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রচার হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় উদ্যমশীল ও সৎসাহিত্যের উৎসাহদাতা, আমার পৃষ্ঠপোষকরূপে না থাকিলে' এ কার্য আমার পক্ষে এক দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হইত। এজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

"আহিরীটোলা ইউনাইটেড রিডিং-রুমস" নামক সুবৃহৎ পাঠাগারের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল চন্দ্র এম-এ, বি-এল, মহোদয়, তাঁহাদের লাইব্রেরির কয়েকখানি অতি প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, আমাকে সুদীর্ঘকালের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়া, কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

বিনীত গ্রন্থকার

বেহালা, (২৪ পরগনা)
ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫

হরিসাধন তাঁর গ্রন্থ রচনার জন্য যেসব বইপত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন তার একটি তালিকা তিনি দিয়েছেন; তা নিম্নে উদ্ধৃত হল—

1. Beveridge—*History of India* (1958-62).
2. Richardson, D. L. Edited *Bengal Annual*,
3. *Illustrated Hand-Book of Calcutta* (Black & Co.), 1864.
4. Blechynden, Kathleen—*Calcutta Past and Present*, 1905-1978.
5. Blockmann, H—*A paper on Old Calcutta*, 1864.
6. Bolts, William—*Considerations on Indian Affairs*, 1772.
7. Buckland, C.E.—*Bengal under the Lt. Governors*, 1901.
8. Long J.—*Selections from the Old Calcutta Gazettes*.
9. Setoncarr and others— *Do* *Do*, 6 Vols.
10. J. C. Marshman, *Calcutta Review—Calcutta in Olden Time*, Vols XVII and XXV 1852-55.
11. Carey, H.H.—*The Good Old days of Hon'ble John Company*, Vols. I & II, 1882.
12. *Compendious Ecclesiastical and Historical Sketches of Bengal*, 1819.
13. Cotton, H.E.A.—*Calcutta Old and New*, 1907, 1981.
14. Dey, S.C.—*Hooghly Past and Present*.
15. Busteed, H.E. Dr.—*Echoes from Old Calcutta*, 1882, 1888.
16. Firminger, Rev. W.K.—*Thacker's Guide to Calcutta*.

17. Hart, Rev. W.H.—*Old Calcutta. Its Places and People One Hundred years ago*, 1895.
18. Hunter, Sir William—*India*, 2 Vols.
19. Hedges—*Diary Haklyut Societ's Edition* 1681,1688.
20. Holwell—*India Tracts*. (1774).
21. Hyde, Rev. H.B.—*The Parish of Bengal.*
22. Hamilton—*East India* (being the observations and remarks of Capt. A. Hamilton who resided in those parts from the years 1688 A.D. to 1728).
23. *Indian Review* Vol. III.
24. *List of Tombs Statues and Monuments in Bengal*, 1896.
25. Long, Rev.J.—*Peeps into Social Life in Calcutta a century ago, & Selections from Unpublished Records of the Government, 1748-67.*
26. Mitchel, Edmund—*Guide to Calcutta*, 1890.
27. Ray, A. K.—*Census Report*, Vol. VII.
28. Stewart—*History of Bengal*, 1813-original Edition.
29. Sterndale, R.C.—*Historical Account of the Calcutta Collectorate*, 1855.
30. Wheeler, J. Talboys—*Early Records of British India*, 1879.
31. Wilson, C.R.—*Early Annals of the English in Bengal* (3 vols.)
32. Bose, N. Edited *Biswakosha*—Several vols.
33. Banerji, Babu Kali Prasanna—*History of Bengal.*
34. Halder, Babu Madan Mohan—*Basuka* (an account of the Setts and Bysacks in in Old Calcutta.
35. Copy of a piece of rare Manuscript containing the account of Kamdeva Brahmachari the founder of Barisa Sabarna Family (kindly supplied by Babu Harish Chandra Ray Chowdhury).
36. Ray, Babu Nikhilnath—*History of Mushidabad*
37. Sastri, Pandit Satya Charn—*Pratapadityacharit.*
38. *Aitihasika Chitra* (Monthy Magazine)
39, Deb, Raja Benoy Krishna—*Early Growth & History of Calcutta*, 1905.
40. Ghosh, N. Bar-at-law—*Life of Maharaja Nabakrishna*
41. *Bengal Past and Present* (Calcutta Historical Society's Journal).
42. *Kalikhestradipika* etc.
43. *Sahitya Parisat Patrika.*
44. *Calcutta Review* (Old Numbers) Containing the Articles—Territorial Aristrocacy of Bengal.
45. Ghosh—*History of Indian Chiefs and Zaminders.*
46. *History of the Supreme Court* (Calcutta Review).
47. Hunter, Sir W.—*Statistical Account of Bengal*
48. *District Gazetteers—Jessore and Hoogly* (New Edition).
49. Saraswati, Prannath B.L. —*The Administration of Warren Hastings*
And several other Works.

'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে নিম্নলিখিত চিত্রসূচী ছিল—
১। ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ। ২। ভারত-সম্রাজ্ঞী মেরী। ৩। লর্ড হার্ডিঞ্জ। ৪। লর্ড কারমাইকেল। ৫। কবিকঙ্কণের বর্ণিত কলিকাতা ৬। সম্রাট আকবর ৭। মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্থাপিত যশোরেশ্বরী ৮। প্রাচীন কলিকাতা সহরের নক্সা ৯। প্রাচীন কালের কলিকাতা ১০। জোব চার্নকের হস্তাক্ষর ১১। জোব চার্নকের আমলের ও তৎপরবর্তী কালের কলিকাতা ১২। জোব চার্নকের সমাধি ১৩। অতি প্রাচীনকালের কলিকাতা, কালীঘাট ও আদিগঙ্গা (তিনশত বৎসর পূর্বে) ১৪। পুরাকালের ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ১৫। রাজা সীতারাম রায়ের হস্তাক্ষর ১৬। জন জেফানিয়া হলওয়েল (কলিকাতার জমিদার) ১৭। ১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার নক্সা ১৮। প্রাচীন দুর্গ ও কলিকাতা সহরের নক্সা (১৭৫৩ খ্রীঃ) ১৯। বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ২০। কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ (গঙ্গাধারের দৃশ্য) (ইহাই সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন) ২১। লর্ড ক্লাইভ ২২। পলাশীক্ষেত্রে বিখ্যাত ক্লাইভের সহযোগী অ্যাডমিরাল চার্লস ওয়াটসন ২৩। হলওয়েল প্রতিষ্ঠিত ব্ল্যাক-হোল স্মৃতিস্তম্ভ ২৪। পুরাতন কেল্লার ব্ল্যাক-হোল গৃহের দৃশ্য ২৫। লর্ড কার্জন প্রতিষ্ঠিত ব্ল্যাক-হোল স্মৃতি ২৬। কলিকাতার পুরাতন দুর্গ (লেফটেন্যান্ট ওয়েলসের প্ল্যান) ২৭। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের লালদীঘির দৃশ্য ২৮। ওয়ারেন হেস্টিংস ২৯। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস ৩০। স্যার জন ক্লেভারিং ৩১। রিচার্ড বারওয়েল ৩২। হেস্টিংস হাউস ৩৩। গবর্ণমেন্ট হাউস ও কাউন্সিল হাউস ৩৪। শতাব্দী পূর্বে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট ও এস্প্ল্যানেড (ধর্মতলা) ৩৫। সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স ও খিদিরপুর প্রতিষ্ঠাতা

কশেজ কিড, ৩৬। প্রাচীন কলিকাতার সাধারণ দৃশ্য (গঙ্গার ধার ১৭৯৪ খৃঃ) ৩৭। রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্র ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তাক্ষর প্রতিলিপি ৩৮। সুপ্রীমকোর্টের প্রথম জজ স্যার ইলাইজা ইম্পি ও তাঁহার সহযোগিগণ ৩৯। প্রাচীনকালে ওল্ডকোর্ট হাউস দৃশ্য (১৭৮৪ খৃঃ) ৪০। শতাব্দ পূর্বে চৌরঙ্গী ও তৎপার্শ্বস্থ ময়দান (১৭৯২ খৃঃ) ৪১। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের সেন্ট্রাল গির্জা ৪২। বর্তমান কালের রাইটার্স বিল্ডিং ৪৩। শতাধিক বৎসর পূর্বে বাগবাজার ও কুমারটুলী (চিৎপুর রোড) ৪৪। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব-বাহাদুর ৪৫। কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউস বা লাট প্রাসাদ ৪৬। বর্তমান কালের হাইকোর্ট ও গঙ্গাতীরস্থ পথের দৃশ্য ৪৭। বর্তমান কালের লালদীঘি ৪৮। বর্তমান কালের এসপ্ল্যানেডের দৃশ্য ৪৯। মনুমেণ্টের উপর হইতে পরিদৃশ্যমান বর্তমান কলিকাতা।

'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা ছিল ১০৩৪, মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণের মূল্য ছিল তিন টাকা।

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৯১৪-য় যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল তার মুখ্য অংশ এখানে দেওয়া হল—
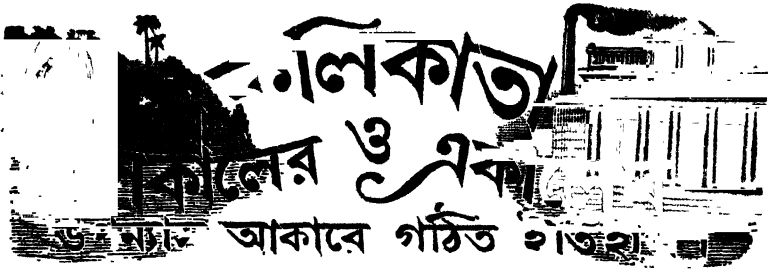
ইতিহাস জগতের বিরাট ব্যাপার। একাধারে ইতিহাস ও সুখপাঠ্য উপন্যাস। অসংখ্য হাফটোন চিত্র। নবাবী আমল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এবং পুরাতন কলিকাতার (দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বের) ম্যাপ, নক্সা ও নানাবিধ দৃশ্য সম্বলিত। প্রায় তিনশত বৎসরের ঐতিহাসিক ঘটনা। বাদশাহী আমলের কলিকাতা, নবাবী আমলের কলিকাতা, ইংরাজের প্রথম আমলের কলিকাতা, আর বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান কলিকাতা।

... ...

ডিমাই আট পেজী ১০০ ফর্মার উপর। কমবেশী এক হাজার পৃষ্ঠা। সুন্দর কাগজ উৎকৃষ্ট ছাপা, বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ৩৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

উক্ত বিজ্ঞাপন থেকে এ সংবাদও জানা যায় যে গ্রন্থখানি সেকালে অর্থাৎ আজ থেকে সত্তর বছর আগে (১৯১৫-য় প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়) গ্রাহক-ভিত্তিতে গ্রন্থখানি বিপণনের ব্যবস্থা হয়েছিল। গ্রন্থখানি যে তখনকার পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছিল, তা সহজেই অনুমান করা যায়; কারণ মাত্র ৬ বছরের ব্যবধানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে কিঞ্চিত মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। দ্বিতীয় সংস্করণও স্বল্প কালের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। প্রায় ষাট বছর পরে গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

'কলিকাতা সেকালের ও একালের' গ্রন্থের সূচীপত্র ছিল বিস্তৃত, অর্থাৎ অধ্যায়ের প্রথমে যে আলোচনা সূত্রগুলি আছে, সেগুলি সূচিতেও দেওয়া ছিল: বাহুল্য বিবেচনায় বর্তমান সংস্করণে সেই বিস্তৃত সূচি দেওয়া হয় নি।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

৪, ২, ১৯৮৫

(ওপরের কাঠের ব্লকটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের টাইটেলে ব্যবহৃত হয়েছিল।)

নির্ঘণ্ট

স্থান

ছ

জ

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তি

ও

ট